পরিচারিকা।

(নব পর্য্যায়)

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

তৃতীয় বর্ষ।

১৩২৫ অগ্রহায়ণ—১৩২৬ কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

তৃতীয় বর্ষ।

১৩২৫ অগ্রহায়ণ—১৩২৬ কার্ত্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

——:*:——

পরিচারিকা—সূচী।

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
	(থ)	
থিয়েটার দেখা (চিত্র)	শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী	৭৮৩
	(দ)	
দরবেশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৪৪৯
দিদি (আলোচনা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি,	৬০১
দিন যায়, মাস যায় (কবিতা)	শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,	৬০২
দিন যায়, যাক্ দিন চলে (কবিতা)	শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,	৭৫৫
দীপালী (কবিতা)	"বনফুল"	৭৬৯
দু'জনের একজন ঐ	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৬৩৮
দুরন্ত ঐ	শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র	৫৮২
দুঃখের রাজ্য ঐ	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৫৭৯
দেবতা (গল্প)	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী	৬৩৩
দেবেন্দ্র সঙ্গমে	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৮১০
	(ধ)	
ধর্ম্মসমন্বয়ে আকবর বাদসাহ	শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় বি-এ,	২৪
	(ন)	
নাবুঝ (কবিতা)	শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,	৫৫৫
নারী ঐ	শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ সরকার	৫৫২
নিবেদন	সম্পাদিকা	১
নূতন দেশের নবীন প্রভাত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৬৮০
	(প)	
পণ্ডিতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	৪৫৯
পত্র ঐ	শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	১৮৪
পথ ঐ	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	৩৪৮
পয়লা এপ্রিল (গল্প)	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	৪৪৪
পরম্পর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ,	৬৮৩
পরিশিষ্ট	কোচবিহার সাহিত্য-সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী—৪৮২ পৃষ্ঠার পর	
পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি	শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি-এ,	৪৭৪
পল্লীর গর্ব্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৩২৭
পাগল (গল্প)	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৯
পাগলী (কবিতা)	সম্পাদিকা	৭৪০
পার্ব্বতী (গল্প)	ঐ	১০৮
পুত্তলিকা চতুষ্টয় (গল্প)	শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবী	১৮৮
পুজনীয়া ৺কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু উপলক্ষে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি	২৮০
পুষ্করিণী (কবিতা)	সম্পাদিকা	১৬৭
পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের সাম্প্রদায়িকতা	কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর	২০৮
প্রতিবাদ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৫১৭
প্রদীপ ঐ	'বনফুল'	২৭১
প্রভাতী ঐ	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু	২৬৬

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

লেখক লেখিকার নামানুক্রমিক সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা সূচী।

(ম)

পরিচারিকা সূচী।

চিত্র-সূচী

'ঝঞ্ঝায় সান্ধ্য-প্রদীপ'

চিত্রশিল্পী—শ্রীঅনাদিনাথ সান্যাল।

চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর সৌজন্যে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

যিনি দিনকে মাসের মধ্যে, মাসকে বৎসরের মধ্যে ও আবার বৎসরকে যুগের মধ্যে চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছেন আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরিচারিকা-ব্রতের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ করি! যে মানব-দেবতা সর্ব্বমানবের মধ্যে থাকিয়া এই দুই বৎসর সেবার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আজও আবার এই নূতন বৎসরের প্রারম্ভে এই তরুণ উষার স্নিগ্ধালোকে পূজার প্রতীক্ষায় হৃদয়-মন্দির-দ্বারে উপস্থিত! তিনি যে হৃদয়ের সেবারূপ পূজা গ্রহণ করিয়াছেন সে যে তাঁহার ঐ বরাভয় হাস্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! আয় তবে দীনা হীনা পূজারতা পূজারিণী, তোর পূজা দে, তোর সেবা দে, তোর সুখে-দুঃখে আন্দোলিত, নিন্দা-প্রশংসায় সম্পীড়িত, হাসি-অশ্রুতে বিমথিত হৃদয়খানি এই জীবন-দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দে আর তাঁহার ঐ দক্ষিণ হস্তের কল্যাণ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নূতন উৎসাহে নিষ্কাম সেবাব্রতে আজ দীক্ষা গ্রহণ কর্! এ ত শুধু জ্ঞানের পূজা নয়, এ যে ভক্তির পূজা তাই আজ সেবাই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিল, পরিচারিকা সেবা করিবে—আর বিশ্বদেব তাহা গ্রহণ করিবেন, ইহার চেয়ে সহজ আর কি হইতে পারে? এই বিশ্ব—যাহার ভিতরে বাস করিতেছি, যাহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছি, শ্রবণ দিয়া শুনিতেছি, হস্ত দিয়া স্পর্শ করিতেছি, সেখানেই সেবা দান করা এ যে বড় সহজ বড় সুন্দর, এই যেখানে নরে-নরে নারায়ণ, নারীতে-নারীতে নারায়ণী! যিনি আপনার আত্মার কণা-কণা অংশ দিয়া এত বড় জীবাত্মার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি—এক রূপকে যিনি বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে পূজা দেওয়ার মত সহজ সুন্দর সাধনা আর কি আছে?

বড় দুঃখের এই সেবা, বড় আঘাত সংঘাতের, বড় ক্ষতি অপমানের তবু দিতেই হইবে, কারণ ইহাতে আনন্দ আছে, এই সেবার গোড়ার কথা আনন্দ,—কিনা আনন্দ হইতে এই সেবার আরম্ভ, আবার শেষের কথা আনন্দ —কিনা আনন্দেই ইহার লয়! আর মাঝের কথাও আনন্দ কিনা—অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয় এই সেবার জন্য, ভক্তের ইহা হইতে অধিক আনন্দের কথা আর কি আছে? যে সেবা আনন্দের ভিতর জন্ম লইয়া দুঃখের সঙ্কটময় পথে আনন্দের তীর্থে লীন হইয়াছে সেই সেবা দিবার সাধন-যজ্ঞ আজ আরম্ভ হইল,—কাহাকে? না যিনি প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎসর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর সকল হইতে প্রিয়—অন্তরতর এই পরমাত্মা, এবং যিনি মহান্ প্রভুর্ব্বৈপুরুষঃ এই মহান পুরুষ সকলের প্রভু।

আত্মদান।

—ঃ*ঃ—

সুখের হাসি দুখের ঘন অশ্রু-ধারে
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব আপনারে।
একহাতে দান ক'রে আবার রাখ্‌ব না ক আশা পাবার;
টিঁক্‌তে এবার দিব না আর অহঙ্কারে,
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব আপনারে।

অনেক পেলাম হর্ষব্যথা এই জীবনে,
ভারের বোঝা বাড়িয়েছি যে আপন মনে।
আমার ভাল-মন্দ-মেশা কেবল পাবার নেবার নেশা,
তোমার পায়ে ঢাল্‌ব প্রভু দেওয়ার ভারে;
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব আপনারে।

মুক্ত ?

—ঃঃ—

সত্যই আজ আমি মুক্ত,—কারাগার হ'তে ছুটী পেয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি; সংসারে আমার এমন একটু কিছু নেই, যাতে আমায় বাঁধ্‌তে পারে, যাতে আমি প্রাণ খুলে বল্‌তে পারি—ঐখানে আমার আকর্ষণ! মুমুক্ষু না হয়েও মুক্তি আমার আজীবনের সঙ্গী হতে উঠেপড়ে লেগেছে,—সেই জন্মতিথি হ'তেই! মার জঠর থেকে মুক্ত হ'তে না হ'তেই বিধাতা মাতৃস্নেহ হ'তে মুক্তি দান করেছিলেন, সেই সঙ্গে দেহ হ'তে প্রাণপাখিটি মুক্তি পেল না কোন্ অপরাধে! পিতাও পরপারে চলে গিয়েছিলেন, কয়েক মাস পূর্ব্বে,—সুতরাং সংসারে আমায় বাঁধবার নিজের কেউ আর ছিল না। এক বৃদ্ধা,—প্রতিবেশিনী,—সে একে একে সব হারিয়ে, মুণ্ডিতশীর্ষ কদম্ব বৃক্ষের মত সংসারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল; শুন্‌তে পাই, মায়ার বন্ধন ছিন্ন হ'লেই নাকি মোক্ষলাভ,—বৃদ্ধা জীবনের খেওয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েও মোক্ষলাভের মহাসুযোগ উপেক্ষা করেছিল—মায়ার বাঁধনে আবার ধরা দিয়াছিল—মায়াবন্ধনহীন আমায় বাঁধ্‌তে! গ্রামের সকলেই বলেছিল, শুনেছি,—"ও-ছেলে কি বাঁচে—জন্মমাত্রই যে মাতৃ-হারা"—তবু আমি বৃদ্ধার, মায়ের অধিক যত্নে বেঁচেছিলেম; অনেক দিন বুঝ্‌তে পারি নাই, জান্‌তাম না আমার মা নাই; সে কথা শুনেও আমার তা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'ত না। বৃদ্ধা ছিল আমার পিতামাতা সর্ব্বস্ব!

দিন ত কাট্‌ছিল বেশ! সুখও ছিল না,—দুঃখও ছিল না,—অভাব আমাদের সামান্য—অল্পেই আমরা সুখী ছিলেম, দিন ত কাট্‌ছিল বেশ! সে এক কন্‌কনে শীতের রাতে বৃদ্ধার প্রবল বেগে জ্বর এল—সাত দিনেও তার

বিরাম হ'ল না—একজ্বরী বুকের ব্যথা। কব্‌রেজ বল্লেন—"এ যাত্রা বুঝি বুড়ী বাঁচে না।" সে কথা শুনে প্রাণমন আমার হাহাকার করে উঠ্‌ল,—চোখের জল ধরে রাখ্‌তে পার্‌লেম না। প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করছিলেম,—তার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেম—আমার কেবল মনে হ'ত—বুঝি এবার বুড়িমাকে আমার হারাই! অশ্রু গোপন করতে চেতাম—পারতেম কৈ? বৃদ্ধা তা বুঝ্‌তে পেরেছিল—সে তার ক্ষীণ হস্তে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলত, "কাঁদিস্ কেন বাছা, আমি ভাল হয়ে উঠবো।" হায়! আশা!

তিন সপ্তাহ সেই ভাবে কেটে গেল! দরিদ্রের সংসার, কিই বা ছিল—আর কিই থাক্‌বে! যা ছিল, তা বেচে এতদিন ঔষধপথ্য চলে ছিল—সে দিন সব তার শেষ হয়ে গেছে,—বন্ধু বল্‌তে ছিল যারা—তাদের সে অবস্থা বুঝ্‌তে বাকী ছিল না,—ধার দিবার ভয়ে তা'রা সরে পড়েছিল,—আমার তখন চারদিকে আঁধার! সেই অনটনের সংসারে কব্‌রেজ পর্য্যন্ত বিরূপ হলেন—স্পষ্টই বলে গেলেন—'চেষ্টা আর বৃথা—বৃদ্ধা আর কিছুতেই বাঁচবে না!' শুনে প্রাণ শুকিয়ে গেল, কব্‌রেজের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লেম, তিনি তখন কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—চেষ্টা চলুক; বলকর পথ্যের চেষ্টা দেখ।—যে অবস্থা—আমার ভিজিটটা না হয় পরেই দিও।"

বলকর পথ্য পাই কোথা,—আড়াই টাকা সের বেদানা—ক'দিন চালাতে পারি,—তখন এক কপর্দ্দকও হাতে নাই যে!

বৃদ্ধার প্রাণ বুঝি বেদানায়,—তাকে একা ফেলে তারই চেষ্টায় চল্লেম। বাজারের সাম্‌নে বাবুরা "কোন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য" বক্তৃতা করছিলেন—দাঁড়িয়ে একটু শুন্‌লেম,—ভাব্‌লেম আমিও যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এঁদের কাছে চাইলে কিছু পাওয়া যেতে পারে! আশায় বুক বেঁধে কিছু প্রার্থী হতে চেলেম,—মুখে কথা ফুট্‌ল না,—দরিদ্র হই, ভিক্ষা সেই প্রথম! অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁদের একজনের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানালেম—বিমুখ হতে হ'ল—ও-অর্থ ওখানে ব্যয়ের জন্য নয়! বেদানা,—ফলের দোকানে থাকে থাকে সাজান রয়েছে,—কত কাকুতি মিনতি করে তার একটা ধারে চেলেম,—আমায় বিশ্বাস করে কে ধার দেবে!—অবশেষে ভিক্ষা চাইলাম—তাতেও "না"। খেটে খেতে—উপার্জ্জন ক'রে বেদানা-রসের মাধুর্য্য উপভোগ করতে একজন বাবু আমায় উপদেশ দিলেন। আমার বেদনা বুঝ্‌বার কেহই ছিল না!

অবশেষে বল্‌তে লজ্জা হয়,—নিজের উপর—মানুষের উপর, সকল আস্থা হারিয়ে যে কার্য্যে মতি হ'ল তা জগতের চক্ষে—সমাজের চক্ষে অতি হীন। আমি সত্যসত্যই তাই করে বস্‌লেম,—মুখ ফুটে বল্‌তে জিভে আট্‌কে আস্‌ছে,—আমি ফলের দোকান হতে চুরি কর্‌লেম বেদানা!—আমার বুড়িমার প্রাণ!

বেদানার রসে সত্যই যেন বৃদ্ধার দেহে বল দিল—সে দিন সে বেশ কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লো—সবই প্রায় আশার কথা। অসদুপায়ে ফল এনে প্রাণে কেমন একটা অশোয়াস্তি অনুভব করছিলেম—বুড়ীর আশার কথায় আমার সে ভাব কেটে গেল!

বেদানা শেষ হয়ে গেল। আবার বাজারে বেড়িয়ে পর্‌লেম—বেদানা চুরি কর্‌তে! সে আশঙ্কার কথা, প্রবৃত্তির নিবৃত্তির, বিবেকের দ্বন্দ্বকলহের কথা আজ আর কাজ কি! চুরি কর্‌ব বলেই সে রাতে বেড়িয়েছিলেম চুরিই কর্‌লেম! হা হরি!

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন চুরি চল্ল,—চার দিনের অপরাধ বিধি বুঝি সইতে পার্‌লেন না; প্রবৃত্তিই বা কে দিল নিবৃত্তির ব্যবস্থাই বা কর্‌ল কে! দোকানী পূর্ব্বের চুরি লক্ষ্য করে সাবধান হয়েছিল; বমাল

আমাকে পাকড়াও করলে। গালি মন্দ কিল চড়ের অবধি থাক্‌ল না,—একটি কথাও বল্‌তে পারলেম না,—কাতরতার একটি নিশ্বাস পড়ল না—প্রাণটা পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। মনে কেবল হচ্ছিল—"হায়! হ'ল কি—এ কি করে ফেল্‌লাম!"

পুলিস এসে হাতে হাতকড়া দিতেই প্রাণটা চম্‌কে উঠ্‌ল,—তাই ত,—কি করতে এ কি হয়ে গেল! হায়! বুড়ীমাকে আমার দেখ্‌বে কে! তার যে আর কেউ নাই! এত দূরে নেমেও তাকে রক্ষা করতে পারলেম না! স্মরণে এল না তখন—রক্ষা করবার আমি কে; ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলেম। মনে হচ্ছিল কেবল বুড়ীর দশা। বুক ফেটে কান্না এল; আর ঠিক থাক্‌তে পারলেম না। মেয়েদের মত কেঁদে লুটিয়ে পড়্‌লেম,—কারো তাতে দয়ার উদ্রেক হ'ল না, বরং বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে ভগ্নহৃদয় আরো চূর্ণ করে গেল।

বাহ্যিকভাবে দৃঢ় হলেম বটে; মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌লো না। হাজতের জনহীন কক্ষে, রজনীর স্তব্ধতায় আমার কানে কেবলি ধ্বনিত হ'ত বৃদ্ধার কণ্ঠ: চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তো—তার রোগক্লিষ্ট বদনখানি, মনে পড়্‌তো তার সে দিনের কথা!—"কাঁদিস্ কেন বাছা! আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব।" আর ভাল হয়েছ, কে তোমায় দেখ্‌ছে! আয়ু থাক্‌তেই মৃত্যু লেখা ছিল তোমার। এ দু'দিন কি করে কাটছে মা!

বিচারের দিন হাকিমকে সব খুলে বল্লেম। দয়া ভিক্ষা চেলেম। অপরাধ করেছি, শাস্তি দিন, দু'দিন কেবল অপেক্ষা করুন, বুড়ি একটু সেরে উঠুক, আমি আপনি এসে যে শাস্তি হয় গ্রহণ কর্‌বো।

সে কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌ল কিনা জানি না; তবে হাকিম বুড়ির খোঁজে লোক পাঠালেন, বোধহয় আমার কথার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্যে। লোক ফিরে এসে যে সংবাদ শুনাল,—সে কথা যে আজও মুখে আন্‌তে প্রাণ ফেটে যায়, বুড়ীর নাকি সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেছে। তবে আর কিসের জন্যে কোন্ আশায় মুক্তি প্রার্থনা! হাকিমকে বল্লেম "হুজুর দয়া করুন! আমার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করুন—চোর আমি,—বুড়ীর প্রাণহন্তা আমি—যদি বেদানা চুরি না করতেম—তা হলে কি আজ এমন ভাবে—একা, না জানি কি হতাশার মধ্যে—কি কষ্টে তার প্রাণ বেড়িয়েছে রে—বেদানায় না হ'ক অন্য উপায়ে হয় ত তার প্রাণ বাঁচাতে পার্‌তেম।"

দেখ্‌লাম হাকিমের চক্ষু অনার্দ্র থাক্‌ল না। কিন্তু ন্যায়ের বিধান কি কঠোর,—কিরূপ অলঙ্ঘ্য। চোর আমি, আমার শাস্তি না হওয়াই যে প্রত্যবায়—পাপ—আমি ত তাই চাই! সেই আমার শাস্তি! জেল হ'ল দু' মাসের! জেলের কঠোরতা, মানুষের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার, আমাকে আর কি কাতর কর্‌বে—আমি চাই আরো কঠোরতা,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

সে প্রায়শ্চিত্তের আজ শেষ হয়ে গেছে—আজ আমি কর্ম্মহীন,—অবলম্বনহীন,—আমার আজকার এ মুক্তিতে যে কি তীব্র বিষ—কি বিপদ কে বুঝ্‌বে? তার শূন্য পতিত গৃহ,—আমার স্মৃতির স্বর্গে, খালাস পেয়েই ছুটে গিয়ে যে শূন্যে হৃদয়পূর্ণ করে এসেছি—তারপরও কি আমার বলতে হবে—আজ আমি মুক্ত! গৃহহীন, সঙ্গীহীন, মুক্ত আমি—আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে আমার সমগ্র পৃথিবী পড়ে আছে,—সেই এ গৃহহীনের গৃহ! তবু বারবার মনে হচ্ছে—সত্যই কি আজ আমি মুক্ত!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

'স্বদেশী সাহিত্য।'

অধিকাংশ নদীই সাগরে পতিত হয়,—সে জন্য এরূপ বলা চলে না যে, যে সকল নদী সাগরে পতিত হয় তাহারা একটী অপরটী হইতে বিভিন্ন নয়। গঙ্গা চিরকালই গঙ্গা; সাহিত্যক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা খাটে। প্রত্যেক বড় সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যের অংশ—মানবের অনন্ত চিন্তাধারার একটী স্রোত, অসীম ভাবরাশির একটী প্রবাহমাত্র। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য উহা বিশিষ্ট ভাবে কেবলমাত্র ঐ দেশেরই সাহিত্য, অন্য কোন দেশের নয়। বিশ্বসাহিত্যও আছে। স্বদেশী সাহিত্যের কথাও ভুলিলে চলিবে না। সূর্য্যের আলোতে সাতটি বর্ণ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে এই একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের খেলা দেখাইয়া থাকে; আমরা জগৎ জুড়িয়া সকলে যে আলোক ভোগ করি তাহার রং সাদা, কিন্তু মেঘের উপর যখন সেই আলোক রামধনুর সৃষ্টি করে তাহার রং নীল পীত লোহিত প্রভৃতি। এই প্রকারে জগতের চিরকালের সত্যগুলি, ধারণাগুলি যাহা সকল দেশের সাহিত্যের বিশেষ উপাদান, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল দেশের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক দেশেরই 'স্বদেশী সাহিত্য' বলিয়া একটা নিজের সম্পত্তি আছে। এইটী ইংরাজী সাহিত্য, এইটি বাংলা সাহিত্য এই শ্রেণীবিভাগ শুধু ভাষাগত বৈষম্যের উপর নির্ভর করে না, একটা জাতির সভ্যতা, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা সেই জাতির সাহিত্যের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

কতকগুলি স্বদেশভক্ত, যাহারা বাঙ্গালার প্রাণের ধারার একটা সুর তুলিয়া ধরিয়াছেন ও বলিয়াছেন 'হে বাঙ্গালার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাত্মা, বিদেশীয় সাহিত্যের সুরে এই দেশী সুরটী হারাইয়া ফেলিও না, 'তাহারা কি বস্তুতঃই 'দেশাত্মক শুচিবায়ুগ্রস্ত' সে কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের বিচারের বিষয়। ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে যাহারা 'সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি (Policy of protection) অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাদের কথার প্রকৃত অর্থ কি ?

আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে একটী মনুষ্য অপর একজন মনুষ্য হইতে ভিন্ন, একজনের জীবনের আদর্শের সঙ্গে অন্য আর একজনের জীবনের আদর্শ ঠিক মিলে না। সেইরূপ জাতীয় জীবনের দিক হইতে দেখিলে একজাতি আর একজাতি হইতে বিভিন্ন,—একজাতির সভ্যতার গতি, অপর একজাতির সভ্যতার গতি হইতে ভিন্ন পথগামী। মিশরীয় সভ্যতা রোমক কিম্বা গ্রীসীয় সভ্যতার প্রবাহ যে খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ভারতীয় সভ্যতার স্রোত সেই খাত দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। আধ্যাত্মিকতা যাহা ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহা আর কোনও দেশের সভ্যতায় স্থান পায় নাই এবং অন্যান্য দেশের পার্থিব বস্তুর প্রতি অত্যাশক্তি ভারতের জাতীয় জীবনের জন্য কোনই অমৃত আহরণ করে নাই।—প্রত্যেক দেশেরই প্রত্যেক জাতিরই এই ভাবে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি কখনই নষ্ট হয় না কিন্তু জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া উঠে। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িতেছে, যে চিন্তাস্রোত ভারতসাগরে জন্ম লাভ করে, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরে ও অতলান্তিক মহাসাগরে আলোড়ন তুলিয়া থাকে। সেই জন্য একটা জাতি 'অচলায়তনের' বন্ধনের মধ্যে

থাকিয়া আপনাকে বিকশিত করিবে, মুক্ত আলোক ও মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসিবে না, অথচ পূর্ণতার দিকে চলিতে থাকিবে ইহা ধরণা করাই ভুল। সাহিত্যে যাহারা "সংরক্ষণ নীতি" (Policy of protection) অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহারা কোন দিনই বৈদেশিক সাহিত্যের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলেন না কিম্বা তাহারা সাহিত্যের একটা গতযুগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী নহেন, তাহাদের কথাটা কিছু অন্য প্রকারের। তাহারা ইহাই বিশেষ করিয়া বলিতে চান যে বৈদেশিক প্রভাব থাকে থাকুক আপত্তি নাই কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব যাহা, যে বিশেষত্ব এতকাল পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা যেন বৈদেশিক প্রভাবে চাপা পড়িয়া না যায় ইহাই "প্রকৃত সংরক্ষণ নীতি"।

কোনও দেশের সাহিত্য—সেই দেশবাসীর জাতীয়ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, সেই দেশের সভ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সাহিত্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে, সাহিত্যের ধারার সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা মিলাইয়া দেখিলে এই সত্যই আমরা দেখিতে পাই। বিখ্যাত সমালোচক Hudson সাহেব বলিয়াছেন যে 'Literature is the progressive revelation age by age of a nation's mind aud character।" একটা জাতির চরিত্র ও মনের ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তি হইল সেই জাতির সাহিত্য। কোনও একজন লেখক সেই দেশের অন্যান্য লেখক হইতে বিভিন্ন হইতে পারেন সন্দেহ নাই, একটু তলাইয়া দেখিলে একটা কথা ধরিতে পারা যায় যে নানা প্রকার বৈষম্য থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে তিনি সেই দেশের অন্যান্য লেখকদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আছেন। তাহার জীবনের আদর্শ, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ধ্যান ধরণা সেই দেশের অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধারণার সহিত তীর্থ সলিলে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অনেকেই Greek spirit এবং Hebrew spirit এই দুইটী কথা শুনিয়াছি। Greek spirit বলিতে এই বুঝায় না যে সকল গ্রীকই একই চিন্তা করিত, অনুভব করিবার মাত্রা তাহাদের একই প্রকারের ছিল। Greek spirit এবং Hebrew spirit এই কথা দুইটীর দ্বারা ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে যে একজন মনুষ্যের সহিত অপর একজন মনুষ্যের ব্যক্তিগত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাদ দিলে প্রত্যেক গ্রীকের মধ্যেই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি গ্রীক-চরিত্রের আছে। এই ভাবে জাতীয় চরিত্রের একটা সাধারণ সুর ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সেই জাতির সকল ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা সকল সময়েই Grecian Cut এবং Mongolian Cut প্রভৃতি কথা মনুষ্যের মুখাকৃতি সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকি। মনুষ্যের আকৃতি সম্বন্ধে এই জাতীয়ত্বের কথাটা যেমন সত্য, সাহিত্যের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য।

ইংরাজি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা আলোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবে ইংরাজি সাহিত্য গঠনে কাজ করিয়াছে—কিন্তু কোন দিনই ইংরাজি সাহিত্য বিদেশী সাহিত্য হইয়া পড়ে নাই। ইংরাজ জাতির সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে আধ্যাত্মিক নৈতিক রাজনৈতিক উন্নতির ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরাজ জাতির জীবন, জীবনের আদর্শ, ইংরাজ জাতির আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া কোন দিনই ইংরাজি সাহিত্য আপনাকে গড়িতে পারে নাই। আদিকবি চশারের যুগ হইতে কবি টেনিসনের যুগ অবধি ইংরাজি সাহিত্য ইংলণ্ডের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। চশার ফ্রেঞ্চ সাহিত্য ও ইতালীয় সাহিত্য দ্বারা প্রভূত পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু চশারের কৃতিত্ব সেইখানেই—যেখানে তিনি দেশের খাঁটি ভাবগুলির ও দেশের চরিত্রগুলির যথাযথ আকার প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কীর্ত্তি Canterbury Tales ও Prologueএর

মত কবিতা রচনায়; Book of Duchessএর মত বিদেশীর সাহিত্যের অনুকরণে নহে। দ্বিতীয়তঃ এলিজাবেথের যুগ। এলিজাবেথের যুগ যে ইংরাজি সাহিত্যের সত্যযুগ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তখন চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সমাজের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল। এই যুগের সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল Shakespeareএর নাট্যাবলীতে। Shakespeare এর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ইংলণ্ডের ইতিহাস কিম্বা ইংরাজ জাতির তৎকালীন জীবনের আদর্শকে কি ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল? তাহার প্রায় প্রত্যেকখানা নাটকেই দেশের এবং জাতীয়ত্বের এমন একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে—যে ছাপটা সকলেরই চোখে পড়ে এবং আমাদের সামনে তুলিয়া ধরে। এলিজাবেথের যুগের যথার্থ ইতিহাস—এলিজাবেথের যুগের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস জাতীয় জীবনের অননুভবনীয়—স্ফূর্ত্তির ইতিহাস। এই ভাবে আমরা দেখি ইংরাজি সাহিত্যের প্রত্যেক যুগের ইতিহাসের সঙ্গে তখনকার লোকের জীবনের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও ধারণার একটা প্রকাণ্ড যোগ রহিয়াছে। ভারতের সাহিত্যের ও ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা ছোটকাল হইতেই একটা গল্প শুনিয়া থাকি যে কোন একজন সাহেব বলিয়াছিলেন যে "Indians are born Philosophers" অর্থাৎ কিনা ভারতের লোক জন্ম হইতেই দার্শনিক হইয়া উঠে। কথাটা সাহেবপ্রবর যে ভাবেই বলিয়া থাকুন ইহা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতার জাতীয়ত্বের মূলমন্ত্র। এই কথাটার সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে। ভারতের সভ্যতা কি চিরদিনই জগতের নশ্বরতা ও পার্থিব বস্তুর অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে! শঙ্করের "মায়াবাদের" ভ্রান্ত ব্যাখ্যা কি ভারতের আধ্যাত্মিকতার নামান্তর মাত্র? ভারতের জীবনের আদর্শ কোনও দিনই ইন্দ্রিয়কে উড়াইয়া দেয় নাই, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়াছে মাত্র—যেন উহা আত্মার পূর্ণ পরিণতির বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়ায়। "কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রেই সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধি-স্থাপন ইহাই ভারতের সনাতন সাধনা।" ভারতের সাহিত্য ও চিত্রকলা চিরকালই এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। এই আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখাই সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য এবং তথাকথিত "দেশাত্মক শুচিব্যাধিগ্রস্ত" সাহিত্যিকগণের চেষ্টার স্থল।

আমাদের দ্বিতীয় কথা হইল যে যাহারা সংরক্ষণ-নীতি-পন্থী তাহারা কি গত বৈষ্ণবযুগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী? বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সম্বন্ধ কি? বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম স্ফুটনের সময় দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমবন্যা বাংলাদেশ প্লাবিত করিয়াছিল সেই জন্য সে সময়ে যে সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল তাহাতে উক্ত ধর্ম্মের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে তত্ত্ব দেশে প্রচার করিয়াছে সেই তত্ত্ব এই দেশবাসীর কানে নূতন শুনায় নাই। সাময়িক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে তাহারা এই তত্ত্বগুলি ভুলিতে বসিয়াছিল আবার সময়ের অচিন্তনীয় প্রভাবে তাহারা আবার এই ধর্ম্মের আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ভারতের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশাবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে জীবন-দেবতার আবাহনে পূজনে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের ছায়াপরিস্ফুট দেখিতে পাই। মানবাত্মার সঙ্গে পরমপিতার সম্বন্ধটা বৈষ্ণবদের চোখে অনেকটা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সম্বন্ধের মত। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার সঙ্গে "আমার" সম্বন্ধটা অনেকটা বন্ধুত্বের মত। বৈষ্ণবকবিগণ ও রবীন্দ্রনাথ একই প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন মাত্র। একটা কথা এইখানে বলিতে হইবে রসের দিক হইতে বৈষ্ণবকবিগণের

যে ভাবাবেশ রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। যাহাই হউক আমাদের বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথই বলি আর বৈষ্ণবকবিদের কথাই বলি, তাঁহাদের কাব্যে যে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে সে সুর ভারতের চিরন্তন সুর, এই সুর যে শুধু যমুনাতেই উজান বহিয়াছে তাহা নহে—সমস্ত বাংলার হৃদয়ে যে ভাবের গঙ্গা আছে তাহাতেও প্লাবন আনিয়াছে। তবেই যাঁহারা বৈষ্ণব যুগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাহাদের উদ্দেশ্য একটা গতযুগকে ফিরাইয়া আনা নহে, বৈষ্ণব কবিতার প্রাণহীন অনুকরণ নহে, যে আদর্শ যে ভাব বৈষ্ণবকবিগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সেই আদর্শের সেই ভাবের সাধনা।

এই বাংলাদেশের উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে ২০০ শত বৎসর অবধি একটা বিদেশীয় জাতি তাহাদের অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তথাপি আজ আমরা উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালী আপনার বাঙ্গালীত্ব হারায় নাই বাংলা সাহিত্য নিজের আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই। আমাদের সাহিত্য দেশবিদেশে পরিচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্য জাতিকে যে কথা শুনাইয়াছেন তাহাতে ভারতের সনাতন কথাই বেশী—। ভারতবর্ষের বাণী জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনার মধ্য দিয়া বিংশশতাব্দীর নবসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বিশ্বমানব-পরিষদের প্রথম সভায় ব্রজেন্দ্রনাথের আহ্বানে বাঙ্গালী চিন্তাবীরের চিন্তার কথা শুনিবার জন্য পাশ্চাত্য জগতের ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। "বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একই ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।" তাহারা প্রচার করিয়াছেন ভারতের সনাতন বাণী আর তাহারা গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন—আমাদের "স্বদেশী সাহিত্যের" দেহ।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।

কবি ও ব্যাধ।

কবি। হে নিষাদ, প্রাণ লয়ে কর তুমি খেলা
কি দুরন্ত ব্যবসায়। কবি তাপসের
অভিশপ্ত জীব তুমি।

ব্যাধ। অভিশাপ আনে প্রেমধারা, অভিশাপে
নেমে আসে স্বরগের প্রীতি-মন্দাকিনী।
অভিশপ্ত আমি, তাই এসেছে ধরায়
ক্যাবের অমৃতনদী পুণ্য ভাগীরথি।
তুমি কি বুঝিবে কবি ওগো চিত্রকর
মৃগয়ার আনন্দ অপার ? কেশরীর

গর্ব্বিত গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ভীম,
বন্য ঘোটকের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ,
বিচিত্র প্রলয় ছন্দ ! বুঝিবে কি করি ?
কথার কন্দুক ক্রীড়া লয়ে থাক তুমি
পাবে কিসে বন্ধকার আনন্দের ভাগ !
প্রাণের অব্যবসায়ী, মরা প্রাণ লয়ে,
কর খেলা, কি কৃতিত্ব কি আনন্দ তাহে !

কবি। চপল নিষাদ কেমনে বুঝিবে বল
কৃতিত্ব আমার। আনন্দের সৃষ্টি করি.
সৌন্দর্য্যের বৃষ্টি করি আমি, তুমি তোল
ক্রন্দনের ধ্বনি। মোহিনী তুলিকা মোর
মৃতেরে জিয়ায়, তব শর হরে প্রাণ।
অশ্রুত–বারতা আনন্দ সন্দেশ আনি
পূর্ণ করি ধরার ভাণ্ডার, তুমি শুধু
দীনা কর প্রকৃতির রম্য বনস্থলী।

নিষাদ। ক্ষম চপলতা, সত্য তুমি সৃষ্টিকর
সৃষ্টি করো আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ কারাগার ;
ধরায় অতলস্পর্শ দুঃখ সরোবরে
বেঁধে রাখ নয়নের জলে। অশ্রুতেই
আনন্দ তোমার, বিষাদ তোমার খাদ্য।
নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! সদয় হৃদয়হীন !
মরমের কাতরতা পরাণের ক্ষত
শুকাতে দাও না তুমি। কর নিত্য
কলঙ্কে অমর। তুমিই বর্দ্ধিত কর
স্মৃতি পুরুভুজে। কে কোথায় কোন দিন
প্রেমের আহ্বানে কর্ত্তব্যে করেছে হেলা,
কোন যুগে কেবা চলেছে বিপথ পথে,
তুমি শেখ নাই ক্ষমা, বন্দী কর তারে
ধরণীর কলঙ্কের প্রদর্শনী গৃহে।

কবি। আমার বাঁধন, ফুলের বন্ধন সে যে
সোহাগের আনন্দের অমৃতের বাঁধ।
বাধা হীন ব্যথা হীন সৌন্দর্য্যের কারা।
তুমি বধ, সারস শাবকে সারসীর
স্নেহ-ক্রোড়ে, কপোতীর শান্ত প্রেমনীড়ে
বধ কপোতেরে। স্নেনহীন প্রেমহীন
হৃদিহীন তুমি।

নিষাদ। তুমি কবি আরও ক্রূর অধিক নির্ম্মম
সতীকে বিধবা কর, পুত্র শোকাতুরা
কর জননীরে, শুধু আনন্দের লাগি।
কি বিকট নিষ্ঠুর পুলক। তুমি শুধু
সৌন্দর্য্যের দেবতার পায় দয়ামায়া
দাও বিসর্জ্জন। আদর্শের যূপকাষ্ঠে
নিত্য তুমি দাও নরবলি। দেশভক্তি
পতিভক্তি ঈশ্বরের নামে তুমি কবি
প্রাণ চাও শুধু। করাল চামুণ্ডা সম
শোণিতের ভুখা তুমি, প্রাণের পিয়াসী।
প্রচণ্ড কৌশিক সম চাও দিবানিশি
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা। তুমি কবি দিবানিশি
প্রাণ নিয়ে কর হেলা ফেলা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিষ্টি সরবৎ।

—:*:—

(১)

রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত তুফানী বাঁদীকে লইয়া তাস খেলিয়া, দুই ননদ ভাজে মনের উল্লাসে খোস গল্প করিতে করিতে এ ঘরে এক বিছানায় শুইয়াই দুজনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমিনার স্বামী—আহম্মদ সাহেব তাঁহার দাওয়াইখানার কাজ লইয়া রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাহির মহলে ব্যস্ত ছিলেন, তারপর তিনি কখন অন্দরে আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ মহলে শয়ন কক্ষে গিয়াছেন, আমিনা কিছুই জানে না। সে পশ্চিম মহলেই ভ্রাতৃজায়া

ইনেব বিবির শয়ন কক্ষে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। ইনেব আসিয়া অবধি আজকাল আমিনার অধিকাংশ সময় এইখানেই কাটে। আমিনার বয়স বছর ষোল, ইনেব তার চেয়ে বছর খানেকের ছোট।

হঠাৎ দুড়্ দুড়্ শব্দে বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তুফানী বাঁদী আমিনাকে সজোরে ঠেলিয়া ব্যস্ত ভাবে ডাকিল "আমিনা বিবি, আমিনা বিবি,—ওঠো ওঠো, ও মহলে চল— ছোট মিঞা বাড়ী এসেছেন!"

ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঘুম চোখ রগ্ড়াইয়া আমিনা সবিস্ময়ে বলিল "কে এসেছে,—দাদা?"

তুফানী বলিল "হ্যাঁ গো—মিঞা এ ঘরে আস্ছেন, তুমি শীগ্গী ও-মহলে চল—"

এই,—"ও-মহলে" আমিনাকে পাঠাইবার জন্য তুফানী প্রতিদিন রাত্রেই এমনি করিয়া আচম্কা আমিনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া শশব্যস্তে তাড়াহুড়া লাগাইয়া দেয়!—তুফানীর এই নিদারুণ বদ্ অভ্যাসটার জন্য নিদ্রালস আমিনা তাহার উপর আন্তরিক চটিয়া যায়,—কিন্তু তা বলিলে কি হয়? দাওয়াইখানার কাজ সারিয়া আহম্মদ সাহেব ঘরে আসিলেই, তুফানীর টনক্ নড়িয়া যায়,—কোন একটা আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রভাবে তুফানী তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করিয়া বসে—ডাক্তার সাহেবের আলমারীর চাবির প্রয়োজন, অথবা অন্য কিছুর প্রয়োজন,—অতএব আমিনা বিবির ও-মহলে যাওয়া চাই!—এমনি করিয়া প্রতিদিন, রুমাল হারানো, পানের ডিবা হারানো,—নিদেন পক্ষে নস্যের কৌটা খুঁজিয়া না পাওয়ার সংবাদটা তো তুফানী বহিয়া আনিবেই!—এবং আমিনাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া তো,—ও মহলে রাখিয়া আসিবেই! আমিনার সুখময় নিদ্রাটুকু না ভাঙ্গাইলে যে তুফানী-শকুনীর কিছুতেই স্বস্তি হয় না!

কাজেই—দাদার আগমন সংবাদ সহ,—'ও মহলে' যাইবার তাড়াটা একযোগে তুফানীর নিকট পাইয়া, আমিনা একটু সংশয়ান্বিত হইল, ভাল করিয়া চোখ রগ্ড়াইয়া চাহিয়া বলিল "দাদা সত্যি এসেছে? কই কোথা?—"

তুফানী ব্যস্ত হইয়া বলিল "ঐ বারেণ্ডায় জুতোর আওয়াজ, তুমি ওঠো ওঠো—পালাও জল্দী—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তুফানী নিজেই মাথায় কাপড় টানিয়া অন্য দিকের দুয়ার দিয়া পলাইল! সম্ভ্রান্ত গৃহের আদব-কায়দা দুরস্ত প্রথানুসারে, প্রভু-পরিবারের পুরুষগণকে বাঁদীরা যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত সমীহা করিয়া চলে। বিনা প্রয়োজনে সচরাচর সামনে বাহির হয় না।

বারেণ্ডায় সত্যই জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। এ মহলে এত রাত্রে দাদা ছাড়া আর কেহই যে জুতার শব্দ করিতে পারেন না,—সে সম্বন্ধে আমিনার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, কাজেই ব্যস্তভাবে গায়ের কাপড় টানিয়া আধ-জাগন্ত ইনেব বিবিকে একঠেলায় পুরা-জাগন্ত করিয়া, দাদা আসার সংবাদ জানাইয়া, তাড়াতাড়ি আমিনা খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িল। ইনেব মাথায় কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া খাটের একপাশে উঠিয়া বসিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুন্সী আব্লু সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। হৃষ্ট পুষ্ট সুদীর্ঘ আকৃতির সুপুরুষ যুবা তিনি,—স্বভাব খুব শান্ত নিরীহ ধরণের। সংসারের ভালমন্দ কিছুতেই বিশেষ আসক্ত নন,—আশৈশব নিজের পড়াশুনা, শিকার-খেলা ও কুস্তি লড়া লইয়া দিন কাটাইতেছেন। সংসারের অন্য কোন বিষয়ে বড় একটা চোখ কান দেন না, সকল বিষয়েই প্রসন্ন অথচ সকল বিষয়েই একটু নির্লিপ্ত গোছের মানুষ!—সেই জন্য অনেকেই,—বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ-সুহৃদ্ ছোট ভগ্নিপতি মহাশয়—অর্থাৎ আহম্মদ সাহেব তাঁহাকে নিরেট আহাম্মক্ বলিয়া সম্মান অভিনন্দন জানাইয়া থাকেন। অবশ্য আব্লু সাহেব তাহাতে বিন্দুমাত্রও কাতর নন, বিশেষতঃ ও সকল বিষয়ে খেয়াল

রাখিবার এতদিন তাঁহার অবসর ছিল না—বি-এল, পরীক্ষা লইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন! সম্প্রতি পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।

আমিনাকে ব্যস্তভাবে খাটের উপর হইতে নামিতে দেখিয়া অগ্রজ সোনার চশমার ভিতর হইতে প্রসন্ন স্নেহময় দৃষ্টি তুলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন "কিরে আমিন্,—"

একটা ছোট খাটো কুর্নিশ করিয়া আমিনা স্মিতমুখে বলিল "তুমি কখন এলে, জী?—"

হাতের ছড়িটা যথা স্থানে রাখিয়া জামা খুলিতে খুলিতে—আব্লু উত্তর দিলেন "প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক হবে—"

আমিনা সবিস্ময়ে বলিল "আধ ঘণ্টা!—দেখ্লে, কেউ এতক্ষণ আমাদের উঠিয়ে দেয় নি—"

আব্লু বলিলেন "আমি আহ্মুর ঘরে বসে কথা কইছিলুম—হ্যাঁ, আহ্মু বল্লে বটে, যে ওরা রাত বারোটা পর্য্যন্ত জেগে তাস খেলে ঘুমিয়ে গেছে—"

আমিনার মুখ ম্লান হইয়া গেল! হায়, তাহার এই ভক্তিভাজন অগ্রজটির কাছে তাহার নামে এরই মধ্যে এত বড় দোষাবহ অভিযোগ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে!—দাদা তাস খেলাটা অত্যন্ত অপছন্দ করেন, আহম্মদ সাহেব তাহা খুব ভাল করিয়াই জানেন,—তবুও এ কথাটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া—এ ত নিছক-দুস্মনী করা ছাড়া আর কিছুই নয়! আমিনা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রাণপণে মুখ চোখ রগ্ড়াইয়া পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইল।

আব্লু তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটু স্নেহাদর-মিশ্রিত আগ্রহের স্বরে বলিলেন "আহা, তোর ভারী ঘুম পেয়েছে, না?—তা তুই এইখানেই ঘুমো না আমিন্, আমি ও-ঘরে আহ্মুর বিছানায় গিয়ে শুচ্ছি—"

সলজ্জ স্মিতমুখে চোখ মুছিতে মুছিতে আমিনা বলিল "না না, তুমি এইখানেই শোও—" বলিয়াই দ্বিতীয় বাক্যের প্রতীক্ষা না করিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল। আব্লু বলিলেন "ওরে কে আছে ওখানে, এক গেলাশ খাবার-জল দিয়ে যেতে বল তো—"

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ঘরেই জল রয়েছে, আমি দিচ্ছি—"

কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া আনিয়া দাদার হাতে দিয়া, আমিনা বলিল "পান চাই? সেজে এনে দেব?—"

আবলু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "না না; আমার কাছে কেনা পান আছে, বেশ ভাল মিঠে পান,—তুই বরং নিয়ে যা,—" বাঁ হাতে জামার পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া আমিনার সাম্নে খুলিয়া ধরিয়া আব্লু বলিলেন "অনেকগুলো আছে, তোর য'টা খুসী নে।"

আমিনা হাসিমুখে একটা পান তুলিয়া লইয়া, পুনশ্চ আর একটা লইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে ভাজের হাতে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হইল,—আব্লু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "ওরে ওরে আমিন দাঁড়া, আমি আহ্মুকে পান দিয়ে আস্তে ভুলে গেছি, তুই দুটো নিয়ে যা—"

আমিনা দাঁড়াইয়া পড়িয়া, কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু এরূপস্থলে সঙ্কোচ প্রকাশ করা অধিকতর সঙ্কোচের কাজ!—আবলু বুঝিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া ডিবা হইতে পান তুলিয়া, নিঃশব্দে ভগিনীর হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া জলের গ্লাশটা মুখে তুলিলেন; আমিনা চোখ কান বুজিয়া, লজ্জারক্ত মুখে পলায়ন করিল!

বনিয়াদী মুন্সী পরিবারের এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি প্রায় নবাবী আমলের কেতায় নির্ম্মিত। এক সময় ইঁহারা বিপুল ধনশালী ছিলেন, এখন সরিকগণের সহিত ভাগাভাগি করিয়া পৃথক হইয়াছেন। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে পল্লী

ছাড়িয়া, কালিসহরে গঙ্গার ধারে আবলু সাহেবের পিতা এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া—শেষ জীবনটা এইখানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। মফঃস্বলে নানাস্থানে ইহাঁদের জমিদারী আছে, তাহার আয় প্রায় পঞ্চাশ, ষাট হাজার টাকা; আবলু সাহেব পিতার একমাত্র পুত্র,—ভগিনী দুইটির মধ্যে আমিনা তাঁহার ছোট, আয়েসা বিবি বড়। তাঁহার স্বামী রহমান সাহেব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুতরাং ভবঘুরে বৃত্তি লইয়া পরিবারবর্গসহ তিনি প্রায়ই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। মহরমের ছুটী উপলক্ষে শীঘ্রই তাঁহারা দেশে আসিবেন—এইরূপ কথা আছে।

(২)

আমিনার স্বামী আহমদ সাহেব—ইহাঁদের কোন মৃত আত্মীয়ের সন্তান। আবলুর পিতা, ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তারপর মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে,—তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, এইখানেই বাটীসংলগ্ন যথোপযুক্ত নূতন মহল নির্ম্মাণ করাইয়া কন্যা জামাতাকে বাসের জন্য দান করিলেন। দুই বছর হইল আহমদ সাহেব এখানে ব্যবসা করিতেছেন। শ্বশুর বছর খানেক হইল আবলুর বিবাহ দিয়া সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।

পাশাপাশি পাঁচখানা ঘর ও স্নানাগারের পাশ দিয়া সুপ্রশস্ত লম্বা বারেণ্ডা পার হইয়া, আমিনা নূতন মহলে—অর্থাৎ দক্ষিণ মহলের বারেণ্ডায় আসিয়া পৌঁছিল। তুফানী বাঁদী দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, আমিনাকে ঘরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া সে নিঃশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বারেণ্ডার অন্যদিকে, সদরে নামিবার সিঁড়ির দুয়ারটা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবু শয়নকক্ষে ঢুকিবার পূর্ব্বে আমিনা একবার সেদিকটায় চাহিয়া দেখিতে ভুলিল না,—তারপর ক্ষিপ্রলঘুচরণে নিঃশব্দে ঢুকিয়া পড়িল।

স্বামী তখন টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া আলোর সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া, একটা টাট্‌কা খবরের কাগজ পাড়িতেছিলেন, আমিনা ঘরে ঢুকিতেই অন্যমনস্কভাবে কাগজ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিলেন,—তারপর তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। আমিনা তাহার দিকে আজ দৃক্‌পাত করিল না,—তবে পান দুটা তো দিতে হইবে, তাই গম্ভীর মুখে ডিবাটার সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু টেবিলের উপর ডিবাটা পাওয়া গেল না, অথচ মুখ ফুটিয়া সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না, যেহেতু—আজ সেই 'তাসখেলার' কথা লইয়া মনটা তাহার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া আছে। কাজেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে, সশব্দে দুট্‌পাট্‌ করিয়া চারিদিকের জিনিসপত্র সরাইয়া নড়াইয়া অন্তর্হিত ডিবাটার প্রচুর খোঁজ করিয়া শেষে বিছানার উপর হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। অন্য কেহ হইলে পান দুটা দিবার জন্য সে কখনই ডিবাটার এত খোঁজ করিত না, টেবিলেই নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিত,—কিন্তু ঐ স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ মানুষটির 'ফরকট্' যে অনেক! যেখানে সেখানে খাবার জিনিস দিতে দেখিলেই,—উনি তৎক্ষণাৎ আতঙ্কেই অসুস্থ হইয়া পড়িবেন কি না!—কাজেই দায়ে পড়িয়া আমিনা সদা সতর্ক হইয়া চলে।

ডিবাটা আনিয়া অনাবশ্যক শব্দসহকারে সজোরে ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিয়া—বিনাপ্রশ্নেই আমিনা সংবাদ জ্ঞাপন করিল—"দাদা পান খেতে দিলে, কল্‌কাতা থেকে এনেছে,—মিঠা পান—".

কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া, স্মিতমুখে স্বামী বলিলেন "মিঠা পান? ও, কিস্‌মতের জোর খুব,—দাঁড়াও আমিনা, শোন—"

আমিনা চলিয়া যাইতেছিল, আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল "কি?—"

আহমদ্ একটু বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া, বলিলেন—"বল্‌ছি কি,—দাদা যখন ভালবাসা জানিয়ে পান দুটো দিয়েছে-ই,—তখন দাদার বোনের উচিত—"

সজোরে মাথা নাড়িয়া প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতার সহিত আমিনা উত্তর দিল, "আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না !—কেন নিজের হাত দুটো তো রয়েছে—"

"রয়েছে বটে, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে,—ও যে অকর্ম্মণ্য হয়ে আছে !—ডাক্তারী কেতাবগুলা এখনি ঘাঁট্‌ছিলুম,—জান তো ও-গুলোয় নাই হেন জিনিসই দুনীয়ায় নাই,—অতএব—"

স্বামীর কথা শেষ হইতে না হইতে, আমিনা কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া আনিয়া, পিক্‌দানিটা পায়ে করিয়া ঠেলিয়া দুয়ারের কাছে সরাইয়া দিয়া, খুব গম্ভীরভাবেই বলিল "হাত ধোও—"

ইহার উপর আর তো তর্ক চলে না ! অগত্যা ভাল মানুষের মত হাত ধুইয়া, পান দুইটা মুখে পুরিয়া আহমদ্ একটু মোলায়েম স্বরে বলিলেম "আজ, কার গোলাম চোর হোল আমিনা বিবি,—তোমার না আব্দুর বিবির ?"

"জানি না—"বলিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া আমিনা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"জানি না" বলিয়া সাফ জবাব ঝাড়িয়া দিলেও, স্বামীকে যৎকিঞ্চিৎ 'জানাইয়া' না দিতে পারিলে আজ ত বেচারার ঘুমাইয়া স্বস্তি হইবে না !—কিন্তু কেমন করিয়া সে কি বলিবে,...মনের ভাণ্ডারে তাহার বিশেষ কিছু গোছ-গাছ পাওয়া গেল না ! রাগের চোটে সেখানে আজ সবই হুলস্থুল !—ক্ষণিকের জন্য গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিমানসজল দৃষ্টি তুলিয়া একটানা ছন্দে দ্রুতস্বরে বলিয়া ফেলিল "তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কয়ো না, কাল থেকে আমায় আমিনা বলে ডেকো না, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ?—"

ভিতরের উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে আহমদ্ সাহেবের ফুসফুস্ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল ! কিন্তু স্ত্রীর রাগের সময় স্বামীর পক্ষে হাসাটা যে একান্ত সহানুভূতিহীনতার লক্ষণ, আমিনা ইতিপূর্ব্বে সেটা তাঁহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, কাজেই চক্ষু লজ্জার দায়ে হাসি চাপিবার জন্য,—চেয়ারের পাশে মুখ ফিরাইয়া খুব খানিক-ক্ষণ ধরিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া লইয়া শেষে রুমালে মুখ মুছিয়া, গম্ভীর ভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন "তা বেশ,—সম্পর্ক না থাকে, নেই, নেই, কিন্তু কথাটা —" খপ্ করিয়া উঠিয়া গিয়া চক্ষের নিমেষে আমিনার হাত দুইটা ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিয়া অত্যন্ত সকরুণ ভাবে বলিলেন "কথাটা কি বন্ধ করে থাকা যায় ?—বিশেষ,—এক ঘরে যখন ঘর করতে হচ্ছে—"

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আমিনা গোঁজ গোঁজ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "বেশ, বেশ, কাল থেকে আমি অন্য ঘরে ঘর করতে যাব,—ঐ পাশের ঘরটা তো পড়ে আছে, কাল থেকে ঐ ঘরে তুফানীকে নিয়ে—হাত ছাড়—"

হা—হা শব্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া, আহমদ সাহেব সকৌতুক বলিলেন "তোবা, তোবা, তোবা !—আমার সঙ্গে তফাৎ হয়ে অন্য ঘরে ঘর করতে যাবে—শেষে তুফানীকে নিয়ে !"

আমিনা কথাটার মাথামুণ্ড অর্থ বিশেষ কিছু তলাইয়া বুঝে নাই, বুঝিলও না !"—ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "তা কি করব ? তোমার মত লোকের সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখ্‌ছি না, তা বলে ! তুমি কি না দাদার কাছে আমার নামে চুকলি কাটতে গেলে ! আচ্ছা—" প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দারুণ অভিমানের ব্যথায় আমিনার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল !—ঢোক গিলিয়া আবেগ দমন করিয়া—বলিল "আচ্ছা আমরা যে রাত বারোটা পর্য্যন্ত জেগে তাস খেলছি,—তুমি সে নিজের চোখে দেখেছ ? না, আমরা যখন তাস খেলছিলুম, তখন যে টং টং করে বারোটা বেজে গিয়েছিল, সে তুমি নিজের কানে শুনেছ ?"

এতক্ষণের পর এই চিকিৎসা ব্যবসায়-ব্রতী ভদ্র লোকটির ঠাহর হইল,—বর্ত্তমান বিদ্রোহ ব্যাধির মূল কি? বিপন্ন হইয়া দাড়ি চুলকাইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি উত্তর দিলেন—"না, নিজের চোখ কান, তখন ডাক্তারখানার রোগীগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল, ওগুলোর ভরসা কি করতে পারি—"

"তবে দাদার কাছে চুকলি কাটতে গেলে কেন? আমি তোমার নামে কারুর কাছে কিছু বলতে যাই? না তোমার ঐ দাওয়াইখানার নামে কারুকে কিছু বলতে যাই? তুমি কিসের জন্যে এমন দুস্‌মনী সুরু করেছ বলতো—"

স্বামী একটু আদরের সহিত তাহার কটিবেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন "আহা অত চটো কেন আমিনা, শোন না বল্‌ছি, বসো,—"

আমিনা তাঁহারা হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "না আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে, তোমায় কিছু বলতে হবে না,—তুমি এবার থেকে আর আমার সঙ্গে কোন কথা কোয়ো না বুঝলে—" আমিনার চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিইয়া বিছানায় গিয়া আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

আর তো ঘাটান চলে না?—আহমদ্ সাহেব নিতান্ত ঔদাসীন্যের সহিত একটু হাসিয়া "বেশ—বহুৎ আচ্ছা—" বলিয়া খবরের কাগজখানা তুলিয়া তাহাতে পুনরায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলেন।—কিন্তু ক্ষণপরেই শয্যাশায়িতা আমিনার দিকে চাহিয়া, তাঁহার অধরপ্রান্তে নিঃশব্দে একটু নষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল,—কাগজে আর মন লাগিল না!

(৩)

পরদিন বেলা সাড়ে সাতটার সময় বালক ভৃত্য রুস্তমের ডাকাডাকি শুনিয়া আহমদ্ সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল; আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মেলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া ধড়্ মড়্ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—কি মুস্কিল! এতখানি বেলা হইয়া গিয়াছে আমিনা তাঁহাকে উঠাইয়া দেয় নাই, এতক্ষণে রুস্তম আসিল ঘুম ভাঙ্গাইতে!

বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—আমিনার চিহ্ন নাই! ভোর ছ'টায় ঘুম ভাঙ্গা তাহার অভ্যাস। প্রতিদিন বিছানা ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে সে স্বামীকে জাগাইয়া দিয়া যায়,—আজ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে নিঃশব্দে পালাইয়াছে!

মনে পড়িল,—কাল রাত্রে আমিনা রাগ করিয়া কথা বন্ধ করিয়াছে এবং তিনিও সেইজন্য একটু রাগ দেখাইবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ অবধি জাগিয়া কাগজ ও কেতাব ঘাঁটিয়া তবে সকাতর চিত্তে ঘুমাইতে গিয়াছিলেন!—কিন্তু সব ব্যর্থ! হায়রে কিস্‌মৎ! আমিনা অক্ষত চিত্তে ঘুমাইয়া, নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে,—আর তিনি কি না জরুরী কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া, পড়িয়া পড়িয়া অকাতরে সকালবেলা ঘুমাইতেছেন! দুত্তোর,—আমিনাকে জব্দ করিতে গিয়া, শেষে জব্দ হইলেন কি না তিনি নিজেই! হায়, এ লজ্জার কথা যে কাহাকেও বলিবার নয়!

নিঃশব্দেই চিকিৎসক মহাশয়ের ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ভৃত্যকে বলিলেন "বেমারীলোগ্ কোই আয়া রে?—"

ভৃত্য বলিল "নেই হুজুর, ফজেরুসে পাণি বর্‌ষাতে যো—"

আহমদ্ সাহেব জানালা দিয়া বাহিরে দিকে চাহিলেন, তাইত বটে, ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সারা আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন!—এই বৃষ্টিতে রোগীরা কেহ যে আসিয়া, ফিরিয়া যায় নাই, ইহাতে তিনি মনে মনে যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেন। ভৃত্যকে আদেশ দিলেন "কোচম্যান্‌কে বোল দেও,—তিনঠো 'কল্' হ্যায়, সারে আট্ বাজ্‌নে গাড়ী জোৎনা চাহিএ—"

"যো হুকুম খোদাবন্দ—" বলিয়া সে সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—আহমদ্ পুনশ্চ ডাকিয়া বলিলেন "এ রুস্তম, থোড়া ঠাহ্‌রো বাচ্চা,—বিবিসা'ব্ কাঁহা রে?—"

"পাছিম্ মহল পর,—জনাব, বোলাবেঙ্গে?—"

"নে হি—নেহি," আহমদ্ হাসি মুখে বলিলেন, "তোম্ আপ্‌নে কামপর্ যাও—"

ভৃত্য চলিয়া গেল। আহমদ্ সাহেব স্নানাগারে গিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান প্রভৃতি সারিয়া বাহিরে আসিয়া,—চারিদিক চাহিলেন, কোন মুল্লুকে আমিনার ছায়া মাত্র দেখিতে পাইলেন না! সে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রূপেই গা ঢাকা দিয়াছে!

যাহাই হউক, আমিনাকে উত্তমরূপে জব্দ করিবার একটা অকাট্য সদুপায় মনে মনে উদ্ভাবন করিতে করিতে তিনি আসিয়া পোষাক কামরায় ঢুকিলেন। তারপর স্বচ্ছন্দ মুখে শীস্ দিয়া একটা উর্দ্দু গান গাহিতে গাহিতে পোষাক পরিতে সুরু করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়ারের পর্দ্দার পাশে পরিচিত হস্তের অলঙ্কার শিঞ্জন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল,—আহমদ্ সাহেবের কান দুইটা দস্তরমতই 'উৎকর্ণ' হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি যে, সেদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, সে তথ্য পাছে অন্য কেহ টের পায়,—সেই ভয়ে তাঁহার শীসের গান,—তাল মান হারাইয়া বিষম বেতালে বেমানান সুরে অস্বাভাবিক উচ্চ শব্দে ধ্বনিত হইয়া,—সাহানা স্থলে ছায়ানট রাগের আবির্ভাব করাইয়া বসিল! নিজের অবিবেচনা দোষে, তাঁহার সদ্যঃস্নাত সুন্দর সদাপ্রফুল্ল মুখখানা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল!—আয়নার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ আড়াল করিয়া, অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে গলায় 'টাই' বাঁধিতে বাঁধিতে—বিপন্ন ভদ্রলোকটি, হঠাৎ শীসের গান ছাড়িয়া গুণ্ গুণ্ শব্দে গলার গান সুরু করিয়া দিলেন!—সে গানটা অবশ্য কোন হতাশ-প্রণয়ী কবির নিদারুণ 'হাত-তোড়া' ব্যাপারের শোচনীয় সংবাদ লইয়া রচিত!

পর্দ্দার বাহিরে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে উস্ খুস্ করিয়া আমিনা মৃদু কণ্ঠে বলিল "চা এনেছি—ঘরে যাব?"

সঙ্গীত ব্যস্ত আহমদ্ সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না,! আমিনা আর একটু উঁচু গলায় ডাকিল "শুন্‌তে পাচ্ছ,—আমি ঘরে যাব।—পর্দ্দাটা সরিয়া দাও—"

এবার আহমদ্ সাহেবের সঙ্গীত সমের মাথায় ঘা খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল!—আমিনা গলা খাটো করিয়া বলিল "চা এনেছি—"

আহমদ্ নিরুত্তর!—আমিনা রাগিয়া বলিল "বেশ, থাক্ আমি চল্লুম!—"

'এ্যা—হ্যা' শব্দে কাশিয়া, যথাসাধ্য গাম্ভারী চালে গোঁফে তা দিতে দিতে, ধীরে-সুস্থে আসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া আহমদ্ সাহেব কি বলিতে গেলেন,—কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! আমিনা তৎপূর্ব্বেই ক্ষিপ্রলঘুচরণে বারেণ্ডা পার হইয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে! আহমদ্ সাহেব অবাক্ হইয়া গেলেন,—কিন্তু আর তো চেঁচাইয়া উচ্চ গলায় ডাকাডাকি করা চলে না, হইলেই তো 'খেলো' হইয়া পড়িতে হইবে! অগত্যা হতাশ ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া

আসিয়া, গায়ে ওয়েষ্টকোট চড়াইয়া বোতাম আঁটিতে লাগিলেন, শীসের গান, গলার গান, সমস্তই এবার সম্পূর্ণ নীরব!

মিনিট তিনেক পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আবলু সাহেব চা'য়ের কাপ ও প্লেট হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "চা—নে,"

আহমদ্ চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া সক্ষোভে বলিলেন "ইয়া আল্লা শেষে তুই চা আন্‌লি রে!"
তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সরল চিত্ত আবুল সাহেব হঠাৎ থতমত খাইয়া গেলেন!—ক্ষণকাল—তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না! মূঢ়ের মত চাহিয়া বলিলেন "আমি কি করব? আমিন্ যে বল্লে!"

নিজের ব্যবহারে আহমদ্ নিজেই একটু অপ্রতিভ গম্ভীর ভাবে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার সরাইয়া দিয়া, "Thanks" বলিয়া চায়ের পাত্রটা টানিয়া লইয়া, ব্যস্ত ভাবে পান সুরু করিয়া দিলেন।

আবলু চেয়ারটা দখল করিয়া—আহমদের মুখ পানে চাহিয়া একটু সন্দিগ্ধ-বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন "কি হয়েছে রে?"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, আহমদ্ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কিছু না—"

আবলু একটু অনুরোধের স্বরে বলিলেন "বল্ না,—চাপিস কেন্, ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?"

আহমদ্ যেন সে কথা শুনতেই পান নাই,—এমনি ভাবে, সহসা অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন "কি বল্লেন জী? আপনার বিবি সাহেবা পীড়িত? ওঃ, ডাক্তার চাই, বহুৎ আচ্ছা,—কিন্তু ফিএর টাকাটা যেন অগ্রিম পাই মশাই—" তিনি চায়ের পাত্র নামাইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া, আবলুর দিকে হাত বাড়াইলেন।

আবলু তৎক্ষণাৎ হাসি মুখে উঠিয়া গিয়া,—বাঁ হাতে তাঁহার ঘাড় ধরিয়া নীচু করিয়া ডান হাতে,—পিঠের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত বসাইলেন! আহমদ্ চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "Oh! Dear me!—বাড়ী চড়াও হয়ে আক্রমণ! উকিল মহাশয়, আপনার আইন দেবতার কসম্ খেয়ে সাচ্চা বলুন, কত নম্বর ধারা অনুসারে মামলা রুজু হবে?—

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া বসিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া গোঁফে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে, মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে আব্‌লু উত্তর দিলেন—"এক শো সাড়ে বারো থেকে পাঁচ শো সাড়ে ছাপ্পান্নর মধ্যে যেটা হোক একটা বটে, কিঞ্চিৎ এদিক ওদিকও হতে পারে, ঠিক স্মরণ নাই—"

"ধন্যবাদ উকিল সাহেব, এবার আপনার পরামর্শের পারিশ্রমিকটা গ্রহণ করুন,"—আহমদ্ জামার আস্তিন গুটাইয়া ঘুঁষি বাগাইয়া, আবলুর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই উৎকট-রহস্যপ্রিয়, দুরন্ত দুষ্ট ভগিনীপতির সহিত আবলু সাহেবের পরিচয়টা অনেক দিনের! কাযেই তিনিও, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, সজোরে আহমদ্ সাহেবের দুহাত মুঠাইয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে সেকহ্যাণ্ড ওরফে ভদ্র দস্তুর 'নড়া ছেড়া' ব্যাপারের নির্দ্দয় অভিনয় সমাধা করিয়া—অত্যন্ত সুপ্রতিভ ভাবে সলজ্জ বিনয়সূচক ভঙ্গিতে বলিলেন "আরে, আরে তাও কি হয়! তুমি হচ্ছ বন্ধু লোক, তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যবহার—"

আহমদ্ বলিলেন "অনুগৃহীত হলুম, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে বন্ধুত্বটা শিকেয় তুলে রাখাই প্রশস্ত বিধি—অতএব—" তিনি হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে লাগিলেন।

আবলু সতর্কতার সহিত প্রাণপণ বলে মুঠা শক্ত করিয়া,—অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত সমর্থনসূচক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "অবশ্য, অবশ্য,—কিন্তু এই মুন্সী বংশের একটা চিরাচরিত অভ্যাস আছে,—নিঃস্বার্থ দানশীলতা—"

আহমদ্ হাসিয়া বলিলেন "বিলক্ষণ! কিন্তু ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকাটাও যে মুন্সীবংশের জামাইদের পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সেটা অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখ্‌বেন,—"

বিপন্ন আবলুর মাথায় হঠাৎ এক নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইল!—ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন "আহা-হা বন্ধু তোমার চা-টা যে জাহান্নামে চল্ল,—" বলিতে বলিতে ডান হাতের বজ্রমুষ্টি নিষ্পেষণে আহমদের দুটা হাত এক-যোগে চাপিয়া ধরিয়া নিজেই বাঁ হাতে করিয়া চায়ের কাপ্‌টা তুলিয়া তাহার মুখে ধরিয়া,—স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন "আহা, খাও খাও এটা খেয়ে নাও আগে—"

আহমদ্ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন সাড়ে আট্‌টা বাজিতেছে আর বেশী দেরী নাই! ...... আর তো এই ছেলেমানুষী কৌতুক লইয়া ধস্তাধস্তি করিয়া সময় কাটান যায় না. অগত্যা বিনাবাক্যে নিঃশব্দে চাটুকু গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন. তারপর পিছনে টেবিলের দিকে চাহিয়া রুমাল লইবার ভাণ করিয়া, সবিনয়ে হাত ছাড়াইয়া লইয়া,—অকস্মাৎ ক্ষিপ্রবেগে ফিরিয়া, অসতর্ক আবলুর কান দুইটা কসিয়া মলিয়া দিয়া,—এক লম্ফে পিছু হাটিয়া গম্ভীরভাবে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন "আজ এইখানেই সন্ধি! তিনটে 'কল' আছে, এখনি বেরুতে হবে,—ক্ষমা কর বন্ধু, adieu! তোমার মঙ্গল হোক—"

"উহু-হু"—বলিয়া কানের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আবলু চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া,—আহমদের উদ্দেশে গুটিকতক সুমিষ্ট সম্ভাষণপূর্ণ কটু-কাটব্য বর্ষণ করিলেন। আহমদ্ ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে,—এমনি তাচ্ছল্যসূচক ভাবে, আপন মনেই, থার্ম্মোমেটার, ষ্টেথেসকোপ, পকেট কেস, ইত্যাদি গুটাইয়া লইয়া টুপিটা টানিয়া মাথায় দিয়া সসজ্জ বেশে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।—কিন্তু সহসা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল,—তিনিও থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন!

আবলু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "হুঁ, হুঁ, কেমন জব্দ! বেশ হয়েছে! লঘু-গুরু না মানার ফল ঐ!—খামকা আমার কান দুটোকে এমন নিষ্করুণ শাস্তি দেওয়া মশায়.—ভেবেছ কি মাথার ওপর, 'একজন' নাই!—কেমন? লম্ফ ঝম্ফ করে যেমন বেরুচ্ছিলে. আর অম্‌নি মাথার ওপর আকাশটি ভেঙ্গে পড়্‌ল! এবার?"

আহমদ্ অন্য চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাহিরের আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "এবার আপনার উচিত আর এক কাপ্ গরম-চা আনিয়ে দেওয়া!—যেহেতু আপনার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার চা-টা—"

ব্যস্ত হইয়া আবলু বলিলেন, "দোহাই তোর আহমু, তোর মুখে ভদ্রভাষা শুন্‌লে আমার ভয়ানক হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় ভাই,—সোজা করে বল, আর এক কাপ চা চাই?"

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিয়া আহমদ্ বলিলেন "সত্যি ভাই, বড় উপকার হয় তা হলে,—দেখ্‌ছিস আজ কেমন বাদলের দিন—"

আবলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আচ্ছা আচ্ছা. তুই বস, আমি ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে চা করিয়ে আন্‌ছি—"

একটু উস্‌খুস্ করিয়া আহমদ্ বলিলেন "ওরে আবলু,—তা তুই আর কষ্ট করে আসিস নি ভাই. চা-টা অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দে ভাই—"

আবলু বোকা বনিয়া গেলেন! সবিস্ময়ে বলিলেন "কেন, হলেই বা —"

মাথা চুলকাইয়া আহমদ্ বলিলেন "আরে না, না, বন্ধে, বুঝিস্ না কেন? আঃ. তুই একটা নিরেট আহাম্মক্!"

আব্লুর দৃষ্টি পরিষ্কার হইল! একটু নষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমি আস্‌ব না. রুস্তমকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে তো হবে—"

আহমদ্ সাহেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আরে না. না. জিনেব বিবিকে, জিনেব বিবিকে—"

"বহুৎ আচ্ছা—," বলিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া আব্লু পুনশ্চ ফিরিয়া চাহিলেন; একটা অর্থসূচক কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন "ঝগড়া হয়ে গেছে, না?—তুই ভারী বেয়াদব লোক,—আমিনাকে অত রাগাস্ কেন বল দেখি?

আহমদ্ সাহেব দাড়ি চুলকাইয়া সকরুণ মুখে বলিলেন—"সত্যি—দেখ ভাই, আমি মনে করি যে বেশ গ্রাম্ভারী চালে ভারিক্কি মেজাজে সোজাসুজি ঘরকন্না সুরু করে দিই,—কিন্তু কি জানি ভাই, ওকে দেখ্‌লেই, আমার কেমন ঝগড়া কর্‌তে ইচ্ছে হয়.—আমি কিছুতেই চুপ করে থাক্‌তে পারি না! বড় মুস্কিল হয়েছে দাদা!"

আবলু ইহার উপর আর কোন টিকাটিপ্পনী না কাটিয়া শুধু নিঃশব্দে একটু হাসিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।—আহমদ্ সাহেব পরক্ষণেই সহসা উদ্বিগ্ন ভাবে তাহাকে ডাকিয়া ফিরিইয়া, অনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিলেন "দেখিস ভাই,—আমিনাকে যেন বলে দিস না যে আমি তাকে দিয়েই চা পাঠাতে বলেছি,—দেখিস, খবরদার,—"

আবলু সহাসে বলিলেন তোর বাঁদরে পীরত্ব রাখ্! ঝগড়া করতেও ছাড়বি না,—অথচ রাখ্‌তেও পার্‌বি না, আবার ইজ্জতের কান্না! তুই ভয়ঙ্কর বেয়াদব! "

কপালে হাত ঠেকাইয়া আহমদ্ সাহেব হতাশ ভাবে বলিলেন "নসীব!"

(৪)

পশ্চিম মহলে আসিয়া রুস্তমকে ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইতে বলিয়া, আব্লু এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া আমিনার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমিনা বা জিনেব কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, শেষে রুস্তমের কাছে সংবাদ জানিলেন,—তাহারা দুইজনে তেতালার কেতাবের ঘরে গিয়াছে। আবলু নিজেই বারেণ্ডার ভিতরের সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দ পদে তেতালায় চলিলেন,—অভিপ্রায়, হঠাৎ গিয়া দেখিয়া লইবেন দুজনে কি করিতেছে!

নির্দ্দিষ্ট ঘরের কাছাকাছি হইতেই—ঘরের ভিতরকার অনর্গল উচ্চারিত বাক্যস্রোত কানে পৌঁছিল, ধীর মন্থর গমনে তিনি দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন দুইজনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া—নুন দিয়া কাঁচা আম চর্ব্বণ করিতে করিতে মনের সুখে মাথামুণ্ড গল্প জুড়িয়াছে!

জিনেব দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, আবলু দুয়ারের কাছে যাইবামাত্র আগেই তাঁহার সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল!—সে খপ্ করিয়া আঁচলটা আমের উপর ঢাকা দিয়া ঘোমটা টানিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিল,

আমিনা পিছন ফিরিয়া দাদাকে দেখিয়া, কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমগুলার দিকে চাহিয়া সলজ্জ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না!

রসায়ন-বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে, কাঁচা আমের অপকারিতা গুণ যতই প্রবল হউক,—কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই লজ্জিত-অপরাধী-যুগলকে আর পীড়া দিতে আবলুর এতটুকুও প্রবৃত্তি হইল না!—বিশেষতঃ, দুইজনের অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় আবলু নিজেও কিঞ্চিৎ সহানুভূতি-বিগলিত হইতে বাধ্য হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া, সামনে শেল্‌ফের উপর ওয়েবষ্টার ডিক্সনারীখানা দেখিতে পাইয়া, হাঁফ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে,—যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে আবলু বলিলেন "ওরে আমিন, একটা কাজ কর, না, লক্ষ্মী দিদি আমার,"

আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল "বল—কি কর্‌ব?"

আবলু ডিক্সনারীর দিকে চাহিয়াই বলিলেন "রস্তমটা কি যে ছাই-ভস্ম চা ক'রে খাওয়ালে, কিচ্ছু টেষ্ট পাওয়া গেল না, একটু ভাল রকম চা করে দিস তো বড় ভাল হয়,—আমি জল চড়াতে বলে এসেছি—"

আমিনা সাগ্রহে বলিল "বহুৎ খুব, আমি এখুনি যাচ্ছি,—এক পেয়ালা তো?—"

"না না, আমার এক বন্ধু আছে, দু পেয়ালা চাই—"

"আচ্ছা—" আমিনা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বেচারা ইনেব অত্যন্ত বিপদে পড়িল, তাহার ইচ্ছা—আবলু দৃষ্টিপথাতীত হইলে সে বমাল গুটাইয়া লইয়া চম্পট দিবে, কিন্তু আবলুর নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না,—মিছামিছি অভিধান খুলিয়া সত্য সত্যই তিনি তাহার ভিতর নানাদ্রব্য অন্বেষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন! ইনেব আড়্‌চোখে তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে সন্তর্পণে বমাল সরাইবার আয়োজন করিতে লাগিল,—ইতিমধ্যে কি মনে পড়ায়, আবলুর চমক ভাঙ্গিল, ডিক্সনারী বন্ধ রাখিয়া ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু স্বরে ডাকিলেন "ইনেব—"

লজ্জা-চকিত নয়নে চাহিয়া ইনেব উত্তর দিল "জী—"

আবলু বলিলেন "আহ্‌মুর সঙ্গে আমিনার কি ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে জানো? আমিনা তোমায় কিছু বলেছে—"

মৃদু-হাস্য-রঞ্জিত মুখে, সলজ্জ-সঙ্কোচে ইনেব উত্তর দিল "বলেছে,"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া আবলু বলিলেন "কি হয়েছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ইনেব নিজের আঙুলের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লজ্জারক্ত মুখে বলিল "তাস খেলার কথা কালরাত্রে উনি আপনাকে বলে দিয়েছেন, না—! আমিনা দিদি তাই রাগ করেছে।"

আবলু স্মিত-হাস্যে বলিলেন "তাই রাগ! আচ্ছা ছেলে মানুষ বটে!...... ...ইনেব—"

"জী—"

"আমিনা সব কথাই তোমায় বলে?—"

সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ইনেব স্বীকার করিল—সব!

অভিধান ফেলিয়া, আবলু ইনেবের দিকে অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে বলিলেন "আচ্ছা বলতো সত্যি করে—তুমিও আমিনার কাছে তা হলে সব কথা বল—?"

ইনেবের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল ! চকিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলিল "না, না সব বলি না—"

আবলু নিকটে বসিয়া ইনেবের মুখের দিকে চাহিয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন "সব বল না ?—তা হলে কিছু কিছু বল, কেমন ? ছিঃ, ছোট বোন সে আমার, তার কাছে তুমি—" বাকী কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া আবলু নিজেই হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িলেন।

ইনেব কুণ্ঠিত ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরব রহিল।

ইনেবকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে আবলুর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তো সময় নাই ! নীচে চা-পর্ব্বটা এখন পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কৌশল মতে সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে হইবে তো ! আবলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "একলাটি এখানে থাক্‌বে ? নীচে চল—"

ইনেব মনে মনে পরম আশ্বস্ত হইয়া বলিল "আপনি আগে যান—"

তাহার কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিয়া আবলু সস্নেহে ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন "আবার আমায় আপনি বল্‌বে ?—বল 'তুমি',—বল, বল্‌বে না ? যাক তবে, ছাড়ছি নে আমি,—বল 'তুমি'—"

দুহাতে মুখ ঢাকিয়া ইনেব সলজ্জ হাস্যে বলিল "বলব, বল্‌ব—এখন নয়, এর পর—"

হাসিতে হাসিতে দ্বিতলে নামিয়া আসিয়া আবলু দেখিলেন আমিনা ঘোরতর ব্যস্ততার সহিত চা ছাঁকিতে বসিয়াছে। আবলু একটা চৌকী টানিয়া লইয়া নিকটে বসিয়া,—গোঁফে তা দিতে দিতে, চা' এর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভালরূপ চা করিতে পারে নাই বলিয়া, আমিনার কাছে খুব এক চোট বকুনী খাইয়া বালক ভৃত্য রুস্তম সসঙ্কোচে একপাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া একান্ত মনোযোগে নয়নযুগল প্রাণপণে বিস্ফারিত করিয়া, একাগ্র অধ্যবসায় সহকারে—ভালরূপ চা প্রস্তুতের প্রণালীটা শিক্ষা করিতেছিল, আবলু হঠাৎ তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "ওরে বাচ্চা, ওঠ ওঠ,—চট্ করে দাওয়াইখনায় ছুটে গিয়ে দেখে আয় তো আমার দোস্ত ভদ্রলোকটি এসেছেন কি না ?—"

রুস্তম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—'না কোন ভদ্রলোক আসেন নাই।'

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে আবলু বলিলেন "যাঃ বেচারা এসে পৌঁছুতে পার্‌লে না ?—কি আর কর্‌ব, তাঁর কপালে নাই !—তা এটা নষ্ট হয় কেন, আহ্‌মুও তো সকালে ভাল চা খেতে পায় নি,—যা, এটা আহ্‌মুকে দিয়ে আয়—" নিজে একটা পাত্র টানিয়া লইয়া দ্বিতীয়টা রুস্তমের দিকে সরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়া, তাহার কাপড়ের দিকে চাহিয়া,—অকস্মাৎ বিস্ময় মিশ্রিত বিরক্তির সহিত বলিলেন "বেয়াদব কাঁহাকা !—এত ময়লা কাপড় মানুষে পরে ? কাপড়ের চেহারা দেখ্‌লে যে তোর হাতে খেতে ঘৃণা হয় ! যা তোকে চা নিয়ে যেতে হবে না,—পালা"—আমিনার দিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন "যাও তো আমিন্, আহ্‌মু ঘরে বসে আছে, এ কাপ্‌টা তাকে দিয়ে এস তো—"

আমিনা গলা চুলকাইয়া—অসহিষ্ণুভাবে বারেণ্ডার এদিক ওদিক চাহিল, কিন্তু কোন ঝি চাকরকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ চিত্তে নিজেই বিনা প্রতিবাদে চা লইয়া উঠিল, চলিতে চলিতে বারবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, যদি দৈবাৎ কাহাকেও দেখিতে পায় !

পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার শেষপ্রান্তে আসিয়াছে,—এমন সময় সর্ব্বসন্তাপহারিণী দুর্গতিনাশিনীর মতই,—সামনে তুফানী বাঁদীর শুভ আবির্ভাব ঘটিল! হাঁফছাড়িয়া আমিনা বলিল "যা তো ভাই তুফানি, চা-টা ও ঘরে টেবিলে রেখে আয় তো—"

সর্ব্বাবস্থা-অভিজ্ঞা তুফানী বলিল "সাহেব ঘরে আছেন, তুমি যাও"

আমিনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "আমর্ তা কি আমি জানিনে? সেই জন্যেই বল্‌ছি,—যা ভাই লক্ষ্মিটি—"

তুফানী হাসিয়া বলিল "আহা, তোমার কাছে এম্নি করে 'লক্ষ্মিটি' হয়ে শেষে মনীবের বিষনজরে পড়ে—আখের মাটী করি আর কি! বেশ মজা!—সে হবে না, আমিনা বিবি,—তুমি যাও, তুমি যাও—"

আমিনা বাধা দিয়া সকোপে বলিল "দ্যাখো চা জুড়িয়ে যাচ্ছে,—ভাল চাও তো যাও বল্‌ছি"—

বিপন্ন হইয়া তুফানী বলিল "আমার দায়দোষ নেই বাপু, রাজায় রাজায় লড়াই,—মাঝখান থেকে উলু খড়গুলো—"

আমিনা তাড়া দিয়া বলিল "বকিস না থাম, আগে চা দিয়ে আয়,—আমি এইখানে দাঁড়াচ্ছি—যা জলদি—"

তুফানী মাথায় কাপড় টানিয়া, চা লইয়া অদূরে ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া একটু কাশিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়া চায়ের কাপ্‌টা টেবিলে নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল।

আমিনা সাগ্রহে বলিল "কি বল্লে রে?"

তুফানী গম্ভীর হইয়া বলিল "কি আর বল্‌বেন, মাটীর দেবতাটির মত চুপ করে চেয়ারে বসে যেমন বই পড়্‌ছিলেন তেমনি পড়তে লাগলেন,—একবার শুধু চেয়ে দেখ্‌লেন।"

আমিনা একটু চিন্তিত হইয়া বলিল খাবে তো-" তুফানী অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল "তা কি করে জানব,—তোমার উচিত একবার যাওয়া;—যাও না বিবি—" আমিনা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল "উহুঁ! তা হবে না,—সকাল বেলা কিনা আমায়,—নাঃ, আমি কক্ষণো যাচ্ছিনে—"

কিন্তু কক্ষণো' যাইবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিলেও বর্ত্তমানে, গরম চা-টা পাছে জুড়াইয়া যায় সেই আশঙ্কায় আমিনার মনটা অত্যন্তই উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল! কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই! রাগটার মর্য্যাদা হানি ত করা চলে না!—প্রস্থানোদ্যত হইয়া ইতস্ততঃপরায়ণ চিত্তে অন্যমনস্ক ভাবে একবার দুয়ারের দিকে চাহিল,—দেখিল আহমদ্ দুয়ারের সামনে আসিয়া পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন!

মুহূর্ত্তের জন্য আমিনার মনটা একটু বিচলিত হইল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল সকালবেলার কথা!—তৎক্ষণাৎ মাথায় সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পশ্চিম মহলের দিকে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

জন্ম মঙ্গল ।

—:*:—

(১)

ব্যর্থ এ জনম মোর, অভিপ্রায়হীন
সৃষ্টি, সৃষ্টিনাথ তব, আমারে সৃজন
কেমনে কহিব প্রভু ? এই রাত্রি দিন
অহরহ মুহুর্মুহু করিছ রচন
আমারে তুষিতে এই মহা আয়োজন
অগণিত উপাচার বর্ণগন্ধগীতে
অযাচিত উপহার বরেণ্য মোহন
স্নেহপ্রেমকরুণার পর্য্যাপ্ত অমৃতে।
একি সব মিথ্যা কথা ? মিথ্যা অভিনয় ?
বিশ্বব্যাপী আমরণ চিরন্তন কাজ
মানবের, যদি খেলা—সত্য নাহি হয়,
থাক্ মোরে ঠাঁই চির এই খেলা মাঝ।
স্রষ্টার এ সৃষ্টি আমি—মোর প্রয়োজন,
তাঁহার ইচ্ছায় এক দানিতে জীবন।

(২)

বিশ্বরাজ, তোমা হ'তে দূরে কোথা তবে
র'ব আমি ? ধরণীর বক্ষতল জুড়ি
যত কিছু আবর্জ্জনা গ্লানি ক্লেদ র'বে
পাপ মোহ মিথ্যা ক্ষতি ক্ষয় ক্ষোভে পূরি
সে সবারে উপাড়িয়া উন্মুলিয়া নাশি
বহাতে হইবে মোরে সৌন্দর্য্যের হাসি।
হবে মোর সব কাজ তোমার ইঙ্গিতে
হবে মোর সব বাণী তোমারি সঙ্গীত।
আমার প্রশংসা গানে শুনিব তোমার
মঙ্গল আরতি-গাথা কীর্ত্তি বলিহারা।

রাজা তুমি যাবে পথে, পথ-শোভা যথা,
বিছাইব আপনার কার্য্য-চিন্তা কথা
আমি র'ব ধ্বজাধারী নকীব তোমার
করিব করাব' তব গৌরব প্রচার।

(৩)

সত্য হয়ে দৃঢ় হয়ে প্রতিজ্ঞার বলে
অপমান অবজ্ঞারে রুধিব দু'করে
আপনারে ছিন্ন করি ভিন্ন করি জলে
রহিব না দীন নেত্রে প্রসাদের তরে!
ছাঁটিয়া তোমারে, ক্ষুদ্র গৃহ কোণে রাখি
স্পর্শ শুচি জাতি বর্ণ বিচারের বাধা
নির্ব্বিচারে বিরচিয়া তোমারেই ঢাকি
উচ্চারিব উচ্চ স্বরে শুধু মন্ত্র সাধা ?
প্রলোভনে, ভয়ে ভুলি, যদি অবিচার
বরণ করিয়া লই—তা' হলে তোমারে
করিব গো অপমান, যেন অনিবার
এ প্রতিজ্ঞা থাকে মনে আলোকে আঁধারে!
নর সেবা নরপ্রীতি করিতে সাধনা
স্বার্থে দিয়া দর্ভাসন না করি বঞ্চনা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মসমন্বয়ে আকবর বাদ্‌শাহ।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব বহুকাল হইতে জাগ্রত। কালাতীত ঋষিধর্ম্মেও সমগ্র সৃষ্টিকে এক ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও জীবজগতকে এক প্রাণসূত্রে গাঁথিয়াছে। বুদ্ধদেবও জীব-জগতের দুঃখনিবারণের নিমিত্ত যে নিবৃত্তির পথ অনুসরণ করিলেন তাহাতে বিশ্বমৈত্রীই প্রচারিত হইয়াছিল, জাতিবর্ণের বিচার, নরনারীর অধিকার ভেদ তিরোহিত হইয়াছিল।

মুসলমান শাসন ও সভ্যতা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে যে কেবল নব জাতি সংঘাত মাত্র ঘটিল তাহাই নহে, এক নব ধর্ম্মান্দোলনেরও সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বহুকাল গিরিগুহায় বা আশ্রমে শিষ্য প্রশিষ্যের

মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মকে লোকচক্ষু ও সাধারণে গোচর করিবার ভার মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রচারকগণ গ্রহন করিয়াছিলেন। এই কালেই কুমারিল ভট্ট, দার্শানক শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ভারতের চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে এই সন্ন্যাসীদলের আন্দোলনফলে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং যাগযজ্ঞ ও মূর্ত্তিপূজার সম্ভার বিস্তৃতিলাভ করে। ষড়দর্শনের জটিলতত্ত্ব ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া রহিল, ত্রিমূর্ত্তির পূজার আড়ম্বর বাড়িয়া উঠিল, সন্ন্যাসী-প্রচারকগণের মধ্যে রামানুজাচার্য্য প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকরূপে সকলকে আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ভারতে সমন্বয়-বাদের ভিত্তিকে এইযুগে তিনি দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে শিখগুরু নানক এক অভিনব সমন্বয়ের ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানকে অবাধে বাঁধিতে লাগিলেন।

সমন্বয়বাদ চিরদিন সেইখানে উদ্ভূত যেখানে ধর্ম্মসংঘাত ও বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শ ঘটে। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে মোগলভারতে একাধারে হিন্দু, মুসলমান, পারশীক, বৌদ্ধ, যেসুইট্, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেছিল। যে হৃদয় স্বাধীনচিন্তায় আনন্দানুভব করে, ধর্ম্মকে বহিরাবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, তাহাকে প্রহেলিকার আবরণে আবৃত, ভয় ও সংস্কারের মধ্যে অচিন্ত ও অব্যক্ত রাখিতে চাহে না তেমনি হৃদয়ে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব জাগ্রত হইতে পারে। আকবর শাহ স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি সকল ধর্ম্মের তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বাধীন চিন্তা ও সত্যান্বেষণ ভিন্ন নূতনের প্রতি আকৃষ্ট হইবার ভাব কোনও কোনও হৃদয়ে এত প্রবল যে স্বস্ব ধর্ম্মের বিধিনিগড়ও সেরূপ মনকে আবদ্ধ করিতে পারে না। ইতিহাস আকবর শাহের ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। ১ম কারণ, হিন্দুদিগের সংস্পর্শ। সাহসী ও সুদক্ষ হিন্দু সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় রাজ্যশাসনের প্রয়োজনীয়তা আকবর শাহ সুস্পষ্ট দেখিলেন। টোডরমল্লের ন্যায় কেহই বাদশাহের রাজ্যশাসনে সাহায্য প্রদান করিতে পারে নাই। প্রথম হিন্দু সেনাপতি টোডরমল্ল। আকবরের রাজ্যবিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থার সহিত টোডরমল্লের নাম জড়িত। তাঁহারই নির্দ্দেশে মানসিংহের ন্যায় হিন্দু সেনাপতি "সাতহাজারি" পদে বৃত হন। ২য় কারণ, বাদশাহের হিন্দুমহিষী গ্রহণ। অম্বরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ মোগল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভগবান দাস সেই উপলক্ষে "পাঁচহাজারী" সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু ভিন্ন আকবরের অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী পত্নীও অনেক ছিলেন। হিন্দুপত্নী গ্রহণের এক ফল "জিজিয়া" প্রভৃতি বিধর্ম্মীর উপর স্থাপিত কর নিবারণ।

আকবরের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমানের এমন কোনও প্রভেদ ছিল না, যে জন্য এক হিন্দু তীর্থযাত্রীর উপর কর স্থাপন করা তাঁহার চক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। অন্য পক্ষে আকবর শাহ হিন্দুর সহমরণ, বাল্যবিবাহ, বালিকার চিরবৈধব্য অস্বাভাবিক ও নৃশংস বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তৃতীয় ও প্রধান কারণ সুফিদিগের প্রভাব। যে দুই সুফিভ্রাতার নাম আকবরের জীবনবৃত্তান্তের সহিত সংস্পৃষ্ট, তাঁহারা আকবরের সভার আভরণস্বরূপ ছিলেন। গুণে, জ্ঞানে ইহাদিগের তুলনা সেকালে মিলিত না। ফৈজী কবি, আবুল ফজল ঐতিহাসিক। বাদশাহের উপর ফৈজী ও আবুল ফজলের প্রভাব অপরিমিত; এই দুই ভ্রাতাদ্বারা বাদশাহ সুফী-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হন। আবুল ফজলের ন্যায় চিন্তাশীল ও বহু জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাবে আকবর ধর্ম্ম ও দর্শনের প্রশ্নগুলির প্রকাশ্য আলোচনায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ফতেপুরের ইবাদত্-খানায় এই সকল তর্ক চলিতে লাগিল। এই সময়ে ফতেপুর এক সুরম্য নগরে ও সম্রাটের প্রিয় বিহারস্থানে

পরিণত হইয়াছে। এই নগরের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীসম্পাদের সহিত সাধু সালিম চিস্তি ও সম্রাট পুত্র সলিমের জন্মকথা জড়িত রহিয়াছে। এক্ষণে ফতেপুর জনশূন্য, পরিত্যক্ত। কোনও ঐতিহাসিক বলেন "আজ ফতেপুরের ভগ্নাবস্থার ন্যায় বিষাদ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ দৃশ্য ভারতে আর নাই—ইহা অতীত স্বপ্নের নীরব কাহিনী। ইহা আজিও উহার সাত মাইল বেষ্টিত নগর সাম. উহার প্রাকারযুক্ত সাতটী বৃহৎ দরওজা, বিস্ময়কর প্রাসাদরাজি, সলিম চিস্তির মর্ম্মরকবর, বিচিত্র চিত্রাবলী ও কারুকার্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণহীন দেহের ন্যায় দণ্ডায়মান।" ঐতিহাসিক ইহাকে ভারতের পম্পিয়াই ও চিত্রসৌন্দর্য্যের সমাবেশ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের এমনি লীলাভূমিতে আকবরের সমন্বয়ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইবাদতখানায় ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বকলহে বাদশাহের মন সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। গোঁড়া মোসলমান ও উদারমতাবলম্বীর মধ্যে বিদ্বেষ জাগরিত হইল। বাদশাহ সকল ধর্ম্মেই সত্য দেখিতে পাইলেন এবং কোনও এক ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। আবুল ফজল এই উদারভাবাত্মক কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, যাহার সহিত আধুনিক কালের টেনিসন্ প্রভৃতি কবির রচনাসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। যথায় যাই সকল লোকের ভিতরে তোমাকেই দেখি, হে ঈশ্বর ; বহু ঈশ্বরবাদী বা মোসলেম কেহই তোমার একমাত্র প্রিয়পাত্র নহে; আমি খ্রীষ্টানের ভজনালয়ে যাই, কখনবা মসজিদে, সর্ব্বত্রই দেখি তোমাকে।" এই প্রকার সমন্বয়বাদ দিনে দিনে বাদশাহের মন অধিকার করিতে লাগিল। তিনি প্রায়ই উষার আলোকের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া প্রাসাদপ্রাঙ্গনে একটী প্রস্তরখণ্ড উপবেশন করিতেন ; বালার্ককে ধীরে ধীরে উদিত হইতে দেখিতেন এবং জীবনের রহস্যচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। এই সময়ে নানা সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। একদিকে তিনি সাগ্রহে খ্রীষ্টযাজকের বাক্য শ্রবণ করিতেছেন অন্যদিকে হিন্দুযোগীর মুখে বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিবাদও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এমন অবস্থায় মোসলমান ধর্ম্মের সীমার মধ্যে তাঁহার মন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। তিনি সর্ব্বপ্রথম অভিবাদনে "আল্লাহো আকবর" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ প্রবর্ত্তন করেন। ইহার অর্থ "ঈশ্বরই মহান্", এবং প্রতি নমস্কারে—"জাল্লা জাল্লালু" অর্থাৎ "তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হউক" ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

ইংলণ্ডে রাজা অষ্টম হেন্‌রী যেমন পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া আপনাকে ধর্ম্মনেতা বলিয়া ঘোষিত করেন, মোগলভারতে সেইরূপ বাদশাহ আকবর আপনাকে মোসলেম ধর্ম্মের প্রতিভূ করিয়া তুলিলেন। পুরোহিত সম্রাট একদিন ফতেপুরের প্রশস্ত মসজিদে সর্ব্বসমক্ষে খুৎবা (প্রার্থনা) পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন কিন্তু ভাবে অভিভূত এবং জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ইহার পরে এক অভিনব ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সম্রাট ধর্ম্মের সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার আপনি গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল মধ্যে বাদশাহ তাঁহার "দিন-ইলাহি" অর্থাৎ স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন। ইহা সকল ধর্ম্মের সংগ্রহ ও অদ্বৈতবাদ। এত উদারমত ও স্বাধীন চিন্তাপ্রিয় হইয়াও বাদশাহ সামান্য কুসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন না। পীর ফকির, সাধুদিগের কবর প্রায়ই দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহাদের অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। ইহা লইয়া ঐতিহাসিক বেদোনী, সম্রাট-চরিত্রকে যথেষ্ট উপহাস করিয়াছেন। কারণ বেদোনী গোঁড়া মোসলেম ছিলেন, সম্রাটের উদারতা পছন্দ করিতেন না। আবুল ফজল ও ফৈজী ভিন্ন সম্রাটের নবধর্ম্মের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষক বড় কেহ ছিল না। কারণ বাদশাহ নানা মত ও নানা ভাবকে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করিতে পারেন নাই উহা ভাবুকতা ও অজ্ঞতা দুইয়ের মধ্যেই ডুবিয়া গেল। একদিকে সম্রাট সূর্য্যের স্তব করিতেন, বিশেষ দিনে

কপালে হিন্দুর ন্যায় তিলক করিতেন, হাতে যজ্ঞসূত্র বাঁধিতেন, আবার পারশিকদিগের ন্যায় অগ্নির উপাসনা করিতেন। প্রাসাদে তিনি হিন্দুর হোম ও পারশিকের অগ্নি উপাসনা উভয়ই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এরূপ ভিত্তিহীন নবধর্ম্ম কাহারও হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিল না; ইহার মত সকল চঞ্চল, ইহার গভীরতাও অল্প। বাদশাহের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে এই ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তবে এরূপ সমন্বয় চেষ্টার পরোক্ষ ফল তুচ্ছ করিবার নয়, কারণ ইহাদ্বারা প্রকৃত সমন্বয় ধর্ম্মের প্রতি মানবসমাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হয়।

বাদশাহের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে উলিয়ম ফিঞ্চ (William Finch) নামে ভ্রমণকারী ধ্বংসোন্মুখ ফতেপুর দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই খোয়াবগা (স্বপ্নের ঘর) যাহার মর্ম্মর পর্দ্দার মধ্যে বাদশাহ গ্রীষ্মের শান্তিময় দিবস কাটাইতেন, গৃহদ্বারে সেই পার্শী বয়ান, আবুল ফজল ও ফৈজীর সুরম্য গৃহ, দেওয়ানাখাস্ (যেখানে মোসলমান পণ্ডিতবর্গ, কেথলিক পাদ্রী, অগ্নিউপাসক, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণ সুতীব্র তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, আর যেখানে বসিয়া অদূরে নীতিবান্ বেদৌনী ভ্রূকুটী করিতেন), এবং সৌন্দর্য্যের খনি তুর্কীদেশীয় মহিষীর কুঠী তখনও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক বেদৌনী বলিয়াছেন খ্রীঃ ১৬ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বপ্রথম মোগল সভায় উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ পুত্র মোরাদকে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ও আবুল ফজলকে উহার তর্জ্জমা করিতে আদেশ করিলেন। বাস্তবিক সম্রাটের নিকট কোনও নূতন বস্তু অনাদৃত হইত না। কৃত্রিম উপায়ে সোনা প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত হইতে জ্যোতিষ সকলই তিনি চর্চ্চা করিতেন। নূতনের প্রতি এরূপ অনুরাগ যেমন সকল উন্নতির মূল তেমনি তাহা অনেক স্থলে কেবল বালকোচিত কৌতূহলমাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং চিত্তের স্থিরতা ও দৃঢ়তা নষ্ট করে। *বাদশাহ আকবর নূতনের পক্ষপাতী হইয়া বহু উন্নতির সূচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার "দীন-ইলাহি" ভ্রমপূর্ণ ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

মারহাট্টা।

—:*:—

(১)

হিন্দু যবে জাবন্মৃত মোগলদলের অত্যাচারে,
উঠ্‌ল কাঁপি আর্য্যভূমি যবন জাতির চরণভারে,
ধাতা তোদের করল প্রেরণ সত্যরতন রক্ষালাগি,
হিন্দু বীরের হৃদয় যাগের চরু হ'তে উঠ্‌লি জাগি;
সঞ্জীবিত করলি সবে শক্তি সুধা সঞ্চারি',
উঠ্‌ল মাতি নবীন তেজে দুর্ব্বলেরো ক্ষুদ্র হিয়া;

শুভক্ষণে আস্‌লি নামি স্বর্গ হ'তে স্বর্ণরথে,
লুপ্ত হ'তে দিস্‌নি তোরাই হিন্দুনাম আজ বিশ্বহ'তে।
বীর্য্যে তোরা বিশ্বে মহান তাই তো তো্দের উচ্চশির,
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ ধরা ধন্য তোরা আর্য্যবীর।

(২)

দলন করি দুষ্টদলে করলি পালন পুণ্যবানে,
আশ্রিতেরে অভয় দিলি শক্রসখা সমান জ্ঞানে,
প্রতিহিংসা সাধন তোদের ক্ষমা করি শত্রুজনে,
স্বধর্ম্মে তোর নিধন শ্রেয়ঃ, শাঠ্য তোদের শঠের সনে;
স্বাধীনতার করলি পূজা বৃদ্ধ শিশু সবাই মিলি,
নিত্য ধ্রুব সত্য তরে পুরুষনারী পরাণ দিলি;
ঝঞ্ঝা মাঝে অটল থাকি উঠ্‌লি আপন চরণ ভরে,
হাস্যমুখে করলি বরণ যুদ্ধে মরণ মোক্ষ তরে;
বীর্য্যে তোরা বিশ্বে মহান তোদের সদা উচ্চশির,
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ ধরা ধন্য তোরা আর্য্যবীর!

(৩)

অনাহারে রাত্রিদিনে বৃষ্টিধারা পৃষ্ঠে ধরি,
ছুটলি তোরা মরুর মাঝে ভূধর শিরে অশ্বোপরি,
বজ্রসম শক্তি দেহে নেত্রে সবার বহ্নি জ্বলে,
কঠিন করে কঠোর কৃপাণ বিশ্ব-বিজয়-মাল্য গলে,
গুরুর বাসে গড়্‌লি ধ্বজা দেবীর আশীষ ধরলি শিরে,
ঢাল্‌লি শোণিত দেশের তরে আপন করে বক্ষ চিরে;
যুদ্ধ তোদের ধর্ম্ম তরে তুচ্ছ করে আপন প্রাণ,
শিরের চেয়ে সার বড় তোর প্রাণের চেয়ে শ্রেষ্ঠমান,
বীর্য্যে তোরা বিশ্বে বড় জগৎ মাঝে উচ্চশির,
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ মোরা ধন্য তোরা আর্য্যবীর!

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

বধূ।

হেমন্তের নিশিরস্নাত প্রভাতে দুই পাশের শ্রেণীবদ্ধ তরুবিথির ফাঁকে ফাঁকে পীতাভ স্নিগ্ধ রৌদ্র আসিয়া গ্রাম্য কাঁচা রাস্তার উপর পড়িয়াছে। কোনও কোনও গৃহস্থের প্রাঙ্গণের সুপারীগাছের অগ্রভাগ প্রভাতের বাতাস লাগিয়া মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। নরেন রেশমী চাদর উড়াইয়া এসেন্সের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে ফুল মোশনে সাইকেল ছাড়িয়া চলিতেছিল। এক একবার বৃক্ষশ্রেণীর অবসান সীমায় মুগ্ধনেত্রে মা লক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চলের মত পাকা ধানের স্বর্ণশীর্ষ হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সম্মুখের একটা বিচালী বোঝাই মহিষের গাড়ীকে অনবরত বেল বাজাইয়া এক পাশ করাইয়া সে নিজের পথ করিয়া লইল। থড়ম পায়ে গায়ের খঞ্জির উপর কোঁচার কাপড়টা জড়াইয়া ছাতি মাথায় দিয়া বিনয় আসিতেছিল। নরেন তাহাকেও সরাইবার অভিপ্রায় বেল্ টিপিল, বিনয় একটু সরিয়া হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল "কি, তুমি ছুটি পেলে?" "পেলাম" "তা এদিকে যাচ্ছো, বাড়ী যাবে না? নরেন একটু থামিয়া বলিল "যাবো। তোরা ভাল আছিস্ তো?" "আছি। তুমি এস শিগ্‌গীর। কোথা যাচ্ছো?" "পোষ্টাপিস্।" বিনয়ও নরেনের কাঁধের উপর ভর দিয়া তাহার পশ্চাতে উঠিয়া পড়িল।

তাহাদের চলন্ত সাইকেলটাকে দেখিয়া একটা বাবলা গাছের আড়ালে দুইটী তরুণী কৃষক-বধূ আর্দ্রবস্ত্রে জলের কলসী কাঁখে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটী পুরাতন ইষ্টক বাহির করা চারিদিকে বটঅশথের মৌরসীপাট্টা লইবার মত শিকরময় বাড়ীর সম্মুখে নরেনকে শীঘ্র ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বিনয় নামিয়া পড়িল। বাড়ী ইঁটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা কিন্তু ভিতর বাহির গোবরের ঘুঁটে এবং তাহার অস্তিত্বের চিহ্নে চিহ্নে একেবারে ঢাকা সে প্রাচীর ঘুঁটের কিংবা ইঁটের তাহা লক্ষ্যনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিনায় একটী কূপের কাছে বসিয়া একটী কিশোরী গোবরমাটীমাখা হাতে পায়ে সাবান দিয়া স্নান করিতেছিল। বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল "উঁহু ওতো হচ্ছেনা সাবি ও যে বার্নিস রং, শীগ্‌গির উঠ্‌বে না, একখানা ঝামা এনে দোব? সাবি মৃদু হাসিয়া কহিল "আচ্ছা তুমি 'ত খুব ফরসা বাপু।" "আমি ফরসা নই তো কি? তোর মত কালপেঁচা? নে নে এই আমার ছুরীখানা নে. একটা পুরু ছাল তুলে ফেল্‌লেই দিব্যি টকটকে রং বেরিয়ে প'ড়্‌বে।" সাবি এবার উত্তর না দিয়া মুখ ঘসিতে লাগিল। বিনয় তেমনি হাসি মুখে আবার কহিল "বাস্ বাস্ হয়েচেরে হয়েচে এইবার মেমগুলাও ঘোমটা দিতে সুরু ক'রবে। আঃ মা কোথায়? মা, ওমা।" গৃহিণী বাহির হইয়া বলিলেন "কিরে?" সাবি মাতাকে দেখিয়া প্রায় কাঁদকাঁদ মুখে কহিল "দেখনা মা মেজ্‌দা কি বলছে।" বিনয় সহাস্যে একবার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিল "মা, দাদা এসেচে।" মাতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সত্যি? তোকে কে বল্‌লে?" "কেউনা। এইমাত্র একসঙ্গে দুজন এলাম সে পোষ্টাফিসে গেল।" "ওমা খবর দিলনা কিচ্ছুনা বৌমা যে এখানে রয়েচেন" বিনয়ের মুখ দারুন বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল "রয়েচেন তো হয়েচে কি? অন্যায় যা তারই প্রশ্রয় কি চিরদিনই দিয়ে আসতে হবে নাকি?" মাতার মুখে স্পষ্ট চিন্তার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সেই সময় রান্নাঘর হইতে বধূর হাসিমাখা মুখখানি বাহির হইল "ও ঠাকুরঝি ক্ষেপ্‌চো কেন ভাই, সাবান না মাখলে যে বিয়েই হবেনা।" "ওঃ না হল তো ভারি বয়ে যাবে আমার; তার জন্য তোমার এ

মাথা ব্যাথা কেন ? "ওমা আমার মাথা ব্যাথা হবেনা, শুদ্ধ এই ভাবনায় কাল সারা রাত্তির ঘুম হয়নি জানতো ?" "ইস্ ! আমার ভাবনায় যে মিথ্যে কথা বোলচো বৌদি, হ্যাঁ শুনেচ দাদা এসেচেন।" বধূর মুখের আনন্দোজ্জল দিপ্তিটুকু নিমেষে নিবিয়া ম্লান হইয়া গেল।

সে সঙ্কুচিত মুখে ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। বিনয়ের বড় ভাই নরেন এল্-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার ছাড়পত্র গ্রহন করিতে প্যারে নাই। এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পরই, প্লীহাযকৃতে ঢক্কাকার উদর, মুখের দাঁতগুলি পোকাখাওয়া, পাণ্ডবর্ণা জীর্ণাশীর্ণা সপ্তম বর্ষীয়া নির্ম্মলার সহিত তাহার বিবাহ হয়। নরেন তখন নবীন জীবনের সুখ সৌখিনতায় ভরপুর; সে জাগিয়াই প্রেমের স্বপ্ন দেখিত, নিদ্রার ভর সহিত না। তাহার এমন আসরে কিনা জুটিল একটা কাবন্ত লেশ মাত্র বর্জ্জিতা বালিকা। মেয়েটী তখনো কোনও সরম সঙ্কোচের অধীন হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা নরেন কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া আবার রাত্রির জন্য বাহিরে হইতেছিল। তাহার কোটের বোতামের ঘরে একটা চমৎকার গোলাপ ছিল। নির্ম্মলা ফুলটার জন্য নাচিয়া উঠিল, সে লইবেই, আবদার দেখিয়া নরেনের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। দু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জুতা মারিয়া নিকাশ করিবার ভয় দেখাইলেও সেই একগুঁয়ে মেয়ে নিরস্ত হইল না। নরেন নত হইয়া জুতার ফিতায় ফাঁস দিতে গেলেই সে ফুলটা লইতে গিয়াই ঘৃণায় মুখ সরাইয়া বলিল " আঃ রামঃ তুমি মদ খেয়েচো " নরেন তড়িদ্বেগে সোজা হইয়া উঠিল " খবরদার ! এত স্পর্দ্ধা তোর।"

তৎক্ষণাৎ মাকে ডাকিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল ঝাঁটা মারিয়া ওইটাকে বিদায় না করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। এই ব্যাপার লইয়া মাতাপুত্রে বচসা খুবই পাকিয়া উঠিল। ফলে নির্ম্মলাকে বাপের বাড়ী পাঠান হইল। নরেনও মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেসনের ছোট বাবু হইয়া ষ্টেসনে ষ্টেসনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অবাধে নরক পঙ্কে ডুবিয়া আছে। বছর পাচেক পরে সেই পাণ্ডুর জীর্ণ কাটামোতে তরুণ বসন্ত হিল্লোলে শুষ্ক লতার মত নির্ম্মলার সারা অঙ্গে অনুপম লাবণ্য শ্রী কচি কিশলয়ের মত জাগিয়া উঠিল। পাংশু মুখে সদ্যবিকশিত গোলাপের রক্তাভাস রঞ্জিত হইল। মুগ্ধা শ্বশুড়ী পুত্রের অনুপস্থিতিতে বধূকে কাছে আনিয়া রাখিতে লাগিলেন। পুত্রের আগমন সম্ভবনা হইলেই তাহাকে তিনি পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন; এবার সে আবার কি কাণ্ড বাধাইবে কে জানে ? বিনয় সুবোধ ও বুদ্ধিমান, সেই কেবল দাদার কার্য্যকলাপ দেখিয়া জ্বলিয়া যায়। কিন্তু নির্ম্মলার সদাপ্রফুল্ল প্রভাত-পদ্মের মত হাসিমাখা মুখখানি কেহ কোনও দিন এ জন্য বিন্দুমাত্রও মলিন হইতে দেখে নাই।

(২)

প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে একটা অজস্র শেফালি ঝরা ফুলের মাঝে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চের নিচে কচু হরিদ্রা শুশুনী কলমী ক্ষেত্রের ভিতর লেপামোছা যম-পুকুর লইয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠা বালিকা সুরি সুর করিয়া " রাজার বেটা পক্ষী মারে" তার পর ! তার পর কি ? ও বৌদি বলে দাওনা ভাই, দাও,—নরেনের সদ্যসুপ্তোত্থিত কর্ণে ভগিনীর উচ্চারিত কথা প্রবেশ মাত্র সে উগ্রভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তবে বুঝি মা আবার সেইটাকে আনিয়াছেন ছেলের চেয়ে তাঁর বউ কি বড় হইল ? সহসা বাহিরে দৃষ্টি পড়িল—স্নান শিক্ত বস্ত্রাবৃতা সলিলাদ্র ফুটন্ত পদ্মের মত একটা সুন্দরীর উপর। ভিজা কাপড় ভেদ করিয়া লাবণ্যময়ীর আরক্তবর্ণের আভা দেখা যাইতেছিল। রেশমের মত তরঙ্গায়িত কেশদাম স্তরে স্তরে আজানু আচ্ছাদিত করিয়াছিল। দুগাছি লালশাঁখায় মোমের মত সেই হাত দুখানি ঝাঁটা। সুন্দরী কাচা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল। তাহাকেই সুরি মন্ত্র বলিয়া দিতে বলিতেছিল। নরেনের

মুগ্ধনেত্র আর ফিরিল না,—এই নাকি সেই ? তাও কি হইতে পারে ? তবে বৌদি বলে কেন ! তাহার খুড়তুতো ভায়েদের কাহারো স্ত্রী হইতে পারে। চমৎকার সুন্দরী বটে ! নির্ম্মলা হাতের আলুর খোসা ছাড়ানো-অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া তাড়াতাড়ি ফুটন্ত ভাতের ফেন গালিতেছিল এবং সাবিত্রী এক কোণে বসিয়া মশলা বাটিতেছিল। নির্ম্মলা অগ্নিতাপে আরক্ত ঘর্ম্মসিক্ত কপালের অলকগুচ্ছ কাঁধের উপর মাথা ঘসিয়া সরাইতেছিল। গৃহিনী ম্লান মুখে মৃদুস্বরে বলিলেন "বৌমা !" মুখ তুলিয়া বধূ বলিলেন "কি বল্‌চেন মা" "ভাত তো নেবে গেচে তুমি দুটো খেয়ে নাও মা, এখনি আসবে গিয়ে।" বধূ মুখ নত করিয়া ক্ষণেক কি ভাবিয়া কহিল "আমি থাকি না মা" "কি করি মা ভয় করে যে" বলিয়া শাশুড়ী আবার খাইয়া লইতে বলিলেন বধূ এবারও মিনতিপূর্ণ চক্ষে শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া কহিল "আপনার পায়ে পড়ি মা আমি থাকি এখানে।" এবার অনুমতি পাইয়া সে প্রসন্নমনে রন্ধনে মনোনিবেশ করিল। দ্বিপ্রহরের খররোদে গোয়াল ঘরের খড়ের চালে বসিয়া কপোতযুগল স্বজাতীয় ভাষায় কূজন করিতেছিল। ঘরের ছায়ায় নিরলসা বালিকা সরি রান্নাঘর হইতে বাটা হলুদ সংগ্রহ করিয়া কাঁচকলার খোসায় উপাদেয় ব্যঞ্জন রাঁধিয়া বন্ধুবৃন্দকে পরিবেশন করিতেছিল। সম্মুখে বড়দাদাকে দেখিয়া কাদার ভাতমাখা হাতখানা ত্রস্তে কাপড়ে মুছিয়া তাড়াতাড়ি আল্‌নার কাপড় তুলিতে গেল। নরেন একটু হাসিয়া কোন্ কাপড়খানি কার প্রশ্ন করিতে লাগিল। একখানি কাপড়ে সরি বিব্রত হইয়া গেল সেখানা নির্ম্মলার। নরেন প্রশ্ন করিল "এখানা কার ?" "বৌদির।" "বৌদি কে ?" কি মুস্কিল ! বৌদিদিকে আবার বড়দাদা চেনেন না ! সরি চারিদিকে চাহিল কেহ কোথাও নাই যে প্রশ্নটার উত্তরটা দিয়া দিবে। সরি বলিল "জানিনে তো।" "আমোল ! বল্‌চিস্ বৌদি আর জানিসনে ?"

সাবি মনে মনে বড়দাদার আশু ছুটীপূর্ণ কামনা করিল। কহিল "হ্যাঁ এখানা বৌদিদিরই তো।" "সে বৌদির নাম কি ?" "তাঁর নাম ?" "হ্যা কি ?" "নির্ম্মলা" বলিয়া সাবি কাপড়গুলা বিশৃঙ্খলভাবে গায় মাথায় জড়াইয়া দ্রুত পদে ঘরে গিয়ে উঠিল। এবং নিদ্রিতা মাতার কোলের কাছে শুইয়া পড়িল। কক্ষান্তরে নির্ম্মলা সাবিত্রীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল মুক্ত জানালা দিয়া একজোড়া অপলক চোখের উপর দৃষ্টিপাত মাত্র সবেগে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সে সরিয়া বসিল। সাবিত্রী মুখ ফিরিয়াইয়া দেখিয়া হাসিল। সেই সময় সরি হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিল "তোমার নাম বলে দিইচি।" সাবি উৎসুক হইয়া বলিল "কাকে রে ?" "বড়দাদাকে" বধূ গম্ভীর মুখে কহিল "বেশ" করেচ, ভারি কাজই করেচ কি বকশিস্ পেলে ?" সরি অপ্রতিভ হইয়া কহিল "জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই" একটু চমকিয়া নির্ম্মলা চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে নরেন ভাবিতেছিল বেশ দেখিতে হইয়াছে তো ? এইবার ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমি এতদিন দেখিনি ! তা সঙ্গে যেতে পেলেই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। এখানে তো এই খাটুনী খাটে সেখানে কেবল মাত্র দুজনার কাজ। তা আমিও বড় বাঁধা নই। প্রস্তাবটা করলে মন্দ হয় না। বিনয়ের কাছে কথা তুলিয়াছিল। বিনয় কহিল "ব'লে দেখ মাকে, বৌদিদিকে,—মা পাঠান যদি নিয়ে যাও। আর বৌদি যদি যেতে চান," নরেন মনে মনে কহিল "যেতে আবার চাবেন না ? ওর আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কি ? নিয়ে যেতে চাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।" বস্তুতঃ এই রকম স্ত্রীলোকদের যে আবার একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে তাহা নরেন বিশ্বাসই করিতে পারিত না। তবে মাকে একবার বলা; কিন্তু বলি বলি করিয়াও যে মুখ ফুটিয়া মায়ের কাছে এপ্রস্তাব তুলিতে পারিতেছিল না। ক্রমশঃ তাহার ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছিল, সে নির্ম্মলার সহিত কথাবার্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

(৩)

সাবি ও সরিকে লইয়া গৃহিণী বাড়ীর সংলগ্ন প্রতিবাসীর ঢেঁকিতে কিছু হলুদ কুটিতে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সরিকে নির্ম্মলার কাছে রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সরি আবার মায়ের কাছেই চলিয়া গিয়াছিল। নির্ম্মলা একাকী বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সারিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেলে সে নিয়মিত শাঁখ বাজাইয়া ঘরের দুয়ারে জলের ছিটা দিয়া দীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় দিতে যাইতেছিল। ধুপের মৃদুগন্ধে ছোট প্রাঙ্গনখানি সুরভিত। নির্ম্মলা তুলসী মূলে প্রণাম করিয়া নতমস্তক তুলিবামাত্র দেখিল সন্ধ্যার অস্পষ্ট ধুসর আলোকে তাহার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া নরেন। তাহার আপাদ মস্তক বারেক কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুত স্পন্দিত বুকটা সামলাইয়া সে মাথার কাপড় টানিয়া মৃদুপদে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নরেন ডাকিল "দাঁড়াও, শোন" নির্ম্মলা অধোমুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের প্রদীপের মৃদুরশ্মির সমস্তটা প্রায় তাহারই মুখখানি রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। নরেন কহিল "আমার ছুটী ফুরিয়েছে,—তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?" নির্ম্মলা মুখ তুলিল কিন্তু উত্তর করিল না। নরেন আগ্রহের সহিত কহিল "কি বল ? যাবে তা হ'লে কেমন ?" নির্ম্মলা শান্ত স্থিরকণ্ঠে কহিল "কোথায় ?" "আমার সঙ্গে, বাসায়।" "না।" আশ্চর্য্য হইয়া নরেন কহিল "যাবে না ? কেন ?" নির্ম্মলা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "যাবোনা।" "কেন শুনি।" "আমি গেলে ঠাকুরঝিদের নিয়ে একা মায়ের কষ্ট হবে।" "ওঃ তাই যাবে না, কিন্তু মা তো আমারই মা, আর আমারই বোন্ ওরা।" "হ্যাঁ,—আমার শাশুড়ী ননদের কষ্ট হবে।" বলিয়া আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া নির্ম্মলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নরেন বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। নরেন ভাবিয়াছিল স্ত্রী তো তাহার, তাহারই ইচ্ছাধীন। যখন যেমন করিয়া ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া রাখিবে কিন্তু ফলে দেখিল ইচ্ছার অধীন হওয়া ত দূরের কথা তার নিজের ইচ্ছাটুকু সতেজে প্রকাশ করিবার পথটুকুও আর নির্ম্মলার নিকট নাই। নির্ম্মলার দৃঢ়তা এমনি কঠিন যে কোনও কথাই যেন আর সেটুকু ভেদ করিতে পারে না। যাত্রার দিন বেলা ১০টার সময় নির্ম্মলা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করিতেলি। সাইকেল লইয়া বাহির হইতে হইতে, নরেন সেখানাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠেস্‌দিয়া রাখিয়া নিশঃব্দে আসিয়া চৌকাটের উপর দাঁড়াইল। নির্ম্মলা নতমুখে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতে লাগিল।

নরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "চল্‌লাম আজ তুমি ত আর গেলেনা" নির্ম্মলা একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া নীরবে মুখ নামাইল। নরেন আবার কহিল "আচ্ছা সত্যিই তুমি যেতে চাও না! এবার নির্ম্মলা মুখ তুলিয়া ধীরে অথচ তীব্রকণ্ঠে কহিল "না, আমি চাই যে এই শশুরের ভিটেতে একটু আশ্রয় পেয়ে থাকতে, আমার জন্যে কারু কোন অভ্যস্ত জীবনের ধারা বদ্‌লাতে হয় এত আমি চাইনে, কিছু নই বলে, আমি খেলার পুতুলও নই।" নরেন এই তীব্র কৈফিয়তের মুখে এতটুকু হইয়া গেল। প্রতিবাদ করিয়া কোমল কণ্ঠে কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল কিন্তু সাবিত্রীর মনের আওয়াজে তাড়াতাড়ি দাওয়ার নীচে নামিয়া পড়িয়া সাইকেল টানিয়া বাহির হইয়া গেল। সাবিত্রী আসিয়া নির্ম্মলাকে কহিল "বড়দা কি বলিয়াছিলেন বৌদি ?" নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল সে তাহা গোপন করিয়া কহিল "তা আমি তোমায় বল্‌বো কেন!" সাবিত্রী কহিল "না ভাই সত্যি বলনা কি বলছিলেন।" নির্ম্মলা হাসি মুখে কহিল "যে মস্ত একটা খবর বলাই যায় না।" সাবি রাগ করিয়া কহিল "যাও, চাইনা শুনতে।" নির্ম্মলা ডাকিল "শোন শোন বল্‌ছি" সাবি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আগ্রহভরে কহিল "বল" "চমৎকার একটী বরের সন্ধান পাওয়া গেছে।" সাবি হাসিয়া ফেলিল কহিল, "তুমি মর, তার পর বড়দাদার কথাটা ভাবিয়া তাড়াতাড়ি নির্ম্মলার

কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল "না ভাই তুমি যেওনা ওঁর সঙ্গে, আমরা তোমায় ছেড়ে থাকতেই পারবো না।" নির্ম্মলা মনের ভিতর সাবিত্রীর উৎফুল্ল মুখের পাশেই নরেনের ম্লান মুখখানি জাগিয়া উঠিল।

দিন কয়েক পরে দুই প্রহরের সময় নির্ম্মল রান্না করিয়া বসিয়াছিল। চারি দিকে প্রখর রৌদ্রে ভরা। বিনয় আসিয়া গায়ের কোট্‌টা খুলিয়া দড়ির আলনার উপর রাখিতেছিল, নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে কহিল "আচ্ছা ঠাকুরপো দুপুর যে উৎরে চল্‌লো খিদে-তেষ্টাও কি পায়না বাপু তোমার।" গায়ের গঞ্জিটা খুলিতে খুলিতে মৃদু হাসিয়া কহিল "দেরী তো তোমার জন্যই হয়ে গেল বৌদি. যে ভারী জিনিষ নিয়ে এসেচি তোমার, জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁট্‌তে হয়েচে" নির্ম্মলা বিস্মিত হইয়া কহিল "সে আবার কি আমার আবার কি এনেছ?" "এই দেখনা" বলিয়া বিনয় কোটের পকেট হইতে টানিয়া একখানি সুদৃশ্য রঙ্গীন খাম বাহির করিয়া নির্ম্মলার হাতে দিল নরেনের হাতের লেখা নিজের নামটার দিকে চাহিয়াই নির্ম্মলার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। সে আর লজ্জায় বিনয়ের দিকে চাহিতেও পারিল না। পত্রখানি মুঠার ভিতর চাপিয়া লইয়া ঘরে গিয়া খুলিল। পত্রের প্রতি ছত্রই এই আকস্মিক অনুরাগের আবেগসম্ভূত প্রলাপে পরিপূর্ণ। যে আবেগ সঞ্চারের পূর্ব্বেই নির্ম্মলার বক্ষগুহা ধ্বসিয়া থিতাইয়া গিয়াছে এই সামান্য আন্দোলন তাহা ঘোলাইতে পারিল না। বরং তাচ্ছল্য ভরে নির্ম্মলা মৃদু হাসিল। এসব কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। তার জীবন কেবল মাত্র তার নিজের সুখ দুঃখে ভরিয়া রাখিতে সে চায় না, বিশেষ যেখানে সম্প্রীতির অপেক্ষা অপ্রীতির সম্ভাবনা অধিক। গৃহিনী আসিয়া কহিলেন "বৌমা চিঠিখানা নরেনের তো, পৌছন সংবাদ দেওয়া তো তার স্বভাবে নেই, ভাল আছে তো?" মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়াই নির্ম্মলা সরিয়া পড়িল। আকস্মিক বস্তুর উপর যে অদমনীয় ঝোঁক চাপে, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইলে সে উত্তরোত্তর তীব্র দুর্দ্দাম হইয়া উঠে। ইহারই উত্তেজনায় নরেনের দিবারাত্রিগুলা কাটিতেছিল। নির্ম্মলার উপেক্ষা তাহার আরো রোখ বাড়াইয়া দিয়াছিল। ষ্টেসনে বসিয়া মনে হইতে লাগিল—অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৪)

গৃহিনী স্নান করিতে গিয়াছেন, সাবি রান্নাঘরে উনানে আগুন দিয়াছে, কয়লার ধূমে বাড়ীখানা অন্ধকার। নির্ম্মলা ঘর দ্বার আঙ্গিনা গোবর-মাটি দিয়া লেপিতেছিল. নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানকার পুরাতন ইয়ারবৃন্দ তাহাকে কিছুতেই নূতন হইতে দেয় না তাই চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া আসিয়াছে। মা প্রশ্ন করিলে কহিল "ষ্টেসনের লোকগুলো খারাপ, তারা ছাড়ে না, তাদের তো ব'য়ে গেলেও চলে. আমার আর ও-সব তাতে ডুবে থাক্‌লে চলে কই!" মা মনে মনে হরির লুট মানত করিয়া কহিলেন "তা হলে এখন বাড়ীতে থাকবি তো?" "দেখিগে দিনকতক" বলিয়া সে এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল "মা ওরা আছে তো!" মা অপ্রতিভভাবে কহিল "তা পাঠিয়ে দিলেই হবে।" "না না তা বল্‌চিনে থাকনা তোমার সেবা টেবা করুক।" মা একটু হাসিলেন।

পর বৎসর, বছর-খানেক নূতন শ্বশুরঘর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী নির্ম্মলাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "কই বৌদি তোমার খোকা কই!" নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল 'তোমারটা আগে দেখাও'। নির্ম্মলার বুকে মুখ লুকাইয়া সাবিত্রী কহিল "ধোৎ" সরির কোলে খোকার মৃদু কাকলী শুনিয়া তাহাকে কোলে লইয়া একটু কাসিয়া চোক টিপিয়া কহিল "বড়দা?" নির্ম্মলা হাসিল "না স'ত্যি বল গিয়ে একটা প্রণাম করিগে" অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ঘর দেখাইয়া দিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে নির্ম্মলা কহিল "যাও ভাই বদ্‌লে ভাল হয়ে গেছেন ভয় নেই।" "আমার আবার ভয় হ'তে যাবে কেন? বলিয়া সাবিত্রী নরেনকে প্রণাম করিতে গেল। কয়েক দিন পর একজন বাউল তাহাদের দুয়ার দিকে ঘাসের উপর বসিয়া গাইতেছিল--"সংসার ধোকার টাটি। গড়ে যখন যোগী তখন

ভুঁয়ে প'ড়ে খেলাম মাটি,—ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।" নরেন পা নাচাইতে নাচাইতে শিশ সহযোগে বই পড়িতে ছিল "রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটি।" নির্ম্মলা কহিল "কি বোল্‌চে শুন্‌চো ?" "শুন্‌চি" "লোকটা শঙ্করাচার্য্যের সাক্‌রেদ দেখ্‌চি" "তা—কেন গান ত আর ওরি তৈরী নয় ?"
নির্ম্মলা সহাস্যে কহিল "তুমি কি বল কথাটা সত্যি ? বিষের বাটি ?" "নয় তো কি ?" "বটে ? কিসের চেয়ে শুনি !" নরেন বই নামাইয়া নির্ম্মলার স্থির ধীরোজ্জ্বল মুখপানে একদৃষ্টে ক্ষণেক চাহিয়া কহিল "সব কিছুর চেয়ে গো সব বিষের চেয়ে তীব্র বলেই তো সকল কিছুর অমৃত। তবে যথার্থ রমণী হ'তে জান্‌লে হয়।" নির্ম্মলা স্বামীর পায়ের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল—

হে ভগবান জন্মে জন্মে যেন এই সার্থকতা লাভ ক'র্‌তে পারি।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

এ যে তোমার ধরা।

সারাটি দিন কি যে কথা বলিস অনর্গল
হেথায় ও-সব বুঝবে কেবা বল ?
যে দেশ হ'তে এলি রে তুই সেই প্রদেশের ভাষা
হেথায় কেহ বুঝবে আহা নাহি যে তাহার আশা
স্বর্গীয় ঐ মধুর ভাষা যাও মা হেথায় ভুলি
হেথায় তোমার শিখতে হবে নূতন রকম বুলি।
হর্ষ কূজন চলবে নাক বাছা
এ নয় তোমার কাননভূমি—এ যে তোমার খাঁচা।

সারাটি দিন কি যে করিস খেলনাগুলি নিয়ে
কি হবে হায় হেথায় ও-সব দিয়ে !
যে দেশ হতে এলিরে তুই সেই প্রদেশের খেলা
সঙ্গী কোথা ? চলবে না ক হেথায় সারা বেলা।
তোমার সাথে যোগ দেবে কে ফেলে সকল কাজে,
কারাগারের মতন হেথায় কাজের শাসন রাজে।
হেথায় লীলা নেই ক সুধা ভরা
এ যে তোমার স্বর্গ নহে—এ যে তোমার ধরা।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিবাহ ও বিবাহের পণ।

-ঃ*ঃ

জিজীবিষা একটী মূল তত্ত্ব। জীব-মাত্রেই বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কেন করে? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। ঘোরতর শোক, দুর্ব্বহ অনুতাপ বা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে কোন মনুষ্যই মরিতে ইচ্ছা করে না। মরিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াই মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রত্যেক জীব আহার সংগ্রহ করে। কেন না প্রত্যেক জীবই মুখ্য বা গৌণ ভাবে জানে যে আহার দ্বারা শরীর রক্ষা না করিলে শরীর লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অন্য কোন উপায় নাই! কিন্তু আহার দ্বারা যতই যত্নপূর্ব্বক এই শরীর রক্ষা করা হউক না কেন সে কেবল কিছু দিনের জন্য। অল্প দিনের মধ্যেই হউক বা কিছু অধিক দিন পরেই হউক, মৃত্যু অর্থাৎ এই শরীরের নাশ হইবেই হইবে। এই জ্ঞান অল্পবিস্তর অস্ফুট ভাবে সভ্যাসভ্য সকল মনুষ্যেরই আছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জিজীবিষাও আছে। ইহার ফলে মৃত্যুর পরও এই শরীর বা শরীরের কোন অংশ, অথবা শরীর সংসৃষ্ট কোন বস্তু, অন্তত নামটা যত দিন সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা মানবের প্রত্যেক সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপায় ব্যতীত আর এক উপায়ে প্রত্যেক জীবই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। প্রত্যেক জীবেরই শরীর ও মনের অংশ লইয়া নূতন জীবাণু উৎপন্ন হয়—যাহাকে সন্তান বলে। সেই সন্তান হইতে আবার সন্তান উৎপন্ন হয়। এইরূপ উৎপত্তির শেষ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবই বংশ-পরম্পরায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই জ্ঞান অল্পাধিক অস্ফুট ভাবে প্রত্যেক মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবেরই আছে। সেই জন্য প্রত্যেক জীবেরই মনে প্রবল অপত্যস্নেহ। কেন না অপত্য, জীবের জন্মান্তর মাত্র। এই অপত্য-সম্ভব কেবল বিবাহ দ্বারাই সংঘটিত হইতে পারে। অপত্য উৎপাদনের অন্য উপায় নাই। সেই জন্যই প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে ইহলোকে বাঁচাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রবল যৌন আকর্ষণ স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। বিবাহ করিতে পুরুষেরও যেমন প্রবল ইচ্ছা স্ত্রীরও তেমনই প্রবল ইচ্ছা। জীবের বর্ত্তমান শরীর লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহার্য্যের প্রতি যেমন প্রবল আকর্ষণ, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভ পূর্ব্বক নব কলেবর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিবাহের প্রতিও তেমনই প্রবল আকর্ষণ। যে জীব আহার ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান শরীরের ধ্বংসসাধন করে সে যেমন আত্মহত্যা করে, যে বিবাহ না করিয়া অপত্য সম্ভাবনা বন্ধ করে সেও তেমনই আত্মহত্যা করে। বিবাহ স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্পৃহনীয় হইলেও জীবরাজ্যে আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে পুরুষই বিবাহের জন্য অধিকতর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা করে। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ অল্পাধিক অনুন্নত মানব-সমাজে এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে পুরুষ স্বীয় বলবিক্রম দ্বারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া বিবাহ করে। সীতার জন্য রামকে, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার জন্য ভীষ্মকে, দ্রৌপদীর জন্য পাণ্ডবদিগকে, গোপার জন্য বুদ্ধকে শারীরিক বলবীর্য্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন স্ত্রীরা বীর্য্যশুল্কা ছিলেন—অর্থাৎ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন না করিলে তখন স্ত্রী লাভ হইত না। কিন্তু মানব-সমাজের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক বলের প্রাধান্য আর পূর্ব্বের মত রহিল না। ধন-বল ও বিদ্যা-বল কোন কোন স্থানে তাহার সমকক্ষ, কোন কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সকল বলেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। এই উদ্দেশ্য ধন দ্বারাই মুখ্যভাবে সাধিত হইয়া থাকে। কেন না যে বিদ্যা দ্বারা

প্রয়োজনীয় আহার্য্যের সংস্থান বা ধনাগম হয় না সে বিদ্যা নিষ্ফল। এই জন্যই সভাদেশে বিবাহ করিতে হইলে বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে বর্ত্তমান ধনবল, বা বিদ্যাবলে ভবিষ্যতে ধনাগমের সম্ভাবনা, প্রদর্শন করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কন্যার অভিভাবককে ধন দান করিয়া স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। আসামে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে এবং বঙ্গদেশে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এখন বঙ্গদেশে ইহার ঠিক্ বিপরীত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন কন্যার পক্ষ হইতেই বিবাহের জন্য বরকে টাকা দিতে হয়। এরূপ পরিবর্ত্তনের কয়েকটা কারণ আছে। প্রথম কারণ অর্থনীতি, দ্বিতীয় কারণ আমাদের ধর্ম্মের অনুশাসন। পূর্ব্বে অতি অল্প আয়াসেই সকল শ্রেণীর লোক গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিত। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া এবং অশিক্ষিত বৈদ্যেরা বাঁশের নলের মধ্যে কিছু ঔষধের বটিকা সংগ্রহ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তাহা অতি অল্প হইলেও সেকালে সংসার চালাইবার পক্ষে প্রচুর ছিল। অশিক্ষিত কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণের লোক জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ উপার্জ্জনের সুগম পন্থা নাই। বিশেষত এখন দেশীয় ও বিদেশীয় যৌথ বাণিজ্যের ফলে সমস্ত বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় যৎসামান্য টাকায় জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইহার উপর শিক্ষার ফলে আমাদের স্ত্রীলোকের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং শিক্ষিত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অবস্থা আরও ভাল করিতে প্রচেষ্টা করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। পূর্ব্বে লক্ষ পরিবারের মধ্যে এক পরিবারে পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত কিনা সন্দেহ। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই রন্ধন কার্য্য করিতেন। এখন প্রায় ঘরে ঘরেই পাচক ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের কোন শীতবস্ত্র ছিল না। এখন তাঁহারা সেমিজ, জামা, র‍্যাপার প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের পরিহিত শাড়ী মাসে একবারও রজকালয় দর্শন করিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন প্রতি সপ্তাহে তাহা হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন এতই হইয়াছে যে সেদিন রাজা রামমোহন রায়ের এক স্মৃতিসভায় যখন রাজার লিখিত স্ত্রীলোকের অবস্থার বর্ণনা পাঠ করা হইল তখন কতিপয় যুবক তাহা বিশ্বাসই করিলেন না—সেই বর্ণনাকে "অতিরঞ্জিত" "মিথ্যাকথা" প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিলেন। এই সকল শুভ পরিবর্ত্তনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অথচ দেশে ঘোরতর দারিদ্র্য। ভদ্রবংশীয় যুবকগণ প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ না করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা কেহ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন কেহবা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের শাসনে বা দেশাচারের প্রেরণায় কন্যা পক্ষের লোকেরা তাঁহাদিগকে স্থির থাকিতে দেন না—বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করেন—এবং যুবকদিগের ইপ্সিত সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ করায় তাহাদের যে ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে তাহার নিরাকরণ জন্য পণ দেন। কেন না একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দিয়া কোন কাজ করাইতে হইলে তাহাকে টাকা না দিলে সে কেন সেই কাজ করিবে?

ইহা ভিন্ন পণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার আরও কারণ আছে। তাহারও মূলে অর্থনীতি। পূর্ব্বে আমাদের সমাজ অনেক বিষয়ে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ছিল। দৈনন্দিন ব্যয় ব্যতীত যখনই কোন পরিবারে এমন কোন শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটিত যাহাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক তখনই সমাজের প্রত্যেক পরিবার হইতে টাকা ও দ্রব্যাদি সাহায্য দিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করা হইত। কাহারও মৃত্যু হইলে সকল জ্ঞাতি-বাড়ী হইতে মৃতব্যক্তির পুত্রের জন্য কাপড়, আতপ চাউল, মালসা, ঘৃত, চিনি, কলা, আসিত। শ্রাদ্ধের সময়ে জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরাও টাকা দিয়া সাহায্য করিত। যেন সকলেরই সেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কাহারও বাড়ীতে পূজা হইলে প্রতিবাসিরা চাউল, তরকারি, পাঁঠা, ঘৃত এবং প্রণামী টাকা পাঠাইতেন। কাহারও সন্তান হইলে

অন্নপ্রাশনের সময়ে প্রতিবেশীগণ সেই সন্তানের হাতে টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। বিবাহ উপস্থিত হইলে একবার অব্যূঢ়ান্নের সময়ে আর একবার পাকস্পর্শের সময়ে বস্ত্রাদি এবং টাকা নবপরিণীত দম্পতী. প্রতিবেশীগণের আনন্দ ও সহানুভূতিসূচক উপহার পাইত। এই সুপ্রথা—শোকের সময়ে এবং আনন্দের সময়ে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ—এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সুন্দর প্রথা সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকগুলি বিধবাবিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করায় তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল। সেজন্য ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটে প্রস্তাব করিলেন যে দেশের উপকারের জন্যই যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এত ঋণ হইয়াছে তখন দেশের সকল লোকেরই কিছু কিছু টাকা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঋণ-মুক্ত করা উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন স্থানান্তরে ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এডুকেশন গেজেটে লিখিলেন যে দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন করাকে তিনি ধর্ম্মকার্য্য মনে করেন এবং ধর্ম্মকার্য্যে সাধারণে তাঁহাকে সাহায্য করিবে ইহা তিনি ইচ্ছা করেন না সুতরাং তিনি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবেন না। তাহার পর এখন এমনও হইয়াছে যে শ্রাদ্ধ সময়ে কাহাকেও টাকা পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা ফেরত দিয়া লিখেন "আমার পিতৃশ্রাদ্ধ আমি নিজেই করিব। তাহাতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিব না।" কিন্তু অন্যে তাঁহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য কিছু ব্যয় করিলে কি দোষ হইতে পারে? এখন বিবাহ প্রভৃতি সময়ে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলিতেই এইরূপ ফুটনোট দেখিতে পায়া যায় "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।" যখন সমাজের এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে এবং সমাজে যখন ঘোরতর দারিদ্র্য বিদ্যমান, অথচ বিবাহ যখন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তখন যে পক্ষ সেই ব্যাপারের প্রধান এবং প্রথম উদ্যোগী তাঁহারাই অগত্যা পণরূপে সেই ব্যয় বহন করেন। বিবাহে যে কেবল একবার মাত্র অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা নহে। ইহার ব্যয় পুনঃপৌনিক, প্রথমে বরের বাড়ীর সকলকে ভাল বস্ত্রাদি দিতে হয়। তাহার পর আত্মীয়-বন্ধু লইয়া কন্যার বাড়ীতে যাইতে হয়। বিবাহের পর কন্যার কুটুম্ব-কুটুম্বিনী গুরুপুরোহিতকে প্রণামী দিতে হয়, বাদ্যকর প্রভৃতিকে পুরস্কার দিতে হয়, নববধূ গৃহে আসিলে আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু ব্যক্তিকে ভোজ দিতে হয়, বিবাহিত যুগল অন্তত কিছুদিন যে আমোদ-আহ্লাদে কাটাইবে তাহার জন্য তাহাদিগকে বিলাসদ্রব্য দিতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও কতরূপ অপরিহার্য্য ব্যয় আছে। বরপক্ষ যখন এই ব্যয়ের ভয়ে যুবককে বিবাহ দিতে চাহেন না তখন বিবাহের জন্য অধীর কন্যাপক্ষকেই সেই ব্যয়ের জন্য পণ দিতে হয়।

যাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে তিনি "কন্যাদায়গ্রস্ত"। তিনি আপনাকে মহা বিপদ্গ্রস্ত বলিয়া মনে করেন। কন্যা অতি স্নেহের পাত্রী হইলেও সে পিতার পক্ষে অতি পীড়াদায়ক ভার স্বরূপ। সেই ভার আর একজনের স্কন্ধে আরোপ করিয়া তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন এবং যিনি তাঁহাকে সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন তাঁহাকে টাকা দেন। আর একটা কারণ এই যে পুত্রবান্ ব্যক্তির পুত্রেরাই তাঁহার সমস্ত বিত্তের অধিকারী হইয়া থাকে, কন্যারা কিছুই পায় না। এই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ স্বরূপেও বরপক্ষ হইতে পণ চাওয়া হইয়া থাকে।

এখনকার শিক্ষিত লোক মাত্রেরই মত এই যে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান না করিয়া যুবকদিগের বিবাহ করা উচিত নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের ভদ্রলোকদিগের শতকরা নব্বই জনেরই সেরূপ সংস্থান নাই। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে সমাজে কেবল দারিদ্র্য বাড়ে। বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক পুরুষের হাতে কিছু

অর্থ থাকা উচিত। সেই অর্থ যুবকেরা সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই পণ দিতে হয়।

এই সকল এবং আরও নানা কারণে বঙ্গদেশে বরপণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সংসারে কোন বস্তুই অমিশ্র ভাল বা অমিশ্র মন্দ নহে। বরপণও সেইরূপ। বরপণ প্রচলিত হওয়ায় এখন আর বাল্যবিবাহ হয় না। কেননা বরের জন্য পণ সংগ্রহ করিতে করিতে কন্যার বয়স বাড়িয়া যায়। এখন বহু পরিবারের সতের আঠার এবং তদধিক বয়স্কা অনূঢ়া বালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নহে। বয়স একান্ত অধিক হইলে কন্যাদিগের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায় সুতরাং তখন তাহাদের বিবাহ হওয়া আর ও কঠিন হইয়া পরে।

বরপণের ফলে প্রত্যেক জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী এবং কৌলিন্য প্রথা উঠিয়া যাইতেছে এবং হয় ত জাতিভেদও উঠিয়া যাইবে। ইহাতে কেহ আহ্লাদিত, কেহ বিষাদিত। আমার বিবেচনায় জাতিভেদ উঠিয়া গেলে দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

যে সকল লোকে অন্নবস্ত্র সংগ্রহ না করিয়া এবং কন্যা-প্রজনন সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং এখন কন্যার পিতা হইয়া পণের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অল্প বিত্ত এবং বিত্তহীন লোক বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিবে। তাহাতেও সমাজের কল্যাণ।

বরপণ দ্বারা বিবাহের অপব্যয় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এখন অল্প বিবাহেই বাজী পোড়ান, বাইনাচ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

বরপণ প্রথার সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলময় ফল এই যে নব পরিণীত দম্পতি সংসারে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে হাতে কিছু টাকা পায়। যদি প্রত্যেক পরিবারে এইরূপে সংসার যাত্রা আরব্ধ হয় তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। সুতরাং বরপণ প্রথা বন্ধ করা উচিত কি পণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত তাহা সাধারণের চিন্তার বিষয়।

বরপণের জন্য বহু দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং বহু লোকের বড় কষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু জগতে এমন কোন্ শুভ অনুষ্ঠান আছে যাহাতে কোন না কোন লোকের কষ্ট না হয়? যেখানে পূর্ব্বে চাউল, দুধ, মাছ সুলভ ছিল এখন রেল হওয়ায় সেই স্থানের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য কতক লোকের কষ্ট অপরিহার্য্য।

বর পক্ষ "অন্যায় করিয়া" "জোর করিয়া" অধিক টাকা লইয়া থাকেন এইরূপ অভিযোগের কোন অর্থ নাই। পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া না দেওয়া কন্যা পক্ষের ইচ্ছা। যেস্থান হইতে পণের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়, সেখানে কন্যার বিবাহ না দিলেই ত হয়। বরপক্ষ কখনই কাহাকেও এমন কথা বলিতে পারেন না যে তোমার কন্যাও দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এত টাকাও দিবে। ষোল টাকা দর্শনীর চিকিৎসকও আছেন এক টাকা দর্শনীর চিকিৎসকও আছেন। তুমি যদি ষোল টাকা দিতে না পার বা ইচ্ছা না কর তাহা হইলে এক টাকার ডাক্তারের কাছেই যাইবে। কিন্তু ষোল টাকার ডাক্তারকে দোষ দিতে পার না। ব্যারিষ্টার রায় সাহেব প্রত্যহ পাঁচশত টাকা লইয়া থাকেন কিন্তু উকীল মল্লিক মহাশয় পাঁচ টাকার অধিক চাহেন না। মকদ্দমাকারী যাহার নিকটে ইচ্ছা যাইতে পারে, রায় সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া সে কখনই বলিতে পারে না যে তিনি "অন্যায় করিয়া" বা "জোর করিয়া" তাহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা লইলেন। হরি বাবু অট্টালিকাতেই বাস করুন বা কুটীরেই থাকুন, তুমি যখন মনে কর যে তোমার কন্যা তাঁহার বাড়ীতে বাস করিলে অর্থাৎ তাঁহার পুত্রবধূ হইলে সেও সুখে থাকিবে, কি তুমিও সম্মানিত হইবে তখন তিনি যে পণ চাহিবেন তাহা দিতে সম্মত হইলেই বিবাহ হইবে। তুমি যদি

তাহা দিতে অসম্মত হও তাহা হইলে অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে তোমাকে হরিবাবু কখনই বাধা দিতে পারেন না। সুতরাং "জোর" "অন্যায়" প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার প্রতি প্রয়োজ্য হইতে পারে না।

বরপণে আপত্তিকারীরা বলেন যে শিক্ষিত সমাজে নারীর সম্মান বর্দ্ধিত হওয়া উচিত,—যদি কন্যার সঙ্গে কতকগুলা টাকাই দিতে হইল তাহা হইলে তাহার সম্মান ও আদর রহিল কোথায়? কিন্তু নারীর সম্মানের লাঘব ত কন্যা পক্ষের লোকেই করিয়া থাকেন। কন্যা রত্ন স্বরূপা। রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না বরং অন্বেষিত হয়। নরত্ন মন্বিধ্যতে মৃগতে হি তৎ। কন্যাপক্ষীয়েরাই ত বর অনুসন্ধান করিয়া নারীর সম্মান খর্ব্ব করিয়া দেন। অন্য পক্ষে শিক্ষিত বর বলেন "আমি বিবাহ করিয়া আমার পত্নীকে দাসীর মত রাখিতে চাহি না—মহিলার মত সসম্মানে রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সেরূপে রাখার উপযোগী অর্থ আমার নাই।" ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলেন যে তাঁহারাই সে অভাব পূর্ণ করিবেন। তখন ও বর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে কি কন্যার প্রতি অসম্মান করা হয় না?

সুশ্রী, সুশিক্ষিতা এবং সদ্বংশজা কন্যা ভাল ভাবে থাকিবার অধিকারিণী, সুতরাং সেই কন্যার জন্য অধিক পণ দিতে হয়। অন্য পক্ষে রূপ হীনা অশিক্ষিতা কন্যার বিবাহেও অধিক পণের প্রয়োজন কেননা বিনা পণে তাহার বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রূপ হীনা, অশিক্ষিতা বিকলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ না করিতে যেমন যুবক মাত্রেরই স্বাধীনতা আছে তেমনি যৌতুকহীনা কন্যাকে বিবাহ না করিতেও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তবে কি যাহারা পণ দিতে পারে না তাহাদের কন্যার বিবাহ হইবে না? হইতে পারে কিন্তু কন্যাপক্ষীয় লোকের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত পাত্রের সহিত নহে।

যাঁহারা আইন করিয়া বরপণ উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন যে সেই সঙ্গে এরূপ আইন করিতে হইবে যে কন্যার অভিভাবক যে কোন ব্যক্তিকে বিবাহের প্রস্তাব করিবেন সেই ব্যক্তিই তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য—না করিলে দণ্ডনীয় হইবে। আইনে এরূপ একটা ধারা না বসাইলে, কেবল পণ নিবারণের জন্য আইন কখনই কার্যকর হইবেনা। সেরূপ আইন প্রচলিত হইলে দেশ মধ্যে আরও হাহাকার উঠিবে। কেন না তাহা হইলে দেখা যাইবে যে অধিক সংখ্যার যুবকই বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে।

যদি বরপণ প্রথা তিরোভাবিত করা কর্ত্তব্য বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে একমাত্র উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে। কন্যাপক্ষীয়েরা যেন বর অন্বেষণ না করেন। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে প্রথমে আমাদের ধর্ম্ম ও শিক্ষার সংস্কার করিতে হইবে।

সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে ধনাগমের আশায় যে সকল যুবক বিনা পণে বিবাহ করেন তাঁহাদের হৃদয় অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহাদের মস্তকের প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বরপণ সমর্থক আমার একটা প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এইরূপ কয়েকটা কথা লিখিয়া ছিলেন "প্রবন্ধ লেখক বরপণের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" ভারতীতে সেই প্রবন্ধ পাঠাইবার পূর্ব্বে আর কয়েকখানা পত্রিকায় উহা পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু সম্পাদকেরা তাহা ছাপাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই পত্রিকার মধ্যে একখানিতে সম্প্রতি বরপণ সমর্থন করিয়া একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু অদ্যাপি তাহা পাঠ করি নাই। নারায়ণ পত্রিকায় প্রবন্ধ দেখিয়াছি। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ বরপণের সমর্থকও নহে বিরোধীও নহে। ইহাতে কেবল বরপণ প্রথার কারণ, সেই প্রথা নিরাকরণের উপায় এবং তাহার ফলাফল

নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। বরপণ প্রথা যখন দেশের একটা প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে তখন ধীর ভাবে সমাজের নেতারা ইহা মীমাংসা করেন এই অভিপ্রায়েই আমি ইহা লিখিয়াছি। যাঁহারা এই প্রবন্ধ সমালোচনা করিবেন তাঁহাদিগকে আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিবেন যে গালাগালি ও যুক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

মাতৃ পূজা।

—ঃ*ঃ—

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

(ওমা) মিলেছি মা তোর্ আজি মধুর ডাকে ॥
(মোরা) হিংসা দ্বন্দ্ব গেছি ভুলে,
প্রাণ্ আমাদের গেছে খুলে,
এসেছি মা পূজা দিতে
ছুটে তাইতে মিলে তোকে।
মান্ অভিমান্ ছোট খাটো
ফেলেছিল চোখে কুটো,
এতদিন্ তাই দেখিনিকো,
(এখন) ভরেছে প্রাণ্ তোরে দেখে'।
(এবার) পূজায় যেন বুঝ্‌তে শিখি—
তুই মা মোদের্ সবার্ একই;
ভায়ে ভায়ে যেন ভাল বেসে
হাসি অন্‌তে পারি মুখে।
শক্তিময় তোর্ দুগ্ধ খেয়ে,
চলেছি মা মানুষ হয়ে;
শত বাধায় আর ফির্‌তে না হয়,
এই মত বল্ দেয়া বুকে।
ত্রিশ কোটী তোর্ ছেলে মিলে
অভ্রভেদী মহান্ সুরে,
(তোরে) ডাক্‌বে যবে মা মা বলে,'
সাড়া পড়্‌বে বিশ্বলোকে ॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

```
         ম
[পা  পা]      ১´                  ২                 ০              ৩          ।
গা   গা II{ গা  গপা  -মগা | -রসা  সা  ররা | গা  গা  -া | মা  পা  -া }I
ও    মা    মি  লে  ছিমা     তো•  র  আজ    ম  ধু  র    ডা  কে  •

     ১´              ২              ০              ৩
I  পপা  ধা  ধা | ধা  -া  ধা | ধা  র্সা  -া | না  ধনা  র্সনধপা  I
   মোরা হিং  সা    দ্ব  ন্  দ্ব   গে  ছি  •     ভু  লে•  ••••

     ১´              ২              ০              ৩
I  ধা  র্সা  না | র্সা  র্রা  -া | র্সা  র্সা  ধা | র্সা  র্সা  -া  I
   প্রা  ণ  আ     মা  দে  র     গে  ছে  •     খু  লে  •

     ১´              ২              ০              ৩
I  পা  ধা  র্সা | র্সা  র্সা  -া | র্সা  র্সা  -া | না  না  ধা  I
   এ  সে  •      ছি  মা  •      পু  জা  •      দি  তে  •

     ১´                    ২                 ০                       ৩
I  ধনা  -র্সর্রা  র্রা | র্সা  না  -র্সনা | ধনা—পধা  -ধপা | মধা  পা  -াম  I
   ছু•  টে•  •        তা  ই  স্তে•     •মি  লে•  ••     তো•  কে  •

     ১´              ২              ০              ৩
II{ পা  ধা  ধা | ধা  ধা  ধা | র্সা  র্সা  -া | না  ধনা  -ধপা  I
(১) মা  ন  অ     ভি  মা  ন    ছো  ট  •     খা  টো•  ••
(২) পূ  জা  য়    যে  ন  বু    ঝ  তে  •     শি  খি•  ••
(৩) শ  ক্তি  ম    য়  তো  র    দু  র্ব  •    থে  য়ে•  ••
(৪) ত্রি  শ  কো   টী  তো  র    ছে  লে  •    মি  লে•  ••

     ১´              ২                  ০                     ৩
I  না  না  -া | র্সা  র্রা  -র্গর্রা | র্সা  র্সনা  -ধনর্সর্রা | ( র্সা  র্সা  -া )}I
(১) কে  লে  •    ছি  ল  •চো        খে  ••  ••••           কু  টো  •
(২) তু  ই  মায়ো   দে  র  •স        বা  •র  •••এ           ক  ই  •
(৩) চ  লে  •     ছি  মা  •মা       সু  •খ  ••••           হ  য়ে  •
(৪) অ  ভ্র  •     ভে  দি  •ম       হা  •ন  ••••           সু  য়ে  •

     ৩
  | র্সা  র্সা  ধা  I
(১) কু  টো  •
(২) ক  ই  •
(৩) হ  য়ে  •
(৪) সু  য়ে ( তোয়ে )
```

১´ ২ ০ ৩
I ধা সা´ সা´ | সা´ সা´ সা´ | সা´ সা´ −া | সা´ না −স´না I
(১) এ ত দি ন তা ই দে খি • নি কো ••
(এখন)
(২) ভা য়ে ভা য়ে যে ন ভা ল • বে সে ••
(৩) শ ত বা ধা য় আ র ফি র্ তে না হয়
(৪) ডা • ক বে য বে মা মা • ব লে ••

১´ ২ ০ ৩
I ধা −ধনা স´রা´ | সা´ না −স´না | ধনা পা −ধপা | মধা পা −া^ম II II
(১) ভ ০রে ছে• প্রা ণ • • তো• রে • ০ দে০ খে •
(এবার)
(২) হা •সি আ• ন তে • • পা• রি • • মু০ খে •
(৩) এ •ই ম• ত ব ০ল দে• মা • ০ বু০ কে ০
(৪) সা ০ড়া প• ড় বে ০ ০ বি• শ্ব • • লো০ কে ০

মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরি।

:*:-

ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ উচ্চ বা যশস্বী হইতে পারে না, অথবা নির্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকাল থাকিবে এরূপ নহে। লোকে স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই মনুষ্যপদবাচ্যে হইয়া থাকে। অনেক সময় সাধারণের মধ্যে এরূপ অনেক বিশেষ হৃদয়বান্ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি দেখা যায় যে, তাহাদের সহিত অনেকের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের নাম প্রচারের জন্য লালায়িত নহেন। কাজেই তাহাদের নাম সকলের নিকট পরিচিত নহে।

মালদহ মুকদমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোঁসাইজী মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরি মহাশয় এই শ্রেণীর ব্যক্তি; তাঁহার নাম বাঙ্গলার অতি অল্পলোকেই জানেন। তিনি জমিদার বা অর্থশালী লোক নহেন। আমাদের দশজনের ন্যায় একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক মাত্র। তবে তিনি গৃহস্থ নহেন;—গিরি সম্প্রদায় ভুক্ত জনৈক সন্ন্যাসী। তাঁহার সাধারণের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, অনুরাগ ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ক্ষণিকের নিমিত্ত অন্তর্হিত হয়। যে কেহ মোহান্তজীর সহিত কিছুদিনের জন্য মিশিয়াছে, সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছে তাঁহার হৃদয় কিরূপ পরদুঃখকাতর। মেট্রোপলিটন কলেজের পালিভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যখন (মালদহ) কলিগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি হইয়া আগমন করেন, তখন তিনি ও তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বন্মণ্ডলী কিছুক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত গোঁসাইজীর সহিত সদালাপে এতদূর সন্তুষ্ট ও গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিজ "সঙ্কল্প" পত্রিকায় গোঁসাইজীর ফটোসহ গুণকীর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এস্থানে তাঁহার কয়েকটী লোকহিতকর কার্য্যের উল্লেখ করিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গত আট বৎসর হইতে তিনি আর্ত্তের কষ্ট লাঘব করিবার মানসে রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। মোহান্তজী অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করিয়া এই আট বৎসর কাল স্বহস্তে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া উক্ত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অনেক দুরারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার দাতব্য-চিকিৎসালয় হইতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৫০ জন রোগী ঔষধ লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ কোন মহামারীর সময় তাঁহার গরীব-নারায়ণের জন্য ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিলে মনে এক প্রকার পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্রের দুঃখমোচন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি কয়েকবার ইংরেজবাজার সরকারী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও কম্বল প্রদান করেন। ১৯১১ সালে উক্ত গোঁসাইজীর গুরুর পিতৃদেবের পরলোক গমন উপলক্ষে তিনি যে একটা ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন, তাহাতে কি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী, কি অশিক্ষিত সাধারণ সকলেই সমভাবে উদর তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রাচীন লোকদিগের মুখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এরূপ ভাণ্ডারা শত বৎসর মধ্যে হয় নাই।

নিদারুণ গ্রীষ্মে জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়া পিপাসিত পথিকের তিনি আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। পর্ণগৃহবহুল পল্লীতে এই সময় আবার অগ্নিদেবের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য কত যে আর্ত্তজন গৃহহীন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাও মোহান্তজীর কৃপাদৃষ্টিতে এড়ায় নাই। গৃহদাহ নিবারণকল্পে তিনি কলিকাতা হইতে নিজব্যয়ে ছয়টি দমকল আনাইয়া ইংরেজ বাজার মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করিয়াছেন এবং কলগুলি যাহাতে সাধারণের সুবিধাজনক স্থানে রক্ষিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধুকার্য্যের ফলে মোহান্তজী কত পরিবারের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি মহৎ কার্য্যের জন্য মোহান্তজীর নাম মালদহবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মালদহ যেরূপ আয়তনে ক্ষুদ্র, সেইপ্রকার শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও এখানে অল্প। এই জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও আবার অনেকে অন্যত্র হইতে কার্য্যোপলক্ষে অথবা অন্য কারণে এখানে আসিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রকৃত মালদহবাসীদের মধ্যে এখনও বিশেষ ভাবে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। মোহান্তজী প্রকৃত মালদহবাসী না হইলেও তিনি অতি শৈশবেই এদেশে আনীত হন এবং এখানেই তিনি লালিতপালিত। কাজেকাজেই মালদহ তাঁহার পক্ষে একপ্রকার স্বদেশ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রাণের টানেই তিনি মালদহের উন্নতি কল্পে অর্থ ব্যয় করিতে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত।

মালদহে বহু পুরাকাল হইতেই নববর্ষের প্রারম্ভে স্থানে স্থানে "গম্ভীরা" উৎসব চলিয়া আসিতেছে। বহুপূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল তাহা বলা যায় না। তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহা বীভৎস ও কুরুচিপূর্ণ ছিল। ইহা হইতেই তৎকালীন সাধারণ লোকের প্রকৃতি ও রুচি সহজেই অনুমান করা যায়। মোহান্তজী দেখিলেন যে, ইহাই জনসাধারণের শিক্ষার প্রকৃত স্থান। উক্ত "গম্ভীরায়" যদি কুরুচিপূর্ণ গীতের পরিবর্ত্তে সহজবোধ্য ও উপদেশপূর্ণ গীত প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত হইতে পারে এবং সকলেই কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই সাধুউদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি গ্রাম্যগীতরচয়িতাগণকে ডাকাইয়া যাহাতে তাহার

উপদেশপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার পদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক লুপ্তপ্রায় "গম্ভীরা"র নবজীবন প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা করিতে হইয়াছে। "গম্ভীরা"র দল উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে বিশেষ প্রশংসার সহিত স্থান পাইয়াছিল। "নায়ক" "সঞ্জীবনী" "গৃহস্থ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় এবং পাবনার সুবিখ্যাত "সুরাজ" পত্রে "গাম্ভীরা"র বিবরণ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি উক্ত গাম্ভীরা নামে একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকাও অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত মোহান্তজী সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে আরও অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক প্রদানে এবং অন্যান্য ভাবে অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। স্থানীয় "অক্রুরমণি" উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় যে সময় মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, সে সময়ে উহার একবার স্থানাভাব হয়। মোহান্তজী উহা জানিতে পারিয়া নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও উক্ত স্কুলের জন্য নিজের গৃহের দুইটি প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া উহাকে শৈশবে রক্ষা করেন। একসময়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট তাঁহার নিজের বাসগৃহ উক্ত স্কুলের নিমিত্ত দান করিতেও স্বীকৃত হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

যাহা হউক মোহান্তজী এক্ষণে স্বগৃহে কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার আদর্শে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক সকলের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত গোঁসাইজীর পরলোকগত গুরু পিতৃদেব গোঁসাই যদুনন্দ গিরি মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ "যদুনন্দ মহাকালী পাঠশালা" নামে অভিহিত হইয়াছে। পাঠশালার ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। দিন দিনই ইহার আশ্চর্য্য শিক্ষাপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদের নিজ নিজ কুমারী কন্যাদিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থোপাধিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যৎসামান্য বেতনে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার অধীনে আরও দুইজন পণ্ডিত আছেন। তৎসত্ত্বেও গোঁসাইজী নিজে অনেক সময় পড়াইয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়টীর ব্যয় এক্ষণে মাসিক ৬০৲ টাকা। পাঠশালা অবৈতনিক, কাজেই ব্যয়ভার সম্পূর্ণই তিনি বহন করেন। বালিকাগণের উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ-পদ্ধতি রীতি-নীতি ও স্তব-পূজাদি পরিদর্শন করিলে মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হয়। মনে হয় যেন পূর্ব্বের ন্যায় আমরা এক সুবর্ণযুগের সম্মুখীন হইতেছি।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারকল্পে তিনি দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে যোগদানে অসমর্থ হইলেও ইনি "গম্ভীরা" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাবনাসম্মিলনীতে ইনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনীতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালে কেবলমাত্র মালদহ হইতে ইনি ও স্বদেশখ্যাত মালদহ জাতীয়শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি-এল. মহাশয় অনুষ্ঠানে যোগদানকল্পে আহূত হন এবং বিশেষ সম্মান যোগ্য স্থান অধিকৃত করেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন মহামান্য রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিটি মালদহ হইতে এই দুইজনকে আহ্বান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মোহান্তজীর সকল কার্য্য একাধারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ যে, তাঁহার প্রতি সাধারণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও উহা সম্যক পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

দৈনন্দিন ব্যাপারেও তিনি একেবারে আড়ম্বরবিহীন। তিনি কখনও শারীরিক সুখ বা ভোগ-বিলাস ইচ্ছা করেন না। বিলাসিতায় যে টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহা অন্য কোন লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তিনি উহা সার্থক বিবেচনা করেন। মোহান্তজীর আদর্শ সকলের অনুকরণীয়।

শ্রীকেশবলাল বসু।

হৃদয়ের পূজা।

—:*:—

(১)

হৃদি মন্দিরে চিরদিন ধরে যে পূজা তোমার হয়,
প্রীতি-চন্দনে, ভক্তি-কুসুমে, সে'ত নহে অভিনয়!
শাস্ত্র-দোহাই অস্ত্র করিয়া পাষাণের পদতলে
মুখে বলা এক কাজে করা আর ফিরেনা পূজারি দলে
আয়োজন হীন হৃদয়ের গান, গাহিছে ভক্তপ্রাণ
হেরিছে হৃদয় আসনে আসীন ভক্তের ভগবান!

(২)

মন্দিরে মঠে ছদ্ম বেশেতে ফিরিছে যতেক ভণ্ড!
নগদ আদায় বিদায়ের লোভে সকলি করিছে পণ্ড!
ব্যর্থ পূজার জঞ্জাল জমা বেওয়ারিস ডাকঘরে,
ঠিকানার গোলে পড়ে থাকে চির সঞ্চিত ধূলি পরে!
মালিকের খোঁজ হয় না যখন আগুনে পুড়িয়া ছাই
ধূলা হয়ে যায় ধূলার মাঝারে, মূল্য কিছুই নাই!

(৩)

ধর্ম্মের হাটে খুলিয়ে দোকান হাঁকিছে দোকানদার,
একেরে সাজায় বিচিত্র করে ভুলাতে খরিদ্দার !
শুধু বাইবেল খ্রীষ্টানে হাঁকে, হিন্দুতে হাঁকে বেদ,
ইস্‌লাম হাঁকে কোরাণ শরিফ !—কত না ধর্ম্ম ভেদ !
সকলেই জানে সুখে দুখে শোকে মানব হৃদয়-যন্ত্র
এক সুরে বাজে সকল দেশেতে একই তাহার তন্ত্র !

(৪)

মন্দির মঠ থাক্‌ দেশে দেশে যেমন যেখানে আছে !
দেবতা যেখানে প্রাচীরবন্দী যাবনা তাহার কাছে !
জীবনে মরণে হৃদয়ের পূজা, হে মোর হৃদয়-স্বামি,
আপনার হাতে সঁপিব তোমার কমল চরণে আমি,
দাঁড়াব মুক্ত আকাশের তলে, জুড়াব হৃদয়মন,
সকলের মাঝে হেরিব তোমার রূপ নরনারায়ণ !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

লাহোর ভ্রমণ।

আমার বহুদিনের সাধ—"লাহোর যাইব, লাহোর দেখিব" সে সাধ এবার পূর্ণ হইল। ১৪ই নভেম্বর সিমলা পাহাড় হইতে রওয়ানা হইলাম; ছোট রেলগাড়ীতেও বড্ড শীত-বোধ হইতে লাগিল; কল্‌কা ষ্টেশনে আসিয়া জানিলাম পার্ব্বত্য-শীত লাহোরে পাইব না। পরদিন প্রাতঃকালে ট্রেণ লাহোরে পঁহুছিবার কথা কিন্তু এত লেট্‌ হইয়াছিল—ভাবিত হইলাম, সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের বলিলাম—"ষ্টেশনে কেহই থাকিবেন না, এত দেরী পর্য্যন্ত কোনও বন্ধুই অপেক্ষা করিবেন না, মোটর গাড়ীও থাকিবে না।" যখন ট্রেণ লাহোর ষ্টেশনে পঁহুছিল, প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী থামিল, আমার সে ভয় ও সে ভাবনা চলিয়া গেল। অনেক কয়জন আমার প্রণম্য,—স্নেহের বন্ধুবান্ধবেরা সপরিবারে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। কত ফুলের মালাই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এক মালার উপর আর এক মালা আমার গলায় দুলাইয়া দিলেন, মনে হইল বুঝি চক্ষু পর্য্যন্ত উঠিল। মালাগুলি সমস্তই প্রায় গাঁদা ফুলের। শুনিলাম এ-সময়ে লাহোরে অন্য ফুল অধিক পাওয়া যায় না। এই ফুলের রঙই হউক আর একটা অপরিচিত মুখ

দেখিয়াই হউক ষ্টেশনের অনেক যোড়া চক্ষু আমার দিকে তাকাইল। বন্ধুদের এই সাদর-অভ্যর্থনার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলাম; তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে কত কষ্ট করিয়া সেই অপরিষ্কার ষ্টেশনে বসিয়াছিলেন সে জন্য দুঃখ প্রকাশও করিলাম, কৃতজ্ঞতাও জানাইলাম। লাহোরে আসিয়াছি—কত যে আনন্দ। এত ভাল অভ্যর্থনা পাইলাম ইহাতে মনে হইল নিঃসন্দেহ—"লাহোরের সবই ভাল।" বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যেখানে একজন সাহেব তাঁহার মোটর গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলাম, বন্ধুবর্গও একখানি মোটর গাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন, কেহ কেহ সে গাড়ীতে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

কোনও ধনী, সম্ভ্রান্তশালী বন্ধু,—তাঁহার সুন্দর ও বৃহৎ উদ্যানবাটী আমার জন্য প্রস্তুত রাখিতে তাঁহার কর্ম্মচারী-দিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। পঁহুছিবামাত্র এক কর্ম্মচারী অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের সকল বন্দোবস্ত কেমন করিয়াছেন জানাইলেন। হর্ম্ম্য-নির্ম্মিত বারাণ্ডা-সজ্জিত গৃহগুলি, চারিদিকে সুন্দর টবগুলিতে পাম্‌স্, চক্ষুকে তৃপ্ত করিল। রেলের পথ, আবার ট্রেণ অনেক দেরীতে পঁহুছিয়াছে; রৌদ্রের উত্তাপ, পথের শ্রান্তিদূর করিবার জন্য একটি যেন শীতল ছায়াতল প্রাণ চাহিয়াছিল—তাহাই পাইলাম। কিয়ংক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান ও পূজার পর পরিতোষের সহিত আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্নেহের সহোদরা—যিনি আমার কয়দিন পূর্ব্বে লাহোরে পঁহুছিয়াছেন, তিনি আসিলেন। দুই ভগ্নী মিলিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। কত কথা,—কথা আর শেষ হয় না। লাহোরে কি করিব—কি দেখিব সেই কথাই হইল।

পরদিন লাহোর-ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব আরম্ভ। এই উৎসব সপ্তাহকালব্যাপী হইবে। ইহার ভিতর ১৯এ নভেম্বর ব্রহ্মানন্দ-দেবের জন্মোৎসব। এখানকার ব্রাহ্মগণের সাদর-নিমন্ত্রণে এই উৎসবে বিশেষভাবে যোগ দিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইলাম। ১৯এ নভেম্বরে বালকবালিকাদিগের একটি পার্টির মত হয় কিন্তু তাহাতে সঙ্গীত গীত হয় ও প্রার্থনা হয়। ছেলেরা হিন্দিতে মিষ্টস্বরে পদ্য বলিল, গল্প বলিল, পরে তাহাদের খেলনা এবং মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি একত্র হইয়াছিল—কিন্তু গোলমাল নাই। আর একদিন এই ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের মিলন হইল। প্রথমে এক বঙ্গমহিলা, হিন্দিতে অতি সুন্দরভাবে পূর্ণ উপাসনা করিলেন, পরে পাঞ্জাব-মহিলাগণ একে-একে কয়জন তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিলেন। একটি মহিলা, নানকের উক্তিগুলি কি মধুরস্বরে—স্তবের সুরে পড়িতে লাগিলেন,—মোহিত হইলাম। শুনিলাম, বাঙ্গলায় কথকতা হইবে, এত পাঞ্জাবীর ভিতর বাঙ্গলা কথকতা, মনে হইল—কেই বা শুনিবে, কেই বা বুঝিবে। কিন্তু সকলের ইচ্ছায় দুইদিন কথকতা হইল; ধ্রুবের মাতা সুনীতির জীবন এবং মীরাবাইয়ের জীবন,—দুইদিনই মন্দির পূর্ণ, সকলে অতি আগ্রহের সহিত শুনিলেন।

একদিন এক পাঞ্জাবী-ধনী-গৃহিণী তাঁহার বাড়ীতে আমাদের দুই ভগিনীর অভ্যর্থনার জন্য অনেক ভদ্র মহিলা-দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বড় সুন্দর সে দৃশ্য,—হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান সকলে মিলিয়া কেমন সদালাপ করিতেছেন, সঙ্কুচিত ভাব নাই—কেমন সকলের সঙ্গে মিশিয়া সকলে চা পান করিতেছেন। সঙ্কীর্ণতা বোধ করি ইহাদের মনে স্থান পায় না। অনেকগুলি বঙ্গমহিলাও লাহোরে আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা বলিয়া বড় আহ্লাদ হইল। ধনী-গৃহিণীর এই পার্টিতে পরমাসুন্দরী একটি যুবতী দেখিলাম, তাহার সৌন্দর্য্য এ-চক্ষুকে মুগ্ধ করিল, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে একজন আমার আত্মীয়া বলিলেন "ফরাসীদেশের মেম, শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন" পরে বলিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণকন্যা। ইচ্ছা হইল মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা কহি কিন্তু আমার মূর্খতা বশতঃ ভাষা না জানায় পরস্পর হাত ধরিয়া পরস্পরের স্নেহ জানাইলাম।

এক প্রাতঃকালে জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার প্রিয় বেগমের কবর দেখিতে গেলাম। প্রথমে জাহাঙ্গীরের কবর দেখিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সে সময় একখানা ট্রেণ আসিতেছিল সে জন্য যাইতে পারিলাম না। রেলের লাইন মধ্যে থাকাতে দুই কবরকে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত করিয়াছে। অগত্যা সম্রাটের কবর দেখিবার পূর্ব্বে নূরজাহানের কবর দেখিতে গেলাম।—একখণ্ড জমী সম্মুখে, তাহা অযত্নে রক্ষিত;—শুষ্কতৃণ, কণ্টক-বৃক্ষে পূর্ণ, তাহার ভিতর দিয়া কবর-গৃহে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিলাম। অতি সাধারণ কবর গৃহের মত এ কবর। গৃহের মধ্য-স্থলে দুইটি সামান্য প্রস্তর নির্ম্মিত কবর, একটি নূরজাহানের কন্যা লাইলার কবর, অন্যটি নূরজাহানের। অল্প কয় বৎসর পূর্ব্বে ছাগ আদি পশু লইয়া পালকেরা এই কবর-গৃহে বিশ্রাম করিত। মাননীয় ভূতপূর্ব্ব লাট কর্জ্জন বাহাদুরের যত্নে এ গৃহ ও কবরের সংস্করণ হইয়াছে, নতুবা যাহা দেখিলাম--তাহাও দেখিতে পাইতাম না। নূরজাহানের কবরের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আহা! এই কি সেই নূরজাহানের কবর!—যিনি গোলাপ জলে স্নান করিতেন—তাঁহার প্রাণশূন্য দেহখানি এত অযত্নে ও অনাদরে পড়িয়া আছে!—মণি-মাণিক্য-খচিত যাঁহার প্রাসাদ ছিল, তাঁহার কবরের উপর এমন কি একটি প্রস্তর-খোদিত নাম পর্য্যন্ত লিখিত নাই, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট একখানি কাষ্ঠফলকে লিখিয়া রাখিয়াছেন, - কোন্ কবরটি নূরজাহানের এবং কোন্ কবর তাঁহার কন্যার। দেহের এত অনাদর! নূরজাহানের অতুল রূপযৌবন, তাঁহার তীক্ষবুদ্ধি, শিল্পদর্শীতা, সমস্ত কি ভুলিয়া যাইবার? সম্রাট জাহাঙ্গীর যে তাঁহার প্রাণাধিকা—বেগম নিকটে না থাকিলে রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইতেন। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রীকে কাছে রাখিবার জন্য একটি চারুকার্য্য-নির্ম্মিত অন্তরাল (স্ক্রীণ) করিয়াছিলেন, সেই অন্তরালের একদিকে রাজসভা ও স্বর্ণসিংহাসনে আসীন সম্রাট; অপরদিকে সেই বেগম নূরজাহান; অন্তরালের মধ্যস্থানে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র. সেই ছিদ্র দিয়া নূরজাহান কোমল, সুন্দর পদ্মহস্তখানি সম্রাটের স্কন্ধে রাখিতেন, এই করস্পর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজকাজ সুচারুরূপে চলিত। কতবার প্রিয়তম পতির উদ্ধারের জন্য নিজজীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া শত্রু-শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রাণপ্রতিমা নূরজাহানের হস্তে মস্তক রাখিয়া নূরজাহানের নাম শেষ-উচ্চারণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, আজ সেই ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাণের এত প্রিয় - এত আদরের স্ত্রীর কবরের এই অবস্থা! নিজ কন্যা কেবল মাতাকে ছাড়িতে পারিল না! মায়ের কোলে লাইলাও ঘুমাইল! এই কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম আমার সাজাহানের প্রতি অভক্তি হইল। মনে হইল যে সাজাহান নিজের প্রণয়ের গভীরতা প্রকাশ করিবার জন্য তাজমহল নির্ম্মাণ করিলেন,—পত্নীর নামে এমন মনোহর কবর করিলেন, সেই সাজাহান পিতার প্রতি একটু মাত্র শ্রদ্ধা দেখাইয়াও কি পিতার পরম আদরের প্রিয়-তমা বেগমের একটী ভালরকম কবর দিতে পারিলেন না? সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবর—শুনা যায় নূরজাহান নিজ ব্যয়ে করাইয়াছেন। বেগমের কবর দেখিয়া সম্রাটের কবর দেখিতে গেলাম। এই স্থানটী নূরজাহানের প্রমোদ-উদ্যান ছিল; নিজগৃহ হইতে এই কবরটি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেন। এখনও অনেক ফলের গাছ আছে কিন্তু ফুল অধিক দেখিতে পাইলাম না। বিস্তৃত উদ্যান, উচ্চ প্রাচীর আজ ভগ্নাবস্থায় কালের সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা প্রথম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার চারিপাশে শত শত ছোট ছোট ঘর। শুনিলাম, সেই ঘরগুলিতে অতীতে ফকির-অতিথি সকল থাকিত, কয় সহস্র দরিদ্রকে প্রতিদিন এই ভাবে সেবা করা হইত। সেই প্রাঙ্গণের একদিকে সুবৃহৎ তোরণ,—সেই তোরণদ্বার দিয়া ভিতরের উদ্যানে প্রবেশ করিলাম, সঙ্গে গাইড্ ছিল। বলিতে লাগিল—"কত রঙের ফুলগাছ সারি সারি ছিল দুই পাশে,--নানা রঙের প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত ছিল পথ," এখন সে সকল কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। প্রাতঃকালের প্রকৃতির

ভিতরে এই কবরের দৃশ্য নূতন হইয়া প্রকাশিত হইল। যেন এ পৃথিবীর নশ্বর দেহ এ জড়জগতে ঘুমাইয়া রহিল—আর প্রাতঃকালে নয়ন খুলিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর দেখিলেন স্বদেশে ফিরিয়াছেন, আর প্রাণ-প্রিয়তমা নূরজাহান তাঁর কাছে।

লাহোরের মাননীয় লাট বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী, আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। একদিন তাঁহাদের প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, কত আদর-সম্মান দিলেন। লাটপত্নী, পাঞ্জাবী সৈন্যদিগের জন্য কত রকম দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন—দেখাইলেন. তাঁহার সঙ্গে শিখ্‌দিগের ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থী সাহেব" এক ইঞ্চ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এই পুস্তক প্রত্যেক সৈন্যকে প্রেরণ করেন--বলিলেন। লাট বাহাদুরের বাড়ীতে আমাদের লাহোর পরিভ্রমণের কথা হইতেছিল,—আমি বলিলাম "একটী স্থান আমার দেখিবার বড় ইচ্ছা"—জানাইলাম কি সে স্থান। সেখানে লাট সাহেবের সেক্রেটরী সাহেব ছিলেন, তিনি বলিলেন "আমার আফিস সেইখানে, আহ্লাদের সহিত আপনাকে দেখাইব—যদি আপনি আসেন।" আমরা দুই ভগিনী অনেকক্ষণ লাট-বাহাদুরের বাড়ীতে থাকিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে সেই স্থানটি দেখিতে গেলাম। স্থানের ইতিহাস ;—সম্রাট আকবর যদিও উদার হৃদয়, ধার্ম্মিক, দাতা প্রভৃতি উচ্চগুণে ভূষিত ছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত নৃত্য-গীত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে অনেকগুলি সুন্দরী যুবতী ছিল—যাহারা সম্রাটকে তাহাদের নৃত্য-গীতে মুগ্ধ করিত। এই যুবতীদের মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী নৃত্যকারিণী ছিল, তাহার নাম আনারকলি অর্থাৎ বেদানার মুকুল। তাহার রূপ-সৌন্দর্য্য যেন বেগমদিগেরও চক্ষুশূল হইয়াছিল। আনারকলির সৌন্দর্য্যে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম মুগ্ধ এবং আনারকলিও নীরবে গোপনে তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি সাহাজাদাকে অর্পণ করিয়াছে। চক্ষে-চক্ষে তাঁহাদের প্রণয়ের আদান-প্রদান হইয়াছিল, এবং হাসির ভাষায় প্রেমালাপ করিয়াছিলেন। আকবরের বেগমগণ এই কথা আনারকলির বিপক্ষে নানাভাবে সাজাইয়া সম্রাটকে জ্ঞাপন করাইলেন। সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও নিজ চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিবেন—স্থির করিলেন। সন্ধ্যার সময় আমোদে গৃহপূর্ণ. সুসজ্জিতা যুবতী নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সকলেই উপস্থিত, বেগমগণের মধ্যস্থলে সম্রাট,—গীত আরম্ভ হইল, নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে, এমন সময়ে সম্রাট সাহাজাদাকে আহ্বান করিলেন। সাহাজাদা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী আনারকলি, তাহার প্রাণাধিক প্রিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, সেলিমও আনারকলির দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইলেন, সে রাত্রে যেন আনারকলির রূপ উথলিয়া উঠিয়াছিল, এত সুন্দর তাহাকে কখনও বুঝি দেখায় নাই। আনারকলির হাসি ও সেলিমের সেই দৃষ্টিতে সম্রাটের তাহাদের গুপ্ত-প্রণয়ের কথা জানিতে কিছুই বিলম্ব হইল না! বিকৃত ও রুষ্টস্বর বশে-রাখিয়া গম্ভীরস্বরে সম্রাট আকবর বলিলেন "সেলিম, এই আনারকলিকে আগামী কল্য প্রাতঃকালে জীবন্ত-প্রোথিত করিতে হইবে।" নৃত্য-গীত বন্ধ হইল, যাঁহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া সম্রাটকে আনারকলির বিপক্ষে কথা বলিয়াছিল, সম্রাটের এই ভয়ঙ্কর আদেশ শুনিয়া তাঁহাদেরও মুখ শুখাইয়া গেল। দেখা গেল সকলেই ভীত,—কেবল আনারকলি নহে। কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা! সাহাজাদা সম্রাটের দিকে তাকাইলেন, সম্রাট বুঝিলেন—পুত্র, দয়া ভিক্ষা করিতেছে। তখন আবার অবিচলিতস্বরে বলিলেন "আমি সম্রাট, তুমি আমার কর্ম্মচারী—আমার আদেশ অন্যথা করিবে না। আনারকলিকে যখন প্রোথিত করা হইবে, তুমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে।" সাহাজাদা সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রমোদসভা ভঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুন্দরী আনারকলি, বস্ত্র-অলঙ্কারে বিভূষিতা, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্তের ভিতর দাঁড়াইয়া,--সম্মুখে তাহার প্রণয়ী সেলিম ; আনারকলির মুখে তখনও হাসি, ঘাতকেরা মাটী ফেলিতে লাগিল,— শেষ দৃষ্টি পর্য্যন্ত আনারকলি হাসিয়া সেলিমকে জানাইল ;—তাহার প্রেম সমভাবে থাকিবে। আকবরের মৃত্যুর পরে সেলিম যখন সম্রাট হইলেন

তখন প্রথম কাজ তাঁহার এই, আনারকলির কবরের উপর মস্‌জিদ করিবেন। তাহাই হইল এবং পারস্যভাষায় অনেক-গুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটী কথা এইভাবে লিখিত—"আমি ভগবানকে শেষদিন পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিব, যদি আমার প্রিয়তমাকে আর একবার দেখিতে পাই।" সেক্রেটরী, আরও কত সেই কবর-প্রস্তরখণ্ড হইতে পড়িয়া তর্জ্জমা করিয়া শুনাইলেন। কোন্ হিন্দু রাজা নাকি সেই কবরের উপরের খোদিত প্রস্তর স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এখন এই মস্‌জিদের মধ্যস্থানে নাই, একপার্শ্বে আছে। আনারকলি বাজার—বৃহৎ বাজার। লাহোরের এক অংশ আনারকলি নামে খ্যাত। আনারকলির প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেম, লাহোরে আজও জীবন্তভাবে রহিয়াছে।

লাহোরের যাদুঘরে অনেক দেখিবার আছে তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের এক প্রস্তর মূর্ত্তি। এ-মূর্ত্তির সদৃশ মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। গৌতমবুদ্ধের কঠোর তপস্যাকালে অনিদ্রায় অনাহারে তাঁহার সে দেহকান্তি কঙ্কালে কিরূপ পরিণত হইয়াছিল এ-মূর্ত্তি পরিষ্কাররূপে তাহা আজও আমাদের জানাইতেছে। এই মূর্ত্তিতে প্রত্যেক অস্থিগুলি গণনা করা যায়, ললাটের শিরাগুলি উচ্চ, চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইলে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে, সহজে এই প্রার্থনা উঠে, "হে বুদ্ধদেব, আমার জন্য তুমি কি এই কঠোর তপস্যা করিলে,—তোমার দেহের এই অবস্থা হইল।"

শিখদিগের মহারাজ রঞ্জিত সিংএর সমাধি দেখিতে গেলাম। লাহোর-দুর্গের সম্মুখে এক বৃহৎ প্রাসাদতুল্য গৃহ, অনেক সোপান উঠিয়া একটি ছাদ অতিক্রম করিয়া সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলাম। মধ্যে মহারাজ রঞ্জিত সিংহের সমাধি এবং তাহার চারিপাশে ছোট ছোট সমাধি, এই সমাধিগুলি মহারাজার সহধর্ম্মিণী মহারাণীগণের; তাঁহারা পতির সঙ্গে সহমরণে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই সমাধিগুলির সঙ্গে দুটী বড় কৌটার আকারের সমাধি; শুনিলাম দুটী কপোত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিল—তাহাদের ভস্ম ইহাদের ভিতর। গৃহটি বড়ই নির্জ্জন—যথার্থ সাধনের স্থান বলিয়া মনে হইল।

লাহোরের দুর্গ। এই দুর্গ এক অনতি-উচ্চ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর—বেষ্টিত রাখিয়াছে এই দুর্গকে। কত ঘর, কত মহল, কত প্রাঙ্গণ—দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া দেখিলাম লাহোরের সহর, আরও কত দূরস্থ স্থান;—শত্রুহস্ত হইতে কিরূপে দুর্গ, দেশকে রক্ষা করিত বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বকালে দুর্গই প্রাসাদ ছিল অর্থাৎ নরপতিগণ দুর্গের ভিতরে সপরিবারে অধিবাস করিতেন। এই উচ্চ পর্ব্বতের উপর এক গভীর কূপ ছিল, বোধকরি সম্রাটগণ ইহারই জল পান করিতেন। আজ সে কূপ বন্ধ। ইহার পর সম্রাটের বাসগৃহ দেখিতে গেলাম। ইহার নাম শিশমহল অর্থাৎ কাচের বাড়ী। তিনদিকে গৃহ, মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের প্রাঙ্গণ। ইহার মধ্যেস্থলে ফোয়ারা। গৃহগুলির বাতায়নগুলি অতি ক্ষুদ্র, সেই বাতায়ন দিয়া সম্রাটের মহিষীগণ বন্যপশুর যুদ্ধ দেখিতেন। সম্রাটদিগের তখন এক অদ্ভুত রকমের আমোদ ছিল। বন্য হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি ধরিয়া আনিত এবং এই প্রাসাদগুলির উদ্যানের ভিতর ছাড়িয়া দিত, পশুগণের লড়াই হইত। এই আমোদ দেখিবার জন্য বেগমদিগের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন—অতি উচ্চ তাঁহাদের গৃহে হইলেও সেখান হইতে পশুদের লড়াই স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। সম্রাটের স্নানের গৃহ দেখিয়া অবাক্ হইলাম, শ্বেতপ্রস্তরের চৌবাচ্চা—তাহার কি পরিপাটী ব্যবস্থা! উষ্ণ-জল শীতল জল কোথা হইতে কিরূপে আসিত, বুঝা গেল না, সিংহের মুখের আকারের কল রহিয়াছে। শিশমহলের একটী গৃহের ছাদ নানারঙ্গের কাচে নির্ম্মিত, দেখিয়া মনে হইল সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্ব্বোচ্চ-আসনা বেগমের এই ঘর। যে গাইড্ আমাদের সঙ্গে ছিল সে

হঠাৎ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, কেহ কেহ ভয় পাইয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই গাইড্ একখণ্ড কাগজ জ্বালাইয়া হাতে ধরিল। নিমেষে সে ঘরের শোভা সহস্র সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইল, ভাবিলাম এ কোথায় আসিলাম—সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। একটা দীপশিখার আলোতে সেই শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচকণাগুলি নানারঙে হাসিয়া উঠিল। এই গৃহে মণি-মাণিক্যে সজ্জিতা অতুল রূপবতী যুবতী বেগমগণ বুঝি দাঁড়াইয়া বলিয়া ছিলেন—"পতি সম্রাটের প্রণয়ের কাছে এ সকলই তুচ্ছ।"

এই দুর্গের ভিতর একটী মন্দির আছে, সে মন্দিরে নাকি এক অতি গভীর ও অন্ধকার কূপ আছে। কিম্বদন্তী—এই 'লবের কূপ'। সময়ে এই কূপ ছিল এবং এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। লবপুর ছিল লাহোরের নাম এবং ইহার অনতিদূরে কুশীপুর বলিয়া দেশ আছে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, লব ও কুশ দুই পুত্রকে এই দুই রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এ মন্দিরটি এখন বন্ধ,—প্রবেশ নিষেধ।

লাহোরের সকলই ভাল লাগিল। সকলের নিকটে স্নেহ-ব্যবহার পাইলাম। যিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মোটর গাড়ী দিয়াছিলেন তাঁহার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।

লাহোর ছাড়িবার পূর্ব্বদিনে বিদায় দিবার জন্য বন্ধু বান্ধবেরা আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন। ব্রহ্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখি—প্রাঙ্গণটী পূর্ণ! সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্নেহসম্মান জানাইলেন,—দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আরও কিছু দীর্ঘকাল যদি থাকিতে পারিতাম—বড় ভাল হইত। আমি দুই সহোদরার হইয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "আমাদের লাহোরে বাস যে এত সুখের হইয়াছে ইহা কেবল তাঁহাদের স্নেহ ও যত্নে" "ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা কখনও দিতে পারিব না"—তাহাও বলিলাম। পরদিন বৈকালে লাহোর হইতে রওয়ানা হইলাম, বন্ধুগণ সপরিবারে আসিয়াছিলেন, সত্যই ফিরিবার সময়—বিদায় লইবার কালে চক্ষে জল আসিল।

আর একটী স্থান দেখা হইল না—সেটী গুরু নানকের জন্মস্থান, পবিত্র স্থানটি স্পর্শ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল।

স, দে।

কবি বসন্তকুমারের প্রতি।

——(-*-)——

কবি তোমার অশ্রুঝরা বুকফাটা ওই সঙ্গীতে
চক্ষে আমার উথ্‌লে ওঠে জল,
না জানি হায় বসন্তেরি কুঞ্জে কাহার ইঙ্গিতে
ঝঞ্ঝা বায়ে টুট্‌ল ফুলদল।
মায়ের চোখে নিবৃল আলো, মুছল রঙীন আল্‌পনা,
বিশ্ব-ভুবন শূন্য হল হায়,
শরৎ দিনের মেঘের মত মিলাল সব কল্পনা,
ডুবল তরী ঘাটের কিনারায়;

হরষ হাসি মিলায়ে গেল পাঁজর-ভাঙ্গা ক্রন্দনে,
হাহাকারে ডুব্‌ল যত গান,
পারিজাতের পুষ্পকলি পড়ল ঝরি' নন্দনে,
হঠাৎ কেঁপে থামল বীণার তান!—
তবু তোমায় ঢাক্‌তে হবে অশ্রু হাসির অঞ্জনে,
তবু তোমার গাইতে হবে হায়,
তবু ছবি আঁক্‌তে হবে ব্যথার শোনিত-রঞ্জনে
সবার তরে মিথ্যা ছলনায়!
বুকের মাঝে উঠ্‌বে যবে অশ্রু সাগর কল্লোলি,
হাসির আড়ে আড়াল করে তাই
গাইতে হবে সজল চোখে বীণার তারে সুর তুলি,
মুক্তি তোমার নাইগো কবি নাই!
কে বোঝে হায় কবির ব্যথা রক্ত-রাঙা অন্তরে,
সবাই চাহে শুন্‌তে কবির গান!
কে জানে হায় কোথায় জাগে কবির কোমল মর্ম্ম রে,
নিখিল হারা নিখিল জোড়া প্রাণ!*

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ভাওয়ালের কবি ৺গোবিন্দ দাস।

(মৃত্যু—১৩ই আশ্বিন ১৩২৫; সোমবার রাত্রি ৫টা।)

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যু হইয়াছে।

"জন্মিলে মরিলে হবে,
অমর কে কোথা ভবে!"—

কাজেই অনেক "সাহিত্যামোদি"গণ গোবিন্দ দাসের মৃত্যুতে যে কোনরূপ মৌলিকতা খুঁজিয়া পাইবেন না, ইহা নিশ্চিত।

পূর্ব্ববঙ্গের এই চিরদরিদ্র কবি, জীবনে যত প্রকার সম্ভব, দুঃখ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া (অথবা সহ্য করিতে না পারিয়া) অবশেষে মৃত্যুর গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্য শঙ্কিত-চিত্তে আর কোন ধনী লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

* "পরিচারিকায়" পুত্রশোকাতুর কবির শোকোচ্ছ্বাস পাঠে।

কবির 'চন্দন' কাব্যের দুইটি কবিতায়,—'গুরুগোবিন্দ সিংহ' ও 'বালিকার প্রেম'এ যে রচনার তারিখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গলা ১২৮৫ সাল। স্থান—জয়দেবপুর। ইহার পূর্ব্বেও কবি আরও কবিতা লিখিয়াছেন। সম্প্রতি গত আশ্বিনের ১৩২৫ 'নারায়ণে' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় কবির দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে,—'ঝুলন' ও 'অসুর-পূজা'। ১২৮৫ হইতে ১৩২৫ ঠিক ৪০ বৎসর; এবং ইহারও উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্ববঙ্গের এক জঙ্গলে বসিয়া কবি গোবিন্দ দাস বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। 'চন্দন', 'কস্তূরী', কুঙ্কুম', 'ফুলরেণু', 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী'—এই ছয়খানি গীতিকাব্য আমি দেখিয়াছি। কবির নিকট অতি অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, 'নব্যভারত'-প্রমুখ মাসিক পত্রিকাদিতে এত অধিক খণ্ড-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহা বিধিমত সংগৃহীত হইলে অন্ততঃ আরও চারি পাঁচখানি কাব্য হইতে পারে। অর্থ থাকিলে কবি না হইয়াও যেমন কবিতার পুস্তক ছাপান অসম্ভব হয় না, তেমনি অর্থের অভাবে কবি হইয়াও এ যুগে কাব্য ছাপান সম্ভবপর নহে। ইহা একটী যুগলক্ষণ। গোবিন্দ দাস কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থের একান্ত অভাব ছিল; কাজেই তাঁহার অনেক কাব্য অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতে পারিল না। হাতের লেখা তাঁহার অনেকগুলি কবিতা ও কাব্য আছে, নানা কারণে তাহারও প্রকাশ এক্ষণ অসম্ভব বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

কবি গোবিন্দ দাসের যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ ছিল, তাহার মধ্যে দুবেলা দুমুঠো খাইতে না পাওয়ার অভিযোগই ছিল প্রধান। সব দেশেই দুঃখী লোকেরা খাইতে পায় না। গোবিন্দ দাস দুঃখী লোক ছিলেন। কাজেই তিনি খাইতে পাইতেন না। 'নব্য ন্যায়ের' দেশে,—নব-নাগরিক-সাহিত্যের নৈয়ায়িকেরা যে ইহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাইবেন, এমন আশঙ্কা আমাদের নাই। তথাপি এমন দু'এক জন ছিল, যাহারা বলিত যে, কথাটা বড়ই লজ্জার ও কলঙ্কের। তা কথাটা যতই লজ্জা আর কলঙ্কের হউক না কেন, নিতান্ত নির্লজ্জ আর বেহায়াও ত কেহ কেহ থাকে? তাহারা প্রথমে কানাঘুষা করিতে করিতে, শেষে কথাটিকে একেবারে সাহিত্যের খাস মজলিসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। ১৩১৮ সালে কবি গোবিন্দ দাস তাঁহার দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রভৃতি জানাইয়া একটী কবিতা প্রকাশ করেন। 'নব্য ভারতে' এই কবিতাটী ছাপা হয়। কবিতাটিতে কোন ঘোর-প্যাঁচ ছিল না। আর ক্ষুধার্ত্তের কবিতায় ঘোর-প্যাঁচ থাকিবেই বা কি করিয়া? কবিতাটিতে স্পষ্ট এই কথা লেখা ছিল যে, "হে ভাই বঙ্গবাসি, আমি প্রতিদিন দুই বেলা খাইতে পাইতেছি না, 'উপোস' করিতেছি; এবং রাত্রিদিন হাহাকার করিয়া একরূপ 'শুকায়ে' মরিতেছি। যদি তোমরা কেউ পার ত আমায় দুটি খাইতে দাও। এখন আমায় খাইতে না দিয়া যদি মারিয়া ফেল, তবে আমার মৃত্যুর পর, আমার চিতায় যদি তোমরা মঠ দাও, তবে তাহাতেই বা এমন লাভ কি? মৃত্যুর পরে অলবট্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমি হয় ত আমার চিতায় তোমরা কিরূপ মঠ দিলে, তা দেখিতেও বা আসিতে পারি; কিন্তু তার চেয়ে বলি, ক্ষুধার্ত্ত আমি, আমায় চারিটী খাইতে দাও।

"ও ভাই বঙ্গবাসি,
আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্-ফট্।
ও ভাই বঙ্গবাসি,
আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?"

এই কবিতাটি বাহির হওয়ার পর, ১লা চৈত্র ১৩১৮, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে "গোবিন্দ দাসের কাব্য-সমালোচনা ও তাঁহার বর্ত্তমান অভাব-লাঞ্ছিত দুর্দ্দশা-পীড়িত অবস্থার সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবনায় ও তৎকর্ত্তৃত্বে একটি সাহায্যসমিতি গঠিত হইয়াছিল।" এই পর্য্যন্ত। ঐ বৎসরেই ফাল্গুন সংখ্যার 'বীরভূমি' পত্রিকায় নিম্ন-উদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যটিও প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন 'বীরভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত-রত্ন। সম্পাদকীয় মন্তব্যটি এইরূপ,—"দুঃস্থ কবি গোবিন্দ দাস;—ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের নাম সকলের পরিচিত না হইলেও, যাঁহারা বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছেন 'চন্দন', 'কস্তূরী' প্রভৃতি যে বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে, তাহা কাব্যরসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তিনি আজ প্রায় ৩০ বৎসর কাল বঙ্গ-বাণীর সেবা করিতেছেন। তাঁহার সরল নিশ্মল কবিতাগুলি বৈদেশিকতার গন্ধ-বিহীন ও বঙ্গ-পল্লীর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস। বড়ই দুঃখের কথা যে, আজ এই প্রতিভাশালী প্রবীণ কবি অতি ভীষণ দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রোগ, শোক ও বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘকাল সাহিত্যসেবার পর হতভাগ্য কবি আজ অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন; 'যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল সেই দরিদ্র হবে'—দেবী ভারতীর প্রতি কবির এই মর্ম্মান্তিক আক্ষেপোক্তি সার্থক হইলেও, একজন একান্ত সাহিত্যসেবক, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাহিত্য-গৌরবে যে জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই তাঁহার স্বজাতির মধ্যে একমুষ্টি অন্নের অভাবে মারা যাইবেন, এ কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য এ দেশে কি কেহ নাই? পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাসস্থান। সেখানে ফুটিয়া তাঁহার হৃদয়-কুসুম সৌরভ দান করিয়াছে, তাহা উপভোগ করিবার অবসর সকলের এখন না হইতে পারে। জীবিতকালে আদরলাভ কবিগণের একমাত্র সৌভাগ্য, তাহা হইতেও ইনি বঞ্চিত। কিন্তু যখন এ দেশের এই যুগের কাব্য-সাহিত্যে কালের নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রকৃত আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে যখন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা শুনিবে, এই আদরণীয় কবি দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া, তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট শুধু বাঁচিয়া থাকিবার মত একমুষ্টি অন্ন-সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই, তখন তাহাদের পিতৃগণের নামে এ অপবাদ কি তাহাদিগকে বাজিবে না?" এই ত গেল ৭ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে কলিকাতার আন্দোলন। ছ'মাস অতীত হয় নাই, ঢাকায় যে সাহিত্য-সম্মিলনী হইয়াছিল—সেই সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন হইতে, শ্রদ্ধেয় সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের অতীত গৌরবের ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে কবি গোবিন্দ দাসের নাম যথাযোগ্য সসম্ভ্রমেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি আমার প্রিয়-সুহৃৎ গোবিন্দ দাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে 'আদিশূরের যজ্ঞভূমি', বল্লালের অস্থি-ভস্মে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি',—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিশ্চিতই তাঁহার অভিভাষণে কবি গোবিন্দ দাসের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ যাঁহারা বিক্রমপুরের অতীত ইতিহাস ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য আলোচনায় ব্যাপৃত, কবি গোবিন্দ দাসকে তাঁহাদের বিস্মৃত হইলে ত চলিবে না।

পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে, দুই দুইবার দুইটি বৃহৎ বিদ্বজ্জন-সম্মিলনে, দরিদ্র কবি গোবিন্দ দাসের সাহায্যের জন্য আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমাদের

পূর্ব্বগামী মহানুভবেরা সম্ভবতঃ এ বিষয়ে আরও আন্দোলন করিয়া থাকিবেন। বাঙ্গালা তাহার একজন দরিদ্র কবিকে একমুষ্টি অন্ন দিয়া বাঁচাইবার জন্য কিরূপ সভা করে, সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে, সেই বক্তৃতার বিবরণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে পরদিন প্রকাশ করে, এবং এইরূপে 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু' ও 'সাহসে দুর্জ্জয়' হইয়া কার্য্য-কালে কিরূপেই বা অতি আশ্চর্য্যরকমে পলাইয়া যায়, এমন যে কত হাঁটিয়া খাটিয়াও আর তাহাদের সন্ধান মিলে না,—এই দৃষ্টান্তের জন্য যদি কেহ কৌতূহলী হ'ন, তবে আমার বিনীত অনুরোধ, তিনি যেন কবি গোবিন্দ দাস সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহায্যসভাগুলিকে স্মরণ করেন। এ যুগে বাগ্‌বিভূতির আবরণে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী তাহার হৃদয়ের দৈন্যকে ঢাকিবার জন্য যতই প্রয়াস করুক, তাহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়েছে। বাঙ্গালী যে কতদূর অন্তঃসারশূন্য ও বচনসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মমত্ববোধ, তাহার নিষ্ঠা ও সরলতা, তাহার একটা ভাল কাজ করিবার স্পৃহা ও ক্ষমতা যে কতদূর পর্য্যন্ত কমিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত আত্মস্থ-প্রকৃতি ও সুস্থ-চিত্ত দেশে বস্তুতই বিরল।

যাহা হউক, কবি গোবিন্দ দাস কোনরূপে কায়ক্লেশে মরিতে পারিয়াছেন। এখন তাঁহার চিতায় মঠ দাও, শোকসভা করিয়া মামুলি চলনসই কতকগুলি প্রশস্তিবাক্য চোট্‌পাটের সহিত উচ্চারণ কর, চাঁদার খাতা খোল, যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু কি ভাবে যে তিনি এতকাল বাঁচিয়া ছিলেন, আর কি অবস্থার মধ্যেই যে আজ নিতান্তই বাঁচিতে না পারিয়া মারা গেলেন, তাহার প্রকৃত খবরটা চাপা পড়িতে না দেওয়াই সঙ্গত। কেন না, ইহা একটা ইতিহাস।

কবির জীবিতকালে, বাঙ্গলার ধনী-মানীদের নিকট বাঙ্গলার সাহিত্যসেবী বিদ্বজ্জনদের সভায়, কত বড় বড় বাড়ী ও গাড়ী-জুড়ির সম্মুখে, কত মূল ও শাখাপরিষদ, কত লাইব্রেরী, কত তৈলচিত্র-সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষে, কত সোফা কৌচ ঝাড় লণ্ঠন ও দেওয়ালের সম্মুখে কবি গোবিন্দ দাসকে একমুষ্টি অন্ন দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কত রকমারী এ্যাক্‌টিংই না হইয়া গিয়াছে। আর না! মৃত্যুর এই আঁধার যবনিকা--সেই লজ্জা, কলঙ্ক ও অপমান-ক্ষতকে যেন চিরদিনের জন্য ঢাকিয়া দেয়। দেখিলাম, বাঙ্গলার মজলিসে, দুঃস্থ কবির জন্য করুণরসের উদ্রেক করা বড়ই কঠিন কার্য্য।

যার যেমন কর্ম্ম, সে তেমনি ফল ভোগ করে। গোবিন্দ দাস আপন কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তা ত বটেই। গোবিন্দ দাস, শুনা যায়, নিতান্তই গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন। বুঝিয়া-সুঝিয়া কথাও বলিতেন না, কাজও করিতেন না, হাতে হাতে তার ফল পাইয়া গেলেন। এ-ও ঠিক কথা। গোবিন্দ দাসের বাড়ীতে লোমহর্ষণকারী অত্যাচার হইল, না হয় হইলই, অমনি সে ব্যাপার লইয়া কবিতায় আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ ছুটিল। আহা, অমন যে 'মগের মুলুক', সেখানেও কি অত্যাচার হয় না? মগের মুলুকেও কবিতা লিখিয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে রুখিয়া দাঁড়ায় কে? এমনি ছিল তাঁর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি! ভাওয়াল হইতে নাকি গোবিন্দ দাসকে কে কবে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। হবেও বা কিন্তু তাই লইয়া এত বিনাইয়া ছিনাইয়া কবিতা লেখার কি আবশ্যক ছিল?

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।

* * * *

আহা তার নরনারী ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বার মাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর, শেলের সমান !
তাদের কলিজা ভাঙ্গা যাতনা-আগুন-রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান !

* * * * *

বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখনিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান !

আবার সেই ভাওয়ালের রূপ-বর্ণনার ভঙ্গীমাই বা কি ?—

তার সে পিকের ডাকে, জ্যোস্না জমিয়া থাকে,
যামিনী মূরছা যায়, শ্যামা ধরে তান !

* * * * *

স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী,
শস্যের কনক-হাস্যে চির-শোভমান ।

এমন যে এত বড় একটা বাঙ্গালী জাতি, ইহাকে একদিন ধরিয়া হাত-পা বাঁধিয়া যদি কেহ নির্ব্বাসন দেয়, তবে তার জন্য দুঃখ বা প্রতিবাদ করিয়া কবিতা লিখিবে, এত বড় অবিবেচক বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে কেহই নাই। বরং সেই নির্ব্বাসনদণ্ড সমর্থন করিবার জন্য ভাড়াটিয়া লোকের আবশ্যক হইলে, খোদ বাঙ্গালী প্রধানদের মধ্য হইতেই তাহার সংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হইবে। এ হেন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে গোবিন্দ দাসের মত একজন দারিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তির ভিটামাটী কোন্ প্রবলপ্রতাপান্বিত কে কবে উচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহা কি একটা মনে করিয়া রাখিবার মত ঘটনা, না কবিতা' লিখিবার বিষয় ? আর ভিটামাটী-উচ্ছেদকারী প্রবল আততায়ীর বিরুদ্ধে 'ছিন্নজিহ্বা সিংহের' কবিত্ব-গর্জ্জন যে শুধু নিস্ফল, তাহাই নহে ; ইহা নানা প্রকারেই বিঘ্ন-সঙ্কুল। কিন্তু কবি গোবিন্দ দাসের সে বিবেচনা ছিল না। তিনি তাঁহার নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থা জানিয়াও বলিলেন—

"সংসারে আমার ভাই,
যদিও কেহই নাই,
তবু ত তোমরা আছ ; দেশবাসিগণ ?"

গোবিন্দ দাস ভাবিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে নাকি তাঁহার আবার 'দেশবাসিগণ' আছে!
গোবিন্দ দাস তাঁহার সেই কল্পিত দেশবাসিগণের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির-নির্ব্বাসন !

বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে ?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ ?"

তা নয় ত কি ? দাস-সুলভ নীচতার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সর্ব্বদাই প্রপীড়িত দরিদ্র দুর্ব্বলকে ঠেলা মারিয়া অতি দ্রুত অত্যাচারী প্রবলের চরণচ্ছায়ায় নিজে মস্তক উত্তোলন করিতে ধাবিত হয়। দৃষ্টান্ত ? বাঙ্গলা দেশের সম্প্রতি কয়েকটা ঊর্দ্ধে উত্থিত মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখিতে পাইবে। সুতরাং বাঙ্গলার কোন বড়লোক (?) গোবিন্দ দাসকে সাহায্য করিলেন না। গোবিন্দ দাসের 'নির্ব্বাসিতের আবেদন' আজ ২৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। অধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় ইহার প্রধান ত্রুটী যে, ইহা Art for Art's Sake নয়। আর সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দোষ যে, এই কবিতাটির অর্থ পাঠ করিবামাত্রই অতি স্পষ্ট বুঝা যায়।

তোমরা বিচার কর আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়-দেশ-ছাড়া,
পথের ভিখারী করি
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা—
*　　*　　*　　*
যারা ভাই বস্ত্র হরে,
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন্ কেঁদে হয় সারা !
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !

গোবিন্দ দাসের 'আবেদন' মত বিচার করিবার জন্য কোন সাহিত্যিক কমিশন বসিয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। কেন না, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম যে, কমিশন অনেক একতরফা অনুসন্ধান ও আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে গোবিন্দ দাসের নির্ব্বাসন দণ্ডের অপ্রকাশযোগ্য অথচ অতিশয় ন্যায়সঙ্গত 'সাহিত্যিক কারণ' (?) বিদ্যমান আছে !

যে দেশে কোন নিঃসহায় প্রপীড়িত কবির উপর দিবা দ্বিপ্রহরে উল্লিখিত অত্যাচারের একটা প্রতীকারের জন্য কোটীতে একটি মিলে না,—

সত্যই সে বঙ্গদেশ,
ভরা শুধু ছাগ মেষ,
সেথানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন !

এই কবিতাটির সাহিত্যিক যাচাই করিবার সময় এখনও বহিয়া যায় নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্য যদি না মরে, তবে গোবিন্দ দাসের সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য, সাহিত্য-ব্যবসায়িগণ অবশ্যই একদিন ওজন করিবেন। সে বাটখাড়া

দাঁড়িপাল্লা ও সে অপক্ষপাত দৃঢ় সবল দক্ষিণ হস্তের অপেক্ষায় হয়ত কিছু দীর্ঘদিনই বা আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু একটী কথা আজই বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত যে গোবিন্দ দাস যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সার্থক হয় নাই। দোষ কাহার? গোবিন্দ দাসের, না তাঁহার 'দেশবাসিগণের'? কোন রসিক ব্যক্তি হয় ত চট্ করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, 'দোষ কারো নয় গো শ্যামা',—ইত্যাদি!

এক জন মুমূর্ষু বুভুক্ষু কবিকে যে কৃতঘ্ন জাতি একমুষ্টি অন্নভিক্ষা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, কি স্পর্দ্ধে, কোন্ সাহসে সে পৃথিবীর বুকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ বজায় রাখিতে চায়? পৃথিবী এবং ইতিহাসে তাহার কোন্ অধিকার? এক দুর্দ্দম আততায়ী সভ্যতার সংঘর্ষণে যে আলোড়ন বাঙ্গালার বুকে আজ শতবর্ষ ধরিয়া চলিয়াছে,—যাহাকে বলা হয় এক উন্নতিমুখী সংস্কার, যাহার কোন ক্রটী দেখাইতে যাওয়াই ব্রাহ্মণ বা গো হত্যার তুল্য, আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না যে, ইহা কি তাহারই শিক্ষা?

এক একটা ঘটনায় জাতির অনেকগুলি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সমস্ত লক্ষণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া বাহির হয়। গোবিন্দ দাসের জীবনালোচনায় আধুনিক হাল ফ্যাসানের ইংরাজানবীশ কেতা-দুরস্ত মুখপাত-প্রশস্ত দেশমাতৃকার ও বঙ্গভাষা-জননীর উন্নতিসাধনে নিয়ত বদ্ধপরিকর এবং ক্লব, সম্মিলন (বার্ষিক ও মাসিক), পরিষদ (মূল ও শাখা) প্রভৃতি দুর্গম স্থানাদিতে সদা-সর্ব্বদা গমনাগমনে ছটফটায়মান ও নিতান্তই ঘর্ম্মাক্তকলেবর, বাঙ্গলার 'সাহিত্যামোদিগণের কোন কোন দিকের একটা অতি বিশিষ্ট পরিচয়ই আমরা লাভ করিয়াছি। মনুষ্যত্বের দরবারে আমরা কবি গোবিন্দ দাস সম্পর্কে নিজেদের এই আচরণ যদি কপালে প্লাকার্ড মারিয়া লইয়া গিয়া উপস্থিত হই, তাহা হইলে, জীবহত্যা সম্ভবতঃ নাও হইতে পারে, কিন্তু সেই দরবারের সদর-দরজার বাহির হইতেই যে আমাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গুরুতর ব্যথা সহ অতি দ্রুত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

কেন না, কবি গোবিন্দ দাস নির্ব্বাসিতের নিষ্ফল আবেদন লিখিয়া, তাহার ঠিক পরের বৎসরেই লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

> বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?
>
> * * * *
>
> গু মাখিয়া মারি ঝাটা যত মনে লয়।

গোবিন্দ দাস দেখিলেন, যাহারা 'অধম' এবং 'পিশাচ', তাহারাও অনায়াসে 'বড়লোক' হয়—যদি 'গর্দ্দভের পদধূলি' মাথায় মাখিতে পারে। 'উকীল, ডাক্তার আদি সম্পাদক চয়' এবং আরও যারা মানা-গণা, তাদের 'অবিচার', 'ব্যভিচার, ও 'ভয়ঙ্কর পাপময় কার্য্যে'র অন্ত নাই, এবং ইহারাই 'বঙ্গের উজ্জ্বল আশা'! আরও ইনি দেখিলেন যে, 'বিবেক বিক্রয়, করিতে ইহাদের তিলার্দ্ধ দেরী হয় না, এবং সর্ব্বদাই 'বলিতে উচিত সঙ্কুচিত য়।' 'ইংরাজী শিক্ষা' ও 'পাশ্চাত্য দীক্ষা' এই দুই ই তিনি দেখিলেন নিতান্ত অসার। 'অই হ্যাট কোট' আর 'বিলাতী কথার চোট' এই সিংহচর্ম্মের অন্তরালেও তিনি প্রকৃত গর্দ্দভটিকে নিতান্তই চিনিতে পারিলেন। ধর্ম্মসংস্কারের অছিলায় যে ধূর্ত্তামি' ও 'ভণ্ডামি', তাহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

'বলেছি বলেছি ঢং—আর কিছু নয়।'—অর্থাৎ মোটের উপর কবি গোবিন্দ দাস শেষাশেষি আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই আমাদের উপর কোন প্রকার শ্রদ্ধা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আর যেটা অল্পাধিক সব বড় বড় বাঙ্গালীই জানে, এবং শিখে, অর্থাৎ উপরওয়ালার মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত কচলান আর 'আজ্ঞে হাঁ,—'তা যা বলেছেন'—'আর আপনার মত' ইত্যাদি এই সমস্ত ত নানা রকমের দুঃখে কষ্টে পতিত হইয়াও তিনি কোন দিন অভ্যাস করিতে পারিলেন না। কাজেই তিনি না খাইয়া মরিবেন না ত মরিবে কে? তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটা নির্লজ্জ স্পষ্টতা ছিল এবং কোন রূপ অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতার এমনি অভাব ছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া রুচিকে শুচি রাখা একশ্রেণী সাহিত্যিকের পক্ষে বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, ভাওয়াল ভাওয়াল করিয়াই গোবিন্দ দাস মারা গেল। 'বিশ্ব', বেচারার খবরটা কোনকালেই লইবার অবকাশ পাইল না। এই আজিকার দিনেও!

এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়।
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,
পতিরে বাঁধিয়া ঘরে,
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়,
কত যে জননী বোন্
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ-সময়। ইত্যাদি

কোন ভদ্রলোক এই সমস্ত অশ্লীল (?) ঘটনা লইয়া কবিতা লিখিতে পারেন—এই রকম স্পষ্টভাবে—ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাতে এতটুকু মাত্রও অস্পষ্টতা নাই যে, কোন রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলিতে পারে। এই রকম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ত গোবিন্দ দাসকে ঘাতকের হস্তে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। আবার মুস্কিল এমন যে, গোবিন্দ দাস তাহা লইয়াও কবিতা লিখিলেন—

আবার সে মোহে মাতি,
পাঠাইলি গুপ্তঘাতী,
গোপনে বধিতে মোরে—এ কি লজ্জা কম?
হা রে ভীরু কাপুরুষ—হা রে নরাধম।

সাহিত্য-গগনের একটি জলন্ত জ্যোতিষ্ক প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী নিজের আগুনে নিজে জলিয়া পুড়িয়া আজ কোথায় খসিয়া পড়িল। আর অতি অল্প লোকেই তাহা চাহিয়া দেখিল। 'বেলাই বিল,' 'চিলাই নদী' আর পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের 'উভতীর' আজ নিস্তব্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-শ্মশানের এক মহাভৈরব আজ মিথ্যা নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া মহাকালের বুকে মিশিয়া গেল। তাহার আরাব, ঈশানের বিষাণ-ফুৎকার, এই মৃতের শ্মশানে কাহাকে ডাকিয়া ফিরিতেছে?

'শ্মশান' লইয়া গোবিন্দ দাস অনেক কবিতা লিখিয়াছেন,—কে জানে, শ্মশানে তাঁহার কি ছিল। এই সাহিত্য-ভৈরবের শ্মশানও বুঝি বা পদ্মার তীরেই একদিন রাত্রিশেষে জলিয়া উঠিয়াছিল। তখন কি অন্ধকার ছিল? বাঙ্গালী 'প্রেতেরা' তখনও বুঝি জাগে নাই? শ্মশান জলিয়া উঠিল—দুর্দ্দাম পদ্মা গর্জ্জিয়া তরঙ্গ তুলিল,—অদূরে ভীষণ প্লাবনে তীরতরু ধ্বসিয়া পড়িল—তখন কি

"—অকস্মাৎ রজত-জ্যোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!"

মহাব্যোমে অন্ধকার,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ। সেই অন্ধকারপথে কাহার, ললাট-নেত্র ঝলসিয়া উঠিল,—মহাকাল কাহাকে লইয়া অন্তর্ধান করিল।

কেহ কি গাহিল?—

"গাও মরণের জয় গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হ'তে কে আসিলে
শুনাও ভৈরবকণ্ঠে সে ভূত-বিজ্ঞান!
মড়ার মাথার খুলি, বাজাও সকলে তুলি,
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পমান!
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
গাও হে ভৈরবকণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান!"

আজ ৩৪ বৎসর পরে, পদ্মার 'শ্মশানঘাটে' আর কেহ কি এই ভৈরবকণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিল? সাহিত্য-শ্মশানে এই ভৈরব নৃত্যের পুনরভিনয় আবার কতদিন পরে সারা বঙ্গ 'কম্পমান' করিবে?*

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

"নারায়ণ" হইতে সংক্ষিপ্ত সার।

* আমরা আরও শুনিয়াছি যে, যে মাসে কবির মৃত্যু হইয়াছে—সেই মাসে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি মাত্র ৮ বেলা ভাত খাইতে পারিয়াছিলেন—অবশিষ্ট দিনগুলি চিঁড়া ও লবণ খাইয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। লেখক।

স্বপ্ন-ভঙ্গে।

প্রিয়াহারা শূন্যপুরী ; স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ কবি-গৃহকোণ—
সত্য, না এ স্বপ্নবাণী ? ক্ষণকাল ভাবিবারে দাও ;
না লইয়া অনুমতি কভু তো সে যায়নি কোথাও
তবে আজ অকস্মাৎ ছেড়ে যেতে কেন হল মন !

করেছি কি অপরাধ ? কৈ, কিছু পড়ে না তো মনে !
শোধ কি দিয়েছি তার বুকভরা প্রণয়ের ঋণে ?
যত ভাবি—মনে হয়, সকলি রহিয়া গেছে বাকী
ঋণ পাশে বাঁধি মোরে সে কি কভু দিতে পারে ফাঁকি !

কোথা দিয়ে কি যে হ'ল—হিসাবে তো মিলিল না কিছু ;
বিনিদ্র-নয়নে তবে লেখা-লেখা-খেলা কেন আর ?
উপাড়ি' মগজ হ'তে রাশি রাশি উপমার ভার,
চল্ কবি, ছাদে বসি' মনোরথে মরণের পিছু।

দিগন্ত ভাসিয়া যায়　　জ্যোৎস্না-ধরায় ;
　　ভুলে গেছি কোথা তার শেষ
অবাক দাঁড়ায়ে আছি ;　হৃদয়ের কাছাকাছি
　　কি যে কাঁপে—নাহি তার ঠিকানার লেশ !
সহসা কি নড়ে গেল, কে যেন রে সরে গেল,
　　ভেঙে গেল জেগে-জেগে-ঘুম ;
তরুলতা চারিধারে ফুলি' ফুলি' উঠিল কাঁদিয়া
হৃদয়-পাষাণে রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাসে চকিতে ঘা দিয়া
গুমরি' উঠিল যেন জ্যোৎস্না-স্নাতা যামিনী নিঝুম !

শান্ত হও স্নেহময়ি, নিশীথ-প্রকৃতি অয়ি !
　　বুঝিয়াছি—কিন্তু কেন শোক ?
আমারে একাকী হেথা ক্ষণকাল দাঁড়াইতে দাও ;

মুক্ত এই গৃহ-ছাদ
নয়ন জলের ফাঁদ
এখানেও কেন আর পেতে দিতে চাও—
আমি যদি কাঁদি—ছি ছি—বলিবে কি লোক !

* * * * *

অশ্রু ? সে তো বহুকাল চুকেবুকে গেছে সই
এখন যে হাসিবার পালা ;
বিজ্ঞ ওষ্ঠপ্রান্ত হ'তে ছুটিয়াছে তীক্ষ্ণ হাস্য
মর্ম্মে মর্ম্মে বিতরিয়া তপ্ত তীব্র জ্বালা ;
এ শুভ সময়ে প্রিয়া তোমার বিয়োগ নিয়া
কাঁদিবার অবসর কই ;—
কাঁদিব ? বল কি সখি !
অদৃষ্ট যদ্যপি করে মারাত্মক ভুল,
বিদ্রূপের অশনিরে খামকা ছড়াতে বলে
শিশিরার্দ্র স্নেহ-শুভ্র ফুল—
সত্য করি বল দেখি তবে
বাতুল সে অদৃষ্টই পরিহাসযোগ্য কিনা ভবে ?···
না, না, অশ্রু—দূরমপসর ;
ধর প্রিয়ে, প্রণয়ের পুরস্কার ধর
—অশ্রু নহে, জমাট বরফ
স্বহস্তের পরিস্কার সরল হরফ—
"মরিয়াছ—বাঁচায়েছ মোরে,
চলুক অবাধ হাস্য কিছুকাল ধরে।"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

ভবানীপুর তীর্থে।

—:*:—

ভবানীপুর হিন্দুদিগের একটী পীঠ স্থান। এখানে দেবীর বাম গুল্‌ফ পতিত হয়। উহা বগুড়া হইতে অনুমান বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকাপথে করতোয়া দিয়া একেবারে ভবানীপুরের ঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তবে বেশী বর্ষা না হইলে চান্দাইকোণা হইতে পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে অথবা গো-যানে যাইতে হয়।

বহুদিন হইতে একবার ভবানীপুর বেড়াইতে যাইব ইচ্ছা ছিল কিন্তু কখনও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে একদিন দুর্গা বলিয়া বাহির হইবার মনস্থ করিলাম। এদেশে স্থলপথে একমাত্র গো-যানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যান। তাহারই বাবস্থা করা হইল। রাত্রি ১১ঘটিকার সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গো-যানে আশ্রয় লইলাম। বিশ মাইল পথ,—যান গড্ডালিকা সুতরাং মধুর ঝাঁকুনিতে অন্ততঃ আয়ুর অর্দ্ধেকটা কমিয়া যাইবে এই ভয়েই ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, শকটচালক বিচালি বিছাইয়া যথাসম্ভব আরামদায়ক শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তবু রক্ষা!

একে অমাবস্যার নিশি, তদুপরি আবার পথে ব্যাঘ্রভীতি ও তস্করের উপদ্রব সুতরাং নিদ্রা মোটেই হইবার আশা ছিল না। এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই মুষলধারে বারিবর্ষণ ও মাঝে মাঝে বজ্র নির্ঘোষ হইতে লাগিল। হঠাৎ দেবরাজের এরূপ সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল বলাই বাহুল্য। যাহা হউক অতিকষ্টে ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রভাতকালে সেরপুরের ডাকবাঙ্গলায় পৌছিলাম। সেরপুরে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস। স্থানটীর চতুপার্শ্বে জঙ্গল, পথ ঘাটগুলিও অতি কদর্য্য অথচ এখানে একটী মিউনিসপ্যালটী বর্ত্তমান! লোকগুলির চেহারা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত। থানা, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টঅফিস হাইস্কুলও আছে! আয়োজনের ক্রটি নাই—ক্রটি কেবল বোধ হয় লোকের!

সেরপুরে তাড়াতাড়ি স্নানাহারাদি সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার গো-যানে আরোহণ করিলাম। সেরপুরের সরভাজা ও রাঘবসাই অমৃত! ভবানীপুর, সেরপুর হইতে চারিক্রোশ মাত্র ব্যবধান। যাত্রীগণের যাতায়াতের নিমিত্ত পূর্ব্বে একটী "জাঙ্গাল" ছিল; এক্ষণে বগুড়ার বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ যত্ন ও উদ্যোগে ঐ অপ্রশস্ত জাঙ্গালটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। পথটীর বিশেষত্ব,—একেবারে সরল ও বর্ষাকালেও কাদা হয় না! পথের দুধারে লোকালয় নাই—স্থানে স্থানে কাচৎ দুই একটী বুনো সাঁওতালের বসতি দৃষ্ট হয়।

বেলা প্রায় ৩টার সময় ভবানীপুরে পৌছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দেবীদর্শনে যাত্রা করিলাম।

পথে একটী শুভ্রকেশ বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল, বৃদ্ধ আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল। এবং তাহার নিকট হইতে ভবানীপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী শুনিলাম।

ভবানীপুরের অনতিদূরেই গোবিন্দপুর গ্রাম। গোবিন্দপুরে একজন কৃতবিদ্য শাস্ত্রাধ্যায়ী সৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের একটী পয়স্বিনী গাভী ছিল। গাভীটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা হেতু একটী বালক ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। উপর্য্যুপরি দুই দিবস দোহনকালে গাভীর একটুক মাত্র দুগ্ধ না হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। বালকও দুগ্ধ না হওয়ার কারণ অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া হতভম্ব হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে বালক, গাভীটি লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল এবং উক্ত ঘটনার কারণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত একটী অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গাভীটির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সে দেখিতে পাইল গাভীটি দ্রুতগতিতে আসিয়া একটী বিল্ববৃক্ষতলে দাঁড়াইল এবং দাঁড়াইবা মাত্র তাহার স্তন হইতে আপনা-আপনি দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় আসিয়া দেখিল স্থানটী প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ও মসৃণ এবং তথায় দুগ্ধের চিহ্ন মাত্র নাই; দেখিয়া বালকের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিল না। সায়ংকালে বালক, প্রভুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু মনোহর চক্রবর্ত্তীও তৎপর দিবস স্বয়ং বালক-বর্ণিত ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবমূঢ় হইলেন। বহু চেষ্টাসত্ত্বেও এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোনই সমাধান করিতে পারিলেন না। কিছুদিবস পরে একটী ঘটনায় সমস্তই তাঁহার পরিস্ফুট হইয়াছিল।

একদা চাটমোহর থানার অন্তর্গত ডেঙ্গলচড়া নিবাসী জনৈক শঙ্খবণিক ভবানীপুরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে একটী পুরাতন পুষ্করিণীতটে উপনীত হয়। ধূলাখেলারতা এক অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকাকে এই শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জ্জন বনভূমিতে দেখিয়া বণিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। বালিকা, বণিককে দেখিয়া শাঁখা পরিধান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বণিক তৎক্ষণাৎ বালিকার কোমল বাহু যুগলে শাঁখা পরাইয়া দিয়া মূল্যের নিমিত্ত তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। বালিকা, বণিককে মনোহর চক্রবর্ত্তীর নিকট গমন করিয়া মূল্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।

নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ, জনমানবহীন, হিংস্রজন্তু সমাকুল বনপ্রদেশে বাপীতটে তাঁহারই কন্যা শাঁখা পরিধান করিয়াছেন ও মূল্যের নিমিত্ত বণিককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বণিক সমভিব্যাহারে জলাশয়তটে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় বালিকার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, শুধু কেবল ধূলাখেলার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, তিনি অধৈর্য্য হইয়া শিশুর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তের করুণ ক্রন্দনে করুণাময়ীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল এবং সরসীবক্ষে শঙ্খালঙ্কৃত বাহুযুগল কমলকোরক সদৃশ বিকশিত হইয়া উঠিল।

বণিক এতকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এইক্ষণ উভয়ে "মা" "মা" বলিতে বলিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ সেই হইতে বালিকার উদ্দেশ্যে তপ জপাদি আরম্ভ করিলেন এবং প্রায় পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হইলে স্বপ্নযোগে বিল্বমূলে পীঠের অস্তিত্ব অবগত হইলেন ও পূজার্চ্চনা করিবার আদেশ পাইলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা ও প্রতি সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া, অগুরু মিশ্রিত পূত গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করিতেন।

একদা মোগল সুবাদার মীরজুমলা দিল্লী যাইবার পথে সায়ংকালে এই ভবানীপুরের ঘাটে নৌকা নঙ্গর করেন। সুবাদার করতোয়ার নির্জ্জন বনপ্রদেশে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া কারণ অন্বেষণে একজন অনুচর প্রেরণ করেন। সুবাদার কয়েকটী কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া বন্দীভাবে দিল্লীতে গমন করিতেছিলেন। যখন অনুচর প্রত্যাগমন করিয়া বনভূমির সমুদয় ঘটনা ও জনশ্রুতি নিবেদন করিল, তখন সুবাদার একাগ্রমনে দেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস সহ প্রশান্ত মনে অন্তরের ব্যথাগুলি দেবীর উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিলেন। নৌকাপথে প্রায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল, দিল্লী পৌছিতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে।

সুবাদার স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িতেছেন এমন সময় একদিন প্রভাতে জনৈক পত্রবাহক সম্মুখীন হইয়া সম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্রাটের একখণ্ড পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

পত্রে সম্রাটের প্রসাদলাভ ও পূর্ব্ববঙ্গের শাসন ভার পুনঃপ্রাপ্তির বিষয় লিখিত ছিল। সুবাদার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন।

এবার ভবানীপুরের ঘাটে পুনরায় নৌকা নঙ্গর করিয়া লোকজন সমভিব্যাহারে পুরী প্রবেশ করিয়া সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিলেন এবং দেবীর ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া দেবীর সেবা-পূজার অভাব মোচনার্থ "ভবতোয়া" গ্রামটী "ভবানীথানে" অর্পণ করেন ও বিপুল অর্থব্যয়ে "যোড়বাঙ্গলা" নাম একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীর অপর নাম ভবানীথান, ভবানীথান হইতে দেবীর নাম ভবানী হইয়াছে, এবং দেবীর ভবানী নাম হইতে "ভবতোয়া" গ্রাম ভবানীপুর নামে অভিহিত।

মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সাঁতইলের অধিপতির করে সমর্পণ করেন। প্রাক্তনের ফলে তিনি অল্পদিন মধ্যেই সাঁতইলের অধিপতি নাটোর রাজাধিরাজের হস্তে দেবীর বিষয়-সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। নাটোরাধিপতি রামজীবন রায় বাহাদুর, নাটোর রাজকুলবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী ও তৎকন্যা তারাসুন্দরী এবং পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর পুরীর মধ্যে বহুমূর্ত্তি স্থাপন, মন্দির নির্ম্মাণ ও দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখনও দেবীর সেবাপূজা, বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নাটোরাধিপতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

ভবানীপুর গ্রামটী পুণ্যতোয়া করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু অধুনা ভবানীপুর হইতে করতোয়া প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত। গ্রামে সামান্য কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, নাপিত ও কুম্ভকার প্রভৃতির বাস। গ্রামের মধ্যভাগে দেবীর মন্দির; উহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর পরিবেষ্টিত। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটী প্রবেশদ্বার। পূর্ব্বদিকের প্রবেশদ্বারটী ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। পুরীর মধ্যে শুদ্ধমনে শুদ্ধভাবে ও নগ্নপদে প্রবেশ করিতে হয়। কথিত আছে;—জনৈক ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবীর মাহাত্ম্য স্বীকার না করা হেতু তাঁহাকে রাত্রিকালে কোনও অদৃশ্য ভীমদেহীর হস্তে দন্ত দুইপাটি হারাইতে হইয়াছিল।

পুরীর ভিতরে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে অট্টালিকাগুলি নাকি অতি মনোরম ছিল, কিন্তু ১২৯৫ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে সবগুলি ভগ্ন হইয়াছে। ভিতরে দুইটি অঙ্গন—দক্ষিণ অঙ্গনে দেবীর মন্দির, শিবমন্দির, নাটমন্দির, গোলাঘর ও কয়টী ভগ্ন অট্টালিকা। উত্তর অঙ্গনে রন্ধনশালা ও ভোজন-গৃহ। প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্বকোণে কাছারী বাড়ী। এখানে নায়েব প্রভৃতি ৭।৮ জন কর্ম্মচারী দেবীর বিষয়-সম্পত্তির আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। ইহার পূর্ব্বদিকে নায়েব মহাশয়ের থাকিবার বাসস্থান, পশ্চিমদিকে বিদেশবাসী যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান। কাছারী-বাড়ীর দক্ষিণে বাজার,—বাজারে মোট আটখানি দোকান, তন্মধ্যে চারিখানিতে ডাল, চাউল, চিঁড়া, গুড় ও অপর চারিখানিতে চিনি, বাতাসা ও ক্ষীর-তক্তি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য পাওয়া যায়। ভবানীপুরের ক্ষীরতক্তি অতি প্রসিদ্ধ। বাজারের পূর্ব্বভাগে আনন্দবাগ। আনন্দবাগে প্রতি রবিবারে ও বুধবারে হাট বসিয়া থাকে।

পুরীর ভিতর উত্তর পার্শ্বে দেবীর মন্দির, মন্দির মধ্যে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দিরের পশ্চিম প্রান্তের একটী প্রকোষ্ঠে একটী যজ্ঞকুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। নাটোররাজ রামজীবন রায় বাহাদুর এই কুণ্ডটী তাঁহার নিজ হস্তের পরিমাপে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১×১ হাত, নির্ম্মাণ করেন। বিশেষত্ব এই যে তাঁহার এক হাতের পরিমাপ আঠার ইঞ্চের দুইহাতের তুল্য।

দেবীমন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে "বারদুয়ারী" নামে একটী মন্দির। মন্দির মধ্যে নাটোর রাজবংশের কুলবধূ রাণী ভবানীর স্থাপিত "ভবানীশ্বর" নামে শিবমূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরটী ভূমিকম্পে ভগ্ন হইলেও এককালে যে ইহার গঠনপ্রণালী অতি মনোরম ছিল তাহা দৃষ্টি মাত্রেই অনুভূত হয়। রাণীভবানীপ্রদত্ত শিবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে শিবের পূজা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

পুরীর উত্তর প্রান্তের প্রাচীরের বহির্ভাগেই অতি পুরাতন "শাঁখারু" বা শাঁখা পুকুর। এইখানেই দেবী বালিকাবেশে শাঁখা পরিধান করিয়াছিলেন।

পুরীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটী অতি পুরাতন বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—এই অশ্বত্থ বৃক্ষই আরোহণ করিয়া বালক, গাভীটির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

মন্দিরের পূর্ব্বভাগে "বেলবরণ" নামক একটী বিল্ববৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নভাগে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপান। প্রত্যহ এই বিল্বমূলে পূজা, ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। এই বিল্ববৃক্ষতলেই দণ্ডায়মানা গাভীর স্তন হইতে বালক, দুগ্ধধারা নির্গত হইতে দেখিয়াছিল।

পুরীর উত্তরাংশে শিববাটী। শিববাটী "কুমার" নামক পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে অবস্থিত। শিববাটীর পূর্ব্বধারের মন্দিরে "তারকেশ্বর" শিবের মূর্ত্তি স্থাপিত। রাণীভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নামের পরিচয়স্বরূপ এই মূর্ত্তির নাম "তারকেশ্বর" কিন্তু ভূমিকম্পে তারকেশ্বর অঙ্গহীন হইয়াছেন।

পশ্চিম পার্শ্বে পাগলি মায়ের মন্দির। ইহার অপর নাম "ত্রিমুণ্ডি" অর্থাৎ গোমুণ্ড, ব্রাহ্মণমুণ্ড ও জারজমুণ্ড ইহার নিম্নভাগে প্রোথিত আছে। সাধক রাজা রামকৃষ্ণ এই ত্রিমুণ্ডি আসনে "শবসাধনা" করিতেন।

কুমার পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে একটী তেঁতুল বৃক্ষতলে অপর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত "পঞ্চমুণ্ডী" আসন। পঞ্চমুণ্ডি আসন যে সমস্ত উপাদানে প্রস্তুত তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। ২টী চণ্ডালমুণ্ড, ১টী শিবামুণ্ড, ১টী সর্পমুণ্ড, ১টী বানরমুণ্ড তন্ত্রোক্তপ্রক্রিয়ায় পরিশোধিত হইয়া এক একটী আসনের নিম্নভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহারাজ-স্থাপিত এইরূপ অপর চারিটি পঞ্চমুণ্ডি আসন, পুরীতে সাধকদিগের তপস্যার নিমিত্ত সংরক্ষিত আছে। পুরীর যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে একটী, পুরীর পশ্চিমধারে একখানি করোগেট্ টিনের ঘরের মধ্যে একটি, পুরীর দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে জলটঙ্গী নামক পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরস্থ বাঁধাঘাটের উপরে একটী, আনন্দবাগের পূর্ব্বদিকে কেলিকদম্ব বৃক্ষতলে একটী, রাজা রামকৃষ্ণ এই সকল আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবীর সাধনা করিতেন। শেষোক্ত আসনটীর বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য উপাদান ছাড়াও একটী কুমারীর শবদেহ ইহার মধ্যভাগে সন্নিবেশিত।

অনেক নির্ম্মল-হৃদয় সাধুসন্ন্যাসী এই সমস্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আবার অনেকে বিভীষিকা দর্শন করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন।

আনন্দবাগটী বড়ই মনোরম স্থল। এখানে রাশীকৃত বকুল বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ থাকায় ইহাকে প্রকৃতিরাণীর বিহারস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আনন্দবাগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, বকুল ফুলের সুবাসে প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার হয়, হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

পুরীর পূর্ব্বভাগে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাঁতইলের অধিপতির কীর্ত্তি।

রাণী ভবানীও ভবানীপুর হইতে চোর্গা পর্য্যন্ত অপর একটী সরল পনর মাইল দীর্ঘ জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া যাত্রীগণের পথকষ্ট নিবারণ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে দেবীর সেবাপূজার বন্দোবস্তের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা রামকৃষ্ণ নিত্য বলির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। দেবীর ভোগে প্রত্যহ বোয়ালমৎস্য, বুটের শাক ও তাল প্রদত্ত হয় এবং দেবীর এমনই মাহাত্ম্য যে এসমস্ত দ্রব্য প্রত্যহই যে কোন প্রকারেই হউক পাওয়া যায়। দেবীর সেবাপূজাদি নিত্যকর্ম্ম নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইবার জন্য পুরোহিত, পণ্ডিত, খাঁড়াইত প্রভৃতি ৬০ জন দাসদাসী নিয়তকাল নিযুক্ত থাকে। চাকী মহাশয়েরা বংশপরম্পরায় দেবীর বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশধরেরাই বংশপরম্পরায় দেবীর পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। পুরোহিত মহাশয়ের অশৌচ প্রভৃতি কারণে মাঝে মাঝে দেবীর সেবাপূজা বন্ধ থাকে, কারণ দেবীর দেহ স্পর্শ করিবার অধিকার অন্যের আদৌ নাই। যিনিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন তিনিই বিপন্ন হইয়াছেন। দেবীর সেবাপূজার কোনও ত্রুটী ঘটিলে দেবী তাহা স্বপ্নযোগে রাজগুরু বা রাজপুরোহিতের গোচর করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া থাকেন। অনেকবার নাকি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে দেবী অর্পণারূপে বিরাজিতা।

পুরী দর্শনান্তে দেবীর চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া নিজকর্ত্তব্য সম্পাদনে গমন করিলাম। ফিরিবার পথে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই তবে কেবলমাত্র গাঁড়ুদহের জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে ব্যাঘ্র মহাশয়ের ডাক শুনিয়া একটু ভীত ও বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। সঙ্গে যে দুইটী সাহসী হিন্দুস্থানী বীর ছিলেন, তাঁহারা বিড়ালছানার ন্যায় গাড়ীর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, আমারও তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসি আসিল—যদিও আমার নিজের সাহসের অবস্থাও তখন বিশেষ সঙ্গীন। যাহাহউক ভবানী মাতার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে বগুড়া আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

শেষ।

—ঃ*ঃ—

আর কেন ? ফুরায়েছে। শান্ত কর রুদ্র ! রোষানল,
নাহি আর অংসেতে তোমার
স্বাধীনতা-সতীদেহ, গতপ্রাণ হেরি অত্যাচার—
(যে তারে জনম দিল সেই চাহে করিতে সংহার)।
হের কি বিকৃত-মুখ দক্ষ ঐ করে পলায়ন,
সঙ্গী যত জর্জ্জরিত ; নির্ব্বাপিত যজ্ঞের ইন্ধন।
চেয়েছিল যজ্ঞাগারে একেবারে যার নির্ব্বাসন,
বিষ্ণুচক্রে তার দেহ দশদিকে পতিত এখন,
স্বাধীনতা-মহাপীঠ কতদিকে হয়েছে গঠন।
হে ভৈরব ! আর কেন ? ধ্যানে এবে হও নিমগন,
অচিরে লভিবে উমা, তপস্যায় রত সে এখন ॥

বুঝেনি তখন মূঢ়, হেরি ধীর তোমার মূরতি
ধ্যানে মগ্ন অচল অটল,
কি শক্তি তোমার মাঝে লুক্কায়িত, উৎস ঝটিকার
সুপ্ত যেন। মুক্ত হলে ত্রিভুবনে উঠে হাহাকার।
শ্মশান-আলয়, অঙ্গে ফণী আর বিভূতি বিলাস;
তারই সনে সতী রাজে, প্রাসাদেতে নাহি তার বাস।
স্বাধীনা সে, হোক্ তুচ্ছ, নিজের ত আবাস তাহার,
তারই মাঝে গড়িয়াছে কি সুখের আবাস ভোলার।
চাহেনি সে নিজে নিমন্ত্রণ,
নিজেচ্ছায় উপেক্ষিলে যজ্ঞে নাহি সম্ভাষি যখন
তখনো ত' নির্ব্বিকার—কিন্তু শুনি সতীর মরণ
জাগিল শ্মশানবাসী। কি প্রলয় করিল সৃজন ॥

এমনই একদিন জর্জ্জরিত শত অত্যাচারে
ছাড়ি ঘোর গভীর হুঙ্কার
ফরাসী জাগিয়াছিল, নির্ব্বাপিত একটি ফুৎকারে
যাহা কিছু গৌরবের তার।

এটক্ত সেদিন পুন টলমল বিশাল রুধিয়া,
এখনও আবেগে তার থাকি' থাকি' উঠিছে কাঁপিয়া
নিরন্তর উৎপীড়ন ন্যায় ধর্ম্ম দলি' যেইখানে,
প্রলয় বিষাণে তারা সচেতন হোক্ মানে মানে
　　ভাবি মনে স্বভাব ভোলার
মুহূর্ত্তে জ্বলিতে পারে সে নয়ন-অনল-আধার ॥

থাক্ —আজ বায়ু বহে তাহাদের গৌরব-কাহিনী
ন্যায়ের পতাকা ধরি' প্রাণপণ করেছে যাহারা,
সর্ব্বস্ব করিয়া দান ভাঙ্গিয়াছে কংসের সে কারা।
জয়, জয় তাহাদের। এস বিষ্ণু সাজিয়া মোহিনী
মন্থনের অবসানে সুরাসুরে অমৃতের লাগি'।
রুধির করিয়া পান ছিন্নমস্তা তৃপ্ত হল আজি;
আর নয়—কমলা গো ধরামাঝে কর মা বিরাজ ॥

এসেছে দীপালি তিথি। সাজা ওরে সাজা দীপমালা
এ নয় পূর্ণিমা নিশি, রাস, দোল অথবা ঝুলন
ঘোর অমাবস্যা মাঝে ভীষণারে এ যে আবাহন
মুণ্ডমালা গলে শোভে, এ যে কালী। শোণিতের থালা
পাপ-পশু বলি করি' সম্মুখেতে কর সমর্পণ।
জগৎ শ্মশান এবে—তার মাঝে লয়ে বরাভয়,
ভয়ঙ্করী ভীমা আজি আসিয়াছে হইয়া সদয়।
নামায়ে কৃপাণ রাঙা, (তৃষ্ণা ত মা মিটেছে এখন,)
দে মা দে জগতে শান্তি, কৃপাকণা করি বিতরণ ॥

''সিদ্ধি' রচয়িতা।

সাড়া

সেকালে হইত দৈত্য-দেবতায় নিত্য যুদ্ধ, আর একালে তোমার আমার মত মানুষই দেবতার প্রতি নিয়তই খড়্গহস্ত। সেকালে আসুরিক মায়ার খ্যাতি ছিল, একালে মানবের অসরলতা ও কপটতা তদপেক্ষা কম প্রসার লাভ করে নাই। ধর্ম্মের প্রকাশ কার্য্যে—মহৎভাবের অনুষ্ঠান ক্রিয়াতে—আমাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের ভিত্তিও —বলিতে দুঃখ হয়—প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ঐ কপটতায়—অতি দ্রুত, এই বাষ্পীয় শকটের যুগে আমরা উন্নীত হইতেছি তথা-কথিত উন্নত-সভ্যতায়! সভ্যতার নামে স্বার্থের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলি দিতে চাহিতেছি অন্যকে—কিন্তু বিধাতার অখণ্ড নিয়মে বলি হইতে হইতেছে আমাদের নিজকে—নিজের মনুষ্যত্বকে—ফলে মায়াবিনী এই দানবীর প্রশ্রয় দিয়া দেশে ধর্ম্মের নামে কি অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়া—নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি—মরিতেছি নিজে ও মারিতে চাহিতেছি দেশকে—জাতিকে—ভবিষ্যৎকে। সত্যের পথ কি তবে সরল নহে?

এক্ষণে আর সত্যসিংহের রাজোচিত বিশাল গম্ভীর উদার রব এ হতভাগা দেশে উত্থিত হয়না—প্রাচ্যের মহাবিদ্যা আজ অজ্ঞানিত গিরিগহ্বরে আবদ্ধ থাকায় প্রতীচ্যের ঈষপের গল্পের সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শনেই আমরা এত মুগ্ধ ও চকিত যে উহার চীৎকার ধ্বনিকে পশুরাজ-গর্জ্জন জ্ঞানে আমরা অসত্য গর্দ্দভকেই অম্লানচিত্তে সর্ব্বপ্রকার পূজাদান করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ এ মহাদেশকে অবনতির চরম সীমায় আনয়ন করিয়াছি। সত্যই মনে হয় এই কি সেই দেশ—যে দেশের রাজা রামচন্দ্র—রাজা হরিশ্চন্দ্র—সত্য পালনের জন্য কি না করিয়াছিলেন—যে দেশে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সত্যের জন্যই বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্য আদি সর্ব্বত্যাগী—যে দেশে বর্ত্তমান যুগেও গুরুগোবিন্দ ও রামমোহন কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে আধুনিক যুগসত্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন—যে দেশের নারী সীতা ও সাবিত্রী জগন্মান্যা—যে দেশের ফুল্লরা ও বেহুলা অতুলনা রত্নদীপসদৃশা?—আর এই বাহ্যচাক্‌চিক্যময় আত্মসুখরত প্রবঞ্চকেরাই কি তবে ইঁহাদের বংশধর?

বালক চিরকালই সরল,—সত্যযুগেও যেমন, কলিতেও তেমন,—আজ যদি কোন বালক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই আবরণ-চর্ম্ম ঈষৎ টানিয়া ফেলিতে চায় তবে আর কি রক্ষা! অমনি আমরা বৃদ্ধের দল 'দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল, নীতি গেল, বেয়াদবীর চরম' প্রভৃতি অরাও-কত-কি-আখ্যানে ও চীৎকারধ্বনিতে তাহাদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়া আবার সেই হতভাগ্যদের—সেই কোমল মতি বালকদিগের জাতিচ্যুত ও নানা প্রকার নির্যাতনের ব্যবস্থা করি—প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্তি অঙ্কুরে বিনাশ করিয়া তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ হই। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতই ক্ষীণ হইয়া আসে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়া, ভাবি আমরা চির চক্ষুষ্মান্—দৃষ্টি আমাদের সর্ব্বত্র —সর্ব্বদর্শী আমরা! মোহ ভ্রম আর কাহাকে বলে?

শুনিয়া আসিতেছি যুগে যুগেই নাকি সাধুর পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতদিগের শাস্তি ব্যবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব হয়—ঐ বিশ্বাস কি অসত্য? —মনুষ্যবিশেষে অবতারের আবির্ভাব—অত্যাচার নিবারণে দেবশক্তির বিকাশ —এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানিতে না হয় সে অন্যকথা—কিন্তু তিনি যে ভাবরূপে মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে স্বপ্রকাশ, প্রকটিত হইতেছেন।—তাহা কি অস্বীকার করিবার? যাহা আসিয়াছে—যাহা এ যুগের দান—তাহার প্রতিরোধ

সম্ভব কি? সে ভাবের জয় হবেই—ভাবের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনীর মিলনে মন্দাকিনীর প্রশস্ত ও পবিত্র ধারার সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিতেছে—তাহার ফল নিশ্চয়ই শুভ;—সে শুভ ফল, ধর্ম্মজগতেও আসিয়াছে—অতএব কপটাচারী সাবধান—যদিও সরল-বিশ্বাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বার্থসিদ্ধিতৎপর হইয়া ভাবিতেছ—কৃতার্থ তুমি—বড়ই চতুর—কিন্তু ও-চতুরতা আর কতদিন—দেবতার আশীর্ব্বাদে ও-দিনের শেষ—'তুক্তাকের অবসান—অতি দ্রুত হইবে নিশ্চিত।

হে সত্যসেবী বালকবালিকা, যুবকযুবতি—ভবিষ্যতের আশা তোমরা—হে সত্যসেবী বৃদ্ধবৃদ্ধা—এস আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে রবিকরস্পর্শে দেশের সমগ্র নরনারী একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের জন্যই প্রাণপণ করিয়া ঘরে ঘরে সরলতার ও পবিত্রতার জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি—সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্যরূপ শক্তি-সংঘের সৃষ্টি করি। রিপু-বিকার-বর্জ্জিত সংযত ও শুদ্ধ মন ও দেহে যে মহাশক্তির পূতাগ্নির সঞ্চার হইবে তাহাতেই কপটাচার ও কুসংস্কারের কুৎসিৎ আবর্জ্জনাদি সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে—তখন সেই সমবেত মহাশক্তি নবযুগের নব জাগরণের জাহ্নবীর পবিত্র ধারায় সমগ্র দেশকে এক নব সৌন্দর্য্যে ও শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া এক বিশুদ্ধ স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় জগতের সমক্ষে প্রতীয়মান হইবে—তখন একমনে ও একসঙ্কল্পে জগতের কল্যাণ-কামনায় ভারতের আদর্শ কৃষক ও বণিক, আদর্শ শিক্ষক ও ছাত্র, আদর্শ উকীল ও মোক্তার, আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার ও কারিকর, আদর্শ বক্তা ও গ্রন্থকার, আদর্শ বিচারক ও বিজ্ঞানবিদ্, আদর্শ ধনবান ও নির্ধন,—এক কথায় দেশের সকলেই এক হইয়া নিজ নিজ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের সম্ভাব্য শক্তি সমুদয় আহরণ করিয়া বিপুল মত্ততা ও অসীম ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত 'ন্যায় ও সত্যের' বিজয় পতাকার নিম্নে সগৌরবে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব সৌভ্রাতৃত্বে ও প্রেমে সুমধুর ঐকতানবাদ্যে ও কণ্ঠে এক সুমহান্ বাণী প্রচারে আবার এই মোহাচ্ছন্ন পতিত জাতিকে উন্নতির হিমাদ্রিশিখরে উত্তোলন করিয়া জগতের পূজ্য ও অনুকরণীয় করিবার সুযোগ আসিয়াছে। হৃদয়ে হৃদয়ে সাড়া দিয়াছে,—গ্রহণ কর। ধন্য হও বড়র বংশধর তোমরা—সেই স্মৃতিতে আত্মহারা না হইয়া সেই স্মৃতির গৌরব-মহিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী বিবিধ উন্নতিতে উন্নত হও। কে আজ অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া বলিতে পারে,—"তুমি পুরাকালের ক্রিয়া-কাণ্ডকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় মনে কর—উহাতেই এ দেশে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির আবির্ভাব করিয়াছিল—উহাই আমাদের পথ।" সত্যই তাই কিন্তু তাঁহাদের ঋষিত্বের মূলে আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম নয়—কর্ম্মের মূলতত্ত্বই তাহাতে অমর,—সে মূলতত্ত্ব আজও তোমার হৃদয়ে কর্ম্ম করিবে—অন্য দেশের লোকের অপেক্ষা—এই ভারতের মাটীর মানুষ তুমি-তোমাতে তাহার অস্তিত্ব অনেক বেশী—সেই মহান্ উদ্দেশ্য—প্রতিষ্ঠাই ভগবানের কার্য্য ভাবিয়া, তাঁহার সৃষ্টের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, স্বার্থে আপনার আত্মার মঙ্গল না ভুলিয়া, নবযুগধর্ম্মে অটল হইয়া, সংযমের বলে বলীয়ান হইয়া—অগ্রসর হও; ভারতে আবার ঋষির আবির্ভাব হইবে। আজ ভারতের যে মাটীতে—যে গুণে মহামতি ঋষিতুল্য এ যুগের আদর্শ গান্ধী ও ব্রজেন্দ্রনাথ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে—গুণ অনুপ্রাণিত হইলে গৃহে গৃহে ঋষির দেশে ঋষির আবির্ভাব নিশ্চিত—এ কল্পনা নহে, সত্য—শাস্ত্রের কথা—অতি সত্য।

-বৃদ্ধ।

বক্রকীট ব্যাধি।

বঙ্গদেশের অধিবাসীদের শতকড়া ৭০ এরও অধিক লোক এই রোগে ভুগিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে বাঙ্গালীর জড়তা, উৎসাহহীনতা এবং দৈহিক দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া মনে করেন।

ইংরাজীতে যাহাকে হুকওয়ারম ব্যাধি বলে, আমরা তাহাকে বক্রকীট ব্যাধি নাম দিয়াছি। এই কীটের দৈর্ঘ্য বড় জোর এক-তৃতীয় কি এক-চতুর্থ ইঞ্চি। মানুষকে আক্রমণ করিবার সময়ে এই হুক অর্থাৎ বঁড়শির মত বাঁকা হইয়া থাকে।

আমরা যাহা আহার করি তাহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে গমন করে। এই কীট ছোট অন্ত্রের উপরিভাগ বিশেষভাবে আক্রমণ করে। বঁড়শীর আকার ধারণ করিয়া কীট দেহের দুই অগ্রভাগ দ্বারা অন্ত্রের পরদা কামড়াইয়া ধরে ও রক্ত শোষণ করে। কীট ত একটি দুইটি নহে, দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া সহস্র সহস্র কীট রক্তশোষণে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্তহীন করিয়া ফেলিতে থাকে। ব্যাধিক্লিষ্ট ব্যক্তি ক্রমশঃ রক্তহীন হইতে থাকে প্রথমে সে নিজেকে রুগ্ন বলিয়াই মনে করে না। কিন্তু ক্রমে এই অনবরত রক্ত শোষণ ফলে রোগী এমন রক্তহীন হয় যে, তাহাদের চক্ষের কোণে রক্তচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, শরীর কাটিলেও গাঢ় রক্ত বাহির হয় না। তৎপর কীট যে স্থল আক্রমণ করে উহা খাইয়া ফেলে, সেই স্থলে একটা দাগ পড়িয়া যায়। এইরূপে অন্ত্র মধ্যে সহস্র সহস্র ক্ষত চিহ্ন জন্মে। অন্ত্র অক্ষত থাকিলে উহা খাদ্যদ্রব্য হইতে যেমন ভাবে রস শোষণ করিয়া দৈহিক পুষ্টির সহায়তা করিতে পারে, ক্ষত অন্ত্র তেমন পারে না। ফলে অজীর্ণতা জন্মে।

এই রোগ অতিদ্রুত পরিব্যাপ্ত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে মলত্যাগ করে উহার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ডিম্ব থাকে। সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু মল ধরে অণুবীক্ষণ দ্বারা উহাতে ১০।১৫টি ডিম্ব দৃষ্ট হইতে পারে। এই ডিম্ব পরে দুই অংশে, ক্রমে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া বিকশিত হইতে থাকে। ক্রমে আবরণ মধ্যে কীট জন্মে। কীট যতকাল বাহিরে থাকে ততকাল তাহার রক্ষার জন্য এই আবরণের দরকার। স্ত্রীকীট আকারে পুরুষ কীট হইতে বৃহৎ।

সরস জমির উপর মল পরিত্যক্ত হইলে এই কীট অতিদ্রুত জন্মিতে ও বাড়িতে পারে। কীটগুলি ঘাস বা পাতার তলদেশে থাকে।

যাহারা এই সকল স্থান দিয়া চলাফেরা করে, কীট তাহাদের অনাবৃত পদ বাহিয়া লোমকূপ বা ঘর্ম্ম নির্গমের ছিদ্র পথে দেহমধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশ স্থানে প্রায়শঃ চুলকানি হইয়া থাকে। মানবদেহে প্রবেশের পূর্ব্বে কীট বাহিরে আবরণ ত্যাগ করিয়া যায়। এই কীট কণ্ঠনালী, গ্রন্থি, ফুসফুস প্রভৃতি মানবদেহের সর্ব্ব অংশেই গমন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া যেমন অনিষ্টসাধন করিতে পারে অন্যত্র তেমন পারে না।

যেখানে সেখানে মল ত্যাগের দ্বারা এই রোগ ভীষণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়। সহরে ও পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই মলত্যাগের এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক যে, ময়লা যথারীতি দূরীকৃত বা প্রোথিত হয়। যে স্থলে মলত্যাগ করা হয় এমন স্থান দিয়া অনাবৃত পদে চলাফেরা করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সঞ্জীবনী।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ | পৌষ, ১৩২৫ সাল | ২য় সংখ্যা।

ত্রাতা।

—:*:—

বিপদে মধুর কর
কে তুমি গো সুন্দর ?
আঁধারে ফুটাও কে গো আলোর জ্যোতিঃ ?
আশার কিরণ ভাঙ্গি',
রামধনু রং রাঙ্গি
অশ্রুমণির দীপে চির আরতি !
শীতের বুকের মাঝে
জীবনের চির বাসা,
নবীন বসন্তে রাজে
চির প্রেম, চির আশা ;
মরণের নীড় হ'তে
ভাসাও জীবন স্রোতে
জীবনে মরণে ওগো চরম গতি !

সঙ্কটে দুর্দ্দিনে
তুমি পার কর তরী,
বেদনায় তোমা বিনে
কে লইবে ব্যথা হরি ;
দূর করি প্রহেলিকা
আঁক রবিকর শিখা,
দুর্গম পথে ওগো চিরসারথি !
সকল ভাবনা ভয়
কেটে যায় নিমেষেই,
কোন ক্ষতি কোন ক্ষয়
কোনখানে কিছু নেই ;
চিরসুখময় বেশে
তুমি আছ সব শেষে ;
তোমার চরণে লহ প্রাণ-প্রণতি ।

ঘটকর্পর।

—:*:—

বিক্রমাদিত্যের সভাস্থিত নবরত্নের নাম নিম্নলিখিত সর্ব্বজনপরিচিত শ্লোক হইতে অনেকেই অবগত আছেন :—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পরকালিদাসাঃ ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

এই শ্লোকটি "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম, কালিদাস। এই কালিদাস জগৎপ্রসিদ্ধ কালিদাস কি না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এবং নানা কারণে 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' গ্রন্থখানিকেও বিশেষ প্রাচীন বা প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না। সুতরাং উপরিলিখিত শ্লোকটি হইতে নবরত্নের অন্যতম রত্ন ঘটকর্পরের কালনির্ণয় করিবার প্রয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ঘটকর্পর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে বাইশটি মাত্র শ্লোকে রচিত ঘটকর্পর নামক একখানি কাব্য প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহার 'যমক-কাব্য' আখ্যা দিয়াছেন। এই কাব্য ব্যতীত ঘটকর্পরের অন্য কোন রচনা আছে কি না, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

এই বাইশটি শ্লোকের শেষ শ্লোকটিতে ঘটকর্পরের নাম আছে :—

"ভাবানুরক্তবনিতাসুরতৈঃ শপেয়ম্
আলভ্য চাম্বু তৃষিতঃ করকোশপেয়ম্ ।
জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥"

অর্থাৎ "তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অঞ্জলিপুটে জল লইয়া আমি যদি অন্য কোন কবি কর্ত্তৃক যমক রচনায় পরাস্ত হই তাহা হইলে আমি ঘটকর্পর (ভগ্ন ঘট খণ্ড) দ্বারা তাঁহার জল বহন করিব। প্রেমানুরক্তবনিতাসুরতের শপথ লইয়া ইহা বলিতেছি।"

"ঘটকর্পর" এই শব্দপ্রয়োগ হইতেই ঘটকর্পরকে এই শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাইশটি শ্লোকসমষ্টিও "ঘটকর্পর—কাব্য" আখ্যা লাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক শ্লোকটিতেই যমক নামক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ আছে। কবিও তাই শেষ শ্লোকে গর্ব্বভরে এই বিষয়ে নিজনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একই বর্ণসমষ্টির পুনরাবৃত্তি হইতে যমকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্বনাথ যমকের এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥"

[সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ]

মম্মট বলেন :—

"অর্থে সত্যর্থভিন্নানাং বর্ণানাং সা পুনঃশ্রুতিঃ।
যমকং পাদতদ্‌ভাগবৃত্তি তদ্‌যাত্যনেকতাম্ ॥"

[কাব্যপ্রকাশ, ৯ম উল্লাস]

এই পুনরাবৃত্তির বহুপ্রকার ভেদ হইতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল ঘটকর্পর যে প্রকারের যমক ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

ঘটকর্পর প্রতি শ্লোকের চার চরণের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়ের শেষ ও তৃতীয় ও চতুর্থের শেষ মিল করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটি এই :—

"নিচিতং খমুপেত্য নীরদৈঃ
প্রিয়হীনাহৃদয়াবনীরদৈঃ।
সলিলৈর্নিহিতং রজঃ ক্ষিতৌ
রবিচন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতৌ ॥"

মেঘ-গুলি আকাশে উঠিয়া আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বিরহিণীর হৃদয়ে যাতনা উৎপাদন করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃষ্টিধারায় পৃথিবীর ধূলি প্রশমিত হইতেছে।

তাহার পর এই শ্লোকগুলি আছে।

"হংসা নদন্-মেঘভয়াদ্ দ্রবন্তি
নিশামুখান্যদ্য ন চন্দ্রবন্তি।
নবাম্বুমত্তাঃ শিখিনো নদন্তি
মেঘাগমে কুন্দসমানদন্তি ॥"

অয়ি কুন্দের ন্যায় দন্তশালিনি! মেঘের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া হংসগুলি পলাইতেছে। নিশায় আর চন্দ্র দেখা যায় না। বর্ষার নূতন জলে আনন্দে মত্ত হইয়া ময়ূরেরা ডাকিতেছে।

"মেঘাবৃতং নিশি ন ভাতি নভো বিতারং
নিদ্রাভ্যুপৈতি চ হরিং সুখসেবিতারম্।
সেন্দ্রায়ুধশ্চ জলদোদ্য রসন্নিভানাং
সংরম্ভমাবহতি ভূধরসন্নিভানাম্ ॥"

নক্ষত্র বিলুপ্ত হওয়ায় রাত্রিতে মেঘে ঢাকা আকাশের আর শোভা নাই। সুখসেব্য নারায়ণ নিদ্রাগত। পর্ব্বতের মত সুবৃহৎ হস্তীগুলি ইন্দ্রধনুখচিত মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইতেছে।

"সতড়িজ্জলদোজ্ঝিতং নগেষু
স্বনদম্ভোধরভীতপন্নগেষু।
পরিধীররবং জলং দরীষু
প্রপতত্যদ্ভুতরূপসুন্দরীষু ॥"

আশ্চর্য্যরূপ সুন্দর পর্ব্বতসমূহের গুহায় বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ দ্বারা বর্ষিত জল ঘোররবে পড়িতেছে। মেঘের গর্জ্জনে সেখানকার সর্পগুলি ভয় পাইতেছে।

"ক্ষিপ্রং প্রসাদয়তি সম্প্রতি কোঽপি তানি
কান্তামুখানি রতিবিগ্রহকোপিতানি।
উৎকণ্ঠয়ন্তি পথিকান্ জলদাঃ স্বনন্তঃ
শোকঃ সমুদ্বহতি তদ্বনিতাস্বনন্তঃ ॥"

কেহ রতিকলহে ক্রুদ্ধ পত্নীর আনন শীঘ্র প্রসন্ন করিবার প্রয়াস করিতেছে। মেঘ সকল গর্জ্জন করিয়া পথিকগণকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। তাহাদিগের পত্নীগণের অসীম দুঃখোদয় হইতেছে।

"ছাদিতে দিনকরস্য ভাবনে
খাজ্জলে পততি শোকভাবনে।
মন্মথে চ হৃদি হন্তুমুদ্যতে
প্রোষিতপ্রমদয়েদমুদ্যতে ॥"

রবির দীপ্তি আচ্ছাদিত হইয়াছে, গগন হইতে বারিধারা ঝরিতেছে। শোকবর্দ্ধনকারী কন্দর্প হৃদয়ে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হওয়ায় বিরহিণী নারী এই প্রকার বলিতেছে।

"সর্ব্বকালমবলম্ব্য তোয়দা
আগতাঃ স্ম দয়িতো গতো যদা।

নির্ঘৃণেন পরদেশসেবিনা
মারয়িষ্যথ হি তেন মাং বিনা ॥"

হে মেঘগণ! তোমরা সকল ঋতুতেই থাক, কিন্তু যখন আমার প্রিয় চলিয়া গিয়াছেন, তখনই তোমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। নির্দ্দয় পরদেশবাসী প্রিয়-বিরহিত আমাকে বধ করিতেছ।

"ব্রূত তং পথিকপাংশুলং ঘনা
যূয়মেব পথি শীঘ্রলঙ্ঘনাঃ।
অন্যদেশরতিরদ্য মুচ্যতাম্
সাথবা তব বধূঃ কিমুচ্যতাম্ ॥"

হে মেঘগণ! সেই নিন্দিত পথিককে বল (কারণ তোমরাই শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিক্রম করিতে পার) "এখন প্রবাসের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ কর। নহিলে তোমার বধূ কি বলিবে?"

"হংসপংক্তিরপি নাথ সম্প্রতি
প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে
দুঃখিতা মনসি সা প্রিয়া চ তে ॥"

হে নাথ! এখন হংসগুলি আকাশে শ্রেণী বাঁধিয়া মানসসরোবরের দিকে চলিয়াছে। চাতকও তৃষিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে। তোমার সেই প্রিয়াও মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছে।

"নীলশষ্পমভিভাতি কোমলং
বারি বিন্দতি চ চাতকোঽমলম্।
অম্বুদৈঃ শিখিগণোঽপি নাদ্যতে
কা রতির্দয়িতয়া বিনাদ্য তে।"

কোমল নীলবর্ণের তৃণরাজি শোভা পাইতেছে। চাতক নির্ম্মল বারি লাভ করিতেছে। মেঘগুলি ময়ূর সমূহকে ডাকাইতেছে। দয়িতাবিহীন তোমার আজ সুখ কি?

"মেঘশব্দমুদিতা কলাপিনঃ
প্রোষিতা হৃদয়শোকলাপিনঃ।
তোয়দাগমকৃশা চ সাদ্য তে
দুর্দ্ধরেণ মদনেন সাদ্যতে ॥"

ময়ূরগুলি মেঘের শব্দ শুনিয়া আনন্দিত কিন্তু বিরহিণী হৃদয়ের দুঃখের কথা বলিতেছে। আজ তোমার সে পত্নী বর্ষার আগমনে কৃশকায়া, দুর্জ্জয় কন্দর্প তাহাকে অবসন্ন করিতেছে।

"কিং কৃপাপি তব নাস্তি কান্তয়া
পাণ্ডুগণ্ডপতিতালকান্তয়া।
শোকসাগরজলে নিপাতিতাং
ত্বদ্‌গুণস্মরণমেব পাতি তাম্ ॥"

তোমার কান্তার পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে অলকপ্রান্ত আসিয়া পড়িয়াছে; শোকসাগরের জলে সে নিপতিত; কেবল তোমার গুণস্মরণই তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে। তোমার কি তাহার প্রতি দয়াও নাই?

"কুসুমিতকুটজেষু কাননেষু
প্রিয়রহিতেষু সমুৎসুকাননেষু।
বহতি চ কলুষে জলে নদীনাং
কিমিতি চ মাং সমপেক্ষসে ন দীনাম্॥"

কাননে কুটজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রিয়বিরহে রমণীগণের মুখগুলি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। নদীগুলির জল কলুষিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। দীনা আমার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ না?

"মার্গেষু মেঘসলিলেন বিনাশিতেষু
কামো ধনুঃ স্পৃশতি তেন বিনা শিতেষু।
গম্ভীরমেঘরসিতব্যথিতা কদাহং
জহ্যাং সখি প্রিয়বিয়োগজশোকদাহম্॥"

পথ সকল বৃষ্টিতে বিলুপ্ত। মদন তীক্ষ্ণবাণযুক্ত ধনুর্ধারণ করিয়াছে। হে সখি! মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনে ব্যথিত আমি কবে প্রিয়বিরহজনিত শোকদাহ পরিত্যাগ করিব?

"কুসুমসুগন্ধিতয়া বনেজিতানাং
স্বনদম্ভোধরবাতবেজিতানাম্।
মদনস্য কৃতে নিকেতকানাং
প্রতিভান্ত্যদ্য বনানি কেতকানাং॥"

গর্জ্জনকারী মেঘসংসৃষ্ট বায়ু দ্বারা কম্পিত কেতকবনসমূহ মদনের নিবাস স্বরূপ হইয়াছে। রমণীগণ কুসুমের সুগন্ধে তথায় যাইতেছে।

"তৎসাধু যত্বাং সুতরাং সসর্জ্জ
প্রজাপতিঃ কামনিবাস সর্জ্জ।
ত্বং মঞ্জরীভিঃ প্রবরো বনানাং
নেত্রোৎসবশ্চাসি সযৌবনানাম্॥"

হে মদনের আবাসস্বরূপ সর্জ্জ! প্রজাপতি যে তোমায় সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সাধু। যৌবন-বিশিষ্ট জনগণের তুমি নয়নের আনন্দদায়ক, কারণ মঞ্জরী সমূহে ভূষিত হইয়া তুমি বনের অন্যান্য সমস্ত বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ।

"নব-কদম্ব শিরোবনতাস্মি তে
বসতি তে মদনঃ কুসুমস্মিতে।
কুটজ কিং কুসুমৈরুপহস্যতে
প্রণিনতাস্মি সদুঃপ্রসহস্য তে॥"

হে নব-কদম্ব বৃক্ষ! মস্তক অবনত করিয়া তোমায় প্রণাম করি। তোমার ফুল-হাস্যে মদন বাস করেন। হে কুটজ! পুষ্পসমূহদ্বারা কেন আমায় উপহাস করিতেছ? বিরহিণীর অতি দুঃখদায়ী তুমি—তোমায় প্রণাম করিতেছি।

"তরুবর বিনতাস্মি তে সদাহং
হৃদয়ং মে প্রকরোষি কিং সদাহম্।
তব পুষ্পনিরীক্ষিতা পদেহং
বিসৃজে সহসৈব নীপ দেহম্॥"

হে কদম্ব! আমি তোমায় সর্ব্বদা প্রণাম করি। আমার হৃদয়কে দাহযুক্ত করিতেছ কেন? তোমার কুসুম-দর্শন করিয়া আমি সহসা তোমার পদে জীবন বিসর্জ্জন করিব।

"কুসুমৈরুপশোভিতাং সিতৈ—
র্ঘনমুক্তাম্বুলবপ্রকাশিভিঃ।
মধুনঃ সমবেক্ষ্য কালতাং
ভ্রমরশ্চুম্বতি যূথিকালতাম্॥"

মেঘমুক্ত জলকণা পাইয়া বিকসিত শুভ্র কুসুমভূষিত যূথিকালতাকে মদনের সময় উপস্থিত দেখিয়া ভ্রমর চুম্বন করিতেছে।

"তাসামৃতুঃ সফল এব হি যা দিনেষু
সেন্দ্রায়ুধাম্বুধরগর্জ্জিতদুর্দ্দিনেষু।
রত্যুৎসবং প্রিয়তমৈশ্চ সমানয়ন্তি
মেঘাগমে প্রিয়সখীংশ্চ সমানয়ন্তি॥"

এই বর্ষাঋতু তাহাদের পক্ষেই সার্থক যাহারা এই ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের গর্জ্জনযুক্ত দুর্দ্দিনে প্রিয়তমের সহিত রত্যুৎসব করে ও বর্ষাগমে প্রিয়গণকে আনয়ন করে।

"এতন্নিশম্য বিরহানলপীড়িতায়া-
স্তস্যা বচঃ খলু দয়ালুরপীড়িতায়াঃ।
স্বস্বারবেণুকথিতং জলদৈরমোঘৈঃ
প্রত্যাযযৌ স গৃহমূনদিনৈরমোঘৈঃ॥"

বিরহানলে পীড়িত ও করুণ প্রার্থনারত তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ালু তিনি বেণুর নিজস্বরের ন্যায় জলবর্ষণকারী মেঘগর্জ্জনে স্বীয় আগমন বিজ্ঞাপিত করিয়া আনন্দকর্ম্মবিশিষ্ট বর্ষার অত্যল্প দিবস বাকি থাকিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে উল্লিখিত 'দয়ালু' কে? কোনও টীকাকার এখানে রাধা ও কৃষ্ণকে নায়কনায়িকারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ কল্পনার বিশেষ কোন হেতু দেখা যায় না। প্রবাসী কোন প্রিয়জনের জন্য বিরহিনীর খেদ ধরিলেই সমগ্র শ্লোকগুলির মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে।

কালিদাস ও ঘটকর্পর সমসাময়িক, কিংবদন্তী হইতে এই কথা মানিয়া লইলে, মেঘদূতের সহিত এই শ্লোক-গুলির সাদৃশ্য অনুভূত হইবে। মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে বার্ত্তাবহ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট পাঠাইতেছে, এই শ্লোক-গুলিতে বিরহিণী প্রবাসী প্রিয়ের নিকট মেঘকে পাঠাইতেছে। কারণ দিতেছে, মেঘেরাই শীঘ্র পথ অতিক্রম করিতে পারে। পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি কোন বাধা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে না। ঘটকর্পরের বিরহিণী প্রবাসী প্রিয়জনকে "পথিক-পাংশুল" বলিয়া তিরস্কার করিতে দ্বিধা করে না। "কর্ম্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে

না, পথিকবধূ তখন একথা মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র। সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে একথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।" (১)

বর্ষাগমে এই চাঞ্চল্য, এই বিরহবেদনার উন্মেষ, বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেখানকার গ্রীষ্ম প্রকৃতই ভৈরবের রুদ্র নিশ্বাস, তৃণগাছটি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক। চাতকের মতই নরনারীর কণ্ঠে পিপাসা, সুগভীর কূপমাত্র সলিলসংগ্রহের একমাত্র উপায়। তৃণহীন ধূ ধূ মাঠ। ক্বচিৎ দুই একটা তরু। তাহারই তলে গো মহিষ নিষণ্ণ। মধ্যে মধ্যে তপ্ত বায়ু, ধূলির ঝটিকা উড়াইয়া দশদিক আঁধার করিয়া দিতেছে। তাই আজিকার দিনেও গগনে যখন নববর্ষার মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে তখন কৃষকরমণীর কণ্ঠে আপনা হইতেই "কাজরী" ধ্বনিত হইয়া উঠে। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও প্রাচীনকালে জলদ গর্জ্জনে অনধ্যায়ের ন্যায়, স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। প্রবাসীর বাড়ী ফিরিবারও এই সময়। কৃষকপরিবারের কর্ম্মঠ পুরুষেরা, যাহারা চাকরী লইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহারাও কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য এই সময়েই ছুটি লইয়া গৃহে ফিরে। আজও তাই বর্ষার আবির্ভাব তাহার চিরন্তন প্রকৃতিটির বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন (২৪মে, ১৮৯০) :—"সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারি নে। পোষ্ট আফিস এবং রেলগাড়ী এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই, তাই জন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে, আর্দ্রতন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকেন না। ডেস্কের সামনে বসে চিঠি লিখে, মুড়ে, টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তারপরে নিশ্চিন্ত মনে স্নানাহার করেন। এমন কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিশের বন্দোবস্ত হয় নি তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল। তাই— 'প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হলো না' কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল।" (২)

কিন্তু বর্ত্তমানকালে ঠিক্ তেমনটি না থাকার দরুণ আমাদের কল্পনার অবাধগতিতে কোন বাধা পড়ে না, বরং দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয় বলিয়াই আমরা অবাধ কল্পনার বল্গা শিথিল করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে অতীতের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াই। কখনও কখনও আমাদের বিরহকাতর মনের বিয়োগব্যথাটির সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সেই বিস্মৃত বিরহী বিরহিণীদের দারুণ ব্যথারও ধারণা করিতে পারি। তাই এত যুগ পরেও 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত' প্রভৃতি আমাদের চক্ষে এক মনোমদ দৃশ্য ধরিতে পারে। তাই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানালোকেও এই মায়াকানন বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ঘটকর্পরের বর্ষাবর্ণনাতে বিশেষ আড়ম্বর নাই। চন্দ্র সূর্য্য আবৃত করিয়া নিবিড় মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ধূলির উপদ্রব ত নাইই, অবিরল বর্ষণে পথের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বত-গহ্বর সকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানে জলের গভীর গর্জ্জন। ময়ূরগণ আনন্দে উন্মত্ত। বারণযূথ মেঘগর্জ্জনে ক্রুদ্ধ, সর্পসকল ভীত। চাতক "দে জল, দে জল" বলিয়া ডাকিতেছে। হংসশ্রেণী মানসসরোবর অভিমুখে চলিয়াছে। ধরণী নূতন শ্যামল তৃণে আচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নদীর জল বর্ষাগমে

(১) নববর্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) সবুজপত্র ১৩২৩; ২৩৩ পৃষ্ঠা।

কলুষিত। মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। কেতক, কুটজ, সর্জ ও কদম্ব প্রস্ফুটিত। ভ্রমর যূথিকালতায় বসিতেছে। বর্ষাকালীন কুসুমে ভূষিত তরুগণ বিরহিণীর হৃদয়ে সন্তাপ জাগাইতেছে।

এই ঘটকর্পরের বর্ষাবর্ণনা। যে কৃত্রিম যমকের বন্ধন ঘটকর্পর স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আর উপমা প্রভৃতির আধিক্য প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও সাদাসিধা কথাতেই তিনি বর্ষার মোটামুটি এক চিত্র দিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা সংস্কৃতকাব্যসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ মামুলি বর্ণনা।

কালিদাস বলিয়াছেন :—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥"

মেঘ উদিত দেখিলে, মিলিত প্রণয়িগণেরই চিত্ত অন্যপ্রকার হইয়া উঠে, যাহাদের প্রিয়জন দূরস্থিত তাহাদের ত কথাই নাই। মেঘ উঠিলে পথিকবধূগণ অলকদাম সরাইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে মেঘের দিকে চাহিয়া দেখে, কারণ এইবার তাহাদের প্রিয়জন প্রবাস হইতে ফিরিবে। বর্ষাকালে কে প্রিয়জনের নিকটস্থ না হয়? (৩) ঘটকর্পরের বিরহিণীও তাই উৎকণ্ঠিতা। জয়দেবের আদিরসপ্রধান গীতগোবিন্দের প্রারম্ভও বর্ষাবর্ণনায়—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" আর আমাদের বৈষ্ণবকবিও সেই প্রাবৃট্‌ সমাগমেই বিরহিণীর উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।" ঘটকর্পর কাব্যের নায়িকাও তাই সুপ্রসিদ্ধ উদ্‌ভটশ্লোকের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছে "কালে বারিধরাণামপতিতয়া নৈব শক্নোমি স্থাতুম্।"

বিরহিণীর দেহবর্ণনার একটি মাত্র বিশেষণ ঘটকর্পর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার পাণ্ডুগণ্ডে অলকপ্রান্ত আসিয়া পড়িয়াছে। বিরহিণীদের একবেণীধারণই নিয়ম। মেঘদূতেও বিরহিণীর মুখের উপর সুদীর্ঘ কেশপাশ আসিয়া পড়িয়াছে, মেঘে যেন চন্দ্র ঢাকিয়াছে,—

"হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণাক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥" (উত্তরমেঘ)

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিরহিণী শকুন্তলারও একবেণীধারণ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥"

ভবভূতির উত্তররামচরিতেও আলুলায়িতকেশা বিরহিণী সীতার অনুরূপ মূর্তি ;—

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥"

ঘটকর্পর একটি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করিলেও তাহার দ্বারাই বিরহিণীর স্বরূপটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(৩) "ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াম্।" (পূর্বমেঘ)

কেহ কেহ বলেন ঘটকর্পরের যমককাব্য হইতে প্রধান ভাবটি (বিরহিণীর মেঘকে দৌত্যে বরণ) আহরণ করিয়া কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কালিদাস ও ঘটকর্পরকে সমসাময়িক বলিয়া মানিলেও, যমককাব্য ও মেঘদূত এ দুইটির মধ্যে কোনটি আগে রচিত তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। বড় জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে উভয় কাব্যের সাদৃশ্য আছে।

মেঘদূতেও যমককাব্যের অনুরূপ বর্ণনা আছে। সেখানেও চাতক ডাকিতেছে ("বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ,") হংসশ্রেণী মানসে চলিয়াছে ("মানসোৎকাঃ...... ...সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ।") নীপ অর্দ্ধবিকসিতকেশরযুক্ত ("নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ,") ময়ূর ডাকিতেছে ("শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ প্রত্যুদ্যাতঃ,") কেতকীকুসুম বিকসিত ("পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ,") কদম্ব প্রস্ফুটিত ("ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ,") যূথিকাসমূহ প্রফুল্ল ("উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি"।) কিন্তু এ সাদৃশ্য দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ সংস্কৃত কাব্যের এগুলি মামুলি বর্ণনা। যে কবিই হউন না কেন, যে সময়েরই তিনি হউন না কেন, বর্ষাবর্ণনা করিতে হইলেই তাঁহার এইগুলি অবলম্বন।

আরও দুই এক জায়গায় যমককাব্য ও মেঘদূতের সাদৃশ্য আছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

"আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥"

রমণীগণের কুসুমসদৃশ হৃদয় বিরহে কেবল আশাবৃন্তেই ধৃত হইয়া থাকে, নহিলে কবে ঝরিয়া পড়িত।

যমককাব্যেও আছে :—

"শোকসাগরজলে নিপাতিতাং
তদ্‌গুণস্মরণমেব পাতি তাম্।"

তোমার গুণস্মরণই শোকসাগরে পতিত তাহাকে রক্ষা করিতেছে।

যমককাব্যের শেষে বিরহী বিরহিণীর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। মেঘদূতে তাহা নাই। তবে মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত দুইটি শ্লোক শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মেঘ গিয়া যক্ষপত্নীকে পতির বার্ত্তা জানাইল ও কুবের যক্ষকে মার্জ্জনা করিলে পতিপত্নীর সম্মিলন হইল ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

"তৎসন্দেশং জলধরবরো দিব্যবাচাচচক্ষে
প্রাণাংস্তস্যা জনহিতরতো রক্ষিতুং যক্ষবধ্বাঃ।
প্রাপ্যোদন্তং প্রমুদিতমনাঃ সাপি তস্থৌ স্বভর্ত্তুঃ
কেষাং ন স্যাদবিতথফলা প্রার্থনা হ্যুন্নতেষু ॥
শ্রুত্বা বার্ত্তাং জলদকথিতাং তাং ধনেশোঽপি সদ্যঃ
শাপস্যান্তং সদয়হৃদয়ঃ সংবিধায়াস্তকোপঃ।
সংযোজ্যৈতৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ
ভোগানিষ্টানভিমতসুখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ ॥"

কিন্তু এ মিলনের কথা না শুনিলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। বিয়োগান্ত হইয়া কাব্য সমাপ্ত হইবে এই ভাবিয়া অসহিষ্ণু কেহ এই শ্লোক রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মেঘদূত কেবল কল্পনার ক্রীড়া। তাহার মিলনে সমাপ্তি দেখিবার জন্য আমরা তত ব্যাকুল নহি।

কোন পাশ্চাত্য সমালোচক ঘটকর্পরের কাব্য অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) যমকে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও এ কথা ঘোষিত হইয়াছে। বিদ্যাধর বলেন :—

"প্রায়শো যমকে চিত্রে রসপুষ্টির্ন দৃশ্যতে।
দুষ্করত্বাদসাধুত্বমেকমেবাত্র দূষণম্॥" (একাবলী, ৭ম উন্মেষ)

যমক ও চিত্রকাব্যে প্রায়ই রসপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা রচনা করা দুষ্কর এই এক কারণেই ইহা অসাধু।

মম্মটও বলিয়াছেন "তদেতৎ কাব্যান্তর্গড়ুভূতম্" (কাব্যপ্রকাশ, ৯ম উল্লাস)। এইজন্য তিনি ইহার বিস্তৃত ভেদপ্রদর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

বাস্তবিকই যমকপ্রয়োগে অত্যধিক নৈপুণ্য দেখাইতে গিয়া কিরূপ শ্লোক সকল রচিত হইয়াছে তাহার উদাহরণ 'নলোদয়' নামক কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি সুপরিচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে যমকের যন্ত্রণায় ভাব কিরূপ পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে।

"নসমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥"

এইরূপ রচনা করিতে কবিও যেরূপ গলদ্‌ঘর্ম্ম হন, পাঠকেরও সেইরূপ প্রাণান্ত। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ঘটকর্পরের রচনার অর্থবোধ করিতে পাঠকদের এ প্রকার কঠোর আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। তাঁহার যমকবন্ধে ভাব বিশেষ প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৃত্রিমতা আছে বটে, কিন্তু তাহা অল্পের উপর দিয়াই গিয়াছে। 'নলোদয়' প্রভৃতি কাব্যের তুলনায়, ঘটকর্পরের কৃত্রিমতা কিছুই নয় বলিলেই হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

(৪) "A lyric poem of a very artificial character, and consisting of only twenty-two stanzas, is the Ghata-karpara, or "Potsherd" called after the author's name which is worked into the last verse. The date of the poem is unknown. He is mentioned as one of the "nine gems" at the court of the mythical Vikramaditya." Macdonell. A History of Sanskrit Literature P. 339.

ঘুমন্ত খোকা।

-ঃ*ঃ-

পাতাঝরা হিমের শিশির একটি ফোঁটা শুকায় নি' যা'
কুজ্ঝটিকায় ঝাপ্‌সা ভানু ঘন মেঘের লুকায় নি' যা'।
দ্বিপ্রহরে সায়র বুকের ছায়ান্বিত পুলক প্রীতি,
স্তব্ধ নিঝুম বনের স্বপন, তন্দ্রাহত রেণুবীথি!
ঘুমায় খোকা—মিলিয়ে গেছে আঁখি কোণের মুক্তাফল,
মধুর হাসির আব্‌ছায়াটি জাগে মুখে অচঞ্চল।

মহোৎসব সমারোহের একটা শোভা ছট্‌কে পড়ে'
কাদের বিপুল আয়োজন এ দেছে যেন ব্যর্থ করে।
কাহার হারের মধ্য-মণি ছিঁড়ে হেথায় পড়্‌লো এসে,
ভঙ্গিমা এক গানের যেন ঘুমায় মানবকের বেশে!
ঘুমায় খোকা—মানব গৃহের সদানন্দের পুরোহিত,
যাহার বাণে হৃদ্‌ পাতালের ভোগবতী হয় প্রবাহিত!

পরশ ও তোর স্পর্শমণি, কার্য্যারম্ভ খেলায় তোর,
জপ্‌ছে নব-জাগরণের মন্ত্র যে রে ঘুমের ঘোর;
মর্ম্মে তোমার কর্ম্ম ফলে কান্না হাসির সাম্যযোগে,
উদয়াস্ত গীতাহুতি জীবন স্বস্ত্যয়নের ভোগে!
ঘুমায় খোকা—অধর নড়ে জগদম্বার স্তন্যপানে,
হাতের মুঠি এলিয়ে গেলেও জড়িয়ে আছে আধেকখানে।

অবিকৃত মাতৃস্নেহ জমাট যেন তুষার সম
আদর যেন নিবিড় হ'য়ে মূর্ত্ত শিশু নিরুপম!
একটা হিয়ার সব আকঙ্ক্ষা, তৃপ্ত তৃষা, অতুল সুখ,
বধূর তপের সফলতা, ছিন্ন মায়ের হৃদয়টুক্‌।
ঘুমায় খোকা—ঘুমের ঘোরে দিচ্ছে সাড়া থেকে থেকে,
অমনি স্নেহ করের পরশ দিচ্ছে দেহে তিলক এঁকে!

ঘুমায় খোকা—স্বর্গ-মাণিক, মাতৃহিয়ার স্নেহের ঝাঁপি,
নারীর বুকের পুতুল খেলা, সজ্জা যাহার জীবনব্যাপী !
গৃহের তলে থির চপলা, মূচ্ছিত এক বাঁশির গান,
একটা মোহন ইন্দ্রধনু, ক্লান্ত নদীর কলতান !
ঘুমায় খোকা—এক অপ্সরার দৃষ্টি যেন নির্নিমেষ,
একটা যেন আলিঙ্গনের ব্যাকুল বাহু নিরুদ্দেশ !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মিষ্টি সরবৎ

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

"না দেখ্‌লে থাক্‌তে নারি, দেখ্‌লে কাটাকাটি"—সুপসিদ্ধ প্রবাদটি অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, আহমদ্ সাহেবের পক্ষে কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে সত্য !—রোগী বিদায় করিয়া, 'কল'গুলা সারিয়া বেলা দুইটার সময় তিনি যখন বাড়ীতে আসিয়া উপরে বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন,—ঘরখানা আমিনা-শূন্য, তখন ভদ্রলোকটির মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল !—ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া পোষাকগুলা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরে বারেণ্ডায় আসিয়া রুস্তমকে ডাকিয়া একগ্লাস জল ও পানের ডিবাটা আনিয়া দিবার জন্য রীতিমত চীৎকার করিয়া,—বাড়ীশুদ্ধ সকলের কান জ্বালাইয়া, পুনশ্চ ঘরে ঢুকিলেন। উদ্দেশ্য, যদি আমিনা আসে !

রুস্তম, মিনিট পাঁচ পরে ঘরে ঢুকিয়া, জলের গ্লাশ ও পানের ডিবাটা টেবিলের উপরই যে পূর্ব্বাহ্নে সাজাইয়া রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে,—সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সবিস্ময়ে বলিল "হুজুর আপ্‌তো ইস্কা পাশ্ রূপেয়া ধর্ দিজিয়ে—দেখা নাই ?—"

টেবিলের দিকে চাহিয়া আহমদ্ দেখিলেন কথাটা সত্য !—আত্মদমন করিয়া অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন, "নেহি,—তোম্ চলা যাও—"

রুস্তম প্রস্থান করিল।—আহমদ্ অপ্রসন্নভাবে আলমারির চাবি খুলিয়া টাকাকড়ি রাখিয়া দিলেন, তারপর সশব্দে আলমারিটা বন্ধ করিতে করিতে দারুণ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"ছাই ভস্ম ভাল লাগে না আর ! খেটে খুটে এসে আবার এই.........হুঁ ! এ সব কি পুরুষ মানুষের কাজ !—"

অন্যদিন অবশ্য আমিনাই এই কাজগুলা করিয়া থাকে !—তবে রাগ হইলে সে, যেদিন গা ঢাকা দেয়, সেদিন নিরুপায় গৃহকর্ত্তা মহাশয়, নিজেই স্বহস্তে গৃহস্থালী গুছাইতে বাধ্য হন,—এবং বলাবাহুল্য, এই ছোটখাটো কাজগুলা তাঁহার পক্ষে তখন দারুণ অস্বাস্তিকর ব্যাপার হইয়া উঠে,—সেই জন্যই উক্ত আক্ষেপ সূচক বাণী !

চো—চো করিয়া এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাশটা খালি করিয়া,—তিনি আরাম কেদারার উপর আড় হইয়া পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনটা মধ্যাহ্ন কালেই—ডিস্পেনসারীর পাশে ছোট ভোজন কামরায়, পোষাকশুদ্ধ চেয়ার টেবিলে বসিয়া সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। কাজের ভিড়ের জন্য দিন ও রাত্রের আহার সেইখানেই তাঁহাকে সারিতে হয়, নচেৎ সময়ের ঠিক থাকে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া হঠাৎ তিনি অধৈর্য্য ভাবে উঠিয়া, নগ্নপদেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। বারেণ্ডায় আসিয়া উৎকণ্ঠাকুল দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না,—অগত্যা নিরুপায় হইয়া, বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে বারেণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে বার বার পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু জাফ্‌রী কাটা, রঙিন্ কাঁচের আয়না-মোড়া জানালা ও খিলান বিলম্বিত চিকের আড়ালে যতটুকু নজর চলিল—তাহাতে সবটুকুই তিনি আঁধার দেখিলেন!—

বহুক্ষণ নিষ্ফল-প্রয়াসের পর নৈরাশ্য-ভগ্ন চিত্তে,—তিনি অবশেষে ঘরে ঢুকিবার উপক্রম করিলেন, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহলের বারেণ্ডায় চিকের আড়ালে আমিনাকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন,—সে হাসি হাসি মুখে, পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে ইনেবের শয়ন-কক্ষের দিকে যাইতেছে!—

তৎক্ষণাৎ আহমদের মনে হইল আব্‌লুও তো শয়ন কক্ষে এখন বিশ্রাম করিতে গিয়াছে! তবে?............ তা হ'লে তো আমিনা নিশ্চয় ইনেববিবির ঘরে আড়ি পাতিতে চলিয়াছে!—

আর যায় কোথা?—তিনিও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার দিকে ছুটিলেন!—আমিনার ঐ চুরিবিদ্যাটা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে যে আজ রীতিমত অপ্রস্তুতে ফেলিয়া—ভালরূপেই জব্দ করিতে পারিবেন, সেই উৎসাহে তাঁহার মুখমণ্ডল সকৌতুক উল্লাসে হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল!—এখন তাঁহাকে পায় কে!

পশ্চিম মহলের বারেণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন, আমিনা সত্যই তখন ইনেবের ঘরের জানালায় ছিদ্র খুঁজিয়া উকি ঝুঁকি মারিতেছে!—আহমদের আর ধৈর্য্য রহিল না! উচ্ছ্বসিত হাসির সহিত ছেলেমানুষের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন "চোর! চোর! চোর!—ওরে আবলু জল্‌দি বেরো,—তোর ঘরে আড়ি পাত্‌ছে!—"

আহমদ এ মহলের বারেণ্ডায় কখনই আসেন না,—তিনি যে হঠাৎ এমন সময় এইরূপে আসিয়া পড়িবেন, তাহা আমিনার স্বপ্নের অগোচর!—সে পরম বিশ্বস্ত, নিশ্চিন্ত ভাবেই,—রাজ গৃহের রহস্যোদ্ঘাটনে একান্ত মনোযোগে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় এই আকস্মিক বজ্রাঘাত!—চমকিয়া থতমত খাইয়া ভয়-চকিত নয়নে পিছন পানে চাহিয়া আমিনা দেখিল,—সর্ব্বনাশ! আহমদ সাহেব তাহার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছেন!—নিমেষে মাথার কাপড় টানিয়া ত্রস্তাকুরঙ্গিনীর মত লঘু লম্ফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া আমিনা ধড়াশ্ করিয়া খিল বন্ধ করিল!—

বন্দুক হাতে লইয়া, আবলু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন "ব্যাপার কি? হোল কি ডাক্তার?"

আমিনার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের উপর বাঁ হাতটা রাখিয়া, হেলিয়া দাঁড়াইয়া,—সলম্ফ-পর্য্যটন-ক্লান্ত আহমদ্-সাহেব হাঁপাইতে হাঁপাইতে সরোষে বলিলেন "উল্লুক কাঁহাকা!—এতক্ষণে 'হোল কি ডাক্তার'!—তোর ঘরের কথা একজন চুরি করে শুন্‌ছে, খেয়াল রাখিস নি?"

স্নিগ্ধ-হাস্যে আবলু উত্তর দিলেন "ওরে কথাই নেই, তো চুরি করবে কি?—চোর ঠকেছে তো!—আহা!"

সবিস্ময়ে আহমদ্ বলিলেন "বিবি ঘরে নাই ?"

আবলু বলিলেন " সে তো ওধারে খাটের উপর ঘুমুচ্ছে,—আমি এখানে জানালার কাছে বসে বন্দুক সাফ করছিলুম বৈকালে শিকার করতে যাব বলে –"

আহমদ্ হতাশভাবে বলিলেন "এখন তা হলে তোরা কোন কথাই কস্ নি ?—

মাথা নাড়িয়া বন্দুকের কল কব্জা পরীক্ষা করিতে করিতে আবলু মৃদু হাস্যে বলিলেন "এখন ছেড়ে,—ঘরে ঢুকে অবধিই—না ! আমি আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ।"

আহমদ্ সবিস্ময়ে বলিলেন "ওরে উল্লুক, তুই কোথাকার বেকুব রে ? কথা কইবার জন্যে জাগাস নি ।"

আবলু বন্দুকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন "বাঃ, ঘুমুচ্ছে মানুষ টা, তার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে—তার সঙ্গে কি এমন মারাত্মক রাজনৈতিক পরামর্শ সুরু করব ? যাঃ, ছেলে মানুষদের জ্বালাতন করা,—ও-সব বাঁদরামী আমার ভাল লাগে না ; চল– শিকারে বেরুবি ?

আহমদ্ বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিলেম "তুই কোথাকার পয়গম্বর রে ?

মৃদু হাস্যে আবলু বলিলেন "এই বাংলা দেশেরই মাটীর এবং তোরই next door, neighbour, মোদ্দা তোর মত অতটা বথা নই ! চল হতভাগা, তোকে এখুনি শিকারে যেতে হবে ।"

আহমদ যোড়হাতে সবিস্ময় বলিলেন "মাপ কর দাদা এই মাত্র, আমার রোগী গুলির,—তর্‌বেতর্‌ধাঁচের রোগগুলি শিকার করে ভয়ানক রকম—জখম হয়ে ফিরছি,—এখন আর শকুনি হাড়গিলা শিকারে উৎসাহ নেই—" আমিনার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া,—অকস্মাৎ দুইহাতে অসতর্ক আবলুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া উপর্য্যুপরি তাহার মুখে চুমা খাইয়া কানে কানে বলিলেন, "তুই আমার পেয়ারের দাদা ভাই, তোর পায়ে পড়ি ভাই বল, কপাট-টা খুলে দিক্—তুই বল্লেই খুলবে ও আমার কথা শুনবে না !—"

অপ্রস্তুত আবলু,—এই উৎকট আদরের আক্রমণে ঘোরতর ব্যতিব্যস্ত হইয়া—প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর লজ্জাক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন,—কেউ কোথা হইতে এই অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক প্রহসনটা দেখিল কি না ? সৌভাগ্যবশতঃ কেউ কোথাও নাই ।— আশ্বস্ত হইয়া আহমদের দিকে চাহিয়া লজ্জারক্ত মুখে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "ষ্টুপীড রাস্কেল ! ছেলে মানুষী দিন দিন বাড়ছে, না ? দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিস্,—দেখবি দেব এমন থাপ্পর—"

সন্ত্রস্তভাবে পিছু হটিয়া আহমদ বলিলেন "না, না, বন্ধু, তোমার শিকারী হাতের থাপ্পর যে মোটেই মিষ্টি মোলায়েম হবে না, সে আমার জানা আছে,– ও মতলবটা মুলতুবী রাখ,—বল ভাই কপাট খুলতে— ।

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া আবলু বলিলেন "কিছুতেই বল্‌ব না,—থাক রাস্কেল ঐখানে দাঁড়িয়ে ! আচ্ছা হয়েছে,—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর !—"

আহমদ সকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন "দ্যাখো এবার আমি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব,—"

আবলু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "আহা ! নিজের গর্দ্দান পরহস্তগত,—উনি আবার আমায় শাসাচ্ছেন !"

আহমদ ঘাড় চুলকাইয়া নীরবে কি ভাবিলেন, তারপর সকরুণ কণ্ঠে বলিলেন "তুই কি নিমকহারাম রে ? আমিনা এল তোর ঘরে চুরি করে কথা শুন্‌তে, আমি ভদ্রলোক তোর উপকার করে তাকে ধরিয়ে দিলুম এখন তুই কিনা এই হয়ে দাঁড়ালি ! তোর একটুও কৃতজ্ঞতা নাই ?—"

গম্ভীর ভাবে গোঁপে তা দিয়া আবলু বলিলেন "যথেষ্ট আছে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কান ধরে দুই গালে চার থাপ্পর বসিয়ে ঋণ শোধ করি !"—কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিলেন "সে যে কত বড় ছেলেমানুষ,—তার এই ছেলেমানুষী বুদ্ধি থেকেই তা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তুই ধাড়ী উজবুক,—তুই কি বলে তার পিছু নিয়ে, এমন বিকট চীৎকারে বেয়াদবি করতে এলি ? তোর একটু লজ্জাও করে না ? আমি তো আশ্চর্য্য হই !—"

আহমদকে টানিয়া একটু অন্তরে আনিয়া চুপি চুপি পুনরায় বলিলেন "আমিনা এখন তোর ওপর চটে আগুন হয়ে আছে, খবরদার ওকে এখন ত্যক্ত করতে যাস্‌নে, হিতে বিপরীত হবে। তুই সরে পড়, একটু পরেই ওর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

সকরুণ ভাবে আহমদ্‌ বলিলেন "সকাল থেকে ঘরে যায়নি ভাই—"

কপট করুণার সহিত আবলু বলিলেন "তুমি তো সেই শোকে এখুনি হাইড্রোসেনিক বিষ খেয়ে মরছ না ভাই তবে আর এত ধড়ফড়ানি কেন ? ভাল মুখে গলাধাক্কা দিয়ে বলছি, চল এখন ওঘরে যাওয়া যাক্‌ !—হার্ম্মোনিয়মটা তোর ঘরে আছে, না ? চলতো একটু গানবাজনা করা যাক্‌—" আবলু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

খুব জোরে সশব্দে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আহমদ বলিলেন "হায়রে নির্দ্দয় !—আচ্ছা আবলু,—এসা দিন নেহি রহেগা,—তোরও সময় এগিয়ে এসেছে—"

আবলু হাসিয়া বলিলেন "আসুক, তা বলে তোর মত লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধি আমার নেই, যে মানুষকে উদ্ব্যস্ত করে আনন্দ পাব ! বাপ্‌, তুই যেন ডাকাত হয়ে উঠেছিস্‌—"

আহমদ বিজ্ঞভাবে বলিলেন "ওরে ওখানে ডাকাত না হলে চলে না, ওরা স্বেচ্ছায় কি—"

আবলু তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বহুৎ খুব,—তোর ডাইওয়েসিস বিদ্যের খুরে গড়, আর কথা কস্‌নি, থাম !—

(৬)

সন্ধ্যার সময় উপরের ঘরে চা খাইবার জন্য গিয়া আহমদ সাহেব দেখিলেন, রুস্তম চা লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন "বিবি ভেজ দিয়া ?—"

রুস্তম উত্তর দিল "নেই হুজুর, উন্‌কো তো বোখার হুয়া, না—কেয়া হুয়া—বড়া শির দাগাতে, ওহিবাস্তে ছাঁতে পর শুত্‌ল হৈন, হামরা ভেজ দিয়া ছোটা মিঞা সাহেব।"

আহমদ্‌ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "ক্যা হুয়া, বোখার হুয়া ?"

আবলু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেম "না না বোখার নয়, বলছি আমি থাম, রুস্তম যা তো বাচ্চা, পান আন,"

রুস্তম চলিয়া গেল। আহমদের দিকে চাহিয়া আবলু বলিলেন "আচ্ছা বাঁদরামী করেছিস্‌, দ্যাখ দেখি সে লজ্জায় পড়ে তখন ঘরে খিল দিয়ে, কেঁদে-কেটে মাথামুণ্ডু ধরিয়ে একাকার করেছে—"

অপ্রতিভ হইয়া আহমদ্‌ বলিল "কেঁদেছে ?"

ক্ষুণ্ণভাবে হাসিয়া আবলু বলিলেন "খুব, ইনেব বল্লে চোখ মুখ ফলে রাঙা হয়ে উঠেছে, ইনেবের কাছেও খুব কেঁদেছে,—বলেছে, দাদার কাছে আমি এজন্মে আর মুখ দেখাব না ?— দ্যাখ দেখি বুদ্ধি ! আমি সাধ করে ছেলে মানুষের সঙ্গে পরিহাস করতে চাই না, দ্যাখ কেমন মজা—

আহমদ্ অপ্রস্তুতভাবে নীরবে চা পান করিতে করিতে কি একটা কথা ভাবিয়া লইলেন। তারপর কাপটা নামাইয়া রাখিয়া রুমালে ঠোঁট মুছিতে মুছিতে বলিলেন "মাথা ধরেছে, নয়? দাঁড়া একটু ডাক্তারী করে আস্‌তে হোল—"

বাধা দিয়া আবলু বলিলেন "খবরদার! সে তেলে-বেগুনে জ্বলে যাবে! তোর ডাক্তারী করতে যাওয়া তো নয়, ডাকাতি করতে যাওয়া!—আর কেলেঙ্কারী করিস্ না আহ্মু, থাম!

আহমদ্ উঠিতেছিলেন, আবলুর কথায়, হাসিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, একটু থামিয়া বলিলেন "সত্যি ভাই, বড় বেশী ছেলেমানুষী বুদ্ধি—"

আবলু বলিলেন "আর ঐ ছেলেমানুষকে নিয়ে তুই রঙ্গ করতে যাস্, তোর গলায় দড়িও জোটে না?"

আহমদ্ ঔদাস্যের ভাণ করিয়া বলিলেন "কই আর জুটল, তাহলে খুসী হয়ে এদ্দিন ঝুলে পড়তুম?—" পরক্ষণে উৎসাহের সহিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ইনেবিবির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে।"

আবলু হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চয় সে অন্তরঙ্গতার মাঝে কি বিচ্ছেদের আঁচর লাগবার যো আছে!"

গভীর ক্ষোভের সহিত আহমদ্ বলিলেন "দেখ্‌লি ভাই, লোহায় লোহায় মিল হয়ে গেল, মাঝখান থেকে যত দোষের ভাগী হল কামার শা—।"

আবলু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "শা—র বুদ্ধি যেমন সুচিক্কণ!—স্থানে-অস্থানে হাতুড়ীর ঘা পিটুলেই কি হয় চাঁদ! বোঝ এবার! আঃ, আমিনা এখন মাস ছয়েক তোর সঙ্গে কথা না কয়ে তোকে যদি জব্দ করতে পারে, তা হলে—"

লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আহমদ্ বলিলেন "আরে বাস্‌রে! কি সাংঘাতিক লোকরে তুই! এমন হৃদয়হীন বাক্যটা উচ্চারণ করলি কোন মুখে! না ভাই না, তোর পায়ে পড়ি অমন অলক্ষণে কথা বলিস্ নি, আমিনা শুনতে পেলে আমায় মুস্কিলে ফেল্‌বে! দোহাই তোর—"

হো হো করিয়া হাসিয়া আবুল বলিলেন, "একেবারে বয়ে গেছিস্! একেবারে বয়ে গেছিস!—আর তোর পাল্লায় পড়ে আমিও ফাজিল হবার দাখিল হয়েছি! তোর বদ্‌মাইসি বুদ্ধির তুড়িলাফের ধাক্কা খেয়ে আমার মৌনব্রতটা ত নির্ঘাৎ-রকমেই ধ্বংস হয়ে গেছে—তোর সংসর্গে মিশে বাজে কথায় বেজায় বক্তার হয়ে উঠেছি! নাঃ, মাটী করলি তুই আমায়!—"

আহমদ্ যেন অবাক্ হইয়া গেলেন! গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া,—শেষে মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া নিছক ভাল মানুষের মত অতি নরম সুরে বলিলেন "ভাই বোনের একই সুর!—বাহ্‌রে বাঃ! আমার কিসমৎ কি চমৎকার! আমি তোদের মাটী করলুম? বলিস্ কি, এ্যাঁ?"

কৌতূহলী হইয়া আবলু বলিলেন "আমিনাও ঐ কথা বলে বুঝি? বাঃ, তা হলে স্বীকার করতে হোল, লোক চেন্‌বার অভিজ্ঞতা তার আছে, ভাল।"

আহমদ্ সকোপে বলিলেন "ভাল হবে না কেন? তোমারই ত সহোদরা তিনি! তুমি ও-কথা বলবে বৈ কি! হুঁ, আহাম্মক্ ছোক্‌রা কোথাকার! তুই—"

আহমদের মুখের কথা মুখেই রহিল, রস্তম পান লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল "হুজুর, দাওয়াইখানামে তিন ঠো বেমারী আয়া—"

আহমদ্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পান লইয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাঁহার কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল! রোগী বা রোগীর সংবাদ লইয়া লোক আসিয়াছে শুনিলেই, তাঁহার কথা বার্ত্তা ত দূরের কথা—তাহার নিদ্রা পর্য্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত। নিজের কর্ত্তব্যের নিকট তাঁহার এতটুকুও ত্রুটি অবহেলা ছিল না। সেথানে তিনি অটল, স্থির,—একান্ত মনোযোগে কর্ম্ম-তৎপর, দৃঢ়-সংযমী পুরুষ!

রাত্রে সমস্ত কাজ সারিয়া যথাসময়ে শয়নকক্ষে আসিয়া আহমদ্ দেখিলেন—আমিনার শয্যা শূন্য,—ঘরের দুয়ারের পাশে বারেণ্ডায় বিছানা বিছাইয়া রুস্তম ও তাঁহার দাওয়াইখানার বালক ভৃত্য মনসুর শুইয়া আছে। আহমদ্‌কে দেখিয়া, রুস্তম উঠিয়া বসিয়া—একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘাড় মাথা চুলকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "বিবিসাহেব অসুস্থ হইয়া তেতালার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আজ সেইখানেই থাকিবেন, তুফানী বাঁদী তাঁহার কাছে থাকিবে। সেই জন্য রুস্তম ও মনসুরকে এ বারেণ্ডায় থাকিবার জন্য, 'ফুফু' সাহেবা পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

'ফুফু' আবলুর পিতার দূর সম্পর্কীয়া এক ভগিনী, হাঁপানি ব্যায়রাম থাকার জন্য বিবাহ করেন নাই। আজীবন চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও দানব্রত অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধাচারে জীবন কাটাইতেছেন। দান না করিয়া কোন দিন জলগ্রহণ করেন না, এমন কি—যে দিন ভিখারী ফকীর কাহাকেও না পাওয়া যায়, সে দিন ঝি-চাকরদের বখশীস্ না দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন না। চরিত্রের জন্য আবলুর পিতা ইঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি-সম্মান করিতেন, এখন আহমদ্ ও আবলু তাঁহাকেই গৃহস্থালীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া মনে করে। ভাইপো ও জামাতাকে তিনি পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন কিন্তু তাই বলিয়া, দম্ভ-গর্ব্বিতা জননীর মত কথায় কথায় তাহাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে যাইতেন না, সেই জন্য তাঁহারাও সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তীত্ব স্বীকার করিয়া চলিতেন। তবে, আহারের সময় ছাড়া তিনি ইঁহাদের বড় একটা দেখা দিতেন না। রান্নামহলের তত্ত্বাবধানে ও সকলের খাওয়াদাওয়া দেখাশুনার পর বাকী সময়টা তিনি উত্তর-মহলের দোতলার ঘরে নিভৃতে থাকিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। সে-সময় সে-মহলে কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না। বাড়ীর কেহ অসুস্থ হইলে ফুফু-সাহেবাই তাহার তত্ত্বাবধান-কর্ত্রী।

রুস্তমের কথা শুনিয়া আহমদ্ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "ফুফু সাহেবা কি আমিনা-বিবির কাছেই আছেন?"

রুস্তম বলিল "হাঁ এতক্ষণ ছিলেন, আমিনা-বিবি ঘুমিয়ে যাবার পর নিজের মহলে গেলেন—"

আশ্বস্ত হইয়া আহমদ্ বলিলেন "ঘুমিয়ে গেছে তো? বহুৎ আচ্ছা,—তুমি যাও রুস্তম, তুফানী বাঁদীকে বলে এস, যদি রাত্রে কোন অসুস্থতা বোধ হয়, তখনি যেন আমায় খবর পাঠায়—আস্তে যাও রুস্তম, শব্দ কোর না,"

রুস্তম ধীরে ধীরে গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'বলিয়া আসিয়াছে।' আহমদ্ বলিলেন "সকাল ছটায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েই তেতলায় গিয়ে বিবি সাহেবার খবর নিয়ে এসো, কেমন আছেন।"

আহমদ্ শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঘুম সহজে হইল না। পড়িয়া পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া একটা লজ্জাবহ বিষণ্ণতার ব্যথা জাগিতে লাগিল। আহা, কেন নির্ব্বোধের মত তখন অমন বাচালতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! ছি, ছি, কামটা সত্যই বড় অশিষ্টতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আহা বেচারা আমিনা এখন মাথার যন্ত্রণায় কত কষ্টই পাইতেছে!...যাক্ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আহমদ্ সাহেব এমন দুষ্কার্য্য কিন্তু আর কখনও করিতেছেন না যে,—ইহা ঠিক্!

সকালে রস্তম তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেই চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "তেতালায় যাও বাচ্চা—"

রস্তম, উৎফুল্ল মুখে বলিল "হুজুর খবর এনেছি, বিবিসাহেব ভাল আছেন, স্নান কর্‌তে গেছেন।"

খুশী হইয়া আহমদ্ বলিলেন "ঠিক্ জান?"

রস্তম, মাথাটা প্রায় কাঁধের সংলগ্ন করিয়া, প্রবল গর্ব্বে স্বীকার-সূচক ভঙ্গি সহকারে বলিল "জী—হাঁ! ময় আপনে আঁখমে দেখা, বহু-বিবিকা সাৎ বিবি-সা'ব গোসলখানামে যাঁতি—তিনোমে বহুৎ ফূর্ত্তিসে হাঁসি খুঁসি কর্‌তে হেঁ, কোই কো কুছ বেমার নেই হুজুর,—"

কৌতূহলী হইয়া আহমদ বলিলেন "তিনোমে হাঁসি খুঁসি? কোই কোই হ্যায় রে?"

রস্তম বলিল "বিবি-সাব, বহু-বিবি-সাব, ঔর ওহায়েদ ভাইয়াকো জরু, তুফানী বাঁদী—"

তুফানীর স্বামী ওহায়েদ মিঞা, আহমদ্-সাহেবের ডাক্তারখানার দ্বারবান্, সে অষ্টপ্রহর বাহিরমহলেই থাকে, আহমদ্-সাহেব সেখানে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পান। অন্দরস্থ বাঁদীকে পাছে প্রভু বুঝিতে ভুল করেন বলিয়া সাবধানী রস্তম, পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহার সদরস্থ স্বামীর পরিচয়টা পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়া দিল!—পরিহাস-প্রিয় আহমদ্ সাহেব, একটু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন "ক্যা হুয়া? তুফানী বাঁদী ওহায়েদ কো জরু হ্যায়? ছ্যাৎ গিধোড়! ময় তো জানে উস্কো নানী হ্যায় রে—"

রস্তম 'অত-শত, বুঝিল না, সজোরে বলিল "নেই হুজুর উস্কো জরু হ্যায়, আপ্‌ন জরু।

"আপ্‌ন জরু!—" হাস্যাবেশ বিদীর্ণ প্রায় আহমদ্ সাহেবের স্বরযন্ত্রে আর পরিহাসের ভাষা যোগাইল না! কুণ্ঠিত রস্তম, থতমত খাইয়া অবাক হইয়া গেল! অতি বুদ্ধিমান রস্তমের, এ-হেন নিদারুণ হতবুদ্ধি অবস্থা দেখিয়া, আহমদ্-সাহেব আর কথা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেন না, হাসিতে হাসিতে গোসলখানায় চলিয়া গেলেন।

একটু শীঘ্র শীঘ্র স্নান প্রভৃতি সারিয়া আহমদ্ সাহেব পোষাক-কামরায় আসিয়া ঢুকিলেন, বাহিরের দিকে-উৎসুক-কান দুইটি পাতিয়া রাখিলেন, কতক্ষণে বারেণ্ডায় আমিনার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়!—কিন্তু বহুক্ষণ কাটিয়া গেল,—তবুও কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, অগত্যা ক্ষুণ্ণচিত্তে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন বারেণ্ডায় রস্তম চা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

আহমদ্-সাহেবের উৎসাহ-প্রসন্ন মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল। রস্তমের হাত হইতে চা লইয়া অতি-গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমিনা বিবি কোথা?"

রস্তম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল "গোসলখানায়—"

বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তির সহিত আহমদ্ সাহেব বলিয়া উঠিলেন "এখনও গোসলখানায়? ভাল যা হোক্! হুঁ,—এতক্ষণ ধরে জল ঘাঁট্‌লে মানুষের অসুখ করে আর না-করে? তারপর সেই ঘরে-বাইরে রোগী নিয়ে 'টানা-পোড়েন' করে জান-হায়রান্ হবে আমার! ওদের কি—"

রস্তম কুণ্ঠা-শুষ্ক মুখে বলিল "হুজুর আমার ভুল হয়েছে, বিবি-সাহেবরা তখন গোসলখানায় যান নি,—গোহাল-বাড়ীতে গোবর নিয়ে ঘুঁটে ঠুক্‌তে গেছলেন্—"

আহমদ্ হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন "ঘুঁটে ঠুক্‌তে কিরে?—" রস্তম উত্তর দিল "জী—হাঁ, মোট্‌কা বাঁদী ঘুঁটে ঠুক্‌তে যাচ্ছিল, তাই ওঁরাও দুজনে সঙ্গে গেলেন, ওঁরাও পারেন হুজুর! দুজনে মিলে 'টিকিয়া-মাফিক্' ছোট ছোট অনেকগুলো ঘুঁটে দিয়েছেন হুজুর।—"

"বটে !—" আহমদ্ হাসিয়া ফেলিলেন ! রুস্তম সাহস পাইয়া,—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল "আবার মাঝে মাঝে দু'জনে কুয়াতলায় বাসন মাজ্‌তেও যান, বাঁদীরা শুধু জল তুলে দেয়, বাকী সব কাজ ওঁরাই করেন ! ফুফু সাহেবকে লুকিয়ে ঐ সব হয় হুজুর !"

রুস্তমের গুপ্ত-দৌত্য-দক্ষতার বহর দেখিয়া আহমদ্-সাহেব মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। নিঃশব্দে চা-পান করিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন "দ্যাখ্ বাচ্চা, এবার যখন বিবি-সাহেবরা কুয়াতলায় বাসন মাজ্‌তে যাবেন, তখন কাউকে কিছু না বলে, চুপি চুপি এসে আমায় একবার খবর দিও তো—"

রুস্তম উৎসাহের সহিত বলিল "বহুৎ আচ্ছা জনাব, কিন্তু তুফানী দিদিটা বড় শয়তান ! ও বিবিসাহেবার পেয়ারের লোক কি না—সন্ধান পেলে সব কাঁচিয়ে দেবে—"

আহমদ্-সাহেব টুপীটা তুলিয়া মাথায় দিবার উদ্যোগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তুমি একটু হুঁসিয়ারীতে কাজ করো, বখ্‌শীস্ পাবে।

রুস্তম ঘাড় নাড়িয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

(৭)

দুপুরবেলা উপরের ঘরে আসিয়া আহমদ্ সাহেব দেখিলেন, তাঁহার জল, পান, আলমারীর চাবি সমস্তই সুশৃঙ্খলার সহিত যথাযথভাবে সজ্জিত আছে,—কিন্তু আমিনা নাই। টেবিলের উপর আবলুর লেখা এক টুকরা চিঠি পড়িয়া আছে "যে তিনি আজ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত বারোটার গাড়ীতে বাঁকীপুর চলিলেন। সেখানে উক্ত বন্ধুর ভাবী-শ্বশুরালয়। বন্ধুর পাত্রী দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির ও অন্যান্য কথাবার্ত্তা ঠিক্ করিয়া তাঁহারা দিন চার পরে ফিরিবেন। তাঁহাদের যাওয়ার কথা হঠাৎ ঠিক হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বাহ্নে সংবাদটা আহমদ্‌কে জানাইতে পারেন নাই। আহমদ্ যেন ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।"

আহমদ্ শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব ঠিক করিতে সুরু দিলেন—যে, আবলু যখন বাড়ীতে নাই, তখন এ কয়দিন আমিনার নাগাল ধরা সম্পূর্ণই অসাধ্য !—পশ্চিম-মহলে 'শূন্য ঘরে হুনো রাজা' হইয়া,—ইনেব বিবিকে লইয়া সে নিরঙ্কুশ প্রতাপে মনের সুখে রাজত্ব করিবে ! আবলু নাই,—কোন্ ছুতা করিয়াই বা আহমদ্ সাহেব ওমহলে যাইবেন ? এবার ত বড় শক্ত সমস্যায় পড়া গেল !

আহমদ্ সাহেব অস্থিরভাবে ঘরের এদিকে ওদিকে দ্রুতবেগে পায়চারী করিতে লাগিলেন ! কিছুক্ষণ পরে মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া—হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে রুস্তমকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার আলমারীর চাবিটা হারাইয়া গিয়াছে নাকি—তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না, চাবিটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বল—"

অবিলম্বে রুস্তম আসিয়া উত্তর দিল যে "চাবি কোথাও হারায় নাই, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বিবি-সাহেব তাহা টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন"।

আহমদ্ সাহেব ইসারা করিয়া রুস্তমকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন "পশ্চিম-মহলে ওরা সবাই কি করছে !"

রুস্তম ততোধিক চুপি চুপি বলিল "হুজুর, তাস খেল্‌ছেন, মোট্‌কা বাঁদীকে সুদ্ধ ডেকে এনেছেন, চার জনে গ্রাবু খেল্‌ছেন—"

আহমদ্ গোঁফে তা দিতে দিতে চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন "ফুফু-সাহেবা নিজের মহলে আছেন, নয় ?"

রুস্তম বলিল "হাঁ—"

আহমদ্ আরও কিছুক্ষণ ভাবিলেন, তারপর এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া পরিষ্কার অক্ষরে উর্দ্দুতে লিখিলেন "আমিনা, আমি আজ বৈকালে হুগলীতে ইমামবাড়ী দেখিতে যাইব, নৌকা ভাড়া করিতে এখনই লোক পাঠাইতেছি, তুমি এবং হানেব-বিবি সেখানে বেড়াইতে যাইবে কি ?"

আদেশমত রুস্তম, কাগজ লইয়া পশ্চিমমহলে গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া সেই কাগজখানাই আহমদ্-সাহেবের হাতে দিল, আহমদ্ দেখিলেন চিঠির উল্টা-পিঠে লাল কালিতে বৃহদাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"না।"

আহমদ্-সাহেব মাথা চুলকাইয়া গুম্ হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুস্তমের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বি বাচ্চা ?"

রুস্তম বলিল "হুকুম করুন—"

আহমদ্-বলিলেন "ওঁরা যেখানে তাস খেল্‌ছেন্, সেখানে সবাইকার সাম্‌নে গিয়ে বলিস্ নি যেন,—'একটা জরুরী বাৎ' বল্‌বার আছিলা করে, বিবি-সাহেবাকে আড়ালে ডেকে আন্‌বি, তারপর বল্‌বি যে "সাহেবের নস্য ফুরিয়ে গেছে, আপনার আঁচলের রিং'-এ টেবিলের ড্রয়ারের চাবি আছে আপনি জল্‌দি গিয়ে নস্য বার করে দিন—" তাতে বিবি-সাহেবা নিশ্চয়ই বল্‌বেন যে "তুমি চাবি নিয়ে যাও—"

রুস্তম বাধা দিয়া উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিল, "হাঁ হুজুর, তা তিনি এখনি নিশ্চয় বল্‌বেন,—"

আহমদ্ তাহার কাঁধ চাপ্‌ড়াইয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন "আরে উজবুক, শোন্,—তুই অম্নি তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌বি,—'আমি নৌকা ভাড়ার কথা বলবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে জল্‌দি যাচ্ছি, আমি এখন অন্য কোথাও যেতে পার্‌বো না,—" নিজের তর্জ্জনী আন্দোলন করিয়া আহমদ্ পুনশ্চ জোরের সহিত বলিলেন—"বল্‌বি 'সাহেব বোল্ দিয়া, আপ্‌কো যানা চাহি, বহুৎ জরুরী কাম্ হ্যায়—' বুঝ্‌লি ?"

রুস্তম একদৃষ্টে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া কথাগুলা যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রভুর কথা শেষ হইবামাত্র সজোরে বলিল "জী—হাঁ, আলবৎ সম্‌ঝা !—"

আহমদ্ কৌতূহল-সাহস নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "কি বল্‌বি বল দিখি ?-—"

আহমদ্ ঠিক যেভাবে, যেরূপ মাত্রায় কণ্ঠস্বর হ্রস্বদীর্ঘ করিয়া যে যে কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, রুস্তম, একে একে সব অনুকরণ করিয়া গেল! শেষে ঠিক তেমনইভাবে তর্জ্জনী আন্দোলন করিয়া সুদৃঢ় স্বরে আবৃত্তি করিল—"সাহেব বোল দিয়া—আপ্‌কো যানা চাহি,—বহুৎ জরুরী কাম্ হ্যায় !"

আহমদ্-সাহেব হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক্ হয়েছে, জল্‌দি যা—"

রুস্তম চলিয়া গেল। আহমদ্-সাহেব এবার ভব্যযুক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া—নিজের অদ্ভুত ছেলেমানুষী আচরণগুলার কথা ভাবিয়া, মনে মনে হাসিতে আরম্ভ করিলেন!—এতক্ষণ বাহিরে,—নিজের সুকঠোর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের নিকট বন্দী হইয়া, পরম শান্ত-সুশীল, ধীর-স্বভাব ভদ্রলোক সাজিয়া, অসুস্থ মানুষদের জীবন-মরণের দায়ের ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া, গম্ভীর-সংযত চিত্তে কত খাটুনি খাটিয়া,—কত ভাবনাই ভাবিয়া আসিলেন, আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই, চৌকাঠের বাহিরে সমস্ত উদ্বেগ দুর্ভাবনার খোলসটা খুলিয়া রাখিয়া,—এখন একেবারে অসংযত

দুঃশীল হইয়া উঠিলেন! এ মজা তো মন্দ নয়!—আহমদ্-সাহেব কথাটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভিতরে-ভিতরে হাসির উচ্ছ্বাসটা ফেনাইয়া-ফেনাইয়া অসহ্য উচ্ছল হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল! সৌভাগ্যক্রমে সাম্‌নে তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ-জন কেহ ছিল না তাই রক্ষা, নচেৎ তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। গোঁফে তা দিতে দিতে,—অতি কষ্টে নীরব নিঝুম হইয়া আড়ে-আড়ে দুয়ারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ঠোঁটের কোণে অলক্ষিতে সকৌতুক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল!

কিছুক্ষণ পরে, মুখের উপর প্রকাণ্ড ঘোমটা টানিয়া আমিনা দুয়ারের সাম্‌নে দেখা দিল, কিন্তু চৌকাঠ ডিঙ্গাইল না! ক্ষণমধ্যে তাহার হাতের চাবির গোছাটা সশব্দে ছুটিয়া আসিয়া বিছানার উপর ডিগ্‌বাজি খাইয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে আমিনার ঘোমটা-মোড়া কোমল সুন্দর মূর্ত্তিটিও দুয়ারের সাম্‌নে হইতে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইল!

আহমদ্-সাহেবের ধৈর্য্য লোপ হইল!—একলম্ফে দুয়ারের সাম্‌নে আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিলেন "শুনে যাও, শুনে যাও"

প্রায় কুড়িহাত দূরে গিয়া আমিনা থমকিয়া দাঁড়াইল, মাথার কাপড়টা একটু সরাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া গাম্ভীর ভাবে বলিল "কি?—"

আহমদ্-সাহেব দুই পা অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন "অত দূর থেকে কি বলা যায়? সরে এস—"

আমিনা ঠিক তেমনই গম্ভীরভাবেই আরও চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কথার মত কথা সত্যি কিছু থাকে তো অতদূর থেকে খুব বলা যায়"

আহমদ্ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন "যায় বটে, তবে সেটা ব্যক্তিবিশেষকে! তুমি যদি আমার সম্বন্ধীর স্ত্রী হতে—"

আমিনার সুকঠোর গাম্ভীর্য্য এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল! ফোঁশ্ করিয়া উঠিয়া, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কি বল্লে?"

আহমদ্-সাহেব প্রমাদ গণিলেন!—মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "এই কথার কথা বল্‌ছি, রাগ কোরনা আমিনা,—লক্ষ্মিটি আমার—"

বাধা দিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া আমিনা বলিল "না আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই,—তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, কিচ্ছু সুবাদ নাই, একলা তোমার যা খুশী কর!" আমিনা দ্রুত প্রস্থানোন্মুখ হইল!

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ব্যতিব্যস্ত আহমদ্ সাহেব এবার ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য রাগতঃ ভাবে বলিলেন —"দ্যাখো ভদ্রতার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়াবাড়ী কর তো ভাল হবে না, আমিনা—"

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সদর্পে গ্রীবা উঁচাইয়া বলিল "মন্দটা কি হবে শুনি?—" তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

আহমদ্ সাহেবের অত্যন্ত হাসি পাইল! কিন্তু এখন হাসিলেই সব মাটী!—ধৈর্য্য ধরিয়া সুগম্ভীর মুখে বলিলেন—"এই আমিও তোমার সঙ্গেই পশ্চিমমহলে যাব, গিয়ে;—সকলের সাম্‌নেই—" তারপর যে কি করিবেন আহমদ্-সাহেব খুঁজিয়া পাইলেন না! গলায় সুপারী আটকান'র ভাণ করিয়া খক্ খক্ শব্দে ক্ষণেক কাশিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া পরে বলিলেন "হাতকড়ি পরিয়ে—"

আমিনা সতেজে বলিল "হুঁ! হাতকড়ি!— আচ্ছা যাও না পশ্চিমমহলে,—আমি চল্লুম মার কাছে!—" 'মা' অর্থাৎ—বুড়ু সাহেবা।

সঙ্গে সঙ্গে—সাম্‌নের সিঁড়ি দিয়া তড়্‌ তড়্‌ করিয়া নামিয়া সত্যসত্যই সে উত্তরমহলের দিকে উধাও হইল! আহমদ্‌-সাহেব হতবুদ্ধি নির্ব্বাক্! যাঃ, এবার তো মার ওখানে দন্তস্ফুট করা চলিবেনা!

আহমদ্‌-সাহেব হতাশভাবে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, বিছানার উপর আমিনার চাবিটায় দৃষ্টি পড়িল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সেইটা অগত্যা তুলিয়া জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন,—অভিপ্রায়, আমিনা আসিয়া না চাহিলে ফেরত দিবেন না!—কিন্তু সে আশা সন্দেহপূর্ণ!

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন বেলা প্রায় তিনটা বাজে। নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে একবার বিছানার উপর গড়াগড়ি দিয়া লইলেন কিন্তু শূন্য ঘরখানা ক্রমশঃই অসহ্য বোধ হইল. কিছুক্ষণ পরে বৈকালিক পরিচ্ছদ পরিয়া একখানা উপন্যাস হাতে লইয়া, একটু জোর-পদশব্দ-সহকারে অসময়ে ডাক্তারখানায় চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় আমিনার দেখা পাইলেন না, রাত্রেও না। পরদিনও ঠিক সেই ভাবে কাটিল। রুস্তম ও মনসুর বারেণ্ডায় প্রত্যহ রাত্রে ঘুমাইতে আসিত। আহমদ্‌ কিছু বলিলেন না,—মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, আর হীনতা স্বীকার করিয়া আমিনাকে ডাকিতেছেন না,—আমিনার যেখানে খুশী সেইখানে থাক, এবার তিনিও নীরব-ঔদাস্য অবলম্বন করিলেন! দেখা যাক্‌ কতদূর কি হয়!

ক্রমে আরও দু দিন কাটিল। চতুর্থ দিনে বৈকালে কিছু দূরের একটা 'ডাক' পাইয়া আহমদ-সাহেব চলিয়া গেলেন, রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিয়া আহারে বসিয়া ফুফু-সাহেবার কাছে সংবাদ পাইলেন 'আবলু সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলিয়া সকাল-সকাল আহার করিয়া সে ঘুমাইতে গিয়াছে।'

আহমদ্‌ মনে-মনে উৎফুল্ল হইলেন? এইবার ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গিল তো বেশ হইয়াছে! আমিনা এবার কোথা যায় দেখা যাউক্!

কিন্তু রাত্রে বারোটার পর উপরের ঘরে গিয়া দেখিলেন রুস্তম ও মনসুর পূর্ব্বের মতই বারেণ্ডায় পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে, আমিনা নাই!—পশ্চিমমহলে দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তেতালার ঘরে খুব উজ্জ্বল ভাবে আলো জ্বলিতেছে! আহমদ্‌-সাহেব এবার সত্যই চটিলেন!

(৮)

পরদিন সকালবেলা উঠিয়া যথানিয়মে স্নান প্রভৃতি সারিয়া চা খাইতে খাইতে আহমদ্‌ রুস্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটা মিঞা কাঁহা?—"

উত্তরে রুস্তম জানাইল, তিনি ভোরবেলা উঠিয়া চা খাইয়া গঙ্গার ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। আহমদ্‌ আর কিছু বলিলেন না। দুই তিন দিন হইতে তিনি আমিনার সংবাদ লওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কাজেই রুস্তম চুপ করিয়া থাকে। তবে বখশীসের আশা আছে বলিয়া সে বাসনমাজার ব্যাপারটা প্রত্যহ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে। কিন্তু রুস্তমের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবি-সাহেবারা আজকাল তাসখেলা লইয়া-ই উন্মত্ত, বাসন মাজতে যায় কে!

চা পান করিয়া, মসলা মুখে দিয়া, ডান হাতে টুপী লইয়া, মাথার চুলের উপর বাঁ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে, আহমদ্‌-সাহেব, অন্যমনে হাতের শক্ত রোগীগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে বারেণ্ডা পার হইয়া বাহিরের সিঁড়িতে আসিলেন, দেখিলেন ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া, সিঁড়ির দেয়ালের গায়ে কাঁচের জানালায় চক্ষু লাগাইয়া, পায়ের

আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া, উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া রস্তম এক মনে কি দেখিতেছে। প্রভুর পদশব্দ পাইয়া, থতমত খাইয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল,—তারপর বিনাপ্রশ্নেই কৈফিয়তের সুরে সলজ্জ-হাস্যে সসম্ভ্রমে বলিল, "হুজুর একটা পাগলী গান গাইতে এসেছিল, দেখুন বিবিসাহেবা ওকে বখ্‌শীস্ দিচ্ছেন—"

রস্তমের এই অযাচিত দৌত্য-পারিপাট্যে, আহমদ্-সাহেবের রোগীর-চিন্তা উড়িয়া গেল! কৌতূহলাক্রান্তনয়নে জানালার দিকে চাহিয়া তিনি একটু দাঁড়াইলেন, দেখিলেন রান্নামহলের দুয়ারের কাছে যেটুকু স্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সত্যই সেখানে একজন ছিন্নবসনা অদ্ভুত আকারের স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমার মত, সদ্যঃস্নাতা সুন্দরী আমিনা—তাহার আঁচলে একসরা চাল ও গুটিকতক পয়সা দিতে দিতে প্রসন্ন-করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া স্নিগ্ধ-দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিতেছে, "দ্যাখো, তুমি আবার কাল এসো বুঝ্‌লে?"

তুফানী বাঁদী নিকটেই কোথা ছিল, সে আমিনার এই সাদর-নিমন্ত্রণ-আপ্যায়ন-ব্যাপারটা লইয়া হাসিয়া কি একটু পরিহাস করিল,—লজ্জায় পড়িয়া আমিনাও হাসিল! তাহার তরুণ কোমল মুখ, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রশ্মি-সম্পাতে, মনোরম মাধুরীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—সে কি চমৎকার ভাবাভিব্যঞ্জনা!

আহমদ্-সাহেবের দৃষ্টি যেন জুড়াইয়া গেল! বিমোহিত চিত্তে নিস্পলক নয়নে, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন!—আমিনা এত সুন্দর!—তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল! সেটা তিনি জানেন, জানেন!—তবে ভুলিয়া যান যে, সে শুধু নষ্টামী মাত্র! একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহ তৃপ্তির আবেগে তাঁহার সমস্ত বুকখানা এক নিমেষে যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল! আঃ, আমিনা! এযে তাঁহারই প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মী! যতক্ষণ আমিনাকে দেখা গেল, ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভিখারিণী চলিয়া গেল, আমিনাও সরিয়া গেল।—শান্ত-সৌম্য-জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত বদনে, আহমদ্-সাহেব পরিতৃপ্ত-চিত্তে ধীর-পাদক্ষেপে নীচে নামিয়া গেলেন।

অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশী স্ফূর্ত্তি-প্রসন্নতার সহিত প্রাভাতিক-কর্ত্তব্যগুলি সমাধা করিয়া, দুপুরবেলা একটু সকাল করিয়াই উপরে উঠিলেন, কিন্তু হায়, যেমনকার শূন্য, তেমনই আছে!—অধিকন্তু আজ পান জল পর্য্যন্ত নাই!—

আহমদ সাহেবের স্মরণ হইল তিনি আজ অত্যন্ত সকাল-সকাল আসিয়া পড়িয়াছেন।—আমিনা এখনো তাহার পান জল গুছাইয়া রাখিতে আসে নাই, এইবার আসিবে। কিন্তু তিনি ঘরে আছেন জানিলে সে কখনই ঘরে ঢুকিবে না, হয় ত বা চাকরদের মারফৎ কাজ সারিবে! অতএব..........।

ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া আহমদ-সাহেব কি একটা কথা ভাবিয়া লইলেন। তারপর সকালবেলা আমিনার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন সেই মূর্ত্তিটি মনে পড়িল, একটু হাসিয়া,—আলমারী হইতে একখানা গল্পের বই টানিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়া হইল না।

ডাক্তারখানায় ঔষধের ঘরে বসিয়া কম্পাউণ্ডারেরা তখন ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র প্রভৃতি গুছাইতেছিল। ভিতরের বারেণ্ডায় ওস্তাদে দারবান, গরমজল ব্রাস্ প্রভৃতি লইয়া জলের ফিল্টার পরিস্কার করিতেছিল, আহমদ্-সাহেব সেইখানে আসিয়া নিকটস্থ বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া, টুপী ও ওভারকোট খুলিয়া রাখিয়া—রুমাল লইয়া মুখের ও ঘাড়ের ঘাম মুছিয়া—"আঃ" বলিয়া, বেঞ্চির উপরই আড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। বাঁ হাতের কুনুইয়ে বেঞ্চির উপর ভর দিয়া, বেঞ্চির উপর পা গুটাইয়া, হাতে মাথা রাখিয়া বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃত্য ওহায়েদ্ মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইল! সমস্ত কাজ সারিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গিয়া, প্রভু হঠাৎ কেন যে এমন অসময়ে নামিয়া আসিলেন, সে তাহার কোনই কারণ ঠাহর পাইল না! তবে আজ ক'দিন হইতেই প্রভুকে সে একটু—'কেমন-কেমন' দেখিতেছে, উপরের ঘরে তিনি যে আজকাল বড় বেশীক্ষণ থাকেন না, সে টুকুও লক্ষ্য করিয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া আজকের মত এমন অসময়ে, অকারণে,—পোষাক পর্য্যন্ত না ছাড়িয়া নীচ নামিয়া আসিতে ত কোনদিন দেখে নাই! ওহায়েদ্ একটু শঙ্কিতও হইল।—সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে আড়-চোখে প্রভুর মুখপানে দুই তিনবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ কিছু অপ্রসন্নতার লক্ষণ সেখানে দেখিতে পাইল না, তাহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না, বিশেষতঃ একেই তাহার জিভ্ জোড়া বলিয়া কথাবার্ত্তায় একটু তোৎলামীর টান ছিল, সেই জন্য সহজে সে প্রভুর সহিত কথাই কহিত না, বিশেষ প্রয়োজনে অল্পস্বল্প যাহা বলিত—তাহাও খুব ধীরে!

আহমদ্-সাহেব বই পড়িতে পড়িতে বার বার অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া, সাম্নের ফুলবাগানের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে ঘড়ি খুলিয়াও দেখিতে লাগিলেন,—তারপর বাগানের ফুলগাছগুলার দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন "দশ—পনের—সতের—পঁচিশ মিনিট হইয়া গিয়াছে। আমিনা এতক্ষণ বোধহয় ঘরে আসিয়াছে, কিন্তু থাক আর একটু হোক্,—কে জানে হয় ত বা সে ঘরে আসে নাই, অথবা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিবেন সে বারেণ্ডায় আসিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া পিছু হটিয়া নিঃশব্দে চম্পট দিল! না তাহা হইবে না, সে ঘরে ঢুকিয়া রীতিমত কর্ম্মব্যস্ত হইলে, তারপর—তিনি অতর্কিতে গিয়া দুয়ারে দাঁড়াইবেন, তা হইলে,—আমিনার পলায়নের পথ রুদ্ধ হইবে!

মনে মনে উপযুক্ত সাধু মতলব আঁটিতে-আঁটিতে আহমদ্-সাহেবের ওষ্ঠপ্রান্তে কখন যে, একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি নিজে টের পান নাই,—কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ওহায়েদের দৃষ্টিতে সে টুক্ এড়াইল না! সাহস পাইয়া,—গরম জলে ব্রাস্ ডুবাইয়া, ফিল্টারের কাঁচের দণ্ডগুলির গায়ে সজোরে ব্রাস্ ঘষিতে ঘষিতে—একটু কুণ্ঠা-সহকারে ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"হুজুর হজরৎ বিবি-সাহেবা এখন ভাল আছেন?"

আহমদ্-সাহেব একটু চমকিয়া অপ্রতিভভাবে বইয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া; সংক্ষেপে বলিলেন—"হুঁ—।" মনে মনে খুব হাসি পাইল! বাঃ ওহায়েদের বুদ্ধিটা তো নিতান্ত ভোঁতা নয়! সেও সমজদার! সেও তাঁহার অন্যমনস্কতা—ভাব-বৈলক্ষণ্যের হেতু অনুধাবন করিতে পারে!

বইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া,—আরও কিছু একটা কথা ভাবিয়া লইয়া, সহসা তিনি একটু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন "ওহায়েদ্, তোমার বিবি আজকাল রাত্রে ওপরেই থাকে, না?"

ব্রাসের উপর একান্তভাবে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া ওহায়েদ্ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ—"

আহমদ্-সাহেব বইয়ের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া গোঁফ মুচড়াইয়া একটু যেন ঔদাস্যের স্বরে বলিলেন "কাল রাত্রেও নীচে আসে নি, নয়? আচ্ছা মনসুর, রুস্তম, সবাই তো ওপরে থাকে, রান্নামহলের লোকজন সবাই রান্না-মহলেই থাকে,—তাহলে তুমি আজকাল একলাই এখানে থাক? বাঃ, কই আমায় তো কিছু বল নি ওহায়েদ্,—"

ওহায়েদ্ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরব রহিল। আহমদ্-সাহেব বক্রকটাক্ষে তাহার মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসি-হাসি মুখে বলিলেন "ভারী অন্যায় এসব! আর ওপরেও সব ক'টাই জুটেছে ছেলে মানুষ, মহামুস্কিল! কি যে ছাই তাস খেলায় নেশা ধরেছে ওদের,—রাত্রি জেগে-জেগে এইবার অসুখে পড়্‌বে আর কি—" তারপর সোজা হইয়া বসিয়া একটু কাশিয়া বলিলেন "ওহে, তুমি মানা করে দিও তো এবার থেকে যেন রাত্রে ওপরে কোন দিন না থাকে,—যেই বলুক, কারুর কথা যেন না শোনে, বুঝলে ওহায়েদ্ একটু বুঝিয়ে বোলো—"

ওহায়েদ্ এবার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, মাথাটা খুব নীচু করিয়া বিব্রতভাবে ঘাড় চুলকাইতে সুরু দিল, কি একটা কথা বলিবার জন্য তাহার ঠোঁট দুইটা একবার যেন নিতান্ত অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, সলজ্জ-হাস্যে চুপ করিয়া খুব ব্যস্ততার সহিত ফিল্টার সাফ করিতে লাগিল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আহমদ্-সাহেব বেশ-একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন "আচ্ছা দাঁড়াও, আজ ওদের সকলকারই রাত্রে নীচে আস্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌ছি,—"

"সকলকারই" শব্দটার উপর তিনি এমন অত্যধিক মাত্রায় জোর দিলেন যে,—সেটা ওহায়েদের কানেও অতি বিষম বাজিল! তাহার কপালে ঘাম ছুটিল! হাস্যবিকাশোন্মুখ অবাধ্য অধরোষ্ঠ প্রাণপণ বলে দাঁতে চাপিয়া,—হাঁটুর নীচে মাথা ঝুঁকাইয়া, সে একমনে ফিল্টারের দণ্ডগুলা পরিষ্কার হইল কি না,—তাহাই দেখিতে লাগিল।

আহমদ সাহেব টুপী ও কোট হাতে তুলিয়া, বই লইয়া নিরীহ ভাল মানুষের মত টুক্ টুক্ করিয়া মৃদুপদে উপরে চলিলেন। সিঁড়িতে উঠিবার সময়, জুতার ডগে ভর দিয়া সম্পূর্ণই নিঃশব্দে উঠিলেন।

বারেণ্ডায় পৌঁছিয়া, চকিত-নয়নে চারিদিক চাহিয়া, শয়ন-কক্ষের দিকে কান পাতিলেন। ষ্ট্যাথসকোপ্-তুরুস্ত চিকিৎসকের কানে,—খুব মৃদু একটু খুট্ খাট্ শব্দ পৌঁছিল, উল্লাসে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—নিঃশব্দে ধীরে আসিয়া শয়নকক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, আমিনা টেবিলের কাটের পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার অতিযত্নের কাঁচের ফুলদানিটা রুমালে করিয়া ঝাড়িয়া সযত্নে ফুঁ দিয়া পরিস্কার করিতেছে।

আহমদ্-সাহেব স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, একাগ্র নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন!

(৯.)

ফুলদানি পরিস্কার করিয়া, পিছনে টুলের উপর হইতে টাট্‌কা ফুলের তোড়াটা লইতে গিয়া, সহসা দুয়ারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমিনা আচম্‌কা বিস্ময়-শব্দ করিল "ও মা!—"

পরক্ষণেই সজোরে ঘোমটা টানিয়া, দ্রুতপদে দুয়ারের দিকে ছুটিল! আহমদ্-সাহেব প্রস্তুত ছিলেন—চক্ষের নিমেষে ধাঁ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া শুর্সার উপরে শিকল চড়াইয়া দিলেন, তারপর সুন্দর ভদ্রতা-সূচক সৌজন্যের ভাষায় বলিলেন "কৃপা পূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করুন, আমি পোষাক ছেড়ে এখনি আস্‌ছি—"

আমিনা নীরব। কোন সাড়া দিল না।

একটু পরে পোষাক বদলাইয়া, হাতমুখ ধুইয়া আহমদ্-সাহেব হাসিতে-হাসিতে দুয়ার খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন আমিনা, জানালার কাছে বেতের চেয়ারটার উপর চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মুখের ভাবটা বেশ উদাস গম্ভীর! আহমদ্-সাহেব কিছু বলিলেন না, দুয়ার বন্ধ করিয়া উপরের চৌকাঠে ছিট্‌কানি লাগাইয়া দিলেন,—কারণ আমিনা সেটা নাগাল পায় না।

আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া, আমিনার নিকটস্থ হইয়া,—নিজের নস্যের কৌটা খুলিয়া আমিনার সাম্‌নে ধরিয়া আহমদ্-সাহেব বিনয়সূচকস্বরে বলিলেন "এক টিপ্ গ্রহণ করুন"

"অত শিষ্টাচার আমার সহ্য হবে না—" বলিয়া আমিনা ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া-পড়িবার চেষ্টা করিল, আহমদ্-সাহেব ত্রস্তে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "করেন কি? বসুন—" তারপর একহাতে তাহার মাথার কাপড় সরাইয়া দিয়া অন্য হাতে চিবুক ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া—গভীর স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে

বলিলেন—"বলি,—যতটা দয়া আর করুণা সবই কি সেই রাস্তার পাগলী আর ভিখারিণীদের জন্য খরচ হবে ?—ঘরেও যে একজন অনুগ্রহ-প্রত্যাশী কাঙ্গাল—"

বাধা দিয়া আমিনা ভ্রূভঙ্গী করিয়া সকোপে বলিল "দ্যাখো—"

হতাশ-করুণ-কণ্ঠে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "কি আর দেখ্‌ব বল, আজকাল তুমি যে রকম ভয়ানক হয়ে উঠেছ, তোমার দিকে চাইতেও ভয় করে—"

আমিনা ফশ্ করিয়া মুখের উপর ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "বেশ, ছেড়ে দাও—"

ব্যস্ত হইয়া আহমদ্-সাহেব ঘোমটা উল্টাইয়া দিয়া বলিলেন "বেশ ! এই দিলুম নাও—এখন শোনদেখি, বস এইখানে—"পরক্ষণে সুর বদলাইয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন "ঠাট্টা-তামাসা নয়, বাস্তবিকই কতকগুলো জরুরী কথা আছে, কান দিয়ে শোন, বলি আজকাল এসব কি মুস্কিলের কাণ্ড সুরু করেছ বল দেখি, এ যে এবার কেলেঙ্কারী ঘট্‌তে চল্ল—"

আহমদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমিনা এবার সত্যই একটু বিস্মিত হইল, সন্দিগ্ধস্বরে বলিল "কিসের কেলে-ঙ্কারী ?"

আহমদ্-সাহেব মুরুব্বিয়ানার সহিত গোঁফ্ মুচড়াইয়া প্রাণপণে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলেন "এই আমার ওপরই না হয় তুমি রাগ করেছ,—তা বেশ করেছ,—কিন্তু আমার গরীব চাকরটির অন্ন মারছ কেন বল দেখি ? ওয়াহেদের স্ত্রীকে ওপরে রাত্রে আট্‌কে,—নীচে যেতে দাও না, আর সে বেচারা যে ওদিকে পাগল হয়ে মরবার দাখিল হয়েছে—"

আমিনা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিল ! ক্ষণপরে তীব্র বিস্ময়ের সহিত বলিল "সে বলেছে বুঝি তোমায় ঐ কথা ? উঃ কি শয়তানী বুদ্ধি !—বলি এখন পাগল হয়ে মরবার জন্যই যদি এত বুক ধড়ফড়্ করেছে,—তবে তখন অমন তেজবাজি করে বিয়াল্লিশ লাফ্ ছুঁড়ে মর্‌তে গিয়েছিল কেন ? সেটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার নি ?"

নাকের কাছে নস্যের টিপ্ তুলিয়া ধরিয়া, ঠোঁট মুখ কুঁচ্‌কাইয়া আহমদ্-সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন "তাই নাকি ? ওহায়েদ্ আবার লাফ্‌টাপ্ ছুঁড়্‌তে জানে নাকি ? কই আমি ত সে খবরের কিছুই জানি না !—"

আমিনা রাগিয়া বলিল "তা জান্‌বে কেন ? তুমি জান শুধু, আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে ! সাধে তোমার ওপর রাগ হয় ?—"

আহমদ্-সাহেব শশব্যস্তে বলিলেন "থাক্ থাক্, এখন আমার ওপর রাগটা মাপ কর,—ওদের ব্যাপারটাই বল।—তারপর কি হয়েছে ?—"

আমিনা বলিল "কি আর হবে ? তোমার পেয়ারের চাকরকেই জিজ্ঞাসা করো।—তুফানীর সঙ্গে কিরকম সদ্ব্যবহারটা করে কিছু খবর রাখ ?

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া,—প্রাণপণ শক্তিতে নস্য টানিতে টানিতে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তা কি করে রাখ্‌ব ? ওহায়েদ্ তার স্ত্রীর সঙ্গে কখন কি ব্যবহার করে,—সে কি আমায় সাক্ষী রাখ্‌বার জন্যে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় ?"

তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমিনা সজোরে বলিল "চল্লুম!—ফের যদি তোমার সঙ্গে কোন কথা কইতে আসি—"

খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "হাঁ হাঁ, সবুর!—"

আমিনা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল "এক লহমাও নয়! দুয়ারের ছিট্‌কানিটা খুলে দাও, আমি চলে যাই—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "যাবেই তো, এখন একটু থাম।—ওহায়েদ-দম্পতীর-ঝগড়া ঝাঁটি মিট্‌মাটের একটা বন্দোবস্ত না করে তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না, বোস—"

আমিনা বলিল "আমি ওদের ঝগড়া মেটাবার কি বন্দোবস্ত করতে যাব?"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "যেতে কোথাও হবে না, ঘরে বসেই সে বন্দোবস্তটা তুমি ঠিক্ করে ফেল্‌তে পারবে।" এখন শোন বলি,—ওর স্ত্রীকে আজ রাত্রে বাইরে পাঠিয়ে দাও, পারবে ত?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া আমিনা বলিল "না কিছুতেই না! তুফানী কোনমতেই বাহিরে যাবে না—"

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গান।

—ঃ*ঃ—

আমারে ডাক্‌বে তুমি
জানি গো জানি মনে,
সবাকার আঁখির আড়ে,
সবাকার সঙ্গোপনে;
জানি গো সবার শেষে
আমারে ডাক্‌বে হেসে,
যমুনার আঁধার তীরে
মিলনের বৃন্দাবনে।

ওরে ও অন্ধ হিয়া
মেল রে মেল আঁখি!
আলেয়ার আলো খুঁজে
মোহ-ঘোর টুটল নাকি?
জাগ রে জাগ সুখে
মরণের শীতল বুকে,
লুকায়ে অতল-তলে
আঁধারের আলিঙ্গনে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

বৌদ্ধ নরক।

—:✽:—

পুণ্যকর্ম্মের ভূয়ঃ অনুষ্ঠান ও পাপকর্ম্মের বিরতি—সমাজস্থিতির প্রাথমিক ভিত্তি। সৌধের সৌকুমার্য্য মুখ্যতঃ স্থপতির কৌশলাপেক্ষী, গৌণতঃ ভাস্কর ও চিত্রকরের শিল্পপটুত্বসাপেক্ষ। কিন্তু স্থপতির অভাবে সৌধের স্থিতি কল্পনা করা যায় না; যদি সৌধই না রহিল—ভাস্কর কোথায় তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দিবেন,—চিত্রকর কোথায় তাঁহার তুলির রঙ্ ফলাইবেন? সেইরূপ সমাজপতিরা সমাজ-সৌধের সৌষ্ঠবের কথা চিন্তা করিবার পূর্ব্বে সমাজস্থিতি ও স্থায়িত্বের কথাই প্রথমে আলোচনা করেন—সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন। ধর্ম্মই সমাজের প্রাণ, ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মই সংরক্ষক; অধর্ম্ম সমাজের গ্লানি, অধর্ম্ম দৌর্ব্বল্য, অধর্ম্ম ক্ষয় ও ধ্বংস—এককথায় ধর্ম্মে স্থিতি ও অধর্ম্মে বিলয়—এই মূলমন্ত্রই সমাজনিয়ন্তাদের নিরন্তর ধ্যান ও ধারণার বস্তু। কোন্ যুগে কোন্ সমাজের কোন্ ধর্ম্ম তাহা সেই যুগে সেই সমাজের কর্ত্তারা নির্দ্ধারণ করিবেন; কেননা সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ইহার শাশ্বত সনাতন নিয়ম নাই—একই সমাজের এক যুগের ধর্ম্ম অন্য যুগের উপযোগী নহে। তবে উহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোনও বিশিষ্ট যুগধর্ম্মের উপেক্ষা ও অবহেলা সেই সমাজের পক্ষে থাকিবে। এই জন্যই সমাজব্যবস্থাপকগণ সৎকর্ম্মের প্রণোদনার্থে ও অসৎকর্ম্মের নিবারণার্থে একের পুরস্কার ও অন্যের শাস্তির বিধান করিয়াছেন ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

দেহের সর্ব্বাবয়ব পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যই যেমন কান্তি ও লাবণ্যের বিধায়ক, ব্যাধিপীড়িত শীর্ণ কলেবরে বিবিধ কৃত্রিম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেমন প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয় না, তেমনই পরিপূর্ণ-স্বাস্থ্য সমাজেই কেবল সাহিত্য ও চারুশিল্পের সম্ভব হয়; ব্যাধিগ্রস্ত মরণোন্মুখ সমাজে তাহার বিকাশ সম্ভব নয়। হরিৎসরস দ্রুমরাজির শাখাপল্লবই প্রসূনভারে উল্লসিত হইয়া উঠে, নীরস স্থাণু তরুকঙ্কালে পুষ্পদোহদসম্ভব কবিসময়প্রসিদ্ধির অনুকূল হইলেও স্বভাববিরুদ্ধ। এই সমাজস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যে সকল বিধিনিয়ম উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রত্যেক সমাজ-সেবীর একান্ত পালনীয়। এতৎপ্রসঙ্গে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দার্শনিকের চক্ষে নিতান্ত অদার্শনিক মনভুলান পিতামহী মাতামহীর উপকথা হইলেও সমাজরক্ষায় তাহার যথাযথ স্থান ও মূল্য আছে। যাহাদের লইয়া সমাজ তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দার্শনিকখ্যাতির অভিমান করিতে পারেন। ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার—এই তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণকারীর সংখ্যা অঙ্গুল্যগ্রানিবদ্ধ। অতএব পুণ্যের প্রলোভন ও পাপের বিভীষিকা দেখাইয়া 'অদার্শনিক' অপবাদের কলঙ্ক শিরোধার্য্য করিয়াও যদি কোনও ব্রতী সমাজরক্ষণে যত্নবান হন, তবে তাঁহাকে প্রকৃত বীর, প্রকৃত উপকারী বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এতদুপায়ে সমাজসংরক্ষণচেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে যুগেযুগে দেশেদেশে বিভিন্নজাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার জন্য যে যে জাতির খ্যাতি, তাহাদেরই মধ্যে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দেখিতে পাই। গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়, টিউটন, মুসলমান ও হিন্দুগণ তাঁহাদের স্বস্ব বুদ্ধিবিবেক কল্পনার স্ফুরণের অনুপাতে স্বস্ব ধর্ম্মের অনুমুখ স্বর্গ ও নরক গড়িয়াছেন। প্রথমতঃ সংহিতাকারগণ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সাধারণ লোককে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার ও অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার জন্য মোটামুটিভাবে স্বর্গের সুখৈশ্বর্য্য ও নরকের ভীষণ যন্ত্রণার বর্ণনা করিয়াছেন। এই অসংস্কৃত উপাদান প্রকৃত কারিগরের হাতে পড়িয়া ক্রমবিবর্ত্তন নিয়মে শিল্পের বস্তু হইয়া

প'ড়িয়াছে। মহাকবিগণ স্বস্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই উপাদানকে নিয়োজিত করিয়া আর্টের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। গ্রীক মহাকবি হোমর, ল্যাটিন মহাকবি ভার্জ্জিল, ইতালীয় মহাকবি দান্তে, ইংরেজ মহাকবি মিল্টন, বাঙ্গালীর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। ওডিস, এনীড্, ডিভাইনা কমোডিয়া, প্যারাডাইস্ লষ্ট, মেঘনাদবধকাব্যে তাঁহাদের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। টিউটনের সাগা গ্রন্থে, য়ুহুদীর তালমুদে, মুসলমানের কোরাণে, হিন্দুর রামায়ণমহাভারতে ও বৌদ্ধের ধর্ম্ম ও জাতকগ্রন্থসমূহে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ নরকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। সিবিলের সহিত এনিয়াসের মত, ও বৌদ্ধের সাহত দান্তের মত, মায়ার সহিত রামচন্দ্রের মত, দেবদূতের সহিত যুধিষ্ঠিরের মত, মাতলির সহিত নিমির মত পুণ্যবান পাঠক চলুন একবার বৌদ্ধ নরক ঘুরিয়া আসি।

আমরা নিমিজাতকে পাঠ করি যে মাতলির সহিত বিদেহনৃপতি নিমি, নরক দর্শন করিতেছেন। মাতলি নিমিকে নরকের নদী বৈতরণী দেখাইলেন।

পুতিগন্ধময়, ক্ষার লবণাম্বু, উষ্ণোদক, জ্বালাময়ী শিখা পরিবেষ্টিত বৈতরণী দেখিয়া রাজা ভীতচিত্তে মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সারথি, এই যে অশরীরিগণ তপ্ত নদীতে নিমজ্জিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, উহারা কোন্ পাপে পাপী?" পাপ পরিপক্ক হইয়া কিরূপে ফল প্রসব করে, তাহার বর্ণনা করিয়া মাতলি কহিলেন, "হে রাজন, যাহারা সংসারে ধনমদে দর্পিত হইয়া দুর্ব্বলের পীড়ন করে, তাহারা পাপ অর্জ্জন করিয়া এই বৈতরণীতে নিক্ষিপ্ত হয়।"*

বৈতরণী অন্তর্হিত হইলে, রাজা নূতন দৃশ্য দেখিলেন। কৃষ্ণকুক্কুর, শবল গৃধিনী, ভীষণ বায়স কর্ত্তৃক বিক্রন্ত পাপীগণকে দেখিয়া নিমি কহিলেন—"সারথি, আমি এই দৃশ্য দেখিয়া ভয় পাইতেছি। কে উহারা?" "ইহারা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীকে কটু বাক্য কহিবার জন্য এখানে বায়স কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে।"

জ্বলন্ত পাবকে অবলুণ্ঠিত ও লোহিতবর্ণ অয়সপিণ্ড কর্ত্তৃক চূর্ণীকৃত পাপীগণকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—"কে ইহারা?" সারথি উত্তর করিলেন, "মর্ত্ত্যে ইহারা নিরীহ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণকে জ্বালাযন্ত্রণা দিবার পাপে এখন তপ্ত লৌহগোলকদ্বারা পিষ্ট হইতেছে।"

জ্বলন্তঅঙ্গার গহ্বরে ভর্জ্জিত পাপীগণের চীৎকার শ্রবণে ব্যথিত রাজা জিজ্ঞাসিলেন—'কে উহারা?' "জনসঙ্ঘের সমক্ষে ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল ও স্বস্ব ঋণ অস্বীকার করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য এই পাবকচুল্লীতে সিদ্ধ হইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।"

* হিন্দুশাস্ত্রে বৈতরণীর বর্ণনা এইরূপ :—

> নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
> উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ তরঙ্গিনী।

মেঘনাদবধকাব্যে অষ্টমসর্গে বৈতরনীর বর্ণনা তুলনা করুন :—

> বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
> বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
> তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
> উচ্ছ্বলিয়া ধূমপুঞ্জ, প্রস্তু অগ্নিতেজে।

ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বালাময় বহ্নিপরিবৃত বিপুল লৌহকটাহ অবলোকন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন—"অধোমুখ, উর্দ্ধপদে পাপীগণ যে তপ্ত লৌহকটাহে বিস্পষ্ট হইতেছে, উহারা কে ?" "নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের নির্য্যাতন হেতু এই লৌহকটাহে উহারা দগ্ধ হইতেছে।"

"ওই যে ভগ্নগ্রীব পাপীগণ উত্তপ্ত পয়োপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোন্ পাপে উহারা কলুষিত ?" "এই দুষ্টগণ সংসারে বিহগকুল ও অন্য তির্য্যক্‌জাতির সংহারের নিমিত্ত নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজেরা ভগ্নগ্রীব হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।"

"ঐ যে গভীর নদী প্রবাহিত হইতেছে, আর উহার বেলাভূমিতে কতকগুলি প্রেতমূর্ত্তি অগ্নিতপ্ত হইয়া তৃষ্ণা প্রশমনাভিপ্রায়ে যেমন অবনত হইতেছ আর জলরাশি তুষরাশিতে পরিণত হইতেছে, উহারা কে ?" "উহারা ক্রেতৃগণকে বঞ্চনা করিয়া তুষমিশ্রিত শস্যকণা বিক্রয় করিবার পাপে এখন অগ্নিদগ্ধ, পিপাসাতুর হইয়া জল পান করিতে উদ্যত হইবামাত্র জলের পরিবর্ত্তে তুষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।"

ভল্ল, বর্ষা ও ইষুফলকবিদ্ধ হইয়া যে প্রেতগণ নিরন্তর বিকট চীৎকার করিতেছে, কে উহারা ?" "ঐ দুষ্টগণ পরস্বাপহারী—রজতসুবর্ণ, ধনধান্য, গোমেষছাগ প্রভৃতি পরের সামগ্রী হরণ করিয়া—বর্ষাফলক বিদ্ধ হইয়া এখন তাহার ফলভোগ করিতেছে।"

"ঐ যে কতকগুলি প্রেতমূর্ত্তিকে গলদেশে রজ্জুবদ্ধ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে কর্ত্তন করা হইতেছে, উহারা কোন্ অপরাধে অপরাধী ?" "উহারা মৎস্যজীবী, কসাই, লুব্ধক, অথবা গোমেষছাগমহিষাদির হন্তারক। গতায়ুঃ প্রাণিগণের দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার পাপে আজ নরকে শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।"

"বিকট দুর্গন্ধময় পুরীষহ্রদে ঐ যে বুভুক্ষু প্রেতগণ সাগ্রহে মলমূত্র গ্রাস করিতেছে, উহাদের এ শাস্তি কেন ?" "পরশ্রীকাতর, অসূয়াপরবশ হইয়া উহারা বন্ধুর নিকট থাকিয়া তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সেই পাপ জীর্ণ করিবার নিমিত্ত এই বীভৎস ভক্ষ্যের ব্যবস্থা।"

পূতিগন্ধময় তপ্ত রক্তহ্রদের পানীয়ে ঐ-যে প্রেতমূর্ত্তিগুলি তৃষা নিবারণ করিতেছে, উহারা কে ?" "ভক্তিপূজাপাত্র পিতামাতার প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের এই শাস্তিভোগ।"

"চর্ম্মে বিদ্ধ শতশত বিশিখের ন্যায় ঐ যে পাপীদের জিহ্বা লৌহকণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছে, আর জলাশয় হইতে উত্তোলিত মৎস্যের ন্যায় যাতনায় নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতেছে, কে উহারা ?" "উহারা মর্ত্ত্যভূমে লোভ পরবশ হইয়া বিপণীতে ক্রেতাগণের সহিত মিছামিছি দর করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহাদের ধূর্ত্ততা চিরকাল লুক্কায়িত থাকিবে ; কিন্তু তাহা হয় নাই। বঁড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় এখানে তাহারা যন্ত্রণা পাইতেছে।"

"দূরে দেখিতেছি যে বিস্তৃতবাহু, রক্তাক্তকলেবর ভগ্নপৃষ্ঠ কতকগুলি নারী বিলাপ করিতেছে—তাহাদের কটিদেশপর্য্যন্ত ভূমিতে প্রোথিত, উর্দ্ধভাগ বহ্নিবেষ্টিত,—উহারা কোন্ দোষে দোষী ?" "উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উৎসন্ন নীচকার্য্যে বংশগৌরব মলিন করিয়াছে। বিশ্বাসহন্ত্রী, স্বামিত্যাগিনী কুলটা ঐ নারীগণ জঘন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কোনও পাপকর্ম্মে বিরত না হইয়া সুরতকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।"

তাহার পর রাজা পরদারগামী, পরধনাপহারী, পরধর্ম্মাবলম্বী প্রেতগণের শাস্তি দর্শন করিয়া স্বর্গাভিমুখে চলিলেন।

পাঠক অবগত আছেন যে মহারাজা অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় তাহার পিতা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রাণনাশ করিবার জন্য বিবিধ

উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি শ্রাবস্তি গমন করেন। তথায় জেতবনের প্রবেশ দ্বারে ক্ষিতিতল ভিন্ন হইয়া তিনি অবীচি নরকে নিক্ষিপ্ত হন। অজাতশত্রুও সেই ভয়ে ভীত হইয়া বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। সেই প্রয়াসে বুদ্ধদেব যে কাহিনী বলেন তাহার নাম সঙ্কিচ্চ-জাতক তথায় সঙ্কিচ্চ কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্তের নিকট নরকের বর্ণনা করিয়াছেন।

"রাজন, যে সমস্ত জীব, ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া অধর্ম্মের পথ গ্রহণ করিয়াছে, নরকে তাহারা কি যাতনা সহ্য করে তাহারকথা শুনুন। সঞ্জীব, কালসূত্র, রৌরব, মহারৌরব, সঙ্ঘাত, অবীচি, তপন, পতাপন- নামে আটটা বৃহৎ নরক আছে। ইহাদের হইতে পলায়ন অসম্ভব। উস্‌সদ নামক ১২৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরক আছে। পাপীগণ এইখানে বহ্নিজালায় সন্তাপিত হয়। ভয় যাতনা দুঃখময় এই প্রদেশ। প্রত্যেকটী চতুর্দ্দ্বার বিশিষ্ট চতুষ্কোণাকৃতি। লৌহময় তাহার কুট্টিমতল, লৌহময় তাহার প্রাচীর, লৌহময় তাহার শীর্ষদেশ—শতযোজন ব্যাপী বহ্নিতে ও তাহা দ্রবীভূত হয় না। যাহারা ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীর অবমাননা করে, তাহারা অধোমুখ হইয়া ইহাতে ত্যক্ত হয় আর উঠে না, তপ্তপাত্রে ভর্জ্জ্যমান মৎস্যের মত অগণিত বর্ষ তাহারা স্বীয় পাপের জন্য ভর্জ্জিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোন দ্বার দিয়াই পলায়ন অসম্ভব। মহাপন্নগবিষ যেমন ত্যাজ্য তদ্রূপ ব্রতাচারী সন্ন্যাসী-গণের রোষও পরিহার্য্য। গোতমের অবমানকারী সহস্রভুজ, মহেশ্বাস কেকারাজ অর্জ্জুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের লাঞ্ছনাকারী অন্ধকগণ, মেজ্ঝ, দণ্ডকি প্রভৃতি নৃপবৃন্দ নরকে পচিতেছেন। লোভ অথবা মাৎসর্য্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে নরপাংশুল পিতৃহত্যা করে, অনন্তকাল ধরিয়া কালসূত্র নরকানলে সে দগ্ধ হয়। অয়সকটাহে বিদ্ধ হইয়া তাহার গাত্র হইতে মাংস খসিয়া খসিয়া পড়ে, অয়সশরে বিদ্ধ হইয়া তাহার চক্ষু উৎপাটিত হয়, সে ক্ষারজলে বিসৃষ্ট হয়, পুরীষ ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়, এইরূপে সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। মুখ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য জ্বলন্ত হলফলকে অথবা লৌহপিণ্ড মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, অথবা সুদৃঢ় রজ্জুর সাহায্য লওয়া হয়। এবম্বিধ মুখে মলমূত্র প্রদত্ত হয়। অসিত অথবা পিঙ্গল বর্ণ ক্রব্যাহারী গৃধিনী কাকোলগণ কঠিন লৌহচঞ্চু বিশিষ্ট বিবিধ শকুন, সিংহ খণ্ডখণ্ড করিয়া তাহার জিহ্বা বিদীর্ণ পূর্ব্বক সেই রক্তার্দ্র মাংসপিণ্ড ভক্ষণ করিতে থাকে। ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান প্রমথগণ দগ্ধ বক্ষোদেশে অথবা ভগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকট ঘোর হাস্যসহকারে ভীষণ মুষ্টি বৃষ্টি করে। মাতৃঘাতীর শাস্তি কম নিদারুণ নহে। বিকটাকার দানবগণ লৌহময় ভীম হলাগ্রে তাহার পৃষ্ঠদেশ কর্ষিত করিয়া দ্রবীভূত তাম্রের মত রক্তের স্রোত বহাইয়া দেয়, ও এই বীভৎস পানীয়দ্বারা তাহার পিপাসার জ্বালা শান্ত করে। রক্তশোণিতহ্রদে ভাসমান ন্যাকার জনক গলিত শবে সেই দেশ দুর্গন্ধীকৃত। শোণিত কর্দ্দমের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠে, ভীষণ লৌহসূচীমুখ কৃমিকীট গাত্রচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া সোৎসুকে সেই মাংস ভক্ষণ অথবা রক্তপান করিতেছে।*

* নিরবিলে দৈববাণী, ভীষণ মুরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে,
কাটে কৃমি বজ্রনখা মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ে ছায়া দেহে ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ী
হুহুঙ্কারে। আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী।—মেঘনাদবধ অষ্টম সর্গ।

ভ্রূণহত্যাকারীগণ ক্ষুরধার নামক নরক হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ স্রোতের বৈতরণী নামক নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। সেই নদীর উভয় তীরে সুদীর্ঘ লৌহকণ্টক বিশিষ্ট উচ্চশির অনলমাণ্ডত শাল্মলীতরু বিরাজিত। এই সুতীক্ষ্ণ লোহিতাভ তপ্তকণ্টকে বিদ্ধ হইয়া ব্যভিচারী বিশ্বাসহন্তা পতিগণ ও অসতী নারীসমূহ কষ্ট পাইতেছে। লৌহবেত্রাদ্দিত পৃষ্ঠদেশ, ঊর্দ্ধপদ অধোমুখ, নিকৃত্তাবয়ব পাপীগণ সারারাত্রি যন্ত্রণায় জাগরিত হইয়া আছে। শৈলেপম স্ফুটিত পয়ঃপূর্ণ লৌহকটাহে প্রত্যুষে তাহারা লুক্কায়িত হইয়া স্বস্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। পণলব্ধ যে স্ত্রী স্বামী অথবা তাহার পরিজনবর্গকে ঘৃণা অথবা অমর্য্যাদা করে, তাহার রসনা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া অসংখ্য কৃমির আহার্য্য হয়। তপন নরকে তাহাকে ভীষণ যাতনা সহ্য করিতে হয়।

গোমেষশূকরহন্তৃগণ, মৃগয়াকারীগণ, মৎস্যজীবিগণ ও দস্যুগণ লৌহমুদ্গর পিষ্ট হইয়া অথবা বর্ষাফলক ও সায়কবিদ্ধ হইয়া লবণাম্বুতে পতিত হয়। জালিয়াতগণ দিবানিশি লৌহগদাদ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়া অন্য কোন পরস্ত্রীর উদ্গীরিত পুরীষতুল্য ভুক্তদ্রব্যে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। লৌহমুখ কাক, কাকোল, গৃধিনী, গৃধ্র, সকলেই এই যাতনা ক্লিষ্ট পাপীগণের মাংসে স্বীয় অতৃপ্ত জঠর পুরাইতেছে।

ইহা ব্যতীত চতুদ্বার জাতকে উস্‌সদ নিরয়ের উল্লেখ পাই। তথায় মিত্তবিন্দক নামে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবা, মাতাকে প্রহার করিয়া নরকগামী হইয়াছে। ঐ নগর মিত্তবিন্দকের নিকট সুরম্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। সে সঙ্কল্প করিল—আমি উহার রাজা হইব। সেখানে সে এক পাপীর শীর্ষদেশে ক্ষুরধারবৎ এক চক্রকে ঘূর্ণায়মান দেখিতে পাইল—তাহার যে যাতনা হইতেছে তাহা তাহার মনে হইল না। সে ভাবিল যেন তাহার মস্তকদেশে পদ্ম রহিয়াছে। শৃঙ্খলকে সে মাল্য বলিয়া, রক্তবিন্দুকে চন্দন বলিয়া, বিকট আর্ত্তনাদকে সুমিষ্ট গীত বলিয়া ভ্রম করিল। পরে বুঝিতে পারিল যে লৌহ কুলালচক্র পদ্ম নহে—ক্ষুরচক্র।”

অন্য অন্য জাতকে আমরা লৌহ-কুম্ভী, গূহনিরয় (বিষ্ঠানরক)। কাকনিরয়, পদুমনিরয় প্রভৃতি নরকের কথা পড়ি। মহানারদ কস্সপ জাতকের বর্ণিত নরক সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়া বৌদ্ধ নরক বর্ণনা শেষ করিতেছি।

শবল ও সাম নামে বিপুলকায় মহাবলশালী দুটি কুক্কুর লৌহদন্ত দ্বারা পাপীগণকে খণ্ড খণ্ড করে।

চতুর্দ্দিকে ক্ষুরসংযুক্ত অগ্নিশিখা বেষ্টিত শৈল আরোহণ করিবার সময় পাপীর ত্বক্ ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্ত নিসৃত হইতে থাকে। সুতীক্ষ্ণ লৌহভল্লযুক্ত, রক্তপায়ী, কণ্টক সমাকীর্ণ, কৃষ্ণমেঘতুল্য বনে যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পাপীগণকে প্রবেশ করিতে হয়। নরকের সেই ভীষণ রক্তকলঙ্কিত শাল্মলীতরু আরোহণ করিবার সময় ত্বক্ ভিন্ন ও অপসারিত হয়। সেখানে মেঘপুঞ্জের মত ঘন উচ্চ উচ্চ বনশ্রেণী আছে। শত শত তরবারি তাহার পত্র, মনুষ্যরক্তপায়ী লৌহছুরিকা দ্বারা তাহারা মণ্ডিত, সেই পথে প্রবেশ করিতে গিয়া পাপীগণ রক্তাক্ত কলেবর হয়।

এই নরকবর্ণনায় এমন কিছু বিশেষত্ব নাই। হিন্দু নরকের বর্ণনাও প্রায় এই প্রকারের। বাস্তবিক দান্তে ও ভার্জ্জিলের নরক বর্ণনার সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মেঘনাদবধের কবির কাব্যে নরকের বর্ণনা বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু পুরাণোক্ত নরক, এনীড বর্ণিত নরক, ডিভাইনা কমেডির নরক, (Fairie Queene) ফেরী কুইনের নরক—এই সবগুলির সংমিশ্রণে তাহার নরক গঠিত হইয়াছে। যাহারা এই মহাকাব্যগুলি পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্থলে স্থলে মনে হইবে যেন মেঘনাদ কাব্যে এগুলির অনুবাদ পাঠ করিতেছেন। অতএব যদি বৌদ্ধ নরকের স্থান বিশেষের সহিত মেঘনাদবধকাব্যের নরকের সাদৃশ্য থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই—যেহেতু প্রধানতঃ হিন্দুনরকের ছায়া

লইয়াই বৌদ্ধ-নরক গঠিত হইয়াছে ইহাই আমার ধারণা। আমি আপাততঃ মহাভারত হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সমর্থন করিতেছি।

* * * * * *

ইতশ্চেতশ্চ কুণপৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥ ১৮॥
অস্থিকেশ সমাকীর্ণং কৃমিকীটসমাকুলম্।
জ্বলনেন প্রদীপ্তেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্॥ ১৯॥
অয়োমুখৈশ্চ কাকাদ্যৈর্গৃধ্রৈশ্চ সমভিদ্রুতম্।
সূচীমুখৈস্তথা প্রেতৈঃ বিন্ধ্যশৈলোপমৈর্বৃতম্॥ ২০॥
দদর্শোষ্ণোদকৈঃ পূর্ণাং নদীং চাপি সুদুর্গমম্॥ ২৩॥
অসিপত্রবনং চৈব নিশিতং ক্ষুর সংবৃতম্॥ ২৩॥
করম্ভ বালুকা তপ্তা আয়সীশ্চ শিলাঃ পৃথক্।
লৌহকুম্ভীশ্চ তৈলস্য ক্বাথ্যমানাঃ সমন্ততঃ॥ ২৪॥
কূটশাল্মলিকং চাপি দুস্পর্শং তীক্ষ্ণকণ্টকম্।
দদর্শানাশ্চ কৌন্তেয়ো যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্॥ ২৫॥

—মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—দ্বিতীয় অধ্যায়।—

লৌহমুখকাক প্রভৃতি ক্রব্যাহারী শকুনগণ, অসিপত্রবন, ক্ষুরসংযুক্তবন, লৌহকুম্ভী, তীক্ষ্ণকণ্টক শাল্মলীতরু—আমরা বৌদ্ধনরকে দেখিতে পাইয়াছি। অনুশাসন পর্ব্বে ২২৯।২৩০ অধ্যায়ে মহেশ্বর, উমার নিকট নরকবর্ণনা করিতেছেন। তাহা হইতে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

অসিপত্রবনে ঘোরে চারয়ন্তি তথা পরাম্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্তথা শ্বানঃ কাংশ্চিত্তত্র হরন্তিবৈ॥ ৩২॥
তত্রবৈতরণী নাম নদী গ্রাহ সমাকুলা।
দুস্প্রবেশা চ ঘোরা চ মূত্রশোনিত বাহিনী।
তস্যাং সংমজ্জস্রোতে তৃষিতাম্ পায়য়ন্তি তাম্॥ ৩৩॥
আরোপান্তি বৈ কাংশ্চিত্তত্র কণ্টকশাল্মলীম্।
যন্ত্রচক্রেষু তিলবৎ পীড্যন্তে তত্র কেচন॥ ৩৪॥
অঙ্গারেষু চ দহ্যন্তে তথা দুষ্কৃতকারিণঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে পচ্যন্তে সিকতাসু চবৈ॥ ৩৫॥

প্রথমং রৌরবং নামম্ শতযোজনমায়তম্।
ভৃশং দুর্গন্ধ পঙ্কবং ক্রিমিভির্দারুণৈর্বৃতম্॥
অতিঘোরং অনির্দ্দেশ্যম্ প্রতিকুলম্ ততস্ততঃ।

মহারৌরবসংজ্ঞং তু দ্বিতীয়ং নরকং প্রিয়ে।
তৃতীয়ং নরকং তত্র:কণ্টকাবন সংজ্ঞিতম্।

*　　*　　*　　*

অগ্নিকুণ্ডমিতিখ্যাতং চতুর্থং নরকং প্রিয়ে।

*　　*　　*　　*

দুঃখস্থানমিতি প্রাহুঃ পঞ্চকষ্টমিতি প্রিয়ে।

*　　*　　*　　*

অন্যে চ নরকাঃ সন্তি অবীচি প্রমুখাঃ প্রিয়ে।

শ্রীকালীপদ মিত্র

বন্দী।

কভু,　কাজল-আঁকা কমল-চোখে
　　　অশ্রু জলে ভাস !
কভু,　রক্ত-রাঙ্গা গোলাপ-ঠোঁটে
　　　মোহন হাসি হাস !
হেরি,　স্তব্ধ কভু চন্দ্রবদন
　　　মেঘের অভিমানে
কিবা,　সোহাগ-সুখে চকিৎ চাহ'
　　　আমার মুখপানে !
তুমি,　লক্ষ্মী কভু ঘরের কোণে
　　　লজ্জাবতী লাজে,
কভু,　কঠোর তব বজ্রশোভা
　　　বুকের মাঝে বাজে !
কভু,　তীব্ররূপে দহন করে
　　　অগ্নি শুধু জ্বালো,
কভু,　শান্তরূপে স্নিগ্ধ তুমি
　　　শান্তিবারি ঢালো !

তুমি, শীতল কভু তুষার-সাদা
পাষাণ হৃদে মম,
কভু, সপ্ত-রঙা—বর্ণঘটায়
ইন্দ্রধনু সম !
তব, রূপান্তরের অসীম লীলা
ঢেউয়ের মত ভঙ্গী,
তুমি, লক্ষ ফুলের কণ্ঠমালা
হাজার রঙে রঙ্গী !
আমি, হার মেনেছি দ্বন্দ্ব কেন ?
এখন্ কর সন্ধি,
শুধু, রেখোই মনে একটা কথা
'তোমার আমি বন্দী !'

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

পার্ব্বতী।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট পাহাড়ি-মেয়ে পার্ব্বতী। নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল পাহাড়ের কোল দিয়ে ছুটে চলত, পিঠের উপর মোটা কালো বেণী দুলে উঠ্‌ত, লাল টুক্‌টুকে গালের উপর আকাশের রোদ পিছ্‌লে পড়্‌ত, পাহাড়ের শক্ত বুকের উপর কোমল পায়ের চাপ দিয়ে পার্ব্বত্যতরুর শাখা ধরে সে যে নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত তা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ত না। গরীব মাবাপের একটি মাত্র মেয়ে বড় আদরের—কিন্তু আদরের অনুরূপ যত্ন হ'ত না সে শুধু টাকার অভাবে। কচিগায়ে কোন দিন নতুন কাপড় দিতে পারে নি মা বাপ—নিজেদের পুরাণ কাপড়ের ছেঁড়া কালো ঘাগ্‌রা আর কুর্ত্তি পরিয়ে এই দশ বছর তাকে পালন করেছে, শীতের দিনে পাথরের কুচি পায়ে ফুটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে—তবু নতুন জুতা কিনে দিতে পারে নি, এ-কষ্ট যে মাবাপের প্রাণে কত গভীর কত বিরাট, তা শুধু মাবাপের প্রাণই জানে !

তারা দিন আন্‌ত—দিন খেত, বাপ তার পথের ধারে বসে ছোট ছোট ঝুড়ি ডালা তৈরী করে বিক্রী করত, আর মা তার পিঠের উপর বড় বড় বোঝা ফেলে যাত্রীদের মালপত্র পৌঁছে দিত। যে খুসী হয়ে যা দিত তাইতেই দিন কেটে যেত, তারা কোন দিন মনে অসন্তোষ আনে নি—এই মনে করে যে ভগবান তাদের পরের দোরে ভিক্ষে চাওয়ান নি। খেটে খায় এই তাদের সুখ,—আর বাকি যা অভাব—সে পার্ব্বতী পূর্ণ করেছিল ! এমনি করে সুখে-দুঃখে দিন কেটে যেতে লাগল, পার্ব্বতী বড় হতে লাগ্‌ল। যেমন করে সকাল বেলার গোলাপ কুঁড়িটি সারাদিনের

রৌদ্র-তাপেও একটি একটি করে দল মেলে দিতে থাকে তেমনি করে এত অভাবদুঃখের ভিতরেও তার যৌবনের কুঁড়িটি তার সর্ব্বাঙ্গে একটি একটি করে সৌন্দর্য্যের দল মেলে দিতে লাগ্‌লে ! তার গোলাপী গালের আভা আরো গাঢ় হ'ল, তার চোখের তারা আরো কালো হ'ল, তার চুলের বেণী আরো পুষ্ট হ'ল, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুডোল হ'ল, তার পায়ের চলন মৃদু হ'ল, তার মুখের হাসি আরো সলাজ হ'ল !—আর অত্যন্ত গোপনে প্রেমের দেবতা তার প্রাণের সিংহাসনের উপর বসে অর্থাভাবকে বিদ্রূপ করে নানারকম যাদু বিস্তার করতে লাগ্‌লেন।

পার্ব্বতী এখন তার মাকে সাহায্য করে, সেও এখন ষ্টেশনে গিয়ে নবাগত অতিথিদের ভার বহন করে নিয়ে যায়, তার নবজাগ্রত শক্তিতে সে পার্ব্বত্য-পথের উপর দিয়ে অক্লেশে ছুটে চলে, কপালের উপর দিয়ে মুক্তাবিন্দুর মত ঘর্ম্মবিন্দু ঝড়ে পড়ে—সে ভ্রূক্ষেপও করে না।

পূজার ছুটীতে বড় কাজের ভিড় ! কত দেশবিদেশের লোক আসে, কত রকম-বেরকমের পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র ভাষা ! এ সময়ে পার্ব্বতীদের আর অবসর থাকে না, সেই সকালে উঠে একটু রুটি খেয়ে বাহির হয় আর সারাদিনে আহার বিশ্রামের সময় থাকেনা। সে-বছর পার্ব্বতীর বাপমা মনে করেছিল—যেমন করে হ'ক পার্ব্বতীর বিয়ে দেবে, সে ত সহজ নয়—সে যে অনেক টাকার কাজ, তাই বাপমা আর মেয়ে মিলে উপার্জ্জনের দিকে মন দিয়েছিল। কাজের আনন্দে পার্ব্বতী ভুলে গিয়েছিল—এ কিসের আয়োজন, তবু এতে সে আনন্দ পেত,—কি যেন হবে—যাতে নূতনত্ব আছে, আর ভাবনা চিন্তার অবসান আছে—যে ভাবনা এতদিন থেকে তার বাপমাকে পীড়া দিচ্ছে, এমন কি তার মনকে নিস্তার দেয়নি।

সে দিন তার মার অসুখ, পার্ব্বতী একা গিয়েছিল ষ্টেশনে, গাড়ীর শব্দ, লোকজনের কোলাহল, যাত্রীদের হুড়াহুড়ি, নবাগতদের ব্যাকুলতার মাঝে পার্ব্বতী একা যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাক্‌লে "কুলি" "কুলি" ! পার্ব্বতী ফিরে দেখ্‌লে একজন বাবু। সে উৎফুল্ল হ'য়ে তার বাক্সটিকে কপালের উপর ঝুলিয়ে পিঠে ফেলে নিলে। যুবার বয়েস অল্প, প্রতিপাদক্ষেপে সাদা পায়ের উপর ধুতির কোঁচায় কালো পাড় দুলে উঠ্‌ছে, কালো কোঁকড়া চুল গ্রীবার উপর ঝুলে পড়েছে, আর পার্ব্বতী তারই অনুসরণ করে চলেছে। তারপর পথ ফুরাল, পার্ব্বতী ভার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল, বাবু কি মনে করে পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করে তার হাতে দিলে, চোখে তার করুণা ছাড়া আরো কিসের দীপ্তি ছিল—সে-কি স্নেহ—সে-কি আর কিছু ? পার্ব্বতী সেলাম করে পথে যেতে-যেতে কি ভেবে আর একবার ফিরে চাইলে, তারপর বিলম্ব না করে দ্রুতপায়ে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

প্রায়ই পথে ঘাটে যুবার সঙ্গে দেখা, পার্ব্বতী ভুল করে অন্য পথে চলে যায়, এমন প্রায় নিত্যই হ'তে লাগ্‌ল। পার্ব্বতীর মন যে যুবার কথা ভাবে—যুবাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়, একদিন যুবাকে না দেখ্‌লে কেন যে তার সারাদিনটা [illegible] হয়ে যায়—কেন যে চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কেন যে সারারাত দুঃস্বপ্নে ভরে ওঠে—তা সে নিজেই টের পায় না। সে নানা ছল করে দিনে পাঁচবার করে যুবার বাড়ীর সমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, কতবার সে বাড়ীর ফটকের কাছে বিশ্রাম কর্‌তে বসে, এ জন্য তার কত কাজের ক্ষতি হয়, মার কাছে তিরস্কার পায় তবু সে একবার করে দেখ্‌বার লোভ কিছুতেই ছাড়্‌তে পারে না। আবার সময়ে-সময়ে পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে চোখোচোখি হবামাত্র মনে হয় একি তার মতিচ্ছন্ন হ'ল, তখন তাড়াতাড়ি না দেখার ছল করে লজ্জায় মুখ আরক্ত করে কাজের পথে ছুটে যায়। বাড়ীতে গিয়েও তার মনে স্বস্তি থাকে না, বাপমা কি টের পেয়েছেন ? সে চোখ তুলে তাঁদের মুখে চাহিতে পারে না, পেট ভরে খেতে পারে না, বাপমার কাছে আগের মত আব্দার কর্‌তে পারে না।

টাকা ত জমেছে এখন পাত্র চাই যে. অল্প বয়েস চাই, ভাল বাড়ী চাই, আবার তু'পয়সা যদি হাতে থাকে তবেই বাপমার সাধ পূর্ণ হয়। এমনটি পাওয়া কি সোজা কথা? শেষে একজন জুটল, নেপালী এক যজমানের ছেলে কিন্তু বয়েস বড় বেশী—তা আর কি করা যায়! এমন পাত্র হাত ছাড়া করা উচিত নয়—বিশেষ মেয়ে যখন পয়সার মুখ দেখ্‌বে। বাপমা মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনা কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর এদিকে পার্ব্বতীর তরুণ-জীবনের তরুণ-জগত অন্ধকারে ছেয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তার সঙ্গিনীরা তাকে দেখ্‌লেই বিয়ের কথা নিয়ে ঠাট্টা করে. প্রাচীনারা উপদেশ দেয়.—পার্ব্বতী অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল! এই বিপদ থেকে কেমন করে নিস্তার পাবে এই ভেবে-ভেবে সে আহারনিদ্রা ত্যাগ কর্‌লে! সে কেমন করেই বা তার মাকে জানায়, এ যে তার বাপমায়ের বড় আহ্লাদের কথা, চির কালের ইচ্ছা! সে আহ্লাদ সে ভেঙ্গে দেবে কেমন করে? আর কেন? নিজের মনেই ভাবে, যুবাকেই-বা কেমন করে জানাবে, কি বল্‌বে সে? ভাব্‌তে গিয়ে তার হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম করে, তার সমস্ত দেহের রক্ত, মুখে ছুটে এসে ফেটে বা'হর হতে চায়। এযে অসম্ভব, যুবা-যে বাঙ্গালী, যুবা-যে বিদেশী.! তবু জানি না কোন্ দুরাশায় সে যুবার বাড়ীর কাছেকাছে ফেরে, দূর থেকে যুবাকে দেখে, তার ইচ্ছা করে সে ছুটে গিয়ে বলে ওগো বিদেশী বঁধু, এ-তুমি কি করছ—আর-যে চরণে ঠাই না দিলে বাঁচিনে! কিন্তু মনের বাসনা—মনেই রয়ে যায়, কোথা থেকে পোড়া লজ্জা এসে মনটাকে দুম্‌ড়ে ফেলে, এমনি একদিনের লজ্জার-মুখ সেই যুবাটি দেখে ফেল্‌লে। কি ভেবে তার পরদিন তার বাড়ী যাবার জন্য বল্‌লে। পার্ব্বতীর সে-দিন সে-রাত যেন তার বুকের ভিতর তাণ্ডব নৃত্য বাধিয়ে দিলে, সে-যে কি বল্‌বে, কেমন করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার প্রার্থনা কর্‌বে, কেমন করে যে তার গোপনমনের অত্যন্ত গোপনপ্রেম নিবেদন কর্‌বে তাই হাজার-বার করে হাজার-রকমে ভেবে রাখ্‌তে লাগ্‌ল! কিন্তু বল্‌তে-যে হবেই সে নিশ্চয়, সময়ও বড় বেশী নাই, কাল বাদে পরশু তার আশীর্ব্বাদ, সে হাতযোড় করে বার বার বল্‌লে "হে ঠাকুর এর মাঝে যেন পরিত্রাণের উপায় করে দিও।—তাঁকে যেন পাই!"

একটু বেলা হয়েছিল তখন, যুবা বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়্‌ছিল, এমন সময় পার্ব্বতী এসে সোপানের এক পাশে দাঁড়াল; যুবা, চোখের উপর থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে পার্ব্বতীকে বস্‌তে বল্‌লে। প্রথমেই যুবা কথা পাড়্‌ল;—তার দারিদ্রের কথা, অভাবের কষ্ট কি বড় বেশী, কি করে তাদের রোজগার হয়—ইত্যাদি। পার্ব্বতী. মনেমনে হাজারবার ভাব্‌লে তার মত ধনী আর কে আছে পৃথিবীতে, কিন্তু মুখে যুবার কথায় সায় দিয়ে গেল; সে কিছুতেই স্থির কর্‌তে পার্‌লে না, এই কথার স্রোতকে সে কেমন করে ফেরাবে। কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল, তার মনের গোছান কথা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার চিরঅভ্যস্ত দেহ, আজ প্রথম এই শীতে যেন জমে হিম হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, তার সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তখন কুচি কুচি মেঘ. পাহাড়ের মাথায় জমা হচ্ছে—আর স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র ক্ষণেক্ষণে ম্লান আবার ক্ষণেক্ষণে উজ্জ্বল হচ্ছে। আর পার্ব্বতীর মন সন্দেহতে দুল্‌ছে। সে দিন যুবার বুঝি অবসর ছিল, তাই একটি একটি কথা কয়ে পার্ব্বতীর নাম, তার বাপমায়ের কথা, তার শৈশবের কথা সবই জেনে নিলে। শেষে হঠাৎ কি মনে করে বল্‌লে "আচ্ছা পার্ব্বতী, তুমি আমার কাছে চাকরী করবে?" পার্ব্বতী ভাব্‌লে সে বুঝি আর এ-সুখ সইতে পারে না, সুখেরও যে এত বড় আঘাত আছে তা সে জান্‌ত না, তার সর্ব্বাঙ্গ সুখের আবেশে অবশ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল! তবে ত সে প্রকাশ করে বলার দায় থেকে নিস্তার পেল, বাবু ত সবই বুঝেছেন, তাকে কাছে রেখে সেবা নেবেন এর চেয়ে সৌভাগ্য পার্ব্বতীও কল্পনা কর্‌তে পারে নি ত! তখন সামনে নীল আকাশের কোলে মেঘে ঢাকা বরফের পাহাড়

মেঘমুক্ত হয়ে সকাল বেলার রোদে জল্‌-জল্‌ করে জ্বলে উঠেছে, পার্ব্বতী সেই দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল "হাঁ"। তখন যুবা বল্‌লে "তবে সময় ত বেশী নেই, পূজার ছুটি ত ফুরিয়েছে, কালই যে তাকে কলিকাতায় যেতে হবে, এর মাঝেই ত পাকা কথা দেওয়া চাই।" পার্ব্বতী অনেকক্ষণ থেকে শুধু এইটুকু জানিয়ে গেল "গরীবের ভাগ্যে যদি চাকরী জুটেছে সে কি তা ছাড়্‌তে পারে ?"

এবার যে বিদায় নেবার পালা! এতদিনের সংস্রব ছেড়ে—এতদিনের স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে—চলে যাবার পালা! কিন্তু বাবামাকে কিছুতেই জানান হবে না, তাঁরা যে বাধা দেবেন। সে শুনেছিল কলিকাতায় পাহাড় নেই শুধু, ধানক্ষেত আর মাঠ, সে রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কেবলি ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌ল সেখানে এই উচু-নীচু পাহাড় নেই, কেবল সমতল, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে নুড়িতে-নড়িতে মল বাজিয়ে নির্ঝরিণী ছোটে না—সকালে উঠে বরফের পাহাড়ের এই রজতকান্তি দেখা যায় না, আর সেখানে বাপ নেই আর মা নেই, শুধু আছে সেইজন – যার জন্যে পার্ব্বতীর মন এমন ব্যাকুল, এই সুখদুঃখের যুগপৎ-তরঙ্গ-দোলায় হাসি-অশ্রুর একত্র সমাবেশে পার্ব্বতীর তরুণ মন দোল খেতে লাগ্‌ল। তবু সে মন স্থির করেছিল যাবেই।—সে যে কথা দিয়েছে, আশা দিয়েছে,—আর পেয়েছে! রাত তখন অনেক, মাঝ আকাশে কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ, অশ্রুভরা চোখের জোরকরা হাসির মত হাস্‌ছিল, আর পার্ব্বতীর চিরকালের বন্ধন, তাকে বাড়ীর দিকে টেনে ধর্‌ছিল। মাবাপ তার ঘুমে অচেতন, পার্ব্বতী আস্তেআস্তে মার বুকের কাছে একবার মাথা রাখ্‌লে, বাপের পায়ের কাছে একবার মাথা ঠেকালে, তারপর কিছু না নিয়ে সেই কন্‌কনে শীতের মাঝে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারপর যখন সে যুবার সঙ্গেই গাড়ীতে উঠ্‌ল, তখন কেবলি তার মনে হ'তে লাগ্‌ল—পাহাড়ের কঠিন শীতল বুকে যে এত স্নেহের উত্তাপ ছিল—তাত সে জান্‌ত না, তাই গাড়ী যেমন পাক খেয়ে-খেয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল তার মনে হ'ল কে-যেন এতদিনের এক একটি বন্ধন তার বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ছে, আর তার দুই চোখের পাতা, অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল! তবু তার ভিতর থেকে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল এ কোন্‌ স্বপ্ন রাজ্যের দৃশ্য! সেই ম্লান জ্যোৎস্নার আলোতে সাদা মেঘের স্তূপ, কালো পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে আছে, আর তারি আশেপাশে বড় ‌ড় লম্বা গাছগুলি সদাজাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা ছোটছোট ঝোরা, তরল রৌপ্য ঢেলে বয়ে যাচ্ছে!— পার্ব্বতীর মনে হ'ল এ ত রেলগাড়ী নয়—এযে স্বর্ণরথ, আর সে কোন্‌ এক অজানা রাজপুত্রের সঙ্গে কোন্‌ এক 'সবপেয়েছের' দেশে উড়ে চলেছে!

এত বড় সহর ? এত গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম সে জন্মে দেখেনি! তবু তারি ভিতর থেকে পার্ব্বতী কল্পনা কর্‌ছিল ছোট একটি নির্জ্জন বাড়ী,— তারি ভিতরে নির্জ্জন প্রেমে মগ্ন তারা দুটি প্রাণী! কিন্তু হঠাৎ তার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—যখন সে দেখ্‌লে দাসদাসীতে পূর্ণ মস্ত এক দ্বিতল বাড়ীর সাম্‌নে এসে গাড়ী থাম্‌ল! সে যুবার পিছনে পিছনে নির্ব্বাক্‌ হয়ে উপরে উঠে গেল! নানারকম আস্‌বাবে পরিপাটি করে সাজান শয়নকক্ষ; যুবার সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীও সে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে। একটি খাটের উপর একটি তরুণী শুয়ে, যুবা প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে তরুণীর দুইহাত নিজের হাতের মাঝে তুলে নিয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বল্‌লে "সুধা, কেমন আছ সুধা ? তোমার অসুখ শুনে সেবার জন্যে এই দেখ একজন পাহাড়ী আয়া সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, ওরা অসুরের মত খাট্‌তে পারে, সারাদিন তোমায় দেখ্‌তে পার্‌বে। পার্ব্বতী এই তো" বলে ফির্‌তেই যুবা দেখ্‌লে,— পার্ব্বতী, মাটীর উপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে! ব্যাপার কি ? মুখ যে একেবারে পাংশু—দেহ অসাড় অচৈতন্য! যুবা তরুণীর কপালে হাত দিয়ে বল্‌লে "ভয় পেও না সুধা, ও কিছু না, ও ঝি—শিগ্‌গির এক ঘটি জল আন্‌ ত! ওরা নেপালী কিনা, পাহাড়ের ঠাণ্ডা থেকে এসে কল্‌কাতার গরমে ভির্‌মি গেছে!

স্বরলিপি।

—•—

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই !
এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কুল নাই বা পাই।
আমায়,—নিয়ে চল জগত ছেড়ে ; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হ'তে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত সীমার অন্ত নাই !
তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই ;
ভাবের ভেলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই !
চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয় ;
মহাস্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্ব ছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই !
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে— (এবার) গণ্ডি কেটে মুক্তি চাই।
আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই !

কথা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।
সঙ্গীত-সঙ্ঘের সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী।

২´ ৩ ০ ১
II র্সা র্সর্সা | ঋা´ ঋা´ র্সা | না ননা | দা দা পা I
আ মায় ভা বে র ভে লায় ভু ব ন

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষাক্ষা পা | দা দা ক্ষা | গা গা | ক্ষা সা সা I
স্রো॰ তে ভা সা ও এ বা র ভা ই

২´ ৩ ০ ১
I সা সসা | গগা গা গগা | দা ক্ষা | দা না র্সর্সা I
এ ইভ য়ের বাঁ ধন চা ই নে ক থন

২ ৩ ০ ১
I না র্সা | ঋা´ র্সা র্সা | না না | দা ক্ষা দা II
অ কূ লে কু ল না ই বা পা ই

২
[র্সা র্সর্সা]
(আ মায়) ৩ ০ ১
I হ্মা দা | না -া না | র্সা র্ঋা | র্সা না র্সা I
নি য়ে চ • ল জ গ ত ছে ড়ে

২ ৩ ০ ১
I না র্সা | না না দদা | দা ননা | না -া না I
স ব ক ল রব শা ন্ত• ক • রে

২ ৩ ০ ১
I দা দা | পা পা -হ্মা | গা গগা | গগা গা -া I
শূ ন্য হ তে • শূ ন্যা• ন্ত• রে •

২ ৩ ০ ১
I পা হ্মা | গগা -া ঋা | ঋা -া | সা -া -া I
দি গ ন্তে• • • দূ • রে • •

২ ৩ ০ ১
I না সা | গগা গা -া | দা হ্মদা | দা না র্সা I
জী ব ন্ত• তা • স জী• ব যে থা

২ ৩ ০ ১
I র্সর্সা র্গর্গা | র্ঋা র্সা র্সা | না ননা | দা -হ্মা দ
প্রা• ন্ত• সী মা র অ ন্ত• না • ই

I হ্মা দদা | না -র্সা র্সর্সা | র্ঋা র্ঋর্সা | না র্সা -া I
তো মায় আ • মায় খে লব সে থা •

২ ৩ ০ ১
I না র্সা | র্ঋা র্সা -া | না দা | পা -া হ্মা I
উ ড়ি য়ে প • রা ণ পো • ড়া

২ ৩ ০ ১
I পা হ্মা | র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গর্গা | দা হ্মদা না I
ছা ই ভা বে র ভে লায় ভু ব• ন

২ ৩ ০ ১
I ননা র্সা | না র্সা র্গা | র্ঋা র্সর্সা | না দহ্মা দা II
স্রো• তে ভা সা ও এ বার ভা • • ই

II র্সা র্সা | র্ঋা র্সা -া | না দা | দা পা -হ্মা I
চো খে চো খে • মু খে মু খে •

I হ্মা পা | দা -া হ্মা | গা -া | ঋা -া সা I
হৃ দ য়ে • হৃ দ • • • য়

২´ ৩ ০ ১
I না সা | গা -া গা | গা গা | হ্মা দা না I
মা টি র • মা হু ষ জা নে না

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা | র্গা -া র্গা | র্ঋা র্ঋা | না -দা হ্মাদা I
সে প্রে মে • র প রি চ • • য়

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা | র্ঋা -া র্সর্সা | র্সা র্সর্সা | হ্মা র্সা -া I
ম হা স্ব • চ্ছ• মু ক্ত• তা তে •

২´ ৩ ০ ১
I না র্সর্সা | না -া দা | দা ননা | না- না- -া I
বি শ্ব• ছা • ড়া বি শ্বা• সে তে •

২´ ৩ ০ ১
I হ্মা হ্মা | গা -া গা | গা হ্মা | দা না র্সা I
ম হা প্রা • ণে প্রা ণ মি শা তে

I ননা র্সর্সা | র্গা র্ঋা র্সা | না দদা | দা -হ্মা দা I
ব্যা• কু ল ম র ম আ কুল তা • ই

২´ ৩ ০ ১
I র্গা র্গর্গা | র্সা দা -া | হ্মাহ্মা র্গা | র্ঋা র্সা ননলা I
য ণ্ডী• খে টে • দ ম যে ছো টে (এবার)

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্গর্গা | র্ঋা র্সা -া | না ননা | দা -হ্মা দা I
গ ণ্ডী• কে টে • মু ক্তি• চা • ই

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সর্সা | র্ঋা র্ঋা র্সা | না ননা | দা দা পা I
আ মার ভা বে র ভে লায় ভু ব ন

২´ ৩ ০ ১
I হ্মাহ্মা পা | দা দা মা | গা গা | হ্মা সা সা II II
স্রো• তে ভা সা ও এ বা র তা ই

সুন্দর।

—॰⁂॰—

একদিন জীবন-প্রভাতে প্রথম তোমায় মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম তাহার পরে সারা জীবন ধরিয়া তোমায় ধরি ধরি করিয়াছি কিন্তু ধরিতে পারি নাই। সে দিন বসন্তকালের প্রভাত সময়ে জাগিয়া দেখি কোকিল দৈয়েল শ্যামা সুমধুর স্বরে গান ধরিয়াছে, পূর্ব্ব দিন উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া, উদ্যানে জাতিযুথিমল্লিকা গন্ধরাজ নাগেশ্বর গোলাপ সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যায় তটিনীকূলে বেড়াইতে গিয়া দেখি, একখানি তরি ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে, আরোহী মধুরস্বরে বাঁশরীতে কি গান ধরিয়াছে, আকাশে দেববালারা এক এক করিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে লাগিল। সেই দিন হইতে হে চিরসুন্দর তোমার চরণে জীবন উৎসর্গ হইয়াছি।

এই দেখ আমার বেশভূষা সুন্দর করিয়াছি তোমাকেই ধরিয়া রাখিবার জন্য। আমার শয়নগৃহের প্রাচীরে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি ফ্রেমে আঁটা কত ছবি টাঙ্গাইয়াছি। প্রকৃতির রম্যনিকেতন সমুদ্রকূলে পর্ব্বতের পাদমূলে দেবমন্দির গড়িয়াছি তাহা স্বর্ণমণ্ডিত চূড়ায় বিভূষিত করিয়াছি, মন্দির-গাত্রে কত লতাপাতা ফুল আঁকিয়াছি একদিকে বনের পাখী ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহারা তোমায় খাঁচায় বসিয়া গান শোনায়, আবার আমি তাহাদের স্বরের অনুকরণে কত যন্ত্র গড়িয়া আমার সুললিত স্বর মিলাইয়া তোমায় গান শোনাই। প্রাতঃকালে বাগানের ফুল তুলিয়া, চন্দন ঘষিয়া, সুগন্ধে তোমার পূজা করি;—আবার সন্ধায় ধূপধুনার গন্ধে মন্দির আমোদিত করিয়া তোমার আরতি করি। একদিকে সুমিষ্ট সুপক্ক ফল দিয়া তোমার তৃপ্তিসাধন করিতে যাই—আবার দধিদুগ্ধ মধুমিষ্টান্ন দিয়া তোমার ভোগ দেই। প্রকৃতি তোমায় মধুর স্পর্শে মলয়ানিল ব্যজন করে, আমি তোমার সম্মুখে চামর ঢুলাই। কই তবু ত তোমায় ধরিতে পারিলাম না। তোমার পাষাণমূর্ত্তি যে তেমনই থাকিল।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া দিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দিল। তন্ময় হইয়া ভাবিতাম—আনন্দে মাঝে মাঝে হৃদয় ভরিয়া উঠিত কিন্তু তবুও কেমন অসম্পূর্ণতা ঠেকিত। এতে যে চেতনা নাই।

জীবনের পূর্ব্বাহ্নে এক বালিকার হৃদয় দেখিলাম! জড়প্রকৃতিতে যাহা পাই নাই এই বালিকাতে তাহাই পাইলাম। জড়প্রকৃতিতে পাইয়াছিলাম রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এই বালিকা আমায় শিখাইল—প্রীতি। সেইদিন হইতে আমার হৃদয় বুঝিল মানুষের হৃদয়েও সৌন্দর্য্য আছে। সেইদিন সুললিত স্বরে গাহিয়া ছিলাম,—

হায়, পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে,　　মানুষ জনমে
কি সুখে আছয়ে তারা॥

কিন্তু এই পীরিতি কি সকলেই জানে?—

পীরিতি পীরিতি　　সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা॥

কেন না,—

পীরিতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

এই পীরিতি হইতেই আমার হৃদয়ে দয়া প্রেম ভক্তি স্নেহের জন্ম। জীবনের মধ্যাহ্ন আসিতে না আসিতে বালিকা আমার জীবনাঙ্ক হইতে চলিয়া গেলে এক ক্ষুদ্র শিশুর আবির্ভাব হইল। সে কি স্বর্গীয় সুষমা লইয়া আসিয়াছিল। ছুঁইতে ভয় হইত—পাছে আমার মলিন করস্পর্শে তাহার কোমল অঙ্গ মলিন হইয়া যায়। তাহার প্রতি-অঙ্গে, হে চির সুন্দর, তোমরই বিকাশ দেখিতাম। তাহার হাসিতে মুকুতা ঝরিত, আধ-আধ মধুর বাণীতে তোমারই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু কেমন জড়প্রকৃতিতে তোমায় ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই—এখানেও তেমনই হইল—সে শিশুও আমার জীবনমধ্যাহ্নের শেষমুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

জীবনের অপরাহ্ণে ভাব ও শব্দঝঙ্কার মিলাইয়া কবিতায় তোমার সৌন্দর্য্য খুঁজিতে লাগিলাম। তখন গাহিলাম ;—

তুমি সুন্দর তাই তোমারই বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।

জীবনের সুন্দর কাজগুলি গুছাইয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে লাগিলাম, লোকে তাহার নাম দিয়াছিল "সাহিত্য"।

আজ মনে হইতেছে মধুস্পর্শমলয়ানিলে তোমারই স্পর্শ অনুভব করি—তোমারই কোমল রাঙ্গা চরণ স্পর্শে সরোবরে রক্তকমল ফুটিয়া উঠে, তোমারই কোমল করস্পর্শে চম্পকগুলি ফুটে, তোমার অধরসুধাস্পর্শে গোলাপের এমন সুন্দর শোভা, তোমার মধুরবাণীর কণামাত্র শুনিয়া দৈয়েল, পাপিয়া, কোকিল, শামা, স্বরলহরীতে আকাশ মাতাইয়া তুলে। তোমারই অঙ্গের আভায় ফুলের, পাখীর, সকাল সন্ধ্যায় আকাশের, অমন মনমাতানো বর্ণ, তোমারই নিঃশ্বাসের গন্ধের এক কণা পাইয়া ফুল অমন গন্ধে জগৎকে মাতাইয়া দেয়। তোমারই হৃদয়ের পার্শ্বে যুবক-যুবতীতে প্রেম, পিতামাতায় স্নেহ, সন্তানে ভক্তি, মানবে করুণার বিকাশ। তোমায় সর্ব্বত্র তিল-তিল করিয়া দেখিতেছি—কিন্তু হৃদয়মন্দির আমার শূন্য। আমি মধুপের ন্যায় তিল-তিল করিয়া মধুসঞ্চয় করিয়াছি—কিন্তু মধুচক্র আমার শূন্য। তোমায় মুহূর্ত্তের অধিক ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। সাধ মিটিল না—এমনই করিয়া কত যুগ-যগান্তর কাটিয়া গিয়াছে কত-কত জন্ম বিফল হইয়াছে,—

জনম জনম হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥

তাই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমার জন্য ছুটিয়াছি। দোষ ত তোমারই,—তুমিই ত—

অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলে ঘরে।

হে চির সুন্দর, তোমার পাইবার জন্য কত বেদনা কত কষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু—

কেহুত না কহেরে আওব তোর্ পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥

কাহার অভিশাপ আছে জানি না তাই এই জীবনসন্ধ্যায় চিরবিরহে আমার দিন কাটিতেছে। আজ চাহিয়া দেখি সুধাধবলিত মন্দির কালের প্রকোপে মসীবর্ণ, চিত্রগুলি মলিন, তোমার পূজার পুষ্প শুষ্ক, স্বর্গীয় শিশু কালের করাল ছায়ায় বিষণ্ণ কিংবা সংসারের প্রখর কিরণে শুষ্কপ্রায়, মানবের দয়ামায়া করুণা স্নেহপ্রীতির পরিবর্ত্তে হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতা। যাহাকে দূর হইতে সুন্দর দেখিয়াছি নিকটে গিয়া দেখি—সৌন্দর্য্য কোথায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর শষ্পসমাচ্ছন্ন প্রান্তর দূর হইতে কি মনোহর, নিকটে গিয়া দেখি কুৎসিত মৃত্তিকা; কমলকানন সুশোভিত সরোবরে নামিয়া দেখি পদ্মের পাঁপড়ি ঝরিয়া পড়ে কিংবা আমার হস্তপদ জড়াইয়া যায়, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। হায় কেন বুঝিলাম না ইন্দ্রিয় আমায় প্রবঞ্চনা করে নাই, লালসাই আমার সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাই হে চিরসুন্দর, আমি দেখিয়াও তোমায় দেখিলাম না—হাতের কাছে পাইয়াও তোমায় একমুহূর্ত্ত কালও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। এখন আমার ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর ত তোমায় অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে আর তোমায় ত দেখিতে পাইতেছি না। আমার আশাও বুঝি শেষ হইল,—

গমন অবধি তুয় ন ভেল বিশেখ
ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ।
কবহি মিলন রহ মুখ নাহ সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা।
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরয় নির
কমল গরত্র মকরন্দা॥

তোমার,—

আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥

হইলই বা চক্ষু অন্ধ, নাই বা দেখা দিলে। নয়নে দেখায় আসে যায় কি! হে চিরসুন্দর, হে অন্তরের দেবতা,—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব,
প্রেমচিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।

তাও কি বলিতে হয়,— বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আজি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥ (চণ্ডীদাস)

* * *

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব,
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব॥ (জ্ঞানদাস)

হে সুন্দর—এই শেষ নিবেদন!

শ্রীরাখালরাজ রায়।

অপহৃত।

—:*:—

কত না সুষমা ছিল প্রকৃতি-আননে!
শ্যাম-তরু-লতা-কুঞ্জে, কুসুম-কাননে,
নীলাকাশে, নীলজলে, নীল-নবঘনে,
সুনীলিম শৈলমালা আকাশের সনে
যেথায় মিশিয়া আছে, চারু ইন্দ্রধনু
সুবর্ণ-গরিমাময় সুবিচিত্র তনু—
কত ছিল, সব সখি লইয়াছ হরি
কোন্ মায়া-মন্ত্র-বলে?—হেন যাদুকরী
হেন মায়াবিনী তুমি কভু নাহি জানি!
ক্ষুদ্র ও ললাট, অই ক্ষুদ্র মুখখানি,
আরক্ত অধর-ওষ্ঠ শান্ত দু'নয়ন,
রাখিয়াছ ওরি মাঝে করিয়া গোপন
অনন্ত বিশ্বের হরি অনন্ত সুষমা!
ধন্য তব ইন্দ্রজাল অয়ি নিরুপমা!
তাই এ ধরণীতল বিরস মলিন,
শূন্য রিক্ত নিরন্তর আভরণহীন!
তাই তব আঁখি-কোণে চঞ্চল সুহাসি
দেখায় সে পলে-পলে ইঙ্গিতে আভাসি
লুকান' বিশ্বের ধন সৌন্দর্য্যের রাশি।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা

জাতি-ভ্রষ্টা

—:*:—

(১)

সে ছিল ব্রাহ্মণ-কুমারী; বলা বাহুল্য পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যবলে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছিল সে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে, নিকষ কুলীনের ঘরে। কিন্তু তার পুণ্যের কড়ি বোধহয়, নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ওই জন্মলাভ ব্যাপারেই, নৈলে কি ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই পাপ-গ্রহ তার ভাগ্যকেন্দ্র অমন করে অধিকার করতে পারত! জননী তার জন্ম দিয়েছিলেন, কোল দিতে পারেন নাই; সদ্যজাতাকে ধরণীর বুকে ফেলে রেখেই ধরাত্যাগের তাগিত তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। যে চারটা দিন, জীবনমরণের সংগ্রামস্থলে অপেক্ষা করতে পেয়েছিলেন, তাতে আকাঙ্ক্ষা-স্রোত প্রবল হলেও শক্তির প্রবাহ একবারেই ছিল না। দেহ রক্তহীন; কঙ্কালসার, সন্তান-সুখস্পর্শ-লোলুপ-বাহুর এমন বল ছিল না যে বক্ষের ধনকে বক্ষ-আশ্রয়ে বদ্ধ করতে পারে! মাতৃত্বে কি নিদারুণ নিষ্করুণ অভিশাপ!— আপনার জনও তখন তাঁর নিকটে কেহ ছিল না! রোগীর যথানাম ঔষধের ব্যবস্থা হলেও তাঁকে গৃহান্তরে নেবার ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব ছিল! নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সংসার প্রসূতিকে শয়ন-কক্ষে স্থানান্তরিত ক'রে, জাতাশৌচের জের সর্ব্ব বস্তুতে সংক্রামিত করলে জাতিপাতের আর বাকী থাকে কি! ব্রাহ্মণের প্রাণটা জাতিহীন হ'তে বিদ্রোহ হ'য়ে উঠ্‌লেও মন তাতে কিছুতেই সায় দিতে পেরেছিল না,—পল্লী-সমাজে একঘরে হয়ে থাক্‌বার সাহস তাঁর ছিল না; ফলে, স্বামীর প্রাণভরা সহানুভূতি সত্ত্বেও, এক, সংস্কারের অত্যাচারে সাধ্বীকে শেষ মুহূর্ত্ত গণ্‌তে হয়েছিল, প্রায় নিঃসঙ্গ একা! সূতিকা-গৃহে সঙ্গী ছিল মাত্র তাঁর ধাত্রী,—তাঁর সমবয়সী একটি হাড়ীর-মেয়ে। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা, অদম্য পিপাসায়, হাড়ীর মেয়ের হাতে জল পান না করেও অন্য উপায় আর তাঁর কি ছিল আতুরে নিয়ম নাস্তি! ভগবান দিন দিলে, গঙ্গাস্নানে সর্ব্বশুদ্ধি,—পিপাসা প্রাবল্যে সে কথা তাঁর, স্মরণে এসেছিল কি না সন্দেহ! রোগিণী সহানুভূতির পূর্ণমূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, সেই নীচ জাতীয় রমণীতে।—বাছাকে তাঁর সে কত যত্নে কোলে ক'রে তাঁর রোগ-শয্যা পার্শ্বে বসে থাক্‌ত! অত যন্ত্রণার মধ্যেও মাতা তাঁর প্রাণের দুলালী হতভাগীর কথা ভুল্‌তে পারতেন না! বার বার ফিরে ফিরে তিনি ধাত্রীর ক্রোড়স্থিতা কন্যাকে দেখ্‌তেন; তাঁর নিষ্প্রভ নয়নজ্যোতি দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত। কন্যার চিন্তায়—কন্যার ভবিষ্যৎ-আশ্রয়স্থল শূন্য দেখে হতাশায় মার প্রাণ কি যে করত; নিমজ্জিতের সম্মুখস্থ তৃণগাছটি অবলম্বনের মত, তিনি সেই নিম্নর নীচজাতীয়া রমণীটিকে আশ্রয় না করে পারেন নাই। ক্ষীণহস্তে তার হাতটি চেপে ধ'রে, অতিক্ষীণ স্পষ্ট করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ভোলার মা, তুই আমার খুকুর মা,—তুই তাকে কোল দিয়েছিস, চিরকাল কোলেই রাখিস বোন্!' তাঁর সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভোলার মা তাঁর শেষ অনুরোধ ফেল্‌তে পেরেছিল না, মাতৃহীনার মাতৃস্থান পূর্ণ করেছিল সেই। পিতার মনটা প্রথম প্রথম কেমন খুৎখুঁৎ করত, অবশেষে কিনা অন্ত্যজের হাতে ব্রাহ্মণের মেয়েটাকে এমনভাবে সমর্পণ করতে হ'ল! উপায়ান্তর ছিল না; ক্রণতুল্য শিশুকে মানুষ করা কি পুরুষের কাজ! স্ত্রীলোকহীন সংসার! উচ্চ বংশীয়াদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, নিজ ইচ্ছায় যে তাঁর মেয়েটির লালনপালনের ভার নিতে ইচ্ছুক— পরের সন্তানের জন্য বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান সভ্যতার রীতি নয়; ব্রাহ্মণকে অগত্যা ব্রহ্মণ্যগর্ব্ব খর্ব্ব করে হাড়িনীর হাতে সন্তানকে অর্পণ করে তুষ্ট হতে হয়েছিল। যে যাই বলুক, সে ভার সে নেবার অযোগ্যা ছিল না! সকলে অপয়া

মেয়েটাকে মাথেকো রাক্ষসী নামে অভিহিত করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ও বীভৎস-করুণার উদ্রেক করতে চেষ্টা করলেও সেই অন্ত্যজার অন্তর কেবল প্রতিনিয়ত হতভাগীর জন্য করুণায় কাঁদতে থাকত। আহা, হতভাগী, একটা দিনের জন্যেও মার কোল পায়নি, ওর যে কি কষ্ট অন্যে কি বুঝবে! বুকের মধ্যে ওকে নিতে তার প্রবল ইচ্ছা হ'ত। কচি মুখে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়েও সে তৃপ্ত হ'তে পারত না। হায়! সে কি তার মার মত যত্ন করতে পারবে! বামুনের মেয়ে, কোন্ পাপে তার কোলে ঠাঁই পেয়েছে। অপরাধ যেন আর বাড়িও না ঠাকুর। মেয়ের দুরদৃষ্টের কথা স্মরণে এসে মনটা তার যে কি হয়ে যেত! কেবলি তার মনে হ'ত—তার ত্রুটীতে ও যেন আর কষ্ট না পায়!

দিন দিন করে বৎসরও পেরিয়ে গেল; খুকী তখন হামা দিতে শিখেছে. দু এক পা হাঁটতে পারে, এটা ওটা টেনে-হেঁচড়ে স্থানভ্রষ্ট, নষ্ট করে,— কতই না তাতে আমোদ! হাড়িনী, খুকীর সে সকল কার্য্যে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেত, হাড়ীকে আনন্দ আতিশয্যে সে, সে সংবাদ না দিয়ে থাকতে পারত না,— হাড়ি মাথা নেড়ে বলত "হবে না বামুনের মেয়ে—বুদ্ধি কি হবে ওর আমাদের মত!" সে মন্তব্য ভোলার মার প্রাণে যেন তুষ্টি দিত না! 'বামুনের মেয়ে'—কথাটা যেন পর পর! সত্যিই ও যে পরের,—আকাশের চাঁদ ওযে,—সে আস্তাকুড়ের হাড়ি! না না—মন বলে—'না'—তারা যে মায়েয়ে—এক। হাড়িনী খেতে বসতে কখন হামা দিয়ে এসে দুষ্টু মেয়ে পাতের ভাত তুলে মুখে দিত! আঁা! করে কি! হাড়ীর ভাত! ভোলার মা চমকে উঠত,—রাক্ষুসি!—দুধ খেয়ে পেট ভরে না! এঁটো হাতেই, স্তন্য দিতে, তাকে বুকের কাছে তুলে নিত! বুকের ধন বুকেতুলে নিলে অন্য কথা কি আর মনে থাকে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, ছোট বড়, জাতি-অভিমান সব অতল স্নেহসাগরে ডুবে যায়; মাতৃস্নেহ কি কখন ছোট-বড় জাতিভেদে ভিন্ন! ভোলার মার মনে হ'ত খুকী যে তারি। সোহাগভরে আদর ক'রে সে তাকে কত কি বলে ডাকত "দুখু-দুখি-দুখিনীর ধন দুখিনি,—দুলু-দুলু, দুলুমণি-দুলালি!"

দুলালীর বাপের বাড়ীর পাশেই ছিল হাড়ীর বাড়ী। বন্দোবস্তের সর্ত্তে হাড়িনীর, বামুনবাড়ী থেকেই মেয়েকে মানুষ করবার কথা, কার্য্যে কিন্তু হয়েছিল ঠিক্ তার বিপরীত। অষ্ট প্রহরের সাড়ে সাত প্রহর দুলালী কাটাত হাড়ী-বাড়ীতে। অত বাঁধাবাঁধির মধ্যে হাড়িনী ধরা দিত না. মেয়েও একদণ্ড তার কাছ ছাড়া হ'ত না। পিতা তাতে মনে মনে রুষ্ট হলেও স্পষ্ট করে প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পেতেন না; কন্যার জীবনমরণ তখন ভোলার মার অনুগ্রহনিগ্রহের উপর,—আর অমন করে মার মত স্নেহযত্নে মেয়েকে যে লালনপালন করছে, তাকে কোন্ মুখে ও-কথা বলা যায়!

অজ্ঞান, অবোধ পাঁচ বৎসরের কম বয়সের দুগ্ধপোষ্য শিশু;—তার আবার পাপ পুণ্য কি! শাস্ত্রের বিধিও তাই! নিরুপায় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের জাতিত্ব-গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে, মনে মনে অমন শত যুক্তির অবতারণা করতেন,—সুযোগ হলেই শাস্ত্রের বিধি সব্যাখ্যায় আবৃত্তি ক'রে, কন্যা সম্বন্ধে তাঁর বিধিব্যবস্থায় যথাশাস্ত্র শুদ্ধতায় সাফাই গাইতেন! কিন্তু ক্রমেই কথায় প্রকৃত ব্যাপারটা চাপা দেওয়া তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠছিল, কারণ মেয়েটা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পাঁচ বৎসর অতিক্রম ক'রে আরও এক দু' ক'রে ন' দশে উপনীত হলেও, তার বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শাস্ত্রীয় বিধি মান্য ক'রে চলবার প্রবৃত্তি তাতে একটুও প্রকাশ পেল না! বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধি-বৃত্তি অনেকখানি বেশী বলেই মনে হ'ত,—সংসারের কার্য্যে, পিতার সেবাশুশ্রূষায়, বাধ্যতায় সে-যেরূপ কৃতিত্ব দেখাত, ধীরতার সঙ্গে সেগুলি যেভাবে সম্পন্ন করত তা ও-বয়সী মেয়ের পক্ষে অতি বুদ্ধির পরিচয় হলেও, অমলক জাতিগতগৌরবে সে যে কত উচ্চে তা বাবা মেয়ে বুঝে নিজে তখনও শিখতে পারলে না!—

হায়, মোহান্ধ জীব, মায়ায় যে দৃষ্টিহারা—তার প্রকৃত বস্তুজ্ঞান কবে হবে,—সে সব বুঝে, বুঝ্তে চাইত না কেবল হাড়িনীকে হাড়নীর ভাবে,—তার সমস্ত গুণ, সমগ্র ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল দুশ্ছেদ্য মায়া—অন্ত্যজার সংসর্গে বিরক্তি আসা যে স্থলে উচিত ছিল, সেখানে তার কোন্ পাপে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার সঙ্গ-অনুরক্তি! সে পিতার সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজাপ্রণালীকে ভক্তিভরে মান্য করে এসেছে, সে প্রয়োজন প্রকরণে, উপকরণ আয়োজনে আরব্ধ কার্য্যে প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থাকে সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রেখে পিতার প্রীতি উৎপাদন করেছে, সে কেবল মান্য করে চল্‌তে পারেনি—মাকে তার দূরে রাখ্‌বার বেলায়! পিতার তুষ্টির জন্য, হাড়ীর বাড়ী হতে ঘুরে এসে স্নান পর্য্যন্ত করেছে,—সে স্নানে তার দেহ শুচি বা যাই হ'ক, মন তার তাতে পবিত্র করতে পারে নাই; বার বার তার মনে হ'ত—কি জন্যে তার সে ছাই স্নান—শুচির চেষ্টা তার বৃথা—হাড়ীর-সংস্পর্শ-অশুচি যদি তার স্নানে যায়, তবে তার চেয়ে শুচির মিথ্যা অভিনয় আর কি হতে পারে! যে দেহের প্রতি অণুপরমাণু অন্ত্যজার বক্ষরক্তে,—হাড়িনীর পীযূষে যে দেহ পুষ্ট,—যার অঙ্কে স্থান পেয়ে তার জীবন—স্পর্শ যার অমৃত হতেও অমৃত,—তার সংস্পর্শে যে অপবিত্রতা তার কি শুচি স্নানে! জাত্যাভিমানের আবরণে তা' লৌকিকভাবে ঢাকা পড়তে পারে—কিন্তু দেহ মনে মিশে গিয়েছে যা—তা দেহ থাক্‌তে কি করে সে দূরে ছুঁড়ে ফেল্‌বে! অতটুকু মেয়ে এত কথা চুনিয়ে চুনিয়ে ভাব্‌তে পারত না,—নিজের মনের ভাব তার কাছে সপ্রকাশ হয়ে দেখা দিত না সত্য কিন্তু তার অশোয়াস্তিতে ওরই প্রতিধ্বনি হ'ত! শুচি অশুচির কথা ভাব্‌তে তার মন কেমন অবশ হয়ে আস্‌ত,—পিতাকে সন্তুষ্ট করতে সে সমস্তই করতে রাজি ছিল কিন্তু তার কেন যেন মনে হত—সত্যের নামে মিথ্যার একি হাস্যকর অথচ মূক অভিনয়! মন তার দুঃখক্ষোভে কাণায়-কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত—আহা! বাবার তার সে বিনে আর কে আছে,—হতভাগী সে—ভাগ্য তার কেন অমন হ'ল! ভাগ্যবতী সে—অমন মমতার অফুরন্ত উৎস,—দুধমার কোল পেয়েছিল বলে। কি প্রাণটা তার,—ভদ্রলোকে যে কাজে মাথা দিতে পারে নাই সে নিম্পর নীচজাতি হয়ে, জননীর অধিক কষ্ট সয়ে তা সুসম্পন্ন করছে। সে হ'ক নীচ, যে নীচই কত উচ্চ। তাকে কে তুলনায় আন্‌তে পারে—তাকে ত্যাগ করে পিতাকে বা তুষ্ট করে কোন্ প্রাণে! গোলমালে, এলোমেলোভাবে প্রাণটা তার তোলপাড় হতে থাক্‌ত—অতটুকু মেয়ের কি সাধ্যি সে মন বুঝে কাজ করে—কেবলি তার চোখ ফেটে জল বেরোতে চাইত—অথচ ঐ বয়সেও তাকে চেষ্টা করে সে ভাব গোপন করতে শিখ্‌তে হয়েছিল! দুঃখ তার কিনারা পেত না, যখন তার সকল দুঃখের শান্তিস্থলও উল্টো বুঝে, ভিন্ন ভাবই প্রকাশ করত। দুধমা, তার ধরণ ধারণ হাবভাব দেখে বলত—"ছি! দুলু! এখনো কি ছেলে মানুষ আছিস্—এখন ত সব বুঝ্‌তে হয়—বামুনের মেয়ে তুই—তোর কি আর এখন এ সব সাজে!" সাজে না কি? মার কাছে স্নেহের অধিকার! হায় সংসার! এতই কঠোর—এতই দুর্ব্বোধ তুই—স্নেহ দিয়ে প্রাণ দিয়েছে যে সেও স্নেহের দাবি বুঝে না কেন! সত্যই বুঝে না—সংস্কারাচ্ছন্না ভাব্‌তে পারে না কোনটি সত্য কোনটি অনিত্য! বড় কষ্ট!—বজ্রের সমান, দুধমার অভিযোগ তার প্রাণে আঘাত করত। রাগে ক্ষোভে বল্‌তে ইচ্ছা হ'ত "বামুন নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব।' সংসারে যে ধুয়েই পবিত্র হতে হয়, বড় দুঃখে তাকে তা বুঝ্‌তে হয়েছিল, ক্ষোভে তাকে আরও উন্মত্ত করত। রাগে অভিমানে সে আর ঠিক থাক্‌তে পার্‌ত না—দুধমার সঙ্গে কথা বন্ধ করত—এক বেলা ক'টা ঘণ্টা—শত যুগের কষ্ট সয়েও দুধমার বাড়ী যে'ত না, তাতেও কি রেহাই ছিল! অন্তর্দৃষ্টিহীন 'হেড়েনী!' তাকে না দেখে পাগলের মত হয়ে ছুটে আস্‌ত—বুঝ্‌তে; কত সোহাগ জানাত, তাতেও মন গলে না দেখে চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে সব মান অভিমান ভাসিয়ে দিত। অত কি সওয়া যায়! যার একবিন্দু অশ্রুতে বিশ্বের জমাট অশ্রু, কোন্ প্রাণে তা দেখে সে স্থির থাক্‌তে পারে—সব ভুলে গিয়ে

সে দুধমার গলা, দু বছরের মেয়ের মত জড়িয়ে ধ'রে যে পাপ নিরাকরণের জন্যে এত;—তাহাই আবার করে বসত !

(২)

সব সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়ে গিয়েছিল, দুলুর বিবাহে। যেটায় লক্ষ্য রেখে, যার অন্তরায় ভেবে, পিতা, আচার-সমস্যায় অত উতলা হতেন, সে উৎকণ্ঠার শেষ হয়ে গিয়েছিল মনোমত ঘরে মেয়ের বিবাহে, করণীয় বরণীয় ঘরে বরে, সর্ব্বস্ব পণ করেও মেয়ে দিয়ে তিনি হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলেন। ভোলার-মারও আনন্দের অবধি ছিল না। ও ভয়টা কি তারই কম ছিল! পাছে তার সংস্পর্শ-সম্বন্ধ মেয়ের ভবিষ্যত-সুখের বাধা হয়, একেই গৃহিনীহীন সংসারের মেয়ে, তাতে যদি আবার রটে—ছোট লোকের সংস্পর্শে এসে, মেয়ের ভদ্রোচিত সকল গুণের অসম্ভব অবনতি ঘটেছে,—তবেই মেয়ের ভাল বিয়ে হয়েছে আর কি! সে তাই দুলুকে ইদানীং একটু দূরে দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা করত। আজীবন ভদ্র সংসারের অতি নিকটে থেকে, সে ভদ্রঘরের আচারআচরণ সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তাই সম্বল করে, সে মেয়েকে ভদ্রঘরের মত কাজকর্ম্মে সুনিপুণা করে তুল্‌তে চেষ্টা করেছে; দুলুর বিবাহে সেও সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল; যখন সে শুনেছিল, সংসারের কাজ কর্ম্মের দুলু শ্বশুরঘরে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, তখন তার আনন্দগর্ব্বের সীমা ছিল না,—সে সর্ব্ববিষয়ে নিজকে কৃতার্থ মনে করেছিল! এ বিবাহের মূলে তার হাত ছিল অনেকখানি; প্রকৃত পক্ষে বল্‌তে হলে, সেই ছিল এ বিয়ের ঘট্‌কী। বরের বাড়ীর পাশেই তার বোন-ঝির বাড়ী, তারা ওদের নিতান্ত অনুগত প্রজা. দিনরাত ডাকেহাঁকে সকল কাজে মুনিববাড়ী, তাদের গতায়াত,—একবাড়ীর লোকের মত! ভোলার-মা বোনঝিকে দেখ্‌তে কতবার ওখানে গিয়েছে; সে বিধবা হলে—তাকে তথায় একটা মাস কাটাতে হয়েছিল; সেই সময় বোন-ঝির মুনীববাড়ীর সুখ সমৃদ্ধি আচারআচরণ দেখে মনে মনে বাড়ীর বড় ছেলেটার সঙ্গে দুলুর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছিল। সংসারে শ্বশুরশাশুড়ী ছিল না বটে, কিন্তু ওবাড়ীর ছেলে দুটীর প্রশংসা দশের মুখে,—মা না থাক্‌, আছেন ছেলের পিসী, বুড়ী ভালমন্দে বেশ মানুষ—এমন সংসারে মেয়ে দিতে কার অসাধ! সে মূলে লক্ষ্য রেখে মেয়ের অপূর্ব্ব রূপগুণের কথা সুপ্রচার কর্‌তে কম করে নাই, তার খুব বিশ্বাস ছিল,—যে দুলুকে একবার দেখ্‌বে—অপছন্দ কর্‌তে পার্‌বে কোন্ চোখে! কার্য্যেও ঘটেছিল তাই।

দুলুর সংসার সুখের সংসার, অভাব বল্‌তে কিছু ছিল না। দুলুর দেবর তার সমবয়সী, বৌদি বল্‌তে, ওই কয় দিনেই, সে অস্থির হত, দুলুরও তাকে বড় ভাললাগ্‌ত—দুটী যেন ভাইবোন - জানকীর পেছনে এ-কালের লক্ষণের মত! হাসিঠাট্টায় সংসারের কাজকর্ম্মে সে বৌদির সাহায্য করে কৃতার্থ হতে চাইত। দুলু কত নিষেধ করত—কিন্তু সে কথা শোনে কে! পিসী-শাশুড়ী, বৌমার কাজকর্ম্মের খুব পিয়ার কর্‌লেও, দেবরের সঙ্গে অত মেশামেশিটা আদবেই পছন্দ করতেন না; ছেলেটা সব বিষয়ে ভাল হলেও বড় তার্কিক,—অনাচারী—বামুনের ছেলে হয়েও হিঁদুর আচারবিচার তেমন মেনে চল্‌তে চায় না; তার কথা মত বৌমাটী চল্লেই হয়েছে আর কি! এর মধ্যেই ও সুবির মেয়েটাকে জাতে তুলে নিয়েছে যেন। সুবি হেড়েনীটা নিজে ত অমন নয়, দেব দ্বিজে বেশ ভক্তি আছে; আর ওর মেয়েটা হয়েছে তেমনি টিট! প্রকাশ ছোঁড়াটাই ত তাকে নাই দিয়ে অমন করে তুলেছে, ছোটলোকের মেয়ে,—তাকে অত 'আল্লাদ' দিলে মাথায় উঠ্‌বে না ত কি? যখন তখন ছোঁয়ামাড়া, কষ্টিনষ্টি—সাত বছরের মেয়ে তারি বা দোষ কি,—প্রকাশটা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে যা হয়েছে! আজকাল্‌কার ছেলে; সেকেলে

বুড়ী হাড়ে হাড়ে তার ব্যবহারে চট্‌লেও মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে সাহস করতেন না; অথচ তার অহিন্দু আচার তাঁর পক্ষে সহ্য করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠ্‌ছিল। ওর যা ইচ্ছা করুকগে—বৌটাকে কোন ছুতায় উপদেশচ্ছলে কিছু মিঠেকড়া বল্‌বার প্রলোভন বুড়ী কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিলেন না কিন্তু দুলু তাঁকে সে সুযোগ একেবারেই দেয় নাই। সংসারের কাজ কর্ম্ম সে নিজেই দেখে শুনে এমন সুনিপুণভাবে করে যেত, তার চলাফেরার মধ্যে এমন একটা সহজ সংযত ভাব ছিল, যা দেখে অন্য কথা মনে জাগা অসম্ভব ছিল; সে লোকের মান্যই উদ্রেক করেছে—মান্যহীন করে নাই!

যাই হ'ক একদিন বুড়ীর সন্দেহ সত্যই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল; বৌমাটি এমন একটা কাজ করে বস্‌লেন, যা একটা নবশাকের মেয়েও কর্‌তে দ্বিধা বোধ কর্‌ত। বৌমা কিনা সুবির ঐ মেয়েটাকে ছোঁয়ানাড়া করে নিজ হাতে চুল বেঁধে দিতে পারে! বাবুয়ের-বাসা চুলগুলোয় আধ শিশি সুগন্ধি তেল ঢেলে, নিজের চিরুণীতে আঁচড়ে, নিজের জড়ির ফিতেটা দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে,—এও কি বামনের মেয়ে পারে—একটু ঘেন্না পিত্তি নাই বাপু, এবাড়ীর মেয়ে হ'লে কি পারত!' এও বোধহয় ঐ পলাশের পরামর্শে, বোধহয় কেন,—নিশ্চয়ই! সে, হাজার হ'ক, পুরুষ মানুষ, সে যা করে তাই সাজে, বৌমা কেন তার কথা শুন্‌তে গেল! নতুন বৌ তার একি ব্যবহার! জিজ্ঞেস্ করলে কিনা বলে "না, ও কেন বল্‌বে, আমি নিজের মনেই করেছি,—অতশত বুঝতে পারিনি পিসিমা, মেয়েটার একডালি চুল এলোমেলো আঁধিসাঁদি হয়ে ছিল, কেন যেন মনে হল ওর চুলটা বেঁধে দি, ওকে ছুঁলে যে দোষ হবে সে মনে আসেনি পিসিমা।"

সত্যই ওর মুখের দিকে চাইলে ওর কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, হাবা মেয়ে, ওকে নিয়ে বামনের সংসার কি করে চল্‌বে! হাড়িনীর কোলে মানুষ হয়েছ যে তার কি আর বাছবিচার জ্ঞান থাকে!"

সে কথা শুনে দুলালীর চোখে জল আসে,—হায়! কোন পথে চল্‌বে সে। সত্য ত হাড়ীনীকে সে কি করে দূরে রাখবে,—হাড়িনী যে তার প্রাণে দেবী হয়ে জাগ্রত রয়েছে! তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌ত অমন কাজ আর সে কখন করবে না!

কাজে আবার কখন সে পিসিমার অপছন্দ অহিন্দুয়ানীতে গিয়ে পৌঁছত, সে নিজেই জান্‌তে পারত না। সুবির দুরবস্থা, ওর মেয়েটার চপলতা, সকলের উপর তার দেবরের মতবাদ তাকে তোলপাড় করে দিশাহারা করে দিত! তার ত প্রাণপণ চেষ্টাই ছিল—যাতে অন্যে দুঃখ পায় এমন কাজ কখন সে করবে না, কিন্তু দেবর তার জোর করে বল্‌ত, না বৌদি,—সংসারে কোন্ কাজ ব্যথা না দিয়ে হয়েছে,—সোজা ভাবে চল্‌তে হলেই এক জায়গায় না এক জায়গায় বাধা এসে দাঁড়াবেই—তাকে অতিক্রম কর্‌তে হ'লে ব্যথা না দিয়ে আর উপায় কি? যাকে সত্য বলে জেনেছি, তার প্রতিষ্ঠা করতে হবেই,—অন্যের দুঃখের কথা ত দূরের আত্ম-নিগ্রহ কর্‌তে হয় যদি তাও শ্রেয়! নৈতিক-জগত ও সমাজে সংঘর্ষটা কোথায়, তাদের মধ্যে কোথায় বিরোধ, কোথায় মিলন, দুলু বুঝ্‌বে কি করে,—সে ত আজীবন নৈষ্ঠিক-আচারনিয়মকে মান্য করে এসেছে; আবার দেবরের উদার দুকূলহীন মতগুলাতেও যে সে তারই প্রাণের কথা খুঁজে পায়! মন বলে এক, প্রাণ প্রার্থনা করে অন্য—দুলু পথের মাঝে গুম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়! গন্তব্য পথ কোন্‌টি!

এক দিন সুবির বড় জ্বর, বিধবাকে দেখ্‌বার মত তার আর কে আছে? সেই সাত বৎসরের মেয়েটি মাত্র, কোলে একটি দেড় বছরের খোকা; খোকাটার সে দিন কি কষ্ট; মা-টা প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, ছেলেটা পড়ে পড়ে কাঁদ্‌ছে—তার সাতবছরের বোনের সাধ্য কি তাকে সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে! দুলালী তার অবস্থা দেখে

আর ঠিক থাক্‌তে পারল না,—ছেলেটাকে কখন কোলে তুলে নিয়েছিল! সুবির পাশে বসে মাথা টিপে দিচ্ছিল। পিসিমা সে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে যখন দেখ্‌লেন তুলুর কাণ্ড, তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না,—হাঁ, একটু জলটল দিতে হয়···দূরে থেকে দাও,—হাড়ী, ডোম, চণ্ডালে আর তফাত কি—একবারে তার ছেঁড়া কাঁথায় উঠে বসা হয়েছে! জাত আর রাখ্‌লে না বৌমা!"

পিসিমার গলা শুনে প্রভাত এসে উপস্থিত হ'ল। সে বল্লে "কিসে জাত থাক্‌ল না পিসিমা।" পিসিমা তাকে ভয়ই কর্‌তেন, বেশী কিছু বল্‌লেন না,—যাবার মুখে, ছোট্ট একটা মন্তব্য প্রকাশ করে গেলেন! "বল্‌তে ভয় হয় বাপু, তোদের যা ইচ্ছে কর্‌গে যা—আমার কি—বিধবা মানুষ, বৌমা হবিষ্যি ঘরে যায় তাই বল্‌তে হয়; তা না হয়, ও ওঘরের কোন কাজ বা নাই কর্‌লে!"

প্রকাশ হেসে বল্লে "তা' হলে বৌদি একটা কাজে ছুটী পেলে,—উঠ্‌লে কেন—ছুটীর সময়টা বেচারীর কাছে বসে থাক্‌লে অনেক কাজ হবে।"

তুলালী মনে যথেষ্ট অশোয়াস্তি অনুভব কর্‌ছিল। পিসিমা রাগ করে গেলেন! তুলালী বল্লে, "ঠাকুর পো তুমি না হয় খোকাটাকে একটু ধর, যদি কোন কাজ থাকে সেরে আসি,—পিসিমা অবিশ্যি কোন্ দরকারের জন্যেই আমায় খোঁজ কর্‌ছিলেন!"

প্রকাশ বল্লে "তা হচ্ছে না বৌঠা'ন! তোমাকে পিসিমা একঘরে করেছেন, এ ঘর বিনে তোমার আর আপাততঃ অন্যঘরে কাজ দেখা যাচ্ছে না,—ঘোড়ার কাজ যদি মেড়াকে দিয়ে চল্‌ত তবে আর কথা ছিল কি—সূচ ও চাল্‌নী এক গোত্র হলেও কাজ যে তাদের ভিন্ন—ছেলে রাখা আমাদের কাজ নয়, যার কাজ যার জাতেই কর্‌তে পারে, হুকুম কর, আর যা করতে হয় কচ্ছি!"

তুলু স্ফুরিত অধরে বল্লে "যার জাত হয়েই ত যত অপরাধ হয়েছে ভাই।"

সে কণ্ঠে এমন একটা করুণামিশ্রিত অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল যার বলেই প্রকাশের প্রাণে বৌঠা'নের মনের ভাব স্পষ্ট হয়ে দেখাছিল! সে বল্লে "সত্যিই বৌঠান! পুরুষের স্বাধীনতার সঙ্গে মেয়ের প্রাণটা যদি থাক্‌ত তবে আর সংসারের আবিলা রইত কি! বন্ধনমুক্ত ঘোড়ার মত আমরা, আমাদের মনের বেগ সংযত কর্‌তে না পেরে কেবলি পথে অপথে ছুটাছুটি করে অযথা নিজ শক্তির ক্ষয় কচ্ছি, নিজেরাও ক্লান্ত হচ্ছি, আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যাদের তাদেরও হয়রান কর্‌তে কম কচ্ছি না, তোমাদের মত ধৈর্য্যের বল—সংযমের লাগাম আমাদের থাক্‌ত যদি তবে বলো, কাজ হ'ত কত, তোমরা টেনে আছ বলেই আমরা একভাবে টেঁকে আছি!"

তুলু সত্যই এবার হেসে ফেল্লে, "বলেছ বেশ—তোমার কেবল কথায় কথায় বক্তৃতা;—শুন্‌তেও আমার বড় ভাল লাগে—কিন্তু ভাই, সে টান্‌টায় ধরা দিতে তবে যে বড় চাও না।"

"ওই ত দোষ তোমার বৌঠান,—ব্যক্তিগত কথা এনে পাড় বড়,—সকল কাজেরই যোগ্য অযোগ্য আছে,—এই ধর না,—এই খোকাটাকে নিতেই আপত্তি কর্‌ছিলেম—ও তোমার কোলে কেমন সুস্থির হয়ে আছে দেখ!"

তুলুর প্রাণে সে কথায় স্নেহরস ঢেলে দিল, সে খোকাকে বুকে চেপে ধরে বল্লে "আমি তবে ওকে নিয়ে একটু আসি ঠাকুর পো—ওকে ত একটু দুধ খাওয়াতে হবে; মেয়েটারও ভাতটাত কিছু চাই ত! ওযে বেশী রাত হলে ঘুমিয়ে পড়্‌বে! সুবির মেয়েকে বল্লে "লক্ষ্মি টেপু আমার, তুই ছোট বাবুর কাছে থাক—আমি তোর খাবার নিয়ে আসি।"

পথে বেড়িয়েই তার মনে হল—তাইত পিসিমা অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন,—হাড়ির ঘরে ভাত নিয়ে আস্‌লে কিবা ভাবেন! ডুব দিলে শুদ্ধ হই যদি, তাই না হয় করলেম কিন্তু তাতেও তাঁর মনের খুঁৎখুতিনি যাবে কি? এমন অবস্থায় ওদের ফেলেই বা থাকা যায় কি করে।"

চক্ষে তার তখন আনন্দ নিভে গিয়েছিল—পরানন্দে,—প্রেমে তার প্রাণ তখন পূর্ণ—সে চালিত পুত্তলিকার মত চলেছিল,—প্রাণের কথাটাই কানে মনে শুনতে পাচ্ছিল—খাশুড়ীর ভয়—পিসিমার কথা সে প্রবাহে ডুবে গিয়েছিল যেন, তার বারবার মনে হচ্ছিল—স্নানে বা অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে যার, সে-পাপের ভয় ক'রে, কেন সে-যে পাপের নিরাকরণ হয় না সেই মহাপাপে ডুব্‌বে!

ভয়ে ভয়ে সে খোকাকে কোলে করে বাড়ী ঢুক্‌ছিল, ভয়ে ভয়েই বলি নিজের সুখদুঃখ আনন্দনিরানন্দের ভাব সে হারিয়ে ফেলেছিল—কেবল মনে হচ্ছিল তার, পিসিমার কথা—ছেলেটাকে কোলে দেখে পাছে তিনি ব্যথা পান! অবোধ শিশু বুকে তার মুখ লুকিয়ে, হাত পা নেড়ে চেড়ে খল্‌খল্‌ করে হেসে সারা হচ্ছিল, কি আনন্দ! 'মার বুকের ধন—মা তোর আজ পড়ে—কে তোকে কোল দেবে বাছা!' আর কি দ্বিধা থাকে?—পরকীয়া রসে যে মন তার মজেছে!

স্বামী ঘরের রোয়াকে বসে ছিলেন, চুলু তাকে লক্ষ্য করে নি; তিনি হেসে বল্লেন 'বেশ' ত সেজেছে—তাই পিসিমা বল্‌ছিলেন তোমার জাত নাই!"

ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে, চুলু আড়ালে দাঁড়িয়ে বল্লে "ওর মার যে বড় অসুখ—ওদের রাথে কে। ছোট মেয়েটা কি পারে!"

স্বামী বল্লেন, 'তাতে তোমার দোষ দিচ্ছে কে! আমিত যেতে মানা করি নি!'

চুলু স্বামীর চরণে মনে মনে শত সহস্র প্রণাম জানাল! চক্ষের জল আর কি বাধা মানে! সত্যই তার শিবের মত স্বামী লাভ হয়েছে!

সাহস পেয়ে চুলু বল্লে "তবে তুমি একটা কাজ কর, চুটি ভাত বেড়ে দাও না—টেপীকে সকালে সকালে খাইয়ে দি— আমিত ঘরে যাব না।"

স্বামী তেমনি স্মিত মুখে বলেন "তুমি যাও—যার কাজ তার সাজে। কে তোমায় এক ঘরে কল্লে—ওদের ছুঁয়েছ, ওদের ভাত খাওনি ত!"

এর 'পর কি আর চুলুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আছে।—মনে পড়্‌ল তার আর একদিনের কথা,— তিনি যে জেনেশুনে— তাকে চরণে স্থান দিয়েছেন। মনে জাগ্‌ল শৈশবের স্মৃতি—সে ভাব-প্রাবল্যে তা গোপন করতে পার্‌ল না—বল্লে, "ওদের ভাত ত আমি খেয়েছি, তবুও ত তুমি আমায় নিয়েছ, আজ যদি আবার আমি খেয়েই থাকি তবে কি এখন ত্যাগ কর্‌তে পারবে! আমাকে চরণে স্থান দিতে তুমিও যে জাত খুয়িয়েছ!"

স্বামী বল্লেন" জাত তখন গিয়েছিল কি না জানিনা—জাত রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেম জানি;—সফল তা হয়েছে! তোমার পেয়ে, খাশুড়ীর—তোমার চুধ মার স্বভাবে যে চেতনা জেগে ছিল, আজ তুমি তার মূর্ত্তি দিলে, আর কিসের দ্বিধা—কিসের গোল! বাহিরের স্নানে শুচি হয়ে ওদের জন্যে ভাত বাড়্‌তে হয় বাড়গে—আমি সে সব শুনতে চাইনে,—দাও খোকাকে কোলে দাও—ওকে মাটীতে রাখ্‌তে দিয়ে আর কাঁদাতে দিচ্ছিনে!

প্রাণে প্রাণ মিলে গেল। চুলুও যে তাই চায় সে আর থাক্‌তে পারল না—স্বামীর চরণে মাথা রেখে বল্ল "তথাস্তু!"

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

বিরহের দান।

—:*:—

যৌবনেরি যে কয় দিবস প্রিয়ার সাথে রই নি আমি
একটু ভেবে দেখলে বুঝি, সে-কয় দিনই অধিক দামী।
সে-কয় দিনে বিফল ভেবে মাঝে-মাঝে অশ্রু বয়
কিন্তু সে সব ভ্রান্তিবিলাপ—সেগুলি মোর নষ্ট নয়।
যে-কয় দিবস কাটায়েছি প্রেমানন্দে সঙ্গে তার
যে-কয় দিবস অঙ্গ পরশ লভিয়াছি অঙ্গে তার
সে-সব দিনের সুখের স্মৃতি মাদকতায় রোমাঞ্চন
পেয়ে গেছে কাল-সাগরে চিহ্ন-হারা নিমজ্জন।
অন্তরে তায় ধ্যান করেছি যে-ক'টী দিন পাইনি কাছে
অন্তঃস্তলের প্রতিবিম্বে তাহার শুধুই চিহ্ন আছে।
তাহার নব যৌবনেরি রূপটী চপল মন্‌হরা,
গেল নাক' কোন ছলে বাহুর পাশে তায় ধরা।
দূরে রহি প্রিয়া আমার ধ্যান-ধারণার বন্ধনে
বন্দী হয়ে রয়ে গেল উজল চির-যৌবনে।
যত্নে রাখি রত্ন-সম দুর্দ্দিনের সে সম্বলে
দুর্ব্বিষহ সেই বিরহের দিন যাপনার ঐ ফলে।
অক্ষয় যৌবনের মধু অন্তরেরি মৌচাকে
রইল জমা পার্বে নাক' হর্‌তে কভু কাল তাকে।
কুসুমহারা হবে যখন রূপ মালঞ্চের গাছ পালা
বক্ষে আমার দুল্‌বে তখন যৌবনের ঐ-জয়-মালা।

শ্রী কালিদাস রায়।

সাম্য।

মহাযুদ্ধের অবসানেও পশ্চিম গগনে হিন্দুর বিশাল ওঙ্কার ধ্বনির অনুরূপ দিগন্তভেদী নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে—কিসের ?—সাম্যের। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার তদানীন্তন লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ডে মহাত্মা ক্রমওয়েল যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া এক মহাসাম্যের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং যাহার অধিকতর পুষ্টি ও বিকাশে তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় ফরাসী দেশ ঘন রক্তিম বরণে মণ্ডিত হইয়া কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যই-না করিয়াছিল—

আজ আমরা তাহারই পূর্ণাভিনয় ও পূর্ণাহুতি এই জগদ্ব্যাপী মহাসমরযজ্ঞে দেখিতে পাইলাম। সহস্র সহস্র কালানল-বর্ষী করকাধারা-বর্ষিত ঘোরান্ধকারাবৃত অমানিশা-প্রকৃতির কোলে দেখিলাম—রণরঙ্গিণী বরাননী সুতন্বী নিরুপমা মা আমার—সুধাপানে উন্মত্তা - এলোকেশী দিগ্বসনা হইয়া অতিকায়া—ভীষণারূপে রক্তাক্ত লেলিহান্ জিহ্বায় রক্ত-বীজের রক্ত লেহন করিতেছেন—মায়ের অপূর্ব্ব রণনৃত্যে ও ভীষণ পদভরে সমগ্র মেদিনী বিকম্পিত—সমস্ত জীব ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত—প্রলয়মেঘের হুঙ্কারে—ভীম ঝঞ্ঝাবাতে সৃষ্টি বুঝি আজ রসাতলে যায়. এমন সময়ে সংহাররূপী মহারুদ্রও সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্রীর পদতলে সৃষ্টিনাশভয়ে শিবরূপে নিজেই বিলুণ্ঠিত—অমনি নৃত্যশীলা মা আমার স্থিরা জ্যোতির্ম্ময়ী স্নিগ্ধ সুহাস্যে বরাভয়দায়িনীরূপে প্রকাশিত হইলেন—কোন্ অলঙ্ঘ্য মন্ত্রবলে চকিতে সমস্ত রণবাদ্য থামিয়া গেল—শত সহস্র বজ্র গর্জ্জনে যে গোলা মহাশক্তিতে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রক্তগঙ্গা বহাইতেছিল আজ মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাহা সংরুদ্ধ—তাই আজ জগতের নরনারী ব্যাকুল হৃদয়ে শুভলগ্নে বিশ্বমাতার শান্তিপ্রদায়িনী মুনিজন-মনোহরা মধুর-কল্যাণী রূপ দেখিবার জন্য সহসা সকলেই ক্ষণতরেও ঊর্দ্ধগ্রীব—ঊর্দ্ধনেত্র। বিশ্ববাসী এই বিশাল নীরবতার মধ্যে অনাহত ধ্বনির ন্যায় 'মভৈঃ' 'মাভৈঃ' রবে আশ্বস্ত হইয়া সাম্যের অমৃতারুণ কিরণে ভাসিতে লাগিলেন। যাঁহাদের পুণ্যচেষ্টায় আজ শয়তান, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় কোন্ অজানিত দূর পথে পলায়নপর এবং শীতপ্রদেশের জমাটবাঁধা অন্ধকারও বালার্ককিরণসম্পাতে দূরীকৃত—যাঁহাদের ক্ষরিত পূতরক্তে ধরিত্রী স্নাত হইয়া প্রেমবসনাবৃতা—সেই সমস্ত বিগতজীবন. জীবিত বীরের চরণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণিপাত করি। যাঁহারা সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগতের ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের—জাতি ও ধর্ম্মের—প্রকৃতি ও বর্ণের লক্ষলক্ষ বীরকে একত্র সাম্যমন্ত্রে অভিষিক্ত ও অভিসিঞ্চিত করিয়া প্রত্যক্ষরূপে শিক্ষাদান করিলেন—আজ এই মহামন্ত্র পুণ্যগাথা কীর্ত্তন করিয়া সেই প্রত্যাবৃত্ত বীরগণকে বরণ করিয়া লই। এই পুণ্যস্মৃতি আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনের সূত্রপাত করুক্ এবং ভবিষ্যবংশীয়গণের নিকট স্থায়ী আলোকস্তম্ভরূপে প্রকাশিত হইয়া চিরস্মরণীয় হউক।

যখন মনে হয় এই মহাকুরুক্ষেত্রে অসভ্য কৃষ্ণকায় নিগ্রো 'মেশিনগান' স্কন্ধে লইয়া শিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় বীর দর্পে ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধে চলিয়াছেন—ভারতের কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী—যাঁহারাই একদিন সামান্য কার্ত্তুজ-বিভ্রাটে সিপাহীবিদ্রোহীরূপ মহামেঘের সঞ্চার করিয়াছিলেন তাঁহারই আজ জাতিধর্ম্ম সংস্কারাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুদূর ইউরোপখণ্ডেও অনভ্যস্ত শীতে আড়ষ্ট না হইয়া সরল বীরের ন্যায় পঙ্গপালের মত সমরাগ্নিতে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন—মহাত্মা গোবিন্দ সিংহের ধর্ম্মবজ্রে গঠিত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শিখগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রে—শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ইউরোপবাসীকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া মৃত্যুর হার, বালকের ক্রীড়ণকের মত আপন কণ্ঠে পরিয়া লইলেন—জহরব্রতপরায়ণা রমণীর গর্ভসঞ্জাত প্রতাপের মত বীরপ্রসবিনীর সন্তানেরা—হলদীঘাটের বীরেরা—দলে-দলে সিংহের মত অম্লানবদনে রক্তাক্তকলেবরে যুদ্ধ করিতে করিতে বজ্রগোলা বুকে ধারণ করিয়াও অগ্রসরগতিতে ছিন্নভিন্ন—এমন কি ভীরু কাপুরুষ বলিয়া চিরপরিচিত বাঙ্গালীর শিক্ষিত মেধাবী ভদ্রসন্তানও "আমার রাজা—আমার রাণী" বলিতে বলিতে সংযতপাদবিক্ষেপে অটল স্থৈর্য্যে—অমিত তেজে ও অদম্য উৎসাহে অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইয়া—স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া অব্যক্ত এক সুমহান্ আশার মোহন ছবি মৃত্যুমুখে প্রকট রাখিয়া বিদেশের রণপ্রান্তরে শায়িত—তখন বিস্ময়ে মন আপ্লুত হয় এবং ইঁহাদিগকে চিরস্বাধীনতা সুখপরায়ণ ব্যাঘ্রবলদৃপ্ত শ্বেতকায়বীরের পাশাপাশি সমানভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সাম্য দেবতার হস্তচালনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ইহা এই মহাকুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আশা করি

এখানে একথা বলিলে দোষ হইবে না যে স্বাধীনতার চিরলীলানিকেতন ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকা নাকি অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা ও ন্যায়বিধি সংরক্ষণের জন্যই এ মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অজ্ঞ আমরা—রাষ্ট্রনীতিজ্ঞও নহি—তবে সহজ বুদ্ধিতে এ-টুকু বেশ বুঝি আমাদের মত অজ্ঞই এ দেশে অনেক যাহারা পলিটিক্‌সের গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিলেও ধনীলোকের পোষাকুকুরের মত নীরবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া থাকে আর মনে করে বৃহৎ ভোজের সময় অবশ্যই পরিশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাতেই তাহাদেরও 'ভোজ' হইবে। এ দেশের ধনীর গৃহে ভুরি ভোজনের দিন এখনও (মানুষ না পাইলেও) কুকুরবিড়াল পূর্ব্ববৎ আনন্দই পায়, কিন্তু পাশ্চাত্যপ্রণালীর ভোজন ব্যাপার পৃথক রকমের তাহাতে কুকুরের নির্দ্দিষ্টবৃত্তি অপেক্ষা বেশী আশা করা নিতান্ত অন্যায়। এ দেশের জন সাধারণও বলিয়া থাকে 'ভোজনের ব্যাখ্যা খাবার পর' অতএব উদরস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মত মূর্খসাধারণ ওভাবের কথার উপর কোনরূপ টীকাটিপ্পনী করিতে নিতান্তই অক্ষম। তবে ছেলেবেলায় বাপমা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট ইহা শুনিতাম যে—"সাহেবেরা মিথ্যা কথা জানে না--আশ্রিতের রক্ষক--ন্যায়ের আদর্শ।' এক্ষণে আমি বুড়ো বলিলেও চলে—আমার পোড়া-অদৃষ্টে এমন ইংরেজের পুণ্যচ্ছায়াস্পর্শসুখ ঘটে নাই। ছেলেবেলা হইতে ভূতের ভয়েরও নানাপ্রকার কথা শুনিয়া আসিতেছি—আমার ভাগ্যগুণে তাঁহাদেরও দর্শনলাভ ঘটে নাই তবুও যখন দেশের 'অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিশারদগণ'—বড় বড় ব্যারিষ্টার—পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণও দেবতত্ত্ব ছাড়িয়া প্রেতত্ত্বের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে কম পরিশ্রম করেন নি তখন এ কথা আমার বেশ মনে হয় দেশের রাজনৈতিকবিশারদগণেরও পলিটিক্‌সের ভূতের ছায়া দেখাইয়া দেশ নাচাইবার ও মজাইবার প্রয়াস তুল্যরূপ হইবে। এক কথায়-আমি নিজেই পাড়াগেঁয়ে ভূত—অতোশতো বুঝি না, তবে বুঝি, বজ্রপাত হইলেও কলিকাতা হাইকোর্ট যখন উন্নত শীর্ষে সুবিচারকরূপে দণ্ডায়মান—তখন জাষ্টিস্ স্যর আশুতোষের উক্তিই আমাদের নজির—"পলিটিকস্ পরাধীন জাতির জন্য নয়।" বিশেষতঃ পলিটিকস্ চিরকালই চোরাবালু - নতুবা সিজারের মত বীর ও পণ্ডিত—সিশিরোর মত রাজনৈতিকবক্তাও ওর মধ্যে একেবারেই ডুবিয়া গেলেন! অতএব আমার মত মূর্খেরা ও-কথায় কানে আঙ্গুল না দিয়া আর কি করিবে?

এই মহাকুরুক্ষেত্রে যে সাম্যের ছবি দেখিতে পাই তাহার ভিত্তি পাশ্চাত্যজগতের অন্যান্য বিষয়ের মত—বহির্জ্জগতেই। বহির্জ্জগত সতত পরিবর্ত্তনশীল ও ষড়বিকারযুক্ত—অন্তর্জ্জগত ঠিক তাহার বিপরীত। সোজা কথায় প্রতীচ্যের সাম্যের ভিত্তি দেশাত্মবোধে অর্থাৎ দেশকে সাম্রাজ্যকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা তদুপরি এই সুবর্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাচ্য সাম্যের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয় শতদলের উপর বসাইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের সহিত গাঁথিয়া এক বিরাট সাম্যের স্নিগ্ধ সৌম্য অপরূপ মূর্ত্তির স্বপ্রকাশরূপে দর্শন করিয়া পরানন্দে আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়াছেন। একদিন এই সাম্যের ধ্বনি পুণ্যশীল ভারতবর্ষে আর্য্য ঋষিগণ জলদগম্ভীর স্বরে এইরূপে শুনাইয়াছিলেন ;—

'শৃণ্বন্তু বৈ তে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

ইহাই প্রাচ্যের—সনাতন ধর্ম্মের সাম্যের মূলনীতি! ইহাই মানবের—মানবের কেন 'সমগ্রের' একীকরণের পুণ্যময় বেদমন্ত্র। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে - কত রাজ্যের উত্থান ও পতন কালসাগরে বুদ্বুদের

ত্যায় প্রকাশ হইয়াছে—কত ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, বিভীষিকা এ হতভাগা দেশের উপর দিয়া বহিয়া কত অমূল্য ধন বিনষ্ট করিয়াছে তবুও মনে হইতেছে যেন সেই স্মরণাতীত কালের ঋষিগণ আজ আসিয়া আমাদের নিকট বলিতেছেন 'হে অমৃতের পুত্রগণ—তোমরা শোন'। এই পতিত- দুঃখদারিদ্র্যনিষ্পেষণে মৃত আমরা কি সত্য সত্যই অমৃতের সন্তান! আহত জন্তুর ন্যায় তাড়িত—গৃহহীন—সম্বলবিহীন আমার মত ভাগ্যহীন মূর্খরাও কি তবে অমৃত হইতে উদ্ভূত? দধীচি নিজের হাড় দিয়া দেবপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে বজ্র গড়িয়া দিলেন—স্বয়ং বিষ্ণু, ভৃগু-পদ-চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর মহিমা যে কত বড় তাহার স্পষ্ট ছবি জগৎকে দেখাইলেন—এমন সব পুণ্যাত্মা মহাত্মাগণ আমাদের মত হতভাগ্যদিগকে জন্য মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিতে এ সব লিখিয়া যান নাই জানি—তবুও এমন অবস্থায় পড়িয়াছি যে নিরাশাও হইতে পারি না কারণ 'আমরা অমৃতের সন্তান'—আবার আশা করিতেও সাহসে কুলায় না—কাঁদিতেও পারি না—হাসিলেও দোষ—বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া বলিব কি—বলিবারও শক্তি এবং অধিকার উভয়ই হারাইয়াছি।

বায়ুও যেন আজ ললিত ঝঙ্কারে মধুর ভৈরবী রাগিণীতে কানে কানে বাজিতেছে 'হে অমরের সন্তান—শোন!' আলোও যেন অন্ধকার চিদাকাশে বিদ্যুৎ-অক্ষরে তাহারই হিরন্ময়মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে—আর প্রাণের দেবতা যেন কোন্ গুপ্ত-গভীর গুহা হইতে দৈববাণীর মত বলিতেছেন—"আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো।"

'তুমি উত্তর বা দক্ষিণ মেরুবাসী হও—তুমি শ্বেতকায় বা পীতকায়ই হও—গৌর বা কৃষ্ণবর্ণই হও—তুমি বহুমূল্য শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যবাসী হইয়া বিপুল ধনরাশির উপর পা ছড়াইয়া বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ধরাকে সরা জ্ঞানই কর বা পর্ণকুটীরবাসী হইয়া মৃত্তিকাশয্যা গ্রহণ কর—তুমি অক্ষরাভিমানী উচ্চবর্ণসঞ্জাত পণ্ডিতই হও বা নিরক্ষর চণ্ডালই হও—তুমি পুরুষই হও বা নারীই হও—তোমরা সকলেই যে—'এক-মানুষ—এক দেবতার সন্তান—তোমাদের সকলের লইয়াই যে এক বিরাট মনুষ্যত্বের সৃষ্টি—ইহা ভুলিলে তো চলিবে না।' ইহাই তো প্রাচ্যের সাম্য দেবতা। ইহা ভুলিয়া বিশ্বপ্রেম বা সার্ব্বজনীন প্রেম লাভ করিতে চাওয়া মনে হয় যেন অমৃতভাণ্ড-ত্যাগে হলাহল গ্রহণ করা—প্রসন্নসলিলা পূতগঙ্গোদক নিক্ষেপে লবণাম্বুপান তুল্য। যে অশুভক্ষণে এই হতভাগ্য জাতি তাঁহাদের পুরাতন মহাপুরুষগণের এই উদার ও মহান্ নীতি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই ইহাঁদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। 'গতস্য শোচনানাস্তি।' যাহা হইবার হইয়াছে। অতীতের শিক্ষাটুকু লইয়া অতীতকে ভুলিয়া এস আমরা চিরপূজ্য সেই আর্য্যঋষিগণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই ও অগাধ বিশ্বাসে—বিপুল বলে—অসীম ধৈর্য্যে নিজ নিজ সংযত-পবিত্রতার মহাশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভয়ে অক্লান্তগতিতে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই—তাহা হইলেই এ মহাদেশের পুরাতন শ্রী ও সৌন্দর্য্য নূতনের পোষাকে ফিরিয়া আসিবে—সুনিশ্চিত। আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই দেবতুল্য ঋষিগণ আহ্বান করিতেছেন—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

ঋগ্বেদ, ১০, ১৯১, ২। ৩। ৪।

'তোমরা একত্র মিলিত হও, অবিরোধ করিয়া বাক্য বল, তোমাদের মন অবিরোধজ্ঞানলাভ করুক্। মন্ত্র, সমিতি, মন ও চিত্ত একরূপ হউক্। তোমাদের আকূতি সমান হউক্, হৃদয় সমান হউক্, মন সমান হউক্—যেন তোমাদের সাহিত্য শোভন হইয়া উঠে।'

যে দিন আবার এ মহান্ সত্য জাতীয়-জীবনে পরিস্ফুট হইবে এবং ইহার ধ্রুবসত্যও সম্যকরূপে আমরা উপলব্ধি করিব—সেই দিন আবার প্রতিজনার হৃদয়ে অন্তরেরমানুষটি জাগিয়া উঠিয়া সহস্রদলপদ্মে বিকশিত দেখিব এবং সমগ্র ভারতভূমি এক সুবৃহৎ কোটী-কোটী-দলপদ্মে পরিণত হইয়া তাহার শুদ্ধশুভ্রবর্ণে ও নির্ম্মল গন্ধে সমস্ত জগৎ আকুলিত করিয়া স্বর্গের বিমল পারিজাতরূপে প্রকাশিত হইবে। তখনই আমাদের জাতীয়-জীবনের অন্তরে এমন মহাশক্তির উদ্ভব হইবে যে বালক প্রহ্লাদের ন্যায় আমরা সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতনে অচল অটল অটুট থাকিয়া সিদ্ধিলাভ ও নির্ভয়ে অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার সক্ষমতা লাভ করিব। সেই দিন আবার এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে—দেবগণ আবার পুলকে সুধাবৃষ্টি করিবেন। সত্যযুগের আবির্ভাবে দেবরাজ ইন্দ্র এবার কোটী-কোটী-দধীচি-হাড়-নির্ম্মিত নূতন অমোঘ বজ্রাস্ত্র লইয়া ন্যায়দণ্ড পরিচালনার্থে সিংহাসনারূঢ় হইবেন—অমরবৃন্দের আশীর্ব্বাদে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, করুণা ও প্রেমের গঙ্গা শতসহস্রমুখী হইয়া প্রবাহিত হইবে—অভিশপ্ত এই সাগরসন্ততিগণ সর্ব্বপাপহারিণী সুরধুনিতে স্নান করিয়া শুভ্র বসনে ও নবজীবনে শোভমান ও দীপ্তিমান হইয়া অকৃত্রিম কৃতজ্ঞাবনতহৃদয়ে ও গদগদকণ্ঠে মধুর উদাত্ত সুরে যুগশ্রেষ্ঠ সাধক কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবেন,—

'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর !
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য ! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি ! যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্য জ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত—পাষাণ—
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে।
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ,
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ !

তখন নবভগীরথের নবজাহ্নবীধারায় দেশ প্লাবিত হইয়া অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রও প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করিবে—দৈবজ্ঞানসম্পন্ন অমরগণ ভারতে বিচরণ করিয়া অতুল্য স্বাস্থ্যের বিশুদ্ধান্তঃকরণের দেবদেহ গঠন করিবে—দেবতার স্নেহাশীষে মহামারী দুর্ভিক্ষ অপমৃত্যু অকালমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত ও নির্ব্বাসিত হইবে,—সামান্য নরনারীও পরিমিতাহারী-অনলস হইয়া শুদ্ধচিত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনকের মত আত্মজ্ঞাননিরত থাকিয়া সংসারাশ্রমীর প্রাধান্য ঘোষণা

করিবে। রাজর্ষি জনক বিশাল রাজ্যের ভার স্কন্ধে লইয়া এই অমরপথে বিচরণশীল ও জীবন্মুক্ত বলিয়া পরিচিত, পাশ্চাত্যঋষি সক্রেটিসও নাকি রিপুজয়ী ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন—সামান্য একটী প্রদীপ জ্বলিলে যখন তাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালান যায় তখন এসব আগুনের উৎস কি শুদ্ধ শোভাবর্দ্ধনের বা বৈঠকী-সিদ্ধান্তের জন্যই জগতে প্রবাহিত ও প্রচারিত? মহতের পূজার বিধি সর্ব্বদেশেই সমানভাবে বর্ণিত ও কথিত—তখন আদর্শের অনুকরণ ও তুল্য হইবার চেষ্টা অমরপুত্রগণের নিকট কখনও অন্যায় নহে। কথায় দেব বা অমর সাজিলে দেবত্বের আসন দুর্লভ হইত না—সভাগৃহে বা বৈঠকে মৌখিক অসরল অভিনয়ে মহতের পূজার অনুষ্ঠান নহে—প্রতিজীবনের প্রতিদিনে--প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার আয়োজন ব্যাকুল ও সরল মনে পবিত্রতার পুষ্পোপচারে করিতে হয়। সরলতা বা আন্তরিকতা ইহার প্রধান অঙ্গ। সরলভাবে যাঁহারা যে প্রকার শুভচেষ্টারই প্রয়াস পান তাঁহারাই পূজ্য আর যাঁহারা সারল্যের ভাণ করেন তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও ঘৃণ্য। আর যাঁহারা এইরূপ শুভচেষ্টার মূলে অবজ্ঞা ঘৃণা বা শ্লেষের তীব্র বিষ ঢালিয়া দেন তাহারা মানবের চিরশত্রু—শয়তানের অনুচর। বর্ত্তমানযুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক কবি তাই গাহিয়াছেন,—

'আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস শর্ব্বরী
তার উর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দেই দেবদ্রোহী বলে।
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর! যাক আর সব
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।'

*　　*　　*

"জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন,—
ভক্তি যেন ভয় নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে; শুভচেষ্টা যত
কোন বাধা নাহি মানে কোন শক্তি হতে;
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা পানে
সর্ব্ববন্ধ টুটি! সদা লেখা থাকে প্রাণে

'তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে দিলে অমান্য তোমার।'"

এই জন্যই সর্ব্বদেশের শাস্ত্রই—বেদ, কোরাণ, বাইবেলও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—'মনুষ্যজন্ম দুর্লভ-জন্ম।' শাস্ত্র যখন নির্বিরোধে যবন, খৃষ্টান, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে—এমন কি স্ত্রী পুরুষেরও অভেদ জ্ঞানে অমৃতের অধিকারী বলিয়া সরল ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গেলেন তখন আর কত কাল 'শ্রেণীবিশেষে অধিকারীবিশেষে'—প্রভৃতির মন ভুলানো কথা দিয়া আত্মম্ভরিতার অবলেপে সমাজের এই বিষময় ক্ষত আচ্ছাদিত রাখিয়া ইহার পোষণ ও পরিপুষ্টিতে—দুর্লভ জন্মের মহান্ লক্ষ্য ব্যর্থ করিবে? যখন দেখি রাজাধিরাজ কুলীন রাজা বা দীনাতিদীন ভিক্ষুক চণ্ডাল, মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিরক্ষর মুচির দেহ একই উপাদানে গঠিত—একই প্রকার রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি প্রবাহিত, অধিষ্ঠিত এবং সকল দেহেই ইন্দ্রিয়াদিরও একরূপ বিকাশ ও কার্য্য—মৃত্যুরপর পরিণামেও এই দেহের সমভূতে লয় বা আশ্রয়—তখনি কি মনে হয় না সব মানুষ এক? তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় পরাবিদ্যা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সহজ বা একরূপ নহে কিন্তু কোন্ বিদ্যাই বা তদ্রূপ? যাহাতে এ বিদ্যা সহজ ও সরল হয়—ঘরেঘরে গৃহীত হয়—জনেজনে এই বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারেন তাহারই উপায় কি সাধকবৃন্দের করা উচিত নয়? কেহ কেহ বলেন,—এ যে কলি! যখন দেখি সকল যুগের—সকল দেশের একত্রিত জ্ঞান ও শিক্ষা আমাদের সামনে একাধারে সজ্জিত ও গ্রহণীয়ভাবে বিন্যস্ত তখন কি কলিযুগ বড় বলিয়া মনে হয় না? যখন দেখি পরধন ও প্রাণ নির্দ্দয়ভাবে অপহরণকারী মহাদস্যুও মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী বলিয়া পরিণামে খ্যাত—তখন কি আমরা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবনতশির হইয়া তন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করি না?—আবার যখন কলিযুগ সত্যযুগে পরিণত হইবে—তখন কি মানবচিত্ত তদপেক্ষা কোটী কোটীগুণে অচিন্তনীয় বিস্ময় শ্রদ্ধা গর্ব্ব ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইবে না? যুগান্তকারী এ মহাকুরুক্ষেত্রেও কি কলির বিনাশ সাধন হয় নি? ধ্বনির প্রতিধ্বনি আছে—উত্তরের কি প্রত্যুত্তর নাই?

মনে হয় প্রাচ্যের এই সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার তিনিই অধিকারী—যিনি জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধমনা হইয়া আত্মতত্ত্ববান্। জাতি, কুল, বিদ্যা, তপ, যোগ, যাগ, ধ্যান, ধনজন ও যৌবন—ইহার কিছুরই অপেক্ষা করে না যদি কেহ সরল শুদ্ধ মনে ও দেহে অনন্যচিত্তে সেই পরমপুরুষের আশ্রয় লয় এবং তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন করে। এই অখণ্ড সত্তাকে—'সমগ্র-একীকরণ' সাম্যকে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কে—এই অরূপের রূপকে—সচ্চিদানন্দময়কে—অবাঙ্মনসগোচরম্কে দর্শন করিলে রিপু নাকি আপনা-আপনিই জয় হয়—ত্রিতাপজ্বালাও থাকে না এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় তিরোহিত হইয়া মন অপরূপ শুদ্ধ-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়! কোটী মধ্যাহ্ন-সূর্য্য বা কোটী পূর্ণচন্দ্র মিশ্রিত আলোকরাশিও ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বা অতি তুচ্ছ। যে মৃত্যুর পথ কোটী অমানিশার অন্ধকারাপেক্ষাও ভীষণতর তাহাও আলোকসম্পাতে শত সহস্র বৎসরেরও অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইবার মত এই অচিন্ত্যনীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় বিরাজ করে;—সংশয় তিরোহিত হইয়া মন তখন মুক্ত—সুখদুঃখ পাপপুণ্য আনন্দনিরানন্দ শুচিঅশুচি সংস্কার মায়া প্রভৃতির রাজত্ব ছাড়িয়া ঊর্দ্ধাভিমুখী হয় এবং মন, ভৃঙ্গ হইয়া নিত্য সুধামকরন্দ পানের নেশায়ে ডুবিয়া যায়। তখনই সাম্য আসিয়া স্বাধীনতার আলিঙ্গনপাশে চিরাবদ্ধ হয়। মনে হয় এইখানেই সাধক জীবন্মুক্ত।

প্রতীচ্যের সাম্য গাঢ় হইয়া মৈত্রী বা জমাট সঙ্ঘশক্তিরূপ প্রকাশ পায় এবং ঐ সঙ্ঘশক্তি এককরূপে চালিত হইয়া বহির্জগতের স্বাধীনতাপ্রয়াসী হয় এবং উহা লাভও করে। কিন্তু স্বাধীনতার নামে অনেক সময় ইহাতে

উচ্ছৃঙ্খলতারও ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য স্বাধীন দেশের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও অগাধ ঐশ্বর্য্যপরিপুষ্ট শাসনযন্ত্রদ্বারাই সাধারণতঃ এই সকল জাতীয়-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়; এবং ইহার আয়তন, গঠন শক্তি ও চালনার উপরই ইহার সাফল্য নির্ভর করে। ইহাও আবার নানাবিভাগে বিভক্ত,—পলিটিক্স, পলিটিক্যাল একোনমী, সোসিওলজী প্রভৃতি বহুবিধ নামে এই সকল বিভাগ পরিচিত। আবার সময়ে-সময়ে বিভিন্ন-বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া ইহা এক বিপুল বিরাট জনসঙ্ঘরূপে প্রকাশ পায়—বলিতে গেলে তাহা ঠিক্ অনেকটা আমেরিকার ষ্টীলট্রাষ্টযৌথকারবারের মত—মনে হয় পরিণামেও তদ্রূপ সর্ব্বগ্রাসী। অবশ্যই এই বিরাট সঙ্ঘ-শক্তিকে সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট করিতে হইলে উপরোক্ত বিভাগীয় শাস্ত্রাদিতে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং উহার সম্যক প্রয়োগ শিক্ষা করাও কর্ত্তব্য। ব্যবসা না শিক্ষা করিয়া যেমন ভাবের প্রাবল্যে শুধু পাকা ব্যবসায়ী হয় না এবং তাহার ফল যেমন অধিক ক্ষেত্রেই তিক্ত ও বিষময় হয় তদ্রূপ প্রতীচ্যের মূর্খানুকরণের ফল হাতেহাতেই ফলিয়া থাকে—ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে বোধ হয় কাহাকেও পরের ঘরে যাইতে হইবে না। এ-কথা এখানে বলিয়া রাখা অন্যায় হইবে না—শিক্ষা বা বিদ্যা সম্যকরূপে প্রয়োগ করিবার শক্তি বা সামর্থ্য যে ব্যক্তি বা জাতির নাই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ—আমার মনে হয় উহা মৃতের গাত্রালঙ্কার রূপ সৌন্দর্য্যের ন্যায়। বন্ধনগ্রস্ত ক্ষুধার্ত্তের সম্মুখে যেমন সুখাদ্য ধরিলে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না—প্রয়োগ বিনা অধীত শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যও কি তদ্রূপ নহে? সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত লইয়া এ দেশ কি করিবে যদি তাহার দ্বারা একটী রোগীর চিকিৎসাও না চলে? প্রবন্ধের প্রথমাংশে লিখিত পলিটিক্স্ ক্ষেত্রের নির্ব্বাকের মত এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের নীরব থাকাই কর্ত্তব্য। আমরা যে দেশ সংসারের এই বিক্ষোভে চঞ্চল নহে—যে দেশে ভয় বলিয়া কিছু নাই—সেই দেবতার দেশে,—অমৃতের সেই তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণ প্রদর্শিত পথে আবার ফিরিয়া যাই;—যেখানে গেলে মন মুক্ত হইয়া চিরস্বাধীনতা লাভ করে এবং মৃত্যুরও কালমেঘ অচঞ্চলা সৌদামিনীর প্রকাশ করে।

মনে হয় প্রাচ্যের সাম্যাদর্শ চরম—উহার ভিত্তিও পাকা—উহা চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উহার কল্পনা ও অনুভূতিতে প্রতি হৃদয়ে একাধারে সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাব স্বতঃই মধুর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে; উহা নদী সমূহের মত আপনগতিতেই সমুদ্রে মিশিয়া মহাসাগরের আকার ধারণ করে। মন যখন মহানন্দসাগরে—শুদ্ধজ্ঞানালোকে ডোবে উঠে আবার ডোবে তখন তন্ত্রের এই মধুর উক্তি মনে পড়ে,—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পপাত ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

এবং এই সঙ্গে মৈত্রী বা কারুণ্যে বা প্রেমে ঢল ঢল হইয়া পরমভক্তকবির মত এইরূপে বিশ্বজনের মঙ্গলকামায় সকলকেই ডাকিতে থাকে—

"তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচল খানি ধুলায় পেতে
আঙ্গিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো।

আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তোর
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ॥
তোমার সকল ধন্য যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হের রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক—মগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরাণ প্রদীপ তুলে ধোরো
ঐ আলোতে জ্বলে গো ॥"

মনে হয় একদিন এই প্রেম সুমধুর মুরলীর ধ্বনিতে পরিণত হইয়া অজস্র সুধাধারা বরিষণে গুরুগঞ্জনভূষায় শোভিতাঙ্গ গোপনারীর দেহমনপ্রাণ ও আত্মা সমস্তই হরণ করিয়া—কুল লাজ ভয় যমুনার পূতবারিতে বিসর্জ্জনে—মহানন্দরূপ রাসাভিনয়ে—দেবতাদেরও বাঞ্ছিত ও ভোগ্য নিত্য বৃন্দাবনলীলার প্রকট করিয়াছিল—যে দিন গোধনসমূহ নবশ্যামলতৃণরাজি উপেক্ষা করিয়া হীনচেতনে ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে মোহন মুরলীর অমৃতরোমন্থনে ব্যস্ত—পক্ষীগণ বৃক্ষডালে বসিয়া সে দেবদুর্লভস্বরে পুলকে আত্মহারা ও স্তব্ধীভূত—বিনা পবনে তরুরাজিও সেই মৃতসঞ্জীবনীসুরে চেতনায় মৃদু মৃদু সঞ্চালিত—এবং সে অভিনব বাঁশরীর অমৃত আকর্ষণে যমুনার পুণ্যবারিও সবিতাভিগামিনী হইয়া উজান। আবার সেই দিনের আশায় বাঙ্গালার কবিকুঞ্জের শ্রেষ্ঠতম ভক্তের মুরলী-ধ্বনির মত এই কবিতা-সুধা সুধীর পাঠকপাঠিকাকে সাদরে উপহার দিয়া অতি বিনয়ের সহিত ভক্তচরণে অবনত হইয়া আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।—

"গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র ॥
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অটল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য ॥

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ॥
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণ
দাও সে তোমার অস্ত্র ॥
জান্‌ব তোমার সত্য
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ ॥"

বৃদ্ধ।

বিশ্বাসে।

—:*:—

জীবনের ধন মরণ রতন
হে চিরসুহৃদ মোর!
তব করুণায় হয়েছে আমার
বুকের তমসা ভোর,
কাল যবনিকা গিয়াছে সরিয়া
অমার আঁধার রাতি—
চক্ষে আমার ভাতিছে পুলক
লক্ষ অরুণ ভাতি!
সুন্দর হ'তে সুন্দরতর
অমর জ্যোছনা ভরা
চন্দন-মাখা-নন্দন-ফুল
মন্দারময় ধরা।

মঙ্গল নীরে হেরি যে আজিকে
বিশ্ব করিছে স্নান
দেখিছি তোমার পদ্ম চরণে
রয়েছে আমারো স্থান!

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

ভাষা-শিক্ষা।

—(-*-)—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু।

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোল্‌বার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখ্‌বে না। এর পাল্টা জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখ্‌তে পারে কিন্তু বিদ্যা শিখ্‌বে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজ্‌বে না। আমাদের দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা এর উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিদ্যে নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ইংরাজি না জান্‌লে যে ভদ্রসন্তানের 'দিন আনা দিন খাওয়া' চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, এমন কি রাজ-নীতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এ সব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাকবে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা করব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজমা নয়, তা যে বাঙ্‌লা সাহিত্য, অন্তত সাধু-বাঙ্‌লা সাহিত্য হতে পারে না, তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্‌লা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিত্যই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখ্‌লে যে বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বি মত নেই—এবং থাকৃতে পারে না। তবে বাঙলা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সদুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখ্‌ছে ইংরাজি নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে'—আমাদের বিদ্যার্থীরা যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁদের হাতে উকিলের সনন্দ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাক্ শুদ্ধ ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন যা লেখেন, তা দিনেমার ওলন্দাজ কিম্বা আলেমানের ভাষা হতে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের

গ্রাজুয়েট! এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চ্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?— কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়েসে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চ্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহায্যেই তারা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; সুতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানব-সন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার মনের সঙ্গে তার স্বভাষা জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা সজ্ঞানে শিখ্‌তে হয়; সুতরাং তা শেখ্‌বার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়েসের পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শেখ্‌বার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মদ্য মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আমরা ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। ফলে অল্প বয়েসে ইংরাজি শিখ্‌তে গিয়ে আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বলবেন,—হোক আমাদের ছেলেরা মনে পঙ্গু, তাদের ঐ পাঁচ বছর বয়েস থেকেই A. B. C. শিখ্‌তে হবে, নচেৎ তারা বয়েসকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পারবে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওয়াটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। কেননা অপর দেশের শিক্ষার প্রণালী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে এঁরা এ কথা জানতেন যে, বারো বৎসর বয়েসের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ করবার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম চর্চ্চায় তার সিকির সিকিও পারে না। এই কারণে ছেলেদের বারোবৎসর বয়েসের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংস্রবে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নেরপরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বঙ্গালীমাত্রেরই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা বাঙলা লিখ্‌তে বসলে অবিলম্বে আবিষ্কার করতে পারবেন। সাহিত্যে আমাদের তুল্য মুখচোরা জাত যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার গুণে

আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জানলে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিৎ আছে কিন্তু সে ভিৎ এত কাঁচা যে, তার উপর কি দেশী কি বিলেতি কোনও পাকা ভাষার ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং সক্রিয় হয়ে উঠবে। তখন আমাদের আর এ বলে দুঃখ করতে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রব্যূহে ঢুকতে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা করবার জিনিষ, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মৃতভাষা শিক্ষা করি, সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকও নয়—উপযোগীও নয়। বিদ্যারম্ভেই অমরকোষ ও মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখতে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন করতে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যে উপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এ শিক্ষার গোড়ায় ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা গ্রন্থ কিম্বা গুরুর সাহায্য না নিয়ে, আপনা হতেই যে-সব কথা শেখে, সেই শব্দসংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না করতে পারলে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী-ভাষা শেখার মুস্কিলই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করতে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে সুরু করবার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারম্ভের প্রথম ক্রিয়া নয়।

'সবুজ-পত্র'।
১লা অক্টোবর, ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কবিতার ভাষ্য।

—:#:—

'স্বপ্নভঙ্গে' শীর্ষক যে সমিল গদ্যটী আপনাদের বিখ্যাত পত্রিকায় ছেপে দিয়েছেন, সেটীর জন্যে অনেকেরই কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হল দেখছি। অবস্থা যা' দাঁড়িয়েছে তাতে ঘটক-মহাশয়দের শুভাগমন সম্ভাবনাও অনতিদূর দেখে ভয় পেয়েও যে না গিয়েছি এমন নয়। অ-কবি যদি কবিযশের লোভে হাত বাড়ায় তা' হলে তার কপালে যে দুর্গতিই ঘটবে একথা ঘুণাক্ষরেও আগে টের পেলে কি আর পাঁচজনের কথায় ভুলি! এখন, কবিতা লিখে যে ভুল

করেছি, ভাষ্য লিখে তা' বিল্‌কুল শুধরে না নিলে বিপদ এড়াবার কোনো উপায়ই দেখছিনে। ভিক্ষা,—নর্ত্তকীকে যখন আসরে নামিয়েছেন তখন এই সারঙ্গীটিকেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চালিয়ে দেবেন; তাতে ভাষ্যের মান কিছু কমবে বটে, কিন্তু কবিতার দাম বহুগুণে বেড়ে যাবে। ভাষ্য ছাপা আরও এইজন্যে দরকার, যে ও-কবিতাটী আসলে, এই পরবর্ত্তী বক্তব্যেরই আখড়াই, হিসাবে পাঠানো গিয়েছিল।

"কবির রচনায় তাঁর জীবনের ঘটনা প্রকটিত, ইহা অনুমান করা নিরাপদ নয়"—আপনাদের এ-উক্তি শুধু যে আমি মান্য করি তাই নয়, হাতেকলমে তার সত্যতা সর্ব্বসাধারণকে দেখিয়েও দিতে চাই। জীবনে যে পঙ্ক জমা হয়েছে তা' বেমালুম চেপে যেতে পারা এবং জীবনে যে পদ্ম ফোটেনি তা' বেপরোয়া ছেপে যেতে পারা,—অপরকথায় মনোরাজ্যে ভণ্ডতপস্বী সাজাই যে শ্রেষ্ঠ কবির কাজ, একথা যখন আপনারা মানেন, তখন আশা করি আলোচ্য কবিতাটীকেও উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলেই গ্রাহ্য করবেন—যেহেতু, ও-পদার্থে একটু নূতন ধরণের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও, বস্তুতঃ, শোকের কোন কারণ ঘটেনি। আপনাদের ভাষাতেই বলি—ও-কবিতা রচনা করবার সময় "কবির কল্পনা, সুখদুঃখ, কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ" ছিল না; "বিশ্ব তাঁহার আপনার" হয়ে গিয়েছিল, আর কাজেকাজেই "বিশ্বের সুখদুঃখে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীও" অকস্মাৎ "ঝঙ্কৃত" হয়ে উঠেছিল।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতখানি 'বিশ্বপ্রেম' এতদিন প্রকাশ না করে ঘরের কোণে বসেছিলুম কেন? উত্তর—উপযুক্ত কবি-গুরু জোটেনি বলে। অর্থাৎ, আমার এই খানকতক পল্‌কা পঞ্জরাস্থির আড়ালে দৃশ্যমান বিশ্বের প্রকাণ্ড সুখদুঃখ যে ঘোড়দৌড় খেলবার উপযোগী ফাঁকা ময়দান খুঁজে পাবে, এ-ভরসা কোনো সম্পাদক এ যাবৎ আমাকে দেন্‌নি; সম্প্রতি, আশ্বিনের পরিচারিকায় আপনাদের কাব্য-সম্বন্ধীয় উপদেশ থেকে সত্য আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে—অতএব স্থির করেছি যে এখন থেকে আপনাদেরই পরামর্শ-মাফিক চল্‌বো। বলা বাহুল্য, 'স্বপ্ন ভঙ্গে' হচ্ছে এ-হেন-সঙ্কল্পেরই পয়লা নম্বরের নমুনা।

জলজ্যান্ত স্ত্রীর বুকে কল্পনার ছোরা বসিয়ে দিয়ে ছন্দে বিলাপ করতে পারা শুনেছি অসামান্য লিপিচাতুর্য্যের ফল। লিপিচতুর-রূপে গ্রাহ্য হবার এমন সস্তা উপায় থাকতে এতগুলো বছর যে বৃথাই কাটিয়েছি, এজন্যে আজ অনুতাপ হচ্ছে। কাব্যের গালভরা ভাষায় যাকে "বিশ্বের সুখদুঃখ হৃদয়তন্ত্রীর ঝঙ্কার" বলা হয়, সেটা যে লৌকিক "জোচ্চুরি" শব্দটারই অলৌকিক নামান্তর, একথা আগে জান্‌লে নিশ্চয়ই এতকাল চুপ করে থাকতুম না—কেননা, ও-বিদ্যা অভ্যাস করলে আয়ত্তাধীন করে নিতে খুব বেশী দেরী হয় না। তা' ছাড়া চুরি বিদ্যে যখন বড় বিদ্যে, তখন অভ্যাস করাও প্রত্যেকেরই উচিৎ—শুধু এইটুকু দেখে যে ধরা পড়তে না হয়।

প্রশ্ন উঠেছে—"ও কবিতার লক্ষ্য কে?" দু'কথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত; কেন না, বড় কবিদের মতে কবিতার কোনো নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। তবে, এক্ষেত্রে বড় কবিদের প্রতিধ্বান না কর্‌লেও ক্ষতি দেখ্‌ছিনে—অতএব একটা জবাব গড়ে তোলা যাক :—

কবিতার উপলক্ষ্য যখন ঘরের স্ত্রী, তখন কবিজনোচিত লক্ষ্য যে পরের স্ত্রীই হওয়া উচিৎ তাতে আর সন্দেহ কি! "প্রিয়াহারা শূন্যপুরী" এই শুভ্র মিথ্যাবাদটী কাব্যাকারে ঘোষণা করে' কল্পিত শূন্যস্থানটী পূর্ণ করে' নেওয়াই ওক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ছিল—কিন্তু হায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি; কারণ, শেষের দু'ছত্রে মেকি ধরা পড়ে গিয়েছে। ও রকম কাঠ-খোট্টা ধরণের প্রণয়ীর সঙ্গে প্রেম করবার উদ্যম যে কোনো প্রনয়িনীরই থাক্‌তে পারে না তা' গোড়াতেই ভেবে রাখা উচিৎ ছিল। মানব চরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকাতেই যে অমন চমৎকার কবিতাটা মাঠে মারা গিয়েছে

তা' বুঝছি, কিন্তু উপায় কি ? শিল্পকার্য্যে যাঁরা পরিপক্ক, তাঁদের হাতের কাজে, চোরের মুখের থাদ সহজে ধরা পড়ে না—কিন্তু রবি বাবুর মতন প্রতিভা ও সূক্ষ্ম-শিল্পবুদ্ধি কি আর এক কথাতেই পাওয়া যায় !

আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন যে উঁচুদরের কবিরা নিজে কিছুই লেখেন না, স্বয়ং সরস্বতী এসে তাঁদের কলম' ধরে লিখিয়ে দিয়ে যান। আমি অবশ্য উঁচুদরের কবি নই—তবু কবিতা যখন লিখেছি তখন সজ্ঞানে যে লিখিনি তা' বলাই বাহুল্য। তবে কি সরস্বতী এসেছিলেন ? উত্তর,—অবশ্য কিন্তু একটু প্রকারভেদ আছে। সরস্বতীরা হচ্ছেন দুই বোন—বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি, তাঁর সাক্ষাতকার লাভ করবার সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি—কেননা তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং লক্ষ্মীমন্তদেরই স্কন্ধে বসে থাকেন। আমার ঘাড়ে মধ্যে মধ্যে ছুটু সরস্বতাই যে চাপেন তা' আপনারা বুঝতে পারেন কি না জানিনে, কিন্তু আমি বেশ টের পাই—অন্ততঃ তথাকথিত কবিতাটী লেখবার সময় যে তিনিই চেপেছিলেন একথা হলফ করে বলতে পারি।

সে যাই হোক্, ও-কবিতায় একটা উপকার হয়েছে। মনোজগতে খুনী হতে পারা বিশেষরকম গুণীর-লক্ষণ হোক্ আর নাই হোক্, স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে ও-ভাবে হত্যা করা পুরুষ কবি-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; যে হেতু ও-রকম মিথ্যা-প্রকারে সে-বেচারীদের পরমায়ু বেড়ে যাবে। আমার মতে স্ত্রী-কবিরাও অবসর মত কাব্যে স্বামী হত্যা করলে মন্দ করবেন না, কারণ সেক্ষেত্রেও ফল সমানই হবে। বিশেষতঃ কলমের খোঁচাখুঁচির সাহায্যে ও কাজের চর্চ্চা রাখলে সত্যিকারের ছোরা-ব্যবহারের লোভ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; তা' ছাড়া 'ঐ বাঘ,' করতে করতে সত্যিসত্যিই বাঘ এসে পড়লে পূর্ব্বাপর গা-সওয়া থাকার দরুণ ব্যাপারটা বিশেষ গায়েও লাগবে না।

ভাষ্য এইখানেই শেষ করা যাক্ কারণ কাঁকুরের চেয়ে বীচির বহর বেশী হওয়াটা কিছু নয়। আশা করি কবিতা লিখে যে আক্কেলের অভাব প্রকাশ করেছিলুম, তার যথোচিত সেলামী দিতে পেরেছি। এখন কবিতা ও ভাষ্য একত্র পড়ে বিচার করুন—আক্কেলসেলামীটুকু কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে—লেখকপক্ষে না সম্পাদকপক্ষে ?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন।

——(ঃ*ঃ)——

অনবধানতা প্রযুক্ত গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা পরিচারিকায় নিম্নলিখিত ভুলগুলি ছাপা হইয়াছে;—

৬৭ পৃষ্ঠায় 'শেষ' নামক কবিতায় 'মন্থনের অবসানে সুরাসুরে অমৃতের লাগি'-এর পরে 'চিরন্তন সেই দ্বন্দ্ব আজো যেন নাহি উঠে জাগ' এই পংক্তি বসিবে।

'ছিন্নমস্তা তৃপ্ত হলো আজি'—'আজি' স্থলে 'আজ' হইবে। 'তৃষ্ণা ত না মিটেছে এখন'—'তৃষ্ণা' স্থলে 'তৃষা' হইবে।

৪র্থ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে 'শান্তি'র স্থলে 'শাস্তি' হইবে।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দুঃশাসনের রক্তপান

প্রাচীন পুঁথির পাটায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভীষ্মের শরশয্যা
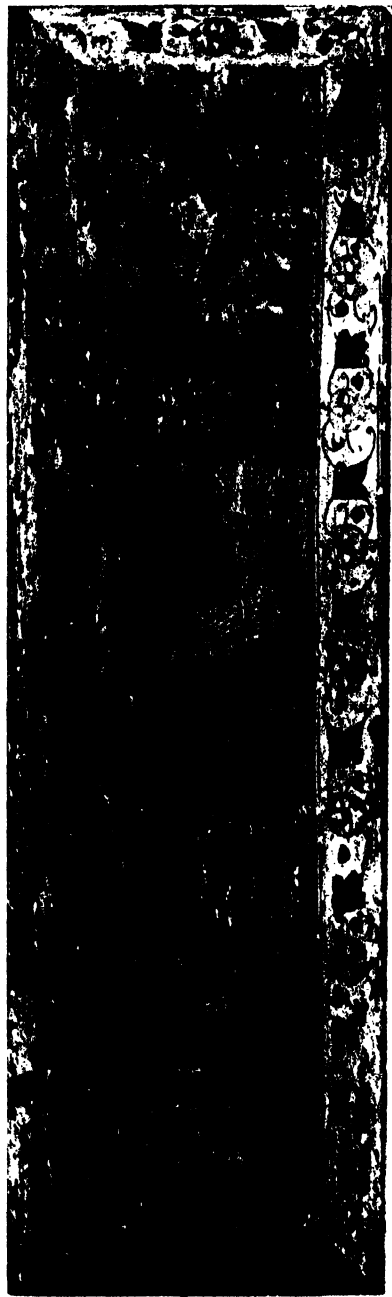
ঃ অঙ্কিত চিত্র হ

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ

৩য় বর্ষ। | মাঘ, ১৩২৫ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

গান।

—:*:—

সুর ভুলে যেই ফিরতে গেলেম
কেবল কাজে
লাগ্‌ল বুকে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা যে।
উধাও আকাশ উদার ধরা
সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা
মিলায় দূরে, নাগাল তাদের
মেলে না যে—
সুর ভুলে যেই ফিরতে গেলেম
কেবল কাজে।

বিশ্ব যে সেই সুরের পথের
হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে
আসা যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ-হেন ঠাঁই
ভুবনে মোর আর কোথা নাই,
মিলন হবার আসন হারাই
আপন মাঝে
সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
কেবল কাজে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

স্বরূপ।

—(-*-)—

স্বরূপ—সে যে চৈতন্যের কথা—সে যে সাধনার পুণ্যগাথা—সে যে বাক্য মন ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানাতীত—সে যে সর্ব্বতত্ত্বাতীত। তিনি যে, সকল দেশ—সকল কাল—সকল অনুভূতিতে সমভাবে ব্যাপ্ত থেকেও, সবারি বাইরে। শ্রুতির কথাও—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনি আবার 'গুহাহিতং—গহ্বরেষ্ঠং' হ'য়েও স্বপ্রকাশ—জ্যোতির্ম্ময়। এ'তে কিছুই বলা হ'ল না কোন্‌দিনই বা কে পেরেছে,—তাঁ'র বিচিত্র কথা বলে' শেষ ক'রতে পার্‌বে না বলেই—কোরাণ বল্‌লেন——

"কোল-লাও কানাল্‌ বাহ্‌রো মেদাদাল্লেকালেমাতে
রাব্বি লানাফেদাল্‌ বাহ্‌রো কাব্‌লা আন্‌ তান্‌ ফাদা
কালেমাতো রাব্বি ও লাও জেএ্‌না বেমেছলিহি মাদাদা।"

কোর্‌আণ সুরা কহফ ৩ রুকু।

অর্থাৎ তুমি বল যে, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিখ্‌বার জন্য যদি সাগর মসী হয় এবং তারি' অনুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় তা' হলেও তাঁ'র কথা লিখে' শেষ কর্‌'বার পূর্ব্বেই সাগর নিঃশেষিত হয়ে যা'বে।'

পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বরাজ শিবমহিম্নস্তোত্রে ব'ল্‌লেন—

"অসিতগিরিসমংস্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রম্‌।
সুর-তরুবরশাখা লেখনীপত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্ব্বকালম্‌।
তদপি তবগুণানামীশপারং ন যাতি॥"

অর্থাৎ সিন্ধু-পাত্রে পর্ব্বত প্রমাণ কালি গু'লে কল্পতরু-বৃক্ষের শাখা লেখনী ক'রে—পৃথিবীকে লিখ্‌বার পাতা ক'রে—স্বয়ং ভগবতী—দশভূজাও যদি যুগ যুগ ধ'রে লিখ্‌তে থাকেন—তবুও হে পরমেশ—তোমার মহিমার কথা লিখে শেষ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। সোজা কথায় ব'ল্লে বলা যায়—'পৃথিবীর সব জল- কূপ, দীঘি, সরোবর, হ্রদ, নদী, সাগর—সকলি যদি কালি হ'ত—আর সমস্ত বন জঙ্গল কেটে কলম তৈরি' করে' যাবতীয় নরনারীর হাতে হাতে দিয়ে তাঁ'র মহিমার কথা লিখ্‌তে বল্‌তো এরূপ ভাবে দিনরাত প্রলয় কাল পর্য্যন্ত লিখ্‌লেও না কি তাঁ'র মহিমার কথা—কিছুতেই শেষ ক'র্‌তে পার্‌ত' না"। তাইতে শুন্‌তে পাই 'অনন্তও তাঁ'র কথার অন্ত না পেয়ে ফিরে এ'লেন'—'ব্রহ্মাদি দেবতা নাকি ধ্যানে তাঁকে শেষ কোরে' দেখ্‌বেন ব'লে ধ্যানস্থ হ'লেন—যুগের পর যুগ চলে গেল তাঁরা ধ্যানেই রইলেন—সে মহা-অনন্তের অন্ত আর পেলেন না'।

তাঁরি ছায়া স্বপ্নে দেখে' কত রাজা রাজতক্ত ছেড়ে আনন্দে তাঁ'রি খোঁজে বনবাসী হলেন,—তাঁরি জন্যে কত দেশের কত মহাত্মা হাসিমুখে আগুনে প্রবেশ ক'রতে একটুকুও দ্বিধা-বোধ করেন নি',—কারাগার, নির্ব্বাসন, অকথ্য নির্য্যাতন, তরবারি, বিষ এমন কি 'ক্রুশে'ও—তাঁ'রি প্রেমে বাসর-সজ্জা রচনা কোরে'—অনন্তের কোলে আনন্দে ঘুমিয়েছেন। তাঁরি জন্যে কত মুনি, কত যোগী, অনাহার অনিদ্রায় শুষ্কদেহে গহন বিজন বনে ধ্যানে নিমগ্ন।—এ সব তো' মিথ্যে বলেও মনে হয় না—এ তো পাগলের পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নাই—এ তো কবিরও উদ্দাম কল্পনা নয়—জগতের ইতিহাস তা' বজ্রডাকে ব'লে যা'চ্ছে। এ যে সেই—"যল্লাভাৎ নাপরো লাভো যৎ সুখাৎ না পরং সুখং, যজ্‌জ্ঞানাৎ না পরং জ্ঞেয়ং।—যাঁকে লাভ কর্‌লে আর অন্য লাভের আশা থাকে না—যাঁকে পেলে সকল সুখ - সকল আনন্দ লাভ হয়—যাঁকে জান্‌লে আর তা'র চেয়ে বড় কিছু জান্‌বার থাকে না—পরানন্দে—পরাশান্তিতে দেহমনপ্রাণ ডুবে যায়। অন্যভাবে ব'ল্‌তে গেলে এ কথা বলা যেতে পারে যে তাঁ'কে পেলে তাঁর জন্য দেহমনপ্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌বার শক্তি জন্মে। তাঁর সামান্য ইঙ্গিতে এ সব সে হেলায় ত্যাগ ক'র্‌তে পারে। সত্যপথের পথিককে ভয় বা মৃত্যু তার বিষম ভ্রূকুটি হান্‌তে পারে না—এমন কি মহাকালও তার বিশাল ঢেউ হিমালয়ের চরণে ক্ষুদ্র নদীর তরঙ্গের মত নু'য়ে পড়ে দূরে স'রে যায়। অনন্ত সৌরজগত—সূর্য্য, চন্দ্র, তারা সভয়ে স'রে তাঁর উর্দ্ধপথ খোলসা করে' দেয়—তাঁকে চেনে সে কেবল উর্দ্ধে উঠ্‌তে থাকে—পতন আর তাঁ'র নাই—অনন্ত উন্নতির কথা তার কাছে বাস্তবে পরিণত হয়। বাঁধন-হারা শ্রাবণ-ধারার মত' প্রলয়ের বাতাসের মত' সে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে' ফেলে। বন ঘিরে' দাবানল যেমন নাচে—সমুদ্র ঘিরে' বাড়বানল যেমন খেলে—ঘননীলমেঘে যেমন বজ্র ঘো'রে—তেমনি ক'রে সে মহানন্দে ছুট্‌তে থাকে। সে তখন পরমভক্ত কবির মত এ'ম্নি ক'রে গাইতে গাইতে তৃষিত চাতকের ন্যায় কেব্‌লি' উর্দ্ধে ধাবিত হয়।

"ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর বাণী!
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!"

এগ্নিধারা স্বরূপের বিচিত্র রস ও গন্ধে ভুবন প্লাবিত হ'য়ে যায়—আকাশও পরিব্যাপ্ত হয়—অন্তরে অন্তর—হৃদয়ও সে রসে ও গন্ধে মেতে উঠে।

মন যে দিন এ'রি গন্ধ প্রথম পে'ল সে দিন কি আবেগে—কি আনন্দে কস্তরী-মৃগের মত সে যে ছুট্‌তে আরম্ভ করলো তা' আর কি ব'ল্‌বো—কত পাহাড়—কত বন—কত তীর্থ—কত-না-দেশ সেই অমৃতের গন্ধ বহন ক'রে আন্‌ছে মনে করে' সে খুঁজে খুঁজে হয়রান্ হ'ল আর ভাব্‌তে লাগ্‌লো—'এ প্রাণমন মাতানো গন্ধ কোত্থেকে আস্‌ছে'? হায়! এ যে তার নিজেরি'—নাভিরগন্ধ!

পরম ভক্ত কবি তুলসীদাস বলেছেন—

"সব হি ঘট্‌মে হরি হ্যায় পহছান্‌তা নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই॥"

মনে হ'চ্ছে এ'রি গন্ধে একদিন আকুল হ'য়ে দেব দৈত্য দানব একত্রে সমুদ্র মন্থন ক'রে সুধার ভাণ্ড উঠিয়েছিলেন—অসুর নিজ বুদ্ধির দোষে সে সুধাপানে বঞ্চিত হ'ল—সে সুধা দেবতারা পান ক'রে অমর হলেন—সকল যুগে কি একই দশা? সে যুগে সুধার জন্য হ'য়েছিল সমুদ্র-মন্থন—এ যুগে হ'ল ধরণী-উৎখাতন। এ যুগের উত্থিত সুধা কা'র ভাগ্যে লভ্য—দেখ্‌বার বিষয় বটে। সুধা যে চিরকালই দেবভোগ্য—তবু অমৃতের পুত্রগণকে সজাগ করা কর্ত্তব্য মনে হয়। যাঁরা দ্বিতীয়-মন্থন আশায় ভুলে রইবেন—তাঁদের ভাগ্যে যে তীব্র হলাহল—তা'তে আর ভুল নাই—এ যুগে তো' শিব এসে আর হলাহল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'বেন না—নিজ নিজ শিব নিজকেই খুঁজে নিতে হবে - সেটা পূর্ব্বেই জেনে রাখা ভাল।

যা'ক সে কথা—মন তো' আর কস্তরী-মৃগের মত' বোকা নয়—তা'র যে বুদ্ধি আছে, তাইতে সে সব দেখে শুনে' ঠাওরায়—এ গন্ধ যে তার নিজেরি'। মন একে একে সমস্ত বাহির খুঁজে যখন দেখে 'বাহিরে' তা'র অমরত্ব নাই, তখন সে আপনাআপনি নিজ অন্তর' পানে ফিরে চাইতে বাধ্য হয়—তখন সে বুঝতে পারে—'সেখানেই তা'র অমরত্ব অঙ্কিত—অতি গোপনে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।' এই তার প্রথম শুভ-দর্শন—বহির্মুখী প্রবৃত্তির এই প্রথম অন্তর্মুখীহওন। সকল বিশ্বে যাঁ'কে খুঁজে পে'ল না আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে সে দেখ্‌তে পে'ল তাঁরি 'প্রকট-আগুন' এই দেহ-ইঞ্জিন চালনা কোর্‌ছে। কঠোপনিষদে আছে——

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥"

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান।' এ কথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়,—'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' এই 'রথ' দেহ এবং 'বামন' যে আত্মা তা'ও কি আবার বো'ল্‌তে হ'বে? বাইবেলেও আছে—"This is the temple wherein resides God"—অর্থাৎ এই মন্দিরেই ভগবান বাস ক'রেন।' প্রকৃতই এ দেহ মন্দির—যেখানে প্রত্যক্ষ দেবতার বাস!

মন এইরূপে নিজ অন্তরে প্রবেশ করে'—বুদ্ধির গর্ভে ঢুকে, বিবেক—চকমকি গ্রহণ করে—চকমকি জলেতে হাজার ব'ছর রইলেও তা'র আগুন হারায় না—যখনি ঠোকা যায়—আগুন বে'র হ'বেই। মন যে কত বড় তা' আর কি, ব'ল্‌ব—শ্রুতিতেও আছে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্‌"—এই 'মনের' দ্বারাই ব্রহ্মকে দৃষ্টি করবে। মন এইরূপে বুদ্ধির আশ্রয়ে নিজের ঘর আলো ক'রে দেখ্‌তে পায়—বাহ্যতঃ এই দেহে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, হস্ত,

পদ, বাক্ পায়ু ও উপস্থ রূপ দশটি দরজা দিয়া বস্তুজ্ঞান গ্রহণ করে—যা'র সারথি 'বিবেক-বুদ্ধি', মন দৃঢ়-লাগাম ও গৃহস্বামী স্বয়ং 'চৈতন্য'। রাজ্যহীন রাজ উপাধি যেমন—জলহীন সরোবর যেমন—মধুহীন মৌচাক যেমন—শক্তিহীন প্রভু যেমন—তাঁ'রাও ঠিক তেম্নি যারা ইন্দ্রিয়াদিকে, স্ববশে না এনেই মনে করেন বুদ্ধিকে জেনেছি—সে যে এদের সারথি'--এবং বুদ্ধিকেও, আত্মার স্ববশে না এনে মনে মনে শুধু ভাবেন 'চৈতন্যই তো রথস্বামী'। আরও মোটা কথায় বল্‌লে বলা যেতে পারে.—যারা এ-সব কথা শুধু—মুখে মুখেই আওড়ান—অবিশ্যি ইন্দ্রিয় ও রিপুকে বশে না এনে—তাঁদের দশা ঠিক্ মক্কেলহীন ব্যারিষ্টারের ভাবী মক্কেলের জন্য আইন নজীর উদ্ধৃত ক'রে বিষম বক্তৃতা দেবার মতো' ।—যদি কোন অভিনেতা ভৃত্যের 'লিভারী-ওয়ালা' পোষাকটি পরিধান ক'রে শূন্য রাজসভাগৃহে এসে নিজ-প্রভুর সিংহাসনটি দখল ক'রে ভৃত্যের পাঠ আবৃত্তি কোর্‌তে থাকেন তখন কি রিপু-পরতন্ত্র বাবু পণ্ডিতদেরও 'চৈতন্য-অভিনয়ের' কথা—কাহারও মনে উদয় হয় না? সরল সত্য কথায় বল্‌তে গেলে তাঁদের দশা অবিকল ভূমিশূন্য রাজার—বড় বড় খেতাবের লেজের মতো। এ যে সাধনার ধন—সাধনা ক'রে লাভ করতে হয়;—নতুবা কি এতদ্দেশে এত শাস্ত্রের উদ্ভব হ'ত আর মহাপুরুষদেরও এতকথা বল্‌বার কি প্রয়োজন ছিল! সাধনার ধন সাধন দ্বারাই লাভ করতে হবে ব'লে উপনিষদ্ তারস্বরে ব'ল্লে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। এখানে মনে করে দেওয়া ভাল চৈতন্যের উপাসক সকলেই হ'তে পারেন—এক্ষেত্রে বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, বড় ছোট, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, সকলি সমান—এই জন্যই নিখিল জগতের নরনারীকেই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে। এবং 'তিনি' এই সব কারণেই 'অধম-তারণ'—'পতিত-পাবন'—'পরম-দয়াল' ব'লে চির-পরিচিত। সত্য-ধর্ম্ম—সনাতন-স্বরূপের-কথা চিরদিন—যুগে যুগে মহা-আশার বাণী-প্রচার ক'রে আস্‌ছে,—নিশ্চয় মনে রাখ্‌তে হবে নিরাশার বাণী অধর্ম্মের—শয়তানের। পরম বৈষ্ণবভক্ত প্রেমানন্দ ব'লেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী
কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব
নিতান্ত মুরখ ভাই॥"

এই কারণে এখানে বেদবেদান্তসর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায় তর্কচূড়ামণি বা বেদান্তবাগীশ—রাবণ রাজার মতও মহাপ্রতাপশালী ত্রিদিবেশ্বর—ঐশ্বর্য্য-তাকিয়া হেলানে বিলাসী মহান্ত মহারাজ বা অগণিত শিষ্য-ঘেরা মঠ-স্বামী বা ভারতী যখন গালে হাত দিয়া বসে সুধু ভাবনা করেন ও নিরাশায় মগ্ন হন বা অভিমান-স্ফীত-বক্ষে সুধু স্মৃতিরই পরিচয়ে সাধুতার অভিনয়ে 'বাহবা' পা'ন তখন তাঁদেরি সাম্‌নে দিয়া রুহিদাস মুচি, গুহক চণ্ডাল, যবন হরিদাস,—দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ উর্দ্ধশিরে প্রভুর নাম গাহিতে গাহিতে রোমাঞ্চিত দেহে ও প্রেমাশ্রু নয়নে কি আনন্দে চ'লে যা'ন তা' আর কি বল্‌বো—শুদ্ধাচারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও দেখে অবাক্ হ'য়ে. এঁদেরি চরণে নতশিরে ধুলাবলুণ্ঠিত হ'ন। দরিদ্র বিদুরের ঘরে প্রভু, যুগে যুগেই এসে থাকেন—মদগর্ব্বিত রাজা দুর্য্যোধনের প্রাসাদে যা'ন না;—প্রভু আমার—দীনহীন মূর্খ গোপ বালকবালিকার ভারও নিজ স্কন্ধে আনন্দে বহন ক'র্‌লেন অথচ মহারাজ কংসের ভার সর্ব্বসহা ধরিত্রীকেও বহন ক'র্‌তে দিলেন না;—দৈত্যরাজ বলি সে শিববাঞ্ছিত পদ নিজের মাথায় রেখে চিরধন্য হ'লেন—আর কি না তাঁরি গুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্য একটী চো'খ কানা হ'য়ে বসে' ভাবনায় ডুব্‌লেন। ভারতে যে ধ্বনি বিদেশেও তা'ই। যে দিন ছুতোরের ছেলে মহাপুরুষ যীশু ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে তাঁ'রি প্রেমে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌লেন্—সে দিন কে ভেবেছিল যে ঈশ্বরের প্রেমই ঐ মহাত্মার দেহে প্রকট? যদিও শ্বেতকায় দানবের হাতে

এমন মহাপুরুষেরও প্রাণ গেল, তবুও সে করুণ দেব-হৃদয় সকলের জন্যে অমূল্য প্রেম-সুধা ঢেলে' দিয়ে নিজ পবিত্র রক্তে দানবের পাপ ধৌত করলেন। যে সব দানবের হাতে তিনি প্রাণ হারা'লেন—তা'দেরি বংশের ছেলেমেয়ে পরবর্ত্তী কালে সেই মহাপুরুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পূজো দিতে লাগ্‌ল'—পশ্চিম চিরকাল জড়-উপাসক নতুবা কি যীশুর মত পরমভক্ত দেবতাকে ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিতে হ'ত? কেন মনে হয় ব'ল্‌তে পারিনে—এযুগেও পশ্চিমে বর্ত্তমান যুগোপযোগী পরমভক্ত মহাপুরুষ এসে দেখা দিলেও তাঁরও যে দানবের হাতে অপমৃত্যু হ'তে পারে—পশ্চিম গগনের হাব ভাব দেখে' তা' বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। ভারত চিরদিনই প্রভুভক্তের উপাসক—ভারত জড়োপাসকের পূজা কো'র্‌তে যে'য়ে তা'দেরি চালনায় যেন প্রভুভক্তের অনুকরণ ও সেবা ক'র্‌তে কখন' ভুল না করেন ইহাই প্রার্থনা। এ দেশের মুক্ত-পুরুষেরা পুনঃ পুনঃ ব'লে গে'ছেন যে ভক্তের সঙ্গ ও সেবাই মুক্তির প্রধানতম প্রকরণ—এ পথে চল্‌লে ভারত যে আবার অজেয়—অমর হ'য়ে উঠবে তা'তে কি আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাক্‌তে পারে?

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ ছেড়ে দিলে—বলতে হয় হজরত মোহম্মদ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ 'বীর-সাধক' যাঁরা সংসারাশ্রমে থেকে বীরের ধর্ম্ম অসি গ্রহণ করে' 'ন্যায় ও সত্যকে' প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছেন তাঁহাদিগকেই 'বীর-সাধক' বলা হইল। মনে হয়—যে অসি 'ন্যায় ও সত্য' রক্ষার্থে উত্থিত হয় না—সে অসি কি অসি'? হজরত মোহম্মদ তাঁর অবস্থানুযায়ী সম্ভাব্য সমুদয় শক্তি—ভিতরের ও বাহিরের আহরণ করে—তিনি তাহা ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই প্রয়োগ ক'রেছিলেন—যে অসি তিনি ধারণ ক'রেছিলেন তাহা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই। কাফের সেই—যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ভজনা না করে অসত্যেরই ভজনা করেন,—তাইতে তিনি এমন-কি, আপন খুড়ো' আবুজেহেল প্রভৃতিকে কাফের—'কাফেরের-মত-কাফের' সংজ্ঞায় অভিহিত করে তাঁদেরও বিরুদ্ধে অসি, চালনা করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এস্‌লামের ভাষায় ইহাকে 'জেহাদে আস্‌গর্' বা 'সোগ্‌রা' বলেন। তিনি নিজে অসত্যসেবী—'মোনাফেক' মুসলমানদিগের বিপক্ষেই যুদ্ধ করে গিয়েছেন। তাইতে কোরাণের এ উক্তি——

"ওমিনান্নাছে মাঁইয়াকুলো আমান্না বিল্লাহে ওবিল্ ইয়াওমিল্ আখেরে ওমাহুম্ বেমোমেনীন।" অর্থাৎ—(হে-মোহম্মদ!) মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা মুখে ব'লে থাকে-'আমরা ভগবানে বিশ্বাস-স্থাপন ক'রেছি' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী—সত্যসেবী মুসলমান নহে (মোনাফেক্)'। প্রকৃত মুসলমান সেই যিনি ন্যায় ও সত্যের জন্য—'আল্লাতালার জন্য তুচ্ছ প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌তে কখনও পিছু-পা হন না। এই কারণেই 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্-মোহম্মদ রসুল উল্লা'—মুসলমানভক্তের নিকটে এত মধুর।

ভারতের মহাত্মা গুরুগোবিন্দও সেই ধাতুতে গঠিত ছিলেন এবং তিনিও শিখগণকে—বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, সংযমী-শিখভক্তগণকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে ন্যায়ের অসিই হাতে তুলে দিয়েছিলেন।—ভীমকায় ও বজ্রদেহে করাল অসি কেন?—বলাবাহুল্য শিখভ্রাতাগণও ঐ মুসলমানভ্রাতাগণের মতো বীরনাদে বল্‌বেন—'ন্যায় ও সত্য' রক্ষার জন্য। শিখ ভক্তগণের নিকটে 'ওয়া গুরুজী কা ফতে' তাই এরূপ প্রাণস্পর্শী ও উন্মাদক। মহাত্মা রামমোহনও যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠপথ—ভারতের মুক্তির পথ—নিজ প্রতিভাবলে দেশবাসীর সম্মুখে এঁকে ধরে'ছিলেন কিন্তু তিনি তাহা নানা কারণে বাস্তবে—জীবন্ত মূর্ত্তিতে গড়ে তুলে যেতে পারেন নি! তিনি ইহা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে বেদান্তের সার্ব্বভৌম নীতি বা সূত্রই হিন্দুকে আবার এযুগে ধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানে আন্‌তে সক্ষম হ'বে। ইহার অনুসরণ করলে হিন্দু আবার এক বিশাল শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হ'য়ে—'আর্য্য—সনাতন' নামের গৌরব রক্ষা করতে সমর্থ হবে। তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুগামীরা তাঁকে ঠিকমত বুঝ্‌তে না পেরে'—'ব্রহ্মচর্য্য' যে ব্রহ্মজ্ঞানের

মূলে একথা ভুলে গিয়ে - শিব গড়্তে অন্য আর কিছু গড়ে' তুলেছেন— তাই এত অল্পদিনেও তাঁরা শক্তিহীন ও ঠাঁই ঠাঁই---তাঁদের এভুল আশু দূর হ'লে তাঁরা যে মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত প্রকাশ হ'তে পারেন তা'তে আর ভুল নাই। ঈশ্বরের রা-ত্ব, এ সংসারে প্রতিষ্ঠা ক'র্তে হ'লে--'ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা,' 'ন্যায় ও সত্যকে'—পূর্ণভাবে বাস্তবে পরিণত করতে হ'বে—একথা সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে ব'লেছেন। চৈতন্য সাধনার পথে প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম শিক্ষা করা উচিত বলে' সে কালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সংযম রীতিমতভাবে শিক্ষা ক'রে তৎপর—গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে ব্রতী হ'তেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ব্রহ্মলাভের উপায় নাই ব'লেই মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষা আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্।" অর্থাৎ তিনি (আত্মা) সত্য, তপস্যা, সম্যগ জ্ঞান ও নিত্যব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য। কঠোপনিষদেও আছে,—

> "যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
> স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥"

অর্থাৎ যিনি বিবেকী, সংযতচিত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হ'ন---যা হ'তে ভয়-ভাবনার একেবারেই শেষ। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও রিপুকে জয় করাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। 'রিপুজয়' অনেকে 'রিপুত্যাগ' বলে' ভ্রম করেন। সন্ন্যাস-ধর্ম্মে 'রিপুত্যাগ' হ'তে পারে—সংসারীর 'রিপুজয়' শিক্ষা করাই উচিত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীনে সংযমিত হ'য়ে থাক্‌বে—মন কখনও রিপু দ্বারা চালিত হ'বে না,—সোজা কথায় দেহ ও মনে রিপুর প্রভাব থাক্‌বে না। কেহ কেহ এ কথা মনে কর্‌তে পারেন যে বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত হ'লেই বুঝি 'রিপুজয়' হয় কিন্তু সেরূপ ভাবনাও ভুল, কারণ তখনও সূক্ষ্মভাবে মনে ইহারা আঘাত কর্‌তে পারে। অতএব মনেও যখন রিপুর সূক্ষ্মপ্রভাব থাক্‌বে না —এমন কি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থাতেও—তখন' সাধকের রিপুজয় হ'য়েছে বুঝ্‌তে হ'বে। গীতায় আছে—

> "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
> ইন্দ্রিয়াণি বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি জয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে তৎপর সাধককে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী 'ন্যায় ও সত্যের' জন্য ইহাদের প্রয়োগ কর্‌লে, ঈশ্বরের কার্য্যেই ইন্দ্রিয়াদি নিযুক্ত বা অর্পিত করা হ'ল বলে মনে হয়। অবিশ্যি' এক একটা রিপুজয়ে বিপুল চেষ্টা ও নিত্য-অভ্যাসের প্রয়োজন হয় এবং তদ্দরুণ মনের 'একাগ্রতা' ও 'ঐকান্তিকতা' অসাধারণরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠে—বুদ্ধি তখন স্পষ্ট—বাস্তবরূপে উপলব্ধি ক'রে যে মনের ভিতর এমন এক মহাশক্তি আছে যাহার বল পৃথিবীর সকল সমবেত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। বোধ হয় কাহারও অজানা নাই--কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের জ্বালা কি তীব্র ও ভয়ানক। কত রাজরাজেশ্বরও ইহাদের একটীর দংশনে অস্থির হ'য়ে নিরুপায়ে জ্বলেপুড়ে' মরেন—কখনও বা ধূলায় পতিত হ'য়ে মোহে কেঁদে কেঁদে সারা হ'ন,—কত মনীষী মহাপণ্ডিতও এ'দের একটীর শক্তির নিকট এক মুহূর্ত্তে পরাজয় স্বীকার করে' গৌরবহীন হ'ন- কত প্রবীণ বিখ্যাত বীর এ'দের একটীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের যুদ্ধ করিতেও অক্ষম ;—এ'তেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন এই ছ'টাকে জয় কর্‌লে যে কত শক্তি ও কত আনন্দ জন্মে তা' আর কাউকে বল্‌তে হবে না। আর আনন্দের পশ্চাতে শান্তি বা সন্তোষ আপনা-আপনিই এসে' পড়ে—তা'ও কি আবার ব'ল্‌তে হয়? রিপুজয়ে 'শক্তি' ও 'শান্তির' বাস্তব মূর্ত্তির দর্শন হয়। মহাচৈতন্য--ইউনিভার্সিটির ছাত্র তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে—

ব্রহ্মধ্যানরূপ-ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রাপ্ত হ'ন। সোজা কথায় তখন তিনি ধ্যানস্থ হ'বার অধিকারী হ'ন—যে ধ্যানে অরূপের রূপ—অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌কে দর্শন হয়। তাইতে' মুণ্ডকোপনিষদে লেখা—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

—অর্থাৎ জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা অন্তর বিশুদ্ধ হ'লেই, ধ্যান দ্বারা এই আত্মার দর্শন হয়।

একটী কথা সকলেরি বিশেষ করে' মনে এঁকে রাখা কর্ত্তব্য যে 'ব্রহ্মচর্য্য' ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সিংহ-দুয়ারে' বসে' পাহারা দি'চ্ছেন তাহা ধনীলোকের পোষাকপরিচ্ছেদের মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইচ্ছামত' গ্রহণ বা ত্যাগ ক'র্‌বার জিনিষ নয়—ইহা দু' একদিন, দু' একমাস বা দু' একবছর পালন করে' ইহার সম্যক্‌ শিক্ষা হ'য়েছে ব'লে কখনও মনে করা উচিত নয়—ইহা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আঁকড়ে' ধরে' থাকতে হ'বে ব'লেই 'নিত্যব্রহ্মচর্য্য' শব্দ সিদ্ধেরা ব্যবহার ক'রেছেন। রিপু জয় ক'র্‌তে সাধককে কিরূপ যুদ্ধ চালা'তে হয় তাহা সিদ্ধ কবীরের ভাষায় নিম্নে দেওয়া হ'ল,—

"পকড় সমসের সংগ্রাম মৈঁ পৈসিয়ে
দেহ পরয়ংত কর যুদ্ধ ভাঈ।
কাট সির বৈরিয়াঁ দাব জঁহকা তহাঁ,
আয় দরবার মেঁ সীস নবাঈ॥

সূর সংগ্রামকো দেখ ভাগে নহীঁ,
দেখ ভাগৈ সোঈ সূর নাহীঁ।
কাম ঔর ক্রোধ মদ লোভসে জুঝনা,
মচা ঘমসান তন খেত মাহীঁ॥
শীল ঔর সাঁচ সন্তোষ সাথী ভয়ে,
নাম সমসের তঁহা খুব বাজে।
কহৈ কবীর কোই জুঝি হৈ সূরমা
কায়রাঁ ভীড় তঁহ তুত ভাজে॥

সাধকা খেলতা বিকট বেঁড়া সতী
সতী ঔর সূরকী চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চরকা,
সতী ঘমসান পল এক লাগে॥

সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ॥

মুসলমান ভক্ত এস্‌লামী ভাষায় এইরূপ সংগ্রামকে 'জেহাদে আক্‌বর্‌' বা 'কোব্‌রা' বলেন।

তিল যেরূপ নিপীড়িত না হ'লে তৈল বাহির হয় না—দধি যেরূপ মথিত না হ'লে নবনী তৈ'রি হয় না—ভূমি যেমন না খুঁড়লে জল উঠে না—বিনা ঘর্ষণে অরণি-নিহিত অগ্নির প্রকাশও যেমন হয় না, তেমি 'ব্রহ্মচর্য্য' ভিন্ন মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ কখনও হ'তে পারে না। যেমন হাজার বৎসর 'আগুন' 'আগুন' বলে'

মহাচীৎকার ক'রলেও শীতক্লিষ্ট ব্যক্তির শীত নিবারণ হ'য়ে শরীর গরম হয় না—'জল' 'জল' ব'লে চীৎকারেও যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পিপাসা দূর হ'তে পারে না—তেম্নি' নিত্যব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন প্রকৃত 'শক্তি ও শান্তি' কথনও লাভ হয় না।

অনেকে আবার 'ব্রহ্মচর্য্যকে' একাহার নিরামিষ খাওয়া বা কতকগু'লো নির্দ্দিষ্ট প্রকরণ বা আচার-ব্যবহার মাত্র মনে ক'রেন—সেরূপ মনে স্থান দেওয়া যে অন্যায়, তা' একটু বিচার করে' দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়। যিনি জিহ্বার লোভে বা শুদ্ধ রসনার তৃপ্তির জন্য অন্যায় আহারাদি ক'রেন—যিনি নিরামিষাশী হ'য়েও রিপুসেবায় তৎপর—আমার মনে হয় পরিমিতাহারী নির্লোভী জিতেন্দ্রিয় মাংসাশীর চেয়ে তাঁ'দের স্থান কথনও উচ্চ নহে। যা' খেলে শরীর সুপুষ্ট বলশালী কর্ম্মঠ ও নীরোগ থাকে এবং রিপুও তৎসঙ্গে মনের আত্মাধীন থাকে অর্থাৎ যাহাতে শরীরের পূর্ণ বিকাশ হয় অথচ রিপুও বশে থাকে মনে হয় সেইরূপ আহারই শ্রেষ্ঠ ;—যদি 'সাত্বিক' নামের কোন সার্থকতা থাকে তবে এইরূপ খাদ্যাদিই 'সাত্বিক আহার।' এই জন্যই বোধ হয় গীতাতে সাধককে 'পরিমিতাহারী' হ'তে বলে' গিয়েছেন। সোজা কথায় 'পরিমিতাহার'কে ব'ল্‌তে হয়,—'না-কম, না-বেশী' অর্থাৎ কম খেয়েও শরীর দুর্ব্বল করা পাপ—আবার বেশী খে'য়ে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া বা শরীরকে রোগপ্রবণ বা রোগযুক্ত করাও তেম্নি পাপ। চৈতন্য তো' আহার ক'রেন না—তিনি যে দেহরূপঘরে বাস করেন সেই ঘরখানা তাঁর বাসের সম্যক্ উপযোগী ক'রে রাখ্‌বার জন্যই আহার,—সেই খাদ্যই কি শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয় না—যাহাতে দেহের পূর্ণ উৎকর্ষ বা অভিব্যক্তি হয়? যে-দেহের পূর্ণ বিকাশ যে-খাদ্যে হইবে তাহাকে তাহাই দিতে হইবে—বলা বাহুল্য অবস্থা-পাত্র—কাল ও স্থান বিশেষে কথন' আমিষ—কথন' নিরামিষ—কথন' বা উভ-সংযুক্ত আহারের ব্যবস্থাও ক'রতে হবে। মাংসাদি আহার যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্তরায় হ'তে পারে না তাহা বেদপুরাণাদি পাঠে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়—মহাতপা অগস্ত্য ও মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ উভয়েই যে মাংসাহারী ছিলেন তাহা সকলেই জানেন বলে' এখানে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত ক'রে বিরক্ত করা অন্যায় মনে কর্‌লাম। অগ্নিও যে হিন্দুদের একজন মহাতেজস্বী দেবতা তা'তে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই—তিনি না হ'লে হিন্দুর আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞাদি কিছুই করা যায় না—এমন কি বিগ্রহাদির আরত্রিক বা ভোগাদিপাকেও তাঁ'রই স্মরণ নিতে হয়। অভিমানী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণেরও দৈনিক আহার্য্য-প্রস্তুত বিষয়েও অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকে আর অন্য কোন উপায় নাই, অথচ বল্‌তে লজ্জা হয়—অগ্নি, গো-ব্রাহ্মণ-শুকরাদি সমস্তই অম্লানচিত্তে যুগে যুগে গ্রহণ ক'রে আস্‌ছেন ব'লেই তাঁর এক নাম 'সর্ব্বভুক্।' এ কথা শুনে' কেউ মনে ভাব্‌বেন না যে আমি অগ্নির নাম দেবতার লিষ্ট থেকে কেটে দিতে বল্‌ছি বরং আমি মনে করি অগ্নির চেয়ে আর তেজস্বী দেবতা হ'তে পারে না ;—কারণ তিনি এত খে'য়েও সে-সমস্ত অনায়াসে জীর্ণ ক'রে তাঁ'র দেহে এক অসম্ভব বলের সম্ভাবনা বা সঞ্চার করেন অথচ তিনি শুদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয় থেকে' তাহা সতত পরমচৈতন্যের উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করে থাকেন। উপযুক্ত আহারে যে দেহের সম্যক্ পুষ্টি ও বল হয় এ কথা আর্য্যঋষিদের অবিদিত ছিল না ব'লেই তাঁরা 'পঞ্চকোষে'র প্রথমেই 'অন্নময় কোষ' উল্লেখ ক'রেছেন। অধিকন্তু তাঁরা দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রিয়-সংযম ও রিপু-জয় ভিন্ন দেহের ও মনের পূর্ণতম বিকাশ কথনও হ'তে পারে না।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়েদিলেও ইতিহাস যুগের মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের করুণায় ছল্ ছল্ লাবণ্যে ঢল্ ঢল্—প্রশান্ত ও উদার—সৌম্য ও স্নিগ্ধ অপূর্ব্ব মধুর দেব-মূরতিখানি মনে জেগে উঠে। মহাপুরুষ কয়েক বৎসর কঠিন যোগাভ্যাসে নিযুক্ত, হ'য়ে সুকুমার—সুকোমল নবনীততুল্য দেহকে অনাহারে বা স্বল্পাহারে

কঙ্কালসারে পরিণত ক'রেছিলেন অথচ যে জন্য এত কষ্ট সহ্য কর্‌লেন তা'র কিছুই লাভ ও'তে হ'ল না—সে হৃদয়বিদারক অবস্থার বর্ণনা আমি এখানে করব না কিন্তু যাঁ'রা আহারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বা আহার সংযমিত হ'লেই রিপু জয় বা মন বশ হয় মনে করেন—তাঁ'দেরি স্মরণের জন্য এ কথা উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পারলেম্ না। আবার বুদ্ধদেবও যে তাঁ'র দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে জনৈক কুণ্ড নামক কর্ম্মকার ভক্তগৃহে শূকরের মাংস ভক্ষণ ক'রেছিলেন—তজ্জন্য তাঁ'র দেবত্বের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় নি'—এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সমগ্র মুসলমানজগতের পূজ্য মহাপুরুষ মোহম্মদ ও সমগ্র খ্রীষ্টান্‌জগতের পূজ্য মহাপুরুষ যীশু, উভয়েই যে মাংসাহারী ছিলেন তদ্বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। আশা করি এই সব বিষয় নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি দি'য়ে বিচার করে' আহার ও ব্রহ্মচর্য্যের পার্থক্য বা সংযোগ বুঝে' প্রকৃত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে কেহই কুণ্ঠিত হবেন না।

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পর সাধক ধ্যানের অধিকারী হ'ন ইহা পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে। এখানেই যা' কিছু অধিকারীর বিচার—বল্‌লে বলা যায়। অর্থাৎ যাঁ'র ইন্দ্রিয় সংযম ও রিপুজয় হ'য়েছে—তিনি নিরক্ষর মুচি বা মেথর হ'লেও ব্রহ্মরূপধ্যান কর্‌বার অধিকারী হ'লেন—রিপুপরবশ বেদান্তরত্ন বা ভাগবতরত্ন, স্বামী বা ভারতী, রাজর্ষি বা মহর্ষি—অজিতেন্দ্রিয় কেহই সে অমূল্য ব্রহ্মরূপ ধ্যান—প্রকৃত ধ্যান কর্‌তে সক্ষম ন'ন। এ কথা ভুলে যাঁ'রা চোখ বুজে' ধ্যানে ব'সেন—তাঁদের এই ধ্যানে যাহা লাভ হয় তাহা প্রকাশ ক'রে বল্‌লে অনেক বিদ্যাদিগ্‌গজের মাথা হেঁট কর্‌তে হয়,—শুধু হেঁট নয় অনেক সময় মাথা মুড়ে' ঘোল ঢাল্‌লেও সেরূপ ধ্যানের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। পাতঞ্জল ব'লেছেন—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"—চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। নদীর স্রোত যেমন একটানা ব'য়ে যায় অম্‌নি সাধকের চিত্তে ব্রহ্মরূপের ভাবনা অবিরত জাগ্‌তে থাকে—ঠিক্ প্রথম যৌবনের গভীর ভালবাসার টানের মতো'। বাহিরে কত কাজ হ'চ্ছে কিন্তু মনে যেন তা'র প্রিয়তমের মূর্ত্তিই ভাস্‌ছে। এই প্রিয়তম আত্মস্বরূপ বা সত্য। শ্রুতিতে আছে "এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমেতি"—ব্রহ্মের অপর নাম সত্য। যীশুও ব'লেছেন 'Truth is God'—সত্যই ঈশ্বর। সিদ্ধ কবীরও ব'লেছেন—

> "কোই রহীম কোই রাম বখানৈ
> কোই কহে আদেশ।
> কহে কবীর অন্ত না পৈহো
> বিনা সত্য উপদেশ॥"

আরও ব'লেছেন—

> "জিন কে নাম না হৈ হিয়ে॥
> ক্যা হোবে গল মালা ডালে কহা সুমিরণী লিয়ে।
> ক্যা হোবে কাশী মেঁ বস কে কা গঙ্গাজল পিয়ে।
> হোবে কহা বরত কে রাখে কহা তিলক শির দিয়ে।
> কহৈঁ কবীর শুনো ভাঈ সাধো জাতা হৈ জম লিয়ে।"

রিপু-জয়ী মন এই বিচিত্র ও অন্ত-হীন সত্যকে ধ্যানে, একান্ত ও একাগ্র চিত্তে ধারণা কর্‌তে প্রয়াস পান। বলা বৃথা রিপু জয় হ'লেই 'জ্ঞান শুদ্ধি' হয়। যখন ইন্দ্রিয় জয় হয় তখনি' প্রকৃত ইন্দ্রিয়াতীতভাব সাধক বুঝ্‌তে পারেন এবং রিপু জয় হ'লে মন স্বচ্ছ হয় এবং সাধক তখন বেশ বুঝ্‌তে পারেন আত্মা মন-পার বা মনাতীত।

তেম্‌নি যখন বিশুদ্ধ-জ্ঞানে ধ্যান দ্বারা ভাগ্যবান—স্বরূপ দর্শন করেন তখনি' সাধক ঠিক্ বুঝ্‌তে পারেন যে ইহা প্রকৃতই জ্ঞানাতীত। 'ভাগ্যবান্'—বল্‌লাম এই জন্যে যে কঠোপনিষদ ইহা লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য, স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম।"

অর্থাৎ 'এই আত্মা উৎকৃষ্ট বচনের দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারাও যায় না। ইনি যে ব্যক্তিকে বরণ কর্‌েন, সেই ব্যক্তিই ইঁহাকে পাইবেন, সেই ব্যক্তির নিকট ব্রহ্ম 'স্বরূপ' প্রকাশ করেন।' সাধারণ ভাবে বল্‌তে গেলে—চাষী যেমন সারা বছর কষ্ট ক'রে চাষা আবাদ কর্‌লেও সময় মত বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হয়, তেম্‌নি তাঁর কৃপা-বৃষ্টি বিনে স্বরূপ-দর্শনরূপ ফসলের আশা নাই ব'লে এরূপ কথা উপনিষদে লেখা,—মনে হয়। এ কথা তিনিই বল্‌বার অধিকারী যিনি সাধনার 'ইনটারমিডিয়েট' রূপ ধ্যানের পরীক্ষায়ও পাশ হ'য়েছেন। যে কথা যেখানে বলা উচিত সেখানে সেটি না ব'ল্লে তা'র সম্যক্ প্রয়োগ হয় না এবং গাধার পিঠে মানুষ না চ'ড়ে—মানুষের পিঠে গাধাকে উঠিয়ে দে'বার মতো' হয়। অনেকে এমন আছেন সাধনার কথা অধিকক্ষেত্রেই উল্টো ভাবে প্রয়োগ ক'রে থাকেন তা'র কারণ তাঁ'রা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ না ক'রে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ব'লে পরিচয় দেন। আবার এটুকুও বলি, সাধনা ক'রে যাঁরা বলেন, তাঁ'রা আমাদের চিরপূজ্য। সাধনার ক্রম জেনে' সাধনার ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত—আদৌ সাধনার পথে না যে'য়ে যাঁরা অতীত মহাপুরুষদিগের প্রতি বিদ্রূপ বা কটূক্তিপ্রয়োগ করে' স্বকীয় বিদ্যা জাহির ক'র্‌তে ত্রুটি ক'রেন না—তাঁ'দের এ-বিদ্যা বা সভ্যতা যত কম প্রচার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সাধনা অনুমানের বা শুদ্ধ অনুভূতির নহে—বা কেবল ভাবের প্রতিমাও নহে—ইহা এক অচিন্তানীয় ভাবে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ। মনে হয় যে মাহাপুরুষ যাহা সাধনা ক'রেছেন তাহাই তাঁহার দেহে প্রকট হ'য়ে তদ্রূপ দেবতার সৃষ্টি করেছে। এই কারণে শ্রুতি বলেন—'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' এমন কি সাধারণের মুখেও শুন্‌তে পাই,—'যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

সত্য বা ব্রহ্মের ধ্যান অর্থে সহজ ভাবে কি বুঝ্‌তে হ'বে? যেমন ইন্দ্রিয়াদি সংযম বা রিপুজয় প্রথমে মনে অনুভূত হ'য়ে পরে উহা মনে ও দেহে জয় হইলেই উহা বাস্তবে পরিণত হ'ল এবং তাহার প্রকট মূর্ত্তি সাধক দেখ্‌তে পেলেন, তেম্‌নি ধ্যানেও আত্মা বা স্বরূপ দর্শনের একটি সুস্পষ্ট সত্যছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণনা কর্‌তে গেলে যাঁরা তাঁ'কে দেখেছেন তাঁ'দের অর্থাৎ সিদ্ধ বা মহাপুরুষদের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে তাঁ'রা যে সমস্ত কথা ব'লেছেন সেই সব আপাতবিরুদ্ধ বাক্য ধ্যানে সম্যক্ ও নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নিমাংসা ক'রে—উহা দেহে—বাস্তবে যতদূর সম্ভব গড়ে' তুল্‌তে হয়। উদাহরণস্বরূপ সোজা কথায় বল্‌তে গেলে, এম্নি ক'রে বুঝান যেতে পারা যায় ব'লে মনে হয়,—'আত্মার জাতি নাই' এই একটী কথা—আত্মা সম্বন্ধে—মহাপুরুষের উক্তি;—যখন মনে মীমাংসা করে সুনিশ্চিতভাবে সমস্ত মানুষ এক বলে' বিশ্বাস হ'ল তখন সাধক ধ্যানে উহা পেলেন—ধ্যানে যে প্রকট মূর্ত্তি সাধক দর্শন কর্‌লেন উহাই ভাবের মূর্ত্তি বলা যেতে পারে এবং উহা ধ্যানে স্থায়ী হ'লে 'ভাব-সিদ্ধ' ব'ল্লে ক্ষতি হয় না—আবার যখন সাধক নির্ব্বিকার চিত্তে অম্লানবদনে—প্রীতির সঙ্গে হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি সর্ব্বজাতিরই অন্নাদি গ্রহণ কর্‌তে সক্ষম হ'লেন তখনই তাহা বাস্তবরূপে প্রকাশ হ'ল বুঝ্‌তে হবে এবং উহা 'করণ-সিদ্ধ' বলা যেতে পারে। এইরূপে 'আত্মার সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিতি'—একটী উক্তি। তা' হ'লে তিনি নির্জ্জনে—বনেও যেমন, সংসারেও তেমন;—তীর্থেও যেমন—আমাদের সাম্‌নেও

তেমন ;—মন্দিরে মসজিদেও যেমন—অন্ত্যজের ঘরেও তেমন ;—চন্দনে যেমন—বিষ্ঠায়ও তেমন ;—মাথার উপরে যেমন—পায়ের নীচেও তেমন ;—স্থূলেও যেমন—সূক্ষ্মেও তেমন ;—ইত্যাদি বাক্যগুলি ভাবনায় যখন সত্য বলে মনে স্থির ও অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে তখনই উহা 'ভাবসিদ্ধ' এবং যখন সাধক তীর্থাদি বা মন্দিরাদিতে অবস্থাচক্রে গেলেও তজ্জন্য পৃথক্ কোনরূপ বিশেষভাবের উদয় হয় না অর্থাৎ সর্ব্বত্রই 'একভাব'—তখনি ঐ উক্তির মর্ম্ম বাস্তবে পরিণত হ'ল এবং তখনই 'করণ সিদ্ধ' বলা যায়।

এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বেদযজ্ঞ মন্ত্রাদি—পাপ পুণ্য—সুখ দুঃখ—কর্ম্ম অকর্ম্ম—শুচি অশুচি শত্রু মিত্র—পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা—গুরু শিষ্য—দিবা রাত্রি—আলো অন্ধকার—মৃত্যুভয় বা যে-কোনো ভয়—সাকার নিরাকার—বাহ্য অন্তর—লক্ষণ অলক্ষণ—ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান—কাল মহাকাল প্রভৃতির তত্ত্ব ভেদ করে' ইহা অনুভূতিতে পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ ও বাস্তবে দর্শন হ'লে এবং তৎসঙ্গে পরমপুরুষের কৃপালাভ সমর্থ হ'লে সাধকের নিকট স্বরূপের জ্বলন্ত ও জীবন্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়। সিদ্ধেরা এ'কে অগ্নি, সূর্য্য, জ্যোতি বা 'নূর,'—হিরন্ময়কোষ প্রভৃতি আখ্যায় ব'লেছেন। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি নিরক্ষর ও মূর্খ হ'লেও সূর্য্যের উদয় দেখে যেমন ব'লে 'দিন হ'য়েছে'—তেমনি সাধনায় পাপ ও সংশয় দূরীভূত হয়ে' অজ্ঞান-অন্ধকার সত্য-সূর্য্যের উদয়ে বিনষ্ট হওয়ায় এবং ত্রিতাপজ্বালা না থাকায়—পরানন্দ ও পরাশান্তির বিমল মধুর জ্যোৎস্না নিত্য-আলোরূপে সাধক-হৃদয়ে ফুটে উঠে বা ভাস্‌তে থাকে—তখন তিনি বেশ জান্‌তে পারেন আত্মা, স্বপ্রকাশরূপ দেখা দিয়ে আজ তাঁকে ধন্য ক'রেছেন। নানক এম্নি সময়েই একথা বল্‌তে পেরেছিলেন—

"প্রভু তেঁহি তব শরণাই আয়া
উতারা গেয়া মেরা মন্‌কা সন্‌সা যব তেরে দরশন পায়া।"

এবং উপনিষদেও লেখা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"—"ন স পুনরাবর্ত্ততে—ন স পুনরাবর্ত্ততে।

সাধনার এই অবস্থা 'জীবন্মুক্তি' বলে অভিহিত—ইহাই অরূপের অপরূপ রূপ—স্বরূপ বলে' কথিত। তখন তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণের ন্যায়, বাক্য থাকিতেও বাক্যহীনের ন্যায়, মন-সত্ত্বেও মনরহিতের ন্যায় এবং প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণের ন্যায় নিঃস্বার্থ হ'য়ে বিচরণ করেন। এবং এ সকলেরই যে অতীত তিনি তখন আর তাহা কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে হয় না। পাতঞ্জলের ভাষায় ইহাই সবীজ বা সবিকল্প সমাধি। এই 'আত্মতত্ত্ব' লাভ হ'লে তৎপর সাধকের 'পর-তত্ত্ব' লাভের অধিকার জন্মে। 'পর-তত্ত্ব' বা পরমাত্মা অন্য ভাষায় নির্ব্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি। আবার এই 'পরতত্ত্বই' প্রেম বলে' পরিচিত। অখণ্ড সত্য লাভের পর প্রেমের জন্ম। মহাপুরুষ যীশু অবশেষে ব'লেছিলেন "Love is god."—'প্রেমই ভগবান'। এই প্রেমের জন্যই শিব পাগল—শ্রীমতী রাধিকা উন্মাদিনী—এই প্রেমেই মহাপুরুষ চৈতন্যদেবও উন্মাদ হ'য়ে সাগরে ডুবে' পরমচৈতন্যে মিশেছিলেন। এই প্রেমের কথাই সাধক কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি 'অমৃতের উৎস' কবিতায় ছুটিয়ে' দিয়েছেন—এঁরা "একমুঠো কথার—আদিরস" তাঁদের কবিতায় ঢেলে যা'ন নি—অমৃত ঢেলে' গিয়েছেন বলে পরমভক্ত রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য ইহা কত ভালবাস্‌তেন—এখনও এ সব কথায় বহু ভক্ত কেঁদে কেঁদে ধূলায় গড়াগড়ি যা'ন। সে যে প্রেমের কথা—পরম ব্যথার কথা! পরম ব্যথার কথা ব'লেই—

সে-কথা গুহ্যাতিগুহ্য এবং আরও বিচিত্র। সে কথার একটু আভাস দে'বার জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে সামান্য ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করে' এ প্রবন্ধ শেষ করা হ'ল।

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম   যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ   কভু না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে সে কভু না জীয়য়॥"

*   *   *

"শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু   পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার কথা নয়   তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পতিয়ায়॥"

বৃদ্ধ

মিলন-সন্ধ্যায়।

আজিকে কেন মোরে কত যে কাজ
করিতে হবে ভাবি তাই
এ কি এ মন পীড়া কহিতে লাজ
অথচ কিছু নাহি পাই!
দীঘীর ঘাটে গিয়ে ফিরি ত্বরিতে
গামোছা ফেলি ঘাটে আসি বাড়ীতে
কে যেন মোর তরে অপেখি আছে ঘরে
আমি যে বধূ ধীরে চলিতে হয়
কিছু যে মনে আজি নাহিক রয়।

গৃহের কাজে মন লাগেনা মোটে
যা'করি এলো মেলো তাই
এঁটোটি না ঘুচায়ে পুকুরঘাটে
ভোজন শেষে ছুটি যাই!

ডুমুর, আতা, জাম, বাঁশেতে ঘেরা
পুকুর-পাড় হ'তে বাবলা বেড়া
আ'লের বাঁকা পথে কে যেন দূর হ'তে
আসিছে দ্রুতপদে এ বাড়ী পানে
বলিয়া বারেবারে নয়ন টানে।

ঢাকিতে চাহি যত প্রাণের কথা
সকলে তত বুঝে লয়—
কেন যে কাঁপে হাত, রাঙিয়া উঠে
কপোল কাণ অসময়।
ঠাট্টা যদি কেউ তা লয়ে করে
সরমে মরে যাই কথা না সরে—
মিথ্যা দিয়ে শত বুঝাই নানা মত—
যদিও ধরা পড়ি তখনি বটে
আসল কথাটি ত' তবু না ফোটে!

কি যেন হয় নাই, কি কাজ সবি
রয়েছে বাকী সারিবার
মনেও পড়ে না কি—বোঝার মত
হৃদয়ে রহে গুরুভার!
হয় ত আসিয়া সে দেখিবে তাই
আমার আয়োজন কিছুই নাই
অক্ষমতা তাই ঢাকিতে এত চাই
বৃথা আড়ম্বরে ব্যস্ততায়—
সুখে কি দুখে এ যে বোঝা না যায়।

যেমন আসিবে সে অমনি সবে
তারে যে আগে ঘিরে নিবে
সোহাগে সমাদরে চুমাতে স্নেহে
প্রবাস দুখ ঝাড়ি দিবে!

উপোষী পিপাসিত এ চিতে মোর
কি যে সে কাতরতা বেদনা ঘোর
বুঝিবে বল বা কে ? দেখিব দ্বার ফাঁকে—
অধীর হয়ে ক্ষণ গণনা করা
নদীর তটে থাকি পিয়াসে মরা !

হা বধূ ব্যথা তোর সবার বেশী,
সবার চেয়ে বুঝি, ভাই !
তাই কি তোরি বেশী ছলনা হেন ?
এ বিনা বুঝি গতি নাই।
প্রেমের নিকষ কি বধূর ছল
অধরে হাসি রাগ নয়নে জল ?
কে জানে অত শত—সময় যায় যত
হৃদয় দুরু দুরু করিছে তত
অধীর ব্যাকুলতা জাগিছে কত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মিষ্টি সরবৎ।

(১০)

আমিনার সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আহমদ সাহেব একটু বিপন্ন হইলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক টিপ নস্য টানিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন "কাজটা ভাল হচ্চে না আমিনা, ওহায়েদের স্ত্রীকে অমন ভাবে আস্কারা দিয়ে তুমি বড়ই অন্যায় করছ—তাকে বলে দিও, এসব রাগারাগির ফল ভাল হবে না, আমি শুনলুম্ ওহায়েদ নাকি ফের বিয়ে করবার্ জন্যে খেপেছে।—"

আমিনার দুই চোখে দৃপ্ত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কি ? বিয়ে করবার্ জন্যে খেপেছে ? ওঃ! আর্ তুমিও বোধহয় তার বিয়ের খরচ গুছিয়ে নিয়ে, বরকর্তার সাজ সেজে তৈরী হয়ে বসে আছ, কেমন ?—"

উদাস দৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়া, নিরীহ ভালমানুষের মত অতি কোমলস্বরে আহমদ্ সাহেব উত্তর দিলেন, "অগত্যা! আশ্রিত, অনুগত, পেয়ারের চাকর, সে বেচারা যদি বিয়ের জন্য ঝোঁকই ধরে বসে, তবে আমি কি আর খরচের জন্যে কুণ্ঠিত হতে পারি—"

রাগে আগুন হইয়া আমিনা বলিল "বেশ, বেশ, বেশ! যাও তুমি তোমার পেয়ারের চাকরকে নিয়ে থাকগে, তুফানীর ভার রইল আমার ওপর—আমি ওর ব্যবস্থা করব! ওঃ, একটা বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সীমা রাখ্‌লে না, আবার আর একটা বিয়ে! গলায় দড়িও জুট্‌ল না! আহা, ভাগ্যে বাবা ওদের বিয়ে দিয়ে গেছলেন, তাই আজ তুফানীর ওপর এত তম্বি, বলি বিয়েটা যদি না হোত তো তুফানীকে পেত কোন চুলোয়?"

আহমদ্ সাহেব হঠাৎ বিষম খাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া উঠিলেন! তারপর রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে হাস্যোজ্জ্বল নয়নে আমিনার পানে চাহিয়া বলিলেন "তা সে যে চুলোতেই তোমার তুফানী ছাই চাপা থাক, ও যখন ছাই উট্‌কে তাকে টেনে বের করেছে, তখন তো ও নিজের দখলিস্বত্ব ছাড়্‌তে পারে না।—এটা হ্যাঁ কি না তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কোর, সে আইন টাইন পড়েছে—"

অত্যন্ত চটিয়া আমিনা বলিল "তুমি থাম, তোমার তার জন্যে ঘটকালী করতে হবে না। চাকরের বিয়ের ধূমধামে লেগেছে সেই ভাল,—" আমিনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া তখনই মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "তা তুমিও নিজে ঐ সঙ্গে একটা করে এস, না,—বেশ ভালই হবে! চাকরের নতুন বিবি আস্‌ছে, তোমার নিজেরও অম্নি—"

আহমদ্ সাহেব হঠাৎ বাধা দিয়া, চক্ষের নিমিষে আমিনাকে কাছে টানিয়া লইয়া, একহাতে নিজের বুকের উপর তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে নস্যের টিপ্ তুলিয়া তাহার নাকের কাছে ধরিয়া সহাস্যে বলিলেন "নাও, নিঃশ্বাস টেনে বলতো এবার কি বল্‌ছ?—"

আমিনা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মুখ সরাইয়া লইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আরক্ত মুখে বলিল "গেলুম, গেলুম, ছাড়—"

ব্যঙ্গস্বরে আহমদ্ সাহেব বলিলেন "এর বেলায় গেলুম, গেলুম, কেন? বল না, কি বল্‌ছ—"

আমিনা রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল "ছেড়ে দাও—" আমিনার অবস্থা দেখিয়া আহমদ্ সাহেব নস্যের টিপ্ ধরা হাতটা একটু দূরে সরাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহাকে ছাড়িলেন না। আমিনা নিঃশ্বাস টানিয়া সুস্থ হইয়া বলিল "এম্নি করেই মানুষকে জব্দে ফেল্‌তে হয়?"

অর্থসূচক কটাক্ষ হানিয়া স্বামী বলিলেন "হুঁ, বোঝ!—"

আমিনা সে কটাক্ষের মর্ম্ম কি বুঝিল, এবং মনের অবস্থা তাহার কি হইল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। প্রকাশ্যে কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে বলিল "আমি বুঝ্‌তে চাই নে, যার সখ্ হয়, সে বুঝুক—পরক্ষণেই ব্যস্ত হইয়া বলিল "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আমার ঢের কাজ।"

স্বামী ত্রস্তে বাধা দিয়া বলিলেন "নাও, মানলুম হার! স্বীকার করছি সবটা ষোল আনা আমারই,—এখন ঠাণ্ডা হও।—কতটা কাজ আছে? আমায় কিছুই ভাগ দেবে না?"

আড় চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া আমিনা হাসিয়া ফেলিল! দুজনেরই নয়নে নয়নে প্রীতিবহ পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! সাগ্রহে স্ত্রীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে স্বামী বলিলেন "বড় শয়তানী করেছ!—এম্নি রাগই কি করতে হয়?—"

হাসিমুখে স্বামীর কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া আমিনা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া,—সপ্রতিভ ভাবেই জানাইল "হয়!"

স্বামী আবার হাসিয়া উঠিলেন! তারপর সেই কথা লইয়া দুজনে বহুক্ষণ ধরিয়া পরিহাসের তর্ক চলিল, সে তর্ক আর ফুরায় না! স্বামীর সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া, মাথামুণ্ড যুক্তির সাহায্যে আমিনা পরম বিজ্ঞতার সহিত

মন্তব্য প্রকাশ করিল যে স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে এক ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করেন তবে স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গে এগার ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে, ইহাতে স্বামীর রাগ করা অন্যায়!

কথাটার অযৌক্তিকতা লইয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলে অফুরন্ত তর্ক চলিবে, এবং এই আসন্ন সন্ধির মাঝে বিচ্ছেদের নূতন আয়োজনও হয়ত বা সুপ্রস্তুত হইয়া যাইবে! বুদ্ধিমান্ আহমদ সাহেব, সুশীল কোমল ব্যবহারে ব্যাপারটা শোধ্‌রাইয়া লইয়া সদুপায়ে আমিনার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। আমিনা সলজ্জহাস্যে মুখ সরাইয়া লইয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আচ্ছা, যাও, এখন অনেকক্ষণ গল্প করা হয়েছে, আর নয়, এবার ভদ্রলোকের মত ছিট্‌কিনিটা খুলে দাও দেখি, চলে যাই—"

সকৌতুক নয়নে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "পারিশ্রমিক ?"

কপট-কোপে ভ্রূভঙ্গি করিয়া আমিনা বলিল "ওঃ ভয়ানক ব্যবসাদার হয়ে উঠেছ যে, কথায় কথায় পারিশ্রমিক! আমার কাছেও হাত পাত্‌ছ ?—"

হাস্যোজ্জ্বল বদনে স্ত্রীর চোখে চোখ মিলাইয়া স্বামী উত্তর দিলেন "না হলে দিন চল্‌ছে না যে! অবস্থা আজ কাল অত্যন্ত শোচনীয়!—"

রাগতঃ ভাবে আমিনা বলিল "দ্যাখো আবার ঐ সব কথা বলবে যদি—"

বাধা দিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "হাঁ, হাঁ কসুর মাপ কর। আত্মচর্চ্চা না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু পরচর্চ্চাটা বড় জরুরী হয়ে পড়েছে, ওটা না হলেই চল্‌বে না আমিনা, রাগ টাগ কোর না। মেহেরবাণী করে আমার কার্য্যোদ্ধার করে দাও। সংসারের গৃহিণী তুমি,—হাসি তামাসা নয়, আমিনা, সব সময় তোমার ছেলেমানুষী শোভা পায় না, সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় তোমার দায় ঢের, বুঝ্‌লে—" তাঁহার পরিহাসের স্বর পরিবর্ত্তিত হইল।

স্বামীর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে একটা গুরুভার দায়িত্বের সঙ্কেত আমিনার মনের উপর সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল। একটু বিচলিত হইয়া উৎকণ্ঠিত নয়নে স্বামীর পানে চাহিয় আমিনা বলিল "আমি কি করব বল—"

স্বামী সস্নেহে আমিনার হাত নিজের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইয়া, কোমলভাবে বলিলেন "আমি ঠাট্টা করে তোমায় রাগিয়ে দিয়েছি আমিনা, মাপ কর। ওহায়েদ বিয়ের কথা কিছুই জানে না, সে তেমন ছেলেই নয়—"

প্রতিবাদের স্বরে আমিনা বলিল "না, নয়! সব খবর তো জান! তোমার কাছে ভিজে বিড়ালটী সেজে থাকে, তুমি মনে কর, আহা মরি এমন চাকর আর হয় না! চাকরের গুণ কত, তা তো জান না,—তুফানী বেচারাকে জ্বালিয়ে মারে!"

নস্য টানিয়া একটু চিন্তিত ভাবে আহমদ সাহেব বলিলেন "কারণ কি ?—"

আমিনা বলিল "খোদাকে মালুম—তুফানীকে কিন্তু বড় উত্যক্ত করে! আহা, কি অন্যায় বল দেখি, রাত দুপুরের সময় বেচারা খেটে খুটে একটু ঘুমুতে গেছে, তখন কি না মিছে কথা বলে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে জ্বালাতন করা, এতে রাগ হয় না ?

আহমদ সাহেব নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, আমিনা অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল "শুধু তাই! ওর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে জব্দ করবার জন্যে, তোমার নবাব চাকর আবার তোমার সেই টাইগার কুকুরের বাচ্চাকে বিছানার ওপর তুলে নিয়ে গেছলেন, একেই তুফানী কুকুর টুকুর দুচক্ষে দেখতে পারে না, কাযেই ও

আরও চটে যায়। তাতেও তোমার সেই নবাব হটবার পাত্র নন, তিনি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে, কুকুর বাচ্চার মুখে মুখ দিয়ে চুমো খেয়েছেন, শুনলে বিদ্যে!"

আহমদ সাহেব হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! আমিনা একটু ম্লান হইয়া অসন্তোষের সহিত বলিল "তা তুমি হাসবে বৈ কি! তোমার কি বল না—

পরক্ষণে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল "না না, সত্যি, হাসি ঠাট্টার কথা নয়, এগুলো কি রকম অন্যায় বল দেখি—"

হাসি সংযত করিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন "দ্যাখো আমিনা, ও সমস্যাটা মীমাংসার ভার যদি আমার উপর দাও তো—আমি এখনই চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি করে দিতে পারি, কিন্তু তুমি তাহলে চটে আগুন হয়ে, এখনই হাত ছাড়া হয়ে যাবে, সে ভয়ও প্রচুর পরিমাণে আছে! অতএব ও দুঃসাহস প্রকাশে কাজ নাই,—তোমায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছি—ওহায়েদ দম্পতির ঝগড়া ঝাঁটি মেটাবার ভারটা ওদের উপরই দাও, ওরাই সে কাজটা সব চেয়ে সুশৃঙ্খলে শেষ করে ফেলতে পারবে, তোমার আমার বিদ্যে বুদ্ধি সে ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে যাওয়া, সব চেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ!—আর বাস্তবিক সত্যি কথা,—স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ঝাঁটিটা স্থায়ী করে রাখা, বড় কদর্য্য অশান্তিকর ব্যাপার!—"

ব্যঙ্গস্বরে আমিনা বলিল "আহা! এর মধ্যে এত তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তোমার! ধন্য হলুম!—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—ঝগড়া ঝাঁটিটা স্থায়ী করে রাখা কদর্য্য অশান্তিকর ব্যাপার হলেও—মূলে সেটা সৃষ্টি করা কিন্তু, খুবই সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক শান্তির ব্যাপার, কি বল? হাসছ কেন? বল না ঠিক করে, সেটা খুব ভাল খুব আনন্দ-জনক, খুব মনোরম ব্যাপার, কেমন?"

মানুষের মনুষ্যত্ব যাহার মধ্যে আছে, মানুষের হৃদয় লইয়া, অন্যের হৃদয়কে অনুভব করিবার ক্ষমতা যাহার আছে,—প্রকৃত সত্যের নিকট নতশির হইয়া দণ্ড গ্রহণের তেজস্বিতা তাহারই থাকে! আমিনার ব্যঙ্গপূর্ণ মিষ্ট-ভর্ৎসনাটুকুর, আঘাত—আহমদ সাহেবের এতক্ষণকার অসঙ্কোচ পরিহাস-উজ্জ্বল মুখখানা,—এইবার সসঙ্কোচ লজ্জাররাগে রাঙা করিয়া তুলিল! ক্ষমাপ্রার্থী দৃষ্টিতে চাহিয়া, বিনয়ের স্বরে বলিলেন "মাপ কর, মাপ কর আমিনা,—সে কসুর মাপ কর, আমি নিজের দোষ স্বীকার করছি, সংসারে মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক হয়ে থাকে—কিন্তু সে ত্রুটি কি চিরদিনই মনে রাখতে আছে,—"

বাধা দিয়া আমিনা বলিল "আছে বৈ কি! মর্ম্মান্তিক যা কিছু,—মানুষের মনে তা চিরদিনই জেগে থাকে—"

সজোরে আমিনার হাত চাপিয়া ধরিয়া আন্তরিক মিনতিপূর্ণ স্বরে আহমদ সাহেব বলিলেন "চিরদিনই! সমান ভাবেই?"

আমিনা মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ বিচলিত হইয়া—তখনই আত্মবিস্মরণ করিয়া লইল, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু বেশী মাত্রায় উদাসভাব অবলম্বন করিয়া বলিল "সমানভাবে? হ্যাঁ সমানভাবে সেই ব্যবহার করে চল, সমান ভাবেই সব আমার মনে থাকবে,"—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গেই, সে হাতটা ছাড়াইবার জন্য এক টান দিল।

"সেটি হবে না,—" বলিয়া আহমদ সাহেব আরো একটু জোরের সহিত আমিনার হাত চাপিয়া ধরিলেন আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল "উহু-হু ছাড়, লাগছে—"

কুণ্ঠিত-বিনয়ের স্বরে স্বামী বলিলেন "বড় চটিয়েছি আমিনা, তোমার এত রাগ হবে, তা বুঝতে পারি নি,—এখন বড় দুঃখ হচ্ছে, বল তুমি, আমায় কিসে মাফ করবে—"

আমিনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল "হবে, হবে,—সে হবে এখন! উঃ, চুড়িগুলো যে ভয়ানক লাগছে, হাতটা যে গেল আমার—"

আহমদ সাহেব হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাহুমূল চাপিয়া ধরিলেন, পাছে আমিনা পলাইয়া যায়! কিন্তু আমিনা পলাইল না, উল্টা তাহার চোখের সামনে, কঙ্কনযুক্ত হাতখানা তুলিয়া ধরিয়া, সকরুণ অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিল "দ্যাখো দেখি কি করলে? চুড়িসুদ্ধ হাতখানা এমনি জোরে মুঠিয়ে ধরেছ যে, হাতে রক্ত জমে গেল—"

অপ্রতিভ আহমদ-সাহেব, সযত্নে তাহার হাতখানা ধরিয়া সুকৌশলে পেশীমণ্ডল টিপিয়া, এদিকে ওদিকে রক্ত পরিচালন করিতে করিতে, ঈষৎ অনুতপ্ত-স্বরে বলিলেন "দ্যাখো দেখি বিদ্যা!—তুমি এম্নি পাগলামী সুরু করেছ যে আমায় সুদ্ধ পাগল বানাবার যো!—তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্যমনস্ক হয়ে, তোমারই হাত এম্নি জোরে মুঠিয়ে ধরেছি যে,—ছিঃ!—আর লাগ্‌ছে?"

স্বস্তি-ব্যঞ্জক স্বরে আমিনা বলিল "না, আর না, বেশ হয়েছে, ছেড়ে দাও।" আমিনা হাতখানা টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘড়ির দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল "দেখতে পাচ্ছ?—এবার ভালমানুষের মত জামাজোড়া পরে বেড়িয়ে পড় দেখি, দুয়ারটা খুলে দাও, আমি আগে চলে যাই—"

আহমদ সাহেব বলিলেন "ঐ! আসল কথাই যে অসমাপ্ত রয়ে গেল! সে হবে না, কথাটা ঠিক করে ফেল, বল আজ ওহায়েদ মিঞার স্ত্রী নীচে যাবে ত?

ঘাড় নাড়িয়া আমিনা বলিল "না, সেটা হচ্ছে না, তোমার অহঙ্কারী চাকরের স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য তুফানী যে আগেই ঘাড় নীচু করবে, সেটা আমি হতে দেব না—"

বিপন্ন হইয়া আহমদ সাহেব বলিলেন "আহা মেহেরবানী করে, এ যাত্রা তাকে ক্ষমা করতেই বল,—"

আমিনা অধিকতর বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আচ্ছা গরজে লোকত তুমি! কে তুফানীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে যে তুফানী আগেই গায়ে পড়ে তাকে ক্ষমা করতে যাবে?"

আহমদ্ সাহেব বলিলেন "আহা চাইবে, চাইবে—ওহায়েদ ক্ষমা চাইবে, না হলে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের ঘরকন্নাই চলতো না! আগে, আপাততঃ দুটোকে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগটা দাও—"

আমিনা হাসিয়া ফেলিল!—ঘাড় ফিরাইয়া টেবিলের বইগুলার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখোচোখী চাইলে,—এ রকম ক্ষেত্রে মানুষের যে কি রকম বিভ্রাট ঘট্‌তে পারে সেটা তোমার আশীর্ব্বাদে আমার খুব ভাল রকমই জানা আছে, সেই জন্যেই তুফানী বেচারা অত যত্নে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে!—" তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল "আচ্ছা চাকরের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন, বল দেখি?"

ব্যস্তস্বরে আহমদ্ সাহেব বলিলেন "সেটা বলব এখন এরপর—খুব সঙ্গোপনে! আপাততঃ বল—"

বাধা দিয়া আমিনা বলিল "আপাততঃ নূতন কথা কিছুই বল্‌বার নাই, ঐ এক কথা,—তুফানী যেতে পারবে না, যদিও যায়, আমি তাকে যেতে দেব না—" পরক্ষণে কি একটা কথা মনে পড়ায়, একটু হাসিয়া বলিল "সে গেলে আমার চল্‌বে না, রাত্রে আমার কাছে থাক্‌বে কে?"

আহমদ্ সাহেব কি একটা কথা বলিতে গিয়া, সহসা ত্রস্তভাবে থামিলেন,—আমিনার মুখপানে চাহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

পাছে নিজেও এখনই হাসিয়া ফেলে,—সেই ভয়ে আমিনা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আলমারীর দিকে যাইতে যাইতে বলিল "সাড়ে চারটে বাজ্‌তে চল্ল, গল্পের জের কি আর মিট্‌বে না ?—"

"মিট্‌তে দিচ্ছ কই ?" বলিতে বলিতে আহমদ-সাহেব উঠিয়া আসিয়া আমিনার স্কন্ধমূল ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া স্নেহময়স্বরে বলিলেন "আর কেন, মিনতি কর্‌ছি এবার মিটিয়ে ফেল, আমার আর সময় নাই, দুষ্টুমী ছেড়ে সোজাসুজি বল,—আমার অনুরোধটি রাখ্‌বে ত ?"

আমিনা ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল "আচ্ছা দুষ্টুমী না হয় ছেড়েই দিলুম কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?—থাক না দিন কতক, হোক না ওহায়েদ একটু জব্দ, তারপর সব ঠিক্ হয়ে যাবে। ওদের মুখের ঝগড়া মুখেই শেষ হয়ে গেছে, মনে কারুর কিছুই নাই, সে আমি বেশ জানি—কেন ভাব্‌ছ তুমি ?"

নস্য টানিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন "আহা, আমি না হয় গুরু ভাবনা, কাউকেই আমল না দিলুম, কিন্তু তাহলেও এটা যে খুব আনন্দ বা উল্লাসের বিষয় নয় সেটা ত মান ?—তাছাড়া ওহায়েদকে জব্দ করা ?—তুমি বল আমায়,—আমি নিজের বুকে হাত রেখে কসম্ খেয়ে বলছি, সে জব্দ হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে !—দোহাই তোমার আমিনা—"

পিছু হটিয়া আমিনা ব্যস্তভাবে বলিল "আঃ কি যে কসম খাওয়া, দোহাই মানা শিখেছ,—যাও ভাল লাগে না ! একটু থামিয়া বলিল, "নাও, আমার ঝকমারী হয়েছে, বল এখন আমায় কি করতে হবে ?—কিন্তু মনে রেখো, তুফানী নেহাৎ সোজা পাত্র নয়, সে আমার হুকুমে পায়ে হেঁটে কবরে নাম্‌তে রাজি আছে, কিন্তু আমি যদি এখন সোজাসুজি বল্‌তে যাই যে,—'যা তুফানী ওহায়েদের সঙ্গে দেখা করে আয়,' তাহলে সে মোটেই আমায় গ্রাহ্য কর্‌বে না—"

আহমদ-সাহেব বলিলেন "আহা এতটা সোজা করেই বা বল্‌বার দরকার কি ? একটু না হয় বাঁকা করেই বল,—আমার খাতিরে—"

হাসিয়া আমিনা বলিল "তথাস্তু ! বল কি করতে হবে !—"

আহমদ-সাহেব পুনশ্চ নস্য টানিয়া চিন্তা-গম্ভীর মুখে বলিলেন "এস দেখি, আমার পোষাক কামরায়,—সেইখানে পরামর্শটা স্থির করা যাক্, পোষাকটাও তৎক্ষণে পরা হবে।"

মিনিট দশেক পরে, সাজসজ্জা করিয়া, সহাস্য-প্রফুল্লমুখে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আহমদ-সাহেব পোষাক কামরা হইতে বাহির হইয়া—নীচে নামিয়া গেলেন।—

(১১)

রাত্রি নয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই, আমিনা 'ঘুম পাওয়ার' আছিলা করিয়া, সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া আসিল। তারপর ইনেরকে তাহার শয়ন কক্ষে পাঠাইয়া দিয়া,—ইদানিন্তন ব্যবস্থামতে তুফানীকে সঙ্গে লইয়া নিজে ভালমানুষের মত—তেতলায় চলিল।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সহসা "ওহো—" রবে সুদীর্ঘ উদ্বেগপূর্ণ-বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, আমিনা তীব্রবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তুফানী বিস্মিত হইয়া বলিল "কি হোল—"

শশব্যস্তে তড়্ তড়্ করিয়া সিঁড়ি বহিয়া নামিতে নামিতে আমিনা যথাসাধ্য ব্যাকুলতা জানাইয়া, ত্রাস্ত স্বরে বলিল "যাঃ! আলমারীর চাবিটা তাড়াতাড়িতে কোথায় রেখে এসেছি, মনে নাইতো! আয় ভাই তুফানী চট্ করে এইবেলা চাবিটা খুঁজে রেখে আসি—"

তুফানী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া, আমিনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, চলিতে চলিতে ঈষৎ তিরস্কার পূর্ণস্বরে বলিল "দিন রাতই হেথা সেথা ছুটোপাটি করে বেড়াচ্ছ, তা ঘরের জিনিসের তদ্বির করে কে? বল্লে তো কথা শুনবে না—"

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আহা! কোন লক্ষ্মী এত উপদেশ দিচ্ছ গা? বলি, তুমি কথা শোন? আচ্ছা আমি অনুমতি দিচ্ছি,—যাও তো লক্ষ্মী,—তোমার নীচেকার,—ঘরখানার অবস্থাটা একবার তদারক করে এস তো—"

তুফানী একটু হাসিয়া বলিল "সে ঘর কি আর এখন আমার আছে? থাক্‌লে নিশ্চয়ই তদারক করতে যেতুম—" পরক্ষণে সে কথা উল্টাইয়া লইয়া আমিনাকে তাড়া দিয়া বলিল "চল চল আবার চাবি খুঁজতে তিন ঘণ্টা পার করবে তো—এদিকে ন'টা বাজে, হুঁস রেখো—"

আমিনা চলিতে আরম্ভ করিয়া পরম নিশ্চন্ততা-জ্ঞাপক স্বরে বলিল "রেখেছি মোদ্দা রাত্রি এগারটার কমে কেউ ঘরে আস্‌ছে না, মনে রেখো—"

দক্ষিণ মহলে শয়নকক্ষে আসিয়া আমিনা এদিক্ ওদিক খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া গেল, তবুও চাবির সন্ধান মিলিল না। এদিকে ঘড়িতে টং টং করিয়া ন'টা বাজিয়া গেল। আমিনা হতাশ হইয়া একখানা সোফায় বসিয়া পড়িয়া বলিল "যাঃ চাবি তো তাহলে হারাল!"

তুফানী চিন্তিত মুখে চারিদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল "সাহেব তো পকেটে করে নিয়ে যান নি? জান কিছু—"

"তা কি করে জান্‌ব—" বলিয়া আমিনা উঠিয়া ব্যস্তভাবে চাবি খুঁজিতে লাগিল। তুফানী নিজ মনেই অনুচ্চস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিল' "তা হয় তো হতেও পারে, তোমার সঙ্গে এখন কথাবন্ধ হয়ে আছে, তাই তোমায় ভাবিয়ে জব্দ করবার জন্য হয়তো চাবিটা লুকিয়ে রেখেছেন, তোমার কি মনে হয়?"

আমিনা গম্ভীরভাবে বলিল "তা হতেও পারে,—গুণে তো ঘাট নেই। কিন্তু নিজে যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে বড় মুস্কিল হবে। খোঁজ তুফানী, আগে আমরা খুঁজে-পেতে ভাল করে দেখি, তারপর জিজ্ঞাসা করা যাবে।"

অন্বেষিত স্থানগুলা পুনরায় অন্বেষণ করিতে করিতে,—তুফানী বলিল "কই বাপু, এখানে তো কোথাও চাবি দেখ্‌ছি না,—সাহেবজীই চাবি নিয়ে গেছেন তা হলে!—আচ্ছা আমিনাবিবি,—তখন বহুজীর কাছে তো স্বীকার করলে না, কিন্তু আমার কাছে মিথ্যেটা বলা তোমার উচিত হয় না, সত্যি করে বল দেখি,—দুপুর বেলা অতক্ষণ ধরে যে ঘরে বই পড়ে কাটালে, তা সাহেবের সঙ্গে তোমার কোন কথাই হোল না?"

আমিনা টেবিলের কাগজপত্র উট্‌কাইয়া দেখিতে দেখিতে, সুগম্ভীর মুখে বলিল "তুমি বুঝি আমার তেম্নি বেহায়া ঠাউরেছ, তোমার আন্দাজ তো খুব! আমি আবার কথা কইব? আমার বুঝি লজ্জাসরম কিছুই নেই—?"

তুফানী একটু হাসিয়া বলিল "আহা তোমার লজ্জাসরম থাকলে কি হবে অন্য পক্ষেরও যে সেটা থাকবে তার তো কোন মানে নাই। আমি মানছি তুমি কথা কও নি কিন্তু তিনিও কি অমনি চুপ করেছিলেন? আমার তো, তা মনে হয় না—"

আমিনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "বেশ না হয় তো আমি নাচার—"

অকস্মাৎ—"রুস্তম" বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিয়া আহমদ্-সাহেব গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন! গৃহস্থ প্রাণী দুইটী সন্ত্রস্তভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া গেল। চকিত নয়নে তাহাদের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, অহমদ্-সাহেব আপনা হইতেই গম্ভীরভাবে জানাইলেন "শরীরটা কিঞ্চিৎ খারাপ হওয়ার জন্য, তিনি সকাল সকাল ডিস্পেনসারীর কাজ সারিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন, এখনই শুইয়া পড়িবেন।" আমিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন "রুস্তম কোথা গেল?"

আমিনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'জানে না।'

পকেটে হাত দিয়া, সহসা বিস্ময়ের সহিত চমকিয়া আহমদ্-সাহেব বিশুদ্ধ উর্দ্দু ছন্দে বলিয়া উঠিলেন "ওহোঃ! বড়া চুক্ গ্যয়া হো! ওহায়েদ—" বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন—।

তুফানী নিঃশব্দ-পদে ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, আমিনার দিকে চাহিয়া তিনি সহসা ব্যগ্রভাবে বলিলেন "ওহায়েদ কো আওরাৎ?"

আমিনা অস্ফুটস্বরে বলিল "সেই রকমই শুনেছি, কোন দরকার আছে?"

ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন "আ—হো!" অর্থাৎ "হাঁ!" পরক্ষণে পকেট হইতে একটা নূতন ব্রাস্কোর কৌটা ও একখানা সাবান বাহির করিয়া আমিনার হাতে দিয়া বলিলেন "জুত্তেকে রওগণ ঔর কুত্তেকো সাবান,— দুনো ওহায়েদকো পাশ ছোড় দে আনা চাহি এ.—জলদি উন্‌কো ভেজ দেও—"

চাপা হাসির ঠেলায় আমিনার ঠোট দুটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, অতিকষ্টে সংযত হইয়া দ্রুত আসিয়া তুফানীর হাতে জিনিস দুইটী দিয়া কানে কানে বলিল "বরের মুখখানি দেখে সব যেন ভুলে যেও না, জলদি ফিরো,— তুমি এলে তবে আমি তেতলায় যেতে পারব, মনে রেখো,- যাও শীঘ্র, আর দাঁড়িও না।"

তুফানী কোন উত্তর দিল না, নীরবে একটু হাসিয়া প্রভুর আদেশ পালনের জন্য সদরের সিঁড়ির দুয়ার পার হইয়া নীচে নামিয়া চলিল। "অর্দ্ধপথ গিয়াছে., এমন সময় পিছনে সশব্দে সিঁড়ির দুয়ার বন্ধ করিয়া, আমিনা খিল আঁটিতে আঁটিতে সকৌতুক হাস্যে বলিল "আজ আর অন্দরে ঢুকতে পাচ্ছ না মশাই, সেই-খানেই থেক—"

তুফানী ব্যস্ত হইয়া বলিল "মাপ কর আমিনা বিবি,—"

আমিনা মোলায়েম সুরে উত্তর দিল "সে হবে এখন, কাল! আজ আমার ভারি ঘুম পেয়েছে, এখন চল্লুম কিছু মনে কোর না,"

আমিনা সত্যই শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর বারেণ্ডায় আসিতেই, আমিনা দেখিল তুফানী সামনে দাঁড়াইয়া! চোখো-চোখি হইতে দুজনের মুখেই সলজ্জ-স্মিত রহস্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল!—তুফানী কি একটা কথা বলিতে

যাইতেছে দেখিয়া, আমিনা তাড়াতাড়ি বলিল "জুস্তেকো রওগণ আর কুস্তেকো সাবুন, দুনো চিজ কালরাত্রে যথাস্থানে পৌঁছেছিল ত ?

তুফানী কপটকোপে বলিল "নাঃ, সে আমি খেয়ে ফেলেছি ! আচ্ছা. দাদার একদিন দিদির একদিন,—সেটা মনে রেখো, এবার সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হলে, ডেকো আমায় তেতলায় যাবার জন্যে,—যাব ভাল করে ! আর এই কান মলে নাকখৎ দিয়ে রাখ্‌ছি ফের যদি কখনো তোমার সঙ্গে তাস হাতে করি !— উঃ, কাল রাত্রে যে বকুনিটা দিয়েছে আমায় !

সবিস্ময়ে আমিনা বলিল "কে, ওহায়েদ !—কে বল্লে তাকে তাস খেলার কথা ?

একটু এদিক ওদিক চাহিয়া তুফানী বলিল "খোদ মালিক !—" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তুফানী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল "উঃ, আমার ওপর সে রাগটা যদি দেখতে ! বল্লে, "হজরৎ বিবি সাহেবেরা ছেলেমানুষ, তাঁরা ছেলেমানুষী করতে পারেন, কিন্তু তুমি বুড়ো ধাড়ী কি বলে তাঁদের সহায়তা কর ?—আমার মনীবের দিল খারাব হয়ে যায়, তাঁর শুকনো মুখ দেখলে আমার শুদ্ধ জান্ ঘাব্‌ড়ে যায়। আমার সাহেব অসময়ে আজ কাল ওপর থেকে নেমে আসেন, তাঁর হাসি নেই, সে স্ফূর্ত্তি নাই !.........এই সব আরো কত কি।—"

লজ্জায় আমিনার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল "এসো তো কলঘরে, সব শুনি।— তুফানীকে টানিয়া লইয়া আমিনা দ্রুতপদে কলঘরে চলিল।

কলঘরে ঢুকিয়াই আমিনা বেদীর উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল "বলতো সব—"

তুফানীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল "দ্যাখো আমিনা বিবি, আমি সব সত্যি কথাই বলতে রাজি আছি—কিন্তু তুমি কসম খেয়ে বল, সাহেবের সঙ্গে লড়াই ঝগড় বাধিয়ে বসবে না ?

অধৈর্য্যভাবে আমিনা বলিল "হ্যাঁ হ্যাঁ সে কসম খাব এখন, তুই থাম—"

তুফানী হাসি হাসি মুখে বলিল "থামলুম্, আমার দায়-দোষ নেই !—সাহেবের ওপর রাগ করবার ছুতো টুকু তুমি হরঘড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছ, আর আমি যে তোমার রাগের খোরাক গুছিয়ে দিয়ে যাব, সে বান্দা আমায় পাও নি। একেই তো যে খোসনাম হয়েছে আমার—তা বলবার নয়—

আমিনা বলিল "তুই বল্‌বি কি না, তাই বল—"

তুফানী সবিনয় বলিল "আমার মাথ খাও, বল এই তুচ্ছ কথা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি করবে না—

একটু হাসিয়া আমিনা বলিল "না, করব না,—আল্লার কসম ! বল—"

গতকল্য দুপুরের পর ওহায়েদের সঙ্গে আহমদ সাহেবের যে যে কথা হইয়াছিল, তুফানী রহস্যকোমলকণ্ঠে ধীরে ধীরে সব বলিল নিজের স্বামীর উদ্দেশে কিছু কিঞ্চিৎ ঠাট্টাও করিয়া লইল। যে হেতু গৃহবিবাদে আক্রান্ত প্রভুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া, তাঁহারও অন্তঃকরণ ব্যথিত !—

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া আমিনার রাগ ভাল হইয়া গেল, কিন্তু ওহায়েদ দম্পতীর মিলন ব্যবস্থা লইয়া— আহমদ্ সাহেব তাহাকে যে কিরূপ নির্দ্দয়ভাবে ঠকাইয়াছেন সে কথাটা মনে পড়ায় বড় অনুতাপ হইতে লাগিল। আহা, আমিনা কেনই যে বোকামি করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিল !

দুপুর বেলা নিভৃতে স্বামীর সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে বলিয়া আমিনা মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিল। প্রকাশ্যে তুফানীকে বলিল "তোর কোন ভয় নাই।"

অনেক দেরীতে স্নান করিয়া স্নানাগার হইতে বাহিরে আসিল। আহমদ্-সাহেব তখন রুস্তমের হাতে চা খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

দুপুরে কাজকর্ম্ম সারিয়া আহমদ্-সাহেব উপরে আসিতেই, আবলু-সাহেব তাঁহার কাছে গিয়া হাজির হইলেন। দুজনে গল্প চলিতে লাগিল। আমিনা বাহির হইতে শব্দ পাইয়া, নিঃশব্দে তেতলায় পলায়ন করিল জিনেবও তাহার সহগামী হইল, দুজনে সমস্ত দুপুরটা সেইখানেই পড়িয়া ঘুমাইল। তুফানী কোথায় রহিল আমিনা তাহার খোঁজ লইল না।

রাত্রে আজ আর তাস খেলা হইল না,—যেহেতু তুফানী নাককাণ মুচ্‌ড়াইয়া শপথ করিয়াছে, সে আর তাস খেলিবে না।—আজ আমিনারও তাস খেলায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না, সে জিনেবকে ধরিয়া উর্দ্দু কবিতার বই পড়াইয়া,—কাব্যচর্চ্চা করিয়া কোনমতে সময় কাটাইয়া, যথাসময়ে শয়নকক্ষে চলিল। তেতলার ঘর আজ শূন্য পড়িয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মাথার শিয়রে আলো জ্বালিয়া রাখিয়া স্বামী বিছানায় শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, আমিনা ঘরে ঢুকিতেই কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কেঁও জি, সকাল থেকে দেখাই পাই নি যে, দুপুরে তেতলায় গিয়ে ঘুম দেওয়া হোল কেন?"

আমিনা নত নয়নে গম্ভীরভাবে বলিল "আমার খুস"—তারপর পানের ডিবা সাম্‌নে রাখিয়া বলিল "রইল পান—" পরক্ষণে চাদরখানা টানিয়া, আপাদমস্তক মুড়িয়া দিয়া, বিছানার একপাশে ঝুপ্‌ করিয়া শুইয়া পড়িল।

আমিনার ভাবগতিক দেখিয়া আহমদ্-সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। কাগজ ফেলিয়া, আমিনার মুখের আবরণ সরাইয়া, বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "এর মধ্যে আবার কি বেমার ধর্‌ল?"

আমিনা মুখ সরাইয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া, একান্ত উদাসীনভাবে বলিল "বেমার আবার কি ধর্‌বে? আমি কি আর মানুষ, যে আমার বেমার হবে? আমি হচ্ছি একটা আস্ত গাধা!—না হলে, কাল, কেনই যে তোমার পেয়ারের চাকরের অমন সাংঘাতিক ধরণে প্রাণ ধড়্‌ফড়্‌ করেছিল, আর কেমন করেই যে সে-খবর তোমার প্রাণে এসে পৌঁছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কেনই যে তার জন্যে অমনভাবে তোমার মাথা টন্‌ টন্‌ করে উঠেছিল, সে সব কি আর আমার বুঝ্‌তে বাকী থাকত?—মানুষ হলে, তখনি আমি সমস্ত পরিষ্কারভাবে বুঝ্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু আমি ত মানুষ নই আমি জানোয়ার, তাই—" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলা বলিয়া, শেষের কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া—অন্য দিকে সরিয়া গিয়া সে গুটি-সুটি মারিয়া শুইল।

আহমদ্-সাহেব বুঝিলেন, তুফানী-বাঁদীর মারফৎ সমস্ত ব্যাপার ফাঁশ হইয়া গিয়াছে!—অন্য-ত্রুটি ক্ষালনের জন্য তর্ক বা প্রতিবাদ না করিয়া তিনি নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য,—সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজখানা তুলিয়া চোখের সাম্‌নে ধরিয়া পরম মনোযোগ সহকারে দেখিতেও ভুলিলেন না।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিঃশব্দেই কাটিল। তার পর আহমদ্-সাহেব একটু নড়িয়া-চড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "আমিনা ঘুম পেয়েছে কি?—"

আমিনা একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আহমদ্‌-সাহেব খবরের কাগজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পুনশ্চ বলিলেন "খবরের কাগজে কতকগুলো মজার খবর বেরিয়েছে। প'ড়ব—শুনবে ?"

মুখের উপর কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া আমিনা অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল—"হুঁ, ঘরের মজা নিয়েই অতিষ্ঠ হয়ে আছি, আর খবরের কাগজের মজায় কাজ নাই"

বাধা দিয়া স্বামী আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"আহা নো না—"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া আমিনা বলিল "না আমি শুনব না,—" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমিনার—এতক্ষণকার তর্কনিরস্ত রসনা মহাশয়ের, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সব টলমল করিয়া উঠিল! হঠাৎ মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—"আচ্ছা দাদার কাছে আজ দুপুর বেলা সব কুটুর-কুটুর করা হয়েছে তো ?—"

স্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন "কুটুর-কুটুর ?' আমায় ইঁদুর ঠাউরে বস্‌লে না কি ?—"

শুইয়া শুইয়া আরাম উপভোগ করিতে করিতে ঝগড়া করিলে ঝগড়ার মান-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে ? কাজেই আমিনা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর দিল "না, পয়গম্বর তুমি! বল না সোজা করে,—দাদার কাছে একদিনের সমস্ত খবরগুলি লাগিয়েছ ত ?—"

স্বামীর মুখে দুষ্ট কৌতুকের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাগজ ফেলিয়া কুনুইয়ের উপর ভর দিয় একটু উচুঁ হইয়া নরম সুরে বলিলেন "কি লাগাব ?—আবলু কদিন বাড়ী ছিল না তাই অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে আবলুর স্ত্রীকে আমিনা দখল করে বসেছিল ?—"

ফোঁস করিয়া আমিনা বলিল "দ্যাখো, আবার !—"

হতবুদ্ধির ভাণ করিয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "তবে ? তবে কি লাগাব যে, আমার ওপর রাগ করে আমিনা ঘরে ঢুকত না, তাস নিয়ে তাদের তেতলার নিভৃত দফতরখানায় যেত এবং অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য ঘুঁটে ঠুক্‌ত বাসন মাজ্‌ত,—ভিস্তিনী ঝাড়ুদারণী—ইত্যাদি—

ঘর্ম্মাক্ত মুখে আমিনা বলিল "কে বল্লে তোমায় এত কথা বল তো ? নিশ্চয় রস্তম লক্ষ্মীছাড়া ! নয় ?"—

ঔদাস্যের সহিত আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "তা সে যেই বলুক, অবশ্য কথাগুলা যে খুব খাঁটি সত্য, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহলেও ভদ্রলোক আবদুল মিঞা এমন বেয়াদব Inquisitive নয় যে পরের পারিবারিক-তত্ত্ব অন্বেষণে সেই ঠিক্‌-দুপুরের রোদে আমার কাছে ছুটে আস্‌বে, সে এসেছিল বৈষয়িক ব্যাপারের সম্বন্ধে কথা কইতে!"

সন্দিগ্ধভাবে আমিনা বলিল "আমার সম্বন্ধে কোন কথাই দাদাকে বল নি ?—"

আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "কিছু না, বিশ্বাস না হয় বল এখনি আবলুকে ডেকে তোমার সাম্‌নেই—"

ব্যস্ত হইয়া আমিনা বলিল "দ্যাখো, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি—"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "ঐ নাও! আমায় অকারণে সন্দেহ কর্‌বে, অথচ আমি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী সাফাইয়ের নামোল্লেখ কর্‌লেই, চক্ষু চড়কগাছ বানিয়ে বসবে, এত মন্দ মজা নয় !—"

আমিনা বলিল "হুঁ! কত বড় ভাল মানুষ তুমি! তুমি যতই সাক্ষী পয়দা কর, আমি তোমায় এক চুলও বিশ্বাস করি না!—সাধে তোমার ওপর রাগ হয়?"

বাধা দিয়া আহমদ্-সাহেব সোৎসাহে "হোক্ হোক্ আরো হোক্—আরো হোক্! মেহেরবানী করে বল আর আমায় কি কর্‌তে হবে, কিসে তোমার ক্রোধ-রিপুর আরো শ্রীবৃদ্ধ সাধন হবে—"

আমিনা ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে দুই মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল "অবাক্ কর্‌লে, উঃ! কি ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি? আচ্ছা কাল দুপুরবেলা প্রতিজ্ঞা করেছ না, যে আর কখনো আমার সঙ্গে লাগ্‌বে না? এখনো যে দু রাত্রি পোয়ায় নি! কি ঘৃণা! ছিঃ!—"

স্বামীর রঙ্গভরে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বলিলেন "আচ্ছি বাৎ!—অতঃপর?—"

রাগিয়া আমিনা বলিল "ঝক্‌মারী আমার! ফের যদি তোমার সঙ্গে কই— তবে—",

ক্ষিপ্রহস্তে আমিনার মুখ চাহিয়া ধরিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "হাঁ হাঁ, ওটা ঐ-পর্য্যন্ত থাক, আর নয় আমিনা, মাফ কর—"

কিন্তু আমিনা মাফ করিবে কি, তাহার অন্তরাত্মা তখন শোচনীয় দুঃখে ম্রিয়মান! আহমদ্-সাহেব যে ওহায়েদের সহিত পরামর্শ করিয়া—আমিনার পরম প্রিয়পাত্রী, তুফানীর ভবিষ্যত মাটি করিয়া দিলেন, সে মনস্তাপ আমিনা রাখে কোথায়? কাজেই উপযুক্ত প্রসঙ্গটা লইয়া সে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামীর সহিত বাদানুবাদ করিয়া শেষে গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিল—"এবার আমার দুর্দ্দশা কি হবে বল দেখি? যে দিন তুফানীকে আমার দরকার হবে সে দিন—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "অবশ্যই তাকে পাবে, ওহায়েদ আমার দুরন্ত চাকর—সে ইসারায় কাজ বোঝে! দেখেছ ত রাত বিরাতে কল এসেছে, আমি তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গেছি, কিন্তু ওহায়েদ হুঁসিয়ার!—আমি নীচে নাম্‌তে না নাম্‌তে স্ত্রীকে ওপরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে,—

ঘাড় নাড়িয়া আমিনা বলিল "সে আলাদা কথা,—সে যে তোমার গরজ!—কিন্তু যে দিন আমার গরজ পড়্‌বে,—তোমার সঙ্গে যে দিন ঝগড়া হবে সে দিন আমি একলাটি কেমন করে—"

হা হা করিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন "কোই হরজ নেই,—যে দিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি 'একলাটী' হয়ে পড়বে, সে দিন তোমার দোসর যোগাড় করে দেবার জন্য দায়ী রইলাম, আমি!"

আমিনা সকোপে বলিল "আহা!"

ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

পূজারিণী।

—:*:—

সেবার যখন মহামারীর করাল গ্রাসে পড়ি
ঘরে ঘরে ছেলে বুড় যাচ্ছে গড়াগড়ি
পরলোকের শমন এল জোর
বৃদ্ধ পুরোহিতের ভাগ্যে হ'ল না রাত ভোর।
অসময়ে মুখের কথা বন্ধ ক'রে
এই জগতের অন্তরালে কোথায় গেল সরে।
আর কোন ত ক্ষোভ ছিল না মনে
কেটেছিল সকল বাঁধন ইহলোকের সনে,
ঘরে শুধু ঠাকুর ছিলেন, ছিল পূজার ভার,
আর ছিল তাঁর একটি দুহিতার
সুব্যবস্থা করতে বাকি,
মৃত্যু যবনিকা যখন পড়্‌ল জীবন ঢাকি'!

শোকে অধীর বালা
—এখনো যে জ্বল্‌ছে বুকে স্বামীর মৃত্যুজ্বালা
দারুণ হুহু রোলে;
স্বামীহারার একটি বাঁধন পিতা গেলেন চলে।
শিশুকালে মাতৃহারা
পিতার স্নেহে মুছেছিল দুই নয়নের ধারা
খুঁটি নাটি কাজে,
ভুলেছিল সকল অভাব তাঁরি বুকের মাঝে!
যতই মনে পড়ে সে সব কথা
উথ্‌লে ওঠে চাপা বুকের ব্যথা
দুটি চোখে অশ্রু নাহি বাঁধন মানে
তাহারি মাঝখানে

পড়্‌ল মনে যে নারায়ণশিলা আছেন ঘরে
কে তবে আজ তাঁহার পূজা করে ?
শ্যামা বলে "ঠাকুর তুমি তবে
অভাগিনীর দুঃখে কি আজ উপোসী হ'য়ে রবে ?"

মৃতদেহ বিদায় হ'লে মুছে নয়ন ধারা
পাগল পারা
শ্যামা এবার ছুট্‌ল যত বামুন ঘরে ঘরে
সবার কাছে এই মিনতি করে,—
"ঠাকুর ঘরে আছেন উপবাসী
মহাপাতক হ'তে মোরে বাঁচাও কেহ আসি !"
কেউ এল না শুনে
নানারকম ছুতনাতা তুল্‌ল বুনে বুনে।
ও পাড়ার ঐ ভট্‌চার্য্যির ছেলে
এ কাজ নিতে পার্‌ত অবহেলে,
আসল কথা সবাই জানে শ্যামার ঘরে নাইক কড়ি
তাতে আবার সারাজীবন থাক্‌তে হবে পড়ি
কঠিন শুদ্ধাচারে,
ক'টা মানুষ এমন ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে পারে ?

আবার শ্যামা ফির্‌ল ঘরে
যুক্ত দৃঢ় করে
বল্‌লে "ঠাকুর মনে বড়ই পেয়েছি আজ ক্ষোভ
তোমার পূজার বেশী যারা করে টাকার লোভ
তারাই পূজার অধিকারী,
অশুদ্ধ কি হ'ল কেবল সাধ্বী সতী নারী ?
সইব না ত আর
এমন ভ্রান্ত মিথ্যা লোকাচার !"

তবু তাহার মনের কোণে শঙ্কা কেন আসে
জানি না সে কোন্ ঠাকুরের দারুণ পরিহাসে
ক্রমে ক্রমে সব গিয়েছে তার
কে বল্‌বে যে এই কাজেতে ইচ্ছা কি তাঁহার !
কোশাকুশি নিয়ে তবে স্বরু হ'ল ঘণ্টা নাড়া
তবু কেন প্রাণ দিল না সাড়া
তবু কেন থাম্‌ল নাক' বুকের কাঁপুনি যে
ভেবে না পায় নিজে !

এদিকে ত উঠ্‌ল মহারোল
বিষম গণ্ডগোল,
নারায়ণের পূজা কবে করেছে কোন্ নারী ?
তবে কেন বুঝ্‌তে নাহি পারি
ঠাকুর তুলে নেন্ সে পূজাভার,
—রহস্য তাঁহার !

এমনি ক'রে কিছু দিনে থাম্‌ল কোলাহল
ক'রে নানান্ ছল
সবাই আসে তাহার ঘরে
মুখে যাহাই বলুক্ মনে শ্রদ্ধা যেন করে !
শ্যামা ভাবে আপন মনে কি হ'ল যে তার
যারা কভু চাইত নাক' ভুলে একটিবার
তাহার পানে
আজ্ যে কিসের টানে
প্রণাম ক'রে এসে দাঁড়ায় সবে
ভালমন্দ বার্ত্তা নেবার দরদ এল কবে।
ভাল নাহি লাগে ঐ সম্মান
আপন মনে দিবারাতি কাঁদে শ্যামার প্রাণ
কোথায় গেল সে দিনগুলি
বহে গেছে দুঃখসুখের হাজার লহর তুলি',

ছিল না এই বাঁধাবাঁধি
প্রতিবেশীর দুঃখে শোকে উঠ্‌ত হিয়া কাঁদি',
ছুট্‌ত যবে তাদের ঘরে বস্‌ত গিয়ে পাশে
আজ্ সে কথা ভাবে শুধু আকুল দীর্ঘশ্বাসে।
যোড় হাতে সে কয়—
"ঠাকুর তুমি এ কোন্ খেলা খেল্‌ছ লীলাময়,
বস্‌তে জুড়ে বুক
হতভাগীর ভাগ্যে বুঝি সইল না সে সুখ ?
পাই না কেন প্রাণে সাড়া
দাসীরে কি কর্‌লে চরণছাড়া ?"

ক্রমে ক্রমে বছর গত মন বসেছে কাজে
তবু কেন সন্দেহ যে আসে বুকের মাঝে—
করে নাড়া চাড়া,
জগতে কি নেইক পূজা ইহার চেয়ে বাড়া ?
ভক্তি শুধু বদ্ধ রবে শুদ্ধ দেবালয়ে
বাহির নাহি হ'বে জগৎজয়ে ?
বিচার ক'রে চল্‌বে পলে পলে
সকল জাতির পুণ্যতীর্থজলে
শুদ্ধ হ'য়ে গড়িয়ে সেকি পড়্‌বে নাক' প্রেমে ?
শশীরকর-লেখার মত ধরার বুকে নেমে ?

আবার সুরু কর্‌লে যাওয়া আসা
দুঃখে সুখে ভালবাসা
দুঃখী আতুর জনে;
নিন্দা অপবাদের শঙ্কা রাখ্‌লে না আর মনে।

মল্লিকা সে ভ্রষ্টা-নারী,
শ্যামা শুধু শুন্‌লে কাণে অসুখ বড় তারি
ভরসা কিছু নেই বাঁচিবার গিয়েছে সব ধন,
কোথায় বদ্যি, কোথায় পথ্যি, কোথায় আত্মজন !

তখনি সে জুট্‌ল সেথা গিয়ে,
ব্যাপার কি এ—
অভাগিনীর বুকের বোঝা একটিমাত্র ছেলে
কোথায় যাবে ফেলে !
হতজ্ঞানে ঐ চেতনা রয়েছে জাগরূক
বেশী ক'রে ভাঙ্‌ছে ভাঙ্গাবুক !
মৃত্যুছায়াবিবর্ণ সে চেয়ে মায়ের পানে
ত্রাস জেগেছে শিশুর প্রাণে,
ফুঁপিয়ে কেঁদে ধর্‌ল গলা শ্যামার বুকে এসে,
অশ্রু জলে শ্যামার হৃদয় আপনি গেল ভেসে।
মল্লিকা তার হাতের মাঝে ধ'রে শ্যামার
বল্লে কথা দুটি
"দিদি গো আজ আমার জন্মশোধ
একটিমাত্র এই অনুরোধ,—
চরণ হাতে দিও না আর ঠেলে,
তোমার পুণ্যে তরে' যাবে এই অভ.গীর ছেলে!"

মল্লিকারে নিয়ে গেল শ্মশান ঘাটে
যে পথ গেছে বহু দূরের মাঠে
সে পথ দিয়ে চল্‌ল শ্যামা ঘরে
মাতৃহারা শিশুটিকে চেপে বুকের 'পরে।

কিন্তু এ আর রইল নাত চেপে
লোকের মুখে মুখে আরো উঠ্‌ল ফুলে ফেঁপে,
মুচি কিম্বা হাড়ির ছেলে হ'বে,
পুষ্যি-ছেলে পূজারিণীর কেউ শুনেছে কবে ?
তারে নিয়ে ছি ছি পালন-করা,
পাপের ভারে ডুব্‌ল বুঝি ধরা !
ঢের সয়েছে তার
তা' বলে কি গ্রামের মাঝে সইতে হ'বে এমন অনাচার !

ধর্ম্মে যারা চাঁই
সবাই মিলে বল্‌লে শ্যামায় আজ তাড়ানো চাই !
মিঠেকড়া যুক্তি শেষে হ'ল এই
প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া উপায় নেই,
ছেলে ছাড়ুক আজ,
নয় ত ছাড়ুক্ ঠাকুর-পূজ নিয়ে তাঁহার অভিশাপের বাজ !

ক্ষণকালের জন্য যেন শ্যামার চোখে নিভ্‌ল দিনের আলো
কোন্‌টা মন্দ কোন্‌টা ভাল
বুঝ্‌তে নাহি পারে,
ছেলের মুখে চেয়ে আবার বক্ষ ভেসে গেল অশ্রুধারে !
ভাব্‌লে মনে হেসে
এত ব্যাথার ব্যথী হয়ে এই ব্যথাতে বিকল হ'ব শেষে ?
এখনো ত যাই নি ভুলে মনে,
মল্লিকা যে ইচ্ছাটিরে জানিয়ে গেল সঙ্গোপনে !
এখনো ত যাই নি ভুলে পিতার উপদেশে
দিয়েছিলেন কতই স্নেহে কতই ভালবেসে !
এখনো ত যাই নি ভুলে কি যে গভীর স্নেহে
মরা মায়ের স্তন্য আজো বইছে সারা দেহে !

রইল না আর দ্বিধা কিছু,
ভাব্‌লে নাক' উপায় আগুপিছু
বেরিয়ে প'ল দিন দুপুরে পথের মধ্যিখানে
হাজার সুরে আস্‌তে শুধু লাগ্‌ল তাহার কাণে
পাপীষ্ঠা সে ভ্রষ্টা-নারী ;
—চোখে তাহার আনন্দাশ্রু বারি
বুকের মাঝে ঠেলে ওঠে মাতৃস্নেহ-ধারা,
মা পেয়েছে শিশু মাতৃহারা !

বিবাহের পণ।

—:*:—

(প্রতিবাদ)

অগ্রহায়ণের 'পরিচারিকা'য় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় লিখিত 'বিবাহ ও বিবাহের পণ' শীর্ষক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে প্রবীণ লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। স্ত্রীপুরুষের যৌন-মিলন ভগবানের অভিপ্রেত এবং তাহা কেবল বৈধ-বিবাহদ্বারাই সাধিত হইতে পারে। সকল দেশে সকল সময়ে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং আমাদের দেশে ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার এমন কি ধর্ম্মসাধনের উপায়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। পুরুষ বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবে এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিবে, ইহাই আমাদের ধর্ম্মের অনুশাসন; এবং ইহা হিন্দুসমাজ চিরকাল পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর ভাবরাজ্যে এক বিপুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে আমাদের অধিকাংশ সামাজিক প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী-পরিবার প্রায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে,—কতকটা এই ভাবসংঘাতে, কতকটা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহারই ফলে, ভদ্রসমাজে পুরুষের বাল্যবিবাহ রহিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ভাবনা একান্নবর্ত্তী-পরিবারভুক্ত পুরুষকে কিংবা তাহার অভিভাবককে কখনই বড় পীড়িত করিত না। সুতরাং পঞ্চদশ কি ষোড়শবর্ষ বয়স্ক বালকের বিবাহের পথে বিশেষ কোন বাধাই ছিল না। কারণ তাহার যে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র সংসার হইতে পারে, যাহার ভার তাহাকে নিজেকেই বহন করিতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা তখন বড় ছিল না। সে ভার একান্নবর্ত্তী পরিবার গ্রহণ করিত। অন্নবস্ত্রের অভাব তখন এরূপ ছিল না, এবং আধুনিক বিলাসিতা নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করে নাই গৃহে গৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্য,—স্বাস্থ্য ও শান্তি বিরাজ করিত।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। একদিকে যেমন নানা কারণে দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইতেছে, বৃহৎ পরিবার পালন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার শিক্ষিত যুবক নব শিক্ষার প্রভাবে পিতা ভ্রাতা কি অপর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং যতদিন না সে উপার্জ্জনক্ষম হয় ততদিন সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অভিভাবকও তাহার এই মতের পোষকতা করেন। ফলে তাহার বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই নূতন অবস্থার আরও একটি ফল এই হইল যে বিবাহক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর পাত্রের উদ্ভব হইল। যাহারা সুশিক্ষিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম, কিংবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র তাহারা স্বভাবতঃই সুপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল আর যাহারা মূর্খ অতএব (সাধারণতঃ) অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম কিংবা দরিদ্র বা অসচ্চরিত্র এইরূপ কুপাত্রের সংখ্যাও কম হইল না। এইরূপ প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল না। তখন লোকে বর দেখিয়া কন্যাদান করিত না, ঘর দেখিয়া করিত। বালক বর বিদ্বান কি মূর্খ, চরিত্রবান্ কি অসচ্চরিত্র এরূপ কথা উঠিতই না; কারণ পনের ষোল বৎসর বয়সে বালকের চরিত্রও গঠিত হয় না, শিক্ষাও নামে মাত্র হয়। ঘরে মিলিলেই তখন বিবাহ হইয়া যাইত। কৌলীন্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

পুরুষের বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেল বটে; কিন্তু কন্যাদের বিবাহ এখনও বার কি তের বৎসরের মধ্যে সমাধা করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের পিতারা বদ্ধপরিকর। এ-বয়সে বালিকাদের সুশিক্ষিতা ও কলাভিজ্ঞা (accomplished) হওয়া ত দূরের কথা, তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্যও সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, যেটুকু শিক্ষাও এই বয়সের মধ্যে সম্ভব তাহাও সাধারণতঃ বালিকাদিগকে দেওয়া হয় না। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে যদিও বিবাহার্থী যুবকদের মধ্যে শিক্ষাদির তারতম্য অনুসারে বেশ একটা সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, কিন্তু তথাকথিত বিবাহযোগ্যা বালিকাদের মধ্যে বংশ ও রূপ ব্যতীত আর কিছুই পরস্পর পার্থক্যের কারণ থাকিতেছে না। যদি তাহারা সুশিক্ষিতা ও গুণবতী হইত এবং যৌবনের রূপলাবণ্যে ভূষিতা হইলে তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও একটা ভালমন্দের সুনির্দ্দিষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি হইত। তাহা হইলে হয় ত আধুনিক পণপ্রথা ভিন্ন আকার ধারণ করিত। ইহা যে একেবারে থাকিত না তাহা বলা যায় না। কারণ সকলেই সুপাত্রে স্ব স্ব কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সুপাত্রের সংখ্যা খুব বেশী নহে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে পাত্র সম্বন্ধে একটা প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য। ইহাই আধুনিক পণপ্রথার প্রধান কারণ। ইহার উপর যদি কন্যার রূপ ও বংশগৌরব না থাকে তাহা হইলেও সৎপাত্রকামী পিতাকে অর্থালঙ্কারের প্রলোভন দেখাইতে হয়।

এইরূপে কন্যাপক্ষই পণপ্রথার আশ্রয় দিতেছেন। বরপক্ষও পণগ্রহণটিকে বরের মর্য্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই জন্যই দেখা যায় আভিজাত্যগর্ব্বিত ধনীদের মধ্যে পণের পরিমাণ অতিরিক্ত মাত্রায় বেশী। আমাদের আড়ম্বরপ্রিয়তাও এই প্রথাটাকে নিষ্ঠুর ও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। জাঁকজমক না করিলে আমরা তৃপ্ত হই না। অথচ ইহার জন্য নিজে খরচ করিতে, হয় দারিদ্র বশতঃ অক্ষম, নয় স্বচ্ছলতা স্বত্ত্বেও কুণ্ঠিত; সুতরাং কন্যাপক্ষের-অর্থশোষণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বীরেশ্বরবাবু বলেন, 'বরপণ দ্বারা বিবাহের অপব্যয় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।' এ কথা কন্যাপক্ষে সত্য হইতে পারে, কিন্তু বরপক্ষের দিক হইতে সত্য নহে। বাজীপোড়ান এখন ফ্যাসান নহে বলিয়া উঠিয়া গিয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ অপব্যয় আসিয়াছে। বাইনাচ নৈতিক কারণে ও রুচির পরিবর্ত্তন বশতঃ বিবাহের উৎসবসভা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্থলে শোভাযাত্রা প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই আধুনিক বরপণের কারণ বোঝা যাইবে। কিন্তু বীরেশ্বর বাবু এক অদ্ভুত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক পুরুষের হাতে কিছু অর্থ থাকা উচিত। সেই অর্থ যুবকেরা সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই পণ দিতে হয়।' সুতরাং 'বরপণ প্রথার সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলময় ফল এই যে নবপরিণীত দম্পতী সংসারে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে কিছু টাকা পায়।' এই মত সত্য হইলে, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে কখনও পণের দাবী করিত না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় এই শ্রেণীর বরকর্ত্তারই 'খাঁই' সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ছেলে ভাল হইলে ত কথাই নাই। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র বরও বিবাহে যাহা কিছু পণ পায় তাহা প্রায় সমস্তই (অবশ্য বধূর অলঙ্কার ব্যতীত) বিবাহের সময়েই খরচ হইয়া যায়। একথা বীরেশ্বর বাবুই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন, 'বিবাহ যখন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তখন যেপক্ষ সেই ব্যাপারের প্রধান এবং প্রথম উদ্যোগী তাঁহারাই অগত্যা পণরূপে সেই ব্যয় বহন করেন।' তাহা হইলে আর পণপ্রথার 'মঙ্গলময় ফলের' অস্তিত্ব থাকে কোথায়? 'শিক্ষিতবর' যদি পত্নীকে 'মহিলার মত সসম্মানে রাখিতে ইচ্ছা' করেন (এবং

ভদ্র পরিবারে প্রত্যেক বরেরই ইহাই কর্ত্তব্য), তাহা হইলে তিনি কি বিবাহেলব্ধ পণের অর্থ হইতে এই ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন? তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে পণের টাকা বিবাহে সমস্ত ব্যয়িত না হইয়া বরের বা তাহার অভিভাবকের হস্তে থাকে, তাহা হইলেও সেই অর্থের পরিমাণ কত এবং কতদিনইবা তদ্দ্বারা পত্নীকে 'মহিলার মত' রাখা যায়? স্বামী নিজে কৃতী না হইলে স্ত্রীকে সসম্মানে রাখিবে কি করিয়া?

যদি পণের অর্থ বরপক্ষকে না দিয়া কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহা স্ত্রীধনরূপে কন্যার নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন এই দরিদ্র দেশে এই প্রথার কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বীরেশ্বর বাবু যতই কেন ইহাকে একটা 'শুভ অনুষ্ঠান' বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করুন না, ইহা সমাজে অশুভ ব্যতীত কোন শুভ ফল আনয়ন করিতেছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

কিরূপে এই অকল্যাণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারে তাহা সহজে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। বীরেশ্বর বাবু বলেন, যে একমাত্র উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে;—তাহা হইতেছে এই, 'কন্যাপক্ষীয়েরা যেন বর অন্বেষণ না করেন।' এই উপদেশ অনুসৃত হইলে বরপণ কমিতে পারে, কিন্তু অনেক কুমারীর ভাগ্যেই যে বরলাভ ঘটিয়া উঠিবে না তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য সমাজেও কন্যার বিবাহের জন্য অনেক মাতাকে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বরশিকারের চেষ্টা করিতে হয়। বার্ণার্ড শ (Bernard Shaw) তাঁহার 'Getting Married' নামক নাটকের ভূমিকায় এ কথা সকলকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—The daughters of women who cannot bring themselves to devote several years of their lives to the pursuit of son-in-law often have to expiate their mathers' squeamishness by life-long celebacy and indigence. অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোক জামাতা সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট ব্যয় না করে তাহাদের কন্যারা চিরকুমারী থাকিয়া দুঃখে ও দারিদ্র্যে তাহাদের জননীদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। পাশ্চাত্য-সমাজেই যখন এই অবস্থা তখন বরপণ নিবারণ চেষ্টায় উক্ত পন্থা অবলম্বনে যে বিশেষ সুফল লাভের আশা নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে নারীর স্বাধীনভাবে জীবননির্ব্বাহের সম্ভাবনা খুব কম, এবং পিতা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের উপরও তাহার নির্ভর করা বোধহয় বেশীদিন চলে না; সুতরাং বিবাহ তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। শুধু জীবিকার জন্য নহে, জীবনের একটা অবলম্বনের জন্যও হিন্দু নারীর বিবাহের প্রয়োজন। সাধারণ হিন্দুরমণী বহির্জগতের বড় ধার ধারে না। তাহাদের সম্বন্ধে রাণী লুইসার উক্তি বিশেষরূপে সত্য—'The children's world, that is world enough for me' —শিশুদের জগৎই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

অতএব যাহাতে তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা কমিয়া যায় এরূপ কিছু করা উচিত নয়। আমি উচ্চশিক্ষিতা স্বাবলম্বনক্ষমা মহিলাদের কথা বলিতেছি না। সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের কথাই বলিতেছি।

একটা পরিবর্ত্তন সমাজে আসিয়াছে— তা সে পণপ্রথার ফলেই হউক কিম্বা পাশ্চাত্যভাব ও আদর্শের সংঘর্ষেই হউক। তাহা এই যে, এখন আর মেয়েদের যৌবনবিবাহে হিন্দুসমাজ কোন আপত্তি করে না। পূর্ব্বে কাহারও গৃহে দশ বৎসরের বেশী বয়সের কন্যা অনূঢ়া থাকিলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইত। এখন প্রায় ঘরে ঘরেই পনের ষোল বৎসরের যুবতী কন্যা বিরাজমানা। বরপক্ষও এরূপ কন্যা গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব বয়স্থা কন্যাদের প্রায়ই কোনরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। আমরা যদি সকলে মিলিয়া মেয়েদের বারো তেরো বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুশিক্ষিতা ও সদ্‌গুণশালিনী করিয়া পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি, তাহা হইলে একদিকে স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা যেমন সমাজে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। অপরদিকে তেমনই আবার পণপ্রথার ভীষণতাও কমিয়া যাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

বরুণ।

—(-*-)—

হে বরিষ্ঠ হে বিরাট হে বরাঙ্গ বারীন্দ্র বরুণ
দাও দৃষ্টি বিশ্বপরে স্নিগ্ধ শান্ত সস্নেহ করুণ।
তোমার বিরাট দেহে নদ নদী শিরা উপশিরা
বহিতেছে রসধারা এ বিশ্বের বারুণী মদিরা।
সঞ্জীবিত উদ্দীপিত এ নিখিল তব কৃপা-রসে,
হে রসবিধাতা দেব বিশ্ব তব পিপাসায় শ্বসে
ঢাল' ঢাল' আশীর্ব্বাদ গিরিশৃঙ্গ ভাঙিয়া চূরিয়া
প্রপাত নির্ঝর ধারে নিখিলের আর্ত্ততা হরিয়া।

বিদ্যুৎ ভ্রূভঙ্গি তব, ঘনদল তব কেশ-পাশ,
ধূসরে শ্যামলকরে সঞ্জীবন তোমার নিশ্বাস।
বিক্ষোভিত বীচিকুল আন্দোলনে তোমার স্পন্দন
আনিছে বিভবরাশি বিশ্বতটে লুটিয়া নন্দন
কণ্ঠে দুলে মীন-মাল্য নক্রকুল ঘোষে জয়ধ্বনি,
তিমিঙ্গিল রক্ষা করে সুগহন তব রত্ন-খনি।
পদ্মাসন রচে তব হংসকুল ভাস্কর ধবল
কম্বুনাদে অম্বুবালা ঘন-ঘন সঞ্চারে মঙ্গল।
তোমার প্রসন্ন হাস্য কুবলয়ে কুমুদে কহ্লারে
ফুঠে উঠে হ্রদে হ্রদে শতহ্রদা-প্রকাশে মল্লারে।

মরুদ্বর্গ করে সেবা শৈবালের চামর ঢুলায়ে
বিনতা নন্দন সেবে সুকোমল পক্ষাগ্র বুলায়ে
পুষ্কর ধরেছে ছত্র জলস্তম্ভে; সায়াহ্ন স্বপনে
আবর্ত্তক হস্তে উড়ে জয়ধ্বজা প্রতীচীর কোণে।
লাবণ্য অমৃত ধারে তৃপ্ত কর বিশ্ব প্রজাকুল
হে প্রচেতা চেতস্বান্ কর মোরে তব পূজাফুল।

হে বদান্য মুক্তহস্ত বিধাতার দানের সচিব,
রাখ শুষ্ক বিশ্বপরে তব সৌম্য চরণ রাজীব।
তোমার প্রবাল গৃহে ইন্দিরার শৈশব উৎসব
লাজ-বৃষ্টি সম তুমি ছড়াইছ মৌক্তিক বৈভব।
পারিজাত সুধাভাণ্ড দেহ তুমি দেবতামণ্ডলে
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে দেছ তুমি দেব আখণ্ডলে
ত্রিভুবনে আহ্লাদিতে দেছ তুমি চন্দ্রিকা কৌতুক
উপেন্দ্রে দিয়াছ তুমি রমা সহ কৌস্তুভ যৌতুক।
তাহাদের পুত্রগণে মুষ্টিভিক্ষা দেহ মাতামহ
হর' তুমি স্নেহস্পর্শে তাহাদের যাতনা দুঃসহ।
স্রোতে স্রোতে তত্ত্ব লও পাঠাইয়া বারতা তোমার
পোতে পোতে ভরে দাও আশীর্ব্বাদ পণ্যের সম্ভার,
তটে তটে অন্নসত্র খুল তুমি অকুণ্ঠিত স্নেহে
ঘটে ঘটে জীবরস পাঠাইয়া দাও গেহে গেহে,
কূপে কূপে পাঠাইয়া অনাবিল শীতল যতন
চুপে চুপে রক্ষা কর সৃষ্টি তব হে জীব জীবন,
নদে নদে গদ্‌-গদ্ তব প্রেম আশ্বাস সান্ত্বনা
হ্রদে হ্রদে পদ্মগন্ধে দূর কর দাহের যন্ত্রণা,
ডুবে ডুবে মীন সব খুঁজে তব অভয় চরণ
চির শুভে মুঠে মুঠে আনি মোরা করিয়া হরণ।

প্রণমি যাদসাংপতি, নমি তব রুদ্র রূপ পায়,—
শিব রূপে শুভ দাও ধ্রুব দাও তব রুদ্রতায়।
হুঙ্কারে রথের চক্র, তব হস্তে ভীম নাগপাশ
বন্যার প্লাবনে বুঝি বিশ্বভূমি করে ঐ গ্রাস।

ভেঙে চুরে অনিত্যের আয়োজন দুর্ম্মদ উন্মাদে
উদ্যান অটবী ক্ষেত্র গিরিদরী পুর জনপদে
খণ্ডপ্রলয়ের মত খণ্ড খণ্ড করি বিশ্বলালা
করে। বিশ্বে সমভূমি গলাইয়া হিমাদ্রির শিলা
ঐ মহাকাল মূর্ত্তি, মোরা জলপ্লাবনের 'পরে
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম ভাসি ডুবি কাঁপি থর থরে।
তব দিগ্‌গজ শিরে অস্তগামী সূর্য্যের সংঘাতে
ধবক ধবক গজমুক্তা পিঙ্গবর্ণ অনল সম্পাতে
দেখায় ভীষণ লীলা। ঔর্ববহ্নি দাউ দাউ জ্বলে
স্বর্ণদ্বীপ মণিগৃহ, জতুগৃহ সম যায় গলে।
সিন্ধুগর্ভ শৈল শৃঙ্গ একাকার ও-পদ পরশে
বারুণী প্রমত্ত রক্ত চক্ষুর্দীপ্তি আত্মাকোষে পশে।
এই ভীম মূর্ত্তিমাঝে আছে তব গোপন আশ্বাস,
এ মূর্ত্তি হেরিয়া তব শেষে দৈত্য পেয়েছে তরাস।
এই মূর্ত্তি ধরে' তুমি চূর্ণ কর সকল জীর্ণতা
ওঙ্কারে ঘোষিত করি নব নব জীবন বারতা।
এই মূর্ত্তি ধরি তুমি ব্যোমপথে করেছ প্রেরণ
স্বর্গ মর্ত্ত্যে দেবনরে যাহা চির মধুরমিলন
ধ্রুব জননীর যাহা চিরন্তন শাশ্বত স্বরূপ
বেদের অনলবাণী। ধ্রুবগর্ভ প্রলয়ের ভূপ!
এ মূর্ত্তিতে হেরি তব বিশ্বগ্রাসা বিভীষিকা মাঝে
ধ্রুবের অমৃতবাণী যুগান্তায়ে ঘনারাবে বাজে।
তব ভৈরবতা মাঝে প্রজাপতি আনাসাগ্র ডুবে
"সম্বর সম্বর রূপ শান্ত হও" যাচিছে ত্রিস্টুভে।
যুগে যুগে সংসারের এ ভীষণ প্রলয় প্রকাশে
ভাস্বর করিয়া দাও জ্ঞাননেত্রে ধ্রুবের আভাষে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মেঘমুক্ত।

—ঃ❀ঃ—

সংসারটা তার কিছুতেই ভাল লাগ্‌ছিল না। কি যেন একটা হয়ে গিয়েছে। কি,—কেন,—কার অপরাধে? সে প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না! সে ত জ্ঞানবুদ্ধিতে কখনও ইষ্ট বিনে কারো অনিষ্ট করে নি,—তবে কেন তার এ শেষ বয়সে এত পরিতাপ! জীবনটায় সে কখন দুঃখকে আমল দেয় নি, দিতে হ'ল কি না সেই এই বয়সে। গরীব গয়লার ছেলে; গরীবভাবেই সে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিল, তাতে আবার দুঃখ কি! যৌবনে সে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছে, বহু পরিশ্রমে—তাতে সুখই ছিল—দুঃখ কোথা? শরীরখানাও ছিল তার তেম্‌নি, হৃষ্টপুষ্ট,—যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়—কষ্টি পাথরের চক্‌চকে একটা পাহাড়ের মত। পরিশ্রমের শরীর,—প্রতি অঙ্গ পুষ্ট-সুন্দর,—যেন স্থপতির গড়া, পাথরে খোদা নিখুঁৎ মূর্ত্তি! বৃদ্ধ বয়সেও যখন সে অনায়াসে, কাঁধে পূরা এক মণি দুধের ভার নিয়ে, বাহু দুলাতে দুলাতে অবাধ গতিতে ছুটে চল্‌ত, বাহুবক্ষপৃষ্ঠের মাংসপেশী তার দেহগতির ছন্দ অনুবন্ধে, তালে তালে উঠানামা করত, দর্শক তখন মনে মনে না বলে পার্‌ত না,—'হাঁ, একখানা চেহারার মত চেহারা বটে!' কেবল চেহারার জন্য সে সর্ব্বজনপরিচিত ছিল না, যে তাকে দেখে নি, সেও তার নাম শুনেছে, তার সাহসের কথা গর্ব্বের,—গল্পের বিষয় ছিল,—এক-জীবনে উন্নতির উদাহরণ দিতে হ'লেই তার নামটা সবার আগে উঠ্‌ত; কোন মতে মাথা-লুকাবার-মত কুঁড়ে ঘরকে একদম পাকা ইমারতে পরিণত করতে পেরে ছিল ও-অঞ্চলে কেবল গিরীশ গয়লাই! ঠিক সে জন্যও নয়, লোকে জান্‌ত তাকে অন্য কারণে। লোকটা ছিল সে স্বতন্ত্র রকমের,—অমন সহজ, সরল প্রাণীটাকে বুঝে ওঠা কেমন কঠিন ছিল। এক দিকে ছিল সে যেমন হিসাবী;—হিসাবের এককড়া কড়ি তার কাছে রেহাই ছিল না, অন্য দিকে আবার হাত ছিল তার তেমনি দরাজ,—লোকটা বেহিসাবীর একশেষ,—অর্থদানের পাত্রাপাত্রের হিসাব তার একবারেই ছিল না,—'দেব' বল্‌লে দেরী সইত না,—'না' বললে 'হাঁ' বলায় কার সাধ্য! লক্ষ্মীর কৃপাও তার প্রতি ছিল যেমন, লক্ষ্মীছাড়ার মত খরচটাও ছিল তার তেম্‌নি! অত ধনের অধিকারী হয়েও দুটা পয়সা আন্‌বার জন্য কিনা সে কর্‌ত,—রোজগারের বেলায় ছোটবড় বাচবিচার তার আদৌ ছিল না, আবার অর্থের তুলনায় ছোটবড়কে পৃথক করে দেখ্‌তে সে জান্‌ত না—সে আপনার স্বজনে পরকে বুঝ্‌ত—সেইটাতেই ছিল তার সমতা! লোকে স্থির হয়ে সেটাকে তলিয়ে দেখ্‌তে চাইত না,—তাকে একাধারে বিপরীত ভাবাপন্ন ভেবে নিয়ে, তার সম্বন্ধে কত কি মন্তব্য প্রকাশ করত,—কেহ বল্‌ত,—"হবে না, বেটা ভেমো গয়লা,—বুদ্ধি আর ওর হবে কতটুক্; আশি বছর বয়সেও গয়লা জাতের বুদ্ধি গজায় না—ওর ত বয়েস ষাট্ পেরোয় নি! গয়লা কুলের খোকা,—ওর চোখে ধূলো দিতে আর কতক্ষণ!', কেহবা সহানুভূতিতে সায়া হয়ে বল্‌ত 'লোকটার চিরটা কাল একভাবেই গেল, ঐ বাঁক আর কাঁধ হ'তে নাম্‌ল কৈ? একজীবনে রোজগারটাও ত কম কর্‌লে না,—নিজে তার আর ভোগ করলে কতটুকু। চিরটা কাল খেটেই মলি, তবে সুখ কর্‌বি আর কবে!

তারও যে সুখ দুঃখের ধারণাটা অন্যের অপেক্ষা ভিন্ন রকমের ছিল তা' নয়, সেও লোকের মত, অবিরাম-বিশ্রামকেই সুখের উপাদান বলে ভেবে এসেছে, কিন্তু চেষ্টা করেও তার মধ্যে সুখের সন্ধান পায় নি। অসুখবিসুখ তার শরীরে অতি কমই ছিল, তবু যদি কোন কারণে তাকে একটা দিনের জন্য দৈনন্দিন কাজ হ'তে অবসর নিতে বাধ্য হ'তে হ'ত, সে দিনটা তার আর কাট্‌তে চাইত না,—কেবলি তার মনে হ'ত, 'কত কাজ বা অসমাপ্তভাবে পড়ে আছে,—

অন্যে কি তার কাজ তাঁরি মত করে সমাধা করতে পেরেছে ! কোথায় বা কি হ'ল !'—সে না হ'লে তার সংসার যেন অচল ! সে দিন সে দশবার, ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করত—'অমুক কাজ করা হয়েছে কি ? অমুক বাড়ী দুধ দেওয়া হয়েছে ত ? লোক জনের কাজে বিশ্বাস কি ! ওদের যে কচি কচি ছেলে মেয়ে অনেকগুলি,—সময় মত দুধ না পৌছালে কি কম কষ্ট !' এমনি শত প্রশ্ন তার মনে উঠে' তাকে অস্থির করে তুলত। সুখ বলতে মাথায় তার যাই থাকুক, মনের সুখ তার ছিল সেই পরিশ্রমে,—কার্য্যের সুসমাপ্তিতে—এবং সেইটাই ছিল তার সকল উন্নতির মূল ! আদিতে পরিশ্রমটা অর্থ-লালসায় আরব্ধ হ'লেও, পরিণামে ওটা হয়ে গিয়েছিল তার স্বভাব ;—কার্য্যের মিষ্টত্ব তার রক্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে কাজই ছিল তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ! ফলে দাঁড়িয়েছিল, তার যে কথা সেই কাজ ! দেশশুদ্ধ লোক বুঝেছিল,—গিরীশের মুখ হ'তে, কোন কাজে একবার 'হঁ' কথা আদায় করতে পারলে, তার সুসমাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত ! তাই ছোটবড় সকল কাজে ডাক পড়ত তার সকলের আগে; সময়ের অভাব বরং তার ছিল, গ্রাহকের অভাব ছিল না। আনন্দ আদর অর্থ—সংসারীর যাবতীয় সুখ দান করেছিল তাকে, তার শ্রমানুরক্তি, সুন্দরভাবে কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা।

সে চেষ্টা ত জীবন-ভর সমভাবেই চলছিল, তবু কেন তার শেষের দিনগুলা সহসা এমন আকারে দেখা দিল ! দেহটা অকর্ম্মণ্য হবার পূর্ব্বেই কর্ম্মানন্দ তার নিভে আসছিল ! কোথা, শেষ বয়সে কর্ম্ম-যজ্ঞের অবসানে সে সাফল্য আশা করেছিল, তা না কোন্ অপরাধে তার সংসারে—না তার মনে অশান্তির বিষ ঢেলে দিল। এর পূর্ব্বেও ত জীবনে কত অশান্তির কারণ এসেছে তাতে তাকে দমাতে পারে নি, প্রিয়তমা পত্নী তাকে একটি মাত্র পুত্র উপহার দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিল,—ছোট ভাইটি, প্রতি কার্য্যে তার সহায়, ছায়ার মত ছিল,—সেও চিরপ্রস্থান করেছিল; অমন বুকভাঙ্গা শোকে তার অধীরতা প্রকাশ পায় নি,—সে সকলি ভুলে গিয়েছিল কর্ম্মানন্দে,—যারা গিয়েছিল তাদের শোকে নিজকে কাজের বাহির হতে না দিয়ে যাদের তারা রেখে গিয়েছিল, তাদের যত্নে, লালনপালনে আত্মনিয়োগ করে, সংসারের কর্ম্মকেই বরণ করে নিয়েছিল। তারপর—পুত্রকে সে পাঠশালে পড়াশুনায় ভাল দেখে, বড় আশায়, তাকে একে একে ইংরাজির তিন তিনটা পাশ করিয়ে এনেছিল, বড় আশা তার মনে ছিল, ছেলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন হবে,—সে আশা হত হলেও সে আহত বক্ষকে হাহুতাশ করতে দেয় নি, কর্ম্ম-বাঁধনে সে নিজকে কসে বেঁধে শক্ত হয়ে সকল ক্ষোভ দূরে ঝেড়ে ফেলেছিল !

তখনও জীবনে যতটুকু বেলা ছিল, নিজের গতিতে নিজের ভাবে নিজের গন্তব্যপথে পূরা ভরসা নিয়ে চলবার পক্ষে সেই ছিল যথেষ্ট ! আশার আলোকে তখন কি তার মনে উঠতে পারে—সায়াহ্নের কথা ! তার মন ছিল তখন আহরণে,—অগণিত বস্তুসম্ভার তার সম্মুখে—বিচার করে কি, রয়েসয়ে, সেগুলি খুঁটে তোলবার ! সঞ্চয়ের আনন্দে, ঈপ্সার প্রাবল্যে, দেহশক্তির গতিতে সে ঊর্দ্ধ আকাশপানে চেয়ে দেখতে অবসর পায় নি—সূর্য্য তখন কোথায় ? সহসা কেন সন্ধ্যার আগত অন্ধকার-ভীতিবিহ্বল কোন এক আকুল পক্ষীর আর্ত্তস্বর শ্রবণ ক'রে তার মন এমন হয়ে গেল,—সম্মুখে মুখ তুলে চাইতেই নজরে পড়ল—দিবা যে প্রায় অবসান ! গন্তব্যপথ যে কত দীর্ঘ !—কোথায় তার শেষ ! প্রান্তে কি সে, জীবনে উপনীত হতে পারবে ! পা কি আর উঠতে চায়,—চলার আনন্দ যে তখন প্রাণ হ'তে নিভে গিয়েছে ! ভাবনার শেষ নাই ! কোথায় আশ্রয়, কে দেবে ? মরু-উদ্যান যেন সে দেশটা,—কারো ত সেখানে ঘরবাড়ী নাই,—সবাই পথিক—কে কা'কে আশ্রয় দিতে পারে ! এত আশা, এত উৎসাহ, আহরণের আনন্দ সবই যে বৃথা—কেবল আরো কষ্টেরি কারণ,—সত্যই কি সব তার ভস্মের জন্য—অপরিহার্য্য পরিণামে সব পরিত্যাজ্য !

(২)

গিরীশ ত জানে সব বিষয়বিভব সমস্তই তার আপনার,—তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জনের কড়ির সে সমস্ত! তারই,—সমস্তই তারই,—কি উপায়ে সেগুলিতে তার অখণ্ড স্বামীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, সে চেষ্টা এত কাল সে করে এসেছে! কত কষ্টে, কত যত্নে নিজহাতে গড়েতোলা সংসার। তার প্রত্যেকটি পাকা, চিরস্থায়ী করতে সে কত না চেষ্টা করেছে! সে সবের প্রতি তার কি গভীর টান,—মমতা,—মায়া! এখন কেন সেগুলির দিকে চাইতে ভাবনা আসে—হায়! তার অভাবে সে সবের দশা কি হবে! তার অভাব! ভাবতেই প্রাণটা চমকে ওঠে! যেটা এতদিন ভুলেছিল,—জেনেও যাকে প্রাণে স্থান দেয় নি,—সেইটা এখন কেন যেন,—দূরে ঠেলে রাখতে চাইলেও কখন কেমন করে এসে উঁকিঝুঁকি মারে! কে যেন এতকাল ডেকে ডেকে ফিরেছে,—অন্য কাজের আবেশে সে স্বর কর্ণে পৌঁছে নি একবার যখন শুনেছে তার আহ্বান কি আর না শুনে উপায় আছে, ডাকছে—যেতেই হবে—সকল ছেড়েও তার আশ্রয় না নিয়ে গত্যন্তর নাই আর! পরপারে তার ঘর—পারের-তরী বড় পল্কা,—বহিবার মত ভার সইতে পারে না!—তবে উপায়? এত যত্নের এত! পড়ে রইবে কি এ-পারে! তাদের কে এমন করে রাখবে! ভাবতেই বৃদ্ধের প্রাণের মাঝে কেমন করে ওঠে! এমন অট্টালিকা—চিরস্থায়ী করে গড়া—তারও যে চুণবালি যত্নের অভাবে খসে পড়ে! বছরে এক কলি চুণ না ফিরলে মলিন হয়! তার এ কাজ এমনি করে, এমনি যত্নে কে হায়, বর্ষে বর্ষে দেখেশুনে সুসম্পন্ন করে তার কীর্ত্তিগুলি অক্ষত রাখবে!

ছেলে?—সেই ত আছে! না সে ত ও-কাজের কেউ নয়,—তার মত করে এ-সব রক্ষা করা হরিশের সাধ্য কি! সে পারবে না—পারবে না! বৃদ্ধ আজীবন অন্যের কৃতিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি, সে এখন কি করে তা পারবে! লোকে বলত—ঐটিই তার উন্নতির মূল;—আজ সেইটাই হয়েছে তার সব চেয়ে তীব্র বেদনা!

(৩)

ছেলে বি.এ,—সে ব্যবসার কি বোঝে—না, বুঝতে চেষ্টা করে! অর্থে কার না আনন্দ, অর্থাগমে কার অনিচ্ছা কিন্তু শিক্ষিত ছেলের আয়াসেই যে আতঙ্ক। সে চায় চকুরী তাও কর্ত্তৃত্বপণা, আজকাল তা ক'জনের ভাগ্যে মিলে—জুটলেও যেমন চাকুরীই হ'ক না দাসত্বে সে কর্ত্তৃত্বও জটিল! ছেলে তাই বাড়ীতে বসে'! সুসজ্জিত বৈঠকখানায় মজলিস্ করে' গল্পেগুজবে দিন কাটায়! তাকে দিয়ে গিরীশের সংসার ঠিক্ থাকবে! ছেলে তাকে কতদিন বলেছে, 'বাবা, আর কেন—অনেক করেছ,—জীবনে একটু সুখশোয়াস্তি কর—ছাড় ওসব বৈ দুধ,—নিজ কাঁধে ওসব বওয়া আর ভাল দেখায় না!' কেন ভাল দেখায় না? হেয় কাজ বলে? কিসে হেয়? শারীরিক পরিশ্রম ওতে যে অত্যধিক! শিক্ষিতের মত মন্তব্য বটে! কিন্তু খেটেই যে সে, বড় যদি হয়ে থাকে পরিশ্রমেই সে বড়—সকলি তার বাঁকের কড়ির! মাটি ধরে উঠেপড়েই ত সে চলতে শিখেছে! সেটাকে, আদির আশ্রয়কে কেউ ছোট করে দেখালে প্রাণে বড় বাজে! ছেলের কথায় বুড়োর বড় দুঃখ হয়, ভয় হয় সে সকলি অপাত্রে দেবে, অপব্যয় আর ব্যয় এক নয়! অপব্যয় হতে কি ক'রে সে তার এত সাধের সংসারকে রক্ষা করবে! এত দিন যেগুলিকে নিত্য বলে মেনে, তাদের অস্তিত্ব অটুট অটল রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, আজ তার মহাপ্রস্থান-শঙ্কিত প্রাণ সেগুলির উপর অনিত্যতার ছাপ মেরে দিলেও সে তাদের নিত্যতাই প্রার্থনা করছিল—অনিত্যের নিত্যতা কোথা? সেটার সন্ধানে বিফলমনোরথ হয়েই সে

আকুল! তার হতাশ প্রাণ হাহাকার করছে। মুখ ফুটে কথাটি পর্য্যন্ত বলতে তার ইচ্ছা হয় না—ভাবে আর ভবে! ঠিকই সে নিজেই নিজের নিকট দুর্ব্বোধ! কেবল একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার আবছায়া তার চতুর্দ্দিকে ঘিরে ফেলছে যেন, সে খুঁজে পায় না করণীয় কি? উপায় কোথা?

(৪)

গিরীশের যখন এমন মনের অবস্থা, ছেলে তার তখন সমাজের উচ্চ সোপানে উঠতে ব্যস্ত! এ পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে, হরিশের সকল আশাভরসা, জ্ঞানগর্ব্ব নষ্ট হ'তে বসেছে; হায়! তাদের এমন বাড়ীঘর, এত ধন রত্ন, শিক্ষিত সে,—এ সকল গুণগরিমায় সে যেটাকে ঢাকতে চায়, সেটা তার প্রাণে কাঁটা হয়ে নিয়ত বেদনা দিচ্ছে! সকলে তাকে সভ্যভব্য যাই বলুক সাক্ষাতে যত প্রশংসাই করুক না কেন, সে ঠিক্ জানে, গোপকুলে যে তার জন্ম, সে কথাটা তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না! সেইটাই শেল হয়ে বিঁধে তার প্রাণে! তার দুঃখ, তার চিন্তা এ পোড়া ভারতে কেন জাতিভেদ অস্তিত্ব লাভ করেছিল! রাগে ক্ষোভে স্বার্থে তার ইচ্ছা হয়; সেই পন্থা সে তখনি আবিষ্কার করে যাতে জাতের 'জ' পর্য্যন্ত সেই মুহূর্ত্তে লোপ পায়! হরিশের সে দুঃখ অমূলক নয়, জাতির অত্যাচারে তাকে যে অনেক সইতে হয়েছে, একটা প্রেমসঙ্কট তাতে লুক্কাইত থেকে, জাতির দাগ তার মনে আরো স্পষ্ট করে তুলেছিল। সে প্রাণটা তার অবহেলায় ফেলে দিয়েছিল, এক ভামিনী তরুণীর রাঙা চরণ তলে! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম-কুমারী সে। তাদের মিলন-পথে কোন বাধা ছিল না। ধন, ঐশ্বর্য্য, শিক্ষা সকলই পরিণয়ের অনুকূলে, কেবল প্রতিকূলে ঐ জাতিটা! তরুণীর জাতিজাল-ছিন্ন উদারপন্থী পিতা, স্পষ্টই তাকে জানিয়েছিলেন "জাত ব'লে কথা নয়—তাঁদের পারিবারিক প্রথায় ব্রাহ্মণেতর জাতে কন্যাসম্প্রদান নিষিদ্ধ।" পারিবারিক রীতির উপর আর কথা চলে না! সর্ব্বরীতির বাহিরে যাঁরা—ভেদাভেদমুক্ত, সাধ করে তাঁরা আর প্রথার পাকে পড়ে না! তাঁদের অকাট্য যুক্তির ন্যায্যতা-অন্যায্যতা পরীক্ষা করে দেখ্‌বার, অবসর না রেখে, নিজকে চেয়ে দেখ্‌বার প্রবৃত্তির অভাবে, যত ক্রোধ, যত আক্রোশ তার তীরের মত এসে পড়েছিল ঐ জাতটার উপর আর এই মাটিটার উপর,—সেই মাটিটা এমনি বদগুণ বিশিষ্ট যে তার উপর বাস করলে জাতিহীন হতে গেলেও সিন্ধবাদের ভুতের মত জাতটা আবার কোন্ সূত্রে কাঁধগরদান জুড়ে বসে—সংস্কাররীতি ঠেলে ফেলতে চাইলেও রেশম কীটের সুতার মত অ-সংস্কার সংস্কার হয়ে চতুর্দ্দিকে ঘিরে বেড়ে বদ্ধ করে! হরিশের প্রাণ তাই তখন বিষম তিক্ত, উৎক্ষিপ্ত উদাস—তারও কাছে সংসারটা ভাল লাগ্‌ছিল না একবারেই! পিতাই ত তাকে এমন বিপন্ন করেছে—জন্ম দিয়া;—আজও সে কাঁধ হ'তে বাঁক নালাতে চায় না— চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে লোকে কি করে' ভুলতে পারে? ভদ্রতা ভব্যতা থাকে কিসে!

পিতা ও পুত্রের, বৃদ্ধ ও যুবকের হৃদয়ে ভিন্ন আকারে একই চিন্তা, একই সমস্যা—'থাকে কিসে'—কিসে আধেয় ছেড়েও আধারটাকে বজায় রাখা যায়! ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষে পড়ে না, চঞ্চল যুবক পাঁচজনার কাজে অস্থির চিত্ত হয়ে বুঝতে পারে না, শূন্য আধারেও যে বায়ু—আয়ুই তাদের!

পিতার নিকট পুত্রের কীর্ত্তি অজ্ঞাত থাকে ক'দিন! সমস্তই সে জানতে পেরেছিল তাতেই আরো তার চিন্তার বৃদ্ধি করেছিল......তার ধন মান জাত রক্ষা হবে কি করে।

বৃদ্ধ একদিন পুত্রকে ডেকে বল্লে "হরিশ! ও-সব খেয়াল ছাড় বাবা, তোকে সংসারে প্রতিষ্ঠা করে যাই—আমার সময় ত প্রায় হয়ে এসেছে—আপত্তি করিস্ না আর।"

শিক্ষিত পুত্র তখন স্পষ্টই বল্লে 'না আমি গয়লার অশিক্ষিতা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করতে পারব না—বিয়ে যদি করতে হয় তবে শিক্ষিত-সমাজে!'

পিতা হেসে বল্লে "পাগলামী ছাড়, গয়লার ছেলেকে কোন্ বামনে মেয়ে দেবে! দিলেই তুই তাকে নিতে রাজি হবি কেন—দুধে দৈয়ে কি এক হয়—মিশালে দুটাই দৈ হয়ে যায় যে।' ছেলের ক্রোধের অবধি থাকল না সে বল্লে "বাবা তুমি বুঝ্‌বে কি! চিরদিন বামুনকে বড় করে দেখে মানুষের প্রকৃত স্থানটা কোথায় দেখ্‌তে ভুলে গেছ, দাবিটা করতেও সাহস করতে পার না, যুগ-যুগান্তরের বশ্যতা এ-দেশের প্রাণটা এমনি নীচে নামিয়ে দিয়েছে! মেয়ে দেয় না দেয় বুঝ্‌ব আমি সেটা, সকলি আর তোমাদের মত নয়,—জাত জাত বলে প্রাণ মান সব বিনাবিচারে পরের পায় নোয়াতে যাবে।

বৃদ্ধ বল্লে "বটে! বিয়ের তোর সুবিধে হচ্ছে না বলে, জাতটা হ'ল যত দোষের! জাত ত্যাগ কি যে সে করতে পারে,—ত্যাগ যে তাতে অনেকখানি, ধন জন ত্যাগের চেয়েও সে ত্যাগ বড়। লোক জানে মরণ তার সমস্তই কেড়ে নেবে, জাত-অজাত থাকবে না তবু চায় সে মৃতসৎকার, নিজ জাত দিয়ে করাতে, গুণের ওপর জাতের প্রতিষ্ঠা সেটা কি সহজে কেউ ছাড়্‌তে চায়!"

ছেলে বল্লে "গুণের উপর জাতের প্রতিষ্ঠাটা ত ভারি!—তা যদি হ'ত তা হ'লে কথা ছিল কি! তুমি আমি তবে কি এ ভাবে পড়ে রইতাম, হিন্দুর কথা ত দূরে—যারা জাতকুল ঘুচিয়ে মানবসঙ্ঘে মিশতে চেয়েছে তারাই কি গুণের উপর ওর প্রতিষ্ঠা মেনেছে, মুখে বল্লেও মনে রয়েছে—ঐ রক্তের কথা—জাতটা আমাদের অধঃপতন এনেছে এম্‌নি!"

পুত্রের মন্তব্যে বৃদ্ধের আস্থা না থাকলেও, পুত্রের কথা তাকে স্মরণ করিয়া দিয়েছিল, আর একটা দিনের কথা! আজ তার মনের পরদা উঠে গিয়েছে, নূতন আলোক-সম্পাতে সে দেখ্‌তে পেয়েছে কোথায় জাত, কোথায় জাতহীন হয়েও মানুষের গৌরব; কিসে এই অনিত্য ধনের সাফল্য,—তার সদ্ব্যবহারে! সমাজের, সংস্কারের অত্যাচারে সে দিন সে কি ভুলটাই না করে ফেলেছে! সেও যে তার ছিল রক্ষণীয়।—অসহায়া তার সাহায্য ভিক্ষা করে তার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাকে ধনী জেনে, জ্ঞানী বলে মেনে অমন একটা অন্যায়ের প্রতীকার-প্রার্থিনী হয়ে সে তার স্মরণ নিয়েছিল! বৃদ্ধ এই জাতির গর্ব্বে দশের সঙ্গে সেও অন্ধ বনে' দুখিনীর সকল প্রার্থনা, তার সকল বেদনা উপেক্ষা করেছে,—সতী যেটাকে সত্য বলে মেনে শতঅত্যাচার শির পেতে নিয়েছিল, গিরীশ তার সে মহত্ব দেখ্‌তে না পেয়ে, তাকে জেনেশুনেও, তার কষ্টের লাঘব করে নি, দুঃখের কারণই হয়েছে! এতই সে গরীব ছিল, স্বামীর শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত যথাসময়ে সম্পন্ন করে শুদ্ধ হতে পারে নি! তার উপর মেয়েটা তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, বিয়ে তার দেয় নি, ভাল ঘরে না হ'ক্‌ যে কোন একটা বরে মেয়েটাকে দিয়ে সে জাত-রক্ষা করতে পারত ত, তেমন বর অনেক ছিল, তাতে তার মতি ছিল না! তাই তাকে দশে মিলে এক-ঘরে করেছে;—গ্রামে স্বজাতের গণ্ডিতে তার আর বস্‌বার উপায় নাই! মানুষের জাতরক্ষা করতে গিয়ে, ভালকে বরণ করতে গিয়ে সে কত দুঃখ পেয়েছে, বৃদ্ধের আজ তাই মনে উঠ্‌ল, সে বল্লে "ওরে সত্যিই বলেছিস্‌ গুণের উপর জাতের প্রতিষ্ঠা, সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি,—তাই ত ওরা জাত ছেড়েও জাত ছাড়্‌তে পারে নি! জাত রেখেছে বলে স্বজাতিরা ছেড়েছে যাকে জাতিহীনা হয়েও যে জাতিতে শ্রেষ্ঠ,—তাকেই তবে রক্ষা কর, সেই হবে আমার বরণীয়, তার করস্পর্শে আমার ধন-উপার্জ্জন সার্থক হবে—যে আমাকে যাই বলুক না কেন

আমি ওকেই সর্ব্বময়-কর্ত্রীরূপে গ্রহণ কর্‌ব ; ওর কন্যাই হবে আমার পুত্রবধূ, উত্তরাধিকারিণীরূপে ওকেই আমি গ্রহণ কর্‌লাম, কিছুইতেই এর অন্যথা হবে না !

পুত্র বল্লে "কে ?"

পিতা বল্লে "সেই সতী—যে স্বামীর শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হ'বার পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব বেচে স্বামীর ঋণ কড়ায়গণ্ডায় শোধ করেছে,—যে অপাত্রে কন্যা দেবার চেয়ে তাকে আজও কুমারী করে' রেখেছে, সেই মানদা গোয়ালনী। সকলের চক্ষে যে হীন হলেও আজ আমার চক্ষে পূজ্য, জাত যখন তুইও মানিস্ না, তোর চক্ষেও সে তাই হওয়া উচিত; আপত্তি আর করবি কিসে, শিক্ষায় ? ওর যদি শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে বই পড়েও বেশী শিক্ষা হয় না, ওর যদি জাত না থাকে জাত তবে কারো নাই, ওর ধন নাই থাকুক অর্থবিত্ত আমার ডুবতে যাচ্ছিল, ওই, সে সব রক্ষা কর্‌বে—ওর মেয়ের মত মেয়ে ত আমি আর দেখ্‌ছি না।"

পুত্র ত্রাসে ভাব্‌ল "তাই ত ! বুড়ো যে একরোখা, অবশেষে সব ধনরত্ন হ'তে বঞ্চিত কর্‌বে নাকি ! বশ্যতাই মঙ্গল ! সে নত শিরে বল্লে " তোমার যা ইচ্ছা বাবা, ছেলে কবে বাপের অবাধ্য !"

বৃদ্ধ অনেক দিন পরে মেঘমুক্ত আকাশের মত চিন্তামুক্ত হয়ে বল্লে "জানি।"

বাহিরের জাতি ছাড়িলে কি ফল
অন্তরের জাতি না গেলে
মানুষের জাতি রেখেছে যে জন
জাতি আসে তার কি ফলে ॥

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

—————:*:—————

পত্র।

জানি না সে কোন পরম বিরহী লিখিয়া কয়েক ছত্র—
বিরহীর মন-বিনোদন হেতু সৃষ্টি করেন পত্র।
যাহার অভাবে অনাদি দুঃখ পেয়েছে বিরহী যক্ষ,
সদ্ভাবে যার শকুন্তলার বিরহে হ'ল মোক্ষ।
ব্যথিতের ব্যথা দূরিতে কি চিঠি সঞ্জীবনের মন্ত্র।
ফুৎকারে যার নিমেষে উড়িল মোহের সাবেক তন্ত্র।
প্রণমি তাহার স্রষ্টারে আমি ; বিরহের ব্যথা অল্প-
করিয়া যে চিঠি দিয়াছে আমারে সহ্য করার কল্প।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

ছিটে-ফোঁটা।

ছবি আমরা যখন দেখি তখন সেটাকে দেখি আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের মানসিকভাব ও অবস্থার বশবর্ত্তী হয়ে, তাই কোন ছবি কোন ব্যক্তির মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয় আবার কারো বা সেই ছবিটা মোটেই ভাল লাগে না। অনেকটা রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং সর্পে রজ্জুভ্রম যে মানসিক কারণ থেকে ঘটে, ছবি দেখাতেও তাই ঘটার সম্ভাবনা। বস্তুত শিল্পীর মানসিক অবস্থার ছাপটিই শিল্পীর পটে লেখা থেকে যায় এবং তাঁর সেই ভাবটি নিতে হ'লে সমঝদারের শিল্পীর চেয়ে আরো গভীরতার দরকার।

* * * *

প্রকৃতির ভিতরকার রস-লাবণ্য গ্রহণ করতে হ'লে যেমন একটা বিশেষ বোধশক্তির বিকাশ না হ'লে হয় না, ছবি-দেখা সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথাই খাটে; বরং ছবি-দেখতে সেটার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম অনুভূতি ও শিক্ষা থাকার প্রয়োজন। প্রকৃতিতে যে চঞ্চলতা আছে তার বাতাসের স্পর্শে, প্রতিনিয়ত আলোর বদল প্রভৃতি ছবিতে দেবার যো নেই কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্ত্তের বাতাসের স্পর্শ এবং পাতায় পাতায় আলোর নাচন' যা শিল্পীর মনকে স্পর্শ করেচে সেইটি শিল্পী ঠিক্ সেই একভাবে অনন্তকালের জন্যে সঞ্চয় করে চিত্র-পটে ধরে রাখেন। তাই যদি কোন যুবকের প্রতিকৃতি পটে দেখি, সে পটের যুবক বাস্তব-জগতের সচঞ্চল গতিতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় না, সেই পটে একভাবেই যুবকের যৌবন অটুট থেকে যায়। তাই দেখি ছবি মৌন, সংযত।

* * * *

শিল্পী শিল্প রচনা করেন কেবল হাতের বা চোখের সাহায্যে নয়, তার মনটি দিয়েই ছবিটি তৈরী হয়; তাই ছবিতে কোন্ শিল্পী কতটা রং দিয়েচেন, কি উপায়ে এঁকেচেন সেটা দেখার চেয়ে কোন্ শিল্পীর শিল্পে তার মনটির কতটা খোঁজ পাওয়া যায় সেইটিই দেখার প্রয়োজন।

* * * *

শিল্পী মাত্রেই আত্ম-বিস্মৃত। যে শিল্পী যতটা নিজের বিষয় সজাগ থাক্‌বেন, তাঁর শিল্প ততই স্থূল ও কদাকার-ভাবে দেখা দিবে। সূক্ষ্ম অনুভূতি কখনও নিজের বিষয় সজাগ থাক্‌লে বাঁচে না লজ্জাবতীর মত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

* * * *

প্রকৃতি অসীমের মধ্যে সীমাকে আমাদের সাম্‌নে ধরে দেয় কিন্তু শিল্পী দেখায় রেখা ও রঙের সীমার দ্বারা অনন্তকে। প্রকৃতির তাই অনন্ত নীল আকাশ, উদার গম্ভীর সমুদ্র অনন্তের আভাষ আমাদের দৃষ্টি সীমায় এনে ধরে দেয়, আর শিল্পী সেই প্রকৃতির অনন্ত ভাবটিকে সীমাবদ্ধ রাখার যাদুতে অনন্তের মহিমায় প্রচার করে।

* * * *

শিল্পীর শিল্পকলা তার রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মনে যে উচ্চভাব জাগিয়ে তুলে দেশের ও দশের একটা সমূহ উপকার সাধন করে তুলবে—এমন কথা বলা যায় না; তবে শিল্পকলা অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে মনের যে গভীরতা ও সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি বাড়ায় সেটা দেশের ও দশের পক্ষে একটা কম লাভ নয়। এই কারণেই দেশের ছবি যত প্রাচীন হয় ততই তার মূল্য বেড়ে যায়। এখানে শিল্পীর রং বা তুলির দাম নয়—তার গভীরতাই মূল্য।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

প্রীতি-গীতি।

—:#:—

এ কেমন ও গো এ কেমন ও গো
এ কেমন ও গো রীতি !
অনাদিকালের সুমহান সুরে
ধ্বনিতেছে প্রীতি-গীতি !
দলে দলে লোক আসিতে যাইতে
শুনিছে পাতিয়া কান,
বাজে কার বাঁশি, উঠে কার হাসি,
নাহি তার অবসান !
ধারা হ'তে নামে ধারা,
হয় না সে পথহারা,
সাক্ষ্য দিতেছে আকাশে নীরবে
রবি শশী গ্রহ তারা !
ভাঙে আর ভাসে চুপে চুপে আসে
ঢেউয়ের পরে ঢেউ,
গড়িয়া ভাঙিছে ভাঙিয়া গড়িছে
চোখে দেখে তারে কেউ !
জীবনের তটমূলে,
মরণের উপকূলে,
মিলন বিরহ বিরোধের গানে
এক সুর কেবা ভুলে !
থামে নাক প্রীতি, থামে নাক গীতি
কিছু নাহি শেষ হয়,
অন্তবিহীন জীবনের ধারা
সে যে মৃত্যুঞ্জয় !

* * * *

আজ তুমি আমি যে গান গাহি গো
তরুণ অরুণালোকে,
আমাদের মত গেয়ে চলে গেছে
যাদের দেখি নি চোখে।

বিচিত্র একসুরে
হৃদয় অন্তঃপুরে
আজো অতীতের অশ্রুত গান
জগতে জগতে ঘুরে।

এক গান গেয়ে, এক তরী বেয়ে
চলিছে সর্ব্বলোকে,
এ-পারে ও-পারে আলোকে আঁধারে
সুখে দুখে রোগে শোকে।

বাহুপাশে লয়ে টানি,
কহে' মৃদু আশা বাণী
চিনেও সে-জনে নারিনু চিনিতে
জেনেও নাহিক জানি।

হাসি ক্রন্দনে জীবনে মরণে
নিতি করে আনাগোনা,
নিখিলের স্রোতে চলা ফেরা তার
মুখেতে ঘোম্‌টা টানা।

● ● ● ● ●

ঘুচিল মরণ ভয়,
হ'ল জীবনের জয়,
ফুরাবে না তুমি, হারাব না আমি
র'ব যেথা সব রয়।

অভয় বারতা করিছে ঘোষণা
নীরবে তুলিয়া তান,—
শেষ হ'ল বলে যা'র লাগি কাঁদি
তারো নাহি অবসান।

ভাসিছে কালের ভেলা,
চলিছে রসের খেলা,
অজ্ঞাত এক মিলন-তীর্থে
মহামানবের মেলা!
কোন্ সাগরের কল্লোল হ'তে
ভেসে আসে প্রীতি-গীতি,
কবেকার গানে কে গো সে ভুলায়
বিশ্বজনার ভীতি!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

পুত্তলিচতুষ্টয়।

—:*:—

(১)

যৌবরাজ্য লাভের পরই অবন্তীরাজের হৃদয়ে সন্তানসাধ উদয় হয়। অপর্য্যাপ্ত ধন—অপরাজেয় ক্ষমতা—আর তরুণী পত্নীর প্রতি তরুণহৃদয়-পূর্ণ প্রেম। কিছুরই অভাব ছিল না—কেবল এই সমস্ত সুখকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে একটী শিশুর কামনা করিতেন।

সে বহুদিনের কথা। সংসারে সকল বাসনাই পূর্ণ করিতে পারিয়াছে এমন পুণ্যবান কয় জন আছে? যৌবন-সীমা শেষ হইয়া গেল তথাপি তাঁহারা নিঃসন্তান। দেবদ্বিজে তাঁহাদের অচলানিষ্ঠা—কিন্তু হতাশাপীড়িত রাজদম্পতি বিবিধপ্রকারে দেবার্চ্চনা করিয়াও অদৃষ্ট ফিরাইতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখী ছিলেন,—অশেষ সুখরাশি বেষ্টিত হইয়াও তাঁহাদের অন্তরে শূন্যতা ও দৈন্যের সীমা ছিল না।

বিধাতার বরে অবশেষে তাঁহাদের প্রায় শেষ বয়সেই গৃহ ও হৃদয় আলোকিত করিয়া সুলক্ষণা রাজকুমারী জন্মগ্রহণ করিলেন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বাগ্দেবী বীণাপাণির পূজামুহূর্ত্তে জন্ম বলিয়া সকলে আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন বীণাপাণি। পূজার আয়োজন শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া রাজা সেই পূজার আনন্দে কন্যার জন্ম-উৎসব মিশাইয়া দিলেন।

পঞ্চমী চন্দ্রকলা দিন দিন বাড়িতেছিল;—রাজকুমারীও ঘনীভূত জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় দিন দিন বয়োবিকাশের চারুতা লাভ করিতেছিলেন। ক্রমে পঞ্চবর্ষ অতীত। রাজা বলিলেন, এই কন্যা শুধু আমার দুহিতা নহে,—প্রকৃত প্রস্তাবে এ আমার পুত্র,—ইহার শিক্ষাদীক্ষা আমি পুত্রের ন্যায় বিধান করিব।

তাহাই হইল। যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ ক্রিয়ার পর অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত রঙ্গনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজমন্ত্রী গোপালভট্ট সেই বাল্যবয়স হইতেই কন্যাকে মৃদু মৃদু রাজনীতির উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার কোন অঙ্গেই ত্রুটী থাকিল না।

অবন্তীরাজের জীবনস্রোতে মন্দধারা বহিতেছিল,—তিনি বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত, তখন রাজকন্যা পূর্ণ-যৌবনা! আনন্দবিস্ফারিত গর্ব্বিত হৃদয়ে রাজা দেখিলেন,—কন্যা রূপে অতুলনীয়া—আর ততোধিক অতুলনীয়া—বিদ্যা ও বুদ্ধিতে! সাধারণ রাজপুত্রেরা ঐশ্বর্য্যদর্পে বিদ্যা বা জ্ঞানলাভে উৎসুক থাকে না বা পিতার দৃষ্টান্তে মৃগয়া বা যুদ্ধমাত্রেই আসক্ত হইয়া উঠে,—কিন্তু বীণাপাণি নারীস্বভাবসুলভ মৃদুতায় ধীরা, নিজের শিক্ষার স্বয়ং উদ্যোগিনী,—আর বয়ঃপ্রবীণ পিতামাতার দৃষ্টান্তে দেবদ্বিজে ভক্তিমতী,—সুশিক্ষায় বালিকা অনেক রাজা ও রাজকুমারের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

অধ্যাপক রঙ্গনাথ শাস্ত্রী আসিয়া রাজাকে জানাইলেন, "রাজকন্যার অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, অল্পকালেই বালিকা শিক্ষকের অধিকৃত বিদ্যা সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছেন।

শাস্ত্রীই তখন সে-দেশের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। তাঁহার কথায় রাজার আনন্দের সীমা থাকিল না, তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়া কন্যাকে ডাকিলেন—প্রশান্ত সাগরের ন্যায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও তেমনি সুস্থির গাম্ভীর্য্য লইয়া বীণা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যহই রাজা কন্যাকে দেখিতেন—কিন্তু আজ যেন তাঁহাকে নূতন চক্ষে দেখিলেন। রঙ্গনাথ শাস্ত্রীর অতুল্যা ছাত্রী—এই কন্যা কি তাঁহারই দুহিতা? এই শ্বেতবসনা—জ্যোতির্ম্ময়ী একি স্বয়ং বীণাপাণিই তাঁহার গৃহে জন্ম লইয়াছেন?

উচ্ছ্বসিত অশ্রু, আদর ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কন্যা চলিয়া গেলে রাণী বলিলেন,—"এইবার বীণার বিবাহের উদ্যোগ কর।"

মুগ্ধহৃদয় রাজা স্মিতমুখে কি চিন্তা করিতেছিলেন, পত্নীর বাক্যাবসানে সানন্দস্বরে বলিলেন "আমিও এই কথাই ভাবিতেছিলাম! আমাদের বয়স হইয়াছে, রাজ্যশাসন আর ভাল লাগিতেছে না;—বীণার বিবাহ দিয়া সেই উপযুক্ত পাত্রকে আমার ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

রাণী বলিলেন, "মগধরাজপুত্র যোগ্যপাত্র নহেন কি? মগধরাণী আমার বাল্যসখী,—তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—"

মগধরাজপুত্র? আমি তাঁহার কথা জানি। কিন্তু মহিষি! শুধু পাত্র বা রাজ্য দেখিয়া আমি কন্যার বিবাহ দিব না আমার বীণাপাণি নির্ব্বোধ নয়—বালিকাও নয়,—সে ইচ্ছা করিয়া যাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে সেই তাহার পতি। তুমি অগ্রে তাহার মত জান,—পরে পাত্র স্থির করিব।"

কন্যার মত? মগধরাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে রাণীর বহুদিনের সাধ,—কন্যার মত লইতে হইলে সে আবার কি গোল বাধাইবে কে জানে?

রাণী দুইদিন সন্দেহে কাটাইয়া সখীদিগকে দিয়া রাজকুমারীর মতামত জানিলেন তাঁহার মগধরাজ কেন—কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আজীবন কুমারী থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা।

বিবাহ করিবে না? এ আবার কি কথা? স্ত্রীলোকে বিবাহ করিবে না ইহাও কি কথা? বিরক্ত হইয়া তিনি রাজাকে বলিলেন,—"নারীর শিক্ষা অনেক সময় বিড়ম্বনায় পরিণত হয়,—কন্যা কি বলিয়াছে জান?"—সকল কথা শুনিয়া রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"ইহা ত কোন দোষের কথা নয়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই বলিয়াছে ত? বিবাহ করিবে না—এ কথা ত বলে নাই? কেন ইচ্ছা নাই তাহা না জানিয়া কেন এত চিন্তা করিতেছ? তাহাকে ডাক,—আমি স্বয়ং তাহাকে সকল কথা বলিব।"

বীণা আসিয়া নতমুখে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভাব দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পিতার বক্তব্য পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন।—রাজাও তাহা বুঝিলেন; হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ত সকল কথাই বুঝিয়াছ মা—আমাদের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান তুমি,—আমাদের জীবন ক্রমে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এ সময় তোমাকে বিবাহিতা দেখিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি,—তাহাতে তোমার আপত্তি কেন বীণা ?—"

কন্যা নীরব।—রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বিবাহ শুধু তোমার জন্যও নয় মা!—কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পিতা শাস্ত্রানুসারে বাধ্য,—আর তোমাকে কি আমার বুঝাইতে হইবে যে অধিক দিন তোমার কুমারী অবস্থায় রাখিলে আমি লোকসমাজেও নিন্দনীয় হইব ?—"

কন্যা মুহূর্ত্তমাত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—পরে পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাবে বলিলেন—"আমি তাহার জন্য বলি নাই।"—

"তবে কিসের জন্য বলিয়াছিলে। তোমার অভিপ্রায় কি ?"

বীণার মুখে লজ্জার রক্তরাগ দেখা যাইতেছিল,—অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন,—"তাহাতে হয় ত আমি অসুখী এই আশঙ্কা করিতেছিলাম। কিন্তু যথার্থ কথা, ইহাতে আপনাদের প্রতি অন্যায় করা হয় বটে।"

রাজা হাসিলেন।—"না মা, শুধু আমাদের কথা ভাবিও না!—তোমার অসুখের কারণ এখন তুমি নিজেও বিবেচনা করিতে পার,—তোমার পিতা মাতা শুধু তোমার সুখই দেখিতে চান,—কেবল তোমার আনন্দেই এখন আমাদের আনন্দ। তাই ত এ কথা লইয়া এত আলোচনা করিতেছি বিবাহে তোমার আপত্তির কি কারণ খুলিয়া বল।"

কন্যা কিন্তু কিছুই বলিলেন না; তাহাকে লজ্জিত দেখিয়া রাজাও নীরব থাকিলেন।

(২)

পরদিন রাজকুমারীর সখী আসিয়া মাতাকে বলিল যে বিবাহে রাজকুমারীর কোন আপত্তি নাই কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কয়েকটী দ্রব্য তিনি প্রার্থনা করেন।

রাণী বিস্মিত হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বে আবার কি চাই ?—বলিলেন, "কি চাই বল।"

সখী বলিল, "তিনি একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী স্বর্ণকার চান, আর একমণ স্বর্ণ, একমণ রৌপ্য এবং ঐ পরিমাণে তাম্র ও লৌহ প্রার্থনা করিতেছেন।—"

ধাতু আর স্বর্ণকার ? রাণী হাসিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা বলিলেন "হাসিও না রাণি, বীণার বুদ্ধির তুলনা নাই,—এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয় তাহার কোন অভিসন্ধি আছে। তাহাকে বলিও আমি শীঘ্রই তাহাকে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেছি।"

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণকার আসিয়া কন্যাকে প্রণাম জানাইল,—"রাজকুমারীর কি অনুমতি ?"

বীণা হাসিয়া বলিলেন, "অনুমতি সামান্য,—এই চারি প্রকার ধাতুতে চারিটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার একটি সর্ত্ত থাকিবে,—তোমাকে সপরিবারে আমার এই অন্তঃপুরের উদ্যানে বাস করিতে হইবে। যতদিন না আমি আদেশ দিব ততদিন বাহিরে যাইতে পাইবে না। ইহাতে তুমি সম্মত ?"

স্বর্ণকার বলিল, "অসম্মতির ত কোন কারণ নাই মা, আমি স্বচ্ছন্দে তোমার সন্তানের ন্যায় বাস করিব—তাহাতে কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তোমার কাজ কি বল দেখি?"

"কাজ ত বলিলাম। চারিটী পুত্তলি প্রস্তুত করিতে হইবে। আমি যেরূপ বলিয়া যাইব অবিকল সেই আকারে গঠন করিবে—সকলই আমি বলিয়া যাইব, তুমি কেবল আকার দিয়া যাইবে মাত্র।"

তাহাই হইল। ভবন-সংলগ্ন এক গৃহে স্বর্ণকারের পরিবারবর্গ আসিয়া বাস করিল।—শিল্পীর বাহিরে যাইবার আদেশ নাই,—উদ্যানের সীমা লঙ্ঘন নিষেধ। দ্বারে প্রহরী।—বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে এখনও সকল মূর্ত্তি গঠিত হয় নাই।—কিন্তু তাহাতে শিল্পীর বিরক্তি ছিল না,—কন্যার বর্ণনানুযায়ী মূর্ত্তি রচনা করিতে করিতে সে আনন্দে বিভোর থাকিত,—যে প্রতিমা নির্ম্মাণে যেন মাদকতা ছিল,—উত্তেজনা ছিল। কর্ম্মাবসরে স্নানাহারকালেও সে সেই চিন্তায় অন্যমনস্ক থাকিত!—রাজকন্যার গোপনরহস্যে সেও যেন অন্তরের সহিতই যোগ দিয়াছিল।

বৎসর শেষ হইল,—রাণী অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিলেন। কন্যার এই নূতন খেয়ালের তিনি কোন কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।—তিনি সখিদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কত দেরী?" তাহারা রাজকুমারীর নিকট জানিয়া বলিল "আর বিলম্বের কারণ কিছুই নাই।—বল গিয়া তিনি সত্বরই স্বয়ম্বরা হইতে চান্।—তবে বিবাহে তাঁহার বিশেষ পণ আছে সেই গুলি যথাযথ পালিত হইলেই তিনি বিবাহ করিবেন নতুবা নহে—।

স্বয়ম্বরা। রাণী বিরক্ত হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"তা বীণাই আমার স্বয়ম্বরা হইবার যোগ্যা কন্যা।—আমি এখনই তাহার উদ্যোগ করিতেছি। কিন্তু তাহার পণ কি?"

দাসী বলিল,—"তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে সম্প্রতি তিনি যে চারিটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছেন, বিবাহার্থীকে তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।"

"প্রকৃত মূল্য? এ কথার অর্থ?"

"অর্থ আর কি? পুত্তলির যাহা ন্যায্য মূল্য তাহাই বলিতে হইবে।"—

হাসিয়া রাণী বলিলেন,—"স্বর্ণকারের কার্য্য রাজপুত্রগণকে করিতে হইবে বুঝি?"—

রাজা বলিলেন "সে যাহাই হউক,—বীণা যাহা ইচ্ছা করিয়াছে তাহাই হইবে,—আমি এই মর্ম্মেই স্বয়ম্বর ঘোষণা করিব।"—পরে দাসীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"এ ঘোষণা কি রাজন্যবর্গের জন্য—না মনুষ্য-নির্ব্বিশেষে হইবে?—বীণা একথা কিছু বলিয়াছে কি?"

নতশিরে দাসী বলিল,—"হাঁ মহারাজ, রাজকন্যা বলিয়াছেন এ নিমন্ত্রণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হইবে। তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলে সে যেই হউন তিনিই তাঁহার বরমাল্য লাভ করিবেন।"—

রাণী বলিলেন,—"সে যদি একজন সামান্য স্বর্ণবণিক হয়?"—

হাসিয়া রাজা বলিলেন "তুমি ভুল বলিতেছ রাণি,—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বলাতেই বুঝিতে হইবে যে সহজ লোকের পক্ষে ইহা অসাধ্য, কন্যার প্রতি অবিচার করিতেছ কেন—জান ত সে হিন্দুধর্ম্মে প্রবল অনুরাগিণী!"

স্বয়ম্বরের সংবাদ দেশময় প্রচারিত হইল!

অদ্ভুত পণ!—পুত্তলির মূল্য নির্ণয়;—ইহার অর্থ কি মন্ত্রিন্?—

রাজারে অনেক মন্ত্রী অনেক অর্থ করিলেন,—তবে ইহার সাধারণ অর্থ আর কি হইতে পারে?—সঙ্গে উৎকৃষ্ট নিকষ,—বিজ্ঞ স্বর্ণবণিক,—স্বর্ণকার এবং একজন গণিতশাস্ত্র বিশারদকে লইয়া যাইতে হইবে।—উত্তমরূপে পরীক্ষার পর, স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ,—ইহা আর বেশী কথা কি?!—

তাঁহারা সকলেই ভাবিতেছিলেন,—কিছুই কঠিন নয় এ পণ!—আমিই নিশ্চয় রাজকুমারীকে লাভ করিব!—কিন্তু একটু আশঙ্কা,—যদি অন্য কোন রাজা বা রাজপুত্র আগেই গিয়া পরীক্ষায় জয়ী হইয়া বসে?—

সাধারণ লোকও অনেক চলিল, কেহ দর্শনার্থী আর কাহারও বা এমনও আশা ছিল যে—'যদি রাজগণ পরাস্ত হন—তবে একবার আমরাও চেষ্টা করিয়া দেখিব!'—

(৩)

অবন্তী নগরের বহির্দ্দেশে বিশাল প্রান্তরে সুবিস্তীর্ণ পটাবাস নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।—নিমন্ত্রিত প্রত্যেক রাজার জন্য এক এক অংশ পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে সজ্জিত,—তাহাতে—শয়ন উপবেশন ভোজনাদির জন্য উৎকৃষ্ট স্থান,—পারিষদগণের জন্য, কর্ম্মচারীবর্গের জন্য,—হস্তী অশ্ব শকটাদির জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা।—তাহাতে যথাযথ দাসদাসী খাদ্য পেয়াদির প্রাচুর্য্য দেখিয়াও সকলে বিস্মিত হইলেন।—

নিকটের রাজগণ পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন।—রাজকন্যা বলিলেন—"অনর্থক বিলম্ব করিয়া ফল কি যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পুত্তলি প্রেরিত হউক,—প্রত্যেক রাজা দশদিন করিয়া সময় পাইবেন, ইতিমধ্যে প্রতিমার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া আমায় জানাইবেন,—উত্তর সত্য হইলেই আমি তাঁহাকে বরণ করিব।"—

তাহাই হইল।—মহারাণীর বিশেষ অনুরোধে পুত্তলি সর্ব্বাগ্রে মগধশিবিরে প্রেরিত হইল।—দেখিয়া মগধ রাজকুমার ভাবিলেন আমিই সৌভাগ্যবান,—কারণ এ পুত্তলির মূল্য নির্ণয় কিছুমাত্র কঠিন নহে!—

কি সুন্দর গঠন!—প্রথম দিন পুত্তলি কয়টি হাতে হাতে শুধু দেখিতে দেখিতেই ফিরিল।—চারিটি মূর্ত্তিই একই আকারের,—প্রসন্ন সহাস্যবদনা স্বর্ণময়ী নারী;—কোমল বিশদ নেত্রা শ্বেতোজ্জ্বলা রজত-প্রতিমা;—আর সেই অতুল্য কারুশিল্প তাম্র ও লৌহ প্রতিমাদ্বয় সহসা দৃষ্টি আকর্ষিণী না হইলেও একবার চক্ষু তাহাতে পতিত হইলে দৃষ্টি ফিরাইতে পারা কঠিন! সে গঠনের—সে ভঙ্গীর বুঝি তুলনা নাই।

দ্বিতীয় দিন হইতে রাজার সুদক্ষ স্বর্ণকার কতই না উপায়ে পুত্তলিকা চতুষ্টয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাজাকে জানাইল; সে ফল রাজা দেখিলেন মন্ত্রী দেখিলেন,—ধনাধ্যক্ষ দেখিলেন? অবশেষে সকলেরই বিশ্বাস হইল গণনা নির্ভুল।—পুলকিত হৃদয়ে রাজা ভাবিলেন—কল্য প্রভাতে আমিই এই বিশাল অবন্তীরাজ্যের আধিপত্য ও তাহার সহিত সর্ব্বজনপ্রার্থিতা কুমারী বীণার পাণিলাভ করিব!

আশায় উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতেই রাজা পুত্তলিকা ও তাহাদের মূল্যতালিকা রাজকন্যার নিকট প্রেরণ করিলেন। কি উত্তর আসিবে? কখন আসিবে?—শীঘ্রই আসিতেছে, এত উৎকণ্ঠা কেন? রাজকন্যা তাঁহারই। বালিকা এ কি তুচ্ছ পণ লইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র ভূপতিকে আহ্বান করিয়াছিলে? এত সামান্য বাহা,—রাজা অন্তরে অন্তরে হাসিয়া আকুল হইলেন।

দণ্ডদ্বয় মধ্যে দূত ফিরিয়া আসিল। কি সংবাদ? রাজকন্যা কি বলিলেন! দূত তাঁহাদের প্রেরিত পত্রখানি ফিরাইয়া দিল—উপরে স্বর্ণাক্ষরে রাজকন্যা লিখিয়াছেন "গণনা ভুল, পুত্তলির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই।"

আনন্দ-উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল ;—কিয়ংকাল স্তব্ধ থাকিয়া রাজকুমার বলিলেন—এত করিয়া গণনা করিয়াও ভুল করিলে ? ধিক্ !”

বণিক তৌলিক—সকলেই অধোমুখ, মগধ-শিবির নীরব হইয়া গেল।

পরদিন কাশীরাজের পালা। মগধের পরাজয়ে তাঁহার আনন্দের সীমা নাই,—রাজরাণীর পক্ষপাতিতায় মগধ প্রথম স্থান পাইয়াছিল—নতুবা কাশীরাজের তুল্য কে ? নির্ব্বোধ মগধ হারিয়াছে,—এখন আর রাজকন্যার জন্য ভাবনা নাই, তিনি তাঁহারই ! অবন্তীর বিশাল রাজ্য কাশীরাজ্যে যুক্ত হইলে আর তাঁহাকে কে পাইবে—দুইদিনে মগধ জয় অনিবার্য্য,—তাহার পরই বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিবেন ! হয় ত—হয় ত একদিন কাশীই যে ভারত সাম্রাজ্যের একছত্রী সম্রাট হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

দশম দিনের প্রভাতে কাশীরাজের নির্ণয়পত্র রাজকন্যার নিকট প্রেরিত হইল। আবার আশা উদ্বেগ,—কিন্তু উত্তরও ঠিক তেমনি নৈরাশ্যপূর্ণ !—কাশীরাজেরও মীমাংসাপত্র ভ্রমপূর্ণ—রাজকন্যা আবার এই উত্তর পাঠাইয়াছেন ।

পরদিন কাঞ্চীরাজের পালা। যথারীতি চেষ্টা ও দশদিনের প্রভাতে রাজকন্যা তাঁহার উত্তরও “হয় নাই” বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে দশার্ণ-ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, কোশল, মথুরা, সিন্ধু ও কাশ্মীর। একে একে সকলেই পুত্তলি পাইলেন—এবং কাহারও উত্তরই বীণাপাণির মনোনীত হইল না !

একি রহস্য ! এতগুলি দেশের বিজ্ঞ স্বর্ণবণিক, রাজন্যবর্গ, সুধী মন্ত্রীগণ সকলেই কি মূর্খ—অন্ধ—জ্ঞান নাই কাহারও ? রাজকন্যা কি এই সকলকেই উপহাস করিতে ডাকিয়াছেন ? সকলেই চিন্তিত—কিন্তু পরাজয়সত্ত্বেও কেহ দেশ ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না,—কে জয়ী হইবে—কেমন করিয়া—কি উত্তর দিয়া জয়ী হইবে—এই কৌতূহলে সকল রাজাই শিবিরে বাস করিতে লাগিলেন।

অবন্তীরাজেরও অর্থব্যয়ের সীমা নাই, প্রত্যহ সেই চতুরঙ্গসজ্জিত রাজন্যগণের পরিচর্য্যা আহারাদির ব্যয়ে তিনিও যেন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে তাঁহার দুঃখ ছিল না,—কিন্তু কন্যার যে কি ইচ্ছা তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। রাণী বলিতেছিলেন, বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তাই বীণা এ সকল উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে ! নতুবা এতগুলি রাজার উত্তরও কি ভুল হয় ? বীণা কি এত বিদুষী ?

রাজগণ অবন্তী ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু রাজকন্যার আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে কি ঘটে দেখিবার জন্যই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট রাজারাও পরাস্ত হইলেন। রাজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধারণ লোকও কেহ অগ্রসর হইল না। শেষে রাজকন্যার পুত্তলি সে দিন অপরীক্ষিতভাবে পড়িয়া থাকিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া রাণী বলিলেন, “কন্যার আর বিবাহ হইয়াছে !”

(৪)

মগধরাজকুমারের বাল্যবন্ধু তারানাথ, স্বয়ম্বর ঘোষণার সময় দেশে ছিলেন না। তিনি দেশে ফিরিয়া এই দেশব্যাপী মহা-উৎসাহজনক সেই দীর্ঘ্যকালব্যাপী স্বয়ম্বরের উৎসব দেখিবার জন্য অবন্তী দেশে মগধকুমারের অতিথি হইলেন।

রাজকুমারের বন্ধুকে পাইয়া মহানন্দ! "সখা, আর এ পুরাতন অবসাদজনক শিবিরবাস সহ্য হয় না,— কৌতূহলের দায়ে চলিয়া যাইতেও পারিতেছি না—অথচ এ বিরক্তি যেন অসহ্য হইয়া পড়িতেছে!—এ সময় তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

তারানাথ প্রশ্ন করিলেন,—"কি সে অদ্ভুত পুত্তলিকা? কতগুলি রাজা আজ বৎসরকাল ধরিয়া যাহার মূল্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না,—সে পুত্তলিকা কেমন?"

মগধকুমার হাসিয়া বলিলেন—"শুধু রাজগণও ত নয়, কত প্রসিদ্ধ স্বর্ণকারেরও মূল্য নির্ণয় ব্যর্থ হইয়া গেল। বুঝিয়াছি,—এসকলই রাজকুমারীর ছলনা। ডাকিয়া রাজন্যবর্গের অপমান করাই তাঁহার অভিপ্রায়। কি করিব, স্ত্রীলোক—কিন্তু অবন্তি-মহারাজ কেন আমাদের এ কষ্ট ভোগ ও লজ্জা দিলেন?—এ অন্যায়ের কি প্রতিবিধান নাই?"

তারানাথ বলিলেন—"অবন্তীর উপর অন্যায় ক্রোধ করিতেছ বন্ধু! এই বৎসরাধিক কাল ধরিয়া তোমাদের আতিথ্য-সৎকারে তাঁহার কত চেষ্টা কত ব্যয় ও কিরূপ চিন্তা গিয়াছে তাহা ভাবিতেছ না কেন? কন্যার বিবাহ দিতে কোন্ পিতার অনিচ্ছা?—তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইও না। তবে রাজকুমারীও তাঁহার পুত্তলি"—মুহূর্ত্তকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারানাথ বলিয়া উঠিলেন—"ভাল সখা, আমি একবার সেই প্রতিমা চারিটি দেখিতে পাই নাকি?"—

রাজকুমার হাসিলেন। "পুত্তলি? তুমি পুত্তলি দেখিয়া কি করিবে সখা? যদিও সে শিল্প চতুষ্টয় দ্রষ্টব্য-হিসাবেও সুন্দর—"

কতকটা তাহাও বটে!—তারানাথ বন্ধুর কথার সহিত বলিয়া উঠিলেন, কতকটা তাহাও বটে!—এ দেশের লোক যাহার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে—সে পুত্তলি দেখিতেও সাধ যায় সত্য।"

"পুত্তলি দেখিতে আসে নাই তারা, তবে তোমার যখন এতই সাধ তাহা দেখিতে,—তা আমি বোধ হয় তোমার সে বাসনা মিটাতে পারি;—অদ্য প্রাতে দূত বলিয়া গিয়াছে, "যদি আবার কোন রাজা ইচ্ছা করেন তবে পুত্তলি আনাইয়া যতদিন ইচ্ছা রাখিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।"

তারানাথ আনন্দিত হইলেন। রাজাও নূতন উৎসাহে বলিয়া পাঠাইলেন যে আমার শিবিরে আর একবার পুত্তলি প্রেরিত হউক।

যথাসময়ে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি কয়টি আসিল।—বহুলোকের করস্পর্শেও তাহাদের দেহে কিছুমাত্র মালিন্য দেখা যায় না,—রাজকন্যা স্বয়ং তাহাদের অঙ্গের চিহ্ন কালিমাদি পরিস্কার করিয়া যেন নূতন করিয়া রাখিয়াছেন।—

মূর্ত্তি আনীত হইলে তারানাথ বলিল "এ পুত্তলি আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, তুমি এক মাস সময় লইবে। আর আমার জন্য একটা নির্জ্জন শিবির নির্দ্দেশ করিয়া দাও, পাচক ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইবে না—এমন কি তুমিও না!"—

রাজকুমার উচ্চহাস্য করিলেন!—"বটে! এমনভাবে পরীক্ষা?—এ পরীক্ষায় নূতনত্ব আছে বটে!—ভাল তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে।"

নদীতীরে—শূন্য প্রান্তরের সম্মুখে দ্বার রাখিয়া তারানাথের নির্জ্জন নীরব শিবির প্রতিষ্ঠিত হইল।—পার্শ্বে সরল সুদীর্ঘ পুরাতন বৃক্ষতলে শিলাসন,—দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর ঘন নীলিমা,—মৃদু হাসিয়া তারানাথ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মগধ-শিবিরেও কোন বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না,—মাঝে মাঝে রাজা, পাচককে প্রশ্ন করেন যে "বন্ধু কি করিতেছে ! কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতেছে ?—"

পাচক উত্তর দেয়—"সে কখনও তারানাথকে পরীক্ষা বা সেরূপ কোন চেষ্টা করিতে দেখে নাই।—প্রত্যহই সে দেখে যে তিনি স্নানাদি করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। পুত্তলি কয়টি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান. আহার প্রারম্ভে যুবক আহার্য্যদ্রব্যাদি সেই প্রতিমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেন—বোধ হয় যেন নিবেদন করিতেছেন।—তার পর স্বয়ং আহার করেন।—" ইহার অধিক আর সে কিছুই জানে না।

রাজা বিস্মিত হইলেন। কিভাবে সে পরীক্ষা করিতেছে দেখিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিতেছিল. গোপনে তিনি লুকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোথায় কি ?—তারানাথকেও কখনো সে সকল কিছুই করিতে দেখিতে পাইলেন না !—কখনো বা দেখিলেন তিনি নদী-সৈকতে বসিয়া কোন একটি প্রতিমাকে ক্রোড়ে লইয়া সঙ্গীতমগ্ন,—"হৃদয়ে দেখি তোমা যে চারু-সাজে,—এসগো সেই রূপে জগত-মাঝে !"—কখনো বা শিলাসনে বসিয়া পুত্তলি-সম্মুখে ধ্যানমগ্ন,—বাহ্য-চৈতন্য হীন. দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির প্রতিই স্থির—তাহাতে আর প্রকাশ্য দর্শনশক্তি নাই ! কখনো বা এমনো দেখা যায় যে পুত্তলি কয়টিকে লইয়া তারানাথ, স্নানে নামিয়াছেন,—খেলার ছলে হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন—তাহাদিগকে স্নান করাইয়া অঙ্গমার্জ্জন করিয়া বস্ত্রাদির অভিনব সজ্জা প্রদান করিতেছেন ! যেন খেলা—যেন পূজা—!

প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া মাস অতীত হইল। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় কুমার পরিষদগণের সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন. সকলেই খেলায় নিবিষ্টচিত্ত.—খেলা শেষ হইয়া আসিতেছে, জয়-পরাজয়ের প্রতি উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি ও চিন্তা নিবদ্ধ,—তারানাথ নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বসিলেন।

সেবারের খেলা শেষ হইল। জয়ের আনন্দে কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া কুমার মুখ তুলিয়াই মিত্রকে দেখিতে পাইলেন,—তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন !—"জয় হৌক ! রাজকুমারের সর্ব্বত্রই জয় হউক !"

"এতদিনে রাজকুমারকে স্মরণ হইল নিষ্ঠুর !—তোমার পুতুল খেলা শেষ হইয়াছে এতদিনে ?"—সখাকে আলিঙ্গন করিয়া কুমার গদগদকণ্ঠে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন।—

তারানাথ বলিলেন, "সেও ত তোমারই জন্য সখা !—তোমার জন্য এই চিন্তা আমায় অতদূর অগ্রসর করিতে পারিয়াছিল নতুবা শুধু ঐ পুত্তলি লইয়া এই যে মাসকাল আমার যত্ন ও পরিশ্রম—তাহার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? না ঐ সকল অকারণ কার্য্যেই আমার তেমনভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইত ?—"

"কোন প্রয়োজন ছিল না, পুত্তলির মূল্য লইয়া আমার আর কোন উদ্বেগ নাই,—এখন আমি কিছুদিন তোমার সহিত বাস করিতে চাই।—সেই বাল্যকালে—সেই গুরুর নিকট শিক্ষার সময় আমরা দুইজনে যেমন একত্র একভাবে থাকিতাম,—তেমনি—"

সাদরে রাজকুমারের কর চুম্বন করিয়া তারানাথ বলিলেন,—"দরিদ্র বন্ধুকে এত ভালবাস সখা ?—ধন্য !—তোমারই জন্য একটা কাজ করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া আজ আমার চিত্ত যেন ভরিয়া উঠিতেছে !—সে কাজ যতই তুচ্ছ হৌক না কেন, এই সমস্ত ভারতের নৃপতি-সমাজের মধ্য দিয়া তুমি উচ্চ মাথায় রাজকন্যার বরমাল্য পরিয়া দেশে ফিরিবে,—এ চিন্তায় আমার বড় সুখ হইতেছে প্রিয়তম !—এ দীনহীন বন্ধুর অতি ক্ষুদ্র কার্য্য প্রার্থিতার স্পর্শের মধ্য দিয়া যখন তুমি অনুভব করিবে—"

কুমার হাসিয়া উঠিলেন। "কি বলিতেছ সখা?—তুমি কি সত্যই উন্মাদ হইয়াছ?—কোথায় প্রার্থিতা—আর কোথায় তাহার স্পর্শ—! কি বলিতেছ তুমি?—তোমার পুতুলখেলার পরিণাম"—

তারানাথও হাসিয়া বলিলেন,—"তাহার পরিণাম তোমার বিবাহ!—এই বিশাল জনতার মাঝ দিয়া মহা-গৌরবের অভিযান!—আমি কেবলই সেই কথা ভাবিয়া সুখানুভব করিতেছি,—তোমার সেই আনন্দ-গৌরবের স্বয়ম্বর মাল্য লাভের—"

হাসিয়া কুমার লুটাইয়া পড়িলেন।—তাঁহার সখা কি বলিতেছে?—যাহাই হউক এ সকল কথা লইয়া হাসি তামাসা সেও মন্দ নয়।—তিনি পরিহাসের স্বরে বলিলেন,—"তাহার পর?—বিবাহ উৎসবে তুমি কিসের পদ লইবে তারা?—গায়কের! না ক্রীড়কের?—"

"আমি—? আমি ভোজনের আসনে বসিব সখা? পাহাড়েপাহাড়ে বেড়াইয়া শ্রান্ত আছি—ভাল করিয়া আহারাদিও হয় নাই,—তোমার বিবাহের কল্যাণে কয়দিন খাইয়া বাঁচিব!—আর সখা, যদি রাজকুমারীর আর কোন প্রয়োজন না থাকে—পুত্তলি কয়টী আমায় দিতে বলিও।—আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।"—

"সত্য?—তাহা দেখিয়াছি বটে!—কিন্তু তোমার পুত্তলিলাভ ও আমার মাল্যলাভ—এ দুয়ের মধ্যে সম্ভাবনার স্থিতি কতখানি বল দেখি? অতলস্পর্শ সাগর না হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ?—কত বড় দূরত্ব!—"

কিছুমাত্রও না!—এখান হইতে অবন্তি-প্রাসাদ—এইটুকু দূরত্ব মাত্র!—যাও বিলম্ব করিও না, এখনি রাজভবনে সংবাদ পাঠাও যে "কল্যই তুমি স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিতেছ,—রাজকুমারী যেন প্রস্তুত থাকেন—কল্যই তাঁহার বিবাহ।"—

বন্ধুর দৃঢ়-স্বর শুনিয়া রাজকুমারের অন্তরও চমকিত হইয়া উঠিল।

রাজকুমার নিঃশব্দে সখার প্রতি চাহিলেন। দীর্ঘ উন্নত বলবান দেহ—কৃষ্ণকেশরাজিমণ্ডিত বৃহৎ মস্তক, প্রশস্ত ললাটের নিম্নে বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু যেন হাসিতেছে?—শুদ্ধভাবে রাজকুমার তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

(৫)

প্রভাতে কোলাহলে ও উৎসাহে ক্ষুদ্র অবন্তী যেন ঝঞ্ঝাচঞ্চল সাগরের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

নৃপতিগণ বিস্মিত!—মগধ কি গণনায় মূল্য নির্দ্ধারণ করিল!—রাজকন্যা কি সে মূল্য মনোনীত করিয়াছেন!—একেবারে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান!—কি করিয়া কি হইল!—মগধ কি করিল।

কেহবা হাসিল—কেহ পরিহাস করিল—অনেকে রাজরাণীর ষড়যন্ত্রের কথাও বলিতে ভুলিল না!—"রাজকুমারী অবশেষে মাতার চেষ্টায় মগধকে বিবাহ করিতেছেন!—বিবাহ ত হওয়া চাই!—দেখিলে না, পুনরায় যখন আবার পুত্তলি প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখনই ত বোঝা গিয়াছিল যে এখন রাজকুমারীর আপনার প্রয়োজনও বড় মাথা তুলিয়াছে।"

যাহাই হউক—বিবাহ দেখার কৌতুহল কাহারও কম ছিল না!—মুহূর্ত্তমধ্যে রাজসভা পূর্ণ হইয়া গেল।

মণ্ডপ মধ্যে —সম্মুখেই পাত্রমিত্রবেষ্টিত মগধরাজকুমার,—পুত্তলি চারিটী বস্ত্রাবৃত হইয়া তখনও তাঁহাদেরই নিকট স্থাপিত ছিল।—রাজকুমার স্বহস্তে বীণাপাণিকে তাহা প্রদান করিবেন!—প্রত্যেক পুত্তলির কণ্ঠে তাহার প্রকৃত মূল্যতালিকা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।—কন্যা নিজে তাহা দেখিয়া লইবেন!

কিন্তু কন্যার নিকট হইতে এ কথার আপত্তি আসিল!—পুত্তলির মূল্য যথার্থই হইয়াছে কিনা এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে।—তিনি মগধের আহ্বানে প্রকাশ্য-সভায় যাইতে প্রস্তুত ন'ন!—তবে জালান্তরালে উপবিষ্টা থাকিয়া তিনি পুত্তলি পরীক্ষা করিতে পারেন।

তাহাই হইল —যাহারা শুধু রাজকন্যাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইল।—রাজগণ বুঝিলেন—"এই কন্যা বুদ্ধিমতী বটেন!—মগধের কথায় তাহারাও হতবুদ্ধি হইয়াছেন কিন্তু তিনি হন নাই!—আপনার কর্ত্তব্যে তাঁহার কোনখানেই ত্রুটী নাই!—সহসা কোন নূতন কথা তুলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া অসাধ্য।

সভা পরিপূর্ণ,—স্বর্ণ-যবনিকার অন্তরালে রাজকন্যা আগমন করিলেন, কঞ্চুকি আসিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে তাঁহার প্রণাম জানাইল। অরুণবসনা তরুণী দাসী -তপনপ্রমুখিনা উষার ন্যায় জালসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—মগধকুমার একবার অন্তরে অন্তরে শিহরিলেন।

অবন্তী-মন্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন,—"মগধরাজকুমার পুত্তলির মূল্য নির্ণয় করিয়াছেন—এই কথা কল্য দূতমুখে কথিত হইয়াছে,—সমবেত রাজন্যবর্গকে সেই জন্য আমরা নিমন্ত্রণ করিয়াছি।—এক্ষণে কুমার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন।"

রাজকুমার শুষ্কমুখে তারানাথের প্রতি চাহিলেন।—তাঁহার মুখে অস্পষ্ট হাসি—চক্ষে স্পষ্ট সঙ্কেত!—মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "হাঁ আমরা মূল্য নির্ণয় করিয়াছি বটে!—তবে তাহার সত্যাসত্য কুমারীর বিচারে প্রতিপন্ন হইবে।"

কঞ্চুকী পুত্তলি লইয়া দাসীকে দিল,—সে অন্তরালস্থিতা রাজকন্যার নিকটে লইয়া গেল।—মুহূর্ত্তকালও নহে—তৎক্ষণাৎ দাসী ফিরিল!—"হাঁ যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইয়াছে!"—স্বর্ণপুত্তলির মূল্য স্থির!—সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া গেল!—মগধের বক্ষোরক্ত সবেগে উছলিয়া উঠিল, তারানাথ হাসিতেছিলেন—বালকের ন্যায় মুক্ত আনন্দের হাসি!

রৌপ্যপুত্তলি দেখিয়াও রাজকন্যা বলিলেন—"ইহারও যথার্থ মূল্য নির্ণীত হইয়াছে!—" কন্যার নিকট-বর্ত্তিনী সঙ্গিনীগণ দেখিল বীণাপাণির মূর্ত্তি স্থির, দেহ ঘর্ম্মাক্ত—আসন্ন লজ্জায় অথবা কি জানি কেন,—ঘনীভূত সৌন্দর্য্যের সহিত চন্দ্রকান্তি বদনমণ্ডল অরুণদর্শন-সম্ভাবিতা পদ্মিনীর ন্যায় কোমল।

ক্রমে তাম্রপ্রতিমা আসিল ও তাহার কণ্ঠ-লগ্ন পত্রে দৃষ্টি করিয়াই কন্যা বলিলেন—"হইয়াছে!" তাহার পর লৌহমূর্ত্তি আসিল।—ভাবস্তম্ভিত মুখে সতৃষ্ণভাবে কন্যা তাহার প্রতি চাইলেন—ইহার কণ্ঠে মূল্যতালিকা নাই।—চরণপ্রান্তে স্বর্ণপত্রে উৎকীর্ণ—অক্ষরমালা!

তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যা অধোমুখ হইলেন!—আবার চাহিলেন,—সেই উজ্জ্বল স্বর্ণময় ভাষা—"ইহার মূল্য আমি স্থির করিতে পারিলাম না,—বোধ হয় অমূল্য।"

সখীরা দেখিতেছিল,—রাজকন্যার মুদিত প্রায় নয়ন হইতে জলধারা ঝরিতেছে—কতক্ষণ পরে সেই স্বর্ণলিপিখানি কপালে স্পর্শ করাইয়া গদগদস্বরে তিনি বলিলেন, পিতাকে গিয়া বল, "আমার সমস্ত উত্তরই মিলিয়াছে,—যিনি এই প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছেন তিনিই আমার স্বামী ?"

প্রতিহারী জানাইল, "রাজকন্যার সকল প্রশ্নের উত্তরই ঠিক্ হইয়াছে।"

মগধদলে মহাহর্ষে জয়ধ্বনি উঠিল।—অবন্তীরাজ উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। আদেশ দিলেন, "উত্তর যখন বীণাপাণির মনোমত হইয়াছে তখন তিনি এই সভায় আসিয়া রাজকুমারকে মাল্যদান করুন; কারণ তাহাই স্বয়ম্বরের প্রথা।"—

মগধের অদ্ভুত জয়ে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।—ইহার পর কন্যার আগমন সম্ভাবনায় তাঁহারা আরও অভিভূত হইয়া গেলেন। যাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলেই একদৃষ্টে যবনিকার প্রতি চাহিয়া থাকিলেন।

রাজকুমারী আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন।—অতুলনা সুন্দরী!—হাঁ তাহাই ত!—মেঘান্তরিত সূর্য্যের সহসা প্রকাশে নব রৌদ্রালোকের ন্যায় সে রূপজ্যোতিঃতে সভা যেন আলো হইয়া গেল!

সুগঠিত মর্ম্মরপ্রতিমাবৎ শুভ্রকান্তি, নিটোল দেহযষ্টি বেষ্টন করিয়া পদ্মরাগদ্যুতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চিনাংশুক, প্রতিপাদক্ষেপে তাহার স্তরেস্তরে আলোছায়ার মনোমদ শোভা,—বক্ষস্থল আবৃত করিয়া মুক্তাহার সারি দিয়াছে,—একখণ্ড প্রকাণ্ড হীরক কণ্ঠনিরূপে জ্বলিতেছে।—মস্তকে চূর্ণ হীরকের শোভন শিরোভূষণ,—তাহা হইতে তিনটী প্রকাণ্ড দীর্ঘ মুক্তা নামিয়া সম্মুখের কপালে পড়িয়াছে—তাহারই উর্দ্ধে হীরকশুভ্র পক্ষীপক্ষচূড়া,—ধীর পাদবিক্ষেপের তালে তালে নূপুর বাজিতেছিল,—কন্যা আসিয়া সেই অগণিত মুকুটধারীগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন—সকলেই ভাবিতেছিলেন,—যেন কোন দেবীপ্রতিমা আনিয়া কে সেখানে স্থাপন করিয়া গেল!—ইনি যেন মূর্ত্তিমতী ইন্দিরা—যেন স্বরূপিণী বীণাপাণি!

অবন্তীরাজ ডাকিলেন—'এস মা! ইনিই মগধরাজকুমার,—তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ইনিই তোমার বরমালা লাভাধিকারী হইয়াছেন,—এস এই রাজগণের সম্মুখে তুমি ইহাকে বরণ কর।"

কুমারী অগ্রসর হইয়া পুষ্পাধার হইতে আনন্দকল্যাণী নাম্নী বিচিত্র মালা রাজকুমারের কণ্ঠে পরাইতে উদ্যত হইলেন।—রাজান্তঃপুরে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল—সভাপ্রান্তে বাদ্যকরদল বাদ্যোদ্যম করিবার জন্য প্রস্তুত—এমন সময় মগধকুমার যেন চমকিত হইয়া পিছাইয়া গেলেন!—

"স্থির হও রাজকুমারী!—মহারাজ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।"—

রাজকুমারী যে ইচ্ছায় ইহার এই পণ করিয়াছিলেন তাহার মীমাংসা কিরূপভাবে ও কাহার দ্বারায় ঘটিয়াছে তাহা সমস্ত না শুনিয়া মাল্যদান করিবেন কেন?

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তারানাথ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"একি বলিতেছ রাজকুমার? আমার এত কষ্ট সব বিফল করিবে?—" সেইরূপ মৃদুস্বরে কুমার বলিলেন,—"তুমি স্থির হও! রাজকন্যার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতে হইবে।"—পরে পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"শুনুন্ অবন্তিরাজ! রাজকুমারি—আপনিও অনুধাবন করুন,—তাহার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন। স্বর্ণকার বা বণিকের সহায়তায় যেভাবে পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ চলিতেছিল তাহাতে যদি আমি বা অন্য কেহ জয়ী হইতাম তাহা হইলে সে জয়পরাজয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিত এবং কন্যার মাল্যলাভের অধিকারী হইতাম।

এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা ঘটে নাই;—মাত্র একজনের বুদ্ধিবলে,—কার্য্যগত বুদ্ধি নহে—তাহা কেবল মানসিক চিন্তার প্রাচুর্য্য মাত্র,—সেই অসাধারণ ধীশক্তিমান মহাত্মার কৃত এই গৌরবজনক কার্য্যের কৃতিত্ব আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি—আর সে হিসাবে এই অসামান্যা বুদ্ধিমতী নারীর পাণিগ্রহণেরও বোধহয় আমি যোগ্য নহি!—এই যে দিব্যকান্তি পুরুষ, আমার সখা এই রাজনন্দিনীর উপযুক্ত পাত্র,—কন্যা বোধহয় এমন স্বামী কামনা করিয়া সেই আশ্চর্য্য পণ করিয়াছিলেন।—ইঁহাদের মিলন হোক্ ইহাই আমার একমাত্র কামনা।”—

কুমার নীরব হইলেন। সকলের দৃষ্টি তারানাথের প্রতি ফিরিল। তাঁহার মুখ ভয়ে বা লজ্জায় বিবর্ণ,—হাঁ মহারাজ আমিই এ কার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু রাজকুমারীর পাণিলাভের আশায় করি নাই—সে কথা মনে জাগিলে নিশ্চয় এ কার্য্য করিতাম না ইহা স্থির—! আমি সামান্য শ্রমজীবি—কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করি—রাজপুত্রের প্রীতির জন্যই পুত্তলিগুলিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অবন্তিপতি বলিলেন,—“তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু রাজকুমার যখন আপনাকেই সমস্ত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন তখন আপনি বিবাহ করিবেন না কেন?”—

“বিবাহ কেন করিতে চাহি না তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না—বিবাহে আমার মন নাই এই পর্য্যন্ত;—স্তব্ধ সভায় গুঞ্জন উঠিল—কন্যা আপনার হাতের মালা তারানাথের চরণতলে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিতা, মগধকুমার ও অন্যান্য সভাস্থ সকলকে প্রণাম জানাইয়া মৃদু গতিতে যবনিকা-অন্তরালে চলিয়া গেলেন।—

আবার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

(৬)

অবন্তিরাজ তারানাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন “তবে এখন বিবাহের আয়োজন করিতে পারি কি?”

“বিবাহ!—না মহারাজ বিবাহে ত আমার কখনও আপত্তি নাই! —তবে রাজকন্যা বিবাহে আমি প্রস্তুত নই!—রাজকুমারের জন্যই আমি এ কাজ করিয়াছিলাম, আমার বড় সাধ ছিল যে সখার জয়লাভ দেখিয়া—নিজেও সুখী হইব;—কিন্তু—”

তারানাথ অধোবদন হইলেন।—রাজা বিমর্ষভাবে বলিলেন—“যে জন্যই হউক ঘটনা যখন তোমার এই অবস্থার উপস্থিত করিয়াছে এবং আমার কন্যা তোমাকেই মাল্যদান করিয়াছে তখন তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে!”

মৃদু হাস্যের সহিত তারানাথ কহিলেন,—“রাজকন্যা ভুল বুঝিলেন,—আমার বন্ধুই তাঁহার এ ভ্রমের কারণ—আমায় কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে যে ঐশ্বর্য্য আর দারিদ্র্য পরস্পরের বিরোধী গুণ—ইহাদের মিলন প্রায়—”

বাধা দিয়া মগধকুমার বলিলেন,—“তোমার কথাগুলা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে না সখা!—ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্যকে যাঁর ন্যূনাধিকভাবে দেখ—তবে আমায় সখা বলিতেও বোধহয় তোমার আপত্তি—”

তারানাথ লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিলেন,—“বন্ধুত্ব স্বামীত্ব—এ উভয় কি সমতুল্য সখা?”—

এইবার পুনরায় রাজকন্যার দাসী যবনিকার বাহিরে আসিল।—সে করযোড়ে রাজাকে জানাইল,—“বিবাহের জন্য যেন ইঁহাকে উত্ত্যক্ত করা না হয়!—”

অবন্তীরাজের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল,—দাসীর কথায় অস্ফুট গর্জ্জনস্বরে তিনি বলিলেন,—“না আমি কাহাকেও উত্ত্যক্ত করিতে চাই না!—কিন্তু বীণাকে বুঝিতে বল—সভার মধ্যে এভাবে তাহার মান্যের অপমান—আমারও অপমান!”—

"অপমান! মহারাজ! ইহা আপনাকে ব্যথিত করিল? না, আমি কাহারও মনে কষ্ট দিতে চাহি না! আমারই ভুল হইয়াছিল—আমি আপনাদের দাসেরও তুল্য নই—আমার দ্বারায় আপনাদের অপমান সম্ভবে না!—রাজকুমারীর দত্ত সম্মান আমার শিরোধার্য্য!"—বলিয়া তারানাথ পদতলের মাল্য তুলিয়া মস্তকে বেষ্টন করিলেন।

দূরস্থ রাজগণ তাঁহাদের এ সকল বাক্যালাপ শুনিতে পান নাই।—রাজকন্যার তারানাথকে মাল্যদান পরে তাঁহাদের মৃদু আলাপ—অবশেষে তারানাথের মাল্যধারণান্তে অবন্তীরাজের তাঁহাকে ধান্যদূর্ব্বাদলে আশীর্ব্বাদাদি শেষ হইলে,—স্বয়ম্বরের প্রধান ব্যাপার শেষ হইল দেখিয়া তাঁহাদের দূত আসিয়া জানাইল,—"রাজন্যবর্গ, পুত্তলিকা-গুলির মূল্য কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে প্রকাশ্য-সভায় জানিতে চাহেন।"

মগধ-রাজপুত্র বলিলেন, "শুনিলে সখা?"—

তারানাথ বলিলেন, "শুনিয়াছি! এত জানিলে"—

সখাকে অঙ্গুলি তর্জ্জন করিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "মিনতি করি তোমায়—আর দ্বিধা করিয়ো না!"—

দূতের উত্তরে রাজমন্ত্রী বলিলেন,—"উত্তম মগধ-রাজকুমার। আপনার সখাকে অনুরোধ করুন,—তিনি কি উপায়ে পুত্তলির মূল্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন!—"

মৃদুস্বরে রাজপুত্র বলিলেন, "বল সখা বল। একথা সত্যই প্রকাশযোগ্য।"—

সেইরূপ স্বরে হাসিয়া তারানাথ বলিলেন,—"বিবাহ ত হইল রাজকন্যার সহিত, সঙ্গে পাইলাম এই অবন্তী রাজ্য—আবার এই সভামধ্যে বক্তার আসন ইহাও আমারই! না রাজকুমার!"—

"হাঁ সখা! ইহা তোমারই উপযুক্ত!" তোমায় বলিতেই হইবে।"

"তোমার লজ্জা হইতেছে না নির্ব্বোধ! এ সকল যে তোমারই ছিল—! তুমি কি বুঝিবে আমার চিত্তে কি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে?"—

"তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া রাজকুমার বলিলেন, ছিছি তারা! ছিঃ!—আর এসকল কথা মুখেও আনিও না।—তোমার এই ব্যবহারে রাজকুমারীর মনে কি কষ্ট হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতেছ না কেন?"—

"রাজকন্যা? হাঁ,"—তারানাথের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলাইয়া গেল! ক্ষণকাল পূর্ব্বের দৃশ্য,—সেই চরণাবনতা বিষণ্ণ ভক্তিনম্রতি পূজারিণী! চারিদিকে ঝলসিত ঐশ্বর্য্য মুকুটের মধ্যে দীনহীন তারানাথেরই নিকট লুণ্ঠিতা প্রণতা রাজকুমারী!

সে দিব্য চরিত্রগরিমায় যুবকের মস্তক অবনত হইল। তাহার পর কি দৃশ্য?—সকল দ্বন্দ্বের অতীতা স্থির ইচ্ছাবৃত্তি,—কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার জন্য তাহার সৃষ্টি হয় নাই—কর্ত্তব্যের আকর্ষণে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরে কর্ত্তব্য শেষে সে মৃদু নূপুর সিঞ্চন ধ্বনির সহিত স্থির চরণে চলিয়া গেল। আবার বাহিরের কোলাহলে—তাহার স্থির মনোভাব, অবহেলাভাব দাসীর আকারে আসিয়া জানাইল যে,—"সংসারের কোন কিছুরই জন্য তাহার ক্ষোভ নাই—শুধু তাহার জন্য যেন কাহাকেও উত্ত্যক্ত করা না হয়!'—হাঁ তাহাই বটে!—ইহা তাহার কর্ত্তব্য-পালন ব্যতীত আর কিছুই নয়!

মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তমাত্র তারানাথ ভাবিল—"ইহা অবহেলা,—শুধু কর্ত্তব্য—শুধু"—মুহূর্ত্তকাল এই চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে যেন শুষ্ক করিয়া দিল—! কর্ত্তব্য!—সংসারে কর্ত্তব্য পালনের মূল্য বড় বেশী,—কিন্তু—ইহা কি সত্যই শুধু প্রাণহীন শুষ্ক কর্ত্তব্য মাত্র?—

রাজকন্যার প্রদত্ত মালাগাছি তারানাথ মাথা বেড়িয়া গলায় পরিয়াছিলেন,—এতক্ষণ সেই মস্তকবষ্টিত অংশ-টুকু—শিথিলভাবে কপাল ও কর্ণ বেড়িয়া নামিয়া আসিতেছিল—এইবার তাহা গড়াইয়া তাঁহার গলায় আসিয়া পড়িল!—পূর্ব্বের বক্ষোলম্বিত মাল্যাংশ প্রায় জানু পর্য্যন্ত আসিয়াছিল—এবারের ক্ষুদ্র বেষ্টনটুকু নামিয়া কেবল কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বক্ষস্থল স্পর্শ করিল!—স্নিগ্ধগন্ধী সুকুমার পেলব-পরশ,—তারানাথ শিহরিয়া উঠিলেন!—যেন কাহার পুষ্পকোমল বাহুলতা—যেন কেমন সুগন্ধ নিবিড় বন্ধনচেষ্টা!

তারানাথ অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, মগধরাজকুমার দেখিলেন তাহার প্রিয়সখার মুখে যেন কোন দিব্য জ্যোতিঃর দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে,—সর্ব্বাঙ্গে এক অপ্রতিম প্রভাবের আবির্ভাব।

সখার নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন "ঘটনার আকার বুঝিয়াছ কি বন্ধু!—তোমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেই হইবে!—ইহাতে আমার ও রাজকন্যার উভয়েরই মর্য্যাদা নিহিত—ইহাও ভাবিয়া দেখিও।"—

হাসিয়া তারানাথ বলিলেন, মূল্য ত প্রতিমাদের দেহেই সংলগ্ন আছে!

(৭)

সভা মধ্যে পুনরায় মূর্ত্তিচতুষ্টয় আনীত হইল।

বয়োপ্রবীণ কোশলরাজ উঠিয়া আসিয়া মূর্ত্তিগুলির নিকট দাঁড়াইলেন। মূল্যতালিকা তাহার কণ্ঠে সংলগ্ন আছে,—কোথায় তাহা?

তিনি প্রথমেই স্বর্ণপ্রতিমাকে টানিয়া লইলেন,—কৈ—? হাঁ এই যে! সুবর্ণ প্রতিমার শিল্পশোভার চরম উৎকর্ষময় বক্ষের উপর একটি 'কানাকড়ি' একটি সামান্য সূত্রে বদ্ধ হইয়া দুলিতেছে!—ভগ্ন কপর্দ্দক! এই বহুভার-স্বর্ণ—এই অতুল্য-নির্ম্মাণ—ইহার মূল্য সামান্য ছিদ্র-কপর্দ্দক?—পূর্ণ নহে অর্দ্ধ-কপর্দ্দক?—ইহার মূল্য এই নির্ণীত হইয়াছে?—তাহার পর রৌপ্যমূর্ত্তি,—তাহার কণ্ঠে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিলম্বিত,—এক স্বর্ণমুদ্রার এত বড় প্রকাণ্ড রৌপ্য—তাহার মূল্য এক স্বর্ণমুদ্রা?—ইহাই কন্যা প্রকৃত মূল্য বলিয়া মানিয়া লইলেন?—হইবে না কেন, স্বর্ণপ্রতিমার মূল্য যখন একটি 'কানাকড়ি'—তখন রূপার আর কি মূল্য হইবে? সে হিসাবে এক স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট—বরং অধিকই হইয়াছে!

তাম্রপুত্তলির কি মূল্য?—তাহাকে নিকটে লইয়া কোশলরাজ দেখিলেন—ইহার কণ্ঠে কোন মুদ্রা গ্রথিত নাই,—একখানি পত্রে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"সংসারে ইহার মূল্যও অযুত স্বর্ণমুদ্রা!"—পত্রখানি মূর্ত্তির বক্ষে সংলগ্ন।—

তাম্রমূর্ত্তির মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা?—হাঁ, স্বর্ণের তুলনায় তাম্রের এই মূল্য যথার্থ হইয়াছে বৈ কি!—আর রাজকন্যাও ঠিক এই মূল্য নির্ণয়কারীর ন্যায়ই ধীমতী!—কোন মূর্খ রাজার দেশে "মুড়ি মুড়কী"র একদর হইয়াছিল বলিয়া পরিহাসের কিম্বদন্তি আজিও চলিয়া আসিতেছে—আর কুমারী বীণার পরিণয়ে তাম্রের মূল্য স্বর্ণের অপেক্ষা দশ সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইল!—স্বয়ম্বরের বিশেষত্ব বটে!—

অনেকে হাসিল—আবার অনেকে যেন কি একটা চিন্তা করিয়া শুষ্কভাবে বলিল—"না নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে।"—

চতুর্থপুত্তলিকার কি মূল্য? ঔৎসুক্য ও অবজ্ঞা উভয়ভাবের দৃষ্টিই তাহার প্রতি পতিত হইল।—শিল্পচাতুর্য্যের চরমোৎকর্ষ?—প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীই যেন সজীবভাবের লীলাবৈচিত্রে খচিত;—সেই নিমেষহীন চক্ষুতে যেন ধ্যানপরতার ভাব অঙ্কিত.—সর্ব্বাঙ্গে কল্পনাময় আবেশ—হস্তের মুষ্টি হইতে কি যেন খসিয়া পড়িতেছে,—কেশ ও বেশ শিথিল, কেবল ওষ্ঠাধরে স্থির আনন্দের অপরিস্ফুট হাস্য, উষার আভাষের মত ফুটিয়া উঠিতেছে!—

ইহার মূল্য আবার পদতলে!. স্বর্ণ পত্রে খোদিত,—যেন শ্বেত সোনার ফুলটি দিয়া প্রতিমাকে পূজা করিতেছে! মূল্য সংখ্যা কত?—"আমি ইহার মূল্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না বোধহয়—ইহা অমূল্য!"—

কোশলরাজ বলিয়া উঠিলেন "এ প্রতিমার মূল্য দাও নাই কেন?"

তারানাথ এইবার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এ প্রতিমার মূল্য?—বলিয়াছি ত মহারাজ,—এ প্রতিমার মূল্য সংসারে নাই,—মানুষের কৃত গণন-সংখ্যায় ইহার মূল্যাঙ্কপাত হইতে পারে না!—সেই জন্যই বলিয়াছি ইহা অমূল্য!—ঐশ্বর্য্যে স্বর্ণে বা মণিমাণিক্যের সহিত যে ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই—কি দিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিব?"—

"মূল্য নাই? লৌহ প্রতিমার মূল্য নাই,—এ কিরূপ কথা! এ কথার অর্থ কি, তাহা তুমি বিশদভাবে প্রকাশ কর!"

অপূর্ব্ব মূল্য গণনা!—সভার সকলে উদ্‌গ্রীবভাবে তারানাথের প্রতি চাহিয়া ছিলেন!—সে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন বিশাল জনতার সম্মুখে তিনি পুনরায় ম্রিয়মান হইয়া গেলেন!—পার্শ্ব হইতে মৃদুস্বরে মগধকুমার কহিতেছিলেন,—"বল সখা! বল,—এ সঙ্কোচের সময় নয়—বল!"—

তারানাথ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলেন "আমাকেই কি বলিতে হইবে?" মগধ বলিলেন "তুমি না বলিলে বলিবে আর কে? এ রহস্য আর কে জানে?" তারানাথ বলিল "আর এক জন জানে।"

"এ রহস্যের গুপ্ত মর্ম্ম অবন্তিরাজ-সংসারেও আর একজন জ্ঞাত আছে!—মা জননী বীণাপাণি তাঁহার অধম সন্তানের দ্বারা তাঁহার অসামান্য জ্ঞান, পুত্তলির আকারে পরিণত করিয়াছিলেন.—আজ আবার কে প্রশ্নাক্রান্ত মহাবার্ত্তা-উৎসুক জনতার সম্মুখে প্রকাশের ভারও তাঁহার এই ক্ষুদ্র ভক্তের প্রতিই অর্পণ করিয়াছেন।—অবন্তী ঈশ্বর!—ভারতের সমবেত নরপতিগণ!—অধীনের নিবেদন শ্রবণ করুন।"—

অবন্তিরাজ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—এ সেই বৃদ্ধ স্বর্ণকার!—এতদিন যাহাকে বীণাপাণি আপনার পুরোদ্যানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন—এ সেই!—সচকিতে তিনি বলিলেন,—বল শিল্পি, তোমার বক্তব্য শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল!—

স্বর্ণকার প্রথমে তারানাথের চরণে প্রণত হইল,—"প্রণাম মহাত্মন!—তুমিই ধন্য!"—তাহার পর রাজগণের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে করযোড় করিয়া সে বলিল,—"এই প্রণতি—আমি সকল সভার উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি!—আমার ন্যায় দীন ব্যক্তি এ সভায় উপস্থিত থাকিবার যোগ্য নয়,—কিন্তু যেমন বাগ্‌দেবীর দয়ায় মূকও বাচাল হইয়া উঠে—তেমনি আমি আমার দেবী বীণাপাণির কৃপায়—এ সভায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! আমার দৈন্য আমি সকলের চরণে রাখিয়া তাঁহার মহিমামূর্ত্তি স্মরণে—এই হৃদয়স্পর্শী কথা বলিতেছি!—"

স্বর্ণকার অগ্রসর হইয়া স্বর্ণমূর্ত্তিটিকে উঠাইয়া লইয়া বলিল,—"আসুন মহারাজ, লক্ষ্য করিয়া দেখুন,—এই স্বর্ণ প্রতিমার কোন বিশেষত্ব আছে কি না, সর্ব্বাঙ্গের কোথাও কোন দ্রষ্টব্য আছে কি না !"—

কোশলরাজ বলিলেন, "আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি,—নূতন করিয়া আর কি দেখিব,—যদি কিছু অভিনব ব্যাপার থাকে তুমিই তাহা প্রকাশ কর।"—

স্বর্ণকার বলিল, "তাহা নহে,—আমার বোধহয় রাজগণ স্বহস্তে কোনদিন ইহাদের পরীক্ষা করেন নাই,—মূর্খ ধাতুজীবি ও সামান্য গণনশাস্ত্রবিদ্‌গণই ইহাদের মূল্য লইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছে মাত্র। নতুবা ভারতের এতগুলি উজ্জ্বল রত্নের মধ্যে কেহই যে ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন না ইহা অশ্রদ্ধের কথা !—হাঁ দেখুন প্রভু, এই পুত্তলির কর্ণরন্ধ্রে অতি সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র নাই কি ?"—

"আছে বটে !—তাহা কেহ লক্ষ্যও করেন নাই,—কিন্তু এ ছিদ্রে মূল্যের কি তারতম্য হইবে ?"—

স্বর্ণকার বলিল, "ইহাতেই ইহাদের মূল্য বোধ হইবে মহারাজ !—এই দেখুন ইহার দুইটি কর্ণপথেই ছিদ্র,—ইহার মধ্য দিয়া এই স্বর্ণসূত্রগাছি চালনা করুন দেখি।"—

একটি দীর্ঘ স্বর্ণসূত্র বাহির করিয়া সে কোশলরাজের হস্তে দিল,—বিস্মিত হাস্যে কোশলপতি পুত্তলির কর্ণছিদ্রে তাহা চালনা করিলেন,—তার এক কর্ণে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কর্ণপথ দিয়া বাহিরে আসিল।—"মূর্ত্তির ভিতর কি শূন্য ?"—অনেকেই এই প্রশ্ন করিলেন।—

"না মূর্ত্তিটি শূন্যগর্ভ নয়,—কিন্তু এখনও কি কেহ ইহার মূল্য বুঝিলেন না ?"—

কেহ উত্তর দিল না,—অবন্তিরাজ বলিলেন,—"তুমি কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিও না,—যাহা বলিবার তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া যাও।"—

স্বর্ণকার যেন কিছু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—"ক্ষমা করুন !—আমি অল্প কথাতেই সকল বলিয়া লই।—স্বর্ণ-মূর্ত্তির উভয় কর্ণপথের বিশেষত্ব সকলেই দেখিলেন ত ?—ইহাই ইহার প্রকৃত মূল্যের অনুমান হ'ল।—যে ব্যক্তির কর্ণপথের এমনি অবস্থা—উপদেশ, সৎ কথা—এবং যে-কোন জ্ঞাতব্য কথাই হউক না কেন, এক কর্ণে শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় কর্ণদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়,—যাহার অন্তঃকরণে সে সকলের কিছুমাত্রও প্রবেশ করে না,—সংসারে সে মানুষের কি মূল্য ?—না এই ছিদ্রকপর্দ্দকেরও তুল্য নহে !—তাই এক ভগ্নবরাটক ইহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে !"—

স্বর্ণকারের কথা শেষ হইতে না হইতে কোশলরাজ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"উচিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে !—আমরা অন্ধ,—কিছুই বুঝিতে পারি নাই !—তাহার পর—! বল,—বল ভাগ্যবান্ !—"

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্ণকার রৌপ্যপুত্তলিকে উঠাইয়া লইল।—বলিল, "এই দেখুন, ইহারও কর্ণরন্ধ্রে সেইরূপ ছিদ্র,—কিন্তু সূত্র—দেখুন দ্বিতীয় কর্ণপথ দিয়া বাহির হইল না, এবার তাহা প্রতিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে,—সদুপদেশ বা জগতের প্রকৃত হিতবাণী শুনিয়া—এ অন্ততঃ প্রকাশ করিয়া বলিতেও জানে,—চাহিয়া দেখিলেই অনুভূত হইবে—স্বর্ণমূর্ত্তির ন্যায় ইহার মুখে সে তরল ভাবহীন হাস্যও নাই—সে প্রসন্নতা চোখের মধ্যেও হাসিয়া উঠিয়াছে।—এ তত্ত্বজ্ঞ না হইলেও তত্ত্বপ্রায়,—এরূপ ব্যক্তির মূল্য আছে—ইহাদের মূল্য স্বর্ণ দিয়া নিরূপিত হইতে পারে। তাই ইহার মূল্য একটি পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা।"—

"তাহার পর—!" রাগ-প্রসন্ন বদনে কোশলরাজ বলিলেন—"তাহার পর।"—

"তাহার পর তাম্রপুত্তলি! ইহারও কর্ণে ছিদ্র এবং এই দেখুন স্বর্ণশলাকা কথঞ্চিৎ অধঃকৃত,—যেন কণ্ঠ পথে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই জাতির পুরুষ সর্ব্বদাই হিততত্ত্ব ও আনন্দ, ইহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন,—সম্পূর্ণ বোধ না হইলেও প্রত্যেক পদার্থেরই ভাব নির্ণয়ে ইঁহারা সচেষ্ট;—শুধু মুখের কথাতেই ইঁহাদের জ্ঞান শেষ হয় না—নিজের মধ্যে লইবার জন্যই ইঁহারা ব্যাকুল।—সংসারে এই শ্রেণীর মনুষ্যও অতি বিরল,—তাই ইহার মূল্যও—দরিদ্রের পক্ষে মহৈশ্বর্য্য—অযুত স্বর্ণমুদ্রা নির্ণীত হইয়াছে—।"

সভা নীরব।—সদ্যোবর্ষণোন্মুখ ঘনঘটার ন্যায় সে বিরাট সভা যেন কিসের ভারে অবনত মুখ—স্থির-শান্ত!—সে শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়ায়—তাঁহাদের পরিহিত মণিমাণিক্য বালার উপরে যেন একটি সুন্দর সজল-কোমল আভা দেখা দিয়াছে!—পুষ্পিত উপবন শোভার উপর—নবজলধর শ্যামলচ্ছায়াপাত সৌন্দর্য্যের মত তাহা মধুর! শীতলকারী!—

ভাববিগলিত চক্ষে স্বর্ণকার এইবার লৌহপ্রতিমাকে উঠাইয়া লইল।—

"আর অধিক বলিবার নাই,—দেখুন মহারাজ। লৌহমূর্ত্তিরও কর্ণে রন্ধ্র,—তাহাতেও সূত্র চালনা করিলাম,—কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই—অনায়াসে তন্তু গিয়া প্রতিমার—অন্তস্তল-হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে!—যিনি হৃদয়বান্ পুরুষ, জগতের সমস্ত সত্য—সমস্ত আনন্দ—সম্পৃহভাবে গিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে!—সত্য তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়—আনন্দ তাঁহার সমগ্র ধমনীতে চালিত হয়—সে মহাপুরুষের জীবনেই এখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়া যায়!—চাহিয়া দেখুন তাম্রপ্রতিমার মুখ চিন্তাকুল, উদ্বিগ্ন অথচ তেজোরাশি বেষ্টিত।—সে যেন আপনার মধ্যে কি এক বিশাল শক্তির অনুভব পাইয়াছে, তাহার অঙ্গুলীবদ্ধকর প্রার্থনারত,—যেন কিসের প্রয়াসী?—কিন্তু এই লৌহ পুত্তলি,—"

সহসা বক্তার স্বর রোধ হইল,—কিয়ৎকাল সে যেন আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কণ্ঠ পরিস্কার করিয়া বলিতে লাগিল।—"সকলে চাহিয়া দেখুন এই মূর্ত্তির আকৃতি স্বতন্ত্র,—এই উদাসী মূর্ত্তির আকারে সে প্রতিভার স্ফুরণ আর দেখা যায় না,—দেহের বন্ধন এলায়িত;—চক্ষুর স্বচ্ছতার সম্মুখে যেন কোন 'অদৃশ্য বস্তু ভাসিয়া উঠিয়াছে—নেত্র-তারকায় তাহারই অস্পষ্ট ছায়া।—সেই ছায়ারই ভাবে সমস্ত প্রতিমাটির ভাবও বোধহয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—আমি নিজে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছি, মাতার নিকট তাহার ব্যাখ্যাও শুনিয়াছি, কিন্তু চিন্তার দৌর্ব্বল্যে ইহার ভাব আবার আমার নিকট অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে!—"

স্বর্ণকার আবার নীরব হইল।—কোশলরাজের গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া দরদর অশ্রুধারা ঝরিতেছিল,—আনন্দকণ্টকিত দেহ অবন্তীরাজ দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলেন সভায় কাহারও চক্ষু শুষ্ক নয়।—সকলের মুখেই এক অভিনব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে!—

মগধ-রাজকুমার মৃদু হর্ষোদ্বেগে তারানাথের কর্ণে বলিলেন,—"সখা, চাহিয়া দেখ!—"

সভা উতরোল হইয়া উঠিতেছিল,—কোশল, মদ্র ও সিন্ধুদেশের বিজ্ঞ নরপতিত্রয় আসন ত্যাগ করিয়া রাজকুমারীর জাল সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—গম্ভীর আশীর্ব্বচনের সহিত কহিলেন,—"না বুঝিয়া তোমার অনেক দোষ দিয়াছিলাম কুমারি!—কিন্তু এই বয়সে তোমার স্বয়ম্বরে আসিয়া যে শিক্ষালাভ করিলাম—তাহা প্রকৃতই অমূল্য,—নারীরত্ন! তুমি মনোমত পতিলাভ করিয়া সুখী হও!

(৮)

অবন্তিরাজ সভা ভঙ্গের আদেশ করিতেছিলেন,—এমন সময় আবার একজন দূত আসিয়া জানাইল,—কাশীরাজ ও কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন যে, কিরূপে ইনি এই প্রতিমাগুলির রহস্য ভেদ করিলেন—।

কোশলরাজ বলিলেন, "ইহা কর্ম্মগত কোন চেষ্টা নহে,—মানসিক স্ফূর্ত্তির সূক্ষ্মতার ফল। একথা প্রকাশ্যে না বলিলেও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়,—তবে রাজগণ যদি শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তবে তোমার বলিতে আপত্তি কি বন্ধু ?"—

মগধ-রাজকুমার ত্বরিতস্বরে বলিলেন "কিছুই না !"—পরে বন্ধুর কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভাবিয়াছিলে—বক্তার আসন হইতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছি,—কিন্তু বিধাতা তোমার এরূপ বাম সখা, আমি কি করিব বল ?—এখন ঐ আমাদের সমবয়স্ক বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হইবে—"

তারানাথ বলিলেন "এ সভার মাঝখানে কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে সত্যই ধৃষ্টতা,—কিন্তু আর ইঁহাদের অনুরোধ লঙ্ঘন করিবার সাধ্যও আমার নাই।—"

"বলিব—কথা বলিব,—কিন্তু কি বলিব তাহাও যে বুঝিতে পারিতেছি না !—বলিবার মত কথা কি আছে বল দেখি ? সে কথা শুনিবার জন্য ইঁহাদের এত আগ্রহই বা কেন ?"—

এই সময় কোশলরাজ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আসুন মহাশয়, প্রথমতঃ কি উপায়ে আপনি পুত্তলিদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করেন সেই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করুন। যুবক রাজগণ সত্যই কৌতূহলী হইয়াছেন।"—

তারানাথ মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কৌতূহল ?—হাঁ, প্রথমে আমারও কৌতূহলই হইয়াছিল মহারাজ !—কিন্তু আমার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল যে প্রতিমাগুলির মূল্যের অর্থ—বাহ্যবিষয়ে বা স্বর্ণরৌপ্যের দিক্ হইতে নির্ণীত করা হয় নাই, রাজকুমারীর উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে।—সেই জন্য আসিয়াই আমি সখাকে পুনরায় পুত্তলিগুলি প্রার্থনা করিতে বলি, আমার ইচ্ছা ছিল যে যদি আমার বুদ্ধিতে সে রহস্য ভেদের ক্ষমতা হয়—তবে আমার প্রিয়সখাকে আন্তরিক প্রণয় উপহার দিবার একটি বিশেষ উপলক্ষ্য পাইব।—"

হাসিয়া তাঁহাকে খোঁচা দিয়া রাজপুত্র বলিলেন,—"এ ধানভানিতে শিবের গীত আরম্ভ করিলে কেন ? যাহা বলিতেছ বলিয়া যাও।"—

"আমাকে নিজের ইচ্ছায় বলিতে দাও সখা !"—পরে সভার প্রতি ফিরিয়া তারানাথ বলিতে লাগিলেন।—"তাহার পুত্তলিগুলির আকৃতি ও মুখভাব দেখিয়াই আমি বুঝিলাম যে আমার অনুমান যথার্থ, মানবহৃদয়বৃত্তি সকলই এই পুত্তলি আকারে রচিত হইয়াছে।—ইহাদের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন, কোন বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়া যে তাহা নির্ম্মিত তাহা নির্ণয় করা সত্যই দুঃসাধ্য।—তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে এ রাজসভা বা জনতামুখরিত শিবিরে বাস করিয়া নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা যায় না,—অথচ এ গুপ্তবিষয় স্থির করিতে প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক,—তাই সখার নিকট নির্জ্জন শিবির,—বাধাবিপত্তিহীন অবসর প্রার্থনা করিয়া লইলাম।—"

বলিতে বলিতে তারানাথ কিছুক্ষণ থামিলেন।—মৃদু হাসিয়া একবার রাজকুমারের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"তাহার পরের কথা আমি কি করিয়া বলিব বুঝিতে পারিতেছি না।—বলিয়া মানুষ বুঝাইয়া দেওয়ার

মত শক্ত ব্যাপার বড় কমই আছে।—আমিও প্রথমপ্রথম কিছুই বুঝিতে পারি নাই,—ক্রমে ধারণা হইল যে এই স্বর্ণ বা লৌহপুত্তলি লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে,—তাম্র বা রৌপ্যপ্রতিমাদ্বয় পূর্ব্বোক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মাত্র,—রহস্যের সৃষ্টি এই দুইটীর মধ্য দিয়া আরম্ভ হইয়াছে।—ভাবিলাম, কিন্তু তাহাদের গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশের সাধ্য কিছুতেই হইতেছিল না!—"

সলজ্জ হাসির মধ্যে তারানাথ আর একবার নীরব হইলেন।—তাঁহার মুখে যেন কেমন অপূর্ব্ব আলোকের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল; মগধকুমার কোমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সখার পানে চাহিয়াছিলেন,—তাঁহাকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"বলিয়া যাও না!"—

"বলিতেছি।—কিন্তু যথার্থপক্ষে সে সকল কথা ত ঠিক্ বলিবার মত নয়,—আমি কেমন করিয়া যে সে কথা প্রকাশ করিব তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিতেছি না!—হাঁ" বলিয়া তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—"বলিতেছি, আমি আমার সাধ্যমত সকল কথা বলিতেছি কিন্তু বলিবার দোষ হয় ত তাহার অর্থ পরিস্ফুট হইবে না!—সে কথার অনেক অংশ বক্তব্য,—বলিয়া প্রকাশ করা যায়—আর কতকাংশ এত—"

বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি যেন কোন বহির্ম্মুখী হৃদয়াবেগকে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন।—"সেই পুত্তলিগুলি ধাতু নির্ম্মিত,—প্রকাশ্য জড় ব্যতীত আর কিছুই নহে,—কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহারা যখন নির্ম্মিত হয় তখন ইহাদের কাল্পনিক ও কারুর চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ ইহাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আপনার আভাষ রাখিয়া গিয়াছে!—ইহারা জড়মূর্ত্তি হইলেও নির্ম্মাতার ইচ্ছাশক্তির অনুসরণ সর্ব্বদাই ইহাদিগকে অস্ফুটতর চৈতন্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।—না, আমি সে সকল কথা আর বলিতে পারিব না,—তবে এইটুকু পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি তখন ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে শুধু বাহিক অনুসন্ধান বা পর্য্যালোচনায় সহজে ইহাদের মর্ম্মভেদ করিতে চেষ্টা করা বড় কঠিন, অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর।—সেইজন্য আমি পুত্তলিগুলির সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম।—যেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উহারা রচিত, সেইভাবের উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের প্রীতি উৎসারিত করিয়া দিয়া আমি সেইভাবের পূজা করিয়াছি,—তদ্গতচিত্তে তাহারই ধ্যান করিয়া, সেবা করিয়া, আর অকপট চিত্তে তাহার সঙ্গলাভের প্রার্থনা করিয়া তাহাকে আমার মধ্যে আবির্ভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

"জড়ে চৈতন্যের অনুধ্যান আমাদের দেশে নূতন কথা বা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়,—সাধনার তারতম্য ও প্রণালীভেদে স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতির আভাষও তাহাতে প্রতিফলিত হয়,—সেইরূপ সাধকের ইচ্ছাশক্তির ও সাধনার নিয়মানুসারে জড়সংলগ্ন চিন্তা অপর চিন্তার মধ্যে সঞ্জীবিত হওয়া কোন আশ্চর্য্য কথা নয়!—আমি ভাল বাসিয়া—পূজা করিয়া এ প্রতিমাগুলির নিকটস্থ হইয়াছিলাম।—এমনও ঘটিয়াছিল যে উহাদের কল্পনা বা রচনার পরমাণু বিন্দুও আমার নিকট সজীবভাবে ধরা পড়িয়াছিল।—উহার কতটুকু অংশ কাব্য—আর কতটুকু আরাধ্য—কোন্ স্ফীতিটুকু উজ্জ্বলের কোন্ রেখাটি অনুভবের তাহা আমার চক্ষে যেন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছিল—উহাদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'প্রকৃত মূল্য'—তাহার সম্বন্ধে আমার শেষে কোন সন্দেহ কোন ভাবনাই ছিল না, আমি উহাদিগকে চিনিয়াছিলাম, উহাদের নির্ম্মাণকল্পনা সত্যই আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।—তাহাতেই সখাকে আমি নিঃসন্দেহে স্বয়ম্বর প্রার্থনা করিতে বলি।"

তারানাথ নীরব হইলেন। সভাস্থ সকলেই নির্ব্বাক, আনন্দোজ্জ্বলিত নয়নে অবিস্মিতপতি নতমুখ জামাতার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কতক্ষণ পরে মগধরাজকুমার প্রশ্ন করিলেন,—"আপনাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে কি?—"

হাঁ হইয়াছে!—কোশলরাজ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"হাঁ হইয়াছে!"—ইহার পর আর কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না! ইনি জ্ঞানী, ইঁহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আর কিছুই নাই,—কিন্তু তুমি,—রাজকুমার আমি এতখানি বয়সে তোমার ন্যায় স্বার্থত্যাগী কখনও দেখি নাই?—এ বৃহৎ ব্যাপারে অনেক দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও শিক্ষণীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে তুমিই আদর্শ,—তোমার স্মৃতির সম্মানে এই স্বয়ম্বর সভার মহত্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।—তুমি ধন্য!"—

তারানাথের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল,—মগধরাজকুমার তাঁহার কাণে মুখ রাখিয়া বলিলেন, "লাভটা কার বেশী তারা?"—

সেইরূপ মৃদুস্বরে তারানাথ বলিলেন,—'এতক্ষণে আমার মনের আঁধার ঘুচিয়াছে। –আমি তোমার মাথায় গৌরবের হার পরাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা শতগুণে মূল্যবান—মহিমার সর্ব্বোচ্চ ভূষণ সম্মান-মুকুট তুমি লাভ করিয়াছ।—ইহা তোমার স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার—ইহাই তোমার যোগ্য! আজ তোমার বন্ধুত্বের গৌরবেই ধন্য!"—

নিম্নের বিশাল জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে গুঞ্জনধ্বনির অস্ফুট কোলাহল,—অবরোধ জালশ্রেণীতে মৃদুমুহু সিঞ্জন, রুণুরুণু নূপুর নাদ,—রাজগণ পরস্পর আনন্দ সম্ভাষণের বৈচিত্র্য,—সভাতোরণ-শিরে আনন্দের উন্মাদিনী লীলাময়ী সাহানা রাগিণী বাজিয়া উঠিল।

শ্রীহেমনলিণী দেবী।

ইতিহাস।

—:*:—

পক্ষপাতই লক্ষ্য তোমার, সত্য বলনা,
দম্ভে বড় করতে কর নিত্য ছলনা।
ভোলো রিপুর শৌর্য্য বীর্য্য বিপুল চাতুর্য্য,
কলঙ্কেতে ঢাকো তাদের হিয়ার মাধুর্য্য।
জিঘাংসা ও হিংসা পোষো নাইক ক্ষমা হে,
ক্ষুদ্রে তব রুদ্র কর স্বার্থ জমায়ে।
সাজাও তুমি অসৎ হেয় প্রবল বৈরীকে
গুপ্তঘাতীর বসন চোপাও প্রেমের গৈরিকে।
কাপুরুষে বীর করহে, রৌদ্র নীহারে
নরবলির যুপকে বসাও বৌদ্ধ বিহারে।
সাজাও তুমি শঠকে সাধু, মুক্ত ভোগীকে,
মঠকে বল নাট্যশালা, দস্যু যোগীকে।
জাতীয়তার জাল খতিয়ান নকল দাখিলা
অহঙ্কারের ব্যঙ্গ ছবি বৃথায় আঁকিলা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের সামাজিকতা।

বিগত ২৯শে নবেম্বর তারিখের "The English man" পত্রিকায় বিলাত হইতে সংবাদদাতা ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্যার সত্যেন্দ্রনাথ সিংহের "Social life in Bengal" নামক বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে প্রসঙ্গক্রমে ঐ উপলক্ষে আমার কিছু বলিবার আছে। Lord Islington সেই বিদায় সভার সভাপতি ছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশীর মধ্যে সামাজিকতা দৃঢ়তর হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সভাস্থলে "General cheering greeted Lord Islington's declaration" হইবার দরুণ এই কথাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্রিটীশবাসী এ কথা অন্তরের সহিত অনুমোদন করিয়াছেন। স্যার সত্যেন্দ্র স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে এবং ভাষাতেই বলিয়াছিলেন ;—

"Sir Satyendra spoke in warm terms of the good work of the Calcutta Club in bringing Indians and Englishmen together in intimate social relations on a footing of perfect equality.

এ উপলক্ষে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন,—

"He said he could not resist the temptation of expatiating on the immense political value of organised work in this connection. Quoting the remarks of the Montagu Chelmsford Report in the social problem, he said such general observations had often been made and perhaps had not been productive of much good effect.

He had a practical suggestion to make, namely, that the rule or convention in English clubs excluding Indians as such should be got rid of without delay, People in the United Kingdom could not conceive the amount of bitterness which was created by a rule of that kind. "When we come to this country" said Sir Satyendra, "some of us belong to the most exclusive clubs in London, clubs to which perhaps many of my English friends in Calcutta would not find it possible to belong. But when we go back we are told, if not expressly, at any rate by implication, that we can enter this or that club only as waiters. If my suggestion is adopted, no harm will be done.

দেশ কাল পাত্র ভেদে সব কাজ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের একান্ত বিশ্বাস দেশী বিলাতী মিশামিশি যেমন Black and white মিশামিশির ন্যায় হইয়া পড়িবে। East and West দুদিক হইতে অবশ্য মিলিত হইবে, ইহারই পূর্ব্বাভাষ আমরা যেন স্পষ্ট দেখিতেছি। জগতের আপদ যুদ্ধে এ সম্পদই লাভ হইবে বলিয়া

আমরা একান্ত বিশ্বাস করি। আপদ বরাবর সম্পদকে আকর্ষণ করে। তাই বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "সুখ এবং দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিতেছে এবং—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তাঁরই ঠাঁই ॥"

এই আপদ এবং সম্পদ সংসারের জন্য যমজ-সন্তানের কাজ করিতেছে। এই যমজ-সন্তানই ভবিষ্যৎ জগতে সুসন্তানের কার্য্য করিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষে আমি একটি ইংরেজ বন্ধুর কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বন্ধু এক্ষণে মর্ত্তালোকে নাই; কাজেই মৃত বন্ধু সম্বন্ধে সুকথা বলাই ভাল এবং সঙ্গত। ত্রিপুরারাজ্যের একজন অহেতুকী বন্ধু জুটিয়াছিল যখন ত্রিপুরা-রাজ্যের এবং ব্রিটিশগভর্ণমেন্টের মধ্যে কতকগুলি ঘোরতর রাজনৈতিক কার্য্যে জটিলতা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক জটিল কার্য্যের খবরাখবর সাহিত্যিক জগতের জন্য নহে। এই ইংরেজ বন্ধুটির নাম পর্য্যন্ত, সমস্ত—ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া বলিলেও, বঙ্গদেশেও কেহ জানেন কিনা আমি বলিতে পারি না। Mr. C. W. Mc. Minu ছিলেন I. C. S. এবং জাব্বলপুরের কমিশনার অবসর গ্রহণ করার পর ত্রিপুরারাজ্যে তিনি ব্রিটীশ ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ জমিদারীর ম্যানেজার হইয়া আসেন। তিনি কার্য্য করিতেন ম্যানেজার রূপে,—কিন্তু প্রাচীন ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি তিনি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার জন্মস্থান ইংলণ্ডকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষকে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলিতেন;—

"ইংলণ্ড আমার Father-land, ভারতবর্ষ আমার Mother-land. আমি যেন ভারতবর্ষের কোলে চির শান্তি লাভ করিতে পারি।"

ভগবান তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেই তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীতে Circular road সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় কর্ম্মময় জীবনে তিনি ছিলেন মহারাজার "Obedient servant।" আর যখন তিনি গভর্ণমেণ্ট ও রাজার মধ্যে Buffer রূপে থাকিয়া কোন বিষয় মীমাংসা করিতেন তখন তিনি ছিলেন মহারাজার "Sincere friend" এমন কি তিনি মহারাজা রাধাকিশোরের নিকট পত্রাদি লিখিতে এই ভাষাই ব্যবহার করিতেন। এই দু'নলা বন্দুকের দ্বারা তিনি কত কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, কত সমস্যা পুরণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রাচীন রাজ্যের কত মান ইজ্জত্ বহাল রাখিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য এবং অপ্রাসঙ্গিক হইবে। প্রবন্ধ লেখকের সহিত এই দুই ক্ষেত্রে আমাকে কত মিশিতে হইয়াছে, কর্ম্ম করিতে হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজকর্ম্ম জগতে মিশিতে গিয়া সংসার জগতে বন্ধু পাইয়াছিলাম। এই ইংরেজ বন্ধুটিকে পাইয়া যথার্থ ইংরেজ জাতির মহত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠকবর্গের নিকট কৈফিয়ত দিতেছি।

"Tippera Succession" ব্যাপারে তিনি ব্রিটীশ উচ্চ আদালত Privy councilকে পর্য্যন্ত দোষারোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এবং তিনি যদি দৃঢ় এবং সরল ভাবে এ কার্য্য না করিতেন তাহা হইলে ত্রিপুরার উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া এ প্রাচীন ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে একটা ঘোরতর দোষ স্পর্শ করিত।

এখানে আমরা Mr, C. W. Mc. Minu কর্ত্তৃক Tippera Succession সম্বন্ধে রিপোর্ট উদ্ধৃত করিলাম ;—

"The decision of 1818 has been regarded as the Magna Charta of Bara Thakurs, it was confirmed by the Sudder Dewani in 1820 and the decision is quoted by them again in 1887. It is referred to by the High Court on 20th September 1804. With due reverence as the precedent and lastly the Privy-Council in 1809 March 15th. Accepts this plea so tainted and corrupt with unquestioning faith and all courts have since regarded this whited sepulchre of corruption, as a shrine of British Justice an incarnation of righteous Equity Page 8."

পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে ত্রিপুরা সম্বন্ধে আর কোন কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি ভারতের কি রকম বন্ধু ছিলেন তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি যখন লণ্ডন গিয়াছিলেন তখন আমাকে একখানা পত্র লিখেন, তাহার কিয়দাংশ উদ্ধৃত হইল।—

East Bourne, London,
20-9-

"Why not reprint the three letters and the Times articles and add your own comments and send copies to the Governors and English native papers. Ask His Highness. Probably I spent five days of nine hours each on these letters and I may say it. I am the only man in England who could lay his hand on all the facts and figures, which I have mentioned. I give my whole time to such studies causing domestic contention thereby, that is when the Purda system is a boon! Often twice a week my wife declares war against my book threatens to burn it etc. Golehab and I am going to fight together for certain reforms Natfve members in Council in India and England, simultaneous examinations for Civil Service and Commissions for native offieres."

ইংরেজমহলে মাঝে মাঝে আমাকে তিনি "দেশীদের জন্য প্রবেশ নিষেধ" জায়গায় গতিবিধি করিতে গিয়া অনেকবার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। সে দরুণে আমার যে লাভ হইয়াছিল এবং ইংরেজ ভদ্রলোকের যে সব বদ্ধারণা দূর হইয়াছিল সে পুণ্য—Mr. Mc. Minu সাহেবের পুণ্য বটে। আমরা উপলক্ষ মাত্র। তিনি স্বদেশী গোলমালের বহু পূর্ব্বে ভারতের উৎপন্ন জিনিষ ব্যবহার করিতেন এবং বস্ত্রাদি তিনি দেশীয় জিনিষের দ্বারা প্রস্তুত করাইতেন। এমন কি ইংরেজী জিনিষ ব্যবহার করি বলিয়া তিনি আমাদের সহিত ঝগড়া করিতেন! স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সদাসর্ব্বদা দেশীয় পোষাকে থাকিতেন—এ কথা আমাদিগের স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং প্রাচীন রাজ্য—আমাদের প্রাচীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাবাহত করিতেন।

তিনি ভারতবর্ষের জন্য কি কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার প্রাণে ভারতবর্ষের টান কেমন উজান বহিত তাহা পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। অথচ আমরা কেহই এ খবর জ্ঞাত নহি। অনেক সময় অনেকে Mc minuকে বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলিয়া জানিত কিন্তু সে ভ্রম অনেকে এখন টের পাইয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে Mc. Minu সাহেবের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইতাম। তিনি দেশীয় লোকদিগকে ইংরেজের সহিত মিলন সংঘটিত করেন ইহা তাঁহার আন্তরিক মতলব ছিল। এ জন্য তিনি মাঝে মাঝে ভারতবাসীদের dinnerএ নিমন্ত্রণ করিতেন। একদিনের কথা আমার মনে আছে। আমাকে তিনি United Service Clubএ dinnerএ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অনুরোধ করিলেন, দেশীয় পোষাকে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহা আমার পক্ষে একটা মুস্কিল হইয়া পড়িল। উপস্থিত হইয়া দেখি কয়েকজন Civilian এবং তৎসহ ইংরেজ মহিলার মজলিস। আমার যতদূর মনে হয় Mr. Buckland ও Miss. Buckland উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গা ইংরেজীতে Buckland সাহেবের সহিত আলাপ করিতে পারি কিন্তু—Miss. Bnckland সর্ব্বনাশ! আমি Mc. Minu সাহেবকে ধরিয়া বসিলাম। আমাকে যে Miss Buckland এর হাওলা করিলেন এখন উপায় কি? আমি যে মহিলা মজলিসে আনাড়ী। Mc. Minu সাহেব বলিলেন, "কুচ্ পরোয়া নাই। তুমি প্রাচীন রাজাবাসী, তোমার ভয় কি? কিন্তু rightly aimed flattery, অব্যর্থ সন্ধান।" একটা কথা মনে আছে—Buckland সাহেব আমাকে সমাহিত করিতেছেন "তোমরা মফঃস্বলের লোক, আমার মেয়েকে Moffessilite করিও না।" Miss Buckland সহাস্যে উত্তর দিলেন "Moffessilite কাহাকে বলে আমি জানি না" (কারণ তিনি সপ্তাহকাল হইল বিলাত হইতে আগত।) আমি বলিলাম "আপনি অবশ্য Moffussalite, কারণ Moffussul-এই ভাল গোলাপ ফুটিয়া থাকে!" Miss Buckland পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বাক্যালাপ ও dinner সরস হইয়াছিল। তার পর দিন Mc. Minu সাহেব আমাকে বলেন "গত রাত্রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করার দরুণ আমার Sample ঠিক্ হইয়াছে। কেন ইংরেজরা বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিবে না। ইহা লইয়া আমার সহিত ঘোরতর তর্ক চলিত. কিন্তু আজ আমার জিত হইয়াছে।" তখনও Calcutta Club হয় নাই। কাজেই আমার নিতান্ত ধারণা যে Mc. Minu এর একাগ্রতায় দেশীয় ও ইংরেজের একটা platform প্রস্তুত হইয়াছে, সেখানে দেশীয় ও ইংরেজগণ সমভাবে মিশিতে পারে।

কলিকাতায় club সৃষ্টির বহুদিন পূর্ব্বে Mr. Mc. minu উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ধরণের একটা রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হওয়া উচিত, যাহাতে দেশী এবং বিলাতী লোকের অভিনয় পূর্ণমাত্রায় অভিনীত হইতে পারে। "পূর্ব্ব পশ্চিম আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে" একথাই সেই দিন স্যার সত্যেন্দ্র লণ্ডনের সামাজিক বিদায় ভোজে বলিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়া ছিলেন যাহা আমার মৃত ইংরেজ বন্ধু Mr. Mc. minu হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এক্ষণে যে রাজ্যে আছেন সেই রাজ্যে বসিয়া এ তামাসা দেখিতে পাইবেন ইহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

অশ্রুর আকর্ষণ।

—(:*:)—

মলিন মুখে মুক্ত দ্বারের পাশে
ছোট্ট মেয়ে দাঁড়াল সে এসে,
শুধানু তায় 'চাই কি আমার কিছু?'—
রইল চুপে মুখটি ক'রে নীচু।

ছিন্ন বসন, রুক্ষ অলক মাথে,
দুইগাছি তার কাঁচের চুড়ী হাতে;
শুধানু তায় 'চাই কি আমায় বল্',—
চক্ষে তাহার ঝর্‌ল শুধুই জল!

বল্‌ল ধীরে মুছে আঁখির ধার
'মা কি তবে বাঁচবে না'ক আর?'—
শীর্ণ দুটি হাত ধরে তায় আনি
চোখের জলে লইনু বুকে টানি।

চুম্বিতে তায় মুখখানি তার তুলি
কাঁদন বুকে উঠ্‌ল দুলি ফুলি,—
হেরিনু সে আর্ত্ত মুখের মাঝে
মা-হারা মোর মেয়ের ছবি রাজে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল। ৪র্থ সংখ্যা

গান।

জীবনের ভার নাও নাও প্রভু,
বেদনার ভরা নাও হে,
জননীর মত বুকে লয়ে টানি'
নয়ন মুছায়ে দাও হে।

বিফল সাধনা অবশ পরাণ,
পথে পথে ঘুরি' গেল দিনমান,
বড় বেদনায় আসিয়াছি পায়
বারেক ফিরিয়া চাও হে।

দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর প্রায়
করুণা মাগিয়া বৃথা ফিরি হায়,
লহ ব্যথা ভয়, লাজ পরাজয়,
নয়নের বারি লও হে।

প্রণয় স্বপন, স্নেহের পিয়াস,
বুকভরা শত আশা অভিলাষ,
বিরহ-বেদন, হরষ-মিলন,
সকল ভুলায়ে দাও হে।

পারি না বহিতে জীবনের ভার,
দিবসের খেয়া ফুরালো আমার,
চির ঘুমঘোর আনি' প্রাণে মোর
চেতনা হরিয়া নাও হে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

সৌন্দর্য্যবোধ

———:*:———

সৌন্দর্য্যকে যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি আমরা বুঝিতে পারি ইহা আমাদের জীবনের বিশেষ একটি শুভলক্ষণ। সৌন্দর্য্য সকল সময়ে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না, আমরা সকল সময়ে তাহা বুঝিতে পারি না, তাহা উপভোগ করিতে পারি না; কিন্তু জীবনের কোন কোন বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে তাহা যখন আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে তখনই আমরা জানিতে পারি সৌন্দর্য্যবোধের মাঝে কতখানি গূঢ় আনন্দ নিহিত আছে।

এই সৌন্দর্য্যকে যুগে যুগে আমাদের ভারতবর্ষ কেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে তাহার চিহ্নসকল এখনও বর্ত্তমান। চিত্রকর রংএর পর রং ফলাইয়া, শিল্পী কঠিন প্রস্তরখণ্ড-সকল খোদিত করিয়া, সঙ্গীতকার মীড়ের পর মীড় টানিয়া এবং কবি ছন্দের জাল বুনিয়া সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে এই যে এত চেষ্টা তাহা কি সত্য সত্যই সেই সকল গুণীদের সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? আমাদের জন্য তাহার কিছুই কি অবশিষ্ট নাই? গুণী যে অমর, তাঁহাদের তিরোভাব অসম্ভব! আমরা তাহাদের সাক্ষাৎ পাই, যখন সে শুভমুহূর্ত্ত আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়। সেই সকল সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন যখন আমাদের আবেশ-বিহ্বল করিয়া তোলে, সৌন্দর্য্যকে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। আমরা যখন সেই সকল অতীত সৌন্দর্য্যের মোহে ডুবিয়া যাই তখনই বুঝিতে পারি আমাদের ভারতবর্ষ কি সৌন্দর্য্যের দেশ! এমন গভীর সৌন্দর্য্যের ধ্যান করিয়া সুন্দরকে কেহ কোথাও পাইয়াছে কি না জানি না। যখন দেখি প্রতি রংটির মাঝে কি অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য রাখিয়া তাহারা চিত্র আঁকিয়াছিল, তুলির স্পর্শে হৃদয়াবেগকে কি প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছিল, বর্ণভঙ্গিমার ভিতর দিয়া কি উজ্জ্বলতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তখনই বুঝিতে পারি আমাদের অপেক্ষা তাহারা সৌন্দর্য্যকে কতদূর সত্য করিয়া বুঝিয়াছিল! এখনও দেখি প্রস্তরের উপর কি সূক্ষ্ম শিল্প তাহারা রাখিয়া গিয়াছে, কতশত বৎসরের

সাধনালব্ধ অনুভূতিকে প্রস্তরফলকের উপর খোদিত করিয়া গিয়াছে, পুষ্পের দলগুলির মাঝে কি স্বাভাবিকতা, কি জীবন্তভাব জাগাইয়া গিয়াছে তখনই বলিতে ইচ্ছা করে,—

"সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলক ভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণসদ্ম পদ্মের মতন।"

ইহার পর কবির সৌন্দর্য্যবোধ। সে যে সৌন্দর্য্যকে কেমন করিয়া রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার ভুরি-ভুরি প্রমাণ আমাদের দেশের পুরাতন কবিদিগের পদাবলীতে দৃষ্ট হয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য যদি না প্রাণের মাঝে মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিত তবে কি কবি বলিতে পারিত,—

"হাতক দরপণ　　মাথক চুল
নয়নক অঞ্জন　　মুখক তাম্বুল!
হৃদয়ক মৃগমদ　　গীমক হার
দেহক সরবস　　গেহক সার।"

এ ত শুধু বিলাসের সামগ্রীর সহিত তুলনা হইল, তাই কবি ক্ষান্ত না হইয়া আবার রাধার মুখ দিয়া বলাইলেন,—

'পাখীক পাখা　　মীনক পানি
জীবক জীবন　　হম তুঁহু জানি!'

এত বলিয়াও মনে হইল কিছুই বলা হয় নাই তাই রাধা আবার বলিতেছেন.—

তুহু কৈছে মাধব　　কহবি মোয়?

হে মাধব, তুমি যে কেমন তাহা কি আমায় বুঝাইয়া দিবে?

এমনি করিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে। এত সুললিত এবং আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রেমের কবিতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথায় পাইব? ইহার প্রধান কারণ আমাদের ভারতবর্ষে যেমন পাশ্চাত্য দেশ সকল তেমন নহে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থল আমাদের এই দেশের গুণীদিগকে সৌন্দর্য্যের উপাদান অনুসন্ধান করিবার জন্য দেশান্তরে যাইতে হয় নাই, চারিদিকে এমনি সৌন্দর্য্যের বাহুল্য! নদ নদী পর্ব্বত কন্দর ও সমতল ভূমির এমন একত্র সমাবেশ সকল দেশে দৃষ্ট হয় না। আবার সর্ব্ব প্রদেশের ফুল ফল শস্য আমাদের এই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে, মাটির এমনি গুণ! প্রকৃতি যে শুধুই এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিয়াছে তাহা নহে, এই সকল প্রকৃতি-দত্ত সামগ্রী হইতে আমরা কতরূপ রং উৎপন্ন করিয়াছি; কতরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। বিদেশীয়গণ প্রকৃতির নিকট এই সাহায্য পায় নাই তাই তাহারা কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাই আমাদের প্রাচীন হিন্দুযুগের পর যখন মুসলমানের রাজত্ব আরম্ভ হইল, তখন শিল্পকলার মাঝেও একটি নূতন যুগ আসিয়া পড়িল। তাহারা সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতির অনুকরণ আরম্ভ করিল, প্রকৃতির বুকে তাহারা যেমন যেমন পত্রপুষ্প ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিল তাহাই আপনাদিগের শিল্পকলার মাঝে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিল, ইহার ফলে মুসলমান শিল্পী উন্নত হইলেও সেই সঙ্গে সহানুভূতি অভাবে হিন্দুদিগের যে একটি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল তাহা ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। আমাদের ভারতবর্ষ কখন অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে নাই; সে যে সৌন্দর্য্যের স্বাদ হৃদয়ের মাঝে উপলব্ধি করিয়াছিল তাহারই আনন্দে নূতন নূতন

শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকালই সৌন্দর্য্যকে নূতন করিয়া দেখিয়াছে, নূতন করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কখনও অন্যের নিকট হইতে তাহা ভিক্ষা করিয়া লয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসকল শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া শিল্প-সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই অন্তরমুখী দিকে। যখন পাশ্চত্য দেশবাসীগণ একটি বস্তু দেখিত এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিত তখন এতদূর বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিত যে নূতন সৃষ্টির মাঝে বস্তুতন্ত্রতাই প্রধান হইয়া দেখা দিত কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। একটি বস্তুকে দেখিবার সময়ে তাহার বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতিকে প্রভেদ করিয়া দেখিয়াছে এবং যতটুকু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় ভাবটিকে মূর্ত্তি দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের সৃষ্টির মাঝে সূক্ষ্মতা ও ভাবতন্ত্রতা এবং পাশ্চত্য শিল্পের মাঝে স্থূলতা ও বস্তুতন্ত্রতা আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? পদার্থ, না গুণ, না মনোবৃত্তি? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনের মাঝে উদয় হয়। সৌন্দর্য্যকে পদার্থ অথবা গুণ কিছুই বলা যাইতে পারে না, ইহা অনেকাংশে মনোবৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। কারণ যদি একটি বস্তুর কোন বিশেষ গুণ থাকিত তবে তাহা ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রভেদ হইত না; ইহা হইতেই বুঝা যায় সৌন্দর্য্য শুধু অন্তরের জিনিষ তাই একটি বস্তুর মাঝে আমি যতখানি সৌন্দর্য্য দেখি অন্যে তাহা দেখে না। প্রাচীনকালের শিল্পকলা দেখিলে জানিতে পারা যায় তখন প্রতি ব্যক্তির কি সৌন্দর্য্যবোধ ছিল এবং এই সৌন্দর্য্য-বোধ যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন এক একটি ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য এক একটি বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, সমস্ত ভারতবর্ষ সেই একই রীতি অনুসারে শিল্পকলার সাধনা করিত। তাহারই ফলে সঙ্গীত-শিল্পে রাগরাগিণী, ভাস্কর্য্যে ও চিত্রাঙ্কণে শিল্পশাস্ত্র ও কাব্যে সাহিত্য দর্পণের সৃষ্টি হয়।

শিল্পে আমরা যেমন আনন্দ রসাস্বাদ করিতে পারি তেমনি কোন কোন শিল্পে দুঃখেরও মাধুর্য্য লাভ করি। আমার বিশ্বাস এই দুঃখানুভূতিপূর্ণ শিল্পই শ্রেষ্ঠ, ইহা একদিকে আমাদিগকে যেমন করুণায় অভিষিক্ত করিয়া তোলে তেমনি আপনার মাধুর্য্যে মুগ্ধ করে। দুঃখের সহিত সৌন্দর্য্য মিশ্রিত হইয়া যে চারুশিল্পের উদ্ভব তাহার তুলনা নাই। এই দুঃখভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পাশ্চত্য দেশে ও ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেও বহুল পরিমাণে প্রভেদ আছে। আমাদের দেশীয় শিল্পীগণ দুঃখকে হৃদয়ের মাঝে গভীর ভাবে ধ্যান করিয়া যে অমৃতটুকু পাইয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহাদের শিল্পকলাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং চিরকাল রাখিবে। সৌন্দর্য্যকে ধ্যানের দ্বারা এমন করিয়া উপলব্ধি করিতে আর কোন্ দেশ সক্ষম হইয়াছে?

দেশী ও বিদেশী প্রেমের মাঝেও এই একই প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশের প্রেম শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সন্ধান করিয়াছে এবং যখনই তাহা পাইয়াছে তখনই ক্ষান্ত হইয়াছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরের জিনিষটুকু পাইবার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দি,—

"Her *cheeks* are like the blushing cloud
That beautifies Aurora's face
Or like the silver crimson shroud
That Phoebus' smiling looks doth grace.
Her *neck* is like a Stately tower
Where Love himself imprisoned lies

To watch for glances every hour
From her divine and sacred eyes."

এমনি করিয়া প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা চলিল, কিন্তু তাহর পরপারে আর কিছুই নাই; যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা কোন অতৃপ্তি নাই। ইহার সহিত একবার দেশীয় কবিতার তুলনা করি। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই শুধু বিদ্যাপতির মূল কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—এইটুকু মনে রাখিতে হইবে ইহা পূর্ণ সম্ভোগের কালের কবিতা—তাহা হইলেই ইহার গূঢ় আকাঙ্ক্ষার গোপন বেদনামাখা সুরটুকু প্রাণের মাঝে বাজিয়া উঠিবে,—

'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল!
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয় জুড়ন ন গেলি!'

—:※:—

শ্রেষ্ঠ-সন্ন্যাস।

—(-※-)—

(গাথা)

একদা কপিলবাস্তু নগরের ন্যগ্রোধ আরামে
উপজিল নৃপ নন্দ ভগবান বুদ্ধে নতি কামে!
প্রসন্ন সুগত, নন্দে কহিলেন সাদর বচনে—
"পুণ্য যদি চাহ বৎস্য, ভোগ রাগ বিলাস ব্যসনে
ত্যজি লহ বৈরাগ্যের বৈজয়ন্তি চীবর-কেতন
জগতের কল্যাণেতে ক'রে দাও আত্মনিবেদন
আকর্ণ আরক্ত গণ্ড নিবেদিল নন্দ করযোড়ে—
"প্রব্রজ্যায় নাহি বাঞ্ছা ক্ষমা কর প্রভু এবে মোরে।"

পূর্ণ এক বর্ষ পরে নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে
নিজে প্রভু আসিলেন নন্দ মহারাজের পুরীতে

স্তবচ্ছন্দে বন্দি' পদ নন্দ অভিনন্দিয়া সুগতে—
পদব্রজে পিছে পিছে চলিতে লাগিল রাজপথে,
আশ্রমে পুরোপকণ্ঠে পৌঁছে দিতে বুদ্ধ ভগবানে
সুবিনীত, লক্ষ্যহীন নগরের মহোৎসব পানে!
পৌঁছায়ে সুগতে সঙ্গে নন্দ যবে মাগিল বিদায়
নিবারিয়া ভগবান, বসিতে কহিল ইসারায়।

"এত কেন ত্বরা বৎস্য, সংসার কি এতই সুখের?
দেখিছ' না জরা মৃত্যু হাহাকার আকর দুখের?
সম্পাদ সে ইন্দ্রধনু! এ যৌবন পর্ব্ব-বিন্দু চলে
প্রতিপদে তিলে তিলে জরসা অমার সুকবলে!
সর্ব্ব শেষ আছে মৃত্যু—ফেলে যেতে হয় সব যত
সুখশ্রী ভঙ্গুর ভবে বারাঙ্গনা-ভ্রূভঙ্গের মত!
সম্পাদ, স্বজন, প্রিয়া, ভোগবাঞ্ছা যত দিন প্রাণ
দেহান্তে বিলীন সব! দেখ' এক বৈরাগ্যই ত্রাণ!

নন্দের প্রবণ চিত্ত দোলাকুল সন্দেহ দোলায়
সুমন্দ মারুত সমআন্দোলিত লতিকার, হায়!
প্রাণ মন সর্ব্ব-অঙ্গ যে মন্দিরে বন্দী ও বন্দারু
গুঞ্জরিছে সুন্দরীর চুম্বি' মুখ-মকরন্দ-চারু—
যাহার বিরহে দেহ ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু-যাতনায়—
তার তরে লজ্জা কেন বচনের ঘটে অন্তরায়?
কহিল রাজেন্দ্র শেষে—"গৃহই আমার প্রিয়, প্রভু,
ভাল হোক্ মন্দ হোক্ প্রব্রজ্যায় ইচ্ছা নাহি কভু।"

না ছাড়িয়া তবু বুদ্ধ দানিলেন বহু উপদেশ
একান্ত সে অনুরোধ এড়াইতে নারিল নরেশ।
প্রব্রজিত হ'ল নন্দ। পরিধানে কাষায় বসন
পাত্র-পাণি, বনবাসী, মনোদুঃখে স্তম্ভিত বচন।
প্রিয়ার চিন্তায় ধ্যানে যাপে দিন মর্ম্মদাহী ছলে
তিতে বক্ষ নিরন্তর বেদনার তপ্ত আঁখি জলে!
পূর্ণ হ'ল এক মাস। জাগে নন্দ প্রিয়াস্মৃতি নিয়া
বিনিদ্র নিশায় হেরে তন্দ্রাপথ কান্তা আগুলিয়া।

দিন দিন পাণ্ডুরুচি প্রিয়া হারা (নহে বোধি ধ্যানে)
দেখিয়া নন্দেরে প্রভু পুছিলা ডাকিয়া কাছ-পানে,
এ ব্রত পরম ধর্ম্মে মনঃস্থির হইয়াছে কি না !
উত্তরিল অধীর নৃপতি—"মরিতেছি প্রিয়া বিনা !
ফিরাইয়া লহ দেব এ নিষ্ঠুর করুণা তোমার,
যেতে দাও গৃহে মোরে কিম্বা দাও সঙ্গ দয়িতার !
এ বৈরাগ্য দীক্ষা যে গো হত্যা সম নিষ্ঠুর ভয়াল
কুটিল হিংসার মত, স্বার্থসম সুনীচ, দয়াল !"

কাটিল আরেক মাস। অপরাহ্ন। বহে মন্দানিল—
নিঃসঙ্গ বসিয়া নন্দ। ঊর্দ্ধে শান্ত অম্বর সুনীল।
আঁকিল কান্তার চিত্র গলিত গৈরিক শিলাতলে
মণ্ডি' মনোমাধুরীতে কল্পনায় মিলনের ছলে !
কহিল তন্ময় নন্দ—"সত্য প্রিয়ে এই মিথ্যাচার !
আমার সন্ন্যাস চেয়ে মিথ্যা ভবে কিছু নাই আর !
এ চীবর রক্ত বর্ণ তব প্রেম রাগ মঞ্জিমায়
কাটে দিন ছদ্ম বেশে, বাঁচি শুধু তোমারি চিন্তায়।

অদূরে শুনিতেছিল কয় জন ভিক্ষু এ বিলাপ
প্রভুর গোচরে আসি কহি' দিল শ্রমণের পাপ !
সহসা উদ্দীপ্ত হ'ল সুগতের বদন-মণ্ডল
পুলকে স্পন্দিল নেত্র, উপজিল চরণ-চঞ্চল।
গম্ভীর আননে প্রভু ভৎর্সিলেন নন্দ নরনাথে—
"উন্মত্ত হ'লে কি নন্দ? বিসর্জ্জিলে লজ্জা ধর্ম্মসাথে ?
এই চর্ম্ম রক্ত মাংসে গড়া' এই কুশ্রী দেহ তরে
দলিছ চরণে এ কি জ্যোতির্ম্ময় অমর সুন্দরে ?"

কহিল অধীর নন্দ সুন্দরীর বিরহের ভারে
"ক্ষমা কর হে ঠাকুর, রূপহীনা বলো না তাহারে !
কন্দর্প-কামুকলতা, অনিন্দ্যা-সুন্দরী, সুলোচনী,
কুন্দস্মিতা সে যে অনুপমা—নিবিড় স্তবক-স্তনী ;
সুললিত লোল ভ্রূলতার সাবলীল লাস্যে যার
বিশ্ব করে জয়, যার অনবদ্য বদন-শোভার

পরিমাণ-পরিমাপে শোভাকর হের চন্দ্রমায়—
তুলাদণ্ডে উর্দ্ধে অধিরূঢ় আপনার লঘুতায়।

"আমার বিহনে সে যে বিরহিণী চক্রবাকী হেন
চেয়ে আছে নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকার দিগন্তরে যেন!
বিদায় প্রারম্ভে তার সকাতর মৌন দৃষ্টিখানি
উপাড়িতে নারি আজো শল্যসম বক্ষে আছে হানি!
মণি রত্ন গজ বাজি রাজ্য সৌধ আমার সকল
দয়িতা পরশমণি—ইহলক্ষ্মী বিহনে বিফল!
প্রিয়াই আমার সুখ, ধ্যান পূজা, সব সেই মম—
দিগ্বিদিকে দেখি তাই—তারি কথা তারি লিপি সম!

ধীরে ধীরে কহিল সুগত—"বৎস্য মোর এ যে ভ্রম!
অকল্যাণ-মিত্র মোহে ত্যজিবি কি কল্যাণ পরম?
রমণীয় কিছু নাই ভবে। মানবের অনুরাগ,
আর এই চিরন্তন কামনা ও প্রার্থনার ফাগ
লাগে যার গায় (হোক্ সে কুৎসিত যত এই ভবে)
তারেই সুন্দর করে, প্রিয় করে মাধুর্য্য-গৌরবে!
মুছে ফেল এ স্নেহ-কলঙ্ক, ছিঁড়ে দেখ মায়া ডোর
কি কুৎসিত বীভৎস সংসার দিয়াছ যাহারে ক্রোড়।"

"দয়ার দেবতা যে গো করুণার তুমি অবতার—
এ কি বাণী তব মুখে, এ কেমন তব ব্যবহার?
ক্ষুদ্র নর আমি ভবে, বুঝি ও গো ক্ষুদ্রতর কথা
সেই শ্রেষ্ঠ স্বর্গ তার যার তরে বাজে যার ব্যথা!
সন্তুষ্ট যে যেথা থাকে থাকিবারে দাও তারে সেথা
পথিক সে নিজে খুঁজে লয় সুপথ তাহার যেথা!
আমি যারে ভালবাসি সে আমার স্বর্গ মোক্ষ সব
আমারে যে ভালবাসে সে আমার পরম বৈভব।"

"জনক ও জননীর যুগ্ম প্রেম প্রীতি রসায়নে
জন্মারম্ভ গর্ভে যার; বাৎসল্যের স্তন্য ও চুম্বনে
নিয়ত বাড়িল যাহা; বল্লভীর বাহুবল্লী যারে
একান্ত আগ্রহে ঘিরি রাখিয়াছে আলোঅন্ধকারে—

সে কি পারে বিসর্জ্জিতে জন্মগত প্রীতি ভালবাসা ?
পশুও পারে না যাহা, মানুষে তা' কর' তুমি আশা ?
কৃমি কীট জন্মে যথা থাকে তারা সেথায় হরষে
বাঁচে না কখনো তারা প্রাসাদের বিলাস আলসে !"

এতেক কহিয়া নন্দ উন্মাদের মতন অধীর
বুদ্ধ পদে রাখি চীর, সসম্ভ্রমে আনমিল শির।
পরি নিজ পূর্ব্ব বেশ চকিতে ছুটিল নরপতি
জনপদ পথ ধরি আপনার মনোরথ গতি।
"প্রেমই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ" কহিলেন প্রভু পুলকিত—
"প্রিয়-সেবা-তোষে যাহা মহানন্দে হয় উপচিত,
মানবের মন গোমুখীতে। এ প্রেমে যে আত্মহারা
কৌপীন তাহার মিথ্যা, সন্ন্যাসে সে সকলের বাড়া।" *

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মিষ্টি সরবৎ।

—:*:—

(১৩)

মহরমের ছুটি হইয়াছে। আবলু-সাহেবের বড় ভগিনী, স্বামীর সহিত পুত্রকন্যাদের লইয়া এখানে আসিয়াছেন। শিশুদের কোলাহলে বাড়ী আনন্দ-মুখর। আমিনা এবং হনেবের স্ফূর্ত্তি উৎসাহের সীমা নাই। রহমান-সাহেব অন্য সম্পর্কে হনেবের জননীর মাতুল, কাজেই একদিকে মাতামহ অন্যদিকে নন্দাই হওয়ার অধিকারে আইন-সঙ্গত পরিহাস-রসিকতার ক্ষমতা লাভ করিয়া, প্রৌঢ় ডেপুটী-সাহেব এই নবীন দম্পতি-যুগলকে লইয়া খুব আনন্দ জমাইয়া তুলিয়াছেন! হনেব সলজ্জ, আমিনা ব্যতিব্যস্ত! আবলু-সাহেবের নিগ্রহের সীমা নাই, তবে স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা তাঁহার সহায় আছেন তাই রক্ষা! রহমান-সাহেব সময় বিশেষে নিঃস্বার্থ করুণা-পরবশ হইয়া আহমদ্-সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেও, মাঝে মাঝে তাঁহাকে জব্দও করিতেছেন বিলক্ষণ!—রহমান-সাহেবের প্রকৃতিটি সদাহাস্যময়, মনটি উদার স্নেহশীল। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অনেকটা তাই, তবে স্নেহ ও কোমলতা গুণের আধিক্যে তাঁহাকে একটু স্বতন্ত্র দেখায়। আহমদ্ এবং আবলু ইঁহাদের উভয়কেই আন্তরিক সম্মান করিয়া চলিতেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসাতে আবলু-সাহেব তাঁহাকে পশ্চিমমহল ছাড়িয়া দিয়া নিজে দ্বিতলে উঠিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণ মহলের আড্ডা তাহাতে একেবারেই হতশ্রী হইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া আহমদ্-সাহেব

* (বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা হইতে)

তাঁহাকে নিজের মহলে টানিয়া আনিয়াছেন। আহমদ্-সাহেবের পোষাক-কামরার পাশের ঘরটি সুন্দররূপে নূতন আসবাবপত্রে সাজাইয়া-গুছাইয়া, আবলু-সাহেবের বাসের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

সে দিন সমস্ত সকালটা ধরিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া, অপরিসীম গৃহিণীপণার সহিত,—অভ্যাগত আত্মীয়-গণের সেবা-যত্নের সুব্যবস্থা করিয়া, দুপুরবেলা সকলের আহারাদি শেষ হইলে আমিনা তাহার দিদির কাছে গিয়া আড্ডা দিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বেচারা ইনেবও ছায়ার মত তাহার অনুগামী হইল।

দিদি তখন ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া একটু নিদ্রা যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। যুগল-মূর্ত্তিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সভয়ে চুপি-চুপি বলিলেন "আস্তে, আস্তে,—খোকারঘুম এসেছে,—একটু শব্দ পেলেই ও উঠে পড়্বে। আমিনা তোর ঘরে যা, ইনেবকেও ওর ঘরে দিয়ে যাও, আবলু আছে সেখানে।"

ইনেব লজ্জায় জড়সড় হইয়া কি একটা প্রতিবাদ করিতে গেল, ইতিমধ্যে আমিনা সপ্রতিভ হাস্যে বলিয়া উঠিল "সে তো আমি বলেছি ওকে, তা ও লজ্জায় দিশাহারা হয়ে রয়েছে, সেদিকে ঘেঁস্‌তে রাজি নয়, আমার লেজুড় ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—আমি কি কর্‌ব?—"

দিদি একটু স্নেহময় ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন "তুই-ই যত নষ্টের জোড়! তুই ভাল মানুষের মত নিজের ঘরে যা দেখি, তার পর আমি দেখ্‌ছি ইনেব কোন্ দিকে যায়—"

রহমান-সাহেব পাশের ঘরে শয্যায় শুইয়া তাঁহার প্রিয়তম ফর্‌সীটির সহিত বিশ্রাম্ভালাপ করিতেছিলেন, এ ঘরে হাঙ্গামা শুনিয়া, ফর্‌সীটি হাতে লইয়া সহাস্য মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কি—ব্যাপার কি? দুই সখিই যে এখানে! বেচারা সখা দুটি কোথা?

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, দিদির কোলের কাছে নিদ্রাতুর ছয় মাসের শিশুটী চমকিয়া চোখ মেলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল! আমিনা সোল্লাসে হাততালি দিয়া বলিল "ঐ! দেখ্‌লে দিদি,—উনিই খোকাকে ওঠালেন,—আমার দোষ নাই কিন্তু,—আমায় বোকো না—"

দিদি কৃত্রিম কোপে বলিলেন "না, বক্‌বো না! নে এবার ছেলে নিয়ে থাক্! ঝি চাকরেরা সবই খেটেখুটে এতক্ষণে খেয়ে একটু ঘুমুতে গেছে, সকলের শরীরেই আলস্য আছে, তোদের মত তো কেউ নয়! আমি তো তাদের এখন কিছুতেই ডাক্‌ব না, তোকেই ভোগাব—"

আমিনা উৎসাহের সহিত বলিল "বেশ তো, দাও না, তাতে আমি ডরাই না—"

ইনেব ব্যস্ত হইয়া বলিল "না আমি ওকে নেব—"

আমিনা ত্রস্তে শিশুকে তুলিয়া লইয়া সকোপে বলিল "নেবে বৈ কি তুমি! পালাও এখান থেকে, দিদির হুকুম,—যাও তুমি দাদার ঘরে—"

"আর তুমি?—" বলিয়াই ইনেব সলজ্জভাবে মুখ নীচু করিয়া হাসিল।

একটা মোড়া টানিয়া লইয়া, নিকটে বসিয়া রহমান-সাহেব উৎসাহের সহিত বলিলেন "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্-কথা!—" তারপর হঠাৎ আমিনার দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া একটু চুপি চুপি বলিলেন "যাও না,—তুমিও তোমার feeding-groundটির দিকে রওনা হও না—দুপুরবেলা হেথা-সেথা 'দুপুরে মাতন' ক'রে বেড়াচ্ছ কেন—"

আমিনা রাগতঃভাবে চোখ রাঙাইয়া বলিল "দেখুন, আপনি থামুন, দয়া ক'রে—"

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের স্বরে রহমান-সাহেব বলিলেন "দ্যাখো, ধমকের ঝাঁজটা দ্যাখো একবার!—না, শ্রীমান ভায়া আমার, বিলক্ষণ জব্দ হয়ে আছেন বটে! ওগো সুন্দরি—"

আমিনা তাঁহার কথা চাপা দিবার জন্য খুব চেঁচামেচি করিয়া 'হাথী পর হাওদা, ঘোড়ে পর জিন্' ইত্যাদি রবে বাল্য-অভ্যস্ত একটা কি কবিতা আবৃত্তি সুরু করিয়া দিল! শিশু স্ফূর্তির উচ্ছ্বাসে, মেঝের উপর সুকোমল চরণ দুইখানি ঠুকিয়া ঠুকিয়া থপ্ থপ্ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সামনে পিছনে ঝুঁকিয়া অসামঞ্জস্য তালে, মাসীমার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নাচিতে লাগিল। গোলেমালে রহমান-সাহেবের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, আমিনা মনে মনে স্বস্তি পাইয়া, গর্ব্ব-প্রফুল্ল মুখে বলিল "দেখ্ছ দিদি,—খোকা কেমন নাচ্ছে?"

দিদি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রহমান-সাহেব ফর্সীর নল ফেলিয়া, আমিনার মাথাটা দুইহাতে ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া—গৃহস্থ সকলে যাহাতে শুনিতে পায়, এমনিভাবে সংগোপনে (?) বলিলেন "খোকা তো বেশ নাচ্ছে, কিন্তু খোকার মেসোমশাইটির অবস্থা কি-রকম হচ্ছে একবার খোঁজ নাও—শুনছ—শুনছ—"

ত্রস্তে মাথা টানিয়া লইয়া, আমিনা ভগিনীপতির মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "দেখুন—" পরক্ষণেই দিদির সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই সে হাসিয়া ফেলিল!—তারপর ক্ষুণ্ণভাবে অনুযোগের সহিত বলিল "দ্যাখো তো ভাই দিদি,—আমি ওঁকে বড় ভাইটির মত মান-সম্ভ্রম কর্তে চাই, আর উনি কিনা এম্নিভাবে রঙ্গ করে সব উড়িয়ে দেবেন!—" ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "হুঁ! গবর্ণমেণ্ট যে কি গুণেই আপনাকে হাকিম করেছিলেন, আমি অবাক্ হয়ে তাই ভাবি! কি বিদ্যেই শিখেছেন, আহা!—"

ফর্সীতে সুদীর্ঘ-টান দিয়া রহমান-সাহেব কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমিনা বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিল—"দেখুন, আপনার রসিকতাগুলা বরং সহ্য কর্তে পারি, কিন্তু আপনার ঐ ফর্সীর উৎকট রসালাপ—ও আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।—আমি আশ্চর্য্য হই যে, দিদি কেমন করে আপনার ঐ ফর্সীটাকে বরদাস্ত করে নিলে!—আপনার ফর্সীটাকে দেখ্লে আমার তো কেবলই মনে হয় যে কল্কেটা আছ্ড়ে ভাঙ্গি, আর ফর্সীটা দরিয়ার জলে ভাসাই!"

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহমান-সাহেব কপট-বিস্ময়ে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—"শোন, শোন, প্রেস্ক্রিপ্স্যানটা শোন একবার! আচ্ছা আমিনা বিবি,—সত্য বল তো—নস্যোর সৌগন্ধটা বড় মিষ্ট, না?"

লজ্জায় আমিনা চুপ!—ঘাড় হেঁট করিয়া, সে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। যেন খোকার পা দুইখানি সে একান্ত মনোযোগে দেখিতেছে!—

দিদি এতক্ষণ নীরবে হাসি-হাসি মুখে ইহাদের বাক্‌বিতণ্ডা শুনিতেছিলেন। এইবার আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "নস্যোর গন্ধ মিষ্টই হোক, তিক্তই হোক, সেটা ওর কাছে পরম সুন্দর হতেই বাধ্য!—আমিনা, তুই উঠে পড়্তো দিদি,—ইনেবকে ওর ঘরে দিয়ে যা, এখান থেকে তর্কের ঝড় সর্লে আমি এখন একটু ঘুমিয়ে বাঁচি—"

আমিনা বলিল "ওঠো ইনেব—"

ইনেব এমন মজলিশ ছাড়িয়া উঠিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া দিদির দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল "আপনার খালি ঘুম, ঘুম—একটু জেগেই থাকুন না—"

আমিনা বাধা দিয়া বলিল "না, নাঃ! দিদি বেচারা ঘুমুক্, তোমাতে আমাতে পলাই,—শুধু একলাটি জেগে বসে থাকুন ওই ফর্‌সাওলা ঝগ্‌ড়াটে মানুষটি—"

রহমান-সাহেব বলিলেন "দেখ্‌বে, যাব তোমার ঘরে ঝগড়া জমাতে—"

দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আহা কি ছেলেমানুষী কর।—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমিনা অমনি তৎক্ষণাৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "হ্যাঁঃ! তাই বটে, না তাই বটে! বিশ্রী ছেলেমানুষী—" পরক্ষণেই খোকাকে কোলে লইয়া ইনেবের হাত ধরিয়া সে বাহির হইয়া চলিল। দিদি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন "ওরে ছেলেটাকে দিয়ে যা, ও এখনি কান্নাকাটি জুড়ে তোদের ব্যতিব্যস্ত কর্‌বে যে!—"

"কাঁদে যদি তো, দিয়ে যাব—" বলিয়া আমিনা চট্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রহমান-সাহেব বিদ্রূপের স্বরে কি একটা কথা বলিলেন, আমিনা শুনিতে পাইল না।—ইনেব একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া, পিছনপানে ফিরিয়া বলিল "ডাক্তার-সাহেব এখনো ঘরে আসেন নি, আপনারা ভাব্‌বেন না।"

হো হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া রহমান-সাহেব ঘরের ভিতর হইতেই উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"তবে যাব নাকি আমি,—শুন্‌ছ আমিনা—"

আমিনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, ছুটিয়া পলাইল।

পশ্চিমমহলে পা দিয়া ইনেব আমিনার কাণে-কাণে বলিল "ও ভাই আমিনা দিদি, যতক্ষণ না ডাক্তার-সাহেব আসেন, ততক্ষণ চল তোমার ঘরে বসি গে—"

আমিনা গৃহিণী-জনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না না,—দাদা পাশের ঘরে আছে, এখন ও ঘরে গিয়ে তোমার গল্প করা হবে না, যে দিদি শুন্‌লে রাগ কর্‌বে, দাদাই বা কি মনে কর্‌বে? বল্‌বে আমিনাটার জ্বালায় দিনেরবেলা ইনেবকে একবার দেখ্‌তে পাবার যো নাই!"

লজ্জায় লাল হইয়া ইনেব বলিল "হ্যাঁ তা বৈকি? তা কক্ষণো বল্‌বেন না। দ্যাখো না, উনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন—"

"আচ্ছা দেখি, ধরতো খোকাকে" বলিয়া আমিনা খোকাকে ইনেবের কোলে দিল। খোকা হাতপা ছুড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া কতকগুলা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিল। আমিনা তাহার বাচালতা দেখিয়া সকোপে শাসন করিয়া বলিল "ওরে ছেলে, চুপ! মামুজী ঘরে আছে, আবার এইখানে চেঁচিয়ে 'কাউ কাউ' করা হচ্ছে! ফের যদি চেঁচাবে তো দেব এখনি দুমু করে এক কিল বসিয়ে!—"

আমিনা মুঠা উদ্যত করিয়া খোকাকে কিল দেখাইল। খোকা পরম খুশী হইয়া খক্ খক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—তারপর নিজের ছোট্টহাতের কচি আঙুল দুইটি মুখে পুরিয়া চুক্ চুক্ করিয়া চুসিতে চুসিতে—শাসনকর্ত্রী মাসীমার দিকে নিতান্ত নিরীহভাবে জুল্ জুল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

খোকা বিদ্রোহিতা ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছে দেখিয়া, আমিনা নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশব্দ পদে, অদূরস্থ ঘরখানির দুয়ারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। তারপর দুয়ারের ফাঁক হইতে উঁকি দিয়া, ঘরের ভিতর চকিতের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া—ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত চুপি-চুপি ইনেবের কাণে কাণে বলিল "ঐ তো দাদা জেগে আছে!—শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌ছে, তুমি যাও ভাই, দুষ্টুমী কোরনা—"

দ্বিতীয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে খোকাকে টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা ইনেব সলজ্জভাবে একটু ইতস্তত: করিয়া শেষে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল!

(১৪)

ঘরে তখন আহমদ্-সাহেব আসেন নাই। আমিনা শেল্‌ফের উপর হইতে একখানি বাংলা গল্পের বই টানিয়া লইয়া,—শয্যার কাছে আসিল। খাটের উপর খোকাকে শোওয়াইয়া দিয়া, তাহার উপর বুক দিয়া পড়িয়া উপর্যুপরি শিশুর মুখে চুমা খাইয়া, অনেক রকম আদর জ্ঞাপন করিল। শিশু পরম পরিতোষ সহকারে "হোঁক-হোঁক" শব্দে আন্তরিক প্রসন্নতা জানাইয়া পা ছুড়িতে ছুড়িতে আঙুল চুষিতে লাগিল। আমিনা পাশে শুইয়া পড়িয়া, বুকের কাছে শিশুকে টানিয়া লইয়া, বইখানি খুলিয়া চোখের সাম্‌নে ধরিয়া পড়িতে সুরু দিল। খোকা সেই নিস্তব্ধতার অবকাশে আঙুল চুষিতে চুষিতে, কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দেই ঘুমাইয়া পড়িল।

আরো কিছুক্ষণ কাটিবার পর সিঁড়িতে আহমদ্-সাহেবের জুতার শব্দ হইল। আমিনা কাণ খাড়া করিয়া একবার শব্দটা শুনিয়া পুনশ্চ পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল, বইখানা তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। কাজেই, তখন ছাড়িতে পারিল না।

জুতার শব্দটা সিঁড়ি ও বারেণ্ডা পার হইয়া ক্রমে দুয়ারের কাছে পৌঁছিল। ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া, সহসা বিস্ময়সূচক স্বরে—"এ কি!" বলিয়া আহমদ্-সাহেব দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

আমিনার ভ্রূক্ষেপ নাই! সে একমনে পড়িয়াই চলিল। মিনিট দুই তিন কাটিল, আহমদ্-সাহেবের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমিনা আরব্ধ পরিচ্ছেদটা শেষ করিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল,—দেখিল স্বামী চৌকাঠের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-মুগ্ধ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া কৌতুক-স্মিত—অধরে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

খোকা যে আমিনার বুকের কাছে শুইয়া আছে, পড়ার ঝোঁকে আমিনা সেটা ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামীর হাসি দেখিয়া সলজ্জভাবে একটু সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। নিদ্রিত শিশু, নাড়া পাইয়া, চমকিয়া,—ঘুমের ঘোরেই ভীত ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিনা সরিতে পারিল না। সন্তর্পণে শিশুকে চাপ্‌ড়াইতে-চাপ্‌ড়াইতে আড় চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল "অমন করে হাস্‌ছ যে?"

"তোমায় দেখে—" বলিয়া আহমদ্-সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। আমিনা বলিল "ওকি, ঐ পোষাকেই ঘরে ঢুকছ যে!—"

"দাঁড়াও খোকাটিকে একবার দেখে যাই—" বলিয়া তিনি খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শিশুটির দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বলিলেন "চমৎকার ঘুমুচ্ছে।—খোকাটি তোমার কাছে এমন করে শুয়ে আছে, দেখে হঠাৎ আমি চম্‌কে গিয়েছিলুম!"

লজ্জা-কুণ্ঠিত স্বরে আমিনা বলিল "কেন?—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ও, তোমার বুকের কাছে ওম্‌নি ভাবে শুয়ে আছে, হঠাৎ দেখেই আমার চোখে যেন কেমন এক রকমই লাগ্‌ল! ছোট ছেলে এক মজার জিনিস, না?"

তিনি হেঁট হইয়া শিশুর ললাটে একটি চুমা খাইলেন। আমিনা সঙ্কুচিতভাবে একটু সরিয়া গেল। সস্নেহ দৃষ্টিতে শিশুর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল "দুষ্টুমী দেখো,—এ ধারে অগাধে ঘুমুচ্ছে,—কিন্তু আমার কাপড়টি ধরে আছে শক্ত মুঠোয়! পাছে আমি পালাই!—"

আহমদ্ সাহেব কোন উত্তর দিলেন না, কি একটা কি কথা মনে পড়ায়,—আমিনার মুখ পানে চাহিয়া নীরবে শুধু হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি দেখিয়া, কে জানে কেন,—আমিনার ভারী লজ্জা বোধ হইল, সঙ্কুচিতভাবে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া—সরিয়া শুইয়া, একটু কাশিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আবার হাস্‌তে সুরু দিলে যে! রকম কি?—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন, "একটা কথা মনে পড়্‌ল"

আমিনা বলিল "কি?—"

চকিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া, আমিনার কাণের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নস্বরে তিনি বলিলেন "ভাব্‌ছি, এমন কোন একটি খোকার মা হ'লে, এখন তোমায় নেহাৎ মন্দ মানায় না, আমিনা!—আর তা হ'লে, কথায়-কথায় ঘর-থেকে ঠিক্‌রে পালানর দফানিকেশ!"

"আচ্ছা, যাও—" বলিয়া লজ্জাবিব্রত আমিনা—হাতের কাছে কোথাও কিছু না পাইয়া খপ্ করিয়া বইটা টানিয়া নিজের মুখের উপর চাপা দিল। আহমদ্-সাহেব হাসিতে হাসিতে পোষাক কামরার দিকে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পোষাক ছাড়িয়া সাবানে হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, আহমদ্-সাহেব সাধারণ বেশে নস্যর কৌটাটি হাতে লইয়া, মুখে একটি অগ্নি হীন চুরুট ধরিয়া, ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। আমিনা তখনও তেমন অবস্থায় পড়িয়া আছে। আহমদ্ সাহেব তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া মুখের উপর হইতে বইখানা সরাইয়া লইয়া দেখিলেন—সে তখনো চোখ বুজিয়াই নিঃশব্দে হাসিতেছে!

অত সুকোমল স্নেহ পূর্ণ একটি মৃদু চপেটাঘাত আসিয়া আমিনার গালের পাশে পৌঁছিল, কিন্তু সে চোখ চাহিল না,—মুদ্রিত নয়নেই স্বামীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া, চুপ চুপ বলিল "এখানে বসতে হবে না, ছিঃ, দুয়ার খোলা রয়েছে, দেখ্‌ছো?—ভদ্রলোকের মত উঠে গিয়ে ওধারে ঐ কৌচটার ওপর বোস—"

স্বামী কপট-গাম্ভীর্য্যে বলিলেন "এই অনুরোধটা কি নিতান্ত অভদ্র-জনোচিত হোল না? ছিঃ, শিষ্টাচার কাকে বলে একেবারেই জান না দেখ্‌ছি। কৌচে বস্‌ব এখন এরপর, আগে এইখানে বসে প্রিয়বন্ধু মোহিনীবাবুর প্রীতি-উপহার এই মূল্যবান চুরুটটির দাহন-কার্য্য সমাধা করি—"

সবিস্ময়ে চোখ মেলিয়া আমিনা বলিল "কী? চুরুট পোড়াতে হবে? এই ঘরে বসে? আমার কাছে?—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তা কি করব? অন্তরঙ্গ বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধ!—সে মাথার দিব্য দিয়ে বলেছে—"

আমিনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, "ছাই-ভস্ম ঐ বিটকেল গন্ধে আমি যে এখনি মাথা ধরে মরব!—"

আহমদ্ সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "সেই জন্যেই বন্ধুবর এত আগ্রহে অনুরোধ করেছেন।"

মাথা তুলিয়া, বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আমিনা বলিল "কি? আমার মাথা ধরিয়ে মারবার জন্য তোমার বন্ধু মাথার দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করেছেন?—আঃ! তবে বুঝি বন্ধুদের কাছে আমার নামে কুৎসা করা হয়েছে সব? না?—"

আহমদ্-সাহেব উদাস দৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়া নরম সুরে বলিলেন "তা যৎকিঞ্চিৎ করতে বাধ্য হয়েছি বৈ কি! আমার কোন সখ মেটাবার যো নাই! ঘরে বসে চুরুটটা-আসটা খাব, তা সে পথও বন্ধ! এতে আপশোষ হয়, কি না হয়?—কাজেই বন্ধুদের কাছে দুঃখের কথা কিছু কিছু বলছি।"

আমিনা অবাক্ হইয়া গেল! ক্ষণপরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি!—উঃ, এর জন্যে তোমার এত আপশোষ!—বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করতে যাওয়া! ছিঃ!—বেশ আমি আর কিচ্ছুটি বলব না, তোমার যা খুশী তাই কর, ঘরে বসে চুরুট খাও, গাঁজা খাও, গুলি খাও, আমি কিছু আপত্তি করব না। তবে ওসব বিট্‌কেল গন্ধ আমার সয় না, আমি বাইরে চল্লুম।—"

আমিনা সত্যই উঠিয়া পড়িল। নাড়া পাইয়া ঘুমন্ত শিশু চমকিয়া চোখ মেলিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিল। আমিনা থামিল, সাবধানে শিশুকে পুনশ্চ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতে-পাড়াইতে, সাতিশয় অপ্রসন্নতা সহকারে—অথচ খুব সংযত স্বরে অস্ফুটভাবে বলিল "আঃ এ ছেলেটিও হয়েছে তেম্‌নি!—"

"হুঁ বোঝ—" বলিয়া আহমদ্-সাহেব মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে সুরু দিলেন। আমিনা অভিমান-সজল-দৃষ্টি তুলিয়া বলিল "আর হাস্‌তে হবে না, থাম—"

অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আহমদ্-সাহেব থামিলেন। চুরুট-টি ছুড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, সহাস্যে বলিলেন "এই নাও, রইল চুরুট! আমার নানা দাদাও কখনো চুরুট খায় নি, আর তো ছেলেমানুষ! রহমান-সাহেবের জন্য এক বাক্স কিনে এনেছিলুম, তাই তারই একটা নিয়ে এসেছিলুম তোমায় রাগাবার জন্য! মাপ কর আমিনা আর চোটো না, মোহিনী বাবু এসব খবরের এক হরফ্‌ও জানেন না,—যতগুলি কথা বলেছি তার আদ্যোপান্ত সবই মিথ্যে!"

আমিনা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল "সব মিথ্যে?"

আহমদ্ সাহেব বলিলেন "সমস্ত! আমি শুধু তোমার চটে উঠবার দক্ষতটা দেখছিলুম! উঃ, কি ভয়ঙ্কর!"

বিষম সংশয়ান্বিত হইয়া আমিনা বলিল "এতগুলো কথা সমস্তই মিথ্যে?—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "সমস্ত! সমস্ত! সমস্ত! 'বিলকুল মিথ্যা! কিন্তু আমি নিজেই দোষ স্বীকার করছি, আর রাগ করা চল্‌বে না তোমার।—"

আর যায় কোথা! এতক্ষণ আমিনা যদিবা রাগ করিতে ভুলিয়াছিল, এবার ভুলিল না। সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "নাঃ রাগ করা চল্‌বে না!—খুশী হয়ে তোমায় বক্‌শীস্ দেবে নয়? আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার পা দুটো ধরে ঠক্ ঠক্ করে পায়ে মাথা ঠুকি—"

আহমদ্-সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া দুয়ারের সেই ছিটকানীটা বন্ধ করিয়া দিয়া, নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া, টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজখানি তুলিয়া লইয়া, কোচে গিয়া বসিলেন, তারপর সুবোধ বালকটির মত তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলেন।

আমিনা গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আহমদ্-সাহেব অতি সন্তর্পণে ঘাড় ফিরাইয়া আড় চোখে তাঁহার পানে চাহিলেন, চোখোচোখি হইতেই সমাধিমগ্না আমিনার আন্তরিক

শান্তির কি যে ব্যাঘাত সংঘটিত হইল, বলা কঠিন, হঠাৎ সে উচ্চ উচ্ছ্বাসে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল! আহমদ্-সাহেব ব্যস্ত ভাবে দাড়ি চুল্‌কাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া হাসি সাম্‌লাইয়া লইয়া পুনশ্চ কাগজে চোখ দিলেন। আমিনা হাসিতে হাসিতে বলিল "অবাক্ করেছ তুমি! উঃ, ঠোঁটে কি মিথ্যে কথাটি যোগানই আছে? আশ্চর্য্য বটে! আমার তো একটা মিথ্যে কথা বল্‌তে গেলে কি কোথাও একটা জিনিস চুরি কর্‌তে গেলে, আগে হাসি পায়। ওবেলা দিদির কৌটো থেকে একটু জরদা চুরি কর্‌তে গিয়ে—" বলিয়াই হঠাৎ সে থামিল, ঢোক্ গিলিয়া, একটু থত মত খাইয়া বলিল "জরদা খেলে দিদিকে বেশ দেখায়, না?—"

আহমদ্-সাহেব কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন "হুঁ, খেতে ধরেছ বুঝি? দ্যাখো ঠাট্টা-তামাসা নয়,—উগ্র বিষ, খাঁটি নিকোটিন্ ওসবে আছে! বুঝে খেও—"

আমিনার মুখ শুকাইয়া গেল। কোনমতে আত্মদমন করিয়া বলিল "হ্যাঁ, খেতে ধরব কেন? তাই বুঝি খায়! ঐ ইনেব বলছিল কিনা,—তাই—" বলিয়াই বিচলিত ভাবে সে কথা উল্টাইয়া লইয়া—চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া,—ফশ্ করিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া, পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বলিল "দ্যাখো এতে একটা চমৎকার গল্প পড়্‌ছিলুম, বেশ গল্পটি, আচ্ছা বল দেখি লোকে মদ খায় কেন?"

আহমদ্ সাহেব কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মাতাল হবার জন্য—"

আমিনা উৎসুকভাবে বলিল "আচ্ছা মাতাল হয়ে কি করে বল দেখি? আমি কক্ষণো মাতাল দেখি নি, একদিন মাতাল দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়—"

আহমদ্-সাহেব পরম নির্লিপ্ত ভাবে গোঁফ মুচ্‌ড়াইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন "খাব, একদিন মদ্ হব মাতাল—"

নিদারুণ অবজ্ঞার স্বরে আমিনা বলিল "তুমি! ওহ্!—" বলিয়াই বইখানা চোখের সামনে তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মিনিট কয় পরে, পুনরায় বই হইতে চোখ তুলিয়া, কৌতূহলপূর্ণ স্বরে বলিল "আচ্ছা সত্যি বলতো—মাতাল হয়ে কি করে?—"

আহমদ্-সাহেব উদাস-গম্ভীর কণ্ঠে একটানা ছন্দে বলিয়া চলিলেন "হাসে, কাঁদে, নাচে, লাফায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনী করে। আবার সময় বিশেষে, অত্যন্ত প্রিয়তম ব্যক্তিটির জীবন সংহার করেও বসে!—"

আমিনা সভয়ে বলিল "ওরে বাবা!—" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি একটা কথা ভাবিয়া লইল। শেষে স্বামীর মুখপানে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিতে করিতে—সহসা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আহমদ্-সাহেব কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া, প্রাণপণে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া, সুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "হাসিটার অর্থ?"

আমিনা কৌতুক-স্মিতমুখে বলিল "সত্যি,—ভাব্‌ছি, যদি কোনদিন তুমি সত্যি-সত্যি মদ্ খেয়ে মাতাল হও, তা হলে আমি কি করি?"—সে আবার হাসিয়া উঠিল।

আহমদ্-সাহেব কাগজ ফেলিয়া, এদিকে ওদিকে নস্যের কৌটাটা খুঁজিতে খুঁজিতে, গম্ভীরমুখে বলিলেন "বিষয়টা চিন্তনীয় বটে! একদিন Experement করে দেখ্‌তে হবে।—"

আমিনা বলিল, "মদ খাবে নাকি?—

আহমদ্-সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! কপালে চোখ তুলিয়া, মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন "বাঃ, তা, না হ'লে চল্‌বে কেন ?—"

আমিনা বিস্মিত হইয়া বলিল "সত্যি খাবে ?"

শয্যার উপর হইতে নস্যের কৌটাটি তুলিয়া প্রাণপণে এক টিপ্‌ নস্য টানিয়া, একটু কাশিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া,—বইয়ের শেল্‌ফের দিকে চাহিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "There is no doubt about it. আমি তো খাবই, আর সেই সঙ্গে খাওয়াব আব্‌লু মিঞাকে !—"

চমকিয়া আমিনা বলিল "কি ? দাদাকে-সুদ্ধ খাওয়াবে !—" পরক্ষণেই ঘোরতর অবিশ্বাসের সহিত সজোরে বলিল "হুঁ! দাদা তো আগে খেয়েছে! সে তোমার মত নয় তো !—"

আহমদ্-সাহেব ততোধিক জোরে বলিলেন "এই কথা! দেখো তবে !—Through fire and water. এই কাণ মলে কসম্ খাচ্ছি, আবলুকে মদ্ খাওয়াবো, খাওয়াবো, খাওয়াবো! নিজেও আলবৎ খাব !—তখন দেখো মজা! তারপর দুই ঘরে দুই মাতাল নিয়ে তোমরা দুজনে কি কর সে আমায় দেখ্‌তে হবে ।"

ভয়ে আমিনার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিল "দ্যাখো, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না—"

আহমদ্-সাহেব সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "এই নাও! আমি কি ভাল লাগ্‌বার জন্যে বল্‌ছি ? না, সত্যি সত্যি-ই ঠাট্টা কর্‌ছি !—আমি আসল কথাটা বল্‌ছি ?—"

এবার সত্যই আমিনার মাথা গরম হইয়া উঠিল—হঠাৎ, বাধা দিয়া উত্তেজনার সহিত বলিল "খেও, খেও, খেও! তোমার যা খুশী তাই কোরো। কিন্তু ঘর ঢুকতে পাবে না তা ব'লে রাখ্‌ছি,—আমি সেদিন ঘরে খিল দিয়ে একলা থাকব !—"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া, আহমদ্ সাহেব পরম মনোযোগ সহকারে পুনশ্চ নস্য টানিয়া,—সুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "খিল দিয়ে থাক্‌তে পারো, থেকো, মোদ্দা এই জানালার পাশে ঐ নারকেল গাছে যিনি বসবাস করছেন,—মাঝে মাঝে পদাঘাতে যিনি নারকেল বাল্‌তোগুলো ভেঙ্গে সশব্দে মাটীতে ফেলে দেন, জানো তো তাঁর কথা—তিনি রাত্রে ঐ জানালা থেকে উঁকি দিয়ে তোমায় একলা দেখে যদি, আলাপ-পরিচয় করতে ঘরে ঢোকেন—"

দিনে দুপুরের রৌদ্রালোকে, এ কথাগুলা বিশেষ কার্য্যকরী হইল না। আমিনা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "দ্যাখো ভাল হবে না বল্‌ছি—"

"আঃ শোন না, সত্যি কথাই বল্‌ছি—ঠাট্টা নয়, এই- সত্যিই যদি রাগ করে কোনদিন ঘরে খিল দিয়ে একলা তুমি থাক, তা হ'লে মনে রেখো, উনি সে দিন নিশ্চয়ই—" আহমদ্ সাহেবের মুখের কথা মুখেই রহিল, বাহির হইতে রুস্তম দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল "হুজুর বেমারী আয়া—জরুরী ডাক—"

আহমদ্-সাহেব বিছানায় শুইয়া পড়িতে যাইতেছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "কাঁহা সে আয়া ?—"

রুস্তম উত্তর দিল "হোগ্‌লি—রায় বাহাদুর সাব্‌কো মোকাম-সে,—হাওয়াগাড়ী লায়া, আপ্‌কো যানে হোগা, চিঠ্‌ঠি হ্যায়—"

"মাটী করেছে রে ? আহা, এমন জমাট আসরে,—বজ্রাঘাত! বলিতে বলিতে আহমদ্-সাহেব আসিয়া দুয়ারের ছিট্‌কিনী খুলিয়া ফেলিলেন। রুস্তমের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িয়া, ব্যস্তভাবে বলিলেন "উন্‌কো বৈঠ্‌নে কুর্সি দে দেও, ঔর মেরা সেলাম দেকে বোলো, সা'ব পোষাক পিন্‌কে জল্‌দি আঁতে হেঁ—"

রস্তম চলিয়া গেল। আহমদ্-সাহেব ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে বাছিয়া খুঁজিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে একখানা বই টানিয়া লইয়া—তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া নির্ঘণ্ট-পত্রে খুঁজিয়া কি একটা অধ্যায় বাহির করিয়া মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে পড়িলেন। তারপর একটু ভাবিয়া বইখানা রাখিয়া বলিলেন "আমিনা ওঠো, ওঠো, ঐ আলমারীটা খুলে ডিক্যাপিটার ফিক্যাপিটার সমস্ত যন্ত্রগুলো বের করে দাও দেখি—"

আমিনা মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া তখন বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, সে কোন উত্তর দিল না।

আহমদ্-সাহেব তাহার বাহুমূল ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন "শুনছ, ওঠো, বড্ড তাড়াতাড়ি। লেডি ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছেন, লোক ছুটে এসেছে, প্রসূতির অবস্থা মুমূর্ষু, এখন কথা কইবার সময় নাই,—ওঠো, যন্ত্রোগুলো ব্যাগে ঠিক করে দাও, আমি পোষাক পরতে চল্লুম।"

আমিনার রাগ যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছিল, কিন্তু তবু সে এই ব্যবহারে এখন একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। মেঘের উপর ফিকা-রৌদ্র বিকাশের ন্যায় একটুখানি ক্ষীণ ব্যঙ্গভরা হাসি তাহার ঠোঁটের উপর ফুটিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল "আর মদের ডিক্যাণ্টার-টাও ভর্ত্তি করে দিতে হবে না?"

আমিনার গালে একটি মৃদু-কোমল চপেটাঘাত করিয়া স্মিতহাস্যে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ও কথার জবাব ফিরে এসে দেব, এখন সময় নাই।" তারপর দ্রুতপদে তিনি পোষাক-কামরায় চলিয়া গেলেন।

আমিনা নিঃশব্দে উঠিয়া যন্ত্রের ব্যাগ গুছাইতে বসিল। কোন্ ক্ষেত্রে কি কি জিনিসের প্রয়োজন, সেগুলো সে স্বামীর সহায়তায় শিখিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে আহমদ্-সাহেবের কোন জিনিস ভুল হইলেও, আমিনার হইত না। সেইজন্য বিশেষরকম ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হইলে আমিনা যখন নিশ্চিন্তরূপে গা-ঢাকা দিত, তখন চিকিৎসক মহাশয় বড়ই বিভ্রাটে পড়িতেন, তবে অল্প-স্বল্প ঝগড়া-ঝাঁটি থাকলে, এরকম অবস্থায় আমিনা সেটা সহজেই চাপা দিয়া ফেলিত—কারণ স্বামী ঘরের মধ্যে সামনে বসিয়া থাকিলে আমিনা নির্দ্দয়-বিদ্রোহিতা করিতে পারে, কিন্তু তিনি যখন বিশ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য বলিদান দিয়া, কঠোর-দায়িত্বের পথে, গুরুহ কর্ত্তব্যপালনে যাত্রা করিতেন,—তখন স্বামীর উপর সহানুভূতিতে এবং কি একটা অজ্ঞাত আগ্রহে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তারপর—যতক্ষণ না স্বামী, শ্রমক্লান্ত দেহে, সাফল্যের আনন্দ-জ্যোতিঃ উজ্জ্বল দৃষ্টি লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেন,—ততক্ষণ তাহার স্বস্তি থাকিত না। কলহ বিবাদ থাকিলে, অবশ্য, এ সময় হঠাৎ সামনে আসিতে আমিনার ভারী লজ্জা হইত, তাই সামনে দেখা দিতে পারিত না, কিন্তু এই সময়টির জন্য, আড়ালে তাহার একান্ত উৎসুক চক্ষু দুইটি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকিত।

পোষাক পরিয়া এ ঘরে ঢুকিয়া আহমদ্-সাহেব দেখিলেন যন্ত্রের ব্যাগটি গুছাইয়া কোলে লইয়া, আমিনা একটা সোফায় বসিয়া, স্তব্ধভাবে কি ভাবিতেছে। তিনি নিকটস্থ হইতেই আমিনা ব্যাগটি খুলিয়া সামনে ধরিল, জিনিসগুলার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন "ঠিক্ হয়েছে সব, আর কিছু চাই না।—"

তারপর আহমদ্ সাহেব ব্যাগটি হাতে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া দুয়ারের কাছে সহসা দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া সপরিহাসে বলিলেন "চটে অভিশাপ দিও না, মেহেরবাণী পূর্ব্বক কল্যাণ প্রার্থনা কর, যেন নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আসি, বুঝ্লে"

আমিনা কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিল। সঙ্কট-পীড়িত রায় বাহাদুর-গৃহের বিষাদ-কল্পনা-স্মৃতি তাহার সরল কোমল-কিশোর মনটিকে কেমন একটা সমবেদনা-ভারে সকরুণ করিয়া খুলিয়াছিল, স্বামীর পরিহাসের উত্তরে—এখন আমিনা কথা কহিতে পারিল না।

রাত্রি সাড়ে আটটার পর আহমদ্-সাহেব কল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দাওয়াই-খানায় অনেকগুলি ঔষধ-প্রার্থী জমা হইয়া বসিয়াছিল, পোষাক বদলাইয়া হাতপা ধুইয়া তাড়াতাড়ি রাত্রের আহার শেষ করিয়া, তাহাদের যথোচিত বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। সমস্ত কাজ গুছাইয়া ডিস্পেন্সারী হইতে উঠিতে তাঁহার রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, শয়নকক্ষে আসিয়াই জামা খুলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আজ সমস্ত দিনে একবারও তিনি শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিতে পান নাই, তার উপর গুরুতর পরিশ্রমে শরীর অত্যন্তই শ্রান্তি অলস বোধ হইতেছিল। কাজেই আর বসিতে পাড়িলেন না।

আমিনা বোধহয় নিকটেই কোথা অপেক্ষা করিতেছিল, মুহূর্ত্ত পরেই সে ব্যগ্রভাবে ঘরে ঢুকিল। তাহার গালে তখন প্রচুর পরিমাণে পান ঠাসা ছিল, কাজেই প্রথমটা সে কথা কহিতে পারিল না একটা বেতের চেয়ার টানিয়া সামনে আসিয়া বসিয়া—টুকটুকে পাতলা ঠোঁট্ দুখানি কষ্টেসৃষ্টে একটু ফাঁক করিয়া—সাবধানে চিবুকটা উঁচু করিয়া অস্পষ্ট ভাবে বলিল "সেখানকার খবর কি বল তো? তোমার রোগীটি কেমন আছে?"

একটু হাসিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "খবর ভাল। তুমি নিজে হাতে সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছ, রোগী সুস্থ হ'তে কি বাকী থাকে!—

আমিনা আগ্রহের সহিত বলিল "কি ছেলে হোল? খোকা?"

স্বামী উত্তর দিলেন "না খুকি। বেশ সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশু। তবে মা-টি-অত্যন্ত ছেলে মানুষ কি না তাই কষ্টটা কিছু বেশী পেয়েছেন।—নাও মশারীটা ফেলে, শুয়ে পড়, ভারী ঘুম পেয়েছে আমার—"

ঢোক গিলিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ সজোরে শিহরিয়া—শরীর ঝাঁকাইয়া—আমিনা চেয়ার ছাড়িয়া ত্রস্তে উঠিয়া পাড়ল, তারপর বিনাবাক্যে উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিয়া পলাইল।

আহমদ্-সাহেব অর্থটা কিছু বুঝিতে পারিলেন না অবাক হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট ক্রমে পনর মিনিট কাটিল. আমিনার দেখা নাই। শ্রান্ত আহমদ্-সাহেবের অত্যন্তই অবসাদ বোধ হইতেছিল, তিনি উঠিয়া আর আমিনার খোঁজ লইলেন না। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন সে নিশ্চয় পশ্চিমমহলে গিয়াছে। তিনি ক্লান্ত চক্ষু মুদিয়া নিদ্রার চেষ্টায় মন দিলেন।

ক্ষণ পরেই দুয়ারের কাছে জুতার শব্দ হইল। আহমদ্-সাহেব চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আব্লু-সাহেব বাহির হইতে ডাকিলেন "আহমু, আছ, জী—"

আহমদ্ সাহেব উত্তর দিলেন "আছি ঘরে এস—" ঘরে ঢুকিয়া,—ব্যগ্র চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া আবলু-সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন "আমিনা ঘরে নাই! তাহ'লে এরা দুটোতে কোথা গেল এখন? পশ্চিমমহলের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে, উত্তর-মহলেরও দুয়ার বন্ধ, এরা তাহ'লে গেল কোথা?"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "সে কি? দুজনেই গেছে? তাহলে দ্যাখো পোষাক কামরায় ঢুকেছে বোধহয়।"

আবলু সাহেব বলিলেন "না, না,—আমি সব ঘর খুঁজে এসেছি।—বারেণ্ডায় নাই, কোথাও নাই।

আহমদ্-সাহেব একটু রহস্যের সুরে বলিলেন "তবে কি দুজনের ডানা টানা বেরুলো নাকি—" বলিতে বলিতে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "চল, একবার সন্ধান করে দেখা যাক্ কোথায় উড়্‌ল দুজনে—"

আবলু সাহেব একটু বিরক্তভাবে বলিলেন "না, না, ঠাট্টা নয়। দ্যাখ দেখি অন্যায়, রাত দুপুরে কোথায় দুজনে ছুটোপাটী করতে বেরুল, এতে দিক্ ধরে না?"

আলোক লইয়া বাহিরে আসিয়া দুজনে চারিদিক খুঁজিলেন, কোথাও কাহারও সন্ধান পাইলেন না। এবার আহমদ্-সাহেবেরও ভ্রূযুগল রীতিমত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন "তবে কি এরা পশ্চিম মহলের তেতলার ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে ?—"

আব্লু-সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "না না, আমি ওমহলে দিদির কাছে ছিলুম, একটু আগে আমি ওমহল থেকে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে ও-দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল, তখন এরা দুজনে এখানে বারেণ্ডায় ছিল।—তারপর আমি খানকতক চিঠি লিখ্‌তে বসেছিলুম, একটু পরে ইনেব গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মশারীটা এখনই ফেল্‌তে হবে কি না, আমি বারণ কর্‌লুম, সেও বাইরে চলে এল, বাস্ আর দেখা নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আহমদ্-সাহেব চিন্তিতভাবে বলিলেন "দক্ষিণমহলের ছাদের চাবি খুলে সেইখানে যায় নি তো ?—শুণে ঘাট নাই, চলতো আলোটা নিয়ে, একবার দেখে আসা যাক।"

বারেণ্ডার পাশে সিঁড়ি দিয়া, আলোক হাতে দুইজনে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, ছাদের দুয়ারের চাবি খোলা ! আব্লু সাগ্রহে বলিলেন "এই যে !"—তারপর দ্রুত অগ্রসর হইয়া ঈষদুচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন "আমিনা—"

ছাদ হইতে ক্ষীণস্বরে উত্তর আসিল "জী—"

তিনলম্ফে সিঁড়ি পার হইয়া দুইজনে ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন একটা কার্পেটের গালিচার উপর দুইটা বালিশ মাথায় দিয়া আমিনা ও ইনেব নিঝুম ভাবে পড়িয়া আছে !

নিকটে আসিয়া আবলু বলিলেন "এখানে এমন করে শুয়ে কেন ?—"

দুই জনের কেহই কোন উত্তর দিল না। ইনেব মুখের উপর ঘোমটা-টা প্রচুর পরিমাণে টানিয়া, খুব জড়সড় হইয়া শুইল, আর আমিনা বালিশের উপর মুখটা প্রাণপণে গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।—

আহমদ্-সাহেব তাহার মাথাটা ধরিয়া সোজা করিয়া মুখের সাম্‌নে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া ধীরভাবে বলিলেন "কি হয়েছে বল দেখি তোমাদের; সত্যি করে বল, কিছু অসুখ কর্‌ছে ?"

মুখের উপর হাত আড়াল করিয়া আমিনা অস্ফুট স্বরে বলিল "হাঁ বড় অসুখ কর্‌ছে ?"

দুই জনেই সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন "কি হচ্ছে ?—"

আমিনা আর উত্তর দেয় না। উপর্য্যুপরি প্রশ্নপৃষ্ট হইয়া অবশেষে নিস্তেজ স্বরে বলিল "বড্ড বুক ধড়্ ফড়্ কর্‌ছে আর মাথা ঘুর্‌ছে,—আমাদের।"

এ বংশে কস্মিনকালে কাহারও মূর্চ্ছার ব্যারাম নাই। আর থাকিলেও—এমন ভাবে দুইজনেই যে এক সময়ে সে ব্যাধির পূর্ব্বরাগ আক্রমণে আক্রান্ত হইবে, এমন কোন কথা নাই ! আহমদ্-সাহেব সংশয়-উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দুই জনেরই ধমনী-গতি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মাথা ও কপাল অত্যন্ত গরম ! বুঝিলেন যে কোন কারণেই হউক, একটা স্নায়বিক উত্তেজনার আঘাতে দুইজনেই নিদারুণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অত্যন্ত কোমলভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন "কিছু ভয় পেয়েছ কি তোমরা ? সত্যি বল দেখি"

দুই জনেই ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই বেশ একটু বিচলিত বোধ হইল। আহমদ্-সাহেব দেখিলেন দু জনেরই কপাল দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে।—

একটু ভাবিয়া তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন "ঠিক্ করে বল দেখি, তোমরা কিছু খেয়েছ কি ?—"

বলা বাহুল্য, আমিনা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িল—'না।' কিন্তু ইনেব স-সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আহমদ্-সাহেবের সন্দেহ দৃঢ়তর হইল, পরম আশ্বাসের স্বরে অতি সুকোমলভাবে তিনি বলিলেন "বলুন তো বিবি-সাহেব, আপনি সত্যি কথা বলুন তো, কোন ভয় নেই আপনাদের, কেউ কোন কথা বল্‌বে না, আপনি ঠিক করে বলুন—কিছু খেয়েছেন আপনারা, নয় ?—হঁ', বলুন তো কি খেয়েছেন ? বলুন, তাতে লজ্জা নেই—আচ্ছা আব্‌লু, জিজ্ঞাসা কর তো ভাই—উনি কি বলেন—"

ইনেবের সামনে ঝুঁকিয়া আব্‌লু বলিলেন "বল না কি বল্‌ছ, কি খেয়েছ তোমরা ?—"

অস্ফুট স্বরে সভয়ে ইনেব বলিল "জর্‌দা।"

আব্‌লু-সাহেব বলিলেন "জর্‌দা! অঃ! ওরে আহম্‌, জর্‌দা খাওয়া হয়েছে!—" পরক্ষণে ঈষৎ উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন "বেশ হয়েছে! আচ্ছা হয়েছে! থাক দুজনে এই ছাদে পড়ে! জরদা খাওয়া! ওঃ, তারপর কাল মদ খাওয়া হবে, পরশু গাঁজার কল্‌কে পয়্‌দা হবে,"

সহানুভূতি-করুণ কণ্ঠে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আহা থাম, থাম—এখন কিছু বলিস্ না। জরদার তেজে ওরা যে কতখানি জখম্ হয়েছে, সে ওদের অন্তরাত্মাই টের পেয়েছে আর কিছু বল্‌তে হবে না।—"

রুষ্টভাবে আব্‌লু বলিলেন "কি বলিস্ বল্ দেখি ভাই—সাধে রাগ হয়! এই দুপুর রাত্তে, জরদা খেয়ে ছাদে এসে পড়েছে, তোতে আমাতে দুজনেই যদি ঘুমিয়ে পড়্‌তুম, তা হলে ছটীপাড়্ দুটো থাকতো সারারাত্রি এই খোলা যায়গায় হিমে পড়ে! তারপর! এমন রাগ হচ্ছে আমার, ইচ্ছে করছে গলা টিপে দুটোকে ছাদ থেকে টপ্ টপ্ করে ফেলে দিই—"

বাধা দিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "যথেষ্ট সুবিচার হয়েছে আর নয়। আমার ঘরে শেল্‌ফের ওপর তাকে অডিকলোনের শিশিটা আছে, নিয়ে আয়। আর একটু জল আর একখানা পাখা,—হাঁ আর পোষাক কামরার আলনায় শালটা আছে আমার, সেটাও আনিস, এদের পাগুলো বড় বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া আব্‌লু দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতাভাবে আমিনার মন তখন পরিপূর্ণ, কাজেই স্বামীর হাতখানি টানিয়া নিজের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে চাপিয়া ধরিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে, একটু অনুযোগের স্বরে বলিল "তুমি নিজে এসেছ বেশ করেছ, দাদাকে সুদ্ধ ডেকে আন্‌লে কেন বল দেখি ? দ্যাখো দেখি এখন দাদা কত রাগ কর্‌ছে—এর পর ইনেব বেচারীকে হয় তো আরও বকুনী দেবে—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আমি আবলুকে ডাকি নি, আমি তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। আবলু ওঁকে খোঁজবার জন্যে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ক্রমে আমার কাছে এসে হাজির! তা তোমরা জর্‌দা খেয়েছিলে, বেশ করেছিলে, ওপরে ছুটে এলে কেন ?"

আমিনা বলিল "হ্যাঁ! তারপর সেইখানে টাট্‌কা টাট্‌কা ধরা পরে তোমাদের কাছে আরো জব্দ হই আর কি! এতেই রক্ষা নাই!—দ্যাখো তুমি যেন আর রসান দিও না, তোমার পায়ে পড়্‌ছি, এবার থেকে যা বল্‌বে সব শুনব, দাদাকে থামাও—"

একটু হাসিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আচ্ছা থাম, ওকে মজা দেখাচ্ছি।"

সিঁড়িতে আব্‌লুর পদশব্দ পাইয়া, আমিনা স্বামীর হাতটি সরাইয়া দিল। আব্‌লু নিকটে আসিয়া জলে অ-ডি-কলোন ঢালিয়া দুজনের মাথায় দিলেন। আহমদ্-সাহেব পাখাটা তুলিয়া সজোরে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন "শালটা দুজনের পায়ে ঢাকা দিয়ে দে।"

আবলু-সাহেব তথাকরণে ব্যাপৃত হইতেই, আহমদ্-সাহেব হঠাৎ মহাব্যস্তভাবে বলিলেন "এর পা গরম হয়ে এসেছে, দ্যাখ্‌তো দ্যাখ্‌তো ওঁর পা কি এখনো তেম্‌নি ঠাণ্ডা আছে—"

ইনেব সসঙ্কোচে পা গুটাইতে যাইতেছিল, আবলু বিরক্তভাবে বলিলেন "আঃ থাম—না'—" তারপর পায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন "নাঃ এখনো বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে।"

আহমদ্-সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন "দে তো ভাই খুব জোরে রগ্‌ড়ে—এখনি গরম হয়ে যাবে।"

সরল চিত্ত আবলু-সাহেব দ্বিধাহীন চিত্তে চিকিৎসক মহাশয়ের সদুপদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। আহমদ্-সাহেব আড় চোখে আমিনার পানে চাহিয়া একটু ইঙ্গিতসূচক কটাক্ষ হানিয়া অতি নরম সুরে বলিলেন "আহা এই সময় এক টিপ নস্য হ'লে বড় সুবিধেই হোত! আচ্ছা আব্‌লু, তুই নীচে গিয়েছিলিই যখন, তখন আমার নস্যের কৌটা-টা ভুলে এলি কি বলে?"

আবলু-সাহেব সরল ভাবে উত্তর দিলেন "নস্যের কৌটার কথা তুই তো আমায় বলে দিস্ নি—"

বাধা দিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "বলে আবার দেব কি? একটু হিসেব করে কায করতে হয়! বি, এল পাশ্ কল্লেই কি হয় হেঁ!—"

একটু হাসিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন "তা বটে! কিন্তু তোমার নস্যের কৌটা-টাও যে ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে ধর্‌তে হবে, ইউনিভার্‌সিটি সে কথা আমায় শেখায় নি—।"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তা শেখাবে কেন! ইউনিভারসিটি তোমায় শুধু শিখিয়ে দিয়েছে যে তোমার—" বলিয়াই ইনেবের দিকে চাহিয়া দস্তুরমত অভিমানপূর্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন "বুঝ্‌লেন্ বিবিসাহেব, আবলুর প্রাণের যত কিছু ভক্তিভালবাসা সব আপনার ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ কর্‌তেই ইউনিভারসিটি বলে দিয়েছে! আর কারুর জন্যে কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখ্‌তে বলে নি—আমার এত ভালবাসার নস্যের কৌটার জন্যও—না!"
বিব্রত হইয়া আবলু-সাহেব বলিলেন দ্যাখ্ অহ্‌মু এবার ঠাশ্ করে এক চড় বসিয়ে দেব তোর গালে—"

সুনিপুণ অভিনেতার মত অতি করুণ কোমল কণ্ঠে, আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তা দেবে বৈ কি! তোমার এমনই কি-দিনই পড়েছে, বল! তুমি এখন একজন'!—সেবার সেরা সেবা—হজরৎ বিবি সাহেবের চরণ সেবার অধিকারী এখন তুমি! আহা!—"

আমিনা আর সামলাইতে পারিল না। বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত ইনেব ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া পা টানিয়া লইয়া ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আহা আপনি উঠবেন না, আপনি শুয়ে থাকুন, কেমন মাথাটা এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে তো!"

মাথার অবস্থা ভাল কি মন্দ, ইনেব নিজে সেটা তখন সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে যদিও অক্ষম, কিন্তু লজ্জার খাতিরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হাঁ ভাল।"

ইনেবকে উঠিতে দেখিয়া দায়ে পড়িয়া আমিনাও উঠিল। আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তোমরা এবার নীচে যেতে পারবে?"

আমিনা ও ইনেব দুইজনেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া স্বীকৃত হইল। আবলু ও আহমদ্-সাহেবের সাহায্যে উভয়ে ঘূর্ণ অবসন্ন দেহে কোনক্রমে নীচে নামিয়া আসিল।

. সে রাত্রির মত সেইখানেই সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। আবলু-সাহেবের তিরস্কারের পালাটা যদিও সেইখানেই শেষ হইল, কিন্তু আমিনা ও ইনেব লজ্জায় ও সঙ্কোচে আর্ টুঁ শব্দ উচ্চারণ করিল না।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

অক্ষম।

—ঃ*ঃ—

(ইংরাজী হইতে)

ছলছল চোখে কহিল ক্ষুদ্র তারা
　　মোর প্রতি কারো নাহি বুঝি হায় মমতা
ধরার আঁধার একটু হরিতে পারি
　　আমার বক্ষে নাহি যে তেমন ক্ষমতা।
রজনী কহিল "বাছা মোর" বুকে টানি
　　"চান্দ্র-জগতে তুই যে রে প্রাণ-অংশ
জানিস্ নে তুই তোর দাম কতখানি
　　তুই বিনা হবে সৌরজগৎ ধ্বংস।"

শরতের মেঘ দুর্ব্বল ম্রিয়মান
　　কহিল কাঁদিয়া কি হবে ব্যর্থ জীবনে,
কয়টি বিন্দু সলিলে আমার প্রাণ
　　নিঃসার হীন নিঃস্বে কি হবে ভুবনে ?
কহিল কানন "ব্যথ নহ ত ভাই
　　তুমি বিনা মোর সংসার হবে খিন্ন
শীতের শিশির বরিষার ধারা নাই
　　কলি-দলে আজ কে ফুটায় তোমা ভিন্ন ?"

ক্ষুদ্র শিশুটি ভাবে জননীর মত
সংসার-তরী-ক্ষেপণি পারিবে ধরিতে
বলে মার কোলে কাকুতি করিয়া কত
"আমি যে হায় মা পারি না কিছুই করিতে।"
চুমা দিয়া মাতা কহে তারে বুকে টানি'
"তুই বিনা হবে নিখিলের খেয়া বন্ধ
কেমনে জানিবি তোর দাম কতখানি
তুই বিনা হবে সংসারখানি অন্ধ।"

শ্রীকালিদাস রায়।

সাত্ত্বিক আহার।

গুরু। 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে, হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে।' বলিতে পার ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই না। ভারতবাসী আজ ধর্ম্মভ্রষ্ট। হীন অনুকরণের মোহে সে আজ নানাবিধ অখাদ্য খাইয়া দেহে ও মনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভ্রভেদী কীর্ত্তিপতাকা বহন করিবার শক্তি সে কোথা হইতে পাইবে? এখন বুঝিয়াছ—কেন অখাদ্য খাইতে নিষেধ করি।

শিষ্য। গুরুদেব, এ নিষেধ অনাবশ্যক। ইট, পাথর, টিন প্রভৃতিতে আমার কোনকালেই রুচি নাই। শুধু আমার কেন? কয়েকজন স্তন্যপায়ী শিশু এবং দু'একজন উন্মাদ ব্যতীত কাহারও ঐসকল দ্রব্যে আস্থা দেখি না। আমি বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠা, গুর্জ্জর, পাঞ্জাব সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, মানুষের যাহা খাদ্য মানুষ তাহাই খাইয়া থাকে।

গু। অখাদ্য বলিলে নিকৃষ্ট খাদ্যকেই বুঝিতে হইবে।

শি। নিকৃষ্ট খাদ্য বর্জ্জনীয় একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, এবং এই কারণে সাগু বা বার্লি ভ্রমেও স্পর্শ করি না।

গু। আমি সাগু, বর্লির কথা বলিতেছি না আমি—

শি। বুঝিয়াছি, আপনি চালকুমড়া, কাঁচাপেঁপে, থোড় ইত্যাদিকেই অখাদ্য বলিতে চান। তা, এগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে আমার কিছু মাত্র দ্বিধা নাই।

গু। তুমি কূটতর্ক করিতেছ। আমি চালকুমড়াকে অখাদ্য বলি নাই। তুমি জান, জগতের যাবতীয় পদার্থই খাদ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু যাবতায় পদার্থই খাদ্য নহে। কোন দ্রব্য খাদ্য কিনা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে শরীরের উপর তাহার ক্রিয়া কিরূপ। শাস্ত্রে আছে অন্নময় প্রাণ অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের প্রকৃতি অনুসারে

ভোক্তার আকৃতিপ্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভোজী কৃমি মেরুদণ্ডহীন, দুর্ব্বল, ও ধরণীর অতি মলিন পঙ্কসাগরে চিরনিমজ্জমান, আর নীর-দনীরপ্রয়াসী চাতক চটুল পতত্রচালনপটু, স্বচ্ছন্দচারী ও চিরনির্ম্মুক্ত নীল বিমানের বার্ত্তাবহ। জীবজগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরের মানবও যদি আজি হইতে ভূমিসংলগ্ন কীটপতঙ্গাদি লেহন করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক শতাব্দী পরে শরীর গঠনে এবং বলবুদ্ধিতে সে অতি কদর্য্য ভেকের অনুরূপ হইয়া পড়িবে। অতএব সদসদ্বিচারণা সুনিপুণ বুদ্ধির সাহায্যে তাহাকে এমন খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা তাহার একমাত্র সাধ্য অনন্ত উন্নতির অনুকূল।

শি। আপনি কিরূপ খাদ্যের বিষয় বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। Hydrogen বা coal gasএ উদর পূর্ত্তি করিলে উন্নতি হইতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

গু। তুমি জান মানুষের উন্নতির মূলে তাহার বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যত মার্জ্জিত তাহার উন্নতিও তত অগ্রসর হইবে। সকলেই জানেন দুর্ব্বল দেহে সবল মনের অস্তিত্ব অসম্ভব। উৎকট শিরঃপীড়া বা কর্ণশূল লইয়া স্থির বুদ্ধির কার্য্য করা দুঃসাধ্য ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। অতএব যে খাদ্যে শরীরে কোনপ্রকার গ্লানি না হয়, যাহা সহজপাচ্য, এবং যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, এক কথায় যা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন তাহাই প্রকৃষ্ট খাদ্য। সাংখ্যকার বলেন "সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্টমুপষ্টম্ভকং চঞ্চল রজঃ। গুরুবরণকামেবতমঃ—" ইহার অর্থঃ—সত্ত্ব লঘু এবং প্রকাশক। নিজে চঞ্চল এবং অন্যের চাঞ্চল্য বিধায়ক রজঃ। এবং গুরু ও বুদ্ধির আবরণক তমঃ। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বই বাঞ্ছিত।

শি। আপনি কি Sanatogen বা Panopeptenকেই মানবের একমাত্র খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন?

গু। তোমার মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে। গোমাংস সম্ভূত Ponopeptenকে তুমি খাদ্য বলিতে চাও! তোমার রসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না ইহাই আশ্চর্য্য! উপরোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আমিষ আহার মাত্রেই রাজসিক। কারণ জীব মাত্রেই চঞ্চল এবং আহার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভোক্তার শারীরিক ও মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়। সকলেই জানেন মাংসাশী গৃধ্র, ব্যাঘ্র শৃগাল, ভল্লুকাদি জীবগণ কত হিংস্র, চঞ্চল ও দুষ্প্রবৃত্ত। অপর দিকে নিরামিষাশী জীবমাত্রেই শান্তপ্রকৃতি ও নিরীহ, যথা শশক, মেষ ও গাভী—

শি। ও মহিষ, বরাহ, ঘোটক ও মর্কট।

গু। কথার উপর কথা কহিও না। পশু পক্ষ্যাদির মাংস রজোগুণাত্মক পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সকল মাংসে রজোগুণের মাত্রা সমান নহে। 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং'। ইহা হইতে বুঝা যায় রজোগুণ রক্তবর্ণ, তমঃ কৃষ্ণ ও সত্ত্ব শুক্লবর্ণ। অতএব যে মাংস যত অধিক রক্তবর্ণ তাহা তত অধিক পরিমাণে রজোদুষ্ট। এই কারণ, অতিরিক্ত 'শূকরগোমৃগমাংসে পুষ্ট' জাতিগণ অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, রক্তলিপ্সু ও অস্থিরচিত্ত হইয়া থাকে। এই সকল জাতি অকারণ-উত্তেজনায় কখনও মেরুপ্রদেশে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটে, আকাশে পাখা নাড়িতে চায়, জলে Submarine এবং স্থলে motor car চালায়, এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফালাফি করিয়া জীবনলীলা সমাপন করে, বা আপন আপন শিরশ্ছেদ করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবে মাতিয়া উঠে। ইউরোপীয় মহাসমরে একথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে উন্নতি বলিয়া ভ্রম করেন। কিন্তু এ উন্নতি ঐহিক, অবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত ও অবাস্তব। আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। এবং চাঞ্চল্য তাহার প্রত্যবায়। বহুবিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সমাহিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সাধনা রাজসিক জাতিগণের অজ্ঞাত। কাক কখন কিরূপ রব করে, এবং তাহার কোন স্বরের সহিত বিশ্বনিয়মের কোথায়

কতটুকু যোগ আছে, কাক 'ক্রৌঞ্চ' বলিলেই বা কাহার মাথায় টাক পড়িবে এবং 'কুরুতং' বলিলেই বা কাহার গোঁফ গজাইবে এই বিষয় বহুবর্ষ ব্যাপী এক নিষ্ঠ গবেষণা, চীন, জাপান, জার্ম্মাণ বা মার্কিণে প্রত্যাশা করিতে পার? কখনই না।

শি। গুরুদেব বুঝিতে পারিলাম চাঞ্চল্য নিবারণই জীবনের মহাব্রত এবং মানবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য আফিঙ্।

গু। তুমি শাস্ত্রবচন বিস্মৃত হইতেছ। পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় আফিঙ্ তমোগুণাত্মক, কারণ তাহা কৃষ্ণবর্ণ, বুদ্ধির আবরণক এবং গুরু,—দমে ভারি না হইলেও দামে ভারি। ইহা কখনও প্রকৃষ্ট খাদ্য হইতে পারে না। তবে রাজসিক অপেক্ষা তামসিক শ্রেয়ঃ। কারণ রজোগুণে অনিষ্ট, তমে ইষ্টও নাই অনিষ্টও নাই। কিন্তু রজস্তমোবর্জ্জিত সাত্ত্বিক আহারই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ইষ্ট। সত্ত্বগুণাত্মক খাদ্য শুক্লবর্ণ, সহজপাচ্য ও জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশক। যথা;—ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সন্দেশ ও সফেন আতপ তণ্ডুলের অন্ন।

শি। গুরুদেব, বহুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছি। ভবৎকথিত লঘু পথ্যের একটাও পরিপাক করিতে পারি বলিয়া বোধ হয় না। আমি প্রত্যহ প্রাতে দুইটী করিয়া মুরগীর ডিম খাইয়া থাকি। আশীর্ব্বাদ করুন ইহাতেই আপনার সত্ত্বগুণের বিকাশ হউক।

গু। তণ্ডুল অপেক্ষা ডিম্ব সুখপাচ্য ইহা তোমার মুখস্থ কথা। ডিম্বে কতটা উত্তেজনা হয় তাহার কিছু হিসাব রাখ?

শি। উত্তেজনা ত লক্ষ্য করি নাই। তবে ডিম্ব আস্বাদ করিলে উহা আস্বদের প্রবৃত্তি অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া যায় বটে।

গু। তবেই হইল। তোমার রসনার পরিতৃপ্তি হইবে বলিয়া প্রত্যহ দুইটী প্রাণী হত্যা করিতে চাও। এইরূপ নিয়মিত হিংসার চর্চ্চায় কি তোমার মানসিক উন্নতি হইবে?

"সচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্যাদগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।"

শি। শাকেরদ্বারা উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে সত্য। এই পূর্ত্তিই কি আহারের উদ্দেশ্য?

গু। শাকাদিরদ্বারা কি কেবল উদরের পূর্ত্তিই হইয়া থাকে? তুমি জান উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক এবং মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাতি মৎস্য মাংসাদি স্পর্শ করেন না বলিয়াই এত বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম।

শি। কাবুলীরাও বলিষ্ঠ এবং—

গু। কাবুলীরা শীত প্রধান দেশের লোক। উহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। শাকসবজিই মানবের স্বাভাবিক খাদ্য ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আধুনিক মত। তুমি ইহা বিশ্বাস কর কি না?

শি। অবশ্য বিশ্বাস করিব। তবে বাংলা দেশ ইউরোপ নহে, আমরাও পণ্ডিত নহি। তাই আমাদের প্রীতিভোজ মাত্রেই চপ্, কাটলেট, কোর্ম্মা, কারির এত প্রাচুর্য্য।

গু। অখাদ্য খাইয়া যাহাদের রুচিবিকার ঘটিয়াছে তাহারাই ঐ সকল গলাধঃকরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাঁহারা চিরকাল নিরামিষাশী মৎস্য বা মাংসের আস্বাদ ও তাঁহাদের ন্যক্কারজনক।

শি। এ কথা সত্য। পাশ্চমদেশীয় পাচকগণ মৎস্য স্পর্শ করেন না। কিন্তু শুনিয়াছি উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার মৎস্যের আস্বাদ পাইলে মৎস্য চুরি করিয়া খাইতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা বিকৃতরুচির পরিচয়

সন্দেহ নাই। আমার ত কখনও পুঁইশাক চুরি করিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ পুঁইশাকের স্বাদ আমার অবিদিত নহে।

গু। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। মাংসাহারে এই বলবতী প্রবৃত্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে উহা পরিহর্ত্তব্য।

শি। এইবার খাদ্যাখাদ্য বিচারের পথ সুগম হইল। বুঝিলাম বরফমিশ্রিত ঘোলের সরবৎ পান করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইলে লঙ্কা ও লবণ সহযোগে যবের ছাতু খাইতে হইবে।

গু। সাংসারিক জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব। এই জন্য শাস্ত্রে পশুবলির ব্যবস্থা; বলির পশু আহার করিতে পার।

শি। পদধূলি দিন, গুরুদেব। আপনি আমার মৃতবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। বলির পশু খাইতে পাইলেই চরিতার্থ হই। আর কিছু চাই না। পাঁটা, খাসি ছাড়া, অন্য মাংস কয় দিনই বা খাইতে পাই ?

গু। কিন্তু তোমরা বৃথামাংস খাও।

শি। মাংস পাইলেই মুখে পুরিয়া দিই গুরুদেব। কণামাত্রও বৃথা হইতে দিই না।

গু। তুমি আস্বাদ কর, আর না-কর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। স্বয়ং জগন্মাতা যাহাকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবেন শুধু তাহারই দেহ সার্থক, অন্য সবই বৃথা। অতএব ছাগল খাইতে ইচ্ছা হইলে তাহাকে দেবতার নিকট বলি দিতে হইবে। দেবোদ্দেশে ছিন্নমুণ্ড ছাগমাংস মহাপ্রসাদ।

শি। মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে মাংস ক্রয় করি, হিংসার ধার ধারি না। কিন্তু ছাগলকে বলির জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে আমাকেই। ইহাতে হিংসার চর্চ্চা হইবে না ?

গু। বলি দিয়া তুমি তাহার কল্যাণই কর, হিংসা কর না ?

শি। আপনি কি নিজের কল্যাণ কামনা করেন ?

গু। নরবলির প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তোমার এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে।

শি। বলি দিলে ছাগের কল্যাণ হয় বটে, কিন্তু আমার কল্যাণ হইল কৈ ? মাংস খাইতে ইচ্ছা হইলেই যদি কালীঘাট ছুটাছুটি করিতে হয়, তবে ত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কাজ নাই, গুরুদেব, আমি এখন হইতে কুমড়া আর কলাই ডালকে জীবনের সম্বল করিলাম। শুধু তরকারীতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়া খেদ মিটাইব। আর ত কোন উপায় দেখি না।

গু। পেঁয়াজ অত্যন্ত উগ্র, গরম ও অশাস্ত্রীয়। উহা স্পর্শ করিতে পার না। তবে কাঁচালঙ্কায় দোষ নাই। কারণ লঙ্কার খাদ্যপদার্থ বীজ শ্বেতবর্ণ ও সাত্ত্বিক।

শি। গুরো, পেঁয়াজ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইলে দাসের প্রাণসঙ্কট হইয়া উঠে। শুনিয়াছি ভারতের অর্দ্ধেক লোক কেবল এক বেলা মাত্র আধিভৌতিক আহার করিতে পায়। আমাকে দেখিতেছি দুই বেলা আধ্যাত্মিক আহার করিয়া শীঘ্রই ব্রহ্মে বিলীন হইতে হইবে।

গু। পিঁয়াজ ছাড়া আর কোনও নিরামিষ খাদ্য কি সংসারে নাই ?

শি। অনেক আছে। উডুম্বরপত্র, অশ্বত্থমূল, আরও কত কি আছে। কিন্তু সকলের রুচি সমান নহে।

গু। তোমার রুচি দেখিতেছি কেবল পশুমাংসে।

শি। কেবল পশু বলিবেন না, গুরুদেব। মীন, কূর্ম্ম, ভেক, কর্কট, পানকৌরী ইত্যাদি কিছুতেই আমার অরুচি নাই।

গু। তুমি এক কাজ কর। মনু বলিয়াছেন "মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদঃ।" অতএব তুমি অন্য সর্ব্ববিধ মাংসের পরিবর্ত্তে মৎস্য আহার কর কর। মৎস্য নির্দোষ।

শি। গুরুদেব, যদি এতদূর অনুগ্রহ করিলেন ত আর একটু করিতে কৃপণতা করিবেন না। মৎস্যে অনুমতি দিয়াছেন, মৎস্যের Equivalentএ ও দিন।

গু। তুমি চাও কি?

শি। আমি বলিতেছিলাম ইংরাজী হোটেলের Chicken, Pork ইত্যাদি বড় পছন্দ করি। যদি মৎস্যের পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে———

গু। এ কথা আমার কাছে বলিলে তাই রক্ষা। আর কোথাও বলিও না। বলিলে জাতিচ্যুত হইবে।

শি। কেন, গুরুদেব?

গু। কেন? নিষিদ্ধ মাংস খাইলে দেহ রুগ্ন হয়। শূকরের মাংসভোজিদিগের মধ্যে ফিতাকৃমির প্রকোপ কাহারও অবিদিত নহে। আর গোমাংস ভোজনের পরিণাম কুষ্ঠরোগ ইহা হয় ত প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

শি। একবার ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পারিলে হয় ত প্রত্যক্ষ করিতাম। কিন্তু ধর্ম্মলোপভয়ে সমুদ্র যাত্রা করি নাই। যাহা হউক, অখাদ্য খাইয়া যদি রুগ্ন হই, তাহা হইলে ধোপ ও নাপিতের অভাবে, মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে বা কণ্টকিত শ্মশ্রুর কণ্ডুয়নে অতিষ্ঠ হইলেই কি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব?

গু। স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে কি না সে চিন্তা সমাজের নহে। তুমি নিজকর্ম্মদোষে শরীরপাত করিতে উদ্যত হইলে সমাজ তোমাকে ত্যাগ করিবেন। তোমার উপর সমাজের এই দণ্ড।

শি। সুরাপান করিলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু সুরাপায়ী ত কখনও জাতিচ্যুত হয় না।

গু। সুরায় দোষ নাই "দ্রবদ্রব্যসাহচর্য্যাৎ।"

শি। রুগ্নের প্রতি সমাজের এত আক্রোশ কেন?

গু। আক্রোশ হইবারই কথা। রুগ্ন ব্যক্তি সমাজে বাস করিবার যোগ্য নহে। কারণ সামাজিক সদনুষ্ঠানে তাহার সামর্থ্য নাই।

শি। এ কথা সত্য। আপনি সে দিন মজুমদার গৃহে ছানা, দধি, ক্ষীর ও কাঁটাল অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিয়া তিন দিন শয্যাগত ছিলেন; কাজেই হালদার পুত্রের উপনয়নে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গু। হাঁ, সে দিন আহারটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল।

শি। আপনি কি জাতিচ্যুত হইয়াছেন?

গু। আমি জাতিচ্যুত হইব! আমি তিন সন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করি না। আমাকে তুমি জাতিচ্যুত করিতে চাও! তুমি! হতভাগা, নাস্তিক কৃশ্চান, গোখাদক,—

শি। গুরুদেব এতক্ষণে বুঝিলাম কোন্ খাদ্য সত্ত্বগুণাত্মক।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

———

বৃথাযাত্রা।

—:*:—

(১)

তোমারে ভুলিয়ে নাথ বাহির হইনু যবে,
তখনো জানি নি মনে এমনি বিফল হবে,
যাত্রা মোর প্রভাতের ;
মেঘভাঙ্গা আকাশের,
নীরব ভ্রুকুটী মোরে নীরবে কহিল যবে,—
"বৃথা যাত্রা পসারিণি"—ভাবি নি এমন হবে !

(২)

গিয়াছে কাটিয়া সেই প্রভাতের হেলাখেলা,
নাহি সে তরুণ রবি ; এখন বাড়িছে বেলা,
হেলিয়ে পড়েছে রবি,
মনে হয় বৃথা সবি,
কে কহে ডাকিয়া মোরে "পসারিণি ভাঙ্গ মেলা,"
গিয়াছে কাটিয়া সেই প্রভাতের হেলাখেলা !

(৩)

নদীতটে বাঁধা তরী, মাঝি ডাকে উভরায়,—
"কোথায় পারের যাত্রি ! শেষ খেয়া বহি' যায় !
বেচা কেনা হ'ল নাকি ?
ঐ শুন থাকি থাকি
সন্-সনি উঠে হাওয়া, নদীপারে যাওয়া দায়—
আঁধার আসিলে হবে ; শেষ খেয়া বহি যায় !"

(৪)

আমার ত বেচা কেনা কিছুই হ'ল না হায় !
কেমনে যাইব পারে ভাবি তাই নিরুপায় !
কোথায় পারের মাঝি !
এ ঘোর দুর্দ্দিনে আজি,
ল'বে কি করুণাভরে এই দীন অভাগায় ?
আমার ত বেচাকেনা কিছুই হ'ল না হায় !

(৫)

"একখানি ঠাঁই মোর এখনও রয়েছে বাকী,
কে তুমি পারের যাত্রী ডাকিতেছ থাকি থাকি ?
তোমারে লইতে হ'বে ;
আর কেহ পড়ি র'বে,
সায়াহ্নের নদীকূলে—থাক্ ক্ষতি নাহি তায়,
তোমার যে নাহি কিছু ! তোমারে কি ফেলা যায় ?"

শ্রীকেশবলাল বসু ।

ফুলের স্বপন ।

——(ঃ*ঃ)——

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। একদিকে যেমন পাতা ঝরার ধূম, আর একদিকে তেমনি নতুন কচি পাতায় নতুন পল্লবে কিশলয়ে সবুজের ছড়াছড়ি, কাঁচা জীবনের রসের ঢেউ, নতুন আনন্দ-উৎসবের জয়পতাকা। নতুন গাছে নতুন ফুলের বিকাশ, রংএর জারিজুরি, সৌন্দর্য্যের উৎস ! এমনি একটি ফাল্গুনের সন্ধ্যায় মলয় বাতাসের মাতামাতিতে ছোট একটি গোলাপ কুঁড়ি একটী গোলাপ গাছের পাতার আড়ালে দুলে দুলে সারা হচ্ছিল। পাপড়িগুলির কঠিন বাঁধন একটু শিথিল হয়েছে, ফুট্‌ব-ফুট্‌ব করছে তবু ফোটে নি, গন্ধ তখনও বাহিরে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে গোলাপ কুঁড়িটির স্ফুটনোন্মুখ অন্তরটিকে মসগুল করে রেখেছে, এমনি তার অবস্থা। আশেপাশে আর যারা ফুটেছে তাদের লজ্জার বাঁধন ঢিলে হয়েছে, অবগুণ্ঠনও কমে এসেছে, তারা আনন্দে হেসে এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করছে, কুঁড়িটি তাইতেই ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ছে, পাতার আড়ালে গিয়ে হাসি চেপে আবার উৎসুক হয়ে মাথা তুলে দেখ্‌ছে,—এই নব-যৌবনদীপ্ত জগৎখানাকে।

কোথা থেকে একটি মস্ত বড় কালো ভোম্‌রা উড়ে এসে তার কাছেই হাজির হ'ল। কুঁড়িটি ভাব্‌লে এত ফোটা ফুল থাকৃতে তার কাছে এ আব্দার কেন? বেচারার মনে বড় ভয়ও হল, সে ত দুর্ব্বল, কেমন করে আত্মরক্ষা করবে? কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, অত বড় কালো ভোম্‌রা কোন জোর জবরদস্তি করলে না, শুধু বড় করুণ সুরে আব্দার জানাতে লাগ্‌ল গুণ্ গুণ্ গুণ্! কি সে সাধা-সাধনা গুণ্ গুণ্ গুণ্। আশে পাশের ফুলগুলি এ রঙ্গ দেখ্‌বার জন্যে কেবলি চারিদিক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগ্‌ল। বেচারা ছোট গোলাপ কুঁড়ি যতই সরে যতই দুলে-দুলে বলে "না না" ভোম্‌রাটিও ছাড়ে না, বড় অভিমানভরা সুরে বারবার ভিক্ষা চায় গুণ্ গুণ্ গুণ্! কিন্তু ওদিকে সন্ধ্যারও ত বড় বেশী দেরী নেই, হাল্কা পাত্‌লা অন্ধকারের একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপর ধীরে ধীরে নেমে আস্‌ছে; সমস্ত দিনের আলোক পারাবার সন্তরণ ক'রে নক্ষত্রগুলি নিজেদের আঁচলঢাকা প্রদীপগুলিকে অতি সন্তর্পণে বাঁচিয়ে দু' একটি করে আকাশপ্রান্তে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে! তখনও গোলাপকুঁড়িটির ভয় ভাঙ্গে নি, সে আগের মতই বারেবারে অস্বীকার জানাচ্ছে। অগত্যা ভোম্‌রাটি বড় দুঃখে, বড় অভিমানে আর সাধাসাধনা না করে, এবার ভোঁ করে উড়ে গেল। বেচারা নিশ্চয়ই বুঝেছিল যেখানে অধিকার নেই সেখানে ভিক্ষা চাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই হ'তে পারে না। গোলাপকুঁড়িটি মনের ভিতরে কি এক রকম অব্যক্ত বেদনা নিয়ে সেই পাতার শ্যামল শয্যার উপর ঘুমে ঢলে পড়্‌ল।

সে দেখ্‌লে তার পুষ্পজন্মের অনেক বছর আগে সে যেন এই পৃথিবীরই মানুষ ছিল, ওদেরই মত হাস্‌তে কাঁদ্‌তে ভালবাস্‌তে জান্‌ত! এক বড়-মানুষের বাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মেয়ে,—মা বাপের আদরের দুলালী! রূপও তার তেমনি, যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সহস্র ধারায় ঝরে পড়্‌তে চাইত; ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য যেমন কিছুতেই পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, তেমনি রবির স্বর্ণোজ্জ্বল রশ্মি যেমন কিছুতেই মেঘে চাপা পড়ে না তেমনি। স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যে ভরপূর এই মেয়েটির মনে রূপের গর্ব্বেরও তেমনি অন্ত ছিল না, সে জান্‌ত সে রাজরাণী হবার উপযুক্ত, সে হাজারে একজন! এই রূপকে নানা উপায়ে ফুটিয়ে তোলার দিকেও তার কম দৃষ্টি ছিল না, সে তার কালো চিকণ কুন্তল কখন বা এলিয়ে, কখন বা শিথিলভাবে কবরীবদ্ধ করে কখন বা বেণীবন্ধন করে নানা ভঙ্গিতে দর্পণের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ত কিসে তাকে বেশী সুন্দর দেখায়। নিত্য নূতন রংএর কাপড় পরে', বর্ষায় নীলাম্বরী, শরতে আশমানি, বসন্তে কনকচাঁপার মত বাসন্তি রংএর কাপড়, আবার কখন বা ফিরোজা, কখন বা গোলাপী, তবু তার মন উঠ্‌ত না, যে রং তার এমন সোণার অঙ্গে মানায় সে রং বুঝি এখনও সৃষ্টি হয় নি! মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারেরও নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন হ'ত। মাতার স্নেহান্ধ চোখে এগুলি কোন দিন দোষাবহ বোধ হয় নি, বরং মনে মনে এই কথাই ভেবেছেন,—আহা, সে যদি এ সব ভোগ না করবে তবে করবে কে? বড় দুঃখের মেয়ে যে তাঁর! পিতার এ সকল দিকে দৃষ্টিই ছিল না, কেমন করে তিনি সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করবেন, কেমন করে সে চিরসুখিনী হবে! বয়সও তার কিছু বেশী হয়েছিল, পিতামাতার স্নেহাকুল মন তার বিবাহের কথা ভাব্‌লেই বিচ্ছেদ-কাতর হয়ে উঠ্‌ত তাই সে কথা এত দিন ঠেলে রেখেছেন কিন্তু আর যে চলে না, মেয়ের বয়সও যে হ'ল! এদিকে পিতামাতার মনের মত পাত্রও যে মেলে না।

তারপর সে একদিন দ্বারের আড়াল দিয়ে পিতামাতার কথা শুনতে পেলে,—"সব ত ভাল, কিন্তু অমন সুন্দর মেয়ে আমার গোলাপী তার শেষে অমন কালো বর"—

"তোমরা মেয়ে মানুষরা কেবল রূপ দেখ, কি সৎ বংশের ছেলে চারু, কি সচ্চরিত্র, পরোপকারী, ধর্ম্মবিশ্বাসী, যেমন ওর বাপ ছিল ঠিক্ তেমনি ; রূপ নাই হ'ল—"

"গোলাপীর কি মনে ধরবে সেই কথাই আমি—"

"মেয়ের আবার মনে ধরাধরি কি ? অমন জামাই আর পাবে কোথায় ? তোমার বাবা মা কি দেখে আমায় মেয়ে দিয়েছিলেন বল ত ?"

মা হেসে মুখ নত করলেন, বাবা নিশ্চিন্তের সুরে বল্লেন,—"মেয়ে আমাদের চিরসুখী হবে সে ভাবনা করো না।"

"তা হলেই হ'ল ; আর অমি কিছুই চাই নে।"

মা হাসিমুখে উঠে গেলেন।

গোলাপীর চারুর সঙ্গেই বিয়ে হ'ল ; কিন্তু সে রাত্রে সে যখন স্বামীর মুখ দেখ্লে তখন তার কেবলি ইচ্ছা হ'ল সে চীৎকার করে কাঁদে, কিম্বা আত্মহত্যা করে! হয়ে উঠ্ল না কোনটাই, হ'বার মাঝে হ'ল শুধু সে চারুর কাছে ঘেঁস্লে না, আর ভোর থাক্‌তে উঠে পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল!

এদিকে চারু গোলাপীকে নিয়ে নিজের বাড়ী গেল। তাদের নিজেদের বাড়ী ; বিষয়-সম্পত্তিও মন্দ নয়, টাকা-কড়ির কোন অভাব নেই, তাই চারু বেশী করে পরের উপকার করার অবকাশ পায়! গোলাপীই বাড়ীর কর্ত্রী, তার ইচ্ছাই সেখানে সর্ব্বময়ী, চাকর দাসী সকলেই তার আজ্ঞা পালনে উৎসুক, গোলাপীর কিন্তু তাতে মন ওঠে না। পিতামাতার উপর অভিমান ক্রমে রাগে পরিণত হ'ল, কি তার এতখানি রূপ সে কি এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে ? এই কি তাঁদের সৎপাত্র ? এমন কালো স্বামী যে তাঁর মুখে চাইলে দিনের আলোও অন্ধকার হয়ে আসে। সে নিজের দেহের দিকে চায় আর ক্ষোভে তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এমন অতুল্য রূপ সেকি এমন স্বামীর হাতে পড়ে অনাদরে শুখিয়ে ঝরে যাবার জন্য ? এ দেখ্‌বে কে, এর মূল্য বুঝ্‌বে কে, মূল্য দেবে কে ? স্বামীর ত সেদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি যে কি ভাবেন, কি ভেবে দিন কাটান, তা গোলাপী বুঝ্‌তেও পারে না. বুঝ্‌তে চেষ্টা করতেও তার প্রবৃত্তি হয় না। এমন যে বসন্তকালের সন্ধ্যা, তার স্বামী কোথায় এসে বল্‌বেন "প্রিয়ে তোমার রূপ সাগরে আমি ডুবে আছি, তোমার পদতলের রক্তিম ছায়ায় আমি মৃত্যু কামনা করি!" তা নয় কোথায় কার বাড়ী রোগীর পথ্য জোটে নি, কোথায় কার বাপের শ্রাদ্ধের সংস্থান নেই, কোথায় কার বাড়ী মরা ওঠে নি, সেইখানে তার স্বামী! গোলাপীর আপাদমস্তক জ্বলে যায়—এ সব কি সহ্য হয় ? সে নিজের রূপের মাদকতায় মত্ত হ'য়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়, কেমন করে সে একে প্রকাশ করবে, কেমন করে জগৎকে দেখাবে তার সেই সৌন্দর্য্য—যা বুঝি কেবল মনেই কল্পনা করা যায়।

বাড়ীর অতিথি-অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করা গোলাপীর কাজ, তাই একদিন স্বামী এসে যখন বল্লেন "গোলাপী চল আমার ছোটবেলার বন্ধু রমণীমোহনের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দিই" সেদিন গোলাপী বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হ'ল না। এমন ত প্রায়ই ঘটে।

অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবা, কালাপেড়ে মিহি ধুতি পরা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় কোঁকড়া কালো চুল! রমণীমোহন অবাক হয়ে দেখ্‌লে একি রূপ, তার চোখের পাতাও বুঝি পড়ে না! গোলাপী বারেবারে আরক্ত হয়ে ভাব্‌লে,—এই বুঝি সেই, যাকে সে এতদিন ধরে চেয়ে এসেছে, সে তার রূপ দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে! গোলাপীর মন এক মুহূর্ত্তে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল!

এমনি করে আলাপ যতই গাঢ় হ'তে লাগ্‌ল তার রূপের সাধনাও বেড়ে চল্‌ল। সে মনকে বারে বারে বোঝালে এ ত কিছু অন্যায় নয়, সে সুন্দর তাই সে সৌন্দর্য্য দেখাচ্ছে, এ যে তার বিধিদত্ত বর, কিন্তু তার ও রমণীমোহনের মনের মাঝে কোথায় যে মোহ বসে লুকিয়ে পাপের জাল বিস্তার করছিল তা সে বুঝ্‌তেও পার্‌লে না।

চারুর উদার মন আকাশের মত; সেখানে মেঘ বড় একটা দেখা যায় না।

স্বামীর ভাবে একটু সন্দেহ প্রকাশ হ'ত না, তিনি তেমনি হাসি-খুসি সদা-প্রফুল্ল! সন্ধ্যার সময়ে প্রায়ই বাড়ী থাকেন না, যত রাজ্যের অভাব-বেদনা দূর করার ভার বিধাতা বুঝি একা তাঁর উপরেই দিয়েছেন। রমণীমোহনও এই সময়টিতে আসেন, কাজেই তাঁর আতিথ্যের সেবার ভার পড়ে একা গোলাপীর উপর, ত্রুটীও হয় না কিছুই।

এমনি করে ঘটনা যখন অনেক দূর গড়িয়েছে তখন গোলাপী শুন্‌লে তার স্বামীর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। স্বামী সেজন্য এতটুকুও ক্ষুণ্ণ নন্‌, তিনি বলেন "মর্‌ব ত সবাই একদিন, এ বরং ভালই হ'ল প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বার ফুরসৎ পাওয়া গেল!"

শরীর ক্রমেই যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছে এ কথা তিনিও যেমন হেসে উড়িয়ে দিতেন, গোলাপীও দিত। মুখে হাসি আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও চারুর বুকের ব্যথাটা হঠাৎ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ত কেন যে তা চারু বুঝেও বুঝ্‌তে চাইত না।

নিবিড় বর্ষা! জলের আর বিশ্রাম নেই, কেবলি ভেকের ডাক আর ক্ষণে ক্ষণে মেঘগর্জ্জন বৃষ্টি পতনের অবিরাম গানের তাল রাখ্‌ছে! স্বামী সেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ী ফিরে এসে শয্যায় আশ্রয় নিলেন, এদিকে রমণীমোহনের আজ গোলাপীর অনুরোধে বিশেষ নিমন্ত্রণ!

স্বামীকে অসময়ে বাড়ী ফির্‌তে দেখে পর্য্যন্ত গোলাপীর মন কিছু বিরূপ হ'য়েছিল, আরো হ'ল যখন তিনি ডাক্‌লেন "গোলাপ, একটু কাছে এস, বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও ত!" রমণীমোহন এ দিকে অনেকক্ষণ হ'ল বাইরের আফিস ঘরে বসে আছে, গোলাপী যথাপক্ষে বিরক্তি দমন ক'রে বল্‌লে "এখন ত বস্‌তে পার্‌ছি নে, ঠাকুর হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছে; সংসারের কাজগুলো সেরে ফেলি" বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার একবার চারুর বুকের ব্যথাটা বড় প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, নিঃশ্বাসের কষ্টে শ্বাস বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল, তার পরেই সে ভাবটাকে কাটিয়ে তিনি উঠে বস্‌লেন। এদিকে কি কাজে তিনি আফিস ঘরে গিয়ে দেখেন রমণীমোহন ও গোলাপী গল্প-গুজবে মেতে আছে। স্বামীকে দেখে গোলাপীর মাথার ভিতরে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ কর্‌তে লাগ্‌ল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে স্বামী বল্‌লেন, "তুমি কখন এলে ভাই? তোমরা এখানে গল্প করছ আমি এদিকে গোলাপীকে খুঁজে সারা বাড়ী তোলপাড় করছি" বলে তাঁর সরল উচ্চ হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দিলেন। মাঝে যে একটা বাষ্প জমে আস্‌ছিল সেটা এই হাসির উত্তাপে কোথায় উড়ে গেল।

মুখে না বল্‌লেও স্বামী জান্‌ছিলেন তাঁর মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাই বিষয়-সম্পত্তির উইলও তৈরী হয়েছিল, গুজব উঠেছিল তিনি গোলাপীকে এক চতুর্থাংশ দিয়ে বাকি সব দুঃখী আতুর জনের মঙ্গলার্থে দিয়ে গেলেন।

সে আর এক রাত্রি; নিমন্ত্রণ রক্ষার পর রমণীমোহনের আর বাড়ী যাওয়া হ'ল না, বৈঠকখানাতেই শয্যার ব্যবস্থা হ'ল। স্বামীর অসুখের সেদিন বড়ই বাড়াবাড়ি। গোলাপী অনেক রাতে যখন শুতে এল স্বামী তখন

গভীর নিদ্রাভিভূত। গোলাপী আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে শুয়ে কি এক অব্যক্ত বেদনার অস্বস্তিতে কেবলি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল। স্বামী তার এত কাছে তবু কত দূর? সে আর কি কখন তাঁর নাগাল পাবে? তারপর হঠাৎ কখন তার হাতখানি স্বামীর হাতে ঠেকে গেল,—একি, এ যে ঠাণ্ডা হিমের মত; পাষাণের মত শক্ত আড়ষ্ট! গোলাপী নানা রকমে স্বামীকে নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌লে দেহে ত কোন সাড় নেই; তবে কি স্বামী মৃত? আতঙ্কে শিউরে উঠে রমণীমোহনকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে স্বামীর টাকার বাক্স ভাঙ্গা, রমণীমোহনেরও কোন চিহ্ন নেই! তবে কি—? এক মুহূর্ত্তের মাঝে গোলাপীর মন যেন সব বুঝে নিলে,—তার স্বামীর মৃত্যু, তাঁর রোগের কারণ, রমণীমোহনের অন্তর্দ্ধান; এক মুহূর্ত্তের মাঝে গোলাপীর মন যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল! সে যেন কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

* * * *

তার পর আর কোন চেতনা নেই যেন; যখন চেতনা ফিরে এল গোলাপী দেখ্‌লে কেবল লাল লাল, কেবলি লাল! জবা ফুলের মত লাল, রক্তের মত লাল—আর কিছুই নেই! তার স্বামীর চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে—হুহু ক'রে লোল জিহ্বা লক্‌-লক্‌ করছে, আর তারই মাঝে তার কালো স্বামীর প্রশান্ত কালো স্মিত মুখখানি! বড়ই সুন্দর—বড়ই সুন্দর! কিন্তু এ কি চিতার আগুন, এ আগুন যে ধীরে ধীরে গোলাপীর অন্তরের ভিতরেও প্রবেশ করছে, সেখানেও আর কোন রং নেই কেবলি লাল! আবার দেখ্‌লে তার অশ্রুরও ত শেষ নেই চোখে, অশ্রুসাগরে সব ভিজিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু সেই আগুনের এমন প্রতাপ, এমন বীর্য্য, এমন তেজ যে তার উত্তাপে অত অশ্রুও শুখিয়ে কাট হয়ে গেল! একি হ'ল—এ যে অন্তর পুড়ে গেল, জ্বলে গেল, ছাই হয়ে গেল,—এমন সময়ে গোলাপ-কুঁড়িটির ঘুম ভাঙ্গ্‌ল। সে দেখ্‌লে স্বপন ত মিথ্যা কিন্তু চিতার আগুন ত মিথ্যা নয়, ও যে ঐ পুব আকাশেও ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি লাল টক্‌টকে জ্বলছে! এ আগুন যে তার মনেও রক্তিমা ছড়িয়ে দিয়েছে তাও ত মিথ্যা নয়, তারও যে আগাগোড়া লাল হয়ে ফুটে ফেটে পড়্‌ছে; আর শিশিরাশ্রু যে তার বেদনারক্তিম মনখানিকে ভিজিয়ে দিয়েছে সে কথাও ত মিথ্যা নয়, তবে কাল সন্ধ্যা বেলার সেই কালো ভোম্‌রা যে আজ হাজার আহ্বানেও ফিরে আস্‌বে না এ কথাও কি সত্যি? যতই সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল ততই যেন চিতার আগুনের দাহ বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তার অশ্রুকে শুখিয়ে তার হৃদয়ের লাল রক্তকে শুষে নিতে লাগ্‌ল!

সাম্য *

—*—

দাঁড়া তাদের হাতটি ধরে—
  ধূলিমেখে সর্ব্ব অঙ্গে
  দাঁড়িয়ে যারা পথের পরে!
ক'স্‌নে ভুলে তাদের কথা,
বুঝিস্‌নেক কোথায় ব্যথা,

* কলিকাতা ব্রহ্মবাদী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে রচিত। রামপ্রসাদী সুর।

নিঃস্ব যারা বিশ্ব মাঝে
　　কাঁদে না প্রাণ তাদের তরে !
গভীর অন্ধকারে নীচে
পড়ে তারা থাক্‌বে পিছে
বুকে করে তুলে নেবার
　　নেই কি কেহ যতন করে !
ভেদাভেদ সব যাবে ভুলে,
দেখ্‌বে বারেক নয়ন তুলে,
প্রাণের মাঝে সবই সমান
　　ছোট বড় পরস্পরে !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-সমস্যা।

[বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে, পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ নেতা স্বদেশবৎসল শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহোদয়ের "The Problem of National Education in India." নামক একটি সুযৌক্তিক, সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও উদ্দীপনা সম্ভবে না,—বিশেষতঃ অক্ষমের হস্তে! মূল প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণকে মহাপ্রাণ লাজপতের চিন্তা প্রণালীর সহিত পরিচিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।]

ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি-পরিকল্পনায় যাঁহারা নিয়োজিত, তাঁহাদের দৃষ্টি, কতিপয় মূলতত্ত্ব ও অবস্থা বিশেষে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। আমি তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত করিব। শিক্ষাই জাতীয়-জীবনের প্রাণ,—ভিত্তি,—আদিকথা, উহাকে আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কি ব্যক্তিগত জীবনের, কি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, উভয়েরই প্রাণমূলে শিক্ষা,—মৌলিক বস্তু! বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রত্যেক জীবনই সমাজের; শিক্ষাও তাহাই,—ব্যক্তিপরম্পরায় উহার অভিব্যক্তি ও বিস্তৃতি। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক যে ভাবেই লওয়া হ'ক না কেন, উহার ধরণধারণ, রীতিনীতি, চরমলক্ষ্য ওই সমাজ-তন্ত্রে,—সামাজিক অনুষ্ঠের প্রধান প্রধান ক্রিয়াকলাপের উহা অন্যতম। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর মুখাপেক্ষী, একে ছাড়িয়া অন্যের গত্যন্তর নাই, উভয়ের শুভাশুভ এমনি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত।

শিক্ষা চরম সাফল্যের সোপান; সেই সাফল্যই জীবন,—উন্নতির অবাধ অনন্ত প্রবাহ! স্রোত যেমন অবিভাজ্য, জীবনও তদ্রূপ,—উহার অবিরাম উন্নতি প্রবাহের বিভাগ অসম্ভব। ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যার্থে পণ্ডিতগণ জীবনকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করিলেও উহার মূলসূত্র বিভাগের অতীত,—এক। জীবন,—গতিশীল জীবন—সর্ব্ব দৈবীশক্তির সমবায়, লক্ষ্য তাহার অদ্বৈত,—ক্রমোন্নতির চরম সীমায়।

জীবন পরিবর্ত্তনশীল, সত্য; কিন্তু কেবলি পরিবর্ত্তনশীল নহে,—পরিবর্দ্ধনশীল,—পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে। মনুষ্যের প্রাণ অচল স্থাণুবৎ নহে,—শক্তির আধার। প্রাণ-শক্তির বিকাশ অনেক ক্ষেত্রে অতি ধীর হইলেও, উহার গতি যে নিত্য তাহা ধ্রুবসত্য! কর্ম্মের ধর্ম্ম নিয়ত হৃদয়ে-হৃদয়ে কার্য্য করিয়া পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে; ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনে, পরিবর্দ্ধনে সমাজ-শক্তির বিবৃদ্ধি; ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, সমাজের উন্নতিও তেমনি ব্যক্তির। আত্ম ও পরকে একসূত্রে আবদ্ধকারী বহুবিধ কার্য্য, ও ভাবাদির সমন্বয়ে সমাজ-দেহ; সে সকল গুণাবলীর আভ্যন্তরিক উন্নতিতেই সমাজের শক্তি,—স্বাস্থ্যোন্নতি। দেহের অন্তযন্ত্র যেগুলি তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করিয়া শরীর যেমন স্বাস্থ্যলাভ করিতে অসমর্থ,—সমাজ-দেহেরও তেমনি, যাহা প্রধান প্রধান অংশ,—ধর্ম্মকর্ম্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক-উন্নতিমূলাত্মক বৃত্তি যেগুলি তাহার,—বিকাশ ও উন্নতির ব্যবস্থা না হইলে সামাজিক উন্নতির আশা আকাশকুসুমতুল্য! এক কথায়, মনই সর্ব্ববিষয়ের মূলে; মনই আশা, উৎসাহের, জ্ঞানের, মাতৃভূমি, মনের ক্রোড়েই, তাহার স্বাস্থ্যকর স্তন্যেই—উহারা ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় করিয়া আত্ম-বিকাশে সমর্থ হয়, সুতরাং পারিপার্শ্বিক-জগতের প্রভাব মানুষের উপর অদম্য, তাহার পাশমুক্ত হওয়া অসম্ভব—একথার কোন সত্যতা নাই; বরং পারিপার্শ্বিক-জগতের বন্ধন, সুনিয়ন্ত্রিত আত্মশক্তিতে যে যতখানি ছিন্ন করিতে সমর্থ সে ততখানি স্বাধীন। স্বাধীনতাই পরিণতির তৌল-যন্ত্র; সবল অন্তঃকরণের পরিচায়ক। স্বাধীনতা বলিতে সেই মানসিক পরিবর্ত্তন, যাহার বলে মানুষ স্বভাবের প্রভাবকে অপ্রতিহতভাবে গ্রহণ না করিয়া বা সমাজের সমষ্টির প্রভাবে আত্মবলি না দিয়া, আত্ম-আদর্শকে সমাজের অনুকূল গঠনে গড়িয়া তুলিতে পারে, ও তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। স্বাধীনতা সর্ব্ব-সুখাধার, স্বাধীনতা ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বাধীনতা অর্থে বাহ্যিক,—শারীরিক-দাসত্ব-বিযুক্ত—অবস্থা নহে,—প্রবৃত্তির পাশমুক্তি, সংস্কারে অনসুরক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। সমস্ত আবিলা, মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যে যতখানি আপনার প্রভুত্ব আপনাতে লাভ করিতে পারিয়াছে, সে সেই পরিমাণে স্বাধীন;—আত্মজ্ঞানের অনুপাতে স্বাধীনতার অনুপাত, অথচ সে কোনক্রমেই সমাজ ছাড়া নয়। তাহার ব্যক্তিত্বে যে সত্য প্রকটিত, সমাজের ব্যক্তিটিতেও তাহা নিহিত,—জাতীয়ত্বে তাহা পরিস্ফুট! জাতির ছোট বড়তে, তার কম বেশী লোকসংখ্যায়, জাতীয় উন্নতিঅবনতি সূচিত হয় না—সুস্থ সবল কর্ম্মঠ ও একতাগুণযুক্ত অধিবাসী যে জাতিতে যত অধিক সে জাতি তত উন্নত। একতা বলিতে সমষ্টির বাহ্যিক একীকরণ বা একপর্য্যায়ে আনয়ন নহে,—প্রাণে-প্রাণে একই মূলশক্তি ক্রিয়া করিলে প্রতি হৃদয়ে যে অনুভূতি ও উদ্দেশ্য এক হইয়া যায়,—একই লক্ষ্য সকলের,—তাহার সাফল্য বিধানের জন্য সকলের সমবেত চেষ্টা, সাহায্য সহানুভূতি,—একেরও দশের একই কার্য্য,—ব্যক্তির ও সমাজের, সমাজের ও জাতির কার্য্য-কারণ, ধ্যান-ধারণা একই লক্ষ্যে,—সেই না একতা,—জাতীয়-জীবনের সাড়া—হৃদয়স্পন্দন! জীবনের এই স্পন্দনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই শিক্ষার আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তাহাই; শিক্ষার বিমল আলোকে যেন প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মবুদ্ধির উন্মেষ হয়—তাহাকে সমস্ত সংস্কার হইতে বিমুক্ত, বিযুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করে—যেন সর্ব্বসন্দেহমুক্ত সে অনায়াসে দ্বিধাহীনভাবে বলিতে পারে, বুঝিতে

পারে. সে নিজেই তাহার ভাগ্য-বিধাতা,—তাহার শুভাশুভ তাহার আত্মশক্তিতে,—ভাগ্যদেবতা বলিয়া আর কেহ কোথা নাই ; পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল মিথ্যা—তাহার আত্মশক্তি মানসিক বল সর্ব্বশক্তি হইতে প্রবল ; তাহার উন্নতিতে. উন্মেষে, সমাজের উন্নতি ! সে সমাজে যুক্ত হইয়াও আপনার হৃদয়-শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে আপনাতে স্বাধীন,—আবার স্বাধীন হইয়াও আত্মকৃত কর্ম্মের ফলাফলের জন্য সমাজের নিকট দায়ী, তাহার কর্ত্তব্য অতি গুরু, কিন্তু সাধ্যাতীত কিছুতেই নহে। তাহাতে আত্মপরের অপূর্ব্ব মিলন—স্বার্থে পরার্থের অপূর্ব্ব সম্মিলন—কি অপার্থিব আনন্দ ! শক্তির—মানবিকতার কি বিমল বিকাশ ! ভারতবাসী আপনার মধ্যে এত বড় শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেও আজ ভীত, সে সর্ব্বদা নিজকে আত্মশক্তি বিবর্জ্জিত পরমুখাপেক্ষী ভাবিয়া ভাবিয়া এমন স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে প্রতিপদে সে বিশ্বাস করিতে চায়, সে নিজে কিছুই নহে, পরের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্ম সম্পাদনে অক্ষম, দৈবই তাহার প্রত্যেক কার্য্যনিয়ন্তা ! আত্ম-জ্ঞানহীন জীবনই কি সর্ব্বদুঃখ ও সর্ব্বনাশের হেতু নয় ?—আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্রই কি হওয়া উচিত নহে—যাহাতে প্রতি প্রাণ অনুভব করিতে পারে, কর্ম্ম ও কিস্‌মৎ অদম্য বা অজেয় নহে, মানুষ ইচ্ছা করিলে আত্মশক্তি প্রভাবে, অবিরত চেষ্টায় আত্মকে উন্নতি-শিখরে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ, সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণ পারগ। হিন্দুধর্ম্ম কুত্রাপি দৈবের বশবর্ত্তী হইতে উপদেশ দেয় নাই ; বরং উহার কর্ম্মবাদ দৈবের দুর্ব্বলতাই জ্ঞাপন করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্রও তাহাই হওয়া উচিত ; অতি জোরের সহিত প্রচার করিতে হইবে,—মানুষ আত্মশক্তি প্রভাবে জীবনের স্রোত, চিন্তা, কর্ম্ম, সামাজিক-অবস্থা সমস্তই উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। কর্ম্ম মর্ম্মের উপরে কিছুতেই নহে। মহম্মদীয় ধর্ম্মও কখনও দৈবের কিস্‌মতে আস্থা স্থাপন করিতে বলেন নাই ; তথাপি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, ভারতের ঝোঁকই ঐ দৈব বিশ্বাসে !

শিক্ষা দ্বারা এই জড়ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে ! হইতে পারে ভারতের মাটির ধর্ম্মই ঐ দৈবের দিকে, কিন্তু মাটির গুণ বা আবহাওয়ার তেজ অনতিক্রম্য নহে, মনের বলের নিকট বাহ্যিকশক্তি তুচ্ছ, তাহার বলেই সকল বাহ্যিক-বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। ভৌগোলিকসংস্থান বা পূর্ব্বপুরুষের রক্তই মানুষের স্বভাবের নিয়ন্তা—তাহার সামাজিক স্বভাব গঠনের আদিকারণ—এই প্রাচীন মতবাদের অসত্যতা সুপ্রমাণিত হইয়াছে ; ভারতবাসীকে তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইতে হইবে ; পারিপার্শ্বিক-জগতের আবহাওয়ার প্রভাব ব্যক্তির মনের ও সমাজের উপর কার্য্য করে সত্য কিন্তু ঐকান্তিক অধ্যবসায় উন্নতির পথের সকল কণ্টক দূর করিতে সমর্থ, মনুষ্যের চর্ম্মের বর্ণ মনের উন্নতির পরিমাপক নহে, মানসিক শুভ্রতাই সর্ব্ব বর্ণের উপরে—তাহা আর সভ্য জগতে বর্ত্তমান যুগে প্রমাণিত হইতে বাকি আছে কি ?

সত্য বলিতে গেলে, ভারতীয় মন কয়েক শতাব্দী হইতে প্রবাহহীন, নিশ্চল—কেহ কম, কেহ বা বেশী ; শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার কড়াকাড়, পুরোহিতের পক্ষপাত ব্যবস্থা, শিক্ষার সঙ্কট, জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগাভাব, দেশে অবিরত অশান্তি, জাতি ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব, সন্ন্যাস ও সংসার একাকার করিয়া সংসারের অনিত্যতা, অসারত্ব অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বড় বড় কথায় প্রকৃত শাস্ত্রবাক্যরূপে জোর গলায় প্রচারিত হওয়ায় লোক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জাতীয় জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, অমন জলদগম্ভীর স্বরে যে ভ্রান্তি থাকিতে পারে তাহা ধারণায় আনিতে না পারিয়া কেবল তাহারা ভীত চকিত হইয়া পশ্চাৎ পদে ভর করিয়াছে ; জাতীয় উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় নাই একটুকু—হটিয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকখানি ; জীবনকে গতিশূন্য করিয়াছে গতি দিতে পারে নাই। সময়

সময় সেই নির্ব্বাণমুখ, জীবনবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই,—তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাও তিরোহিত হইয়াছে কারণ তাঁহাদের উপদেশ আদর্শ কাহারও বা প্রেমে, কাহারও বা ক্রিয়াকাণ্ডে, কাহারও বা শাস্ত্রীয় মতবাদে প্রতিষ্ঠিত, সাধারণ শিক্ষার উপর একটিও সংস্থাপিত নহে; সুতরাং সূর্য্যের অন্তর্ধ্যানই ঘোর অন্ধকার; বিগত সহস্র বৎসরে ভারত লাভ করিতে পারিয়াছে অতি অল্পই, হারাইয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী; হারায়াছি বলিতেই স্মরণে আসে ভারতের অতীত কথা—কি ছিল কি গিয়াছে। ভারতের অতীত চিত্র সম্বন্ধেও দুই দলের দুই মত—একটি অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত! একদল বলেন "ভারত আবার সভ্য কবে, চিরকাল এ দেশে অসভ্যের (barbaras) বাস। গতিহীন অনুন্নত জীবনের উদাহরণস্থল ভারতবাসী! কি মনস্তত্ত্বে, চিন্তারাজ্যে, কি আবিষ্কার ক্রিয়ায় কি কর্ম্মজীবনে ভারত কবে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? ভারতীয় মানবসঙ্ঘ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত,—স্থাণু!" এই সে দিনেই একজন নিছক সমালোচক ছাপার হরপে প্রচার করিয়াছে ভারতবাসীর জাতীয়তার-আত্মপ্রসাদ—"আমরা একজন হইয়াছি ভাব"—বৃথা, ("There never was a Civilization in India.") সে গর্ব্ব করিবার মূলে কিছুই নাই। ব্রিটিশ শাসনের আদি অবস্থাতেও বিলাতী সমালোচক জেম্‌স্ মিল ও পাদ্রি ফাদারগণ পুনঃ পুনঃ ভারতের ইতিকথা ঐ বর্ণেই চিত্রিত করিয়া অসীম আত্মপ্রসাদ ও বস্তুর সহিত পরিচয় না লইয়াই পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কালে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল,—পাশ্চাত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারে। ইউরোপীয় জগত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ (অধিকাংশই তাহার ভ্রমপ্রমাদযুক্ত হইলেও তাহাই) পাঠ করিয়া প্রাচীন সভ্যতায় ভারতের স্থান,—জ্ঞান গরীমায় ভারত কত উন্নত হইয়াছিল তাহা মানিয়া লইল। ভারতবাসী এক প্রাতে জাগ্রত হইয়াই দেখিল (তৎপূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীও ভারতের অতীত গৌরবে ইউরোপীয়ের ন্যায় আস্থাহীন ছিল)—তাহারা আর অসভ্যের সন্তান নহে, মস্তিষ্কের উর্ব্বরতায়, চিন্তাশক্তির প্রখরতায়, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এত উন্নত ছিলেন যে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিদ্যাবত্তায় স্তম্ভিত হইয়াছেন; এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বক্ষ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল,—আমরা আমাদের একটা কদর যেন খুঁজিয়া পাইলাম—অতীত গৌরবে স্ফূর্ত্তিমান হইয়া ভবিষ্যতকে উজ্জল চিত্রে কল্পনা করিতে সাহসী হইলাম। উন্নতি যে আমাদিগকে আলিঙ্গন না করিল তাহা নয়, নবযুগের জাগরণের নব উৎসাহ উদ্যম আমাদিগকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিল! সেই শুভ মুহূর্ত্তেই ভারতের নবযুগের অভ্যুদয়, (renaissance) নবজাগরণ। কিন্তু ওই অতীত গৌরবের সম্মোহে অনিষ্টও আমাদের কম হয় নাই; আমরা গর্ব্বে অন্ধ হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম অনেকেই। বিপক্ষ সমালোচকের উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া যুক্তির পরিবর্ত্তে 'উতর' গাহিতে আরম্ভ করিলাম। একদর্শী হইয়া, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পক্ষ হইতে জগতের যাহা কিছু উন্নতির—সত্য শিব সুন্দর, তাহাদের আবিষ্কর্ত্তার স্থান দাবী করিয়া বসিলাম। তাহাতেও বরং ক্ষতির কথা ছিল না, আমরা যদি গর্ব্বমোহে আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা বিস্মৃত না হইতাম। বর্ত্তমান সভ্য-জগতের উন্নত জ্ঞান, শিল্প-কলাদি সমস্তকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে যাইয়া 'আমরা কি ছিলাম' সে চিন্তাতে, আমরা ভুলিয়া গেলাম 'আমরা এখন কি?' যেখানে লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত ছিল,—যে স্থান হারাইয়াছি তাহার জন্য অনুশোচনার সহিত, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অদম্য উৎসাহ অধ্যবসায়ের আবির্ভাব স্বাভাবিক ছিল, তাহার স্থলে এই মাটির গুণে—আমরা লাভ করিলাম বৃথা অহঙ্কার! উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত এ ভাব ভারতবাসীর হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইবার আশা নাই। আমাদের জীবন-সমস্যা ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে; মহাপরীক্ষায় সময় সমুপস্থিত,

এখন আপনাকে বুঝিয়া চলিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী,—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা মাথা তুলিতে পারিব না কোন দিনই।

যে জাতি অবিরত বৈদেশিক দ্বারা অবজ্ঞাত, এমন কি স্বদেশের নেতাদের নিকটেও, যাহারা আত্মসম্মান ও আত্ম-বিশ্বাসের বাণী শুনিতে পায় না তাহাদের উন্নতির আশা আর কিসে? সুতরাং বর্ত্তমানের নেতাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—যাহাতে দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে সেই শিক্ষার, সেই উপদেশের ব্যবস্থা করা। প্রচলিত দৈব বিশ্বাস, পরনির্ভরতা, সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি অতি অনিষ্ট-কারী মতবাদ যাহতে ভারত ভুলিয়া যায়, যাহাতে শক্তিশালী শাস্ত্রের প্রকৃত সত্ত্বা প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্বগৌরবের মর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষা দেশবাসী প্রাপ্ত হইতে পারে—জাতীয়শিক্ষা-পদ্ধতি সে রূপ ভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত নহে কি?

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচকগণ ত যখন তখন বলিবেই,—আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়া আছি,—আমাদের বহু বর্ণ বিভাগ, বহু জাতি, ধর্ম্মবিপর্য্যয়, শত শত ধর্ম্মসম্প্রদায়, বহু প্রকার ভাষা—সাধারণতন্ত্র লাভের পথে আমাদের অন্তরায় অথবা শাসন শক্তির উন্মেষ আমাদের মধ্যে এত ধীর যে অতি দূর ভবিষ্যতেও স্বায়ত্ত-শাসনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত আমরা হইব না। এই জন্যই বুঝি, আমাদের উপদেষ্টাগণ ভারতের জনসাধারণকে ক খ গ ঘ এর সহিত পরিচিত হইতে দিতেও পরাঙ্মুখ এবং আমাদের সন্তানদিগের জন্য ব্যবসাবণিজ্যজনক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে নারাজ; তাহারা উপদেষ্টা রূপে অবতীর্ণ হইলেও আমাদিগকে অন্ধকারে রাখাই যে তাহাদের অভিপ্রেত, তাহাতেই তাহাদের স্বার্থ তাহা কি বুঝিবার ও স্বদেশবাসীকে বুঝাইবার সময় আসে নাই! সত্য সর্ব্বকালেই সত্য,—পুরাকালেও সত্য যাহা ছিল আজও তাহাই,—শাশ্বত যাহা তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না—মূল সত্য চিরকালই অটুট, কিন্তু তাহার বাহ্যিক আবরণের তাহার হ্রাসবৃদ্ধি সুনিশ্চিত। ঋষিগণ কথিত মূল লক্ষ্য-স্থল (principle) শাশ্বত কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ উন্নত হইলেও তাহা চরম বা পরিবর্ত্তনের বাহিরে নহে! যাহার আরম্ভ হইয়াছিল ঋষিগণের সেই সুদূর অতীতে, আজ তাহার পরিণতি যদি অন্যত্র, অন্য জাতির হস্তে ঘটিয়া থাকে তাহা ভারতে—এই এতকালের নিদ্রিত ভারতে—ঘটে নাই বলিয়া যদি ঈর্ষায় সে উন্নতিকে উন্নতি না বলিতে চাও,—আধুনিক উন্নতির চরম পরিণতি যদি, আকারে প্রকারে, প্রাচীন পুঁথি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কর—তাহা হইলে এই বিংশশতাব্দীতে তোমার জন্ম বৃথা! সর্ব্বদা মনশ্চক্ষু উন্মিলন করিয়া আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে আমার নবযুগে নব পৃথিবীতে বাস করিতেছি—আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এবং আমাদের গৃহস্থালী মধ্যে কত তফাৎ, কত পরিবর্ত্তন! কত উন্নতিঅবনতির চিহ্নে তাঁহাদের ও আমাদের গৃহস্থালী এক ও একস্থানে স্থিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন আর এ গৃহের ব্যবস্থা সে গৃহের উপযোগী করিলে চলিবে না—কালধর্ম্মে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানকে উন্নত প্রকৃতির প্রকরণে, প্রণালীতে রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমাদের জীবন মন প্রাণ জাতি আবাস, এককথায় অন্তর ও বাহির সময়ের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, আদি অবস্থা—ভিত্তির কথা, স্মরণে রাখিয়া বর্ত্তমান সুদৃঢ় ভাবে এরূপ উন্নত প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে ভবিষ্যতেও যেন সমস্তই অটুট থাকে, কোন ক্রমেই কেহ যেন বুঝাইতে না পারে—আমরা কাহারও অপেক্ষা হীন,—আমরা যেন এই উন্নতমুখী সংসারের বুকে বাসা বাঁধিয়া বিস্মৃত না হই—ভূত হইতে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যত উন্নত হওয়া চাই। বর্ত্তমানে উহারা আমাদিগকে যতই হীন বলিয়া চিত্রিত করিতে প্রয়াস পা'ক্ না কেন, এখন এমন প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে যাহাতে

প্রতিদ্বন্দীরা কিছুতে আমাদিগকে আর বুঝাইতে পারিবে না—আমাদের অতীত হীন ছিল—বর্ত্তমানে আমাদের অস্তিত্ব নাস্তি। সে বিপদ আর নাই—বিপদ আমাদের ভবিষ্যত লইয়া—এখনও আমরা পদে পদে অতীতের গৌরবে ভুলিয়া যাইতে চাই—অতীত ও বর্ত্তমান এক নহে—অতীত আমাদের অতি উজ্জ্বল হইলেও বর্ত্তমানে অন্যের নিকট আমাদের শিক্ষা করিতে অনেকে আছে, আমাদের অতীতের সহিত মিলে না বলিয়াই আধুনিক উন্নতি হীন নহে,—আমাদের গ্রহণীয়, অনুকরণীয়—অবশ্য তাহাদের আকারে নহে; গ্রহণীয় তাহাদের ভাবে—এদেশের উপযুক্ত আকারে—মূলে এক হইলেও আকার হইবে তাহার বিভিন্ন—মূলতঃ মহামানবসঙ্ঘ এক—একই অমৃতের পুত্র কিন্তু জাতীয়তায় তাহাদের আকার ভিন্ন ভিন্ন—মূল ঠিক রাখিয়া জাতিকে আপনার ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই মনস্বিনী এনি বেসান্ত বলিয়াছেন—'জাতীয়শিক্ষা আত্মশ্লাঘা ও বিকশিত-স্বদেশ-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। উহার আবহাওয়া হইবে খাঁটি দেশীয়,—ভারতীয় সাহিত্যের মিষ্ট মধুর নূতনত্বে তাহা নিত্য সজীব থাকিবে,—পুরাতনের অপকারী অংশ বিবর্জ্জিত হইয়া উন্নত ভবিষ্যতের চরম লক্ষ্যে উহার গতি হইবে।' তাহা হইলেই ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কাহাকেও ছোটবড় করিবার উপায় নাই! ধর্ম্মজগতে ন্যায়দর্শনে, শিল্পকলাদিতে পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নত ছিলেন বলিয়াই বর্ত্তমানে আমরা সেগুলিতে পশ্চাতে পড়িয়া আছি—তাহা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইলে চলিবে না, বরং আমরা গর্ব্বের সহিত বলিব "আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সকল তথ্যেরই মালেক ছিলেন, আমরা নেশায় বিভোর হইয়া তাঁহাদের অর্জ্জিতবিদ্যা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি, আর না চেতনা যখন ফিরিয়া আসিয়াছে—আমরা উন্নতবংশের সন্তান—আমরা সুকুমার-বিদ্যা আয়ত্তের অধিকারী—আমরা স্বল্প চেষ্টাতেই আমাদের উন্নত পিতৃপুরুষ হইতেও উন্নততর সোপানে—জগতের সর্ব্বজাতির লোভনীয় সুউচ্চ শিখর জয় করিয়া লইব।

মানবিকতা নিত্য উন্নতিশীল। মনুষ্যের জ্ঞান নিয়ত অগ্রসর হইতেছে; প্রকৃতির উপর মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বও দিন দিন বাড়িতেছে। সভ্যতা আমাদিগকে এক উন্নত সৌধ প্রস্তুতকরণোপযোগী সর্ব্বদোষমুক্ত ভিত্তি, সুদৃঢ় গঠনমঞ্চ দান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছে! আমাদের জনসাধারণ অন্য দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে, সুযোগ সুবিধা পাইলে পৃথিবীর কোন জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দীতায় ভারতবাসী পশ্চাৎপদ নহে। আমরা একতার উপাসক হইলে অচিরে মনুষ্যোচিত ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে; এখন হইতে আর কোন সুযোগকেই বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না; আমরা স্পষ্টই বুঝিয়াছি—দৈহিক বলই চরম বল নহে—মানসিক শক্তিই শক্তি—দৈহিক বন্ধন মাত্রই অধীনতা নয়—আন্তরিক বল অজেয়, মানসিক গুণের পরিবাক্তিই স্বাধীনতা পরম আনন্দের হেতু!

এমন অবস্থায় নেতাদের আর জনসাধারণকে কোনক্রমেই ভাবিতে দেওয়া উচিত নয় যে তাহারা অন্যের অপেক্ষা হীন; বৈদেশিকগণও যে জাতীয়তা ও সভ্যতা ক্ষেত্রে আমাদের অনুন্নত অবস্থার উল্লেখ করিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাহারও প্রতিবাদ প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। আমরা যতই নির্জ্জিত হই না কেন, আমরা শিরদাঁড়া সোজা করিয়া আমাদের মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখিব, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া স্মরণে রাখিব—আমরা মানুষ,—আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকেও সেই শিক্ষায় মনুষ্যের ধর্ম্মে মানুষ করিয়া তুলিব। মানুষ যে, নিজকে ছোট করিয়া দেখিলে সত্যই ছোট হইয়া যায়! কাহারও নিকট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার বা কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক নাই! বন্ধুর সমালোচনা আমরা সাদরে আহ্বান করি—তাহাতে আমরা উপকৃত হইব; হৃদয়হীনের,

ঈর্ষাময়,-জাতিবিদ্বেষী-হলাহলে অস্থির হইবার কারণ নাই, নীলকণ্ঠের বংশধর আমরা অনায়াসে সমস্ত গলাধঃকরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইব।

পরের নিন্দায় আমরা টলিব না, প্রশংসায় আমরা আত্মহারা হইব না—আমরা একথা ভুলিব না মুনিরও মতিভ্রম ঘটে। আমাদের পিতৃপুরুষের যে মতবাদটী ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা ভ্রম বলিয়াই গ্রহণ করিব, যে মতটী উন্নতির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহার উন্নতিতে সচেষ্ট হইব, আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে আমাদের আদর্শ আমাদের উন্নতিমূলক ও উন্নতযুগের উপযুক্ত হওয়া চাই। সেইটিতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালীকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পাদনে সাহস ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ প্রয়োজন; ইহাতে একতা, পরস্পর সহায়তা, মৈত্রী ও কর্ম্মকেন্দ্র এক-উদ্দেশ্যমূলক হওয়া চাই, সর্ব্বোপরি চাই,—কি ব্যক্তির, কি সমগ্র জাতির আত্মনির্ভরতা ও আত্মজ্ঞান। কেহ যদি আমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তাহা গ্রহণে অবশ্য আমরা পরাঙ্মুখ হইব না কিন্তু কার্য্যসম্পাদনে নির্ভর করিব কেবল আপনার শক্তির উপর। জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা সমাধানেও আমাদিগকে এই নীতিতে (in this spirit) লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা প্রত্যেক বস্তুকে, প্রত্যেক মতবাদকে, চিন্তাকে, চিন্তা প্রণালীকে, আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক আলোকে ধরিয়া প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিব—তাহাতে সত্য ও সত্ত্বা কতখানি—তাহার পর না তাহা গ্রহণের কথা। তীব্র সমালোচনায় বিচলিত হইলে আমাদের চলিবে না, চরম পরীক্ষায় আমাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষিত হ'ক—আমরা তাহাই প্রার্থনা করি,—তবে না আমরা ধরিতে পারিব আমাদের অবলম্বিত পন্থা কতখানি বিপদসহ,—সার তাহাতে কতটুকু! ভবিষ্যতে তাহার অস্তিত্বের সম্ভবনা কি পরিমাণ! সত্যই আমরা ইংরাজ, জার্ম্মেণ বা আমেরিকান বা জাপানীর অনুকরণ করিয়া বিদেশী হইতে চাই না,—তাহাতে আমাদের মঙ্গল নাই,—তাহাদের সভ্যতা আর আমাদের সভ্যতার মাপ (standard) কখনই এক হইতে পারে না—আমরা ভারতবাসী, ভারতবাসীই থাকিব, মনে প্রাণে তাহাই প্রার্থনা করি,—উন্নতিতে, উদ্যমে, উৎসাহে, আত্মশক্তিতে আত্মপদে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাই, মনুবংশের চিরআকাঙ্ক্ষিত মন্দির-পথগামী যাত্রীর অগ্রপংক্তিতে অগ্রসর হইব,—ভারতের অতীত গৌরব—প্রাচীন সভ্যতায় প্রথম পংক্তিতে তাহার স্থান—প্রথম ছিল—প্রথম থাকিতেই হইবে আমাদিগকে—সেই স্মৃতি, সেই ভবিষ্যত-আশা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া আত্মপ্রসাদের সহিত বলিব—আমরা আদি উন্নতির মাতৃভূমি ভারতের সন্তান; ভবিষ্যতেও মাকে আমাদের গৌরব-কিরীটে ভূষিতা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিব—"মা আমার!"

আমাদের জাতীয়তা এই এক 'মা' ডাকের মধ্যেই নিহিত! জাতীয় শিক্ষা বলিতে কি বুঝিব? স্থানীয় বা প্রাদেশিক, কিম্বা সাম্প্রদায়িক শিক্ষাই কি জাতীয় শিক্ষা? অধীত বা অধ্যয়ন-সহায়ক ভাষা বা অধ্যাপকের অথবা অধ্যয়ন-ব্যবস্থাকারীর জাতি অনুসারেই কি উহার নামকরণ? না—তাহা কিছুতেই নহে! সত্য কবে স্থানবিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিতে গণ্ডিবদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ বলিয়াছেন,—সত্য যে শাশ্বত এখনকার ঋষিগণও তাহাই প্রচার করিতেছেন তাহাই,—বিজ্ঞান ও ন্যায়ের পরিমাণে সত্য অদ্বৈত! পাশ্চাত্য ন্যায় বিজ্ঞান, বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ব্যাখাত, বলিয়াই কি আমার তাহা গ্রহণবিমুখ হইব? আমরা এই যুগেও কি সেক্সপিয়র, বেকন, গেটে, সিলর, এমারসন, হুইটম্যানপ্রমুখ, ক্ষণজন্মা মণীষীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই—তাঁহাদের অমূল্য উক্তিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারি,—না তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে? ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অস্ত্রোপচার বিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্ভিদবিদ্যা,

জীবতত্ত্ব প্রভৃতি কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান অতিক্রম করে নাই? ব্যবসা, বাণিজ্যনীতি, অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতি ও সামুদ্রিক-যান-বাহন তত্ত্বের ত কথাই নাই বৈদেশীক বলিয়া সে সকল পরিত্যাগ করিতে হইলে কি আর সভ্যজগতে কোন জাতির স্থান থাকে! আমরা ইদানিং ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ও ইউনানী হকিমী চিকিৎসাপ্রণালার অতি উচ্চপ্রশংসা ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা শুনিতে পাই,—উহাতে যতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে কিন্তু তাই বলিয়াই কি পুরাকালের আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান কালের বৈদেশীক চিকিৎসা প্রণালী হইতে উন্নত বলিতে হইবে,—আধুনিক শিশুচিকিৎসা শিশুপালন, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি ভারতে যতই প্রসারিত হয়, ততই মঙ্গল সে কথা কে একদর্শীর মত অস্বীকার করিবে! ইউরোপও ত একথা বলে না,—পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাহাদের যে চিকিৎসা প্রণালী ছিল তাহাই তাহাদের চরম; তাহা হইলে উন্নতি হইত কিরূপে?—তবে আমরাই কেন গতিভ্রষ্ট হইয়া বলিব—আমাদের যাহা ছিল তাহাই চরম—প্রাচীনের উপর উন্নতির আর স্থান নাই—তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমানের অস্তিত্ব নাই—স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য!

আমাদের একদল লোকের মুখে শুনিতে পাই "কাজ কি বাবু জড়-জগত লইয়া অত কথা,— আধ্যাত্মিক উন্নতিই উন্নতি! আসুরিক ভাবাপন্ন যাহারা তাহারাই ওসব বাহিক বস্তু লইয়া মাতিয়াছে, মাতুক,—আমাদের নিভৃত (retired) জীবনই ভাল, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই সুখ আমরা যা আছি সেই যথেষ্ট!" মুখে শুধু এসকল অসার অকথ্য বাক্য বলিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত নন, তাহারা পুস্তক লিখিয়া, কবিতা ও প্রবন্ধে এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিকতার বিষবীজ দেশময় ছড়াইতেছেন,—এরা যদি দেশের বন্ধু—পরিত্রাতা হন্—হা হরি—দেশদ্রোহী তবে আর কাহারা! 'হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রাণের স্বদেশী ভ্রাতৃগণ, সাবধান—আধ্যাত্মিকতা আর জড়তা এক নহে, ত্যাগ অর্থে হারান নহে—ধ্যান বলিতে নিদ্রা নহে। আধ্যাত্মিকতা যে সর্ব্ববিষয় আত্মার উন্নতি—পরিণতি মনুষ্যের মানুষত্ব, পূর্ণ বিকাশের দিকে গতি!...দেহের মনের সকলের! আমরা নিভৃতে থাকিতে ইচ্ছা করিলেই কি একাধারে পড়িয়া থাকিতে পারিব, যে দেশের আয়তন কুড়িলক্ষ বর্গমাইলের অধিক যাহার অধিবাসীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর ⅕, সে দেশের সন্তানের পক্ষে কি আত্মগোপন সম্ভব? সন্তান যদি মাতৃ ধন হইতে নিজকে বঞ্চিত করে, তাঁহার অতুল অপরিমিত ঐশ্বর্য্য অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে না—অন্য আসিয়া দখল করিয়া লইবে নিশ্চয়।

আপনার ধন, অধিকার যে 'আধ্যাত্মিকতার ওছিলায় বা আলস্যে' অপরকে বিনাবাক্যব্যয়ে ছাড়িয়া দেয় সে কত দূর অপদার্থ, কাপুরুষ! সবল আকাঙ্ক্ষা করে আপনার দখল। যাহা আমাদের তাহা কেন বিদেশীকে ভোগ করিতে দেব?

আমাদের সন্তানগণের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য,—তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিলে পাপ কি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না? আমাদের বিত্ত, স্বত্ব, স্বাধীনতা, মানবিকতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে তাহার উন্নতি, সেই পন্থাই আমাদের অবশ্য অবলম্বনীয়, সেই শিক্ষাতেই আমাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত করা অত্যাবশ্যক। সেই শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা! তাহারই সুব্যবস্থা হউক!

মনুষ্যের মূলগত স্বভাব এক; বিভেদ বিভাগ কেবল সম্প্রদায়ে, ভাষায়, আবাসভূমির আবহাওয়ায়,—তাহাতে কি? বাহ্যিক বিভিন্নতা যে তুচ্ছ; আন্তরিক,—আভ্যন্তরিক ধর্ম্ম,—জগতে যে এক,—এক হইতেই চাহিতেছে,— প্রাণের স্বভাব একতা,—তাহা হইতেই হইবে। যুক্তরাজ্যে আসিয়া একবার নয়ন মন সার্থক করুন। সমগ্র সভ্য-জগতের অধিবাসী, বহু জাতি, বহুবর্ণের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া হৃদয়ঙ্গম করুন,--সভ্যতা শিক্ষা,—বিরাট

পক্ষের শত প্রতিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা স্বত্বেও—মানুষকে গলাইয়া মিলাইয়া কি মোহিনী শক্তি বলে এক করিয়া ফেলিতেছে,—এক মহামানবে পরিণত করিতেছে। পথিকের, পর্য্যটকের বেশভূষা ধরণ-ধারণ, ভাষা, বাক্য, কথন-ভঙ্গী দেখিয়া শুনিয়া কি আর বিভেদ করিবার উপায় আছে—এ, ও-জাতি হইতে ভিন্ন! তথায় দেখিতে পাইবেন জগতের সকল জাতি, সম্প্রদায় পৃথিবীর সকল ভাষা ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক! একই ভাষায় সকলে এমনই ভাবে বাক্যালাপ করিতেছে, যে তাহাদিগকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই—এ-আমেরিকান ও ইংরাজ ও-ভারতবাসী ইত্যাদি ইত্যাদি! এক, গাত্রবর্ণে সময় সময় পরিচয়, তাহাও বাহ্যিক, বেশ ভূষায় তাহাও এমনি ভাবে আচ্ছাদিত যে সহজে ধরিবার উপায় নাই! কার্য্যক্ষেত্রে, কুশলতায় ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন জাতি এমনি মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। বিসদৃশ্যও অতি সামান্য, আমি এমন চীনা ও জাপানী অনেক দেখিয়াছি, যাহারা ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে, ইউরোপীয়দের চেহারার সহিত এমনভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে প্রকৃত পরিচয় না জানা পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই তাহারা ইউরোপীয় নহে। জাপান যে কত দ্রুত ইউরোপীয় হইয়া পড়িতেছে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। জাপানের এই অনুকরণ প্রবৃত্তিকে অনেকেই নিন্দার চক্ষে দেখিবেন কিন্তু জাপানীরা যে ইউরোপীয়দের অনুকরণ না করিয়াই পারে না। এই অনুকরণ যে স্বাভাবিক, সার্ব্বজনিক! এই যে, সে দিন যুক্তরাজ্যবাসী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ একপ্রাণ হইয়া জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এমন কি আমেরিকায় ভূমিষ্ঠ জার্ম্মেণ-সন্তান জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—ইহার মূলে কি—ঐ একপ্রাণতা—দশের স্বার্থ এক হইয়া নূতনত্বের দিকে অগ্রসর নহে?

সত্য,—একীকরণ-জগত ভীষণ! জগতের বৈচিত্রই সুন্দর ও নমনীয়! তাহা সুন্দর বা যাহাই হ'ক্ জগতের বৈচিত্র মরিতে বসিয়াছে। না—ঠিক্ তা নহে, বাহ্যতঃ উহার আর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না,—না—তাহাও নহে একবারে উহা বিলুপ্ত হইবার নহে,—তবে দুইশত বৎসরে উহা এমন হইবে যখন সমস্ত সভ্যজাতির চিন্তা, সভ্যতার জ্ঞান, মূলতঃ এক হইয়া যাইবে! তৎকালে তাহাদের প্রচারকের, অধ্যাপকের, যাজকের, রাজনীতজ্ঞের ভাব ও ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে পারে কিন্তু জনসাধারণের জীবন-গতি এক হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে একই খাদে,—লক্ষ্য সকলেরই হইবে মহামানব সঙ্ঘের মহাসমুদ্রে! ইউরোপ ও এশিয়া এক হইয়া যাইবে, আফ্রিকা আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া দাঁড়াইবে, আমেরিকা কোল দিবে—পৃথিবী হইবে এক!—তখন আর এ বিভিন্নতা থাকিবে না,—এ ভিন্ন, বিদেশী, ওর দীক্ষা কেন আমি গ্রহণ করিব—সে ভাব জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে।—এক দিন জগত, ভারতের নিকট শিষ্যের ন্যায় শিক্ষা করিয়াই আজ উন্নত হইয়াছে,—আমরা কেন তবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার নবরত্নে পূর্ণ করিতে, তাহাদের নিকট হইতে আহরণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইব!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

বরণ।

মরণের রূপে আজি হেরেছি তারে
মম কুঞ্জদ্বারে।
এত যে সাধের দেহ
সযতনে রচা গেহ
যত শ্রেয় যত প্রেয়
দিব উহারে!
সংসারে নানা কাজে
লুকায়ে আছিনু লাজে
গোপনে নানান্ সাজে
চিনে যাহারে!
মরণের রূপে আজি হেরেছি তারে
মম কুঞ্জদ্বারে!

ফিরিলে দুয়ার পানে
কতমত সাবধানে,—
দেখেছি সে আহ্বানে
আঁখির ঠারে!
করমের মাঝে যবে
বঁধুয়া সে বাঁশী-রবে
ফুকারি ফুকারি ক'বে
'মনের ভারে—
ভুলিয়া কি গেছ প্রিয় ভুলিলে কারে?'
র'য়ে কুঞ্জদ্বারে!

এস আজি এস প্রিয়!
হে অনন্ত কমনীয়!
তুমি মম বরণীয়
লহ আমারে!

অবসান দিন-শেষে
বিরাম-নগন-বেশে
নিবিড় হিয়ায় এসে
ধর গো তারে!
যে তোমা ভুলিয়াছিল অহঙ্কারে ?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভাগ্যলিপি।

—:*:—

(১)

ইন্দিরা দরিদ্র কন্যা। সংসারে তাহার মা-ই ছিলেন একমাত্র অবলম্বন। তিনিও প্রায় মাসাধিক কাল হইতে শয্যাগত। এই দুঃখের দিনে, মহেন্দ্র বাবুই তাহাদের ছিলেন একমাত্র সহায়। লোকে বলে—ইন্দিরার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার মাতা বলিতেন, তাহার নাকি জন্মপত্রিকায় ষোল বৎসরে কি একটা দোষ আছে। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া তাহার পিতার নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রতিবেশিনীদের তীব্র বাক্য জ্বালায় বিধবা অতিষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন। আজ এই রোগশয্যায় পড়িয়া দুঃখিনী বিধবা, কন্যার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন। এই অসহায় বালিকাকে কে বিবাহ করিবে! তাঁহার এমন কোন হিতৈষী বন্ধু নাই, যিনি এই দুঃখিনী বালিকার বিবাহে সাহায্য করিবে বা দেখিয়া শুনিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তাহাকে দান করিবে। যাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মাতাপুত্রীর দিন চলিতেছিল, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, তবু তাঁহার উপরে এতটাই চাপ দিতে বিধবার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। ইন্দিরা সুন্দরী, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি হয় ত তাঁহার স্নেহের কন্যাকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিতেও পারেন। একটু ক্ষীণ আশা বিধবার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু বাধা ঐ জন্মপত্রিকায়। বিধবা ভাবিয়া আকুল হইল, কাহার নিকট তাঁহার স্নেহের কন্যাকে রাখিয়া যাইবেন! জগতে এমন কোন আত্মীয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া এই অনাথা বালিকা জীবনের বাকি দিনগুলি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিতে পারিবে।

ইন্দিরাকে কিন্তু সেজন্য চিন্তিতা বলিয়া মনে হইত না। সে রুগ্না মাতার সেবা করিয়া, সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দিত। এবং প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া, স্নানান্তে শিবপূজা করিয়া পূজার ফুলগুলিসহ মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবলিঙ্গটি গঙ্গার জলে—বিসর্জ্জন দিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিত। অপরাহ্ণে যখন মহেন্দ্রবাবু তাহার মাকে দেখিতে আসিতেন, তখন তাঁহার সহিত আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় গল্প করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। ইন্দিরার মাতার অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। সে দিনটা ছিল বড় মেঘলা। আকাশে করিকুম্ভের মত স্তূপে স্তূপে মেঘ সঞ্চিত হইয়া দলে দলে

যেন এদিক্ ওদিকে মাতামাতি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সে ভীত মনে সেই অন্ধকার-ময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়াছিল। তাহারও হৃদয়টা জুড়িয়া বুঝি এমনিই একটা কালো মেঘ, ঐ উন্মত্ত ঝড়ের মতই তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

মাতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। একটি সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমি ত চল্লুম ইন্দু, কিন্তু তোর কোন একটা কিনারা করে দিয়ে যেতে পারলুম না, এই আমার বড় দুঃখু রইলো।" মাতার বাক্যে ইন্দিরার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইবার মত হইলেও সে শান্ত স্বরে কহিল "তার জন্যে দুঃখু কি মা? আমি চিরকুমারী থাকবো।" ক্ষুন্নস্বরে মাতা উত্তর দিলেন "তা কি হয় মা! সমাজের ভয় সকলেরই আছে, এমন অবস্থায় কে তোকে ঘরে ঠাঁই দেবে মা।" রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত করিয়া ইন্দু কহিল "তোমার ত আর ছেলেমেয়ে নাই মা, যে, তাদের বিয়ে দিতে হবে, আমার সমাজের ভয় কি মা? মহেন বাবুর স্নেহ-ছায়াতে সে আমি স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দেব।" মাতা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন "মহিনকে একবার খবর দে তো মা।" ইন্দিরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

(২)

মহেন্দ্র বাবু সুসজ্জিত অট্টালিকায় বহু দাসদাসী সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই বৃহৎ পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহের সৌন্দর্য্য যাহাতে বৃদ্ধি করে সেই স্ত্রী পুত্র পরিবার তাঁহার যে নাই! বিদ্যা-উপার্জ্জন, বিষয়ালোচনা, অর্থ-উপার্জ্জন করিয়াই তিনি দিন কাটাইতেছিলেন। যাহাতে অনুরাগ, তিনি তাহাই করিয়াছেন, সংসারে অনুরাগ ছিল না কাজেই সেটা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমনি করিয়াই তাঁহার জীবনের সপ্তবিংশতি বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল, এবং অবশিষ্ট দিনগুলি সেইভাবে কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যে দিন বাল্যবন্ধু মোহিনী বাবুর অনুরোধে এই দুঃস্থ পরিবারের উপকারার্থে আসিয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হইলেন, যে দিন বালিকা ইন্দিরা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল সেই দিন হইতে কি যেন একটা মোহে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এমন গোলাপী রং এমন চোখ! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেন সেই কোমল দেহের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন "এত রূপ!" তাঁহার ঔদাসীন্য-ময় জীবনটাকে কে যেন এই দরিদ্র-পরিবারের সহিত একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া তাহার জীবনে সাফল্য আনয়ন করিয়া দিল। তিনি প্রতি দিন তাহাদের বাড়ী যাইয়া ইন্দিরার মাতাকে দেখিয়া আসিতেন। এবং সরলপ্রাণা ইন্দিরার সহিত গল্প করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতেন। লোকে নানা প্রকার কথা রটাইতে ছাড়িত না। এজন্য বিধবা সময়ে সময়ে যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিয়া কন্যাকে বড় একটা মহেন্দ্র বাবুর সহিত মিশিতে দিতে চাহিতেন না, আজ কিন্তু তাহার সে দ্বিধাসঙ্কোচ আর রহিল না। মহেন্দ্র বাবু আসিলে তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন "বাবা, আমি ইন্দুকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্চি, যদি যোগ্য পাত্র পাও বাবা, তা হ'লে ইন্দিরার বিয়ে দিও। তুমি আমাদের অনেক উপকার ক'রেচ, আর বেশী কি বল্‌বো বাবা, বিধবার এই শেষ অনুরোধ পার ত রক্ষা করো।" ইন্দিরা সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া, মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "না মা, তুমি এ অনুরোধ করো না, আমি জীবনের বাকি দিনগুলা এমনিই বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো, সেজন্যে ওঁকে বৃথা অনুরোধ ক'চ্ছ।" মহেন্দ্র, শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল "না না, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি প্রাণপণ যত্ন করবো।" মহেন্দ্রের বাক্যে মাতার ম্লান মুখখানা সন্ধ্যার ম্লান আলোটুকুর মত

সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াই মুহূর্ত্তে যেন গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বিধবার কৃতজ্ঞ অন্তরের শেষ আশীষ-বচনটুকুও জানাইবার অবকাশ হইল না। বিধবা তাহার হিস্সায় কন্যাকে অর্পণ করিবার জন্যই যেন এতক্ষণ জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

ইন্দিরার মাতার মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বাবু একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ইন্দিরার নিকট নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর সে বাড়ীতে সর্ব্বদাই যাওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া ঘন ঘন যাওয়া আসা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এত আকর্ষণের পরিণাম কি? ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া ভবিতব্যতার হাতে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া স্বকল্পিত শত যুক্তিতে আত্ম-প্রতারণায় আশ্রয় লইতে, মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন।

সেদিন রবিবার, হাতে কোনও কাজ না থাকায় দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। একথা সেকথার পর মোহিনী বাবু বলিলেন "ইন্দিরার বিয়ের আর কোথায় চেষ্টা করা যাবে ভাই, তুমিই তাকে বরণ করে নাও না?" মোহিনীর বাক্যে মহেন্দ্র যেন আকাশ হতে পড়িলেন, "আমি! বলিস্ কি রে, এ বয়সে আবার বিয়ে?" ঈষৎ হাসিয়া মোহিনী বাবু কহিলেন "তোর চেয়ে কত বুড়ো পার হয়ে যাচ্ছে, ত তুই! তোর এমনি কি বেশী বয়স হয়েচে শুনি?" মহেন্দ্র উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—"খেপ্‌লি না কি রে! আমার মত পাত্রের হাতে এমন রত্ন দেওয়া যায়?" সোৎসাহে মোহিনী কহিল "কেন যাবে না, তুমি পাত্রটা মন্দ কিসে? একটু বয়েস বেশী! তা এমন ঢের হয়ে থাকে।" পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া মহেন্দ্র কহিলেন "তারপর এই বুড়ো বয়সে নাত্‌নীর বয়সী স্ত্রী এনে, চুলে কলপ মাখিয়ে আবার নূতন করে যৌবনের অভিনয় করতে হবে বুঝি।" মহেন্দ্রের এই উপহাস বাক্যে মোহিনী মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, "ইন্দুই বা কি কচি খুকী রে, তারও ত পনরো পেরুলো বোধ হয়। যাক্ তুই ত কারুর কথা রাখ্‌বিনে, মিছে বলা।" বলিয়া সে ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

গোধূলির শেষ-সূর্য্যের কিরণটুকু তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে নাই। খিরকির সম্মুখস্থ নদীতে যেন সোনার জলে টল্ মল্ করিতেছিল। পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠের পর মাঠ যেন প্রকৃতির শ্যামাঞ্চল-খানি বিছাইয়া দিয়াছে। সূর্য্যদেব যাই যাই করিয়াও যেন ধরার মায়া কাটাইয়া তখনও যাইতে পারিতেছিলেন না নির্জ্জন ঘাটে বসিয়া ইন্দিরা মাতার কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহার সমস্ত হৃদয়খানা দারুণ বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। অন্তরের শূন্যতা অনুভব করিয়া তাহার দুইটি চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে-ছিল। সহসা মহেন্দ্র বাবুর আগমনে যেন তাহার চিন্তার ধারাটা একবারে বদলাইয়া গেল। বহুদিন পরে হঠাৎ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত, একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়স আজ ইন্দিরা প্রথম জানিতে পারিল,—সে যুবতী! যে সমাচার তাহার কাছে এই পঞ্চদশ বৎসর অগোচর ছিল, হঠাৎ আজ কোন্ বৈদ্যুতিক তার যোগে কে যেন তাহা তাহাকে জানাইয়া দিয়া গেল, কি একটা নূতন ভাষা তাহার কানে কি কহিয়া তাহার হৃদয়টাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। যেন তরুণ, কিরণ-পাতে শুভ্র তুষার নির্ঝরের মত সে বিগলিত বিচলিত হইয়া মস্তক নত করিল। মহেন্দ্র বাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন "আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে দেখতে না পেয়ে এখানে এলুম, তুমি একলা এখানে বসে কি করচ ইন্দু?" কিছু দিন পূর্ব্বে যাহার সাতে গল্প

করিয়া শেষ হইত না, আজ লজ্জায় তাহার সহিত ইন্দিরা কথা কহিতে পারিল না। লজ্জারাগে তাহার সৌন্দর্য্য যেন শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। মুগ্ধনেত্রে মহেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। একটুখানি পরে আপনাকে সংযত করিয়া কহিলেন—"একটা কথা আছে ইন্দু, ভিতরে এস।" লজ্জানত নেত্রে, বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত চরণে ইন্দিরা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মহেন্দ্র বাবুর হৃদ্ যন্ত্রীও সহসা যেন বেসুরা বাজিয়া উঠিল। সেভাব তিনি অন্তরতম প্রদেশে চাপা দিয়া শান্তকণ্ঠে যেন সম্মুখের প্রাচীরটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "একটি পাত্র পাওয়া গেছে, যদিও একথাটা তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন, তবুও তুমি বড় হয়েছ, উচিত বোধে আমি তোমার মতটা জানতে এসেছি, ইন্দু।" এই বার তিনি ইন্দুর মুখের পানে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। নতমস্তক, লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ইন্দিরা কহিল "যার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা ত আপনার অবিদিত নাই, তবে একথা কেন?" একটুখানি থামিয়া মহেন্দ্র বাবু কহিলেন "সে কোনও কাজের কথা নয় ইন্দু, কোনও ব্রাহ্মণ কন্যারই অবিবাহিত থাকার ব্যবস্থা নাই! তা ছাড়া তোমার দেখাশুনা করবে কে?" শান্তকণ্ঠে ইন্দিরা কহিল "একটি অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যা আপনার কাছে বোধ হয় ততটা ভার নাও হতে পারে। অন্ততঃ আমি ত তেমনিই আশা করি।" ক্ষুণ্ণ স্বরে মহেন্দ্র কহিল "সে জন্য নয়। এ চিরজীবনের কথা! তুমি ভাল করে বুঝে দেখো ইন্দু, তারপর আজ না হয় কা'ল এ কথার উত্তর দিও। আমি এখন চল্লুম।" বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার অন্তস্তল মথিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। নিরতিশয় বিষণ্ণ মনে সেই স্থানে ইন্দিরা বসিয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের শক্তি, অন্তরের সে দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল যেন।

(৪)

মহেন্দ্র বাবুর চক্ষে সংসার শূন্য,—তাঁহার দাসদাসীপূর্ণ সেই বৃহৎ বাড়ীখানা যেন জনমানব হীন। কিন্তু এই শূন্যতা যে, কোন্ খানটায় তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে না পারিলেও একটা যে কিছু ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। একখানা চৌকির উপরে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় তিনি সেই কথাগুলাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন চাকর আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি টেরও পান নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখের খোলা জানালাটা দিয়া বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, অমনি বস্তু বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের জীবনটা যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। শত আবশ্যকেও আজ কাহাকেও কাছে ডাকিতে ইচ্ছা হইতে ছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার দিকে চাহিয়া স্থপতির গড়া মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কিরূপে যে, সময় কাটিতে ছিল তাঁহার খেয়াল ছিল না; কখন যে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও মনে নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভৃত্য ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—"বাবু, মোহিনী বাবু এসেছেন।" "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।" বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। গত রজনীর অন্তরের অবসাদটাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া মুখে চোখে প্রফুল্লতা আনিতে চেষ্টা করিলেন।

মোহিনী বাবু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন "কি হে মহেন, আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্চে কেন বল ত?" মহেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। "তুই স্বপ্ন দেখেছিস্ না কি রে?" মহেন্দ্র এ কথা অস্বীকার করিলেও মোহিনী স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—একটা চিন্তায় যেন বুকে অহরহ দগ্ধ করিয়া তাঁহার বদনে একটা বিষাদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা গোপন করা মহেন্দ্রর সাধ্যাতীত হইলেও সে গোপন করিতেছে কেন? ভাবিয়া মোহিনী কহিল

"ইন্দিরার বিয়ের কি হলো হে?" সহসা মহেন্দ্রর মুখখানা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল "সে ত বিয়ে করতে চায় না, বৃথা চেষ্টা কোরে আর লাভ কি ভাই।" বিস্মিত হইয়া মোহিনী কহিল "সে কি হে, বিয়েই করতে চায় না! কি বলে সে?"

"সে বলে—চিরকুমারী থাকবে।" একটুখানি চিন্তা করিয়া মোহিনী কহিল "এও কি সম্ভব! তুমি ভাল কোরে জিজ্ঞেস করো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও কথা আছে।" আগ্রহের স্বরে মহেন্দ্র কহিল "তবে চল্‌না রে একটু ঘুরে আসা যাক্। হয় ত তোর কাছে সে কথাটা সোজা হয়ে যাবে।" মোহিনী একটুখানি হাসিয়া কহিল "আমার কাছে ত সে কথা সোজা হয়েই রয়েছে, তুই ত বুঝবি না ভাই, মিছে বলা।" বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মহেন্দ্র আনমনে উত্তর দিল "দূর্ তুই যা নয় তাই ভাবিস্।" মোহিনী কোন কথা না বলিয়া আবারও একটুখানি হাসিয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র বাবু ইন্দিরাকে অনেক বুঝাইয়াও স্ববশে আনিতে পারিলেন না। ভাবিলেন তাহার জননী যখন—তাঁহারই উপরে তাহার সম্পূর্ণ ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইন্দিরার বিবাহের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এবং আপনার অবাধ্য অন্তরটার উপরে মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রাণপণে তাহাকে দমন করিতে চেষ্টিত হইলেন। নিজের স্বার্থের জন্য তাহার প্রতি অন্যায় করিবার তাঁহার কোন অধিকার?

(৫)

গৃহকার্য্য সমাপনান্তে ইন্দিরা তাহাদের ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক কোণে তাহার মাতার পরিত্যক্ত স্থানটিতে বসিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। পঞ্চমীর অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্না ক্রমে সরিয়া যাইতেছে—চাঁদও পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপরের নীল আকাশে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ স্থানে স্থানে যেন উপেক্ষিত ভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। ইন্দিরা আকাশের পানে চাহিয়া শূন্য মনে তাহাই দেখিতেছিল। আকাশের স্থানে স্থানে তুলা পেঁজার মত মেঘগুলি যেমন ভাসিয়া যাইতেছিল—ইন্দিরারও অন্তরের সমস্ত চিন্তাগুলো যেন তেমনি একটির পর একটি ভাসিয়া যাইতেছিল। ইন্দিরার ভাগ্যলিপির কথা সে যেদিন মায়ের কাছে শুনিয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই চিরকুমারী থাকার কথাটা প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অন্তরে জাগিয়াছিল। এই পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে ত আর অন্য কিছুই ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর মন তাহা চায় না কেন? আর একটা আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিয়া উঠে কেন? সহসা চমকিত হইয়া সে যখন আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থানটাতে দৃষ্টিপাত করে—দেখে সেখানে একটা অকূল সমুদ্রই বহিয়া যাইতেছে। তেমনি উদ্বেল উচ্ছ্বাস তেমনি বাতাসের শব্দ, তেমনি দিকহারা অশান্তি। কিন্তু কেন? তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া সে যখন সেই সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন কি দেখিতে পায়? কেবল নৈরাশ্যময় অন্ধকারের সহিত তাহার জীবনের সহস্র সংঘাতময় ধারাগুলো মিশিয়া যেন অকূলে ছুটিতেছে। কিন্তু আর একটা জীবনের অস্পষ্ট ছায়া অজ্ঞাতে তাহার জীবনের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে এমন দিশাহারা করিয়া তুলে কেন? জননী যদি তাঁহার সেই শেষ মুহূর্ত্তে এমন একটা অসম্ভব আশার আভাস না দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয় ত সে আপনার ভাগ্যলিপিটাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে জীবনটাকে বহিয়া চলিতে পারিত। কিন্তু এখন ত তাহা হইবার উপায় নাই, এ যে তাহার মায়ের দান। তিনি স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই যে তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা। তাঁহার কথা সে মিথ্যা হইতে দিবে না,

স্বয়ং চিরদিন এমনি জ্বলিয়া মরিবে। সে চিন্তায় অন্তরে শিহরিয়া উঠে। না, না, তাহা যে হইবার নহে! তাঁহার মানসম্ভ্রম নষ্ট সে হইতে দিবে না, তাছাড়া এই অনাথা বালিকাকে কি তিনি হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছেন? এ শুধু তাঁহার দয়া মাত্র! পশ্চাতে পদশব্দে সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। বৃদ্ধা হরির মা—"হাঁ গা বাছা, সারা রাতটা কি বোসেই কাটাবে? ঘরে এস না মা।" "এই যে যাই হরির মা।" বলিয়া সে উঠিয়া ঘরে গেল।

পরদিন সকালে স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষগুলিতে জল সেচন করিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গনে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—মহেন্দ্র বাবু আসিয়া তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তখন তাহার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুত খেলিয়া গেল। রোমাঞ্চিত দেহে, সে মধ্য পথেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পদদ্বয় যেন আর উঠিতে চাহে না। তাহার সেই অবস্থা দৃষ্টি করিয়া মহেন্দ্র বাবু একটুখানি হাসিয়া কহিলেন "আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা কচ্চি ইন্দু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে এস না, একটা কথা আছে।" ইন্দু ভাবিল 'আবার সেই কথা! এ কথার কি শেষ নাই? প্রতিদিন এই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিবার জন্যই কি উনি এখানে আসেন! এ'কি রহস্য! যাক্ আজ সে কথার একটা মীমাংসা শেষ করিয়া দিবে। আর নিত্যই এই তীব্র জ্বালাময়ী ঘটনা লইয়া বাক্যালাপ আর সহ্য হয় না।' ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইয়া সে মহেন্দ্র বাবুর একটু দূরে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর, মহেন্দ্র বাবু আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন "তুমি আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ ইন্দু—" ইন্দিরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার মহেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। সহসা চারি চক্ষুতে মিলন হইয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আন মনে যেন বলিয়া উঠিলেন "তোমার অন্তরের কথাটা স্পষ্ট না শুনে আমি আজ আর উঠ্‌চি না ইন্দু।" ইন্দিরা প্রাণপণ বলে হৃদয়ে দৃঢ়তা আনিয়া কহিল "সেটা নাই শুনলেন, আমার ভাগ্যলিপির কথা ত আপনার অবিদিত নাই, সেইটাই কি যথেষ্ট নয়?" "কিন্তু আমি তোমার কোষ্ঠির মিল্ করেই তার ব্যবস্থা করেছি তবু ও তুমি সেই কথাটাই কেন যে ধরে রয়েছ, আচ্ছা আমার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হওয়া কি তুমি সম্ভব মনে কর?" "না—যাক্ সে কথা আর আমি শুনতে চাই না। কিন্তু তাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি?" "নিশ্চয়ই, নইলে লোকে ভাব্‌বে কি—" একটুখানি থামিয়া ইন্দু কহিল "তবে শুনুন, ভেবেছিলুম এ জীবন থাকতে একথা আপনাকে জানতে দোব না, কিন্তু আপনার পীড়াপীড়িতে আজ আমাকে বলতে হলো, দোষ নেবেন না। মা আমাকে সম্প্রদান করে গেছেন, আমি নিবেদিতা! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করা অসম্ভব।" বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র বাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন "এঁ্যা কি বল্লে, তুমি নিবেদিতা! কিন্তু এ কথা ত তোমার মা আমাকে কিছুই বলেন নাই। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ইন্দিরা "মায়ের শেষ সময়ের কথাগুলো একবার ভেবে দেখুন দেখি, কিন্তু সে জন্য আমি আপনাকে লোকের কাছে অপদস্থ করতে চাই না। আমাকে ক্ষমা করুন।" বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

(৬)

সেদিন ইন্দিরার সহিত বাক্যালাপের পরে, একটা কালো পর্দা মহেন্দ্র বাবুর চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া, সমস্ত ঘটনাটা যেন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। তবুও তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, এই কথাটাই ঠিক তার অন্তরের কথা কি না! এতক্ষণ তিনি ইন্দিরার দিক্‌টা লইয়াই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতে ছিলেন, এবং সেই দিক্‌টাতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজের দিক্‌টা ভাবিয়া দেখিবার মত তাঁর মোটেই

অবসর হয় নাই। হঠাৎ সে কথাটা মনে পড়িয়া সমস্তই যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে মনে—লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন "এতকাল পরে বিবাহিত জীবনটা কেমন লাগিবে! লোকেই বা কি বলিবে? ছিঃ!" সহসা জুতার শব্দে ফিরিয়া চাহিতেই, সম্মুখে মোহিনী বাবুকে আসিতে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া মোহিনী কহিল "কিহে, তুমি যে একবারে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছ, ব্যাপার কি বল দিকি?" "বিলক্ষণ, কে, আমি! আমি রোজই ত বেরুই ভাই, তোরই দেখা পাইনে।" বলিয়া তাহাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়াই শয্যায় যাইয়া বসিল।

এ কথা সে কথার পর, মোহিনী বাবুর জেরার টানে তাঁর অন্তস্তল মধ্যে যেখানে যা কিছু লুক্কায়িত ছিল, সমস্তই প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, এতটুকু তৃণ পর্য্যন্ত কোনোখানে আটকাইয়া রহিল না। মোহিনী বাবু নিস্তব্ধ-ভাবে বসিয়া সব শুনিলেন, একটা আরামের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"যাক, তাহলে এখন সব উদ্যোগ করা যাক, কি বল?" আজ হঠাৎ বন্ধুর নিকট হৃদয়ের সমস্ত ভারটা উজাড় করিয়া দিয়া, মহেন্দ্র বাবু অনেক পরিমাণে মনটা হালকা বোধ করিলেও একটু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, এবং কহিলেন "রোস ভাই এত ব্যস্ত কেন? এখনও তার মনের কথাটা ঠিক বোঝা যায় নাই, কেবল মায়ের আদেশ বলেই যদি—" বাধা দিয়া মোহিনী বাবু কহিল "আচ্ছা তাই হোক কিন্তু এ সংবাদটা তোমার শ্রীশ্রীখুড়ীমাকে দিতে পারি কি? কারণ—বরের মাসী, কনের পিসি হয়ে সমস্ত ভারটা ত তাকেই বইতে হবে, কি বল?" মহেন্দ্র বাবু কি বলিতে উদ্যত হইতেই, মোহিনী বাবু বলিয়া উঠিলেন "থাম ভাই, আর কোনও কথা আমি শুনতে বাধ্য নই।" প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন।

শ্রাবণের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী অলস মন্থর পবনে তরুলতা-সোনালি জ্যোৎস্নালোকে মৃদু মন্দ দুলিতেছিল। এমনি একটা আবেশময়ী যামিনীতে মহেন্দ্র বাবুর সহিত ইন্দিরার শুভ পরিণয় হইয়া গেল। এ বিবাহে সেরূপ উৎসবাদি কিছুই হইল না। মোহিনী বাবু দুই তরফা ভার বহন করিয়াও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আদর-অভ্যর্থনায় তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। যথা সময়ে ইন্দিরা আসিয়া মহেন্দ্র বাবুর শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া দিল।

সম্বৎসর পরে আনন্দময়ীর আগমনে যেমন সমস্ত বঙ্গ জীর্ণ অবসাদ দূরে রাখিয়া নবশক্তি লাভ করে—প্রবাসী দীর্ঘ প্রবাস যাপনের পর, শত আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে যেমন কত নিহিত মর্ম্ম বেদনার—কত সুদীর্ঘ বিরহের অবসানে কত সুখ—আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া গৃহীকে আবাহন করিয়া লয় তেমনি মহেন্দ্র বাবুর শূন্য গৃহখানি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ইন্দিরাকে আবাহন করিয়া লইল। এবং সেই আনন্দহিল্লোল যেন শতধারে ইন্দিরাকেও স্পর্শ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন একটা অজানা তন্ত্রীতে সহসা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার সপ্তস্বরা যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিল।

ইন্দিরা নেহাৎ বালিকা ছিল না, মহেন্দ্র বাবুর বিশৃঙ্খল সংসারে শীঘ্রই শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, মহেন্দ্র বাবুকে সুখী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল, এবং বোধ করি সফল হইতেও পারিয়াছিল। আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি যে, মহেন্দ্র বাবুর অযত্ন-রক্ষিত কেশকলাপে কলপ মাখাইবার আদৌ প্রয়োজন হয় নাই, তবে সুগভীর নিশীথে তাঁহাকে নূতন করিয়া কোনও অভিনয় করিতে হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা সঠিক অবগত নহি, বরং তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লই দেখা যাইত।

ইন্দিরাকে কিন্তু একটু ক্ষুণ্ণ বলিয়াই বোধ হইত। যদিও মাতার শেষ অনুরোধ রক্ষা হওয়ায় একটা অব্যক্ত আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্য চিন্তা সেখানে স্থান পাইত না, তথাপি আপনার ভাগ্যলিপির কথাটা মাঝে মাঝে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিয়া তাহার অন্তরটাকে ব্যথিত করিয়া তুলিত। মহেন্দ্র বাবুর স্নেহ শান্ত বাক্যে তাহা ঢাকিয়া ফেলিলেও সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। মহেন্দ্র বাবু বলেন—"তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না, মানুষ যে মানুষের অদৃষ্ট গণনা করিয়া এত সুস্পষ্ট বলিয়া দিতে পারে তাহা একবারেই অসম্ভব। আর যদিই তা হয় ত তিনি পুরুষাকারের দ্বারা নিশ্চয়ই খণ্ডন করিতে পারিবেন। এত শীঘ্র সেটা ফলিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। অন্ততঃ তাঁহার এই সুস্থ সবল দেহে।

(৭)

তখন গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছেল। পল্লীগ্রামে সহরের ন্যায় অত্যধিক গ্রীষ্ম না থাকিলেও এক একটা দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেন আগুন বৃষ্টি করিয়া যাইতেছিল। এমনি একটা সময়ে ইন্দিরা হরির মাকে সঙ্গে লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটিতে পা দিয়া যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এবং তাহার মাতা যেখানে বসিয়া পূজা অর্চনা করিতেন, সেই তুলসীমঞ্চের নিকটে বসিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেও ইন্দিরা তাহার মাতার পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র কুটিরখানির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিগত জীবনের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি যে, এই কুটিরখানির সহিত বিজড়িত হইয়া আছে, সেখানেই সে যে আজন্ম পালিত হইয়াছে, কত হর্ষোচ্ছ্বাস, কত মর্ম্মবেদনা যে, তাহার ধুলিকণার মধ্যে নিহিত আছে, যাহা আজীবনের পরিচিত, তাহা কি দুই একদিনে সহজে বিস্মৃত হইতে পারে? তাই মহেন্দ্র বাবুর প্রকাণ্ড পুরী ত্যাগ করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া এই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র কুটীরখানিতে বাস করিত, এবং বৃহৎ অট্টালিকা অপেক্ষা, এইখানেই সে যেন বেশী আরাম বোধ করিত। আর একটা মাস, তার পরেই সে ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া সতরো বৎসরে প্রবেশ করিবে। তা হলেই আর কি? ভাবিয়া তাহার অন্তরতম স্থান হইতে আপনা হইতেই যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এমন ভাগ্য কি সে করিয়াছে! তাহার অদৃষ্টাকাশের তম-রাশি কাটিয়া গিয়া, সে সৌভাগ্য রবি কি উদিত হইবে? শুষ্ক প্রায় আশা লতাটিতে নব নব পত্র মুঞ্জরিত হইয়া কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার অদৃষ্ট-কানন সুশোভিত সৌরভময় করিয়া তুলিবে? সে ভাগ্য যে, সে করিয়া আসে নাই। একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অমনি দুইটি চোখের পাতা যেন অশ্রু সিক্ত হইয়া উঠিল। স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় কোনমতে সে তাহা রোধ করিয়া অন্যদিকে মন দিতে চেষ্টা করিতেছিল।

আজ প্রীতি ভোজ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া মোহিনী বাবু—মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গনে পা দিয়াই ডাকিলেন "মহেন কই হে?" মহেন্দ্র বাবু শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, ভিতর হইতেই ডাকিলেন "কে মোহিনী, আয় ভাই।" ঘরে ঢুকিয়াই মোহিনী বাবু কহিলেন "এমন সময়ে শুয়ে আছ যে? আজ আমার ওখানে নেমতন্ন, দুজনেরই বুঝ্‌লে।" "কিন্তু আমি ত ভাই আজ যেতে পারব না, আমার শরীরটে আজ তত ভাল নাই, শেষে ত খুবই হচ্চে রে! কিন্তু আজ কাল আবার শরীরের দিকে একটু বেশী মন দিতে হয়েচে কিনা। তা ভাই সেজন্যে শ্রীশ্‌ফুলকে দুঃখ করতে নিষেধ করে দিস্ বুঝলি।" একটুখানি থামিয়া আবার আপনা হইতেই কহিলেন "আমি আর এক দিন খেয়ে আসবো 'খন, আজ ইন্দুকে নিয়ে যা, তাহলেই দুজনকে খাওয়ানর ফল হবে,

আমার শরীরটে নিতান্তই খারাপ, নইলে আমিও যেতুম।" ক্ষুণ্ণ স্বরে মোহিনী বাবু—"কি হয়েচে তোর?" বলিয়া গায়ে হাত দিয়া—"তাই ত গাটা একটু গরম ঠেক্‌ছে যেন, কাজ নেই ভাই যে দিন-সময় পড়েছে। কিন্তু শ্রীশ ফুলকে পাঠিয়ে দিস্ আমি গাড়ী পাঠাব,।" বলিয়া তিনি গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বাবু ডাকিয়া বলিলেন "হাঁ সে আর বল্‌তে হবে না তুই যা।"

ইন্দু রান্নাঘর হইতে তাঁহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। শরীর অসুস্থ, কথাটা শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। হস্তের কাজ দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল, এবং মহেন্দ্র বাবুর ললাটে হস্ত রাখিয়া কহিল "উঃ তাই ত, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে যে।" বলিয়া ভীত চকিত নেত্রে মহেন্দ্র বাবুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল "তুমি আমার যাওয়ার কথা ওঁকে আবার কেন বল্লে? আমি ত যেতে পারব না।"

মহেন্দ্র বাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল "কেন?"

"তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে?"

"তাতে কি? আমি ত আর এক দণ্ডেই মরে যাব না।" ইন্দিরা অন্তরে যেন শিহরিয়া উঠিল, ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল 'আহা কথার ছিরি দেখ না, তা হ'লেও আমি যাব না কিন্তু।"

"না ইন্দু সে হবে না, আমি এখনও অনেক দিন বাঁচবো, তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি যাও।" বলিয়া আপনার শরীরের প্রতি এক বার দৃষ্টি করিয়া আবারও কহিল "এ শরীর শীগ্‌গির ভাঙ্‌চে না, তুমি একটুতেই ভয় পাও কেন বল ত?"

তবুও আমি যাব না, হরির মা গিয়ে বলে আসুক।"

"ছি, ইন্দু তা হয় না, আমাদের জন্যেই তাদের এই আয়োজন, শ্রীশ্ ফুল তাহলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবেন, তুমি মিছে ভয় করছো, আমার তেমন কিছুই হয় নি ত।" বলিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া ললাটে চুম্বন করিলেন। ইন্দিরা কিন্তু সেকথা শুনিল না, ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ঔষধ পথ্যের কোনও ত্রুটি হইল না, তার উপর ইন্দিরার প্রাণপণ শুশ্রূষা, তবুও কিন্তু জ্বর প্রতি দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যেন শয্যার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। ইন্দিরা তাহা লক্ষ্য করিল। রোগ যে চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে ইন্দিরার বিলম্ব হইল না। তবুও কিন্তু সে আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। হায়, আশা না মিটিতেই যে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে, নিষ্ঠুর ভাগ্য যেন মোহময় সুখ স্বপ্নের মতই তাহাকে ভ্রুভঙ্গি করিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। স্বামীর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়া সে তীব্র বেদনায় দগ্ধ হইতেছিল।

শশব্যস্তে মোহিনী বাবু ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীশ্ ফুল, এখন কেমন দেখ্‌চো?" বিবর্ণ মুখে, তাহার বড় বড় কালো চক্ষু দুইটি মোহিনী বাবুর মুখের উপর স্থাপিত রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল "দেখুন" সহসা তাহার দুইটি চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কি নিরাশার সে চিত্র, কি বিষাদময়ী সে মূর্ত্তি! সেদিকে মোহিনী বাবু অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন "একটু সারলেই বায়ু পরিবর্ত্তন-ব্যবস্থা করা যাবে, তা হলেই সেরে যাবে এখন, ডাক্তারবাবু ত খুবই আশা দিয়ে গেলেন, ভয় কি শ্রীশ্ ফুল।"

ইন্দিরা শুধু একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন কথা বলিল না।

কি বলিবে সে—এসবই ত তার দগ্ধ অদৃষ্টের ফল! নহিলে এমন সুস্থ সবল দেহ, বৎসর অতীত হইতে না হইতে এমন কঠিন রোগাক্রান্ত হইবে কেন? রুগ্ন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে—প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। হায়, সে

যদি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিত, তাহলে ত আজ এই মর্ম্মভেদী তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে হইত না। সেজ্বালা যে ইহাপেক্ষা ঢের ভালো ছিল। তবু ত দিনান্তেও সে এক বার তাঁর মুখখানি দেখিতে পাইত। একটা নৈরাশ্যের হা হা রব যেন তাহার সমস্ত হৃদয়টা ছাপাইয়া উঠিল। রুদ্ধ অশ্রুরাশি প্রস্রবণের ন্যায় ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মহেন্দ্র বাবু চক্ষু মেলিয়া পত্নীর মুখের উপর ম্লান দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "ইন্দু এমনি কোরে দিবারাত্রি কি নিজের শরীরটাও ভেঙ্গে ফেল্‌বে? আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবো ভয় কি তোমার! একটু এই বিছানার পাশেই শোও দেখি।" এক নিঃশ্বাসে এই কথা গুলি বলিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া পাড়লেন। একটুখানি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতখানি বাড়াইয়া পত্নীর কম্পিত হস্তখানি ধরিয়া আপনার রক্তশূন্য ওষ্ঠের উপরে চাপিয়া ধরিলেন। "ছি ইন্দু তুমি কাঁদ্‌চো?" বলিয়া একবার তাঁহার সেই ম্লান বিবর্ণ মুখে মুহূর্ত্তের জন্য হসিতে চেষ্টা করিলেন। দিবসের শেষ রক্ত আভাটুকুর মত, মুমূর্ষুর ম্লান হাসিটুকু যেন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। ইন্দিরা দুই বাহুর স্নেহ-নিবিড় বেষ্টনে স্বামীর চৈতন্যহীন দেহটাকে সাবধানে জড়াইয়া ধরিয়া কপোল-তলে কপোল রাখিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় বলিল "ওগো তুমি সেরে ওঠ, আমাকে একলা ফেলে যেও না, আমার যে তিন কুলে কেউ নাই গো, ভাগ্যহীনা দেখেও যে তুমি ঘৃণাভরে পায়ে ঠেল নি, দয়া করে বুকে তুলে নিয়েছিলে।"

শ্রীমতী শরদিন্দু দাসী।

প্রভাতী।

—:*:—

ওগো উষার উদয়-অরুণ
সোনার শতদল,
নীল-সাগরের ফুল তুমি গো
অম্লান উজ্জ্বল!

অন্ধকারের বন্ধ টুটে
কি আনন্দে উঠ্‌লে ফুটে,
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলে
আলোর শতদল!
নীল-সাগরের ফুল তুমি গো
অম্লান উজ্জ্বল!

সৌরভে প্রাণ আকুল হ'ল,
উঠ্‌লো গেয়ে পাখী ;
ফুলের ভারে পড়্‌লো নুয়ে
বনের যত শাখী !
তোমার পানে চেয়ে ছিলাম,
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম !
মাথার 'পরে কাহার আশীষ
ঝরলো অবিরল !
ওগো উষার উদয়-অরুণ
সোনার শতদল।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য শিল্প প্রদর্শনীর দশম অধিবেশন।

-:*:-

আমরা এবার প্রাচ্য-শিল্প প্রদর্শনীর দশম অধিবেশন দেখতে গিয়েছিলুম। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এই শিল্প-সভার পূর্ব্বের সকল প্রদর্শনীতেই উপস্থিত ছিলুম ; এখন সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের যেটুকু বলবার অধিকার জন্মেছে সেইটুকু মাত্র বলতে যাচ্ছি। এবারও ধর্ম্মসমবায়ের দ্বিতলে একটি হলে একজিবিসান খোলা হয়েচে। হলে প্রবেশ করবার পথে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কতগুলি ভাস্কর্য্য রাখা আছে। সেগুলি সবই ইংরোপীয় পদ্ধতিতে গঠিত, প্রাচ্যশিল্প-প্রদর্শনীতে সেগুলি খাপ খায় নি বলে আমাদের বিশ্বাস কিন্তু সেগুলি শিল্পকলার আসরে স্থান পাবার যোগ্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। ভি, পি, কার্ম্মাকার রচিত স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিমূর্ত্তিটি আমাদের মন্দ লাগেনি। তাছাড়া শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী রচিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের ব্রঞ্জের প্রতিকৃতি এবং বিড়াল ছানা কোলে একটি শিশুর মূর্ত্তি, এই দুইটি উৎকৃষ্ট রচনা। শিশুর হাসিটি বড়ই মধুর ফুটে উঠেচে।

চিত্র-শিল্প প্রদর্শনী গৃহে আমাদের প্রথমেই দুখানি জাপানী সিল্কের বড় চিত্র চোখে পড়লো। এই ছবি দুখানির বিষয় আমাদের সবিশেষ জানা না থাকলেও চিত্র রচয়িতাকে শতমুখে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। চিত্র দুখানি ভাল জহুরীর দ্বারা যাচাই হবার উপযুক্ত ; আমাদের সেগুলির বিষয় বেশী কিছু না বলাই ভাল মনে করি।

প্রাচ্যশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবারকার চিত্রগুলিতে একটি মুক্তির ভাব আছে, তাতে রঙ্গের চটক্ বা রেখার বাহুল্য নেই ; কিন্তু তবুও সব ছবিগুলিতেই দেখবার চেয়ে ভাববার কথাই যেন বেশী করে মনে পড়িয়ে দেয়। অবনীন্দ্র বাবু প্রস্ফুটিত চেরী গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুল পাখীটি এঁকে আমাদের চেরী গাছের গান না বোঝালেও তাঁর গাছের চিত্রটিতেই যেন সঙ্গীতের রস মাখান আছে বেশ বোঝা যায়। কুয়াসার ছবিটিতে স্বভাবের নগ্নতার উপর কুয়াশার আবরণের একটা হেঁয়ালীর কথা স্বতঃই মনে হয়। অনেকে বলেন যে চিত্রকলাতে অসীমের কাব্য ও সঙ্গীতের মত অসীমের ভাবে আনা যায় না। তাঁরা যদি অবনীন্দ্র বাবুর 'এসিয়ার আলো' চিত্রখানি দেখেন, তা হলে দেখবেন যে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের পরে তাঁর জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে যে এক অনির্ব্বচনীয় দেবভাব ফুটে উঠেচে, তার উপর আকাশ থেকে অনন্তের অসীম আলো যেন আশীর্ব্বাদের মত বর্ষণ হচ্চে। অনন্তের আভাষ দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। হিমালয়ের চিত্রগুলি আমাদের তত মনে লাগেনি। নন্দলাল বসুর ঝড়ের ছবিটি একটি শিল্প প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র। প্রথমে ছবিখানিকে একটা হেঁয়ালি বলে মনে হয়। প্রথমে ছবিটা চোখেই পড়ে না মনে হয় যেন চিনা হরফের মত অচেনা একটা কিছু। পরে দেখতে দেখতে দেখা গেল কোনারক মন্দিরের দ্বিতল কার্ণিসের উপর যে কতগুলি সারি সারি পাথরের মূর্ত্তি আছে—কোনটি কর্ত্তাল বাজাচ্চে—কোনটি বা বাঁশী, কেউবা ঢোল—এই ছবিটিতে সেই বিরাট ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষের উপর প্রকৃতির দৌরাত্ম্য দেখান হয়েচে। নন্দবাবুর এই ছবিটিতেও অবনীন্দ্র বাবুর এসিয়ার আলোর ছবির মত দর্শকের মনে অনন্তের ভাব জাগিয়ে তোলে। নন্দবাবুর বনে হারানো গাভীর ছবিটি একখানি আশ্চর্য্য রচনা। এটিকে শুধু বাঙলা দেশের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি অনুসারে আঁকা বলেই যে আমাদের ভাল লাগে তা নয়, এটিতে একটি সহজ ছন্দ (Rythem) একটি গতি (movement) বা ভাবের সঙ্গে দেখানো হয়েচে তা অল্প ছবিতেই পাওয়া যায়। নন্দবাবুর এবারে দুঃখের বিষয় খুব কম ছবিই প্রদর্শনীতে দেখতে পেলুম। শারদশ্রী একটি আলঙ্কারিক পরিকল্পনা (decorative design) শরৎ-লক্ষ্মীর শুভশ্রী অমল-ধবল মেঘের মধ্যে যেমন ফুটে ওঠে এটিতে সেই রসটির সন্ধান পাওয়া যায়। গোচারণ, শীত ও বসন্ত নন্দলাল বাবুর অপর ৩টি রচনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কুলির শববাহন চিত্রখানি এবং বাঙলার আটখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবারকার শ্রেষ্ঠ রচনা, এগুলির প্রত্যেকটির বিশদভাবে বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সময় ও স্থানাভাবে বলা গেল না। গগনেন্দ্র বাবুকেই আমরা জনকোলাহল বা ভীড়ের ছবি আঁকতে দেখি, অপর আধুনিক শিল্পীরা বড়ই একলা একলা ভাবের চিত্রই এঁকে থাকেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার ছবিটিতে কবিবরকে সামনাসামনি না দেখতে পেলেও ছবিটিতে তাঁকে সহজেই চেনা যায়। এই ছবিটিতে চন্দ্রাতপের উপর থেকে একটা যে শুভ্র আলোকপাত এবং পটভূমিতে (back ground) অসংখ্য জন-কোলাহলের ভাব শিল্পী দেখিয়েচেন তাতে ভাবুক দর্শকের মনে অনেক গভীর ভাব জাগিয়ে তোলবার সম্ভাবনা। দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী একটি নবীন শিল্পী। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যম ও উৎসাহ খুবই প্রশংসার্হ। তাঁর চিত্রগুলিতে যদিও তাঁর শিক্ষকের হাতের পরিচয় পাওয়া যায় তবুও নবীন শিল্পীর উদ্যমকে প্রশংসাই করতে হয়। নরেন্দ্রনাথের 'বাউল' নন্দলাল বসুর চিত্রের নকল, সিল্কের উপর বড়করে আঁকা। তা ছাড়া 'রাখাল' এবং 'সকাল'। সকালের পদ্মগুলি জাপানী পদ্ম-চিত্রের নকল যদিও তা প্রদর্শনীর তালিকায় ভুলক্রমে উল্লেখকরা হয়নি। ক্ষীতিন্দ্রনাথ মজুমদার একটি শিল্পী যাঁর চিত্রে আমরা একটি নিজস্ব ধরণ (style) দেখতে পাই যেটা মোগল চিত্র, অজন্তা চিত্র ও আধুনিক চিত্রের মাঝামাঝি থেকে তৈরী। শিল্পীর অজ্ঞাতেই এইরূপ নিজস্ব শিল্প রচনাভঙ্গী গঠিত হয়ে থাকে। চাঁদের আলো

ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল, তা ছাড়া গনেশজননী ও মহাদেবের ও চৈতন্যদেবের ছবি। ক্ষিতিন্দ্রনাথের এবারকার চৈতন্যের ছবিটি তাঁর রচিত পূর্ব্বের চৈতন্যদেবের মত ভাল না হলেও এমন একটি ভক্তি রসাপ্লুত ভাব মাখান আছে যে ছবিটি বর্ণবাহুল্য হলেও সৌন্দর্য্যের হানি মোটেই হয় নি। একটী ময়ূর, গাছের ডালে বসে আছে—চৈতন্যদেব তারই পাশে আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করচেন। আনন্দ-নৃত্যের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গেও জীবের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ বড়ই মধুর ফুটেছে। শৈলেন্দ্রনাথ দে এবারে আমাদের কালিদাসের যে কয়েকটা মেঘদূতের ছবি দেখালেন এগুলি অনেক দিন আমাদের মনে থাকবে। ছবিগুলির রচনার ভিতর এমন একটা নির্ভীকতা ও সরলতা আছে যা এবারকার অন্যান্য প্রশংসাযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। অসিত কুমার হালদারের মানুষ, দুর্দ্দিন, নতুন-আলো, সরাই,আশীর্ব্বাদ, এই কয়েকটী চিত্র আছে। মশাল হাতে একটা তেজী মানুষের প্রকাণ্ড ছবিটি সিল্কের উপর আঁকা।

প্রতাপেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবজন্তুর কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেচেন। এই তরুণ শিল্পীর ছবিগুলিতে বেশ একটা নবীনতার গন্ধ আছে এবং সেই জন্যেই আমাদের মধুর লেগেছে। প্রতীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ animal pianter হবেন এরূপ আশা করা যায়। এইরূপে এক এক জন শিল্পী এক একটী বিষয় অভিজ্ঞ হওয়া মন্দ নয়। অনীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর একটি 'জগাই মাধাই'—তাও আবার নন্দলাল বাবুর নকল। আসল ছবি তাঁর কেন দেখলুম না জানি না। তাঁর হাত আছে ভবিষ্যতে তাঁর হাতের আসল ছবি আমরা দেখতে পেলে খুসী হব। শ্রীরমেশচন্দ্র বসুমজুমদার "শোকাতুরা" ছবিখানিতে শোকের ভাব এবং সেই সঙ্গে রঙের সরলতা মিলিয়ে খুবই সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। তাঁর জামদারী-কাছারী একটি ব্যঙ্গচিত্র। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে একজন পাইক জমিদারী কাছারীতে ধরে নিয়ে এসেচে, জমিদার ভুঁড়ি ও হুঁকো নিয়ে ব্যস্ত, স্তাবকেরা পাশে বসে খোসামোদ করচে, একখান সামাজিক শিক্ষাপ্রদ নাটকের মত দর্শক মাত্রকেই চমৎকৃত করে তোলে। দুঃখের বিষয় ছবিখানিতে তিনি রঙ দেন নি। বিপিনচন্দ্র দের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে 'কনের' ছবিটি আমাদের ভাল লেগেচে। এই ছবিটিতে একটি কনে রাঙা শাড়ী পরে জলা দেশে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নৌকায় চড়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্চে আঁকা হয়েছে। ঠাকুমার ছবিটিতে ঠাকুরমার মুখের খুসির ভাবটি বেশ কিন্তু মূর্ত্তি বিন্যাস (figure composition) ভাল হওয়ায় নি বলে মনে হয়। আলপনা ছবিটি অবনী বাবুর পার্ব্বণীতে প্রকাশিত ছবিটির কথা মনে পাড়য়ে দেয়। সত্যেন্দ্রনারায়ণ দত্তের কয়েকটি ছবি আছে। অশ্বিনীকুমার রায়ের খেলার সাথী। একটি ছেলে হামা দিয়ে বাছুরের সঙ্গে খেলা করচে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ঠিক বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ের ভাব মনে জাগিয়ে দেয়। চারু রায়ের এবারে মোট দুখানি চিত্র, তাও উল্লেখযোগ্য নয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের রাধাকৃষ্ণের কয়েকটি ছবি ভারি চমৎকার। এই শিল্পী মোগল শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

কাগজে দেখলুম কোন সুধীব্যক্তি দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ছবির ভিতর বিলাতিভাব আছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেচেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বিংশশতাব্দীতে শিল্পীরা যদি বিলাতি শিল্প-রীতি জেনে এরা নিজের দেশীয় রীতির অভিজ্ঞতার দ্বারা দেশের শিল্পকে জাগাতে চান তাতে শিল্পকলার উন্নতি অনিবার্য্য কিন্তু এ কার্য্যটি অবশ্য ওস্তাদ শিল্পীর পক্ষেই সহজ ও ভাল পথ। নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্ধ-অনুকরণ করাতে বিপদে পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা। নবীন শিল্পী দুর্গাশঙ্কর বাবুর চিত্রগুলিতে আমরা প্রবীণ শিল্পীদের হাতের পরিচয় যথেষ্ট পেলুম এবং এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান অন্তরায়। নচেৎ এবারে তাঁর চিত্র অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীদের চেয়ে ভালই হয়েছিল। কৃষ্ণচূড়া এবং বাঁশরী নামক দুখানি ছবি প্রদর্শনীর তালিকা ছাড়াও আছে। এই দুইখানি দুর্গাশঙ্কর

বাবুর নবীন হাতের নবীনতারই পরিচয় দেয়। দুর্গেশচন্দ্র সিংহকে আমরা ওস্তাদ শিল্পীদের দলের একজন বলে জানতুম তাঁর হাতে এত কাঁচা কাজ আশা করি নাই। নটেশনের আঁকা "কোনার্ক" "ঝরণা"। সি, কে, কে ওয়ারিশ এর 'সাপ পূজা ও অন্যান্য কতকগুলি চিত্র আছে, অজন্তার ছবির নকলটি বেশ হয়েছে। সারদাচরণ উকীলের নাম অনেকেই জানেন, তাঁর কিন্তু এবারে বেশী ভাল ছবি দেখলুম না। তবে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ছবিটি ভাল ছবি। কূপের ধারে চিত্রটির বর্ণবিন্যাস ও আঁকার ধরণ একেবারে বিলাতির অনুরূপ। হাকিম খাঁর গ্রীষ্মকাল একটি মাত্র ছবি। দুঃখের বিষয় পাখা হাতে মহিলাটির গহনাগুলি একেবারে হালফ্যাসানের কুৎসিৎ গহনার মত চোখের পীড়া দেয়। দেবীপ্রসাদের Homeward bound ছবিটি জ্ঞাতানুসারে বিলাতি ছবির নকল না হলেও বড়ই বিলাতি-প্রাচ্য-শিল্প প্রদর্শনীর যোগ্য নয়। 'হোলি খেলার' চিত্রটিতে মূর্ত্তিবিন্যাস (figure composition) প্রশংসা করবার না থাকলেও ছবিটি দেখবার মাত্র ভাল লাগে। ও, সি, গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাধিকা' একটি শোচনীয় চিত্র। রাধার মাথায় খোঁপা, গহনা ও পরিচ্ছদ বাঙালী বাড়ীর গৃহিণীর কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। গাছের আড়ে শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিৎ চেহারা ও রাধার স্থূল বিকলাঙ্গ আমাদের চিত্রকলার প্রতি বিতৃষ্ণাই জন্মিয়ে দেয়। এবারে তাঁর "বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির উৎপত্তির কারণ" ছবিটির পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি তিনি যা এঁকেচেন সেটি বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কতদূর সঙ্গত হয়েচে বলা যায় না। বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের কেশের বর্ণ নীল, দেহের বর্ণ কাঞ্চনময়, ঠোঁট লাল, বসন পীত প্রভৃতি অনেক বিষয় বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা আছে। ছবিতে এগুলি না জেনে আঁকতে গেলে বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধমূর্ত্তি অন্য কোন মূর্ত্তি বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা। এখানে আমাদের বলা প্রয়োজন বোধকরি যে শিল্পী শ্রীযুক্ত ও, সি, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যদি রেখাকৌশল ভালরূপে আয়ত্ত করে ছবি আঁকেন তবেই তিনি যথার্থ শিল্পী হতে পারবেন। এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায় বসন্তের ছবিটি সুরেন্দ্রনাথ করের "বসন্তের" ছবিটি থেকে ভাব গ্রহণ করে আঁকলেও আমাদের ভাল লাগল। সাজাহানের বন্দী অবস্থার ছবিটি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমোদ গঙ্গোপাধ্যায় একটি উদীয়মান শিল্পী। নিরঞ্জন সেনের চিন্তা, ও পারঘাটের ছবি দুখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদ্মকন্যা ছবিটির অসামঞ্জস্যতার কারণ এই যে একটি সুকোমল পদ্মের উপর একটি ওড়নাপরা গহনাপরা স্থূলকায়া রমণী মূর্ত্তির অবস্থান। পাগল ছবিটি বাহুল্য বর্জ্জিত ভাল ছবি।

বীরেশ্বর সেনের অনেকগুলি ব্যঙ্গচিত্র আছে। আমরা সেগুলির প্রশংসা করি। শিকারী ও ঝরণার ধারে ছবি দুখানি দুর্ভাগ্যবশত Edmand Dulac ও Duras এর আঁকার পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ বলে মনে হয়। "উর্ব্বশীর জন্ম" ছবিটিতে মেঘকে এরূপ 'অক্‌টোপাসের' মত ঘোরালো পেঁচালো করে আঁকার স্বার্থকতা কি বুঝি না। তবে আলঙ্কারিক হিসাবে মন্দ হয় নি। যাইহোক বীরেশ্বর বাবু যে বাঁধাবাঁধি পথ না মেনে পথ কেটে চলবার চেষ্টা করচেন, এতে তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়। শ্রীমতী প্রতীমা দেবীর 'স্তনটানা' ওস্তাদ শিল্পীর হাতের কাজের মত পাকা রচনা। শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর রেখাঙ্কণ কৌশল আমাদের খুবই ভাল লাগে।

পরিশেষে শ্রীমতী সরলা দাসী, রচিত 'পরশুরাম' ও 'মা ও ছেলে' সেগুন কাঠে খোদাইকরা দুটি—সুন্দর মূর্ত্তির কথা না উল্লেখ করে শেষ করতে পারলুম না।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

প্রদীপ।

—:*:—

নহ তুমি রাজরাণী চিরসুখ নিলীনা,
কৃষকের বধূ তুমি আভরণ বিহীনা!
সভাতলে জ্বলনাক রূপরাশি বিলায়ে,
গৃহবধূ থাক তুমি গৃহকোণে মিলায়ে!
মলিন আঁচর তলে সরমেতে জ্বলিয়া
দীনের কুটীর তুমি থাকগো উজলিয়া!
গরীবের বধূ তুমি শঙ্কিতা সরমে!
বাতাসেরও পরশেতে মরে যাও মরমে!
দেবসেবা কর তুমি তুলসীর মূলেতে!
ঠাঁই পাও সমাদরে দেবের দেউলেতে!
আকাশ-প্রদীপ হয়ে আকাশেতে উঠিয়া
দেবতার শুভাশীষ লও দেবি লুটিয়া!
মৃন্ময়ি দেবি অয়ি এমনই জ্বলিয়া,
দীনের কুটীর থেকো চিরই উজলিয়া!

"বনফুল"

মানব সাধনার চরম বাণী।

—:*:—

"মনে হয় কি একটী শেষ কথা আছে,
সেইটী হইলে বলা সব বলা হয়;
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে,
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে—
সেকথা শুনিতে সবে আছে আশা করি'
মানুষ এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে!"—রবীন্দ্রনাথ।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধ যে পংক্তি কতিপয় আজ মাথায় করে' দাঁড়াচ্ছে, কিছুদিন আগে আর একটী প্রবন্ধ তা' বুকে রেখে বলেছিল "কে বল্‌তে পারে, কোন্ medium-কে আশ্রয় করে' সেই last words প্রকাশ পাবে যা' শুনে মানবজগতের মনের চেহারা বিলকুল বদল হয়ে যাবে," আর সেই সঙ্গে এ-ইঙ্গিতও ব্যক্ত করেছিল যে কবির সমস্ত হৃদয় যে কথার সন্ধানে ফিরছে তাকে প্রকাশ করবার গৌরবও তিনিই ভবিষ্যতে বহন করবেন। কিন্তু "At the cross roads" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে কবি স্পষ্টাক্ষরে স্বীয় অক্ষমতা জানিয়া বললেন যে জগত এমন এক শিশুর জন্ম-প্রতীক্ষায় আছে যার আধ্যাত্ম-চেতনা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সজাগ হবে এবং তিনি যা' করতে ব্যর্থকাম হলেন তা' অবলীলাক্রমেই করে যাবে। কবির উদ্দিষ্ট ভাব-শিশু যদি এতদিনে জন্মে থাকে, তবে তার message নিশ্চয়ই কবিগুরুর হস্তগত হয়েছে; ইতিমধ্যে আমরা যে বাণীর সন্ধান পেয়েছি, তার উল্লেখ অনাবশ্যক হবে না,—কেননা তা' শুন্‌লে মানুষ ঘরে না ফিরুক, পথে বেরুতে পারবে। উল্টো ফলের কথা বলছি এইজন্যে যে এ-প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাবার বাহাদুরী প্রকাশ করতে পারায় স্বভাবতই তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী, অধিকন্তু ও-সাধনার ধারাকে পেছিয়ে না দিয়ে অগ্রসর করে' দেবার উচ্চাভিলাষও যে রাখে না, একথা বল্‌লে মিছে কথা বলা হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ব্যাপারের কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটায় আমার অসংখ্য গুরুর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখেছিলুম—'Who aimeth at the sky, shoots higher than he that means a tree'—কিন্তু আজ আর কারুর সঙ্গেই আমার কিছু মাত্র মতভেদ নেই, কেননা ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পোলিটিক্যাল বহির্বিদ্রোহ ও ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মক্ষেত্রের ফিলজফিক অন্তর্বিদ্রোহ, এই পরস্পর বিরোধী ব্যাপারের সমকালীন অরণি সংঘর্ষণে সর্ব্বাবরোধের চরম-সমন্বয়-বাণী আমার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছে। কিছু কাল যে অগ্নির জ্বলন্ত-শিখার শক্তিতে অনেক বন্ধুবান্ধবকে ব্যথিত করতে বাধ্য হয়েছি, আজ তার শান্ত-শীতল আলোক-প্রভা ভারতবর্ষীয় নব-ব্রাহ্মণ-সমাজ বা লেখকমণ্ডলীর পদপ্রান্তে পৌঁছে দিতে দাঁড়িয়েছি। দুঃখ যে মানুষকে কত সহজে সংশোধন করে, তা' নিজের জীবন দিয়ে সব চেয়ে ভাল জানি বলেই অপরকে দুঃখু দিতে আমি ভয় পাইনি,—তবু যাঁদের অন্তরে আঘাত করে' বারংবার নিজেকেও কাঁদিয়েছি তাঁরা আজ আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্ত্তির জয়গান করে' অনেকেরই কাছে আমি প্রহেলিকাবৎ হয়ে আছি—কিন্তু প্রহেলিকা এর মধ্যে কিছুই নেই—আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেমের স্বচ্ছ মুকুর-সম্মুখে যে যেভাবে দেখা দেয়, মুকুরও তাকে ঠিক্ সেই ভাবই প্রত্যর্পণ করে' থাকে। প্রমথ বাবুর বৃত্তাকার শিল্প-চাতুর্য্য সকল-মতেই মত দিয়ে নিজেকে সকলেরই সমান বুদ্ধিমান মনে করাতে চেয়েছিল,- রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্যও অগত্যা তাঁর শিষ্যোত্তমের সাহিত্যের স্কন্ধে চরম সদর্থ আরোপ করে' তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবারই চেষ্টা করে' এসেছে। শিবের যখন মাথা ঘোরে, সুদর্শন-চক্রও তখন ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে—কেন যে এটা হয় তা' বলা যায় না, তবে হয় এরকম। 'চার-ইয়ারি'-সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে' এ-নাগাদ যতগুলি প্রবন্ধ ও চিঠি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তা' ঠিক পর পর পড়ে এসে এ-প্রবন্ধ পড়লে এবং এ-প্রবন্ধ পড়ে সেগুলি আর একবার পড়লে সকলেই তাদের যথার্থ অর্থে চিনে নিতে পারবেন। কিন্তু সে যাই হোক্, প্রমথনাথের শিষ্যত্ব-স্বীকার আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল এবং তাতে আমি যথেষ্ট উপকৃতও হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাপ্যের চেয়ে উপরি-প্রাপ্যে মানুষের মমতা বেশী; একথা যদি সত্য হয়, তা' হলে গুরুর চেয়ে উপগুরুর

প্রতি টান বেশী দেখিয়ে নিশ্চয়ই আমি অমানুষের কাজ করিনি। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে; রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, তাঁর সার্টিফিকেটের শাসনে, শিশু থেকে আরম্ভ করে' অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তো চোখ বুজে করতে পারে,—ও-সার্টিফিকেটকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে তাঁর নিন্দা করতে পারে এবং সার্টিফিকেট-বিহীনের উচ্চপ্রশংসা করে' লোককে দাবিয়ে দমিয়ে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারাতেই তো কেরামতির পরিচয়। আপনারা আপনাপন মনকে জিজ্ঞাসা করে' ঠিক বলুন দেখি—এ পরিচয় আমি দিতে পেরেছি কি না?

জানি, আপনারা সব প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে আমাকে একটুও প্রশংসা করবেন না। বেশ, আমিও কারুর প্রশংসার কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখিনে—আপনাদেরও নয়, আপনাদের রবীন্দ্রনাথেরও নয়, প্রমথনাথেরও নয়। তাঁদের সার্টিফিকেট দরকার হলে, অন্যের দেওয়া টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে আমার কাছে ছুটে আসবেন ভালবাসা নিতে ও ভক্তি দিতে।

কিন্তু না, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে যেন আমি ইচ্ছা করলেই প্রমথবাবুর "গুরুমারা বিদ্যের" দোহাই দিয়ে এক ঢিলে এই যুগল-গুরু-হত্যা করে' তাঁদের আসনে পাকা হয়ে বসতে পারি। কিন্তু সত্য কথা এই যে সে দুরভিসন্ধি আমার নেই। প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জানেন কিনা বলতে পারি নে যে আমার অপূর্ব্ব গুরুকরণের নজির হচ্ছে এই :—

"নমস্কার অতীতের মহাত্মা মহর্ষিগণ,
দীক্ষাগুরু যোগীন্দ্র নারদ,
নমস্কার হে রবীন্দ্র! যাঁর হরিনাম বীণে
উথলিছে শত-চিত্তহ্রদ—
নমস্কার মানবের যত হিতকামীগণ! তথাপি বিদায় চাহি আজ,
মৃদঙ্গ-বাঁশরী সুরে ছড়ানো জড়ানো হৃদি মুক্ত হোক্ বিশ্বরঙ্গমাঝ,
যাঁর নামে শতবীণা ঝঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ চাহে, নাহি চায় চরম বিরাম
ঘুমের আরাম;—
হোক সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে
বুঝি নাই যারে;
খুঁজে লব প্রাণ হতে তারে"—প্রাণ ও প্রকৃতি (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৯)

এখন জিজ্ঞাস্য—খুঁজে কিছু পেয়েছি কি? উত্তর—অবশ্য, Law of spirit কে পাওয়া গিয়াছে।

কি সে Law?

সেই কথাই বলতে দাঁড়িয়েছি—অতএব ক্রমশঃ বলেছি :—

(২)

পৌষ-সংখ্যা 'সাহিত্য' সেদিন লিখেছি—"Law of Gravitation যেমন আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বেও ছিল এবং মানবজাতি বুদ্ধি-বিচ্যুত হবার পরও থাকবে, Law of spirit বা আর্টও তেমনি কবিবুলের জন্ম পূর্ব্ব থেকেই

আছে এবং ও-বংশ নির্ব্বংশ হয়ে যাবার পরও থাকবে। কোন্ কবি কি পরিমাণে এই Lawকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন সেইটুকু মাত্র তাঁদের কেতাব পড়ে আমরা জানতে পারি—অবশ্য যদি সে-নিয়ম আমাদের মধ্যে থাকে।"

অপর পক্ষে;—

পৌষ-সংখ্যা 'মালঞ্চে' Sex problem সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছি তাতে বলছি—"আত্মার অভাবের নামই প্রেম বা প্রেমের অভাবের নামই আত্মা নয়; প্রেম আত্মারই স্বভাব। এই প্রেমকে নিজের মধ্যে পাবার পর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোনো বালাই আর থাকতেই পারে না, কিন্তু তারপর মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাটা সহজেই এসে পড়ে। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সাহায্যে প্রেমকে যথাযথ-ভাবে চালনা করবার শক্তি তখন অনায়াসেই হয়ে আসে।"

উক্ত উক্তির যুগল-মূর্ত্তিতে দেখা যাবে যে প্রথমটীতে যাকে 'আত্মা ও নিয়ম' বলা আছে, দ্বিতীয়টীতে তাকে 'প্রেম ও কর্ত্তব্য' নামে চিহ্নিত করা গিয়াছে—প্রথমটী হচ্ছে পুরুষ আর দ্বিতীয়টী স্ত্রী। কিন্তু 'মালঞ্চে' আমি কর্ত্তব্যের বা lawএর internal দিকটী চেপে external দিকে পাঠকদের মনকে চালিয়ে দিয়েছি. কেননা, তখনও নারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে দেবার সময় আসেনি। পূর্ব্বেই 'পরিচারিকায়' বলেছি যে মানব চিত্ত-এস্রাজের কর্ণ মর্দ্দন করে' তার তন্ত্রীগুলিকে পর্দ্দায়-পর্দ্দায় বেঁধে তুলতে চাওয়াই নিপুণ শিল্পীর কাজ—আর বলিনি যা তা হচ্ছে এই যে জীবন-শিল্প-সৃজনে আমার স্বহস্ত আমার গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের চেয়ে যে অনেক বেশী পাকা, এ-বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, আমার নিজের এক বিন্দুও নেই। প্রকৃত পক্ষে, একটা হওয়াও দরকার; কেননা, গুরুর চেয়ে শিষ্য দড় না হলে তাঁর স্বরূপকে পরিচিত করবে কে?

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে দম্ভ আর গলাবাজি করেই আমি জয়ী হয়ে চলেছি—নইলে 'Law of spirit' 'Duty of love' ইত্যাদি মামুলি কথাই তো আউড়ে চলেছি—law বা dutyটা যে কি, তা তো কৈ বলছিনে!

বটে!—তবে,

প্রকৃতি ঘোমটা খোল, দেখাও সহজ সত্য
রেখেছ যা' আবরণে ঢাকি
লুকায়ে স্বরূপ, ছি ছি, কেন গো আকুল কর
চিত্তপটে মায়াচিত্র আঁকি
এ-প্রাণ পুরুষ আজি তোমার ঘোমটা দেখি স্বহস্তে সরায়ে দিতে চায়—
বিশ্বজন সভা-মাঝে, অয়ি মোর প্রিয়তমা, হাসিমুখে বাহিরিয়া আয়,
শ্লোকের উপরে শ্লোক বর্ষে বর্ষে জমিয়াছে, শাস্ত্রে রুদ্ধ সাধনার পথ,
এই আবর্জ্জনা ভেদি' চলিল ছুটিয়া তবে সুনির্ম্মল রশ্মি-রেখাবৎ
দীপ্ত মনোরথ!—
চিরপ্রেমময়ি অয়ি! ধরিয়া ফেলেছি তোরে, আর কোথা যাবি—
এই দেখ প্রাণে মোর ঝুলিতেছে চাব!...

প্রশ্ন শুনছি—কৈ, দেখাও দেখি চাবি ? ...

দেখবে ? বেশ, তবে বেড়িয়ে পড় এই দীন-দরিদ্র ভারত-পল্লীপ্রান্তের চির-কিশোর প্রাণ থেকে সেই অপরাভূত পরাক্রম ঐন্দ্রজালিক চাবি যার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সাধক-চরিত্রের অ- ব্র কলঙ্ক-কালিমা মুহূর্ত্তে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে,--যার অদম্য মন্ত্রশক্তি এই তমসাচ্ছন্ন মানব বাসভূমিকে কলির অধিকার থেকে আত্মতেজে ছিনিয়ে নিয়ে সত্যলোকের নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও অপাপবিদ্ধ সপ্তম-স্বর্গে চক্ষের নিমেষে উন্নীত করে ধরতে পারে. বেড়িয়ে পড়, বেড়িয়ে পড় আমার প্রাণের প্রতিভায় অর্থময় চিরপুরাতন নবীন বাণী. ভগবদ্গীতার অন্তরাত্মা, রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত ভগবান অতীত ভারতবর্ষে পতিতোদ্ধার-দক্ষ মহাতপস্যার জগত-বিস্ময়কর ফল,—

বল, হে আমার জীবন-গীতার চরম আর্টিষ্ট. বল এই যোগসিদ্ধ দেহমন্দির-অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের আত্মাসমষ্টিকে আকৃষ্ট করে' জলদগম্ভীর বজ্রগর্জ্জনে সেই জ্যোতিস্মণ্ডিত পুণ্যবাণী—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহং"

জানিয়ে দাও সকলকে যে এই হচ্ছে 'প্রাণের নিয়ম', 'প্রেমের নিয়ম' দৃশ্যমান্ বিশ্ব-মর্ম্মের 'কেন্দ্রীয় নিয়ম', যাতে আত্মসমর্পণ করলে নরনারী যেখানে যা করুক্, তোমারই আদেশ প্রতিপালন করবে, তোমারই চিরগৌরবান্বিত জয়পতাকাকে বহন করবে। বৈরাগ্যের পথই প্রেমের পথ,—কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এই বৈরাগ্যই তার অচল শিখা জ্বালিয়ে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছে; রবীন্দ্রনাথের "বিজয়-গৌরব" এই বৈরাগ্যেরই দাস, আর আদর্শ নারীরা কবির ঐ বৈরাগ্য-শিখায় তাদের প্রেমের হবি-পাত্র প্রফুল্ল-চিত্তে উজাড় করে' দিয়ে স শিখাকে হোমাগ্নি-শিখায় পরিণত করেছে।

যাও তবে আমার বক্ষ-নিসৃত মহাবাণী—ধীরে ধীরে গিয়ে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আলিঙ্গন কর; আর আলিঙ্গন কর সেই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য-কীর্ত্তিকে যে রবীন্দ্রনাথ ঐ বাণীরই বরপুত্র। চারিয়ে যাক্ তবে আকাশে বাতাসে এই পরমাত্মার চরম নিয়ম, আর গড়ে উঠুক এই পলিটিক্সের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের পলিটিক্সে ভরা বিশ্ব-ভুবনের মর্ম্মকোষে সেই--

"প্রেমের জগৎ"

যেখানে ব্যবহারিক বা সামাজিক শাসন-রজ্জু নরনারীকে স্পর্শও করতে পারে না,—যেখানে পাপ নেই, শোক-তাপ নেই,—আছে শুধু নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্বর্ণ সিংহাসনে নরদেবতা ও নারীদেবীর অপাপবিদ্ধ যুগল মূর্ত্তি নির্ভয়ে আলিঙ্গন-বদ্ধ,— আর তার চতুর্দ্দিকে বিচিত্র পরিহিতব্রতে ছুটে বেরুবার জন্য জাগ্রত ভারতবর্ষের কর্ম্মানন্দ কলরব। এস ধনী, নির্ধন, যে যেখানে আছ—এস সাহসিকা নারী ও বীর্য্যে অটল পুরুষ দ্বিধাশূন্য চিত্তে এই আত্মার আদেশ গ্রহণ ও প্রচার কর। গ্রথিত হয়ে যাক্ তোমাদের দেহে, মনে, প্রাণে, কর্ম্মে ও বাক্যে এই অমোঘ নিয়ম —

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহং"।

• • •

কৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

রামীর প্রতি।

—(-*-)—

কোন্ নব বৃন্দাবনে, কালিন্দীর তটে—
লইয়া কলসা কক্ষে আসি একাকিনী
দাঁড়াইলে, হে সুন্দরি, রামী রজকিনি!—
কি চিত্র আঁকিলে তুমি কবি চিত্র-পটে!

সেদিন কি জেগেছিল ফাল্গুনের দিন?
পুলকি উঠিয়াছিল সারা বিশ্বখানি?
কোকিল ঝুলিতেছিল বিশ্ব প্রেম বাণী!
শিহরি উঠিতেছিল কানন বিপিন!

অথবা নামিয়াছিল আষাঢ় নবীন?
মেঘে মেঘে ঘেরেছিল সমস্ত আকাশ?
অদূরে মাধবী কুঞ্জে কেকাকল-বীণ্—
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে আর্দ্র বাতাস!

নিমেষে পড়িল ধরা চণ্ডিদাস কবি—
হেরিল তোমার রূপে রাধিকার ছবি;

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বীরবলের হালখাতা।*

——:*:——

(সমালোচনা)

"সবুজ পত্রে'র সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবল রূপে ১৩০৯ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৩ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর ধরিয়া যে সকল প্রবন্ধ মাসিকপত্রে লিখিয়াছেন সেগুলি তিনি "বীরবলের হালখাতা" নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। "প্রকাশিত" বলিলে ঠিক বলা হইল না, "ছাপাইয়াছেন" বলাই উচিত, কেন না তিনি তাঁহার পূর্ব্বের গ্রন্থ "সনেট পঞ্চাশৎ" ও "চার-ইয়ারি-কথা"র ন্যায় এই বইখানিরও কোনরূপ বিজ্ঞাপন দেন নাই।

---

* পরিচারিকার তরফ হইতে এই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা ১৩২৫ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সঃ।

ইহার দুই কারণ আছে, তিনি এই পুস্তকে বলিয়াছেন "আমি সাহিত্য-ব্যবসায়ী নই। অর্থাৎ অদ্যাবধি আমি বই কিনেই আস্‌ছি, কখনও বেচিনি, সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করলে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্রেতার দিক্ থেকে যা বল্‌বার আছে তাই বলতে পারি, বিক্রেতা হিসাবে কোন কথাই বল্‌তে পারিনে।" তদ্ভিন্ন তিনি বিজ্ঞাপনের বিরোধী কারণ বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি মিথ্যা কথা বলেন এবং বিজ্ঞাপনে আত্মম্ভরিতার প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ হয়। তাই সুবুজপত্রে কাহারও বিজ্ঞাপন তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। কয়েকমাস হইতে সবুজ পত্রের মলাটে পুস্তক কয়খানির নাম, দাম ও প্রাপ্তিস্থান ছাপান হইতেছে। পুস্তক বা গ্রন্থকারের নাম একটা বিশেষণও নাই। তিনি বিলাত ফেরত হইয়াও বিলাতের commercialism এর দিকটা কদর্য্য বোধে পরিহার করিলেন। আর আমাদের সাহিত্য-ব্যবসায়ী গ্রন্থকারেরা পয়সা খরচ করিয়া কিংবা না করিয়া বড় বড় লোকের সার্টিফিকেট সহ বিজ্ঞাপনে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরিয়া ফেলিতেছেন!

এই পুস্তকখানিতে মোট ২৭৮ পৃষ্ঠা আছে; তদ্ভিন্ন উৎসর্গ পত্র ও টাইটেল পেজ আছে কিন্তু সূচীপত্র নাই ও পুস্তকের মূল্য কোথাও লেখা নাই। আবার কাগজের মলাট! ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে গ্রন্থকার বইয়ের ব্যবসায়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। সবুজপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিয়াছি বইখানির দাম একটাকা এবং বই হইতেই পেন্সিল দিয়া একটা সূচীপত্র তৈয়ার করিয়াছি তাহাতে দেখিলাম সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টি বিষয় বা প্রবন্ধ আছে। ইহার প্রথমটির নাম "বীরবলের হালখাতা" ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসে লেখা। আরও দুটি ১৩০৯ সালেই লেখা ৪র্থটি ১৩১২ ও ৫মটি ১৩১৯ সালের লেখা। অবশিষ্টগুলি ১৩২০ হইতে ১৩২৩ পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরে লেখা। গ্রন্থকার যে এই পনের বৎসর ধরিয়া এই বীরবলী ঢং বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

বীরবলী ঢঙে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহা বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই সহজে চিনিয়া ফেলিবেন। ইহা ঠিক ব্যঙ্গ-সাহিত্য বা হাসির-গানের শ্রেণীভুক্ত নয়। অথচ বিদ্রূপও ইহাতে আছে কিন্তু সেই বিদ্রূপের অন্তরালে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি কথাও অসার নহে। হয়ত কোন কোন মত সম্বন্ধে কাহারও অন্যমত থাকিতে পারে। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা অতি অল্প। বীরবলী ঢঙে অনুপ্রাস, যমক, দ্ব্যর্থ ও উপমাগুলি সুন্দর ও অপূর্ব্ব। কেবল যমকের প্রয়োগে একস্থানে একটা ভুল কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কারণ উপহাসে ওরূপ ব্যবহার আমরা সকলেই করিয়া থাকি।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটি ব্যক্তিগত কথা লইয়া লিখিত। এগুলি সাময়িক সংবাদপত্রের উপযোগী। যে সময়ে বাহির হইয়াছিল তখন ইহাদের একটা উপযোগিতা ছিল। স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবার মত গুণ এগুলিতে নাই। সুতরাং এগুলিকে সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান না দিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি সুন্দর ও সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি কথা এই যে—সাহিত্য মনের খেলা, খেলার যেমন কোন উদ্দেশ্য নাই সাহিত্যেরও তেমনই কোন উদ্দেশ্য নাই। খেলাতে যেমন আমরা আনন্দ পাই, সাহিত্য আলোচনাতেও তেমনই আনন্দ পাই। বেশ সুন্দর কথা, কিন্তু ফুটবল খেলাতে সময় সময় আনন্দের পরিবর্ত্তে যেমন নিরানন্দ জন্মে আমাদের সাহিত্যের আলোচনা বিভাগেও তাহাই হয়, সুতরাং সেই নিরানন্দের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার প্রয়োজন কি?—যা'ক অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবগুলিই ভাল তবে এক শ্রেণীর ভাল নয়। অধিকাংশ প্রবন্ধেই স্থানে স্থানে "অতিবুদ্ধি" প্রকাশিত হইয়াছে এই "অতিবুদ্ধি"'র জন্য সেরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার

প্রয়োজন তাহা বাঙ্গলায় খুব কম লোকের আছে। যে সকল বঙ্গীয় পাঠক কেবল নভেল নাটক না পড়িয়া অন্য বইও কথন কথনও পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের চিন্তার নূতন নূতন দ্বার ইহাতে খুলিয়া যাইবে।

বঙ্গসাহিত্য, বাঙলাভাষা, বাঙলার সমাজতত্ব, রাজনীতি, শিক্ষার প্রথা, সঙ্গীত আর্ট, চিত্রকলা সমালোচনা, মাসিকপত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ইহাতে পাওয়া যায়। বাঙলাভাষা কিরূপ হওয়া উচিত এই লইয়া একদিন যে "গোলযোগ" হইয়াছিল স্বনামে ও ছদ্মনামে আমিও তাহাতে একদিন "গলাযোগ" করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে বীরবলের মতে সকলে যায় না দিলেও তাঁহার কথাগুলি খুব প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—শব্দকল্প-দ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে. তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনও আপত্তি নেই। যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে কথা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।—এজন্য তিনি "এষা, মঞ্জুষা, করঙ্ক, বৈতালিক" প্রভৃতি আনকোরা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা ফোর্ট উইলিম কলেজের পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া সংস্কৃতানুসারিণী হইয়া যে নিজের জাতি হারাইয়াছে সে কথা গ্রিয়ার্সন সাহেবও জোর-গলায় Linguistic Survey of India পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বীরবলী ভাষার "করলুন, করতুম, করে ও তার" স্থানে "করিলাম, করিতাম, করিয়া ও তাহার" লিখিয়াও যে ভাষা সরল করা যায় তাহার সাক্ষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। মৌখিক-ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে লিখিয়াছেন "ভাষার মৌখিক গঠন লেখায় যতদূর সম্ভব রক্ষা করবার সার্থকতা এই যে, তাতে করে রচনা প্রথমত দুর্ব্বোধ হয় না, দ্বিতীয়ত তা শ্রুতিকটু হয় না। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন ও কাণ দুই-ই যে ধারণের বাক্য শোনায় চিরদিন অভ্যস্ত, যতদূর সম্ভব রচনায় সেই ধরণের বাক্যই ব্যবহার করা শ্রেয়। ভাষা জিনিষটা বক্তার একলার সম্পত্তি নয়, শ্রোতাও তার অংশীদার।" হয় ত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ত তলব করিতে পারেন যে "তুমি তবে মৌখিক ভাষায় লেখনা কেন ?" সুতরাং এইখানে একটু ক্ষুদ্র কৈফিয়ত দিলে ভাল দেখায় না। আমি বহুদিন হইতে ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের কেতাবী রূপই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কয়েকবার চিঠিপত্রে মৌখিক রূপ লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু অভ্যাস দোষে খিঁচুড়ী পাকাইয়া বসিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" দ্বিতীয়তঃ বানান ঠিক করিতে পারি নাই কোথায় হসন্ত দিব আর কোথায় উপরে কমা দিব। তৃতীয়তঃ আমি কথনও কথায় বার্ত্তায় "করলুম, করতুম" বলিনা, "করতাম, করলাম" বলি।

বাঙ্গলার সমাজ সমন্ধে বীরবল এমন কথা কোথাও বলে নাই যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগিতে পারে অথচ বহুদোষ দেখাইয়া দিয়াছেন যাহা সমাজ সংস্কারকেরা মনে রাখিলে অনেক কাজ হইতে পারে, তিনি বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের এমনি ২।৪টি ব্যাধির অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন যাহা কেহ কথনও ভাবিয়া দেখেন নাই। যথা—বাঙ্গালী সমাজে প্রাচ্য দর্শনের শিষ্য বলিয়া রূপ-কানা আর য়ুরোপীয় ফ্যাসনের দাস বলিয়া রঙকানা। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও মনের ভাবে মিল নাই। আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি হয় বর্ত্তমান য়ুরোপের দিকে এগোনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছোনো। আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মসাহিত্য সকলক্ষেত্রেই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে;—শুধু মধ্য নেই। ইত্যাদি—

এই পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর কথা আছে তাহাও বঙ্গীয় পাঠকের প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি। গল্প পড়িতেই অধিকাংশ পাঠক ভালবাসেন, ইহার কারণ সম্বন্ধে বীরবল বলেন,—আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য। নিজের জীবন ঘটনাপূর্ণ না হলেও অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চ্চা করে' মানুষে সুখ পায়। অনুরূপ অবস্থায় পড়লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হয়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্রপূর্ণ হতে পারত এই মনে করে আনন্দ অনুভব করে। যুদ্ধ সম্বন্ধে বীরবলের মারফত "নারীর পত্রে" আমরা কয়েকটি সারগর্ভ কথা শুনিতে পাইয়াছি। নারী বলিতেছেন, "আমরা সব জীবনের সৃষ্টি করি, সুতরাং সে জীবনের রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম এবং তার ধ্বংস করা মহাপাপ। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিম্বা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়। মানব পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয় তার প্রমাণ তার দেহ। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয়, তাহলে অনেকে মিলে অনেককে বধ করা যে কি করে ধর্ম্ম হতে পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।"—পাশ্চত্য সমাজ বিজ্ঞানের মতে - "সমাজ হচ্ছে একমাত্র অঙ্গী এবং ব্যক্তিমাত্রেই তার অঙ্গ; নিজের স্বার্থের জন্য করলে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য করলে সেই একই কাজ মহাপুণ্য।" খাঁটি বীরত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো—পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেঁচে থাকা।" অন্যত্র বীরবল বলিয়াছেন "বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে ইয়ুরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল; এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ করবে।" ইহার মধ্যে অনেকগুলি অমূল্য বচন আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নবশিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারবো, ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে স্থান না পেত, তাহলে না ভেবে চিন্তে, লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে, সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। কেবল মাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। স্কুলে লিখে এসে যে কালি আমরা হাতে আর মুখে মেখেছি, তার ভাগ আমরা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে চাই। যেমনি একজনে লোক-শিক্ষার সুর ধরে, অমনি আমরা যে তার ধুয়ো ধরি তার একটি কারণ এই যে, একাজে আমাদের শুধু বাক্যব্যয় করতে হয়, অর্থ ব্যয় করতে হয় না। আমাদের শিক্ষকের একহাতে সংস্কৃত আর এক হাতে ইংরেজি ধরে, আমাদের উপর দুহাতে চাবুক চালাচ্ছেন। যাঁরা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরাজি ভাষায় ওকালতি এবং "কলাবতী" করেন, তাঁরা যে ও ভাষায় শুধু পড়া মুখস্থ দেন, তা শ্রোতা মাত্রেই বুঝতে পারে।" আর কত তুলিব?

সাহিত্য সম্বন্ধ "মলাট সমালোচনা" ও "বইয়ের ব্যবসায়"এ তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের লেখক ও পাঠক উভয়কেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশের অনেক বই বিজ্ঞাপন, সার্টিফিকেট ও চকচকে মলাটের দোহাই দিয়া ভি পি যোগে অনেক লাইব্রেরীতে স্থান পায়। সেগুলি পড়িলে সময়ে সময়ে মাকাল ফলের কথা মনে পড়ে। "বীরবলের হালখাতা" হাতে পড়িলে অন্ততঃ সে কথা কাহারও মনে পড়িবে না একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বনমল্লিকা—রচয়িতা শ্রীমান কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,। আকার ৯৬+॥৵০ পৃঃ; ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য বাঁধাই ১৲ টাকা আবাঁধা ৸০ আনা। প্রকাশক মেসার্স চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং। ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কবি কুমুদরঞ্জনের পরিচয়, বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার নিকট নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাঁহার মানস-সরোবরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাধার 'শতদলের' সুবিমল মিষ্টমধুর সৌরভে, যাঁহার ভক্তিচন্দন-চর্চ্চিত 'বনতুলসী'র পবিত্রতা ও মনোহারিত্বে ভাব-যমুনা 'উজানি'র নানা ভঙ্গের রস-তরঙ্গে বঙ্গবাসী বিমোহিত;—যাঁহার 'একতারা'র সুমধুর ঝঙ্কারে বাণীর বীণা-নিক্কণ সঞ্জীবিত, পল্লীর প্রাণ অধ্যুষিত, তাঁহার আর নব-পরিচয়ের স্থান কোথা? যিনি মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় সুনিপুণ চিত্রকরের মত পরিচিত বর্ণসম্পাতে, সকল মনুষ্যের নিত্য উপভোগ্য অতি প্রাণের, গ্রামের, জন্মভূমির, গৃহের ভাবময় আলেখ্য স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কনে পটু, যিনি প্রীত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিতের ফটোগ্রাফার তাঁহার পরিচয়ের আর বাকি কি আছে! বাকি ছিল অতি অল্পই,—সেই অল্পের ব্যবধানও মুছিয়া ফেলিয়াছে তাঁহার এই স্বভাবজাত 'বনমল্লিকা',—মল্লিক-মালাকরের শান্তরসাস্পদ পূত মন-মালঞ্চে যে মল্লিকা জন্মলাভ করিয়াছে তাহা সত্যই অনিন্দ্য,—আত্মার আকাঙ্ক্ষিত সৌরভ-বারতায় ভরপুর! তাঁহার পুষ্পবিথীর এটী উৎকৃষ্ট-তম সৃষ্টি! ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বের সেই পল্লী-চিত্র—

'মাটীর দেয়াল খড়ের চালা গোবর দেয়া মেজে' 'ছাড়া কোকিলের গান' 'পশু পাখী তরু লতার স্নেহ'—

'তীর্থ আমার স্বর্গ আমার ক্ষুদ্র গৃহকোণ,
'সফল আমার পুণ্যিপুকুর সফল আরাধন'
'শষ্পশ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ-ছায়ে
পল্লীরাণীর ভক্ত দুলাল, কতই গীতি নিত্য গাহে।'

আরও—

'ঘর কর টাবটুব রও তুমি নিত্য,
বাঙলার প্রাণ তুমি, কৃষকের বিত্ত'

পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার কাব্য অলঙ্কৃত করিয়া আছে—অধিকন্তু বনমল্লিকার সৌরভে গৌরবে—

"ভাষার অলকানন্দা, ভাবের শ্রীবৃন্দাবন, গোবিন্দের গীত
যৌবন যমুনা জলে ভাসায়ে আনিলে তুমি আনন্দ সচ্চিৎ"—

স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়া প্রচার করিয়াছে—

ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ
গান আর প্রাণ তুমি করে দিলে এক,'—

চিত্তশুদ্ধি হইলে স্বপ্ন আর টেকে কতক্ষণ? মাঘের কুজ্ঝটিকা যতই ঘন হ'ক না কেন সূর্য্য কিরণ মূর্ত্ত হইয়া উঠিলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে কোথা? তখন যে আপনি নয়নে ধরা পড়ে—

'সত্য দিয়া মিথ্যা গড়ে মানুষ ভেঙ্গে চিত্র,
কান্তি দিয়ে ভ্রান্তি রচে শত্রু না সে মিত্র?
হারার সে যে কোমল কারা,
নিঃস্ব আমার বিশ্ব সারা,
নিত্য লভে নেত্র ধারা
দুই জগতের অর্ঘ্য।'

তখন কি আর সে সব কিছু প্রাণ চায়? তখন যে—

'বেচা কেনা নেনা দেনা চুকিয়ে যায় সব
নীরবতায় ডুবে যায় মেলার কলরব'

তখন—

'ধ্যান তারে পেতে চায় প্রাণ চায় তারে
গান মরে খুঁজি,
জীবন সফল হবে পরিপূর্ণতায়
তারে পেলে বুঝি।
কোন্ সুলগনে স্বাতী নক্ষত্রের জলে
ধন্য হব আমি,
ফলিবে এ রিক্ত বুকে সেই মুক্তাফল
বল অন্তর্যামী।
ধ্যান মোর মূর্ত্ত হ'ক প্রাণ পা'ক ছবি
দাও সেই ধন,
সার্থক হউক মোর তুচ্ছ দেহ গেহ
জীবন যৌবন।'

জীবন যৌবনের গর্ব্ব ত তখন তাঁহার অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে; দেবতার দান রূপে তাহা সার্থক হ'ক। শুক্তি হৃদয়ে শুভ্র মুক্তার ন্যায় তাঁহার অন্তরতম প্রদেশেও দীপ্তমান সেই—শুভ্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ "(ঈশ ৮)—" যিনি তমোহীন, দেহহীন, ক্ষতহীন, স্নায়ুহীন, মলাহীন, পাপহীন, যিনি,—তাঁহার শুভ অধিষ্ঠান, আসন সংস্থাপিত হইয়াছে! ভক্তের

'সব গিয়েছে সব গিয়েছে
নয়'ক তবু নিঃস্ব রে,
সব দিয়েছে সব দিয়েছে
সব পেয়েছে ঈশ্বরে।'

অন্তরে তাঁহার কেবল উচ্ছলিত—

উদ্ধারের এ মন্দাকিনী
শ্যামের সরল বাঁশীর সাড়া
মুমূর্ষুর এ সঞ্জীবনী
অন্ধ জনের নয়ন তারা
শোকের প্রলেপ দুঃখের সাথী,
জীবন মরণ সফল কর
আঁধার বুকের উজল বাতি
বল রে হরেকৃষ্ণ হর।"

তখন—

"অকূল নিয়ে ব্যাকুল তুমি সুদূর তোমার ঘর
পরকে কর আপন তুমি, আপন কর পর।"

ওগো কেবা আপন, কেবা পর—সকলই যে আজ তাঁহার ভূমানন্দে আপন—তাঁহার মনে প্রাণে যে ধ্বনিত হইতেছে—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

সে সুরে সে আত্মহারা,—বিশ্বসঙ্গীতের মধুর ধ্বনি তাহাকে বিভোর করিয়াছে, প্রাণ আকুল হইয়া বলিতেছে—

'গীতটী জানি, রচিত কার জানিনে তার নাম,
কোন দেশেরি লোক সেটী গো কোথায় তাহার ধাম?
এই মনোহর মন্দির হায় শিল্প কাজে ভরা,
জানতে ওগো পারবে না ত কাহার হাতে গড়া!'

কে তুমি—হে অজ্ঞেয়? কোথায় তুমি?

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো—'

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না বাক্য যাইতে পারে না, মন বুদ্ধি যাইতে পারে না—' ও সে এমন, সে অমন কথায় কে বলিতে পারে—

'স এষ নেতি নেতি আত্মা।'

ওগো সকল ধ্যানধারণার অতীত সে আত্মা! ওগো সে যে অন্তরে বিরাজমান হইয়াও অন্তর,—তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না,—ভক্ত তাই কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে,—দেখা দাও হে—

"তোমার নামের অনুরাগী আমায় করহে,
ভেঙেচুরে একেবারে নূতন গড় হে।
চুকিয়ে দাও আশার নেশা, সকল অহঙ্কার,
নামিয়ে দাও প্রাণের বোঝা, অভিমানের ভার,
তুমি থামিয়া দাও একেবার হিয়ার ধুক ধুক,
শেষ দাবী দাও ওই চরণে লুকাইতে মুখ।"

যদি ওই অভয় চরণে শরণ পাই তবে আর কিসের ভয় —

"বিপদ সাগর গর্জ্জে যদি, ভয় করোনা মন
অগস্ত্য যে আসছে পথে দম্ভ কতক্ষণ ?
রাজার চেয়ে নইত কমি গরব কিসের তার
ফকির চেয়ে নই যে বড় কিসের অহঙ্কার।
জীবন আমার অফুরন্ত অন্ত কোথা হায়,
পলের সে যে ইন্দ্রধনু ওই মিলিয়ে যায়
বাড়তি নহে কম্‌তি নহে নিক্তি ধ'রে দান,
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান !
ভয়ও আছে, অভয় আছে, আছে বুকের বল,
কাঁটাভরা মৃণাল আছে, সোণার শতদল,
শিশুপালে বধ ক'রে সে, রাখালে দেয় কোল,
ইঙ্গিতে সে জগৎ দোলায় কদম্বে খায় দোল,
বলির মাথায় দেয় সে পদ, ভৃগুর পদে বুক,
ভয়কে করে অভয় সে যে দুখকে করে সুখ,
আছে পাঞ্চজন্য ধ্বনি, আছে বাঁশীর গান,
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান।

এ চরম অভয় বাণীর উপর আর বলিবার কি আছে !

মন্দিরা,—রচয়িতা শ্রীমান বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। আকার ১৬ পে, ৯৩+॥৵০ পৃঃ; সুন্দর এণ্টিক কাগজে পরিপাটী ছাপা। মূল্য সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই ॥৵০ আনা। 'মানসী' কার্য্যালয়, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সপ্তস্বরা,—এখানিও শ্রীমান বসন্তবাবুর। আকার ১৬ পে ১৪০ পৃষ্ঠা সুন্দর রেশমী বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট,—দেশপূজ্য কতিপয় মহাত্মার, সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্রে শোভিত, মূল্য এক টাকা। 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কবি বসন্তকুমারও চেনা বামুন। যে দিন তিনি প্রথম ভয়ে ভয়ে

"আমি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো
কারয়া দুরাশা শুনাতে গান
কিছু নাই মোর আনিয়াছি তাই
মন্দিরা এই কাঁসার দান," বলিয়া মন্দিরা হস্তে বিনীত নম্র

ভাবে সাহিত্য-আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার হাতের গুণে, কাঁসার মন্দিরাতেই, 'ঐক্যতানের

সুরশিঞ্জনে রিনিকি ঝিনিকি ঝনন্ রবে' মিষ্ট মধুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। সে দিনই তাঁহার পরিচয় হইয়া গিয়াছে! সে বারতা, শ্রোতৃবর্গের সে ভাব কবির নিকটও অজ্ঞাত ছিল না—তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন—

"জগতের আজি, বিশাল আঙিনা
পূরিয়া গিয়াছে হরষে ;
উৎসবে মাতি চলেছে সকলে
বিপুলানন্দ রভসে।"

তিনি সেই দিনের সাফল্যে বুঝিয়াছিলেন, মন্দিরাই যে হস্তে এমন বাজিয়াছে, তাহার ভবিষ্যত উজ্জল, তাই সে দিনের সভা শেষে কবি আশার সুরে গাহিয়াছিলেন —

"ভাঙ্গুক সভা থামুক রে গান, আজের মত তবে ;
আবার যখন আসব হেথায়,—তখন সে গান হবে!"

সত্যই সে দিন হইতে কবি সমভাবে আসর জমকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার 'সপ্তস্বরা'—

"সপ্ত ভদ্র কুসুম ধবল বাণী পবিত্র রূপ,
সপ্তচ্ছদ শুভ্রবর্ণ মর্ম্মের স্মৃতি-স্তূপ,
ভক্তচিত্ত সেবার রক্তে রাঙা সপ্তলা দল,
সপ্ত কণ্ঠ রচিছে মালিকা সুকঠিন অতরল,—
ভারতীর করে সপ্তস্বর-নিধান
সপ্তবর্ণে সপ্তলোকের সপ্তশতীর গান—

পল্লীর গান, প্রাণ প্রেমের দান, সুখ ও দুঃখ, প্রকৃতি পূজা, কি সহজভাবে তাঁহার সুস্বর-লহরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে! বসন্ত বাবু ভাব সাগরের ডুবুরী, প্রকৃতির পূজারী, পল্লী-জীবনের সুধা-মন্থনকারী অমর, আবার রহস্য পারাবারের তুফান—কবির হৃদয় উচ্চ, সরস, সবল, তিনি পরকে আপন ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, সমবেদনা, সহানুভূতি তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তাঁহার গান এত মিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী। অধিকাংশ স্থলে কবির ছন্দাদি সুন্দর বিষয়োপযোগী কিন্তু স্থানে স্থানে তাল যে না কাটিয়াছে তাহা নয়;—আমরা বিনীতভাবে কবির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। প্রার্থনা কবির অনাবিল, অবিরাম ভাব উৎস্য অফুরন্ত, হক—কবি যে সাধনায়—

"বনে করিয়াছি যে তপ কঠোর
তারি ফলে আজি এ সুযোগ মোর" লাভ করিয়াছেন, তাহা মায়ের কৃপায় সার্থক হ'ক!

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারের প্রাচীন "চণ্ডিকাব্রত" পুঁথির দ্বিতীয় পাটার (এক পৃষ্ঠা)

(শালবাহন রাজ ও ধনপতি)
"সম্যক প্রকারে তারে করিছি দর্শন
এরূপ শুনিয়া ভূপ বলিছে তখন

(ধনপতির কমলে কামিনী দর্শন)
"কোথা বা হইতে কন্যা তখনি আসিয়া
প্রধান তাহার এক করিক গ্রাসিয়া"

(ঝড়ে বিধ্বস্ত ধনপতির নৌকা)
"পরে সাধু চলিল নৌকার পর চড়ি
দেবীর কোপেতে রাতে নৌকা গেল উড়ি"

কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারের প্রাচীন "চণ্ডিকাব্রত" পুঁথির প্রথম পাটার (এক পৃষ্ঠা)

(ধনপতি ও খুল্লনা)
"জানাইলা সাধুক শুনিয়া ধনপতি
গৃহিনীক বলিচেন এরূপ ভারতী"

(খুল্লনাকে দেবকন্যাগণের দেবীপূজা শিক্ষাদান)
"হারা ছাগ পাবা আর হবা পুত্রবতী
দেবীর প্রভাবে দুঃখ যাবে শীঘ্রগতি"

(খুল্লনার পুজার ঘটে ধনপতির পদাঘাত)
"সেরূপ দেখিয়া অতি ক্রোধবশ হয়া
ভঞ্জন করিল পদে আঘাত করিয়া"

(খুল্লনার সূতিকাগার)
"শ্রীপতি তাহার নাম রাখিল তখন
প্রসবিল সুত নিজ কুলের নন্দন"

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। | চৈত্র, ১৩২৫ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

বর-মঙ্গল।

—:*:—

আমি করেছিনু খুব কঠোর তপ
কত না জনম জনম ধরিয়া তোমার জপ
তাই তুমি মোরে দিয়াছ এ বর
এই সংসারে বাঁধিবারে ঘর
মানবের মাঝে এইটুকু ঠাঁই,
করুণাময়,
নহিলে এ ভূমি অমনি কখন সুলভ হয় ?

আমি চেয়েছিনু এক সুখের পুরী
এত সুখ তাই দিয়াছ দেবতা জগত-জুড়ি,
খনে খনে নানা জনে জনে দিয়া
এত যে পসরা দিছ' পাঠাইয়া
তরু গিরি নদী মরু দরী আদি
জলে ও থলে—
মোরই তরে নাকি পাঠায়েছ, তাই সকলে বলে।

আমি ডেকেছিনু তোমা আদর করে'
তারি প্রতিদান দিচ্ছ' বুঝি এই আজিকে মোরে।
সখা সখী প্রিয়া হিয়ার পাত্রে
একি সওগাদ দিবস রাত্রে ?
চিনিনা জানিনা যাদেরে কখনো
তাদের' ডাকা—
পথে পথে একি পদে পদে তব ফেরৎরাখা ?

আমি একবার ভাল বেসেছি বলে
এত কল্যাণ এত ভালবাসা দিলে কি চলে ?
পশু ও পক্ষী কীটপতঙ্গ
করে দেছ' মোর অন্তরঙ্গ—
এক কণা পেয়ে শতগুণ দিয়ে
কি লীলা তব ?
অজ্ঞেয় তুমি এ তারি আভাষ নিত্যনব !

আমি শুভখনে তোমা বাঁধিতে গিয়া
বাঁধা পড়ে গেছে কঠিন বাঁধনে আমার হিয়া !
কত না সুখের এ যে বন্ধন
নানা রূপে করি পরি-রঞ্জন
জাগিতেছে চির অন্তরে মম
অমৃত-আলো
ধরণীরে তাই এত প্রাণাধিক বেসেছি ভাল !

আমি তোমারে পাইব করিয়া আশা
এসেছি মর্ত্ত্যে—তোমারি বক্ষে বেঁধেছি বাসা !
তাইতো ডাকিনা কভু তোমা মুখে
ডাকে কি মায়েরে—শিশু মা'র বুকে
তবু সংসার যে বলে মিথ্যা
সে থাক্ দূরে—
আমি যেন থাকি মানবের এই মিথ্যাপুরে !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মিষ্টি সরবৎ।

—(*)—

(১৬)

পরদিন সকালে আহমদ্-সাহেব বাথ-গাউন ও জাপানী ঘাসের শব্দহীন চটি পরিয়া স্নানাগার হইতে পোষাক-কামরায় যাইবার পথে,—আব্লুর ঘরে কি একটা তর্ক-বিতর্কের অস্ফুট আওয়াজের মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ শুনিতে পাইয়া, কৌতূহলী হইয়া একটু দাঁড়াইলেন। শুনিলেন ইনেবের কি একটা কথার উত্তরে আব্লু হাস্য-কোমল কণ্ঠে বলিতেছেন, "কি মুস্কিল! আমি কি নিজের কষ্টের জন্যে বলেছি! আহ্মু বেচারা খেটে-খুটে বাড়ী এল, সে যে রাত বারোটার সময় একটু ঘুমিয়ে আরাম পাবে, তোমরা তার যো-টি রাখ্লে না, দুজনে জরদা খেয়ে মাতাল হয়ে তেতালার খোলা ছাদে গিয়ে হাজির হলে!—আহ্মু না হয় হেসেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, কিন্তু ও যে খাম্‌কা তোমাদের অন্যায়ের জন্য কতটা কষ্ট পেলে, সেটা বিবেচনা কর। ও-গরীব না হয় কিছু বল্লেই না—"

বাধা দিয়া মৃদু-কোমল-কণ্ঠে ইনেব বলিল "তাই বুঝি,—গরীবের হয়ে বড়লোক তুমি,—তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে গাঁজার কল্‌কের ফরমাস্ দিয়ে বসলে?—"

অপ্রতিভ হাস্যে আব্লু-সাহেব বলিলেন "আঃ বলছি তো, আমার রাগ হয়েছিল, আমি রাগ সামলাতে পরি নি, অন্যায় করেছি।—কিন্তু সেটুকু নিয়ে এত রাগারাগি কেন? বুঝেছ,—রাগটা হচ্ছে, মানুষের মহৎ দুর্ব্বলতার লক্ষণ।"

ইনেব অধিকতর মৃদুস্বরে বলিল "সেটা এখন বুঝলুম, কাল কিন্তু গাঁজার কল্‌কে আমদানি হওয়ার সময় বুঝেছিলুম,—ও জিনিসটা ঠিক তার বিপরীত সামগ্রী—"

এবার আহমদ্-সাহেবের ধৈর্য্য লোপ হইল! লুকাইয়া কথা শুনিতে হইতেছিল বলিয়া একেই তো তাঁহার অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল, তার উপর এই অভিমান-গঞ্জিত দাম্পত্য-আলাপের সুমিষ্টতর রহস্য-ব্যঞ্জনায় তাঁহাকে একেবারেই বিচলিত করিয়া তুলিল! সশব্দে হাসিয়া দুয়ার ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর পা দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। ইনেব চট্ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া ঘরের এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

খুব মস্ত গোছের বিনীত ভাব দেখাইয়া—আহমদ্-সাহেব সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া বলিলেন "বিবিসাহেব, অনধিকার প্রবেশের ত্রুটিটা দয়া করে ক্ষমা কর্‌বেন, আপনাকে কিছু বলবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করতে এলুম, বল্‌ব?—"

ইনেব ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সম্মতি জানাইল।

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "দেখুন, এই উজবুক্-টাকে আর কিছু বল্‌বেন না, কাল যেমনি আপনার ওপর অসম্মান-জনক উক্তি প্রয়োগ করেছে, তেম্নি হাত-নাগাদ্ পায়ে ধরে 'এ্যাপোলজিও' চেয়েছে, মনে আছে তো আপনার!—বলুন, আর কি ওর ওপর রাগ করা উচিত?—"

ইনেব স্তব্ধ ! আব্‌লু-সাহেব এতক্ষণ একটু বোকা বনিয়া বসিয়াছিলেন, এইবার আহমদ্‌-সাহেবের আকস্মিক আবির্ভাব ও এত আড়ম্বরপূর্ণ বিনয় নিবেদনের যথার্থ অর্থ বোধগম্য হইতেই—সজোরে উচ্চ হাস্য করিয়া সকৌতুকে বলিলেন "ওরে শয়তান ! তুই বুঝি এতক্ষণ বাইরে ওৎ পেতে কথা শুনছিলি ?"

কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া—উল্টা ঘাড় উচাঁইয়া—রীতিমত জোরের সহিত ধমক দিয়া আহমদ্‌-সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "না শুন্‌লে তোর সদ্গতি করবে কে রে, রাস্কেল। চুপ উল্লুক, তুই এখন আসামীর কাঠগড়ায় আছিস্‌, মালুম থাকে যেন—" তারপর ইনেবের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ নম্র-বিনয়ে সসৌজন্যে বলিলেন "তা হলে একে এবারের মত ক্ষমা করলেন, তো ? বলুন—"

ইনেব বিপদগ্রস্ত হইয়া নীরবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।—

আহমদ্‌-সাহেব পুনরায় বলিলেন "বেশী কিছু নয়। ঘাড়টি নেড়ে হাঁ বলুন। আমি চলে যাই—"

অগত্যা ইনেব মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া "তথাস্তু" জানাইল।

আহমদ্‌-সাহেব আবলুর দিকে চাহিয়া গর্ব্ব-প্রফুল্ল মুখে বলিলেন "বুঝ্‌লি রে বেকুব ! ওকালতী শুধু পাশ করলেই হয় না, নিজের ঘরে, জটিল-গার্হস্থ্য-ব্যাপারের মীমাংসায় ওবিদ্যার ব্যবহারিক-দক্ষতাটা,—Great quantity জেনে রাখা চাই, নচেৎ তোমার মত উজবুকের পক্ষে ওবিদ্যা বিল্‌কুল্‌ নিষ্ফল !—"

আব্‌লু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি দুয়ারটি টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া, নিজের পোষাক কামরায় চলিয়া গেলেন। পিছনে আব্‌লুর হাস্যধ্বনিতে ঘর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। আহমদ্‌-সাহেবের আর দৃক্‌পাত নাই !

পোষাক পরিয়া শয়ন-কক্ষে আসিয়া দেখিলেন,—আমিনা চা প্রভৃতি লইয়া বারেণ্ডার দিকের দুয়ার দিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

টেবিলের উপর চা রাখিয়া আমিনা যেমন ফিরিয়া দাঁড়াইবে—আহমদ্‌-সাহেব অমনি পিছন হইতে আচম্বিতে তাহার কানের পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যঙ্গপূর্ণ বিনয়ের স্বরে বলিলেন "বন্দেগী জনাব, জর্দ্দার নেশা এবার ভাঙ্গ্‌ল ?"

"আচ্ছা, যাও—" বলিয়া সলজ্জ হাস্যে মুখ সরাইয়া লইয়া,—আমিনা একটু ক্ষোভ-মিশ্রিত অনুযোগের স্বরে বলিল "আমি তো সে জানি ! আমি একদিন জর্দা খেয়ে দোষ করেছি, কিন্তু তুমি পঞ্চাশ দিন ধরে ঠাট্টা করে তার সুদের সুদ উশুল করবে ! তুমি এমন ভয়ানক লোক, হুঁ !—"

আহমদ সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আরে না না, চোটো না, চোটো না। আমি এখন ভয়ানক লোক মোটেই নয়, বরং একজন মস্ত Peace-maker—মহাশয় ব্যক্তি ! জানো, তোমার দাদার ঘরে এইমাত্র শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করে আসছি।"

বিস্মিত হইয়া আমিনা বলিল "দাদার ঘরে ? কেন ? কি হয়েছিল সেখানে ?"

আহমদ সাহেব মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিলেন "বিশেষ কিছু নয়, শুধু একটা বিরাট দাঙ্গার আয়োজন ! তোমার নাবালক দাদাটী একেই তো নিরেট আহাম্মক তার ওপর নেহাৎ উজবুক, দেখলুম বিপদে পড়ে সে বেচারা নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কি করি—অগত্যা দয়া পরবশ হই'য়ে একটু এগিয়ে গিয়ে, তার মাথাটা বাঁচিয়ে দিয়ে এলুম !—"

আমিনা একটু হাসিয়া বলিল "আহা তুমি এতদূর শান্তিপ্রিয় সদাশয় মানুষ হয়ে উঠেছ ? তা বেশ ! এখন এবার আমার সঙ্গে কতক্ষণে খুটিনাটি আরম্ভ হবে, ঠিক করে বল দেখি ?"

আহমদ্-সাহেব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিলেন, একটু হাসিয়া পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন "না না, ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বলছি শোন,—দ্যাখো তোমায় চটিয়ে দেবার আগেও আমি মনে করি তোমায় চটাব না, আর—চটিয়ে দেবার পরও আমার বড় অনুতাপ হয় যে আহা কেন চটালুম!—কিন্তু ঠিক্ ঐ চটাবার সময়টিতে—আমার সে সব কিছুই মনে পড়ে না!

আমিনা হাসিয়া বলিল "আহা! কি চমৎকার মহত্ত্ব!"

ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রস্তুত হইয়া,—আহমদ্-সাহেব রুমালটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া একটু নরম সুরে বলিলেন "দ্যাখো, কিন্তু ওর মধ্যে আর একটা কথা আছে জানো, যে,—একহাতে তালি বাজে না?—"

আমিনা দস্তুরমত প্রতিবাদের সুরে, তৎক্ষণাৎ বলিল "বাজে না? কেন বাজ্‌বে না? খুব বাজ্‌বে, এই দ্যাখো—" বলিয়া নিজের বাঁ হাতটা সামনে প্রসারিত করিয়া দিয়া, তার উপর ডান হাতটা উপর্য্যুপরি সশব্দে আঘাত করিয়া সস্মিত মুখে বলিল "দেখ্‌লে এই তো, এমন করেও তালি বাজে!—"

হা হা শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন "নাঃ, আমায় হার মানালে আমিনা! তোমায় এখন আর পেরে ওঠবার্ যো নেই!—বাপ!—"

সলজ্জ সঙ্কোচে আমিনা বলিল "আহা!" তারপর তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য, আলমারীর দিকে চাহিয়া বলিল "যন্ত্রগুলো কাল থেকে নীচেই পড়ে আছে বুঝি, ওগুলো কবে সিদ্ধ করে ওপরে পাঠাবে?"

আহামদ্-সাহেব উত্তর দিলেন "আজই ৯টার সময় ষ্টেরেলাইজ-বক্স থেকে তুলে সাফ্ করে কম্পাউণ্ডার ওপরে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক্ তেম্‌নি যত্ন করে তুলে রেখো। আর, কালকের টাকাগুলো তুলেছ?—"

আমিনা বিস্মিত হইয়া বলিল "টাকা? নাঃ, কই কোথায় আছে টাকা? তুমি তো বলনি আমায় কিছু,"

ততোধিক বিস্মিত হইয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "বলি নি? বাঃ!—" পরক্ষণেই ভুল সংশোধন করিয়া—পুনশ্চ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন "তার মধ্যে—বল্‌বই বা কাকে? কাল যে তুমি মস্ত এক নেশার কাঁধে চড়ে নরলোক ছেড়েই যাত্রা করেছিলে।—"

সলজ্জ হাস্যে অভিমান কুপিত দৃষ্টি তুলিয়া আমিনা বলিল "আবার সেই কথা!—দ্যাখো, এবার কিন্তু—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আহমদ্-সাহেব সুরে সুর মিলাইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "'এবার কিন্তু ভাল হবে না!' না আমিনা—"

একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া আমিনা বলিল "হ্যাঁ—রাতদিন ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না,—থাম। টাকা কোথা রেখেছ—?

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "বালিশের তলায়,—না, না, বোধ হয় এই দোয়াতদানির তলায় রেখেছি, দেখো দেখি, তোলো ওটা,—হাঁ ঐখানেই আছে, গুণে রাখো—"

টেবিলের দোয়াতদানি তুলিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া আমিনা গুণিতে লাগিল। আহমদ-সাহেব নীরবে চা প্রভৃতির সেবায় মন দিলেন।

আমিনা টাকা গণিয়া লইয়া বলিল "এই পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট,—দশটাকার তিনখানা নোট, আর এই খুচ্‌রো সাড়ে বাইশ টাকা, এই তো সব শুদ্ধ?"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "হাঁ, ঐ রকমই কত হবে, আমার ঠিক মনে নাই। খুচ্‌রো কত আছে বল্লে, সাড়ে বাইশ? আচ্ছা ওটা আমার Diurnal বাক্সে রাখ, আর রায় বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর ঐ আশি টাকা—ওটা—"

বাধা দিয়া আমিনা সাগ্রহে বলিল "কি বল্লে। এটা রায় বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর পাওনা? ওঃ!—" পরক্ষণেই একটু দুষ্টামী-মাখা বিনয়ের হাসি হাসিয়া বলিল "তবে আর তুমি এটা নিয়ে কি করবে? এটা আমায় দান করে দাও—"

একটু হাসিয়া কোমল স্বরে স্বামী বলিলেন "তুমি নেবে? তা নাও।—ওটা আর আমার টাকার সঙ্গে রেখো না, একেবারে তোমার ক্যাশে রাখ।" রুমালে মুখ মুছিয়া, মশলার ডিবাটি সামনে টানিয়া লইয়া, মুখে মশলা দিতে উদ্যত হইয়া সহসা কি একটা কথা মনে পড়ায় সকৌতুক হাস্যে সহসা তিনি বলিলেন—"শোন শোন আমিনা, আমার দিকে চেয়ে দেখো—"

আমিনা পিছন ফিরিয়া আলমারী খুলিতেছিল, স্বামীর ব্যস্ত-আহ্বানে বিস্মিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল "কি—?"

প্রচ্ছন্ন-বিদ্রূপে অত্যন্ত বিনয়-কোমল কণ্ঠে স্বামী বলিলেন "বল্‌ছি কি,—আমার ওপর রাগ হলেই তো—ওগুলি আবার ফিরিয়ে দেবে?"

এটা আমিনার চিরাচরিত অভ্যাস! তবে টাকাকড়ি যাহা হাতে লইয়া খরচ করিয়া ফেলিত, রাগ হইলে সেগুলা হাতে হাতে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিতে পারিত না বলিয়া, যথেষ্ট আপেক্ষসূচক অনুতাপের উক্তি শুনাইয়া দিতে ত্রুটি করিত না! স্বামী নীরবে শুনিতেন আর নিঃশব্দ কৌতুকে হাসিতেন! তারপর অবশ্য যথাসময়ে আমিনার রাগ ঠাণ্ডা হইত, এবং সন্ধি হইলেই—সকলের আগে, ফেরৎ দেওয়া সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতেও সে বাধ্য হইত! কিন্তু তা হইলে কি হয়? রাগের সময় রক্ষা থাকিত না!

স্বামীর কথায়—আমিনা বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হ্যাঁ তা দেব!—" বলিয়াই স্বামীর মুখের পানে উজ্জ্বল-স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, পরিস্কার কৈফিয়তের সুরে, অম্লান-বদনে বলিল "দেব না? নিশ্চয় দেব? তোমার ওপরই যখন রাগ করলুম, তখন তোমার জিনিসই বা নিতে গেলুম কেন? তা আমি নেব না—"

ব্যঙ্গ-স্বরে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "অতএব পত্র পাঠ যথাসর্ব্বস্ব ফেরৎ দানই,—রাগের সময় প্রশস্ত বিধি! আচ্ছা আমিনা, ঠাট্টা নয়, রাগ করো না, একটি কথা সত্যি করে বলতো—শুনছ, চেয়ে দেখো আমার পানে,—আচ্ছা, সংসারে এমন কতগুলো জিনিস আছে, যা একবার নিলে, আর ফেরৎ দিতে পারা যায় না,—জানো তো? আচ্ছা, এবার রাগ হলে সেগুলো ফেরৎ দেবার কি ব্যবস্থা করবে বল দেখি—"

ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে ক্যাশবাক্সটা দুম্ করিয়া আলমারী হইতে নামাইয়া, আমিনা একান্ত মনোযোগে হিসাব মিলাইতে সুরু করিল। স্বামীর কথার উত্তরে কিছু বলিল না।

স্বামী পিছন হইতে ডাকিলেন "শুন্‌ছ, জবাব দাও না,"

আমিনা 'টুঁ', 'হুঁ,' কোন শব্দও করিল না।

আমিনার সামনে আসিয়া, দুই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া—আমিনার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া,—আহমদ্-সাহেব পরিহাস-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"শুন্‌তে কি কিছুই পাচ্ছ না?—কথার জবাব নাই কেন?"

সকোপে ঝঙ্কার হানিয়া আমিনা বলিল "আমি জানি না, যাও!"—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! আর নয়! নিদারুণ অনিচ্ছা স্বত্বেও বেচারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মহা অপ্রস্তুতে পড়িয়া,—হঠাৎ সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! আঁচল হইতে চাবিটা খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া,—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিভরা রাগের স্বরে বলিল "এই নাও,—রইল সব! গোছাও তুমি, আমি পারব না চলুম—"

ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার কাঁধ ধরিয়া থামাইয়া স্বামী, ব্যঙ্গ মিশ্রিত বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন "আরে হঃ! তালিম্ দেওয়া তুকিঘোড়াটির মত, তুড়ুক্ করে লাফিয়ে উঠে ছুটছ কোথা? রহো, রহো—"

আমিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হ্যাঁ রইবে বই কি! আচ্ছাঃ! আমি তুর্কি ঘোড়াই হই, আর আরবী ঘোড়াই হই—এবার থেকে তুমি যতক্ষণ ঘরে থাক্‌ছ ততক্ষণ আমি আর ঘরেই ঢুক্‌ছি না!—সকালে বিকালে তুমি বেরুবার পর—আর রাত্রে তুমি ঘুমাবার পর, তবে আমি ঘরে আস্‌ব, মনে রেখো—"

মাথা হেলাইয়া—যেন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদনের স্বরেই আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আচ্ছি বাৎ! এখন ভাল মানুষের মত আমার বাক্সটা গুছিয়ে দিয়ে যাও দেখি!—" আমিনাকে টানিয়া বাক্সের কাছে তিনি বসাইয়া দিলেন।

অস্ফুট স্বরে আমিনা বলিল "হুঁ! আমি যেন পাগল নাকি—তাই খেপিয়ে খাবার যোগাড়! দ্যাখো আমি যতক্ষণ ঘরে থাক্‌বো—ততক্ষণ তুমি—খবরদার—আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, বুঝ্‌লে?—"

হাসা রুদ্ধ অধরে, চক্ষু বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া নীরব সম্মতি জানাইয়া, আহমদ্-সাহেব টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া ষ্ট্যাথেস্-কোপ, থার্ম্মমেটার প্রভৃতি পকেটে পুরিতে লাগিলেন।

বেচারা আমিনা—স্বামীকে কথা কহিতে বারণ করিলেও—তৎক্ষণাৎ নিজে দায়ে পড়িয়া, সে সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল, নিজেই! নোট কয়খানি বাক্সে তুলিতে উদ্যত হইয়া বলিল "তা হ এই টাকাটা আমি নিলুম, বুঝ্‌লে—মহরমের দিন কাঙ্গালী-ভোজন করাব এতে—কেমন?—"

আহমদ্-সাহেব ক্ষণিকের জন্য নীরব রহিলেন। তার পর একটু কাশিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিটি-মিটি চক্ষে আমিনার পানে চাহিয়া বলিলেন "ও সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য ছিল, কিন্তু কথা কইতে বারণ করেছ, নয়? কই বা কেমন করে?"

একটু হাসিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া আমিনা বলিল "তা না হয় কও,—আমি অনুমতি দিচ্ছি। বল কি বলবার আছে?"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "বলছিলুম কি,—এই তো সেদিন বক্‌রীদের সময় কাঙ্গালী-ভোজন করালে। মহরমের দিনও কাঙ্গালীদের ভোজনটা যেখানে হোক যথেষ্ট পরিমাণে জুট্‌বে, তার ওপর কেন আর তুমি আড়ম্বর করে গোঁজামিল দিতে যাবে; তার চেয়ে, যদি যথার্থই টাকাগুলি সদ্ব্যয় করতে চাও; তা হলে সামনে এই শীতকাল আস্‌ছে, খানকতক কম্বল কিনে—অন্ধ, আতুর, কাণা, খোঁড়া—যারা যথার্থ পাবার পাত্র, তাদের দান কর, দান সার্থক হবে। শীতের সময় তারা গায়ে দিয়ে বাঁচ্‌বে।"

আমিনা একটু ভাবিয়া বলিল "ঠিক বলেছ, ওটা আমার মনেই পড়ে নি। —তাই করব, কিন্তু—" একট ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "এই ক'টি তো মোটে টাকা, এতে ক'খানিই-বা কম্বল হবে, আর কিছু দাও না—" বলিয়াই

পরম উৎসাহের সহিত বলিল "তোমায় পকেট থেকে বার করতে হবে না। ইতিমধ্যে এম্নি ধরণের যদি আর একটি 'কল' পাও, তবে সেই টাকাটি আমায় দিয়ে দিও,—বুঝ্লে?—তা হলেই এক রকম হবে।"

আহমদ্-সাহেব একটু হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

আমিনা ক্যাশবাক্স বন্ধ করিয়া আলমারীতে তুলিয়া কি একটা কাজের জন্য টেবিলের কাছে সরিয়া গেল। আহমদ্-সাহেব তখন টেবিলের আয়নার সাম্নে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া, কপালের চুল সরাইয়া সোলা হ্যাটটি ঠিক করিয়া মাথায় বসাইতেছিলেন, আমিনাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "কেমন, সাজসজ্জা ঠিক হয়েছে? যম রাজার মহাবল পরাক্রান্ত অনুচরগুলির সঙ্গে লড়াই করে জিতে উঠ্তে পারবো তো?—"

আহমদ্-সাহেবের কথাগুলি বোধ হয় কিছু বেশী মাত্রায় নীচু স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, বেচারী আমিনা সেগুলা ঠিক যথাযথ রূপে শুনিতে পাইল না,—সে একটুখানি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া,—আন্দাজেই একটা যুক্তি-সঙ্গত সুমীমাংসা ঠিক করিয়া লইয়া পাত্‌লা টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি উল্টাইয়া, থপ্ করিয়া জবাব দিল "কী! লড়াই আর লুট! তা তোমার তো কোন বিদ্যারই কসুর নাই, ও দুটি বিদ্যায় হাত পাকাবে, ও-আর বেশী কথা কি?"—বলিয়াই সে হিসাবের খাতাটি ও দোয়াত কলম টানিয়া লইয়া, পরম নিশ্চিন্তভাবে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হিসাব লিখিতে উদ্যত হইল।

"কোন বিদ্যারই কসুর নাই? কোন বিদ্যারই না? চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি, দাগাবাজি—" বলিতে বলিতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া আহমদ্-সাহেব নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সহসা দুহাতে আমিনার কটি-বেষ্টন করিয়া নিকটে টানিয়া বলিলেন—"আর, আর,—বল বল আর কি?—"

লেখায় বাধা পাইয়া, আমিনা মহা বিরক্তির সহিত প্রবল গাম্ভীর্য্যে বলিল "আঃ, ছাড় ছাড়,—সময় নেই, অসময় নেই, কি যে রঙ্গ কর, তার ঠিক নেই,—ছাড়—। দ্যাখো, এই রইল তবে, তুমি লিখো—" আমিনা রাগ করিয়া কলম ফেলিয়া দিল।

আহমদ্-সাহেব পরম আশ্বস্ত ভাবে বলিলেন "যাক!—এবার বল, আর—আর কি?—"

আমিনা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল "আমি জানি না, যাও—"

বাঁ-হাতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ব্যস্, একটু সরে এসে বল, তারপর?—"

আমিনার রাগও ধরিয়াছিল, হাসিও পাইতেছিল—বিপন্ন হইয়া হঠাৎ সে টুক্ করিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া দুহাতে সবলে স্বামীর হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখ গুঁজিয়া, হাসিয়া ফেলিল। তাহাকে উঠাইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "শোন-না, শোন—"

বারেণ্ডা হইতে আবলু-সাহেব ডাকিলেন "আহমু—"

মুহূর্ত্তে আমিনাকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "হাঁ জী—এস,—ঘরেই আছি।"

মুক্তি পাইয়া আমিনা শশব্যস্তে উঠিয়া—তৎক্ষণাৎ দে ছুট্! পোষাক-কামরার দিকের দুয়ার খোলা ছিল, সুতরাং সে সেই পথেই প্রস্থান করিল, যাইবার সময় পর্দার আড়াল হইতে—দুষ্ট কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি বাড়াইয়া একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলিল "বেশ হয়েছে!"

আবলু সাহেব ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্রতিভভাবে ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "আমিন্ এইখানে ছিল, আমি তো জানিতাম না!—

আহমদ্-সাহেব তখন টেবিলের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া হিসাবের খাতাখানির দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি সংযত করিয়াছেন! যেন—এতক্ষণ তিনি একমনে হিসাবের খাতাই দেখিতে ছিলেন! আবলু-সাহেবের কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া সুগম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"তুমি তা না জানায়, তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি শুধু আমারই হিসাবের খাতায় জমার ঘরে একটা মস্ত অঙ্ক বাদ পড়ে গেল! আর একটু হলেই আমার হার্টফেল হয়ে গিয়েছিল আর কি!"—

শেলফের বইগুলার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে আবলু সাহেব উত্তর দিলেন "তোমার মত হার্টলেস মানুষের হার্ট ফেল হবে, সে যে নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না! -"

ধমক দিয়া আহমদ বলিলেন "নিমকহারাম! এই না তোর ঘরে গিয়ে কত কষ্টে অমন সুন্দর ঘটকালীটা করে এলুম—"

শেলফের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া আবলু বলিলেন "যেমন তুমি, তেম্নি তোমার ঘটকালী! পরিণাম তার, চমৎকার শোচনীয়!"

তর্জ্জন করিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "কি! আমার ঘটকালী ব্যর্থ? এ যে অসম্ভব!"

পরক্ষণেই স্বর বদলাইয়া একটু কৌতূহলের সহিত বলিলেন "সত্যি তামাসা নয়, কি হোল রে আবলু?

আবলু-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বইখানার পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বলিলেন "সেটা সাধারণের নিকট অবক্তব্য!—"

আহমদ্-সাহেব অধীরভাবে বলিলেন "আরে উল্লুক আমি সাধারণের সামিল নই, আমি একটা মস্ত অসাধারণ! বল এখন—"

চশমার ভিতর হইতে—সলজ্জ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবলু-সাহেব নিম্নস্বরে বলিলেন "তুই ষ্টুপীড্ এখনি আমিনার কাছে গল্প করবি তো? না তোকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এইটুকু জেনে রাখতে পারিস,—চটে-মটে, ঘর ছেড়ে পিট্টান দিয়েছে, আর শাসিয়ে গেছে, যে আর এ মহলে আসছে না, আজ রাত্রে যেখানে হোক আশ্রয় নেবে!—"

মাথার টুপী খুলিয়া মাথা চুলকাইয়া, চিন্তিতভাবে একটিপ নস্য টানিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ওরে ইনিও যে তোর বোনের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠলেন! এদের এসব ব্যামো কিসে ঘোচে বল দেখি?—"

কৌতুক-স্মিত হাস্যে আবলু-সাহেব বলিলেন "তুই তো হাকিম, দাওয়াই বাৎলানোর দায় তোর!—"

মাথা চুলকাইয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তা বটে!"—তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন "হুঁ! পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করাটা, বড় আপশোষের কথা! আচ্ছা বন্ধু তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দাওয়াই বাৎলানোর ভারটা আমিই নিলুম!

আবলু-সাহেব বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "দাওয়াইটা কি হবে শুনি? ষ্টিমুলেণ্ট মিকশ্চার?"

তাহার কাঁধে চপেটাঘাত করিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন 'অবসাদগ্রস্ত মুমূর্ষুর পক্ষে সুপ্রযুক্ত ঔষধ তাই! দাঁড়া, অনেকগুলি কাহিল রোগী হাতে আছে, আগে সে গরীবদের দেখে আসি, তারপর এঁদের চিন্তায় মন দেব!—"

টুপীটি তুলিয়া লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

(১১)

কিন্তু গরীবদের দেখিতে গিয়া, দৈববিড়ম্বনায় চিকিৎসক মহাশয় এক ধনবান রোগীর পাল্লায় পড়িয়া সেই দিনই সাড়ে এগারটার ট্রেণে বক্সার চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে কাহারও সহিত দেখা হইল না,—আমিনার সহিতও নয়। তারপর সেখানকার কাজ্ সারিয়া চার দিন পরে মহরমের শেষ উৎসবের পূর্ব্ব দিন বেলা সাড়ে চারটার সময় বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ডাক্তারখানায় ঢুকিয়া প্রথমেই কম্পাউণ্ডারদের নিকট রোগীদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানিয়া লইয়া তিনি সরাসর দ্বিতলে উঠিলেন। রুস্তম পোষাকের ব্যাগ লইয়া পিছনে পিছনে উপরে চলিল।

দ্বিতলের বারেণ্ডায় আবলু-সাহেব তখন একখানা ইজি চেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়া কি একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়িতেছিলেন। শ্রান্ত ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া শশব্যস্তে, মমতাপরবশ চিত্তে চেয়ারখানি তাহাকে সরাইয়া দিয়া, নিজে একটা টুল লইয়া বসিলেন। তারপর চিকিৎসা চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের সম্বন্ধে সংক্ষেপ সংবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রুস্তম পোষাকের ব্যাগ নামাইয়া দিয়া, আহমদ্-সাহেবের জুতামোজা খুলিয়া দিতে বসিল।

জুতামোজা খুলিয়া, পোষাক উৎরাইয়া পরিবার জন্য প্রভুকে 'ধোতি ও কুর্ত্তা' দিয়া রুস্তম নিজ মনেই বুদ্ধি খাটাইয়া, আমিনার খোঁজে চলিল। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উৎসাহ-উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া-ই ডাকিল "জনাব—"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে, কথোপকথনরত শ্যালক-ভগিনীপতি এক যোগে চমকিয়া বলিলেন "কি হয়েছে ?—"

আবলু-সাহেব যে সেইখানে ছিলেন, উৎসাহ-উন্মত্ত রুস্তম সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, নচেৎ সে এমনভাবে আদব-কায়দা বিগর্হিত চালে অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার 'জনাব'কে ত্রস্ত-আবাহনে চমকিত করিতে সাহসী হইত না! এতক্ষণে হুঁস্ হইতেই কুণ্ঠা-ভীত নয়নে আবলু-সাহেবের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া, অপ্রতিভভাবে ঘাড় চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে, গুটি-গুটি চরণে, নিতান্ত ভাল মানুষের মত গজেন্দ্রগমনে আসিয়া—আহমদ্-সাহেবের চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল, তারপর বিনাবাক্যে নিঃশব্দে তাঁহার পরিত্যক্ত পোষাকগুলি লইয়া পোষাক-কামরায় গমনোদ্যত হইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আহমদ্-সাহেব সবিস্ময়ে বলিলেন—"কি হয়েছে রে ?"

রুস্তম থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ঘাড়ে আবার কি ব্যাধির উপদ্রব ঘটিল কে জানে,—সে ব্যতিব্যস্তভাবে উপর্য্যুপরি ঘাড় চুল্‌কাইতে-ই লাগিল! প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিবার অবকাশই যেন পাইল না!—আবলু-সাহেব যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কি বল্‌তে এসেছিলি, বল,—থাম্‌লি কেন ? কি খবর ?—"

একটু থমকিয়া—স্তিমিত নিষ্প্রভ নয়নে বারেণ্ডার মেঝের শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে—কুণ্ঠা জড়িত স্বরে রুস্তম বলিল "খবর কিছু নয় হুজুর,—বিবি-সাহেবা উপর-মহলে নেই, তাই বল্‌তে এসেছি।"

আবলু বলিলেন "কোন্ বিবি-সাহেবা ? আমিনা ?—কোথায় সে ?—"

রুস্তম বিচলিতভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর সভয়-চক্ষে আবলু-সাহেবের উৎকণ্ঠা-ব্যগ্র দৃষ্টির দিকে আর একবার চাহিয়া হঠাৎ আহমদ্-সাহেবের পানে ফিরিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিয়া ফেলিল "তাঁরা দু'জনে, বহুজী সুদ্ধ—কুয়াতলায় বাসন মাজ্‌তে গেছে, হুজুর।"

মুহূর্ত্তে আহমদ্-সাহেবের দৃষ্টি পরিষ্কার হইল! পূর্ব্বকথা মনে পড়িল! তড়াক্ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া উৎসাহ-ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন—"কি—কি—কি? বাসন মাজ্‌তে গেছেন? বহুজী সুদ্ধ? নীচে কুয়া-তলায়?—"

এতক্ষণে রুস্তম যেন ধরে প্রাণ পাইয়া বাঁচিল!—গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, পরম আগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"জী, হাঁ! বাঁদীরা দাঁড়িয়ে হাসছে উঁরা দুজনে বাসন মাজ্‌ছেন্।—" একটু থামিয়া বলিল "আবো ভি বহুৎ বর্‌তন্ মাল্‌নেকো জমায়েৎ হ্যায় জনাব—"

আহমদ্-সাহেব সাগ্রহে বলিলেন "এখনও ঢের 'বর্‌তন' আছে? তুমি কি বলেছ তাঁদের, আমি এসেছি?—"

রুস্তম বলিল "কিছু না হুজুর, তাঁরা আমায় দেখ্‌তেই পান নি। আমি চুপি চুপি পিছু হেঁটে পালিয়ে'এসেছি। তাঁরা কেউ টের পান নি।"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাস্য রোধ করিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "কে আছে সেখানে? ফুফুজী,—খোকার মা—"

রুস্তম ব্যগ্রতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল "কেউ না হুজুর, কেউ না। তাঁরা সবাই এখন ঘুমুচ্ছেন, সেখানে সেরেফ্ বাঁদীরা আছে, তবে তুফানী দিদিও আছে হুজুর—" বলিয়া ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া সে একটু অপ্রসন্নভাবে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ তুফানী দিদির উপস্থিতিটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়!

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ঠিক বল্‌ছ, ফুফুজী সেখানে নাই?—"

রুস্তম দৃঢ়তার সহিত বলিল "না জনাব, তিনি এখন সেখানে যাবেন না—এ ঠিক্।"

আহমদ্-সাহেব বলিল "রুস্তম, ঘরে টেবিলের বাঁ পাশের ড্রয়ারটা খুলে দ্যাখ, গোটাকতক আধ্‌লা পয়সা আছে, দুটো বের করে আন,—চট্ করে—"

ঝুপ্ করিয়া পোষাকগুলা চেয়ারের হাতার উপর ফেলিয়া দিয়া, একলম্ফে রুস্তম ঘরে ঢুকিয়া, একটানে হড়াশ্ করিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া, দুটি আধ্‌লা পয়সা লইয়া ক্ষণমধ্যে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। আহমদ্-সাহেব সে দুটা হাতে লইয়া, আব্‌লু-সাহেবকে ঠেলাদিয়া বলিলেন "ওঠ।"

আব্‌লু-সাহেব এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়াছিলেন, এবার সবিস্ময়ে বলিলেন "কোথায়? সেখানে নাকি?"

আহমদ্-সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন "রুস্তম, এগিয়ে দেখ্ বাচ্চা, ফুফুজী সেখানে এসেছেন, না কি—"

আজ্ঞা মাত্রে রুস্তম ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত লম্ফ দিয়া ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "চল্ আব্‌লু, নতুন বাঁদী দুটির তলব্ চুকিয়ে দিয়ে আসি।—"

সভয়ে পিছু হাটিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন "তোমার মরণ-বাড় বেড়েছে, নয়?…তারপর?—"

আহমদ্ সাহেব বলিলেন "তারপর আর কি? তোমার বিবিসাহেবা এবার চটে গিয়ে কি করেন দেখা যাক্—"

ঘাড় নাড়িয়া আবলু-সাহেব বলিলেন "না ভাই, আহ্‌মু, অত দেখাদেখিতে আমার সাহস নেই, ওসব দিকে আমার বুদ্ধি খেল্‌বে না—"

আহমদ্-সাহেব তাঁহার ঘাড় ধরিয়া রীতিমত ধাক্কা দিয়া বলিলেন "আলবাৎ খেল্‌বে। 'চালালেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চালালেই হত বুদ্ধি'—জানো তো, ভড়্‌কাচ্ছ কেন ?—"

কিন্তু এত উৎসাহ সত্বেও আব্‌লু-সাহেব পুনশ্চ পিছু হাটিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "না না, তুই বুঝ্‌ছিস্ না, ওদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিটা ভয়ানক বেশী, এখনি হয় তো মার কাছে কিম্বা দিদির কাছে গিয়ে নালিশ কর্‌বে—"

আহমদ্-সাহেব সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন "খেপেছিস্ তুই, তা পারবে না. চল—"

ঘোর বিপদে পড়িয়া আব্‌লু সাহেব সকাতরে বলিলেন "দোহাই আহমু, আমায় বাদ দিয়ে চল ভাই, দেখ্ একে তো সেখানে আমিনা আছে—"

হাসিয়া পরিহাস ভরে ঘাড় নাড়িয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তেম্নি তুই তো আমি ও যাচ্ছি হে.—"

বাধা দিয়া আব্‌লু-সাহেব বলিলেন "তারপর—" বলিয়াই তিনি একটু থামিয়া. হাসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা নাই,—সেই দিন থেকে—"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ঘাড় উচুঁ করিয়া—আহমদ্-সাহেব তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "কথা নাই ? কেন ? তুই কথা কস্‌নি, কেন রে উল্লুক—"

মৃদু হাস্যে আব্‌লু সাহেব উত্তর দিলেন "কার সঙ্গে কথা কইব রে উল্লুক ! দেখা পাই না যে—"

"অঃ" বলিয়া আহমদ্-সাহেব মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া একটু ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন "আচ্ছা চল্, তবে দস্তুরমত দুষ্‌মনীই সুরু করা যাক্ ! তোর বোনের ঘোর সন্দেহ যে, আমি তার—না'লক দাদাটিকে অহোরাত্র তালিম্ দিয়ে শিখিয়ে শিখিয়ে সাবালক করে তোলবার চেষ্টায় আছি, চল তো ভাই, আজ তার সন্দেহটা নির্ম্মূল করে দিয়ে আসি—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, রুস্তম সিঁড়ির দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া. সুদক্ষ গুপ্ত চরটির নিঃশব্দে আহ্বান-সঙ্কেত করিল ! আব্‌লু-সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল, আহমদ্ সাহেব জুতা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে নগ্নপদে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া দ্রুত ছুটিলেন ! অগত্যা আব্‌লু-সাহেব ভাল মানুষের মত নিজেও জুতা খুলিয়া ফেলিলেন।

পথপ্রদর্শক রুস্তম, বন্য খরগোশের মত লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়া নিঃশব্দে আগে আগে ছুটিয়া চলিল, পিছু পিছু চলিলেন তাঁহারা !—এদিকের সিঁড়ি বহিয়া তাঁহারা সোজা রান্নামহলের উঠানে নামিয়া আসিলেন, সামনেই একজন দাসী ঘর ধুইতেছিল. আর একজন উঠান ঝাট দিতেছিল, তাহারা সসম্ভ্রমে ঝাঁটা ফেলিয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময় নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল !

রুস্তম বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া, কুয়াতলার কাছাকাছি হইয়া, একটু দূর হইতে—পরম মোলায়েম ভাবে নাকি সুরে হাঁকিল "তুফানি দিদি, তুয়া সে হট্ বাও—"

তুফানী বোধ হয় প্রহরা-ব্যপদেশেই কুয়াতলার দুয়ারে অবস্থান করিতেছিল. কিন্তু সে সময় কোনদিকেই ভয়ের সম্ভাবনা না থাকায় সে বেচারা বোধহয় অতিরিক্ত মাত্রায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে—তাহার 'সতর্ক-নজরটা' বাহিরের দিকে না রাখিয়া ভিতরের দিকেই—কর্ম্ম নিরতা বিবি সাহেবাদের. নৈপুণ্য-ত্রুটি সংশোধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চির-চঞ্চল রসনা মহাশয়ও সকৌতুকে আস্ফালিত হইতে ত্রুটি করিতেছিল না !—এ হেন সুখ সৌভাগ্যের মাঝে রুস্তমের একান্ত বেসুরা কণ্ঠস্বরটা তুফানীর কানে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঠেকিল, ত্রস্তে পিছু ফিরিয়া,

অকস্মাৎ রস্তমের পিছনে যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া,—সে যেন হতভম্ব হইয়া গেল! বিবি সাহেবাদের সাবধান করিয়া দেওয়া চুলায় যাউক,—সে আর নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসুৎ পাইল না! ক্ষিপ্র হস্তে ঘোমটা টানিয়া সুট্ করিয়া সেখান হইতে কোনদিকে সরিয়া পড়িল!

ক্ষণমধ্যে আব্লুকে টানিয়া লইয়া আহমদ্-সাহেব কুয়াতলার দুয়ারে হাজির! একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল "কৈ? মুন্সী-সাহেবদের বাড়ীর নতুন বাঁদী দুটী কৈ? এই যে! আহা মরি মরি;—এমন না হলে কি বড় লোকের বাড়ীর বাঁদী বলে মানায়? আসুন সাহেব দেখুন, কি নসীবের জোর আপনার! কি খপ্সুরথ শোভা! আহা মরে যাই, মরে যাই—"

আমিনা ও ইনেব তখন কোমরে আঁচল জড়াইয়া হাতের কনুই পর্য্যন্ত সুর্কি, ছাই, খোল মাখিয়া একাগ্র মনোযোগে ঘাঁড় হেঁট করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে থালা বাটি রগ্ড়াইতেছিল সহসা এই অভিনব সম্ভাষণে বিষম চমক খাইয়া—ঘাঁড় তুলিয়া চাহিয়া দুজনেই যেন নিমেষ মধ্যে বজ্রাহত হইল! পরক্ষণে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া সেই ছাই মাখা হাতেই মাথার কাপড় টানিয়া দুজনে সন্ত্রস্তভাবে দু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল!—অবশ্য দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া।

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আবলু-সাহেব লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন "ছাড়, আহমু ছাড় আমি এবার চলে যাই—"

সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "যাবেন কি মশাই? সে কি কথা!—খোদা আপনাকে এমন সব আশ্চর্য্য দৌলতে দৌলতবান্ করেছেন আপনি সে সৌভাগ্য আমায় দেখাবার জন্যে মেহেরবাণী করে এতদূর অবধি টেনে নিয়ে এলেন—"

প্রতিবাদ করিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন "আমি টেনে এনেছি! আশ্ আহমু ফের মিথ্যে কথা বল্বি......"

চোখ টিপিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আহা থামুন, থামুন, তাও আর লজ্জা কি? বন্ধুলোক আমি মশাই—। আদাব্ বিবি সাহেব, বেয়াদবী মাফ্ করবেন—আসুন মুন্সী সাহেব,—বেচারা বড় মুখ করে বড়লোকের বাড়ীতে খাট্তে এসেছেন, অনেক পাওনার আশা রাখেন, কিছু ভাল রকম বখশীস্ দেন—" বলিয়া একটি আধ পয়সা আব্লুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া,—ইনেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

প্রাণপণ অনিচ্ছায় হাত টানিয়া লইয়া আব্লু-সাহেব বলিলেন "তুমিই দাও না—"

জোর-গলায় আহমদ্-সাহেব বলিয়া উঠিলেন "ছোঃ! ওকথা কি বলতে আছে?—" সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটিয়া মাথা নাড়িয়া,—দৃঢ় মুষ্টিতে আব্লুর হাত ধরিয়া, হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, ইনেবের সন্নিকটে উপস্থিত করিলেন। বিপন্ন আবলু সাহেব অগত্যা আধ পয়সাটি ফেলিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "আমার দায় দোষ নাই। এ সব, আহ্মু পাজীর বদ্মাইসি, আমিনা তোমরা আমার ওপর রাগ-টাগ কোর না—" বলিয়াই তিনি হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেলেন। আর পিছন ফিরিয়া চাহিলেন না।

আহমদ্-সাহেব সসৌজন্যে ইনেবের উদ্দেশে বলিলেন "এই নেন, আপনার পাওনা মুন্সী সাহেব চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, এবার আপনার সঙ্গিনীর পাওনাটা, বুঝে নেন, এই রইল—" হেঁট হইয়া তিনি ইনেবের পায়ের কাছে অন্য আধ পয়সাটি ফেলিয়া দিলেন।

আমিনা এতক্ষণ ঘোমটা টানিয়া, আড়ষ্ট কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার ঘাড় ফিরাইয়া ঘোমটার ভিতর হইতেই একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল 'দাদা গিয়াছেন কি না'—! তারপর মুখ তুলিয়া ভ্রুকুটী করিয়া রূদ্ধস্বরে বলিল "আর কিছু পারলে না? বাড়ীতে পা দিয়েই আমাদের সঙ্গে শয়তানী জুড়ে দিলে!—"

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গভীর আক্ষেপের স্বরে আহমদ্-সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"এর নাম শয়তানী জুড়ে দেওয়া হোল! বাঃ, হায় খোদা, দুনীয়ায় কারুর উপকার করতে নেই, সংসারের মানুষ এম্নিই অকৃতজ্ঞ বটে!"—

"হাঁ, সংসারের সবাই অকৃতজ্ঞ, শুধু তুমিই খুব সুকৃতজ্ঞ সদাশয় মানুষ! থাম এখন—" বলিতে বলিতে বেচারা আমিনার চোখ দিয়া সত্য সত্যই রাগে জল বাহির হইয়া পড়িল!—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া হাতের উল্টা পিঠে করিয়া ঘোমটার কাপড়ে চোখের জল মুছিয়া ত্রস্ত স্বরে বলিল "যাও, ঢের হয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে আর রঙ্গ দেখতে হবে না, দয়া করে সর এখন—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "এই যে সর্‌ছি দয়া করে, কিন্তু শোন দেখি, একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে, শোন,—শোন,—" আহমদ্-সাহেব তাহার ঘোমটার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একটু নিম্নস্বরে বলিলেন "শোন দেখি, একটা বলি আব্‌লুর বিবি কি সত্যিই তোমার—লাখরাজ,—না পীরোত্তর সম্পত্তি, যে এমন বেহিসেবী চালে, নিস্পরোয়াভাবে তাঁকে দখল করে বসেছ! বেচারা আব্‌লু যে একবারও তাঁকে চোখের দেখা দেখ্‌তে পায় না, এইটাই বা কি রকম কথা?"

আমিনা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল! তারপর বিস্ময়ে এবং কতকটা রাগেও বটে, মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল "কী! আমি ইনেবকে দখল করে বসেছি! শোন ইনেব শোন, শোন একবার কথা গুলো!—তখন তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করতে না,—খালি বল্‌তে তোমার পায়ে পড়ি আমিনা দিদি, হাতে ধরি আমিনা দিদি, মাথা খুঁড়ি আমিনা দিদি,—এবার দ্যাখো বিনা দোষে আমিনা দিদির মাথায় কত দোষ পড়্‌ছে, এবার আমিনা দিদির মাথা কে বাঁচায় বল দেখি!—" অশ্রু উচ্ছল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলল "এখন ইনেব আমারই লাখরাজ সম্পত্তি, পীরোত্তর সম্পত্তি হবে বৈ কি! কিন্তু তখন আমি ওকে ডেকেছিলুম, না ঐ—নিজে থেকে ছিনে জোঁকের মত আমায় পেয়ে বসেছিল! জিজ্ঞাসা কর না ওকে, আমি পঞ্চাশ বার ওকে বলেছি যাও দাদার ঘরে,—তবুও কথা শোনে নি,—এখন আমারি দোষ!—" কথা বলিতে বলিতে আমিনার চোখে জল আসিয়া পড়িল!

এবার আহমদ্-সাহেব ভিতরে-ভিতরে একটু বিপদগ্রস্ত হইলেন,—আন্দাজের জবরদস্তী করিয়া যে মানুষটির ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া ফেলিয়াছেন, সে মানুষটি রাগের চোটে এখন কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন—মর্ম্মে, মর্ম্মে! কিন্তু মুখে 'খাটো' হইবার পাত্র ত তিনি নন, কাযেই নিজের 'আন্দাজী-চালটা' এখন সোজাসুজি স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইল না! নিরীহভাবে ঘাড় চুল্‌কাইয়া একবার দুয়ারের দিকে চাহিলেন, তার ইনেবকে লক্ষ্য করিয়া,—অতীব কোমলতার সহিত—খাঁটি পঞ্চম সুরে বলিলেন "তা যাক্ যা হয়ে গিয়েছে, তা বয়ে যেতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ, ওসব বাজে কথা নিয়ে বকাবকি করা নিস্ফল। এখন ছিনে জোঁক মহাশয়া, আপনি মেহেরবাণী করে ক্ষান্ত হোন, যা হয়ে গেছে, যাক! এখন যা হওয়া উচিত, আপনি সেই চেষ্টায় মন দেন, বুঝ্‌লেন্? মুন্সী সাহেবের সঙ্গে মিট্‌মাট্ করে ফেলুন। কেমন, রাজী তো? বলুন আমার অনুরোধ রাখ্‌বেন? বলুন—"

ইনেব অভ্যস্ত কলের পুতুলটির মত ঘাড় নাড়িল, না হইলে সে বেচারার নিস্তার ছিল না, তাহা সে ঠিক জানিত। এই একটি অনুরোধ পালনে অস্বীকৃত হইলে, এখনই যে দশলক্ষ উপরোধের বোঝা তাহার ঘাড়ে স্তূপীকৃত হইবে, সে ভয়টা তাহার অত্যন্তই ছিল সেই জন্য, দায়ের পাট সারিয়া সে ত্রস্তে ঘাড় নাড়িল।

আহমদ্-সাহেব পরম আশ্বস্ত চিত্তে, সসৌজন্যে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আদাব বহুৎ আমি, আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম, জানবেন। আর আপনাকে জ্বালাতন করার জন্যে যেটুকু অপরাধ হয়েছে, নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন।—"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া দুয়ারের কাছ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া আমিনার দিকে চাহিয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন "তুমিও কিছু মনে-টনে কোর না যেন, বুঝ্‌লে—"

আমিনা তখন গালে হাত দিয়া গুম্ হইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাঁহার এই অভিনব সুর পরিবর্ত্তন শুনিয়া, বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া বলিল "কি ?—"

আহমদ্-সাহেব ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন "এই বল্‌ছি যে রাগ-টাগ কোর না—"

এতক্ষণে আবার আমিনার মনের মধ্যে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল! সজোরে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল "নাঃ, করবো না! আচ্ছা, তুমি যাওতো এখন—"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "অর্থাৎ—'ভবিষ্যতে দেখা যাবে ?' না, না, ওসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দাও—ওগুলা ভয়ানক অন্যায়!—" যেন নিজে তিনি সমস্তই ন্যায়সঙ্গত কাজ করিয়াছেন ও তাঁহার ব্যবহার-গুলিও আদ্যোপান্ত নির্জ্জলা ভালমানুষীর পরিচয়ে পূর্ণ! কিন্তু আমিনার তখন রাগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, কাজেই সে আর কলহ করিতে পারিল না, অস্ফুট স্বরে শুধু বলিল "হুঁ!—"

আহমদ্-সাহেব একটু চিন্তিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

স্মৃতির ভরা। *

——:*:——

আজো সে মুখখানি পরাণে রাজে গো,
বেদনা-বিদলিত হৃদয় মাঝে গো!
জ্যোছনা-ধারা-সম প্রণয়-সুধারাশি,
অধরে অনুপম মধুর মৃদু হাসি,

* গান। স্বর্গীয় রজনীকান্তের "প্রাণের পথ বয়ে" সুর।

করুণা-ছল-ছল নয়নে আঁখিজল,
মাধুরী-ঢল-ঢল মোহন সাজে গো!
পড়ে গো পড়ে মনে চাহিয়া মুখে মম
কহিল—'যাই তবে, যাই হে প্রিয়তম,—'
মুছাতে আঁখি ধারা কাঁদিয়া হনু সারা,
আজো সে শেষ-বাণী মরমে বাজে গো!
হারায়ে গেছে সব, ফুরায়ে গেছে খেলা,
স্মৃতির ভরা লয়ে কাটিছে সারা বেলা,
দু'দিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল,
দু'দিনে লুকাল সে স্বপন মাঝে গো!
শুষ্ক হিয়া আজি, ছিন্ন বীণা তার,
তৃষিত ভাঙা বুকে হাহারব অনিবার,
মরণ আসি কবে বেদনা জুড়াইবে,
আছি সে পথ চাহি আঁধার সাঁঝে গো!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

আমাদের হিন্দুর নারীপূজা।

আজন্মকাল শুনিয়া আসা যাইতেছে, আমাদের এই হিন্দুধর্ম্ম বড় উদার; এই সনাতন ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির প্রতি বড় সমাদর, বড় সম্মান; নারী জাতিকে পূজা করিবার কথা আছে; হিন্দুর কাছে নারী—দেবতা।

যখন এই হিন্দুসমাজের বহুবিবাহ, অসংখ্য বিবাহের বিষয়, বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরবের কৌলিন্য প্রথা মনে আসে, যখন ঘরে ঘরে হিন্দুবিধবাগণকে দেবী বানাইবার বন্দোবস্তের ব্যবস্থানিচয় দৃষ্টিগোচর হয়; যখন আত্মীয়কুটুম্ব পরিচিত অপরিরিচিত স্বজাতির "হাঁড়ির খবর" জানিতে পারা যায়, দেশের লোকের সামাজিক ও সাংসারিক আচার-ব্যবহার প্রণিধানপূর্ব্বক দর্শন করা যায়, তখন আদর-সম্মানের কথাটা মোটের উপর কথার-কথা ভিন্ন আর কিছু মনে ত হয় না। কোন্ ধর্ম্মেই বা কথায় ও কাজে, উপদেশ ও আচরণে বিশেষ রকম মিল বা সঙ্গতি দৃষ্ট হয়? হিন্দুধর্ম্মই যে একা ধরা পড়িয়াছেন এমন নহে। তবে কিনা আমাদের এই হিন্দুজাতির আপনার ঢকা আপনি বাজাইবার সখটা বড় অধিক।

অনেকের মুখে—বিশেষতঃ প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞজনের নিকট শুনা গিয়া থাকে,—এখন সময় পড়িয়াছে মন্দ, কেহ কিছু মানে না, শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ পালন করে না, তাই এখনকার কালে নানা অবিচার অত্যাচার অনাচার

ঘটে, কিন্তু আগেকার কালে—(কোন্ স্বর্ণ যুগে কে বলিবে ?)—লোকে বড় ধার্ম্মিক ছিল, নিষ্ঠাবান্ ছিল, শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল, তখন এমন সব হইত না। সত্য না কি ?

আমাদের শাস্ত্র সব মুনি-ঋষিগণ প্রণীত; তাঁহারা ছিলেন অগাধ পণ্ডিত, অসীম জ্ঞানী, দেবজ্ঞানিত ব্যক্তি, দেবতা-বিশেষ। স্থলে স্থলে দেবতার চেয়েও বড়; কেননা দেখা যায়, অনেক সময়ে দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। অনেক মুনি অনেক শাপে অনেক দেবতাকে অনেক প্রকারে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। এহেন মুনি-ঋষিগণ—তাঁহারা ত্রিকালদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ—তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ দেখাইবার বাসনা আছে।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ এবং তাহার বিধিনিষেধ, স্মৃতি ও পুরাণ মধ্যেই লিপিবদ্ধ। স্মৃতি ও পুরাণ সমূহেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা সেই সকল হইতেই অল্প-স্বল্প উদ্ধৃত করিব। অন্যত্র হইতেও কিছু শুনাইব।

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের ভিতর ভগবান মনুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মনু-রচিত সংহিতাতে আছে—　　"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"　৩ অঃ ৫৬ শ্লোঃ

যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, পূজা আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন।

শুধু তাহাই নহে; অপিচ—　"যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"　৩ অঃ ৫৬ শ্লোঃ।

যে পরিবারে স্ত্রীলোকে পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ধর্ম্ম সমুদয় বৃথা হইয়া যায়!

মহৎউক্তি কে না স্বীকার করিবে ? এই সঙ্গে আরও রহিয়াছে—

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"* ৩ অঃ ৫৭ শ্লোঃ।

যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোনও দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়!

এই সকল শ্লোক পাঠ করিলে, স্ত্রীলোকের সম্মান ভগবান মনুর নিকট বিলক্ষণ উচ্চশ্রেণীর ছিল মনেই ত হয়।

ইহার সহিত মহর্ষি আবার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানিব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥" † ৩ অঃ ৫৮ শ্লোঃ।

* "স্ত্রিয়স্তুষ্টা শ্রিয়ঃ সাক্ষাৎ রুষ্টাশ্চ দুষ্টদেবতাঃ।
বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টাঃ নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ॥"　(বৃহৎ পরাশর।)

স্ত্রীগণ সন্তুষ্ট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; রুষ্ট হইলে দুষ্টদেবতা স্বরূপ; সন্তুষ্ট হইলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি করেন, অপমানিত হইলে কুলনাশিনী হয়েন।

† "আয়ুর্ব্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।
নশ্যন্ত্যেতে তদাপ্রীতৌ তাসাং শাপাদ সংশয়ঃ॥"　(বৃহৎ পরাশর।)

স্ত্রীপ্রীতি হইতে পুরুষের আয়ু ধন যশ পুত্র লাভ হইয়া থাকে; স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদিগের শাপ হইতে এই সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকগণ অসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন সেই কুল অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীজাতির এতদূর ক্ষমতা, এমন প্রতাপ যিনি প্রচার করেন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব উঁচু সুরে বাঁধা, স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

ভগবান আদেশ করিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন,--

"তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈর্নরৈ র্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥" ৩ অঃ ৫৯ শ্লোঃ।

অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন; বিবিধ সদনুষ্ঠানকালে ও উৎসব সময়ে নিত্যই অশন বসন ও ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

মহর্ষির মত,— "স্ত্রিয়ন্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥" ৩ অঃ ৬২ শ্লোঃ।

স্ত্রীগণ যদি সুপ্রসন্না থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত কুল প্রসন্ন, স্ত্রীগণ অপ্রসন্না হইলে সমস্তই অপ্রসন্ন।

মহর্ষি বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন,—

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণ তত্র বৈ ধ্রুবম্॥" ৩ অঃ ৬০ শ্লোঃ।

যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। কে না বলিবে একথা ধ্রুব সত্য? দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় সুন্দর বাণী!

শুধু স্বামী সম্বন্ধে নয়, মহর্ষির অনুজ্ঞা,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥" * ৩ অঃ ৫৫ শ্লোঃ।

স্ত্রীলোককে বহু মান ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহু কল্যাণকামী পিতা ভ্রাতা পতি ও দেবরগণের কর্ত্তব্য।

এ সমস্ত দেখিলে, হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির সমাদর বিলক্ষণ, ইহা বুঝিতেই হয়।

স্মৃতিশ্রেষ্ঠ মনুসংহিতায় এমন সব মহাবাক্য রহিয়াছে। স্মৃতি যাঁহারা মানিতেন বা মানেন; মহর্ষি মনুকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিতেন বা করেন, তাঁহাদের স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রকৃষ্ট—ইহা আমাদের ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না কিন্তু কাজে কি তাহাই দাঁড়াইয়াছে? প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিতে গেলে বলিতেই হয়—নিশ্চয়ই নহে। তাহার কারণ আছে।

যে মনু. যে মহর্ষি, নারীজাতি সম্বন্ধে এমন সব উদার শ্লোক রচনা করিয়া, এমন সব সুন্দর বিধান দিয়া, স্ত্রীজাতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দু জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন; আপনাদের হৃদয়ের প্রশস্ততার পরিচয়

* "ভর্তৃভ্রাতৃ পিতৃজ্ঞাতি শ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

পতি ভ্রাতা পিতা জ্ঞাতি শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবর এবং আত্মীয়বন্ধুজন কর্তৃক স্ত্রীলোক বেশভূষা ভোজনাদি দ্বারা সৎকৃত হইবেন।

দিয়াছেন, সেই মনুই, সেই ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই আবার স্থলান্তরে—তরুণী গুরুপত্নীর প্রতি যুবা শিষ্যের সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।

অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥" ২ অঃ ২১৩ শ্লোঃ।

ইহলোকে পুরুষদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকগণের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনও প্রমত্ত বা অসাবধান হন না।

এই সঙ্গেই আবার টুকিয়াছেন;—যুবা শিষ্যের পক্ষে যুবতী গুরুপত্নীর পদধূলি লইবার উদ্দেশে পা ছুঁইতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন, *—দোষটা পড়িতেছে এক স্ত্রীজাতির উপর; পুরুষ চিরকালই নির্দ্দোষ ভাল মানুষটি। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যব্রতী শিষ্যবর্গের এত শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি, এত শিক্ষা, এত অভ্যাস, এত সংযম, এত আচার বিচার লইয়া মাথা কুটাকুটি, সবই কি জল বুদ্বুদ্?

স্মরণ রাখিবেন, শিষ্য-গুরুপত্নী সন্তান ও জননী বলিলেও চলে—তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা হইতেছে। অনেকে বলিতে পারেন—ইহা সাবধানের পরামর্শ; রক্তের সম্পর্ক ত নাই, একটু বেশী সাবধান হইলে দোষ কি? কিন্তু শুধু ইহা থাকিলে ত বরং রক্ষা ছিল। রক্তের সম্বন্ধও বাদ পড়েন নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা দেবকল্প ভগবান অসঙ্কুচিত হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"† (২ অঃ ২১৫ শ্লোঃ)

মাতা ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন-গৃহে বাস করিতে নাই। ইহার কারণ—ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান যে তাহারা জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

নিতান্ত বাড়াবাড়ি নহে কি? কি আশ্চর্য্য রুচি! কি অদ্ভুত শিষ্টাচার! স্পষ্টবাদিতার কি সীমা নাই? মুনি ঋষি হইলে কি সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারিবার প্রয়োজন হয় না? জিতেন্দ্রিয় মুনিবৃন্দ, তাঁহারা সম্ভবতঃ অন্তর্য্যামী, তাঁহাদের মতে কাহারও সম্পর্ক জ্ঞানটুকুও নাই। মনুষ্য ও পশুতে তাহা হইলে তফাৎ কি? সর্ব্বত্রই বুঝি—

"ঘৃতকুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্।"

আগুনের তেজে ঘি গলে, না, এখানে বরং একটু উলটা গাওয়াই হইয়াছে। মনুষ্য সৃষ্টির আদি যুগের বীভৎস আচার-ব্যবহারের জের আজিও কি মিটে নাই? মনে করা যাইত, এ প্রকার উক্তি চাণক্যশ্লোক বা

* এই সৎপরামর্শ সম্বন্ধে এমন মন্তব্যও কেহ প্রকাশ করিয়াছেন—"ঋষিদিগের মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি এবং তাঁহাদিগকে শতবার নমস্কার করিতেছি।" ইনি উচ্ছ্বাসভরে কহিয়াছেন—"সুনির্ম্মল প্রভাত আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল ভাবোদ্দীপক কি সুন্দর বিধি!" (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যাহা হউক পুরাণোক্ত চন্দ্র ও তারার গল্পের মূল কোথায় বুঝা যাইতেছে। অহল্যা ইন্দ্র সম্বাদে 'উত্তর' দাওয়াই হইয়াছে বোধ হয়।

† সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নামে কুৎসিত উপাখ্যানের মূল বুঝি এইখানে। শ্রুতি স্মৃতি যাহাতে ইঙ্গিত মাত্র করেন, পুরাণ উপপুরাণে সে বিষয়ে মহামহীরুহ গড়িয়া থাকে।

হিতোপদেশেই শোভা পায়। মহা-মহা-ঋষি, তাঁহাদের মুখেও এমন কথা! স্ত্রীজাতির প্রতি—মাতৃজাতির প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বটে! ইহাই নাকি নারীপূজার নিদর্শন! নারীকে দেবী করিয়া তোলা! স্ত্রীজাতির পূজা পাইবার যোগ্যতার পরিচয়?

স্মৃতির এই অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়াই নিশ্চয় প্রাতঃস্মরণীয়া 'পঞ্চকন্যা'র অন্যতমা শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা ঠাকুরাণীকে উপদেশ দিয়াছিলেন;—"প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদের সহিত একত্র বাস করিও না।" (মহা। বন। ২৩৩ অঃ) এটিও ত আর এক মহর্ষি (বেদব্যাসের) রচনা।*

মাতব্বর মুনিঋষিগণের আক্কেল বিবেচনা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, কোন পুরুষ লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন না হইয়া থাকিতে পারেন?

পর পর তিনটি মনু-শ্লোকের সার মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে,—পুরুষকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকের স্বভাব; স্ত্রীলোক পুরুষমাত্রকেই উন্মার্গগামী করিতে পারে, সম্পর্ক-বিচার নাই।

এতাদৃশ কথা যাঁহারা বলেন, এমন মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারাই আবার লেখেন কি না—'স্ত্রীজাতিকে পূজা করিতে হয়!' তাঁহারাই আবার নারীজাতির নাম দিয়াছেন 'মহিলা!' একি প্রহেলিকা?

শুধু ইহাই নহে, অবধান করুন; যে মহর্ষি প্রচার করিয়াছেন, 'যেখানে নারীর পূজা হয় না, সে কুল উৎসন্ন যায়',—সেই অসীমজ্ঞানী মহাপুরুষই স্পষ্টাক্ষরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই,—

"নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে॥" (৯ অঃ ১৫ শ্লোঃ)

স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই। সুরূপই হউক আর কুরূপই হউক।.........ইহার পর বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্যে শোভা পায় না।

মহর্ষিবর আরও উপদেশ দিতেছেন,—

"বিধাতা কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ; ইহা বিশেষ অবগত হইয়া সতত তাহাদের রক্ষা বিধানে, সবিশেষ যত্নবান হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য।" (৯।১৬)

অর্থাৎ অষ্টপ্রহর কড়া পাহাড়ায় রাখিবে। ইহারই নাম নারী-পূজা? ইহাই নারীজাতির প্রতি সম্মান না সমাদর? †

* 'পঞ্চম বেদ' মহাভারতেও রহিয়াছে,—

সহস্রে কিল নারীণাং প্রাপ্যেতৈকা কদাচন।
তথা শত সহস্রেষু যদি কাচিৎ পতিব্রতা॥

† বিষ্ণুশর্ম্মা শাস্ত্রের বচন দেখাইয়া দিয়াছেন,—

"ন লজ্জা ন বিনীতত্বং ন দাক্ষিণ্যং ন ভীরুতা।
প্রার্থনাভাব এবৈকং সতীত্বে কারণং স্ত্রিয়াঃ॥" (১৬১ শ্লোঃ)

এই সকল কথাই আরও কিছু ফাঁপাইয়া ফেনাইয়া মহাভারতে 'নারদ-পঞ্চচূড়া সম্বাদ' সন্নিবেশিত হইয়াছে। সে নিবন্ধ এমন অশ্লীল, জঘন্য, এমন লজ্জাজনক, এতদূর গ্লানিপূর্ণ, সমগ্র স্ত্রীজাতির এমন মহাহানিকর, যে এখনকার কালে যে সকল কদর্য্য কথা উদ্ধৃত করিয়া পত্র পৃষ্ঠা কলুষিত করা চলে না। কৌতূহলী পাঠক অনুশাসন পর্ব্ব অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় দেখিয়া লইবেন। তাহার মধ্যেই আছে,—

"তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে স্ত্রীজাতি কখনই উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।"

সন্দেহ হয়, এ সকল অংশও কি ভগবানের অবতার-বিশেষ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রণীত। যে লেখনী হইতে সতী সাবিত্রী দময়ন্তী বাহির হইয়াছে, এই স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা তাঁহারই রচিত? ম্লেচ্ছ-ভাষায় Blasphemy একটা শব্দ আছে, তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি জানি না; ইহা কি তাহাই নহে? এ সকল কথা, এমন সব মত উল্লেখ বা উচ্চারণ করিলেও পাপ হয়।

যাহা হউক আর কিছু না হউক, অন্ততঃ শ্রীলতার অনুরোধে উত্তর প্রদানে অসমর্থ সমগ্র নারীজাতিকে দেবর্ষি-মানবকুলের ভক্তিভাজন ভগবান মনু যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহার বাড়া অপবাদ বা গালি কি আর হইতে পারে! প্রথম তিনিই পথ দেখাইয়াছেন বলিতে হয়। তিনিই যে সবার বড়, সবার আদি। তিনি যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা হইতে পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাস জাহাজ-বাঁধা কাছি পাকাইয়াছেন।

এই মহর্ষি মনুই কিনা আবার বলেন,—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" ৯ অঃ ২৬ শ্লোঃ।

গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহা কল্যাণকর প্রজোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকে; এই কারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী এতদুভয়ের কিছু মাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না।

ইহা কি বিদ্রূপ, না রহস্য, না স্তোকবাক্য? যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়া অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িয়া 'আবার কল্যাণভাজন,' 'মান্যার্হা' 'গৃহলক্ষ্মী'!—পদগুলা আর্ষ-প্রয়োগ না কি?

তবে, এখানে ভাল কথা বলিবার একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে,—'প্রজনার্থং'। স্বার্থের উপরোধে 'লক্ষ্মী মেয়েটি'!

মহাভারতে দেখা যায়—　"শ্রিয় এতাঃ স্ত্রিয়ো নাম সৎকার্য্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পালিতা নিগৃহীতাশ্চ শ্রীঃ স্ত্রী ভবতি ভারত॥" (অনুঃ ৪৬।১৫)

যতী নহেন, ব্রহ্মচারী নহেন, স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিবার বিশেষ কারণ যাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাদেরও এই প্রকার সব মত! আশ্চর্য্যের অধিক। এমন না হইলে আর পূজা!

বিষ্ণুশর্ম্মা সপ্তমে সুর চড়াইয়া মহাভারত হইতে তুলিয়াছেন,—

"নাগ্নি স্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥" (অনু। ৩৮।২৫ শ্লোঃ)

স্ত্রীজাতিকে পশুরও অধম করা হয় নাই কি? স্ত্রীলোক ও বালকে বুঝিতে পারে এমন ভাষায় এ সকল শ্লোকের অনুবাদ না করাই ভাল। ধন্য মহর্ষিগণ!

যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উঁহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উঁহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উঁহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

বাঃ! এই মহাভারতের অনেক বচনই আমরা শুনাইতেছি। কি সুন্দর লক্ষ্মীঠাকুরাণী বানানো হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; ক্রমশঃ আরও দেখিতে পাইব।

মহাভারতে বহুবিবাহের বহুল প্রচলন, রাক্ষস-বিবাহের অনুমোদন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরিণীতা পত্নীকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পাশা খেলায় বাজি রাখা,—পত্নীর প্রতি ব্যবহারের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—অনপনের গভীর অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। সভামধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে কুলবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,—স্ত্রীজাতির প্রতি কোন্ ব্যবহারের নিদর্শন!

অমন যে রামায়ণ, যাহাতে স্ত্রীর সোনার প্রতিমা গঠনের কথা রহিয়াছে, সেই রামায়ণ গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়,—মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরিচয় দিতেছেন,—"আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গ-পরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে।" (আরণ্য ১৩।)

তাজ্জব ব্যাপার! বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই মহর্ষির সহধর্ম্মিণী দেবী লোপামুদ্রা সাধ্বীরমণীকুলের আদর্শস্বরূপা। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে দৃষ্ট হয়, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধান নিচয়ের সকল খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানিয়া চলিতেন। এহেন পত্নীর পতিরও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এমন কঠোর ধারণা! কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

রামায়ণে আছে--সীতাকে বনবাস দিয়া রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া, তাহাই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতঃ সস্ত্রীক যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কি সুন্দর! কিন্তু ইহাও আমরা ভুলিতে পারিনা,—যে পত্নী, যে সীতা পিতৃআজ্ঞায় রামের বন-গমন কালে দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন,—"নাথ তুমি যদি অদ্যই বনে গমন কর আমি পদতলে পথের কুশ কণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব।" সেই পত্নীকে, সেই সীতাকে লঙ্কা জয়ের পর রাম হেন স্বামী অম্লানবদনে কহিয়াছিলেন—"তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে .....তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাহি না......।" আরও কত রূঢ় বাক্য মর্ম্মবিদারক তিরস্কার আছে, পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন বা কি? পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহারের নিদর্শন পক্ষে ইহাই বোধহয় যথেষ্ট হইয়াছে। (লঙ্কা ১১৬)

স্মৃতি-পুরাণের কথায় আসা যাক।

অপর একজন স্মৃতিকার অত্রিমুনি আজ্ঞা করিয়াছেন,—

"জপস্তপতীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনাঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতিনানি ষট্॥" (১৩৫ শ্লোঃ)

জপ তপস্যা তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন ও দেবতা-অরাধন এই সকল কার্য্য স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির পাতিত্যজনক, অর্থাৎ করিতে নাই। *

দেখা যাইতেছে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বেলায় স্ত্রীজাতি শূদ্রের সমান ; তা তিনি ব্রাহ্মণীই হউন, ক্ষত্রিয়াই হউন, আর যাহাই হউন না কেন। স্ত্রীজাতি সব একসাড়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষে বামুন-শূদ্র পার্থক্য ;— অথচ স্ত্রী 'সহধর্ম্মিণী'। স্বামীর সঙ্গে অনেক কাজে চলে, স্বামী ছাড়া একা স্ত্রীর কিছুই চলে না। সম্মান-সোহাগের চূড়ান্ত! নাম দিয়াছেন 'অর্দ্ধাঙ্গিনী'—ইহাই যথেষ্ট, আবার কি ?

স্মৃতিশাস্ত্রে রহিয়াছে,—

"শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" (দায়ভাগ ১৬।১।৩)

ভগবান মনুর আদেশ,—

"শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না ; স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই, ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ।" †

আদর পূজার ইহাও বুঝি অভিজ্ঞান। অপেক্ষা করুন, আরও আছে : ভগবান মনু এই সঙ্গেই জানাইয়াছেন,—

"শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাশ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥" (৯ অঃ ১৭ শ্লোঃ)

স্ত্রীজাতি হইতে শয়নাসন-ভূষণ-শীলতা, ক্রোধাদি, পরহিংসা, কৌটিল্য ও কুৎসিতাচার—এ সমস্তই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

মহাভারতে মতটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—

"ন চ স্ত্রীণাং ক্রিয়া কাচিদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যশাস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতামিতি শ্রুতিঃ॥" (অনু ৪৩।১১)

স্ত্রীগণের প্রতি কোনও কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই ; উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যা ও মিথ্যাবাদিনী।

মহাভারতে স্থলান্তরে রহিয়াছে,—

"স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং লঘুচিত্তা হিতা স্মৃতাঃ।
চলস্বভাবা দুঃসেব্যা দুর্গ্রাহ্যা ভারতস্তথা॥
প্রাজ্ঞস্য পুরুষস্যেহ যথা বাচঃ তথা স্ত্রিয়ঃ।" (অনু ।১৯ শ্লোঃ

স্ত্রীগণ বহু দোষের আকর এবং তাহারা অত্যন্ত লঘুচিত্ত ; তাহারা চপল প্রকৃতি। অনেক সেবা করিলেও তাহাদের মন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের বাক্য যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, স্ত্রীলোকের হৃদয়ও সেইরূপ।

* শাস্ত্রের বিধান এইরূপ, কিন্তু পুরাণ-ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, অনেক ব্রাহ্মণী, অনেক ক্ষত্রিয়া, এ সকল বিধান 'থোরাই কেয়ার করিয়াছেন। তাঁহারা জপতপ, তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন বা দেবতারাধন, ইহার কোনটাই বাদ দেন নাই।

† ক্রমে ইহা হইতেই বোধহয় দাঁড়াইয়াছে,—স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখাইতে নাই, স্ত্রীলোক লেখাপড়া করিলে বিধবা হয় ; তবে আমরা নেপথ্যে বলিয়া রাখিতে পারি—শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র পাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ও অপ্রাচীন স্মৃতিমধ্যে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিরোধ।

অত কথায় কাজ কি ? কৌমারব্রতী ভীষ্মদেবের মুখ দিয়া জ্ঞানসমুদ্র মহর্ষি ব্যাস এক কথায় সার তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়াছেন,—

"ন হি স্ত্রীভ্যঃ পরং পুত্র পাপীয়ঃ কিঞ্চিদস্তি বৈ।" (অনু।৪০।৪ শ্লোঃ)

ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই।

সাধু !

এমন সব কথা যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহাদেরই লেখনী হইতে আবার বাহির হইয়াছে কি না—'নারীজাতি পূজার্হা।' ইঁহারাই আবার বলেন কিনা—

'ন গৃহম্ গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

গৃহিণী না থাকিলে গৃহ গৃহই নহে। এমন কত কথাই আছে ! 'গৃহশোভা', 'গৃহলক্ষ্মী'।

এই ব্যাসদেবই বলিয়াছেন,—

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধং ভবেৎ পুমান্।" (২।১৪ শ্লোঃ

স্ত্রী যে পর্য্যন্ত না ঘরে আসেন, সে পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধমনুষ্য। বাঃ !

শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারগণের অন্যতম দক্ষ প্রজাপতি (?) বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—" স্ত্রীলোক সকল জলৌকার তুল্য ; অলঙ্কার বস্ত্র ও অন্ন প্রভৃতির দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও তাহারা সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্তই শোষণ করে, আর কিছু না, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলৌকা পুরুষের রক্ত ধন মাংস বীর্য্য বল ও সুখ—সমস্তই শোষণ করে।"

শ্লোকগুলা শুনানই ভাল—

"যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি॥
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরাং তু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্॥" (৪।৯—১০ শ্লোঃ

রক্তশোষী জোঁক ! পূজার আর বাকি কি ?

কুলটা সম্বন্ধে এরূপ উক্তি সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, এখানে ভদ্র ঘরের স্ত্রী বধূ কন্যা কুলকামিনীর কথা হইতেছে, কুলত্যাগিনীর নহে।

মহর্ষি দক্ষ আরও কহিয়া গিয়াছেন,—

"সশঙ্কা বালভাবে তু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ।
ভৃত্যবন্মন্যতে পশ্চাদ্ বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্॥" (৪।১১ শ্লোঃ

যখন (স্বামী স্ত্রীর) পরস্পরের বয়স অল্প থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে ; যখন পরস্পরের যৌবন কাল উপস্থিত হয়, তখন স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয় না ; অর্থাৎ স্বামীর ইচ্ছামত চলে না ; যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

সত্যই কি তাই? হায় মহর্ষিগণ! তোমরা কি গৃহিণী লইয়া কোন বয়সেই সুখী কি নিশ্চিন্ত হও নাই? তাই কি এত তপ্ত শ্বাস, এত কটুকাটব্য হিতোপদেশ তাহা হইলে ত ঠিক উপদেশ দিয়াছেন,—

"ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাস্ত্রিয়ঃ॥" (৩৭০ শ্লোঃ

দিলে থুলেও নয়, মাথায় করিয়া রাখিলেও নয়, সরল ব্যবহারেও নয়, সেবাশুশ্রূষাও নয়, মারধর্ করিলেও নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিলেও নয়; কিছুতেই কিছু হয় না; নারীজাতি বড়ই বাঁকা; স্ত্রীজাতটা একেবারেই বাগ মানে না।

ইহাই বটে স্ত্রীজাতিকে পূজা? এই নাকি নারীজাতির প্রতি সম্মান বা সমাদর? এই বুঝি হিন্দুধর্মের দেবীর পরিচয়?

স্মৃত সংহিতাকার ব্যাসদেব আজ্ঞা করিয়াছেন,—

"দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তু সদা ভবেৎ।" *

ভার্য্যা দাসীর ন্যায় সতত স্বামীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিবে।

সে আদিষ্ট কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায়ই হউক, পত্নীকে পালন করিতেই হইবে; নহিলে প্রত্যবায় ঘটে। স্ত্রীর পক্ষে সে আদেশ বিচার করিবার অধিকার নাই। †

মহাভারতে রহিয়াছে,—

"পাত দরিদ্র ব্যাধিত বিপন্ন রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণ বিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে স্ত্রীর অবিচারিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য।"

(অনুশাসন। উমা মহেশ্বর।]

নারীপূজার ইহাও ত একটী মস্ত অভিজ্ঞান!

জগৎগুরু শ্রীমন্ শঙ্করাচার্য্য প্রশ্নোত্তরে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ছন্দোবন্ধে স্ত্রীজাতির পরিচয় দিয়াছেন,—

'সুরাবৎ সম্মোহনকারিণী' 'পিশাচী'; তাহাতেও বুঝি আশ মিটে নাই; ক্রমে—'দ্বারং কিমেকন্নরকস্য? —নারী।' নরকের দ্বার নারী। সাবাস্ যতী ব্রহ্মচারী! চিরকুমার তুমি, তবু কখনও ঘা খাও নাই! বিনা অপরাধে মর্ম্মাঘাত!

হিন্দুশাস্ত্রের অপার করুণা! এই নারীজাতিকে আবার বলা হয়—'আদ্যাশক্তির অংশ।' স্ত্রীজাতি—স্ত্রীলোক মাত্রই দেবতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে,—

"বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (১১।৫ শ্লোঃ

* মহাভারতে দেখিতে পাইবেন,—

"দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি। শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যাং প্রকুর্ব্বতী॥"

† স্বামীর যথেচ্ছ আদেশ ও পত্নীর তাহাই মাথায় করিয়া লওয়ার কথা উঠিলে অনেকের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের' বণিক-দম্পতি মনে আসিবে। কিন্তু সেটা বোধ করি অতিথি-সৎকারের আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়াই গণ্য করিতে হয়।

হে দেবি দুর্গে! জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, যত প্রকার স্ত্রীলোক আছে, সকলই তোমার অংশ।

মা দুর্গার অংশের প্রতি কি সম্মানই দেখানো হইয়াছে, হইয়া আসিতেছে!

বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছেন,—

"রে বর্ব্বর নর! গতি কি হত তোমার
বিহনে অঙ্গনা অবস্থার!
কে গাঁথিত প্রেম সূত্রে সমাজের হার—
পিতামাতা কুমারী কুমার!
দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া কোমল করিয়া হিয়া
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা—
কে পূরাত স্বর্গচ্যুত আত্মার কামনা?"

কিম্বা থাক—আমরা করিব উক্তি, কবিদের মতামত শুনাইতে বসি নাই; শাস্ত্রবাক্যের কথা হইতেছে।

মনে হয় সনাতন ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ চটিয়া আগুন হইবেন। তাঁহারা চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিবেন 'অন্যান্য ধর্ম্মে যাহাই থাকুক্ আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রে মাতা ভগিনী ভার্য্যা এবং অপর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভাল কথা কি নাই?' আছে; গোড়াতেইত আমরা অনেক কথা শুনাইয়াছি। অধিকন্তু মনুসংহিতায় এমন বাক্যও রহিয়াছে—"মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া।" (২।১৪৫ শ্লোঃ)। "ভার্য্যা আপনার দেহ, অতএব তাহাদের প্রতি অন্যায়াচরণ কোনরূপেই বিধেয় নহে।"—"পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। (১২।১২৯ শ্লোঃ)। স্মৃতি রচয়িতা ঋষি আপস্তম্ব ও বিষ্ণু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"পর পত্নীগণকে মাতৃবৎ ভগিনী বা কন্যাবৎ দেখিবে।" (৩২৩ শ্লোঃ) অতি উত্তম। এসকল পুরুষের প্রতি উপদেশ; কিন্তু দেবকল্প ঋষিগণ জননী ভগিনী পত্নীদিগকে, কিরূপে কি পরিচয়ে, জগত সমক্ষে খাড়া করিয়াছেন?

প্রাচীন প্রায় সকল ধর্ম্মেই স্ত্রী জাতিকে গালি গালাজ প্রচুর পরিমাণে এবং বর্ব্বরোচিত রূঢ় ভাষায় পর্য্যাপ্ত আছে;—অবশ্য সর্ব্বত্রই, লেখনী অস্ত্র,—পুরুষ সিংহের থাবায়। কিন্তু অপর ধর্ম্মের কথা আমরা ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম, ম্লেচ্ছ আচার বলিয়াই উড়াইয়া দিয়া থাকি। জগতের সারধর্ম্ম বলিয়া আমরা যাহা জানিও মানি, তাহা সভ্যতার জন্মভূমি আর্য্যামীর রঙ্গভূমি এই ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি আছে তাহারই অল্প স্বল্প নমুনা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। সকল কথা উদ্ধৃত করিবার বিদ্যাও আমাদের নাই এবং তাহা করিতে গেলে সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া পড়ে। তুলনার কথা আসিতেছে না, তবে ইহা বোধহয় অবাধে বলা যাইতে পারে যে হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উলঙ্গ ভাষায় 'বে-আবৃরু ভাবে' কুৎসিৎ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, (যথা—মহাভারতে 'নারদ পঞ্চচূড়া সম্বাদ'—অনুশাসন পর্ব্ব ৩৮অ, কিম্বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে—শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ৮৪ অধ্যায়) সেরূপ আর কোথাও নাই। ধর্ম্ম গ্রন্থের কথা বলিতেছি, উপন্যাস ইপাখ্যানের নহে। এসব কথা এখন থাক।*

ভগবান মনু আজ্ঞা করিয়াছেন,—

---

* হয়ত কেহ কেহ বাইবেলের Old Testament উল্লেখ করিবেন কিন্তু সেখানে এরূপ ভাবে নাই বরং "আরব্য- উপন্যাস" কতকটা পাল্লা দিতে পারে। (Burton's Arabian Nights. Suplementry Volume শেষ।)

"স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, যুবতীই হইক বা বৃদ্ধাই হউক, গৃহে থাকিয়াও স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ মাত্র কার্য্য ও স্বতন্ত্র ভাবে করা উচিত নহে। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে; কিন্তু কখনও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না"

মহর্ষি অন্যত্র আদেশ দিয়াছেন—

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" স্ত্রী জাতি কখনও স্বাধীন অবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নহে।

ঋষিবর স্পষ্ট খুলিয়াই বলিয়াছেন—

"স্ত্রীলোক পিতা ভর্ত্তা ও পুত্র—ইহাদের সহিত পৃথক হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল—উভয় কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকে।" (৫ ১৪৯)

অতএব মহর্ষির উপদেশ—"স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদিগের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিরে রক্ষাকর্ত্তার নিদেশমত কার্য্য করিতে হইবে।"

ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলেন -"পিতামাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে, ও পুত্রেরা বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; ইহাদের অভাব হইলে আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগকে রক্ষা করিবে। কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না।" (১।৮৫)

নারদ ব্যবস্থা দিয়াছেন,—"যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্ম বিরুদ্ধপথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।"

পৈঠিনসির অনুজ্ঞা,—"স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে।"

গৌতমের বিধান;—"স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যেও স্বতন্ত্রা অথবা স্বাধীনা হইবে না। কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাঁহার অমতে কাজ করিবেনা।" (১৮।১

বৃহস্পতির উপদেশ—"শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকে তরুণ বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।"

স্মৃতিকার বিষ্ণুর আজ্ঞা,—"ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে, বেশবিন্যাস না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।" (২৫অ)

যাজ্ঞবল্ক্য এরূপস্থলে ক্রীড়া, সভাদর্শন, উৎসব দর্শন, এমন কি হাস্য পরিহাস ও নিষেধ করিয়াছেন।" (১।৮৪)

দেখা যাইতেছে, সকলেরই সন্দেহ প্রচুর। মহিলাকুল অবলা বলিয়াই কি এই অতি সাবধানের বন্দোবস্ত? শুধু তাহাই নহে; সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—স্ত্রীলোককে কোনমতে স্বাধীনা থাকিতে দিবে না, জাতিটা অবিশ্বাসিনী।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ, উহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার, মুখে মধুরভাষিণী, স্ত্রীজাতির অন্ত পুরাণাদিতেও পড়িয়া পাওয়া যায় না। অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।"

হিতোপদেশে তাহা হইলে হিত উপদেশই দিয়াছেন,—

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু (রাজকুলেষু চ)।"

তাইত আমরা কথায় কথায় প্রবচন আওড়াই—"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য ঋষিরা এত ব্যগ্র, বুঝা যাইতেছে যথেষ্ট কারণ ছিল; ছিল বলি কেন? আছে ও চিরকাল থাকিবে বলাই ঠিক।

যাহা হইক, জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিবৃন্দ একমত,—স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন পুরুষের বশে থাকিবে; —ইহা শাস্ত্রের আদেশ; মানিয়া লইতেই হইবে। বশে থাকিতে হইলেও আদর পূজার অসদ্ভাব না ঘটিতে পারে; বশে থাকিতে হইলেই যে দাসীবাঁদীর ন্যায় থাকিতে হইবে' এমন কোনও লেখা পড়া নাই। কিরূপ থাকিতে হয় তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি ও আরাধ্য দেবতা।

মনু বলিয়াছেন,— "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥" (৫।১৫৫)

স্ত্রীলোকদিগের স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতি সেবা দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্মৃতিকার বিষ্ণুর ও এইমত। (২৫।১৫)

পুরাণ উপদেশ দিয়াছেন,—

"ইদমেব ব্রতং স্ত্রীণাময়মেব পরোবৃষঃ।
ইয়মেকা দেব পূজা ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

স্ত্রীলোকদিগের ইহাই একমাত্র যজ্ঞ, এই একমাত্র ব্রতানুষ্ঠান, এই একমাত্র দেবতার্চ্চন যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না।

পতিবাক্য পালনই পত্নীর একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

বৃহৎ পরাশরে (স্মৃতি শাস্ত্রে) রহিয়াছে,—

"জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াং।
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমর্চ্চয়েৎ॥

জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীর প্রভু। পতি ভিন্ন পত্নীর অন্য দেবতা নাই; অতএব স্ত্রী পতিকেই প্রভুভাবে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে।

স্কন্দ পুরাণে আছে,—

"তীর্থ স্নানার্থিনী নারী পতিঃ পাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপি বিষ্ণুর্ব্বা পতিরেকোঽধিকো মত॥" (কাশীখণ্ড ৪)

পত্নীর গঙ্গাস্নান ইচ্ছা হইলে পতির পাদোদক পান করিলেই সেই ফল হইবে। মহাদেব বা নারায়ণ হইতেও পতি পত্নীর কাছে বড়।

স্মৃতিকার অত্রিরও এই মত (১৩৭ শ্লোঃ

হিন্দুর ঘরের মা লক্ষ্মীদের বলিবার জো নাই যে 'পতির মত পতি হইলে আমরা এ মতটা মানিতে পারি।' মুনি ঋষিগণ সে দিকটাও পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণের অনুজ্ঞা,—

"ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

পতি ক্লীব বা দুর্দ্দশাপন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হউক, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থাপন্ন হউক, স্ত্রীর কখনও তাহার অবাধ্য হওয়া চলিবে না।

অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই, দৃষ্টান্ত মজুত আছে। স্মৃতির এই আইন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থে নানা গল্প রচিয়াছে; একটি এই,—

এক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ অথর্ব্ব কুষ্ঠ রোগী, একদা জনৈক সুন্দরী বেশ্যাকে দেখিয়া খাপ্পা হইয়া উঠেন। বৃদ্ধের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহার পত্নী—হিন্দু ঘরের পতিপরায়ণা রমণী তাহাকে কাঁধে করিয়া সেই বারবনিতার ভবনে লইয়া যান। রূপ ব্যবসায়ী সেই দরিদ্র অথর্ব্বকে দেখিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া তাড়া করিতে উদ্যত। পতিপ্রাণা পত্নী সেই নীচ বেশ্যার হাতে পায়ে ধরিয়া—গৃহস্থ বধূ বারাঙ্গনার দাসী বৃত্তি স্বীকার করিয়া—সেই ভীমরতিগ্রস্ত স্বামীর অভীষ্ট পূরণে তাহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ *)

সুন্দর গল্প; কিন্তু ইহা পাতিব্রত্যের নিদর্শন না পত্নীত্বের অবমাননার কজ্জলোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত? আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—"জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্প।" (রবীন্দ্রনাথ)

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কানা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীর তিনি গুরু, পূজ্য ও ইষ্টদেবতা। স্বামীর চরণ সেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরম গতি লাভ হয়।

স্মৃতিকার ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতায় আদেশ করিয়াছেন,—"পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে না।" (২।৪৮ শ্লোঃ)

ভগবান্ মনু আজ্ঞা করিয়াছেন,—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥" (৫।১৫৪ শ্লোঃ)

শীল রহিত অর্থাৎ কদাচারী, কামুক অর্থাৎ লম্পট, গুণহীন অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধি সৌন্দর্য্যাদি বিহীন হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাহার সেবা করিবে।

স্বামী কদাচারী হয় হউক, পরদারগামী হয় হউক, কোন গুণের সহিত তাহার সম্পর্ক না থাকে না থাকুক, তবু তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। সকল পাপে পাপী হইলেও, সকল দোষে দোষী হইলেও স্বামী, স্ত্রীর নিকট হইতে দেবতার মত পূজা পাইবার অধিকারী।

আর স্ত্রীর বেলা?—ভগবান মনুই জানাইয়াছেন,—"পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানাপ্রকার পাপ রোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।" (৫।১৬৪ শ্লোঃ)

মহর্ষি বিধান দিয়াছেন—

"বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥" (৯।৮১ শ্লোঃ)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বৎসরে, মৃত পুত্রা হইলে দশম বৎসরে, কন্যা মাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসরে, কিন্তু অপ্রিয় বাদিনী হইলে সদ্য সদ্য পরিত্যজ্যা। বৃহৎ পরাশরেও এই বিধান পাওয়া যায়।

বন্ধ্যা, মৃতপ্রজা কিম্বা কন্যামাত্র প্রসবিনী হওয়া কিছু স্ত্রী বেচারীর হাত নহে, তথাপি সে পরিত্যাজ্যা;—এমনি সূক্ষ্ম বিচার!

স্মৃতিশাস্ত্রে আছে,—"স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করে, বা মুক্তহস্তে ব্যয় করে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।"

প্রার্থকাটার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পুরুষের বেলায় সাত খুন মাপ,—তিনি কুৎসিতাচারী বেশ্যাসক্ত গুণসম্পর্কহীন হইলেও স্ত্রীর পক্ষে দেবতা, আর স্ত্রী, মাত্র মিষ্টভাষিণী না হইলে তাহাকে সদ্য সদ্য 'তালাক্' দেওয়া চলে।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, কুঁদুলে ঘরকন্নায় অপটু, উড়নচণ্ডী স্ত্রীকে Divorce করা চলে। গৃহিণী ঠাকুরাণীদের এটা খেয়াল রাখা ভাল।

স্বামী লম্পট পরদাররত হইলেও স্ত্রীর নিকট দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়াছেন,—

"নির্ব্বাস্যাঃ ব্যভিচারিণাঃ প্রতিকূলা স্তথৈব চ।"

কিম্বা স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হয়।

স্মৃতিকার বিষ্ণুর আদেশ,—

"যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।" (৫ অনুঃ)

স্মৃতিকার শ্রেষ্ঠ মনুর আজ্ঞা,—

"যে স্ত্রী আপন জ্ঞাতদর্পে কিম্বা সৌন্দর্য্যাদিদর্পে নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহুলোকসমাজে লইয়া কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবে।"* (৮। ৩৭১ শ্লোঃ)

* এই স্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে না হইতে পারে। এক সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—অসতী স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না? সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বড় সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন: "স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়; তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা বিধান হইলে ভাল হয় না? যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও, সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলই বিষয় পাইবে, কেন না সে পুরুষ। কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রীলোক। ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ হৈ চৈ করা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?" (সাম্য)

ব্যভিচার ত গুরুতর ব্যাপার, স্ত্রীর পক্ষে সামান্য ত্রুটিতেও বিষম মুস্কিল। স্কন্দপুরাণে আছে,—"স্বামীর কথায় স্ত্রী কড়া জবাব করিলে তাহাকে শিয়াল কুকুর হইয়া জন্ম লইতে হয়—

"সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জন বনে।"

পতি তাড়না করিলে, পত্নীকে মুখটি বুজিয়া সহ্য করিতে হয়, নতুবা পরজন্মে বাঘ বিড়াল হইতে হয়—

"তাড়িতা তাড়িতুমিচ্ছেৎ সা ব্যাঘ্রী বৃষদংশকা।"

পতিকে না দিয়া পত্নী নিজে মিষ্টান্নাদি মুখে তুলিলে বাদুড় শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়—

"গ্রামে সা শুকরী ভূয়াৎ বল্গুর্বাপি স্বাবড়্ভুজা।"

পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে স্ত্রীকে ট্যারা চোখো হইতে হয়—

"কটাক্ষয়তি যান্যং বৈ কেকরাক্ষী তু সা ভবেৎ।"

পুরুষান্তরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে কাণা কুমুখী কুৎসিত হইয়া জন্ম লইতে হয়—

"কানা চ বিমুখী চাপি কুরূপা যাপি জায়তে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রহিয়াছে—

"বাক্‌তর্জ্জনাদ্ভবেৎ কাকী হিংসনাচ্ছুকরী ভবেৎ।
সর্পী ভবতি কোপেন দণ্ডে চ গর্দ্দভী ভবেৎ।
কুক্কুরী চ কুবাক্যেনপক্ষা চ বিষদর্শনাৎ॥" (শ্রীকৃষ্ণ জন্ম। ৭৫।৪৪—৪৫ শ্লোঃ)

এই প্রকার ছোট বড় নানা অপরাধে (?) আরও নানা পশুজন্ম লাভ প্রভৃতি ব্যবস্থা আছে। সকল কথা তুলিবার আমাদের স্থান নাই। বুঝা যায় ছোট ছোট ছেলেদের যেমন জুজুর ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখিতে হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতিকে সেইরূপ সুন্দর সহজ উপায়ে বশে রাখিতে চাহেন। পান হইতে চূণটুকু না খসে; তা হইলেই বিপদ! সাবধানের মার নাই; কেন না, পুরুষের নিকট প্রবাদ বাক্য হইয়া রহিয়াছে,—

"স্ত্রিয়াঃ চরিত্রাঃ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

যত দোষ একা স্ত্রীজাতির! গো-বেচারা পুরুষ! ভাগ্যে শাস্ত্রকার নাই!*

স্ত্রীজাতিকে পূজার কথা হইতেছে, কথাটা সপ্রমাণ হয় নাই কি?

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে আছে,—

"ন চন্দ্রসূর্য্যৌ ন তরুং পুন্নাম্না যা নিরীক্ষ্যতে।
ভর্ত্তৃ বর্জ্জং বরারোহা সা ভবেৎ ধর্ম্মচারিণী॥"

(মহাভারত। উমামহেশ্বর সম্বাদ)

যে নারী, অপর পুরুষের মুখ দেখা ত দূরের কথা, পতির মুখ ব্যতীত পুংলিঙ্গ শব্দ বাচক চন্দ্র সূর্য্য কিম্বা বৃক্ষকেও নিরীক্ষণ না করেন, সেই নারীই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী।

* আমাদের দেশের পুরুষ— পতিকেই নারীর একমাত্র প্রেয় ধ্যেয় শ্রেয় বলে নির্দ্দেশ করেছে। সেই আদর্শ তাদের সম্মুখে খাড়া করে ধরে রেখেছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজে যত কঠোর বিধান—এই অভাগিনী নারী জাতির জন্য। পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হউক, অশীতি বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক; স্ত্রীকে পদাঘাত করুক, সমাজ সব সইবে; কেবল নারী জাতির পান থেকে চূণটি খস্‌লেই সর্ব্বনাশ!"—দ্বিজেন্দ্র রায়।

বলিতে ইচ্ছা হয়,—আসুন মা লক্ষ্মীরা, কে কে যথার্থ ধর্ম্মচারিণী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, দেখা যাক্। হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায় চরিয়া বেড়াও কে জানে?

শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অনুকূলা ন বাগদুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা।*
আত্মগুপ্তা স্বামীভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥" (দক্ষ।৪।৪ শ্লোঃ

যে স্ত্রী পতির সদা অনুকূল আচরণ করে. ও মধুরভাষিণী এবং স্বধর্ম্মরক্ষায় সদা ব্যাপৃতা ও পতির প্রতি অকপট ভক্তিমতী. সে স্ত্রী মানুষী নয়, সে দেবতা। (পতি কুলাকুলা যাহাই হউন না কেন—এ টুকু স্মরণীয়।)

দেবতা বনিয়া যাইবার সহজ উপায়!—সহজ?

নামে ত দেবতা আছেনই, কাজে দেবতা হইতে হইলে, তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্রে কি আছে, আমাদের একবার দেখিয়া লইলে মন্দ হয় না।

অগ্নিপুরাণে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিম্ সুরম্।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুবং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতান্॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বৃত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী॥"

স্ত্রী প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া, পতি-দেবতাকে নমস্কার করিয়া, গৃহতল ও প্রাঙ্গনদেশ গোময় বা জলদ্বারা অনুলিপ্ত করতঃ ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্নান করিতে যাইবেন। স্নান করিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে পতিচরণে প্রণিপাত করিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য গৃহ দেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক অবশিষ্ট গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পতিকে ভোজন করাইতে হইবে। পতির আহারান্তে উপস্থিত অতিথিগকে ভোজন করাইয়া সর্ব্ব শেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে।

এমনই করিয়া দেবতা হইতে হয়! হায়! স্বর্ণ যুগ গেল কোথায়? এখানে সব কথা নাই। পুরাণের এই দেবতা বনিবার প্রণালীটুকু স্মৃতি শাস্ত্রে (ব্যাস সংহিতায়) আরও বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; দেবীগণের উপকার উদ্দেশে আমরা তাহার মর্ম্মার্থ শুনাইয়া রাখি;—

*অপ্রিয়বাদিনী বা দুর্ম্মুখীকে ঋষি ঠাকুরেরা বোধ হয় বড়ই ডরাইতেন; অদ্য সদ্য 'তালাক' দিবার ব্যবস্থা শুনান গিয়াছে; পরন্তু মহাভারতে রহিয়াছে—মিষ্টভাষিণীর সুনাম,—

"সখায় প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্য স্তস্মাদ্দারা পরাগতিঃ॥"

"স্ত্রীলোক প্রত্যুষে পতির শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে। তৎপরে গোময় গোমূত্র ও জল সংমিশ্রণ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে 'গোবরছড়া' দিবে। তৎপরে পাকোপযোগী ধৌতস্থালী প্রভৃতি পাত্র সকল পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া জল ও তণ্ডুলাদি পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। পাকশালার সমস্ত পাত্র প্রতিদিন বাহির করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিবে। মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা চুল্লী সংস্কৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে। শিল নোড়া প্রভৃতি যুগ্ম বস্তুগুলি পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবে না, যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবে। এইরূপে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সকল সমাধা করিয়া শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরু-জনকে প্রণাম করিবে এবং কায়মনবাক্য দ্বারা স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবে।

নির্ম্মল ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায়, নিরত তৎপরা হইবে। তৎপরে অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট যে কিছু অন্ন থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষ ভাগে আয়ব্যয় চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে, আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহ নীতি বিধান করিবে এবং সাধুশয়ন আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে তাঁহারই নিকট তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" ২অ। ২০—৩২ শ্লোঃ।

হিন্দু নারীর দেবী হইতে হইলে এই প্রকারে চলা চাই।

প্রায় সকল স্মৃতি-পুরাণেই এই প্রকার ব্যবস্থা। এমন না হইলে আর আমরা লোকের কাছে কেমন করিয়া বড়াই করিয়া বেড়াই 'দেখ দেখি হিঁদুর ঘরের মেয়েরা কেমন সেবা-পরায়ণা, স্নেহশীলা, কথার বাধ্য, সাধ্বী, ধৈর্য্যবতী, কষ্টসহিষ্ণু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আরও অনেক কথা, অনেক বিধান আছে, আমরা অল্পের ভিতর নমুনা দেখাইয়া যাইতেছি।

বুঝিতে পারিতেছি, আজকালকার এই সভাসমিতি, বক্তৃতা, আন্দোলন, অবাধ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সফ্রাজেট, নারীভোটের দিনে বধূ ঠাকুরাণীরা কর্ত্তব্যের ফর্দ্দ দেখিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিবেন ও বলিবেন—'এ ত ক্রীতদাসীগণের রোজনামচা, দাস্যগিরির পালায় এর চেয়ে নূতন কথা আর কি থাকিতে পারে? সে সব দিন-কাল গিয়াছে, হে বাপু। এখনকার দিনে আর এ সব চলে না।*

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

* নারীদুঃখকাতর মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুরমণীর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন—"বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধঅঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নীকে দাস্যবৃত্তি করিতে হয়।" (সহমরণ, ২য় খণ্ড)

মনে হয়, হিন্দু আচারজ্ঞ কেহ কেহ চটিয়া যাইবেন, এবং বিবাহকালীন মন্ত্র দেখাইয়া দিবেন, "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূং ভব, ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।" কিন্তু Theory ও Practice এ কত তফাৎ তাহাই ত আমরা দেখাইতেছি। শাস্ত্রে এমন কথাও আছে, "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমা সখা। ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য: ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥" কিন্তু ব্যবহারে?

সমাজভ্রষ্টা।

—:*:—

বাণী যখন নয় বছরের শিশু
পূর্ণ যুবা স্বামী তাহার বিশু
পিতৃধনের অধিকারী,
যৌবনেরই মত্ত মদে বিষম অত্যাচারী,
দিনে দিনে পলে পলে করছে আয়ুক্ষয়;
—বাল্যসুলভ ভয়,
লজ্জা চরম, শঙ্কা, ডরে বাণীর মনে ত্রাস
কঠিন হ'ল শ্বশুর-বাড়ী বাস!
ঘরে বিশুর মন উঠে না নিত্য নতুন ছল
পঙ্ক-মলিন পাপের গভীর জল
তারি তলায় ডুব্‌ল ক্রমে
পাপের বোঝা নিত্য নতুন উঠ্‌ল জমে জমে।

স্বামীর দরশন
ভাগ্যে যদি মিলে কভু কাঁদে বাণীর মন!
এমনি করে তিন বছরে
অত ধনের একটি কড়ি রইল না আর ঘরে,
দেনার দায়ে মুখ দেখান ভার
বিশুরে সেই গ্রামের মাঝে খুঁজে তখন মিল্‌ল না'ক আর।
আত্মজনে বল্‌লে "আহা বাছা
বয়স নেহাৎ কাঁচা
জানি না কোন্ মনের দুখে
একটি কথা বল্‌লে না'ক মুখে
যোগী হয়ে বেরিয়ে গেল দেখি,
ঘরে যে বৌ নেকী
হারামজাদা নেহাৎ পাজী
আর কিছু না এসব শুধু বৌয়েরই কারসাজি!"

তারপরে লোক-পরম্পরায় খবর এল গ্রামে
বিশু নামে
এ গাঁয়েরই মরেছে একজন
শীর্ণা নদীর ধারে যেথা আছে গভীর বন
বীভৎস কোন্ রোগের ক্ষতে ;
বাড়ীর লোকে তখন সবাই বাণীর কাছে বল্লে নানামতে
"ও বাছা আর তোমায় নিয়ে করব বল কিবা
রাত্রি দিবা
কে আর রবে তোমার সেবা নিয়ে
থাক আপন মায়ের বাড়ী গিয়ে!"

বাণী বিদায় হ'ল যবে
বয়স তাহার বছর বারো হবে!
সিঁথীর সিঁদুর মুছে তাহার হাতের নোয়া ছাড়ি
বাণী এবার ফিরল মায়ের বাড়ী!
বিধবার ঐ একটিমাত্র মেয়ে
তাহারি মুখ চেয়ে
ভুলেছিলেন স্বামীর মৃত্যু, দৈন্য দুখ জ্বালা ;
অনেক সেধে, অনেক জপে মালা
দূরাত্মীয়ের সাহায্যেতে শেষ কড়িটি ফেলে
পেয়েছিলেন আশাতীত, পেয়েছিলেন বড়-ঘরের ছেলে!
বাণীরে তাই দেখে যে আজ
মাথায় যেন পড়্ল ভেঙ্গে বাজ!
বড় সুখে অকাতরে মায়ের বুকে নিদ্রা গেল বাণী ;
কপালে কর হানি
মাতা বসে রইল নিশি জাগি
বল্লে শুধু, "দুরদৃষ্টে এই কি ছিল হায় রে হতভাগী!"

চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে চাকরী নিল মাতা
পরের বেড়ী ধরতে গিয়ে ভিজে ওঠে ভাবি চোখের পাতা,
নইলে কিবা খাবে?
—দুটি পেটের অন্ন কোথা পাবে?

বাণী হেথা ভাগ করে নেয় মায়ের বেদনাকে
হাতে হাতে এটা-ওটা গুছিয়ে দিতে থাকে !
এমনি করে কাজে বিরাম হীন
দুঃখে সুখে লাগ্‌ল যেতে দিনের পরে দিন !

বাণীর দেহে রূপ ধরে না আর
যৌবনেরই বসন্ত-সম্ভার
এল জীবনকুঞ্জবনে,
সর্ব্বদেহ ফুট্‌ল সঙ্গোপনে ;
ফোটে যথা অকারণে ঊষায় ফুলবালা,
ফোটে যেমন জ্যোৎস্না-হাসি প্রেমামৃত ঢলা
নিশীথ-রাতে,
চিত্রকরের হাতে
ফোটে যেমন শিল্প-কলা, কবির মনে রং,
ফোটে যেমন কচি রোদে কাঁচাসোনার ঢং !
জীর্ণ বেশে ছিন্ন সাজে
আরো বেশী পূর্ণ শোভা ফোটে দেহের মাঝে,
—শত হাজার মেঘস্তর
ঢেকে যেমন রাখ্‌তে নারে দীপ্ত রবিকর !
এত রূপের ভার
আপন মাঝে থাক্‌তে নারে আর
ভরা মধুচক্র সম,
আষাঢ় নব মেঘের মত নিবিড় নিরুপম,
একটু ছুঁলে ওরে
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে পড়্‌বে বুঝি ঝরে !

চৌধুরীদের বড় ছেলে মণি
রূপের গুণের খনি
ওকালতি পাশ করেছে দু'মাস হ'ল সবে
ভাগ্য যাচাই কর্‌তে এবার বিদেশপানে বেরিয়ে যেতে হবে

বাণী সেদিন পরিবেশন কর্‌তে গেল পাতে
কেমনে এক সাথে
দোঁহার পানে দোঁহার আঁখি নেমে
উঠ্‌ল না আর মুগ্ধ হয়ে রইল সেথা থেমে!
ক্ষাণিক পরে ফির্‌ল যবে বাণী
থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌ছে দেহখানি।

তার পরেতে এক সকালে জলের কলসি নিয়ে
বকুলতলা দিয়ে
বাণী যখন ফির্‌তেছিল মণির সাথে দেখা
প থ একা,
কাছে এসে বল্‌লে কি যে লজ্জা-জড় সুরে
এক নিমেষে বাণীর জগৎ উঠ্‌ল দুলে ঘুরে!
কোনমতে আপনাকে সে সুসম্বৃত করি
বল্‌লে "হরি হরি
অমন কথা আন্‌লে কেন মুখে
বড়ই দুখে
পড়ে আছি চরণছায়ে, অভাগিনীর দুঃখ কেন লবে
আমায় নিলে তুমি যে আজ সমাজভ্রষ্ট হবে!"
ছুটে গেল আপন গৃহ পানে
লুটিয়ে পড়ি ভূমির 'পরে ব্যথাব্যাকুল প্রাণে
অনেক কান্না কাঁদ্‌ল সেদিন বাণী।
তার পরেতে বেশী ক'রে মাথার কাপড় টানি
লেগে গেল আবার কাজে
রান্নাঘরের বাসনগুলি আপন হাতে মাজে!

মণি গেল প্রবাস-বাসে
আপন মায়ের কাছে তাহার পত্র কভু আসে,
এমনি করে কাট্‌ল তবে মুখ না চেয়ে কারো
বছরখানিক আরো!
শেষে যে দিন পিয়ন এসে বাণীর হাতে দিলে চিঠি
মাটির সাথে মিশিয়ে গেল দিঠি

থরথর কাঁপ্‌ল হিয়া
অশ্রু শুধু পড়্‌ল ঝরে দুটি নয়ন দিয়া!
লেখা আছে "ছেড়েছি সব আশা
তোমার ভাল চাওয়ার লাগি খুঁজে না পাই ভাষা;
বন্ধু ব'লে দিলাম হাতে
প্রথম উপার্জ্জনের টাকা এই চিঠিটির সাথে
অনুগ্রহ নয়,
—হয়ত কাজে লাগ্‌তে পারে দুঃখে অসময়!"

চারি দিকে পড়্‌ল ঢিঢিকার
মুখ দেখান হ'ল ভার,
"ঘেন্না একি লজ্জা একি ছাই
একটুখানি ধর্ম্মেরও ভয় নাই?"
চৌধুরীদের গিন্নি এসে বল্‌লে শেষে বাণীর মায়ের কাণে
"প্রকাশ যেন হয় না কোনখানে;
তবে কি না কেমন করে রাখ্‌ব বল আর
রাস্তা এবার দেখ আপনার!"
প্রতিবেশী বল্লে সবে "কেমন ক'রে থাক্‌বে বল কাছে
নষ্টা নারীর ছোঁয়াচ লাগে পাছে
বৌঝিয়েদের বিপথ-পানে আবার যদি টানে
তার চে' বাপু আপন-বাসা খোঁজ গে কোন্‌খানে!"
মণির টাকা কয়টি নিয়ে হাতে
মায়ে ঝিয়ে বেরিয়ে গেল নিশীথ ঘন রাতে!

সকালবেলা শ্রাবণ-ধারা ঝর্‌ল অবিরল
বিধাতার এ দুটি চোখের দুঃখ-করুণ জল!

মেয়ে।

—✲—

কেদার বাবু আদালতের কেরাণী। পঁচিশ টাকায় আরম্ভ করিয়া এখন, প্রায় বিশ বৎসর চাকুরী করার পর তাঁহার বেতন ষাট টাকায় উঠিয়াছে। এদিকে মা ষষ্ঠির কৃপাপ্রাচুর্য্যে দুইখানা তক্তপোষেও ছেলেদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠিতেছিল না। ইহা ছাড়া মা, বিধবা ভগ্নি একটী, দুইটী পিতৃহীন ভাগিনেয় তাঁহার সংসারভুক্ত। বড় মেয়ে লীলা, বিবাহের বয়স ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয়া কন্যা উমাও বিবাহের উপযুক্তা কিন্তু সংসারের খরচ চালাইবার জন্যই বাজারে প্রায় দুই হাজার টাকা দেনা হইয়া গিয়াছে। পুত্র ললিত তীক্ষ্ণ মেধাবী, কিন্তু তাহার স্কুলের বেতন দেওয়াই ভার স্বরূপ ছিল, এখন সে স্কুল ছাড়াইয়া কলেজের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই প্রহরে গৃহিণী অর্থাৎ কেদার বাবুর মা বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন এবং লীলা রাশি রাশি ডাল বাটিয়া দিতেছিল। কেদার বাবু আসিয়া একটু দূরে ছায়ায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিলেন। মা প্রশ্ন করিলেন "তোদের সত্য বাবু যে ছেলের জন্যে কনে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন তা ফেরেন নি?" কেদার বাবু সম্মুখে তেলের বাটী লইয়া বসিয়াছিলেন, গলার পৈতা কোমরে নামাইয়া কহিলেন "আজ ফিরেচেন, সত্য বাবু সাত হাজার টাকার কমে ছেলের বিয়ে দেবেন না।" সত্য বাবু অফিসের একশত টাকা বেতন ভোগী হেডক্লার্ক। অবস্থা তাঁহার যেমনই হউক না কেন, উপযুক্ত পুত্র দুইটীর বিবাহে তিনি যথেষ্ট লাভবান হইবার আশা রাখেন। মাতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কিন্তু তাঁর বড় ছেলে সুরেন ত এখনও বিয়ে পাশও করেনি, এখনি বিয়ে দেবেন?" "দেবেন বই কি, ওঁর নাকি এই সময়ই টাকার বেশী দরকার।" মা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "মন্দ ব্যাপার নয়, বাপের টাকার দরকার তাই ছেলের বিয়ে,—তা তোরও ত টাকার দরকার তুইও দে ছেলের বিয়ে, অত ভাবনায় কেন মিছা খুন হচ্ছিস্!" কেদার বাবু ক্ষণেকের তরে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন, চিন্তার গাঢ় ছায়া তাঁহার মুখে লেপিয়া গেল। "ছেলের স্ত্রীকে শ্বশুর ভরণপোষণ করবেন, এত বড় উপকার সেই হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্তের করবেন বলে তাকে কিঞ্চিৎ দোহন করে নেওয়া এঁরা উপযুক্ত উচিতই মনে করেন মা।" লীলা একবার নত চোখ তুলিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইল। মা কহিলেন "তাতো করেন, কিন্তু নিজের মেয়েকে দিতে ইচ্ছে আর কার না করে, তবে আমাদের এই শ্রেণীর লোকের আর দিয়ে পেট ভরে না আমরা কেথা থেকে অত দিতে পারি।" "হুঁ, মা আমাদের মধ্যে সমাজে কয় জন আর বড় লোক আছেন,—আমাদের মত কুড়ি থেকে এক শো এই মাইনের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই ত তিন ভাগ। আমরা পেটের দায়ে সংসারে খরচের জন্য, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, ঋণগ্রস্থ হই,—আর ছেলের বিয়ে দিয়ে তা থেকে মুক্ত হই, আবার বি, এ, ফেল করে আমার ছেলেও ঢুকবেন এই কেরাণীর কাজে যদি বড় ভাগ্য হয় তো পাশটা কোরে একটা স্কুল মাষ্টার হবেন, আমার ছেলের আবার বিয়ের কথা বল্‌চো মা?" উমা আসিয়া ডাল বাটিতে বসিল; লীলা উঠিয়া রান্নাঘরে মায়ের সাহায্যে গেল। কেদার বাবু দুই কন্যার পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্নান করিতে গেলেন। এই গলগ্রহ কন্যাদুইটীর বয়স যে স্থান-কাল না মানিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল, এজন্য শুধু এই মেয়ে দুইটীই নয়, ইহাদের মা পর্য্যন্ত যেন বিশ্বসংসারের কাছে অপরাধী হইয়া উঠিতেছিলেন। কন্যা হইয়া জন্মিবার অভিশাপ যে কোন্ পাপে কাহার নিকট পাইয়াছিল তাহা না জানিয়াও তাহারা যে বাপ মায়ের কত বড় বালাই তাহা বুঝিয়া সদা সর্ব্বদা কুণ্ঠিত, শঙ্কিত মনে নিঃশব্দে সংসারের কাজ করিয়া যাইত। তবু এই বোঝা যে অসহ্য লাগিত না সে এই জন্য যে তাহাদের সাথী সঙ্গিনী যতগুলি সকলেরই এই অবস্থা!

(২)

দিন কয়েক হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে, কাদায় ছোট মেটে বাড়ীর চারিদিক যেন পচিয়া উঠিয়াছিল। লীলা ও উমা ভিজিয়া ভিজিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করিতেছিল। লীলা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি বাহির করিয়া মাজিতে যাইতেছিল উমা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল "আমায় দে দিদি, তুই আজ খুব ভিজেছিস্, আর ভিজ্‌লে নিশ্চয় অসুখ কর্‌বে।" লীলা হাসিয়া কহিল "যা তোর গিন্নিপণা ক'রতে হবে না, তুই ঘরটা তো পরিস্কার করগে যা" লীলার একটী ছয় বৎসরের ভাই সতু কি একটা আবদার লইয়া ঘরের ভিতর উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল, কেদার বাবুর ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল "আঃ জ্বালিয়ে মার্‌লে যে! এক পাল মেয়ে রয়েচে; সে গুলো ক'রচে কি?—এই উমি"—দুই বোন্ পরস্পর মুখ চাহিল আরক্ত মুখে বাসনের বোঝা ঝুম্ করিয়া নামাইয়া লীলা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল "যা মরগে যা"—ছোট ভাইটীকে কোলে করিয়া ভুলাইয়া লীলা বিছানায় বসাইয়া দিতেছিল তাহার মা কহিলেন "তোরা শীগ্‌গির কাজ সেরে এসে একজন কেউ খুকীকে নে, এটার জ্বর হয়েছে বোধ হয়।" কেদার বাবু একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, কহিলেন "কোন্‌টার আবার জ্বর হ'ল?" "খুকীর। আজ কদিন থেকে এই রকম জ্বর হচ্চে, কি জানি দিদির মেয়েটা এম্‌নি ঘুস্ ঘুসে জ্বরে দিন কয়েক ভুগে শেষটা মারাই গেল।" কেদার বাবু কহিলেন "তোমার দিদির কপালের কথা ছেড়ে দাও, তিনি ত মেয়েকেই আদর ক'রতেন, তাঁর মত ভাগ্য হ'লে আমি ত বেঁচে যেতাম, তাঁর তো পাঁচটা মেয়ে হ'ল, তার মাত্র আছে একটা, মেয়েগুলো জন্মায় আর মরে, আমার ছেলেগুলো বরং রোগেও ভোগে কিন্তু—" মাতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লীলার পানে চাহিয়া কহিলেন "হয়েচে যদি তো মরলেই কি রক্ষা।" দুই চক্ষু ভরা অশ্রু লইয়া লীলা ফিরিয়া আসিয়া উমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল "যা আর ভিজ্‌তে হবে না।" উমা একটু আশ্চর্য্য হইয়া দিদির মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া তারপর চলিয়া গেল। বুঝিল ইহা তো নিত্যকার ঘটনা, তাহাদের দুইটি ভগ্নির মরণে আন্তরিক যাহাই হউক, সংসারে সমাজে পিতামাতা কতখানি মুক্তি পাইতে পারেন তাহা ত পলে পলে তাহারা বুঝিতেছিল। গ্রাম্য চলিত কথা—ঋণ পরিশোধ ও কন্যা মরণ এক,—আপাততঃ ব্যথাদায়ক হইলেও পরম নিশ্চিন্তকর। সন্ধ্যায় কেদারবাবু বাজারের ঠিকা চাকর সঙ্গে করিয়া বাহির হইতেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর চাদর ও ছাতি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। লীলা ধূপ ধুনা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই পিতাকে অসময় শায়িত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের দুই ভগ্নির প্রসঙ্গমাত্রে পিতার মুখ যে গম্ভীর হইয়া ওঠে তাহা দেখিয়া শুনিয়া তাহারা প্রায়ই সরিয়া সরিয়া বেড়াইত। কিন্তু পিতার শয্যা গ্রহণে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভীতকণ্ঠে লীলা প্রশ্ন করিল "আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে বাবা, অসুখ ক'রচে?" কন্যার প্রশ্নে জ্বলিয়া উঠিয়া কেদারবাবু তিক্তকণ্ঠে কহিলেন "না, আমার মস্ত সুখ তোমরা, হয় তোরা মর নয় আমি মরি তা হলেই সব অশান্তি চুকে যায়।" লীলা অসম্বরণীয় অশ্রু লুকাইবার জন্য, বিশ্বের কালীমাখা আঁধার মুখ লইয়া বাহির হইয়া গেল। তুলসী-মূলে মাথা রাখিয়া যোড়করে প্রার্থনা করিতেছিল "হে ঠাকুর মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও!" গৃহিণী সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, কহিলেন "ওরে কে লীলা, কেহ?" অস্ফুট কণ্ঠে লীলা জানাইল "হাঁ।" মা ঘরে গিয়া কহিলেন "অসময় শুয়ে কেন রে?" কেদারবাবু মাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিলেন কহিলেন "দেখ মা ওই মেয়েগুলোকে দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে." মা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "এই এত ভাবনা ভেবে ভেবে একটা উপায় তো হচ্চে না, হোক্, বড় হ'ল বই তো নয়, ঘরে ঘরেই তো এখন এমন হচ্চে।" "তা বলে তো আর নিশ্চিন্ত হতে পারিনে, এরপর দেখ্‌ছি, মা, আমাদের মত বাপমায়ে আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠ্‌তে পারবে না, বিলাতের

দশা হয়ে উঠ্‌বে।" সম্প্রতি লীলার বিবাহের যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল এইটী সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্য। সুপাত্র অনেকগুলিই জুটিয়াছিল কিন্তু অর্থের জন্য তাহা ঘটা অসম্ভব; বর্ত্তমান পাত্রটি ম্যাট্রিকুলেসান ফেল করিয়াছে। বরের পিতা, কেদারবাবুর সমবয়স্ক, চল্লিশ টাকা বেতনভোগী কিন্তু দুইটী কন্যার বিবাহে তাঁহার ভদ্রাসনখানি বন্ধক পড়িয়াছে, এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহা উদ্ধার করিবেন। সুতরাং সর্ব্বসমেত প্রায় তিন হাজার দর দিয়াছেন। পাত্র আবার পড়িবে। কিন্তু পাত্রের বয়স দেখিলে সে যে ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাশে প্রবেশ যোগ্য একেবারেই নহে ইহা বালকও বুঝিবে। কেদারবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন শেষ উত্তর একই পাইলেন; তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এখন অগত্যা ললিতের বিবাহ দেওয়া ব্যতীত উপায় নাই। ললিতের যে সম্বন্ধ আসিয়াছে সে কন্যার পিতা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। হুগলিতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে গ্রহণ করিলে চারি পাঁচ হাজার পাইবার আশা করা যায়। তবে যখন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা বেচাকেনার বাজারই হইয়াছে তখন দরদস্তর করিলে আরো কিছু পাওয়া বা আদায় করা যাইতেও পারে।

(৩)

নির্দ্দিষ্ট পাত্রের সহিত লীলার বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই ললিতের বিবাহ হইয়া গেল। ভুবনবাবুর কন্যা সুষমা প্রচুর যৌতুকসহ দরিদ্র কেদারবাবুর অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নগদ তিন হাজারের কিছু অধিকমাত্র পাওয়া গেল। তাহাতে কেবলমাত্র লীলার বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কেদারবাবুর উপযুক্ত পুত্র আর ছিল না যাহার বিবাহের পণের অর্থে বাজারের ঋণ ও উমার বিবাহ হইতে পারে। তথাপি যাহাতে একসঙ্গে এই দুইটি কন্যা সম্প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন এজন্য কেদার বাবু পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একজন বৃদ্ধা আত্মীয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহার দেবর শ্রীযুক্ত গিরিশ মুখুয্যে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করিবেন। যদিও গিরিশবাবু, কেদারবাবু অপেক্ষা কিছুমাত্র কনিষ্ঠ নন, এবং তাঁহার দুইটি পুত্রবধূ, পৌত্র বর্ত্তমান তবু যৌতুক ও পণ কিছুরই যখন প্রয়োজনাধিক্য নাই তখন এমন সুযোগ কেদারবাবু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। গ্রাম্য সম্পর্কীয় ঠাকুরদাদা কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন "আমি শুনেছি গিরিশের শরীর আজকাল একটুও ভাল নেই, ওখানে এ কাজ না করাই ভাল, সৎছেলের সংসারে কি আর ঠাঁই পাবে? শেষটা সেই হাঁড়িতে যায়গা ত দিতেই হবে, তবে কেন এমন তাড়াতাড়ি করচো?" দুর্মুখ বলিয়া বুঝিলেও কেদারবাবু ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন "হাঁড়িতে স্থানাভাবের জন্যই কি মেয়ের বিয়ে লোকে দিয়ে থাকে দাদা? হাঁড়িতে এখনও অমন চারটে মেয়ের স্থান আমার হ'তে পারে কিন্তু বিয়ের পর; এ পাত্র হাত ছাড়া ক'রলে আমি আর পাত্র পাব কোথা?" এ সংবাদে কন্যার মা গোপনে উচ্ছ্বসিত অশ্রু অঞ্চলে মুছাইলেন কিন্তু সন্তানের মাতা হইয়া স্বামীর যে ক্ষতি করিয়াছেন এত বড় অপরাধের পর আবার এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। ললিত মনে মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া পিতার নিকট প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু নতমুখে মাথা চুলকাইয়া অনেক কষ্টে এইটুকু মাত্র বলিতে পারিল যে "উমির বিয়ে এখন নাই বা হ'ল পরে চেষ্টা করলেই হবে।" কেদার বাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন "পরে হবে, টাকা আসবে কোত্থেকে শুনি?" ললিত অত্যন্ত ঘামিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল "এর পরে যদি কোনখানে—" মুখ বিকৃত করিয়া কেদার বাবু কহিলেন "বিনা পয়সায়? পাগল হয়েচ তুমি; তোমার বিয়েতে আমি টাকা নিই নি? কে আমার মেয়েকে ওমনি নেবে, আমি তো ফতুর হয়ে গেলাম। এই আমাদের সন্তানদের বাসের জন্যই ত ভাড়াটে বাড়ীর সংখ্যা বাড়চে। এর পর কুড়ি টাকা ত্রিশ টাকা

মাইনের তোমার ঘাড়ে এই সংসার প'ড়বে, তার চেয়ে যেমন তেমন কোরে তোমার এই দায় থেকে তো উদ্ধার ক'রে রেখে যাই ; আমার এই অজীর্ণ, অম্বলে জীর্ণ শীর্ণ দেহখানা আর কদিন ? উমা লীলার চেয়ে তোমার অবস্থা কিছুমাত্র সুখের হবে না বাপু কোনও ভাবনা নেই, যাও। আর আর প্রত্যুত্তরের পন্থা না পাইয়া ললিত অধোমুখে ফিরিয়া গেল। পিতামহী কপালে হাত দিয়া কহিলেন "ও সব যার যেমন বরাত।" বাস্তবিক ইহা ছাড়া আর সান্ত্বনা কি আছে ?

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উমা দেখিল দুয়ার খুলিয়া ঠাকুমা বাহির হইয়া গিয়াছেন ; বাহিরে চাহিয়া দেখিল সেই অপ্রিয় মেঘাচ্ছন্ন দিন, আকাশের সীমা হারা পাংশু মেঘের কোনওখানে কিছুমাত্রও ফাঁক নাই। বাড়ী ঘর গাছপালা সব বর্ষাসিক্ত। কোথাও একটু শুষ্ক একটু পরিচ্ছন্নতা নাই ; অন্তর বাহির সবই ভারাক্রান্ত ম্লান। ইহা ছাড়া ঘুম ভাঙ্গিতে যে দেরী হইয়া গিয়াছে এই কুণ্ঠাতে সন্ত্রস্ত হইয়া সে উঠিয়া পড়িল শয্যা তুলিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল লীলা তখনও ঘুমাইতেছে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া উমা কহিল "ও দিদি আজ কপালে কি আছে, ওঠ্ একেই দেরী হয়ে গেচে এখনও ঘুমুচ্ছিস্ ?" লীলা ঠিক যেন জাগিয়াই ছিল এমনি ভাবে ক্লিষ্টস্বরে কহিল "তুই যা কাজ ক'রগে আমি আজ পারছিনে উঠ্‌তে আমার অসুখ ক'রছে।" উমা তাহার কপালে হাত দিয়া চুপি চুপি কহিল "কিন্তু জ্বর হয়েছে শুনলে বাবা নিশ্চয়ই বকবেন ভাই।" লীলা তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল "আমার বুঝি জ্বর হয়েচে ? আমার শুধু মাথা ধরেচে, তুই বলিস্‌নে কাউকে, সেরে গেলেই উঠ্‌বো।" উমা বাহির হইতেই কেদার বাবু প্রশ্ন করিলেন "তোরা এখন উঠ্‌লি বুঝি ? আশঙ্কায় মুখ বিবর্ণ করিয়া উমা নীরবে সরিয়া গেল। তাহার ঠাকুমা কহিলেন "এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো তোদের, হাজার বার ডেকে ডেকে এদের ওঠাতে পারিনে, আমরাও ছোট বেলা ঘুমুতাম বাপু, এমন ঘুম তো কক্ষণো ঘুমুইনি, আর তিনি ? তিনি বুঝি এখনও ওঠেনই নি ?" কেদার বাবু রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন "এখনও ঘুমুচ্চে কি ? যা তুলে দিগে যা" উমা বলিবেনা স্থির করিয়াও বলিয়া ফেলিল "তার অসুখ করেচে।" কেদার বাবু কহিলেন "কি হয়েছে ?" "মাথা ধরেছে" ঠাকুমা খিঁচাইয়া উঠিলেন "মাথা ধরেচে ব'লে আর উঠ্‌তেই পারচে না ? তবে থাক্ এই বাসি ঘর দোর অমনি পড়ে থাক্।" উমার মা কোলের খুকীকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন কহিলেন "ধর উমা একে নিয়ে গিয়ে লীলার কাছে দিয়ে আয়, আমি কাজকর্ম্ম সেরে ফেল্‌চি" মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মাথায় গামছা চাপাইয়া লীলা বাসন মাজিতে বসিয়া গিয়াছে, উমা ছুটিয়া গেল "তোর দুটি পায়ে পড়ি দিদি ওঠ্ জ্বরে তোর সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে আর জলে ভিজিস্‌নে।" লীলা আরক্ত মুখে গর্জ্জিয়া উঠিল "তুই একটা আস্ত বোকা উমি, ওঠ্ ওঠ্ করচিস্, উঠে যাব কোথায়, কে ক'রবে এসব তুই তো ? তোর বুঝি জ্বর হতে জানে না ?" উমা ম্লান মুখে কহিল "জ্বর তো আমার হয় নি" বাহিরের কাজ শীঘ্র সারিবার জন্য দুই বোনেই বসিয়া পড়িল। এমনি অবজ্ঞায় অবহেলায় কন্যা হইয়া জন্মিবার অতি কঠিন অপরাধে জীবন্মৃত অবস্থায় মেয়েদের কৈশোর জীবন সকল কষ্টে সহিষ্ণু হইয়া ওঠে।

(৪)

লীলা ও উমাকে পাত্রস্থ করিবার পর কেদার বাবুর অজীর্ণ-জীর্ণ অস্থিপঞ্জর কয়খানা যেন এলাইয়া পড়িল। পড়িল সংসারের নিকটতো মুক্তি নাই, ললিতের পড়া অতি কষ্টে চলিতেছিল কিন্তু আর যে চলিতে পারে এমন কোন আশা নাই। লীলা ও উমা উভয়ের কর্ম্ম ভার একা সুষমার হাতে পড়িয়াছে সুতরাং সাংসারিক শৃঙ্খলা ও তেমন নাই। কয়েকদিন হইতে কেদার বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি একমাসের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিতে

বাধা হইয়াছিলেন। ললিত কলেজ হইতে ফিরিয়া গায়ের পাঞ্জাবীটা অতি সাবধানে খুলিয়া রাখিতেছিল কিন্তু পুরাতন পাঞ্জাবীটা একটু টানেই ফাঁসিয়া গেল। সুষমা বসিয়াছিল তাহার পানে চাহিয়া ললিত কহিল "যাক্ গে এটা ব্যবহারে অযোগ্যই হ'য়ে গেছে, বাবা কেমন আছেন?" "ভাল আছেন, বেশ গল্প করছেন।" ললিত নিমেষকাল তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্তে কহিল "তুমি কেমন আছ?" সুষমাও হাসিয়া মুখ নত করিল। অন্য ঘরে কয়েক দিনের রোগ যন্ত্রণার পর সেই দিনই কেদার বাবু সুস্থ হইয়া স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কথা যে ললিতের প্রথম সন্তান পুত্র বা কন্যা কোন্‌টী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ললিতের মা কহিতেছিলেন যে তাঁহার প্রথম সন্তান ললিত কেদার বাবু ও জননীর প্রথম সন্তান সুতরাং ললিতের প্রথম সন্তানও পুত্র হওয়াই অধিক আশা। হর্ষোজ্জ্বল মুখে উভয়ে তাহাই আলোচনা করিয়া ললিতের সাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। ললিত আসিয়া পিতার পাশে বসিল। তাহার মুখ প্রচ্ছন্ন বেদনাহত। উমার বৈধব্য সংবাদ সে পাইয়াছিল কিন্তু জরাজীর্ণ দেহ পিতাকে জানাইতে পারে নাই। কিন্তু পিতার অসুস্থ সংবাদে স্বয়ং উমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ললিতকে পত্র দিয়াছিল। কয়েকদিন পরে পিতার দুঃখ দারিদ্র ক্লিষ্ট মুখে একটু প্রসন্ন ছায়া দেখিয়া আর সংবাদ দিয়া আঘাত করিতে পারিল না। দিন কয়েক পরে উমার পুনঃ পুনঃ আগ্রহে ললিত তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিল। উমা আসিয়া যখন পৌছিল তখন তাহার মা ললিতের জন্মদিনের স্বর্গীয়া শাশুড়ী কৃত কাজের অনুকরণে সুষমার সুতিকাদ্বারে শাঁক লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং ধাত্রীকে সন্তান জন্মিবামাত্র হুলু দিবার জন্য মনে করিয়া দিতেছিলেন। উমাকে দেখিয়া হাতের মঙ্গল শঙ্খ প্রবল অমঙ্গল শব্দে একটা জল কেরোসিনের টিনের ভিতর পড়িয়া গেল। ললিত শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে রোদনোদ্যতা মাকে কহিল "চুপ্ গোল না এ ত নূতন নয়? বিয়ের দিনইত হয়েছিল; যাও যা ক'রছিলে করগে।" কেদার বাবু ললিতের ভবিষ্যৎ জীবনের কতকটা নিরাপদ সূচনা স্বরূপ পৌত্র জন্ম সংবাদের আশায় বিছানার বালিসে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। উমাকে দেখিয়া অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে মানুষের যে অবস্থা হয় তাঁহার সেইরূপ হইল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষে কাঠের মত শূন্য দৃষ্টিতে নিরাভরণা শুভ্রবেশা বালিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বহুক্ষণ সঞ্চিত দীর্ঘ হৃদয়ভেদী শ্বাস প্রবল জোরে ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িলেন, তখন সুতিকা গৃহে নবজাত শিশুর ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিরও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বিব্রত হইয়া ধাত্রী সান্ত্বনার স্বরে কহিতেছিল, "ছি ছি মেয়ে হয়েছে বলে কি কাঁদতে আছে? মেয়ে না হলেই কি সৃষ্টি চলে গা? চুপ কর চুপ কর, এরপর আবার কত খোকা হবে।" ললিতের পানে একবার চহিয়া কেদার বাবু পাশ ফিরিয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করিতেছিলেন "কি হল?" কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জিজ্ঞাসু নেত্রের সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা পরম উল্লাসে নাচিতে নাচিতে আসিয়া অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কহিল "ওমা খুকী হয়েছে, খুকী হয়েছে।" দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে "মেয়ে হল: আবার মেয়ে—? বলিতে বলিতে কেদার বাবু শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার লুণ্ঠিত মস্তক ব্যস্ত ভাবে ধরিয়া ফেলিয়া ললিত ডাকিল "বাবা—বাবা কি হল? জল নিয়ে আয়, জল নিয়ে আয় উমি, বাবার ফিট্ হ'য়ে গেছে।"—

শ্রীনীহারবালা দেবী।

একঘরে।

—:*:—

বিলাত যাইয়া কেহ হইয়া বিদ্বান
স্বদেশে ফিরিলে তার কি প্রতিবিধান ?
সে যে বড় হয়ে গেল এই অপরাধ
ধরি তারে জাত হতে করে দাও বাদ।

এতই নিষিদ্ধ খাদ্য খাইলাম হায়,
কোনো ফল লাভ দেশে হইল না তায় !
তাহার অখাদ্য খাওয়া হইল সার্থক
এই দুঃখ সহ্য করা যায় কাঁহাতক ?

যদ্যপি অনূঢ় হয় তবে তারে ধরো
ভগিনী বা ভাগিনীর সাথে চেষ্টা করো
যদি রাজী নাহি হয় দূর কর তারে
সবে মিলে একঘরে কর একেবারে।

যদি উচ্চপদ পায় তাহার আফিসে
অথবা তাহার কোন সহী সুপারিশে
চেষ্টা করো জামায়ের চাকরীর তরে
চাকরী না পেলে তারে কর একঘরে।

ব্যারিষ্টার হয়ে যদি, বিনা পয়সায়
অনুরোধ করে দেখ তব মামলায়
তব ব্রিফ লয় কি না, দেখ চেষ্টা করে
না হইলে একেবারে কর একঘরে।

যদ্যপি কখনো পড় বিষম ঠেলায়
সবে মিলে গিয়ে তার ধরো দুই পায়
যদ্যপি বিপদে রক্ষা করিতে না পারে
সবে মিলে একঘরে কর তবে তারে।

যদি না ভাগিনা তব পায় শিক্ষা ব্যয়
টাকা ধার দিয়ে যদি শোধ তার লয়
যদি মোকদ্দমা তব না দেয় জিতিয়ে
জাত গেছে বলে তারে দাও তাড়াইয়ে।

আত্মীয় বলিয়া খুব কর মেশামেশি
সবারে জানতে আরো কর ঘেঁষাঘেষি
তাহে যদি মাখামাখি নাহি করে বড়
তবে তারে সবে মিলে একঘরে করো।

তার পর ছেলেমেয়ে বড় হলে তার
বৈবাহিক সম্বন্ধের চেষ্টা বার বার
করে দেখ যদি তবু না হয় বেহাই
একঘরে করো তারে দিও না রেহাই।

যদি বা সে সমাজের নাহি ধারে ধার
ভ্রাতা ভগিনীরা সব আছে ত তাহার
তাহাদের কুটুমের কুটুম যাহারা
শেষকালে একঘরে হউক তাহারা

দেখাও সমাজ আজো যায় নাই মরে
রাগিলেই করিবারে পারে একঘরে
ব্যথা যদি পায় কভু সমাজের বুক
পাবে সে ত একঘরে' করিবার সুখ।

বেতালভট্ট।

বিবাহ সমস্যা।

—— ঃ*ঃ ——

শিরোমণি। কেন পাত্রের অভাব কি? তোমার মেয়ে ত বেশ সুলক্ষণাক্রান্তা, রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

কৃষ্ণকান্ত। গুণের কথা বলিবেন না, শিরোমণি মহাশয়! স্ত্রীজাতির গুণ তার আঁচল ইত্যাদির ন্যায় একটা অনাবশ্যক উপসর্গ। তবে আমার কন্যার রূপ আছে বটে। বঙ্গদেশ যদি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-লোক হইত তাহা হইলে এতদিনে একটা পাত্র জুটিত নিশ্চয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে—

শি। তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ। এদেশে গুণের আদর নাই? তবে পাচীর মার এত সুখ্যাতি কেন? ভাল রাঁধিতে না পারিলে তাঁহার এত সুখ্যাতি হইত?

কৃ। আমার অপরাধ হইয়াছে। গুণ বলিতে আমি সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদিকে বুঝিয়াছিলাম।

শি। এগুলা পুরুষোচিত গুণ। নারীতে ইহারা বিসদৃশ, সন্দেহ নাই। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। পুরুষের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার নিজের ধর্ম্ম থাকিলে, অর্থাৎ তিনি নিজে সত্যপ্রিয় বা ন্যায়নিষ্ঠ হইলে সংসারে অশান্তি হইবার সম্ভাবনা।

কৃ। এই কথাটা পূর্ব্বে বুঝিলে ভাল হইত কিন্তু তাহা বুঝি নাই। ছেলেগুলির সঙ্গে তাহাকেও এসব এই সব কুশিক্ষা দিয়া বসিয়াছি। আচ্ছা শিরোমণি মহাশয়, আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মকথা শুনিলে শূদ্রের কানে গলিত শিশা ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। কন্যাকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিলে পিতার প্রতি এরূপ কোন দণ্ডের বিধান আছে কি?

শি। না। বরং এমন কথা আছে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" কিন্তু কথায় কথায় পতির প্রতিবাদ করিতে শিখান শিক্ষা নয়।

কৃ। আমার ভয় হয়, আমার জামাতা যদি প্রতিবাসিনী বিধবার বাস্তুভিটা কলে-কৌশলে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমার কন্যা প্রতিবাদ করিবেই।

শি। পতি অন্যায় করিলে জগদীশ্বর তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তাহা লইয়া স্ত্রীর মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। পতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করাই সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। দেবতার সমালোচনা করা পাপ, এবং প্রতিবাদ করা মহাপাপ।

কৃ। তবে উপায় কি হইবে শিরোমণি মহাশয়! পতি দেবতা, পিতাও ত ছোট খাট দেবতা। সেই পিতৃদেবের প্রতি আমার কন্যার যেরূপ ব্যবহার তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। তাহার শাসনে আমার একটুও বেফাঁস কাজ করিবার উপায় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে দু'এক টাকা উপরি পাইতাম তাহাও বন্ধ করিতে হইয়াছে। এই দুর্দ্দান্ত মেয়ে পতিগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শালগ্রামের মত নির্ব্বিকল্প হইবে হঠাৎ কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

শি। নিরাশ হইও না। তোমার কন্যার শিক্ষার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। পতিগৃহে আবার তিনি নূতন শিক্ষা পাইবেন!

কৃ। এই এক সান্ত্বনা আছে বটে। আমার এক বন্ধু কন্যার শেমিজ পরা প্রভৃতি কতকগুলা কুঅভ্যাস ছিল। তাহার পতিগৃহে এগুলা খ্রীষ্টানী, বাবুয়ানী, দেমাকের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত। একজন কিছু দিন তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রাবল্যে শান্তিপুরী কাপড়ের লূতাতন্তু জালে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হিন্দুত্বের পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমার কন্যার সম্বন্ধে কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ তিনি নিতান্ত শিশু নহেন।

শি। বয়স কত হইল?

কৃ। আপনি আমাদের আত্মীয়, নিতান্ত ঘরের লোক। আপনার কাছে বলিতে সঙ্কোচ নাই; বয়স পনেরোর অধিক হইয়াছে। কিন্তু বাজারে এগার বৎসর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। মিথ্যার সাহায্যে কোনরূপে স্বর্গ বজায় রাখিয়াছি। সত্য কথাটা প্রকাশ পাইলেই উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ শুদ্ধ নিজে এখান নরকের মহলাকে ঝুপ, করিয়া পড়িয়া যাইব এইরূপ অবস্থা!

শি। তাইত, আর রাখা চলে না।

কৃ। মেয়েটাও এমনি দুর্ভাগা যে রসদ আধা হইতে সিকি করিয়াও তাহার বাড় কমাইতে পারিলাম না। এ-দিকে জ্যাঠা মহাশয় শক্রতা করিয়াছেন। আমি দরিদ্র, আমার মেয়েকে কালেজে পড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? মেয়ে যদি পাড়ায় পাড়ায় তাস খেলিয়া বেড়াইত বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সতর ঘণ্টা ঘুমাইয়া কাটাইতে পারিত তাহা হইলে কোনরূপে সমাজে টিকিতে পারিতাম। কিন্তু কিতাব পড়া, আঁকিয়ে, বাজিয়ে, গাইয়ে মেয়ে লইয়া আমি কী করি? আমার জাত, ভাত দুই মারা যাইবার যোগাড় হইল।

শি। আমরা সকলেই নিষেধ করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার জ্যাঠা মহাশয় এমনি গোঁড়া যে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তা—আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়েও ত অনেকে চায়।

কৃ। লেখাপড়া জানা কেন? তাঁহারা সবই চান, পরীর মত রূপ, বাণীর মত বিদ্যা, শাহারার মত টাক, গাধার মত বুদ্ধি, সবই তাঁরা চান যদি সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা রকমের যৌতুক থাকে। আমার কাছে যে আসল জিনিসটারই অভাব। অথচ দেশের এমনি অবস্থা হইয়াছে যে গলায় কাপড় দিয়া ভিক্ষা করিলেও কিছু মিলে না। সেদিন আমারই একটী বন্ধুর কাছে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভিক্ষার্থে আসিয়াছিলেন। বন্ধু বলিলেন "কন্যাদায় বলিয়া কোন পদার্থ আমি জানি না। পেটের দায় বা প্রাণের দায় বুঝিতে পারি। কিন্তু কন্যাদায় কি?" আমি বলিলাম "আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত সৎকার্য্যে দান করিয়া থাকেন, অথচ এই বিপন্নকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে কৃপণতা করিলেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন "বিপন্ন কে? অর্থ না থাকিলে যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া না যায় তবে বিবাহ না দিলেই চলে। তাহাতে নিন্দা হইতে পারে, ধোপা নাপিতের কার্য্য নিজেকে করিতে হইতে পারে, নিমন্ত্রণের লুচি পলান্ন বন্ধ হইতে পারে, প্রতিবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে তাসখেলা নিষিদ্ধ হইতে পারে। ইহার কোনটাই মারাত্মক নয়। একঘরে হইয়া থাকায় আরামও আছে। কিন্তু লোকের আপত্তি নিবারণ করিবার মত অর্থ আমার নাই। তোমাকেও হাঁটিয়া আফিস করিতে হয়। তাহাতে তোমার কষ্ট হয় নিশ্চয়। তাই বলিয়া তুমি কাহারও নিকট মোটরকার ভিক্ষা কর না, করিলেও ব্যর্থকাম হইবে। যদি এমন হয় যে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিলে সেটী অনাহারে প্রাণ হারাইবে, তবে সেই কন্যাকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। এ ব্যক্তি ত সেরূপ কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। কন্যার সুখের জন্য ইনি যে খুব ব্যস্ত তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি নিজের জন্যই ব্যস্ত। কন্যাকে রুগ্ন, বৃদ্ধ বা নেশাখোরের হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি খুব সম্ভব লোক নিন্দা হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। বঙ্গদেশে এরূপ বর্ব্বরতা বিরল নহে। অর্থ দিয়া যদি হৃদয় ক্রয় করা যাইত তাহা হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে দেশের এই হৃদয়হীনতা দূর করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপ হইবার উপায় নাই। অতএব কন্যাদায়গ্রস্তের হাত দিয়া বরকর্ত্তার পকেট ভর্ত্তি করা নিতান্ত বাজে খরচ মনে করি। টাকা দিয়া কখনও কোন black mail বন্ধ হয় নাই। বাংলাদেশের এই black mailও বন্ধ হইবে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে, যতদিন কন্যাপক্ষ এই কথা বুঝিতে না পারিবেন যে গরজ একা তাঁহারই নহে।

শি। হোঃ, হোঃ, হোঃ, তোমার বন্ধু ত বেশ সদুপদেশ দিয়াছেন। তবে আর চিন্তা কি? কন্যাকে অবিবাহিত রাখিলেই সকল গোল মিটিয়া গেল।

কৃ। সর্ব্বনাশ! এরূপ করিলে পূর্ব্বপুরুষের প্রতি অসম্মান দেখান হইবে না? "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং," ইত্যাদি বীরবাণী আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। আমরা বীরদর্পে

গতানুগতিকেরই অনুসরণ করিব। আমাদের দেশে সীতা পরিত্যাজ্যা হইয়াছিলেন "রাবণস্য চ দৌরাত্ম্যাৎ।" আমাদের এখনকার সমাজেও দুরাত্মার অভাব নাই। অতএব মেয়েকে হাত পা বাঁধিয়া জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে যেখানে হউক এক জায়গায় ফেলিয়া দিতেই হইবে।

শি। না, জলে ফেলিতে হইবে কেন? আচ্ছা, তুমি এই উপলক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ কত ব্যয় করিতে পার?

ক্ব। পাঁচ শত।

শি। তাইত, পাঁচশত টাকার বর মেলা ত অসম্ভব। আজকাল ছেলের বাজার দর যেরূপ! স্নেহলতা মরিল, আরও কত কুমারী আগুনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল তবু ত দেশের চৈতন্য হইল না।

ক্ব। বোধ হয় পথে ঘাটে বক্তৃতা যথেষ্ট হয় নাই বলিয়া। আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই জীবনে দুই পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন। অথচ কন্যা উদ্ধারের মূল্য স্বরূপ এই টাকাটা চাইলেই পাওয়া যায়, বিনাক্লেশে। এই নিমিত্ত চাহিবার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দু চারজন কন্যাকর্ত্তা জোর গলায় বলিতে থাকেন "হে বন্ধুগণ, পণ গ্রহণ করিলে কন্যাকর্ত্তাকে ক্লেশ দেওয়া হয়, অতএব তোমরা এখন হইতে আর বরপণ চাহিও না।" কিংবা যদি গাল দিয়া বলেন "যে পণ গ্রহণ করিবে সে সুদখোর ও সন্তান বিক্রেতা।" তাহা হইলে বরপণ প্রথার যে চির উচ্ছেদ হইবে এ কথা মানব চরিত্রজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শি। এ সকল আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। আমি বলিতেছিলাম আমার হাতে একটী পাত্র আছে।

ক্ব। আছে? দর কত?

শি। হাজার টাকার মধ্যে করিয়া দিতে পারি।

ক্ব। হাজার টাকা কোথায় পাইব, শিরোমনি মহাশয়?

শি। কেন? তুমি ত পাঁচশত টাকা খরচ করিতে পার। বাকী টাকা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া পাইবে। তারপর মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া দিলে দুই বৎসরেই সে টাকা শোধ হইয়া যাইবে।

ক্ব। বিষয়টী অতি নিপুণতার সহিত বুঝাইয়াছেন। টাকাটা ত নগদ পাইলাম। তারপর?

শি। তারপর আর কিছুই না। পাত্র হাজার টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁর পূর্ব্বপক্ষের স্ত্রীর অলঙ্কারাদি অনেক আছে। সে সব আর তোমাকে দিতে হইবে না।

ক্ব। পাত্রটী দোজবরে?

শি। দোজবরে ঠিক নয়। একটী তাঁর চতুর্থ পক্ষ।

ক্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষের সন্তানাদি বর্ত্তমান?

শি। হাঁ। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিবাহিত। স্ত্রীপুত্র লইয়া সকলেই পৃথক্ সংসার করিতেছেন। গৃহবিবাদের কোন সম্ভাবনা নাই।

ক্ব। তাহা হইলে পাত্রটির বয়স আশী বৎসরের কম নয়, দেখিতেছি।

শি। অত হইবে না। এই ত্রিশাত্তর চলিতেছে।

ক্ব। কি করেন?

শি। কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু করিতে হয় না। কালীঘাটে এঁদের তিনখানি বাড়ী আছে তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়। বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তিনি তোমার কন্যার নামে লিখিয়া দিবেন।

ক্ব। তাইত, অতি মহাশয় ব্যক্তি! পাত্রটীর নাম কি?

শি। শ্রীবিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়!

ক্ব। কালীঘাটের বেষ্টা! সে যে একটা পাঁড় মাতাল!

শি। হুঁ, মাঝে মাঝে একটু আধটু নেশা করেন বটে। তা সে কুসংসর্গে পড়িয়া। অনেকদিন হইতেই গৃহহীন। দেখিবার লোক কেহ নাই। এ অবস্থায় মানুষ একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। বিবাহ হইলেই সে দোষ শুধরাইয়া যাইবে। পতিকে সৎপথে লইয়া যাওয়াও ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য। এই খানেই ত শিক্ষার সার্থকতা।

ক্ব। কিন্তু এ সার্থকতা লাভের অবসর ঘটিবে কি? লোকটা ত দুচারি দিনের মধ্যেই মাথার শির ফাটিয়া মারা যাইবে।

শি। এটা তুমি অতি অযৌক্তিক কথা বলিলে। বিষ্ণুবাবুর বয়স এতই কি বেশী! লোকে বিরানব্বই বৎসর বয়সেও দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন সে খবর রাখ? তাহার তুলনায় ইনি ত যুবা। এখনও শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

ক্ব। হাঁ, ভুঁড়ি বিপুলায়তন বটে।

শি। আর যদি তোমার কন্যার অদৃষ্টে বৈধব্য লেখাই থাকে তুমি কি তাহা খণ্ডন করিতে পার?

ক্ব। তাহা ত পারি না। কিন্তু আমি অতি মোহান্ধ। আমার ঐ একমাত্র কন্যাকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বিষ্ণুলোকে পাঠান, বা বেষ্টা মাতালের হাতে দিয়া জীবনের চরম সার্থকতায় নীত করা, ইহার কোনটাতেই আমার মন সরিতেছে না।

শি। বিষ্ণুবাবু সম্বন্ধে তুমি পূর্ব্ব হইতেই মন বিস্বাদ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়া তাঁহার দোষগুলি তোমার চ'খে পড়িতেছে। কোন মানুষের প্রতি এরূপ অকারণ বিদ্বেষ ভাল নহে। সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন।

ক্ব। আমি বাহিরের মানুষটীকেই খুঁজিতেছি। ভিতরে ভগবান্ না থাকিলেও আমার চলিবে।

শি। তোমার মনের মত পাত্রই বা কোথায় পাইবে, শুনি।

ক্ব। একটী পাত্র আছে। ছেলেটী Assistant Engineer. বয়স ছাব্বিশ সাতইশ, যেমন কার্ত্তিকের মত রূপ তেমনি হৃদয়, সরল ব্যবহার। যদি অনুমতি পাইত—

শি। এ ছেলে ত হীরার দরে বিকাইবে। তুমি ইহার কাছে ঘেঁসিতে পারিবে?

ক্ব। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় পাত্রটী জীবন্ত পুরুষ মানুষ। পিতৃভক্তির আঁচ লাগাইয়া জড়পদার্থ বনিয়া যায় নাই। ইহাকে হীরার টুকরার মত খপ্ করিয়া নিক্তিতে চড়ান সহজ হইবে না।

শি। তবু কন্যাকে সাজাইয়া দান করিতে হইবে ত।

ক্ব। সে কথাও হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "স্ত্রীকে সাজাইবার ভার আমার, আপনাদের নহে। আপনার দত্ত অলঙ্কারে লোক চক্ষু বাঁধিয়া বেড়ান তাঁহারও গৌরবের হইবে না, আমারও না"

শি। এমন পাত্র! এও সস্তায়! কোথাও গলদ্ নাই ত?

ক্ব। কৈ গলদ্ ত কিছু দেখি নাই। রূপে, গুণে,—

শি। আমি এ সব গলদের কথা বলিতেছি না। তুমি বংশ, গোত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ সন্ধান লইয়াছ?

ক্ব। লইবার প্রয়োজন হয় নাই। পাত্রের নাম সত্যব্রত ঘোষ

শি। কি বলিলে? সত্যব্রত—?

কৃ। ঘোষ।

শি। ঘোষ? গোয়ালা?

কৃ। না, Assistant Engineer.

শি। তুমি শিববন স্মৃতিরত্নের পৌত্র হইয়া গোয়ালার ঘরে কন্যাসম্প্রদান করিতে চাও! তোমার হইল কি?

কৃ। সুমতি হইল।

শি। ইহাকে তুমি সুমতি বল? হিন্দুর বিবাহে এত যে বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা তাহা কি শাস্ত্রকারগণের একটা গাঁজাখুরি বলিতে চাও?

কৃ। সে কথা বলি কোন সাহসে?

শি। তবে কোন বুদ্ধিকে অব্রাহ্মণে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পতিত হইতে চাও?

কৃ। পতিত হইব কেন?

শি। কেন "হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ." এ কথা মান কি না?

কৃ। মানি বৈ কি। মানি বলিয়াই ত বেষ্টা মাতালকে ছাড়িয়া সত্য ঘোষের উপাসনা করিতেছি।

শি। বিষ্ণুচরণ বাবু নীচ হইলেন! তিনি কতবড় কুলীন তা জান? স্বয়ং কামদেব পণ্ডিতের বংশ।

কৃ। বংশের সহিত ত কন্যার বিবাহ দিতে পারি না।

শি। বিষ্ণুবাবুই বা ছোট কিসে? তোমরা ত পাঁচ পুরুষে ভঙ্গ। তিনি এখনও স্বভাবে আছেন।

কৃ। তাঁহার স্বভাব ত মাতলামী।

শি। বার বার ঐ একটা দোষের উল্লেখ করিতেছ কেন? সংসারে নিষ্পাপ কে? তোমরা জীবনে কোন পাপ কর নাই?

কৃ। অনেক করিয়াছি। মেয়েটাকে অপাত্রে দিয়া সেই পাপের মাত্রা আর বাড়াইতে চাহি না।

শি। তোমার মতে ব্রাহ্মণ অপাত্র, আর গোয়ালা হইল সৎপাত্র! তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে জান? যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ; যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যাঁহার কার্য্য তিনিই ব্রাহ্মণ; সমস্ত বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, কামক্রোধাদি কর্ত্তৃক অনুপহত চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করা যাঁহার ব্রত তিনিই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ এক সময়ে হিন্দুজাতির শিরোভূষণ ছিলেন। সসাগরা ধরণীর অধিপতি রাজচক্রবর্ত্তীগণ বিনত মুকুটমাণিক্যালোকে ইঁহাদের চরণারবিন্দ সমুদ্ভাসিত করিয়া কৃতার্থ হইতেন। অনাদি কাল হইতে ভূদেব নামে অভিহিত সেই ব্রাহ্মণকে তুমি আজ হীন, নীচ, অপাত্র বলিলে! কি বলিব, এখন ঘোর কলি। তাই তোমার রসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না।

কৃ। বেষ্টার এত গুণ ইহা ত পূর্ব্বে জানিতাম না।

শি। বেষ্টার প্রতি এত আক্রোশ কেন? তুমিই বা ব্রাহ্মণ কিসে? তুমি কি তিন সন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ কর?

কৃ। আমি ত ব্রাহ্মণ নহি। এবং এই কারণে অব্রাহ্মণে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

শি। ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলেও তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার ধমনীতে এখনও ভরদ্বাজ মুনির রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ঘোষপুত্রের কি গুণ আছে, শুনি?

কৃ। কেন? কন্যার কাম্য রূপ, মাতার কাম্য বিত্ত, পিতার কাম্য শ্রুত, সবই আছে। উপযুক্ত ভোক্তা মিলিলে মিষ্টান্নেরও অভাব হইবে না।

শি। এসকল গুণ কি ব্রাহ্মণের ঘরে দুর্লভ?

কৃ। ব্রাহ্মণের ঘরে দুর্লভ নহে। গোয়ালার ঘরেও সুলভ দেখিতেছি।

শি। তাহাও যদি হয়, তবু ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া গোয়ালা খুঁজিতেছ কেন?

কৃ। সুনিশ্চিত গোয়ালা ছাড়িয়া অনিশ্চিত ব্রাহ্মণ খুঁজিতে যাই কেন?

শি। তোমার মতে জাতিভেদ প্রথাটাই তাহা হইলে অ-শুভ। কিন্তু জগতের কোথায় জাতিভেদ নাই? ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল কি মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন জান? সেই মহাসত্য এই যে বৃক্ষলতাকীটপতঙ্গাদির মধ্যেও জাতিভেদ আছে। যথা;—উদ্ভিদ্ রাজ্যে তুলসী, উডুম্বর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ,—

কৃ। রক্ষা করুন, উডুম্বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত নহি।

শি। বিবাহ দিতে বলিতেছি না। আমি শুধু দেখাইতেছি জগতের সর্ব্বত্র বর্ণভেদ আছে।

কৃ। সেজন্য এত পরিশ্রম করিয়া ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে যাইতে হইবে কেন? আপনি বলিলেই বুঝিতে পারিব উডুম্বর বৃক্ষ ব্রাহ্মণ, এবং বেষ্টা মাতাল ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি ত কন্যার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছি না যে ব্রাহ্মণ না হইলে কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে; আমি তাহার বিবাহ দিব, একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছি।

শি। তোমরা দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়াই জাতিভেদের উচ্ছেদ করিতে চাও। জাতিভেদ থাকাতে দেশের কত কল্যাণ হইয়াছে জান? বংশানুক্রমে এক কাজ করিয়া তাহাতে দক্ষতা লাভ করা যায় এ কথা তোমাদের গুরু ইংরাজও অস্বীকার করিবেন না।

কৃ। আমিও অস্বীকার করিতেছি না। আমি নিশ্চয় জানি পিতৃপিতামহের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সত্য ঘোষ দুগ্ধে বেমালুম ভাবে জল মিশাইতে পারিত। আমিও তাহা হইলে অন্য পাত্রের সন্ধান করিতাম।

শি। তুমি বলিতে চাও আপন আপন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সকলেই Assistant Engineer হউক।

কৃ। এমন কথা বলি নাই।

শি। আর বলিতে বাকী রাখিলে কি? কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। গুণকর্ম্মগত বর্ণভেদ হইবেই।

কৃ। হইয়াছেও। যেমন আমাদের দেশে উচ্চবর্ণ বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি এবং নিকৃষ্টবর্ণ যদু চাটুয্যে পাঁউরুটি ওয়ালা, মধু বাঁড়ুয্যে পাচক প্রভৃতি।

শি। অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণ যে বর্ণভেদের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং মহাজনগণ যে বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য, কেবল তোমার বর্ণিত বর্ণভেদই গ্রাহ্য। তোমার মতে ভারতের তাবৎ লোকই ভ্রান্ত। তুমিই কেবল ঠিক বুঝিয়াছ। কেবল তোমার বুদ্ধিই অনাবিল। আর কি বলিব? নিজের বুদ্ধিতে চলিয়া অধঃপাতে যাও।

কৃ। তবে চলিলাম।

শি। ধিক্!—একটা কথা,— সত্য ঘোষকে ত জামাতা করিবে। কিন্তু কোনদিন তোমার কন্যার আহার কালে তিনি যদি অকস্মাৎ সে স্থানে উপস্থিত হন?

কৃ। ক্ষতি কি?

শি। ক্ষতি কি? শূদ্রের চক্ষু হইতে এক প্রকার magnetism নির্গত। ইহার সহিত মিশ্রিত হইলে অন্ন বিষময় হইয়া উঠে, এ কথা তোমার জানা নাই।

কৃ। সত্য না কি, শিরোমণি মহাশয়? একথা ত জানা ছিল না। তবে আপনার উপদেশই শিরোধার্য্য করিলাম। এখন বেশ বুঝিতেছি ঘোষপুত্রের নেত্রবিগলিত দৃষ্টির সহিত ম্যাগ্নেটিস্‌মের ধারা প্রপাত অন্নের সহিত উদরসাৎ করিয়া আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সুস্থশরীরে বেটার শ্রীমুখোৎসারিত সুরাসুরভি সমুদ্রমনে নিত্যস্নান করা আমার কন্যার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

শি। তোমার এই ধর্ম্মভাব দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। কিন্তু একটা বড় বিঘ্ন দেখিতেছি। Patel bill পাশ হইতে বসিয়াছে। একবার পাশ হইয়া গেলে অঘরে বিবাহ দেওয়াই আইন হইবে। তখন সর্ব্বস্ব পণ করিলেও আর বিষ্ণুচরণকে জামাতা রূপে বরণ করিতে পারিবে না।

কৃ। এখন উপায় কি, শিরোমণি মহাশয়?

শি। আর্ত্তনাদ। আমরা হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। Consent bill পাশ হইবার দুর্দ্দিনে বাংলার আট কোটী নরনারী কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল "ধর্ম্ম যায়!!" আজও ধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আজও গগনস্পর্শী আর্ত্তনাদের প্রয়োজন। যদি উক্ত বিল পাশ হইয়া যায় তখন এ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই চলিবে। কিন্তু পাশ হইবার পূর্ব্বে, এই ধর্ম্মকে কিছুতেই লোপ পাইতে দিব না। ইহা লোপ পাইলে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইব।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

প্রামোন্মাদ।

(Shelley)

প্রথম মধুর তন্দ্রাটুকুর
আবছায়া-ঘোরে, মোর
ঘুম ভাঙে যবে দেখিতে দেখিতে
স্বপ্ন-প্রতিমা তোর—
ধীর সমীরের মৃদু-নিশ্বাসে
শিহরে তখন রাতি,
আর, আকাশে ছড়ানো তারায় তারায়
কাঁপে লো কনক-ভাতি।

তুহারি-স্বপন　　মাঝখানে জাগি'
　　চমকি' উঠিয়া পড়ি ;
কে-জানে কেমন　　কে-যেন অমনি
　　চরণে বাঁধিয়া দড়ি,
টেনে টেনে টেনে
　　　　আমারে লইয়া আসে
অয়ি প্রেমময়ি,　　তোরি এ মুক্ত
　　বাতায়নটীর পাশে।

ঢুলে ঢুলে পড়ে　　মদির সমীর
　　ঘন-তিমিরের বুকে—
স্তব্ধ নীরব　　তটিনীর কোলে
　　ঢুলে পড়ে গাঢ় সুখে ;
　　চাঁপার সুবাস ঝরে—
স্বপ্নে মধুর কল্পনা যথা
　　সঞ্জিত থরে থরে!
　　পাপিয়ার যত গান,
তুলি' তরঙ্গ যামিনীর বুকে,
সে-বুকেই পুনঃ লুটাইয়া সুখে,
　　　　লভে, আহা, অবসান—
আমিও যেমন　　অয়ি প্রণয়িনি মোর
মরণে মিলাব　　লুটায়ে হৃদয় তোর!

বিছানো ঘাসের　　বিছানা হইতে
　　এ-তনু তুলিয়া ধর্—
　মোহে মুরছিয়া মরি বুঝি এইবার ;
ও-প্রেম-বারিদ　　গলায়ে, সখিরে,
　　　　চুম্বন-বারিধার
বরণ কর্ অধরে ও মোর
　　আঁখি-পল্লব-'পর ;

পাংশু শীতল গণ্ড আমার, হায়,
বুকের ভিতরে দ্রুত-তালে নাচে প্রাণ-
ও-কোমল-হৃদি কমলে ইহারে
চাপিয়া ধরিবি আয়,
মিলন-পুলকে ফেটে হই খান্ খান্।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

বেদনার স্মৃতি।

——:*:——

(১)

সেণ্টপল গির্জ্জার পাশের বাড়ীখানাতেই সেই বুড়ো বাস করত। গির্জ্জাতে যখন প্রভাতীসঙ্গীত সুরু হ'ত বুড়োও তখন শয্যা ছেড়ে সে দিনের কাজের ভিড়ে তন্ময় হ'য়ে পড়্ত। কাজ ছিল শুধু টাকা ধার দেওয়া আর উঁচু হারে সুদ লওয়া। তাই বুড়োকে "ইহুদী সাইলক" সাজ্তে হয়েছিল—পাড়ার ছেলেদের দৈনিক কাজ ছিল বুড়োর সমালোচনা। শুধু সমালোচনা নয়—বুড়ো যখন সেই কালো মিশ্মিশে টুপিটা মাথায় দিয়ে, গায়ে পাদরীর মতন ময়লা একটা ঢিলা পোষাক পরে তার পুরাণো লাঠিখানার উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পথে হেঁটে চলে যেত, তখন কত বাড়ীর জানালার মধ্য দিয়ে যে নিষ্ঠীবন, ময়লা ঐ সাদা ধব্ধবে মাথার উপর পড়্ত তার গণনা হয় না। বুড়োর কিন্তু তাতে মোটেই লক্ষ্য ছিল না—সেই ছেঁড়া ময়লা পোষাকের কাপড় দিয়েই মাথাটাকে মুছে, যেমন চলেছিল তেম্নি চলে যেত।

অধমর্ণের দল যখন এমন উত্তমর্ণের নিকট এসে কিছু সুদ ছেড়ে দেবার জন্য চোখের জলে বুড়োর নীরস কঠিন প্রাণটাকে একটু সরস, নরম করতে চাইত, তখন কিন্তু বুড়ো শুধু এক গম্ভীর 'না' উত্তর দিয়েই তার রসহীন এবং নিষ্ঠুর স্বভাবটাকে মূর্ত্তিমান করে তুলত। মুখের সে ভাব দেখে কারো আর দয়া ভিক্ষার জন্য দ্বিতীয় কথা বল্তে সাহস হ'ত না। হতভাগারা শুধু সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুঁজি পাটা যা কিছু সব নিঃশেষ করে' ঋণশোধ করত। আর বিষণ্ণতার কাল ছাপ মুখে নিয়ে বাড়ী গিয়ে আস্ত। কেউ কি এমন নিষ্ঠুর হৃদয় বুড়োর কাছে সহজে আস্ত?—নিতান্ত নিরুপায় হয়ে, বিপদে পড়্লে তবে এসে এর দ্বারে হাত পাত্ত। বুড়োও তখন হাতের মুঠোতে পেয়ে তার রক্ত শোষণ করতে ছাড়্ত না। সকলে তাকে সাধে কি 'ইহুদি সাইলক' বলত? বুড়ো যখন সুদের টাকাগুলো এক এক করে গণ্তে সুরু করত—তখন দন্তশূন্য মুখের হাসির মাঝেও যেন কি রকম একটা ক্রুর ভাব ফুটে উঠত। ঠুং ঠুং ঠুং শব্দ ক্রমাগতই যেন তাহার কর্ণকুহরে বীণাধ্বনির মতন বেজে উঠত।—আর ওদিকে অধমর্ণের এক একখানা বুকের পঞ্জর ভেঁঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে যেত। বুড়োর আসল নামটা ছিল ক্রোটসস্। যেমন বুড়ো নিজে বিদ্ঘুটে স্বভাবের, তার নামটাও ছিল সেরূপ। বুড়ো কিন্তু নামের জন্য মোটেই কেয়ার করত না—যে ইচ্ছে সাইলক বলুক—যে ইচ্ছে ক্রোটসস্ বলুক, তাতে সে মোটেই গ্রাহ্

করত না—শুধু হাসত। কিন্তু সব হাসি, সব আমোদ ঐ সকাল বেলার টাকা শোধের সময় যেন কি রকম একটা গাম্ভীর্য্যে মিলিয়ে যেত। বুড়োর আর একটা রোগ ছিল সে রাত্রে বের হত না— যদিও কোনদিন তাকে রাত্রে দেখা যেত, তা কদাচিৎ। জিজ্ঞাসা করলে বলত চাঁদের আলো বড় ঠাণ্ডা, তার সহ্য হয় না। বুড়োর সবই ছিল খাপ্ছাড়া অদ্ভুত রকমের—কেমন রহস্যজনক। লোকে বলত বুড়ো নাকি বেশ জমিয়েছে –দশ বার লাখ্ হবেই —কার্পণ্য দোষ কেবল তাকে একটী পাইও খরচ করতে দেয় না। বুড়ো নাকি গভীর রাত্রে আলো জেলে সঞ্চিত মুদ্রা গণনা করত, আর থলিগুলো আরও কসে বাঁধত, রাতটা তার উপর শুয়েই কাটিয়ে দিত। ছেলেরা যখন জিজ্ঞাসা করত "আচ্ছা সাইলক্, এত যে জমিয়েছ—তাকি যাবার বেলা নিয়ে যেতে পারবে? আর যাবার সময়ও ত ঘনিয়ে আস্ল, দুকাল গিয়েছে—তিন কালে ঠেকেছ। বৃথা সঞ্চয় ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, খেয়েদেয়ে আমোদ করে', দিন ক'টা কাটিয়ে দাও। কেন নিজকে কষ্ট দিচ্ছ!" বুড়ো শুন্ত এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত অন্যটা দিয়ে। আর হাস্ত, কিন্তু হাসির সঙ্গে কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যেত!

অর্থের আনন্দের মাঝে তবে কি কোন বিষ লুকান আছে?

(২)

যুবকদের সকলেই বুড়োকে বিদ্রূপ করত, বাক্যবাণ বিদ্ধ করতে কেউ ছাড়ত না। কিন্তু হার্বার্ট ছিল শান্ত, শিষ্ট, ধীর যুবক—বুড়োর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, সে বেশ শিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা বল্ত, কুশল জিজ্ঞাসা করত। বুড়োও এই ছেলেটিকে আদর যত্ন করত, পথে দেখা হলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা চলত।

হার্বার্ট সেদিন রাত্রে হোটেল থেকে ভোজন করে ফিরছিল। মনের স্ফূর্ত্তিতে গান গাইতে গাইতে হার্বার্ট ঠিক্ গোরস্থানে এসে পড়্ল। চাঁদ উঠেছে জ্যোৎস্না গোরস্থানটিকে বেশ জাঁকাল করে তুলেছে, বেশ একটু শীতও পড়েছে, রাস্তায় বরফ পড়্তে সুরু করেছে। গোরস্থানের দিকে চাইতেই সে যেন কি একটা দেখ্তে পেল। তাইত! ঐযে কি একটা পাথরের উপর বসে! সাদা পোষাক। এমন সময়ে কে এখানে অমনভাবে বসে! কোন সাড়া-শব্দ নাই—যেন একটা জড়পিণ্ড। যুবক কৌতূহল বশে, এক পা দু'পা করে তার সামনে গিয়া দাঁড়াল—যেন যন্ত্র-চালিত হয়ে। বুড়ো ক্রোটসস্ থম্কে চেয়েই বল্লে "কে? হার্বার্ট, বসো।"

"আপনি এখানে এমনভাবে রাত্রে বসে রয়েছেন, চাঁদের আলো না কি আপনার অসহ্য?"

"তা কি করব, আজ যে আমার অভিসার! কিছুতেই তাই আমাকে ঘরে ধরে রাখ্তে পারে নি।"

"অভিসার? তা—কি?"

"কেন অভিসার বুঝ্লে না? আজ যে আমার তার সঙ্গে এখানে মিলন হবে! আজ আমার মহা উৎসব।"

"কার সঙ্গে?"

"আমি যাকে ভালবাসি—কেন বুড়ো বলে কি এ-হৃদয়ে এক সময়ে প্রেম, ভালবাসা ছিল না?"

বুড়ো একটু থেমে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বল্তে লাগলো।

"হার্বার্ট, চেয়ে দেখ, ওই যে একটা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। ওটা এই কিছুক্ষণ হ'লো আমার মাথার'পরে ছিল। এই যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, এটাও কি সব সময়ই ঠিক এক ভাবেই চল্ছে? কখনও ধীর, কখনও প্রবল হ'য়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই যে চাঁদ রয়েছে ওটাও মাঝে মাঝে মেঘের বুকে ডুবে যায়—জোছনাও কালো হ'য়ে যায়। এই তো কিছুক্ষণ হ'লো আমি সহরে ছিলাম, কিন্তু এখন এখানে। তুমি ত আর এখানে আস্বার জন্যে আসনি—কোথায় যেতে কোথায় এসে পড়েছ। তাই বল্ছি জগৎটার মধ্যে মিনিটে মিনিটে পরিবর্ত্তনের স্রোত

বেশ প্রবল হ'য়ে বয়ে যাচ্ছে। আজ তুমি আমোদে রয়েছ—আজ তোমার স্ফূর্ত্তিময় জীবন, আজ তোমার কাছে ধরা যা বসে বোধ হচ্ছে কিন্তু এমন দিন হয় ত আসতে পারে যে দিন হার্বার্টও ঠিক এরই একটা কিছু উল্টা হ'য়ে যাবে। আমার জীবনেও এম্নি একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে—আজ তোমরা আমাকে কৃপণ বলছ, 'ইহুদী সাইলক' নাম দিচ্ছ,—আরও কত কি ভাবে জালাতন করছ। কিন্তু হার্বার্ট আমি কি কৃপণ হ'য়েই জন্মেছিলাম, আমি কি সত্যই ইহুদী? তা নয়, আমারও একটা বয়স ছিল, একটা সময় ছিল যখন কেউ আমাকে ইহুদী বল্‌তে সাহস পেত না—আমিও দুহাতে টাকা উড়াতাম—কৃপণের স্বভাব মোটেই ছিল না আমার। সেই এক সময় এখন কালের স্রোতে কোথা ভেসে গিয়েছে!—সকলই ঐ সর্ব্বনিয়ন্তার বিধান—সকলই তাঁহার ইচ্ছা। যাক্, বড় ফেনিয়ে তুলছি,—আমি যে এই সহরেই একজন ফলবিক্রেতা ছিলাম, তা বোধহয় তোমাদের কেউ জানেই না। তখন তোমরা ছিলে না—তখন যারা ছিল, যাদের নিয়ে আমোদ করেছি তারা আজ কোথায়? ফল বিক্রয় করতাম—নানা রকমের ফল; সেই কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় আমেরিকা, কোথায় আফ্রিকা পৃথিবীর প্রায় সব স্থান থেকেই আমার দোকানে ফল আসত। যে ফল অন্য কোথাও পাওয়া যেত না তা শুধু আমার ওখানেই পাওয়া যেত। তাই আমার অনেক সম্রান্ত লোকের সহিত পরিচয় ছিল। দোকানে বসেই কত লর্ড, ডিউকের দেখা পেতাম। আমিও তখন নিজকে খুব উঁচুদরে যাচাই করতাম—ফলবিক্রেতা ছিলাম বলে কি! মনে হ'ত আমার মতন সৌভাগ্যবান্ লোক অতি বিরল। যখন এত বড় বড় লোক এসে বল্‌ত, "ওহে ক্রোটসস্, একটা ফল দেও তো" তখন আমার বুক যেন সাত হাত চওড়া হয়ে যেত—আমি হাসিমুখে স্বহস্তে ফল তুলে দিতাম। জীবনটা চলেছিল বেশ কিন্তু একদিন কোথায় যেন কেমন করে হঠাৎ একটা স্থানে বাঁধা পেয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। কি ছিলাম হয়ে গেলাম কি!

সে দিনের কথা আজও মনে আছে। থাকবে না কেন! সে স্মৃতি কি মুছবার—সে যে জীবনের মহা পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত! সে দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—দস্তুর মত ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমি গরম পোষাক পরে—দোকানে বসে পথের দিকে চেয়েছিলাম। ভাব্‌ছিলাম আজ আর খদ্দের আসছে না—এই দুর্য্যোগে কি কেউ আসতে পারে? চিন্তা স্রোতে বাঁধা পেল ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে। দেখি দ্বারে একখানা ফিটন—কোনও ডিউক হ'বে। আরোহীকে দেখে আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারলাম না—কারণ এর পূর্ব্বে আর কোনও মহিলার শুভ আগমন আমার দোকানে হয় নি! ডিউক অব আলিংটনের কন্যা যে আজ এমন দুর্য্যোগে আমার দোকানে আসবে—স্বপ্নেও মনে হয় নি। আমি যেন একটা কি হ'য়ে গেলাম! কি মতিচ্ছন্ন? চোখে চোখ! সিবাষ্টিয়ানের মুখ লাল হ'য়ে উঠল—চোখের পাতা নেমে আসল! সুমধুর মৃদুস্বরে একটী কথা বের হ'লো "কয়েকটী ফল দিন।" আমি ফল দিতে অগ্রসর হ'লেম, যতবার দেই ততবারই হাত কেঁপে ফল পড়ে যায়, তার পরে মনে নাই কি করেছি, সবই গোল হ'য়ে গেল। যখন আবার আগেকার মতন চেয়ে দেখলাম—বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—সিবাষ্টিয়ানের ফিটনের চাকার দাগ রাস্তার কাদাতে বেশ ফুটে উঠেছে, তা কালে মুছে মিলিয়া যাবে কিন্তু অন্তর মধ্যে যে একটা দাগ রেখে গেছে তা কি মুছ্‌বার না মেলাবার! হার্বার্ট তুমি ভাব্‌ছ সব আজগুবি—সব মিছা! আমিও অনেক সময় ভাবি যে এরূপ একটা অভাবনীয় ব্যাপার কেমন করে বন্যার জলের মতন এসে আমার জীবনের এক কূল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হার্বার্ট, বোধহয় ভাল লাগ্‌ছে না, আর বিশ্বাসও হ'চ্ছে না? বুড়ো হয়ে গিয়েছি, মাথার চুল পেকে গিয়েছে, পাগলের মতন এক আরব্যোপন্যাসের গল্প ফেঁদে বসেছি। মনে হ'চ্ছে না হার্বার্ট? আর তা' না হ'লে মনে হচ্ছে বোধহয় আমি কোনও নেশার ভরপুর হ'য়ে প্রলাপ বকে যাচ্ছি; আচ্ছা, তার পরে কি জানি বলছিলাম? ...

ভাবি কি রকমে জীবনের এক কূল ভাসিয়ে নিয়ে গেল! যাক্ অধিক বলে কাহিনীটাকে লম্বাচওড়া করার দরকার নেই। তারপর, শোন হার্বার্ট, সিবাষ্টিয়ানের সেই প্রথম সাক্ষাতের পর আমি আর সেই ক্রোটসস্ রইলাম না। প্রত্যহই দোকান খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে থাক্‌তাম্। খদ্দের এসে বার বার ডেকে বিরক্ত হ'য়ে চলে যেত—ক্রেতার সংখ্যা ক্রমে কম্‌তে লাগ্‌ল। হাঁ করে রাস্তার লোকের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তাম, আর যত গাড়ী যাতায়াত করত মনে হ'ত এই বুঝি আবার সিবাষ্টিয়ান আমার দোকানে এসে সুমধুর সুরে বল্‌বে—"আজ আবার এসেছি—কয়েকটা ফল দিন।" একদিন সিবাষ্টিয়ানের সেই ফিটনের স্বপ্নই দেখ্‌ছি—আর পথ পানে চেয়ে আছি—সত্য সত্যই দেখ্‌লাম তারই ঘোড়ার মতন একটা ঘোড়াকে উর্দ্ধশ্বাসে লাফাতে লাফাতে আস্‌ছে! সর্ব্বনাশ! ঘোড়াটা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল—সাধ্য কি চালকের তাকে তখন বশে আনে,—সকলে ভয়ে হৈ চৈ করে ঘোড়াটাকে আরও উশৃঙ্খল করে তুল্‌ছিল,—মনে হচ্ছিল মুহূর্ত্ত পরেই ফিটনখানা ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে যাবে। আরোহীর জীবনের আশা তখন সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বরের হাতে। আমার যেন কি একটা মনে হ'ল, কেমন হয়ে গেলাম—দোকান থেকে পাগলের মতন দৌড়িয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। —সম্মুখে ঘোড়াটা বায়ুবেগে অগ্রসর হচ্ছিল। ভীরুলোকগুলো আমার এই পাগলামী দেখে সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ক্রোটসস্ পেছিয়ে পর, পেছিয়ে পর। দেখ্‌ছ না ঘোড়া আসছে?" স্বয়ং তিনিই বোধহয় আমার সহায় ছিলেন তাই ওদের কথায় কান না দিয়ে, গিয়ে একেবারে ঘোড়ার বল্গা ধরে ফেললাম—সহসা গতি রোধ হওয়ায় ঘোড়াটা সাম্‌নের পা দুটো তুলে পিছ-পায়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফিয়ে উঠ্‌লাম ঘোড়াটা তখন একটা ভীষণ চিঁহি-হিঁ-হিঁ শব্দ করে গাড়ীখানা উল্টে ফেলে দিতে চাইলো। বল্গা ধরে ঝুলে পড়্‌লাম, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ঘোড়ার লাগাম তখন সইসের হাতে দিয়ে আরোহীর দিকে অগ্রসর হ'লাম; আরোহীর প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা, সজোরে গাড়ী হতে বের করে তাঁকে কাঁধে তুলে নিলাম। একি! এযে—আরোহী নয়,—আরোহিণী সিবাষ্টিয়ান। তারপর কি হ'য়েছিল মনে নেই—লোকে বলে আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম—তারা বাসায় রেখে গিয়েছে।

দিন পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিখানা খুলেই দেখি—একি!

প্রিয়তম ক্রোটসস্,

এ জীবন তোমার কৃপায়ই ফিরে পেয়েছি—এ জীবন তোমারই। গত রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছি—তুমিই নাকি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলে—তাই এ জন্মেও একটা দৃঢ় বাঁধন আমাদের উভয়কে বেঁধে ফেলেছে। জন্মান্তর বিশ্বাস কর? আমি কিন্তু খুব করি। কিন্তু এ জন্মে মিলন অসম্ভব—একটা মহা বিঘ্ন প্রতিরোধ করছে। তুমি ফল বিক্রেতা—আমি ডিউক কন্যা। এ জগতে যদিও অসম্ভব—কিন্তু জীবনের পরপারে—আমরা এক হ'ব—চির মিলন সেখানে—এখানে নয়। এ জন্য আমি চির কুমারী থেকে কাটিয়ে দিব।"

ইতি তোমার—সিবাষ্টিয়ান।

সে দিনই মনে জাগ্‌তে লাগ্‌ল "তুমি ফল বিক্রেতা—আমি ডিউক কন্যা।" দুটো কথা যেন সুতীক্ষ্ণ সূচের মতন হৃদয়ের প্রতি কোণে আঘাত করতে লাগ্‌ল। মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ফল বিক্রেতা বলে আমি জগতে এত ঘৃণ্য, ফল বিক্রেতা কি মানুষ নয়? শুধু এই জন্যই কি উভয়ের মিলন অসম্ভব? এ দেশের ডিউক, লর্ড, ত যাদের টাকা আছে তারাই হ'তে পারে—কেবল টাকা নিয়ে সম্পর্ক, আচ্ছা,

আমিও কি পরিশ্রমে বিস্তর টাকা সঞ্চয় করতে পারি নে? এই চিন্তা হতেই—দোকান-পাট বন্ধ করে, 'টু লেটে'র এক ছাপ মেরে অষ্ট্রেলিয়াতে চলে গেলাম। হার্বার্ট, বড় রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ শোন গির্জ্জার ঘড়িতে দুটা বেজে গেল। সংক্ষেপে বলে ফেলি—পাগল যখন বাচাল হয় তখন আর তার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। যাক্, অষ্ট্রেলিয়াতে সোনার খনীতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এমন কি তারপরে একটা খনীর স্বত্বাধিকারী পর্য্যন্ত হ'য়ে খুব টাকা জমিয়ে, মুদ্রার থলিগুলো কাঁধে ফেলে—পাঁচ বছর পরে আবার এখানেই হাজির হ'লাম। এসেই শুনি আর্লিংটনের কন্যা চিরকুমারী সিবাষ্টিয়ান কয়েক মাস হ'ল ক্ষয়রোগে মারা গিয়াছে। শুনেই বসে পড়্‌লাম। হা অদৃষ্ট! সিবাষ্টিয়ান তো তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে—আমি কর্‌লাম কি? এই যে বিস্তর নিয়ে এসেছি এও তো তার জন্যই—তবে এই টাকাগুলাও তারই কোন স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। তখন থেকে যেন কি হয়ে গেলাম—আবার অর্থলিপ্সা হলো—এবার শুধু মৃত সিবাষ্টিয়ানকে পাবার জন্য তাকে জীবিত কর্‌বার জন্য। কেবলই মনে হ'ত এমন একটা স্মৃতিস্তম্ভ তার কবরের উপর তৈয়ের কর্‌তে হবে যেন সে জগতে পুনর্জ্জীবিত হয়ে, বিরাজ কর্‌তে পারে। তাই হার্বার্ট—আমি আজ সাইলক, আজ কৃপণ; ওই চেয়ে দেখ, নৈশ নিস্তব্ধতার মাঝে অনন্ত নভোমণ্ডলের নিম্নে চন্দ্রালোকে আলোকিত হ'য়ে সিবাষ্টিয়ানের কবরের উপর সৌধ জেগে উঠ্‌ছে হার্বার্ট বল, তুমিই বল, এখনও কি আমি কৃপণ, এখনও কি আমি নিষ্ঠুর, কঠোর—ইহুদী সাইলক? সিবাষ্টিয়ান আর আমি ওখানে বিশ্রাম করব—সংসারশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, গিয়ে সিবাষ্টিয়ানের বাহুর উপরে ওখানে ঘুমিয়ে পড়্‌ব। ওঃ রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে হার্বার্ট, অভিসারের সময় বোধহয় চলে গেল—বোধ হয় সে চলে গেছে। যাই দেখি গিয়ে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ক্রোটসস্ ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত মহাশ্মশানের বক্ষের উপর দিয়ে দৌড়িয়ে, স্তম্ভরাজির পশ্চাতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। হার্বার্ট স্থাণুবৎ স্থির হয়ে এক দৃষ্টে বৃদ্ধ যে দিকে গেল সে দিকে চেয়ে রইল, তারপর শিলাখণ্ড হ'তে উঠে একটা মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ছেড়ে, সহরের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল।"

দিন কয়েকের মধ্যেই গোরস্থানে একটী বিচিত্র উচ্চ সৌধ—প্রভাতসূর্য্যের সোনালী আভায় ঝলসে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টপল গির্জ্জার ওই পাশের বাড়ীখানার সম্মুখে সাইন-বোর্ড ঝুলতে লাগ্‌ল—"এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আশ্বাস।

—:*:—

সে শুধাল মোর মুখ পানে চেয়ে
"এই যে গো আমি আছি!"
চিরদিন তারে দূরে দূরে খুঁজি
যে ছিল গো কাছাকাছি!
তাই ত আমার ভরে নাই বুক,
তাই ত আমার ঘুচে নাই দুখ,

তাই ত আমার খুঁজিতে যুঝিতে
কাজের হয়েছে হেলা,
নিমেষে আসিয়া শুধায় হাসিয়া
"এখনো পড়েনি বেলা!"

অভয়।

—*:—

হাত দুটি ধরে সে কহিল মোরে
"চল ফিরে যাই ঘরে!"
কহিনু—"সুখের নষ্ট-নীড়েতে
ফিরিব কেমন করে?
যাবনা, যাবনা, ফিরিয়া চাবনা
যেখানে জাগিছে ভয়"—
"অভয় বারতা শুনাব তোমারে
চল—আর দেরী নয়!"

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

ছিটে ফোঁটা।

—:*:—

ছবি জীবন্ত হয় ও চলে কখন? যখন সমঝদার তার নিজের মনের রস—ভাবকে সমগ্র ভাবে জাগিয়ে তুলে' ছবিটিকে দেখে। তখন ছবি একটা রেখা বা রঙের সমষ্টিমাত্র থাকেনা সেটির ভিতর তখন রঙের ও রেখার অতীত এক অনির্ব্বচনীয় জিনিষ সুরের মত তাঁরা অনুভব করতে থাকেন—তখন তাদের কাছে ছবি একটা বাহ্যিক রূপের ছবি নয় সেটা মনের ছাপ বা ভাব।

কোন দেশের বা কোন কালের শিল্পকে একটা চূড়ান্ত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-শিল্প বলে ধরে থাকা চলে না।—কেননা, শিল্প কলার কোন শেষ নেই; বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানুষের সৃষ্টি ধাতার সৃষ্টির মতই নব-নব ভাবে ক্রমেই বিকাশ পেতে থাকে, তার শেষ নির্দ্দেশ করলেই তাকে প্রাণে মারা হয়।

শিল্পী মনের গতিশীল চিন্তা থেকে একটি বিশেষ ভাবকে তাঁর কলা-কৌশলে দানা বাঁধেন যেটি বহুশত বৎসর পরেও দর্শকের মনে প্রতিদিন নবীন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে সম্রাট শাহজাহানের মনে যে তাজ নির্ম্মানের পরিকল্পনা জ্যোৎস্না-রাত্রের স্বপ্নের মত ভেসে উঠেছিল, তারি ফলে আজ শত শত বৎসর পরেও তাজ দর্শনে বিশ্ববাসীর মনে নব নব রূপ-রসের সৃষ্টি হচ্চে—এইখানেই শিল্প বিশ্বজনীন।

অনেকে ভাবেন চিত্রে রূপ প্রকাশ করাই প্রধান কাজ যেহেতু ছবি বলতে একটা কিছু আকৃতির কথাই প্রধানত মনে হয়; আবার কেহ কেহ ভাব প্রধান ছবি ভালবাসেন। কিন্তু চিত্রে রূপের ভিতর ভাব-রসের বাসা

—রূপের সঙ্গে ভাব হরিহর আত্মার মত ছবিতে বিরাজ করে। তবে, রূপের জন্যেই প্রধানত ছবি নয়, তার ভাব প্রকাশই হ'ল আসল কাজ।

সাহিত্যের মত শিল্পের নানান ভাবের সমাবেশ দেখাতে গেলে সেটি জটিল হেঁয়ালীতে পরিণত হয়ে পড়ে। (শিল্প হেঁয়ালী নয়।) তাই আমরা দেখি জগতের শিল্প ইতিহাসে সর্ব্বপ্রাচীন শিল্পীরা একটি কোন মূলগত ভাবকেই চিত্রে ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যে ফোটাতে চেষ্টা করেচেন এবং সেই ভাব সহজেই ফুটে উঠেচে। আবার আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র লণ্ডন সহরের (Impressionist School) ভাবচিত্রের অভিব্যক্তিতে ছবি বাহ্যিক আকার বা রূপ এমনই তলিয়ে গেছে যে ছবির ভাবটি খুঁজতে গিয়ে বস্তুত অধীর হয়ে পড়তে হয়! এখানে কলা কৌশল (technique) শিল্প-কলাকে (Fine artকে) ছাড়িয়ে উঠেচে। এখন তাই ইতালীয় প্রাচীন চিত্রকলা বা মিশর প্রভৃতির প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মত সরল সহজ প্রাণস্পর্শি ভাবের ব্যঞ্জনা শিল্পের মধ্যে বড় দেখা যায় না।

শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বস্তুত শিল্পের কোন সংস্রব দেখা যায় না। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের যা-কিছু ছাপ তা তার শিল্পেই চিরকাল অমর হয়ে থাকে, তার জন্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। শিল্পীর শিল্পই তার জীবনের একমাত্র বড় পরিচয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কোনই মূল্য নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত শিল্পকলা আছে যার রচয়িতার নাম বা জীবনী বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিহীত আছে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

সাফল্য।

আজি মুখ চাওয়া মোর ফুরালো।
তোমার অসীম করুণা লভিয়া,
তাপিত হৃদয় জুড়ালো॥
শ্রাবণের ধারা ঝর ঝর ঝরে,
ভিজায়ে কঠিন বালুকা ঊষরে,
তেমতি, এ হৃদি-মরুভূ আগারে,
চিরতৃষা মম নিভালো॥
ছিনু পথ চেয়ে বসিয়ে।
নিশি জাগরনে অলস নয়ন,
কখন ফেলেছি মুদিয়ে॥
ওগো কার মুখ চাহি প্রভাতে উঠিনু?
তোমার মোহন পরশ লভিনু,
তব ব্যাথাহরা দিঠে, দুখ পাশরিনু
প্রেম সরোবরে নাহিয়ে॥

শ্রীমতী সরযূ মৈত্র।

সেকালের বাঙ্গালীর বেশভূষা।*

বাঙ্গালীর বেশভূষা সেকালে কিরূপ ছিল ইহা আলোচনা করিবার অগ্রে, দুই একটি পুরাতন বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

বৈদিকযুগ সম্বন্ধে সকলের ধারণা—তখন মুনিঋষিগণ বল্কল পরিধান করিতেন। সে কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্যবস্ত্রের ব্যবহার ছিল না এমন নহে। তুলা, পশম ও শণের বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। শণের বস্ত্রকে ক্ষৌম বলিত। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বেদে সূচী ও সীবনের কথা আছে। সুতরাং সেলাই করা বস্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুসংহিতায় তসর ও রেশমের উল্লেখ আছে। তসরকে কোষের ও রেশমকে পাট বলিত। মহাভারতীয় যুগে প্রথম চীনাংশুক চীনা রেশমের ব্যবহার ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বিশ্বকোষে" লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি অমরকোষে চীনাংশুক কথা পাই নাই। অমরকোষ এই বৌদ্ধযুগে লিখিত, ইহাতে যে উল্লেখ নাই মহাভারতীয় যুগে তাহার ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

মহাভারতীয় যুগে কিরীট, হার, অঙ্গদ, চক্রবাল, বলয়াঙ্গদ, বৈদুর্য্যমণি, কুণ্ডল বলয়, করে শঙ্খ, মণিময় স্বর্ণহার কিঙ্কিনী প্রভৃতি অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। পুরুষকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মহার্হ স্ত্রালঙ্কার উপহার-স্বরূপ দেওয়া হইত। এক, করে শঙ্খ ব্যতীত সকল অলঙ্কারই পুরুষে ব্যবহার করিত। যোগীসন্ন্যাসীরা অজিন ও বল্কল পরিতেন আর সাধারণ লোকে ধৌত বসন, সূক্ষ্ম-বস্ত্র, রক্ত-বস্ত্র ও মহার্হ বসন পরিত। স্ত্রীলোকেও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিত। সৈনিকেরা বর্ম্ম পরিত এবং সম্ভবতঃ বর্ম্মের আকারে কোনরূপ জামাজোড়াও পরিত। বৌদ্ধযুগেই ইহার নিদর্শন পাই।

কলিকাতার মিউজিয়মের ভরহুৎগৃহে যে পাথরের রেল বা বেড়া আছে তাহাতে জাতকের চিত্র অঙ্কিত আছে ইহাতে পুরুষের পরিধানে আস্তিনযুক্ত জামা আছে, জামাগুলির নিম্নভাগ কোঁচকান। নাভিদেশ উন্মুক্ত। কোমর হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত ঘাঘরা কোমরবন্ধ দ্বারা আবদ্ধ। এই কোমরবন্ধের দুই পার্শ্ব দুই পায়ের মধ্য দিয়া প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে। মস্তকে উষ্ণীষ। প্রহরীদের গায়ে চোগা। পুরুষের কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে বলয়, গলায় হার, কাহারও কাহারও পরিধানে ধুতি, ইহার ভাঁজগুলি সুস্পষ্ট। স্ত্রীলোকের গলায়, মস্তকে, কর্ণে, বক্ষে, বাহুতে ও হস্তে, কটি ও চরণে অলঙ্কার আছে। ভরহুৎ গৃহের তক্ষণ শিল্প অন্যূন দুই হাজার বৎসরের।

অমরকোষ হইতে জানিতে পারি পুরুষ মস্তকে মুকুট ও শিরোরত্ন, কর্ণে কর্ণবেষ্টন বা কুণ্ডল, গলায় হার, কটিতে শৃঙ্খল ও চরণে নূপুর, বাহুতে কেয়ূর, অলঙ্কার ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোক শিরে চূড়ামণি, সিঁথীতে বালপাশ্যা, ললাটে ললাটিকা কর্ণে কর্ণিকা, তালপত্র, গলায় কণ্ঠভূষা ও মুক্তাবলী, দেবচ্ছন্দ বা শতাবলী, একাবলী নক্ষত্রমালা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হার, বাহুতে বলয়, কেয়ূর, অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়ক, করভূষণ, কটিতে মেখলা ও কিঙ্কিণী বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, চরণে পদাঙ্গদ মঞ্জীর ও নূপুর পরিত।

বৌদ্ধযুগে ছাল নির্ম্মিত ক্ষৌম, মৃগরোমজ রাঙ্কব, কার্পাসজাত চাদর, কোষজাত পট্টবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। সাধারণে বস্ত্র যুগ্ম ব্যবহার করিত, এইরূপ ধৌত বস্ত্র যুগলের নাম ছিল উদ্গমনীয়। প্রক্ষালিত পট্টবস্ত্রকে পত্রোর্ণ,

* বর্দ্ধমান পরিষৎ শাখায় পঠিত।

সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রকে দুকূল, উড়ণীকে প্রাবৃত ও বহুমূল্য বস্ত্রকে মহাধন, সামান্য বস্ত্রকে চেল বা অংশুক, শোভন বস্ত্রকে সূচেলক বা পট্ট এবং মোটা বস্ত্রকে স্থূল শাটক বলিত।

কম্বল, আসন ও গাত্রবস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত। পরিধেয় বস্ত্রকে অন্তরীয় বা অধাংশুক বলিত। ইহাই ধুতি বা পাজামা। উত্তরীয় বস্ত্রকে প্রাবার বা সংব্যান বলিত। ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবারিত হইলে প্রাবার ও স্কন্ধে বা গলায় ফেলিয়া রাখিলে উত্তরীয় বা সংব্যান বলিত। অঙ্গ আবরণের জন্য চারিটি পৃথক নাম পাওয়া যায় প্রচ্ছদপাট বা নিচোল, নীশার আপ্রপদীন ও চোল বা কূর্পাসক। ইহার মধ্যে আস্তিনবিহীন জামাকে চোল, আস্তিনযুক্ত জামাকে নিচোল, মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত আবরণবস্ত্রকে আপ্রপদীন্ বলিত। নীশার কথনও উষ্ণীষরূপে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিত আবার গাত্রাবরণ রূপেও ব্যবহৃত হইত। সেনার বস্ত্রাদি নির্ম্মিত জামাকে কঞ্চুল বলিত।(১)

অঙ্গরাগের জন্য কুঙ্কুম চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। লোকে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অধিবাসন করিত। কথনও কথনও কতকগুলি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইত। লোকে গালে ও কপালে রঞ্জিত গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিত্র আঁকিত। নানা প্রকারের ফুলের মালা ব্যবহার করিত, কেহ বা কেশে জড়াইত, কেহ বা শিথায় ঝুলাইত, কেহ বা বক্ষে ধারণ করিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে এইরূপ অঙ্গরাগ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে যে সকল খোদিত চিত্র আছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় সেকালে জড়ির কাপড় ও ছিট প্রচলিত ছিল। নর্ত্তকীরা পাজামা ও পাশোয়াজ পরিত। সাঞ্চীস্তূপ উদয়গিরি ও অমরাবতীর স্তূপের চিত্র দেখিলে সেকালে যে পাজামা, চাপকান কোমরবন্ধ চাদর ও বুটের ন্যায় চর্ম্মপাদুকার ব্যবহার ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। সূর্য্য মূর্ত্তিতে অধিকাংশ স্থলে বুটের ন্যায় পাদুকা আছে ও জঙ্ঘার অধিকাংশ (Cycle Hose এর ন্যায়) মোজাদ্বারা আবৃত। এই মোজার উপরিভাগের দুই পার্শ্বে V এর আকারে কাটা। সূর্য্যমূর্ত্তি ভিন্ন অন্যত্র ও কোথায় কোথায় পদে বুটের ন্যায় পাদুকা বা উপানৎ আছে। বিষ্ণুপুরের মন্দির গাত্রের চিত্রে এইরূপ পাদুকা দেখিয়াছি।

এইবার বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সেকালের বাঙ্গালীর বেশভূষার উপাদানের বিষয় আলোচনা করিব।

আমি যে সকল পুরাতন কবির গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিত প্রণীত শূন্য-পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার বয়ঃক্রম অন্যূন ছয়শত বৎসর। ইহাতে অলঙ্কারের মধ্যে অঙ্গুরী, টাড়, বালা ও কঙ্কণের নাম পাই। বস্ত্রের মধ্যে দুকুল বস্ত্র, নেতর ধুতি, নেতর বসন, নেতর সুতী, পাট ও জোড়া কথা পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় 'নেত' কথার অর্থ লিখিয়াছেন 'ছিন্নবস্ত্র'। যেখানে 'নেতর পতাকা' আছে, সেখানে এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু নেতর ধুতি, নেতর বসন স্থলে এ অর্থ সুসঙ্গত হয় না।(২) খ্রীষ্টাব্দ দশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীবদন তাঁহার মনসামঙ্গলে "নেতের উড়নী" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে মহাদেব ইন্দ্রকে বলিতেছেন "পাট নেত বাস পর গলে রত্নমালা। হাড়মাল্য মোর গলে পরি বাঘছালা॥" জয়ানন্দ

(১) সৈন্যগণ এতদ্ব্যতীত কোমরবন্ধ, বর্ম্ম, ও উষ্ণীষ ব্যবহার করিত। তুন্নবায় ও সৌচিক জাতি প্রস্তুত করিত এবং চর্ম্মকারগণ পাদুকা নির্ম্মান করিত।

( ) মাণিক গাঙ্গুলি তাঁহার শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলে লিখিয়াছেন, 'নেতের আঁচল ভিজে নয়নের জলে।' জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাই—'পাটনেতে জোট রজত দিল একে একে।'

তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপের বাজারে কি কি বিক্রয় হইত তাহার বর্ণনা স্থানে বলিয়াছেন "পাট নেত ভোট, সকলাৎ কম্বল", এ চারি স্থলেও ছিন্নবস্ত্র ন্যাতা অর্থ হয় না। এস্থলেই পাট অর্থে রেশম আর নেত অর্থে তসর বা কোন বহুমূল্য জড়িযুক্ত কার্পাস াত সূক্ষ্ম বস্ত্র বলিয়া বোধ হয়।

ইহার পরে রূপনাথের ধর্ম্মমঙ্গলে স্ত্রীলোকের চিত্রিত কাঁচুলির কথা পাই, মাণিক গাঙ্গুলি এক স্থানে ষোলটি শ্লোক ও অন্যস্থলে দুইটি শ্লোকে আর ঘনরাম মোটে ছত্রিশটি শ্লোকে কাঁচুলির চিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। এই চিত্রগুলি একত্র করিলে বোধ হয় বায়োস্কোপের একটি ক্ষুদ্র ফিলম্ হইত। এই কাঁচুলি বহুদিন হইল বাঙ্গলা দেশ অন্তর্ধান করিয়াছিল। কেবল যাত্রার দলের স্ত্রীলোকের-পোষাকে ব্যবহার ছিল। এখন অবশ্য কাঁচুলি, বডি বা জ্যাকেটরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। (৩)

মনসারভাসান প্রণেতা ক্ষেমানন্দ, জোড়ধুতি, চিকণ-বনাত, আনন্দাই-শাড়ী, চেলী, মলমল, ছিট, উড়নী গরভস্‌ত চাদুরা, নীলশাড়ী পাটপাটাম্বর, শালমের থান, ভোটকম্বল জামা (৪) জোড়া ও পাগ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিজ বংশীবদনের বর্ণনায় গঙ্গাজলি-শাড়ী, নেতের-উড়নী, পাটশাড়ী, ঘাঘর, নীবিবন্ধ, ঘুঘুরা কথা পাই। মাণিক গাঙ্গুলির সময় দেশে সুচল ব্যবহৃত হইত। নাপিত আত্মীয়ের বাড়ী শুভ সংবাদ দিয়া পুরস্কার পাইল "পট্ট কাপাস ইজার যোড়া জোড়া আর।" রাজা শিকারে যাইবেন তাঁহার পোষাক এইরূপ "পাগড়ী সুরচিত, শিরপর শোভিত শোভন সাজুয়া গায়। শ্রবণে কুণ্ডল, করিছে ঢল ঢল মকমলি উপানৎ পায়॥" ভাটের পোষাকের এইরূপ বর্ণনা আছে "পরিশোভা ভাল, পুরটে মিশাল, প্রচিত্র পাগড়ী মাথে। তাহার উপর জরি মনোহর, মুক্তামণ্ডিত তাতে॥ শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, কিরণ কাবাই গায়। হেমহীরা সহ। উপ উপানহ, অতি অনুপম পায়॥"

কবিকঙ্কণের সময়ে পাটের গড়া, পাটের জাদ, খুঞাধুতি, কাচাধুতি, জোড়গড়া, পীতধড়ি, বিবাহাদি শুভকার্য্যে পীতবসন, স্ত্রীলোকের বার হাত শাড়ী, মেঘডম্বুর কাপড়, তসরের শাড়ী, খোসলা ধুতি (উর্ণাবস্ত্র), সগল্লাদ, ভোটকম্বল প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এই 'সগল্লাদ' শব্দকে জয়ানন্দ 'সকলাত' বলিয়াছেন। ইহা একরূপ বহুমূল্য বিছানা বলিয়া বোধহয়।

জয়ানন্দ বলেন নবদ্বীপের বাজারে খড়িগ রঙ্গি কাপড়া পাটনেত ভোট সকলাত কম্বল বিকাইত। শ্রীচৈতন্য দেব কৃষ্ণকেলী বস্ত্র পড়িতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে যাত্রাসিদ শাড়ী, কাপড়ের-রাজা, খুঞা, নেত, মল্লাফুল কাপড় অগ্নিফুল শাড়ীর উল্লেখ দেখিতে পাই।

---

(৩) পূর্ব্বে যে কঞ্চুকের উল্লেখ করিয়াছি তাহার অনুকরণে প্রস্তুত বলিয়া স্ত্রীলোকের জামাকে কঞ্চুলিক বলিত। এই কঞ্চুলিকা হইতে কাঁচুলির উৎপত্তি। আমাদের ধুতির কোঁচাও বোধহয় কঞ্চুক শব্দজাত।

(৪) এই জামা ও আধুনিক জামা শব্দ বিস্তর পার্থক্য আছে। জামা জোড়া শব্দের জামা পূর্ব্বকালের কঞ্চুক। ইহার পুরো আস্তিন ছিল, গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত চাপকানের ন্যায় তন্নিম্নে পাদদেশ পর্য্যন্ত ঘাঘরার ন্যায় কোঁচকান। ইহা বড় লোকেই ব্যবহার করিত। হিন্দুস্থানী বিবাহের বর এখনও এই জামা পরিয়া থাকে। যাত্রা থিয়েটারে পূর্ব্বকালের পচ্ছিদরূপে এখনও ইহার ব্যবহার আছে।

ঘণরাম বর্দ্ধমান রাজকবি ছিলেন। তিনি শাল দোশালা, সরবন্ধ জোড়ার উল্লেখ করিয়াছে। রামপ্রসাদ রাজ-বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "জরীর পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে" তাছাড়া বনাত, মখমল, পট্টু' ভুসনাচ, খাসা, বুটাদার ঢাকাইয়া, মালদহ নলাটি চিকণ সরবন্ধ-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে দিল্লীর দরবারে বিলাতী খেলাত গায়ে দেওয়াইলেন।

আমরা ইহাতে দেখিলাম মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে পায়জামা ও চাপকান ছিল। দরজীও ছিল। অথচ অনেকে বলেন আমরা বাঙ্গালী যে পায়জামা চাপকান গায়ে দিই তাহা মুসলমান বাদসাহদিগের অনুকরণ করিয়া। কোন প্রবন্ধ লেখক দরজী (মুসলমান) কথায় সংস্কৃত প্রতিশব্দ না পাইয়া চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে বলিয়াছিলেন "মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এদেশে দরজী ছিল না।" রাজা, যোদ্ধা, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি লোকেই এই জামা জোড়া, কঞ্চুক, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে ধুতিই ব্যবহার করিত। এই ধুতির সুবিধার কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের দেশে প্রস্তরের তক্ষণ শিল্প না থাকিলেও মন্দির গাত্রে খোদিত ইষ্টকের চিত্রে পুরাতন বেশভূষার অতীত স্মৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হুগলী জেলায় ব্রিটিশ চন্দন নগর, ও পুরুষোত্তম পুরে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে এইরূপ বহু চিত্র দেখিয়াছি। নৌকার দাঁড়ী মাঝির পোষাক—চাপকান, কোমরবন্ধ, পায়জামা ও মস্তকে পাগড়ী, পাল্কী বাহক, বন্দুকধারীর ও ঢাল তলোয়ার ধারীর পোষাক—ছোট চাপকান, ছোট পায়জামা মস্তকে হ্যাটের ন্যায় টুপি। নৌকায় স্ত্রী আরোহীর পোষাক—বক্ষে কাঁচুলি পরনে শাড়ী বা ঘাঘরা এবং ওড়না কালীয়দমন যাত্রার বৃন্দাদূতীর ন্যায় মস্তক বেষ্টন করিয়া পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ লোকের ধুতিও পরণে আছে।

আমাদিগের দেশের যাত্রাওয়ালা এবং মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুতকারী ভাস্করগণ বহুদিন পর্য্যন্ত পুরাতন পোষাককে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য (Fashion) এর নিকট পরাজিত হইয়া সেগুলিও ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে অদৃশ্য হইতেছে।

এইবার অলঙ্কারের কথা বলিব। সেকালে নিম্নলিখিত অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। মস্তকে রত্ন মুকুট, চূড়ামণি কপালে ঝুরি মুক্তাবলী, সিঁথী পশ্চাৎদেশে পুষ্প রচিত ঝাঁপা, পাটের থোপনা, কর্ণে কর্ণফুলি, চক্রাবলী, কর্ণপুর, কুণ্ডল, (উপর কর্ণে) চাকী নিম্ন কর্ণে বলি, এই বালি জাঙ্গপুর উপরিভাগে এখন ও 'বালি" নামে অভিহিত। নাসায় নাকচনা, মুক্তাবলীযুক্ত বেশর। গলায় হিরণ্য মাদুলি শতেশ্বরী হার, গজমুক্তা হার, গ্রীবাপত্র চন্দ্রহার, কলধৌত কণ্ঠমালা, সরস্বতী হার ও শিশুর গলায় বাঘনখ। বাহু ও মণিবন্ধে তাড়বালা বা টাড়বালা বাজুবন্দ বা বিজটা, কেয়ুর, অঙ্গদ, বলয় (বা বালা) বিভিন্ন নামের শাঁখা যথা লাবণ্য শঙ্খ, শ্রীরামলক্ষণ শঙ্খ, লক্ষ্মীবিলাস শঙ্খ, রাঙ্গা রুলি, সোণার চুড়ি, খাড়ু, কনক বাহুটি। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, কটিতে কিঙ্কিণী ও সোণার শিকলী, পদে পাশুলি, নূপুর রত্নময় উট গোটামল, মগরা খাড়ু, ব মকর খাড়ু, ঘুঙ্ঘুর সহিত। (৫)

অঙ্গরাগের জন্য অগুরু, কালাগুরু, কস্তূরী কুঙ্কুম, চন্দন, চুয়া, শিলারস প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। এগুলি গায়ে মাখাইবার কাজ ছিল নাপিতের যথা, —মাণিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে "মর্দ্দন না পড় নিযুক্ত

(৫) অলঙ্কাররূপে কড়ির প্রচলন ছিল যথা "ঝলমল করে গাঁঠ্যা কড়ি শ্রুতি মূলে" ও "হৃৎগ্রীবে শোভা করে হীরামাটা কাড়।" শ্রীচৈতন্য দেব "গুঞ্জাদাম" বা কুঁচের মালা গলায় পরিতেন।

নিজ কাজে। মাথায় চন্দন, চুয়া মত্ত মনসিজে॥" (৬) স্ত্রীলোকে ললাটে প্রশস্ত সিন্দুর দিয়া গোরোচনা ও চন্দনের বিন্দু তার চারি পাশে দিত। নয়নে কজ্জল লাগাইত। কর্পূর দিয়া পান খাইয়া অধর রঞ্জিত করিত। স্নানের সময় বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল, আমলকী মাখিত (৭) শুভকার্য্যে উবটন্ ও হরিদ্রা মাখিত। বঙ্গবাসী আফিসের প্রকাশিত মনসামঙ্গলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় বিদ্যারত্ন এই উবটন্ কথার অর্থ লিখিয়াছেন "অঙ্গরাগ বিশেষ", কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই। জাজপুর উপবিভাগের রাজপুত জাতির বিবাহে এখনও উবটন্ ব্যবহৃত হয়। যব, হরিদ্রা ও নানারূপ সুগন্ধি মশলা ভাজিয়া পিশিলেই উবটন্ হয়। ইহা তৈল ও হরিদ্রার সহিত অঙ্গে মাখিবার প্রথা আছে।

পুরুষেও দীর্ঘ কেশ রাখিত কখনও খোঁপার আকারে বাঁধিত কখনও বা পাগড়ীর মধ্যে ঢাকা থাকিত। (৮) স্ত্রীলোকের দুই প্রকার খোঁপার নাম পাইয়াছি 'লোটন ঝুঁটি ও গুয়া মুঠা কবরী।" ভুবনেশ্বরের মন্দিরে বহু প্রকারের খোঁপার নমুনা আছে। খোঁপায় ও কেশে চাঁপা মালতী প্রভৃতি ফুলের হার দোহারা তেহারা করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরিত। সামাজিক কার্য্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে মাল্যচন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিবার রীতি ছিল। সমাজপতিই সর্ব্বপ্রথমে মাল্যচন্দন পাইতেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই বিবাদ বাধিয়া যাইত। মাল্যের খুব বেশী ব্যবহার ছিল বলিয়াই মালাকার জাতির জীবিকা চলিত।

কাচের আয়না কতদিন হইতে চলিয়াছে জানি না কিন্তু ধাতুজাত দর্পণের ব্যবহার ছিল। বেশভূষা করিবার সময় ও বরণ-ডালায় দর্পণের ব্যবহার ছিল। বিবাহের বর এ দর্পণ সর্ব্বদা হাতে রাখিত। জাজপুর উপবিভাগে নাপিতের গৃহে এখনও কাঁসার গোলাকার দর্পণ আছে। বিবাহে এখনও ইহার প্রচলন আছে অবশ্য তাহাতে মুখ দেখা যায় না।

কাহার মতে "যে জাতির পরিচ্ছদ যত মিশ্র বা জটিল সে জাতি তত উন্নত, সুতরাং আমাদের কোট প্যান্টালুন ইত্যাদি ইউরোপীয় পরিচ্ছদই ব্যবহার করা উচিত।" শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষাই পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাহ্যাড়ম্বরে লোক ভুলান ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। এই গৌণ উদ্দেশ্যেই যদি পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলেও আমাদের সেকালের চোগা, চাপকান, পাজামা, পাগড়ী কি কোট ওয়েষ্টকোট, নেকটাই, হ্যাটের নিকট পরাজিত হইবে? ইয়ুরোপীয় পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে হইলে দিনে অন্ততঃ চারি পাঁচ রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয়। সভ্যতাপন্ন লোকের পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার

---

(৬) ভারত চন্দ্রের সময়ে আতর গোলাপ রাজারাজরাদিগের মধ্যে বেশ চলিয়াছিল।

(৭) মাথায় মাখিবার আমলা কোন কোন গন্ধদ্রব্যের সহিত মিলাইয়া গন্ধ বণিকাগণ বিক্রয় করিত। যথা কবিকঙ্কণে—

"মণ্ডলার বেনা আইল শঙ্কর দাসের বেটা।
আওলা বাঁটিয়া যায় করতলে ঝাঁটা॥
দুই দুই পণ বেচে আওলা এক পাত্র।
তায় শিলারস চুয়া কর্পূর যাবত্র॥"

(৮) যথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—(ক) "মস্তকের কেশ বাঁধে দিল মন্ত্র পড়্যা।"

(খ) কনক কলেবর, ধুলায় ধুসর, আউল্যাল চাঁচর কেশে।

(গ) মিত্রের বচন শুনি সর্ব্বলোক কান্দে। গায় আছড়িয়া পড়ে কেশ নাহি বান্ধে।

আমার অধিকার নাই। কিন্তু ধুতি ও উড়ানী যে আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জাতীয় পরিচ্ছদের উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত এ দেশে আট মাস কোন জামা বা পিরাণের প্রয়োজন নাই। আর তাঁতের আদিম সন্তান ধুতি উড়ানাকে পায়জামায় পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখি না। ধুতি পরিয়া শয়নে, উপবেশনে, ধাবনে, উল্লম্ফনে, বৃক্ষারোহণে, সন্তরণে কোন অসুবিধা নাই। পরিধানে কোনরূপ আগুণ লাগিলেও খুলিতে বিলম্ব হয় না। এখন যেরূপ লম্বা কোঁচা করিয়া ধুতি পরিবার রীতি প্রচলন হইয়াছে চাল্লশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সে রীতির উদ্ভব। এরূপ লম্বা কোঁচা থাকিলে অবশ্য ধুতি পরিয়া সব কাজ করা চলে না। (১)

সেকালে অধিকাংশ লোকেই জামা গায়ে দিত না, তাই কবিগণ রূপ বর্ণনায় "নাভি সুগভীর।" "ত্রিবলী" "আজানুলম্বিত বাহু" প্রভৃতি কথা প্রয়োগ করিতেন। তখন অধিকাংশ লোকে কুস্তি করিত। শরীরের গঠনও সুন্দর ছিল। সুঠাম শরীর নগ্ন রাখিয়া দশজনকে দেখাইয়া লোকে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। এখন ডায়াবেটিস ডিসপেপ্সিয়া পীড়িত দেহ দেখাইবার মত নহে। ব্রাহ্মণে উপবীত দেখাইলে প্রণাম পাইত। ব্রাহ্মণেরও প্রণাম পাওনা উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন সকলের অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আর উত্তরীয় বা উড়ানী দ্বারা সেকালে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। বাজারে গিয়া জিনিষ পত্র বাঁধা চলিত। সামান্য শীতে গায়ে দেওয়া হইত। শীতাতপে মাথা বাঁধা চলিত। পথিমধ্যে স্নানের প্রয়োজন হইলে ধুতিখানা ভিজাইয়া উড়ানীখানা পরা চলিত।

পাগড়ী বঙ্গদেশ হইতে কেন উঠিয়া গেল: ইহার কারণ নির্ণয় করিতে আমি অসমর্থ। বাঙ্গলার কৃষকে রৌদ্র বৃষ্টিতে আত্মরক্ষার জন্য এখনও টোকা ব্যবহার করে। বিলাতি ছাতার ব্যবহার বেশী দিনের নয়। আর তৎপূর্ব্বেই পাগড়ী বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। যোগ্যতর হস্তে পড়িলে এরূপ প্রবন্ধ আরও মনোহর হইত বলা বাহুল্য।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

বৈরাগী-তলার মেলা।

কে বলো এ ডাঙ্গায় ডেকে আন্‌লে এত লোক
দেখে আমার ভরলো রে বুক ভরলো দুটী চোক্।
কোন নারদের নিমন্ত্রণে আজকে অকস্মাৎ
অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে পাতলো এসে পাত।
আস্‌লো হেতা দিগ্বিজয়ী কোন্ সে রঘুরাজ,
উঠ্‌লো ক্ষীরোদ মন্থনেতে লক্ষ্মী নাকি আজ!
কোথায় তোমার কপিধ্বজ, কোথায় নারায়ণ
অষ্টাদশ এ অক্ষৌহিণী চায় কি মহারণ?

(১) বঙ্গদেশ সূক্ষ্মধুতির জন্য বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের সূক্ষ্ম ধুতি বিদেশে চালান যাইত। সাধারণে মোটা কাপড় বা গড়া পরিত। সূক্ষ্ম ধুতি ধনীদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহার করিত।

কোন ঝুলনে রাধাশ্যামের আজকে হবে দোল ?
মুহুর্মুহু উঠছে কি তাই মধুর হরিবোল।
ভাসাইতে কোন নদীয়া, করতে কারে ত্রাণ
প্রেমের গোরা আনলে হেতা হরিনামের বান!
বলো কাহার দান-সাগরে এমন মহোৎসব
কোন ভূপতির তোরণ-দ্বারে জাগে এমন রব ?
ছিল ঢুদিন হেথায় কেবল ভক্ত সাধু এক
পতিতপাবন চরণ ধূলার শক্তি তোরা দেখ !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মহীসুরাধিপতির সম্বর্দ্ধনা।

বিগত ৩রা ফাল্গুন তারিখে কোচবিহার সাহিত্যসভা মহীসুরাধিপতিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

বিবিধবিদ্যাবিলাস-রস-রসিকাশেষকীর্ত্তিকুশল-

ক্ষত্রকুলশিখামণি-মহীসুর-মহী-মহীন্দ্র-শ্রীশ্রীমৎ সার্ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার্

মহারাজ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, মহানুভবস্য

অভ্যর্থনা-প্রশস্তিঃ।

এহ্যেহি রাজন্যগণাগ্রগণ্য,
এহ্যেহি বিদ্বৎপ্রণয়প্রবীণ।
এহ্যেহি ভূমণ্ডলসর্ব্বমান্য,
এহ্যেহি সাহিত্যকলাভিধন্য ॥ ১ ॥

ত্বদর্চ্চনাযোগ্যপদার্থহীনৈ-
র্হৃদাসনং কল্পিতমাসনায় ;
গৃহাণ চিত্তার্ঘ্যমথাশ্রুপাদ্যং
[illegible] ভক্তিস্রুগন্ধিপুষ্পম ॥ ২ ॥

বিদ্যা ধনং ধর্ম্ম ইহৈকলোকে
তিষ্ঠন্তি নৈবং হি চিরপ্রসিদ্ধিঃ।
ভবন্তমাসাদ্য গুণৈর্ব্বরিষ্ঠং
সার্থপ্রবাদোঽপি নিরর্থকোঽভূৎ ॥ ৩ ॥

ত্বং শীলবান্ ভীষ্ম ইব প্রশস্যঃ,
ত্বং ধৈর্য্যবান্ শৈল ইবাপ্রধৃষ্যঃ।
ত্বং জ্ঞানবান্ জীবসমো যশস্যঃ,
ত্বং ধর্ম্মবান্ ধর্ম্মসুতেন তুল্যঃ ॥ ৪ ॥

ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্যমহত্ত্ব-শৌর্য্য-
চারিত্র-সৌজন্যগুণৈর্বিশিষ্টৈঃ
'দিক্‌পালমাত্রাঘটিতো নরেন্দ্রঃ'
শাস্ত্রীয়বাদং সফলীকরোষি ॥ ৫ ॥

দেশেষু চ স্থাপয়িতা প্রজানাং
বিদ্যালয়ানাং মতিবর্দ্ধনার্থম্।
সাধূপকারেষু সদানুরক্তঃ,
ত্বষ্টাগ্ন-গৃহ্লাসি তথৈব যুক্তঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যাবীর্য্যপ্রথিতবিভবে কীর্ত্তিমদ্ভির্গরিষ্ঠে
জাতঃ শ্রীমানখিলগুণভূঃ ক্ষত্রবংশাবতংসঃ।
প্রাজ্যং রাজ্যং সকলসুখদং স্বৈগুণৈস্ত্বং বিধৎসে
কুল্যাসেতুপ্রভৃতি-করণৈর্ধাতুবিদ্যাবিধিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

মধুর-মধুর-মূর্ত্তিঃ প্রীতিবিশ্রম্ভধামা,
করুণহৃদয়-দৃষ্টিঃ রূপলাবণ্যসীমা।
প্রকৃতিষু শুভবুদ্ধিঃ রাজ্যভব্যৈকলক্ষ্যঃ,
জয়তি জয়তি নিত্যং কৃষ্ণরাজো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

খবেদবহ্নিন্দুমিতে শকাব্দে সৌরিবাসরে।
শুভনামে ফাল্গুনে সৌরমাসদশ্যৈর্বিনয়ান্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥

কোচ্‌বিহারসাহিত্যানুশীলনীসমিতেরিয়ম্।
মহীসুরমহীন্দ্রায় প্রশস্তির্দীয়তে মুদা ॥ ১০ ॥

——:*:——

অভ্যর্থনা প্রশস্তির অনুবাদ।

১। হে রাজন্যকুলতিলক, হে পণ্ডিতমণ্ডলীপ্রীতিবর্দ্ধন, হে ভূমণ্ডলবাসিমানববৃন্দবরেণ্য, হে কাব্যনাটক ও সুকুমার কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ সার্ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার্ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সাহিত্যসভায় শুভাগমন করুন।

২। আপনার ন্যায় মহামহনীয় মহাজনের অভ্যর্থনার উপযুক্ত উপকরণহীন, কুচবিহার সাহিত্য-সভার দীন সদস্য (আমরা) আপনার পবিত্র উপবেশনের নিমিত্ত হৃদয়াসন পাতিয়া দিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের মানস অর্ঘ্য, হর্ষাবগলিত অশ্রুপাদ্য ও ভক্তিরূপ সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণ করুন।

৩। বিদ্যা, বিত্ত ও ধর্ম্ম এক ব্যক্তিতে অবস্থিতি করে না, ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত জনপ্রবাদ। কিন্তু ঐ তিন বস্তু অধুনা আপনার ন্যায় গুণগৌরবশালী অসাধারণ পাত্র লাভ করিয়া ঐ চির প্রচলিত প্রবাদকেও ব্যর্থ করিয়াছে।

৪। আপনি ভীষ্মের ন্যায় প্রশস্ত চরিত্র, অচলের ন্যায় অবিচলিত ধৈর্য্য শোভিত, বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানমণ্ডিত, এবং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তুল্য ধার্ম্মিক।

৫। মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ পার্থিব নরপতিকে দিকপাল মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি দয়া, দাক্ষিণ্য, ধীরত্ব মহত্ত্ব, বীরত্ব, সাধু চারিত্র্য, শিষ্টতা প্রভৃতি অনন্যসুলভ অতিমানব গুণাবলীতে বিরাজিত থাকিয়া এই শাস্ত্রীয় বাক্য বর্ণে বর্ণে সার্থক করিয়াছেন।

৬। আপনি প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান বিস্তার মানসে দেশমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিরিয়াছেন। আপনি যেমন সাধুদিগের হিত সাধনে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর, তেমনি অসাধুদিগের দমনে নিরন্তর তৎপর রহিয়াছেন।

৭। হে মহারাজরাজেশ্বর! আপনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বীরত্ব, শৌর্য্যমণ্ডিত কীর্ত্তিভূষণ পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৌরবিত ক্ষত্রিয়বংশের শিরোভূষণরূপে নিখিল গুণের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ধাতুবিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বিলাসভূমি। আপনার সুবিশাল রাজ্য শাসনসৌকর্য্যে ও কুল্যাখনন, সেতুবন্ধন, রথ্যা নির্ম্মাণ আদি পূর্ত্ত কার্য্যের সুশৃঙ্খলায় দিন দিন প্রকৃতি পুঞ্জের বিপুল সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছে।

৮। হে নৃপেন্দ্রচূড়ামণি মহীসুরেশ্বর কৃষ্ণরাজ! আপনি অতীব প্রিয়দর্শন, মানবমাত্রেই আপনার প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র, আপনার হৃদয় দয়ার্দ্র ও দৃষ্টিকারুণ্য বর্ষিণী; জগতে আপনার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অতুলনীয়। আপনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন, রাজ্যের হিতাকাঙ্খাই আপনার জীবনের মূলমন্ত্র। মঙ্গলময়ের কৃপায় সর্ব্বত্র আপনার বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

(৯—১০)। কুচবিহার সাহিত্য সভার সদস্যবৃন্দ অতি বিনীত ভাবে ১৮৪০ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের তৃতীয় দিবসে শনিবারে মহীসুরাধীশ্বরের করকমলে হৃষ্টচিত্তে এই অভ্যর্থনা প্রশস্তি উপহার দিতেছেন।

কোচবিহার সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্স্ ভিক্টর্ নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মহোদয়ের অভিভাষণ।

—:*:—

YOUR HIGHNESSES and GENTLEMEN,

I deem it an honour and a privilege to be able to say a few words today.

Before I proceed any further, let me, on behalf of the Executive Committee and members of the Cooch Behar Sahitya Sava, offer His Highness the Maharaja Bahadur of Mysore a hearty welcome. It is seldom indeed we get an opportunity of welcoming so great a personage in our midst. Your Highness, through the munificent patronage of our beloved Ruler, this Sava was started 4 years ago with the primary object of historical Research, and a lesser degree the Arts, Sciences and Literature although there are probably hundreds of volumes written on the history of other parts of India, little or next to nothing is known to the outside world of the ancient history of these parts. It is one of our duties therefore, to collect material, and place before the world a true and authentic history of Cooch Behar and neighbouring territories. Before I close, allow me to thank Your Highness for kindly sparing us a few minutes of your valuable time and affording us the opportunity of welcoming you in our midst.

অনুবাদ।

অদ্যকার সভায় কিছু বলিতে সক্ষম হওয়ায় আমি গৌরবান্বিত ও অনুগৃহীত হইয়াছি।

বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি কোচবিহার-সাহিত্য সভার ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সদস্যগণের পক্ষ হইতে মহীসুরাধিপতিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মহানুভব ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ আমরা কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের লোকপ্রিয় মহারাজের উদার অভিভাবকতায় চারি বৎসর পূর্ব্বে এই সভা স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং তৎসহ শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শত শত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও এতদঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বাহ্যজগতে একরূপ অজ্ঞাতই রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ দ্বারা কোচবিহারও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের প্রকৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস জগদ্বাসীর সম্মুখে স্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমি আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যে হেতু তিনি বহু মূল্য সময়ের কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহীসুরাধিপতির উত্তর—

শ্রী

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলিনী সমিতিং প্রতি ইয়ম্ উক্তিঃ

অয়ি মহারাজ ভো ভোঃ পণ্ডিত বর্য্যা সভাসদঃ

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলিনী সমিতেঃ সন্দর্শনাৎ অভ্যর্থনা বাক্যাচ্চ আনন্দ পরবশো ভবাম্যদ্য।

ভবদীয় প্রশস্তি বচনে ময়ি মহান্ প্রেমভাবঃ প্রকটীকৃতঃ তদর্থং তত্রভবতো বন্দে।

অস্মদীয় রাজ্যে প্রজানাং হিতায় বিদ্যাভ্যাসায় চ যে যে প্রযত্নাঃ কৃতাঃ তে সর্ব্বেঽপি ভবদ্ভিঃ সম্যক্ বিদিতা এবেতি নিতরাং মোদোহহম্ অনাদি কালাৎ সমুপাগতায়াঃ ধর্ম্মাদ নিখিল-পুরুষার্থ বোধিন্যাঃ পরিপোষণার্থং বিশেষতঃ প্রচারার্থং চ প্রবৃত্তায়াঃ অস্যাঃ সমিতেঃ প্রীতের্ম্ম পাত্রতা সমজনীতি অমন্দানন্দ সুধাম্বুধৌ নিমজ্জামি।

“—” জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরাভিধ বিরুদাঙ্কিতস্য মহারাজস্য সমাবলম্বাৎ ইয়ং সমিতিঃ সংস্কৃত বিদ্যাপ্রচারস্য প্রধান ভূতা তা ইতোঽপ্যধিকাং খ্যাতি মেষ্যতীতি অহং দৃঢ়তরং প্রত্যেমি। আর্য্যেভ্যঃ অস্মদীয়েভ্যঃ পুরাতনেভ্যঃ ক্রমাদনু প্রাপ্তমিমং বিদ্যানিধিং অপ্রমত্ততয়া রক্ষিতুং দেশোন্নতি হেতোঃ প্রাচুর্য্যমাপাদয়িতুং চ ভবদীয়া সমিতিঃ ইয়ম্ অতীব সহকারিণীতি মন্যে।

অয়ং ভবতাং পরম প্রেমাস্পদীভূতো মহারাজঃ ভবদীয় কুশলানু যোগার্থং প্রতিক্ষণ মুপচীয় মানোৎসাহঃ বর্ত্ততে ইতি জানে—কিং চাস্য মহারাজস্য অনুজবরঃ মহারাজ কুমার ভিক্টর নারায়ণাভিধঃ যস্যাঃ দধ্যক্ষতা পদ মলং করোতি আয়ুষ্মান তস্মাদয়ং সমিতিঃ অতিশয়েন বৃদ্ধিমেষ্যতীতি দৃঢ়তরং প্রত্যেমি।

শিবং ভবতু।

শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্গানুবাদ—

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলিনী সমিতির প্রতি এই উক্তি—

মহারাজ ও সুপণ্ডিত সভাসদ্‌গণ! আজ কুচবিহার সাহিত্যানুশীলিনী সমিতি সন্দর্শনে ও অভ্যর্থনা বাক্যে আনন্দিত হইয়াছি।

আপনাদের প্রশস্তি বচনে আমার প্রতি বিশেষ প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য আপনাদের অভিনন্দন করি।

আমার রাজ্যে প্রজাদের হিতের জন্য ও বিদ্যা-ভ্যাসের নিমিত্ত যে সকল প্রযত্ন করা হইয়াছে তাহা সকলই আপনাদের সুবিদিত জানিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনাদিকাল হইতে আগত ধর্ম্মাদি সমস্ত পুরুষার্থ বোধিনী সংস্কৃত বিদ্যার পরিপোষণ ও বিশেষতঃ প্রচারের জন্য প্রবৃত্ত এই সমিতি আমার প্রীতির পাত্র হইয়াছে, এই হেতু আমি প্রগাঢ় আনন্দ সুধা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নামাঙ্কিত এই মহারাজের অভিভাবকতায় এই সমিতি সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারে সর্ব্বপ্রধান হইয়া ইহার অপেক্ষাও অধিক খ্যাতিলাভ করিবে ইহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমাদের পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে ক্রমানুসারে প্রাপ্ত এই বিদ্যানিধি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে এবং দেশের উন্নতির জন্য বহুল প্রচার করিতে আপনাদের এই সমিতি অত্যন্ত সহায় হইবে ইহা আমি মনে করি। আপনাদের পরম প্রেমাস্পদ এই মহারাজ আপনাদের কুশলের জন্য প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত বিদ্যমান তাহা আমি জানি। বিশেষতঃ মহারাজের অনুজবর মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ যখন ইহার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন তখন এই সমিতি যে অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করিবে তাহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

মঙ্গল হউক—শ্রীকৃষ্ণ।

মহীসুরাধিপতি সভার হিতার্থে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রদান করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হয়।

বিদ্যাবিজ্ঞানবিশারদ শ্রীমন্ মহীসুর মহীপতেঃ কৃতজ্ঞতা প্রশস্তিঃ।

১। জয়তু জয়তু রাজন্ রাজ-রাজন্য বন্ধো
নয়-বিনয়-চরিত্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-সিন্ধো।
জনহিত-রত-চিত্ত-শ্লাঘ্যশীলৈকনিষ্ঠ
মুকুর-বিমল-বুদ্ধে দেশমাতুর্ব্বরেণ্য॥

২। প্রকৃতি-বিভব-পূর্ত্ত্যৈ রাজ ভূত্যৈ চ সম্যক্
পরিহৃতসুখভোগো রাজ-কার্য্যৈক-চিত্তঃ।
অগণিত-তনু-পাতং মন্ত্রসিদ্ধৌ নিযুক্তঃ
জগতি বিপুল-কীর্ত্তি-খ্যাতি-শান্তী-লভস্ব॥

৩। বিহার-সাহিত্যসভাং নিরীক্ষ্য
ত্বয়ার্পিতা হৃদ্‌হৃদা সহস্রম্।
মুদ্রা বয়ম্ মুগ্ধ-হৃদঃ সদস্যাঃ
গৃহ্ণীমহে সৌম্য সসাধুবাদম্॥

৪। পূতাত্মা বিবুধাশ্রয়ো গুণবতাম্ শ্রেষ্ঠঃ শরণ্যঃসতাম্
সৎসঙ্গী শ্রুত-শৌচনির্ম্মলমনা বিদ্যাব্ধিপারংগমঃ।
শাস্ত্রালাপসুখী কলাসু কুশলো বিদ্যার্থি-কল্পদ্রুমঃ
সদ্যোৎসাহ-বলোর্জ্জিতোবিজয়তাং শ্রীকৃষ্ণরাজোনৃপঃ॥

৫। দ্যুমণৌকলসংপ্রাপ্তে শনৌ নেত্রমিতেদিনে।
নভোযুগাহি-শুভ্রাংশুমিতে শাকে সমর্পিতা॥

হে রাজ-রাজেশ্বর-মিত্র, হে বিনয়, চরিত্র, রাজনীতি, প্রজ্ঞা ও বিবেকের আধার, হে জন-কল্যাণ-নিদান, হে নিষ্কলঙ্ক-কুলশীল সম্পন্ন, হে দর্পণ তুল্য স্বচ্ছবুদ্ধি স্বদেশ-মাতৃকার বরেণ্য সন্তান! সর্ব্বত্র আপনার জয়ধ্বনি বিঘোষিত হউক। ১।

আপনি আশ্রিত জনমণ্ডলীর বৈভব বৃদ্ধিও রাজসমৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" মূলমন্ত্র করিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সতত স্বলক্ষ্য সাধনে জাগরূক আছেন। বিধাতার করুণায় আপনি ধরাতলে অসীম যশ কীর্ত্তি ও সুখ শান্তি ভোগ করুন। ২।

আপনি অদ্য কোচবিহার সাহিত্য সভা ভবনে শুভাগমন করিয়া ইহার কার্য্য কলাপ দর্শনে প্রীত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চার উন্নতিকল্পে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আপনার এতাদৃশ অসম্ভাবিত বদান্যতা দর্শনে মুগ্ধ হৃদয় সভার সদস্যগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে ধন্যবাদের সহিত এইসাত্ত্বিক দান গ্রহণ করিতেছেন। ৩।

হে ছাত্রসমাজকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণরাজ নৃপেন্দ্র? আপনার মন অতি উদার ও অতি পবিত্র। আপনি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাদিগের ও শাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্বারা সুধীসমাজের আশ্রয় স্থল। গুণিগণগণনায় অগ্রগণ্য, সদাশয়দিগের পালক, সৎসঙ্গে নিরত, পবিত্রতা ও জ্ঞানাগ্নিতে আপনার মনোমালিন্য নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনি অপার বিদ্যাপারাবারের অদ্বিতীয় পারদর্শী। আপনি উদ্দীপ্ত উৎসাহ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও মনস্বিতা প্রভৃতি গুণ রাশিতে সতত দেদীপ্যমান। ৪।

দ্যুমণি (সূর্য্য) কুম্ভরাশিস্থ হইলে (ফাল্গুন মাসে) শনিবারে ৩রা তারিখে ১৮৪০ শকাব্দে এই কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হইল। ৫।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিরহিণী রাধা

কুচবেহার রাজপুস্তকাগারের প্রাচীন চিত্র হইতে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বৈশাখী।

—:#:—

কৃষ্ণ ত্যজে বাঁশী মোহন মধু হাসি, কৃষ্ণা সাজিয়াছে ঐ গো আজ,
শ্যামের দেহ বাঁকা কোথা সে শিখী পাখা কোথা সে পীতধড়া কোথা সে সাজ!
প্রেমেতে বাধা-বাধা কোথা সে নাম রাধা স্নিগ্ধ অন্তরে দিল না ঢালি
খড়গ ধক্ ধক্ জিহ্বা লক লক্ মুক্তকুন্তলা করালী কালী!

*

*　　*

কোথা সে সুন্দর মোহন কলেবর উমার তনুলতা ফুলের বেশ
নিচোল অঞ্চল কাঁপন চঞ্চল অদম অন্তরে মদন-ক্লেশ?
মোহিনী উমা হেরে রুদ্র জেগেছে রে রুদ্ধ অন্তরে বিকার নাই,
ললাটে থাকি থাকি জ্বলেছে ঐ আঁখি মদন জ্বলেপুড়ে হয়েছে ছাই!

মধুর মধুমাস হতাশে ফেলে শ্বাস গেল রে গেল গেল সকল সুখ,
প্রেমেরে চুম্বিয়া যা ছিল বিকশিয়া ঝরিল সবই আজ ভাঙ্গিয়া বুক !
ফাগুন অঙ্গনে ফুলের বনে বনে যে হাসি নিতি নিতি লুটিয়া যায়—
প্রখর রবি তাপে প্রাণের সন্তাপে শুখায়ে যায় তাহা হায় গো হায় !

অন্তরীক্ষ কাহাকে কহে ?

অন্তরীক্ষ শব্দের অর্থ যে "অনন্ত গগন" বা "শূন্য" ইহা আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই জানেন, এবিষয়ে আবার সংশয় বা জিজ্ঞাসা কেন ?

হাঁ কথা এইরূপই বটে, সকলে সেই মান্ধাতার অতিবৃদ্ধপিতামহহইতে অদ্যাপর্যান্ত আবহমান কাল ঐরূপ অর্থই জানিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ অন্তরীক্ষ, নভঃ, ব্যোম বা আকাশ শব্দের প্রকৃতার্থ শূন্য বা অনন্ত গগন নহে। ফলতঃ অন্তরীক্ষ ও নভঃ শব্দের প্রকৃতার্থ "ভুবর্লোক" বা মধ্যম লোক, এবং উহা বর্ত্তমান তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান (অপোগস্থান) কিংবা উহা পুরাণের কেতুমালবর্ষের সহিত অভিন্ন এবং আকাশ ও ব্যোম শব্দের প্রকৃতার্থ আদি স্বর্গ দ্যো বা বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া। প্রমাণ ?

প্রমাণ বেদাদি সর্বশাস্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধে অন্তরীক্ষ যে বর্ত্তমান তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থান, তাহা সপ্রমাণ করিয়া প্রবন্ধান্তরে আকাশ বা ব্যোম যে মঙ্গলিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিব। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন যে—

ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ,
ভুব ইতি অন্তরিক্ষং, সুব ইত্যসৌ লোকঃ। ১৭ পৃ

আমাদিগের অধ্যুষিত এই যে ভারতবর্ষ, ইহাই ভূর্লোক বা ভূলোক, ঐ যে সুদূর-সংস্থ স্বর্গলোক, উহারই নাম "সুবঃ" বা "স্বঃ", অর্থাৎ আদি স্বর্গ দ্যো বা মঙ্গলিয়া এবং ভুবর্লোকের নামান্তরই "অন্তরীক্ষ"।

ভূলোক যে ভারতবর্ষ, পরন্তু ভূমণ্ডল নহে, তাহার প্রমাণ কি ? তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ফলতঃ "ভূভারতে" এই প্রবাদবাক্য, ব্রাহ্মণের ভূদেব ও ভূসুর নাম ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের "ভূঃ—অয়ং লোকঃ" এই বাক্যের ভূ—যে ভারতবর্ষ, তাহা সংসূচিত করে। আর সুবঃ যে স্বঃ বা দ্যো অর্থাৎ মঙ্গলিয়া, তাহাও

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। তবে যেমন স্বর্গ শব্দ যজুর্বেদে "সুবর্গ" বলিয়া বিবৃত, তদ্রূপ "স্বঃ" শব্দও ভাষার বিকারে যজুর্বেদে "সুবঃ" এই আকার ধারণ করিয়াছে। আচ্ছা—

ভুবঃ যে অন্তরীক্ষ

ইহা যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্যানুসারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু অন্তরীক্ষ যে শূন্য বা গগন নহে, পরন্তু কোনও জনপদ, অর্থাৎ তুরুষ্ক পারস্য ও অপোগস্থান, তাহা কেন স্বীকার করিতে হইবে? দেখ প্রামাণ্য কোষ অমর বলিতেছেন যে—

"লোকস্তু ভুবনে জনে"

লোক শব্দের অর্থ মনুষ্য (জন) ও "ভুবন" বা জনপদ। সুতরাং যাহার নাম "ভুবর্লোক", তাহা শূন্য হইতে পারে না। তবে কেন কলিকাতার একজন মহামান্য ব্যক্তি, আমোরকায় বলিয়া আসিলেন যে—

"ভুবর্লোক"

পৃথিবী ও শূন্যস্থ স্বর্গের মধ্যবর্ত্তী কোনও শূন্যবিশেষ? স্বর্গ শূন্যস্থ কোনও অপাদগম্য স্থান—ইহা কল্পনাসাগরের ফেনবুদ্বুদাবশেষ, এবং কেহ অদ্যাপি উহার অবস্থানবিন্দুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না, এবং "ভুবর্লোক" যে একটী শূন্যখণ্ডাবশেষ, ইহাও সাধু বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ফলতঃ "ভুবর্লোক" একটী সীমাবদ্ধ পাদগম্য জনপদ। যদুক্তং যজুর্বেদভাষ্যে শ্রীমতা সতা মহীধরেণ—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ৩৭ক। ৩অ

অত্র মহীধরঃ...ভূর্ভুবঃ স্বঃ—পৃথিব্যাদীনি লোকত্রয়নামানি।

এই ভূঃ—ভুবঃ ও স্বঃ, পৃথিবীপ্রভৃতি লোকত্রয়। অর্থাৎ ইহারা তিনটী লোক বা জনপদ। অর্থাৎ এই পৃথিবী পৃথুর পৃথুল রাজ্য ভারতবর্ষ, পরন্তু ভূমণ্ডল (world) নহে। পৃথিবী শব্দের মুখ্যার্থ ভারতবর্ষ; ফলিতার্থ মধ্যমা পৃথিবী অন্তরীক্ষ, আর পরমা পৃথিবী দ্যো বা আদি স্বর্গ (কশ্যপ্রভৃতিসপ্তদ্বীপাত্মক বর্তমান মঙ্গোলিয়া) এবং পৃথিবী শব্দের তৃতীয় ফলিতার্থ (Secondary meaning) ভূমণ্ডল। আর স্বঃ—আদি স্বর্গ দ্যো, ও ভুবঃ—অন্তরীক্ষ। কেবল মহীধর নহেন, পাণিনির তত্ত্ববোধিনীটীকায় শ্রীমজ্জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী এবং হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বে ধৃত যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যবচনও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে—

সপ্ত ব্যাহৃতি (ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য)

উপর্য্যুপরি (উত্তরোত্তর) সংস্থিত সাতটী লোক, পরন্তু ইহারা একটী শূন্য গগন বা শূন্যসংস্থ কোনও অপাদগম্য বস্তু নহে।

আচ্ছা বুঝিলাম ও স্বীকার করিয়া লইলাম যে ভুবর্লোক অন্তরীক্ষ এবং উহা একটী জনপদ বা ভুবন। কিন্তু তবে কেন বেদের বহুমন্ত্রে উহা শূন্যার্থে প্রযুক্ত দেখা যায় (৭। ২৫ সূ। ১ম প্রভৃতি)?

হাঁ, একথা অতি সত্য, বেদের কতিপয় মন্ত্রে "অন্তরীক্ষ" শব্দ পক্ষিগণের বিহারক্ষেত্র গগন বা শূন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্র পৌরাণিক ভ্রান্তির যুগে প্রণীত। কেন না অন্তরীক্ষ যে একটী ভুবন বা জনপদ, তাহা বেদের বহু মন্ত্র পাঠেই জানা যায়। যথা—

অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্বাক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা। ২৫ক।২অ যজুর্ব্বেদ

বামন বিষ্ণু (কশ্যপাত্মজ) স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সহ (১৬। ২২সূ। ১ম ঋগ্‌বেদ দেখ) স্বর্গহইতে ত্রিষ্টুভ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরীক্ষে দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ করেন।

বিষ্ণু স্বর্গভ্রষ্ট মন্বাদি দেবগণ সহ ভারতে আগমন করেন। তিনিও নর দেবতা, অন্যান্য দেবতারাও জননমরণ-শীল নরদেবতা বটেন, ইঁহারা কেহই শূন্যচর বা উভচর পক্ষী নহেন, সুতরাং এই অন্তরীক্ষ শূন্য গগন নহে—পরন্তু ভুবন বা জনপদ। তথা হি—

দিবি অন্যাঃ সদনং চক্রে উচ্চা, পৃথিব্যা মন্যাঃ অধি অন্তরিক্ষে। ৪। ৪০ সূ। ২ম

এই মন্ত্রের দিব্ (দ্যুলোক), পৃথিবী ভারতবর্ষ (ভূঃ) এবং অন্তরীক্ষে সদন বা ভবন নির্ম্মাণের কথা বলা হইতেছে ? অতএব এই অন্তরীক্ষ জনপদ বা লোকবিশেষ। কেন না শূন্যে সদননির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে।

তস্থিবান্ অন্তরিক্ষে যঃ। ৫। ৮৫। ৫ম

তত্র সায়ণঃ... ... ...যো বরুণঃ অন্তরিক্ষে তস্থিবান্। যে বরুণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেনঃ বরুণ দুইজন, একজন অদিতিনন্দন, অন্য বরুণ মাতা মনুর সন্তান। এই দ্বিতীয় বরুণই ভারতবর্ষহইতে অন্তরীক্ষের অন্তর্গত পারস্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। গ্রীকগণ ইঁহাকেই Uranas (বরুণস্) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই বরুণও কশ্যপের ঔরসে মাতা মনুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং ইনি "মনুষ্য", সুতরাং ইঁহার বাসস্থান "অন্তরীক্ষ"—শূন্য গগন হইতে পারে না। তথাহি অথর্ববেদঃ—

ত্রয়োলোকাঃ সম্মিতা ব্রাহ্মণেন. দ্যৌরেব অসৌ পৃথিবী অন্তরীক্ষং। ২২৯পৃ। ২য় খণ্ড

লোক বা ভুবন তিনটী, দ্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া, পৃথিবী এই অস্মদধ্যুষিত ভারতবর্ষ এবং অন্তরীক্ষ। ব্রাহ্মণগণ এই তিন স্থানেরই সত্তা অবগত আছেন। তথাহি—

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুত হবং মে, যে অন্তরিক্ষে যে উপদ্যবিষ্ঠ। ১৩। ৫২সূ। ৬ম

যে সকল দেবতা অন্তরীক্ষে ও দ্যো বা আদি স্বর্গ (দ্যবি) মঙ্গলিয়ায় আছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।

বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ

শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—কৃতবিদ্য লোকদিগের উপাধি বা নাম দেব বা দেবতা। তাঁহারা কেহ কশ্যপসন্তান ও কেহ কেহ বা ধর্ম্মপুত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের বাসস্থান "অন্তরীক্ষ", শূন্য হইতে পারে না। তথাহি—

অন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ। ৬। ১১০সূ। ১ম

অর্থাৎ অন্তরীক্ষের লোকদিগের নিকট হইতে বা লোকদিগকে।

অন্তরীক্ষে লোক বাস করিত ? অতএব এহেন অন্তরীক্ষ শূন্য গগন হইতে পারে না। অন্তরীক্ষে কোন্ কোন্ নরেরা বাস করিতেন ? তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

আন্তরিক্ষ্যা যা প্রজাঃ গন্ধর্বাপ্সরস শ্চ যে, সর্বাস্তাঃ। ১৪৩১ পৃঃ।

অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব ও অপ্সরঃপ্রভৃতি যে সকল প্রজা বাস করেন,—তাঁহারা সকলে। তথাহি—

অত্র বসবো রন্তু দেবা উরৌ অন্তরীক্ষে। ৩।৩৯ সূ। ৭ম।

এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে ধবপ্রভৃতি অষ্টবসু সুখে বিহার করেন।

বসুরন্তরিক্ষসৎ ।৫ ৪০।৫ম।

ধবপ্রভৃতি অষ্টবসু অন্তরীক্ষে বাস করিতেন। তথাহি—

অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ। আদিপর্ব্ব।

বিষয় শব্দের অর্থ জনপদ—"বিষয়ঃ স্যাৎ ইন্দ্রিয়ার্থে দেশে জনপদেঽপি" ইত্যমরঃ। অন্তরীক্ষ যে একটি বিষয় বা জনপদ, উহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার প্রজার ন্যায়। তথাহি বিষ্ণুপুরাণম্—

পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরীক্ষগা।

ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈব সার্ণবম্॥ ৩৩।২অ। ২অংশ।

পশ্চিমে উৎপন্ন সীতা নদী পূর্ব্বমুখী হইয়া অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া এক পর্ব্বতহইতে অন্য পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক ভদ্রাশ্ববর্ষ বা বর্ত্তমান চীন দেশ দিয়া পূর্ব্ব সাগরে পতিত হইয়াছে।

অতএব যে অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বাদি প্রজা সকল বাস করেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দেবতারাও গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন, যাহার উপর দিয়া উত্তালতরঙ্গময়ী সীতা নদী (ইয়াং শিকয়াং) প্রবাহিত, সে অন্তরীক্ষ কখনও খেচর পক্ষীদিগের বিহারক্ষেত্র হইতে পারে না। তথাহি—

যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্। অথর্ববেদ

যেহেতু নরিষ্যন্তরাজার পুত্র শকগণ (সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়) শাকারী ভাষা (৩৮৭ পৃ সাহিত্যদর্পণ) লইয়া অন্তরীক্ষে গমন করেন।

ইহাই ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশ (তুরুষ্ক) স্থ আর্য্যারম (Urzarom) প্রদেশ। সুতরাং এ অন্তরীক্ষ শূন্য গগন নহে।

সকলেই জানেন যে, মহারাজ ত্রিশঙ্কু ভারতহইতে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তির জন্য স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু ভোট না পাওয়াতে তিনি ইন্দ্রত্ব না পাইয়া অন্তরীক্ষে আসিয়া মস্তক হেট করিয়া থাকেন, আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন না। যদি মহাভারত ও পুরাণের এই ঐতিহ্য অবিতথ হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, ত্রিশঙ্কু, শূন্যের দিকে পা ও মাটীর দিকে মাথা দিয়া শূন্যে নিরালম্বে ঝুলিতেছিলেন ? না, তিনি মর্ম্মাহত হইয়া অন্তরীক্ষের একদেশ আফগানিস্থানে আসিয়া তথায় থাকিয়া যান, অপমানভয়ে আর ভারতে প্রত্যাগমন করেন না, ইহাই সত্য ?

হে সাক্ষেন ভ্রাতৃগণ! মাধ্যাকর্ষণহেতু যখন সামান্য একটী কুটাও শূন্যে থাকিতে পারে না, তখন পাঁচ মণ ওজনের ভীমের গদা এখনও শূন্যে ঘুরিতেছে ও ত্রিশঙ্কুও শূন্যে পা উপরে, মাথা নীচে দিয়া এখনও ঝুলিতেছেন,

তোমরা কি ইহাও বিশ্বাস করিতে চাহ? যেমন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত কুল্লূক, মনুর ২৩।১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—

"তোমরা শ্রৌতার্থে কোনও আশঙ্কা করিও না,
উহাতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে,"

তদ্রূপ তোমরাও কি ইহাও বিশ্বাস করিতে চাও যে—ত্রিশঙ্কু কোনও দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রকৃতির দ্বার অর্গলিত এবং যুক্তির বক্ষে পদাঘাত করিয়া ঐ-রূপে শূন্যে পা দিয়া ঝুলিতেছিলেন ও এখনও রাবণের চিতার মতন ঝুলিতেছেন?

হে ভ্রাতৃগণ! বৈদিক কোষ নির্ঘণ্টুর ১৫শ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে (জীবানন্দী সংস্করণ) যে—

বিয়ৎ, আকাশ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, ভূ, পৃথিবী ও অধ্বর ইতি ষোড়শ অন্তরিক্ষনামানি।

যদি নিঘণ্টুকোষপ্রণেতা সুস্থমস্তিষ্কে এই সকল কথা লিখিয়া থাকেন, আর হিন্দু তোমরা ইহা মানিয়া লইতেও নতকন্ধর হও, তাহা হইলে যে অন্তরীক্ষের নাম ভূ, পৃথিবী, সমুদ্র ও অধ্বর, তাহা কি প্রকারে শূন্য হইতে পারে?

আকাশ-গঙ্গা ও বিয়দ্গঙ্গা একই, উহা আমাদিগের কাশী ও কলিকাতা-তলবাহিনী ভাগীরথী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যে আকাশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, সে আকাশ কি প্রকারে শূন্য হইতে পারে? বৃহৎ পরাশর বলিতেছেন যে—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং
দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ॥ ৬।৩অঃ।

আকাশ (মেরু পর্ব্বতের) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং উহা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের পূর্ব-বাসস্থান (চরকের ৫০৩ পৃষ্ঠা দেখ—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সংস্করণ)।

এখন বল দেখি আমাদিগের বাপদাদারা কি শূন্যে বাস করিতেন, না কোনও পাদগম্য স্থলে বাস করিতেন? আকাশ বা স্বর্গ কি আমাদিগের আদি জন্মভূমি নহে? যদুক্তং ছান্দোগ্যেন—

ইমানি হ সর্বাণি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।
আকাশ এব জ্যায়ান আকাশঃ পরায়ণম্।

জগতের এই সমস্ত প্রাণী আকাশহইতে সমুৎপন্ন। আকাশ জগতের সকল অয়ন (জনপদ) হইতে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনতম। তথাহি অমরসিংহ:—

স্বর্ণদী সুরদীর্ঘিকা

গঙ্গা বা ভাগীরথীর নামান্তর স্বর্ণদী (স্বর্গের নদী) বা দেবগণের দীঘী।—সুতরাং এ আকাশ শূন্য বা Sky নহে পরন্তু আদিস্বর্গ এই মঙ্গোলিয়া (বৃহদারণ্যকেও আছে যে আকাশ মনুষ্যদিগের আদি বাসস্থান।) ঐরূপ সীতা নদী ও গন্ধর্বাদির বিহারক্ষেত্র অন্তরীক্ষও শূন্য সংস্থা নহে, পরন্তু তুরুষ্ক, পারস্য, ও আফগানিস্থান।

আরও দেখ, শূন্য গগনের আর একটী নাম যে ভূ বা পৃথিবী, ইহাও ষোল আনা মিথ্যা কথা। কেন নিঘণ্টু অন্তরীক্ষকে ভূ ও পৃথিবী নামে সংসূচিত করিলেন? যেহেতু ভারতবর্ষের নাম ভূ ও পৃথিবী, একারণ ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনাধীন তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান অর্থাৎ অন্তরীক্ষের নামও ভূ ও পৃথিবী হইয়াছে। বেদে অন্তরীক্ষ—মধ্যমা পৃথিবী নামে বিবৃত—

অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাং পরমস্যাং পৃথিব্যাং ৯।১০৮।১ম।

অবমা পৃথিবী —ভারতবর্ষ, পরমা পৃথিবী আদি স্বর্গস্থো এবং এই মধ্যমা পৃথিবীই অন্তরীক্ষ (সায়ণ ভাষ্য দেখ)। তৈত্তিরীয় বৈদিকগণকেও বরুণের অন্তরীক্ষ বাসস্থান "তৃতীয় পৃথিবী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যাহার নাম ভূ এবং পৃথিবী, তাহা শূন্য গগন হইতে পারে না।

আরও দেখ—অন্তরীক্ষের আর একটি নাম "সমুদ্র"। শূন্য গগন সমুদ্র বা সাগর নহে, সুতরাং সমুদ্রাপরনামা এই অন্তরীক্ষ শূন্য হইতে পারে না। না পারুক—তথাস্তু--কিন্তু স্থলময় তুরুক, পারস্য ও আফগানিস্থানের নামই বা "সমুদ্র" হইল ও হইবে কেন? উহাদের নাম সমুদ্র হইবার কারণ, এই যে উহারা পশ্চিম সাগরগর্ভে সম্ভঃ প্রসূত—

ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।১।১৯০।১০ম।

ঈশ্বরের সেই উৎকট তপস্যাহইতে পশ্চিম সমুদ্রগর্ভে (অর্ণবঃ অধি অর্ণবাৎ অধি অর্ণবগর্ভে, ঐ মন্ত্রের ২য় চরণ দেখ) সমুদ্র বা অন্তরীক্ষ (এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য দেখ) জন্মগ্রহণ করে।

উহারা সমুদ্র বা জলপ্রধান ছিল, তাই উহাদের নাম সমুদ্র ও আপঃ (এই আপঃ হইতেই অপোগস্থান বা আফগানিস্থান শব্দ প্রসূত)।

আচ্ছা, সায়ণ যে সমুদ্র শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ করিলেন—তাহা যেন নিঘণ্টু অনুসারেই করিলেন, কিন্তু উহার নিগম বা শিষ্টপ্রয়োগ কোথায়? মহামান্য ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

ত্রিতো বিভর্ত্তি বরুণং সমুদ্রে। ৪।৯৫।৯ম।

ত্রিতনামক দেবতা মাতা মনুর সন্তানবরুণকে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষে লইয়া যান।

তাই পৌরাণিকেরা বলিয়া গিয়াছেন বা বলিয়া থাকেন যে—

সমুদ্রো বরুণালয়ঃ।

সুতরাং বরুণ যখন কচ্ছপ বা কুম্ভীর নহেন, তখন এই "সমুদ্র," না সাগর ও না শূন্য গগন বটে? তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ! গৃহো হিরণ্ময়ঃ। ৪৯০ পৃষ্ঠা। ২য় খণ্ড।

হে রাজন্ বরুণ! অপ্সু অর্থাৎ অন্তরীক্ষে তোমার যে গৃহ আছে, উহা লৌহময় (হিরণ্য—লৌহ ও স্বর্ণ)। তথাহি—যজুর্ব্বেদঃ—

মনুষ্যান্ অন্তরিক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ। ৬ ক—৮অ—

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, মাতামনুর সন্তান মনুষ্যগণকে (বরুণ প্রভৃতি) অন্তরীক্ষে লইয়া যান। তথাহি—

বায়ুমন্তরিক্ষাৎ। ৩০০ পৃষ্ঠা ছান্দোগ্য মহেশপালসংস্করণ।

প্রজাপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ অর্থাৎ অন্তরীক্ষের অন্তর্গত আফগানিস্থানহইতে যজুর্ব্বেদমন্ত্রসমাহারার্থে মহর্ষি বায়ুকে (৪২।৯ অ মনু দেখ) গ্রহণ করেন। তথাহি—

অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসা
অমনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।
মাতুঃ পদে পরমে অন্তি সৎ গোঃ। ১০।৪সূ।৫ম।

পৃশ্নি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। (১৬৬সূ।৬ম ভাষা দেখ)। মহর্ষি ত্বাতান (Teuton) পিতৃভূমি স্বর্গহইতে (Paradics lost হইলে) মাতৃভূমি ভারতে আগমন করিয়া এখানে বহুকাল বাস করেন। তৎপর অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আপগানিস্থান স্থলে পরিণত হইলে তিনি

মাতা গো বা পৃশ্নির অঙ্গে তুরুষ্কে

একটী গোপনীয় স্থান মনোনীত করিয়া তথায় গমন করেন এবং তিনিই তথায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ও ব্যাবিলোনিয়াপ্রভৃতি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেবগন্ধর্বমনুষ্যাদির বাসস্থান এই অন্তরীক্ষ গগন বা শূন্য হইতে পারে না।

আরও দেখ গগন বা শূন্যের নাম "অধ্বর" ইহাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহ অবগত নহেন। সুতরাং অন্তরীক্ষ— শূন্য গগন হইতে পারে না। আচ্ছা তুরুষ্ক ও পারস্যাদির নামই বা "অধ্বর" হইবে কেন? না উহাদের নামও অধ্বর নহে, কিন্তু "অন্তরীক্ষ"।

তবে নিঘণ্টু কেন অন্তরীক্ষপর্য্যায়ে—"অধ্বর" শব্দের পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন? আর অষ্ট বসুরা ত প্রথম অমৃত বা তিব্বতবাসী—

তং হ যৎ প্রথম মমৃতং তং
বসব উপজীবন্তি আগ্নিনা মুখেন। ছান্দোগ্য

অষ্ট বসু প্রথম অমৃতে মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্ব বাস করিতেন। তবে কেন ঋগ্‌বেদ বসুগণকে "অন্তরীক্ষসং" বলিয়াছিলেন? কেনই বা বিষ্ণুপুরাণ তিব্বতপ্রভবা ও তিব্বতপ্রবাহিতা সীতা নদীকে "অন্তরীক্ষগা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন? তিব্বত ত তুরুষ্কাদির অন্তর্গত নহে?

এ অতি সত্য কথা। প্রথমতঃ দ্যো (আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া) এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অন্তঃ মধ্যে দেখা যায় (দ্যাবা পৃথিব্যোঃ অন্ত র্মধ্যে ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে ইতি অন্তরীক্ষং)—এই বিগ্রহে তুরুষ্কাদির অন্তরীক্ষ সংজ্ঞা হয়। ঐ সময়ে তিব্বত ও তাতার এবং সাইবিরিয়া বা ত্রিদিব স্থলে পরিণত হইয়াছিল না। তৎপর যখন ত্রিদিবের (মহঃ—তপঃ—সত্য) উৎপত্তি হয় (১২—১৯০সূ—১০ম) ও সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যাইয়া উহার নাম "স্বঃ" ও আদি স্বঃ দ্যোর নাম "পিতা" বা পিতৃভূমি (Fatherland) রাখেন, তখন সকলে ভ্রান্তিবশতঃ —

দব ও দ্যো (দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ। অমর)

এক ভাবিয়া বসেন, তখন কৃত্রিম দ্যো (ত্রিদিব) এবং পৃথিবীর ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী আসল দ্যো ও তিব্বত তাতারকেই সকলে ভ্রমবশতঃ অন্তরীক্ষ ঠাহরিয়া বসেন। সেই ভ্রান্তির যুগে প্রণীত কতিপয় ঋঙ্‌মন্ত্রে এবং বিষ্ণুপুরাণে তিব্বত—অন্তরীক্ষ (বসুরন্তরিক্ষসৎ) এবং (সীতাগাৎ অন্তরীক্ষগা) নাম ধারণ করে। কিন্তু পরবর্ত্তী লোকেরা এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া

দ্যো (মঙ্গলিয়া)
হরিবর্ষ (তাতার)
কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত)

এই স্থানগুলিকে দিব্যং নভঃ, বা দিব্যং অন্তরীক্ষং নামে সংসূচিত করেন। কালে পরবর্ত্তী ঋষিরা উক্ত স্থানত্রয়কে—

"মধ্যস্থান"

বলিয়া বিশেষিত করিয়া দেন। তাই যাস্ক—ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যস্থানবাসী দেব বলিয়া সংসূচিত করেন।

অতঃপর আমরা আর্য্যযুগের বেদভাষ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও সায়ণাদির ভাষ্যদ্বারা সপ্রমাণ করিব যে "অন্তরীক্ষ" শূন্য গগন নহে, পরন্তু উহা ভুবর্লোক এবং উহা একটী জনপদ, যাহাতে গন্ধর্ব্বাদি সকলে বাস করিতেন।

তন্নোরিৎ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ।
গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪।২২সূ।১ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদং অন্তরিক্ষং। তথাচ তাপনীয়শাখায়াং সমাম্নায়তে—
যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণসেবিতং অন্তরীক্ষং ইতি।

বিপ্রগণ গন্ধর্বদিগের দেশে অঙ্গুলিদ্বারা ঘৃতের ন্যায় ঘনীভূত বরফ (ঘৃত—ঘৃতসমুদ্র—বরফময় সমুদ্র) লেহন করিয়া থাকেন। উক্ত গন্ধর্বগণের দেশের নামান্তর অন্তরীক্ষ, তথায় যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ বাস করিতেন। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ— যে অন্তরীক্ষে যে দিবি পৃথিব্যাং
যে চ মানবাঃ। ১৮৭পৃ ৩য় খণ্ড।

অন্তরীক্ষ, দিব (দ্যুলোক--সাইবিরিয়া) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষে যে সকল মনুষ্যগণ (মাতা মনুর সন্তান বরুণ প্রভৃতি) বাস করেন। গন্ধর্ব্বো অপ্সু। ৪।১০।১০ম

অপ্ অর্থাৎ জলপ্রধান অন্তরীক্ষে গন্ধর্বগণ বাস করেন। তথাহি—
সমুদ্রিয়া অপ্সরসঃ। ৩।৭৮।৯ম

অপ্সরোগণ সমুদ্রপ্রভব অর্থাৎ অন্তরীক্ষবাসী। তথাহি—
যৎ অন্তরীক্ষে। ২।৯সূ।৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... অন্তরীক্ষে গন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতে মধ্যমে লোকে।
যে অন্তরীক্ষাৎ। ৩২৫পৃ ১ম খণ্ড অথর্ববেদ:

তত্র সায়ণঃ ... ... অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ঈক্ষিতং অন্তরা ক্ষান্তং বা
যক্ষগন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতং অন্তরক্ষং।

অন্তরীক্ষে। ২।৯।৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... গন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতে মধ্যমে লোকে।
অন্তরীক্ষাৎ। ৩৮।৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... অন্তরীক্ষাৎ মধ্যমাৎ লোকাৎ।
অন্তরিক্ষে। ১৬৭পৃ অথর্ব ১ম খণ্ড

তত্র সায়ণঃ— ... .. দ্যাবাপৃথিব্যো মধ্যবর্ত্তিনি লোকে।
অন্তরিক্ষেণ। ৬২৪পৃ ঐ

তত্র সায়ণঃ... ... ...দ্যাবাপৃথিব্যো মধ্যবর্ত্তিলোকেন।

অতএব যাহা দ্যৌ (স্বর্গ) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) র মধ্যে বর্ত্তমান একটি সীমাবদ্ধ লোক যাহা দর্শনযোগ্য—যাহা যক্ষগন্ধর্বাদির বাসভূমি, তাহা কি প্রকারে শূন্য বা গগন হইতে পারে ?

আচ্ছা গন্ধর্বগণ ত পারলৌকিক স্বর্গবাসী ? কোনও পারলৌকিক স্বর্গের কথা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। যদি কেহ হিন্দুশাস্ত্র হইতে পারলৌকিক স্বর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা—

"তেষাং বহেয় মুদকং ঘটকর্পরেণ।"

তবে উহা ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য এবং দাশরথির পাঁচালাতেই আছে। যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব, দুর্যোধনকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন কি অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া মুক্ত করেন না ? এখনও আফ্রিদিদিগের দেশে

"গান্দাব"

নামে একটী নগর আছে। উহাই গন্ধর্বগণের নগরবিশেষ, আমরা কি পারলৌকিক গন্ধর্বদিগের নিকট গন্ধর্ব-বিবাহপ্রথা পাইয়াছিলাম ? এখনও কি ভারতবর্ষে সঙ্গীতব্যবসায়ী গন্ধর্বী (গান্ধাবী) ও কিন্নরগণকে (মধুকান প্রভৃতিকে) দেখা যায় না ? দেখ মহামান্য রামায়ণও বলিতেছেন যে—

ভরতশ্চ যুধাজচ্চ সমেতো লঘুবিক্রমৌ।
গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩
ততঃ সমভবৎ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণং।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়ো জয়ঃ ॥ ৫
হতেষু তেষু সর্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥ ১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্করাবতে।
গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥ ১১। ১০১ সর্গ। উত্তরকাণ্ড

ভরত গন্ধর্বগণকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তাঁহাদিগের দেশ গান্ধারে পুত্র পুষ্কর ও তক্ষের নামে পুষ্করাবতী ও তক্ষশিলা (ট্যাক্শিলা) নামে দুই নগর স্থাপন করেন।

এই পুষ্করাবতী এখন পেশোয়ার ও গান্ধার কান্দাহার। সুতরাং গান্ধার বা কান্দাহার যে আফগানিস্থানের অন্তর্গত, সেই আফগানিস্থান কি অন্তরীক্ষের এক দেশ নহে ? সর্ববেদে ইহাও আছে যে—এই অন্তরীক্ষ দিয়া দেবযান পথ প্রসারিত এবং মর্য্যাদ দেবগণ এই অন্তরীক্ষ পথে—ভারতবর্ষে আগমন করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্তরীক্ষ কি শূন্য বা গগন হইতে পারে ?

আচ্ছা আফগানিস্থান ভিন্ন তুরুস্ক ও পারস্যও কেন অন্তরীক্ষমধ্যগত হইবে ? যেহেতু ঋগ্‌বেদে আছে যে—

ত্রীণি অন্তরিক্ষা।

অন্তরীক্ষ তিনটী (ত্রিধব), সুতরাং একারণ আমরা তুরুস্ক ও পারস্যকেও অন্তরীক্ষ বলিতে বাধ্য। বরুণ এই পারস্যেরই রাজা ছিলেন। আচ্ছা কেন ইহাই হউক না যে তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানও অন্তরীক্ষ, আবার শূন্য বা গগনও অন্তরীক্ষ ? এক শব্দের কি নানা অর্থ থাকেনা ?

ইহাও অতি সত্য কথা। কিন্তু যখন প্রামাণ্য যজুর্বেদ বলিতেছেন যে—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং,
কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং। ৫৯ক—২৩অ

এই ভুবন বা ভূমণ্ডলস্থ সকলের নাভি বা আত্মোৎপত্তিস্থান (৪। ১০।১০ম ভাষ্য দেখ) কি তাহা কে জানে ? দ্যাবাপৃথিবী কাহাকে কহে—তাহা কে জানে ? অন্তরীক্ষ কাহাকে বলে—তাহা কে জানে ? অর্থাৎ কেহই জানে না।

তাহা হইলেই জানা গেল যে—এই মন্ত্রপ্রণয়নের সময় সকলে অন্তরীক্ষ কাহাকে বলে— জগতের আদি উৎপত্তিস্থান কি—দ্যাবাপৃথিবী বলিতে কি বুঝায়, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী কালের মন্ত্রসমূহেই অন্তরীক্ষ "বি" বা পক্ষিগণের বিহারক্ষেত্র শূন্য বা গগনে পরিণত হইয়াছে। (৭। ২৫ সূ। ১ম) ফলতঃ উহা অনন্ত প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আচ্ছা, দ্যাবাপৃথিবী কি ? দ্যো ও পৃথিবী—অর্থাৎ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং এই ভারতবর্ষ। আচ্ছা, অন্তরীক্ষকে "অধ্বর" বলে কেন ? দিব্য নভঃ বা দিব্য অন্তরীক্ষের নাম যজ্ঞ বা অধ্বর। উহা মানবের আদি জন্মভূমি, তজ্জন্য উহাকে অন্তরীক্ষপর্য্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।৩৫।১৬৪।১ম। ৬২।২৩ অঃ যজুর্ব্বেদ।

এই যে "যজ্ঞ" বা "অধ্বর" সকল ভুবনের নাভি বা আদ্যুৎপত্তি স্থান। আচ্ছা, "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ যে স্বর্গ, তাহা ত পৃথিবীর কেহই বলেন না ও জানেন না ? যাঁহারা বেদ পড়েন নাই বা পড়িয়া বুঝেন নাই, তাঁহারা জানিবেন কি প্রকারে ? যজ্ঞো বৈ স্বঃ। ১১ক। ১অঃ ভাষ্য। যজুঃ।

স্বঃ বা স্বর্গের নামান্তর যজ্ঞ। তথাহি—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণং—

এতৎ খলু বৈ দেবানামপরাজিত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ। ৯৪৫পৃঃ।

যজ্ঞ বা স্বর্গ জনপদ দেবতাদিগের একটি অপরাজেয় আয়তন অর্থাৎ জনপদ।

যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। ইতি শ্রুতেঃ।

এই যজ্ঞ বা আদি স্বর্গ দ্যোঃইতেই সকল প্রজা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (১। ১৩০ সূ। ১০ম দেখ)

অতএব সকলে ভাবিয়া দেখুন অন্তরীক্ষ শূন্য, না তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থান। নভঃ ও অন্তরীক্ষ ?

আচ্ছা অন্তরীক্ষের ইকার দীর্ঘ করা হইল কেন ? ঋষিরা ত "অন্তরিক্ষ" বানান ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ? কিন্তু ইহা আর্ষ প্রয়োগ। ঋষিরা ত বশিষ্ঠ।

শব্দও "বশিষ্ঠ" বলিয়াও লিখিতেন। ফলতঃ উহা ঋষিগণের লিপিগত ভ্রম। আচ্ছা অন্তঃ ও ঋক্ষ শব্দের কেন সমবায়ে অন্তরিক্ষ শব্দ ব্যুৎপাদিত হউক না ?

তাহাতে অর্থ কি হইবে ? অন্তঃ=মধ্য এবং ঋক্ষ=নক্ষত্র। ইহাতে ত কোন অর্থ হাজির করে না ? উহার যোগে ত—অন্তর্ঋক্ষ ভিন্ন অন্তরিক্ষ বা অন্তরীক্ষ হইতে পারে না ?

আচ্ছা "নভঃ" যে শূন্য নহে, তাহার প্রমাণ কি ? লাটিনগণও ত ইহা (Nobis) শূন্য গগনার্থে প্রয়োগ করিতেন ? ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। সুতরাং তাঁহারা ভ্রান্তির যুগে এদেশ পরিত্যাগ করাতে ইউরোপে নভঃ—শূন্য ও আকাশ—sky হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে "নভঃ" যে কোনও সীমাবদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা সপ্রমাণ হয়। যথা—

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তার পরিমণ্ডলাৎ।

নভ স্তাবৎ প্রমাণং বৈ, ব্যাস মণ্ডল তো দ্বিজ ॥ ৪। ৭অ। ২অংশ

হে দ্বিজ ! পৃথিবী বা ভারতবর্ষের ভূমিপরিমাণ যত, নভেরও ভূমিপরিমাণ তত। ইহার পরও কি কেহ বলিবেন যে নভঃ, ভুবর্লোক ও অন্তরীক্ষ, মূলতঃ শূন্য গগন ছিল ?

আমরা এই জন্যই একখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অভিধান রচনা করিতেছি, যাহাতে বৈদিক ও লৌকিক সকল অর্থই থাকিবে। আমরা বারান্তরে "মাতা মনু" এই প্রবন্ধে দেখাইব যে—জগতে মনু নামে একজন নারীও বিদ্যমানছিলেন। যিনি যজুর্ব্বেদীয় লোকদিগের বিশেষতঃ জর্ম্মাণদিগের পূর্ব্বপিতামহী।*

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

দুজনের একজন।

—:*:—

(E. W. Wilcon)

আসিবে সেদিন, যবে এ-দুয়ের কোনো একজন
বৃথাই পাতিয়া রবে সজাগ শ্রবণ
শুনিতে সে বাণী যাহা কারো কণ্ঠে ফুটিবে না আর।
প্রভাত মিলায়ে যাবে বার বার এসে,
মধ্যাহ্ন মলিন হবে জ্বলে জ্বলে শেষে,
ধরণীরে ঘিরে ঘিরে আসিবে আঁধার—
করুণ দু'খানি আঁখি প্রতীক্ষায় চেয়ে রবে তবু,
সেই পদধ্বনি-আশে যাহা আর ফিরিবে না কভু।

(২)

এ-দুয়ের একজন,—অনতিবিলম্বে যাবে দেখা,—
ভেসেছে জীবন-স্রোতে নিতান্তই একা,
সঙ্গীহারা, স্মৃতিবিদ্ধ প্রাণ
যে-প্রাণে বাজে রে শুধু বেদনারি গান !
এ-মধুর দিনগুলি তখন হয়তো কোনো নবযুগে, মরি,
দাঁড়াইবে নবরূপ ধরি'
জ্যোতিঃস্নাত প্রাতে
বাসন্তী-উষার যেন স্বপ্ন, আহা বরষার রাতে।

* শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুকাল হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য ; কিন্তু তাঁহার উক্তি ও যুক্তিতে এমন অনেক কথা দৃষ্ট হইবে যাহা প্রচলিত মতবাদ হইতে বিভিন্ন। তিনি যখন কোচবিহারে সাধারণ সভায় বৈদিক প্রমাণাদি সাহায্যে কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেন, তৎকালে স্থানীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে একটু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সেটাকে প্রাণেরই পরিচয় বলিয়া মনে করি। যদি কাহারও পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে, তাহা সংযত ভাষায়, যুক্তিযুক্ত ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা পত্রস্থ করিতে প্রস্তুত আছি। সঃ

(৩)

দু'জনের একজন লইয়া বেদনা-দীর্ণ হিয়া;
ভিজাইবে লবণাশ্রু দিয়া
যতনে জমায়ে রাখা পত্রগুলি বহুদিনকার;
ক্লিষ্ট ওষ্ঠপুটে বারংবার
চুমিবে প্রত্যেক প্রিয়-স্মৃতিটীরে তুলি',
লভিতে তাহারি মাঝে, প্রীতি-সিক্ত এই সব, মধুবর্ষ্যগুলি।

(৪)

দু'জনের একজন, অতঃপর করুণ-নয়নে
দেখিবে গো একা জাগি' বিরহ শয়নে,
এ-সৌন্দর্য্য, এ-আলোক, হাসিভরা এই বসুন্ধরা
যেন বা গল্পের ছবি,—যে-গল্প হইয়া গেছে শেষ;
ভাবিবে রে—এ-জীবন শুধুই নীরস কার্য্য করা;
সে হতভাগ্যেরে তরে, আশীর্ব্বাদ কর আজ, ওগো পরমেশ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

মিষ্টি সরবৎ।

—:*:—

(১৮)

বৈকালে রোগীদের ডাকাডাকির তাড়ায় সত্বর আহমদ্-সাহেব দাওয়াইখানায় চলিয়া যান। সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত খাটিয়া একদফা অভ্যাগতগণকে বিদায় করিয়া, দাওয়াইখানা হইতে উঠিয়া তিনি উপরে চা খাইতে গেলেন, ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর আলোটা খুব উজ্জ্বলভাবেই জ্বলিতেছে বটে,—কিন্তু চারি দিক দৃষ্টি সঞ্চালনে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন—সবই অন্ধকার! আমিনা নাই!

নিরুৎসাহভাবে বাহিরে আসিয়া, বারেণ্ডার এদিকে ওদিকে বার কতক পায়চারী করিয়া—অবশেষে,—নিস্তেজ-করুণ কণ্ঠে হাঁকিলেন "রস্তম, মেরে চা লাও—"

রস্তম উত্তর দিল "জী হাঁ, মেবি যাতে হেঁ—"

আহমদ্-সাহেব এবার নিঃসন্দেহেই বুঝিলেন, আমিনার দর্শন আশা বৃথা! সে আজ এখন কিছুতেই আসিতেছে না! অগত্যা হতাশ-ভগ্ন চিত্তে, বারেণ্ডাতেই সেই ইজি-চেয়ারটার উপর আড় হইয়া পড়িয়া, ম্লান দৃষ্টিতে সামনের

দেয়ালের আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই ঘটনার পর আমিনাকে আর দেখিতে পান নাই, কাজেই মনটা কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যময় বোধ হইতেছিল।

মিনিট কয় পরে রস্তম চা লইয়া সাম্‌নে আবির্ভূত হইল, প্রভুর হাতে চা পাত্র দিয়া চোর-চোখো-দৃষ্টিতে সভয়ে একবার শয়নকক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি বলিল "হুজরৎ বিবি-সা'ব ইয়ে কোঠরি কো অন্দর মে হ্যায় হুজুর ?"

আহ্মদ্-সাহেব বলিলেন "না এখানে তো নাই, কেন, কি খবর ?—"

রস্তম যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল !—মাথা নীচু করিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিল। তারপর—চোখে একটু জল আনিবার চেষ্টায়, প্রাণপণে চোখ রগড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল "তুফানী দিদি আমায় তারপর ঝাঁটা মার্‌তে এসেছিল, হুজুর —"

আহমদ্-সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন "মার্‌তে এসেছিল ? মারেনি তো ?—"

যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণভাবে রস্তম করুণকণ্ঠে বলিল "না ঝাঁটা মারে নি।—তবে গালে একটা চড় মেরেছে—"
সান্ত্বনা দিয়া প্রভু বলিলেন "আঃ তাতে কি হয়েছে ? দিদি বলে তো ডাক তাকে,—তা ছোট ভাইটী তুমি, আদর করে না-হয় একটা চড়ই মেরেছে, ওকি আর ধর্‌তে হয় ! তা শোন,—তুমি তো তাকে উল্টে চ'ড়াও নি ?—"

ফোঁশ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সকাতরে রস্তম বলিল "না হুজুর, আওরাৎ যে—"

সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন "হাঁ ঠিক্। মনে রেখো যতই কাজিয়া হোক্,—যতই রাগ হোক্, খবরদার—জংলী জানোয়ারের মত কক্ষণো আওরাৎ-লোকের গায়ে হাত তুলোনা, আর চাষা-চোয়াড়ের মত মুখ ছুটিয়ে গালাগালি কোর না, খুসি হয় আদর করে "মুখপুড়ি, পোড়ার মুখটা" বল্‌তে পার, ব্যস্—তার ওপর আর উঠো না,—বুঝ্‌লে, মনে থাক্‌বে তো ?"

ঘাড় নাড়িয়া রস্তম স্বীকার করিল, থাকিবে—।

পকেটে হাত দিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তোমার তুফানী দিদি, ক'টি চড় মেরেছে ? মোটে একটি ?

আন্তরিক দুঃখের সহিত রস্তম বলিল "হাঁ হুজুর, মোটে একটি—" সঙ্গে সঙ্গে পুনশ্চ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চোখ রগড়াইল !

প্রভু তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন "যাক্ তাতে আর আপ্‌শোষ করে কি হবে ? তবে দু'গালে দুটি চড় হলেই বেশ ভাল হোত, না রস্তম ? আচ্ছা নাও এই দুটি টাকা, একটা গোয়েন্দাগিরির বখশীস্! একটা চড় খাওয়া'র বখশীস্ খুশী তো ?

সলজ্জ-সন্তোষে কুর্ণিশ করিয়া রস্তম বলিল "যো হুকুম খোদাবন্দ্—"

আহমদ্ সাহেব চা-এর পেয়ালা তুলিয়া চুমুক দিয়া একটু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন "বিবি-সাহেব কোথায় রে ?—"

রস্তম চুপি চুপি বলিল "কি জানি হুজুর কোথায়। তিনি আজ বড়া খাপ্পা হয়েছেন, আমার ওপরও বহুৎ গোসা করেছেন, আমি কসুর কবুল করে পায়ে পড়ে মাপ চেয়েছিলুম,—তিনি আমার কথা টের পেতেন না হুজুর, ঐ তুফানী দিদি মুখপুড়িটাই আমার নাম বলে দিলে—না হ'লে—"

বাধা দিয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "খুশী হয় তো আদর করে একবার মুখপুড়ি বল্‌তে বলে দিয়েছি বলে—সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখপুড়িটা হয়ে গেল ? না রস্তম, তুমি বড়ই বেয়াদব হয়ে উঠেছ। নাঃ তুমি ওসব কিছুই বল্‌তে পাবে না, সেরেফ্‌ দিদি—"

থতমত খাইয়া রস্তম বলিল "জী হাঁ হুজুর, দিদি—"

আহমদ্‌ সাহেব বলিলেন "তারপর ? মাফ্‌ চাওয়াতে বিবি-সাহেব কি বল্লেন ?—"

মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে রস্তম বলিল "যাও, তোমার মাফ্‌ চাইতে হবে না, মনীব আদর দিয়ে দিয়ে তোমার কাঁচা মাথাটি কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন,—তোমার মধ্যে আর কোন পদার্থ নাই, কাল থেকে তুমি অন্দরে ঢুকো না "

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া আহমদ-সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন "বেশ, অন্দর ওঁদের, অন্দরে ওঁরা যদি ঢুক্‌তে বারণ করেন, ঢুকোনা, কাল থেকে সদরে মনসুরের জায়গায় তুমি বহাল হোয়ো, মনসুর অন্দরে তোমার কাজ করবে—"

রস্তমের মুখ ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু তবু সে মোরিয়া হইয়া, শেষ চেষ্টা দেখিবার আশায় বলিল "কিন্তু আবার যদি কোন দিন খুশী হয়ে বলেন 'রস্তম তুই অন্দরেই বদলী হয়ে আয়' তা হলে কি আস্‌ব জনাব ?"

আহমদ-সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ আলবৎ"

আশ্বাস পাইয়া রস্তম, পরম আশান্বিত হইয়া উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল "বিবি-সাহেব আমার উপর রাগ করেন বটে কিন্তু বেশী দিন 'নারাজ' হয়ে থাকেন না, একটু রাগ পড়্‌লেই আবার খুশী হয়ে বহুৎ মিঠা বাৎ বলেন 'আপ্‌নে বাচ্চা-মাফিক' আমায় পিয়ার করেন হুজুর।"—বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিল, কি একটা কথা মনে পড়ায় ব্যস্ত-ভাবে বলিল "আজ শুধু আমার ওপরই গোসা করেন নি, বহু-বিবিজীর ওপরও বহুৎ নারাজ হয়েছেন, ওঁকে বলেছেন 'তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না, আমার কাছে এসো না—' শুনে তো উনি কান্নাই জুড়ে দিয়ে-ছিলেন হুজুর!—সে কি কান্না !"

মুহূর্ত্তে সহাস্তবদন আহমদ-সাহেবের শান্তসংযত অন্তরটা অত্যন্তই বিচলিত হইয়া উঠিল ! কারণ এমন নিদারুণ দুঃসংবাদটা আবদুকে শুনাইয়া প্রাণ খুলিয়া খানিকটা হা-হুতাশ করিয়া লইতে হইবে কিনা !—ত্রস্ত হইয়া বলিলেন "ছোট মিঞা কোথায় ? জল্‌দি ডাক জল্‌দি ডাক—"

রস্তম বলিল "তিনি বাড়ীতে নাই হুজুর, সেই বিকালবেলা রান্না-বাড়ী থেকে এসে পোষাক পরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নাই।"

হতাশ হইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন "ফেরেন নাই ! আচ্ছা রস্তম এক কাজ কর্‌তে পারিস্‌, তোর বিবি-সাহেবাকে একবার খুঁজে আন্‌তে পারিস্‌ ?—"

ঠিক্‌ সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দিকে সিঁড়ির দুয়ার হইতে, ওয়াহেদ্‌ ভৃত্য সবিনয়ে নিবেদন করিল "বেমারী লোগ্‌ মুলাকাৎ মাংতে জনাব—"

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "থাক্‌ রস্তম, থাক্‌ এখন, আর নয়। কিন্তু আজ আমি চট্‌-পট্‌ কাজ সেরে ওপরে আস্‌ব, ঠিক্‌ সাড়ে আটটা বাজ্‌লেই আমার খানা দিতে বোলো—"

সেই চপল-পরিহাস-প্রিয় সদানন্দ মানুষটি মুহূর্ত্তে আবার স্থির-সংযত হইয়া, নিজের দুরূহ কর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সে মুহূর্ত্তের গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া কে বলিবে যান মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অমনভাবে হাসিতেছিলেন।

(১৯)

রোগীদের কাজ শীঘ্র সারিয়া, রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিতেই আহমদ্-সাহেব উপরে আসিলেন। আহারটা তৎপূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

উপরের বারেণ্ডায় পা দিয়াই, আহমদ্-সাহেব শুনিলেন তাঁহার পোষাক কামরায় একাধিক কণ্ঠের কলরব গুঞ্জন চলিতেছে, তাহার মধ্যে আবলুর ও জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা--অর্থাৎ রহমান-সাহেবের স্ত্রীর, সুকোমল হাস্যধ্বনিও শুনিতে পাইলেন। একটু বিস্মিত হইয়া তিনি ডাকিলেন—"আবলু"—

আবলু সেইখান হইতেই সাড়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আলো হাতে লইয়া অগ্রসর হইয়া জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা বলিলেন "কে আহমু নাকি ?"

সসম্ভ্রমে আহমদ্ সাহেব বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ। আপনি যে এমন সময়, এখানে ?"

স্মিত কোমল-হাস্যে তিনি বলিলেন "এস গো ভাই, তোমায় বকুনী দেবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি।—আহমু তুমি মিথ্যেই মড়া কেটে ডাক্তারী শিখেছ, আর মিথ্যেই চিকিৎসের জোরে মরন্ত মানুষকে জীবন্ত করে বেড়াচ্ছ, দ্যাখো দেখি তোমার ঘরেই কত বড় একটা মস্ত জন্তু অনায়াসে ভূত পোষা রয়েছে, তুমি কি রকম ডাক্তার ?

আহমদ্ সাহেব বুঝিলেন,—আমিনার সম্বন্ধেই কথা হইতেছে, একটু হাসিয়া তিনি নিরুত্তর রহিলেন।— আবলু আমিনার চেয়ে যদিও বয়সে বড় বোন, তিনি যে আহমদ্ সাহেবের সমবয়স্ক, সুতরাং তাঁহার সামনে অকাতরে রহস্য-বিদ্রূপ স্রোত বহাইতে আহমদ্-সাহেবের বিন্দুমাত্র দুঃখ-দরদ নাই! কিন্তু এই মাননীয়া বয়োজ্যেষ্ঠা শ্যালিকা—ইঁহাকে তিনি—একটি ছোট-খাট গুরুজনের সামিল বলিয়াই মনে করিতেন, সেই জন্য চক্ষু লজ্জার অনুরোধে দুরন্ত-চপল রসনাটি কষ্টেসৃষ্টে চাপিয়া রাখিলেন।

ঘর হইতে আবলু-সাহেব বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কি রে, তুই যে আজ এত সকাল সকাল ওপরে এলি ?

আহমদ্ সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন যে সেখানে রোগীর বাড়ীতে কাল রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই, তাই সকাল সকাল উপরে আসিলেন। কথা কহিতে কহিতে নিকটস্থ চেয়ারটা শ্যালিকার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সসৌজন্যে বিনীতভাবে বলিলেন "আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ?"

সস্নেহ হাস্যে তিনি বলিলেন "দীর্ঘজীবি হও, কিন্তু দাদা এখন তো আমার সময় নাই, বসতে পারবো না, মাফ্ কোরো। ছেলে ওঠ্‌বার সময় হয়েছে,—" পোষাক কামরার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন "এই বাঁদরটা আজ আমাদের যে নাকাল করেছে, বলবার নয়, দেড় ঘণ্টা ধরে বাড়ীর চারিদিকে খুঁজে—তারপর ছাদ খুঁজে না পেয়ে শেষে ওকে খুঁজতে বাগানে পর্য্যন্ত গেছ্‌লুম—। তারপর কোথাও না পেয়ে, শেষে ঘুরে ফিরে এসে দেখি তোমার এই পোষাক কামরায় আল্‌নার আড়ালে জানালার নীচে পড়ে একটা কাল রংয়ের শাল মুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে,—! তা কেমন ঘুম জান তো, সেই সন্ধ্যা থেকে এই রাত ন'টা পর্য্যন্ত ঘুম! আজ ইস্কেবের সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে কিনা সন্ধ্যায় দুজনের ঝগড়া হয়েছিল—"

আহমদ্-সাহেবের আত্ম-সম্বরণ শক্তি লোপ হইল! হো হো করিয়া মুক্ত স্ফূর্ত্তি উচ্ছ্বাসেই—সজোরে হাসিয়া উঠিতেই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অশোভন-চপলতা ধরা পড়িবার ভয়ে, হাঁচিয়া কাসিয়া সেটা কোনমতে সামলাইয়া লইলেন। তা হইলেও 'বলা মুখ, চলা পা,' ত থামিবার নয়,—ঘাড় হেঁট করিয়া মিটি মিটি চক্ষে পোষাক কামরার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তাহলে ঝগড়ার শোকেই অমন সুগভীর নিদ্রাটা এসেছিল বোধ হয়! আর অন্য পক্ষের অবস্থাটা কি রকম আবলু? ষ্টিমুলেণ্ট মিক্‌চার চাই নাকি?

আবলু কোন উত্তর দিলেন না, শুধু তাঁহার ঘাড়ে একটি চপেটাঘাত বসাইয়া একটু হাসিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা, পরিহাস-স্নিগ্ধ, সুকোমল হাস্যে বলিলেন "হাঁ, সে তোমার ষ্টিমুলেণ্ট মিক্‌শ্চার চাইবার মতই অবস্থা হয়েছিল কতকটা! সন্ধ্যার থেকেই দেখ্‌ছি ইনেব শুক্‌নো মুখে একলাটি হেথা-হোথা ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি মানেটা প্রথমে বুঝ্‌তে পারি নি। তারপর শুন্‌লুম আমিনা রাগ করে একলাই ও-মহলে চলে গেছে, তাই নাকি ইনেবের বড়ই দুঃখ হয়েছে! যাক্ তারপর আমিনার দেখাই পাই না, দেখাই পাই না, ভাবলুম, তুমি এসেছ সে বুঝি তোমার জিনিষপত্র গোছান নিয়েই ব্যস্ত আছে, ক্রমে শুনলুম তুমিও ঘরে নাই, আমিনাও ঘরে নাই,—তারপর নিজেও খুঁজ্‌তে এলুম।

আবলু-সাহেব হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন "আঃ আহ্‌মুর ঘুম পেয়েছে দিদি, ওকে ছেড়ে দাও—ওসব ভূতগত ব্যাপার শুন্‌বে না, তুমি থাম।—"

অদম্য-কৌতূহলে, আহমদ্-সাহেবের চক্ষু তখন স্থির-বিস্ফারিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, আবলুর কাছে এই অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া,—তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "তুই থাম, হাঁ তারপর কি হল বলুন তো—"

তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবলু সাহেব ব্যতি-ব্যস্ত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ বলবেন পরে! ও দিদি বোধ হয় তোমার খোকা উঠে কাঁদ্‌ছে, ও মহলে যাও—"

আহমদ্ সাহেব বলিলেন "দেখ্‌ছেন, আপনাকে বিদায় করবার জন্য ভায়ার ব্যস্ততা দেখ্‌ছেন? এর নিগূঢ় অর্থটা—মনে মনে বুঝতে পারছেন, নিশ্চয়, সে আর প্রকাশ করে বলাটা।—"

আবলু সাহেব এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া লজ্জারক্ত মুখে ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন "দ্যাখ্ আহ্‌মু—"

আহমদ্ সাহেবও তৎক্ষণাৎ সুদক্ষতার সহিত সমানভাবে সমান্তরাল রেখায় ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন "দ্যাখ আবলু।—"

আবলুর দিদি হাসিয়া বলিলেন "তোমাদের কলহ পাণ্ডিত্যের জয় জয়কার হোক্, আমি এবার বিদায় নিই, সত্যিই হয় তো ছেলে উঠেছে—"

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "না না, উঠ্‌লে নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া যেত, দাঁড়ান, দয়া করে আপনার ভূতের গল্পটা শেষ করে দিয়ে যান।—"

"না দিদি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কিছু বোল না—" সঙ্গে সঙ্গে আহমদ্-সাহেবের ঘাড় ধরিয়া তাঁহার ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "ঘুমগে যা—"

আহমদ্-সাহেব এক পা পিছাইয়া, দুই পা আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন "পীঁপড়ের পাখা যে মরবার জন্যই ওঠে, সেটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সত্য! দ্যাখ্ আবলু, ভাল মুখে বলছি মেলা চালাকি করিস্ নি,—এখনি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌ব! বল্‌ব সেদিন রাত্রের ছাদের উপরকার সেই কথা?—

আব্‌লু সবিস্ময়ে বলিলেন "কি কথা রে?"

চোখ রাঙাইয়া ধমক্ দিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "কি কথা রে? আবার ন্যাকামো হচ্ছে!—দেখ্‌বি? বল্‌ব তবে? বলি? বলি?—" আবলুর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্যালিকার দিকে চাহিয়া হঠাৎ খপ্ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা আপনার জরদার কৌটা-টায় কতগুলি জরদা আছে?" আমায় দুটি দিতে পারেন?

আব্‌লু-সাহেবের চোখের ধোঁয়া কাটিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার হইল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ নীচু করিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একান্ত মনোযোগে গোঁফে তা দিতে সুরু করিলেন!

আহমদ্-সাহেবের এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিস্মিতা হইয়া তিনি বলিলেন "কেন বল দেখি? জরদা কি করবে?"

অম্লান বদনে আহমদ্-সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন "এই আমার গুটি দুই তিন রোগী দাঁতের গোড়া ফুলে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাদের একটু একটু জরদা খেতে ধরাব মনে কর্‌ছি,—জরদায় উপকার হবে না? কি বলেন আপনি?"

রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট দুস্থদের দুর্দ্দশায় সহানুভূতি করুণচিত্তে তিনি তখনই সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ নিশ্চয় উপকার হবে! আমি তো তাই সেরেফ্ দাঁতের ব্যথার জন্যেই জরদা ধরেছি!"

আহমদ্-সাহেব অনুমোদনের সুরে বলিলেন "তাই তো বল্‌ছি, আচ্ছা, জরদা খেয়ে আপনার পায়ের তলা যখন ঠাণ্ডা হয়ে যেত, তখন কি ঘসে রগ্‌ড়ে গরম কর্‌তে হোত?"

প্রশ্নটা এমনই আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত সরল ভাবে উচ্চারিত হইল যে, তাহার মধ্যে যে কিছু মাত্রও অভিসন্ধি আছে, ধরে কার সাধ্য? সরলা ভদ্রমহিলাটি একটু থতমত খাইয়া গেলেন, কি যে উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ইতিমধ্যে প্রত্যুৎপন্ন মতি প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় হঠাৎ ব্যগ্রভাবে পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন "থাক্ সে কথা, এখন আমার পোষাক কামরার খবরটা বলুন, কোন ভূত এসে পোষাক-আষাক পরছিল নাকি?—"

আবলু সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জনান্তিকে অস্ফুট স্বরে শুধু বলিলেন "জাঁহাবাজ ছেলে!"

আহমদ্-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, শ্যালিকা একটু হাসিয়া বলিলেন "না ততদূর জমকালো ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তবে ইনেবের সঙ্গে ঝগড়া করে আমার বোনের মনে না কি বড্ডই দুঃখ হয়েছিল, তাই কাপড় কেচে এসে এ ঘরে জানালার নীচে একলাটি চুপ করে বসেছিল—তারপর খানিকক্ষণ অন্ধকার ঘরে একলা থাক্‌তে থাক্‌তে,—ভয়! শেষে ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য শালমুড়ি দিয়ে ধরাশয্যা নিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বোজা,—তাতেই আপদ শান্তি! এতক্ষণে নড়া ধরে টেনে উঠিয়ে খেতে বসালুম আবলু তো হেসেই অস্থির হচ্ছিল!—"

পশ্চিম মহলে পুত্রের কান্নার শব্দ পাইয়া তিনি বলিলেন "তোমরা বসো, আমি এবার চল্লুম—"

তিনি চলিয়া গেলেন। পশ্চিম মহলের দ্বার রুদ্ধ হইল। আবলু-সাহেব এ মহলে দ্বার রোধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চকিত কটাক্ষে একবার পোষাক কামরার দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিলেন "তুমি মর্‌বে আজ, দিদির কাছে জরদার কথা তুলেছ, আমিনা সব শুনতে পেয়েছে।"

যেন কতই বিস্মিত হইয়াছেন, এমনই ভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "তাতে হয়েছে কি? আমি তো কোন অসদুদ্দেশ্যে ও কথা তুলি নি। তুমি যে সে দিন রাত্রে বিবিসাহেবার চরণ সেবা করেছিলে, আমি সেই শুভ সংবাদটা শুধু ওঁকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম মাত্র—"

আব্লু সাহেব হাসিয়া অধিকতর চুপি চুপি বলিলেন "যতই সাফাই গাও, তোমার সেই আধ পয়সার দাম সহজে শোধ হচ্ছে না, মনে রেখো—"

পোষাক কামরার দিকে যাইতে যাইতে গলা পরিস্কার করিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "আমি একবার ওঘরে যাচ্ছি জামাটা রাখ্ব।—" ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন জানালার পাশে একটি ছোট মাদুর পাতিয়া, আমিনা ও ইনেব মুখোমুখি শুইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, তাঁহাকে দেখিয়া দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল, আমিনা দিল—একটু বেশী করিয়া!—

আহমদ্-সাহেব সেটুকু দেখিয়াও দেখিলেন না,—যেন কিছুই হয় নাই এবং কস্মিন কালে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও যেন একান্ত অসম্ভব,—এমনি ভাবে নিতান্ত সহজ সুরে তিনি বলিলেন "আমার পোষাকের ব্যাগটা খুলে ময়লা কাপড়গুলো বের করে নিয়েছ কি?—"

আমিনা রাম-রহিম কোন উত্তর না দিয়া শুধু ঘোমটাটা একটু বেশী করিয়া টানিল। উত্তর না পাইলেও—আহমদ্-সাহেব আপন মনেই পরক্ষণে বলিলেন "তা তুমি কখনই বা বের করবে? এই তো মোটে বিকেল বেলায় এসেছি। তা যাক গে, এখন আমার সব পোষাকগুলো ময়লা হয়ে গেছে, বুঝ্লে, কাল সকালেই আমায় এক সুট্ পোষাক বের করে দিতে হবে,— কাল সকালেই সেটা বের করে দিতে পারবে, না আজ রাত্রেই বের করে রাখ্বে?—"

আমিনা এবারও নিরুত্তর! কিন্তু আহমদ্-সাহেব নিরুদ্যম হইবার পাত্র নন,—যেন উত্তর পাইয়াছেন, এমনি ভাবে পুনশ্চ বলিলেন "আজই পোষাক বের করে রাখ্বে? তাই রাখ, কাল সে তোমায় তাড়াতাড়ি করে কষ্ট পেতে হবে, দ্যাখো, সেই গরদের সুট-টা বের করে দাও—উঠো দেখি—"

আমিনা উঠিল না, নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল, আহমদ্-সাহেব অত্যন্ত মৃদুভাবে বলিলেন "তা হলে কি কাল সকালেই দেবে? আচ্ছা তাই হবে। তা এদিকেও তো রাত দশটা বাজে, তোমরা কেন আর মশার কামড়ে পড়ে আছ, যাও ঘরে শোও গে,—উঠুন তো বিবিসাহেব,—যান, আপনার ঘরে—"

ইনেব জড়সড়ভাবে উঠিতে যাইতেছিল, এবার আমিনা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া বলিল—"খবর্দ্দার ইনেব, তুমি যেতে পাবে না! কেন,—তুমি তো আমার লাখরাজ সম্পত্তি, পীরোত্তর সম্পত্তি আরো কত কি সব হয়েছ,—তবে আবার কি! তুমি কোথাও যেতে পাবে না, আজ থাক আমার কাছে!—"

কথাগুলা সমস্তই বেশ পরিস্কার রূপে আহমদ-সাহেবের কাণে ঢুকিল, কিন্তু তিনি যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে বলিলেন "এ্যা, কি বল্ছ? এখন তোমরা এইখানে থাক্বে? আচ্ছা তা না হয়—"

আহমদ-সাহেবের কথায় বাধা পড়িল, বাহির হইতে আবলু-সাহেব ডাকিলেন "আহমু, ওরে,—হার্ম্মোনিয়াম-টা কি—"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রুখিয়া উঠিয়া আহম্মদ-সাহেব বলিলেন, "আঃ খালি পিছু ডাকা! সকল কাজেই পিছু ডাকা! এই আবলু ষ্টুপীড্‌টা যা হয়েছে,—ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডি,—যত কুস্বপনের গোড়া! ওর জ্বালায় কোন কাজে ভাল হবার যো নাই—"

বাহির হইতেই আবলু সাহেব হাসিয়া বলিলেন "কি এমন মহৎ Expeditionএ তুমি সেজে গুজে চলেছ, যে পিছু ডাকায় বাধা পড়্‌ল?—"

অবজ্ঞার স্বরে আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "হুঁ! তুমি তার মর্ম্ম কি বুঝবে বল? তোমার কি সে বিষয়ে হুঁস্ পবন্ জ্ঞান আছে, আহাম্মক্ ছোগুরা কোথাকার!"

আবলু সাহেব বলিলেন "তা সে আহাম্মকই হই, আর যাই হই, তুমি যখন ঘরে গেছ, তখন দয়া করে' হার্ম্মোনিয়মটা নিয়ে এস, বেহাগ আলাপ করা যাক্—"

মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "তুমি এখন বেহাগ আলাপ করবে বৈ কি? তোমার এখন কি সময়ই পড়েছে বল! আমার মত তো—হুঁ! বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া পকেট হইতে চাবির রিং বাহির করিয়া তিনি নিজেই পোষাকের ব্যাগ খুলিতে বসিলেন, হার্ম্মোনিয়মের খোঁজ লইলেন না। আসল কথা এখন তিনি এঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে রাজি নহেন। যা হৌক একটা ছুতা করিয়া তাই বসিয়া পড়িলেন।

দুয়ারের সাম্‌নে আসিয়া আবলু সাহেব বলিলেন "কি এমন দারুণ দুঃখে তুমি দাঁত কপাটি খেয়ে ভির্মী গেছ শুনি? জাহান্নামে যাও আমি নিজেই বাজনাটা নিয়ে চল্লুম—"

পোষাকের ব্যাগ খুলিয়া ময়লা কাপড়গুলা বাহির করিয়া ঝুপঝাপ শব্দে ফেলিতে ফেলিতে আহমদ্ সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন "তা বাজনার সঙ্গে বেহাগ আলাপ করতে করতে তুমি সশরীরে বেহেস্তে যাও, আমার কিছু আপত্তি নাই, কিন্তু বারেণ্ডায় বসে বাজালে ও-মহলের সমস্ত লোকগুলির ঘুমের দফা নিকেশ হবে, তার চেয়ে সখ মেটাতে হয় তো এইখানে বসে সঙ্গীত চর্চ্চা কর।—"

বাজনাটা তুলিয়া আবলু সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "এইখানে বসব—"

"ক্ষতি কি তাতে—" বলিতে বলিতে আহমদ্ সাহেব হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া আমিনার দিকে চাহিয়া—দেখিলেন যে ঘোমটার ভিতর হইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে!—আর যায় কোথা! মহা-উৎসাহে গোঁফ চুমরাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ জেদের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হাঁ, এইখানেই তোকে বসতে হবে, খবর্দ্দার আবলু, তুই কোথাও যেতে পাবি না, বস্ এইখানে—বাজা এইখানে—আমিও গাইব।—"

শেষের কথাটার মধ্যে একটা ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, এবং গৃহের একটি প্রাণী সেটা খুব তীব্র ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিল! পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, আমিনা ইনেবের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, ফিস ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ দিতেছে।

এদিকে পোষাকের ব্যাগ খালি করিতে করিতে, আহমদ্ সাহেব পুনরায় হঠাৎ উল্লাস ভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ইয়া আল্লা! ভুলেই গেছি! ওরে আবলু ব্যাগটার মধ্যে যে কার্ব্বনেট্ অফ্ এ্যামোনিয়া থেকে ক্লোরেফরম্, ব্রাণ্ডি পর্য্যন্ত অনেক জিনিষ রয়ে গেছে! আর ভাই, আজ একটু ব্রাণ্ডি খাওয়া যাক্! আমার মাথা খাস্ আবলু, আজ তোকে খেতেই হবে—" সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া তিনি আমিনার মুখভার

পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়াস পাইলেন, দেখিলেন আমিনা আতঙ্ক-ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার তাঁহার পানে একবার আবলুর পানে চাহিতেছে,—তাঁহার সহিত চোখো চোখি হইতেই সে ভ্রূকুটি করিয়া দৃষ্টি ফিরাইল।

অধিকতর উৎসাহের সহিত আহমদ্ সাহেব বলিলেন "বুঝ্লি আবলু ব্র্যাণ্ডি আছে, রম্ আছে, এইটেই খাওয়া যাক্, কি বল ?—" বলিয়াই লাল রংয়ের তরল পদার্থ পূর্ণ একটা বোতল তুলিয়া, সন্তর্পণে হাত আড়াল দিয়া লেবেলটা আবলুকে দেখাইয়া গোপনে কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। আবলু সাহেব তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিলেন "হঁ হাঁ ঐ ভাল, ও খুব ঝাঁঝালো জিনিস, চমৎকার রম্! দাঁড়া আমার ঘরে গ্লাশটায় জল আনি, একটু জল মিশিয়ে খেতে হবে—" আবলু সাহেব বাজনা রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ইনেবকে লক্ষ্য করিয়া আহমদ্ সাহেব খুব কোমলস্বরে বলিলেন "বিবি সাহেব, আপনারা একটু একটু খেয়ে দেখবেন না কেমন জিনিস ?—"

আমিনা ঘোমটা সরাইয়া ক্রোধ-স্ফুরিত ওষ্ঠে বলিলেন "হ্যা দেখবেন বৈ কি ? আচ্ছা বেশ!—" বলিয়াই ছোঁ মারিয়া ইনেবকে উঠাইয়া লইয়া অকস্মাৎ তীরবেগে ছুটিয়া পাশের দুয়ার দিয়া আহমদ্ সাহেবের শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া, চক্ষের নিমেষে খিল বন্ধ করিল!

আহমদ-সাহেব বোতল ফেলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে—বারেণ্ডার দিকের দুয়ারেরও দড়াম্ করিয়া খিল বন্ধ হইল! হতবুদ্ধি আহমদ্-সাহেব গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(২০)

আবলু-সাহেব জলের গ্লাশ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া গ্লাশটি আহমদ্-সাহেবের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া, মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িলেন! আহমদ্-সাহেব সকরুণ মুখে বলিলেন "হাসি নয়, হাসি নয়! এ-যে বড় মুস্কিল হোল আবলু! এখন কি করা যায় বল ভাই ?—"

আবলু-সাহেব চুপি-চুপি বলিলেন "এখন ভাই-ই বল, আর দাদা-ই বল, আর নানা-ই বল,—এর ওপর কোন কেরামতি দেখান'র শক্তি আমার ঘাড়ে নাই, এবার তাল সাম্লাও তুমি মিঞা-সাহেব!

আহমদ্-সাহেব ফোঁশ্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অধিকতর করুণভাবে বলিলেন "তুমি এম্নি বেইমানই বটে!—"

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে ততোধিক করুণ স্বরে আবলু সাহেব বলিলেন "কি করব ভাই, তোমার মত এমন ইমানদার দুনিয়ায় যে দুটো পয়দা হয় নি,—সে খোদার কসুর, আমার নয়! এখন তুমি কি রকম ধরণে মাত্লামী করিবার প্লান্টা ঠাউরেছ, আমায় বাৎলে দাও,—আমি বাজ্না বাজাব, আর তুমি loud bray সুরে ঝিঝিট খাম্বাজ গাইবে ?"

বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া আহমদ্-সাহেব অস্ফুটস্বরে গোঁহ-গোঁজ করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ! গাইবে ঝিঝিট খাম্বাজ! আমার বলে এখন যা হচ্ছে,—মাথাটা একদম গুলিয়েই গেছে!—"

আশ্বাসের স্বরে আবলু-সাহেব বলিলেন "আহা যাক্ যাক্ ও-মাথা গুলিয়ে যাওয়াই মঙ্গল! অনেক মানুষ শয়তানী-উপদ্রব থেকে নিস্তার পেয়ে বাঁচ্বে।—এখন বন্ধু মদ খেয়ে মাত্লামী সুরু কর।

আহমদ্-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিন্তিতমুখে বলিলেন "না বাস্তবিক ঠাট্টা নয়, এখন কি করা যায় বল দেখি ?"

গোঁফে তা দিয়া আবলু-সাহেব বিজ্ঞভাবে বলিলেন "এখন তো করবার মত সৎকার্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, আর তা ছাড়া এমন সঙ্কটস্থলে আমিও তোমায় কোন পরামর্শ দান ক'তে রাজি নয়, ছেলে বেলায় ইংরেজ গুরুর নিষেধ শুনেছি—"It is not well to lead others If all goes well you get an equal sharo. If not, you alone get all the blame." এহেন শাস্ত্রের বচন লঙ্ঘন করে—"

অত্যন্ত চটিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "আরে রাখ, তোর শাস্ত্রের বচন!—হাড় জ্বালালে! আমার বলে এখন যে বিপদ হয়েছে,—জান্ গেল—"

বাধা দিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে খুব উচ্চকণ্ঠে যেন পাশের ঘরে সবাই শুনিতে পায় এমনিভাবে—আবলু-সাহেব হাঁকিয়া বলিলেন "ঐঃ! তা, এখন জান গেল, প্রাণ গেল, বলে চীৎকার করলে কি হবে? একটা অত্যন্ত সোজা কথা আছে যে 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!' তা ছাড়া হাকিম মানুষ তুই—হাকিমী যখন শিখেছিস, তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোঁড়ায় দাঁত বসিয়েই—প্রথমে তোকে একটা নীতি উপদেশ শিখ্‌তে হয়েছে যে "Prevention is better than cure." এখন প্র্যাক্‌টিশের ক্ষেত্রে সে কথা ভুলে গিয়ে অমনতর জাঁদ্রেল ধরণে ডিগ্‌বাজির বহর দেখালে চলবে কেন?

আহমদ্-সাহেব ক্ষণিকের জন্য গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—কি একটু ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে নিজের দুই কাণ মোচড়াইয়া বলিলেম "কোন্ আহাম্মক্ কোন্ বেকুব আর এমন কায—"

বাধা দিয়া ত্রস্তভাবে আবলু সাহেব বলিলেন "উহুঁ, না, না, হোল না, হোল না, দাঁড়া আমি ঠিক করে দিই—" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে, পিছন হইতে আহমদ সাহেবের দুই কান ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন "কোন বেকুব, কোন উল্লুক, কোন গাধা আর এমন তামাসা জীবনে ভোলে! কেমন এঁ্যা?—"

আহমদ্-সাহেবের কাণ দুইটা জ্বলিয়া গেল! কিন্তু আবলুর সে নির্দ্দয় পরিহাসে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার মোটেই ছিল না, কাজেই নিরীহভাবে নিজের কাণের উপরই হাত বুলাইতে বুলাইতে বিমর্ষ করুণ মুখে বলিলেন "না ভাই না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই কসম খাচ্ছি, আর কক্ষণো যদি কিছু বলি! আব্‌লু তোর পায়ে পড়ি ভাই, বাঁচা আমায়।—বল ভাই এটা রম্ নয়, রোজ-সিরাপ,—"

আবলু-সাহেব চুপি চুপি বলিলেন "আরে থাম, এর মধ্যে রহস্যোদ্ভেদ করা হবে না। তুই এখন খানিকক্ষণ মাত্‌লামীই কর্ না—তারপর—"

ভগ্নোদ্যম আহমদ্-সাহেব বিষণ্নভাবে বলিলেন "আরে দ্যাৎ! মাত্‌লামী করবে! আমার বলে চোখে নেশাই জমছে না, কিছু ভালই লাগ্‌ছে না, তা আবার কাটামুণ্ডের দাঁত খামটি দেখাতে যাবে!—নাঃ, ওসব আর হবে না, হবে না—"

অকস্মাৎ বারেণ্ডায় বাহিরের দিকে সিঁড়ির দুয়ারে করাঘাত করিয়া বাহির হইতে ওহায়েদ্ দারবান ডাকিল "ডাংদার সা'ব্—ডাংদার সা'ব্—"

আহমদ্-সাহেবের বিচলিত—বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা সেই শব্দসংঘাতে চট্ করিয়া স্থির হইয়া গেল! ত্বরিতে বাহিরে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া, বলিলেন "কি খবর?"

ওহায়েদ্ সংক্ষেপেই বলিল 'গঙ্গার ওপার হইতে 'কল' আসিয়াছে।'

আব্‌লু-সাহেব পিছন হইতে আসিয়া কপট-গাম্ভীর্য্যে ইংরেজিতে বলিলেন "এ শুধু ব্যক্তি বিশেষের মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাতের ফল!—"

আহমদ্-সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "তা সে যাই হোক, আমি আজ কিছুতেই বেরুতে পারছি না, অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক ওরা" ওহায়েদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "নূতন লোক তো?"

ওহায়েদ থতমত খাইয়া বলিল "হুজুর, মালুম নেই মের'—"

সহসা স্বভাব-বিরুদ্ধ অসহিষ্ণুতার সহিত অত্যন্ত বিরক্তি ভাবে আহমদ্ সাহেব বলিয়া উঠিলেন "পঞ্চাশ দিন তোমার কাণে কামড়ে বলে দিয়েছি যে রাত্রে যখনই 'কল' আস্‌বে তখনই আগে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নেবে, তারপর—" পরক্ষণে আত্মদমন করিয়া বলিলেন "যাও তাঁকে বল, সাহেবের আজ ভয়ঙ্কর শরীর খারাপ হয়েছে, তিনি আজ কিছুতেই বেরুতে পারবে না, আপনারা অন্য ডাক্তার নিয়ে যান,"

আবলু সাহেব বলিল "কিম্বা বল, নাম ঠিকানা লিখে রেখে যান, কাল সকালে ডাক্তার যাবেন—"

একটু হাসিয়া আহমদ্ সাহেব বলিলেন "না না,—সে আর বল্‌তে হবে না, এত রাত্রে যারা ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়েছে তারা নেহাৎ দায়ে পড়েই বেরিয়েছে, কাল সকাল পর্য্যন্ত তর সইবার উপায় তাদের নাই, ওরা অন্য ডাক্তারই নিয়ে যাক,—কিন্তু ওহায়েদ শোন, যদি পুরাণো রোগী হয়, তাহলে বল, "নাম ঠিকানা দিয়ে রোগীর কি হচ্ছে—কি অবস্থা, সব লিখে দেন, ডাক্তার প্রেসক্রপসান্ করে দিচ্ছেন," তারপর কম্পাউণ্ডার বাবুকে উঠিয়ে দাওয়াই করিয়ে বিদায় দিও—"

"যো হুকুম খোদাবন্দ—" বলিয়া ওহায়েদ দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। আহমদ্-সাহেব চিন্তিতভাবে বারেণ্ডার এদিকে ওদিকে পায়চারী করিতে করিতে গোঁফে তা দিতে লাগিল।

আব্‌লু-সাহেব ইজি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে খুব মিহিস্বরে বলিলেন "বন্ধু, তোমার মেডিকেল সায়ান্সের কসম খেয়ে এখন সত্য করে বল দেখি,—তোমার মগজ ভরা ওত সখের শয়তানী খেয়ালগুলো, এখন মাথায় কোনখানটায় জমাট বেঁধে বসে পড়েছে? এই বেলা সেখানটায় স্ক্রু এঁটে দিই, কি বল?"

একটু হাসিয়া আহমদ্-সাহেব বলিলেন "স্ক্রু আঁটতে হবে না, সে আমি এখন মগজ থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে মাথা হাল্কা করে নিয়েছি, না হলে কি খাট্‌তে পারি? সেটুকু ক্ষমতার জোর আমায় রাখ্‌তে হয়—"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে আব্‌লু সাহেব বলিলেন "আমিন্, জানালা দিয়ে আহমুর ষ্টেথেস্‌কোপটা বের করে দাও তো, আহমু কলে' যাচ্ছে—দাও শীঘ্র—"

ঘরের ভিতর হইতে চাবি চুড়ির ব্যস্ত-চঞ্চল ঝনাৎকার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, আহমদ্ সাহেব আশান্বিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চাহিয়া বলিলেন "শুধু ষ্টেথেস্‌কোপ দিলে তো চল্‌বে না,—একস্যুট পোষাক বের করে দিতে হবে যে, লক্ষ্মীটি,—একবার বেরিয়ে এস তো—দ্যাখো ঠাট্টা নয়, দেরী করবার সময় নাই, আমার রোগী 'কোলাপ্স্' হয়ে গেছে, এস চট্ করে—শুনছ—"

হাসি চাপিবার জন্য আব্‌লু সাহেব প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিলেন। আহমদ্ আহেব দুয়ারে করাঘাত করিয়া অনুনয় পূর্ণ স্বরে বলিলেন "শুনছ, দুয়ারটা খোল, আচ্ছা, এইটেই কি তোমার রাগ করবার সময় হোল, আমার রোগী মারা যায়, দ্যাখো, সময় বয়ে যাচ্ছে,—শুনছ, শেষে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধর্‌লে রোগী বাঁচাতে পারব না, আঃ কি মুস্কিল, খোল না—" অধৈর্য্যভাবে তিনি দুয়ারে উপর্য্যুপরি করাঘাত করিলেন। কিন্তু বদ্ধ দুয়ার ঝন্ ঝন্ শব্দে একটা ব্যঙ্গ-প্রতিধ্বনি করা ছাড়া আর কিছুই ফল হইল না।

ওহায়েদ সিঁড়ির দুয়ারের সামনে আসিয়া বলিল "জনাব, ইয়ে বাবুসা'ব মুলাকাৎ মাংতে হ্যে—"

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে কাতর কণ্ঠে এক বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "ডাক্তর সাহেব, দয়া করে একবার এদিকে আসুন, আমি বড় বিপদগ্রস্ত—"

বৃদ্ধের গলার আওয়াজ শুনিয়া আহমদ্-সাহেব চমকিয়া উঠিলেন! এ কি! এযে ওপারের প্রসিদ্ধ জমিদার, অবসর প্রাপ্ত সবজজ রায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর!—শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আদাব, আদাব, একি আপনি যে এত রাত্রে!"

সবজজ মহাশয় বলিলেন, "নমস্কার, বড় বিপদে পড়েছি, আমার দৌহিত্র মরণাপন্ন............" বৃদ্ধ সংক্ষেপে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন "আমি দেওয়ানকে পাঠাচ্ছিলুম, কিন্তু পাছে আপনি যেতে অস্বীকার করেন তাই নিজে ছুটে এসেছি ডাক্তার, অনুগ্রহ করে একবার আপনাকে যেতে হবে,—গেলবার ছেলেটিকে আপনি মরা-বাঁচিয়েছেন, এবারেও আপনার হাতে ফেলে দিলুম, দয়া করে—"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া আহমদ্-সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "করেন কি, করেন কি? এ যে আমার ঘরের কথা! আমায় মাপ করুন, আমি জানি না যে আপনি এসেছেন! চলুন আমি এখনই যাচ্ছি, আমায় আর কিছু বল্‌তে হবে না।"

আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন "বাঁচলুম ডাক্তার-সাহেব, ভগবান আপনাকে সুখী করুন, আসুন তা'হলে, আমার নৌকা ঠিক্ আছে—" তিনি নামিয়া গেলেন, ওয়াহেদ সঙ্গে গেল। আহমদ্-সাহেব বলিয়া দিলেন—কম্পাউণ্ডারকে ঔষধের বাক্স লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বল।"

তাঁহারা অদৃশ্য হইলে, আহমদ্ সাহেব সশব্দে না, এখন ওর সম্পত্তির ভার আপনার হাতে দিতে চল্লুম,—যান ঐ উল্লুকটার কাণ ধরে টেনে নিয়ে যান -"

এবার সত্যই দুয়ার খুলিয়া গেল। ইনেব ঘোমটা টানিয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিল, আহমদ-সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের দুয়ার খুলিয়া পোষাক কামরায় ঢুকিয়া আমিনাও বিনা বাক্যে পোষাক বাহির করিতে বসিল।

ইনেব কোন দিকে না চাহিয়া, ভাল মানুষের মত ঘোমটা দিয়া, নিঃশব্দ পদে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, মাঝ পথে আবলু সাহেব তাহাকে আটকাইলেন!—কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, প্রসন্ন-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি, সপরিহাসে কি বলিলেন,—ইনেব স্নিগ্ধ হাস্যে দৃষ্টি তুলিয়া ততোধিক চুপি চুপি কি উত্তর দিল! আবলু সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া, উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "ওরে আহমু, তুই কি নিমক্ হারাম্ মাতাল রে! ডাকের নাম শুনে, তেমন জমকাল নেশা ছেড়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, নির্লজ্জের মত ডাক্তরী করতে ছুটেছিলস্! তোর জীবনে ধিক্! তোকে যে সবাই 'ছিঃ' বল্‌ছে রে!"

ক্ষিপ্র- চতুরতার সহিত তৎক্ষণাৎ ঘরের দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া আহমদ সাহেব বলিলেন "কে বিবিসাহেবা বুঝি! ওঃ! বহুৎ খুব; বড় খুশী হলুম! দ্যাখ্ আবলু, আমার এই দুর্ভাগ্য সংঘাতে যে তোর সৌভাগ্য-বিকাশ হোল, এতেই আমি আন্তরিক সন্তোষে পরিতৃপ্ত হলুম ভাই!—আর বিবি সাহেব আপনি যে ধিক্কার দিলেন ওটা বাধ্য হয়েই মাথায় তুলে নিলুম, আমার মত দুর্ভাগা জীবেদের নসীবের লিখনই এই! মদের নেশা তো তুচ্ছ কথা, শক্ত ঘানিতে ঠেকলে মহানিদ্রার নেশা ছেড়েও আমাদের ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে,—তা সে যাই হোক, আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি, আবলু কিন্তু খুব নিমকহালাল মাতাল, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, এখন ওর সম্পত্তির ভার আপনার হাতে দিয়ে চল্লুম,—যান ঐ উল্লুকটাকে কাণ ধরে টেনে নিয়ে যান—"

আবলু সাহেব বলিলেন "তোমায় তার জন্য ফফরদালালী করতে হবে না, থাম নিজের চরকায় তেল দ'ও।—"

"আচ্ছা" বলিয়া আহমদ্-সাহেব পোষাক কামরায় চলিয়া গেলেন। আমিনা তখন তাঁহার শার্টে বোতাম পরাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মাথায় কাপড়টা একটু টানিল।

আহমদ্-সাহেব বলিলেন "ওয়াহেদের স্ত্রী এসে তোমার কাছে থাকবে, বুঝলে, আবলুর স্ত্রীকে ওঘরে পাঠিয়ে দিও।—"

আমিনা নত শিরেই ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার লক্ষণ জানাইল, আহমদ্-সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা শোন, চেয়ে দেখো।—"

আমিনা চাহিয়া দেখিল না, শার্টটা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিয়া প্যাণ্টে গ্যালিশ পরাইতে পরাইতে চোখ নীচু করিয়া বলিল 'বল'।—

আহমদ-সাহেব নিকটে আসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমায় এম্নি করে দূর হয়ে যেতে হচ্ছে, এতে তোমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে নয়? —"

"জানি না" বলিয়া আমিনা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আহমদ-সাহেব ছাড়িবার পাত্র ন'ন—উপর্য্যুপরি প্রশ্ন সুরু করিলেন, আমিনা রাগিয়া বলিলেন "হ্যাঁ হচ্ছে! যাও!"

যেন কতই হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন, এমনইভাবে আহমদ্-সাহেব বলিলেন "হ্যাঁ এইটুকুই শুন্তে চাইছি! তাই বল! তাই ত হওয়া উচিত!"

ক্ষুব্ধ-ম্লান চোখ দুটিতে গভীর ভৎর্সনা ভরিয়া আমিনা মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল, তারপর কোন কথা না বলিয়া প্যাণ্ট ফেলিয়া দিয়া, জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আহমদ্-সাহেব আর কথা কহিলেন না।

(২১)

পরদিন বেলা বারোটার সময় আহমদ্-সাহেব 'কল' হইতে ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। আমিনা শয়নকক্ষে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কি কাজে ব্যাপৃত ছিল, তাঁহার পদশব্দ পাইয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি দুয়ারের দিকে চাহিল,—না জানি রায়মহাশয়ের দৌহিত্রটির কি সংবাদই এখনই শুনিতে হইবে।

আহমদ্-সাহেব চৌকাঠে পা দিয়াই মাথা হইতে টুপী খুলিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "এই নাও, গৃহস্থ ভদ্র মহিলাটিকে দস্তুর মত সম্মান জানাচ্ছি।—"

আমিনা মনের মধ্যে আশ্বাস পাইয়া বলিল, "হ্যাঁ-জুতো মেরে গরু দান যাকে বলে! একি স্নান হয়ে গেছে যে! —সেখান থেকেই?"

আহমদ্-সাহেব অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "স্নান হয়ে গেছে—আহার হয়ে গেছে—রোগী খুব ভাল আছে, কাল রাত্রে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাকে ঠাণ্ডা করে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও সারা রাত্রি তোফা ঘুমিয়েছি!—"

মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া, আমিনা সকৌতুকে হাসিয়া বলিল "ঘুমিয়েছিলে! ঘুমুতে পেরেছিলে তো! এ্যাঁ বল কি? তা হলে সেই সাধের মাতাল যাত্রা ছিরকুটে যাওয়ার আপশোষটা মাঠেই মারা গেল!—"

আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "কি আর করি বল! তোমার অভিশাপ, সে তো ব্যর্থ হবার নয়! পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে চোখকাণ বুজে ক্ষতি স্বীকার করে নিলুম। যাক, আমিনা তুমি আর একটি কলের টাকা চেয়েছিলে এইটে নাও,—" দুইখানি দুইশত টাকার নোট টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন "আজ মহরম, কলকাতা থেকে কম্বল নিয়ে এই একটার গাড়ীতে লোক আস্‌ছে, আমি টেলিগ্রাম করে এসেছি।—"

হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমিনা বলিল, "খুব কৃতজ্ঞ হলুম! বেশী আর কি বল্‌ব? খোদা তোমার মঙ্গল করুন, আর শয়তান যেন দয়া করে তোমার ঘাড়ের ওপর থেকে সেই দুষ্টুবুদ্ধির বোঝাটা নামিয়ে নেন, এইটুকু প্রার্থনা!—" তারপর একটু থামিয়া সকরুণ মুখে বলিল "সত্যি ঐ জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়, সময় সময় যেন কান্না পায়—"

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন "আমারও পায়—"

হাসিয়া আমিনা বলিল "হাঁ তুমি সেই মানুষই বটে!—"

খপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন, "তা সে যাই হই, এখন মাপ কর, আর অভিসম্পাত দিও না, অন্ততঃ আজ রাত্রে যেন আমায় আর 'কলে' বেরুতে না হয়!"

আমিনা বলিল "তা না হোক্‌ কিন্তু কাল মাতাল যাত্রার পর, আজ কি যাত্রা হবে শুনি?—"

সজোরে মাথা নাড়া দিয়া আহমদ্‌-সাহেব বলিলেন, "তোবা, তোবা! আবার! না আমিনা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর তোমায় কিচ্ছুটি বল্‌ছি না, এ একেবারে খাঁটি সাচ্চা বাৎ!—লক্ষিটি, আর রাগ কোরনা, সরে এস—"

* * * *

যথাসময়ে কম্বল আসিয়া পৌঁছিল, বৈকালে মহাসমারোহে দরিদ্রগণকে কম্বল বিতরণ করা হইল।

বড় রাস্তার উপর দিয়া মহরমের মিছিল যাইতেছিল, বাগানের পাঁচিলের ঘুলঘুল্গির ফাঁক দিয়া আমিনা ও ইনেব সন্ধ্যা পর্যান্ত শোভাযাত্রা-সমারোহ দেখিয়া, বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় পাশের বাড়ীর দ্বিতলের জানালা হইতে তীক্ষ্ণ-কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল,—"ঠাণ্ডা বরফ্‌, ঠাণ্ডা বরফ্‌,—আমিনা—"

সাগ্রহে দৃষ্টি তুলিয়া আমিনা বলিল "এ কি! মিনতি রাণী যে! কবে এলে শ্বশুর বাড়ী থেকে? ভাল আছ ঠাণ্ডা বরফ্‌?—"

মিনতি হাসিমুখে বলিল "ভাল আছি, আজই এইমাত্র আসছি তোমরা ভাল আছ তো?—একটা সুখবর শোন, আব্‌লু দাদা বি-এল একজামিনে পাশ হয়েছেন, আজ খবর বেরিয়েছে, উনি এসেই তোমাদের বাড়ীতে খবর দিতে ছুটেছেন, ওটি কে?"

আমিনা ইনেবকে টানিয়া সামনে আনিয়া বলিল "দাদার গৃহলক্ষী। রঞ্জনবাবু পাশ হয়েছেন? বাঃ, তোমাদের দুজনের মাঝখানে আজ আমি দাঁড়িয়েছি ভাই, মিষ্টি আন,—"

মিনতি বলিল "বৌদিদি যে ঘোমটা দিচ্ছে, ও কি ভাই তা হবে না, দাও তো ঘোমটা খুলে, ওঁর সঙ্গে আগে বোঝাপড়া করে নিই—দ্যাখো বৌদিদি, তুমি আমায় লজ্জা কোর না, একে আমিনা আমার ছেলেবেলার ঠাণ্ডা বরফ্‌—"

আমিনা হাসিয়া বলিল "তাতে আমিনার দাদা মিনতির বরের সহধ্যায়ী বন্ধু এবং বিবাহের ঘটক, কাজেই ঘটক-গৃহিণী তুমি মিনতির সঙ্গে কথা কইতে বাধ্য—" আমিনা ইনেবের ঘোমটা সরাইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

তিনজনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পারিবারিক সংবাদই বেশী। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া উভয় পক্ষ পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, কথা স্থির হইল আবার আগামী কাল সকালে দেখা হইবে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া, সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ইনেব বলিল "আচ্ছা ভাই আমিনা দিদি,—তোমার পায়ে পড়্‌ছি ভাই, আমার একটি কথা রাখ-না,—"

বিস্মিত হইয়া আমিনা বলিল "কি কথা?"

আমিনার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, আদর-মাখা অনুনয়ের স্বরে ইনেব বলিল "ঐ তো ভাই তোমার ঠাণ্ডা বরফ্ একজন রয়েছেন, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমার সঙ্গেও একটা কিছু পাতিয়ে নাও—আর তোমায় 'আমিনা-দিদি,' 'আমিনা দিদি' বলে ডাক্‌তে ভাল লাগে না—খুব একটা মিষ্টিগোছের কিছু পাতিয়ে ফেল ভাই।"

সিঁড়ির পাশের ঘর হইতে দিদি ডাকিলেন "ওরে আমিনা এখানে আয়, শুনে যা—তোরা—"

উভয়ে উঠিয়া গিয়া, পাশের ঘরে ঢুকিল। দিদি সেখানে অসংখ্য গ্লাশ লইয়া বিপুল আয়োজনে সরবৎ প্রস্তুত করিতেছিলেন, উভয়কে দেখিয়া বলিলেন "আহমু বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে সরবৎ তৈরী করে খাওয়াবার জন্যে এই রোজ সিরাপের বোতলটা আমায় দান করেছে, তোরা এক এক গ্লাশ নে—" দুইটি গ্লাশ তুলিয়া, তিনি দুইজনের হাতে দিলেন।

গ্লাশ হাতে লইয়া আমিনা ও ইনেব মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিল! এ সেই রোজ-সিরাপ!—হঠাৎ আমিনার মাথায় একটা নূতন ফন্দী আবিস্কার হইল, ত্রস্তে গ্লাশে একটা চুমুক্ দিয়া আমিনা বলিল "খুব মিষ্টি হয়েছে! নাও ইনেব, গ্লাশ বদ্‌লাবদ্‌লি কর ভাই, ছেলেবেলায় একদিন এক পয়সার বরফ কিনে দুজনে ভাগ করে খেয়ে ঠাণ্ডা বরফ পাতিয়েছিলুম ভাই, আর আজ থেকে তোমাতে আমাতে—মিষ্টি-সরবৎ!"

তৎক্ষণাৎ তথাকরণ সুসম্পন্ন হইল! দুইজনে দুইজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরের মুখে চুমা খাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, সকৌতুকে ডাকিল "মিষ্টি সরবৎ!—"

অকস্মাৎ কোথা হইতে রহমান্-সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সবিস্ময়ে বলিলেন "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?"

দিদি হাসিতে হাসিতে ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। রহমান-সাহেব হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ! মিষ্টি-সরবৎ পাতান হোল! আচ্ছা এই সুযোগে আমার সঙ্গেও অমি একটা কিছু পাতিয়ে ফেল—"

গ্লাশ রাখিয়া মুখ মুছিয়া "পাতাচ্ছি দাঁড়ান,—"কুইনিন্ মিক্‌শ্চার"—রাজি?"

কপালে করাঘাত করিয়া রহমান-সাহেব মহা ক্ষোভের সহিত সজোরে বলিলেন "কী! এমন অবিচার! আজকের দিনে, অমনতর মিষ্টি-সরবতের পর,—আমি হলুম তেতো কুইনিন্ মিক্‌শ্চার!"

ইনেব সান্ত্বনার স্বরে তাড়াতাড়ি বলিল "আহা তার জন্যে দুঃখ করছেন কেন? এই ম্যালেরিয়া ভরা বাংলা দেশে কুইনিন্ মিক্‌শ্চার বড় উপকারী জিনিস—"

আমিনা বলিল "বলতো ভাই মিষ্টি-সরবৎ, হুঁ! আমি যে ওঁর দর বাড়িয়ে দিলুম তাতে খেয়াল নাই!—এমি অকৃতজ্ঞ—"

ইনেব একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল "বুঝ্ছেন না এবার আপনাকে ওষুদের আলমারীর মধ্যে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হবে—"

দাক্ষণের বারেণ্ডা হইতে আবলু সাহেব ডাকিলেন "রুস্তম, চা লাও,—ডাংদার সাব আ-গিয়া,—"

"ঐঃ! ঠিক্ হয়েছে—" ক্ষিপ্র হস্তে দুই জনকে ধরিয়া ফেলিয়া, রহমান-সাহেব উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন "আবলু, আবলু, আহমুকে নিয়ে চট্ করে এস তো এখানে—"

ইনেব ও আমিনা পলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইল না, আবলু ও আহমদ্-সাহেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দালানে ঢুকিয়া বলিলেন "কি হয়েছে, কি হয়েছে?"

রহমান-সাহেব বলিলেন "এঁরা দুই মূর্ত্তিতে চুপি-চুপি মিষ্টি-সরবৎ পাতিয়ে ফেলেছেন, আমি টের পেয়ে লোভ সামলাতে পারি নি, তাই এঁরা নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে আমায় কুইনিন্ মিক্শ্চার বানিয়ে দিলেন।—এখন তোমরা বল, এদের যোগ্য শাস্তিটা কি?"

আবলু ও আহমদ্-সাহেব মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া নিঃশব্দে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন,—কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবলুর দিদি ঘরের ভিতর হইতে দুই গ্লাশ সরবৎ হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিলেন "আমি ওদের যোগ্য শাস্তি ঠিক্ করে দিচ্ছি—আমিনা এই গ্লাশটা ধর, ইনেব তুমি ধর্তো এটা—"

দুইজনে বিনা দ্বিধায় আদেশ পালন করিল, তিনি ইনেবকে টানিয়া লইয়া গিয়া আবলুর সাম্নে দাঁড় করাইয়া-দিয়া বলিলেন "আবলুকে সরবৎ দাও—আজ ওর পাশের খবর এসেছে!"

ইনেব লজ্জায় জড়সড় হইয়া সরবতের গ্লাশটি বাড়াইয়া দিল, আবলু চোখকাণ বুজিয়া সেটা টানিয়া লইয়া সরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে আমিনাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহমদ্-সাহেবের কাছে দাঁড় করাইয়া রহমান সাহেব বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "আমার মাথায় কুইনিন্ মিক্শ্চার ঢেলে দিয়ে ভারি খুশী হয়েছ, এবার দাও দেখি আহমুকে সরবৎ—ও-বেচারা অনেক খেটে এসেছে—"

আমিনা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া বারবার আপত্তি জানাইল, কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা!' সরবৎটা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতেই হইল!

সরবৎ হাতে লইয়া আহমদ্-সাহেব গৃহালিকার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন "সরবতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,—"

সুকোমল হাস্যে স্নেহময় স্বরে তিনি উত্তর দিলেন "আর আমি, আজকের এই পুণ্যদিনে, কায়মনে আশীর্ব্বাদ করছি,—এ সরবতের আস্বাদ, তোমাদের পক্ষে খুব মিষ্ট, মধুর ও স্নিগ্ধ আনন্দময় হোক!"

আমিনা ও ইনেবকে দুই পাশে টানিয়া লইয়া দুজনের মাথায় হাত দিয়া রহমান-সাহেব বলিলেন "আর এই সরবতের কল্যাণে তোমাদের হৃদয় উন্নত হোক্, আত্মা পবিত্র হোক্ এবং সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যে তোমাদের জীবন উজ্জ্বল হোক্।—"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বর্ষ—মঙ্গল।

—:*:—

এখনো মুছে নি ফাগুনের রাজটীকা
বনে বনে আর মনে মনে আছে লিখা !
গাজনের তালে রুদ্রের সাড়া পেয়ে
বসন্ত ভয়ে বনান্তে পশে ধেয়ে !—

কুন্তল তার উড়ে নীলাকাশে
দীঘি জলে আঁখি-ছায়া
পলায়ন-পথে ভূঁই-চাঁপাগুলি
বিছায় চিহ্ন মায়া।

শিমুল পলাশ ফুটে
মাথা কুটে পায় লুটে ;—
আশোক গুমরি কহে—
—ফির' ফির' সখা, ওহে !

চিত্রা কুঞ্জে তরুণী বিশাখা আসি
দাঁড়াইল ধীরে অধরে শুষ্ক হাসি ;
চুতকসায়িতস্বর বিহঙ্গ ভয়ে
চলে গেল কোথা স্বর্ণ-বীণাটি লয়ে।

নিমের গন্ধে চাতক কণ্ঠে
বায়ু পেতে আছে কান
তারকাঙ্কিত নিবাক্ আকাশ
স্পন্দ বিহীন প্রাণ !

গন্ধ মিথ্যা কাজে
ঘুরিল কত না সাজে ;
কালবোশেখীর মেঘে
প্রভাত উঠিল জেগে !

দেখিবা মাত্র আলোক তালী বনান্তে
"জয় জয়" রবে গায়ত্রী স্বচ্ছন্দে
গাহিয়া উঠিল কোটি কোটি নরনারী
নব দিন অভিনন্দন সারি সারি !

জগতের হিতে গো ব্রাহ্মণ
ক্ষেত হল হলীশায়
শুভ ভগবতী যাত্রা লগ্নে
অর্ঘ্য দানিল পায়।

গাহিল কুমারী সবে
"দশ পুতুলের" স্তবে
ঘরে ঘরে এক তান
তোমারি স্বাগত গান।

বাসর-স্বপ্ন লুকাল' অন্ধকারে
মুকুল কলিকা আনমিল ফল ভারে
নানা-উৎসবে পুলক মাগিল ছাড়া
এক বসন্ত বহু মাঝে হ'ল হারা।

তব মঙ্গল সজল কুম্ভ
ছাড়ি কম কটি তট—
তুলসী অশথ শিবের মাথায়
সুশোভিল ঝারা ঘট।

নিল তাই নারী যত
ফল জল দান ব্রত
কুমারী রচিল স্নেহে
পুণ্যপুকুর গেহে।

দোদুল দীঘল মহীর আঁচল খানি
ভরিয়া উঠিল ফল ভারে আশা বাণী।
হইল আবার হিসাবে নুতন খাতা
এখনো শুভ্র তাহার সকল পাতা !

আজ দেখি ভরা গত বরষের
খাতাটি কালির দাগে
কে জানে তাহার কোনও অঙ্ক
আসে কিনা বাম ভাগে!

অনাদি হইতে আসি
যাও অনন্তে ভাসি
অতি পুরাতন, তব
এই লীলা চির-নব!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রেম তত্ত্ব।

গত সেপ্টেম্বর মাসের Stand Magazine এ All about Love শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক প্রেম সম্বন্ধে সাতটি প্রশ্ন লিখিয়া নয়জন নবেল লেখককে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাদ্বারাই এই প্রবন্ধ গঠিত হইয়াছে। উত্তরগুলি আমাদের দেশের লোকেরও মনোরঞ্জক ও চিন্তনীয় বোধ হওয়ায় নিম্নে প্রশ্নগুলি ও তাহার উত্তরের অনুবাদ দেওয়া হইল। এই অনুবাদে যথাসাধ্য মূলের ভাব ও ভাষারীতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। "Ideal" শব্দের প্রচলিত বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "আদর্শ" ভুল বলিয়া মনে হওয়ায় "কল্পনা" শব্দ দিয়া অনুবাদ করিয়াছি। "মনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা" বলিলে বোধ হয় অর্থের অনুবাদ ঠিক হইত। "Idealise" শব্দের অনুবাদ "মনে মনে উৎকর্ষ কল্পনা করা" লিখিয়াছি। Paradox কে "আপাত মিথ্যা" এবং Cynicকে "জ্ঞানাভিমানী" করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এই যে যে সকল স্থানে বিসর্গের উচ্চারণ হয় না সেখানে বিসর্গ লিখিতে হয় না। বাঙ্গালাতেও সেই নিয়ম প্রয়োজ্য বলিয়া "সাধারণতঃ" "প্রধানতঃ" প্রভৃতি যে সকল শব্দে বিসর্গের উচ্চারণ মোটেই করি না সে সকল শব্দে আমি বিসর্গ বর্জ্জন করিয়াছি।

প্রথম প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। কাহার প্রেম অধিক প্রবল? পুরুষের না নারীর?

এই প্রশ্নের উত্তরে হরেস্ আনেস্‌লি ভাচেল (Horace Annesly Vachell) লিখিয়াছেন "সাধারণত নারীর প্রেমই অধিক বলবৎ যেহেতু নারীর পক্ষে প্রেমের যত মূল্য, তত পুরুষের পক্ষে নহে। প্রেম নারীর মন যত অধিকার করে পুরুষের তত নয়।"

অস্‌টিন্ ফিলিপ্‌স্ (Austin Phillips) লিখিয়াছেন "পুরুষ এবং নারী প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে, সেজন্য এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না; কিন্তু সাধারণত এই কথা বলা যাইতে পারে যে নারীর প্রেমই

অধিক বলবৎ যেহেতু নারীর প্রেম তাহার হৃদয়ভাব হইতে যে পরিমাণে সঞ্জাত তাহার মস্তিষ্ক হইতে সে পরিমাণে নহে। সে জন্য দারিদ্রের মধ্যে বিবাহ বা বিবাহের সম্ভাবনা হইলেও নারীর প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয় নারী দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং দুঃখ সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে। তেমন স্থলে পুরুষ ভয়ে সরিয়া পড়ে।"

মে এডিঙ্‌টন (May Edington) লিখিয়াছেন "সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পুরুষের প্রেম নারীর প্রেম অপেক্ষা বলবৎ। নারীদিগের বিষয়বুদ্ধি এতই প্রবল যে অতি অল্পসংখ্যক নারীর প্রেমও পুরুষের মত নহে। পুরুষের প্রেম পুরুষকে বাঁধিয়া ফেলে এবং উন্মাদ করে। নারীর কদাচিৎ এরূপ হয়। পুরুষ মনে মনে পূর্ণ উৎকর্ষের কল্পনা করে এবং সেই মনঃকল্পিত পূর্ণ উৎকর্ষের পূজা করে। নারী যাহা বাস্তবিক তাহাই দেখে এবং বাস্তবিকের প্রতি তাহার প্রেমও সংযত হয়। পুরুষ ভাবপরায়ণ কিন্তু নারীদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যকই সেরূপ। পতিপরায়ণা পত্নী অপেক্ষা পত্নীপরায়ণ পতির সংখ্যা অধিক।"

হেন্‌রি ডি ভিয়ার স্টাপ্‌কুল (Henry de Vare Stapcoole) লিখিয়াছেন "পুরুষেই প্রেমের প্রবলতা। যে প্রেম স্থায়ী তাহা পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিক প্রবল নহে কিন্তু আমার বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা উহা নারীতে অধিকতর দেখা গিয়া থাকে।"

শ্রীমতী সী এন্‌ উইলিয়ম্‌সন্‌ (Mrs. C N Willamson) লিখিয়াছেন "যদি নিঃস্বার্থতায় শক্তি থাকে তাহা হইলে আমার বিশ্বাস এই যে বিশেষ স্থল ভিন্ন পুরুষের প্রেম অপেক্ষা নারীর প্রেমই অধিক বলবৎ। কিন্তু বিশেষ স্থল এই প্রশ্নের লক্ষ্য নহে। পুরুষের প্রেম নারীর প্রেম অপেক্ষা বলবত্তর রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু তাহা অতি অল্প কারণেই ভগ্ন হইয়া যায়। নারী যদি কুরূপ হইয়া পড়ে অথবা নারীর যদি কোন অপ্রীতিকর রহস্য বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে কয়জন পুরুষ বর্ত্তমান প্রবল অনুরাগের সহিত তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে? কিন্তু অধিকসংখ্যক নারীই পুরুষ বিকলাঙ্গ বা দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িলেও সেই পুরুষকে ভালবাসিতে থাকিবে এবং সেবা দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে। পুরুষ যাহাই করিয়া থাকুক না কেন সে জন্য অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রেমময়ী নারীর প্রেম নষ্ট হয় না।"

ই টেম্প্‌ল্‌ থর্স্টন্‌ (E. Temple Thurston) লিখিয়াছেন "অতি অল্প এবং অসাধারণ বিশেষ স্থলে ভিন্ন, নারীর প্রেমই বলবত্তম, সে প্রেম যে ভাবে যে দিক্‌ দিয়াই কার্য্য করুক না কেন। ইহার একমাত্র বর্জ্জিত স্থল আছে। পুরুষ বাল্য হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত কখন কখন ভক্তির অনুপযুক্ত পিতা বা মাতার প্রতি আশ্চর্য্য ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করে। কিন্তু নারীর বেলায় প্রায় এরূপ ঘটে না। সাধারণত যাহা অদ্ভুত রসাশ্রিত প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় তাহা পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিক স্থায়ী হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অদ্ভুত রসাশ্রিত প্রেমের দুঃখময় অবস্থাও থাকে যাহার মধ্যে ঈর্ষাই প্রধান।"

উইলিয়ম্‌ লি কুইউক্‌স্‌ (William le Queux) লিখিয়াছেন "নারীই প্রায়শ অতি গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক নারীই প্রেমের জন্য লালায়িত। পুরুষ কিন্তু নারী হৃদয়কে অতি লঘু ভাবেই দেখিতে অভ্যস্ত। সৎ পুরুষকে নারী দেবতা মনে করে।"

বার্ণস্‌ অর্সি (Barnes Orezy) লিখিয়াছেন "মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র রচনা করা বড় কঠিন। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে নারীর প্রেম পুরুষের প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রবল; কেন না নারীর প্রেম বাধা দিতে এবং অনুজীবিত থাকিতে অধিক সমর্থ। যেহেতু বাস্তবিক যাহাকে

প্রেম বলা যাইতে পারে অথচ অতি প্রবল হইলেও দৈহিক প্রেম নহে পুরুষের পক্ষে এরূপ প্রেম, নৈতিক এবং মানসিক গুণের প্রতি সম্মান ও আদরের সহচর। পুরুষ যে নারীকে সম্মান করিতে পারে না তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না ; অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নারীর প্রতি পুরুষের প্রেমের মধ্যে কতক পরিমাণে বিচার আছে, যদিও এই বিচার সৎ ও উচ্চ শ্রেণীর কিন্তু নারীর সেরূপ নহে। পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমে সেরূপ বিচার নাই।—পুরুষ কেমন নারী তাহা বিচার করে না—পুরুষের দোষ থাকিলেও তাহাকে ভালবাসে। নারী যদি ভালবাসে তাহা হইলে সেই পুরুষ হতভাগা, দুশ্চরিত্র এবং অপরাধী হইলেও সে নারীর চক্ষে গালাহাড্ (Galahad) স্বরূপ—নারী তাহার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। নারীর শারীরিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলে অনেক সময়ে পুরুষের মনের নিম্নতম স্তরে অনেক স্থলে এরূপ ভাব উদিত হয় যে 'এই নারী আমার সন্তানের জননী হইবার উপযুক্ত নহে।' কিন্তু প্রেমের ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয় এমন একটা দৃষ্টান্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ যাহাতে সেইরূপ অবস্থায় নারী বলিবে 'না, এই পুরুষ এ পরিবারের প্রধান হইবার উপযুক্ত নহে—সে আমার সন্তানের জনক হইবার যোগ্য নহে।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। নারীর পক্ষে মনোগত প্রেমের কথা মুখে প্রকাশ করা উচিত কি না?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিশ্বাস প্রেমই প্রেমের উৎপাদক। পৃথিবী মধ্য বয়স্ক এবং ততোধিক বয়স্ক নারীতে পূর্ণ যাহারা অবিবাহিত থাকিয়া বিরক্তময় জীবন যাপন করিতেছে, যেহেতু তাহারা উপযুক্ত সময়ে তাহাদের বাঞ্ছিত পুরুষকে লজ্জাশীলতা বা অভিমান বা গর্ব্ব বা ক্রীড়া বশত মনের ভাব বলে নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। নারীর পক্ষে পুরুষ বিশেষের নিকটে প্রেম ব্যক্ত করা বাতুলতা হইতে পারে কিন্তু এমন পুরুষও আছে যাহার নিকটে প্রেম ব্যক্ত করিলে বুদ্ধিমত্তা হয়। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের এমন পুরুষও আছে যাহাকে নারী যদি বলে যে "তোমাকে আমি ভালবাসি অথবা ভালবাসিতে পারিতাম" তাহা হইলেই দুইটী জীবনের সুখ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর এবং নিজ হৃদয়ের উপদেশ পালন করাই নারীর যে উচিত।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। নারীর হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই প্রেম জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত নহে। নারীর পক্ষে প্রগাঢ় প্রেমের ভান করাই নিরাপদ।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত প্রকারে যেমন নিজের প্রেম প্রদর্শন করিয়া থাকে কেবল সেই প্রকারেই করিবেই করিবে। নারীর পক্ষে পুরুষকে বলা "আমি তোমাকে ভালবাসি" ইহা জঘন্য। কেন তাহা আমি বলিতে পারি না।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর পুরুষ কেমন লোক তাহার উপর নির্ভর করে। পুরুষ যদি অতি নম্র ও লজ্জাশীল হয় এবং নারী যদি বুঝিতে পারে যে সেই পুরুষের মনে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে তাহা হইলে নারী তাহাকে নিজ হৃদয়টা একবারমাত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া চমকিত করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের যদি আত্মপ্রকাশ করিবার এবং পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতার অভাব না থাকে তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে কি আছে তাহা যেন পুরুষ নিজেই নারীর সাহায্য ব্যতীত আবিষ্কার করিতে পারে (এই জন্য) নারীর পক্ষে নির্ব্বাক হইয়া থাকাই উচিত। This is not early Victorian wisdom. It is Eve—early and late ever the same.

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর নারীর পক্ষে প্রেম একটা উদ্দেশ্য, আমার এই প্রথম বাক্য মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে যতটুকু বলিলে নীরবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে ততটুকু বলা উচিত। নির্ব্বোধ না হইলে পুরুষ যেমন নিজের কৃতকার্য্যের মূল্য সুলভ বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করে না, নারীও নির্ব্বোধ না হইলে নিজের প্রেমের গভীরতা সুলভ বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করে না।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু আমি অপ্রচলিত মতেরই পক্ষপাতী— আমার মতে নারীর পক্ষে প্রেম ব্যক্ত করাই উচিত। ইহার একটা কারণ এই যে এরূপ করিলে মনের একটা অসুখময় এবং শোচনীয় অবস্থার অবসান হয় যে অবস্থায় থাকিলে পুরুষ তাহাকে ভালবাসুক বা না বাসুক নারী সেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। যদি তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে বুঝিতে পারে যে সে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে এবং এরূপও যে প্রায় না ঘটে এমন নহে যে নারী মনোগত ভাব ব্যক্ত করে বলিয়া পুরুষের মনেও প্রেম সঞ্চারিত হয় যাহার ফলে সুখময় বিবাহ সংঘটিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটী ফ্রেঞ্চ প্রবচন অধ্যাহৃত করিতেছি। Il y a des mariages heuresex, il shy in a point delecieux. অর্থাৎ কোন কোন বিবাহ সুখময় হয়, কোন বিবাহই আনন্দময় হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নারী প্রেম ব্যক্ত করিলে পুরুষের নিকট হইতে অভীষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে নারীর পক্ষে প্রেম ব্যক্ত করা উচিত নহে কেন না তাহাতে নারী পুরুষের পক্ষে হীন হয়। পুরুষ তাহা হইলে সম্পূর্ণ অন্যায় করিয়া নারীকে চঞ্চলতা ও হঠকারিতার জন্য দোষ দিতে পারে। না, নারী সাবধান হইবে এবং প্রেম প্রদর্শন করিবে না এবং পুরুষ যতদিন প্রেম ব্যক্ত না করে ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া তুষ্টি অবলম্বন করিবে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। নারীর যদি প্রকৃত প্রেম জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহা গোপন করা অসম্ভব। সহস্র প্রকারে তাহা দেখা দিবে। পুরুষ নিতান্ত স্থূল বুদ্ধি হইলে উহা বুঝিতে পারিবে না কিন্তু যদি সেই সময়ে তাহার হৃদয় অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে উহা নারীর প্রতি তাহার প্রেমকে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক আকর্ষণ করিবে যেহেতু পৃথিবীতে পূর্ণ প্রেম অপেক্ষা বলবত্তর চুম্বক নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। একাধিক ব্যক্তির প্রতি কি একই সময়ে প্রেম সম্ভব?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহুবিবাহকারীরা আমাদিগকে ধর্ম্মত বলিয়াছেন দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্রিগাম ইয়ঙ্ (Brigham Young) এর নাম করা যাইতে পারে। আমার একটী লোকের কথা স্মরণ হইতেছে যিনি দুই রমণীকর্ত্তৃক অনুরাগী পতি বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তিনি সেই নারীদ্বয়কে তাঁহার সময়, অর্থ এবং অনুরাগ অপক্ষপাতে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকটীর মৃত্যুর পর প্রত্যেক পত্নীই অপর পত্নীর অস্তিত্ব জানিতে পারিলেন এবং প্রত্যেকেরই মনে স্বামী কিরূপ প্রেম সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। অসম্ভব—কেন না প্রেম একটী পূর্ণ বস্তু, যাহাতে দয়া আশ্রয়, গাঢ় অনুরাগ, ভক্তি ইত্যাদি আছে। কিন্তু আকর্ষণ—প্রবল আকর্ষণ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। এই আকর্ষণ প্রেমে পরিণতও হইতে পারে। তখন নূতন প্রেম পুরাতনকে দূর করিয়া দেয়।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। কিন্তু প্রথম প্রেমের মত নাহে। সে প্রেমে প্রবলতা থাকে না। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রতি প্রেমের সাধারণ অর্থ এই যে প্রত্যেকেই আংশিক ভাবে মাত্র প্রেম লাভ করে। প্রেমাস্পদ প্রকৃতিতে গুণ বিশেষ আছে বলিয়াই সেরূপ প্রেম পাইয়া থাকে কিন্তু প্রেমাস্পদ ব্যক্তি দোষেগুণে অখণ্ডভাবে পূজিত হয় না। কেহ কেহ আংশিক ভাবেই প্রেম প্রদর্শন করিতে সমর্থ—কেহ কেহ আংশিক প্রেম পাইবারই উপযুক্ত।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। না। এমনকি সমস্ত জীবনেও একাধিক ব্যক্তির প্রতি সমান প্রেম হয় না। আমি প্রেমের কথা বলিতেছি। মনের যে প্রবল বৃত্তি গোক্ষুর সর্পকে অনুপ্রাণিত করে তাহার কথা বলিতেছি না।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। হাঁ, সম্ভব। বিষয়টা বড় বিস্ময়জনক। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদিগের মনের এক দিক্ মাত্র আকৃষ্ট হয়। অন্য ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক্ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বড় বিপদের সময়ে যথা বিনাশক্রমণে যখন আমরা প্রেমাস্পদ দিগের মধ্যে একজন মাত্রকে রক্ষা করিতে পারি কিন্তু অন্যকে পারি না তখনই আমরা বুঝিতে পারি কাহাকে আমরা একান্ত চিত্তে চাহি।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। প্রেমের যদি ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা যায়—তাহা যদি সাহচর্য্য এবং অনুরাগের এবং প্রবল চিত্তাবেগ ও বিশ্বাসের সম্মিলন হয় তাহা হইলে আমার উত্তর না।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয় সম্ভব এবং বাস্তবিক ঘটিয়াও থাকে প্রায়শ। অধিক সংখ্যক লোকের মত আমার বিরোধী হইলেও আমার বিবেচনায় মনের এবং শরীরের এই আশ্চর্য্য অবস্থা পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যেই অধিক। কোন পুরুষ যদি প্রকৃতই কোন নারীর প্রেমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে যেন অন্য নারীর অস্তিত্বই জানিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ যে নিয়ম তাহা নারীর পক্ষে কখনই নহে, সেই জন্যই বোধ হয় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে বালিকারা শান্ত-সুখময় স্বাভাবিক বিবাহের কথা স্থির হইবার পর হঠাৎ সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আর এক পুরুষকে বিবাহ করে এবং সেরূপ করায় পুরুষের মনে যেরূপ দীর্ঘ পীড়াদায়ক ভাব হয় সে ভাব নারীর হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই না। এক জনের প্রতি অনুরাগই প্রকৃত প্রেম। সংসারে অন্য কেহ থাকুক বা না থাকুক তাহাতে আসে যায় না। প্লেটোনিক প্রেম প্রকৃত প্রেম নহে। পুরুষ বা নারীর মনে প্লেটোনিক প্রেম থাকিলে একাধিক অন্য লোকের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে কিন্তু প্রেমের মনঃকল্পিত উৎকর্ষ যাহা তাহা থাকিলে অনুরাগের একাধিক পাত্র থাকিতে পারে না।

নবম ব্যক্তির উত্তর। সম্পূর্ণ অসম্ভব, যদি প্রেম বলিলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন প্রেম বুঝায়—অর্থাৎ আত্মা বা জীবাত্মা বা হৃদয় অথবা অহম্ বা আমাদের উচ্চতর অংশকে আমরা যাহাই কেন বলি না তাহারই প্রেম এবং শারীরিক প্রেমের মিলন। ইন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ বা নারীর পক্ষে দাসত্ববন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের প্রতি গভীর অনুরাগও থাকিতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একটাকেও অতি কুতর্কের দ্বারাও প্রেম বলা যাইতে পারে না।

চতুর্থ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম সঞ্চার প্রায়ই হয় কি না?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। একজন বিখ্যাত সেনাপতি তাঁহার পত্নীকে প্রাতঃকালে দেখিলেন, সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার সহিত সুখে বাস করিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতি

ভক্তিযুক্ত ছিলেন। সাধারণ লোকের যাহা বিশ্বাস তাহা না হইয়া বরং এইরূপ প্রেমই অধিকতর সংঘটিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। কখনই নহে। কিন্তু কেহ হয়ত এত প্রবল প্রবণতা ও আকর্ষণ অনুভব করে যে নিকটে থাকিয়া সেই ভাবগুলিকে অবিলম্বে প্রজ্জ্বলিত করিতে অথবা দূরে পলায়ন করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে বলিয়া মনে করে। অনেকে স্বীকার করে কিন্তু অধিকাংশ লোকই স্বীকার করে না যে থ্যাকারে (Thackery) যাহাকে কবিত্বের ভাষায় অনুপস্থিতি চিকিৎসা (alibi treatment) বলেন সেই চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পলায়ন করে। এরূপ করিবার কারণ এই যে তাহারা বুঝিতে পারে যে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহার প্রকৃতিতে মহা সহানুভূতি অথবা সেই শ্রেণীর কোন ধর্ম্মভাব আছে অথবা বাইরণ (Byron) যেরূপ বলেন "আমরা যে বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলে অনির্ব্বচনীয়ভাবে আবদ্ধ" সেই শৃঙ্খলে আঘাত লাগিবে বলিয়া।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। প্রায়ই হয় না। কিন্তু হইয়াও থাকে। যখন হয় তখন তাহা প্রকৃত এবং স্থায়ী। হয়ত উহাতে যে বিস্ময় রস আছে তাহাতে এমন সৌরভ থাকে যাহা চিরস্থায়ী। নরনারী উভয়েরই অপ্রতিকার্য্য-ভাবে বিস্ময়রসাস্বাদনের লোভ বড় লোভ—তাহার স্মৃতিও কোমল স্মৃতি।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনায় আত্মা স্বাভাবিক সংস্কারবশে প্রথম দৃষ্টিতে তাহার উপযুক্ত সহচর চিনিতে পারে, যদিও এই তথ্যটা অবিলম্বে হৃদয়ে মুদ্রিত হয় না। আমার আরও বক্তব্য এই যে যে প্রেমের প্রতি যুবা পুরুষের মতির গতি হয় তাহার প্রথম সঞ্চার প্রথম দৃষ্টিতে হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম—বিশেষ নিয়ম নহে।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিশ্বাস প্রায় এরূপ ঘটে না। প্রথম দৃষ্টিতে হৃদয় হঠাৎ চকিত হয়। এই ভাব প্রেমে পরিণত হইতে পারে বা ইহার পরিণাম বৈরাগ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টির প্রেম অল্পে অল্পে বর্দ্ধনশীল অন্য কোনরূপ প্রেম অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হওয়া উচিত; যেহেতু ইহাতে প্রমাণিত হয় যে দুইটী আত্মা পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া এক সঙ্গে উড্ডীন হইয়াছে।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। সকলেই বলে অনেক সময়ে প্রেম প্রথম দৃষ্টিতে জন্মে। যেমন সঙ্গীতের কোন কোন তানলয় বায়ুতে কম্পন উৎপাদন করিয়া সেই কম্পন দ্বারা কাচনির্ম্মিত সামগ্রী এক নিমেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তেমনি কাহারও স্বভাব এরূপ যে প্রথম সংস্পর্শে আসিবামাত্র মনের অগোচরে অনুরূপ গুণ চিনিতে পারে যাহা প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে। বিপরীতানুভূতিরও এই নিয়ম।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। বিস্ময় রসাশ্রিত প্রেম সর্ব্বদাই প্রথম দৃষ্টিতেই সংঘটিত হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষাতেই এই ঘটনার একটা নাম আছে। ...কোন কোন পুরুষ ও নারী—নারী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরুষ —এরূপ প্রকৃতির যে তাহারা এরূপ উত্তেজক ও মনোরম অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া থাকে। তাহারা কুমার হইয়াই জন্মিয়াছে—কুমার থাকাই তাহাদের উচিত।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। এক প্রকার কীটাণু আছে যাহা যুবকযুবতীর উপর কার্য্য করে এবং যাহার নাম বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত রাখেন নাই। ইহা প্রেম কীট। এই কীট প্রধানত নাচ ঘরে, রঙ্গালয়ে এবং সমুদ্র তীরে প্রাদুর্ভূত দেখা যায়। ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথম দৃষ্টিতে লোকে প্রেমে পড়ে। ইহা চঞ্চল এবং যুবা বয়স অপেক্ষা অল্প বয়স্ক লোকেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী প্রেম সংক্রমণের পূর্ব্বলক্ষণ।

নবম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম একটী চারা গাছ নহে। যাহা বাড়ে এবং পুষ্ট হয়। ইহা একটী ভৌতিক শক্তি যাহা সৃষ্ট হয়।

পঞ্চম প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। প্রেমের বিবাহই কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়। পূর্ব্বরাগহীন বিবাহকে যৌথ ব্যবসায়ের অংশ গ্রহণ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, যদি মানুষের দৈহিক উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রকৃত লক্ষ্য হয়। কেবল সাংসারিক লাভ ও সুখের সংবর্দ্ধন অপেক্ষা এবং আত্মার বিস্ফোটক অপেক্ষা দান—এমন কি অপাত্রে দান এবং দুঃখ ভোগ করিয়া মহত্ব লাভ করা শত সহস্র গুণে ভাল।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। প্রেমের বিবাহ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সেই প্রেম যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে বিবাহ মহিমান্বিত হয়। স্থায়ী না হইলে পতি ও পত্নীর মধ্যে সেই সুখের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির বন্ধন থাকিবে। প্রত্যেক মানবেরই পূর্ণ প্রেমের দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। যদিও সেই লক্ষ্যের সংসাধন অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী হইয়া পড়ে তথাপি যে বিবাহ সেই উৎকর্ষ কল্পনাদ্বারা অনুপ্রাণিত নহে তাহা চুক্তি মাত্র, যাহা পুরুষও নারীকে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করে।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। প্রেম ভিন্ন এমন কি সেই প্রেম ক্ষণস্থায়ী হইলেও তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রেরণা বশে যদি কোন পুরুষ নারীকে অথবা নারী পুরুষকে বিবাহ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বাভাবিক সংস্কারেই নীতির প্রস্রবণের মূল নিহিত। যে পুরুষ বা নারীর স্বাভাবিক সংস্কার ভাল ভূমি নহে তাহার নীতি ভাল ফল প্রসব করিতে পারে না, তাহা হইলে বিবাহকারীকে সেই ফলের অধিকাংশ ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আরও কথা আছে—বিবাহ প্রসঙ্গে আরও কথা থাকে—ক্ষণভঙ্গুর প্রেমে যে সকল বিবাহ হয় সেগুলির ফল বড়ই বিষাক্ত। অতএব প্রেমের বিবাহই অসীম রূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনায় প্রেমের বিবাহই বিবাহ নামের যোগ্য। অল্পে তুষ্ট প্রকৃতি হয়ত প্রেম ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যের বিবাহে সুখী হইতে পারে। তাহারা সেই শ্রেণীর লোক যাহারা জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্টের নিম্ন পদস্থ বস্তুতেই সন্তুষ্ট। দুর্য্যোগের সময়ের দৃশ্য এবং সমুজ্জল সূর্য্যালোকে দৃষ্ট দৃশ্যের মধ্যে যে প্রভেদ সুখ এবং প্রকৃত সুখের মধ্যে সেই প্রভেদ।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। রাজ শাসনের পক্ষে প্রেম শূন্য বিবাহ ভাল হইতে পারে যেহেতু যে নারী স্বামীকে ভালবাসেনা সেও নিশ্চয়ই তাহার সন্তানদিগকে ভালবাসিবে এবং যত্ন করিয়া মানুষ করিবে। কিন্তু ইহাতে বিবাহকে আইনের চুক্তি রূপ অবনীত করা হয় যাহাতে উভয় পক্ষই রাজশাসনের ভৃত্য মাত্র। প্রশ্নের যে এই অভিপ্রায় তাহা বোধ হয় না। পতিপত্নীর পক্ষে প্রেমের বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন রূপ বিবাহই সন্তোষজনক সম্বন্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার আইনের সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে। পবিত্রতার ঠিক নিম্নেই যদি পরিচ্ছন্নতার স্থান হয়। তাহা হইলে দাম্পত্য সুখের অভাব এবং সংসারের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের অর্দ্ধেক একই পল্লীবাসী। (শেষ বাক্যটীর মূল এই—**It cleanliness is next to godliness, unhappiness in marriage is surely in the same street with half the evils of the world,**)

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। এই প্রশ্নে একটা অতি বড় প্রশ্ন উঠে। সে প্রশ্ন এই যে,—প্রেম বস্তুটা কি? প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠাপিত বিবাহই যে প্রত্যেক বিবাহেচ্ছু মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানসিক কল্পনা সে বিষয়ে প্রকৃতিস্থ কোন পুরুষ বা নারী সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু "প্রেমে পড়া"টা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথম অনুষ্ঠান তাহাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়। "তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া পরে অবকাশ হইলে অনুতাপ করিবে," এই যে পুরাতন ভয়ানক প্রবচন ইহা সেই সকল যুবকযুবতীর প্রতি প্রযোজ্য যাহারা পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পরস্পরকে না চিনিয়া, পরস্পরের স্বভাব গুণ ও দোষ না জানিয়া গির্জ্জার বা রেজিষ্টারি আফিসে যায়। আজকাল যে মধ্য বয়সে বিবাহের সংখ্যা বাড়িতেছে সেই বিবাহই মোটের উপরে অতি সুখের বিবাহ। ইহার কারণ এই যে তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া হইয়া থাকে।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। কি এই মহার্ঘ ও দুর্ভিক্ষের দিনে কুটীরের প্রেমে ও এত ব্যয় হয় যে দশবৎসর পূর্ব্বে অট্টালিকাতেও তত হইত না। কিন্তু টাকার জন্য প্রেম অপেক্ষা মোটে প্রেম না হওয়াই ভাল। আমার অভিজ্ঞতায় সে সকল বিবাহে টাকার বন্দোবস্ত আছে তাহার কোনটীও সুখের হয় না।

নবম ব্যক্তির উত্তর। তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রথম বিবেচনার বিষয় এই যে মনস্বিনী নারীর পক্ষে প্রেমহীন বিবাহের মত বীভৎস বস্তু আর কিছুই নাই। নারী যদি মনস্বিনী না হয়—সে যদি পুত্তলিকা মাত্র, মৃৎপিণ্ড, চেতনাহীন চিন্তাশূন্য জীব হয়, তাহা হইলে সে কেবল একটা সাংসারিক এবং সামাজিক সম্ভ্রম মাত্র লাভ করে—সে হয়ত কোন পুরুষকে সুখী করিতে পারিবে না। দৈহিক সুখের জন্য কৃতজ্ঞতা অথবা নারীর নিজ পরিজনের প্রতি উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, জীবনহীন ক্ষীণ ভাব মাত্র যাহা প্রথম প্রকৃত প্রলোভনের স্পর্শে শুকাইয়া যাইবে। নারী দিগের দৃষ্টিতে অবশ্য এইরূপ প্রতীয়মান হয়। প্রেম অতি অগভীর হইলে তাহা এমনই দুর্ব্বল জাত হয় যে তাহার পক্ষে কোন নারীকে সুখী করিবার সম্ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। সৌন্দর্য্যহীনা নারীর পক্ষে সুন্দরী নারীর মত প্রেমাস্পদ হওয়া কি সম্ভব?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। যে নারী পুরুষের প্রেমাস্পদ হয় সে নারী কি সেই পুরুষের কাছে সৌন্দর্য্যহীনা? কত কুৎসিত নারী পুরুষের মনে ভক্তিভাব উৎপাদন করিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। "সৌন্দর্য্য থাকে দর্শকের চক্ষুতে।" আমার এক রসিক বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন অথবা অন্যের কথা অধ্যাহৃত করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যহীনা নারী দেখেন নাই। এ কথাটা হয়ত অত্যুক্তি। কিন্তু আমার কথা এই যে আমি এক প্রকার মাত্র সৌন্দর্য্যহীন নারী জানি। যাহারা হাবভাব বর্জ্জিত, কোমলতা বর্জ্জিত, তাহারাই সৌন্দর্য্যহীন। আমরা কি প্রত্যেকেই ভক্তিভাজন সৌন্দর্য্যহীন নারী দেখি নাই?

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। যৌন আকর্ষণ একটা গূঢ় রহস্য। কেহ এরূপে আকৃষ্ট হইলে বুঝিতে পারা যায়। সুশ্রী নারী কল্পনা-শূন্য হইতে পারে। সৌন্দর্য্যহীন নারীর তাহা বহুপরিমাণে থাকিতে পারে। সেই গূঢ় বস্তুটী নারীকে পুরুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা যে পরিমাণে দেয় সৌন্দর্য্য সে পরিমাণে দেয় না। সৌন্দর্য্যহীন নারীর সেই গূঢ় বস্তুটী থাকিলে তাহার প্রেমিকেরা বুঝিতে পারে না যে তাহার সৌন্দর্য্য

নাই। সেও তাহাদিগকে তাহা জানিতে দেয় না। অন্য নারী ব্যতীত বোধহয় তাহা কেহই জানিতে পারে না।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। প্রকৃত প্রেমের সহিত মুখের গঠন এবং বর্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। আমার বোধহয় ব্রণযুক্ত চিবুকহীন নারীকে আমি ভালবাসিতে পারি না। ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী ডেনিয়েল ল্যাম্বার্ট (Daniel lambeat) কেও (অর্থাৎ ডেনিয়েল্ ল্যাম্বার্ট্ যেরূপ স্বভাবের পুরুষ ছিলেন সেইরূপ স্বভাবের নারীকেও) আমি ভাল বাসিতে পারি না। কিন্তু এই তথ্যের সহিত, পুরুষ যে কেবল নারীকেই ভালবাসে কিন্তু তাহার রূপ বা আকৃতি ভালবাসে না, এই মহৎ তথ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণত পৃথিবীতে পুরুষ মনুষ্য অতি কুৎসিত জীব, তথাপি যেমন করিয়াই হউক নারীরা পুরুষকে ভালবাসে। মুখের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহাকে, মনই বল আর আত্মাই বল বা অন্য কিছু বল তাহা পুরুষকে ধরিয়া করায়ত্ত করিতে পারে। ইহা না থাকিলে অতি সুন্দর মুখও ক্লান্তিকর মুখস মাত্র, এবং বোধহয় যেন অতি সুন্দর মুখের পশ্চাতে সেই বস্তুটার অল্লাধিক্যের অভাব থাকাই সাধারণ নিয়ম। মোটের উপরে আমার বিবেচনায় সুন্দরী নারীর মত সৌন্দর্য্যহীনা নারীও প্রেমাস্পদ হইতে পারে যতক্ষণ তাহার মন সৌন্দর্য্য হীন না হয়।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। কেবল যদি সে দেবতা হয় বা অতি প্রতিভাশালিনী হয়। কিন্তু তথাপি ইহা একটা প্রহেলিকা মাত্র। যে পুরুষ তাহাকে ভালবাসে সে হয়ত তাহাকে সুন্দরীই দেখে।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। আকৃতির সহিত প্রেমের কোন সম্বন্ধ নাই। চরিত্রই প্রকৃত প্রেমকে পরিচালিত করে। সৌন্দর্য্যহীনা নারীর যদি চরিত্র-সৌন্দর্য্য থাকে তাহা হইলে যে পুরুষ তাহার চরিত্র ভালবাসে ও জানে তাহার চক্ষে সে সুশ্রী।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। কদাকারেরও এমন প্রকারভেদ আছে যাহা নীরস সৌন্দর্য্য অপেক্ষা পুরুষের চিত্তাকর্ষক। যে সুন্দরী নারীর মুখে তাহার প্রধান বা একমাত্র আকর্ষণ তাহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যহীনা নারী অধিক দিন পতিপ্রাণা হইয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বোধ হয় জীবনীশক্তির আকর্ষণই সর্ব্বপ্রধান। জীবনীশক্তিযুক্তা নারীর প্রশংসাকারী এবং প্রেমের অভাব হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। আমাদের প্রধান নায়িকাগণ এবং সর্ব্বপ্রধান নায়িকাগণ সৌন্দর্য্যহীন ছিলেন। মোটের উপরে ধীর চিন্তাশীল পুরুষ উত্তমরূপে জানে যে চর্ম্মও যত গভীর সৌন্দর্য্যও তত গভীর। সে ইহাও জানে যে, যে ফুল অতি সুশ্রী তাহাই অতি মারাত্মক। যে সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে। তাহারা নারীর সৌন্দর্য্য গ্রাহ্য করে না। নারীর সুমতি, শান্তভাব, কথার মিষ্টতা এবং পবিত্রতা অভিপ্রেত স্বামীকে আকর্ষণ করে। যাহারা সুন্দর মুখ অন্বেষণ করে তাহারা অনেক সময় তাহার নিম্নে লুক্কায়িত দুষ্টভাব দেখিতে পায়। আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে সুশ্রী নারীমাত্রই দুষ্ট, কিন্তু প্রায় অতিমাত্রায় সৌন্দর্য্য অনেক সময়ে গর্ব্ব, প্রমোদাসক্তি, প্রশংসালিপ্সা উদ্দীপন করিয়া থাকে যাহা অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষকে ক্লান্ত করে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। বারে না হইলেও পরিমাণে হয় যে হেতু নারীর পক্ষে প্রথমে পুরুষের উচ্চতর অংশের (higher self) যাহাকে প্রাণ, আত্মা, অহম্ যাহাই বল না কেন তাহার প্রেমাস্পদ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। তখন যদি সে পুরুষের ইন্দ্রিয়ও অধিকার করিয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতি সেই পুরুষের প্রেম সুন্দরী নারীর অনায়াসলব্ধ প্রেম অপেক্ষাও বলবত্তর এবং অধিক স্থায়ী হইবে। প্রথমে ত যে পুরুষ নারীর সৌন্দর্য্যের নিকটে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তাহা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সুন্দরতর অধিক আধ্যাত্মিক ভাব

সম্পন্ন মনুষ্য হইয়া পড়িবে এবং অধিকতর শ্রম-পরায়ণ হইবে। এস্থলেও যেন আমরা প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার কথা স্মরণ করি—প্রেম মহা-মহিম মনোভাব, উহা যে কেবল দৈহিক ভাব নহে ইহা যেন মনে করি।

সপ্তম প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। কোন প্রেম কি চিরস্থায়ী হইতে পারে?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুসাধ্য নহে। সসীম মানব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না আমরা যেন আশা করি যে প্রকৃত অমর প্রেম চিরকালের জন্য প্রস্ফুটিত হয়। প্রেতাত্মাবাদীদের মতে ইহা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। যাহা সাধারণত ভ্রমবশত "চিরস্থায়ী প্রেম" নামে অভিহিত হয় তাহা দীর্ঘকালের অভ্যাস মাত্র; কিন্তু যদি পুরুষ ও নারীর একজন অন্য অপেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্যে এমন অপরিমিত ভাবে প্রধান হয় যে নিজেকে আশ্রয়দাতা ও স্নেহশীল বলিয়া মনে করে এবং নিজের প্রতি দুর্ব্বলের মনে পূজার ভাব উদ্রিক্ত করিতে পারে, অথবা যদি দুই জনই উচ্চাবচ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সমান বা কিছু ছোট বড় হয় যাহাতে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, অথবা প্রায় যেরূপ ঘটিয়া থাকে উভয়েই যদি বৃথা গর্ব্বী এবং এমন নির্ব্বোধ হয় যে পরস্পরকে লইয়া তাহাদের সঙ্কীর্ণ অবশিষ্ট জীবন কালের জন্য সুখে উন্মত্ত হয় এবং পরস্পরের কার্য্যে পরম সন্তোষ লাভ করে তাহা হইলে চিরস্থায়ী প্রেম হইতেও পারে।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। কিন্তু উভয় পক্ষে প্রায় ইহা ঘটে না। নারী বুদ্ধিমতী হইলে সে স্বামীর নিকট হইতে চিরপ্রেম পাইয়া থাকে কিন্তু স্বামী পত্নীর নিকট হইতে তত পায় না। দুই জনের স্থায়ী ব্যবহারিক প্রেম পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। আমি বোধ করি যে প্রকৃত প্রেম ই একমাত্র বস্তু যাহা চিরস্থায়ী তৃপ্তি কামনা নষ্ট করে, মৃত্যু, শত্রুতা নষ্ট করে, বার্দ্ধক্য, উচ্চাভিলাষকে বধ করে এবং সময় আমাদের সমস্ত আদরের বস্তুকেই গ্রহণ করে ও ভাঙ্গিয়া দেয় কিন্তু প্রেমকে কিছু স্পর্শ করে না। মানুষ প্রেমকে ছাড়াইয়া উঠে না কিন্তু প্রেম মানুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়—যত বৎসর অতিবাহিত হইতে থাকে উহা তত বল দান করে, নাশকে ক্ষয় করে এবং নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর ইহা প্রস্ফুটিত হয়।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রেমমাত্রই চিরস্থায়ী হয়। এরূপ না হইয়া পারে না। ইহা চির প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা এবং ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। প্রেমাস্পদের মৃত্যু হইলে যদি অপর জীবিত ব্যক্তি আর একজনকে ভালবাসে তাহা হইলেও প্রথম প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় প্রেমাস্পদ সেই মৃত প্রথমের স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই উত্তর হইতে প্রশ্নটা বিশ্লিষ্ট করিলে এই দাঁড়ায়—প্রেম কতবার প্রকৃত প্রেম হইয়া থাকে?

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। প্রশ্নটা কিছু অস্পষ্ট। যদি ইহার এই অভিপ্রায় হয় যে প্রেম কি প্রেমিকদিগের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী হয়? তাহা হইলে ইহার উত্তরে হাঁ বলিতেই হইবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চিরজীবন ভালবাসিতে পারে—বার্দ্ধক্যে তাহাদের প্রেম আর দেহগত থাকে না। কিন্তু শিশুদের প্রেমের মত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও তাহাতে ভাব-প্রবণতা থাকে। "চির" শব্দে যদি অনন্তকাল বুঝায় তাহা হইলে উত্তরদাতা অনভিজ্ঞতা হেতু তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম যে কেবল স্থায়ী হয় তাহা নহে কিন্তু উহার গাঢ়তা গভীরতা এবং কোমলতা জীবনের সকল অবস্থাতেই বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে এই দুর্লভ সুন্দর অবস্থা থাকে যে স্থলে দুইজনের একজনকে অহংজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্যের সকল কার্য্যে অনুমোদন করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া অন্যে যাহা করে তাহাই ভাল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কোন পুরুষ বা নারী দূর দেশে পতিত গামছাখানাকে ভালবাসিতে পারে না কিন্তু সেই গামছাখানাও কখন কখন প্রেমের সমকক্ষ দয়া উদ্রেক করিয়া থাকে।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। আমার এক পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী ছিলেন যাঁহারা সাতান্ন বৎসর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা প্রেমিক দ্বয়ের মত বহ্নি সেবন করিতে বসিতেন; স্বামী পত্নীর হাত তুলিয়া লইয়া তাহাতে সস্নেহে চাপড়াইতেন। তাঁহারা বলিতেন যে দ্বার বন্ধ করিতে হইবে কি খুলিয়া রাখিতে হইবে এইরূপ সামান্য বিষয় ভিন্ন তাঁহাদের কখনও মতভেদ হয় না। প্রতি রাত্রিতেই সেই সাতাসী বৎসর বয়স্ক স্বামী পত্নীর জীর্ণ হাত তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিজের দিকে প্রেমিকের মত চুম্বন করিতেন। একবৎসরের মধ্যে উভয়ের মৃত্যু হইয়াছিল—তাঁহাদের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরস্পরকে সর্ব্বপ্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন। আমি নিজে ইহা দেখিয়াছি এবং এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হইবে। কিছুই তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। কিছুই তাহাকে ক্ষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু সময় যখন প্রেমাস্পদের মুখে অক্ষয় বলী অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহার পরও প্রেম থাকিবে। পূর্ণ প্রেমের অর্থ পূর্ণ বিশ্বস্ততা, পূর্ণ বিশ্বাস মন ও শরীরের পূর্ণ সাহচর্য্য, লাভ ক্ষতি, কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ঐকমত্য। দুঃখ, কষ্ট, বিরক্তি, চিত্র প্রলোভন প্রভৃতি নরকের সমস্ত শক্তিও প্রেমের শক্তিকে পরাভব করিতে পারে না।

বহু লোকে ভাবে যে এরূপ প্রেম নাই কিন্তু তাহা অবশ্যই আছে। কেবল বিদ্রুপকারী লোকের সমক্ষে তাহা আত্ম ঘোষণা করে না।

অনুবাদকের কথা।

যে নয়জন নবেল লেখক ও নবেল লেখিকা প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনটী বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে। সকলেই বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থলে প্রেম চিরস্থায়ী হয়। সকলেই বলিয়াছেন যে রূপহীনা নারীও প্রেমাস্পদ হইতে পারে। সকলেই বলিয়াছেন যে যে বিবাহে পূর্ব্বরাগ আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদের বাঙ্গালীর বিবাহে পূর্ব্বরাগ মোটেই নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর ভাগ্যে উৎকৃষ্ট বিবাহ নাই।

নারীর প্রেম অধিক না পুরুষের প্রেম অধিক? এই প্রশ্নের উত্তরে সাতজন বলিয়াছেন যে নারীর প্রেমই অধিক। দুই জনের মতে পুরুষের প্রেম অধিক। আমাদের দেশের কবিদের মত জানিতে ইচ্ছা হয়।

পাঁচ জন বলিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে এক জনের অধিক লোককে ভালবাসিতে পারে না। চারিজন বলিয়াছেন পারে। আমাদের দেশের কবিদের মত কি?

প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম সঞ্চার হয় কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সাতজন হাঁ এবং দুই জন না বলিয়াছেন। এশিয়ার কবিগণ বোধ হয় সকলেই হাঁ বলিয়া উত্তর দিতেন। এশিয়ার সভ্য সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর

পরস্পরের সান্নিধ্য প্রায়ই ঘটে না। সুতরাং সেরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইলে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া যায়। সংস্কৃত কবিরা এই প্রথম দৃষ্টি সঞ্জাত প্রেমকে "তারা-মৈত্রক" "চক্ষু-রাগ" প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

নারীর পক্ষে প্রথমে প্রেম ব্যক্ত করা উচিত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সাত জন হাঁ এবং দুই জন না বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কাব্যে এরূপ পড়িয়াছি কিনা মনে হয় না। যে নারী প্রথমে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে পুরুষেরাই প্রথমে বিবাহের প্রস্তাব করে। আমাদের দেশের কবিগণের রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের নায়িকারাই প্রথমে মনোভাব ব্যক্ত করে। শিবের জন্য পার্ব্বতী তপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রথমে নিজেই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। দেবযানী প্রথমে কচের নিকটে প্রার্থিনী হইলেন। তথা হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবার পর যযাতির প্রেমার্থিনী হইলেন। যযাতি বেচারার অপরাধ এইমাত্র ছিল যে তিনি মুমূর্ষু দেবযানীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে তুলিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠাও প্রথমে যযাতির নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন। দময়ন্তী হংসদূতমুখে নলকে মনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখিবামাত্র ধৈর্য্য হারাইলেন এবং তাঁহাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। সাবিত্রীও প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া সত্যবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ জ্ঞাপন করিলেন। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে স্বয়ংবরা হইবার সময়ে নারীমাত্রই পুরুষের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় মনের অভিপ্রায় জানাইত। কিন্তু আমি তাহা বলি না। আমার মতে নিমন্ত্রিত বা রবাহুত যত পুরুষ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইত তাহাদের তথায় উপস্থিতিই তাহাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিত। তাহার পর, কন্যার পক্ষে মাল্যদান প্রথম মনোভাব প্রকাশ নহে। বঙ্গীয় তরুণীরা যুবকদিগের সান্নিধ্যের সুযোগ পাইলে কি করিতেন বলা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরাই তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া তাঁহাদের জন্য প্রথম উদ্যোগী হইয়া বর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

মানস-সরোবর।

কেন ডাকিয়াছি তাই চাহ জানিবার?
চাই না কিছুই প্রিয়া, শুধু ক্ষণতরে
দাঁড়াও সম্মুখে; মোর নয়নের 'পরে
পড়ুক কনক-রেখা কিরণ তোমার।

অনন্ত বাসনা ভরা অশান্ত হৃদয়
মরে' যাক্, গলে' যাক্ তপ্ত তীব্র লাজে!
অমৃত সরসী এক মুহূর্ত্তের মাঝে
করুক্ সৃজন—নিস্তরঙ্গ শান্তিময়,

প্রতিবিম্ব সেই স্নিগ্ধ জ্যোতি নিরমল ;
দেখিতে দেখিতে সেই মানস-সরসে
কনক-কমল এক বিকাশ হরষে
উঠুক্ ফুটিয়া—মূর্ত্ত প্রেম-শতদল !

বিশ্বের সুষমা-রূপে আমি তুমি প্রিয়া,
তারি মাঝে রাখ দুটী চরণ-কমল,
দাঁড়াও মহিম-ময়ী মূর্ত্তি অচপল,
অনন্ত জীবন মাঝে দাও ডুবাইয়া।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

পাগল।

—:*:—

লোকটা গাঁয়ের বাইরে একটা ভাঙা মন্দিরের মধ্যে পড়ে থাক্‌ত। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানা ছেঁড়া কাল রঙের কম্বল, একখানা কাঁদা ভাঙা পাথরের রেকাব, একটা মাটির গেলাস আর একটা পুঁটলী। সে যে কতদিন আগে ও-গাঁয়ে এসেছিল তা কেউ ঠিক বলতে পারে না ; চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছোকরারা বল্‌ত তারা ছেলে বেলা থেকেই—তাকে ঐ রকম দেখে আসছে। তার নাম কেউ জান্‌ত না ; লোকে তাকে 'পাগল' বলেই ডাকত। পুঁটুলীটি সকল সময়েই পাগলের কাছে থাকত ; যখন বেরুত সেটা তার পিঠে ঝুল্‌ত, আর যখন ঘুমাত তখন সেটাকে প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে পাগল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত "পাগল তোমার পুঁটলীতে কি আছে ?" পাগল পুঁটুলীটাকে কোলের উপর রেখে অনিমেষ নয়নে দেখ্‌ত, আর দু'চোখ দিয়ে তার ঝর্ ঝর্ করে জল পড়্‌ত, শেষটা হঠাৎ হো হো করে হেসে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্‌ত "আছে আছে জিনিষ আছে ;" কেউ যদি তার পুঁটুলী কেড়ে নিতে যেত পাগল তাকে ছুটে মার্‌তে আস্‌ত। তার বুলি ছিল "আচ্ছা গেল কোথায় ?" সে আপনার মনে কত গান গাইত, কত কবিতা আওরাত, কত কাঁদ্‌ত কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বল্‌ত "আচ্ছা, গেল কোথায় ?"

তখন রোদ পড়ে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেল্‌ছিল। "Pass here রমেশ" "Off side" "Foul there" এই রকম নানান রকমের কণ্ঠস্বর ; ফুটবলের "চপ্ চপ্" শব্দ ; বাঁশীর "ফুর্‌র্ ফুর্‌র্" সবগুলির একসঙ্গে মিলে সেখানে একটা পবিত্র আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এমন সময় বজ্র-গম্ভীর স্বরে কে বলে উঠ্‌ল—"আজ সাতটার সময় পাঁচখান জাহাজ ছাড়্‌বে, কে বিলেত যাবে যাও ; কার গায় বেশী জোর ছিল ?—দ্রোণাচার্য্যের গায় ?—না দময়ন্তীর গায় ?" ছেলের দলে মহা আনন্দধ্বনি হ'ল ; সকলেই সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল "ওরে পাগল আস্‌ছে রে !" তার পরেই পুরা দমে আবার খেলা চল্‌তে লাগ্‌ল। এবার

খুব নিকটে শব্দ হল—“আচ্ছা গেল কোথায় ?” “ওরে বাবারে” বলে নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে ছেলেরা পালাতে লাগ্‌ল ; কেউ পিছনে এসে তার গায়ে ধুলো দিতে লাগ্‌ল ; কেউ বলতে লাগ্‌ল “পাগল, একে ধরে নিয়ে যাও ;” কেউ বললে “পাগল, ফুটবল খেল্‌বি ?” “হা হা সব পালায় কেন ! সব পালায় কেন !” বল্‌তে বল্‌তে পাগল মাঠের মধ্যে এসে জোর করে ফুটবলে একটা “কিক্‌” করলে। তারপর থম্‌কে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এধার ওধার তাকিয়ে “আচ্ছা গেল কোথায়” বল্‌তে বলতে আবার চলল। ছেলের দল যখন পিছন থেকে তাকে বড়ই বিরক্ত করছিল তখন কেবল পাগল এক একবার পিছন ফিরে বল্‌ছিল “আচ্ছা গেল কোথায় ?”

বোশেখের রাত্তির। তখনও পাড়া একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েনি। চারি ধারে চাঁদের আলো ফট্‌ ফট্‌ করছে ; দূর থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠ্‌ছে ; চাঁদের আলোয় বিহ্বল হয়ে গিয়ে রাত জাগা এক পাখী যেন কিসের খোঁজে ‘পিউ’ ‘পিউ’ করে চারি ধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক গরম, ঘর বাড়ীর জানালা প্রায় খোলা ; কেউ ক্রমাগত হাতপাখা নাড়ছে ; কেহ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্‌ছে ‘মা তারা’ ; কেউ বল্‌ছে ‘উঃ কি ভীষণ গরম ! কোথাও ছেলে ‘মা জল খাব’ বলে কান্না সুরু করে দিয়েছে : মা ঘুমের ঘোরে বল্‌ছে ‘এই যে দি’ কিন্তু এতই ঘুম যে দেওয়া আর হয়ে উঠ্‌ছে না ; কোন বাড়ীতে ছোট্ট ছেলে ঘুম থেকে উঠে কাঁদ্‌ছে আর কিছুতেই শোনে না ; তার বাবা তাড়া দিয়ে বল্‌ছে ‘মার খাবি, ঘুমো !’ এমনি সময়টায় মুখুয্যেদের বাড়ীর কাছাকাছি গম্ভীরস্বরে আওয়াজ হ’ল “আচ্ছা গেল কোথায় ?” বৈকুণ্ঠ বাবুর তখনও ঘুম আসে নি, তিনি খাটের ওপর অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে তাকিয়ায় ঠেস্‌ দিয়ে ‘ভুড়ুক’ ‘ভুড়ুক’ করে থেমে থেমে গুড়্‌গুড়ীর নল্‌টী টান্‌ছেন ; গিন্নী মেঝেতে এক ধারে তাঁর চার পাঁচ বছরের ছোট্ট নাতি নীহারকে নিয়ে শুয়েছিলেন ; নীহাররঞ্জন ঠাকুরমার ঘাড়ের ওপর একখানি কচি পা তুলে দিয়ে, বীরের মত ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুমা মুগ্ধ হয়ে তাই দেখ্‌ছিলেন আর এক একবার ঢুল্‌ছিলেন। অন্য দিন গিন্নী এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু আজ কর্ত্তার উপদ্রবে তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে। কর্ত্তা একটু আগেই ‘ঘরে বেড়াল ঢুকেছে’ বলে গিন্নীকে মহা ব্যস্ততার সহিত উঠিয়েছিলেন। গিন্নী তন্ন তন্ন করে খাটের তলা, সিন্দুকের তলা সব দেখেও বিড়ালের কোন অনুসন্ধান না পেয়ে কর্ত্তাকে বক্‌তে বক্‌তে আবার শুয়েছিলেন। কর্ত্তা তখনও বল্‌ছিলেন “হ্যাঁগা, বেড়াল পেলে ?” গিন্নী চুপ্‌টি করেছিলেন। “আচ্ছা গেল কোথায় ?” শব্দ শুনতেই বৈকুণ্ঠ বাবু বলে উঠলেন ‘এই বেটা পাগল দেখ্‌ছি আজ মন্দিরে যায় নি !” “ওগো শুনচ ? পাগল আর বেশী দিন বাঁচবে না !” গিন্নী এবার মহা ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লেন “তবেই আর কি এবার একেবারে আমার স্বশরীরে স্বর্গলাভ !” “আহা ফট্‌ করে চট কেন ?—চট কেন ? তাই বল্‌ছি।” গিন্নী আর উত্তর দিলেন না ; কাজেই এবার কর্ত্তা বাধ্য হয়ে নল্‌টা নামিয়ে রেখে “দুর্গা দুর্গা !” “আস্তিকস্য মুনির্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা জরৎকারু মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তুতে,” ‘গড়ুর’ ‘গড়ুর’ ইত্যাদি নানা রকমের মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে শুয়ে পড়্‌লেন।

(৪)

সকালে উঠেই সকলে দেখ্‌লে বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ীর কাছের তেঁতুল গাছটার তলায় পাগল বসে আছে। তার মুখে একটী কথাও নাই,—চোখ দুটো যেন তার ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে,—গাল দুটো বসে গিয়েছে ; সে এক ভীষণ চেহারা ! কিন্তু তার পুট্‌লী ঠিক্‌ আছে। অনেকে তাকে চাল দিতে গেল ; বৈকুণ্ঠবাবুর ঝি তাকে ভাত দিতে গেল ; তরফদার গিন্নী তাকে একখানা কাপড় দিতে গেলেন ; কিন্তু পাগল সেদিন কিছুই নিলে না, মাথা হেঁকে

জানিয়ে দিল, সে কিছুই চায় না। সমস্ত দিন পাগল সেখানে চুপ্ করে বসে থাক্‌ল। কত লোক এল, কত লোক গেল; ছেলেরা কেউ ঢিল্ ছুড়ে মার্‌ল, কেউ গায়ে ধুলো দিল; কিন্তু আজ পাগল একটুও নড়্‌ল না,—একটী কথাও বল্‌লে না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি—যখন সে রাস্তাটা প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এল পাগল একবার উঠে চারিধার বেশ ভাল করে দেখে নিল, তারপর আবার আগেকার মত চুপটী করে বস্‌ল। নীহার ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল; বাড়ীর দরজার মধ্যে ঢুকে সে ঝিকে বল্‌লে "আমি পাগল দেখ্‌ব, ঝি আমি পাগল দেখ্‌ব" ঝি অনেক ভয় দেখাল, বল্‌লে "পাগলে ধরে নিয়ে যায়;" কিন্তু নীহার কিছুতেই ছাড়্‌লে না; বল্‌লে "আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব ওর কাছে যাব না।" "আচ্ছা এই দরজার মধ্যে থেকে দেখ, যেন বাইরে যেও না" এই বলে ঝি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। যখন নীহার দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই সে আস্তে আস্তে পাগলের কাছে এসে তার পাঞ্জাবীর বুক পকেট থেকে একটী পয়সা বার করে ওকে বল্‌লে "পাগল তোমার খিদে পায় না? তোমাকে বুঝি কেউ পয়সা দেয় না? আমাকে আমার দাদামহাশয় রোজ একটা করে পয়সা দেয়। তুমি এই পয়সা নাও, খাবার খাবে।" পাগল এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল তারপর নীহারকে হঠাৎ কোলে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে ছুট্‌ল। পথ দিয়ে যারা আস্‌ছিল তারা দেখ্‌তে পেয়ে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। পাগল তাদের দিকে ফিরে ফিরে ইসারা করে চুপ্ করতে বলে আবার পিছনে তাকাতে তাকাতে ছুট্‌ল। মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর চাকর খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পাগলকে ধর্‌লে; বৈকুণ্ঠবাবু নিজে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় সেখানে এসে "মার্ শালাকে মার, শালা আমার নাতুকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল" বলে আস্ফালন করতে লাগ্‌লেন; যে যা পেলে তাই দিয়ে পাগলকে মারতে লাগ্‌ল। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল; সবাই যখন দেখ্‌লে পাগলের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে তখন তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। ঘণ্টা দুই তিন পরে পাগল উঠে বস্‌ল; তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে একটু একটু করে চল্‌তে লাগ্‌ল। সে রাস্তার ধারে যাদের বাড়ী ছিল তারা সে রাত্রে সবাই শুনতে পেয়েছিল রাস্তা দিয়ে কে বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে—"কেড়ে নিল গো কেড়ে নিল।"

(৫)

সাত আট দিন পরে বেলা দশটা এগারটার সময় বোসেদের বড় দীঘির ঘাটে মস্ত একটা গোলমাল বেধে গেল—"সে পাগলটা—পথের ধারে গাছের তলে মরে পড়ে আছে—." কেউ বললে "সে হতেই পারে না—." আমি তাকে কাল বিকেলে মন্দিরের মধ্যে বসে থাক্‌তে দেখেছি;—" কেউ বলতে লাগ্‌ল "বেশ হয়েছে বেটা মরেছে—বাঁচা গেছে, ছেলেপুলে সব রক্ষা পেলে;" কেউ বল্‌লে "বেটা বেতাল সিদ্ধ ছিল;" কেউ বল্‌লে "কালী সাধনা করতে গিয়ে লোকটা পাগল হয়ে গিয়েছিল;" কেউ বললে "আহা পাগলটা অনেক দিন এ গাঁয়ে ছিল, মরে গেল!" বৈকুণ্ঠ বাবু তখন একধারে জিউলির আঠা দিয়ে লেপেছে মাছ ছাড়ছিলেন; তিনি শেষ কালের লোকটার কথায় মহা চটে গিয়ে খট্ খট্ করে খড়ম পায় দিয়ে সেখানে এসে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন "কেহে তুমি বদ্ ছোক্‌রা? কলেজে পড়ে ইংরিজি শিখে তোমার এই বিদ্যে হচ্ছে! বেটা ছেলে চুরী করে নিয়ে যাচ্ছিল সে দিকে তোমার লক্ষ্য নেই আর বেটা চোর বদমায়েস্ মরেছে তাতে তোমার এত দুঃখু।" তার পরই আর এক বৃদ্ধের দিকে ফিরে বল্‌লেন "বুঝ্‌লে রামদয়াল খুড়ো এরেই বলে ঘোর কলি," রামদয়াল খুড়ো তখন বক্র দৃষ্টিতে হরিচরণ

পেয়াদার শাশুড়ী জল নিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখছিলেন; তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন "ঘোর কলি! ঘোর কলি!"

যখন এক দলের মধ্যে এই রকম ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা চল্‌ছিল আর একদল—যারা এখনও ঠিক বৃদ্ধ হয়নি—তারা বল্‌লে "চলহে পাগলটাকে একবার দেখে আসা যাক্।" দেখাদেখি বৃদ্ধদের মধ্যেও অনেকে চল্‌লেন। আমাদের বৈকুণ্ঠবাবুও তাদের মধ্যে ছিলেন।

পাগল গুটিশুটি ভাবে উপুড় হয়ে মরে পড়েছিল, হাত দুইখানা তার বুকের নীচে একটা পুটলী আঁকড়ে ধরে ছিল। বৃদ্ধদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌লেন "ওর বুকের তলায় ওটা কিহে?" একটী ছোকরা পাগলের বুকের তলা থেকে সেটা টেনে বার করতে যাচ্ছিল; বৈকুণ্ঠবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন "তুমি বড় Rash Boy দেখ্‌ছি, তুমি বিনোদ সরকারের ছেলে না? আচ্ছা দাঁড়াও তোমার বাপ্‌কে বলে দিচ্ছি।" ততক্ষণ হাড়ি, ডোম্, মুদ্দফরাশ সব জাতের লোকই সেখানে জমে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পাগলের বুকের তলা থেকে সেই উঁচুপানা জিনিষটা টেনে বার করলে। সকলেই দেখলে এটা পাগলের সেই পুঁট্‌লী, তখন মহা ব্যগ্রভাবে সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন "আচ্ছা খোল ত, ঐ পুঁট্‌লীটা খোল ত, ওর মধ্যে পাগলের কি ছিল দেখ্‌তেই হবে।" পুঁটলী খোলা হ'ল। বার হ'ল একজোড়া ছোট্ট চটি জুতো, একখানি ছোট্ট কালাপাড় ধুতি, একটী ছোট্ট কোট্, একখানি জীর্ণ বর্ণপরিচয়, একখানি ভাঙ্গা শ্লেট, কঞ্চির ঝাঁপে লাগান একটী শ্লেট্‌পেন্সিল, একটী লাটিম, একটুখানি দড়ি, আর দাঁত দিয়ে কামড়ান ছোট্ট একখানি সোনার পদক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হরিতকী।

—:০:—

শুষ্ক ও কসায় তুমি ভক্তিহীন জ্ঞান
রসহীন তুমি যেন রূপহীন ধ্যান,
দেবকাজে পিতৃকাজে নিত্য ব্যবহার
ঔষধে পাঁচনে কর কত উপকার।
আছে তব বহু গুণ সব তুমি পার
প্রাণ রসনায় শুধু তৃপ্তি দিতে নার।
বৃন্ত ক্ষীণ, মৃদু বায়ে যাও তুমি ঝরি'
পাকিবার, বহু আগে রও ভূমে পড়ি।

কিন্তু শুনি মহাফল এও সত্যকথা
ভক্তি রসে পক্ক হলে দাও অমরতা।
তপোবনে থাক তুমি যোগী ঋষি দলে
দেবভোগ্য হও তাঁহাদেরি ভাগ্য ফলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আমাদের হিন্দুর নারীপূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহিণীদের, পূর্ব্ববর্ণিত রোজনামচা, কুটীরবাসী লক্ষ্মীহীনের লক্ষ্মীদের পক্ষে, সম্পন্ন গৃহস্থের নয়। তাঁহাদের জানাইয়া রাখা ভাল, মহাভারতে দেখিতে পাইবেন,—যখন শ্রীকৃষ্ণমহিষি সপত্নী-বিদ্বেষিণী সত্যভামা দেবী পঞ্চস্বামী-সোহাগিনী দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে স্বামী বশ করিবার ঔষধ চাহিয়াছিলেন, তখন রাজরাজেন্দ্রাণী তাঁহার নিত্যকর্ম্মের ঠিক্ এইরূপ—বরং কিছু বেশী—পরিচয় দিয়া সগর্ব্বে কহিয়াছিলেন—"হে সত্যভামে, আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি।"

(মহা। বনপর্ব্ব। দ্রৌপদী-সত্যভামা সম্বাদ।)

হিন্দু কবি হিন্দুর মনের কথাই ছন্দোবন্ধে বাহির করিয়াছেন,—

"আদর্শ জননী
সুভগিনী গৃহলক্ষ্মী তবু তুমি সতি!
নারীত্ব হয়েছে সখি, দেবত্বে বিলীন—
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন!" আহা!

এখানে বিশেষ অবধান-যোগ্য এইটুকু,—এই নিত্যকর্ম্ম-তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায়, নারীজাতির বাবু সাজিয়া উল বুনিয়া, নাটক-নভেল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িয়া দিনাতিবাহন শাস্ত্রানুমোদিত নহে। অপিচ, আজ পশু-বাগান, কাল যাদুঘর, পরশু স্বদেশী মেলা ঘুরিয়া বেড়ানও শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। আর, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, পর্দ্দাপার্টি, জেনানাপার্ক,—সে সব বিষয়ের আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

অনেক বিচক্ষণ লোকের ধারণা,—হিন্দুদিগের জেনানা প্রথা—কঠোর অবরোধ—মুসলমান রাজাদিগের আমল হইতে, অত্যাচার ভয়ে উদ্ভূত হইয়াছে; মতটা কি ঠিক্?

হিন্দুশাস্ত্রেও রহিয়াছে,—

"অস্মাস্নারী পরৈর্বত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতাঃ। অসূর্য্যম্পশ্যা যা রামা শুদ্ধান্তাশ্চ পতিব্রতাঃ॥
সচ্ছন্দগামিনী যা তু স্বতন্ত্রা শূকরী সমা। অবর্দ্দৃষ্টা সদা সৈব নিশ্চিতং পরগামিনী॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।)

যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা বহু যত্নে স্ত্রীদিগকে সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালে রাখেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ শুদ্ধা ও পতিব্রতা হন। যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে গমন করে, তাহারা শূকরী তুল্যা। তাহারা মনে মনে কুভাব পোষণ করতঃ পরে পরপুরুষে অভিগত হয়। *

হিন্দুস্ত্রীর প্রতি আসল ব্যবহারের বিধান কিন্তু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়, স্মৃতিকার ঋষি শঙ্খ ও লিখিত। শঙ্খঋষি উপদেশ দিয়াছেন,—

লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রী র্ভবতি নান্যথা॥"

ভার্য্যাকে লালন ও তাড়ন দুইই করিতে হয়। যে স্ত্রী লালিত হয়, তাড়িতও হয়, (অর্থাৎ আদরসোহাগ পায়, চড়টা চাপড়টাও লাভ করে ?) সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইতে পারে, অন্যথা নহে।

চানক্য-ঠাকুর তবু ছেলেপুলেদের লালন-তাড়ন করিবার 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' লিখিয়া একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই স্মার্ত্ত ঠাকুরের অভিপ্রায় বোধ হয়, ভার্য্যাকে সকল বয়সেই তাড়না করা (ঠেঙ্গান !) যাইতে পারে।

ঋষি লিখিত উপদেশ দিয়াছেন,—

"প্রাকামো বর্ত্তমানা তু স্নেহান্ন তু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতা॥"

স্ত্রী যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এবং স্নেহ বশতঃ যদি কেহ তাহাকে নিবারণ না করে, তবে পশ্চাতে আর তাহাকে বশ করা যায় না; যেমন ব্যাধি উপেক্ষিত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

ইহার উপর আর কলম-বাজি চলে না। অতএব সাব্যস্ত হইল,—ঋষিগণের পরামর্শ,—স্ত্রীকে স্ত্রীজাতিকে কখনও স্বাধীনভাবে অর্থাৎ আপরুচি অনুযায়ী কিছু করিতে দিও না। এবং আবশ্যক বুঝিলে মধ্যে মধ্যে বকুনি ঝকুনি দিতে কিম্বা গালি-গালাজ করিতে তথা কিল ঘুষি না হউক চড়্‌টা চাপড়্‌টা দিতে ইতস্ততঃ করিও না।

শুধু চড়্ চাপড়্ কেন ? অপর স্মৃতিকারগণের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং ভগবান মনু—

স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে তাহার মস্তক ভিন্ন পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে শাসনার্থ (রজ্জু বা বেনুদল নির্ম্মিত) বেত্রাঘাত করিবারও বিধি দিয়াছেন।

স্থল বিশেষে, বৃক্ষ জটা বেত্র অথবা চর্ম্মাদি কৃত রজ্জু (চাবুক) দ্বারা দণ্ড দিবার বিধিও পাশ করিয়াছেন।

(৮।২৯৯ ও ৯।২৩০)

শাস্ত্রকার—স্মৃতি পুরাণ রচয়িতাগণ সকলেই পুরুষ, পুরুষজাতি হাতে পাইয়া, নারীর মর্য্যাদা কেমন রাখিয়াছেন তাহাই আমরা দেখাইতেছি।

হিন্দু জাতির আচার ব্যবহারে স্ত্রী পুরুষ বৈষম্যের সুন্দর তালিকা একটি দেখিতেছিলাম, এখানে শুনাইলে মন্দ হয় না;—

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বয়স লইয়া যাঁহারা তর্ক তুলিবেন, তাঁহাদের কাছে পরাস্ত হইতে হইবে, কারণ বৈদিক যুগে কিম্বা দূর প্রাচীন কালে এত আঁটাআঁটি ছিল না।

স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ সহস্রবার বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-ললনা স্বামীহীন হইলেও পুনর্ব্বিবাহে অধিকার নাই। পুত্র—পুরুষ সন্তান পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী কিন্তু দুঃখিনী কন্যার—স্ত্রী সন্তানের পিতৃ ধনে কিছু মাত্র অধিকার নাই। পুত্র কন্যার অবর্ত্তমানে মৃতা স্ত্রীর স্ত্রীধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব কিন্তু অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামীর ধনে স্ত্রীর জীবনস্বত্ব মাত্র। এরূপ স্থলে স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন কিন্তু মৃত পতির সম্পত্তির দান বিক্রয়ে স্ত্রীর কোনও অধিকার নাই। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সে সম্পত্তি ব্যয় করিতে অনধিকারিনী। শাস্ত্রে আছে,—

"স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতি-দায়াৎ কথঞ্চন ॥" (দায় ভাগ)।

স্ত্রীলোক শিল্প (কর্ম্মাদিদ্বারা) নিজে উপার্জ্জন করিলেও সে ধন স্বামীর হইবে। পিতা মাতা বা স্বামীর ধনে তাহার নিব্যূঢ় স্বত্ব নাই—কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র ; সে ভোগবিলাসিতায় বা আত্মসুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য নহে ; সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক-কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ জন্য।

স্ত্রী বিধবা হইলে—যদি তিনি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরেরও ভার্য্যা হন, তথাপি এক বেলা বৈ ভোজন করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রে আছে—

"একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।" (প্রচেতা)

ইচ্ছা হইলে ও তিনি একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে পাইবেন না। শাস্ত্রে আছে—

উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদিনা।" (স্মৃতি)।

যে পর্য্যঙ্কে তিনি স্বামীর সহিত শয়ন করিতেন, সে পর্য্যঙ্কে বৈধব্যদশায় শয়ন করিলে স্বামীকে পাতিত করিবেন ; অতএব ভূ শয্যাই বিধি। শাস্ত্রে আছে—

"পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।
তস্মাৎ ভূ শয়নং কার্য্যং...... ।" (প্রচেতা)।

যে গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে তিনি আশৈশব অভ্যস্তা, তাহা বিধবা নারী স্পর্শও করিতে পারেন না। শাস্ত্রে আছে—

"গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগে নৈব কার্য্যাস্তয়া পুনঃ।" (স্কন্দ পুরাণ)

স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহাকে দর্পণে মুখ দেখিতে নাই ; পর পুরুষের মুখ দর্শন করিতে নাই ; নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ করিতে নাই। শাস্ত্রে আছে,—

"ন হি পশ্যতি দর্পণং।
মুখং পরপুরুষাঞ্চ যাত্রা নৃত্য মহোৎসবং।
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং ॥" (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত)।

যে শিরশোভা কেশদাম স্ত্রীলোকের প্রকৃতিদত্ত ভূষণ, সেই চুলগুলি পর্য্যন্ত বিধবার রাখিতে নাই। শাস্ত্রে আছে—

"বিধবা-কবরী বন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসো বপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা ॥" (কাশী খণ্ড)

বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ, এই জন্য বিধবা সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে।

অধিক কি একটি সামান্য পান খাইতে ইচ্ছা হইলে তাঁহার খাইবার অধিকার নাই ; বিধবার নিকট পান গোমাংস। শাস্ত্রে আছে,—

"তাম্বুলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ধ্রুবম্॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ,—

যবান্নৈর্ব্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণ স্বয়ং ব্রজেৎ।"* কাশীখণ্ড।

প্রাণ যে পর্য্যন্ত আপনি না যায়, তাবৎকাল যবান্ন, ফল ভোজন, শাকাহার কিম্বা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

এমনই হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য। সহমরণ, অনুমরণ বন্ধ হওয়ায় এমনই করিয়া বিধবাকে জীবন কাটাইতে হয়! তুষের আগুন!

মনে হয়, অনেকে বলিবেন,—এ সকল বিধান বিলাস বর্জ্জন ইন্দ্রিয়-সংযমের পৈঠা। তাহা হইতে পারে; কিন্তু রক্তমাংসের শরীর, বিধবা হইলেই বালিকা কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই কি কায়মন কাঠ-পাষাণ হইয়া যায়?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—'কয় জনই বা শাস্ত্রের এত কড়াকড়ি মানিয়া চলে?' সে কথা হয়ত সত্য, কিন্তু আমরা শাস্ত্রের আদেশ বিধান শুনাইয়া যাইতেছি মাত্র। কে কি করে, না করে, জানি না। তবে ইহা ত স্বীকার করিতেই হয়,—যাঁহারা না মানিয়া চলেন, তাঁহারা শাস্ত্রকে অমান্য করেন, সুতরাং তজ্জন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

স্ত্রী বিধবা হইলে ত এইরূপ ব্যবস্থা ; এদিকে মৃতপত্নীক স্বামীর পক্ষে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, যত ইচ্ছা যাহা ইচ্ছা খাইতে পারেন ; যেমন ইচ্ছা পরিতে পারেন ; যেরূপ ইচ্ছা বিহার করিতে পারেন, বিলাসের সমস্তই উপভোগ করিতে পারেন ; কিছুতেই শাস্ত্রের বাধা নাই, কোন আপত্তির উল্লেখ নাই।—শাস্ত্রকার সবাই ত পুরুষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—

"বিধবাকে কেশসংস্কার করিতে নাই, গাত্রসংস্কার করিতে নাই ; কোনরূপ যান আরোহণ করিলে বিধবাকে নরক গমন করিতে হয়।"

স্কন্দ পুরাণে রহিয়াছে,—

"বিধবাগণ ভূমি-শয্যা আশ্রয় করিবে, অসময়ে আহার করিবে, পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলে তাহাদিগের নরক দর্শন ঘটিবে।"

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে,—

* "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥" ৫।১৫৭

পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প মূল ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখনও পর পুরুষের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিবেন না।—ইহা ভগবান মনুর উপদেশ বা আদেশ।

"জীবনহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামীহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দর্শন করিলে কখনও কার্য্যসিদ্ধ হয় না জননী ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীবিষের ন্যায় পরিত্যজ্য।"

(কাশীখণ্ড। ৪ অধ্যায়।

আপনারা কি বলিবেন না সার্থক 'দেবী' সংজ্ঞা, সম্মানের পদবী !

বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রবীণ হিন্দু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—

"হিন্দু-বিধবার চির-বৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের দেবী-মন্দির।" *

হিন্দুর ঘরের জনৈক পুরমহিলা এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গূঢ় তত্ত্ব বড় পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছেন,—

"………চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিয়া থাকেন, 'আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে ?" অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছান্‌লা তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না, পাছে দেবীর মুখ দেখিলে, আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে ! মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না,—দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে !………

হিন্দুর ঘরে বিধবা ভগিনীটির দান চড়িয়া যায় তখন, যখন স্ত্রী আসন্ন প্রসবা, যখন রাঁধা বাড়ার লোকের অভাব, যখন কচি ছেলেটিকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দু'টি খাওয়াইতে হয়।"

এমনই করিয়া আমরা করি নারীর পূজা ! জগৎ-সমক্ষে বুক ফুলাইয়া জাঁক করিয়া বেড়াই—স্ত্রীজাতি আমাদের কাছে দেবতা। কেহ তর্ক করিতে আসিলে, আমরা কোন্ কাগজে, কোন্ কেতাবে, অপর দেশের অপর জাতির কে কোথায় কবে স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আওড়াইয়া আপনাদের গলদ্ ঢাকিবার চেষ্টা করি।

আবার শাস্ত্রপুরাণ যাঁহাদের বেশী পড়া আছে, তাঁহারা হয় ত পুরাণ হইতে শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়া বলিবেন, এমন কথাও আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

"যেখানে যেখানে (সাধ্বী) স্ত্রীলোকের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম !" (স্কন্দ পুরাণ। কাশী খণ্ড।)

আমরা না বলিয়া থাকিতে পারি না—বাকাই সার ! ধন্য হিন্দুশাস্ত্র ! ধন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ !

স্বদেশ-বৎসল, স্বধর্ম্ম প্রেমিক ভারতের সুসন্তান কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—"সুসভ্য ইয়োরোপে বা আমেরিকায় স্ত্রী জাতির আদর আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহাদের কেবলমাত্র আদর ছিল না অধিকন্তু সেই আদরের সহিত ভক্তি ও পূজা মিশ্রিত হইত। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিতে দেবতার অংশ—মহাশক্তির অংশ দেখিতে পাইতেন।" †

কেমন দেখিতেন, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এই আদর ভক্তি-পূজার স্রোত এমন ভাবে গড়াইয়াছিল যে জীয়ন্ত নারীকে জলন্ত অগ্নির মুখে সমর্পণ করিবার গোঁজামিল ব্যবস্থা চালাইয়া তবে তৃপ্তি লাভ করা হইয়াছিল !

* স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Kt. D. L.—"জ্ঞান ও কর্ম্ম।"

† বাবু সারদাচরণ মিত্র—"শিক্ষিতা ভারত মহিলা।" (ভূমিকা)

নারী-পূজার বেগ সামলানো শক্ত বুঝিয়াই না এই ভারতে স্থানে স্থানে শিশু-কন্যা হত্যার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল—শ্রুতি-স্মৃতির আদেশ বিধান শিকায় তুলিয়া রাখিয়া ?

উপসংহার কালে আমরা শ্রীমতী অনিলা দেবীর অমূল্য প্রবন্ধ "নারীর মূল্য" হইতে আর একটু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না,—

"ইংরেজ যখন আমাদিগকে বলে,—'তোমরা নারীর মূল্য জান না, মর্য্যাদা বোঝ না; তোমরা তাহাদিগকে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে না দিয়া, ঘরের কোণে নির্ব্বাসিতা করিয়া রাখ, তোমরা বর্ব্বর।' আমরা তখনই মনু-পরাশর হইতে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলি—'না, আমরা মা বোনের মুখে রং মাখাইয়া, স্যাম্পেন ক্লারেট পান করাইয়া উত্তেজিত করিয়া, সভা সমিতিতে নাচাইয়া লইয়া ফিরি না; আমরা তাহাদের ঘরের কোণে পূজা করি।' এই প্রকার কথার যুদ্ধে তখনকার মত একরকম জিতি বটে, কিন্তু পূজাটা কি ভাবে হয়, তাহা আলোচনা করিলে, অনেক কথা বাহির হইয়া পড়ে।"

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের চরণে নমস্কার পূর্ব্বক সেই আলোচনাই আমরা যৎসামান্য করিয়াছি।

হিন্দুজাতির আচার অনুষ্ঠান কেবলমাত্র শাস্ত্রশাসিত নহে; লোকাচারের প্রভাব ইহার উপর বিলক্ষণ। পুরুষ-জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের যাহা আদেশ, অবলা জ্ঞানহীনা স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তাহা দশ গুণ অধিক কৃচ্ছ্রসাধ্য। লোকাচার আবার তাহাকে শত গুণ কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। আত্মসুখান্বেষী স্বার্থপর পুরুষ আমরা, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতে চাহি না; সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে আমাদের অবসর বা প্রবৃত্তি নাই। সে বিষয়ে আলোচনা করা অনেকে নিরাপদ মনে করেন না; কারণ, প্রসঙ্গক্রমে তাহাতে স্ত্রীজাতি চক্ষু ফুটিয়া যাইতে পারে; ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। যে নির্য্যাতিত সে চির নির্য্যাতিতই থাকুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এমন না হইলে আর পূজা! এমনই পূজা না হইলে যে সমাজ ওলট্ পালট্ হইয়া যায়; সংসার ছারখার হয়! ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। বুদ্ধিমানের যুক্তি সন্দেহ নাই।

যাহা হউক এই সম্বন্ধে জনৈক্য অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী নিষ্ঠাচারী হৃদয়বান্ হিন্দুর মর্ম্মস্পর্শী করুণোক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লই :—

"হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ্ বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" †

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

---

† স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বসন্ত।

—:*:—

(চীনাকবি ছু কুঙ হইতে)

নিখিল ভরিল ঋতুরাজের রূপে।
কমল কুমুদ মালা যেন রূপবতী বালা
ফুটিল তড়াগ দীঘি অন্ধ কূপে।
ঘনাইল পীচবন পাতার ছায়ে
কুঞ্জ শ্বসিয়া উঠে মলয় বায়ে
গাহিল অযুত পাখী কনক কিরণ মাখি
উইলো ফুটিল নদী পুলিনে চুপে।
চির পুরাতন তবু নিতুই নব
ভাবের হৃদয়ে পুন সমুদ্ভব।
সুন্দর পানে গিয়া ছুটে আজি উছসিয়া
পূজা তার নিশিদিন কুসুম ধূপে।
নিখিল ভরিল ঋতুরাজের রূপে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

ভট্টাচার্য্যের পত্র।

(মারফৎ শ্রীনরেশচন্দ্র দেব।)

পরম শুভাশীষ পুরঃসর বিজ্ঞাপনমিদং—

মহাশয় যে বিরাট দরখাস্তখানিতে সহি দিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা অদ্য যথাবিহিত স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। দিল্লীর লাট দরবারে এত বড় প্রকাণ্ড একখানা ধায়সাধ্য অসংখ্য দস্তখত সমেত দরখাস্ত পেশ করিবার যে কি বিশেষ আবশ্যকতা আপনারা বিবেচনা করিলেন, আমি তাহা সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলাম না,—বরং আমার ত মনে হয় ইহাতে একটা সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে এই যে উক্ত দরখাস্তখানিতে আপনাদের মত যে সকল নামজাদা দস্তখতকারী আছেন বিপক্ষ পক্ষের যদি

কোন ভাল কৌসুলী উত্তমরূপে তাঁহাদের জেরা করিতে সুরু করেন তাহা হইলে আপনাদের হিঁদুয়ানী এখনও কতটা খাঁটি বজায় আছে তাহা পড়িয়া যাইতে পারে সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় ও কর্ত্তব্য ছিল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'অসবর্ণ বিবাহ' আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে শুনিয়া আপনাদের মত গণ্যমান্য দেশের লোকেদের এতটা ভীষণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। কেবলমাত্র যদি আপনারা শিহরিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তবে আর কোন কথাই ছিল না। কিন্তু আপনাদের শিহরণের সঙ্গেসঙ্গে ধর্ম্মনাশভয়ে ভীষণ আর্ত্তনাদও উত্থিত হইয়াছে, এবং আপনারা সদলে সহরে বাহির হইয়া দেশের আর সকলকেও ভয় দেখাইয়া ভীত সন্ত্রস্ত করিবার জন্য ! দ্বার ভাঙ্গিয়া আপনাদের দল অপরের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেঃ—"ধর্ম্ম যায়! কর্ম্ম যায়! মান যায়! মর্য্যাদা যায় বিষয় সম্পত্তি রসাতলে যায়! বংশ

ভেসে যায়! হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত প্রায়! পবিত্র বর্ণাশ্রম, অশুচি হবার উপক্রম! মনুসংহিতা সংহার হল! স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ হল! বামুন কায়েত কামার— কৈবর্ত্ত শূদ্র চামার—হল একাকার! একান্নবর্ত্তী পরিবার গেল ছারেখার! সর্ব্বনাশ হল! সর্ব্বনাশ হল!" "যদি "যদি ভাল চাও, আপন মঙ্গল চাও, পুত্র কন্যার কল্যাণ চাও—আর যদি ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা থাকে, নরকের ভয় থাকে, ধর্ম্মে মতি থাকে—ঈশ্বরে ভক্তি থাকে—তবে এস দলে দলে এই দরখাস্তখানায় দস্তখত করে দাও, নতুবা সব যায়, আর রক্ষা নাই!"—ব্যস্—

হুযুগে যোগ দিবার লোকের অভাব এদেশে পূর্ব্বেও কখন ঘটে নাই এবারও ঘটিল না! দেখিতে দেখিতে ছোট বড় অনেকেই ভাল কি মন্দ বিচার না করিয়াই আশু হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের আশঙ্কায় সশঙ্কিত আপনাদের ঐ দলটিতে সত্বর যোগ দিতে সুরু করিয়া দিল—যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে! কেহই একবার অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া তর্ক করিয়া,—অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় সম্যক বিচার করিয়া, সত্যাসত্য প্রণিধান করিয়া দেখিল না যে তাহাদের আশঙ্কা অমূলক কিনা—?—এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে সত্যই হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইবে কিনা—? অথবা প্রকৃত পক্ষে উহা দেশের ভাবী অকল্যাণের কারণ হইবে কিনা?—কেবল মাত্র জনতার মুখে বায়স নামে প্রসিদ্ধ কোন পক্ষী বিশেষকর্ত্তৃক নিজ, নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় অপহরণের দুঃসংবাদ পাইয়া সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই অদৃষ্ট বায়সের পশ্চাদ্ধাবন করিল! ইহা বস্তুতই একান্ত পরিতাপের বিষয়!—আপনি হয় ত বলিবেন "সে ভাবনায় আমাদের দরকার কি ভট্‌চায্! ওরা ভাল মন্দ বুঝুক আর না বুঝুক দরখাস্তখানা সই করে ছেড়ে দিয়েছে যখন—ব্যস্!—আমাদের কাজ ফতে!"—কিন্তু আমার মনে হয়—ঐটে যেন আরও বেশি পরিতাপের বিষয়!—দস্তখত যে শুধু কেবল মাত্র ধড়া-চূড়া বাঁধা নির্ব্বীর্য্য রাজা রাজড়ার ও তাদের অনুগত, অনুগ্রহপ্রার্থী বেতনভুক্ কি বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত প্রজা, কর্ম্মচারী, পুরোহিত, কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হইয়াছে তাহা নহে—পরন্তু বহু শিক্ষিত বিদ্বান বুদ্ধিমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সম্রাটের প্রদত্ত উপাধীধারী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণেরও হইয়াছে!

জনসাধারণের এতদিন ধারণা ছিল যে ঐ সকল ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আছে এবং কালের গতির সহিত সমপাদক্ষেপে চলিয়া উঁহারা নিশ্চয়ই ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলের সূচনা করিতে পারিবেন কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে দেশের লোকের উক্ত ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন! উপাধিপ্রাপ্ত বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি-গণের অধিকাংশ শিক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অনেকেরই সৎ সাহসের মেরুদণ্ড নাই! রাজা মহারাজার অনুরোধে, উপরোধে, খাতিরে, বা বন্ধুত্বের প্রলোভনে যে দেশের নেতৃ স্থানীয় জনমান্য ব্যক্তিবর্গ অম্লান বদনে আপনাদের স্বাধীন চিন্তা স্বতন্ত্র মত বা প্রকৃত সংবুদ্ধিটুকু এত সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন সে দেশের ভবিষ্যত যে এখনও

বহুকাল তিমির গর্ভেই বিলীন থাকিবে তাহাতে আর বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই ! সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল যুবকবৃন্দ যাহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র বলিয়া মোহরাঙ্কিত তাহাদেরও অনেকে নাকি এই রাজস্কন্ধবাহী অতিকায় দরখাস্তখানায় দস্তখত করিবার দুর্দ্দান্ত প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যদিও এরূপভাবে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিচারে যাহাতে তাহাতে নাম স্বাক্ষর করাটা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বটে তবে যেহেতু যুবক সম্প্রদায়টা—সকল দেশেই চিরদিন হঠকারিতার জন্য প্রসিদ্ধ সুতরাং এই সহি দেওয়ার জন্য তাহাদের বিশেষ অপরাধী করিতে পারা যায় না। আরও আমার বিশ্বাস যে ঐ 'অসবর্ণ বিবাহ' বিধির বিরুদ্ধে লিখিত আপনাদের বিরাট আবেদনে দস্তখতকারী অনেক অবিবাহিত যুবকই মনোমত সুপাত্রী পাইলে অচিরে স্ববর্ণের বাহিরে বিবাহ করিতে বোধ হয় তিলার্দ্ধও ইতস্ততঃ করিবে না ! এবং উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলে আমিও স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা বাহির করিয়া তাহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিতে এক মুহূর্ত্তও অবহেলা করিব না।

এখন আপনি হয় ত আমাকে বলিতে পারেন যে 'আচ্ছা, মহাশয় যখন স্বয়ং এই আইনটার এত পক্ষপাতি,—তখন কি হিসাবে তদ্বিরুদ্ধ আবেদনে স্বাক্ষর দিলেন—ইহার উত্তরে আমি সবিনয় জানাইতে চাই যে আমার উপস্থিত বড়ই টানাটানি চলিতেছে সুতরাং নগদ কিছুর প্রাপ্তি আমি সহজে হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নই। একে ত আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ—গুণকর্ম্মবিভাগশঃ না হই, অন্ততঃ জন্মাধিকার উত্তরাধিকার ও সূত্রাধিকার সূত্রে ত' বটেই ! তারপর যজমান সাধনই হচ্ছে আমদের উপস্থিত একমাত্র শাস্ত্রসম্মত উপজীবিকা, কাজেই মধ্যে-মধ্যে আমাদের এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা প্রায়ই দিতে হয়, নচেৎ যজমান চটিবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। আমি ইতি মধ্যেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি ঘাঁটিয়া অসবর্ণ বিবাহের অনুকূল ও প্রতিকূল অনেকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি ; কি জানি কখন কাহার কিরূপ ব্যবস্থা লইবার প্রয়োজন হইবে তখন উহা কাজে লাগিতে পারে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্ যে অসবর্ণ বিবাহ-বিধি আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইলে ভারতের মহামহিমান্বিত হিন্দু ধর্ম্মের সত্যসত্যই হঠাৎ একেবারে অপঘাত মৃত্যু হইবে কি না ? আমার মনে হয় এ ত্রিকালের বিচিত্রবর্ণ মহাস্থবির এত সহজে কখনই দেহত্যাগ করিবে না ! সে বিষকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় ! কারণ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য শিবাজী একবার ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহার কণ্ঠলগ্ন বিষটুকু অমৃতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু "এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি !" তাঁহার এ শুভ ইচ্ছা সার্থক হয় নাই, তার পর আসিলেন গুরু নানক, গুরুগোবিন্দসিংহ কিন্তু তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারিলেন না—তার পর মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পালা কিন্তু তাঁহারও সমস্ত পরিশ্রম তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় তাঁহার জীবদ্দশার সঙ্গেসঙ্গেই শেষ হইয়া গেল ; অনাদি বৃদ্ধের নবযৌবন বারবার ফিরিতে ফিরিতেও আর ফিরিয়া আসিল না ! শাশ্বত জরা তার লোলচর্ম্ম ও শুভ্র কেশ লইয়া অমর হইয়া রহিল। সুতরাং বৃথা আপনাদের হিন্দুধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা ! এমন কি এই হালের কতকগুলি দুর্ঘটনার আলোচনা করিলেও আপনারা আমার এ কথার প্রমাণ পাইতে পারেন।

প্রথম ধরুন সতীদাহ। নির্দ্দোষী নিরপরাধিনী দুঃখিনীদের বাঁচাইবার জন্য ; অকারণ নিষ্ঠুর নারীহত্যার মহাপাতক হইতে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, যখন ঐ পৈশাচিক প্রথা রহিত হইয়া গেল তখনও আপনারা

ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং তখনও আপনাদের মুখের বুলি ছিল ঐ এক কথা "গেল! হিন্দুধর্ম্ম এইবার রসাতলে গেল!" কিন্তু দেখা যাইতেছে যে 'সতিদাহ' রহিত করিয়াও হিন্দুধর্ম্ম— সম্পূর্ণ অটুট ও নীরেট অবস্থায়ই আছে তাহার কোনও অংশই এখন রসাতল পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই!

তারপর যখন অভাগিনী বালবিধবাদের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল হইতে দেখিয়া, তাহাদের মহিমাময় নারীজন্মটা একেবারে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া গৃহে গৃহে গুপ্ত কলঙ্কের কৃষ্ণ কালিমা নিবিড়তর হইতে দেখিয়া "বিধবা-বিবাহ" বিধির ব্যবস্থা হইল তখনও যে বিপুল আন্দোলন তাহার বিরুদ্ধে আপনারা খাড়া করিয়াছিলেন তাহারও মুখের বুলি ছিল ঐ সেই পুরাতন ক্রন্দন "গেল হিন্দুধর্ম্ম গেল!"- অধিকন্তু ছিল এক বীভৎস আশঙ্কা—"বুঝি এইবার মা, খুড়ীমা ও জ্যাঠাইমাদের দ্বিতীয় পতি পরিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে হয়!" কিন্তু সে ভয়ও এতদিনে অমূলক সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে!

তারপর আবার যখন বাল্যবিবাহের বিষময় ফল নিবারণের জন্য হিন্দুর ভাবী বংশধর গণের, দেশের ভবিষ্যৎ সন্তান সমূহের ভাবী জননীগণের অপরিণত দেহ পরিপুষ্ট হইতে দিবার জন্য তাঁহাদের শারিরীক স্বাস্থ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সদ্যবিবাহিতা, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বধূগুলিকে অশিক্ষিত অবিবেচক পুরুষের পশুপ্রকৃতির অশুভ আলিঙ্গন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের আশির্ব্বাদ মত "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তখনও আপনাদের ঐ একই পেশাদারী সুর অনেক জায়গায় শোনা গিয়াছিল "ধর্ম্ম যায় ইজ্জৎ যায় আব্রু যায়!—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চিরশুদ্ধান্তঃপুরে অপরিচিত বিদেশী শাসনকর্ত্তার একি অনধিকার প্রবেশ—?"

তারপর এই আবার যখন কত অসংখ্য প্রবাসী প্রণয় মুগ্ধ অসবর্ণ নবদম্পতীর সুখ-সৌভাগ্য-সিদ্ধ প্রকৃত মিলনটিকে, বিকৃত সমাজের অকথ্য মলিন অত্যাচারে ম্লান হইতে না দিবার জন্য উহার পীড়নে ও অভিশাপে তাহাদের জীবনব্যাপী নিরানন্দলাভ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য—এই পরিণয়পূত প্রণয়ী দম্পতীদের নির্দ্দোষ শিশু-সন্তানগুলির পরিচ্ছন্ন ললাটপটে যাহাতে আর স্বার্থ সঙ্কীর্ণ জীর্ণ সমাজে পঙ্কিল শাসনদণ্ড অযথা কলঙ্কের তুষিত ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিতে না পারে—নির্ম্মম সমাজের প্রদত্ত ঐ জন্মগত লজ্জার অসহ্য ধিক্কারে যাহাতে তাহাদের অমূল্য জীবনের মুকুলগুলি বিকাশের সুযোগ অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া না যায়—বর্জ্জন-নীতি-পথে নির্ব্বাণোন্মুখ হিন্দুজাতি যাহাতে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংশের করাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া অসংখ্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দিন দিন পৃথক ও দুর্ব্বল না হইয়া ক্রমে একতাবদ্ধ সুস্থ ও সবল হয়—এই আশায় স্বদেশের যথার্থ হিতাকাঙ্খী চিন্তাশীল মনীষি মহাত্মা প্যাটেল এই অসবর্ণ বিবাহ বিধি সম্বদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন কিন্তু আজও শুনিতেছি সেই একই প্রাচীন আর্ত্তনাদের কৃত্রিম বোল্!—সেই চিরাভ্যস্ত কপট বিলাপ—"যায়! যায়! ধর্ম্ম যায়, হিন্দুত্ব যায়! সর্ব্বস্ব যায়! হায়! কি হইবে?"

দোহাই আপনাদের চুপ করুন! আর ওই একঘেয়ে সাবেক চীৎকার ভাল লাগে না! নতুন কিছু যদ্যপি থাকে তবে ঝোড়িয়া ঝুড়িয়া বাহির করুন নচেৎ ওই মায়াকান্নায় আর আবশ্যক নাই। আমি আপনাদের অভয় দিচ্ছি! এত শঙ্কিত বিচলিত ও অধৈর্য্য হইবার কারণ নাই! হিন্দুর সনাতন হিন্দুত্ব এখনও বহুকাল অটুট থাকিবে। কোন অনাদিকালে হিন্দুকুশের পরপার হইতে এই জম্বুদ্বীপে সমাগত প্রাচীনতম আর্য্যজাতির—প্রাণের প্রত্যেক স্তরে কুশাগ্রগুচ্ছ দুর্ব্বাদল, ধান্য ও যবশীর্ষ—হরিতকী তিল তুলসী ও বিল্বপত্রের পবিত্র প্রভাব এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পুরোহিতের প্রতারণা প্রকাশ পাইলেও পিতৃশ্রাদ্ধের বা তর্পণবিধির ভোজ্যের প্রতিবাদ

করিতে সক্ষম এমন পুরুষসিংহের জন্মকাল এখনও সুদূরপরাহত। অষ্টাদশ পুরাণের অষ্টপাশ মুক্ত হইতে অষ্টাশীতি শতাব্দীর সাধনা আবশ্যক,—সার্দ্ধ এক শতাব্দীর শিক্ষার কর্ম্ম নয়! পৃথিবীর কোন দেশের কোনও ভূগোলে বা মানচিত্রে কোথাও এ কথা লেখা না থাকিলেও তথাপি হিন্দুর ছেলে কি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারে যে ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানকে মুক্ত করিবার জন্য মকরবাহিনী জননী জাহ্নবী ওরফে গঙ্গাদেবীকে সুরলোক হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন নাই? পরন্তু গঙ্গা একটী নদী বিশেষ—যাহা হিমালয়ের গোমুখী শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে! সর্ব্বনাশ! ইহা সত্য জানিয়া ও বুঝিয়াও যদি কেহ জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে সাহস করে তবে নিশ্চিত জানিবেন যে অচিরে এই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানে একালেও হিন্দুসমাজে সে ঘোর নাস্তিক বলিয়া অখ্যাতি পাইবে! অতএব মাভৈঃ?—হউক না কেন অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ—হিন্দুর হিন্দুত্ব বিনাশ আমরা জীবিত থাকিতে কোন বিধি-বিধানেরই নাগপাশ সাধন করিতে সক্ষম হইব না! বলে' রাজা রামমোহন রায়ের মত মহাপুরুষ ব্যক্তি যে কাজে হাত দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সদুদ্দেশ্য যাহারা ব্যর্থ করিয়া বসিয়া আছে—তাহাদের কাছে কিনা ঐ বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্যাটেল? সত্যযুগে যাহারা ত্রিভুবনপতি দাম্ভিক বলিরাজকে পথের ভিখারী করিয়াছিল ত্রেতাযুগে রাবণের দেব দ্বিজে অভক্তি দেখিয়া যাহারা তাহাকে সবংশে নিধন করাইয়াছিল! দ্বাপরে যখন ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দ মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মণ্য শক্তিকে তুচ্ছ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন এই ভারতবর্ষে নিক্ষত্রিয় করিতে যাহারা কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া ছিল আর এই কলিযুগে যাহারা ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী মগধাধিপতি নন্দ মহারাজের শুপ্ত বংশ ধ্বংশ করিয়া মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মতেজের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল তাহারা কি আজ সামান্য একটা অসবর্ণ বিবাহবিধির ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইবে?—ধিক্!

দৈবদুর্ব্বিপাকে যদিই বা আজ ঐ অসবর্ণ বিবাহ বিল বিধিবদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলেই কি আপনারা মনে করিয়াছেন যে দেশে উক্ত প্রথা প্রচলিত হইতে থাকিবে? অসম্ভব! কাশী কনৌজ ও নবদ্বীপ ভারতে বিরাজমান থাকিতে তেজঃপুত দীর্ঘচুড়া ও যজ্ঞোপবীতের বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ অচল এক জড়পদার্থে পরিণত হইবে! সেই 'বিধবা বিবাহ বিধির' অবস্থাটাই আজ কি হইয়াছে স্মরণ করিয়া দেখুন না কেন! সমস্ত দেশে বৎসরের মধ্যে পাঁচজন হিন্দু বিধবারও বিবাহ হইয়া উঠে কিনা সন্দেহ! তারপর দেখুন ঐ 'সম্মতি আইন।' আজ পর্য্যন্ত কয়টা মামলা আদালত উঠিয়াছে? প্রতি বৎসর কত অসংখ্য বালিকা অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসবে অক্ষম হইয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। কত না ষোড়শী তাহাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর অনুগ্রহে অবিচ্ছেদে উপর্য্যুপরি সপ্ত সন্তানের জননীত্ব লাভ করিয়া অকালে জরাগ্রস্ত স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন, দুর্ব্বল, শীর্ণ, পাণ্ডুর ও মলিন হইয়া ক্রমে তাহাদের সেই হতভাগ্য জীবনের প্রভাত বেলা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে অসময়ের ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে! ঐ সকল অপরিণত শরীর নষ্টস্বাস্থ্য রুগ্নমাতার গর্ভজাত দুর্ব্বল নির্জ্জীব সন্তানেরা বৎসর বৎসর শিশু মৃত্যুর তালিকার হার বৃদ্ধি করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কখনও কি শুনিয়াছ কোনও সনাতন হিন্দু জামাতাদের বিরুদ্ধে কোনও কন্যাগণের সনাতন হিন্দু অভিভাবকেরা কখনও তাঁহাদের কন্যাদের স্বাস্থ্যনষ্ট করার অপরাধে বা উহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য বাবাজীবনদের দায়ী করিয়া কোনও ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে অভিযোগ করিয়াছে? প্রায় অনেকেই মনে মনে হয়ত তাহাদের অভিসম্পাত দিয়া থাকেন কিন্তু সাধ্য কি যে আইনের সাহায্য লইয়া পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজের অবমাননা করেন বা শাশ্বত হিন্দুত্বের মর্য্যাদা নষ্ট করেন?—

দরখাস্তখানি যদি দিল্লীর পথে এখনও রওনা হইয়া না থাকে তবে উহা আর পাঠাইবেন না। আমি আবার বলিতেছি আপনি স্থির জানিবেন যে সৃষ্টির আদিম সভ্যতার যুগে প্রতিষ্ঠিত এই অতি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী—তাহার সনাতন হিন্দুত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গ শিখরে শ্রেষ্ঠ বর্ণের পদরজ মাখিয়া রক্ষা-কবচ মাদুলী ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের প্রভাবে এখন ও বহুকাল পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া স্মৃতির শাসন ও পৌরাণিক পুঁথির প্রতাপ প্রচার করিতে থাকিবে। জানে ত' একবার যখন এই সনাতন পুঁথির শাসন না মানিয়া দেশে নির্ব্বোধ লোকেরা সমুদ্র যাত্রা করিতে সুরু করিয়াছিল তখন ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কেমন শাস্তি ভোগ করিত? শেষে এই তাল তলার চটীজুতার তলায় মাথা নত করিয়া প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ ভোজন ও উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থায় করা উচিত! আমি বলি যদি কেহ একান্তই অসবর্ণ বিবাহ করিয়া ফেলে তবে সে উক্ত ত্রিবিধ ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডন করিলেই তাহাকে জাতে তুলিয়া লওয়া হইবে এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিলে সব দিক বজায় থাকে এবং ভবিষ্যতে আর যজমান চটিবারও ভয়টা থাকিবে না—। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই সব বাজে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বৃথা আমাদের শক্তিক্ষয় না করিয়া ওই পাপ ইংরাজি শিক্ষাটার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করা যাক্ আসুন! ঐ ইংরাজি কুশিক্ষাই যত অনিষ্টের মূল! উহারাই আমাদের শাস্ত্র পুঁথির ও তন্ত্র মন্ত্রের সমস্ত ফাঁকী ধরাইয়া দিয়াছে! অতএব ওইটাকেই সর্ব্বাগ্রে উচ্ছেদ করা হউক! ইতি—

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।

স্বরলিপি।

—*—

বাউল সুর—তেওরা

এমন, বন্ধ কুলুপ অন্ধকারে
ফিরবো আমি কাহার দ্বারে
পূজার কুসুম শুখিয়ে যাবে
দুয়ার তবু খুলবে না রে
আমার এ-ঘর আমার দুয়ার
আমার যাবার নাই অধিকার
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে এনে
ভরচে হৃদয় হাহাকারে!
আঁচল বাঁধা চাবিখানি
হারিয়ে কোথা গেল জানি
চোখের জলে ভরচে দিশা
এখন বল ডাকবো কারে?

গান ও সুর—শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।　　　　স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

|| { মা- পা র্পা | মগা -া | গা- মা I মা- পা পা | পা- া | পা- া I ||
ব ০ ন্ধ কু ০ লু প্ অ ০ ন্ধ কা ০ রে ০

I পা -ধা ধা | ধা -া | ধা -না I পা পনা -া | ধা -নধা | পা -ধা I }
ফি র্ র আ ০ মি ০ কা হা র দ্বা ০ রে ০

I ধর্সা -র্সা -া | র্সা -না I নর্রা র্রা র্সা | র্সা -া | র্সর্রা -র্সা I
পূ জার০ কু সু ম্ শু কি য়ে যা ০ বে ০

I না সা -া | না -া | না- র্সা I ধনা -র্সা না | ধা -নধা | পা- ধা II
দু য়ার ০ ত ০ বু ০ খু ল্ বে না০ রে ০ ০

I { সা সা -া | রা -া | রা -গা I মা পা -া | পা -া | পা- -া I
আ মার ০ এ ০ ঘ র্ আ মার ০ দু ০ য়ার ০

I পাধা -া | ধা -া | ধনধা পা I পা -ধনা না | ধা -নধা | পা -া]}
আমার ০ খা ০ বা র্ না ই অ ধি ০ কার ০

I পর্সা র্সা -া | র্সা -া | র্সা -না I নর্রা র্রা র্রা | র্সা -া | র্সর্রা -র্সনা I
প্র দীপ ০ খা ০ নি ০ জা লি য়ে এ ০ নে ০

I না র্সা র্সা | না -া | না -সা I ধা না -া | ধ -নধা | পা ধা II
ভ র্ ছে হৃ ০ দয় ০ হা হা ০ কা ০ রে ০

I সা সা -া | রা -া | রা -গা I মা পা -া | মা -পা | গা -মা I
আ চল ০ বাঁ ০ ধা ০ চা বি ০ খা ০ নি ০

I পর্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা না I নর্রা র্রা -র্সা | র্সা -া | র্সা -না I
হা রি য়ে কো ০ থা ০ গে ল ০ জা ০ নি ০

I নর্সা সা -া | র্সা -া | র্সা না I নর্রা -া র্রা | র্সা -া | র্সা -র্রা I
চোখে র ০ জ ০ লে ০ ভ র ছে দি ০ শা ০

I না র্সা -া | না -া | না র্সা I ধনা -র্সা না | ধা -না | পা -ধা II
এখ ন ০ ব ০ ল ০ ডা ক্ ব কা ০ রে ০

চিত্রশিল্পী।

— ※ —

বিধাতা বেচারাকে মনের এত ঐশ্বর্য্য দিয়েও তার ঘরের দৈন্য দূর করেন নি। সে যে এমন চিত্রশিল্পী তা কেউই জান্ত না. তার গুণপণা ভস্ম-ঢাকা অনলের মত গোপনে জ্বলেছিল, পত্রান্তরালের গোপন কলির মত তা আড়ালে ফুটেছিল, সে লোকচক্ষুর দৃষ্টিঅলির কাছে মুগ্ধ-প্রশংসা পাবার জন্য একেবারেই ব্যগ্র ছিল না, সে জান্ত অরণ্যের মাঝেই বনফুলের গৌরব! সে তার ছোট দ্বারের কাছে বসে বিপুল জগতের দিকে চেয়ে দেখ্‌ত—ঐ অনন্ত নীল আকাশের তলায় এই শ্যামল পৃথিবী, ঐ গাঢ় শ্যাম বনের প্রান্তটুকু, ঐ ছয় ঋতুর বর্ণ-গন্ধ-গীত-সম্ভার, ঐ গ্রহনক্ষত্রের হীরক-খণ্ডের মত উজ্জ্বল আলো, ব্রীড়া-রক্তিম হাসির মত উষার ঐ প্রথম বিকাশ, মুমূর্ষুর শেষ আশার মত ঐ সন্ধ্যার শেষ জ্যোতিঃ, বিধবার পট্টবস্ত্রের মত জ্যোৎস্নার শান্ত-বিস্তার, সমস্ত যেন তার প্রাণটিকে সৌন্দর্য্যাসিক্ত ক'রে তুল্‌ত! তার তুলির লিখন দিয়ে মনের সেই রসসম্ভোগকে চিত্রিত করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করত এই ছিল তার পুরস্কার। কিন্তু ক্ষুধা নামে যে রাক্ষসী জঠরের ভিতর বাস করে, সে একটি দিনও আপনার প্রাপ্য আদায় না করে মানুষকে নিস্তার দেয় না। শিল্পী ব'লে তার মনে এতটুকু করুণা ছিল না, সে প্রতিদিন পূর্ণ কর আদায় করে নিত। বেচারা দেখ্‌ল এমন করে প্রকৃতির রসগ্রহণও সম্ভব নয়, তখন সে এক দিন অন্নচিন্তায় ঘরের বাহির হয়ে পড়্‌ল। দেশের রাজা ঘোষণা করেছিলেন গুণের মূল্য দেবেন। বেচারা অনেক আশা করে' পরদিন রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। এই চক্‌ চকে ঝল্‌মলে রাজসভা, তাতে সোনার ছত্রের তলায় স্বর্ণ-চামরের হাওয়ায় বসে' নরপতি। তাঁর মাথার হীরক-কিরীট থেকে যেন মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আলোর বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে পড়্‌ছিল, সেই যত্নপুষ্ট শরীরটি যেন বহুকষ্টে মখমলের জাজিমে সোনার মস্‌নদের উপরে. স্বর্ণছত্রের তলায় সূর্য্যের উত্তাপ আর মাটির কাঠিন্য থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, গোলাপী আতরের সৌরভে পৃথিবীর দৈন্যকে ঢাক্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। দণ্ডধারীরা স্বর্ণ-দণ্ড ধরে' যেন কালকে শাসন করতে দণ্ডায়মান, চাটুকারেরা রাজার স্তুতি গান করে জগতের ক্রন্দন কোলাহলকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। এমন যে রাজসভা সেই রাজসভায় যখন দরিদ্র শিল্পী প্রবেশ করলে. তার মাথা থেকে পা অবধি সকল দৈন্য যেন তার বুকের মাঝে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল. তার পায়ের ছিন্ন পাদুকাও যেন তাকে ধিক্কার দিল, সে হোঁচট্‌ খেয়ে সভাজনের হাস্যাস্পদ হয়ে পড়্‌ল। বেচারা আদব-কায়দা কিছুই জান্ত না, নীচু হয়ে নমস্কার করে সে চোখ নত করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজার তোষামোদকারীরা কেহ বল্‌ল "মহারাজ সময় নষ্ট করে কি লাভ? ওকে অন্দর-মহলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হক্‌." কেহ বল্‌লে "কাঁধে একটা ঝুলি, আর হাতে খঞ্জনী দিলেই ঠিক্‌ মানাত!,' কেহ বল্‌ল "এতে রাজসভার অপমান করা হয়." এমনি করে একটা মিশ্রিত কোলাহল যেন সেই বিস্তৃত রাজসভার মাঝে ভ্রমর গুঞ্জনের মত গুণ-গুণ করতে লাগল। বেচারা লজ্জায় যেন অধিক সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌ছিল, তার মুখখানি রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। যখন সে তার মলিন উত্তরীয়ের আড়াল থেকে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করে বল্‌লে, সে চিত্র দেখাতে এসেছে তখনি আবার একটা কোলাহল উঠ্‌ল "দাঁড়াও দাঁড়াও, উনি হচ্ছেন চিত্রশিল্পী, দেখ্‌ছনা চোখের ঢুল্‌-ঢুলে চাওনি, দেখ্‌ছনা ভোলা-ভোলা ভাবখানা!" বেচারা সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না ক'রে একেবারে রাজার কাছে গিয়ে তার কাগজের আস্তরণ খুলে একখানি চিত্র উন্মুক্ত করে ধর্‌লে। সে বুঝ্‌ছিল—যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে' অপর পক্ষের সৈন্যবল দেখে পলায়ন

করা যেমন হাস্যাস্পদ, অভিপ্রায় সিদ্ধি না করে এ রাজসভা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করাও সেইরূপ বিদ্রূপের কারণ হবে তাই সে ভাবছিল এ পরীক্ষা থেকে যত শীঘ্র মুক্তি লাভ হয় ততই মঙ্গল। সে জন্য বেচারা আজ্ঞার অপেক্ষা না রেখে আপন আপনার গুণপণা দেখাতে গেল। মূঢ়ের মত রাজা তার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন, তার অর্থ যেন—এর অর্থ কি, আমি ত কিছুই গ্রহণ করতে পারছি নে! শিল্পের মর্ম্মটুকু যতই মধুর হক্ না, সে এমনি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য যে তাকে এমনি করে সহস্র লোকের মুক্ত কর্ণের কাছে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে তার সৌন্দর্য্য হানি হয় তার গৌরব হ্রাস হয় কিন্তু বেচারা শিল্পী নিরুপায় হয়ে আপন তার মর্ম্ম প্রকাশ করতে বসল। মনের ভাবটুকুকে এমনি উঁচু গলায় ব্যক্ত করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর দু'একবার কেঁপে গেল, শেষে সে বলতে লাগল—"এ চিত্রটির নাম প্রতিচ্ছায়া! আমরা ভগবানের চোখে যত সুন্দর সেই ছবিটি অঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছি। ঐ যে লোকটি যার অঙ্গে সৌন্দর্য্যের লেশ নেই, সমস্ত অঙ্গে দৈন্যের ছায়া সেই জগতের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত অকিঞ্চনও ভগবানের মনের কাছে কি অপূর্ব্ব সুন্দর। ঐ যে ভগবান তাঁর সাম্‌নেই দাঁড়িয়েছেন, তাঁর বুকের কাছে ঐ যে ছবি সেটি হচ্ছে ঐ কুৎসিত লোকের ছায়া। ভগবানের কাছে সে কি বিচিত্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির লাবণ্য এসে জড় হয়েছে, যুগযুগান্তের বসন্তের ছাপ যেন তাতে জেগে উঠেছে, ভগবানের মুখের আলো মুখের রূপ যেন ঐ বুকের ছবিখানিকে উদ্ভাসিত করেছে। তারপর সেই ছবি যখন ঐ কুৎসিত লোকের মনে আঁকা পড়ল অর্থাৎ যেদিন সে জানতে পারলে সেই চিরসুন্দরের মনে সে কি অক্ষয় সৌন্দর্য্য লাভ করেছে, তার সেই কালো রূপও কি আলো হয়ে উঠেছে সেদিন সে আত্মশ্রদ্ধা ফিরে পেল। ঐ লোকটির বুকের কাছে ঐ যে ছবিখানি ওটি হচ্ছে ভগবানের মনে তার ছবির প্রতিচ্ছায়া। সেদিন সে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে গৌরবের আসনে আপনার স্বরূপটিকে দেখছে। আপনার এ রূপ দেখে তার আশা আর মিটতে চাইছে না।" সভাসদেরা নীরবে তার ব্যাখ্যা শুনছিল, মধু পান করতে করতে ভ্রমরের গুঞ্জন যেমন স্তব্ধ হয় তেমনি করে তারা শুনছিল। মহারাজা বললেন "তোমার প্রতিভা স্বীকার করি, কিন্তু এমন শত শত প্রতিভাশিল্পি প্রতিদিন আমার রাজ সভায় আসে। এর চেয়ে অধিক গুণপণা দেখালে পুরস্কার পাবে।" তখন চাটুকারের দল চীৎকার করে আনন্দধ্বনি করে উঠল ঠিক্ বলেছেন মহারাজ! আমাদের রাজা স্বয়ং ন্যায় ধর্ম্মের অবতার!"

বেচারা সেদিন ম্লান মুখে রাজসভা থেকে বেরিয়ে চলেছে এমন সময়ে এক দাসী এসে চিত্রকরকে জানাল' রাজকুমারী চিত্রগুলি একবার দেখবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। সে জানত না যখন রাজসভা বিদ্রূপের হাসি হাসছিল তখন একটি গবাক্ষের মুক্তা ঝালরের আড়াল থেকে দুটি টানা টানা বড় চোখ তার জন্য করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, যখন সে কম্পিত কণ্ঠে চিত্রের মর্ম্মটুকু ব্যাখ্যা করছিল তখন সেই দুটি চোখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছিল! বেচারা তাড়াতাড়ি মলিন কাপড়ের মোড়কটি রাজদাসীর হাতে দিয়ে লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি তাঁর দাসানুদাস তিনি যে অনুগ্রহ করে দেখতে চেয়েছেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।" দাসী চিত্রখানি নিয়ে দ্রুত চরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে। সে কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর দাসী চিত্রখানির সহিত একটি স্বর্ণ মুদ্রা শিল্পীর হাতে দিয়ে বললে "রাজ-কুমারী বললেন আপনি অসঙ্কোচে এ আনন্দের উপহার গ্রহণ করুন, ঠাকুর ঘরে যেমন ভক্ত সওয়া পয়সার প্রসাদ দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করে এও তাই, এ চিত্রের মূল্য নয়, আনন্দের মূল্য!" বেচারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললে "তাঁকে বলো এ কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।" দাসী ফিরে গেল। সে কঙ্কণের শিঞ্জিনী শ্রবণ করে উপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ

করে দেখ্‌লে, বাতায়নে একখানি গোলাপের মত হাসিভরা মুখ তাহাকে অভিনন্দন কর্‌ছে, সে কতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে সৌন্দর্য্য পারিজাতের দিকে চেয়ে রইল যখন কৃতজ্ঞতায় তার নয়নপল্লব সিক্ত হয়ে উঠ্‌ল তখন তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সে গৃহের দিকে ফিরে গেল।

পরদিন সে সাহসে বুক বেঁধে আবার একখানি চিত্রপট নিয়ে রাজবাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হল। এবার সভাসদেরা পূর্ব্ব দিনের মত বিদ্রূপ হাসি হাস্‌ল না বেচারা সঙ্কোচের মাঝেও অনেকখানি আরাম বোধ করলে। মহারাজ বল্‌লেন "দেখি চিত্রকর আজ তুমি কি এনেছ! সে সঙ্কিত লজ্জায় চিত্রখানি তাঁর সম্মুখে তুলে ধরলে। মহারাজ বল্‌লেন "তুমিই ব্যাখ্যা করে শুনাও। আমার স্থূল বুদ্ধি ওর মাঝে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না!" অমনি চাটুকারের দল চীৎকার করে উঠ্‌ল "বলেন কি মহারাজ! বলেন কি! ওর বুদ্ধি এমনি তীক্ষ্ণ যে রাজার বুদ্ধিকে হার মানায়?"—বেচারা লজ্জায় জড়সড় হয়ে বল্‌লে "মহারাজের আজ্ঞা পালনীয়।—এ চিত্রখানির নাম স্পর্শমণি। পৃথিবীতে যে বসন্ত এসেছে, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যে ঐশ্বর্য্যময়ী হয়ে উঠেছে, কাঞ্চন গাছে কাঞ্চন ফুল ফুটেছে, চাঁপগাছে চাঁপা হেসেছে, বকুল গাছে কোকিল গেয়েছে, সে কথা জানা নেই শুধু ঐ প্রেমহীনের কাছে, তার শুষ্ক পুঁথিপত্র নিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছে। তারপর একদিন দ্বার মুক্ত পেয়ে একেবারে অতর্কিতভাবে শুভ্র বসনা প্রেম আস্‌ছে, এত লঘু চরণে ঘরে প্রবেশ করে এত মৃদু স্পর্শে সে তার বক্ষের নীড়ে আশ্রয় নিল যে সে অনুভব মাত্র কর্‌তে পার্‌ল না। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে প্রেম আপনার কাজ কর্‌ছিল, স্পর্শমণির মত তার মনখানাকে সোণা করে দিচ্ছিল তারপর যে দিন বসন্ত অস্তমিত হয়েছে, সূর্য্যের প্রখর তাপে তৃণহীন সেদিন তার বৃক্ষে পত্রশূন্য, ধরণী প্রেম তাকে বাহিরে টেনে আন্‌ল; কোথায় রইল তার শাস্ত্র কথা, কোথায় রইল তার বিধি বিধান, কোথায় রইল তার শুচি বিচার? বস্ত্রে তার মাটি লেগেছে সেদিকে দৃক্‌পাত নেই, পথের ধূলি যে চন্দন প্রলেপের মত কপালে লেগে গেছে সেদিকে দৃষ্টি নেই সে একেবারে প্রেমে আত্মহারা হয়ে একটা শুষ্ক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে চুম্বন কর্‌ছে! যাকে সে সমস্ত শাস্ত্রের মাঝে খুঁজে পায় নি, কালো অক্ষর-গুলি যাঁকে গোপন করে কেবল রসহীন জটিল শব্দ রূপে বেজে উঠেছিল, সে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে সেই প্রেমময়কে বিশ্বে বিরাজিত দেখেছে, রূপরসগন্ধস্পর্শ দ্বারা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছে প্রেম এমনি স্পর্শমণি!" রাজা যখন এই অর্থের সহিত চিত্রটিকে মিলিয়ে দেখ্‌লেন তখন সমস্তই অতি সহজ হয়ে এল, তিনি আনন্দিত হয়ে বল্‌লেন "চিত্রকর, এ সুন্দর চিত্রখানির উচিত পুরস্কার তুমি পাবে!" চাটুকারের দল সমস্বরে বলে উঠ্‌ল "আমাদের মহারাজের মত গুণগ্রাহী আর কে আছে?" সে বিনয়ের সহিত নমস্কার করে রাজসভার বাহিরে এসেই আবার কিসের প্রতীক্ষায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। মনের উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌ছিল এমন সময়ে রাজদাসী হেসে এসে অভিবাদন করে সম্মুখে দাঁড়াল। আজ আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হল না সে তাড়াতাড়ি চিত্রখানি দাসীর হস্তে প্রদান কর্‌লে। সে একাকী দাঁড়িয়ে মনে মনে দুটি কালো চোখের প্রশংসা কল্পনা কর্‌ছিল, পদ্মদলের মত ওষ্ঠের কাছে একটুখানি মৃদু হাসি! দাসী অন্তঃপুর থেকে কখন যে প্রত্যাগমন করেছে সে জানতে পারেনি; নিদ্রোত্থিতের মত চমকিত হয়ে উঠ্‌ল যখন দাসী চিত্রখানি তার হাতে প্রত্যর্পণ করে কাপড়ের অন্তরাল থেকে কি একটি দ্রব্য নিয়ে তার সম্মুখে ধারণ করে বল্‌লে, "রাজকুমারী তোমার চিত্রকলা দেখে আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ এই করকঙ্কণটি উপহার পাঠিয়েছেন!" সে যন্ত্রচালিতের মত তা গ্রহণ কর্‌লে, যন্ত্র চালিতের মত একবার মাথায় স্পর্শ করলে তারপর আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে বল্‌লে "দেবীর প্রসাদ ভক্ত যেমন করে গ্রহণ করে তেমনি করে আমি গ্রহণ করেছি বলো!" দাসী কৌতুকের হাসি হেসে প্রস্থান কর্‌লে। বেচারা কঙ্কণটিকে

কতক্ষণ নাড়াচাড়া করলে দুইহাতে চেপে একবার বুকের কাছে তুলে ধরলে। উপরে দৃষ্টিপাত করে দেখলে—সেই সুন্দর মুখখানি তেমনি জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করছে। রাজকুমারীর দৃষ্টি যেন তার অন্তরে স্পর্শ করছিল, তার নয়ন আপনি নত হয়ে এল. সে মাতালের মত আত্মভোলার মত গৃহের অভিমুখে প্রস্থান করল। কোথা দিয়ে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত অতিবাহিত হ'ল সে জানতে পারে নি. সে যেন একটা সুখের নেশায় উন্মত্ত হয়েছিল। পরদিন প্রভাতে সে তার চিত্র চয়ন করতে বসল. সেই অন্তঃপুরবাসিনী রাজকন্যার কাছে যা তুলে ধরা যায় এমন অঙ্কন কোনটি? শেষে সে আপনার প্রিয়তম চিত্রখানি নিয়ে কম্পিত বক্ষে রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। নিকটেই দ্বারান্তরালে একটি কোমল বক্ষের স্পন্দন সে কল্পনা করছিল. একটুখানি ভূষণের শিঞ্জিনী একটুখানি নিঃশ্বাসের দ্রুত শব্দ সে যেন বুকের মাঝে অনুভব করতে পারছিল। অকারণে তার মুখখানি লজ্জায় রক্তিমাভ হয়ে উঠ্‌ছিল, তার হস্ত কম্পিত হয়ে উঠছিল, তার মুখের কথা মৃদু হয়ে আসছিল। আজ মহারাজের পার্শ্বেই তার আসন স্থাপিত হয়েছে, সভাসদেরা সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলে। সে যখন তার চিত্রখানি তুলে ধরল, তখন রাজা বললেন "শিল্পি তোমার ব্যাখ্যাটুকুও চিত্রের মতই মধুর আর সুন্দর তাই তোমার মুখ থেকেই আমি এরও ব্যাখ্যা শুনতে চাই।" সে একবার আপনার মনের ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করে নিলে, তারপর বললে মহারাজ এই চিত্রখানিই আমার শ্রেষ্ঠ শিল্প। এই চিত্রখানি অঙ্কনকালে আমার মনের উপর যে রং ধরেছিল সেই রং দিয়ে যদি মহারাজ এ চিত্রখানি দেখেন তবে এর পুরা রসটুকু গ্রহণ করতে পারবেন। এর নাম সর্ব্বনাশের ডাক্। ঐ যে বিলাসিনী নারী—ও হচ্ছে মানবাত্মা। ওর অশন চাই, বসন চাই, ভূষণ চাই, অলঙ্কার চাই, ওর কামনার নীলাম্বরী, বাসনার মুকুট চাই, কৃত্রিম বর্ণের আবরণে সে একেবারে চাপা পড়েছে, এমনি কি কৃত্রিম অহঙ্কারের রংএর প্রলেপে তার দেহের বর্ণটুকু ঢাকা পড়েছে। একদিন যখন সে বিলাস-সজ্জায় প্রবৃত্ত, এমন সময়ে ঘরে আগুন লাগল! কি আগুন, সে কি আগুন! অতর্কিত আগুন তার সব বিলাসের উপাদানকে ভস্ম করে দিল, একেবারে ছাই করে দিল; তার বাসনা গেল, কামনা গেল, গর্ব্ব গেল, অহঙ্কার গেল. সব একেবারে ভস্ম হয়ে গেল! এখন ভিতরের শুদ্ধা নারীটুকু বাহির হয়ে পড়েছে, কি তার দেহের বর্ণ যেন ঐ সূর্য্য কিরণের মত উজ্জ্বল! পাবকশিখা তাকে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্যোতির্ম্ময়ী করে গেছে. যেদিন সে এত বড় বিপদের হাত এড়িয়ে শুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে সেদিন সে পরমাত্মার আহ্বান শুনলে। যে দূরতম ছিলেন তিনিই যে নিকটতম তিনিই যে প্রিয়তম তিনিই যে একমাত্র স্বামী এই জ্ঞানটুকু হবামাত্র সে আপনার বাসগৃহ ত্যাগ করে অভিসার করলে! সে সব ত্যাগ করলে তার মায়া—তার মোহ--সব ত্যাগ করলে, আজ আর কোন বন্ধন রাখা চলবে না, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সেই পরমাত্মাকে পাওয়া—নয়ত সর্ব্বস্ব নিয়ে তাঁকে না পাওয়া। সে মনে মনে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল তাই সে সর্ব্বস্ব ত্যাগকেই শ্রেয় বলে বরণ করেছে সে একেবারে পথে বাহির হয়েছে। সর্ব্বনাশের ডাক্ শুনে এই তার অভিসার।" রাজা নির্ব্বাক্ হয়ে চিত্রকরের কথা শ্রবণ করছিলেন, তিনি আনন্দ গদ-গদ কণ্ঠে বললেন "গুণী তোমার শিল্পগুণ আমায় মুগ্ধ করেছে। কোন্ পুরস্কার তোমার যোগ্য আমি তাই বিবেচনা করে দেখে কাল তোমায় পুরস্কৃত করব।" সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। সে ভেবেছিল দাসী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু বাহিরে এসে দেখলে কেহই নেই। সে মনের ভিতরে একটা মৃদু বেদনা অনুভব করলে নিরাশার একটা মৃদু আঘাত! এমন সময়ে উপরের গবাক্ষ থেকে একগাছি শিরীষ ফুলের মালা তার পায়ের কাছে এসে পড়ল, চমকিত হয়ে দেখলে রাজকুমারী! তাঁর বক্ষের উপহার কি তার চরণ স্পর্শ করলে? সে পরম প্রেমভরে তাড়াতাড়ি ফুলের মালাখানি উত্তোলন করে কণ্ঠে ধারণ করলে, একবার কপালে চক্ষে কপোলে

ওষ্ঠে বক্ষে স্পর্শ করে সে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরে গেল। রাজকুমারীর কালো চোখের কোণে একটা অশ্রুর প্লাবন টল্ টল্ করে উঠেছিল—কি তার অর্থ? পরদিন প্রভাতে রাজা শিল্পীর প্রতীক্ষায় এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন কিন্তু কই সে চিত্রকর? রাজ আজ্ঞায় শিল্পীর সন্ধানে পাইক ছুটল, সন্ধান পাওয়া গেল তার গৃহ উন্মুক্ত জনশূন্য সে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে।

মানুষ।

—:*:—

আপনারে নিয়ে আছি
আপনারে পেলে বাঁচি
আর কারও নাহি রাখি হুঁস্
জগতের সেরা জীব আমরা মানুষ।

কাহার কোথায় প্রাণ কিসে হয় ব্যথা দান
কিসে তার অবসান
মানবের কি ব্যথা পরম
জেনেও জানিনা মোরা তত্ত্বের কোথায় গোড়া
করি তাই নাড়াচাড়া
জগতের সৃজন চরম।

কাজ বাগাবার তরে হাসিরে রেখেছি ধরে
নয়ত কে স্থির করে
কত না হাসির দাম
দাতারও দানের খাতা নিজওরে ভরে পাতা
এ নয় আমার গাথা
মিথ্যা কিনিতে নাম।

ভিতরে কি আছে ছার দেখাব কোঁচার পাড়
ছুঁচার কীর্ত্তন থাক্ বাহিরে জলুষ
এই হ'ল মোরা জীব-জগতে মানুষ।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

মানসিক দৃঢ়তা এবং উৎসাহ।

আমরা ইংরেজী Decision কথাটির মানসিক দৃঢ়তা আখ্যা দিতেছি, Webster ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন "Determination ; Unwavering Firmness" আমরা Energyর অনুবাদ উৎসাহ দিয়াছি। Webster এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'Internal or inherent power ; Power exerted, force, Vigour." একাগ্রতা Earnestness কথার এই ব্যাখ্যা "Ardour or zeal in the persuit of anything." সাহস Courage কথাটার এই ব্যাখ্যা "That quality of mind which enables men to encounter dangers and difficulties with Firmness, boldness, resolution." এই সমস্ত গুণগুলিই পরস্পর একপর্য্যায়ে সম্বদ্ধ এবং একভাবে একটি যাহা বুঝায় অপরগুলিতেও তাহাই বুঝায়। একটিকে অপরগুলি হইতে বিশ্লেষ করা কঠিন, জীবন কাব্যে সকল গুলির সমবায়েই এক সুর গঠিত হয়। একটির শেষ এবং অপরটির আরম্ভ কোথায় এ বলা কঠিন, যাহা হউক ইহার কোন্‌টির কি গুণ ও পার্থক্য কোথায়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান আমাদের কার্য্য নয়, ইহার সমবায়ে আত্মবিশ্বাসে, আত্মজয়ী হইয়া মানুষ কি প্রকারে অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করে এবং ভয় ও মৃত্যুজয়ী হইয়া বিরাজ করে তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। এই অদম্য উৎসাহই সিজারকে অসীম খ্যাতি দান করিয়াছিল এবং এই জোরেই তিনি সঙ্গীদিগকে জোর গলায় কহিতে পারিয়াছিলেন "ভয় নাই—সিজার এবং তাহার সেই ভাগ্য তোমাদের সঙ্গে আছে।"

তাঁহার অপরাজেয় সঙ্কল্পের পাশে মানসিক দৃঢ়তা, উৎসাহ, সাহস এবং একাগ্রতা আসিয়া দুর্ভাগ্যকে পরিহাস ও ভীতিকে বিদূরিত করিতে পারিয়াছিল। এই গুণগুলির উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়াই লুথার রাজন্য ও আভিজাত্যবর্গের প্রচলিত চির পরিচিত ধারার উপর সংস্কারের ছাপ মারিতে পারিয়াছিল। একটা কাজ করিতে যাওয়ায় পিটকে পার্লামেণ্টের একজন সভ্য বলিয়াছিলেন 'এ অসম্ভব,' উত্তরে পিট বলিয়াছিলেন "অসম্ভব! অসম্ভবকেই আমি পদদলিত করে চলে যাই।" একবার তার চিত্ত কোন কিছুর উপর সজাগ হইয়া উঠিলে বাধা বিঘ্ন সব আগুনের মুখে ছাই হইয়া যাইত।

'অসম্ভব' সম্বন্ধে এই সব কাহিনী শুধু খেয়াল কথা নহে, যাহারা বাধা বিঘ্ন কঠোরতাকেই অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করেন তাহাদের কাছে পিটের কথা অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের মানসিক দৃঢ়তা আছে এবং মানুষেই কি করিয়া গেছে তাহা জানেন তাহারা ওই উক্তিকেই কর্ত্তব্যের আহ্বান বলিয়া মনে করিবেন। 'কিটো' মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে লিখিবার বেলায় লিখিয়াছিলেন 'আমি নিজে অসম্ভব বলে কোন কিছু বিশ্বাস করি না, মানুষ নিজের সুবিধা এবং পরিশ্রম অনুসারে যা সে ইচ্ছা করে তাতেই পরিণত হতে পারে।" নিজের জীবনেই এ কথার সত্যতা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। বধির বালক কিটো যে আতুরালয়ে জুতোর নক্সা তৈয়ার করিত তার সঙ্গে একবার পরবর্ত্তী জীবনের "Pictorial Bible," Daily Bible Illustrations" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিশ্ববিখ্যাত কিটোর তুলনা করুন। যদি সত্যই 'অসম্ভব' বলিয়া কিছু থাকিত তা নিশ্চয়ই দরিদ্র বধির বালক এবং পুরা-তত্ত্ব-বারিধির মধ্যে কিছু দেখা যাইত। কিন্তু কিটো তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন না, ইহার মানসিক দৃঢ়তা এবং অদম্য উৎসাহের সম্মুখে সব দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে কোনরূপ অসম্ভই টেকে না। "qui credit posse potest" যে পারিব বলিয়া মনে ভাবে সেই পারে।

প্রায় প্রত্যেক কাজেই ভাল মন্দ এমনভাবে জড়ান থাকে যে, মন্দ হইতে ভালটুকু শুধু বাছিয়া লইলেই হইল না, মন্দ ত্যাগ করিবার উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা ও সেই সঙ্গে থাকা একান্ত আবশ্যক। যুবকদিগের কু-ইচ্ছার প্রলোভন হইতে দূরে থাকার জন্য আজকাল এ ধর্ম্মের দিকে যথেষ্ট নজর রাখার প্রয়োজন। এ স্থানে মানসিক দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প স্থির করিবার ক্ষমতা না থাকিলে পতন অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান যুগ যুবকদিগের চরিত্রে এই সব উপাদান চায়; কর্ম্মক্ষেত্র যুবকদিগের জন্য—মন্ত্রণার জন্য বৃদ্ধেরা আছেন। শারীরিক শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের জন্য যুবকেরা বলবান। আলেকজেণ্ডার মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার রাজত্বের বার বৎসর মানবইতিহাসের একটা কাব্য-যুগ। তিনি বিশ্ব বিজয় করিয়া তেত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

জুলিয়স সিজর তিনশত জাতিকে জয় করেন, আটশত নগর অধিকার করেন, ত্রিশ লক্ষ লোক পরাজিত করেন, সাম্রাজ্যের প্রধান রাজনীতিক রূপে পরিগণিত হ'ন, বক্তা রূপে সিজারের সমান এবং লেখক রূপে ট্যাসিটাসের সমান বলিয়া তাহার যশ যখন পরিব্যাপ্ত তখন তিনি যুবক মাত্র।

উনিশ বৎসর বয়সে ওয়াসিংটন উপনিবেশের এক প্রদেশের সহকারী শাসক হ'ন, একুশ বৎসর বয়সে তিনি ফ্রান্সে দূত রূপে যান, তখন হইতে তাহার বিবাহ সময় সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দেশের কোন না কোন উচ্চ শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ভরা যৌবনের সময় তিনি সাধারণের ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া মাউণ্ট ভারনসে বিশ্রাম জীবন কাটাইতে যান। ক্যালভিন ছাব্বিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Institutes' লেখেন। ঊনত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে মার্টিন লুথারের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়। পিট্ কলেজ হইতে বাহির হইয়াই 'হাউস্ অব্ কমন্সে' যান, তেইস বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রী হ'ন, এবং ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বেই গ্রেট্ব্রিটনের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজনীতিকরূপে পরিগণিত হ'ন।

এ উদাহরণগুলি হয়তো ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধেই খাটে, কিন্তু জাতির শক্তি এবং আশা যে তাহার যুবকেরাই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই. কোন কোন যুবকের নামজাদা ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বা অপর কিছু হইবার দৃঢ়সংকল্প শুনিয়া কেহ কেহ উপহাস করেন, ইয়েল কলেজের ছাত্র ক্যালোনের সংকল্প যেমন তাহার সহপাঠীর নিকট অহমিকাপূর্ণ ও অসম্ভব মনে হইয়াছিল তাহাদের নিকটও একথা তেমনি লাগে, একাদন ক্যালোনের একজন সহপাঠী পাঠে তাহার অত্যন্ত মনোযোগ দেখিয়া ঠাট্টা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেসে ঢুকে যাহাতে আমি খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারি—সে জন্য বাধ্য হয়েই আমায় সময়ের সদ্ব্যবহার যথোচিত করতে হয়।" কথা শুনিয়া তার সহপাঠী এ ভাবে হাসিলেন যেন এ ঠাট্টার কথা—ক্যালোন তখন বলিলেন "তুমি সন্দেহ কচ্ছ না কি! আমার নিজের ক্ষমতার উপর এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে—তিন বৎসর মধ্যে যদি আমি দেশ—সভার একজন খ্যাতনামা প্রতিনিধি না হতে পারি তো আজই আমি কলেজ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।" কেহ হয়তো একে অহমিকা বলিতে পারেন—কিন্তু ইহা সেই মানসিক দৃঢ়তা ও উদাম যাহার কাছে অসম্ভব ও সহজ-সম্ভব হইয়া আসে। চরিত্রের এই আমিত তেজ যদি ভাষায় প্রকাশ হলে অনেক সময় অহমিকাপূর্ণ বা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় এতে দু'মুখী প্রতিভা নিয়ে একজন যা করিতে পারিবে অপরে এর অভাবে দশমুখী প্রতিভা নিয়েও তা করিতে পারিবে না, সাহস ভরা উদ্যম একমুখী প্রতিভাকে যত উর্দ্ধে উঠাইতে পারিবে মানসিক দৃঢ়তাশূন্য দশমুখী প্রতিভাও তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না।

এইখানে যতগুলি কৃতকার্য্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা গেল তাহাদের মধ্যেও বাকস্টনের মত চরিত্র বল দেখাইয়াছেন অল্প লোকেই, স্বাভাবিক বুদ্ধির চেয়ে মানসিক দৃঢ়তা ও উদ্যম প্রভাবেই ইনি ধনী ও মানী হইয়া গিয়াছেন। রেভারেণ্ড টমাস্ বিনি ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"একটা অবিবেচক আলস্যপরায়ণ বালক যাহার মধ্যে প্রতিভা কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কোন স্ফূরণ দৃষ্ট হয় নাই, যে ছাত্ররূপে নিজেকে কোন ভাবে পরিচিত করিতে পারে নাই শুধু কুকুর, খেলা ও বন্দুক লইয়া কাটাইয়াছে, উনিশ কি কুড়ি বৎসরের পর—সম্পত্তি যাহা পাইবার আশা ছিল তাহাতেও ছাই পড়িল, বাইস বৎসরে স্বামী ও পিতা হইল কিন্তু কাজ কর্ম্ম কিছু নাই সদাই অভাব যুক্ত কিন্তু প্রথম জীবনের শত অভাবগ্রস্ত এই বালক পর জীবনে কেবল যে শুধু ধনী ও মানীই হইয়াছিল তা নয়, বিগত লেখক, বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক, জনপ্রিয় বক্তা, ও সাম্রাজ্যের একজন ভিত্তি রূপে পরিণত হইয়াছিল—" কি করিয়া কোথা হইতে এ সব আসিল? বাক্সটনের নিজের লেখা হইতেই এ কথার উত্তর দিতেছি "যতই আমার বয়স হইতেছে ততই নিশ্চিত রূপে আমি বুঝিতেছি যে দুর্ব্বল ও ক্ষমতাশালী লোকের প্রভেদ কোথায়? উৎসাহ—অদম্য সঙ্কল্প দৃঢ়তা, একবার যা স্থির—তা করিতেই হইবে, হয় মরণ—নয় জয়। শুধু এই গুণেই বিশ্বে যা করণীয় সবই করা যাইতে পারে। এ ছাড়া কোন প্রতিভা, অবস্থাচক্র সুযোগই দু'পাওয়ালা জীবকে মানুষ করিতে পারিবে না।" অবশেষে বাল্যেই সেই সব ক্ষণিক সুখ দায়ী আমাদের মধ্যে একদিন যখন ভবিষ্যতের ভীতি চিত্তে সজাগ হইয়া উঠিল অমনি সেই মুহূর্ত্তে বাল্য সঙ্গী খেলা ধূলা সব পরিত্যাগ করিলেন। পরে এই একাগ্র ইচ্ছা ও অদম্য উৎসাহ পার্লামেণ্টও বহু সুগঠিত, সুকৌশলী দলের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে গোঁয়ার বলিতেন, এমন স্থির সঙ্কল্প লোকের এ আখ্যা জোটা কিছু অসাধারণ নহে—কিন্তু তিনি সত্যই গোঁয়ার ছিলেন না, তাঁহার মানসিক দৃঢ়তাই লোকের চোখে এই ভাবে বাজিত। একবার ইনি বলিয়াছিলেন—"মানুষের মেরুদণ্ড অবশ্য থাকা চাই নইলে কি করে সে তার মাথা সোজা রাখবে? কিন্তু সেই মেরুদণ্ড আবশ্যক মত নোয়াবে, নইলে কপাল তার চৌকাঠে লেগে চিরে যাবে যে।"

পিজারো একজন জলদস্যু ছিল কিন্তু তার বীরত্ব ও সাহস ক্ষমতা ছিল বিরাট মহাপুরুষের মত। পেরুলুণ্ঠনের একাগ্র আকাঙ্খা হইতে তাহাকে সহস্র বিপদ, কঠোরতা এমন কি মৃত্যু ভীতিকেও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। প্যাঙ্গোতে খাদ্যাভাবে সঙ্গীয় লোকজন সকল পাগলের মত হইয়া উঠিল, ব্যাধি পীড়ায় অস্থির করিয়া তুলিল, তবু তাহার একাগ্র উদ্দেশ্য হইতে একতিল বিচ্যুত করিতে পারিল না। এমন সময় ভাগ্যক্রমে একখানা জাহাজ দেখা গেল, জাহাজের কাপ্তান তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে পানামায় লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কাপ্তানের সে করুণা বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া নিজ তরবারী দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বালির উপর এক রেখা টানিলেন, তারপর দক্ষিণ মুখো হইয়া তিনি তাহার দস্যুতার সঙ্গীদিগকে বলিলেন "বন্ধু ও সঙ্গীগণ! ও পাশে শ্রম, ক্ষুধার জ্বালা, নগ্নতা, ভীষণ ঝড়—এবং মৃত্যু, এ পাশে সুখ ও আনন্দ। ওই দেখ পেরু তার ধন সম্পদ নিয়ে রয়েছে—এখানে পানমার চির দরিদ্র! বেছে নাও—জনে জনে কি চাই? আমি নিজে দক্ষিণেই যাবো। মৃত্যু সম্ভব জানিয়াও তিনি পানামার জীবন বাঁচানো হইতে পেরুই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতেও শিখিবার যথেষ্ট আছে। সতের বৎসর বয়সের সময় সিজার জলদস্যুদের হাতে পড়েন, দস্যুরা মুক্তিপণ চায় একশত। উত্তরে তিনি বলেন "একশ কেন পাঁচশ দিচ্ছি, কিন্তু ছাড় পেয়েই তোমাদের মৃত্যু ব্যবস্থা কোর্‌ব আমি।" স্পেনে তার সৈন্যেরা বিপক্ষ সৈন্যদের আক্রমণ করিতে তার আদেশ অমান্য করায় তিনি হাতে হাতিয়ার লইয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আমি মোরবো এখানে!" এই বলিয়া স্পেনীয় সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, অগণিত তীর তাহার

দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল, এই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়া তাহার সৈন্যেরা আর স্থির থাকিতে পারিল না—তাহারাও দলে দলে শত্রু সৈন্যের উপর পড়িল ও জয়যুক্ত হইল।

রোমে জনরব উঠিল যে পথে বাহির হইলেই সিজারকে হত্যা করা হইবে। এই কথা তাহার কানে গেলে তিনি নিজ দেহরক্ষী সৈনাদের বিদায় দিয়া একাকী অরক্ষিত অবস্থায় পথে বাহির হইলেন, হত্যা-সঙ্কল্প-কারীরা তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মনে করিল ইনি নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন।

যুবকেরা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে পায় পায় শত বাধা দেখিতে পাইবেন, এই প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে মানসিক দৃঢ়তা তাহাদের বিশ্বাসী সঙ্গীরূপে থাকিয়া তাহাদের বাধা উত্তীর্ণ করাইতে পারিবে। এমন অনেক সময় আসে যখন মানুষকে নিজ মানসিক অবস্থার অপেক্ষা অনেক দরিদ্র বেশ এবং নিম্ন শ্রেণীর কাজ আরম্ভ করিতে হয়, এইখানে চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে দারিদ্রের মর্ম্মবেদনা এবং অপরের উপহাসের ফল বড় ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। স্বচ্ছন্দপ্রিয়তা এবং স্বাভাবিক কার্য্যে অনিচ্ছা মানুষের বহু মহৎ ভাবকে সুপ্ত রাখে, যদি এই দৃঢ়তা ও উদ্যম তাহাদের বিজয়ের পথে চালিতে না করে ত তাহা অমান সুপ্তই থাকিয়া যায়।

একটা ঘটনার উল্লেখ করি—এক যুবক ইংলণ্ডের এক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ছিলেন, এক উচ্চশ্রেণীতে তাহাকে 'এ্যালজাব্রা' শিখাইতে হইত, শিক্ষকের বইখানার সমস্ত আঁকই বেশ করা ছিল, শুধু একটা অধ্যায় তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, ক্লাশ ক্রমেই সেই অধ্যায়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছিল, তিনিও আঁকগুলি কষিবার জন্য বিপুল শ্রম করিতেছিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই ঠিক মিলিতেছিল না, হতাশ হইয়া তিনি অপর একজন শিক্ষকের নিকট আঁকটি লইয়া গেলেন সে শিক্ষক কথাও দিলেন ঠিক করিয়া দিবেন, কিন্তু সে দিন ক্লাসে সে অধ্যায় পড়াইবার কথা তাহার পূর্ব্বদিন কিছুই না করিয়া ফেরৎ দিলেন। শিক্ষক তখন কি করেন! ক্লাসে গিয়া তিনি আঁক কষতে পারেন নাই এ স্বীকার করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই! এ বড় অপমানের কথা। চার মাইল দূরে তাহার এক বন্ধু ছিলেন তিনি খুব ভাল আঁক জানিতেন। স্কুলের পর বন্ধুর কাছে গেলেন, কিন্তু বন্ধু তখন বাসায় নাই এক সপ্তাহের পূর্ব্বে তার ফিরিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, শেষ আশাও এই ভাবে গেল! নিরাশ চিত্তে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, পথে আসিতে আসিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন অকৃতকার্য্যতার কি চূড়ান্ত নিদর্শন তিনি! "কি! এ্যালজাব্রার একটা সমস্যার সমাধান করতে পাচ্ছি না! ক্লাসে ফিরে গিয়ে আমার এই মূর্খতা দেখাতে হবে।" দৃঢ় সংকল্প এবং উৎসাহ তাহার চিত্তকে সজাগ করিয়া তুলিল, তিনি উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমি পারবো এ সমস্যার সমাধান করতে! আমি কষবো এ আঁক!" বাড়ী পৌঁছিয়া নিজ গৃহে গিয়া তিনি এই দৃঢ়তা লইয়া আঁক কষিতে বসিলেন—যে এ না হওয়া পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা কিছু নাই আজ। তিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন, আঁকটি সম্পূর্ণ কষিয়া তার নীচে রাখিলেন "১২। ১৪ বার চেষ্টার পর ২০। ২৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া সেপ্টেম্বর ২—১৮—রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আঁকটি কষিতে সক্ষম হইলাম।"

একাগ্র সংকল্প ও উদ্যমে মানুষ বুঝিতে পারে যে কি মহাশক্তি তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। মানব-সমাজে অগ্রণী হইতে গেলে জাতির এই দুইটি গুণ বিশেষভাবে থাকা দরকার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ছোট বড়।*

—(আলোচনা)—

চোখ মুখ ফুটে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই যে সাহিত্যের আলোক ও বাতাস আমাদের বুকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে—এমন কি, অধিকাংশ স্থান বেদখল করে' ফেলেছে, তার নাম হচ্ছে কাব্য-সাহিত্য, তা, সে গদ্যে বা পদ্যে যাতেই বিরচিত হোক্ না কেন। কাব্য-সাহিত্য আমি তাকেই বল্‌ছি, যা' মানুষের হৃদয়-ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে' আমাদের অপরিমিত বৃত্তি বৈচিত্র্যের আঘাতে সংঘাতে আন্দোলিত হ'তে হ'তে বহির্ঘটনার উপকূলে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে;—যা' ঘটনার চেয়ে ভাবনাকে, যুক্তির চেয়ে মনন শক্তিকে, উক্তির চেয়ে ইসারাকে বেশী বেগবতী করে যায়,—এক কথায় যা' বাহিরের চেয়ে ভিতরকে বা রসাত্মক বাক্যের চেয়ে 'বাক্যের আত্মা' ঐ রসকেই অধিকতর উজ্জল করে' ধরে। এই কাব্য-সাহিত্যের আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবিষ্কার করা যায়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক-বৃন্দের প্রতিভা-উদ্ভাবিত প্রণালী-বৈচিত্র্য তার নজিরও আছে প্রচুর; কিন্তু আলোচ্য-প্রসঙ্গে সে-সকল কথার উল্লেখ টাই কি অনাবশ্যকও হতে পারে, কেননা, কালীপ্রসন্ন বাবুর আধা-নাটকীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি উক্ত লেখকবৃন্দের অনুরূপও নয় বা প্রতিরূপও নয়—অথচ, তাঁর চিত্রণ প্রণালীর এমন একটী বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্য-সুন্দর মনুষ্যত্ব-ব্যঞ্জক নিজস্ব রূপ আছে, যা পাঠকপাঠিকাদের ডেকে সজোরে বল্‌তে পারে "মনস্তত্ত্ব-ব্যবসায়ীদের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রস-বিন্যাস-কৌশল উপভোগ কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও একটু নেক নজর করে' গেলে সময় নষ্ট হবে না।"

এই লেখকের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বর্ত্তমানের মনোবিজ্ঞান-প্রধান রস-সৃষ্টির যুগে ইনি Sociologyকেই প্রাণের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে বরে দাঁড়িয়েছেন; অথচ সমাজ ধর্ম্মের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফল মানবধর্ম্ম-দৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁকে অনুদারও করে তোলেনি। এটা বড় কম শক্তির পরিচায়ক নয়; কেননা, মানুষ সাধারণতঃ যে ক্ষেত্রে কাজ করে, সেই ক্ষেত্রের সত্যই তার কাছে অত্যুগ্র হয়ে উঠে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের সত্যকে ম্লান করে থাকে এটীও প্রাকৃতিক সত্য,—আর এ সত্যকে যিনি যে পরিমাণে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম, সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃতির প্রভু।

'ছোট বড়'-সম্বন্ধে কথা কইবার আগে কেতাব-রচয়িতাটীর প্রকৃতি সম্বন্ধেও যে কথা কইতে হচ্ছে, তার কারণ, প্রসঙ্গান্তরে পূর্ব্বেই বলেছি যে গ্রন্থের চেয়ে গ্রন্থ কর্ত্তার দিকে আমার নজর বেশী। বস্তুতঃ কোনো বই পড়ে বইটা কেমন হয়েছে তা' দেখার চেয়ে, তার রচয়িতার চিত্ত গঠন কিরূপ তা' দেখাই সর্ব্বাগ্রে দরকার; আর তা' এইজন্যে যে আমাদের দেশে ছোট-মুখে বড় কথা শুন্‌তে পাওয়া একেবারেই আশ্চর্য্য নয়। সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের দুশ্চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মতন সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চেরও নকল দেব-দেবী আজকাল সুলভ। 'ছোট বড়' সম্বন্ধে আমার পক্ষ থেকে সকল কথার প্রধান ও প্রথম কথা হচ্ছে এই যে এ কেতাবে লেখক বড় প্রাণ নিয়ে অনেক ছোট কথা বলেছেন, কিন্তু ছোট মুখে কোন বড় কথা বলে' শ্রোতৃদেবীদের পিত্ত চটিয়ে দেন নি।

এ গ্রন্থের ভাগ্য দেবী আলো ছায়ার বরণ ডালা মাথায় করে' সাত জোড়া ভিন্ন জাতীয় যুগলমূর্ত্তিকে সাত পাকে প্রদক্ষিণ করে' গিয়েছেন, আর সে মূর্ত্তি সাতটি এই—

(১) রাইচরণ ও মালতী, (২) কিষণলাল ও সাগরী, (৩) শম্ভুরাম ও ক্ষেমঙ্করী, (৪) কান্তিকান্ত ও বিজয়া, (৫) মোহিত ও মীরা (৬) সুরপনাথ ও লালা, (৭) মোহিত ও বেলা। এই সপ্ত যুগলের মধ্যে প্রথম তিন জোড়া 'ছোট তরফের', আর শেষ চার জোড়া 'বড়-ঘরের। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন

*উপন্যাস—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

--"দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্"—কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁর মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি ঐ 'ছোট'র তরফে ঢেলে দিলেও 'বড়র' দিক্ হ'তে এক চোখোমি করেন নি,—দোষে-গুণে দু'দিকেই ঘটনার ঢেউ তুলে গিয়েছেন।

তাঁর রাইচরণ ও মালতী, হৃদয়-সর্ব্বস্বতার ভিত্তিভূমিতে কোমল ও কঠোরের নিপুণ বিমিশ্রণে যত্নে আঁকা দুটী মর্ম্মস্পর্শী চরিত্র। কিষণলাল ও সাগরীর মতন বুদ্ধি-উজ্জ্বল, সংযত, সরল অথচ Stage-free প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর জীবন্ত চিত্র দেখে লেখক মহাশয়ের হাতের তুলি কেড়ে নেবার লোভ হয়। সব চেয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর 'ক্ষেমঙ্করী-চরিত্র' এবং আমার বিশ্বাস, এ-জাতীয় নিখুঁত ফটোগ্রাফের অন্তর্নিহিত অমল সৌন্দর্য্যটুকু চক্ষুষ্মানদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই আকর্ষণ করবে।—এরূপ চরিত্রাঙ্কণ যে-কোনো শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর পক্ষেই গৌরবের কথা। বিজয়াকে লেখক অন্তরভরা শ্রদ্ধায় মণ্ডিত করে' এ-গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে দেবী-প্রতিমার মত তুলে ধরেছেন,—গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁরই মর্ম্মস্থানে এসে দুঃখ ও করুণা, গ্লানি ও তেজস্বিতা, অন্তর্দাহ ও গরিমায় ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে; এঁকে দেখ্‌লে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি—"মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সাহবে, জগতের মহাদুঃখ যত।"

এই ঘটনাবহুল গ্রন্থখানির ফাঁকে ফাঁকে পল্লী ও সহরের নানাজাতীয় নিসর্গ-শোভা শান্ত-শীতল ছায়া ফেলে নেমে আসায়, গ্রন্থ-পথযাত্রী চিত্ত-পথিক অনায়াসেই শ্রান্তিদূর করতে পারে। পাত্রপাত্রীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার মধ্যে ফেলে লেখক মহাশয় "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা" করবার নৈপুণ্য যে ভাবে প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁর বহুদর্শিতা, মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের সুখদুঃখ ও আশাআকাঙ্ক্ষার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ কালীপ্রসন্ন বাবু যে কতটা তন্ন তন্ন করে' দেখেছেন, তা' শুধু 'ছোটবড়' কেন, তাঁর যে-কোনো কেতাবেই উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রাচীন ও আধুনিক রুচির সমন্বয়-সাধন-কল্পে ইনি যে একটী একাগ্রলক্ষ্য স্থির-ইঙ্গিত নানান গল্পে চালিয়ে যাচ্ছেন, তা' কোনো বিষয়ের একদেশদর্শী মীমাংসায় উপনীত হ'তে অনিচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আধুনিকের চোখে এ-জাতীয় রচনা প্রণালীর দোষ যা' ঠেকে তা' এই, যে এতে জায়গায় "অনেক কথায় একটুখানি" বলা হয় এবং তাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু উত্তরে কালীপ্রসন্ন বাবু অনায়াসেই বল্‌তে পারেন যে তিনি সাধারণ পাঠকের চিত্তোৎকর্ষ-বিধানের জন্যেই তাঁর সুশিক্ষিত লেখক জীবনটী উৎসর্গ করেছেন, সুতরাং মনোরাজ্যে ভ্রাম্যমান নরনারীর বিচারে যা' দোষাই বলে' গণ্য, তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূলে তাই হচ্ছে একটী বিশিষ্ট গুণ,—কেননা সাধারণ পাঠক সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী না হওয়ায় "অল্পের মধ্যে অনেকখানিকে" নাগাৎ করে' উঠ্‌তে পারে না। বলা বাহুল্য, তাঁরও জবাব নিখুঁতই হবে; তা' ছাড়া, আমাদের রচনাদি যে সকল মানস-মহলে ব্যর্থ হয়, তাঁর সৃষ্টি যে সেখানে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে থাকে, আমি নিজেই তার একজন পাকা সাক্ষী। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিনী, যাঁরা পাছে ময়লা হয় এই স্নেহান্ধ আশঙ্কায় আমার লেখা untouched by hand রেখে যান, কালীপ্রসন্ন বাবুর বই বা অন্য রচনা পেলে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিয়ে যাওয়া যে দরকার মনে করেন না, তা' আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি।

সে যাই হোক্, 'ছোটবড়'-রচয়িতার অঙ্গীকৃত ব্রত যে বঙ্গীয় সমাজের একটী প্রকাণ্ড দিকের পর্দ্দা তুলে নবরুচিসম্পন্ন পাঠক ও লেখকের চক্ষে একটী নূতনতর ideal realistic জগত চিত্র খুলে ধরবার দায়িত্বভার সগৌরবেই বহন করে' চলেছে, এ-কথা চোক্‌-গলায় বলা যেতে পারে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভাষা ও সুর।— শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, প্রণীত ও ১নং তাঁতিবাগান রোড, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার ১৬ পেঃ ১৬৪+।৶০ পৃষ্ঠা; ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্য পুরু কাগজের বাঁধাই ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় সমালোচকের কলম হাতে তুলিয়া লইয়া লিখিয়াছেন—"'ভাষা ও সুর' একখানি গীতি কাব্য—কতিপয় খণ্ড কবিতার সমষ্টি মাত্র। কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আবেগ ও একটা প্রবাহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে হৃদয় যখন কাঁদিয়া উঠে, * * * আমাদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, এবং সেই হিসাবে এই কাব্যের দুই একটি কবিতার স্থানে স্থানে একটু আধটু ভাষায় ছন্দের ও মিলের দোষ পরিদৃষ্ট হইবে। "দু'একটি মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।" লেখকের এই সত্য উক্তিতে আমাদের প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই!— "কিছু নাই, কিছু নাই, শুধু ছাই, শুধু ছাই,

ছাই হয়ে যায় জীবন যৌবন ছাই হয়ে যায় মানবের মন,
ছাই হয়ে যায় প্রণয় রতন, কেঁদে কেঁদে ছুটে যাই!—
যাহা ছিল খাঁটি হয়ে গেল মেকি!— প্রাণ কেঁদে বলে,—হায় হ'ল একি?
খেতে হয় তাই খাই, (?) কিছু নাই, কিছু নাই!"

কবিতার নমুনা। লেখক কৃতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট,—তাঁহার নিকট আশার বাণীই আমরা আশা করি, তা না দিন দিন কেন দেশের আশা, উন্নত শিক্ষার ফল যাঁহারা, তাঁহারা দিন দিন এমন হতাশ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন! কবি মনঃক্ষুন্ন হইয়া উদাস-প্রাণে—

"যাক্ যাক্ সব চলে যাক্!
যাক্ সুখ, যাক্ আশা, যাক্ ফুল, যাক্ পাতা, (?)
হ'ক্ ধরা জ্বলে পুড়ে খাক্!
* * *
যাই আমি, যাও তুমি, তোমারে পেনু না আমি
এ জীবনে আর।—
বড় তৃষা, বড় তৃষা, চারি দিকে মরুভূমি
অনল অনল চারি ধার—"

বিভীষিকা দেখিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন—"গাহব ধ্বংসের গীতি" তিনি জানেন যে— "যে গীত মিশিয়া যাবে ধ্বংস-কোলাহলে
মোরে লয়ে ক্ষণেকের পরে!"—জানিয়া শুনিয়া এ "প্রাণের এমারের উচ্ছ্বাস" প্রকাশ করিলে সংসারের অপকার ব্যতীত উপকার আর কি আজকাল অনেক লেখা-বুলি অনেকের মুখেই শুনিতে পাই,—কবি কলম ধরিয়াই "তুমি সখি মোর; ঘোঁচে ঘোঁচা ধরি হাত, নাহি কিয় দৃক্‌পাত চলিব কেবল" * * * "যে

এই বুক মাঝে রাখি, চুম্বন দিয়ে!",—"অপূর্ব্ব (!) আনন্দাবেশে ছ'টি প্রাণ ভেসে যাবে —মুদিব নয়ন!" ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়া বসেন। শিক্ষিত তাঁহারা, নিজে বুঝেন ও জানেন সমস্তই, তাঁহাদের উক্তি কতদূর সমীচিন—

"কি বলিতে কি যে বলি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি,

পাগল হইতে মোর বাকী কিবা আর" আর না!—

—কবির ভাষা ও ছন্দে বেশ প্রবাহ বিদ্যমান; যাঁহাদের এরূপ শক্তি আছে—তাঁহারা যেখানে, তাহার অপব্যবহার করিলে স্বভাবকই দুঃখ হয়!

তুষার।—কবিতা-গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন। ৪৯ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ হইতে শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' মুদ্রিত। আর্টপেপারে পরিপাটী ছাপা। ১৬ পেঃ ৫০ পৃঃ সুন্দর কাগজের কভার। মূল্যের উল্লেখ নাই।

'তুষারে'ও প্রেমিক-প্রেমিকার বা কবীন্দ্রের 'মানস-সুন্দরীর' প্রেমের খেলা, নানা ভাবে, নানা সুরে তাহার বিকাশ-চেষ্টা; সেই অরূপকে স্বরূপে পাইতে কবি আকুল হইয়া ফিরিয়াছেন!—

"খুঁজিয়াছি তোমা কভু জনতার মাঝে মোহাক ভেবেছি, তব পেয়েছি সন্ধান;
সখাতার গ্রন্থ যথা হৃদয়ে বিরাজে, ভেবেছি, দেখেছি তব লতিকা-বিতান!
যেথায় পিতার পুণ্য জননীর স্নেহ শতেক লহরী তুলি স্পর্শেছে হিয়ায়;
জ্যোৎস্নার আবছায়ে হয়েছে সন্দেহ অঞ্চলের অন্তরালে দেখেছি তোমায়।"

কিন্তু অরূপের রূপ চর্ম্ম চক্ষুতে পড়ে নাই। "পাইনা দেখিতে তোমা—বুঝি আকর্ষণ!"
সেই আকর্ষণে কবি মুখর। আশায় কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

"একবার যদি সে পায় আমার অধরে দাও, ওগো, দাও তুমি একটী ফুৎকার
শিহরি জাগিবে পক্ষী হৃদয় পিঞ্জরে গলিবে হিমাদ্রি শিরে আবদ্ধ তুষার।"

ভুল ভুল! আবদ্ধ তুষার কি ফুৎকারে গলে? তুষারকে গলাইতে হইলে উত্তাপ চাই, ফুৎকার নয়! মুখে শুধু বলিলে হইবে না— 'ওগো আমি সেই গান সেই গান চাই

যে সঙ্গীতে সারা গৌড় মাতাল নিমাই, যে গান মথিত হ'ল ব্রজের গোকুলে!"

সে যে বড় সাধনার ফল! অ আর স্বরূপ কথা! 'চাই চাই' রবের স্থান, অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় উক্তির স্থান তথায় কোথা? "সে বড় বিষম ঠাঁই। গুরু শিষ্যে ভেদ নাই!" সংযমে, আত্ম-শুদ্ধিতে, বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দ বিভোর যে তাহার বক্ষেই না তাঁহার প্রকাশ—জীবে জীবে তাঁহার বিভূতি দর্শন—সাম্যের মৈত্রীর ভাব,—প্রেম,—তখন না—প্রাণের প্রার্থনা—

"ওগো আমি সেই গান, সেই গান চাই, আর্য্যে ও অনার্য্যে হবে জাতীয় বন্ধন
নাই বর্ণ ভেদ, সাদা কাল নাই সমস্ত মানবে এক সাম্রাজ্য রক্ষণ।"

বনে তাহা সার্থক করুন।

"দ্বার খোলা ওগো, দ্বার খোলা ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—
ঘর ছাড়া মোরে যে করিল ওরে
তারি ঘর খুঁজি দেশ দেশ।"

—পরিমল

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সৌজন্যে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

দরবেশ।

—ঃ*ঃ—

দ্বার খোলো ওগো, দ্বার খোলো ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—
ঘরছাড়া মোরে যে করিল ওরে
তারি ঘর খুঁজি দেশদেশ;
গিরিদরীবন ভ্রমিয়া বেড়াই,
মনের মানুষ মিলিল না ভাই,
আলেয়ার প্রায় লুকালো কোথায়,
সন্ধান নাহি হল শেষ।

কত দিন মাস, বরষ বরষ,
কত যুগ গেল বৃথা হায়,
স্নেহনীড় ছাড়ি' দু'পাখা পসারি'
বিহঙ্গ ভাসিল নীলিমায়;—

কোথায় হারাল ধরণীর কোল,
বনবীথিকার স্নেহ-হিল্লোল,
পিয়াসার জল মাগি অবিরল
বিফলে অসীম অজানায় !

কোন্ নিষাদের বংশীবাদন,
কোন্ রাখালের বেণুতান,
মনোহরিণীরে ভুলাইল ধীরে,
গোপীরে করিল আনচান্ ?—
বিসরি' শ্যামল শোভাসম্ভার
মরুবালুকায় একি হাহাকার !
কবে যমুনায় টুটে যাবে হায়
অভিসারিকার অভিমান ?

ঘর হল পর, নিকট সুদূর,
মিলিল না তবু অবকাশ,
পথ চলি' হায় পথ না ফুরায়,
বৃথা খুঁজে মরা বারমাস ;
পায়ে ছিঁড়ে এনু স্নেহের বাঁধন,
তেয়াগিয়া গেহ, প্রিয় পরিজন,
তবু শেষ ঠাঁই মিলিল না ভাই,
একি গো নিঠুর পরিহাস !

—বিদায় বিদায় হে গিরি কানন !
হে নদনিঝর গীতিময় !
ফিরিনু আবার আঁচলে তোমার
ওগো পুরাতন লোকালয় !
বাহিরের আলো-রাগিণী-লীলায়
ইঙ্গিত খুঁজি' হারাইনু হায়,
মানবের মাঝে বুঝিনু বিরাজে
চিরমানবের পরিচয় ।

দ্বার খোলো ওগো কে আছ ভবনে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে অনিমেষ
হের গেহহীন স্বজন বিহীন
কুণ্ঠিত দীন দরবেশ ;
মনের মানুষ কোথায় আমার,
সন্ধান হেথা মিলিবে কি তা'র ?
মিটিবে কি আজ প্রাণের পিয়াস ?
বৃথা পথ-চলা হবে শেষ ?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-সমস্যা--

সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়ের অভিমত।

বর্ত্তমান এপ্রেল মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহোদয়ের "National Education" শীর্ষক জাতীয়শিক্ষা সম্বন্ধীয় আর একটি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে! বক্ষ্যমান প্রবন্ধ তাহার অনুবাদ।

(২)

জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনটি অভিমত আমার সমক্ষে বিদ্যমান। প্রথমটি শ্রীমতী এনি বেশান্তের, দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলকের ও তৃতীয়টি সার রাসবিহারী ঘোষের। তন্মধ্যে, নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে গেলে, মাত্র প্রথমটিতে বিষয়োপযোগী গবেষণা বর্ত্তমান ; সুতরাং সেইটিরই আলোচনা প্রথমে করা যাক্। শ্রীমতী বেশান্ত বলিয়াছেন "বৈদেশীক অনুশাসনে, বৈদেশীক আদর্শে যে জাতির সন্তানগণের শিক্ষা ব্যবস্থিত, সে জাতি যত দ্রুত পুরুষত্বহীন ও তাহারা জাতীয় চরিত্রে যেরূপ অসার দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এমন আর কিছুতেই নহে। ১৮৯৬ খৃঃ হইতে আমি বরাবর ভারতবাসীকে জেদের সহিত ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া আসিতেছি যে, তাঁহাদের সন্তানগণকে যে প্রণালীতে যে শিক্ষা দান করা হইতেছে তাহা জাতীয়তার বিরোধী ও আত্ম-ধর্ম্ম-বিনাশকারী! বৈদেশীক আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, বৈদেশীক পোষাকপরিচ্ছদ, বৈদেশীক হাবভাব রীতিনীতি দেশাবগহিত ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে মণ্ডিত করিয়া, মিশনারী বিদ্যালয়ে বিদেশীয় ভাষায়, এরূপ ভাবে বাল-হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইলে, তাহার উর্ব্বরতার আশা আর কোথায় ? এরূপ শিক্ষায় বালকের প্রকৃতিগত-আত্মধর্ম্মটি পর্য্যন্ত যে সত্বাহীন হইয়া তাহার জাতিপ্রাণতাকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

শ্রীমতী বেশান্ত শিক্ষা সমস্যা সমাধানে আরও অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—"আমাদের জাতীয় শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত?" এবং ইহার উত্তর তিনি নিজেই নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করিয়াছেন।

(১) "ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতবাসীর দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের কর্তৃত্বে তাঁহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া অত্যাবশ্যক! ভারতের যাহা বিশেষত্ব সেই ঐকান্তিক ভক্তি আদর্শ, জ্ঞানবাদ ও তাহার নীতিসূত্র, ভারতীয় ধর্মের মূল-সত্তা,—সর্ব্ব বস্তুতে ঐশিক-শক্তির অনুভূতি,—সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়িকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষার মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার মূল ভিত্তি হইবে,—প্রশস্ত-উদার, সহনশীল-নমনীয়, সর্ব্বভূতাশ্রয়াত্মক। সে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে মানিয়া লইবে—সমগ্র মানব সঙ্ঘের গন্তব্য-লক্ষ্য ভগবান,—পথ বিভিন্ন,—লক্ষ্য এক, সকলকে পৌঁছাইতে হইবে আত্মার-আত্মাতে। স্বীকার করিতে হইবে—সকল সাধু সিদ্ধপুরুষ (prophets) তাঁহার প্রেরিত, তাঁহার বাণী প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

(২) "জাতীয় শিক্ষাকে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল শ্লাঘ্য স্বদেশ-প্রেমের আবহাওয়াতে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস আলোচনা দ্বারা, এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলাদি সুকুমার-বিদ্যা, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, উপনিবেশ-সংস্থাপন বাণিজ্যব্যবসা প্রভৃতি সুগোচিত সর্ব্ব কার্য্যে ভারতবাসীকে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া সেই প্রাণ-বায়ুকে স্বাস্থ্যদায়ক নির্ম্মল মধুর করিয়া রাখিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অর্থশাস্ত্রও তুল্য ভাবে অধীত হইবে। ধর্ম্মালোচনায় উৎসাহে বিজ্ঞান ও রাজনীতিকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না।"

(৩) "জাতীয় শিক্ষাকে গৃহশিক্ষা হইতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সমস্ত পণ্ড হইবে। একের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ও মূলতত্ত্ব অন্যের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিত হওয়া চাই। পারিবারিক জীবনের বহির্ভাগে পোষাকী জাতীয়তা,—গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিতে হইবে। কলেজের অধ্যক্ষ, ইস্কুলের শিক্ষক গৃহের উপদেষ্টাগণের সহিত একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিবেন।"

(৪) "জাতীয় শিক্ষাকে প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয় ধাতুতে গঠিত করিয়া জাতীয় স্বভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে ন্যূনাধিক পরিমাণে ইংলণ্ড বনিয়া গেলে চলিবে না—ভারতকে ভারতের নিখিলত্বে (into a mightier India) আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বৃটেশের আদর্শ ইংরেজের পক্ষে কল্যাণকরী কিন্তু ভারতের মঙ্গল ভারতীয় আদর্শে। আমরা প্রতিধ্বনিকে প্রার্থনা করি না (বিদেশীর সহিত) সমস্বরতা (monotony) আমাদের কাম্য নহে, নিজস্ব ঐক্যতানে প্রকৃতির ও পরমেশ্বরের বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ আমাদের জাতীয়তার একত্বের মধ্যে যাহাতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহারই বিধি বিধানই আমাদের করণীয়। প্রকৃতি কি একই বর্ণে, একই প্রকার বৃক্ষ লতায়, পত্র পুষ্পে, সরিৎ সাগরে, পর্ব্বত প্রস্তরে, আকাশে বাতাসে আত্মপ্রকাশ করেন? মূলের বৈচিত্র্য বিকাশেই পূর্ণসত্ত্বার প্রকাশ,—'একঘেয়ে' একত্বে নহে। ভারতের পক্ষ হইতে দোষক্ষালনার্থ পক্ষ সমর্থনের জন্য ওকালতীর আবশ্যকতা নাই, ভারতীয় ধরণধারণের, রীতিনীতি ও পরম্পরাগত প্রবাদ কিংবদন্তির অনুকূলে কৈফিয়ৎ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন,—ভারতের নিজস্ব ভারতেই—তাহার প্রমাণ জগতে হইয়া গিয়াছে,—পক্ষ সমর্থন প্রচেষ্টার আর আবশ্যক? যে দেশের অতুল সৌন্দর্য্য সম্ভারের ভিতর দিয়া ভগবান স্বয়ং যে দেশের সুধীজন চিত্তে আদিতে আত্মবিকাশ করিয়াছিলেন, সে দেশের জাতীয়তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণার দরকার?"

শ্রীমতী বেশান্তের এই অভিমত প্রকাশের ভাষা কি হৃদয়গ্রাহী, প্রত্যেক দেশনায়কের মনোমদ! কি ওজস্বিতায়, কি উৎসাহবর্দ্ধনে, কি মানসিক নির্ম্মলতা সাধনে, তাহা অদ্বিতীয়! আমিও নিজে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া

প্রত্যক্ষ করিয়াছি ইহা কিরূপ ফলপ্রসূ! * * * শ্রীমতী বেশান্তের উদ্দেশে আমাদের,—ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার অন্ত হয় কি? তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ও বারানসীর হিন্দু কলেজ সম্পর্কে যেরূপ অক্লান্তভাবে ও আন্তরিকতার সহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ভারতের স্বরাজ স্বায়ত্ব-শাসন সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রই ভারতবাসীর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সুতরাং এরূপ শ্রদ্ধেয়ার উক্তি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে হইলে তাহা বিশেষ বিবেচনা ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হওয়া উচিত। সেই ভক্তি-আনত হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার সহিত, তাঁহার মতবাদ আলোচনা করিয়া আমাকে যদি বলিতে হয়, আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, তাহা দোষাবহ হইবে কি? তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করেন না—কেহ অন্ধ-ভক্তের মত, তাঁহার মতবাদের অনুসরণ করে! সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ততার দাবীও নিশ্চয়ই সে মনস্বিনী রাখেন না।

ভারতীয় জননায়কের কর্ত্তব্য অতি কঠোর! তাঁহাদিগকে এমন একটি মানবসঙ্ঘের জাতীয়তার বিধি-বিধান ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে যাহার পারিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, গ্রহণ পরিবর্জ্জনে গঠনের যুগ! সুবিবেচনা ও শিক্ষাই সুগঠনের মূলে! সুতরাং শিক্ষাই আমাদের জীবন-মরণ-প্রশ্ন-সমাধানের আদিকথা, সর্ব্ব-সমন্বয়ের প্রধান সমস্যা—জাতীয়তার ভিত্তিভূমি! কাজেই শিক্ষাসম্বন্ধে কোনও উক্তি—তাহার লক্ষ্য, পরিণাম ও প্রণালী 'ষবপব-ভাবে' বিশেষ-বিবেচনার বাহিরে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আমাদের ভবিষ্যত, শিক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে! অতএব আমাদের সম্পূর্ণ মানসিক বল, যাহার যতখানি শক্তি, প্রাজ্ঞতা, স্থির-বুদ্ধি ধীরভাবে এই শিক্ষা-সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করা উচিত! হতা যেন কাহার (কু) সংস্কার বা ভাব-প্রবণ হৃদয়বৃত্তিতে চালিত হইয়া বিপথগামী না হয়! ইহার প্রত্যেক দিকটা গভীর গবেষণা এবং সমাহিত ও তুলনামূলক চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত, পরীক্ষিত হইয়া গৃহীত হওয়া আবশ্যক! আলোচনা-অনপেক্ষ-দ্রুত-সিদ্ধান্ত ভাবপ্রবণ বা সংস্কারবদ্ধ হৃদয়ের সমাধান আমাদের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত না করুক, তাহাতে যে উন্নতির গতি হ্রাস করিবে তাহা ধ্রুব সত্য!

জাতীয় অন্তঃকরণের এখন তরল অবস্থা! ইহার গঠন বিশেষ বিবেচনা ও বিচক্ষণতা সাপেক্ষ। মোমের ন্যায় ইহাতেও ছাপ অতি সহজে সত্বর অঙ্কিত হইবার কথা! জন-সাধারণ যাঁহাদিগকে নেতৃরূপে মানিয়া লইয়াছে যাঁহাদিগকে ভক্তি করে ও ভালবাসে তাঁহাদের মতবাদের-ছাপ তাহারা অনায়াসে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে! কোন ধারণা রীতি-নীতি জাতীয়জীবনের অন্তপ্রবিষ্ট হইলে, তাহা নির্ম্মূল করা সহজ নহে; * * * সেই হিসাবেই এই প্রবন্ধের অবতরণা—মারাত্মক সমালোচনা বা বক্তৃতা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

(৩)

আমাদের জাতীয় আদর্শ কি, তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা সর্ব্বাগ্রে আমাদের হওয়া উচিত। এই নিখিল সভ্যজগতের (Civilized world) অবিভক্ত অটুট অংশ রূপে, আমাদের দেহ ও মনের কার্য্য দ্বারা, সভ্যতার অধিকতর পরিস্ফুটনে নিযুক্ত থাকাই কি আমাদের জাতীয়তার আদর্শ? অথবা আমরা অন্য সকল বৈদেশীক জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, একক, আপনাতে আপনি আত্ম-জাতীয়-উন্নতি সাধনকেই জাতীয়তার লক্ষণ বলিয়া মনে করি? অবশ্য আমরা শাসন-প্রণালীতে-স্বাধীনতা, অর্থনীতির বিধিবিধানে-অধিকার, জাতীয়তার একতা,

পরস্পর সুখদুঃখে-সমপ্রাণতা ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা, সকলেই প্রার্থনা করি কিন্তু তাহার পরিণাম কি? ইহারা কি আপনারা আপনাতেই সীমাবদ্ধ? না—অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য, পরিণতির উপায় স্বরূপ? যদি তাহাই হয়—তবে সে পরিণাত কি?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন 'মোক্ষ'ই আমাদের লক্ষ্য ও প্রার্থিত বস্তু! মোক্ষ অর্থে কি? ইহাই কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ', বৈদান্তিকের পরমাত্মায় জীবাত্মার সমাধি অথবা আর্য্যসমাজীয় ক্ষণিক পূর্ণানন্দ কিম্বা খ্রীষ্টানদের মুক্তি বা গোঁড়া মোসলেম সম্প্রদায়ের 'স্বর্গ'? অথবা সমস্তই ইহার 'ভ্রান্তি'! প্রকৃত মোক্ষ,—মুক্তি বা স্বাধীনতার মতবাদে নহে—দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, অজ্ঞান-অবিদ্যা, সর্ব্ব প্রকার দাসত্ব হইতে বিযুক্ত অবস্থাই 'মোক্ষ'—তাহা কেবল আমাদের নিজেদের নহে—আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের পক্ষেও। ভারতে এমন ধর্ম্মের অভাব নাই—যাহার মতে মুক্তি—পারত্রিক নিত্য-সুখ লাভের একমাত্র উপায় কৃচ্ছ্রসাধন; দুঃখ-দৈন্যাদির মধ্যে দিয়াই পারলৌকিক পূর্ণানন্দ অর্জ্জনের নির্দেশ; প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্ম্মগুলির ঝোঁকও এই কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে! দুঃখ-দৈন্য রোগ-শোকাদিকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর ব্যাপারে ভারতবাসী যেরূপ সহিষ্ণুতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না তাহাদের সকলের লক্ষ্যই মুক্তি বা নির্ব্বাণে—ত্যাগের দ্বারা পরানন্দ অর্জ্জনে? কিন্তু ইহাও ধ্রুবসত্য যে আমরা নিজের বা সন্তান-সন্ততির জন্য কেহই দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, অজ্ঞতা-অধীনতা ইচ্ছা করি না! হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই এ বিষয়ে এক মত! ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ, স্বাস্থ্য ও জ্ঞান অর্জ্জনই যে ইহলোকে সুখ লাভের একমাত্র উপায় ইহা প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম্মমত-সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লালায়িত। মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এই দিকে। কিন্তু আজও জগত হইতে তথাকথিত সিদ্ধ, পুরোহিত, যাজক, সমাজসংস্কারক তিরোহিত হয় নাই—বা তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না যাঁহারা সর্ব্বকার্য্যের অন্তরালে অবস্থান করিয়া সকলকে বাঁধিতে চাহিতেছেন আপন-আপন মতে;—এবং সুবিধা-মত প্রকাশ্যে বাহিরে আসিয়া প্রচার করিতেছেন অনিত্যতার বিষময় মতবাদ!

বৈরাগ্য বা ত্যাগের-দারিদ্র্য আজও ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া আছে। সন্ন্যাসী, দরবেশ এবং মঠধারীগণ আজও মনুষ্যের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে! এমন কি বিজ্ঞ ও উদার সংস্কারকগণ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। আমরা সন্ন্যাসীদিগকে ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মান্য করি, কাজেই ভাবপ্রধান মন তাঁহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যে অনেক আধুনিকভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেরা সন্ন্যাস-জীবনের ধার একটু না ধারিলেও সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপদেশ এবং আদর্শ দেশের যুবকগণের মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই কতকগুলি মনোজ্ঞ সুন্দর ও মহান্ মূলসূত্র দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সেই সেই ধর্ম্মানুরাগীকে (সমাজ বা ব্যক্তিকে) জীবন-আহবে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করে কিন্তু ধর্ম্মোপদেশের বা জাতীয় সাহিত্যের অধিকাংশই জীবনের অনিত্যতা পরিবর্ত্তনশীলতার উপরই জোর দেয় ও আপামর সাধারণ, ধর্ম্মতথ্য সেইভাবে বুঝিতে চায়। জীবনের উদ্দেশ্য,—পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে পরিবর্দ্ধনের সত্বা বর্ত্তমান—সে কথা সে সঙ্গে অনুধাবন করিতে তাহারা বিস্মৃত হয়!

পূর্ণজ্ঞানই মুক্তি,—ইহাই উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা। কেবল অধ্যয়ন বা ধর্ম্মসাধন-বিধি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিলেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না। জীবনের প্রত্যেক দিক অনুশীলনে, পরিচর্চ্চায়—মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ;

যিনি জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সামাজিকতা, লৌকিকতায় চৌকশ, ধীর সংযত, তিনিই না বৃদ্ধ,—পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী। চিত্ত তাঁহার পূর্ণসত্ত্বায় নিবদ্ধ, তাঁহার চক্ষে নিখিল বিশ্বের কিছুই পরিত্যাজ্য নহে; তিনি সংসার ছাড়া নহেন, সামাজিক প্রত্যেক কর্ত্তব্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ তাঁহার করণীয়, সংসারের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দায়িত্ব, দায়াদ, কুটুম্বিতা সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা, সংসারে যাহা যাহা শিক্ষণীয় জ্ঞাতব্য, পূর্ণজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার প্রত্যেকটির অনুশীলন ও আয়ত্ত করিতে হইবে। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে না তাঁহার, জীবনের একটা দিকের উৎকর্ষতা সাধন উদ্দেশ্যে অপর কোন আর একটা অংশ পরিবর্জ্জনের অধিকার,—সাংসারিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা যিনি অর্জ্জন করিয়াছে, তিনিই উহা বর্জ্জন করিয়া, জীবনের অপর উদ্দেশ্য সাধনে অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবার হক্‌দার। পুরাকালের বিষয়-বাসনা ত্যাগের মূলে ঐশ্বর্য্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন ও দারিদ্র্যের গরীমা প্রচার নিহিত ছিল না, জীবন-নাটকের বিশেষ অঙ্কে বা বয়স বিশেষে বিষয়-বাসনা ধন-আকর্ষণ হইতে নিজকে বিমুক্ত করিয়া মনপ্রাণের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ, সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণই সে বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য ছিল! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে সন্ন্যাসীর উল্লেখ নাই; তৎকালীন শাস্ত্রকে সন্ন্যাসধর্ম্মানুকূলে ব্যাখ্যাত করিতে হইলে যথেষ্ট টানিয়া-বুনিয়া করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, আদিকালে প্রত্যেক মুনি-ঋষিরই অর্থবিত্ত বর্ত্তমান ছিল; পরিবার পরিজন সহ তাঁহারা বসবাস করিতেন। সত্য বটে তাঁহারা কোলাহল-পূর্ণ জনতা, নগর হইতে দূরে অবস্থান করিতেন, তাহা সংসার ত্যাগ ইচ্ছায় নহে,—সংসারের উপকারার্থে। শান্তরাস্পদ আশ্রমে নিরিবিলি বসিয়া, যোগ-সমাধিতে আত্মস্থ হইয়া, জীবন ও আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম নিরূপণে,জগতের, বিশ্বমানবের, জাতির, দেশের অশেষ কল্যাণ চিন্তায় ধ্যানস্থ থাকিতেন। অনিত্যতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে তাঁহাদের চেষ্টা ছিল না—তাহাকে যাহাতে জয় করিয়া শাশ্বত বস্তুর সাক্ষাৎলাভ ঘটে তাহাই ছিল তাঁহাদের চিন্তা গবেষণার মূলে। তাঁহাদের শেষ, লক্ষ্য নহে;—লক্ষ্য শেষ সীমায়—চরম-পরিণামে—মানবিকতা, সামাজিকতার পূর্ণ-পরিণতিতে!

মুক্তির আশাতেও তাঁহাদের সে সাধনা নহে,—জীবনসমস্যা সমাধানে মনুষ্য-সজ্ঘকে সাহায্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য! আত্মস্বার্থ হইতে পরার্থই ছিল সে সাধন-আদর্শ! কালে তাঁহাদের জীবনের সেই সুমহান্ উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝিয়া, পরার্থ সাধনে আত্মোৎসর্গকে ত্যাগ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিল। ত্যাগই হইল তখন তাহাদের চক্ষে পরম গরীমাময় আদর্শশীর্ষ,—মানবজীবনের সার্থকতা—অকূল অন্ধকার জীবন-সাগর-বক্ষে আলোকমঞ্চের শিরোস্থিত পথপ্রদর্শক আলোক-রশ্মি! আদর্শ! সত্য বটে জাতির অতি অল্প লোকই ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ-প্রয়াসী, কারণ ও-মানবধর্ম্ম প্রতিকূল আদর্শ, জীবনে প্রতিপালন করা ত সহজ নয়! সুতরাং অনেকেই এই কাম্য-বস্তুটিকে নিজ জীবনে লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও দশমুখে এই সন্ন্যাস ও ত্যাগ-মহিমা প্রচার করিয়া কৃতার্থ হয়, সংসারকে অনিত্য বলিয়া সাধুতা জানায়,—ভাবটা যেন এমনি—যদিও বক্তা স্বয়ং (ঘোর) সংসারী কিন্তু মনের অবস্থা যেন তাহার এমন (কথায়) যে অন্যে বিশ্বাস করুক্—তাহার সন্ন্যাসী বনিতে আর বেশী দেরী নাই। এমন প্রচারের নিগুঢ় তত্ত্ব, মানুষকে 'সাধু' সেবায় অনুরক্ত করিয়া তোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভীতচিত্তে আমাকে বলিতে হইতেছে—এ প্রবৃত্তি কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—আজকালকার মহম্মদী ও খ্রীষ্টিয় প্রচারক-প্রবরদের সম্বন্ধেও ন্যূনাধিক পরিমাণে একথা খাটে! অনিত্যবাদ-সংস্কার এইরূপে আমাদের হাড়ে-মাংসে এমনি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল যে পৌত্তলিকতাবিধ্বংসপ্রয়াসী (iconoclastic reforming agencies) 'আর্য্যসমাজ' 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের পর্য্যন্ত এই অনিত্যবাদের দিকে ঝোঁক।

তাঁহাদের স্তোত্র, সঙ্গীত ও প্রার্থনা এই ভাবে পূর্ণ! এমন কি ইংরাজী শিক্ষা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় স্বভাবের প্রধান স্থান ব্যাপিয়া আছে এই নশ্বরবাদ, নাস্তিবাদ; (negation) আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা নশ্বরতা নহে—একথা সপ্রমাণ করিতে যে যাহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শত সহস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন, সত্য, লিখিত প্রমাণে আদর্শ আমাদের অন্য প্রকারের কিন্তু সত্যকে সরলভাবে মান্য করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে বাধ্য হইতে হইবে,—আমাদের জনসাধারণ মধ্যে "সংসার অসার" এ বিশ্বাস হৃদয়ে হৃদয়ে!—এ কথাও গোপন করিবার উপায় নাই আমাদের সমগ্র সাহিত্যে এ ভাবের অবাধ প্রসার—আধ্যাত্মবাদের নামে ইহা গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছে। মনুষ্য চরিত্র যেরূপ বিস্তৃতভাবে ও নানা দিক দিয়া হিন্দুর পুরাণ ও মহাকাব্যে আলোচিত হইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে কিন্তু তাহাতেও এ সুরের অভাব নাই।

এই সর্ব্বনাশা মুক্তির বিরুদ্ধে আজ কাল যে দুই একটি প্রতি-উক্তি শুনিতে পাই—সংসারটাকে একটু আমল দেই—সেটা কি ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পর্ক-বিরহিত বৈদেশীক শিক্ষার ফল নহে? ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পর্কহীন এই শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল ভাবিয়াই সময় সময় আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে! এ শিক্ষা ব্যতীত জাগরণ-চিহ্ন দেখা দিত না—দিলেও সুদূর ভবিষ্যতে লোক জাগ্রত হইত কিনা কে জানে! আমার মনে হয়—ভারতের এই অনিত্য-নশ্বরবাদের মূলে কুঠারাঘাতই ভারতবাসীর এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য,—ইহাই আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার মূল কারণ! খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরও এই মতবাদের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্তি আছে কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যদি সেই দিকে মন দিতেন তাহা হইলে কি তাঁহারা কখনও আজ এরূপ উন্নত হইতে পারিতেন? খ্রীষ্টিয়ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করে নাই,—খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের সংসার বিরুদ্ধ মতিগতি সত্ত্বেও ইউরোপ যে এত উন্নত,—জীবনকে জীবনরূপে গ্রহণ করাই তাহার কারণ,—সংসারকে রক্ষা করিয়া জগতের উন্নতি সাধন প্রচেষ্টাই তাহার আদিতে। সুতরাং আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই এখন সাধারণের মনভাব পরিবর্ত্তনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করা—তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া—এ জীবনেরও একটা মহান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান,—পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জীবন পথে জীবাত্মা শাশ্বত মহাত্মার সমীপস্থ হইতে প্রয়াস পাইতেছেন—এ যাত্রার পথ হারাইলে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছান একপ্রকার অসম্ভব। সাধারণের ধারণা জীবনটাই হইতেছে যত দুঃখকষ্টের হেতু—আত্মা ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা ছটফট করিতেছে! অথচ জীবনের উপর টান জীবের সকল টানের উপরে! ভারতবাসীকে এখন বিশেষরূপে বুঝাইবার দিন আসিয়াছে—জীবন নিত্যের স্বরূপ, মূল্যবান, দুর্লভ; যাহা কিছু অর্জ্জন করিবার কালই এই জীবন—ইহা যত বেশী প্রবর্দ্ধিত হয়,—সময়ের অপচয় না করিয়া ইহার উৎকর্ষতায় যতই অতিবাহিত হয় ততই মঙ্গল!

পুরাকালের হিন্দুদিগের মধ্যে এই জীবন সত্ত্বার একটা পরিষ্কার ধারণা পরিস্ফুট ছিল,—মানবিকতার ক্রমবিকাশ কিরূপে সাধিত—সে ধারণা,—বিবর্ত্তনবাদ-জ্ঞান তাঁহাদের ছিল তাহার প্রমাণ আছে! তাঁহাদের সে মতবাদের জের আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, নশ্বরবাদের ঘোর তুফানেও এক কোণে মাথা তুলিয়া আছে। এখনো, এমন কি হিন্দু নিরক্ষর চাষীকে মনুষ্য জন্মের কথা জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে "মনুষ্য জন্ম—দুর্ল্লভ জন্ম;—ইহা অতুল—সর্ব্ব জন্মের সার!"—এ পর্য্যন্ত সে ঠিক্ কিন্তু যখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'এ জীবনের উদ্দেশ্য কি?" তখনি সে মহা গোলে পড়িবে। সে নিত্য শুনিয়া আসিতেছে—সুখ-দুঃখ আকর্ষণ ভালবাসা জীবনের এ বৃত্তিগুলি যত, মায়াসম্ভূত—মহা অনিষ্টের কারণ, আশার বিনাশ, অভিলাষের উৎপাটনই জীবনের কার্য্য—পুনর্জ্জন্ম হইতে পরিত্রাণের উপায়! কাজেই জীবন তাহার নিকট তিক্ত,—সে অক্ষম হইলেও, আদর্শ-হিসাবে প্রার্থনা করে ইহা হইতে

পরিত্রাণ লাভ করিতে। * * * জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত—জাতি হইতে এ ভাবের তিরোধান বিধান। যে সাহিত্যে জীবনের এই ক্রমাত্মক ধারণা বর্ত্তমান তাহা কোনক্রমেই জাতীয় শিক্ষার পাঠ্য হওয়া উচিত নহে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ কিন্তু যে ভাষার সাহিত্যে নীতি-গ্রন্থে এই অনিত্যবাদ মুখরিত, সে ভাষা আমার মতে কিছুতেই জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরের ভাষা হইবার উপযুক্ত নহে,—তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিফল ও পণ্ড হইবে নিশ্চিত! ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনে সংস্কৃত ভাষা অমূল্য! সংস্কৃত হইতে শব্দ অলঙ্কার চয়ন করিয়া দেশমাতৃক ভাষার (vernaculars) উন্নতি ও পুষ্টিসাধনে ইহা অতি মূল্যবান। পাণ্ডিত্য লাভে সংস্কৃত চর্চ্চা অত্যাবশ্যক কিন্তু সাধারণ কর্ম্ম-জীবনে জনসাধারণের পক্ষে ইহার মূল্য নাই বলিলেই হয়। এ হিসাবে সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী বা পারসী ভাষা বরং গ্রহণীয়—এখনও এই দুই ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত আকারে অনেক স্থলের প্রচলিত কথ্য ভাষা! ইউরোপখণ্ডে গ্রীক ও লাটিন যেরূপ ভারতের পক্ষে সংস্কৃত তদ্রূপ। সুচতুর ইউরোপ গ্রীক লাটিনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়াছে,—মাত্র যাহারা নিতান্ত সাহিত্য-বিসারদ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই দু'একজন উহার আলোচনা করেন। সংস্কৃত সম্বন্ধেও ভারতে তুল্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ভারত সন্তানকে যদি এই মহা-জীবনসঙ্কটের দিনে জয়যুক্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মৃতভাষার অনুশীলনে, তাহার গৌরব গাথায় স্ফীত হইয়া অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতে না দিয়া যেগুলি হাতেকলমে সম্পাদন করিলে জীবন সমস্যার সমাধান হয়, তাহাতেই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। অতীত গৌরবে মশ্গুল হইয়া থাকিলে, বাস্তব-জীবনে তাহাতে আর কি উপকার! ভবিষ্যতের সুফল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য! ভারতের ভবিষ্যত বংশধরগণকে মহাধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে ভারতের যাহা তাহার নিজস্ব,—যেগুলির জন্য তাহার গরিমা,—রক্ষনীয় যাহা, শক্তি ও উৎসাহে উৎস যেগুলি নব শিক্ষার কার্য্য-বাসরে উন্নতি-সাধন মন্ত্রে সেগুলি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর জীবনকে স্বাস্থ্যময়—কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগে নিখিল জগতের সহিত ভারতকে ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ হইতেই হইবে! জগতের জাতি সমূহের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থান সংস্থাপন করিতে হইলে ভারতকে তাহার বুদ্ধিবিদ্যা, মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রভৃতির এমন সুপ্রয়োগ করিতে হইবে যে একটুকুও যেন তাহার অপব্যয় না হয়,—সখের অবসর ভারতের কোথা? সত্য, সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-নীতি হিসাবে উহা অতুলনীয় কিন্তু জীবন আহবে উহা অচল! ভাষা বিজ্ঞানে, পুরাতত্ত্ব অনুশীলনে, ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য গ্রীক লাটিন অধীত হইবার উপযুক্ত হইলেও উহারা যেমন ইউরোপ আমেরিকায় পরিত্যক্ত; ভারতের সংস্কৃতকে সেই স্থান দিয়া, ভারতবাসীর উচিত সেই সময়টা নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য আধুনিক প্রচলিত ভাষা (modern languages) শিক্ষায় ব্যয় করা। বুদ্ধিমান হিন্দুগণ এ কথা যে বুঝেন না তাহা নহে,—তাঁহাদের কার্য্যই ইহার প্রমাণ। —আমার ত্রৈত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি,—যাঁহারা (সংস্কৃতের ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন জন্য ও সংস্কৃত পাঠে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে) ডি, এ, ভি কলেজ স্থাপন করিয়া তাহার উন্নতির জন্য অকাতরে শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের সন্তানগণকে উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকান্তর্গত সংস্কৃত পড়াইতে পরাঙ্মুখ, কতকগুলি লোক সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে; মন্তব্য তাহাদের "ও সময়টা বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে।"

ব্যক্তিগত ভাবে, আর্য্য-ঋষিগণের প্রতি আমার সম্মান কাহারো অপেক্ষা কম নহে। সেই অতি-বৃদ্ধগণের অতি-জ্ঞান, বিজ্ঞতার জন্য, আমরা যে তাঁহাদেরই, এ কথা স্মরণে আসিবা মাত্র হৃদয় শ্লাঘায় পূর্ণ হয়। তাঁহারা

তৎকালে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে, আধ্যাত্ম-বিদ্যায়, নানা শাস্ত্রে, সমাজ নীতিতে ও সাহিত্যে অত উন্নত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাই আজ বর্ত্তমান-জগৎ উন্নতি-মার্গে এরূপ অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। বহুদর্শীতাই যদি জ্ঞান ও প্রাজ্ঞতার কারণ হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান-জগৎ সেকাল হইতে তিনহাজার বৎসরে অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই উন্নত শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বর্ত্তমানে বৈদেশীক ভাষায় লিখিত। প্রত্যেক বৎসর, প্রত্যেক মাস—না, বৎসরের প্রত্যেক দিন ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ মতে কোন সমুন্নত বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ এক বৎসর পরেই অচল পুরাতন-মতবাদে পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাস্তব পক্ষে দেখা যায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে প্রাণ কাহার চায়? ওঠ,—জাগ—এইত জগতের নিয়ম. কে আর এই সকল উন্নতমুখ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি বিমুখ হইতে পারে? ফল তাহাতে কি? বৈদেশীক ভাষায় লিপিবদ্ধ বলিয়া যদি আমরা তাহার সহিত পরিচিত না হই বা সেই ভাষায় অজ্ঞতা হেতু সে বারতা হইতে আমরা বঞ্চিত থাকি তাহা হইলে সভ্য জগতে আমাদের আর স্থান কোথা? সুতরাং বৈদেশীক ভাষার আলোচনা আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি জগৎ হইতে দূরত্ব মুছিয়া ফেলিতেছে। এখন যদি আমরা কেবল আমাদের নিজের আদর্শ অভিলাষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনটাকে গ্রহণ করিয়া জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চাই. সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া একালে সম্ভব? বাণিজ্যব্যবসা ব্যপদেশে আমরা অন্য জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য। এ সম্বন্ধ রাখা না রাখা আর আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এ বন্ধন অনিবার্য্য। বিদেশীয়ের হস্ত হইতে বাণিজ্যকে উদ্ধার করিয়া যদি ভারতবাসীকে নিজেই সে কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়, যদি তাঁহারা তাহাতে সাফল্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীর যতগুলি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল; শুধু বিদ্যালয়ে নহে বিদ্যা মন্দিরের বহির্ভাগেও সে শিক্ষায় বিরতি হইবে না। জাতির অধিকাংশকেই কৃষিকার্য্য, ও বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাপৃত হইতে হইবে।—এই সকল কার্য্যে আধুনিক ভাষা জানা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার এমত অবস্থায় আমাদের জাতির ভাবিবাত-আশা বালকগণকে যদি, বিদ্যালয়ে,—সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পথে,—সংস্কৃতের ন্যায় একটি অতি প্রাচীন, অপ্রচলিত, জটিল কষ্টসাধ্য ভাষা শিক্ষায় তাহাদিগের উৎসাহ ও অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বর্ত্তমান জীবনসমস্যার যুগে সংস্কৃত শিক্ষারূপ একটী সখ্‌কে প্রশ্রয় দিবার কাহারও অধিকার নাই। তত্ত্বানুসন্ধান ও প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানার্জ্জন এবং জাতীয় সাহিত্যকে শব্দ সম্পদে উন্নত করিবার জন্য অল্প সংখ্যক লোককেই উহার অধ্যয়ন নিয়োজিত থাকিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই প্রচলিত বৈদেশীক নানা ভাষা ও ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিও শিক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি কেবল দেখাইতে চাই—ভারতের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিসর কিরূপ হওয়া উচিত। জাতীয় সাহিত্য আলোচনা অন্তে জাতীয় শিক্ষা প্রণালীর আলোচনা করা যাক। আমাকে বলিতে হইতেছে, আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত শিক্ষা প্রণালীকে বর্ত্তমান জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার সেই পুরাতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। পুরাতনকে ওরূপ ভাবে গ্রহণ অর্থেই প্রত্যাবর্ত্তন,—অগ্রসর কিছুতেই নহে। স্কুলের বর্ত্তমান শিক্ষারীতি ভয়াবহ; ইহা অপেক্ষা পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীও যে অনেকাংশে মঙ্গলকর। বৃটীশ শাসনের প্রারম্ভে যখন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী গৃহীত হয়, সেই সময়ে প্রাচীন প্রণালী তাহার বিশেষত্ব হারাইয়াছে।

আমার মনে হয় প্রতীচ্যের প্রণালী যে পাশ্চাত্যপ্রণালীর কল্যাণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহাতে মঙ্গলই সাধিত হইয়াছে। পুরাতন প্রণালীর শিক্ষা আমাদিগের জাতীয়-জীবনে যে অবসাদ আনয়ন করিয়া তাহাকে পুরুষত্বহীন করিয়া ফেলিতেছিল তাহার তুলনায় পাশ্চাত্যপ্রণালী গৃহীত হওয়াই আমাদের মঙ্গলের কারণ,—বিষয়টি এরূপ বিস্তৃত ও জটিল যে এরূপ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ইহার আলোচনা একরূপ অসম্ভব, তথাপি কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য দুই একটি মন্তব্যের অবতারণা করিতে হইতেছে।

পুরাকালের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরু ও চেলার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সৃষ্টি করিত, তাহা অনেকাংশে মঙ্গলকর হইলেও অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষার-বিরোধী; এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মানবোচিত সুকোমল প্রাণ-ধর্ম্মকে উন্নত ও প্রসারিত করিত সত্য—আমরা তাহা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে হারাইয়াছি;—কিন্তু পুরাতন প্রণালীতে গুরু, চেলাকে তাহার চরিত্র গঠনের এরূপ কতকগুলি নিয়ম-কানুন ও অভ্যাসের সহিত বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন যে শিষ্যের মনকে সেগুলির দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা হইত। স্বাধীনতা ও অবাধ-চিন্তার স্থান তাহার আর থাকিত কোথা? শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইতেছে মানুষকে স্বাধীনভাবে তাহার ও সমাজের জন্য অবাধ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত করা। 'গুরুকুল' শিক্ষা-প্রণালীতে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইত কি? আমার মতে, না,—হইত না। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকালে শিষ্যকে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় ও গুরু যে বাক্যে শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করেন সেই মন্ত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, পুরাকালে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা প্রতীতি হইবে। শিষ্যের মধ্যে গুরুর আর একটি পূর্ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া তোলাই ছিল সে শিক্ষার আদর্শ! প্রত্যেক পিতা-মাতা ও শিক্ষকেরই উচিত নহে কি যে তাঁহাদিগের সন্তান ও শিষ্যদিগকে নিজ নিজ প্রতিকৃতিতে পরিণত না করিয়া, তাঁহাদিগের অপেক্ষা বালককে আরও উন্নত উদার করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করা! আমার এ অভিমত যদি ভ্রমাত্মক হয় তবে কেহ সংশোধন করিয়া দিলে সুখী হইব।

তৎকালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল বড় কঠোর, পদ্ধতিপ্রাণ ও গতানুগতিক! ধর্ম্মশিক্ষাও যাহা দেওয়া হইত, তাহাও ছিল সংস্কারে আচ্ছন্ন, আচার নিয়মে বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ,—ধর্ম্মের উদার উদ্দেশ্য, চেলার হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা আদৌ হইত না। ব্যাকরণের সূত্র ও পাঠ্যগ্রন্থের মূল কণ্ঠস্থ করিতে বহু সময় অযথা ব্যয়িত হইত। উপনিষদের যুগে বরং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা বর্ত্তমান ছিল কিন্তু সংহিতার যুগে তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া অগ্নি ও লৌহে পরিণত হইল! এ বিষয় ভারতকে একা দোষ দিলে চলিবে না, আরব, গ্রীক, ও লাটিনেও এই দশা—শিক্ষা বিধিমত শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। শিক্ষাপ্রণালীর এই সমস্ত গলতি সত্ত্বেও মধ্যযুগে, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, আরব ও ক্যাথোলিক খৃষ্টানগণ-পরিকৃত বিদ্যালয় হইতে উচ্চদরের কত পণ্ডিত, প্রকৃত বিদ্বান, দার্শনিক ও ব্যবহার-শাস্ত্রবেত্তার উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষতায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে! মানুষের মন যে পারিপার্শ্বিক জগতকে অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ,—দেশের কার্য্যনিয়ন্তাগণের কঠোর অনুশাসন, পিতামাতাগুরুকুলের আদেশনিদেশের গণ্ডি, চির-উন্নত-গতি মানব-মনকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অসমর্থ—সেই মনীষিগণ তাহারই জীবন-দৃষ্টান্ত!

হরিদ্বারে গুরুকুল-বিদ্যালয়, প্রতীচ্যের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর, দোষ ও অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা, এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রগণকে যেরূপ বিচ্ছিন্ন ও জনসাধারণ হইতে দূরে পৃথক্‌ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, পূর্ব্বকালে তদ্রূপ করা হইত কি না সন্দেহ! 'গুরুকুল' এই নাম হইতেই মনে হয় শিষ্যগণ তখন গুরুগৃহে তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত; প্রতি বিষয়ে শিষ্য সেই

পরিবারের সন্তানের ন্যায় বিবেচিত হইত। অধ্যক্ষের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা অধিক হইবার কথা নহে। কিন্তু তৎকালেও সুবৃহৎ আশ্রম ও পারিষদও বিদ্যমান ছিল এবং গুরুগণও শিক্ষা অধ্যাপনায়, এক প্রণালীতে কার্য্যকরণে মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়. কিন্তু ছাত্রগণকে যেরূপে পারিপার্শ্বিক মানবসঙ্ঘ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিবার চেষ্টা ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? শিষ্যগণকে প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণে লোকালয়ে আসিতে হইত, মাতৃজাতির সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবর্ত্তা নিত্যই ঘটিত—তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান!

সংহিতা যে শিক্ষা প্রণালীর নির্দ্দেশ করেন তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তুল্য ভাবে গৃহীত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে! আমার মনে হয় উক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ বালকগণের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল। যাহাই হউক না, বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী পরিকল্পনায় সেই পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি সর্ব্বজাতির শিক্ষা উদ্দেশ্যে আংশিকরূপেও গ্রহণযোগ্য নহে। বিশেষতঃ নিখিল জগতের সহিত সমভাবে উন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার জন্য আমরা আমাদিগের সন্তানসন্ততির যেরূপ স্বভাব গঠন প্রয়াসী পুরাতন শিক্ষপ্রণালী তাহার বিরোধী! আমরা শীতাতপের ভয়ে সন্তানসন্ততিকে বদ্ধতাপ গৃহে (in hot house) মানুষ করিতে ইচ্ছা করি না। তাহারা পরিণামে যে সমাজের নেতা হইবার আশা রাখে, সেই সমাজের মধ্যে যাহাতে তাহারা বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইবার অবসর পায় তাহা ব্যবহিত হওয়াই শ্রেয়। ভবিষ্যত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, প্রত্যেকেরই সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের পূর্ণ জ্ঞান আবশ্যক। তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার প্রলোভন হইতে উচ্চে রাখিতে হইবে তাই বলিয়া তাহাদিগকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। প্রলোভন পরিপূর্ণ জগৎ! পৃথিবী আনন্দ সম্ভোগের স্থান। যতক্ষণ লোকে নিজের ও সমাজের অপকার না করিয়া 'স্ফূর্ত্তি' করিয়া ফিরিতে চায়—তাহাকে অবাধে তাহা করিতে দাও! যে পর্য্যন্ত সমাজের প্রতি তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও সমাজের তাহার দায়িত্ব জ্ঞান থাকিবে—সে পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে সমাজ নিরাপদ, জীবনটাকে সখের সুখের উপাদান ভাবিয়া কিছুতেই সে পাপাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না! বালকবালিকার মনে এই শ্রদ্ধা ও সমাজের প্রতি তাহাদিগের দায়িত্ব যে শিক্ষায় পূর্ণভাবে বাল্যকাল হইতেই জাগ্রত হয় তাহার ব্যবস্থা কর। বাল্যকালে তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই তাহাদিগকে জীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করা! পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূর দূরান্তরে কলেজ, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাল-মনকে জগত হইতে লুক্কায়িত রাখিয়া, প্রাকৃতিক গুণে তাহার চিত্তবৃত্তি বিভূষিত করিবার প্রয়াস, অতি পুরাতন কালের কালাতীত ধারণা, তাহা বর্ত্তমান সভ্য জগতে সর্ব্বোতভাবে পরিত্যাজ্য, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহা মানিয়া লইবেন। শিক্ষার নব আদর্শের মূলই হইতেছে—বালকবালিকাকে, পরবর্ত্তী কালে যেরূপ জীবনের, যাহার মধ্যে যাপন করিতে হইবে তাহাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও,—তাহাদের সমাজের পারিপার্শ্বিক বস্তুর জীবনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ণ সুযোগ তাহারা লাভ করুক! তাহারা যেন একক, বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া প্রকৃত জীবনে, উহার উজ্জ্বল ও অপকৃষ্ট অংশের সহিত অপরিচিত না থাকে,—তাহা না হইলে যে, তাহাদের জীবনে যদি এমন দিন আসে—এমন প্রলোভনের তাহাদিগকে সম্মুখীন হইতে হয় তাহারা তখন বহুদর্শীতার অভাবে কেবল পুথিগত শিক্ষায় বিপদোদ্ধার হইতে পারিবে না! নরনারীকে এই জীবন-আহবে জয়ী করাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে? আমরা তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বা দেশের শত্রু করিয়া গঠন করিতে ইচ্ছা কখন করি না।—অদ্য যাহারা বালকবালিকা—তাহারাই কাল সমাজের স্তম্ভ,—

নগরের অধিবাসী। তাহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ, দেশনায়ক, কার্য্যাগ্রগণী আবিষ্কারক, বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ, বিবেচনাক্ষম, বুদ্ধিচেতা ও দার্শনিক প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি। শিক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে বাস্তবজীবনের ও সমাজের উপযোগী হওয়া চাই! প্রত্যেক জীবন সমাজের,—ব্যক্তি লইয়াই সমাজ! বর্ত্তমানের প্রত্যেক উদীয়মান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজ-নীতিজ্ঞের চেষ্টাই,—প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করা—যাহাতে সে ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা বলে ভালমন্দ হিতাহিত বিবেচনা করিয়া জীবনের প্রতি কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে!

আমার মতে বালক-বালিকাকে সন্ন্যাসীতে পরিণত করিবার কল্পনা ঠিক্ নহে। তাহাদিগকে জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রকার-পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়াই ঠিক্। বালককে বিচ্ছিন্নভাবে ও বালিকাকে পর্দার অন্তরালে মানুষ করা হইলে তাহারা পরিণামে দুর্ব্বল চিত্তের নরনারীতে পরিণত হয়। যখন তাহাদিগকে জীবনে কোন প্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয় তখন তাহারা কদাচিৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের জীবন অভিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার অভাবে পতিত হইয়া যায়, এ কথা আমি কল্পনা হইতে বলিতেছি না—ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। সাধারণতঃ স্কুল ও কলেজে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেও উন্নত-প্রণালী বলা যাইতে পারে না। অন্ততঃ সে শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকে না যাহাতে শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত সামাজিক জ্ঞানে উন্নত করিতে পারে। তথায় বিদ্যার্জ্জন হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে না। এ-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে বলিতে হয়, যুবকগণের অর্জ্জনের প্রবৃত্তি আক্ষরিক জ্ঞানকেই বরণ করিয়া লয় বাস্তবের দিকে তাকাইবার অবসর আর তাহাদের থাকে না। বাহিরে যাহাই হোক চরিত্রের দৃঢ়তা এরূপ ক্ষেত্রে জন্মিতে পারে না—অন্তস্তল তরল দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। সংসারে বর্জ্জন ও অর্জ্জনের বস্তু কোন্‌টি তাহার তুলনা করিবার ক্ষমতা না থাকায় দেশের শিক্ষিত সন্তানসন্ততি আত্মরক্ষায় অনেক সময় অসমর্থ হইয়া পড়ে। তাই,—দেশের জননায়কগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ ও সানুনয় অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয় যে তাঁহারা যেন বালকবালিকাদিগকে সংসার ও মানব-সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সেকালের আদর্শে শিক্ষিত করিতে প্রয়াস না পান। বালকবালিকাদিগকে আশ্রিত, অধীন, বা নিকৃষ্ট মনে না করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গীস্বরূপ যেন গ্রহণ করা হয়। আমরা পূর্ণপ্রাণে তাহাদের উপর যেন পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করিয়া সরলভাবে নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রী ও পুরুষকে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের মিলিত শক্তির সম্ভাবই যেন আমাদের কাম্য হয়। আমি জানি আমার এই মত, সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হইবে না, আমাদের দেশের চিরাগত রীতি-নীতি, বহু শতাব্দীর সংস্কার আমার এ মতের বিরুদ্ধে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সাহচর্য্য-মিলিত-শক্তিতে গৃহ ও বাহিরের কার্য্য করিবার শুভ সময় সমাগত প্রায়; আজ না হউক কাল সে দিন আসবেই আসিবে।

অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি আমরা উপকৃত না হই তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য! জগৎ যাহাতে উপকৃত, আমাদের তাহাই যদি বর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে জগতে আত্মরক্ষা কি সম্ভব,—কেবল প্রাণশক্তির অপব্যবহার নহে কি? নীতিজ্ঞান, ভদ্রতা ও সুশীলতা সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের পরিবর্ত্তন আসিবেই আসিবে। আমাদের বালক বালিকা এমন বর্দ্ধিত শিক্ষিত হইবে যাহাতে তাহাদের স্বাধীনতা সরলতা ও পরস্পরের মধ্যে নির্ভর ভাবকে বর্দ্ধিত করিবে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ অসরলতা আর তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কারণ অসরলতা হইতেই কপটতা নীচতা তোষামোদ প্রভৃতি প্রাণের ব্যাধির উদ্ভব হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষক ও গুরুগণ তাঁহাদের

চির-অভ্যস্ত আদেশ ও কর্তৃত্বের সুর বর্জ্জন করিবেন। বালকবালিকা যে তাঁহাদের মনোমত পুত্তলিকা গঠনোপযোগী কর্দ্দম পিণ্ড নহে এ কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষার্থীর মধ্যেও যে তাহাদের গুরুদের মত মন প্রাণ আশা অভিলাষ আত্ম-আদর্শ বিরাজ করিতেছে তাহা শিক্ষকগণ সর্ব্বক্ষণের জন্য স্মরণে রাখিবেন। মানুষের জ্ঞান ও উচ্চাভিলাষই তাহার পথ প্রদর্শক। সে জ্ঞানকে কেহ যদি কর্তৃত্ব বা আদেশবদ্ধ করেন, তাহা হইলে কি বালকবালিকাদিগের মানবিকতা পূর্ণভাবে বিকাশ হওয়া সম্ভব? যদি হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা পরিচালন করিবার অবসর না দিয়া তাহাদিগকে আদেশে কার্য্য করিতে বাধ্য করা যায় তাহার ফলে তাহারা দাসের মত বিচার-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া কলের ন্যায় কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইবে না কি? উহাই হইয়া যাইবে তাহাদের স্বভাব। ঠিক কথা বলিতে গেলে কোমলমতি বালকবালিকাকে একেবারে আদেশমুক্ত করিয়া নিজভাবে কার্য্য করিতে দিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। মতিতে স্বাধীনতা দিতে হইবে কিন্তু তাহাদিগের গতির দিকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখা চাই। যদি তাহারা বিপথগামী হইতে চায় তখনি গুরুর এই আদেশের অধিকার। আদেশে হউক বা তাহা হইতে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াও বিপথগামীকে আবার সুপথে আনিয়া দাঁড় করাইতে হইবে, বাস্—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু গুরুশিষ্যের ব্যবহার সর্ব্বদাই হইবে অতি কোমল, বন্ধুর ন্যায়। পিতামাতা বা শিক্ষক, সর্ব্বদা শিশুর মনোবৃত্তিকে মান্য করিয়া চলিবেন। কোন জাপানীই বালকবালিকাকে কখনও প্রহার করে না অথচ জাপানের বালকবালিকার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ও আদব-কায়দা-দুরস্ত কমই দৃষ্ট হয়। জাপানীরা তাহাদের সন্তানসন্ততিদিগকে কথায়বার্ত্তায় কার্য্যকলাপে যথেষ্ট সম্ভ্রম করিয়া চলে; তাহারা সন্তানদের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করে না। জাপানে শিশুশাসনে বেত্রের ব্যবহার একেবারেই নাই,—দুর্ব্বাক্যও তথা। অন্যপক্ষে আবার জাপানীগণের জীবন কঠোর শাসনে শাসিত; নগরের অধিবাসীরূপে তাহাদিগকে বহুপ্রকারে বশ্যতা ও কড়া শাসনের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। জাপানী সৈনিকগণ তাহাদের তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও কর্তৃপক্ষের আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালনের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহাদের স্বদেশপ্রীতি ও শাসনকর্ত্তার প্রতি অটুট ভক্তি তাহাদিগকে এরূপ কর্ত্তব্যপাণ করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যকালে শাসিত ও তাড়িত হইলে তাহারা এরূপ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। সংক্ষেপতঃ যে শিক্ষা-প্রণালীতে মনুষ্য-স্বভাব ও গতিমতির উপর শিক্ষকের বিশ্বাস নাই সেখানে প্রকাশ্যভাবে শিক্ষার্থীর উপর কর্তৃত্ব ও দণ্ডের ব্যবস্থা। নব্যভারতের কেহই নরনারী বালক-বালিকাকে সেই হীনচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, যদি কেহ করেন তিনি কোন্ অতীত অন্ধকারের যুগে আজও পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। আমি জানি শ্রীযুক্তা এনি বেশান্ত নিশ্চয়ই সেই অতীত অন্ধকার যুগের পুনরাগমনের ইচ্ছা করেন না কিন্তু ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে যে ভারতে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা পুরাতনের একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা যদি কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈদেশীকের মুখে সেই শিক্ষার সুখ্যাতি শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নির্ব্বিচারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। * * * বৈদেশীকের নিন্দা-প্রশংসায় আমাদের আনন্দ নিরানন্দের কোনও কারণ নাই, অতি বিনীতভাবে আমার স্বদেশবাসীর নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন বিদেশীর নিন্দাপ্রশংসার দ্বারা কখনও চালিত না হন। বৈদেশীকগণ যে আমাদিগের সাহিত্যকে প্রশংসা করেন তাহা মূলতঃ প্রশংসমান হইয়া নহে। তাঁহাদের নিজের প্রণালীর প্রতি তিক্তবিরক্ত ভাবই সে প্রশংসার আদিতে। তাঁহারা দুইটির মধ্যে যথোপযুক্ত তুলনা করেন না, এক চরম মত হইতে অন্য চরমে আসিয়া পড়েন আর কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের প্রশংসা কেবল ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। কতকগুলির আবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমাদের অনিষ্ট সাধন, সুতরাং আমাদের পক্ষে তাঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসার আমল না দেওয়াই

শ্রেয়ঃ। আমাদের এখন মহা জীবন-সমস্যা, প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে এক্ষণে অগ্রসর হইতে হইবে, অবস্থা বুঝিয়া অতি ধীরভাবে ব্যবস্থা করার কাল উপস্থিত,—অন্যের কথায় নাচিবার সময় আমাদের নাই!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

বিরহলোক।

লাজ ভাণ অধিকার আরো কত মিথ্যা ছলনায়
মুখে শুধু কহি নাই—সেথা ছিল বহু অন্তরায়!
সেই হ'তে ওগো বন্ধু আজি পূর্ণ দশ বর্ষ ধরে'
রচিতেছি বালু-সৌধ আপনার সান্ত্বনার তরে।
আশার অতীত দান প্রত্যাখ্যান গৌরব কোথায়
আমি মূর্খ এত দিনে শিখিয়াছি যবে নিরুপায়!
সে ফুলের সে বসন্ত, বাসনার সে আবির হোরি,
সে মৃদু মেদুর মধু মদিরার সে মিলন টোড়ি,
সে মর্ম্মের নর্ম্মনট, পুরাতন সে কেলি কদম্ব
সে আশা স্বপ্নের শোভা সমারোহ, সে অলিকরম্ব
আজি স্তব্ধ শূন্য হাহা অপ্রকাশ আর্ত্তনাদ ভরা
গৌরব অছিলা করি বহিতেছি ক্ষত রক্ত-ঝরা'।

হে বন্ধু বাঞ্ছিত চির এখনো কি বোঝ' নি সে কথা—
মুখের কথাই কি গো এত সত্য, জীবন-দেবতা?
মুখের বচন আছে নিমেষে সে করে তা' প্রকাশ
বুকের কেবল শ্বাস মৃত্যু-সম স্তব্ধ বার মাস।
বলেছি যা' মুখ চেয়ে সত্য-ছলে আমি স্বার্থপর
সে কথার অর্থ কি গো তব পাশে আছে অগোচর?
সে দিনের সেই বাণী আজ দেখি মিথ্যা মিথ্যা-হ'তে
এ হেন বিলম্বে আজ বুঝাইব বল কোন' মতে?

অন্তরবাসিনী হ'য়ে আজো যদি নাহি বুঝে থাক'
তবে চিন্তামণি সম, এ জীবনে আর বুঝো' নাক'।

এ চিত্ত-সরযূ তীরে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন
থাক্ শূন্য, হে প্রবাসি, প্রাণারাম, তোমারি কারণ!
উদগ্র এ বাহু মম শূন্যাসনে রাজছত্র ধরি'
রহিবে তোমারি আশে; তব স্তব-গাথা গান করি
কণ্ঠ মোর র'বে তব বৈতালিক চির নিশি দিন—
তব প্রীতি স্মৃতি মোরে দিবে নব প্রাণ মৃত্যুহীন!
জাগুক্ আনন্দ রাকা নিত্য তব হৃদয় আকাশে
মেদুর মলয়ানিলে মুকুলিত নব মধুমাসে!
যেথা ইচ্ছা স্থাপি পীঠ, কর' দেবি স্বর্গ-বিরচন—
উচ্চতর স্বর্গ আমি তব ধ্যানে করিব সৃজন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পয়লা এপ্রিল।

যেন কাহার ভয়বিতাড়িতকণ্ঠে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; আমি চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। ঘুমের অঞ্জন তখনও চোখে লাগিয়াছিল। নীচের বাগান হইতে হাসনাহানার ভারি গন্ধ জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছিল। গোল টেবিলের উপর টাইমপিস্‌টীর টিক্ টিক্ শব্দ রাত্রি যে সুগভীর হইতেছে তাহার সংবাদ দিতেছিল। স্তিমিত আলোকে দেখিলাম, দেড়টা। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, তাহারই গায়ে যেন গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পরে বুঝিলাম উহা কিছুই নয় দীর্ঘ পত্র সমন্বিত নারিকেল গাছগুলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। আর্দ্রবায়ু ঘরে ঢুকিয়া তন্দ্রালস নেত্রপল্লব মুদিয়া দিতেছিল। হাই তুলিয়া আবার শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় কাতর কণ্ঠে পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে অমি, দেখতো', বাবা, বিভু এইমাত্র উঠে সিঁড়ি দিয়ে কোথায় গেল—কে যেন বিভু বলে ডাকলে—আর সে 'এই যে যাচ্চি' বলেই ধড়মড় করে উঠে নীচে দৌড়ল—আমি নীচে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা—সেখানে কাউকেই তো দেখতে পেলাম না—দেখ্, দেখ্, 'নিশিতেই' বুঝি বা ডেকে নিয়ে গেল—একবার সুরেশ বাবুদের বাড়ীটার কাছে দেখিস্—আমি ফণীকে তুলে দিচ্চি সেও একবার উঠে দেখে আসুক—"

আমি সে অবস্থাতেই বাহির হইয়া দ্রুতপদে সুরেশ বাবুদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিলাম। তাঁহাদের প্রকাণ্ড ফটক বন্ধ—সমস্ত নিস্তব্ধ। পার্শ্বের বাড়ী হইতে গভীর সুষুপ্তি-ব্যঞ্জক নিঃশ্বাসের শব্দেই যাহা কিছু চঞ্চলতা ছিল। সব যেন ঘুমাইতেছে। গলিটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—প্রাণের কোন চিহ্নই যেন নাই। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ী হইতে আমার বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই বিভূতির ছোট ভাই—তাহার অপেক্ষা মাত্র দুই বছরের ছোট ফণী দাদার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, এখন ও ফিরে নাই। বিভূতির বাড়ী হইতে যাইবার পর আধঘণ্টার উপর কাটিয়া গিয়াছে—ফণীও অনেকক্ষণ গিয়াছে। দুই ভায়ের আর দেখা নাই! পিসীমা পাগলিনীর মত ঘর বাহির করিতে লাগিলেন,—কখনও মস্তকে করাঘাত করিতেছিলেন, কখনও বা বদ্ধ পুটাঞ্জলি হইয়া কালীঘাটের কালী ও মাতা মঙ্গলচণ্ডীকে তাহার সন্তানদ্বয়ের বিপন্মুক্তির জন্য সছাগবৎস ষোড়শোপচার পূজা দিবার অঙ্গীকার করিতেছিলেন। অন্যান্য দেবতারাও পূজোপচার প্রাপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হন নাই! আমার মনটাও এই আকস্মিক ঘটনায় ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তথাপি মনোভাব গোপন করিয়া পিসীমাকে সাহস দিলাম যে—"ও কিছুই নয়, এক্ষুণি তারা এসে পড়বে—তুমি ভেবো না, আমিই না হয় আর একবার বেরিয়ে দেখে আসছি—"

পিসীমা আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তাই যা বাবা, একবার দেখেই আয়, শীগ্‌গির ফিরতে চাস্—"

আমি পুনর্ব্বার বাহির হইতে যাইব এমন সময়ে গাড়ীর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম একখানি ঘোড়ার গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে। মনে হইল যেন কাছাকাছি কোথাও থামিবে না। হঠাৎ আমাদের দরজার সামনেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কোচম্যান এত জোরে বল্গা টানিল যে অশ্বিনীনন্দন দুইটী কয়েক সেকেণ্ড ঊর্দ্ধপাদ হইয়া রহিল। পরে অশ্বচালকের অভদ্রতার প্রতিবাদ স্বরূপ পেভ্‌মেণ্টের উপর খুর ঠুকিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল ও ঘনঘন মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল।

গাড়ী থামিতে না থামিতে ঘর্ম্মাক্ত বিভূতি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভূমে লাফাইয়া পড়িল।

(২)

এই ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় খাবার ঘরে সুরেশ বাবুর অসুখ সম্বন্ধে খুব একটা উষ্মার সহিত আলোচনা চলিতেছিল। সুরেশ বাবু ও বিভূতিদের বাড়ীর মাঝখানে তিন চারিখানি বাড়ী। তিনি গ্রহণী রোগে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে কলিকাতায় সারপেনটাইন লেনে তাহার নিজের বাড়ীতে চিকিৎসা হইতেছি। কিন্তু রোগের যখন কোন ও উপশম লক্ষিত হইল না তখন ডাক্তারেরা তাঁহাকে হাওয়া বদলাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের কথায় তিনি গিরিডি যান। সেখানে তিনি উশ্রীনদীর উপরেই একটি সুন্দর বাড়ীতে তিন মাস থাকেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত বন্যশালপুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া নদীজলকে ঈষৎ তরঙ্গায়িত করিয়া যখন বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করিত তখন তাহার রোগের জ্বালা অর্দ্ধেক জুড়াইত, ধীরে ধীরে তিনি সারিয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণিক—তাঁহার আয়ুঃ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। বর্ষার মাঝামাঝি তাঁহার রোগ খুব বাড়িয়া উঠিল। গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া পুত্র সুধীরচন্দ্র মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া পিতাকে কলিকাতার বাড়ীতেই ফিরাইয়া আনিলেন। তাহার পর দুই তিন মাস করিয়া অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি হইল। চিকিৎসায় কোন ফললাভ না হওয়ায় সুধীরচন্দ্র কলিকাতার খ্যাত খ্যাত কবিরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। শেষে ফাল্গুনের একদিনে কবিরাজ মহাশয়,

বলিলেন যে সুরেশবাবুর অবস্থা এখন তাঁহাদের শাস্ত্র ও ঔষধের অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন সর্ব্বব্যাধিহর ভগবানের উপর শেষ নির্ভর তিনি যা করেন। এই নিদারুণ সংবাদ সুধীরের মাতা'কে বিষদিগ্ধ শেলের ন্যায় বিদ্ধ করিল। সেই দিন হইতেই তিনি একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

সুধীরদের আত্মীয়েরা তাঁহার পিতার এই সুদীর্ঘ অসুখের সংবাদ জানিতেন। তাঁহার অবস্থা যখন উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছিল তখন তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত অমুক ডাক্তার অথবা অমুক কবিরাজকে একবার দেখাই-বার জন্য তাঁহারা উপদেশ দিতেছিলেন। তাহার মাতাও বর্ষীয়সী অনেক আত্মীয়ার নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন যে তেরোল নামক একটী গ্রাম পাগলা কালীর উপাসিকা একজন চণ্ডালিনী আছে। সে অনেক রকম তান্ত্রিক আচার বিধি জানে—নিশি জাগাইতে, শ্মশান জাগাইতে, ও তন্ত্রসম্মত নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে সে অদ্বিতীয়। জাগ্রত দেবতার কৃপায় অনেকেই এইরূপ শান্তিস্বস্ত্যয়নের ফল পাইয়াছে। যখন সুরেশ বাবুকে কবিরাজ ডাক্তারের জবাব দিয়াছেন, তখন একবার তান্ত্রিক শান্তিস্বস্ত্যয়েন ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় কি? বৈধব্যের আশঙ্কা শত শত মূর্ত্ত প্রেতের ন্যায় সুধীরের মাতাকে যেন ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতেছিল। তাঁহার অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে এইটাই একটি ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ রেখা। সুধীরের এই সব তুক্‌তাকে বিশ্বাস না থাকিলেও এই গুরু বিপদে মাতার সহিত একমত হইয়া তিনি তান্ত্রিক স্বস্ত্যয়নেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকরণের পক্ষে মঙ্গলবার ও শনিবার প্রশস্ত। সে দিনটা মঙ্গলবার অমাবস্যা। সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সুরেশবাবুদের দীর্ঘায়তন আঙ্গিনায় সুবৃহৎ ত্রিপলের নিম্নে এই তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া চলিতেছিল। একপার্শ্বে দেখা গেল—নরকপালে খানিকটা সুরা, আর একটা আম্রপাত্রে কৃষ্ণতিল, রক্তচন্দন, রক্তজবা, আর একখানি ক্ষুদ্র খড়্গ। অপর একটী পাত্রে তিনটী ডাব, কতকগুলি নীল অপরাজিতা ফুল, রাশীকৃত বিল্বপত্র। নিকটেই যূপবদ্ধ ঘনকৃষ্ণ ছাগশিশু পাতা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া ম্যা ম্যা করিতেছিল।

পূজারিণীর আকৃতি শীর্ণ, ভীষণ কদর্য্য, ঘোর মসীবর্ণ শ্মশান হইতে যেন সদ্য উঠিয়া আসিয়াছে। কেশপাশ আলুলায়িত, মস্তকে রক্তজবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের বৃহৎ ত্রিপুণ্ড্র, কালো কালো চক্ষু দুইটী জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। হস্তে রুদ্রাক্ষবলয়, পরিধানে রক্তাম্বর। হোমকুণ্ডের পার্শ্বে ত্রিশূল হইতে একটী প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিতেছিল।

এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার তড়িতালোক বিচ্ছুরিত কলিকাতার বুকের উপর ঘোর কুসংস্কারপূর্ণ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভিনয় হইবে শুনিয়া ওই গলির শিশু যুবা বৃদ্ধ অনেকেই ব্যাপারটা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব কার্য্যে গোলমাল বিঘ্নকর বলিয়া চণ্ডালনীর আদেশে ফটক বন্ধ করিয়া রাখা হইল। যুবক ও বৃদ্ধগণ ইহাতে চটিয়া চলিয়া যাইবার পর বালকগণ রহস্য ভেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তথায় রহিয়া গেল। কেহ কেহ পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া অতিকষ্টে ফটকের উপর দিয়া ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আর যাহারা ছোট, নাগাল পাইতেছিল না, তাহারা ফটকের তক্তার ফাঁক খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক চোখ ফাটলে দিয়া আর এক চোখ বুজিয়া বিস্ময়াকুল লোচনে সেই অদ্ভুত হোমক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা অনিশ্চিত ভয়ে সকলেরই বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

সেই হোমপ্রক্রিয়ার কথা লইয়াই বিভূতি ফণী ও বাড়ীর ছেলেরা মিলিয়া আলোচনা করিতেছিল ও ইহার ফলে সুরেশবাবুর উপর কিরূপ ফলিবে তৎসম্বন্ধে গবেষণা হইতেছিল। পিসীমা নিশি জাগান ও শ্মশান জাগান কাহাকে বলে তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। ওই ডাবগুলি বড় ভয়ানক জিনিস। হোমান্তে ডাবের মুখ কাটা হয়। তাহার পর "নিশুতি" হইলে—ভোর রাত্রে—হোত্রী উঠিয়া লোকের দরজায় গিয়া কাহারও নাম ধরিয়া ডাকে। যদি সেখানে তিন ডাকে সারা না পায় তো অন্য জায়গায় চলিয়া যায়। কেহ যদি তিন ডাকে সারা দেয় তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। সাড়া দিবার পূর্ব্বে ডাবের "মুখি"টী খোলা থাকে। সাড়া পাইলে 'মুখি'টী বন্ধ করিয়া সেই ডাবের জল রোগীকে খাওয়ান হয়। রোগী ধীরে ধীরে সারিয়া উঠে. অপর ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর কবলগত হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ ছেলেদিগকে বলিয়াছিলেন যেন রাত্রে কেহ ডাকিলে তাহারা তিন ডাকে সাড়া না দেয়।

এই সব অশ্রদ্ধেয় কুসংস্কারপূর্ণ কথা শুনিয়া বিভূতির ভারি রাগ হইল। সে মাকে বলিল,—"এ সব আমি বিশ্বাস করি না—নিশি টিশি আমি মানি না। যদি আমাকে কেউ ডাকে তো আমি সাড়া দেব।" পিসীমা বিভূতির গোঁ জানিতেন বলিয়া কিছু বলিতেন না, কেবল ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এই যে এত ঘটনা ঘটিয়াছে আমি কিছুই জানিতাম না। এক সপ্তাহের পর সেইদিন সাড়ে দশটার সময় আমি জয়খণ্ড হারবার হইতে ফিরিয়াছিলাম। কাজেই পিসীমা যে সুরেশবাবুর বাড়ীর দিকটা কেন দেখিতে বলিয়াছিলেন ও "নিশিতে ডেকে নিয়েগেছে" কেন কহিয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

(৩)

বিভূতি লাফ দিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিল। "ব্যাপার কিরে. গাড়ী কোরে কোত্থেকে এলি ?" জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল "ওপরে এস বলছি।" বিভূতিকে দেখিয়া পিসীমা বলিয়া উঠিলেন—"ফণী কোথারে, তোমাকে যে খুঁজতে বেরিয়েছে।"

বিভূতি বলিল, "ফণী কোথা তা' আমি জানি না।—মা তুমি দেরী কোরো না—তৈরী হ'য়ে নাও—এক্ষুণি তোমাকে যেতে হবে—গাড়ী খুঁজতে এত দেরী হয়ে গেল আমি গাড়ী এনেছি—ভারি বিপদ—"

এমন সময় ফণী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—"মা, অনেক খুঁজলাম—দাদাকে তো খুঁজে—এই যে দাদা! দরজায় গাড়ী কেন মা ?"

কি জানি বাবা,—বিভূতি বলচে ভারি বিপদ. আমাকে যেতে হবে! কি হয়েছে রে বিভু ?"

বিভূতি বলিল—"তুমি তো আর একটু হলেই বিপদ ঘটিয়েছিলে—তোমার কথামত নিশি মনে করে যদি সাড়া না দিতাম তা' হলেই তো চমৎকার হ'তো! মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ থেকে জামাই বাবুর ভাই অবিনাশ এই মাত্র সাইকেলে করে এসেছিল বল্লে মনোদিদির আবার হার্টফেল্ হবার মত হয়েছিল—রাত্রে খেয়ে দেয়ে শোবার পর ঘুমের ঘোরেই গোঁ গোঁ করে উঠেছিল—জামাই বাবু তাকে তুলে মুখে জলটল্ দিতে একটু সুস্থ হ'য়ে বল্লে যে তার বুকটা বড় ধড়ফড় করচে—এ বাড়ীতে একবার খবর দিতে বল্লে তাই তো অবিনাশ দৌড়ে এসেছিল। এত রাত্রে গাড়ী কি পাওয়া যায়, খুঁজতে পুজতে তো এত দেরী হ'য়ে গেল—তোমার কথা শুনে যদি সাড়া না দিতাম তো কি হ'ত বলতো ? ওদের তো ডাক্তার ডাকবার বা ওষুধ আনবার মত লোকই নেই।"

কন্যার অসুখ শুনিয়া পিসীমা বিচলিত হইলেন। তিনি যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। ফণী বাড়ীতে রহিল। বিভূতি ও আমি পিসীমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। "জোর্‌সে হাঁকাইবার" দরুন পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ী মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার সব নিস্তব্ধ কোথাও সারাটুকু পর্য্যন্ত নাই! গাড়ীর ল্যাম্প ছাড়া আর কোথাও আলো নাই—চারিদিকে এ কি? একটা অনিশ্চিত ভয়ে পিসীমা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল তবে কি মনোদিদি আর নাই! সজোরে কড়া নাড়িবার আর উচ্চ চীৎকার করিবার পর জামাই বাবু লণ্ঠন হাতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

"কে, এ, বিভূতি? এত রাত্রে যে এখানে? কোনও বিপদ-টিপদ হয় নি তো? সব ভালো তো? গাড়ীতে কে?"

এত রাত্রে ধাক্কাধাক্কি—ব্যাপার কি জানিবার জন্য মনোরমা উপরের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাকে ও ভাইকে এত রাত্রে গাড়ী করিয়া আসিতে দেখিয়া সে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া স্বামীর পিছনে দাঁড়াইল।

বিভূতি বড় অপ্রস্তুত হইল। বলিল—"এই যে অবিনাশ এক ঘণ্টা আগে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়ে এল যে দিদির হার্ট-ফেল্ হবার মত হয়েছিল! আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বল্লে—আমি একা এসে কি করবো বলেই তো আবার গাড়ীটাড়ী ডেকে মাকে নিয়ে এলাম—"

জামাই বাবু ভয়ানক চটিয়া গিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"হতভাগা, অবিটার দিন দিন বাঁদরামি বাড়ছে—একি কাণ্ড সে ক'রে বসলে—দিন দিন যেন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে—আমি এক্ষুণি তাকে শিক্ষা দিচ্চি।" এই বলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মনোরমার আয়ত লোচনের শাসনেঙ্গিতময় কটাক্ষ তাঁহাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া ছিল—অবিনাশ বৌদি'র কৃপায় সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল! মনোরমা আন্দাজ করিতেছিলেন যে ইহার মধ্যে কোন দুষ্টামি আছে।

বিভূতি বলিল, "আপনাকে যেতে হবে না, জামাই বাবু, আমিই যাচ্চি।"

মনোরমা ও জামাই বাবু পিসীমাকে লইয়া বাটীর ভিতর গেলেন। কোচম্যান বিদায় হইয়া গেল। অবিনাশ নীচের একটী ঘরে পড়াশুনা করিত—সেইখানেই শুইত বিভূতি সেখানে গিয়া ধাক্কাদিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ মুছিতে মুছিতে দরজা খুলিয়াদিয়া অবিনাশ বলিল—"কেহে এত রাত্রে ডাকাডাকি ক'রে ঘুম ভাঙ্গায়—আচ্ছা অভদ্র তো?" তাহার পর একটু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ একি, বিভূতি বাবু যে? ব্যাপারখানা কি?"

বিভূতি আর অবিনাশের ভণ্ডামি দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিলেন "এত রাত্রে এখানে কেন? ব্যাপারখানা কি? ন্যাকামি কল্লেই হ'লো আর কি? খবর-টবর দিয়ে এখন জানেন না কিচ্ছু—সাধু! ইচ্ছে হচ্ছে যে এই ঘুষি দিয়ে তোর নাকটা ভেঙ্গে দি—"

সে কথায় কান না দিয়া অবিনাশ বলিল—"বিভুদা তোমার বুঝি এখনও Somnum bulism সারে নি?—না, ভোর ভোর মর্ণিং ওয়াক্ করতে এসেছো?"

বিভূতি ফোঁস্ করিয়া উঠিল, বলিল—"লজ্জা করে না বলতে রাস্কেল, মাও যে এসেছেন!"

এমন সময় বিছানা হইতে ফিক্ করিয়া হাসির শব্দ হইল। সেখানে অবিনাশের ছোট ভাই মণ্টু শুইয়াছিল। মণ্টুর বয়স দশ এগার বৎসর। অবিনাশ তাকে সব প্ল্যানটা রাত্রে বলিয়াছিল। সে এই মজাতে খুব আমোদ পাইয়াছিল।

অবিনাশ কৃত্রিম বিনয়ের সহিত বিভূতিকে বলিল—"মাপ কর ভাই, এতে আমার কিচ্ছু দোষ নেই। দোষ সব এই মণ্টেটার। সে আজ সন্ধ্যে বেলায় বল্‌ছিল যে অনেক দিন তুমি এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দাও নাই… একদিন তোমাকে ডেকে নিয়ে আস্‌তে বল্লে—তোমার কাছে ও নাকি গল্প শুন্‌তে চায়। তখন দেয়ালের দিকে চেয়ে আজ যে পয়লা এপ্রিল সেইটা হঠাৎ intuition হ'ল—আর মগজে চট্ ক'রে একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়া উঠিল—আমার প্ল্যান তৈরী—মণ্টুকে বল্‌লাম—আজই রাত্রে তোর বিভুদাকে আমি নিয়ে আসব তুই এই ঘরে তাকে দেখ্‌তে পাবি। সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। সমস্ত রাত আর ঘুম হ'ল না। স' একটার সময় বেরিয়ে পড়ে তোমাকে খবর দিলাম। তার পর তুমি যখন একলা না এসে মাকে শুদ্ধ নিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়ী খুঁজতে বেরুলে—তখনই আমার বড় ভয় হ'ল—এই রে, সেরেছ—এ কথাটা তো ভাবি নাই! যাকে এখন তো সরে পড়ি, তারপর যা হয় হবে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সুবুদ্ধি ছেলের মত বিছানায় এসে শুলাম—মন রইল রাস্তার উপর কখন গাড়ী এসে পড়ে। শেষ যখন তোমরা এলে তখন ভয়ে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। থাক্ দাদা, দিনের মর্য্যাদা রেখে একটু রসিকতা করে ফেলেছি—কিছু মনে করো না। তুমিও মাকে এনে আমাকে এপ্রিল ফুল বনিয়েছো—আমি কাল মায়ের পা ধ'রে ক্ষমা চাইব—তুমি রাগ করো না—"

বিপ্রলব্ধ বিভূতি অধর দংশন করিয়া কহিল—"এর শোধ আমি একদিন তুল্‌বোই—"

শ্রীকালীপদ মিত্র।

পতিতা।

—:*:—

চিরদুঃখিনী

হে হতভাগিনি নারি শত পদানতা,
তোমার ব্যথার বলো কে করে গণনা?
রমণীর অজানিত দগ্ধোদর ব্যথা
শতগুণ করিয়াছে ত্রিতাপ যাতনা।

অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথা হৃদয়ে বহিয়া
নারীর অসাধ্য কার্য্য সাধিতেছ নিতি
ফুকারি না পরকাশি দহিয়া দহিয়া
উল্টা করিয়াছ তুমি রমণীর রীতি।

শুধু তাই নহে হায় নিভৃত নিবাসে
দুঃখেরই জীবন যাপা দিবা বিভাবরী
হাস্যে লাস্যে হাব ভাবে কৃত্রিম উল্লাসে
নিজেরে দেখাতে হয় সুখ-সহচরী।

দুঃখ সও মূল্য লয়ে কর পর সেবা
অসীম দুঃখের তব মূল্য দেবে কেবা?

দুঃখের অপূর্ব্ব প্রকাশ

ওগো বারনারী আমি জানিতাম আগে
দুঃখ শুধু কাঁদে শ্বসে করে হাহুতাশ
সেও উচ্চ হাস্যে নৃত্যে হাবেভাবে জাগে
তোমারে হেরিয়া মোর হয়েছে বিশ্বাস

জানিতাম উচ্ছলিত হর্ষ কলতান
আরামের প্রকাশক বিরাম লক্ষণ
তোমারে হেরিয়া মোর হইল গেয়ান
ভ্রম বেদনারো হয় প্রকাশ এমন।

আগে জানিতাম দুঃখ ধূসর মলিন
রুক্ষ কেশে জীর্ণ বেশে ম্লান মুখে রাজে
তোমা হেরি মনে হয়, বিলাস সৌখিন
প্রসাধনে চাকচিক্যে জাগে মাঝে মাঝে।

মনস্তত্ব রীতি তুমি করি ব্যভিচার
অপূর্ব্ব প্রকাশ তুমি দিয়েছ ব্যথার।

পূজার ব্যবসায়

আবাল্য দেবতা শত পূজেছিলে হায়
ভক্তিভরে পত্র পুষ্পে ঢালি গঙ্গা জল
একে একে সব ছাড়ি গর্ব্বিত হেলায়
কন্দর্পেরে করেছিলে হৃদয় সম্বল।

যৌবনের অর্ঘ্য করে গেলে অভাগিনি
ত্যজি গৃহ দেবালয়, তাঁহার পূজায়
তিনিও হলেন বাম, ঠেলিলেন তিনি
তব পূজা উপচার নিতান্ত ঘৃণায়।

তাঁর দয়া তুমি শুধু লভ না জীবনে
বিশ্বের সবার তিনি পূরাণ কামনা
তোমারো নাহিক ভক্তি তাঁহার চরণে
কোনো দেবতায় তুমি কর না অর্চ্চনা।

এখন তাঁহার পূজা তব ব্যবসায়
প্রবঞ্চনা, ঘুচাইতে জঠরের দায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

মাতা মনু।

—:*:—

বেদ-বেদান্তাদি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে চতুর্দ্দশ জন মনুর নাম দেখা যায়—ইহা ছাড়াও আরও বহু মনুর সত্বা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—কিন্তু তাঁহারা সকলেই "পুরুষ মনু"। "মাতা মনু" আবার কোথা হইতে আসিল বা আসিবে?

কথা এই রূপই বটে—কিন্তু যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত রসজ্ঞ, তাঁহারা কখনই—"মাতা মনু"র অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে পারিবেন না। আমরা পৃথিবীর কোনও অভিধানেই "দাশ" শব্দের অর্থ যে "ব্রাহ্মণ" তাহা দেখিতে পাই না। প্রাচীন কোনও কোষেই হিন্দুর নিত্য-ব্যবহার্য্য "ব্যাহৃতি" শব্দের পরিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যও উহার প্রকৃতার্থ লিখিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। বিশ্বকোষ এবং শব্দসার ও প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি সমগ্র বঙ্গীয় অভিধানাবলী উহার প্রকৃতার্থ প্রকটনে অসমর্থ হইয়াছেন।

'যজ্ঞ এবং নাভি'

শব্দের অন্য এক একটী অর্থ যে স্বর্গ ও উৎপত্তিস্থান, তাহাও কোন অভিধানে দেখা যায় না।

সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি

শব্দ যে তিনটী পৃথক্ জনপদবাচী শব্দ—তাহাও কোনও অভিধানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং পৃথিবীর আর কেহ "মাতা মনু"র সত্বার উপলব্ধি করিতে নাপারিলেও সামাজিকগণকে ইহা মনে করিতে হইবে না যে—"মাতা মনু" একটী আকাশ-কুসুমবিশেষ। ফলতঃ আমরা এই বহুবৎসরের গভীর গবেষণায় জানিতে পারিয়াছি যে—"মাতা মনু" শব্দটী বেদ ও রামায়ণ মহাভারতের একটী প্রাক্তন পরিজ্ঞাত শব্দ।

কেন আমাদিগের মনে এই "মাতা মনু"'র সত্ত্বার সমুদ্রেক হইয়াছিল? আমরা শাস্ত্রপাঠকালে জানিতে পারিলাম যে—ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর দশপুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম "মরীচি"। ভারত-ভূষা ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলিলেন যে—

"মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ
কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ। আদিপর্ব।

মরীচির পুত্র কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রজা সকল সমুদ্ভূত। তাঁহারা কাহারা? তাঁহারা—

দৈত্য, দানব মানব, আদিত্য (দেবতা)
বৈনতেয় এবং কাদ্রবেয় প্রভৃতি।

সুতরাং ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু—এই দৈত্য, দানব ও মানবপ্রভৃতি সকলেরই "প্রপিতামহ" বা বীজী পুরুষ। সুতরাং এই—"মানব" শব্দ উক্ত পুরুষ মনু (স্বায়ম্ভুব) হইতে ব্যুৎপাদিত। কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে—

দৈত্য, দানব, (দনুজ) ও আদিত্যেরা

কেন "মানব" বলিয়া বিশেষিত হয়েন না? আমার মনে এই সংশয় ও জিজ্ঞাসা আসিয়া আমাকে সন্ধুক্ষিত এবং মুখরিত করিলে, আমি ইহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। অনন্তর একদিন পুরাণ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বায়ু পুরাণে এই বচনটী দেখিতে পাই—

দিবৌকসাং সর্গ এষ
প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ।

দেবতাদিগের এই যে সৃষ্টিকথা বিবৃত আছে, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহারা সকলেই মাতৃনামে পরিচিত। যেমন—

দিতির পুত্র—দৈত্য, দনুর পুত্র—দানব,
আদিতির পুত্র—আদিত্য এবং বিনতার
পুত্র—বৈনতেয় ও কদ্রুর পুত্র—"কাদ্রবেয়" প্রভৃতি।

তবে কেন কেবল মানবগণ, প্রপিতামহের নামে সমাখ্যাত হইবেন? কেন সন্তানেরা মাতার নামে বিকাইতেন? যেহেতু অতি পূর্ব কালে সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, সুতরাং যে প্রকার বাছুরগুলি স্ব স্ব মাতা ধলী, কালী ও বুধি প্রভৃতির নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সকলে মাতার নামে পরিচিত হইতেন। তৎপর যখন সমাজে বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তন হয়, তৎপরও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সন্তানেরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে মাতার নামেই পরিচিত হইতে থাকেন। যেমন—

দৈত্য-দানব আদিত্য প্রভৃতি

ইঁহারাও কশ্যপের সন্তান হইলেও মাতার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই

কশ্যপস্য অপত্যং পুমান্ কাশ্যপেয়ঃ
গর্গস্য অপত্যং পুমান্ গার্গ্যঃ বা গার্গেয়ঃ

ইত্যাদি সংজ্ঞা হইতে আরব্ধ হয়। সুতরাং ঐ হিসাবে "মানব" শব্দটীও যে স্ত্রীমনু হইতে ব্যুৎপাদিত, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। কিন্তু ইহার প্রমাণ পাইতে বহু বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তৎপর যখন রামায়ণ অধ্যয়ন করি, তখন দেখিতে পাই যে উহাতে এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান—

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টি র্দুহিতরো রাম যশস্বিনো মহাযশঃ॥ ১১
কশ্যপঃ প্রতি জগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনু মপি চ কালকাং।
তাম্রাং ক্রোধবশাঞ্চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামপি॥ ১২
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ॥ ২৯,১৪ সর্গ।

(অরণ্য কাণ্ড।)

হে মহাযশঃ রাম! প্রজাপতি দক্ষের ষাইট জন কন্যা, তাঁহারা অতি যশস্বিনী। কশ্যপ তাঁহাদের মধ্যে সুমধ্যমা আট জনকে (পুরাণ ও মহাভারতের মতে ১৩ জন) বিবাহ করেন। উঁহাদিগের নাম যথাক্রমে—

অদিতি, দিতি, দনু, কালকা,
তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা।

এই সপ্তমী মনুর গর্ভে উক্ত কশ্যপের ঔরসে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কতকগুলি শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই জগতে "মানব" নামের বিষয়ীভূত। আমরা পাণিনীয় ব্যাকরণেও এইভাবের একটী সূত্র পাই যে—

মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ। ৪।১।১৬১

মনু শব্দের উত্তর অপত্যার্থে তৌ প্রত্যয় হইয়া ষুক্ আগমে মনুষ্য, মানুষ এবং মানব শব্দ ব্যুৎপাদিত। কিন্তু আচার্য্য জয়াদিত্য বামন ও ভট্টোজী দীক্ষিত স্বস্ব লেখনী হইতে এমন একটী কথাও বাহির করেন নাই যে এই— মনু শব্দটী স্ত্রী-লিঙ্গান্ত। কেন? হয় ত ইঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীমনুর অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় নাই। অথবা যে কশ্যপ, পার-লৌকিক দেবতাদিগের পিতা, তিনি কেমন করিয়া ভৌম মনুষ্যাদিগেরও জনয়িতা হইতে পারেন? একারণ তাঁহারা পাণিনির মনুকে স্বায়ম্ভুব মনুও বলেন নাই ও ইনি কে? তাহাও ধরা পড়িবার ভয়ে মুখে আনিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। কেবল ইহা নহে, ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতাতে ১৩৩—৩৪,৩৫,৩৬।৩৭ প্রভৃতি শ্লোকে ভৃগু দেবগন্ধর্ব্বপ্রভৃতির সমুল্লেখ করিয়া মানবগণকে উভয়তোদন্তঃ বাঘভালুকের এবং বানরাদির প্রকরণে ধরিয়াছেন! কাজেই মাতা মনুর কথা যোল আনাই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মানবেরা মানুষ, তাঁহারা কি দেবতাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইতে পারেন? সর্ব্বনাশ সনাতন বিশ্বাস রসাতলে যায় যে!!

কেবল ইহাই নহে, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশের প্রকাশকেরা পারলৌকিক দেবতাদিগের সংস্রব এড়াইবার জন্য এই তিন গ্রন্থে যে কশ্যপের এক পত্নীর নাম "মনু" ছিল, উহা কাটিয়া উহার স্থানে "মুনি" বসাইয়া দিয়া তৎ পুত্রগণকে —

বিনতা কপিলা মুনিঃ॥ ১২।৬৫ অ
মৌনেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ৬৫ অঃ। আদিপর্ব্ব

বলিয়া দাগাইয়াদিয়াছিলেন। কিন্তু এ সরস্বতীর ভাণ্ডারে কি "মৌনেয়ঃ" নামে কোনও জন্তু বিদ্যমান আছে? বলা বাহুল্য যে এই মাতা মনুর সন্তানেরাই (২য় বরুণ বা Uranas প্রভৃতি) মানব নামের বিষয়ীভূত—পরন্তু "মৌনেয়" নামের নহে। কিন্তু মহাভারতের ঐ স্থানের ৩।৪টী শ্লোক পরেই—"অনবদ্যাং মনুং" ৪৫।৬৬অ বাক্য বর্ত্তমান, কৃত্রিম কর্ত্তার চক্ষে ইহা পড়ে নাই। ঐ অনবদ্যা মনু কি মেয়ে মানুষ ছিলেন না? এই কারণ আমরা মহাভারতের ন্যায় অথর্ব্ব বেদেও বরুণকে মানুষ বলিয়া সংসূচিত দেখিতে পাই। যথা—

যোদেবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ। ৬০৫ পৃঃ ১ম খণ্ড।

যে বরুণ (Uranas) দেবতাও বটেন, আবার মাতা মনুর সন্তান বলিয়া "মানুষ" অর্থাৎ মনুষ্যও বটেন। এই মানবগণ স্বর্গে দেবগণের সহায় ছিলেন। ইঁহারা উভয় দলই পরাভূত হইয়া স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করেন। তৎপর মনুষ্যেরা ভারত হইতে আবার তুরুষ্ক ও পারস্যাদিতে চলিয়া যান। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি—

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত,
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ। প্রতীচীং মনুষ্যাঃ
উদীচীং রুদ্রাঃ। ৩৬০ পৃঃ

স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দেবতারা ও মনুষ্যগণ চারিদিকে যাইয়া প্রাচীন বংশের পত্তন করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্ব দিকে বর্ম্মায়; বৈবস্বত মনু, অত্রি এবং শম্ব্ প্রভৃতি পিতৃলোক (Father-land) বাসীগণ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, রুদ্রগণ উত্তরে (এ বহু পরের কথা) এবং মাতা মনুর সন্তান মনুষ্যগণ পশ্চিমে তুরুষ্ক ও পারস্যাদিতে গমন করেন (উহাও বহু পরের কথা। কেননা এ সময় উত্তরে সাইবিরিয়া এবং পশ্চিমে তুরুষ্ক আফ্রিকাদি স্থলে পরিণত হইয়াছিল না। মনুষ্যেরা ভারতহইতে পশ্চিমে গমন করেন)। উক্তঞ্চ—

মনুষ্যান্ অন্তরীক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০।৮ অঃ যজুঃ

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু মাতা মনুর সন্তান মনুষ্যগণকে অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানি স্থানে লইয়া যান।

যাহা হউক এতদ্দ্বারা জানা গেল যে কশ্যপের মনুনাম্নীও এক স্ত্রী ছিলেন, মনুষ্য—মানুষ ও মানবগণ তাঁহারই সন্তান-সন্ততি। ভগবান্ মনুও বলিতেছেন যে—

যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ। ১২৪।৬ অঃ

যজুর্ব্বেদ মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যলোক তুরুষ্কাদিতে প্রণীত। (মানুষে মনুষ্যলোকে ভবঃ—মানুষঃ)। এই যজুর্ব্বেদীয় মনুষ্যগণই মুসলমানের ভয়ে তুরুষ্ক পারস্য ও আফগানিস্থানহইতে পুনরায় ভারতে আগমন করেন। ঐ সময় পার্শীরাও ভারতে আগমন করিতে বাধ্য হয়েন। ফলতঃ ভারতের সামবেদীয় ও ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণগণ দেবতা ও যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণই (ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ)। তবে মনুষ্যেরাও দেবতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে সামবেদীয় ঋষি ছিলেন।

আচ্ছা বেদ ত সকল শাস্ত্রের আদর্শ, তবে বেদে কেন মাতা মনুর কোনও সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায় না? কেন দেখিতে পাওয়া যাইবে না? সামবেদের আগ্নেয় পর্ব্বে আছে—

জাতঃ পরেণ ধর্ম্মণা যৎ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ।
পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নেঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ॥

৫১ পৃঃ জীবানন্দ সংস্করণ।

অগ্নি ঋত্বিকদিগের দ্বারা অরণীসংঘর্ষণে উৎপাদিত।—পিতা কশ্যপও শ্রদ্ধাযুক্ত মাতা মনু উক্ত অগ্নির উপাসক ছিলেন।

সায়ণ, মাতা'ক পৃথক্ করিয়া মনুকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি কেন কশ্যপের একটী পিতা-বিশেষণ দিবেন? ফলতঃ—

পিতা কশ্যপ ও মাতা মনু।

এরূপ অন্বয় করিতে হইবে। অতঃপর আমরা ঋগ্‌বেদের একটী মন্ত্রে বিষ্ণু, সূর্য্য ও "মনু জাত" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই মনু জাত শব্দের মনুই মাতা-মনু বটেন।

ত্বমগ্নে বসূন্, রুদ্রান্, আদিত্যান্ যজস্বধ্বরং জনং মনু জাতং। ১।৪৫।১ অ।

হে অগ্নে তুমি অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য এবং মাতৃ মনুপ্রভব উত্তম যজ্ঞকারী মনুষ্যগণকে দান কর।

বেশ জানা গেল যে স্বয়ম্ভুব মনুর প্রপৌত্র আদিত্যগণ মানব বা মনু জাত নহেন।

আমরা যাহা যাহা বলিলাম, তাহাতে আশা করি যে অতঃপর আর কেহ মাতা মনুর আবিষ্কর্ত্তাকে কলম্বসের ন্যায় পাদাহত করিবেন না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

উঞ্ছবৃত্তি।

—:*:—

আমি উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের ঝরা ধান,
আমার সাধ্য কোথা তাই করি গো মুক্ত করে দান
নিত্য আমি বেড়াই খুঁজি
জমলো কোথায় আমার পুঁজি,
টাট্‌কা বোঁটায় কোন ফোটা ফুল হঠাৎ হ'ল ম্লান
উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের ঝরা ধান।

(২)

সুদূর গীতের সুরের লাগি পেতেই থাকি কাণ
আকুল করে ব্যাকুল করে ঝরা ফুলের ঘ্রাণ।
কোন তারাটী ফুটলো আগে
সেইটী আমার চোখেই জাগে,
পথহারাদের দেখ্‌ছি শুধু আমার দিকেই টান
উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের ঝরা ধান।

(৩)

অন্ধকারের দাপট্ সহি, হেরি আলোর বান,
আমি দুখের নিষাদ, সুখের বিষাদ নিত্য করি পান
চায় যে সদাই আমার পানে
কাতর ভাবে মলিন ম্লানে
দিনের চেয়ে সঙ্গী আমার সন্ধ্যা ম্রিয়মাণ
উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের ঝরা ধান।

(৪)

আমি নই ডুবারি তুলতে নারি মুক্তা মণি-খান
উচ্চ তবু তুচ্ছ করি পাণ্ডবোর দান।
চকোর আমি মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে শুধু চাঁদের সুধা।
নইক আমি পিক পাপিয়া নাইক মিঠাগান।
আমি উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠে ঝরা ধান।

(৫)

আমি স্বাধীন চাতক দেবের খাতক বক্ষভরা মান
পারিজাতের পাঁপড়ি ঝরা জলেই করি স্নান।
বিশ্বদেবের চরণ ঘেমে
মন্দাকিনী আসেন নেমে,
আমার তৃষ্ণা ক্ষুধা দুঃখ ব্যথা হয় যে অবসান
আমি উঞ্ছবৃত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের ঝরা ধান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শুণুরে পান্থ !

—:০:—

পথিক ! তুমি সুদীর্ঘকাল ধ'রে অবিরাম গতিতে কি যেন একটা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ নয় ? আহা, আজ তুমি বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, এস এস বঁধু, আমার এই সাধের কুরুক্ষেত্রের অশ্বত্থ মূলে একটু বিশ্রাম কর। এস আজ মানব-জীবনের মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ করা যাক্।

এই মানবজীবন—এই না বড় সাধের মানবজীবন একদিন শান্তির পিপাসায় পঞ্চনদের শ্যামলতীরে জ্ঞানের পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিল, নদীনূপুরা শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশে প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা আনিয়াছিল, গয়াক্ষেত্রে বটমূলে বসিয়া সুকোমল রাজতনুর বিনিময়ে 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' লাভ করিয়াছিল, বীরপ্রসূ মহারাষ্ট্র ভূমে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তের বিজয় নিশান উড়াইয়াছিল, সাগরমেখলা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়াও চণ্ডালত্ব স্বীকার করিয়াছিল, অতিথিপূজার নিমিত্ত পুত্রশিরে খড়্গ হানিয়াছিল, ক্রুশবিদ্ধ হইয়াও হাসিমুখে ক্ষমা করিয়াছিল, সহস্র প্রকারে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত হইয়াও মানবমহামিলনমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু, শান্তি মিলন কই ?—প্রাণ জুড়াল কই ?—সাধ মিটিল কই ?

এই মানব জীবন—ভারতের তপোবনে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিল, মিশরের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিল, গ্রীসের উপত্যকায় দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের মহিমা ঘোষণা করিল, রোমের পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নীতিশিক্ষা দিল, ফরাসী প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতার ভেরী বাজাইল, পারস্যের উদ্যানে বসিয়া পবিত্রতার মূর্ত্তি দেখাইল। কিন্তু, তা হ'ল কই ভাই ?

এই মানবজীবন—প্রেমের সমাধিমণ্ডপে 'তাজ' নির্ম্মাণ করিল, প্রেমময়ী পত্নীর স্বপ্ন সফল করিবার জন্য শূন্যে উদ্যান রচিল, নশ্বরদেহ রক্ষা করিবার জন্য পিরামিড্ সৃষ্টি করিল, শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি, বিখ্যাত স্নানাগার, পম্পেয়াই নগর, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর মন্দির প্রভৃতি গঠন করিল, প্রাণের সখ মিটাইবার জন্য "উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর" সেই টেমস নদীর সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিল, শত্রুকে উপেক্ষা করিবার জন্য মহাপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। কিন্তু, তবু ভরিল না চিত্ত।

এই মানবজীবন—অমৃতের সন্ধানে উদ্ভিদ্‌জগৎ, প্রাণীজগৎ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, ভূমণ্ডল সব তন্ন তন্ন ক'রে—অনুশীলন করিল, বৃক্ষ হইতে আপেল পতিত হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গেল, ভ্রমর গুঞ্জন শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় পুষ্পোদ্যানে মধুপান লীলা উপভোগ করিতে গেল, রমণী ভুবনমোহিনী রূপের লালসায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, কোকিলের কুহু শুনিয়া চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল, গভীর গবেষণা করিতে করিতে ষড়দর্শনাদি বিবিধ তত্ত্বের সৃষ্টি করিল, গণিত বিদ্যার প্রভাবে পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে চাহিল, ঐশ্বর্য্যের উন্মাদনায় জগৎ জয় করিবার আশায় কত নরহত্যা করিল, গৌরীশঙ্কর হইতে রামেশ্বর, জেরুজালেম হইতে কামাখ্যা মন্দির পর্য্যন্ত কত তীর্থ পর্য্যটন করিল। কিন্তু, মিলল না—মিলিল না "পরশ-পাথর"।

ভাই পথিক, আরো দেখ্‌তে চাও ? তবে দেখ। পুরাতনের চিতাভস্মের উপর বর্ত্তমানের প্রজ্জলিত চিতার পাশে শান্তিবারি হাতে নূতনের বিশ্ববিমোহন ছবি দর্শন কর।

এই বর্ত্তমান মানবজীবন কি কঠোর সাধনাই না করিল? ভাবিলেও চক্ষু স্থির হইয়া যায়। বিজ্ঞান বলে ত্রিলোক বিজয় করিল। বষ্পরথ, বায়ুরথ, অর্ণব পোত, তার হীন বার্ত্তা, সৌদামিনী দূতী, হাওয়া গাড়ী সম্মোহন-কারা যুদ্ধ কৌশল, বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালী, জলে স্থলে আকাশে অব্যাহত গতি, সমস্তই বিজ্ঞানের খেলা। সুসংস্কৃত রাজনীতি, নববিধানের সমাজনীতি, সমুন্নত বাণিজ্যনীতি ও সমার্জ্জিত শাসন প্রণালী এ সবই বর্ত্তমানের কার্য্য—কঠোর সাধনার ফল। কিন্তু, কি হ'ল?

সুখের লাগিয়ে যে ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

যে শান্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য মানব এতদিন ধরে সামগ্রী সংগ্রহ করিল, সে যজ্ঞের বাঞ্ছিত ফল লাভ হ'ল কই? সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি করিল কই! যা পেলে অপূর্ণ প্রাণ পূর্ণ হবে—খুঁজে মরা চুকে যাবে—পিঞ্জরের দ্বার খুলে যাবে—মুক্ত আকাশে স্বাধীন বিহঙ্গের মত পাখা মেলে ঘুরে বেড়াবে—তা পাওয়া গেল কই? ওগো, কবে ঘাটে বাঁধা শূন্য তরীতে সেই বাঞ্ছিতধন কাণ্ডারী সেজে এসে প্রেমের বাদাম তুলে দিয়ে মানবের মহামিলনের সাগর সঙ্গমে ছুটে যাবে?

পথিক! এ দৃশ্য আর কি দেখা যায়? গর্ব্বান্ধ মানবের পাশবিক অত্যাচারে, পুতিগন্ধময় স্বার্থপরতায় ও পৈশাচিক ঔদ্ধত্যে শান্ত জগৎ বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত বিলোড়িত। কর্ণধার হীন ক্ষুদ্র তরণীখানির মত পৃথিবী টলটলায়মান। ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত। কর্ম্ম স্বার্থ দুষ্ট, ছি! ছি! বর্ত্তমান জগতের দৃশ্য দেখিলে প্রাণ কেঁদে উঠে। লজ্জায় ঘৃণায় রোষে হৃদয় অস্থির হ'য়ে উঠে। মনে হয় দ্বাদশ রুদ্রের তেজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বর্ত্তমানকে ভষ্ম ক'রে তার উপর নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা করি, অথবা সেই দেশে চ'লে যাই যেখানে স্বজাতি বিদ্বেষ নাই—দলাদলি নাই—মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে না সবল দুর্ব্বলকে পিশিয়া মারিতে চায় না—সতীকে বনবাস দিয়া বারাঙ্গনাকে পবিত্র হৃদয় সিংহাসন বসায় না—দুষ্ট সমাজ পীড়ক লম্পটকে রক্ষা করিয়া অত্যুচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করে না—সহৃদয় সচ্চরিত্র অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষকে বাতুল বা Old fool উপাধি দিয়া অসচ্চরিত্র লম্পট গিন্টী করা মাকাল ফলকে আদর্শে সিংহাসনে বসায় না। যেখানে আত্মোপমোন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ সেই দেশে চ'লে যেতে সাধ হয়। যাদের আত্মজ্ঞান কাণ্ডজ্ঞান কিছুই নাই তারা আবার মানুষ? যারা দারিদ্র্যব্রত উদ্‌যাপন করে না, কাঁটা বিঁধিলে কি যাতনা তা জানে না, দুঃখের দাবানলে বিদগ্ধ ও বিশুদ্ধ হয় নি তারা আবার মানুষ? যাদের আত্মসম্মান বোধ নাই, যারা স্বগৃহে প্রবাসী, আত্মোন্নতির প্রয়াস বা প্রচেষ্টা কিছুই নাই তাদের মানুষ বলিয়া সভ্য বলিয়া—গর্ব্ব করা শোভা পায় না। তারা যদি মানুষ হয় তবে বনের পশু দেবতা।

তারা জানে না যে দিন দর্পণ আবিষ্কার করিয়া মানুষ সর্ব্বপ্রথমে নেত্র উন্মীলন করতঃ নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছিল আর জগতের পানে চাহিয়াছিল সেই দিন সে শুভ মুহূর্ত্তে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়—মানবজাতির ইতিহাসের (৺সিদ্ধি গনেশ) লিখিতে হয়। সেই দিন আদি মানুষ তার স্বরে মানবসমাজে ঘোষণা করিয়াছিল—

আত্মোপমোন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যো নরঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

যেদিন ঐ মহাবাক্যের সত্যতা প্রত্যেক মানবহৃদয়ে তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে, যেদিন ঐ বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া নিখিল বিশ্ব ছাইয়া ফেলিবে সেই দিন জগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৎপূর্ব্বে নহে। যখন মানব বুঝিবে বিরাট মানব সমাজ নারায়ণের দেহ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উহারই এক একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র, যখন বুঝিবে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে," যখন বুঝিবে একের সাহায্য ব্যতীত অপরে হয় অন্ধ নয় পঙ্গু, যখন পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে সেইদিন, ওগো সেইদিন বিশ্বমানব-সভ্যতার স্বপ্ন সত্য হইবে। যদি সম্ভব হয়, প্রকৃত শান্তির হিল্লোল সেইদিন প্রবাহিত হইয়া জগতের ক্লীবতা, শঠতা, দীনতা, হীনতা অপহরণ করিবে।

পথিক! বল দেখি, এই যে মানুষ, সুখের অন্বেষণে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে শত রুদ্রের তেজে কঠোর সংগ্রাম করিল তাহাতে কি লাভ হইয়াছে। বাঞ্ছিতের সন্ধান পেয়েছ কি? বরং রাশি রাশি দুঃখের ঝটিকা এসে তার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। কখন আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়; কখন—আরো চাই আরো আলো চাই; কখন—জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি; কখন—মাছ মারা ত হ'ল না ভাই কাদা মাখা সার হ'ল; কখন—উন্মত্ত পতঙ্গ প্রায় অনলে পুড়িমু হায়, কখন—আর শুনিব না শুনিব না মধুপঝঙ্কার—বলিয়া নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাস ফেলিতে শুনিয়াছি।

পথিক! এস। ভুলে যাও মানবসমাজ; ভুলে যাও ভারত, গ্রীস, রোম, মিশর; ভুলে যাও তাজ, ভুবনেশ্বর, পর্ণিনন্ অজান্তা গুহা; মুছে ফেল স্মৃতিপট হ'তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি। একবার এসে নির্জ্জন প্রান্তরে দাঁড়াও। চেয়ে দেখ,—প্রশান্ত নেত্রে চেয়ে দেখ মানুষ কি ক'চ্ছে। মোহিনী মায়া মনোমোহিনী বেশে মায়া-মুরলী বাজিয়ে বাজিয়ে আগে আগে চ'লে যাচ্ছে—আর মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ পেছনে পেছনে ছুটছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অনবরত ছুটছে—হাসছে—খেলছে, আর স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে চ'লে যাচ্ছে। শেষ নাই—অন্ত নাই। তাই নয় কি?

ভাই পথিক! আমিও ভেসে ভেসে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এখানে থেমে প'ড়েছি। কেন জান? একটা স্বর, তেমন স্বর—তেমন মধুর স্বর আর কখনও শুনি নাই, জানি না কোথা হ'তে ভেসে এসে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল মোর।' আর যেতে পাল্লাম না। সে স্বরের অর্থ আছে। বল্লে যা সত্য ভাব্‌ছ—সে শুধু মায়া। তুমিও শুন ঐ বাঁশী বাজ্‌ছে—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

তাঁকে ধরলে তবে ঐ মায়াপাশ ছিন্ন হবে। ঐ শুন ভাই—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে॥"

ব'লে বাঁশী আবার বাজ্‌ছে।—যদি শুনতে চাও তিনি কে, তাও শুনতে পাবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অবস্থান কর। ঐ শুন বাঁশী চিদানন্দরূপ শিবোহহং শিবোহহং—ব'লে আত্মপরিচয় প্রদান কচ্ছে। ওগো, তাঁকে খুঁজ্‌তেও বেশী দূরে যেতে হয় না। তিনি নিকটেই থাকেন। নবদ্বার অবরুদ্ধ ক'রে মাতৃশক্তিকে জাগাও। মার হাতে চাবী আছে। তিনি রত্নমন্দিরের দ্বার খুলে দেবেন। তখন দেখ্‌তে পাবে ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। তিনি যে তোমার ফুলবাগানের মালা—হৃদয় বৃন্দাবনের বনমালী। মুরলী সদাসর্ব্বদাই রাধা—রাধা ব'লে তোমায় ডাক্‌ছেন। বিষয়োন্মত্ত তুমি আত্মবিস্মৃত হেতু সে ডাক্ শুন্‌তে পাচ্ছ না।

পথিক জীব! তুমিই যে পরা প্রকৃতি রাধা। তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ যে—অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥—ভুলে গিয়ে বুঝি ভাব্‌ছ কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণঠাকুর লীলা করেছিলেন। এখন তিনি পাষাণ হ'য়ে গেছেন। না না তা নয়। তুমি যে তাঁর প্রাণ। তোমাকে না পেয়ে তিনি পাষাণবৎ অবস্থান কর্চ্ছেন। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" তোমার দশা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তোমার গৌরাঙ্গ কাঠ হয়ে গেছেন। তুমি রসময়ী। তোমা' ছাড়া শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হবে না। প্রেমময়কে ভাল না বাসলে তুমিও শান্তি পাবে না। মায়ামরীচিকা তোমায় সতত দগ্ধ করিবে। তুমি আধা-শাস্ত্র—অপূর্ণ! প্রেমময়ের সহিত মিলন ব্যতীত পূর্ণ শক্তি লাভ করতে পারবে না। তোমার শৃঙ্খল মোচনও হবে না।

পথিক! আর একটা কথা শুনে তুমি চ'লে যাও ভাই। তুমি যেন মনে করো না যে তিনি কাহারও নিকট সুলভ কাহারও নিকট দুর্লভ হন। অনন্যচিন্তা হ'য়ে তাঁকে ডাকার মত একবার যে ডাকে তিনি তারই হন। হক্ মুচি, হক্ মেথর, হক্ চণ্ডাল এ আনন্দের হাটে আপন পর, ছোট বড়, বামুন চাঁড়াল নাই। সব এক দর। সমাজকে হয় ত দেখিবে—ঐ নীচ জাতিকে দেখে ঘৃণা কর্চ্ছে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। তুমি সে হীন আদর্শকে ধ্বংস করে অভিনব উন্নতিশীল আদর্শ সংস্থাপন করবে। মূর্খকে ডেকে বল্‌বে ভগবানকে পেতে হ'লে ব্যাকরণতীর্থ হবার প্রয়োজন করে না। কেননা—মূর্খোবদতি বিষ্ণয়ে ধীরো বদতি বিষ্ণবে। দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ যারা সমাজের অত্যাচারে নিজকে অপবিত্রতা অস্পৃশ্য মনে করে, হীন হ'য়ে আছে—তাদের ডেকে ব'লো —ভাইরে, অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ সর্ব্বদা মনে রাখিও জগতের ভবিষ্যৎ অধিকারী ঐ নীচ লাঞ্ছিত জাতি, আর একটি কথা মনে রাখিও ভাই—যদি কোন ভক্ত হঠাৎ পদস্খলিত হয় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিও "নমে ভক্তঃ প্রণস্যতি।"

পথিক! যাও ভাই এখন একবার তমসাবৃত মানব সমাজে যাও। আচণ্ডাল সকলকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করে বল গিয়ে—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ রে ভ্রান্ত জীব! তোরা উঠ। আর ঘুমাস্ নে। মোহ কালিমা ঘুচায়ে একবার নয়ন উন্মীলন কর্। চেয়ে দেখ্ দ্বারে কে। পথ ভ্রান্ত তোরা। তোদের পথ দেখাতে সনাতন শ্রীশ্রীপ্রভু আবার ভারতে অবতীর্ণ। তোরা প্রস্তুত হ'। রূপং দেহি জয়ং দেহি বলে মার চরণে আত্মসমর্পণ কর্; মায়াপাশ ছিন্ন করে মুকুরে স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর্। সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি কর। হৃদয়ের ধনকে উপলব্ধি না করলে তোর উদ্দাম বাসনা-সজ্জকে কখনই শান্ত করতে পারবি না. পশুশক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে বশ করা যায় না। পশুপতি হ'লে প্রকৃতি আপ্‌নি এসে ধরা দেয়। আত্মজ্ঞানী ব্যতীত প্রকৃতি-রমণ হওয়া যায় না। তোরা পশুপতি হ'। মানুষ হ'। আত্মানং বিদ্ধি। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। ওঁ শান্তিঃ ওঁঃ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

চন্দ্রমণির জন্মকথা।

—::—

(Ella-Wilcox)

সূর্য্য-কিরণ বাস্‌তো ভাল চন্দ্র-কিরণে—
উর্দ্ধে অধে ছুট্‌তো পিছু পিছু ;
চন্দ্র-কিরণ আরক্ত মুখ, লজ্জা ভয়ে কম্পিত-বুক,
পালিয়ে যেতো পাশ কাটিয়ে ঘাড়টী করে' নীচু।

* * * *

সূর্য্য-কিরণ মনের কথা বলেই দিত খুলে,
প্রেমিক সে যে অসম্-সাহসিক !
ঘিরে তাহার হৃদয়-ফাগুন জ্বল্‌তো অনুরাগের আগুন,
বুঝেও তাহা চন্দ্রকিরণ বুঝ্‌তো নাকো ঠিক্।

* * * *

পালাতো সে স্বপন-সম সাম্‌নে দিয়ে এর
কেশের গোছায় ঝরিয়ে তাহার জ্যোতি,
হায়—যদিরে ভাগ্য-বিধান, এদের মাঝের এই ব্যবধান
ঘুচিয়ে দিয়ে বদ্‌লে দিতে পারতো জীবন-গতি !

* * * *

এক গোধুলি-লগ্নে, যখন ক্লান্ত দিবসখান
পড়ছে লুটে সাঁজের অলিঙ্গনে—
পাক্‌ড়ে ফেলে বাঞ্ছিতারে সূর্য্য-কিরণ হঠাৎ তারে
চাপ্‌তে গেল বুকের কাছে উল্লসিত মনে।

* * * *

এদিকে ঐ বীর-প্রণয়ীর বাহুর বাঁধন-তলে
চমক্ খেয়ে লাফিয়ে উঠে লাজে—
প্রথম-প্রেমের পরশ লেগে, লাজুক মেয়ে দারুণ বেগে
ছুটে গিয়ে লুকুলো এক গিরি-গুহায় মাঝে

* * * *

* একটি শিশুকন্যা, পক্ষান্তরে কবি কল্পিত চন্দ্রকান্ত মণি।

সূর্য্য-কিরণ নাছোড়,—শেষে অনেক খুঁজে খুঁজে,
আন্‌লে টেনে বন্দিনীকে চিনে ;
সেই পাথরের বাসর ঘরেই ফেল্‌লে মালা বদল করে'
সাক্ষী রেখে মুমুর্ষু এক শ্রাবণ-সাঁজের দিনে।

চাঁদের মতন কান্তি যে ঐ চন্দ্রমণিটী
ঐ যে মাণিক দীপ্তি-সমুজ্জ্বল—
তপন-প্রভা চন্দ্রমা আর, মিলে মিশে যেথায় সাকার
ঐটী তাদের দ্বন্দ্বশেষের সন্ধি-করার ফল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

বাঙাল বন্ধু।

—:*:—

(১)

সে আজ তিন বৎসরের কথা। আমি তখন সবেমাত্র ল'কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। দ্বারভাঙা বিল্ডিংএর সিঁড়ি ভাঙিতে তখনও অভ্যস্ত হই নাই ; তাহাতে তখন বেশ শ্রম বোধ হইত। ইভ্‌নিংক্লাসেই এ্যাড্‌মিশন্ লইয়াছিলাম। ল' ষ্টুডেন্টদের সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে মাঝে মাঝে ক্লাসে বসিয়াই নাটক নভেল পড়িতাম। কখন কখন নোট টুকিতাম, আবার কখন কখন বা ওয়ার্ড বিল্ডিং খেলিতাম। এজন্য মাঝে মাঝে নাম রেসপণ্ড্ করিতেও ভুলিয়া যাইতাম ; অধ্যাপকও সুযোগ বুঝিয়া বিবিধ বিশেষণে বিভূষিত করিতেন। কিন্তু আমরা ল' কলেজের ছাত্র—নিন্দা প্রশংসার গণ্ডীর বাহিরে—তাহাতে আমাদের কিছুই আসিত যাইত না।

সেদিন কি জানি কেন নাটক নভেল, এমন কি একখানি 'নায়ক' লইতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্লাসেও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। বিলম্ব হওয়ায় একখানি খাড়ও মিলিল না। বাধ্য হইয়া লেক্‌চার শুনিতে ইচ্ছুক হইলাম ; কিন্তু ভগবান বাদ সাধিলেন। লেক্‌চারের বিষয়টীর গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার আর ইচ্ছা হইল না, ক্ষমতাও হইল না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম।

দুই একটী কথার পর প্রমথ বলিল,—"হাঁ, ভালো কথা, তুই সুরেন ঘোষ বলে কাউকে চিনিস্ বীরু ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বলত ?"

প্রমথ বলিল, "চিনিস্ কিনা তাই আগে বল্ না ?"

একটু ভাবিয়া আমি উত্তর দিলাম, "সিটিতে এক সুরেন আমাদের সঙ্গে পড়্‌তো বটে, কিন্তু সে তো ভট্টচায্। সুরেন ঘোষ ?"

প্রমথ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, ঘোষ, ঘোষ ভট্‌চায্ নয়! সুরেন ঘোষ, কবিতা টবিতা লেখে ?"

ঠিক এমন সময় অধ্যাপকের একটী বিশেষ বাক্য আমাদের শ্রুতিমূলে পৌঁছিল। বুঝিলাম বাক্যটী লেকচারের বিষয়ীভূত নহে—এবং আমাদের স্বরের মাত্রা কিঞ্চিৎ চড়িয়া গিয়াছে।

দুই এক মিনিট গরুচোরের মত এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া আমি বলিলাম, "আজকালকার কবিতা লেখার কথা ছেড়ে দে ভাই! আমার এই সেদিনকার বউ—সেও কবিতা লেখে। 'গঙ্গাজলে' তার একটী কবিতা বেরিয়েছে, পড়িস্ নি ?"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি বেরোয় নি ?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "ছবি বেরুবে কি রে ?"

প্রমথ উত্তর দিল, "কেন, আজকাল ত লেখক, অলেখক, সব্বারই ছবি বা'র করা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে! তা'রা চেয়ে পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই; তুইই দিস্ নি, কেমন ?"

প্রমথ হা সতে লাগিল।

আবার সে আমাকে প্রশ্ন করিল—"তুই তবে চিনিস্ না তাকে? কি বলিস্? আচ্ছা, যখন তোরা মৈমনসিংহে ছিলি—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি আনন্দে বলিয়া উঠিলাম "হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে এইবার! বেশ মনে পড়েছে! সুরেন ঘোষ ত? আমরা দুজনে যে একসঙ্গে পড়তুম্। আমাদের দুজনায় খুব ভাব ছিল! সেইই আজকাল কবিতা টবিতা লিখ্‌ছে নাকি ?"

প্রমথ বলিল—"খুবতো ভাব ছিল, অথচ চিন্তেই তো পারছিলি না ?"

আমি বলিলাম, "সাত আট বছর আগেকার কথা ভাই, তাই ভাল মনে পড়্‌ছিল না। কিন্তু তুই তাকে কি করে চিন্‌লি প্রমথ ?"

প্রমথ বলিল, "আমরা এক মেসে থাকি যে! কাল সে আমাকে তোর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল। তুই খুব মোটা হয়েছিস্ বলে' প্রথম প্রথম সে তোকে ভালো চিন্তে পারে নি। তোর বাবা সবজজ শুনেই তার সন্দেহ দূর হয়েছে!"

আমি বলিলাম, "বাবাতো সেখানে মুন্সেফ ছিলেন !"

প্রমথ বলিল "তা' সে জানে। সেইই বল্লে এতদিন হয়ত তিনি সবজজ হয়েছেন। চ'না, ছুটীর পর আমাদের মেস হ'য়ে যাবি! তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে সে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। তারও এই ফার্ষ্ট ইয়ার; ই সেক্‌শনে পড়্‌ছে।"

আমি বলিলাম "না ভাই, আজ একটু কাজ আছে; আজ আর হবে না। কাল বরং সুরেনকে নিয়ে একটু সকাল সকাল আসিস্। লাইব্রেরীতে দেখা হবে।"

(২)

সুরেনের সহিত দেখা হইবার পরই আমার কৈশোর স্মৃতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। সেই নদী তীরে সান্ধ্য-ভ্রমণ, পণ্ডিত মশাইর সেই কোমল কঠোর অত্যাচার, সুরেনের মাতার সেই অনাবিল স্নেহ একে একে সবই মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যকালের স্মৃতি বিশেষত্বহীন হইলেও তাহা যে বড় মধুর—বড় আনন্দদায়ক!

পিতৃদেব যে বৎসর ময়মনসিংহে বদলি হইয়া যান, আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। জিলাস্কুলে পড়িতাম। তখন হইতেই সুরেন আমার সতীর্থ ছিল। এদিকে সুরেনের পিতা, পিতৃদেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের পরস্পরের বাসাবাটী নিকটে হওয়ায়, আমাদের মেলামেশা করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

ক্রমশঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি জন্মিতে লাগিল। পিতৃদেব কিন্তু নিম্নতন কর্ম্মচারীর পুত্রের সহিত তাঁহার বংশধরের অতটা আত্মীয়তা পছন্দ করিতেন না। বাঙাল ছেলেরা নোংরা, অশিষ্ট, কেশ বেশে যত্ন নাই, ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে জানে না ইত্যাদি—তিনি সর্ব্বদা আমাকে বুঝাইতেন! কিন্তু যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া আপনাকে অগ্রসর করান তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার বালকত্বই যে তাহার একমাত্র কারণ ছিল তাহা নহে; সুরেশেরা মাতা পুত্রে আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া লইত। তাহাদের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারি, তখন আমার এমন সাধ্য ছিল না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার মনের আর একটা গোপনীয় কথা আমি জানিতে পারিলাম। পিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিপ্লববাদীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙাল; তাহাদের সহিত মেলামেশা করিলে আমারও যে মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহাই বা কে বলিবে? বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে আসিয়াছি একথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে যে শুধু আমার উন্নতির পথ গবর্ণমেন্ট রুদ্ধ করিবেন তাহা নহে, পিতার চাকুরী লইয়াও বিষম গোল বাধিতে পারে। পিতা সর্ব্বদা আমাকে এ সব কথা বুঝাইতেন—কিন্তু আমি তাঁর একমাত্র সন্তান তাহাতে আবার শৈশবে মাতৃহীন; কাজেই আমাকে তাঁহার মনের মত গড়িয়া তুলিবার জন্য অত চেষ্টা স্বত্বেও আমাকে কঠোর শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারিতেন না।

এ সব কথা যে একেবারে না বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু তবুও উপায় ছিল না। অবসর পাইলেই সুরেনও আমার কাছে ছুটিয়া আসিত—আমিও তাহার কাছে ছুটিয়া যাইতাম। কিন্তু কেন যে তাহাদের সঙ্গ সুখ আমার অত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুতেই তখন বুঝি নাই।

যে স্নেহলতায় সুরেন আমাকে বাঁধিয়াছিল, তাহার বীজ সে তাহার মাতার নিকটই লাভ করিয়াছিল। আপনার জননীকে তেমন ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও তাহার জননীতে আমি মাতৃরূপ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি! অমন স্নেহশীলা রমনী আমি আজ পর্য্যন্ত আর দুটী দেখি নাই। পরের সন্তানকে যে কেমন করিয়া আপনার করিয়া লইতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। মাতাকে কোন্ শিশু-প্রাণ উপেক্ষা করিয়া দূরে থাকিতে পারে!

একবারকার কথা আমার মনে পড়ে, বসন্ত রোগে আমি ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। সুরেনের কাছে আমার অবস্থা শ্রবণ করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমার বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, আমার তখন মনে হইয়াছিল,

বিশ্বজননী যেন আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। ক্রমাগত কয়েক রাত্রি আমার শিয়রে জাগিয়া তিনি আমাকে কালের কবল হইতে মুক্ত করেন।

সুরেনের মাতার এইরূপ স্নেহবারি সিঞ্চনে আমরা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে এমন একটা বন্ধন পড়িল, যে একের ক্ষণিকের অদর্শনও অন্যে সহ্য করিতে পারিতাম না।

বাবা কিন্তু মাঝে মাঝে বলিতেন, "বাঙালদের ফাঁদে পড়ো না বাবা! ওরা বড় dangerous লোক! মন মুখ কখনও ওদের এক হতে দেখলুম না! আমি ত কম বাঙালের সঙ্গে কাজ করি নি—ওরা যে দেশ ছেয়ে ফেলেছে—ওদের যা কিছু কাজ কর্ম্ম—শুধু উপরওয়ালাকে খুশী কর্ব্বার জন্য! নিজের কাজ গুছোবার চেষ্টা! যাতে মাইনে বাড়ে, যাতে প্রমোসন হয়, ওরা শুধু সেই সব কাজ করে! স্বার্থের জন্য সব কর্ত্তে পারে! কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে ঘুণ হয়ে গেছি—আমার সঙ্গে চাল! আর কলকাতার লোক আমরা, চাল মারা যে আমাদের traditional; বাঙাল আজ আমার ওপর দিয়ে চাল মার্তে চায়! হাসিও পায়! দুঃখও হয়!"

পিতৃদেব যাহাই বলুন না কেন আমি কিন্তু সুরেনের মধ্যে আপত্তিজনক কিছু দেখি নাই। তাহার সরল উদার হৃদয়খানি আমার কাছে মুক্ত করিয়া তাহার হৃদয়ের নিভৃত অংশও সে আমাকে যে দেখাইয়াছিল! তাহা তো স্বচ্ছ, নির্ম্মলই দেখিয়াছি! সুরেনও সত্য ব্যতীত আর কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতাম না। সুতরাং অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; জানিবার প্রয়োজনও ছিল না।

একদিন বাবাকে লুকাইয়া সুরেনকে সব কথা বলিয়াছিলাম। "তোরা এমন ভাই, ছিঃ আর তোদের সঙ্গে মিশ্‌বো না।"

সুরেশ শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিয়াছিল "বেশ।"

কিন্তু সে আজ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। কালের আবর্ত্তনে জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে পরিবর্ত্তন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

(৩)

কয়েকদিন মেলামেশার পর বুঝিতে পারিলাম, সুরেনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সুন্দর, বাঞ্ছনীয় এবং প্রার্থনীয়ও বটে। তাহার হৃদয় আরো প্রশস্ত—মন আরো উন্নত হইয়াছে। বিশ্বমানবকে সে আপনার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। তাহাদের পারিবারিক অবস্থাও কতক কতক জানিতে পারিলাম। তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে পিতা আবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখন তাহারা চারিটী ভাই—একজন আই.এ. এবং আর কয়েকটী স্কুলে পরিতেছে। নিজে এখনও বিবাহ করে নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সুরেন বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজা বাহাদুরের অর্থসাহায্যে চারি বৎসর সেখানে পড়িয়াছে। এবার বি, এস, সি, পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ল' পড়িতে কলিকাতা আসিয়াছে।

নিজ পরিবারে ক্রমশঃ অর্থের অস্বচ্ছলতা বাড়িতেছে বলিয়া পিতার নিকট হইতে কোন প্রকার নিয়মিত সাহায্যের আশা তাহার ছিল না। এক মাতুলের আশায় ভরসায়ই সে পড়িতে আসিয়াছে।

সে-দিন সন্ধ্যায় আমরা সমাজ-সমস্যা লইয়া একটু আলোচনা করিতেছিলাম। উত্তেজিত স্বরে সুরেন বলিতে লাগিল "তুমি বল কি ভাই, এই যে সে দিন হরেন মিত্তির ষাট্‌ সত্তর বছরে বিয়ে কর্‌লে, কই, সমাজ তার কি কর্ত্তে পেরেছে? সমাজের হাত ততদূর পৌছায় কৈ?"

আমি উত্তর দিলাম "সে গাঁয়ের জমীদার, তার সঙ্গে কে লড়্‌তে যাবে বল?"

সুরেন সমানভাবে বলিতে লাগিল,—"ঐ ত মজা! আজকালকার সমাজের কাজই হচ্ছে গরীবের টুঁটি চেপে ধরা, অন্যায়ের প্রতিকার করা তো তাদের ক্ষমতায় কুলোয় না! আহা, বেচারা একে খেতে পায় না, তাতে দু'দুটো মেয়ের বে কোত্থেকে দেবে বল দেখি? তারই শেষ ধোপা নাপিত বন্ধ! সমাজে সেই একঘরে হন! এ-সব কথা বলিই বা কাকে আর শুনবেই বা কে? আর হরেন বুড়োরই বা কি আক্কেল ভাই? নিজে ত নিমতলায় সিট্‌ রিজার্ভ করেছে—বাড়ীতে বিধবা মেয়ে, এখনও দুমাস পোরে নি—আর এরি মধ্যে অম্লান চিত্তে একটা বিয়ে কর্‌লে—তাও বালিকা! উঃ, কি ভীষণ।"

আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

সুরেন তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "পাশের ঘরে বাপ মাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করছেন, মদ-মাংসের সদ্ব্যবহার চলছে - উপরে ইলেকট্রিক্‌ আলো জ্বলছে—আর আর তারি মধ্যে ১২ বছরের বিধবা সংযম শিখ্‌ছে! কি চমৎকার আদর্শ! কি চমৎকার বন্দোবস্ত! এমনি আর কত কথা তুমি শুন্তে চাও ভাই?"

আমি তখনও কোন কথা কহিলাম না। সে আবার বলিতে লাগিল "মেয়েকে যদি সংযম শেখাতে চাও, তাকে যদি তপস্বিনী কর্ত্তে চাও, তবে তোমার বাড়ীখানিকে তপোবন করে তোল দেখি? সবাই মাছ মাংস ছাড় দেখি? মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মতনই সবাই মিলে একাদশী কর দেখি? পারবে?"

আমি বলিলাম "তা কি Practically সম্ভব?"

সুরেন বলিল "তবেই ভেবে দেখ দেখি? তোমরা পুরুষ শিক্ষিত হয়েছ, কলেজে প্রফেসারি, হাইকোর্টের জজ হয়ে কত কঠিন কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করছ, তোমাদের পক্ষে যদি তা' অসম্ভব বোধহয় তবে এক সামান্য বালিকার পক্ষে তা যে কত কঠিন তা কি তুই বুঝিস না ভাই?"

সুরেন আমাকে নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিল, "এ তোমাকে স্বীকার কর্ত্তেই হচ্ছে ভাই, যে আমাদের মেয়েদের উপর আজকাল বড় অত্যাচার হচ্ছে—আর তা' দুদিক থেকে—এক পারিবারিক আর এক সামাজিক!"

আমি বলিলাম—"কথাটা ঠিক তা নয়—তার চেয়ে বরং এই বলতে পার যে পুরুষেরা তাদের কর্ত্তব্যের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের প্রতিরোধ কর্ব্বে কে? হিন্দু বিধবার সংযম ও ত্যাগশীলতা হিন্দু নারীর সতীত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখনও যে আমাদের সমাজের ভিত্তি অটুট রেখেছে। নইলে আমাদের আর আছে কি ভাই?"

সুরেন বলিয়া উঠিল, "সেই জন্যই ত হিন্দু নারীর অসম্মানে, তার প্রতি অত্যাচারে আমি অত আঘাত পাই! আর তাই ত তোর সঙ্গে আজ এতক্ষণ ধরে ঝগড়া করছি!"

আমি বলিলাম "সত্যি ভাই, কিন্তু বলত সুরেন,—আমরা ত বুঝি সব, জানি সব, তবু এর প্রতিকার হচ্ছেনা একটুও কেন, বল্‌তে পারিস্?"

সুরেন এবার হতাশের হাসি হাসিয়া বলিল "নিজেদের দিয়েই ত বুঝ্‌তে পারি বীরু, আমরা পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাশ হয়ে শিখ্‌ছি যে কেবল কথা,—কেউ বা পুরাতনের ধ্বজা ধরে, কেউ বা নব্য সভ্যতার চরমে উঠে—জোর গলায় তার প্রচার করে নিজকে জাহির করতে চেষ্টা পাচ্ছে বৈ ত নয়! অধিকাংশ বাঙ্গলা কাগজ খুল্‌লেই এ কথাটা স্পষ্ট হবে—এই এ-দিনেই একজন বিজ্ঞ সমালোচক নারীর সম্মান দেখাতে গিয়ে—আমাদের সমাজে তাঁদের অতি উচ্চ স্থান ছিল ও আছে সেটা বুঝাতে বসে নিজেই, কোন মহিলাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করবার প্রবৃত্তিটা ছাড়্‌তে পারেন নাই, এতে কি প্রকাশ পায় বল ত? ঐ হৃদয়টা;—শিক্ষা শিখায়েছে কথা—প্রাণটার উন্নতি হয় নি,—তার ঢেকে কথা কইতে চাইলেও সময় সময় অজ্ঞাতে উদ্গার উঠে পেটের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে; এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল নাই ভাই! উচ্চ শিক্ষার যাকে শোধরাতে পারে নি, কথা কাটাকাটি করে কি তা শোধরায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম, সত্যি!—"উঃ, কি তর্কটাই হ'ল, লিখ্‌লে যে একটা প্রবন্ধ হয়ে যেত।"

এমন সময় হঠাৎ প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি রে কবিতা আওড়াচ্ছিস বুঝি?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, ভালো কথা সুরু! তোর কবিতা ত আজকাল দেখ্‌তে পাই না। তবে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ টবন্ধ দেখি বটে। কবিতা লেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?"

সুরেন বলিল, "লিখ্‌লে কি হবে! ছাপে না যে! ওই যে প্রবন্ধ বেরোয় দেখ ওকি ভালো হয়েছে বলে বেরোয়? না, তা নয়? কেন শুনবে? একে ত গদ্য রচনায় অনেকটা জায়গা কভার করে, তাতে আবার সম্পাদকেরা গদ্য রচনা কম পান। কাজেই বাধ্য হয়ে ছাপ্‌তে হয়। এখন বুঝ্‌লে? আর কবিতার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বল্‌তে পারি না—প্রতিদিন গড়ে অন্ততঃ পাঁচটী কবিতা 'গঙ্গাজল' অফিসে যায়! second classএর ছাত্র থেকে সাবডেপুটী পর্য্যন্ত কবি! একবার ভেবে দেখ দেখি ব্যাপারটা!"

প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল "literature এ যখন তোর test আছে তখন তুই Arts পড়্‌লি না কেন ভাই? কত ভালো ভালো বই পড়্‌তে পারতিস্?"

সুরেন উত্তর দিল "Science পড়্‌লে কি আর literatureএ test থাকতে নেই? এই তোরা ত arts পড়েছিস,—আমার চেয়ে খুব বেশী বই পড়েছিস্ কি? আমার তো তা' মনে হয় না!"

প্রমথ উত্তর দিল "বেশী? তোর অর্দ্ধেক বই আমি পড়ি নি! কি করে এত পড়িস ভাই? ছোটবেলায় শুনেছিলাম, বাঙালরা চা'ল চিঁড়ে বেঁধে বাড়া থেকে বেরোয়, পড়াশুনো একেবারে শেষ করে তবে বাড়ী ফেরে। এখন তা চোখে দেখ্‌ছি। কি ক'রে অত পড়িস বল্‌ত?"

সুরেন বলিল "আমরা যে গরীব! একবার ফেল কর্‌লেই পড়াশুনা শেষ! পাশ যে কর্ত্তেই হবে! তাই বাধ্য হয়ে পড়্‌তে হয়।"

প্রথম বলিল—"ন' বই তুই কি এত পড়িস্? monotonous লাগে না? হলো বা দুদিন মাঠে বেড়িয়ে এলি, দু এক দিন থিয়েটার বায়োস্কোপে গেলি, তা না হ'লে ভালো লাগ্‌বে কেন? Stimulent পাবি কোথায়?"

সুরেন বিনয়ের সহিত বলিল "গরীবের আবার stimulent কেন ভাই ? যারা খেতে পড়্‌তে পায় না, তাদের আবার বায়োস্কোপ থিয়েটার !"

প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"তা আমি আগে থেকেই জানি ! বাঙালদের প্রাণে কোন সখ নেই ! আশ্চর্য্য !"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করিয়া থাকার পর সুরেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমি সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম তার কি হ'ল ভাই ? আমি যে বড় বিপদে পড়েছি !"

আমি বলিলাম, "চেষ্টা কর্‌ছি কোন একটা. খোঁজ পেলেই তোকে জানাব !"

সুরেন বলিল "খোঁজ পেলে জানাব বল্লে হবে না ভাই, আমাকে সংগ্রহ করে দিতেই হবে।"

প্রমথ বলিল "কিরে বীরু।"

আমি উত্তর দিলাম "এই একটা কাজকর্ম্ম, টিউসনী ফিউসনী।" প্রমথ সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোদের বাঙালদের জ্বালায় যা হয়। আর কি টিউসনী পাবার যো আছে ? সেদিন কি কাণ্ড হয়েছে শোন বীরু ! এক ভদ্রলোক ত সে দিন খুঁজতে এসেছেন আমার কাছে গ্রাজুয়েট টিউটার ; ফিফ্‌থক্লাসের দুটী ছেলেকে পড়াতে হবে—রাত্তিরে দু ঘণ্টা করে, মাইনে শুনেছিস্‌ আট টাকা। আমরা ত শুনে সব অবাক ! তিনি বল্লেন এতে অবাক হবার মত কিছু নেই মশাই ! ল' কলেজের কত ছেলে পাওয়া যাবে দেখ্‌বেন ! এই এর আগে যিনি ছিলেন তাঁকে ত সাত টাকা করে দিতুম, তিনিও ত বি-এ। আমি বল্লুম, তা পেতে পারেন. বাঙালেরা নিতে পারে। যাদের আর পাঁচটা আছে তাদের পোষাবে। তবে আপনার ছেলের কিছু হয় কিনা তাই ভাব্‌বার বিষয়। খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি, মাষ্টার কিছু পড়ায় ? না "পড়ে পড়ে লেখ" আর "লিখে লিখে পড়" বলেই মাস শেষে টাকা ক'টী হিসাব করে নেয় ! ভদ্রলোক আপন মনে কি বকৃতে বকৃতে চলে গেলেন। এই ত ব্যাপার ! টিউসনীর বাজারটা তোরাই ত মাটী কর্‌লি সুরেন—কেন অত কম মাইনেতে স্বীকার করিস্‌ বল দেখি ? তোদের কি একটুও Selfrespect নেই ?"

"গরিবের আবার Selfrespect কি ভাই ?"

প্রমথ একটু রাগিয়াই বলিয়া উঠিল "আচ্ছা অত যে 'গরিব গরিব' করিস, সেদিন তবে অত নবাবী চাল চাল্‌লি কেন ? চেনা নেই, পরিচয় নেই, টিকিট হারিয়েছে কিনা, তারও কোন ঠিক নেই, তার কোন খবর তুই রাখিস না অথচ অম্লান বদনে, টাকা দুটো ফেলে দিলি ? আমার নিষেধ না হয় নাইই শুন্‌লি, একবার নিজেও ত ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে পার্‌তিস্‌।"

সুরেন হাসিয়া বলিল "বুড়ো বয়সে কি আর এই সামান্যর জন্য সে মিথ্যা কথা বলেছে ভাই ?"

প্রমথও ব্যঙ্গস্বরে বলিল "সেটুকু ধরবার বুদ্ধি থাক্‌লে তোদের আর বাঙাল বল্‌বে কেন ?"

সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া সুরেন তাহার করুণামাখা মুখখানি দিয়া আমার কাছে এক বিনীত আবেদন জানাইল। আমিও তাহাকে যে কোন একটী কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম বলিয়া উঠিল—'ওরে চ চ। ন'টা বাজে যে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে কড়া, আবার হয় ত গেটবুকে নাম লিখ্‌তে হবে।"

সুরেন বলিল "চল যাই"। পরে আমাকে বলিল "আসি ভাই"। সেদিনকার মত তাহারা বিদায় গ্রহণ করিল।

(৪)

দুই তিন দিন পর একদিন মাঠে হঠাৎ প্রমথের সহিত দেখা। আমি তাহাকে সুরেনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল "তার কথা আমায় জিজ্ঞেস করো না ভাই! ঘরে বসে কি করে না করে সেই জানে। একটু বেড়াবে না—কোথাও বেরুতে চায় না।" বাঙাল কিনা, শুধু লেখা পড়া নিয়েই ব্যস্ত!"

আমি বলিলাম "কেন? আমার ওখানে ত প্রায়ই যায়!"

প্রমথ একটু চাপা গলায় বলিল "তাও বড় ভালো নয় ভাই! অবশ্য তোমার দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম "সে কি রে?"

প্রমথ তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল—"বল্‌ছি শোন্। কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি, তুইও ভেবে দেখ্। বাঙ্গালদের সঙ্গে মেলা মেশা একটা কিছু নয়। ওদের যে নাম ডাক কি জানি ভাই কখন কি কাণ্ড বেধে বসে। ওর জন্য শেষে সবাই মারা যাবো?" আমি তাহাকে বলিলাম "তুই সে ভয় করিস্ না প্রমথ! ওকে আমি যেমন চিনি, আর কেউ ত তেমন চেনে না। আমি বল্‌ছি তোকে তুই বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে তেমন সন্দেহের কিছু নেই।"

প্রমথ বলিল "তা না থাকুক, বেশী মেলামেশার দরকারই বা কি? একে বাঙাল ছেলে, তাতে সায়েন্স ষ্টুডেন—তারপর আজকাল আবার যেরকম গীতা পড়্‌তে আরম্ভ করেছে আমার ত ভয় হয় ভাই, কোন দিন বা সি. আই ডি এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়।"

আমি বলিলাম "এ তোর কেমন যুক্তি প্রমথ? সায়েন্স পড়া একটা অপরাধ নাকি? ইন্‌টারেষ্ট আছে, পড়েছে; কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই! আর গীতার কথা যা বল্‌ছিস, গীতা ও ছোট বেলা থেকেই পড়ে। ওর বাবার যে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল, গীতা না পড়্‌লে কেউ জল খেতে পার্‌ত না! আমার চেয়ে ত তুই ওকে বেশী জানিস্ না! আমাকে আর তুই নতুন কি বল্‌বি?"

প্রমথ বলিল 'আমরা বামুন হয়ে পৈতে সন্ধ্যের খোঁজ রাখি না—আর ও কায়েত কি না ওর ধর্ম্মজ্ঞানটা কিছু টন্‌টনে! আবার এদিকে ডিম মাংস টাংস কিচ্ছু খায় না, তা জানিস্ বীরু?"

আমি বলিলাম "সে আর নতুন কথা কি; সে সব তো ও কোন দিনই খায় না?"

প্রমথ বলিল "এই সভ্য যুগে বিশেষতঃ কলেজে পড়ে, যারা মটন চপ, ফাউল কারীর আস্বাদ পায়নি তাদের তুই মানুষ বলিস্? সে দিন ওকে বল্লুম, চ সুরু, দেলখোস ক্যাবিন থেকে দু'কাপ চা খেয়ে আসি, তাতে কি বল্ল শুন্‌বি—বল্লে যে ওসব খাওয়া দাওয়া এ দেশে পোষায় না,—ওখানে কত রকমের লোক,—এক টেবিলে ব'সে, যা'তা' খায়, ওখানে কি খেতে আছে? আমার ত ভাই শুনে চক্ষুস্থির! কায়েতের ছেলে হয়ে বামুনকে ধর্ম্ম শেখাতে আসে? তুই দেখিস্ বীরু, আমি বলে রাখ্‌ছি, ও ঠিক একজন anarchist—ধর্ম্মের কল নিশ্চয়ই একদিন বাতাসে ন'ড়ে উঠ্‌বে!"

আমি মনে মনে তাহার শেষ বাক্যটীর প্রতিধ্বনি করিলাম এবং ভগবানের কাছে তাহাই প্রার্থনা করিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিল। আমাকে বিশেষরূপে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া প্রমথ বিদায় গ্রহণ করিল। আমিও সুরেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিলাম।

বাস্তব ঘটনার উল্লেখে এবং যুক্তির অবতারণা দ্বারা প্রমথ যতই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন, আমি কিছুতেই সুরেনকে ভিন্ন চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। তাহার ব্যবহার, তাহার কার্য্যাবলী আমার কাছে চিরদিনই আনন্দদায়ক ছিল।

(৫)

প্রিয়জনের সামান্য উপকার করিয়াও হৃদয়ে যে একটা আনন্দ অনুভূত হয় তাহাও ত কম প্রার্থনীয় নহে! অনেক অনুসন্ধানেও যখন সুরেনের জন্য কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না, তখন পিতার সহিত যুক্তি করিয়া এক পরামর্শ স্থির করিলাম। তিনি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু আমার প্রার্থনা কিছুতেই নামঞ্জুর করিতে পারিলেন না। কিন্তু সুরেন নিজে গোল বাধাইল। পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সে কিছুতেই আমার মামাতো ভাইকে (ছেলেটি আমাদের বাড়ীতেই থাকিত) পড়াইতে স্বীকৃত হইল না। পড়া ছাড়িতে হয় তাহাও স্বীকার, তবু সে আমাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কথাটা শুনিয়া প্রমথ বলিল "বাঙ্গালদের আর কত বুদ্ধি হবে ভাই! ন্যায্য পরিশ্রম করে টাকা উপার্জ্জন তাতে লজ্জাই বা কি আর দোষই বা কি! কিজানি ভাই সে কি মনে করে যে তা' সেইই বল্‌তে পারে!"

কয়েক দিন পর সৌভাগ্যক্রমে এক সুযোগ মিলিল। এলিজাবেথ স্কুলের একজন গণিত শিক্ষকের প্রয়োজন। আমি বন্ধুবর বিজয়কে ধরিয়া বসিলাম। বিজয় উক্ত স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার ছিল। স্কুলে ও সেক্রেটারীর নিকট তাহার যেরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তাহার অনুরোধ কখন ব্যর্থ যাইত না। বাঙাল বলিয়া বিজয় প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট তাহার শিক্ষা ও হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া বিশেষতঃ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জানিয়া সানন্দে প্রতিশ্রুত হইল। আমিও আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত হইলাম।

ভগবানের দয়ার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া এবং আমার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সুরেন যথাসময় নিজকার্য্যে যোগদান করিল।

খোঁজ খবর লইয়া ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম সুরেনের কর্ম্মপটুতায় ও ব্যবহারে তাহার ছাত্র ও সহযোগীগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বন্ধুবরের এ প্রশংসায় আমারও বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল।

এমান করিয়া ধীরে ধীরে ৺ পূজাবকাশ ও বড়দিনের ছুটি চলিয়া গেল।

(৬)

তিন চার দিন হইল সুরেনের সহিত আমার দেখা হয় নাই। প্রত্যহ না পারিলেও প্রায়ই সে আমাদের বাড়ীতে কিন্তু কই এমন ত কখন হয় না! আমি সম্মুখে যেন একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিতে পাইলাম! বক্ষ দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল!

প্রিয়জনের চিন্তায় অমঙ্গলের দিক্‌টাই সর্ব্বাগ্রে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে! ভাবিলাম নিশ্চয়ই সে পীড়িত হইয়াছে। প্রমথও কলিকাতায় নাই, তবে আজ ফিরিবার কথা, তাহার সহিত দেখা হইলেই সব জানিতে পারিব! যদি প্রমথের দেখা নাইই পাই তবে বাড়ী ফিরিবার মুখে সুরেনের মেসে খোঁজ করিয়া আসিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কলেজে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ বিজয় আসিয়া উপস্থিত। তাহার মুখচোখের ভাব দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম! বিজয় বলিতে লাগিল "খুব friendকে reccommend করেছিলে বীরু! না জেনে, না শুনে কি কখন অমন কাজ কর্ত্তে আছে? এখন কি কাণ্ডখানা করে বসেছে, বল দেখি! সেক্রেটারীকে যে আমি মুখ দেখাতে পরছি না! তিনি শুধু বল্‌ছেন, বিজয় বাবুর জন্যই স্কুলটার দুর্নাম রটে গেল। নইলে বাঙালকে আমি কাজ দেই!"

একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া আমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল! উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম "হয়েছে কি বিজয়?"

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কেন তুমি জান না? সুরেন ঘোষকে যে পুলিশে arrest করে নিয়ে গেছে! anarchistদের ভেতর সে নাকি এক জন বড় চাঁই! এই দেখ না আজকার কাগজেও বেরিয়েছে—

কম্পিত হস্তে বিজয়ের নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া দেখিলাম—

আবার ধরপাকড়

পটলডাঙ্গায় খানাতল্লাসী

ছাত্রাবাসে বমাল ছাত্র ও শিক্ষক গ্রেপ্তার

ইত্যাদি পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল! রুমালে মুখ ঢাকিয়া ইজিচেয়ারে লুটাইয়া পড়িলাম।

বাবার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমথ বলিতে লাগিল "আমি বীরুকে ক'দিন মানা করেছি জেঠা বাবু ও-তা' কিছুতেই শুনত না। বল্‌ত না না সুরেন তেমন নয়, ওকে তোমরা চেন না কে কাকে চেনে এখন দেখ নি ত বীরু! হাজার ভাল মানুষ হোক্ বাঙাল ত!"

অনেক কষ্টে আমি প্রমথকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে গলা চড়াইয়া কহিল "শুন্‌বি আর কি—কালী মিত্তিরের ঘর যখন search হচ্ছিল বর্দ্ধমানের সেই ছোকরারে—সুরেশ তখন করেছে কি দুখানি চিঠি ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে গিয়েছে! কিন্তু বাবা! সি, আই, ডি, দের ত ফাঁকি দেবার যো নেই। তারা তা' টের পেয়ে ওর তোরঙ্গ-ফোরঙ্গ সব search করে কতকগুলি যুগান্তর একটা পিস্তল আরো কি কি সব পেয়েছে! তারপর আর কি একেবারে শ্বশুরালয়ে! কেমন আমার কথা ফল্‌ল ত?"

বিজয় বলিল "দেখ্‌তে ত দিব্যি ভাল মানুষটী ছিল! কথা বার্ত্তায় তো কিচ্ছু বোঝ্‌বার যো ছিল না! তলে তলে এত? ধন্যি যা হোক! বাঙালরা সবাই এমনি নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ বলিয়া উঠিল—"সব—সব! ও ধাড়ী বাচ্চা কাউকে বিশ্বাস নেই! এই যে বীরুর সঙ্গে ওর এত ভাব ছিল, বীরুই কি জান্‌ত যে ও এমনধারা লোক? আবার তেজ কত জানেন? ইন্‌স্পেক্টর যখন জিজ্ঞেস কর্‌লে যে এসব আপনি কোথায় পেলেন? তখন বল্‌ল, "সে কথা বল্‌তে ত আমি বাধ্য নই। সন্দেহ জনক জিনিষ পেয়েছেন—arrest করুন না! অত কথায় কাজ কি? তবে এটা ঠিক যে আমি নিরপরাধ।"

প্রমথের এই কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলেন। আমি যেন শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল—"হ্যাঁ নিরপরাধ যে তা তো বেশ বুঝ্‌তেই পারা যাচ্ছে! বীরু যে চুপ করে রইলে?"

পিতা বলিলেন—"ও আর কি কইবে? আমার কথা তো শুন্‌বে না! তা হ'লে কি আর আজ এমন হয়? যাক্ যা হবার হয়েছে। এখন শিখ্‌লে ত বাঁরু? প্রাণ থাকৃতে আর বাঙ্গালদের ছায়া মাড়িও না! ওরা সর্ব্বনেশে লোক! ওরা সব কর্ত্তে পারে! বুঝ্‌লে?"

আমি আর কি বলিব? কি বুঝিব? কিন্তু ওগো, তোমরাই কি বুঝিবে আমার বক্ষে তখন কি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে! সুরেনের এ বিপদের জন্য যে আমিই দায়ী! আমিই যে একদিন বিপদে পড়িয়া পিস্তলটী ও যুগান্তর-গুলি তাহার ওখানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম! ওগো, তোমরা কি বুঝবে, সে আমার কত নিষ্পাপ, কত নির্ম্মল, সে আমার কেমন বাঙাল বন্ধু!

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। ধীরে ধীরে সবাই উঠিয়া পড়িলেন। আমি তেমনি অবস্থায় সোফায় পড়িয়া রহিলাম।

(৭)

সমস্ত রাত্রি যে কিরূপ উদ্বেগে কাটাইলাম তাহা বর্ণনাতীত। নানা দুশ্চিন্তায় শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল। একটুও ঘুম আসিল না। কখন যে রাত্রি প্রভাত হইল কিছুই টের পাইলাম না।

যখন ঘুম হইতে না—না, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম, তখনও চিন্তাস্রোতের বেগ কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমারই অসাবধানতার ফলে এক অকলঙ্ক চরিত্রে আজ কলঙ্কের রেখা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি আজ বিপ্লববাদী বলিয়া শাস্তি পাইতে বসিয়াছে! উঃ কি ভয়ানক! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল!

আহা সে যে বন্ধু আমার! তার কর্ত্তব্য সে ত যথেষ্ট পালন করিয়াছে। কিন্তু হায়! যা'র জন্য সে এত করিয়াছে, যা'র সমস্ত অপরাধ সে আজ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, সে অকৃতজ্ঞ তাহার কতটুকু প্রতিদান দিয়াছে! মনের ভিতর হইতে কে যেন একজন পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নের আঘাতে আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল!

মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, যাই, সব কথা প্রকাশ করিয়া বন্ধুকে বিপদ মুক্ত করি! কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন একটা দৌর্ব্বল্য আসিয়া আমার হৃদয়কে কাপুরুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। সত্য কথা বলিবার সাহসও আমার হইল না। তখন আমি এমনি অপদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

ক্রমাগত ঘাতসংঘাতের পর শেষে কর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসর পাইলাম। কথা পুলীশের সমক্ষে প্রকাশ করিব স্থির করিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম।

তখন বেলা প্রায় দশটা। হ্যারিসন রোডের মোর অবধি আসিতে না আসিতে হঠাৎ একি দেখি! সুরেন যে! বিস্ময় ও আনন্দে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। নিজের চক্ষুকেও যেন বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

সে ছুটিয়া আসিয়াই আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভগবান খুব রক্ষা করেছেন ভাই, বিশেষ কোন প্রমাণ না পেয়ে—ওকি তুই অমন কচ্ছিস কেন? ছিঃ, তুই কি পাগল হলি নাকি? তোর কি দোষ? হঠাৎ একটা যা হয়ে গেছে তা গেছে। না—না অমন করিস্‌নে ভাই! আমি তা হ'লে বড় দুঃখিত হব।"

"আমি এখনও মেসে ফিরেনি; সংবাদ দিতে আমি তোদের ওখানেই যাচ্ছিলাম! চল, সব বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছি!"

এই কথা বলিতে বলিতেই সে আমাকে টানিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

হায় বন্ধু! কৃতজ্ঞতা জানাইবার এমন কি মার্জ্জনা ভিক্ষারও অবসর দিলে না! ভাই! দেবতারা তোমাদের চেয়ে কত বড়?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

একস্থুর।

—:*:—

(১)

এঁকেছি কতই সুন্দর ছবি, গেয়েছি কতই গান,
শেষে কোন্ কথা বলিতে চাহিয়া আকুল করেছে প্রাণ?
ছাপায়ে আমার দুঃখ বিপদ, অশ্রুকান্নাহাসি,
বাজে ফিরে ফিরে না জানি কি সুরে "শুধু আমি ভালবাসি।"

(২)

বিবিধ ছন্দে গাঁহিয়াছি আমি, বন্দনা নিতি নব,
কোন্ বাণী তার আসি বার বার বেজেছে শ্রবণে তব
চারি পাশে ঘিরে কোন্ কথাটিরে রচিত বাক্যরাশি;
প্রাচীন সে কথা, নিত্য নূতন "শুধু আমি ভালবাসি!"

(৩)

সঙ্গীত শেষে নীরবমন্ত্রে কোন্ সে গানের সুর,
উঠে কাঁপি কাঁপি যন্ত্রীর হৃদে আনন্দে ভরপূর—
কোন সুরে তার হৃদয়ে সবার পলকে ফেলিছে গ্রাসি'
ছন্দ বিহীন নীরব সে গীতি "শুধু তোরে ভালবাসি!"

(৪)

কলতান তুলি' সরিৎ যেমন বহিছে সাগর-পায়
চঞ্চল করা নৃত্যমুখরা আপন পতিরে চায়!
মোর যতগান, যত কল্লোল, তেমনি প্রবাহি' আসি'
চরণে কাহার জানাইতে চায়, "শুধু আমি ভালবাসি!"

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বহু প্রাচীন পুথি এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলাভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুইখানি পুস্তক বাস্তবিকই বাঙ্গলা কিনা—এ সম্বাদ আমার দারুণ সন্দেহ আছে। ইহার একখানি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "বৌদ্ধ দোহা ও গান" অপরখানি শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "নেপালে বাঙ্গলা নাটক।"

"বৌদ্ধ দোহা ও গান" যে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা" এ সম্বন্ধে সাধারণের ত সন্দেহ থাকিবেই স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়েরই প্রথমে সন্দেহ ছিল। তিনি মুখবন্ধে লিখিয়াছেন "ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাক পুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গলা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।" এই ভাষায় লিখিত "সুভাষিত সংগ্রহ" নামক যে পুস্তক বেণ্ডল সাহেব ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এই ভাষাকে কোথাও "একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা" কোথাও বা "বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা" বলিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় মুখবন্ধে তৎপরে বলিয়াছেন। "আমার বিশ্বাস যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গলা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণে প্রভেদ, তথাপি সমস্তই বাঙ্গলা বলিয়া বোধ হয়, এখানেও শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই যে, এগুলি ঠিক পুরাণ বাঙ্গলা, "বোধ হয়" কথা ব্যবহার করিয়াছেন। আর বাঙ্গলী হইলেও যে ভিন্ন দেশে বাস করিয়া তদ্দেশ-ভাষায় রচনা করিতে পারে তাহার প্রমাণ এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালী, হিন্দী ও উর্দ্দুতে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্ব্বে ছন্দ লইয়াই প্রথমে বিচার করিব। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ছন্দে সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার গানে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভেদ ছিল না। তাহার দুই প্রমাণ আছে,—শূন্য পুরাণ ও চণ্ডীদাসের রচনা। চণ্ডীদাসের বর্ত্তমান পদাবলীর ভাষা পরিবর্ত্তিত হইলেও ছন্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ভাষার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেখানেও হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভেদ দেখি না। শূন্যপুরাণে ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রধানতঃ দুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,—পয়ার ও ত্রিপদী। অন্য দুই এক প্রকার ছন্দও চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'আছে বটে কিন্তু সর্ব্বত্র ছন্দ "অক্ষরমাত্রিক"। শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন। উভয় স্থলেই "মাত্রাবৃত্ত" ছন্দের ব্যবহার আছে। মহাপ্রভুর সহচরগণের মধ্যে অনেকে এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আবার অনেকে "অক্ষরমাত্রিক" পয়ার ত্রিপদীতে রচনা করিয়াছেন। সেগুলির ভাষা ও বানান মুখে মুখে ও লিপিকার এবং মুদ্রাকরের দোষে পরিবর্ত্তিত হইলেও ছন্দের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এমন কি এক পদকর্ত্তাই দুই প্রকারের মাত্রায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে "অক্ষরমাত্রিক" পয়ার ত্রিপদী ছন্দ সেখানে ভাষা বাঙ্গলা এবং যেখানে "মাত্রাবৃত্ত" ছন্দ সেখানে ভাষা মৈথিলী বা ব্রজবুলি অবশ্য

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এখন যেমন পয়ার বা ত্রিপদীতে অক্ষর গণনার বাঁধা-বাঁধি, পূর্ব্বে তেমন ছিল না পয়ার কখন কখন ১৪ মাত্রা পার হইয়া ১৬।১৭ পর্য্যন্ত যাইত কিন্তু গানের সময় তাহা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিয়া তাল রাখা হইত। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিতেছি,—

শূন্যপুরাণের পয়ার— উল্লুকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।

" ত্রিপদী—শ্রীধর্ম্মচরণে গুনে, শ্রীযুত রামাই ভনে, হউ কবি অনাদ্যর দাস।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পয়ার—বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।

" ত্রিপদী—হেন মনে পড়িহাসে, আহ্মা উপেক্ষিআঁ রোষে, আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।

বলরাম দাসের ব্রজবুলির পদ (মাত্রাবৃত্ত)

॥ । । ॥ । । | । । । । । । । ।
গোরিক থোরি, ব | দন বিধু হেরইতে,

। । । । । ॥ । ॥ ।
পঁহু ভেল আন ন্দে ভোর—

বলরাম দাসের বাঙ্গলার পদ (অক্ষরমাত্রিক)

এক কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি
আর তাহে দিল হেন পিরীতি বেয়াধি।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তারাও কেবল পয়ার ও ত্রিপদীতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রধানতঃ এই দুই প্রকারের ছন্দ আছে। অথচ এই "বৌদ্ধ দোহা ও গানে" প্রধানতঃ দুই প্রকারের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—দোহা ও চৌপাই। তুলসীদাসের রামায়ণের সর্ব্বত্রই চৌপাই, মধ্যে মধ্যে দোহা ও সোরঠা। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সেকালের দেশভাষায় গানের রচয়িতা বা লেখকের ভুলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও হ্রস দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিত।

"বৌদ্ধ দোহা ও গানের" দোহা—

। । । । । । ॥ । । । । । । । ॥ । । । । । ॥ ।
বরগিরি শিহর উতুঙ্গ মুনি শবরে বাহিঁ কিঅ বাস

তুলসীদাসের দোহা—

॥ । । ॥ । । ॥ । । । । । । । । । । । ॥ ।
বন্দউ সন্ত সমান চিত হিত অনহিত নহিঁ কোউ

দোহার ১ম পাদে ১৩ ও ২য় পাদে ১১ মাত্রা। দোহাছন্দ বাঙ্গলাদেশে আদর পায় নাই।

বৌদ্ধ দোহা ও গানের চৌপাই বা চতুষ্পদী—

। । ॥ । । । । । । ॥ ॥ । ।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ

॥ । । । । । । । ॥ । । ॥ । ।
কানেট চোর নিল কা গই মাগঅ

তুলসীদাসের চৌপাই :—

‖ । । । । । । ‖ । । । । ‖
বন্দউঁ প্রথম ম | হী সুর চরণা

‖ । । । । ‖ । । । । । । ‖
মো হ জনিত সং | সয় সব হরণা

মিথিলা এবং যুক্তপ্রদেশে "অক্ষর মাত্রিক" ছন্দের কোনকালেই ব্যবহার নাই।

এইবার বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার একটি অনুমানের কথা বলিতে চাই। মুসলমানেরা যখন বিহারে প্রথম আগমন করে, তখন বৌদ্ধ বিহারগুলিকে দুর্গ এবং ভিক্ষু ও শ্রমণদিগকে যোদ্ধা ভাবিয়া বিহারগুলিকে ধ্বংস করে। সেই সময় বহু বৌদ্ধভিক্ষু পুঁথিগুলি লইয়া নেপাল ও তিব্বতে পলায়ন করে। মগধে কেবল বিহারগুলিই বিদ্যাশিক্ষার স্থান ছিল। ইহাতে খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত, পালি ও তখনকার প্রাকৃত ভাষায় শিক্ষাদান কার্য্য চলিত। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা তখনকার মগধের প্রাকৃত বা দেশ ভাষা। বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসের পরে মগধে আর বিদ্যাচর্চ্চার কোন স্থান ছিল না তাই মগহি (মাগধী) ভাষার কোন সাহিত্যের নিদর্শনও নাই। সুতরাং তৎপরে বা তৎপূর্ব্বে মগধের দেশ ভাষা কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মিথিলায় হিন্দুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় চর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের দেশীয় ভাষায় লিখিত পদাবলীর সহিত আমরা পরিচিত। তিনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একসময়ের লোক। অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে তাঁহাদের আবির্ভাব কাল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী ও বিদ্যাপতি মৈথিল। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষার সহিত বিদ্যাপতির যত সাদৃশ্য চণ্ডীদাসের (শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের) ভাষার সহিত তত সাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধ দোহা ও গানের কতকগুলি প্রাকৃত কথা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই পাই। কিন্তু এমন কতকগুলি কথা আছে যাহা বর্ত্তমান হিন্দীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গলায় পরিবর্ত্তিত আকারে ছিল আর কতকগুলি কোনরূপে কোন কালে ছিল না। তবে তিন চারিটা কথা এমনও আছে যাহা হিন্দী বা মৈথিলে নাই কিন্তু বাঙ্গলায় আছে। ইহা হইতে এমন অনুমান করা চলে না যে, ভাষাটা বাঙ্গলা। এমনও সম্ভব যে, পদকর্ত্তা বাঙ্গালী বলিয়া সে সময়ের দুই একটা বাঙ্গলা কথা পদে ঢুকিয়াছে।

বৌদ্ধ দোহা ও গানের শেষে অকারাদি ক্রমে শব্দসূচী ও অর্থ দেওয়া আছে। আমি তাহা হইতে আকারাদি ক্রমে শব্দ তুলিয়া প্রথমে দেখাইব বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষার সহিত হিন্দী ও মৈথিলের সাদৃশ্য কত বেশী।

(১) অইস, অইসন, অইসেঁ, অইসো—সং ঈদৃশ বা এতাদৃশ। সং ঈদৃশ স্থানে প্রাকৃত এরিসো হইবে। তাহা হইতে হিন্দী মাগধী এইসা, এইসন, অইসন, প্রভৃতি রূপ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সহচর ও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তারা যখন ব্রজবুলি ধরিয়াছিলেন তখন এই "স" কে পূর্ব্ববঙ্গের দন্ত্য "ছ"য়ে পরিণত করিয়া "ঐছন" লিখিতেন কারণ "স" এর প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বে ছিল না।

(২) অচ্ছ, অচ্ছই, অচ্ছউ, অচ্ছহু, অচ্ছসি, অচ্ছিলেঁ, অচ্ছ প্রভৃতি—সং অস্ ধাতু হইতে এগুলির উৎপত্তি। প্রাকৃত প্রকাশের ১২।১৯ সূত্রে আছে শৌরসেনী ভাষায় অস্ ধাতু স্থানে অচ্ছ আদেশ হয়। এখন শৌরসেণী ভাষার দেশে (মথুরা প্রদেশ) ইহার প্রয়োগ নাই, সেখানে হো, রহ্, থা (স্থা) ধাতু তৎ স্থানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিথিলায় এখন পর্য্যন্ত এই 'অছ' রূপে চলিত আছে। আর চণ্ডীদাসে 'আছ' রূপ ধরিয়াছে। বিদ্যাপতিতে 'অছ' রূপ পাই।

(৩) অখি—সং অস্তি। মগধে এখনও প্রথম পুরুষে দেখ্থিন্, দেখল্থি, দেখল্থিন্ হয়। অর্থ দেখিয়াছে অর্থাৎ দেখিআ + আছে। মৈথিলেও দেখখি ও দেখ্থিহি হয়। 'আছে' এই অর্থে বিদ্যাপতিতে 'থী' পাই।

(৪) অপণু, অপণে, আপ্পণু—সং আত্মন্। বাঙ্গলায় 'অপন' কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না, 'আপন আপনারই' চলে কিন্তু মৈথিলে 'অপন' এখনও আছে। অবশ্য 'অ'র উচ্চারণটা ঠিক্ বাঙ্গলা দেশের 'অ' নয়, বাঙ্গলা ও হিন্দী 'অ'র মাঝামাঝি। মগধে এখনও 'আপ্পন্' চলে।

(৫) আগি—সং অগ্নি, প্রাং অগ্গি। বর্ত্তমান হিন্দী আগ্ মাগধী আগি আগ্। বাঙ্গলায় কিন্তু আগুন।

(৬) আম্হে—সং অস্মাভিঃ বাঙ্গলা আমাদের ও আমাকে। প্রাকৃত অম্হে, 'অ' লোপে ও বর্ণ বিপর্য্যয়ে হমে। সংস্কৃতের চতুর্থী ও ষষ্ঠী স্থানে প্রাকৃতের একমাত্র বিভক্তি হইত। এই 'হমে' মিথিলা ও মগধে ব্যবহৃত হয়।

(৭) আবই—সং আগচ্ছতি। 'আসিতেছে' অর্থে মিথিলা ও মগধে এখনও চলে।

(৮) ইহ—এই। এই অর্থে এখনও হিন্দীতে চলে।

(৯) ইহ—এইখানে। হিন্দীতে হঁহা বা বর্ণবিপর্য্যয়ে হিঁয়া।

(১০) উ—বাঙ্গলায় 'ও' (সং অদস্)। কিন্তু মগধে ও মিথিলায় এখনও 'উ'।

(১১) উঅজ্জই / উবজ্জই } সং উৎপদ্যতে। মগধে এখনও উবজানা বলে।

(১২) উঁচা—সং উচ্চ। ঠিক্ এই শব্দই হিন্দী মাগধী ও মৈথিলে চলে। বাঙ্গলায় পরিবর্ত্তিত উঁচু, উঁচো।

(১৩) কইসন, কইসনি কইসেঁ কইসে—সং কীদৃশ (১) দ্রষ্টব্য।

(১৪) উঠি উঠিয়া অর্থে প্রাচীন বাঙ্গলা ও মৈথিলে চলিত।

(১৫) মই অহারিল—সং ময়া অহারী কৃতম্। 'অহার' যদি 'আহার' হয়, তবে বর্ত্তমান হিন্দী 'মৈ (উচ্চারণ-মন্ন) আহার কিআ'। * বিদ্যাপতিতে উত্তম পুরুষে (হাম) অতীত কালে কৃ ক্রিয়ায় 'করল' ও 'কইল' হইত। 'কইলোঁ', 'করলোঁ', 'কারলোঁ', কৈলোঁ, এই চারি রূপ চণ্ডীদাসে বর্ত্তমান মৈথিলে দেখ্ ধাতুর দেখল্ ও দেখ্লই এই দুই রূপ হয়।

(১৬) কঁহি—বাং কোথায়। এই অর্থে হিন্দী মৈথিল ও মাগধী সর্ব্ব ভাষায় চলিত। বর্ত্তমান মৈথিলীতেও সপ্তমীতে হি হয়, তাই 'কাঁহ', 'জহি', 'তহি', (কুত্র, যত্র, তত্র) মিথিলার শব্দ। সমস্তগুলিই বৌদ্ধ দোহা গানে আছে।

(১৭) কর, করঅ, করঙ, করউ, করন্তু, করহ, করতি, করহু করিঅ, করিয়া, করিঅই, করিজ্জই, করিব, করিবে, করিহ, করী, করু—কৃ ধাতুর এই ১৮ প্রকার রূপ আছে। এই ১৮ রূপের মধ্যে ৮ রূপ অনুজ্ঞার যথা—কর, করহ, করু, করহু, করহু, করিহ, করহি এগুলি মধ্যম পুরুষের ও করউ উ প্রথম পুরুষের। তন্মধ্যে 'কর' বর্ত্তমান হিন্দী, বিহারী ও বাঙ্গলা তিন ভাষায়ই চলিত। 'করহ' পুরাতন বাঙ্গলা ও মৈথিলে চলিত ছিল। 'করু' রূপ বিদ্যাপতিতে ও তুলসীদাসে আছে, চণ্ডীদাসে 'করিউ'। 'করহু' ও 'করহু' রূপ তুলসীদাসে বিদ্যাপতিতে পাই,

* অতীতে "ল" এর উৎপত্তির মূলের বিচার অপর একটী প্রবন্ধে করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রেরিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসে নাই।* করিহ—বাং করিও এই রূপ এখনও মগধ ও মিথিলায় চলে, চণ্ডীদাসেও ছিল। প্রথম পুরুষের করউ—সং করতু, বাং—করুক্, এ রূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়। 'করিঽ'র সহিত মূল পুস্তকে 'ম' আছে, টীকায় অর্থ আছে 'মা করিষ্যসি', ইহা অনুজ্ঞায় সংস্কৃতের লোটের 'হি' হইতে পারে। এ রূপ দেশভাষায় কোথাও কোন কালে ছিল বলিয়া জানিতে পারি নাই। প্রাকৃতে ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর হি হইত যথা—হস্ ধাতুর মধ্যম পুরুষের বহুবচনে হোহিই ও হোহিথা এই দুই রূপ হইত।

'করে' এই অর্থে 'করঅ' চণ্ডীদাসে নাই বিদ্যাপতিতে আছে। সং করোতি স্থানে 'করই' মিথিলায় এখনও চলে, চণ্ডীদাসে নাই। 'করন্ত' পদের শাস্ত্রী মহাশয় অর্থ দিয়াছেন 'করিতেছে।' কর্ন্ত পদটি বাস্তবিক সমাপিকা ক্রিয়া নহে। কর ধাতুতে শতৃ প্রত্যয় করিয়া করৎ হয় (প্রাকৃতে) তাহার বহুবচন 'করন্ত।' একবচনের প্রয়োগ ক্রিয়াতে মৈথিলী ভাষায় এখনও চলে, যথা—দেখাইৎ ছি=বাং দেখিতেছি। মগধ হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তপ্রদেশ পর্যান্ত সমস্ত স্থানে একবচনের প্রয়োগ আছে যথা মগধে—যাৎ বা=যাইতেছ, হিন্দী যাতা হৈ=যাইতেছে। হিন্দীতে বহুবচনে 'যাতেঁহৈ' হয়। বহুবচনের রূপ ক্রিয়ায় উড়িয়া ভাষায় আছে যথা 'আমি দেখিতাম' এই অর্থে 'দেখন্তি।' উড়িয়া ভাষায় প্রথমপুরুষের বহুবচনের 'দেখন্তি' শূন্যপুরাণেরও সেইরূপ 'দেখন্তি' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের 'অন্তি' বিভক্তি যাত। 'করন্ত' রূপ বিদ্যাপতিতে নাই, চণ্ডীদাসে 'করেন্ত' ও 'করন্তি' আছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিতে 'করন্ত' রূপ দেখা যায়। অনন্তরার্থে সংস্কৃতের ক্তা স্থানে শৌরসেনী প্রাকৃতে ইঅ প্রত্যয় হইত। তুলসীদাস ও বিদ্যাপতিতে 'করি' 'করিও' দুইরূপই পাই। চণ্ডীদাসে 'করি' করিআঁ' (বীরভূম বাঁকুড়ার অনুনাসিক) দুইরূপ আছে। বৌদ্ধ দোহা ও গানে 'করি' করিঅ' ও 'করিআ' এই তিন রূপের প্রয়োগ আছে।

'করিঅই' ও 'করিজ্জই'=সং ক্রিয়াতে; দুই খাঁটি প্রাকৃতের রূপ। ইহার অনুরূপ কিছু প্রাচীন বাঙ্গলা বা মৈথিলীতে নাই। 'করিব' ও 'করিবে' এই দুই রূপের অর্থ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন করিব।' 'করিব' কথাটা পুস্তকের দুই স্থানে আছে (১) প্রথম স্থান 'করিব নিবাস' অর্থে টীকায় আছে 'অস্মাভির্নিবাসঃ করণীয়ঃ।' 'করিবে' র সহিত 'ম সাঙ্গ=ময়া অভিষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই 'করিব' বা 'করিবে' বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষায় ভবিষ্যৎকালের সমাপিকা ক্রিয়া 'করিব' বা 'করিবে' নহে। এই 'করিব' বা 'করিবে' কৃদন্ত বিশেষণ। কর্ ধাতু+তব্য (প্রাকৃতে ত লোপে ও ব্য স্থানে ব্ব হইলে)=করিব্ব বা করব্ব এই দুই রূপ ক্রমে করিব বা করব হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলায় তাই প্রথমে আমি, তুমি, সে 'করিব' হইত। (২) আর একটি স্থানে গানে ছাপান আছে 'শাখি করিব' টীকার প্রারম্ভে আছে 'শাখি করিত্বাদি।' ইহা হইতে অনুমান হয় গানে হয়ত 'শাখি করি' এইরূপ ছিল। টীকায় অর্থও দেওয়া আছে সাক্ষিণঃ কৃত্বা।'

সমস্ত কথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে সুতরাং আর কতকগুলি কথা তুলিব সেগুলি বিহারে অর্থাৎ মিথিলা ও মগধে এখনও প্রচলিত আছে (কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে।) প্রথমে দোহার কথা, বন্ধনী মধ্যে বিহারের রূপ ও পরে বাঙ্গলা অর্থ দিব।

কবড়ী (কৌড়া) করি, কাপুর (কাপুর) কর্পূর, কা (কা) কি, কিয় (হিন্দী কিয়া) (সং) কৃত, কুরাড়ী (কুড়ারি, কুড়ানি) কুড়ুল, কো (হিন্দী কো) কে, ঘরহি (মৈঃ ঘরহি) ঘরে, চক্ক (চক্কা) চাকা এই (বিদ্যাপতি জোঁ) যদি. জাব (বিদ্যাপতি জাব) যাবৎ, টুটি (টুটি) ভাঙ্গিয়া নাম (নাও) নৌকা, তসু (বিদ্যাপতি তসু) তাহার, তোহোর (তোহর) তোর, ধাবই (ধাওয়ে) দৌড়ে, পোথি (পোথি) পুথি, পিবই (পিয়ে) পান করে,

পাণিআ (পানিআ, পানি) জল, পুছ (পুছ) শুধাও বা জিজ্ঞাসা কর, বহুড়ী (বহুরী) বৌ, ভণথি (বিদ্যাপতি ভণথি) ভণে, ভলি (হিন্দী ভলি ভাঁতি) ভাল রকমে ভাগেল (ভাগল্) পালাইল, মাগঅ (মাঙ্গে) চাহে, মুষা (মুষা) ইঁদুর রুখের (রুক্ষ হইতে প্রাকৃত রুক্‌খ ও রুক্‌খ ভতত হিন্দীতে এখনও রুখ্ চলে গাছের পতবাল (পতোয়ার) হাঁস, রণ্ডী (রাণ্ডি) রাঁড়, লাঙ্গ (নাঙ্গা) ন্যাঙ্‌টা, বইঠা (বইঠা) উপবিষ্ট, বট্টই (বাটে) বর্ত্তে, বি (ভি) ও, বিহানি (বিহানে) সকাল, বোলই (বোলে) বলে, শাসু (বিদ্যাপতি সাসু, শাস্) শাশুরী, ক্ষামায় (সামায়) ঢুকে, সকই (সকে) পারে, সাচ (সাচ) সত্য, সুসুরা (শ্বশুর অর্থে সুসুরা) শাশুড়ী সো (হিন্দী সো) সে, জিন (তুলসীদাস জিমি) যেমন, অবণা গবণা (আনা জনা কিন্তু দ্বিরাগমন অর্থে গওনা) আসা যাওয়া লোণ (নোন) নুন, বাঙ্গালী (বাঙ্গালী) বাঙ্গালী, কুচ্ছ (কুছ্) কিছু।

দুই এক স্থলে প্রাচীন বাঙ্গলার সহিত সাদৃশ্য পাইতেছি। (১) 'করিআ, করিব' রূপে মৈথিলী ভাষায় পাই না প্রাচীন বাঙ্গলায় ছিল। 'করন্ত' রূপ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। 'নাচন্তি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গলায় ছিল মৈথিলাতে নাই। (২) 'চড়ি' বিহারী ও হিন্দীতে 'চঢ়ি' বাঙ্গলায় 'চড়ি' য়া, 'থাকী' বাঙ্গলায় 'থাকিয়া' এরূপ ক্রিয়া বিহারী বা হিন্দীতে নাই, 'থা' আছে। 'ঘুমই' ক্রিয়া বাঙ্গলায় পূর্ব্বে ছিল না, অর্ব্বাচীন বাঙ্গলায় চলিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'নিঁন্দ' ছিল' (শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।) বিহারী ও হিন্দীতে নিঁদ আছে। বৌদ্ধ দোহা ও গানে 'নিংদ' আছে। 'জীবন্তে' বা 'জীয়ন্তে' পদের অনুরূপ কিছু হিন্দী বিহারীতে নাই। বাঙ্গলায় 'জীয়ন্ত, চলন্ত' চলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি এগুলি শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচন।

বৌদ্ধ দোহা ও গানে পাঁচ রকমের ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। যথা—তসু (তার) করহ (করিব) রুখের (গাছের) হরিণার, ছান্দক (ছন্দের)। ইহার মধ্যে 'তসু' কথাটাই বিদ্যাপতিতে আছে, বিদ্যাপতিতে সর্ব্বনামে 'স' পাওয়া যায় কিন্তু বিশেষ্য পদে কের ও ক, কিন্তু চণ্ডীদাসে কের, ক, এর, র এই চারিটি বিভক্তিই আছে। বৌদ্ধ দোহা গানে ত, হি ও এ সপ্তমীর এই তিন বিভক্তি আছে। ইহার মধ্যে হি ও এ বিভক্তি বিদ্যাপতিতে আছে এবং ত ও এ বিভক্তি চণ্ডীদাসে আছে। চণ্ডীদাসে অবশ্য তে বিভক্তিও আছে। এখন পাঠক বিচার করুন ইহা হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা কিনা।

এইবার 'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' প্রকৃতই বাঙ্গলা এবং নাটক কি না তাহার আলোচনা করিব। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা; কিন্তু আমরা যাহাকে নাটক বলি, এ সেরূপ নাটক নয়, একটি দুটি পাত্র প্রবেশ করিতেছে, আর এক একটি গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে।' কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। মিথিলায় নাটকগুলি সংস্কৃতে লেখা হইত এবং তাহার গানগুলি দেশভাষায় রচিত হইত। 'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকের গান মাত্র। এই পুস্তক হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ৫৯ পৃঃ আছে 'বকরাক্ষসোক্তি—যুদ্ধ॥ কত্থি॥ মেপু ১ ৯॥' তৎপরে 'ভীমোক্তি—যুদ্ধ॥ কত্থি॥ মেপু ১১০॥' এখানে কোন গান নাই, তবে উক্তি কোথায় গেল? তদ্ভিন্ন শুধু বার চৌদ্দটা গান (তাহার মধ্যে আবার অধিকাংশই দুই চার পংক্তির) এক দিবসের পক্ষে যথেষ্ট নহে। গানগুলি পড়িলেও বুঝা যায় মাঝে মাঝে ফাঁক পড়িতেছে।

'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' পুস্তকে চারিজনের গান সঙ্কলিত হইয়াছে (১) কাশীনাথ কৃত বিদ্যাবিলাপ (২) কৃষ্ণদেব কৃত বিদ্যাবিলাপ (৩) গণেশ কৃত রামচরিত্র (৪) ধনপতি কৃত মাধবানল—কামকন্দলা। সম্পাদক মহাশয় বলেন 'ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানি যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। ইহাদের ভাষা কৃষ্ণরাম কবি, বনমালী দাস, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভাষারই মত, তবে একটু যেন পুরাণ ছাঁদে;

দুই একটা বিদেশী কথাও আছে।' আমার মতে কেবল তৃতীয় গ্রন্থকারের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা। অপর তিনজন খাঁটি মৈথিল কবি এবং তাঁহাদের ভাষাও খাঁটি মৈথিলী।

(১) বৌদ্ধ দোহা ও গানে "থাক্" ধাতু থাকায় আমি ইহাকে বাঙ্গলায় "থাক" ধাতুর সঙ্গে সাদৃশ্য বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন মৈথিলে "থাক" ধাতু ছিল কিন্তু বর্ত্তমান মৈথিলে হিন্দী "থক্" ধাতু (শ্রান্তি অর্থে) আসিয়াছে। বিদ্যাপতি পরিষদের পুস্তক ২০১ পৃঃ— গরুঅ কুম্ভ সির থির নহি থাকএ।

(২) নেপালে বাঙ্গলা নাটকের ১৭ পৃঃ সম্পাদকীয় পাদটীকা আছে—'তকরা' অর্থবোধ হয় না। বোধহয় কাতরা পাঠ হইবে। সম্পাদক মহাশয় মৈথিল ভাষা বোধহয় তেমন জানেন না। মৈথিল সাধুভাষায় হমর কিন্তু কথিত ভাষায় হমর্, হম্‌রা দুই হয়, সেইরূপ তাহার অর্থে বর্ত্তমান দক্ষিণ মৈথিলে "তেকরা" শব্দ প্রচলিত আছে। তদ্ শব্দে সম্বন্ধবাচক কের বা কর করিয়া তাকর বা তকর কথিত ভাষায় "তকরা।" উহার অর্থে ওকর, ওকরা দুই হয়, সুতরাং "দেখয়ক মন ভেল তক্‌রা" বাক্যের অর্থ হইবে—তাহাকে দেখিতে মন হইল।

গানের শেষে নেবার ('নেপাল' এর অপভ্রংশ 'নেওয়ার' বা 'নেবার') রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁহার পুত্র রণজিৎ মল্লের ভণিতা আছে। সুতরাং গানগুলি তাঁহাদের রাজত্বকালে লেখা। ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁহার পুত্র ১৭০০ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং গানগুলি বড় জোর দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬০ বৎসরেরও কিছু অধিক পূর্ব্বে রচিত। সম্পাদক মহাশয় ভারতচন্দ্রের ভাষার সহিত কি সাদৃশ্য দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারতের মধ্যে 'একটু পুরাণ ছাঁদ ও বিদেশী কথা'র গন্ধ পাইয়াছেন কিন্তু আমি ধনপতির রচনাতেও মৈথিলীর ছাঁদ দেখাইতেছি :—

১১২ পৃঃ—পহিরিঅ ভলে ভাতি বাঘক চছাল।

ইহার মধ্যে পহিরিঅ = পরিধান করিয়া ভলে ভাতি = ভালরূপে' বাঘক = বাঘের মৈথিলীতে প্রচলিত। 'ভলে ভাঁতি' বর্ত্তমান হিন্দীতে চলিত।

২২৩ পৃঃ—শিব শিব অবে অপনে রচব কওন উপায়।

অবে = এবে, এখন, অপনে = আপনি, রচব = রচিবে, কওন = কোন্ এসমস্ত কথাই মৈথিলী। মৈথিলী ভাষায় পদান্তে অ কিম্বা ই উচ্চারিত হয় না কিন্তু কবিতায় উচ্চারিত হয়। তাই কবিতায় রচব = কথিত ভাষায় রচ্‌ব্।

ছন্দ সম্বন্ধে সেই কথা। দীর্ঘ দুই মাত্রা হ্রস এক মাত্রা। বিদ্যাপতিরও সর্ব্বত্র দীর্ঘ দুই মাত্রা নয় (সম্ভবতঃ গান বলিয়া)। এ গানগুলি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তবে বাঙ্গালীর গানে দীর্ঘ দুই মাত্রা সাধারণ নিয়ম নহে ব্যতিক্রম স্থল যথা—

পয়ার (তিন জন মৈথিল কবির গানে চৌপাই হইয়া পড়িয়াছে)

| | | | | | | | | | || | | || | |
সুরসুর তুয় পদ পংকজ সেব—
|| | | || | | || | | || | |
মোর মনোরথ পূরহ দেব— (মহাভারত ২২১ পৃঃ)

| | | | || | | | | | | | | || |
চলু ভামি জায়ব নৃপতি সমাজ—
| | | | | | | | | | | | | || | |
দুহু মিলি দর কহু | মৃগয়াক সাজ— (ধনপতি ২৩৭ পৃঃ)

ইহার সহিত বাঙ্গালী কবির পয়ার তুলনা করা যাক্—

রাবণে দিলেক দুখ্ বিধিকো কহিবো।
সেখানে এখনে গিয়া আনি জানাইবো॥　(রামচরিত্র)

এইবার কতকগুলি শব্দ তুলিয়া দেখাইব যে সেগুলি শুধু প্রাচীন মৈথিলী ভাষায় নয় বর্ত্তমান মৈথিলী ভাষায়ও প্রচলিত আছে। এমন কি অনেকগুলি শব্দ বিহারের অন্যান্য স্থানেও চলে।

সর্ব্বনাম—হমে (আমি), হমরাকে (আমাকে), হমর, হমরা (আমার), অপন (আপনার), হিনক (ইঁহার) তোহে (তুমি), তোরা (তোর), তোহর (তোমার), তহিক (তাঁহার), তকরা (তাহার, এই শব্দটির অর্থ সম্পাদক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই) তোহ সনি (তোমার সমান), ঈ (এ), একর (এ'র) কওন (কোন), কোনেপরি (কোন পথে, কোন উপায়ে)।

ক্রিয়া—জায়ব (অকারান্ত—যাইব), দেখল (দেখিলাম), আবথি (আসিতেছে), পওলহ পাইলা), চলু (চলি অনুজ্ঞা) জায়িছি (যাইতেছি, দেলহি (উচ্চারণ—দলহিন্ বা দেলাহিঁ=দিলেম); ছপায় (হিং ছিপানা=গোপন করে), তোড়ব (ভাঙ্গিব), কহৈ ছহু (কহিতেছে). উগল উদিত হইল), লেহ (লও), বচলহুঁ (বাঁচিলাম) জোহব (খুঁজিব), ফুলল (গাছে ফুল ফুটিল ইহা বিহারের বাক্ভঙ্গী—নাম ধাতু)।

কারক—শিরহি (শিরে), সুরপুরতহ (সুরপুর হইতে), বহিনিক (বহিনের, ভগিনীর), তসু (তস্য)।

অন্যান্য শব্দ—নিকে (সুন্দর রূপে) সগরে (সকল স্থানে বা সকল লোকে এই অর্থে বিহারে বহু স্থানে চলিত), ভলে (ভাল রূপে যথা হিন্দুস্থানী ভিখারীর গানে "ঠাকুর ভলে বিরাজ হো"।), ভসম (ভস্ম), লগ (নিকটে), সুপ (কুলো), জওঁ (যদি), জনু (যেন না—ছাপড়ায় শুনিয়াছি "যাইহ জউন"=যেন যেও না), সরাপ (শাপ), ভগত (ভক্ত)।

সর্ব্বনাম ক্রিয়ার রূপ সর্ব্বত্র মৈথিলী ভাষায় প্রমাণ যথেষ্ট দিয়াছি, ইহাতেই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইল। সম্পাদক মহাশয়ের আর দুইটি কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন (৶০ পৃঃ) "নেপালীরা 'ক' স্থানে 'গ' ও 'ল' স্থানে 'র' লিখিয়া থাকে। নেপালীদের হাতে 'সকলে' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" উপরে বলিয়াছি ইহার অর্থ সকল স্থানে বা লোকে। শুধু 'সগর' শব্দ এই অর্থে বিহারের পশ্চিমাংশে প্রচলিত। ইহা নেপালীদের দোষ নয়। বিদ্যাপতিও 'সকল'কে 'সাগর' করিয়াছেন যথা—(১) সগর শরীর ধরয়ে কত ভাতি (২) অনুখন সগর নগর ভম চোর। তিনি ১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলিয়াছেন "নেপালীরা 'ষ' স্থানে প্রায়ই 'খ' লিখে।" কায়থীতে একই অক্ষর 'খ' ও 'ষ'এর কাজ করে, আমাদের জনৈক মৈথিল ছাত্র (সংস্কৃত কাব্য ও জ্যোতিষে মধ্যম পরীক্ষা পাশ করিয়াছে) 'ষ' স্থানে 'খ' উচ্চারণ করিত। মিথিলায় সর্ব্বত্র 'ষ' উচ্চারণের এই নিয়ম।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

সে কোথায় ?

সে কোথায়—গেছে কোন্ দূর দূরান্তরে—
রহস্য সিন্ধুর পারে স্বর্ণমেঘময়
বিচিত্র সে পুরী,—দিন শেষ হলে পরে
শ্রান্ত দিনমণি যথা লয় গো আশ্রয় !
সেথায় না পশে ধরণীর কোলাহল,
কেবলি বিশ্রব্ধ শান্তি বিরাজে সে পুরে !
রবিশশী তারকাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল
করিছে আরতি নিশিদিন ঘুরে ঘুরে,
অমর সঙ্গীতে পুরী মুখরিত করি !
নন্দনের পারিজাত পরিমলবাহী
অনিল উল্লাসভরে—মেঘগুলি, মরি,—
নাচায় দুলায় ধীরে ! সেথা পথ চাহি,—
একাকী সে আছে বসে মেঘনীড়ে, হায়,
মোর সনে মহা মিলনের প্রতীক্ষায় !

দুরন্ত ।

ওরে, মনোবন পাখি ! দিবস রজনী
আড়াল হইতে আমি শুনি তোর ধ্বনি ।
কি কহিস্—কলকণ্ঠে কি যোগাস্ গান,
বুঝি না ত, মুগ্ধ হয়ে করি শুধু পান !
মাথা খাস্, পাখি, তুই একবার থাম্,
গলাটি যাবে যে ভেঙ্গে ডেকে অবিরাম !
বাসা তোর যেথা ঘন পল্লব মাঝার,
সেথাই মাথাটি রেখে ঘুমা' একবার !
নিস্তব্ধ নিশীথে—সারাদিন ঘুরেফিরে,
ঘুমায়ে সবাই যবে নিজ নিজ নীড়ে,—
চঞ্চল অনিল সনে ঘুমায় কুসুম,—
দুরন্ত ! তখনো তোর চোখে নাই ঘুম !
ভাখ্, মূঢ় ! তোর দোষে—ভাখ্ আঁখি তুলে,
যোগাসনে যোগীবর মন্ত্র যান ভুলে !

চিঠি ।

ঘুম ভেঙে আজি তার পেয়েছি লিখন !
বিরহবিধুরা বালা মিলনের তরে
হয়েছে কাতরা অতি—মৃদু গুঞ্জ স্বরে
বহি আনে এ বারতা দক্ষিণ পবন !
শশি পক্ষসঙ্গে যবে বিবশা শর্ব্বরী—
অবগুণ্ঠন খানি পড়িবে খসিয়া
কবরী সীমান্তে তার ; খুলিবে গো হিয়া
বিলাতে অনিলে মধু ফুলবধূ, মরি ;—
পতিস্মৃতি মাত্র সাথী রমণী অবলা—
পরশলালসে এলায়িত তনুলতা,—
নিদাঘে জলদ স্মরি শৈবলিনী যথা,—
বিজন মানসবনে জাগিবে একলা !
আজি তাই মন নাহি লাগে কোন কাজে,
রহি রহি হিয়া মাঝে সে আনন্দ বাজে !

অভিসার ।

এমন দুর্য্যোগ রাতে তার অভিসার !
গগন সঘন, ধরা ঘোর অন্ধকার,
শুধু সে চপলা চমকিছে বারম্বার
দিশি দিশি ;—হেন নিশি অভিসার তার !
থেমেছে নিকুঞ্জ গেহে বিহঙ্গ-কূজন,
মধুলুব্ধ মধুপের মধুর গুঞ্জন ;
শুধু সে পূরব বায় দ্বার খোলা পেয়ে,
হা হা করে উন্মাদের মত আসে ধেয়ে !
তখন সে সুদূরতর কোন্ নদী পারে,
সঙ্গীহারা পথহারা গহন কান্তারে,
দৃষ্টিহারা সুগভীর কোন্ অন্ধকারে,
হইতেছে পার, ওগো, মোর অভিসারে !
মেঘ ডাকে, বায়ু হাঁকে, ঝরে বারিধার,—
হেন ঘোর রজনীতে তার অভিসার !

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র

কোচবিহার—সাহিত্য-সভা।

সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

ল্যান্সডাউন হল, ১৩২৬ সন ২৯এ বৈশাখ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ।

কার্য্য-বিবরণ।

১। সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হয়;—

বিভাস

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

ইমন

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,—
শক হূন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন॥

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

** **

বেহাগ

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমানভার।

বিভাস

মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা।
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

(গীতাঞ্জলি)

২। শ্রীযুক্তা রাণী নিরুপমা দেবী মহোদয়া বিরচিত নিম্নলিখিত উদ্বোধন কবিতা সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় পাঠ করেন;—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

—:০:-

তুমি জগতের হৃদয়ে লুকায়ে মৃত্যু করিছ নাশ,
নবজীবনের সৃষ্টির মাঝে শক্তি সুপ্রকাশ।
রজনী আঁধার করি নিঃশেষ
নবজীবনের নব উন্মেষ;
দিকে দিকে তুমি জাগাইছ সাড়া
প্রাণের অভ্যুদয়,
জয় তব জয় জয়!

যাহারা ঘুমায়ে ছিল এতদিন মেলেছে সকলে চোখ
নব উৎসাহে মত্ত করেছে তোমার পুণ্যালোক!
স্বাধীনতা আর জাতীয়তা বীজে
নব প্রাণ রসে উঠিয়াছে ভিজে
আপনার পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে।
আপনার'পরে ভর,
জয় চির নির্ভর।

সঞ্জীবনের মন্ত্র তোমার ফুকারিছে যেই ভেরী,
বলিতেছে সবে "উঠ উঠ জাগ নাহি দেরী নাহি দেরী।"
কেহ নাহি জানে কি যে হবে আজ
করিতে হইবে কার কোন্ কাজ,
রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় বাজিতেছে সেই গান
জয় নিখিলের প্রাণ।

কিছু ঝরে নাই কিছু মরে নাই
কিছু হয় নাই হারা,
সৃষ্টিদিনের প্রথম হইতে
বহিছে একটি ধারা!
যা ছিল তখন এখনও তা আছে,
আমরা বাঁচিলে তাহারাও বাঁচে,
আমরা রাখিলে আদিমের যুগ
হয় পুন অক্ষয়,
জয় অমৃত জয়!

হিন্দু রাজার রাজত্বকাল
ভাতিছে আবার মনে
কোন্ বিদ্যায় বলী ছিল তারা,
ধনী ছিল কোন্ ধনে!

গড়েছিল কি যে কীর্ত্তির লাগি
লিখেছিল পুথি যশ-অনুরাগী
জ্ঞানী ছিল তারা গুণী ছিল তারা
শিল্পের গুরু সেরা
মহাবিদ্যায় সেরা!

আমরা তাঁদের পুণ্য মহিমা
তুলিব আবার ধরে,
তাঁদের জীবনকাহিনী আবার
বলিব প্রচার করে!

আঁকিব তাঁদের জীবন খাতায়
পদাঙ্ক লেখা ধরিব মাথায়
শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁদের সমান
হইব আবার সবে
সে দিন আবার হবে!

আমাদের এই মরা বুকে আজ
দাও তুমি নব-প্রাণ
কণ্ঠ পূরিয়া গাহিব আবার
নবজীবনের গান!

কিসে মোরা হীন ছোট মোরা কিসে
বড় হব মোরা বড় সাথে মিশে,
উঠিব জাগিব কি ভয় মোদের
তুমি আমাদের পিতা
'জনয়িতা পালয়িতা।'

৩। ১৩২৬ সনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়।

৪। নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়।

৫। সম্পাদক কর্তৃক সভায় ১৩২৫ সনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন;—

GENTLEMEN,

I trust you will forgive me addressing you a few words before the conclusion of to-day's programme, and give me your attention for a few minutes.

Let me welcome you all to this the 3rd Annual Meeting, and I would feel obliged by anyone pulling me up, should I be wrong in what I say, or on any point for discussion. You have heard the Annual Report read out by the Secretary, and that will give you all the information you require about the last year's working.

The number of members, whose names have been struck off the list owing to non-payment of subscription seems high, in proportion to the total number of members, but gentlemen you must not forget that all the rules were drawn up by yourselves. If the non-payment of subscriptions is due to its being too high, you have yourselves to blame and no one else. The hands of the Executive Committee are tied. They are bound by the rules. The matter is distasteful, so perhaps I should not have dilated upon it at the Annual General Meeting. But I feel I cannot restrain myself from speaking on one subject—it has been in my mind for months past and to-day it is the first opportunity I have had of speaking about it. It is this—I sincerely deplore the lack of interest taken by the members of the Sava generally. The names of members who take real interest can almost be counted on the fingers of the hands. We have ample funds, towards which His Highness has contributed most generously, what is it you would want. When the Maharaja of Mysore visited us I told him that the Sava was originally started with the idea of Research Work, but if the members will kindly look up the rules and refer to Nos. 3, 4 and 19, they will find that Sub-Committees may be formed for the other Arts and Sciences. To those members, who have any inclination to any art or science, I would feel much beholden, by their helping to start Sub-Committees as soon as possible. But I appeal to you all to take a greater interest. Let there also be more healthy arguments, which is good for mind, body, and soul. By healthy I do not mean heated arguments, which generally lead to unpleasantness—that must be averted at all costs.

It may interest you to know that a Museum in London has approached this State through the Government of India for all Archæological Reports and Works of historical interest. As you know the State has no such departments, but it shows us that there is a great field for work.

The History of Northern and North-Eastern Bengal is practically unknown to the general public, so in conclusion I am glad to announce that His Highness has sanctioned the publication of an authenticated History of the State. The task of collecting all material and writing up preliminaries has been left in the capable hands of our able Secretary Khan Chowdhuri Amanatulla Ahmed. I ask all members for their cordial help, and I am sure none will be more thankful than Khan Chowdhuri himself.

বঙ্গানুবাদ।

ভদ্রমহোদয়গণ,

অদ্যকার সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে দুইচারিটি কথা বলিতে চাই এবং আশা করি যে আপনারা আমার এই কথা কয়টি একটু মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

সভার এই তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি সমাগত সভ্যবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি যে কথা বলিতে যাইতেছি, যদি তাহাতে কোন ভুলভ্রান্তি থাকে, তাহা হইলে আপনাদিগের মধ্যে কেহ কৃপা করিয়া

আমার ভ্রমের সংশোধন করিয়া দিলে কিম্বা তৎসম্বন্ধে আবশ্যক আলোচনা করিলে, আমি অনুগৃহীত বোধ করিব। সভার সম্পাদক এই মাত্র যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, তাহা আপনারা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে গতবৎসরে সভার কি কাজ হইয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

বকেয়া চাঁদা দেওয়ার জন্য, যে সকল সভ্যের নাম সভ্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সভার মোট সভ্যসংখ্যার তুলনায় অধিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু মহোদয়গণ, আপনাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে সভার নিয়মাবলী আপনারাই প্রণয়ন করিয়াছেন। যদি আপনাদের বিবেচনা হয় যে সভার চাঁদার হার অতিরিক্ত হওয়াতেই অনেকে দিতে পারেন না, তাহা হইলে সে ক্রটি আপনাদেরই;—যেহেতু কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি এ সম্বন্ধে নিরুপায়, কারণ তাঁহারা সভার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তবে, এই অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া, সাধারণ সভায় আর অধিকতর আলোচনা করা সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু, একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার মনের কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; ইহা অনেকদিন হইতেই আমার মনে রহিয়াছে এবং আজই আমার পক্ষে এই কথা বলিবার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সে কথাটি এই:—সাধারণতঃ সভার কার্য্যের প্রতি সভ্যগণের আন্তরিক অনুরাগের অভাব দেখিয়া আমার মনে প্রকৃতই কষ্ট হইয়াছে। সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মনপ্রাণের সহিত সভার কার্য্য করেন, তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের উদারতার ফলে আমাদের তহবিলে যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে। আপনাদের এ সম্বন্ধে প্রকৃত অভিলাষ কি, তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হয়। শ্রীশ্রীযুক্ত মহীসুরাধিপতি বাহাদুর যে সময়ে আমাদের এখানে পদার্পণ করেন, তৎকালে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে প্রধানতঃ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সভার নিয়মাবলীর তৃতীয়, চতুর্থ, এবং ঊনবিংশ দফার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সভাসদ্‌গণ দেখিতে পাইবেন যে, যে কোন বিশেষ বিশেষ শিল্প অথবা বিজ্ঞানের অনুশীলনের নিমিত্ত সভা হইতে সবকমিটি নিযুক্ত হইতে পারে। সেই জন্য সদস্যগণের মধ্যে যাঁহাদের মনে কোন বিশেষ শিল্প অথবা বিজ্ঞানের বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাঁহারা যদি সেই সেই বিষয়ে যতশীঘ্র সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন সবকমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব। আমি সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সভার কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হউন। বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় লইয়া উপযুক্তভাবে অনুশীলন এবং আলোচনা হউক,—তাহাতে আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিবিধ উন্নতির সম্ভাবনা। তবে এই সব আলোচনা অবশ্য সরল এবং সাধুভাবেই হওয়া উচিত শুষ্ক অথবা কলহ পূর্ণ বিতণ্ডা করিয়া মনোমালিন্যের উৎপাদন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে,—বরং সেরূপ তর্ক অথবা কলহ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করাই উচিত।

আপনারা শুনিয়া হয় ত সুখী হইবেন যে লণ্ডনের কোন একটী মিউজিয়ম আমাদের কোচবিহার রাজ্যের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সম্বন্ধে বিবরণী এবং পুস্তকাদির জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের যোগে আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যের দফ্‌তরে এরূপ কোন বিভাগ নাই; তথাপি, ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর এবং পূর্ব্বোত্তর ভারতের প্রকৃত ইতিহাস এখনও সাধারণে অবিজ্ঞাত রহিয়াছে। এতদুপলক্ষে আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত তথ্য পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন একখানি উপাদেয় ইতিহাস প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই ইতিহাস প্রণয়নের নিমিত্ত যাবতীয় আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ এবং খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার আমাদের সুদক্ষ সম্পাদক খান চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি সভ্যমহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে সম্পাদককে সানন্দে সহায়তা প্রদান করুন এবং আমার বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইলে তিনি অতিশয় আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন।

১৭। শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনক্রমে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীআমানতউল্যা আহমদ।	শ্রীভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ।
সম্পাদক।	সভাপতি।

কোচবিহার-সাহিত্য-সভার তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

সন ১৩২৫

কোচবিহারাধিপতি মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আইদেবতীর অনুমতিক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মহোদয় ১৩২২ সনের ১৩ই পৌষ তারিখে এই সভা স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়া সদস্যবৃন্দের উৎসাহ ও সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১। আলোচ্য বর্ষে নিম্ন লিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পরিচালক ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ,—সভাপতি।

,, ,, লেপ্টনাণ্ট হিতেন্দ্রনারায়ণ ও
,, দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন বি.এল., বার-এট-ল; } সহকারী সভাপতি।

,, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম.এ. বি.এল., ইত্যাদি, সবডিভিসনাল অফিসার, দিনহাটা;-পত্রিকা সম্পাদক।

,, খান চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ, জমিদার ;—সম্পাদক।

,, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, জমিদার ;—সহকারী-সম্পাদক।

সভ্য

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল.,—সিভিল ও সেসন জজ।

,, জানকীবল্লভ বিশ্বাস, সহকারী-সম্পাদক—"পরিচারিকা"।

,, নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ,—অধ্যাপক-ভিক্টোরিয়া কলেজ।

,, মনোরথধন দে, এম.এ., ,, ,,

,, মৌলবী আবদুল হালিম, শিক্ষক—জেঙ্কিন্স স্কুল।

,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, লাইব্রেরীয়ান—ষ্টেট লাইব্রেরী।

,, ইন্দুভূষণ দে মজুমদার, বি.এ., এম্.এস্.সি.,—এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার।

,, অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ,—স্পেশাল এসিষ্টাণ্ট মহারাজের অফিস।

,, নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,—পুলিস ইনসপেক্টর।

২। ১৩২৫ সনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৮টী অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ৭টী অধিবেশন হইয়াছিল।

৩। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছেন।

বিশিষ্ট সদস্য :—

১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, নাইট্, সি.এস্.আই., এম্.এ., ডি.এল্., ডি.এস্.সি., এফ্.আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এস্.ই., এফ্.আর্.এস্.বি.—কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী এম্.আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এ.এস্., গৌহাটী।

সাধারণ সদস্য বর্ণমালাক্রমে।

১। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ, কোচবিহার।
২। ,, অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৩। ,, অন্নদাপ্রসাদ রায়, কোচবিহার।
৪। ,, অরুণ সেন, বি.এ., বার-এট্-ল, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৫। ,, অশ্বিনীকুমার পাল, বি.এ., কোচবিহার।
৬। ,, আজিজর রহমান, কোচবিহার।
৭। আকিম উদ্দিন আহমদ, বড় মরিচা পোঃ।
৮। আদিত্যচন্দ্র কার্য্যী, কোচবিহার।
৯। আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ঐ
১০। আনসার উদ্দিন আহমদ, বি.এ., ঐ
১১। জে এম আপকার, দিনহাটা।
১২। আফতাব উদ্দিন আহমদ, কোচবিহার।
১৩। খান চৌধুরী আমানত উল্যা আহমদ, ঐ
১৪। আমানত উল্যা আহমদ, ডাক্তার ঐ
১৫। আমীর উদ্দিন মোহাম্মদ, ঐ
১৬। আমীর উদ্দিন মোহাম্মদ, মেখলীগঞ্জ।
১৭। আমীর উল্যা আহমদ, তুফানগঞ্জ।
১৮। আলীম মোহাম্মদ, কোচবিহার।
১৯। মৌলবী আবদুল হালিম, কোচবিহার।
২০। আশুতোষ দত্ত, বি.এ., বি.এস্.সি., এম্.এস্.সি., কোচবিহার।
২১। ইন্দুভূষণ দে মজুমদার, বি.এ.,এম্.এস্.সি., কোচবিহার।
২২। ইন্দুকুমার ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার।
২৩। ইন্দ্রনারায়ণ সরকার, মাথাভাঙ্গা।
২৪। সেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, কোচবিহার।
২৫। রায় চৌধুরী ঈশানচন্দ্র লাহিড়ী, বামনহাট পোঃ, কোচবিহার।
২৬। উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্.এ., কোচবিহার।
২৭। উপেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এ., কোচবিহার।
২৮। উমানাথ দত্ত, বি.এল., মেখলীগঞ্জ।
২৯ উমেশচন্দ্র সরকার, কোচবিহার।
৩০ উমেশচন্দ্র সিংহ, কোচবিহার।
৩১ এমদাদ আহমদ, বড় মরিচা পোঃ, কোচবিহার।
৩২ এসরাইল উদ্দিন চৌধুরী, কোচবিহার।
৩৩ কদর উদ্দিন আহমদ, বড়মরিচা পোঃ ঐ
৩৪ কলিম উদ্দীন আহমদ, বলাহরহাট পোঃ, কোচবিহার।
৩৫ কাজিম উদ্দিন আহমদ, কোচবিহার।
৩৬ কার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত, কোচবিহার।
৩৭ কামাখ্যাপদ মুস্তফী, গোবরাছড়া পোঃ।
৩৮ কামিনীকুমার রায়, কোচবিহার।
৩৯ কালীপ্রসাদ সাহা, কোচবিহার।
৪০ কালীমোহন পাল, কোচবিহার।
৪১ কিশোরীমোহন বড়ুয়া, দিনহাটা।
৪২ কুমুদবন্ধু বিশ্বাস, ঐ
৪৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ঘোষ, কোচবিহার।
৪৪। ,, ঠাকুর কৃষ্ণমোহন সিংহ, মেখলীগঞ্জ।
৪৫। ,, কৃষ্ণবিনোদ সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
৪৬। ,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৪৭ ,, কেদারনাথ বিশ্বাস, কোচবিহার।
৪৮ ,, কেদারনাথ সিংহ, কোচবিহার।
৪৯ ,, কৈলাসচন্দ্র সেন, কোচবিহার।
৫০ ,, ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম, কোচবিহার।
৫১ ,, ক্ষেত্রলাল সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
৫২। ,, খগেন্দ্রনারায়ণ পাটোয়ারী, আদাবাড়ী, গোসানীমারী পোঃ, কোচবিহার।
৫৩। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার।
৫৪। গঙ্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত, বি.এ., কোচবিহার।
৫৫। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, এম.আর. এ.সি., কোচবিহার।
৫৬। গণেশচন্দ্র গুহ, কোচবিহার।
৫৭। গণেশচন্দ্র রায়, কোচবিহার।
৫৮। গিরিজামোহন রায়, কোচবিহার।
৫৯। গিরিজাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৬০। রায় সাহেব গুরুচরণ দত্ত, কোচবিহার।
৬১। গুরুচরণ রায়, ভোগডাবরী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর।
৬২। গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, কোচবিহার।
৬৩। গোপালগোবিন্দ গুহ, কোচবিহার।
৬৪। গোবিন্দবন্ধু রায়, কোচবিহার।
৬৫। চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, এম.এ., ,,
৬৬। জগদ্বল্লভ বিশ্বাস, এম.এ., বি.এল., কোচবিহার।
৬৭। জগদীশচন্দ্র সেন, বি.এ., কোচবিহার।
৬৮। জলধর মিত্র, এল. এম্. এস., কোচবিহার।
৬৯। জানকীবল্লভ বিশ্বাস, কোচবিহার।
৭০। জাফর আলি সরকার, দিনহাটা।
৭১। জিতেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, বি. এস. সি., কোচবিহার।
৭২। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৭৩। জ্ঞানশঙ্কর বাগচী, কোচবিহার।
৭৪। তারাকুমার সেন গুপ্ত, বি.এল., মেখলীগঞ্জ।
৭৫। তারাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ১২৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭৬। রায় চৌধুরী তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার।
৭৭। তারিণীমোহন দাস, কোচবিহার।
৭৮। ত্রিগুণাচরণ চক্রবর্ত্তী, দিনহাটা।
৭৯। ত্রৈলোক্যনাথ সিংহ, মেখলীগঞ্জ।
৮০। দক্ষিণারঞ্জন ধর, বি.এল., তুফানগঞ্জ।
৮১। দীনেশানন্দ চক্রবর্ত্তী, এল.এম.এস., কোচবিহার।
৮২। দুর্গাচরণ সরকার, ,,
৮৩। দুর্লভনাথ চক্রবর্ত্তী, গুড়িয়াহাটী ,,
৮৪। দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বি.এ., ,,

৮৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, কোচবিহার।
৮৬। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, ,,
৮৭। ,, নগেন্দ্রনাথ রায়, এম.এ., বি.এস.সি., এ.সি.জি. আই, জি.এম.আই.ই.ই., কোচবিহার।
৮৮। ,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ., ঐ
৮৯। ,, নরসিংহচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. বি.এল., ঐ
৯০। ,, নরেন্দ্রনাথ সেন, বি.এল., বার-এট-ল, ঐ
৯১। ,, নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি.এ., ঐ
৯২। ,, কুমার নলিনীন্দ্রদেব রায়কত, ঐ
৯৩। ,, নবদ্বীপচন্দ্র দে, ঐ
৯৪। ,, নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, ঐ
৯৫। ,, প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, ঐ
৯৬। ,, নির্ম্মলচন্দ্র মুস্তফী, বি.এল., দিনহাটা।
৯৭। ,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার।
৯৮। ,, নিবারণচন্দ্র রায়, মেখলীগঞ্জ।
৯৯। ,, নিবারণচন্দ্র রায় চৌধুরী, কোচবিহার।
১০০। ,, নিশাহর বর্ম্মা প্রামাণিক, মেখলীগঞ্জ।
১০১। ,, নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার।
১০২। ,, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ,,
১০৩। ,, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা, এম.এ. বি.এল., এম.বি.ই., নবাবগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১০৪। ,, পদ্মনাথ ঈশর, কোচবিহার।
১০৫। ,, পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, ঐ।
১০৬। ,, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি.এল., জলপাইগুড়ি।
১০৭। ,, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, কোচবিহার।
১০৮। ,, প্রফুল্লরঞ্জন ধর, এম.এ., ঐ
১০৯। ,, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১১০। ,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্.এ. বি.এল., ঐ
১১১। ,, প্রমদানন্দ রায়, ঐ
১১২। ,, রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী, ঐ
১১৩। ,, প্রবোধচন্দ্র সেন, ঐ
১১৪। ,, প্রবোধচন্দ্র মিত্র, ঐ
১১৫। ,, প্রিয়ভূষণ রায়, বি.এ., ঐ
১১৬। ,, প্রিয়লাল ঘোষ, ঐ
১১৭। ,, ফকির দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., ঐ
১১৮। ,, ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., ঐ
১১৯। ,, বজলর রহমান, সরকার বি.এল., মাথাভাঙ্গা।
১২০। ,, বলরাম পাল, কোচবিহার।
১২১। ,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১২২। ,, বাণীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ঐ
১২৩। ,, ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., ঐ
১২৪। ,, বিনয়কুমার ঘোষ, কোচবিহার।
১২৫। ,, বিনোদবিহারী দত্ত, বি.এল., ঐ
১২৬। ,, বিপদভঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ঐ
১২৭। ,, বিভূতিভূষণ বসু, ঐ
১২৮। ,, বিভূতিভূষণ দে, ঐ
১২৯। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেন গুপ্ত, কোচবিহার।
১৩০। ,, বিষ্ণুচরণ মজুমদার, ঐ
১৩১। ,, বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৩২। ,, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ঐ
১৩৩। ,, বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, এম.এ., ঐ
১৩৪। ,, বীরেশ্বর সেন, কৃষ্ণনগর।
১৩৫। ,, বেচারাম দত্ত, কোচবিহার।
১৩৬। ,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র নিয়োগী, ঐ
১৩৭। ,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ঐ
১৩৮। ,, ভবাব্ধি কমল সেন, ঐ
১৩৯। ,, ভবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ
১৪০। ,, ভানুনাথ বিদ্যারত্ন, ঐ
১৪১। ,, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল., ঐ
১৪২। ,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ
১৪৩। ,, মথুরানাথ রায়, ঐ
১৪৪। ,, মনীন্দ্রনাথ রায়, এম.এ., ঐ
১৪৫। ,, রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, ঐ
১৪৬। ,, মনোমোহন সান্যাল, ঐ
১৪৭। ,, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৪৮। ,, মনোরথধন দে, এম্.এ., ঐ
১৪৯। ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১৫০। ,, কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর, পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা।
১৫১। ,, মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
১৫২। ,, মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মা অধিকারী, ঐ
১৫৩। ,, মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৫৪। ,, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি.এল., ঐ
১৫৫। ,, মোদনাথ স্মৃতিরত্ন, ঐ
১৫৬। ,, যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, মাথাভাঙ্গা।
১৫৭। ,, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি.এল., দেবীগঞ্জ পোঃ, জলপাইগুড়ি।
১৫৮। ,, যতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, কোচবিহার।
১৫৯। ,, যতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ
১৬০। ,, যদুনাথ নিয়োগী, ঐ
১৬১। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি.এস.সি., এ.এম. আই.ই.এস্., এম. আর. আই., ঐ
১৬২। ,, যোগেন্দ্রনাথ ভিষগ্‌রত্ন, ঐ
১৬৩। ,, যোগেন্দ্রনাথ দাস ঐ
১৬৪। ,, যোগেন্দ্রনাথ বর্ম্মা, ক্ষত্রিয়সমিতি রংপুর।
১৬৫। ,, রজনীকান্ত ভৌমিক, এম.এ. বি.এল., মাথাভাঙ্গা।
১৬৬। ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি.এ., কোচবিহার।
১৬৭। ,, রমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কোচবিহার।
১৬৮। ,, রমেশনারায়ণ চৌধুরী, কোচবিহার।
১৬৯। ,, রসিকলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ
১৭০। ,, রাখালচন্দ্র বণিক, বি.এ., ঐ
১৭১। ,, রাজনারায়ণ পোদ্দার, ঐ

১৭২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার।
১৭৩ ,, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায়, বি.এল., ঐ
১৭৪ রাধাগোবিন্দ রায়, ঐ
১৭৫ রামরতন চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৭৬ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ
১৭৭ লক্ষ্মীকান্ত দাস বড়কায়েত, ঐ
১৭৮। লাটুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঐ
১৭৯ লোকেনাথ দত্ত, এল.সি.ই, ঐ
১৮০ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, এম. এ., ঐ
১৮১ শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম.এ. বি.এল; সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী, দিনহাটা।
১৮২ শরৎকুমার দেব বর্ম্মা, কোচবিহার
১৮৩ শশধর মিত্র, বি.এল., মেখলীগঞ্জ।
১৮৪ শশিভূষণ সেন, কোচবিহার।
১৮৫ শশিমোহন বসু, ঐ
১৮৬ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১৮৭ ,, শৈলেন্দ্র ঘোষ, বি. এ, ঐ
১৮৮ ,, শৈলেশচন্দ্র দে সরকার, ঐ
১৮৯ শ্যামাচরণ তালুকদার, ঐ
১৯০ শ্রীনাথ রায়, ঐ
১৯১ শ্রীশচন্দ্র রায়, ঐ
১৯২ সতীশচন্দ্র রায়, ঐ
১৯৩ সতীশচন্দ্র গুহ, ঐ
১৯৪। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীসতীশচন্দ্র মুস্তফী. কোচবিহার।
১৯৫। ,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এল, ঐ
১৯৬। ,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী, কোচবিহার।
১৯৭। ,, সতীশচন্দ্র দাস, ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গা, রংপুর।
১৯৮। ,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কোচবিহার।
১৯৯। ,, সারদাচরণ মজুমদার, ঐ
২০০। ,, সীতানাথ রায়, ঐ
২০১। ,, সীতেশচন্দ্র সান্যাল, ঐ
২০২। ,, সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি,এল., ঐ
২০৩। সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ঐ
২০৪। সুরেশচন্দ্র গুহ, ঐ
২০৫। সুরেশচন্দ্র মল্লিক, ঐ
২০৬। রায় চৌধুরী সুরেশচন্দ্র মুস্তফী, ঐ
২০৭। সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, এম.এ, ঐ
২০৮। সূর্য্যনাথ গুপ্ত, ঐ
২০৯। হরকান্ত দে, ঐ
২১০। হরনাথ সরকার, ঐ
২১১। হরিদাস সেন গুপ্ত, এম.এ., কোচবিহার।
২১২। হরিনাথ বসু, বি.এল., খুলনা
২১৩। হরেন্দ্রনারায়ণ দাস, কোচবিহার।
২১৪। মহারাজকুমার লেপ্টনান্ট হিতেন্দ্রনারায়ণ, ঐ
২১৫। হেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি.এল, ঐ

৩। আলোচ্য বর্ষে সভার নিম্নলিখিত ৮টী অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ৬টী সাধারণ ও ১টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

তারিখ	অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।
১লা বৈশাখ ..	বার্ষিক	১৩২৪ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গ্রহণ।
৩১শে বৈশাখ	বিশেষ	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারাণী সুনীতি দেবী সি.আই. মহোদয়া কর্ত্তৃক "মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সাহিত্যিক জীবন" বক্তৃতা।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ	বিশেষ	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারাণী সুনীতি দেবী সি.আই. মহোদয়া কর্ত্তৃক কথকতা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, বলরামের ভক্তি, শিখিধ্বজের আত্মদান ও সতীর উপাখ্যান
১৬ই আষাঢ়	বিশেষ (বঙ্কিম স্মৃতিসভা)	শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন রায় লিখিত "বঙ্কিমের ধর্ম্ম" প্রবন্ধ ও স্থানীয় নাট্যসমাজকর্ত্তৃক "কমলাকান্তের দপ্তর" অভিনয়।

তারিখ		অধিবেশন		পঠিত প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ
২৮শে শ্রাবণ		সাধারণ	...	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ লিখিত "ভাষার গুরুত্ব" প্রবন্ধ ও উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।
১৫ই অগ্রহায়ণ	...	সাধারণ	...	শ্রীযুক্ত খান চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ লিখিত "কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা" প্রবন্ধ।
৩রা ফাল্গুন	...	বিশেষ	...	মহীসুরাধিপতির সম্বর্দ্ধনা।
১৬ই ফাল্গুন	...	সাধারণ	...	সভার নিয়মাবলী সংশোধন। ১৩২৬ সনের সম্ভাব্য আয় ব্যয় অবধারণ ও উক্ত সনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

৪। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি মহীসুরাধিপতি শ্রীশ্রীমৎ মহারাজ সার কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার বাহাদুর জি.সি.এস.আই., মহোদয় কোচবিহার নগরে শুভাগমন করায় ৩রা ফাল্গুন তারিখে সভার এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত ও নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ বিরচিত

বিবিধবিদ্যাবিলাস-রস-রসিকাশেষকীর্ত্তিকুশল-

ক্ষত্রকুলশিখামণি-মহীসুর-মহী-মহীন্দ্র-শ্রীশ্রীমৎসার্ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার্

মহারাজ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, মহানুভবস্য

অভ্যর্থনা-প্রশস্তিঃ।

এহ্যেহি রাজন্যগণাগ্রগণ্য,
এহ্যেহি বিদ্বৎপ্রণয়প্রবীণ।
এহ্যেহি ভূমণ্ডলসর্ব্বমান্য,
এহ্যেহি সাহিত্যকলাতিধন্য॥ ১॥

তবার্চ্চনাযোগ্যপদার্থহীনৈ-
র্হৃদাসনং কল্পিতমাসনায়।
গৃহাণ চিত্তার্ঘ্যমথাশ্রুপাদ্যং
হর্ষাৎস্রুতং ভক্তিসুগন্ধিপুষ্পম্॥ ২॥

বিদ্যা ধনং ধর্ম্ম ইহৈকলোকে
তিষ্ঠন্তি নৈবং হি চিরপ্রসিদ্ধিঃ।
ভবন্তমাসাদ্য গুণৈর্ব্বরিষ্ঠং
সার্থপ্রবাদোঽপি নিরর্থকোঽভূৎ॥ ৩॥

ত্বং শীলবান্ ভীষ্ম ইব প্রশস্তঃ,
ত্বং ধৈর্য্যবান্ শৈল ইবাপ্রধৃষ্যঃ।
ত্বং জ্ঞানবান্ জীবসমো যশস্বঃ,
ত্বং ধর্ম্মবান্ ধর্ম্মসুতেন তুল্যঃ॥ ৪ ॥

ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্যমহত্ত্ব-শৌর্য্য-
চারিত্র-সৌজন্যগুণৈর্বিশিষ্টৈঃ।
'দিক্‌পালমাত্রাঘটিতো নরেন্দ্রঃ'
শাস্ত্রীয়বাদং সফলীকরোষি॥ ৫ ॥

দেশেষু চ স্থাপয়িতা প্রজানাং
বিদ্যালয়ানাং মতিবর্দ্ধনার্থম্।
সাধূপকারেষু সদানুরক্তঃ,
দুষ্টানিগৃহ্লাসি তথৈব যুক্তঃ॥ ৬ ॥

বিদ্যাবীর্য্যপ্রথিতবিভবে কীর্ত্তিমন্ডর্গরিষ্ঠে
জাতঃ শ্রীমানখিলগুণভূঃ ক্ষত্রবংশাবতংসঃ।
প্রাজ্যং রাজ্যং সকলসুখদং সৈন্ধবৈস্ত্বং বিধৎসে
কুল্যাসেতুপ্রভৃতি-করণৈর্ধাতুবিদ্যাবিধিজ্ঞঃ॥ ৭ ॥

মধুর-মধুর-মূর্ত্তিঃ প্রীতিবিশ্রম্ভধামা,
করুণহৃদয়-দৃষ্টিঃ রূপলাবণ্যসীমা।
প্রকৃতিষু সুতবুদ্ধিঃ রাজ্যভৈবোকলঙ্কাঃ,
জয়তি জয়তি নিত্যং কৃষ্ণরাজো নৃপেন্দ্রঃ॥ ৮ ॥

খবেদবস্বিন্দুমিতে শকাব্দে সৌরিবাসরে।
শুভমে ফাল্গুনে সৌরে সদস্যৈর্বিনয়ান্বিতৈঃ॥ ৯ ॥
কোচ্‌বিহারসাহিত্যানুশীলনীসমিতেরিয়ম্।
মহীসুরমহীন্দ্রায় প্রশস্তির্দীয়তে মুদা॥ ১০ ॥

অভ্যর্থনা প্রশস্তির অনুবাদ।

১। হে রাজন্যকুলতিলক, হে পণ্ডিতমণ্ডলীপ্রীতিবর্দ্ধন, হে ভূমণ্ডলবাসিমানববৃন্দবরেণ্য, হে কাব্য নাটক ও সুকুমার কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ সার্ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার্ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সাহিত্যসভায় শুভাগমন করুন।

২। আপনার ন্যায় মহামহনীয় মহাজনের অভ্যর্থনার উপযুক্ত উপকরণহীন, কুচবিহার সাহিত্য-সভার দীন সদস্য (আমরা) আপনার পবিত্র উপবেশনের নিমিত্ত হৃদয়াসন পাতিয়া দিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের মানস অর্ঘ্য, হর্ষবিগলিত অশ্রুপাদ্য ও ভক্তিরূপ সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণ করুন।

৩। বিদ্যা, বিত্ত ও ধর্ম্ম এক ব্যক্তিতে অবস্থিতি করে না, ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত জনপ্রবাদ। কিন্তু ঐ তিন বস্তু অধুনা আপনার ন্যায় গুণগৌরবশালী অসাধারণ পাত্র লাভ করিয়া ঐ চির প্রচলিত প্রবাদকেও ব্যর্থ করিয়াছে।

৪। আপনি ভীষ্মের ন্যায় প্রশস্ত চরিত্র, অচলের ন্যায় অবিচলিত ধৈর্য্য শোভিত, বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানমণ্ডিত এবং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তুল্য ধার্ম্মিক।

৫। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ পার্থিব নরপতিকে দিকপাল মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি দয়া, দাক্ষিণ্য, ধীরত্ব, মহত্ব, বীরত্ব, সাধুচরিত্র, শিষ্টতা প্রভৃতি অনন্যসুলভ অতিমানবগুণাবলীতে বিরাজিত থাকিয়া এই শাস্ত্রীয় বাক্য বর্ণে বর্ণে সার্থক করিয়াছেন।

৬। আপনি প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান বিস্তার মানসে দেশমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনি যেমন সাধুদিগের হিত সাধনে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর, তেমনি অসাধুদিগের দমনে নিরন্তর তৎপর রহিয়াছেন।

৭। হে মহারাজরাজেশ্বর! আপনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বীরত্ব ও শৌর্য্যমণ্ডিত কীর্ত্তিভূষণ পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৌরবিত ক্ষত্রিয়বংশের শিরোভূষণরূপে নিখিল গুণের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ধাতুবিদ্যা, খনিজবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বিলাসভূমি। আপনার সুবিশাল রাজ্য শাসনসৌকর্য্যে ও কূল্যাখনন, সেতুবন্ধন, রথ্যা নির্ম্মাণ আদি পূর্ত্ত কার্য্যের সুশৃঙ্খলায় দিন দিন প্রকৃতি পুঞ্জের বিপুল সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছে।

৮। হে নৃপেন্দ্রচূড়ামণি মহীসুরেশ্বর কৃষ্ণরাজ! আপনি অতীব প্রিয়দর্শন, মানবমাত্রেই আপনার প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র, আপনার হৃদয় দয়ার্দ্রও দৃষ্টিকারুণ্য-বর্ষিণী; জগতে আপনার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অতুলনীয়। আপনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন, রাজ্যের হিতাকাঙ্খাই আপনার জীবনের মূলমন্ত্র। মঙ্গলময়ের কৃপায় সর্ব্বত্র আপনার বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

(৯—১০)। কোচবিহার সাহিত্য সভার সদস্যবৃন্দ অতি বিনীত ভাবে ১৮৪০ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের তৃতীয় দিবসে শনিবারে মহীসুরাধীশ্বরের করকমলে হৃষ্টচিত্তে এই অভ্যর্থনাপ্রশস্তি উপহার দিতেছেন।

কোচবিহার সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্স্ ভিক্টর্ নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মহোদয়ের অভিভাষণ।

YOUR HIGHNESSES AND GENTLEMEN,

I deem it an honour and a privilege to be able to say a few words today.

Before I proceed any further, let me, on behalf of the Executive Committee and members of the Cooch Behar Sahitya Sava, offer His Highness the Maharaja Bahadur of Mysore a hearty welcome. It is seldom indeed we get an opportunity of welcoming so great a personage in our midst. Your Highness, through the munificent patronage of our beloved Ruler, this Sava was started 4 years ago with the primary object of historical Research, and a lesser degree the Arts, Sciences and Literature. Although there are probably hundreds of volumes written on the history of other parts of India, little or next to nothing is known to the outside world of the ancient history of these parts. It is one of our duties therefore, to collect material, and place before the world a true and authentic history of Cooch Behar and neighbouring territories. Before I close, allow me to thank Your Highness for kindly sparing us a few minutes of your valuable time and affording us the opportunity of welcoming you in our midst.

অনুবাদ।

অদ্যকার সভায় কিছু বলিতে সক্ষম হওয়ায় আমি গৌরবান্বিত ও অনুগৃহীত হইয়াছি।

বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি কোচবিহার-সাহিত্য সভার ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের পক্ষ হইতে মহীসুরাধিপতিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এরূপ মহানুভব ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ আমরা কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের লোকপ্রিয় মহারাজের উদার অভিভাবকতায় চারি বৎসর পূর্ব্বে এই সভা স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং তৎসহ শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শত শত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও এতদঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বহির্জ্জগতে একরূপ অজ্ঞাতই রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ দ্বারা কোচবিহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের প্রকৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস জগদ্বাসীর সম্মুখে স্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমি আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যে হেতু তিনি বহুমূল্য সময়ের কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহীসুরাধিপতির উত্তর—

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলিনী সমিতিং প্রতি ইয়ম্ উক্তিঃ

অয়ি মহারাজ ভো ভোঃ পণ্ডিতবর্য্যাঃ সভাসদঃ

কুচবিহার-সাহিত্যানুশীলনীসমিতেঃ সন্দর্শনাৎ অভ্যর্থনাবাক্যাচ্চ আনন্দপরবশো ভবাম্যদ্য।

ভবদীয়প্রশস্তিবচনে ময়ি মহান্ প্রেমভাবঃ প্রকটীকৃতঃ তদর্থং তত্রভবতো ভবতো বন্দে।

অস্মদীয়রাজ্যে প্রজানাং হিতায় বিদ্যাভ্যাসায় চ যে যে প্রযত্নাঃ কৃতাঃ তে সর্ব্বেঽপি ভবদ্ভিঃ সম্যক্ বিদিতা এবেতি নিতরাং মোদেঽহম্। অনাদিকালাৎ সমুপাগতায়াঃ ধর্ম্মাদিনিখিলপুরুষার্থবোধিন্যাঃ গীর্ব্বাণবাণ্যাঃ পরিপোষণার্থং বিশেষতঃ প্রচারার্থং চ প্রবৃত্তায়াঃ অস্যাঃ সমিতেঃ প্রীতের্ম্ম পাত্রতা সমজনীতি অমন্দানন্দসুধাম্বুধৌ নিমজ্জামি।

জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরিতি বরনামাঙ্কিতস্য অস্য মহারাজস্য সমাবলম্বাৎ ইয়ং সমিতিঃ সংস্কৃত-বিদ্যাপ্রচারস্য প্রধানভূতা সতী ইতোঽপ্যধিকাং খ্যাতিমেষ্যতীতি অহং দৃঢ়তরং প্রত্যেমি। আর্য্যেভ্যঃ অস্মদীয়েভ্যঃ পুরাতনেভ্যঃ ক্রমাদনুপ্রাপ্তমিমং বিদ্যানিধিং অপ্রমত্ততয়া রক্ষিতুং দেশোন্নতিহেতোঃ প্রাচুর্য্যমাপাদয়িতুং চ ভবদীয়া সমিতিঃ ইয়ম্ অতীব সহকারিণীতি মন্যে।

অয়ং ভবতাং পরম-প্রেমাস্পদীভূতো মহারাজঃ ভবদীয়কুশলাভ্যুদয়ার্থং প্রতিক্ষণমুপচীয়মানোৎসাহঃ বর্ত্ততে ইতি জানে। কিং চাস্য মহারাজস্য অনুজবরঃ মহারাজকুমার বিক্টর নারায়ণাভিধঃ যস্মাদধ্যক্ষতাপদমলংকরোতি আয়ুষ্মান্ তস্মাদিয়ং সমিতিঃ অতিশয়েন বৃদ্ধিমেষ্যতীতি দৃঢ়তরং প্রত্যেমি।

শিবং ভবতু।

শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্গানুবাদ—

শ্রী

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতির প্রতি এই উক্তি—

মহারাজ ও সুপণ্ডিত সভাসদ্‌গণ! আজ কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতি সন্দর্শনে ও অভ্যর্থনা-বাক্যে আনন্দিত হইয়াছি।

আপনাদের প্রশস্তি বচনে আমার প্রতি বিশেষ প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য আপনাদের অভিনন্দন করি।

আমার রাজ্যে প্রজাদের হিতের জন্য ও বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত যে সকল প্রযত্ন করা হইয়াছে তাহা সকলই আপনাদের সুবিদিত জানিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনাদিকাল হইতে আগত ধর্ম্মাদি সমস্ত পুরুষার্থ বোধিনী সংস্কৃত বিদ্যার পরিপোষণ ও বিশেষতঃ প্রচারের জন্য প্রবৃত্ত এই সমিতির প্রীতির পাত্র হইয়াছি বলিয়া আমি প্রগাঢ় আনন্দসুধাসাগরে নিমগ্ন হইতেছি। জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নামাঙ্কিত এই মহারাজের অভিভাবকতায় এই সমিতি সংস্কৃত বিদ্যা প্রচার বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইয়া ইহার অপেক্ষাও অধিক খ্যাতিলাভ করিবে ইহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমাদের পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে ক্রমানুসারে প্রাপ্ত এই বিদ্যানিধি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে এবং দেশের উন্নতির জন্য বহুল প্রচার করিতে আপনাদের এই সমিতি অত্যন্ত সহায় হইবে ইহা আমি মনে করি। আপনাদের পরম প্রেমাস্পদ এই মহারাজ আপনাদের কুশলের জন্য প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত বিদ্যমান তাহা আমি জানি। বিশেষতঃ মহারাজের অনুজবর মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ যখন ইহার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন তখন এই সমিতি যে অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করিবে তাহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

মঙ্গল হউক—শ্রীকৃষ্ণ।

মহীসুরাধিপতি সভার হিতার্থে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রদান করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হয়।

বিদ্যাবিজ্ঞানবিশারদ শ্রীমন্ মহীসুর মহীপতেঃ কৃতজ্ঞতাপ্রশস্তিঃ

১। জয়তু জয়তু রাজন্ রাজ-রাজন্য বন্ধো
নয়-বিনয়-চরিত্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-সিন্ধো।
জনহিত-রত-চিত্ত-শ্লাঘ্যশীলৈকনিষ্ঠ
মুকুর-বিমল-বুদ্ধে দেশমাতুর্ব্বরেণ্য॥

২। প্রকৃতি-বিভব-পূর্ত্ত্যৈ রাজ্যভূত্যৈ চ সম্যক্
পরিহৃতসুখভোগো রাজ-কার্য্যৈক-চিত্তঃ।
অগণিত-তনু-পাতং মন্ত্রসিদ্ধৌ নিযুক্তঃ
জগতি বিপুল-কীর্ত্তি-খ্যাতি-শান্তী-র্লভস্ব ॥

৩। বিহারসাহিত্যসভাং নিরীক্ষ্য
ত্বয়াপিতা হৃষ্টহৃদা সহস্রম্।
মুদ্রা বয়ম্ মুগ্ধ-হৃদঃ সদস্যাঃ
গৃহ্ণীমহে সৌম্য! সসাধুবাদম্ ॥

৪। পূতাত্মা বিবুধাশ্রয়ো গুণবতাম্ শ্রেষ্ঠঃ শরণ্যঃসতাম্
সৎসঙ্গী শ্রুত-শৌচ-নির্ম্মলমনা বিদ্যাব্ধিপারং-গমঃ।
শাস্ত্রালাপসুখী কলাসু কুশলো বিদ্যার্থি-কল্পদ্রুমঃ
সদ্বোৎসাহ-বলোর্জ্জিতোবিজয়তাং শ্রীকৃষ্ণরাজোনৃপঃ ॥

৫। দ্যুমণৌকলসং প্রাপ্তে শনৌ নেত্রমিতে দিনে।
নভোযুগাহি-শুভ্রাংশুমিতে শাকে সমর্পিতা ॥

হে রাজ-রাজেশ্বর-মিত্র, হে বিনয়, চরিত্র, রাজনীতি, প্রজ্ঞা ও বিবেকের আধার, হে জন-কল্যাণ-নিদান, হে নিষ্কলঙ্ক-কুলশীলসম্পন্ন, হে দর্পণ তুল্য স্বচ্ছবুদ্ধি স্বদেশ-মাতৃকার বরেণ্য সন্তান! সর্ব্বত্র আপনার জয়ধ্বনি বিঘোষিত হউক। ১।

আপনি আশ্রিত জনমণ্ডলীর বৈভব বৃদ্ধিও রাজসমৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" মূলমন্ত্র করিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সতত স্বলক্ষ্য সাধনে জাগরূক আছেন। বিধাতার করুণায় আপনি ধরাতলে অসীম যশ কীর্ত্তি ও সুখশান্তি ভোগ করুন। ২।

আপনি অদ্য কোচবিহার সাহিত্য সভা ভবনে শুভাগমন করিয়া ইহার কার্য্য কলাপ দর্শনে প্রীত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চার উন্নতিকল্পে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আপনার এতাদৃশ অসম্ভাবিত বদান্যতা দর্শনে মুগ্ধ হৃদয় সভার সদস্যগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অজস্র ধন্য বাদের সহিত এইসাত্ত্বিক দান গ্রহণ করিতেছেন। ৩।

হে ছাত্রসমাজকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণরাজ নৃপেন্দ্র? আপনার মন অতি উদার ও অতি পবিত্র। আপনি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাদিগের ও শাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্বারা সুধীসমাজের আশ্রয়স্থল। গুণিগণগণনায় অগ্রগণ্য, সদাশয়দিগের পালক, সৎসঙ্গে নিরত, পবিত্রতা ও জ্ঞানাগ্নিতে আপনার মনোমালিন্য নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনি অপার বিদ্যাপারাবারের অদ্বিতীয় পারদর্শী। আপনি উদ্দীপ্ত উৎসাহ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও মনস্বিতা প্রভৃতিগুণ রাশিতে সতত দেদীপ্যমান। ৪।

দ্যুমণি (সূর্য্য) কুম্ভরাশিস্থ হইলে (ফাল্গুন মাসে) শনিবারে ৩রা তারিখে ১৮৪০ শকাব্দে এই কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হইল। ৫।

সভার পক্ষ হইতে প্রদর্শিত নিম্ন লিখিত ঐতিহাসিক বস্তু মহীসুরাধিপতি সন্দর্শন করেন ;—

ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর বিরচিত কয়েক খণ্ড প্রাচীন পুথি, প্রাচীন পুথির চিত্রিত পাটা, সাচীপাতে লিখিত প্রাচীন পুথি, কাপড়ে লিখিত ১৭শ শতাব্দীর মূল সনদ, আকবরসাহের নামাঙ্কিত তরবার, নৌযুদ্ধের পুরাতন কামান, নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা, মোগল ও পাঠান বাদসাহগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা গুপ্ত ও কুষাণরাজগণের স্বর্ণমুদ্রা।

মহীসুরাধিপতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভায় এক সহস্রমুদ্রা সাহায্য প্রদান করিয়া সভার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। আলোচ্যবর্ষে ঢাকা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

৬। ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদিত ও বিরচিত যে ১২ খানা পুথি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্গীত ও ক্রিয়াযোগসার পুথি দীর্ঘকাল হইল সভা মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নানা প্রতিবন্ধক হেতু তাহা এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। আগামীবর্ষে উক্ত দুই খণ্ড পুথি সদস্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বিরচিত সঙ্গীত পুথি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী আই দেবতী বিরচিত "বেহারোদন্ত" নামক পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

৭। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিজের অধিকারে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা গুলির পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ হইতে অনেক সময়ের আবশ্যক হইবে।

৮। আলোচ্যবর্ষে সভা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়াছেন ;—

১। হিতোপদেশ
২। পঞ্চতন্ত্র
৩। প্রাচীন লেখমালা (২য় ভাগ)
৪। প্রাচীন লেখমালা (৩য় ভাগ)
৫। কাশীনাথ
৬। বিরাজ বৌ
৭। শ্রীকান্ত
৮। বিন্দুরছেলে
৯। মেজদিদি
১০। পরিণীতা
১১। বৈকুণ্ঠের উইল
১২। বড়দিদি
১৩। দেবদাস
১৪। পণ্ডিত মহাশয়
১৫। অরক্ষণীয়া
১৬। পল্লীসমাজ
১৭। চরিত্রহীন
১৮। নিষ্কৃতি
১৯। চন্দ্রনাথ
২০। মহাভারত
২১। যমুনাপুলিনের ভিখা-
২২। মোতি কুমারি
২৩। বাসিফুল
২৪। কর্ম্মযোগের টীকা
২৫। অন্নপূর্ণার মন্দির
২৬। মহানিশা
২৭। বাগ্‌দত্তা
২৮। উল্কা
২৯। অভাগী
৩০। ধর্ম্মপাল
৩১। কাঞ্চন মালা
৩২। দুর্ব্বাদল
৩৩। বড়বাড়ী
৩৪। ময়ূখ
৩৫। সত্য ও মিথ্যা
৩৬। সোণারপদ্ম
৩৭। লাইকা
৩৮। আলেয়া
৩৯। বেগমসমরু
৪০। বিল্বদল
৪১ হালদার বাড়ী
৪২। মধুপর্ক
৪৩। লীলার স্বপ্ন
৪৪। সুখেরঘর
৪৫। মধুমল্লী
৪৬। রাসের ডায়ারী
৪৭। ফুলেরতোড়া
৪৮। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস
৪৯। বাঙ্গালার বেগম
৫০। পাগালা ঝোরা
৫১। গৌড় রাজমালা
৫২। প্রাচীন মুদ্রা
৫৩। বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ)
৫৪। বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ)
৫৫। দ্বিজেন্দ্রলাল
৫৬। রবিয়ানা
৫৭। নেপালে বঙ্গনারী
৫৮। বর্ত্তমান জগৎ (১ম ভাগ)
৫৯। বর্ত্তমান জগৎ (২য় ভাগ)
৬০। বর্ত্তমান জগৎ (৩য় ভাগ)
৬১। পুরাতন প্রসঙ্গ
৬২। হরষে বিষাদ
৬৩। গৌড় লেখমালা
৬৪। দিদি
৬৫। ছোট ছোট গল্প
৬৬। পালি প্রকাশ
৬৭। রূপের বালাই
৬৮। পদ্মপুরাণম্, (ব্রহ্ম খণ্ডম)
৬৯। পদ্মপুরাণম, (ভূমি খণ্ডম)
৭০। পদ্মপুরাণম, (পাতাল খণ্ডম)
৭১। পদ্মপুরাণম্, (স্বর্গখণ্ডম)
৭২। পদ্মপুরাণম্, (উত্তর খণ্ডম্)
৭৩। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণম্, (বঙ্গানুবাদ)
৭৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্ (মূল)
৭৫। মৎস্য পুরাণম্
৭৬। গরুড় পুরাণম্
৭৭। লিঙ্গ পুরাণম্
৭৮। খিল হরিবংশ
৭৯। খিল হরিবংশ (মহাভারতের পরিশিষ্ট)
৮০। বায়ুপুরাণম্
৮১। শিবপুরাণম্
৮২। কালিকা পুরাণম্
৮৩। রামায়ণম্

৮৪। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)
৮৫। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)
৮৬। অদ্ভুত রামায়ণম্
৮৭। অধ্যাত্ম রামায়ণম্
৮৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্
৮৯। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (বঙ্গানুবাদ)
৯০। দেবী ভাগবতম্ (মূল)
৯১। দেবী ভাগবতম্ (বঙ্গানুবাদ)
৯২। শ্রীমহাভাগবতম্
৯৩। মহাভারতম্ ১ম ও ২য় খণ্ড
৯৪। বামন পুরাণম্
৯৫। অগ্নিপুরাণম্
৯৬। বরাহ পুরাণম্
৯৭। বিষ্ণুপুরাণম্
৯৮। কূর্ম্মপুরাণম্
৯৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণম্
১০০। কল্কি পুরাণম্
১০১। সৌরপুরাণম্
১০২। দেবী পুরাণম্
১০৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণম্
১০৪। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্
১০৫। ব্রহ্মপুরাণম্
১০৬। স্কন্দপুরাণম্ (মাহেশ্বর খণ্ডম্)
১০৭। স্কন্দপুরাণম্ (বিষ্ণু খণ্ডম্)
১০৮। স্কন্দপুরাণম্ (ব্রহ্মখণ্ডম)
১০৯। স্কন্দপুরাণম্ (আবন্ত্য খণ্ডম্)
১১০। স্কন্দপুরাণম্ (নাগর খণ্ডম্)
১১১। স্কন্দপুরাণম্ (প্রভাস খণ্ডম্)
১১২। স্কন্দপুরাণম্ (কাশী খণ্ডম্)
১১৩। Letters of Aurungzebe
১১৪। যৌতুক
১১৫। অভিমানিনী
১১৬। তিথিতত্ত্বম্
১১৭। মলমাসতত্ত্বম্
১১৮। শ্রাদ্ধতত্ত্বম্
১১৯। উদ্বাহতত্ত্বম্
১২০। আহ্নিকতত্ত্বম্
১২১। শুদ্ধিতত্ত্বম্
১২২। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্
১২৩। মনুসংহিতা
১২৪। ঊনবিংশতি সংহিতা
১২৫। কবিকঙ্কণচণ্ডী
১২৬। জগৎমঙ্গল
১২৭। ৺ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী
১২৮। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা
১২৯। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী
১৩০। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
১৩১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী
১৩২ বৃহৎসংহিতা
১৩৩। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্
১৩৪। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১৩৫। মনসামঙ্গল
১৩৬। জগন্নাথ মঙ্গল
১৩৭। ৺দাশরথিরায়ের পাঁচালী
১৩৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১৪০। ব্রজরায়ের পাঁচালী
১৪১। বাঙ্গালী চরিত
১৪২। গোবিন্দমঙ্গল
১৪৩। বঙ্গভাষার লেখক
১৪৪। প্রবোধচন্দ্রিকা
১৪৫। পুরুষ পরীক্ষা
১৪৬। শিবায়ণ
১৪৭। কৌতুক বিলাস
১৪৮। রাজাবলী
১৪৯। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব
১৫০। শ্রীভক্তমালগ্রন্থ
১৫১। বৈষ্ণব পদলহরী
১৫২। শ্রীরাম রসায়ণ
১৫৩। বঙ্কিম জীবনী
১৫৪। ফেরদৌসীচরিত
১৫৫। মহর্ষি মনসুর
১৫৬। পাষাণেরকথা
১৫৭। শংকুনির্ম্মাণ
১৫৮। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ
১৫৯। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী ৬খণ্ড
১৬০। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত
১৬১। পরগাছা
১৬২। উর্বসী
১৬৩। এক পেয়ালা চা
১৬৪। বৈজ্ঞানিকী
১৬৫। সচিত্র কামাখ্যাতন্ত্র
১৬৬। বারভূঞা

১৬৭। স্রোতেরফুল

১৬৮। পাঠান রাজবৃত্ত

১৬৯। নববর্ষের স্বপ্ন

১৭০। শ্রীকান্ত (য় ভাগ)

১৭১। বিদ্যাপতির পদাবলী

১৭২। বজ্রমণি

১৭৩। বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য

১৭৪। ভিক্ষুপাতিমোক্ষ

১৭৫। স্বামী

১৭৬। অশোক-অনুশাসন

১৭৭। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন

১৭৮। সরল পূর্ত্ত শিক্ষা ১ম ... খণ্ড

১৭৯। ভাষাতত্ব (ম ও ২য় খণ্ড)

১৮০। দুইতার

১৮১। অনুপমা

১৮২। স্পর্শমণি

১৮৩। তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত

১৮৪। ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড)

১৮৫। তামাকের চাষ

১৮৬। গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

১৮৭। অভিধানপ্রদীপিকা

১৮৮। কবীর (১ম ২য় ৩য় ৪র্থ খণ্ড)

১৮৯। হাফেজ

১৯০। মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবন চরিত

১৯১। হদিস পূর্ব্ব বিভাগ

১৯২। হদিস উত্তর বিভাগ ৪খণ্ড

১৯৩। চারিজন ধর্ম্মনেতা

১৯৪। এমাম হসন ও হোসয়ন

১৯৫। মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম্ম

১৯৬। তত্ত্ব সন্দর্ভ মালা

১৯৭। মান চেতন

১৯৮। ময়নামতীর গান

১৯৯। সতী মোহিনী

২০০। মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস

২০১। নবাব সেনের গ্রন্থাবলী

২০২। দত্তা

২০৩। প্রদীপ ও চরাগ

২০৪। ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি

২০৫। ধম্মপদ

৯। নিম্নলিখিত দাতৃগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বের লিখিত গ্রন্থ ও মুদ্রা উপহার প্রদান করায় সভা তাহা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

	উপহৃত বস্তু	পরিচয়	দাতারনাম
১।	সরল বাঙ্গালা অভিধান	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারাণী সুনীতি দেবী সি.আই.
২।	The message of Universal Peace	ইংরাজী, মুদ্রিত,	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক
৩।	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	
৪।	সতী জগন্মোহিনী দেবী	”	
৫।	বিজয় বসন্ত	”	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৬।	কৃষ্ণকালী লীলা	”	
৭।	বাউল সঙ্গীত	”	
৮।	দরঙ্গরাজ বংশাবলী	”	” হেমচন্দ্র গোস্বামী
৯।	বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১১শ (ঢাকা) অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ	”	” নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ
১০।	ঐ ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	..	”

	উপহৃত বস্তু	পরিচয়	দাতার নাম
১১।	উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ ১ম, ২য় খণ্ড	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	শ্রীযুক্ত কুশলচন্দ্র অধিকারী
১২।	শ্রীশ্রীরাসগীতা		”
১৩।	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ		”
১৪।	লরা সখি	আসামী, মুদ্রিত	
১৫।	নমাজ শিক্ষা	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	
১৬।	কালকাবিলাস পুথি	হস্তলিখিত, বাঙ্গালা	
১৭।	মুকুল	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস
১৮।	উচ্ছ্বাস		” [illegible]নাথ সিংহ
১৯।	মনীষাপঞ্চক		” যোগেন্দ্রনাথ রায়
২০।	রীম্মা		” [illegible] মহিমচন্দ্র ঠাকুর
২১।	[illegible]কগাথা		
২২।	প্রী[illegible]		
২৩।	কণিকা		
২৪।	Jhon	[illegible]ত	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ
২৫।	An Address to my young Friends		
২৬।	All India Theistic conference		
২৭।	শুভ জন্মোৎসব	[illegible], মুদ্রিত	” অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ
২৮।	Memoirs of Babar	ইংরেজী, মুদ্রিত	” মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ
২৯।	History of Nepal		”
৩০।	বিদ্যাপতি	বাঙ্গালা, মুদ্রিত	” সতীশচন্দ্র দাস
৩১।	৩টী রৌপ্য মুদ্রা	১। চতুষ্কোণ, আকবর সাহের নামাঙ্কিত ২। গোলাকার, আমীর আবদর রহমানের নামাঙ্কিত ৩। অপঠিত	
৩২।	২টী রৌপ্য মুদ্রা	১। চতুষ্কোণ, আকবর সাহের নামাঙ্কিত ২। গোলাকার, সাহআলম বাদসাহের নামাঙ্কিত, ফরকাবাদ টাঁকশাল	প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৩।	১টী রৌপ্য আধুলি	কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের নামাঙ্কিত,	শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দ্র দেব রায়কত

১০। আলোচ্যবর্ষে সভা ৬টী মুদ্রা ও ২৪৭ খানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগৃহীত গ্রন্থ মধ্যে সমস্তই মুদ্রিত ১ খানা হস্তলিখিত। পূর্ব্ববৎসরে সভার গ্রন্থাগারে ২৪২ খানা গ্রন্থ ছিল। আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে সভার গ্রন্থসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৯ ও মুদ্রার সংখ্যা ৭টী

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি বাঁধাই হইয়া উপরোক্ত গ্রন্থসংখ্যা ভুক্ত হইয়াছে ;—

১।	ভারতবর্ষ ২ খণ্ড ৫ম বর্ষ	৮।	বামাবোধিনী ১১শ কল্প ২ ভাগ
২।	মালঞ্চ ৪র্থ বর্ষ	৯।	সাহিত্য ২৭শ বর্ষ
৩।	সবুজপত্র ৪র্থ বর্ষ	১০।	আলএসলাম ৩য় ভাগ
৪।	ব্রহ্মবিদ্যা ৬ষ্ঠ বর্ষ	১১।	প্রবাসী ২ খণ্ড ১৭শ ভাগ
৫।	ভারতী ৪১শ বর্ষ	১২।	প্রতিভা ৭ম বর্ষ
৬।	কৃষিসম্পদ ৮ম বর্ষ	১৩।	সৌরভ ৫ম বর্ষ
৭।	নব্যভারত ৩৫শ খণ্ড		

১১। সভাপতি মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী নিরুপমা দেবী মহোদয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্পাদিত "পরিচারিকা" পত্রিকার প্রকাশ ভার সভার প্রতি ন্যস্ত রাখায় সভা বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছেন। উক্ত পত্রিকা তাহার উচ্চ আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পরিশিষ্টস্বরূপ পরিচারিকায় মুদ্রিত হইয়া থাকে।

১২। সভার পাঠাগারের দ্বার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সদস্যগণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখা হয়। আলোচ্যবর্ষে "সদস্যগণ ২৲ টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক গৃহে লইয়া যাইতে পারিবেন।" এইরূপ নিয়ম প্রণীত হওয়ায় ২৫ জন সদস্য ৫০৲ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ জন স্বীয় জমা টাকা তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরোক্ত নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ৫০৯ খানা পুস্তক সদস্যগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্ষশেষে ৭ খানা পুস্তক প্রত্যর্পিত হয় নাই।

১।	গল্প ও উপন্যাস	৪০৬	৫।	মাসিক পত্রিকা	৩৪
২।	ধর্ম্মপুস্তক	৬	৬।	সাহিত্য	১২
৩।	জীবন-চরিত	১৯	৭।	ইতিহাস	২৬
৪।	ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	৪	৮।	কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞান	২

১৩। আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সভা ক্রয় করিয়াছেন ;—

মাসিক

ভারতী, সবুজপত্র, সাহিত্য ও ভারতবর্ষ।

সাপ্তাহিক

হিতবাদী, সঞ্জীবনী, মোহাম্মদী ও বসুমতী।

পরিচারিকা সম্পাদিকা মহোদয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজের সম্পাদিত "পরিচারিকা" ও নিম্ন লিখিত বিনিময় পত্রিকাগুলি সভার পাঠাগারে বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন, এজন্য সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

মাসিক

প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নব্যভারত, মালঞ্চ, সৌরভ, প্রবর্ত্তক, আলএসলাম, বামাবোধিনী, নারায়ণ, আয়ুর্ব্বেদ, সাহিত্য-সংবাদ, প্রতিভা, কৃষিসম্পদ, ঢাকারিভিউ, ব্রহ্ম ও বিদ্যা ও উদ্বোধন।

ত্রৈমাসিক

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

সাপ্তাহিক

রঙ্গপুর দর্পণ

১৪। সভার অভিভাবক মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি সুদূর ইয়োরোপে বাস করিতেছেন এজন্য তৃতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি সভার হিতার্থে আলোচ্যবর্ষে ৫০০৲ শত টাকা এককালীন দানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং মাসিক ২৫৲ টাকা হারে সাহায্যদান করিতেছেন। তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ও আনুকূল্যে সভা ক্রমশঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছেন।

১৫। আলোচ্য বর্ষের মে মাস হইতে মাননীয়া শ্রীশ্রীমতী মাতা মহারাণী সুনীতি দেবী সি. আই মহোদয়া কৃপাপরবশ হইয়া সভার হিতার্থে মাসিক ১০৲ টাকা হারে সাহায্য দান করিতেছেন এবং তিনি সভার দুইটী বিশেষ অধিবেশনে সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়া সদস্যগণকে উপকৃত করিয়াছেন।

১৬। সভার দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর সভার গৃহাভাব মোচনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৭। আলোচ্যবর্ষে ২০৲ টাকা বেতনে একজন অস্থায়ী কর্ম্মচারী সভার লেখক নিযুক্ত ছিলেন। ৮৲ টাকা বেতনের একজন ভৃত্য সভার অন্যান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে।

১৮। ১৩২৫ সনে সভার কার্য্যালয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৮১ খানা পত্র প্রেরিত ও ৯৮ খানা পত্র কার্য্যালয়ে আগত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১১০ খানা পত্র প্রেরিত ও ১১৯ খানা আগত হইয়াছিল।

১৯। আলোচ্য বর্ষের নিমিত্ত সভার সম্ভাব্য আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রস্তুত হইয়া পরে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব বৎসরের সম্ভাব্য আয়ব্যয়ের হিসাব সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

আয়—

প্রকার	১৩২৪	১৩২৫
১। পূর্ব্ব বৎসরের আদায় যোগ্য বাকী ...	২০০।৶০	৫০৲
২। সদস্যগণের দেয় চাঁদা	৫২৫৲	৬৯১।।০
৩। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সাহায্য ...	৩০০৲	৩০০৲
৪। পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	১০৩৶৬	...
৫। ব্যাঙ্কে জমা টাকার সুদ	...	৫৫৲
৬। ব্যাঙ্ক হইতে উদ্ধৃত	...	১৮৭৲
	১১২৮৸/৬	১২৬৩।।০

ব্যয়—

		১৩২৪	১৩২৫
১।	বেতন … … …	২৩৬৲	৩৪২।/৯
২।	বাজে খরচ … … …	৫০৲	৭০৲
৩।	আলো … … …	২০৲	২০৲
৪।	পত্রিকা ক্রয় … … …	২০৲	৪৪॥০
৫।	গ্রন্থ ও মুদ্রা ক্রয় … … …	১০০৲	৩০০৲
৬।	পুস্তক বাঁধাই … … …	৩০৲	৩০৲
৭।	ফটোগ্রাফ … … …	৩৬৲	১৫৲
৮।	আলমারী … … …	৩০৲	৮১৲
৯।	গ্রন্থ প্রকাশ … … …	৫০০৲	৩৬০॥০
১০।	খাতাপত্র … … …	৫৲	…
১১।	অনাদায় ও অনপেক্ষিত … …	১০১৸৶৬	…
		১১২৮৸৶৬	১২৬৩।/৯

২০। ১৩২৫ সনে সভার প্রকৃতপক্ষে যে আয় ও ব্যয় হইয়াছে তাহা ১৩২৪ সনের প্রকৃত আয়ব্যয় সহ নিম্নে লিখিত হইল ;—

আয়—

	প্রকার	১৩২৪	১৩২৫
১।	পূর্ব্ববৎসরের তহবীল	১০৩।৶৬	৫৬
২।	সদস্যগণের নিকট প্রাপ্ত চাঁদা	৬৮০।৶০	৩৬৯॥০
৩।	শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সাহায্য	২০০৲	৩০০৲
৪।	শ্রীশ্রীমতী মাতা মহারাণী আই দেবতার সাহায্য	…	৭০৲
৫।	গচ্ছিত	…	৪৬৲
৬।	ব্যাঙ্কে জমা টাকার সুদ	…	৩০৶৬
৭।	ব্যাঙ্ক হইতে উদ্ধৃত	২৬/০	৪২৮৶০
৮।	অন্যান্য	১৶০	৩৲
		১০৭১৸৶৬	১২৫১৸/০

ব্যয়—		১৩২৪		১৩২৫
১।	বেতন	২০৮৷৶৹		৩২৮৷/৯
২।	বাজেখরচ	৫২৷/৩	টিকিট ও পোষ্টকার্ড—২১৷৩ কালী, কলম, পেন্সিল ও কাগজ—১৪৷৶৬ অন্যান্য— ২৪৷৵৹	৬৮৷/৯
৩।	আলো	২২৷৵৩		২৩৶৯
৪।	পত্রিকাক্রয়	২৭৶৶৹		৩৯৵৹
৫।	গ্রন্থ ও মুদ্রাক্রয়	১১০৶৹		২৬০৸/৹
৬।	গ্রন্থপ্রকাশ	৩৪৫৷৵৩		২৪১৲
৭।	পুস্তক বাঁধাই	২৮৷৹		২৮৶৵৹
৮।	অন্যান্য-আলমারী	২৮৲		৭০৲
৯।	মহীসুরাধিপতির সম্বর্দ্ধনা			১,৭৯৷৹
১০।	ফটোগ্রাফ	৩২৲		......
১১।	খাতাপত্র	১৷০		......
১২।	শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা বাবদ হাওলাত—	২০৯৸/৹		......
১৩।	হাতে মজুত	৭৫৬		১১৷৶৯
		১০৭১৶৯		১২৫১৸৹

এই হিসাব বিশুদ্ধ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইল।

শ্রীমনোরথধন দে,
হিসাব পরীক্ষক।
তারিখ ৯ই বৈশাখ, ১৩২৬ সন।

২১। ১৩২৪ সনের কার্য্যবিবরণীতে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভ্যর্থনার ব্যয় ২০৯৸/৹ অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে হাওলাত লিখা হইয়াছিল। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি উক্ত হাওলাত ২০৯৸/৹ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা অবধারণ করিয়াছেন।

২২। ১৩২৪ সনের কার্য্যবিবরণীতে বাকী চাঁদার পরিমাণ ৩৩১৵৹ আনা। তন্মধ্যে ২৯৶৹ আনা আদায় হইয়াছে। ১৩২৫ সনে ২৩৮ জন সদস্যের নিকট প্রাপ্য চাঁদা ৩৮৫৵৹ আনা। পূর্ব্ববৎসরের ৩৩১৵৹ সহ মোট প্রাপ্য ৭১৬৷৹ আনা আলোচ্যবর্ষে চাঁদা আদায় ৩৬৯৷৹ আনা। বাকী ৩৪৬৶৹ আনা। আদায়ী চাঁদা মধ্যে শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমারদ্বয়ের প্রদত্ত ১৪০৲ টাকা। অন্যান্য সদস্যের দেয় ৪৭৬৷৹ মধ্যে ২২৯৷৹ আনা আদায় হইয়াছে।

২৩। সভার নিয়মানুসারে চাঁদা অনাদায় হেতু ২৫ জন সদস্যের নাম সদস্য তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৩২৫ সনের শেষ পর্য্যন্ত ইঁহাদের নিকট সভার প্রাপ্য ৯০৲৹ আনা, ইহা উপরোক্ত বাকী ৩৪৬৶৹ মধ্যে বাদ দিয়া অবশিষ্ট ২৫৬৲ আগামী বৎসরে আদায়ের চেষ্টা করা হইবে।

২৪। আলোচ্যবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মাতা মহারাণীর স্বীকৃত ১১০৲ টাকা মধ্যে ৭০৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

২৫। বর্ষশেষে কোচবিহার ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের চলতি জমার হিসাবে ১০৬৫৶৬ পাই ও ছয় মাস চুক্তির হিসাবে ৫০০৲ টাকা মোট ১৫৬৫৶৬ পাই সভার তহবীল গচ্ছিত রহিয়াছে।

শ্রীআমানতউল্যা আহমদ
সম্পাদক।

শ্রীভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ,
সভাপতি।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩২৬ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

নূতন দেশের নবীন প্রভাত।*

(ক)

দৃষ্টিসীমার চতুর্দ্দিকে রাত্রি শেষের ঘোর কুয়াসায়
পথহারাগো পথিক একা দাঁড়িয়ে গেছি ধোঁয়ার তলে ;
থমকে আছে ভোরের আলো আকাশ-পারের কোন্ অসীমায়,
বিশ্বভুবন গুটিয়ে যেন বিষ্ণু-নাভি-পদ্মদলে !

*   *   *   *

কোন্ কামনার কনক-আভা চমকে গেল সুপ্তি টুটে,
উষার পুরী-প্রবেশ-ভেরী উঠ্‌লো বেজে কাকের ডাকে ;
দীর্ণ করি' ব্যোমকে যেন 'ব্রহ্মপুত্র' উঠ্‌লো ফুটে
সকল-জোড়া বাষ্পরেণুর জমাট-বাঁধা ধূমের ফাঁকে !

*   *   *   *

*স্থান—ধুবড়ী ; কাল—হেমন্ত ও শীতের সন্ধিক্ষণ।

জনম লভি' জলের কোলে বাতাস অধীর ; আকাশ ফুঁড়ি'
পরক্ষণেই দীপ্ত অনল পূরব কোণে কিরণ-মেঘে ;
রশ্মিতে তার মিলিয়ে এল আবছা-ঘন জলের গুঁড়ি,
অবাক-করা সৃষ্টি হঠাৎ আঁখির আগে উঠ্‌লো জেগে।

সত্য না এ স্বপনপুরী,—লতায় পাতায় শিশির-ঝরা
'আইভি'-ঢাকা হাজার কাঁচে সোনার ঝলক উথ্‌লে পড়া।

(খ)

রূপায় মোড়া নদীর চড়ায়, বুনো ঝাউয়ের ধুসর বেলায়,
শিশু-গাছের কুচো পাতার আড়াল-জোড়া নীল-কুচিতে ;
আলোক-ছায়ার উর্ম্মি-খেলায়, দিবস-নিশার মিলন-মেলায়,
এমন করে ছড়িয়ে কে গো গড়িয়ে এলে হৃদয়টীতে ?

বালির চরে চূর্ণ হীরক, উর্ম্মিশিরে জ্বল্‌ছে মানিক,
পথের বাঁকে শালের ফাঁকে এমন সাজে কে আজ এ'লে ?
দাঁড়াও ওগো সকল ভুলে মউল-মূলে দাঁড়িয়ে খানিক
চোখ বুলিয়ে মন ভরে নিই তুলির বালাই গুঁড়িয়ে ফেলে

কুজ্ঝটিকার অণুর কণায় ঢুলিয়ে দিলে এই যে পুরী
কোন্ দিকে এর তাকাই বল, কোন্ সখাকে দেখাই ডাকি।
সজ্জিত এই চিত্রশালার যে-পথ দিয়ে যতই ঘুরি,
হতাশ হয়ে যাই যে ততই, কোন্‌টা রাখি, কোন্‌টা আঁকি।

নূতন দেশে, নবীন বেশে, দাঁড়িয়েছো আজ মধুর হেসে,
বিভোর হয়ে দেখ্‌ছি চেয়ে নির্নিমেষে, নির্নিমেষে !

(গ)

হেথা,　বাংলো-সারির মুক্তামালা পল্লীপ্রিয়ার বক্ষদেশে
দুলিয়ে দিয়ে নগর-বঁধু উল্লাসে তার হাত ধরেছে ;
আধেক সোহাগ আধেক লাজে পল্লীরাণী মধুর হেসে
হাওয়ায় দোলা কানন-মালা হৃদয়-রাজের গলায় দেছে !

*　　*　　*　　*

হেথা,　শষ্পসবুজ 'আইল'-পেড়ে গাঢ়হলুদ বসন কাহার—
মুক্ত মাঠের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সর্ষে ফুলে ;
ক্রোটল-মূলে ঢেউ খেলানো বিচিত্র-রং গাদার বাহার,
মে'দির বেড়ায় বেলের কুঁড়ি মুহুর্মুহু হাওয়ায় দোলে !

*　　*　　*　　*

ওগো,　'কৃষ্ণচূড়া' পরায় হেথায় নিম্বশাখায় মিলন-রাখি,
জল্-পাহাড়ের পাষাণ-বুকে আছ্‌ড়ে পড়ে স্রোতের ধারা ;
কানন-কোলে কূজন তোলে লক্ষ-তরুর কণ্ঠ-পাখী,
তাল-সুপারীর কুঞ্জছায়ে নিটোল-গঠন কলার চারা !

*　　*　　*　　*

হেথা,　রৌদ্র-পারদ-লিপ্ত পথের মুকুর 'পরে গুবাক-ছায়া
আর,　মধ্যে কবি জড়িয়ে ধরি' ছড়িয়ে-থাকা আপন মায়া !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

অন্তরীক্ষে দেবাসুরে যুদ্ধ।*

যাঁহারা 'অসুর' অর্থাৎ 'অহুয়ো—মজদার' উপাসক, তাঁহাদিগের নাম 'অসুর'।

অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ

যিনি অসু অর্থাৎ প্রাণ দান করেন, তাঁহার নাম 'অসুর'। বেদে এই অর্থেই অসুর শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণও অসুর বিশেষণে বিশেষিত হইতেন। পক্ষান্তরে বৃত্র ও বলপ্রভৃতি দেবতা বা আর্য্যগণও অসুর ছিলেন। কেন ?

---

* এই প্রবন্ধের প্রমাণাদি সম্বন্ধে কাহারো কোন সমীচিন বক্তব্য থাকিলে, তাহা সুসংযত ভাষায় প্রবন্ধাকারে প্রেরণ করিলে আমরা আলোচনা হিসাবে সাদরে প্রকাশ করিব।

সঃ সঃ।

ভারতের একদল লোক মদ্যপান এবং দেবোপাসনা করিতেন, অন্য দল (যাঁহারা ভারতীয় দেবগণেরই স্বজাতি) মদ্যপানে বিরত ছিলেন এবং তাঁহারা জ্ঞাতি দেবতাদিগের উপাসনা "নরোপাসনা" বলিয়া উহা না করিয়া— অসুরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পান ভোজন এবং উপাসনা লইয়া ভারতে কলহ উপস্থিত হইলে, নরোপাসক মদ্যপায়ীরা অসুরোপাসকদিগকে 'অসুর' বলিয়া গালি দেন, উহার বিনিময়ে অসুরোপাসকগণ দেবোপাসক সুরাপায়ী গণকে 'সুর' অর্থাৎ মাতাল বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করেন। উক্তঞ্চ রামায়ণে—

সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।

অপিচ যখন নরোপাসক দেবগণ মৃতগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে বসিতেন, তখন অসুরেরা আসিয়া ঐ সকল পিণ্ড খাইয়া ফেলিতেন। ইহাতেই ভারতে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ক্রোধান্ধ দেবগণ বলিতে লাগিলেন—

কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়ঃ।
অস্রেধন্ত ইতন বজ মচ্ছ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবারঃ।
যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যূন্॥ ৯।২৯সূ।৩ম

হে বন্ধুগণ, আর দেবতা আমরা এই দস্যুদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না, সকলে উঠ, প্রস্তুত হও, বর্ষণযোগ্য ধূম বা gass প্রস্তুত কর। প্রাণের ভয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক কেহ আমাদিগকে হিংসা করিতে পারিবে না, এই সাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এই মহাবীর অগ্নিদেব আমাদের সেনাপতি হইবেন।

এই প্রকারে দেবতা ও অসুর সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতীয় দেবগণের আহ্বানে ইন্দ্র ও বিষ্ণু পুনরায় ভারতে আগমন করিলেন। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের সহিত ভারতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উক্তঞ্চ—

ন অস্মৈ বিদ্যুৎ ন তন্যতুঃ সিষেধ,
ন যাং মিহ মকিরৎ হ্রাদুনিঞ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যৎ যুযুধাতে অহিশ্চ
উতা পরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে॥ ১৩।৩২।১ম

মঘবান্ ইন্দ্র ও অহির ন্যায় ক্রূরচেতাঃ বৃত্রাসুর পরস্পর পরস্পরের প্রতি—

বিদ্যুদ্‌ঘটিত অস্ত্র, তন্যতু, (gass)
বরুণাস্ত্র (জলবর্ষণ) ও বজ্র (কামান)

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতে মঘবান্ ইন্দ্র বৃত্রকে পরাভূত করিলেন।

তৎপর কি হইয়াছিল? তৎপরই বৃত্রাদি অসুরগণ (পার্শীদিগের পুর্ব্বপুরুষ) ভারতবর্ষ হইতে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ পারস্য ও তুরুস্কে পলাইয়া যান। উক্তঞ্চ—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যা নিঃশশা অহিং। ১।৮০।১ম

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি তোমার বাহুবলে সর্পের ন্যায় খল বৃত্রাসুরকে পৃথিবী অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে নিঃসারিত করিয়াছ। তথাহি—

অর্বাঞ্চং সুমুদে বলং ৮।১৪।৮ম

বৃত্রাসুরের ভ্রাতা বলকেও ইন্দ্র ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তথাহি—

শূরো নির্যুধা অধমৎ দস্যূন্। ৮।৫৫।১০ম

ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দস্যু অর্থাৎ বৃত্রাদি অসুরগণকে তাড়াইয়াদিলেন। কোথায় ?

যৎ বি বৃত্রং পর্বশো রুজন্

অপঃ সমুদ্রং ঐরয়ৎ। ১৩.৬।৮ম

যেহেতু ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে পর্বে-পর্বে বেদনা প্রদান করিয়া জলপ্রধান সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষে প্রেরণ করিলেন।

মূলে ত 'অপঃ' ও 'সমুদ্র' পদ আছে ? ইহার অর্থ জলপ্রধান অন্তরীক্ষ হইল কেন ?

অপ্ শব্দ দ্বিতীয়ার বহুবচনে "অপঃ" হইয়াছে। নিঘণ্টু অপ্ (আপঃ—প্রথমা বহু) ও সমুদ্র এই উভয় শব্দই অন্তরীক্ষ—পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (নিরুক্ত—১৯ পৃঃ) একারণ আমরা অপঃ সমুদ্রং পদদ্বয়ের অর্থ—জলময় অন্তরীক্ষ করিলাম।

কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষিগণ ত বলিয়া থাকেন যে আমরা পার্শী বা অসুরগণকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মিঃ ম্যাকডোনেল সাহেব ত তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে তারস্বরেই বলিতেছেন যে It is impossible to avoid the conclusion that the Indian branch must have separated from Iranian only a very short time before the beginning of Vedic-literature and can therefore have hardly entered the North West of India even as early as 1500 B.C. (P. 12.)
যেহেতু ভারতীয় আর্য্যগণ ইরাণীয়গণকে ইরাণে রাখিয়া তবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (উঃ পঃ প্রদেশে) সে আজ ৩৪০০ (১৫০০+১৯০০) বৎসরের কথা। আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া তবে বেদ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সে বেদের বয়স খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

হাঁ মোক্ষমূলর ও ম্যাকডোনেল প্রভৃতি এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের যুবকবৃন্দও ইহা গলাধঃকরণ করিয়া এম-এ, বি-এ, পি-আর-এস, পাস করিতেছেন। কিন্তু ইহার মূলে বা আশে পাশে কি কোনও সত্য বিনিহিত আছে? এতৎ সমুদয়ই সাহেবদিগের কল্পনা মহাসাগরের ফেন-বুদ্বুদ। তাঁহারা কোন প্রমাণে বলিতেছেন যে খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ বৎসর হইল আমরা ও ইরাণীয়গণ পৃথক্ হইয়া বেদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ? আর আমরা যে ইরাণীয়গণকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম—এ দুঃস্বপ্নই বা সাহেবেরা কি প্রকারে দেখিলেন ? ইহার প্রমাণ কোথায় ? কেবল I think so; He thought so; Perhaps it may be so আমি এরূপ মনে করি, তিনি এরূপ মনে করিয়াছেন, হয় ত ইহা এই রূপই হইতে পারে, ইহা ভিন্ন সাহেবেরা এসকল বিষয়ে কি কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কি কেবল—
assumed, supposed. ইহা ছাড়া তাঁহারা কি আর একটী প্রমাণও দিয়াছেন ? হিন্দুরা সে সেমিতিকগণের নিকট হইতে অক্ষর ও লিখনপ্রণালী পাইয়াছেন, ইহাও যেমন ষোলআনা মিথ্যা কথা, তদ্রূপ ভারতীয় আর্য্যগণ পার্শীদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—ইহাও তদ্রূপ ষোলআনা মিথ্যা কথা।

হে ভারতীয় যুবকগণ ! Paradise lost হইলে যখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ (আর্য্যগণ নহে, তখন আর্য্য নাম হয় নাই) ভারতে প্রবেশ করেন, তখন এ ভূমণ্ডলে—

ইরাণ, পারস্য, তুরুষ্ক, আরব ও আফ্রিকা

কোথায় ? ইউরোপ (হরিয়ূপীয়া)ই বা তখন কোথায় ছিল ? ফলতঃ তখন আফগানিস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে কেবল একটী রেখার ন্যায় পথ দেখা দিয়াছিল। তাই মহামান্য ঋগ্‌বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে -

মহী দ্যাবা পৃথিবী জ্যেষ্ঠে

বিস্তীর্ণ দ্যৌ বা মঙ্গলিয়া এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবী বা ভারতবর্ষই এই ভূমণ্ডলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জনপদ।

এই দ্যৌ বা মঙ্গলিয়ারই নামান্তর স্বঃ এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের নামান্তর ভূঃ। তখন জগতে ভূঃ ও স্বঃ ভিন্ন অন্য কোনও লোক বা জনপদ ছিলনা। ইহার পরই পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয়।

উক্তঞ্চ— ততঃ সমুদ্রঃ অর্ণবঃ। ১।১৯০।১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্.........ততঃ তস্মাদেব ঈশ্বরাৎ অর্ণবঃ অর্ণসা উদকেন যুক্তঃ সমুদ্রশ্চ অজায়ত। সমুদ্র শব্দঃ— অন্তরিক্ষোদধ্যোঃ সাধারণ ইতি।

ঈশ্বরের সেই উৎকট তপস্যা হইতে (অর্ণব অধি) পশ্চিম সমুদ্রগর্ভে সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষের (তুরুস্ক, পারস্য আফগানিস্থানের) উৎপত্তি হইল।

এই অন্তরীক্ষেরই নামান্তর নভঃ বা ভুবর্লোক, তজ্জন্য ইহার পরই লোক সংখ্যা তিনটী হয়। ভূঃ ভুবঃ—স্বঃ। এই ভূর্ভুবঃ স্বঃই ত্রিভুবন বা ত্রৈলোক্য। যখন গায়ত্রী পঠিত হয়, তখনও এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভিন্ন অন্য কোনও লোক (আফ্রিকা ও ইউরোপ প্রভৃতি) ছিল না। তাই গায়ত্রী পাঠ কালে বলা হইয়া থাকে—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য

ধীমহি ধিযোযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ১০।৬২।৩ম

যে সবিতা বা দিবাকর ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিন লোকের প্রসবকর্ত্তা, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার সেই বরণীয় ভর্গঃ বা তেজের ধ্যান করি।

ফলতঃ দেবতা বা ব্রাহ্মণগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একবারেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান বা আফ্রিকাপ্রভৃতি সাগরগর্ভে নিদ্রিত ছিল। তৎপর ব্রাহ্মণাখ্য দেবতারা ভারতে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর অন্তরীক্ষ বা তুরুস্ক, পারস্যাদি স্থলে পরিণত হয়। স্থলে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ হইতে বরুণ, বায়ু ও ত্ব্যতান (Teuton) যাইয়া অন্তরীক্ষে উপনিবিষ্ট হয়েন। যথা—

ত্রিতো বিভর্ত্তি বরুণং সমুদ্রে

ত্রিতো নামক দেবতা বরুণকে (Uranas) ভারত হইতে সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষে লইয়া যান। তথাহি—

অধ ত্যতানঃ পিত্রোঃ সচাস

অমন্বত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।

মাতুঃ পদে পরমে অন্তিমষৎ।১০।৫।৪

অন্তরীক্ষ স্থলে পরিণত হইলে, ত্যতান (যিনি পিতা স্বর্গ হইতে আসিয়া মাতা ভারত ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন) পৃশ্নি মাতা অন্তরীক্ষের (পৃশ্নিঃ অন্তরিক্ষং সায়ণঃ—১।৬৬সূ।৬ম ভাষ্যং) অন্তে পশ্চিম প্রান্তে একটী রমণীয় গুপ্ত স্থান পছন্দ করিলেন।

এই গুপ্ত স্থানই ব্যাবিলোনিয়া ও মেষপটেমিয়ার আধার তুরুস্ক জনপদ এবং এই ত্যতানই জর্ম্মাণ ও ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পিতামহ Teuton. অহো তথাপি অর্বাচীন বালকেরা সাহেবদিগের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে

বদ্ধপরিকর ও বদ্ধকটি, যে জগতে ব্যাবিলোনিয়া মেষপটেমিয়া ও মিশর, আদি ও অকৃত্রিম সভ্যজগৎ এবং আমরা ঐসকল স্থান হইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আফ্রিকার ইথীওপিয়নগণ কৃতজ্ঞহৃদয়েই বলিয়া গিয়াছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race compelled to leave India, for the impurity cotracted by slaying a certain monarch to whom they owed allegiance. (P. 205)

ফাইলোষ্ট্রটাস একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে ইথিওপিয়ানগণ মূলতঃ ভারতীয় আর্য্যসন্তান। কিন্তু একজন রাজাকে সম্মানের পরিবর্ত্তে ব্যাপাদিত করাতে তাঁহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient orgin,

Indian in Greece (P. 205)

প্রত্যেক মিশরবাসী ইহা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বাপ দাদার কাছে ইহা শুনিয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষের লোক সকল সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং ইথিওপিয়ানগণ ভারতবর্ষ হইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা এখনও সেই ভারতীয় জ্ঞান এবং আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পাঠক ইহা পোকক (Pocoak) নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিজোক্তি। ইনি সত্যবাদী ও ধর্ম্ম ভীরু বলিয়া ইহাঁকেও ইউরোপে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

যাহা হউক আমার সনির্বন্ধ নিবেদন এই যে, হে ভ্রাতৃগণ! রাজাকে সম্মান ও ভক্তি কর, তাঁহার আদেশ ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, অবনত মস্তকে মাথা পাতিয়া লও। কিন্তু রাজার দেশের পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়া এবং বলিয়া থাকেন, তাহা পড়িয়া মুখস্থ করিয়া এম এ, বি এ, পি আর এস, পাশ কর পরন্তু তৎসমুদয় সত্য ভাবিয়া গলাধঃকরণ করিও না। ফলতঃ যাঁহাদিগের দেশে বেদ নাই, যাঁহারা বেদ পড়িয়া বুঝেন নাই কিংবা বেদ গ্রাহ্য করে না, তাঁহাদিগের কথা—

সহসা বিদধীত নক্রিয়াং।

সহসা প্রাণে দিও না। বেদ পড়, উপনিষৎ পড়, শাস্ত্র পড়। দেখ উহাতে কি কি আছে। হে ভ্রাতৃগণ রাজা থাকিতে কোতওয়ালের দোহাই কেন? বেদই জগতে এই সকল বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ।

যাহা হউক বৃত্র ও বল প্রভৃতি অসুরগণ ত অন্তরীক্ষে পালাইয়া গেলেন তৎপর কি হইয়াছিল? বেদ বলিতেছেন যে—

ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতির ও মা। ৩।১৫৩।১০ম।

হে ইন্দ্র তুমি বৃত্রবধকারী, তুমই বাহুবলে অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলে। (অন্তরীক্ষং ব্যতির—উত্তীর্ণবান্।) তথাহি—

সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তাঃ,
যাভিঃ সিন্ধু মতঃ ইন্দ্র পূর্ভিৎ।

নবতীং স্রোত্যাঃ নব চ স্রবন্তীঃ,
দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ ॥ ৮।১০৪।১০ম।

হে শত্রুপুরভেদী ইন্দ্র! তুমি সুরক্ষিতা বিপাশা ও শতদ্রুপ্রভৃতি সপ্ত নদী এবং পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া নব্বইটী স্রোতস্বতী নদী অতিক্রম করিয়াছিলে। দেবতা ও মনুষ্যগণের গমনের জন্য তুমি পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে! তথাহি—

ভীমো বিবেষ আয়ুধেভি রেষাং
অপাংসি বিশ্বা নির্য্যাণি বিদ্বান্।
ইন্দ্রঃ পুরো জর্হ্যাণো বি দূধোৎ;
বি বজ্রহস্তো মহিমা জঘান॥ ৪।২১।৭ম

সেই ভীমবিক্রম ইন্দ্র কিসে জনসাধারণের কল্যাণ হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি দেবগণের প্রভাবে বজ্র হস্তে অসুরদিগের অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিলেন (অপাংসি বিবেষ—ষ—লিপিকর প্রমাদ।) শত্রুগণের বিনাশে হৃষ্টচিত্ত সেই ইন্দ্রের অন্তরীক্ষ প্রবেশে অসুরনগর সকল যেন কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দ্র নিজ বাহুবলে অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন।

সপ্ত বিপ্রা বিশ্বা মবিন্দন্ পথ্যাং। ৫।৩১।৩ম।

সপ্ত বিপ্র সমগ্র অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিলেন। সপ্ত বিপ্র কে কে? ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি ও ত্রিত প্রভৃতি সাতজন বীরপুরুষ যে তুরস্ক পারস্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা অন্যান্য মন্ত্রেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাহা যেন হইল. কিন্তু মন্ত্রে ত অন্তরীক্ষে প্রবেশের কথা নাই? আছে—

পথ্যাং অবিন্দন্

এবং সায়ণ উক্ত পথ্যাং পদের অর্থ করিয়াছেন—

পথ্যাং যজ্ঞস্য মার্গে সাধুভূতাং।

কিন্তু আমরা যখন নিকণ্টুতে "অধ্বা" শব্দ অন্তরীক্ষ পর্য্যায়ে (১৯ পৃঃ) দেখিতে পাই, তখন এখানেও এই "পথ্যা" শব্দে অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় বুঝিয়া লইতে হইবে। যাস্ক ও দেবরাজ যজ্বাও বলিতেছেন যে—

পথ্যা স্বস্তিঃ—পন্থা অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ (পথ্যা)। ৩৪৬ পৃঃ। ঐ ২য় ভাগ।

পদাতে তৎ স্থানিভি রিতে পন্থা,
অন্তরিক্ষং তত্র ভবা পথ্যা। ৩৭৯ পৃঃ। ১ম ভাগ নিরুক্ত।

কিন্তু এখানে যদি স্বার্থে প্রত্যয় করা যায়, তাহা হইলে পথ্যা শব্দের অর্থও অন্তরীক্ষ হইতে পারে।

আচ্ছা স্বীকার করিয়া লইলাম যে—ইন্দ্র অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ত অপর বা পশ্চিম সমুদ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক্ করিতেছিল। ইন্দ্র কি প্রকারে সমুদ্র পার হইয়া পারস্যাদিতে প্রবেশ করিলেন?

দেবতারা স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন কালে এই সমুদ্র পার হইয়াই ভারতে প্রবেশ করেন। এবারও সেই অর্ণবযান যোগে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। উক্তঞ্চ—

যাস্তে পূষন্ নাবো অন্তঃ সমুদ্র,
হিরণ্ময়ী রন্তরিক্ষে চরন্তি। ৬।৫৮।৩ম।

দত্তানুবাদ............হে পূষা! তোমার যে সমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ মধ্যে সঞ্চরণ করে।

আমাদিগের মতে ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই যে 'হে পূষন্! সমুদ্রের মধ্যে তোমার যে সকল লৌহময় নৌকা (অর্ণবযান) অন্তরীক্ষে যাতায়াত করিয়া থাকে।'

ইন্দ্রের এক ভ্রাতার নাম পূষা তাঁহার কতকগুলি লৌহনির্ম্মিত অর্ণবযান ভারতবর্ষ ও অন্তরীক্ষের মধ্যে ছিল। উহারা ফেরী নৌকার কাজ করিত। ইন্দ্রাদিও উহাদিগের সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন।

উত স্ম তে পরুষ্ণ্যামূর্ণাঃ বসত শুন্ধ্যবঃ।

উত পব্যা রথানাং অদ্রিং ভিন্দন্তি ওজসা॥ ৯।৫২।৫ম।

কেবল ইন্দ্র নহেন, তাঁহার সৈনিক (তে) মরুদ্গণ উক্ত অর্ণবযানসাহায্যে পরুষ্ণী নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকট বাহিত বজ্র বা কামানদ্বারা অন্তরীক্ষস্থ নগর ও পর্ব্বতাদি বলক্রমে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

বজ্রেণ বজ্রী নিজঘান শুষ্ণং। ৪।৩২'৫ম।

বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্র প্রহারে শুষ্ণ। সুরকে বধ করিলেন।

উর্দ্ধোহি অস্থাৎ অধি অন্তরিক্ষে,

অধা বৃত্রায় প্রবধং জভার।

জঘান আয়ন্ আপঃ। ৭।৩৩।৩য়।

বৃত্রাসুর অন্তরীক্ষের উর্দ্ধ অর্থাৎ উত্তরদিকে (আর্য্যায়ণে) ছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই অন্তরীক্ষে যাইয়া (আপঃ—আয়ন্ গচ্ছন্ সন্) বৃত্রকে বধ করিলেন।

ইন্দ্রো বৃত্রং হন্ বিষ্ণুনা সচাবনঃ। ২।২০।৬ম।

ইন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রকে বধ করেন।

বি অন্তরিক্ষ মতিরৎ ইন্দ্রো

যৎ অভিনৎ বলং। ৭।১৪।৮ম।

ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে যাইয়া বৃত্রানুজ বলকেও বধ করিলেন।

ইন্দ্রো অন্তরিক্ষং বিভেদ বলং।

নুনুদে বিবাচঃ অভবৎ দমিতা

অভিক্রতূনাং। ১০।৩৪।৩ম

ইন্দ্র অন্তরীক্ষে যাইয়া বলকে নিহত করিলেন, অপভ্রষ্টভাষীদিগকে তাড়াইয়াদিলেন, এবং যজ্ঞবিরোধী অসুরদিগকে দমন করিলেন।

ইন্দ্রো বজ্রী ভিনৎ বলস্য পরিধীন্

ইব ত্রিতঃ। ৫।৫২।১ম

ইন্দ্র ত্রিত দেবের ন্যায় বলের রাজ্যের পরিধি ভেদ করিলেন।

ইন্দ্র ত্বং বিপ্রেভিঃ বি পণীন্ অশায়ঃ। ২।৩৩।৬ম

পণিগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্তরীক্ষে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে নিহত করেন।

অনিন্দ্রা হতা অমিত্রাবৈল স্থান মশেরন্। ১।১৩৩।১ম

এই প্রকারে ইন্দ্রবিরোধী অসুরগণ নিহত হইয়া শ্মশানে শয়ন করিল।

ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ। ৯।১০৩।১০ম

দেবগণের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

হত্বা দেবা অসুরান্ যদায়ন্ দেবা
দেবত্বমভিরক্ষমাণা। ৪।৫৭।১০ম

দেবতারা অন্তরীক্ষে অসুরগণকে বধ করিয়া যখন ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের দেবত্ব রক্ষা পাইল।

এখন পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, এই অন্তরীক্ষটা শূন্য গগন, না একটী মহাজনপদ।

অন্তরীক্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্য সমুদ্রে লৌহময় অর্ণবযান থাকিত। উহাদ্বারা পার হইয়া যাইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণ পারস্যের উত্তরভাগে আর্য্যায়ণে স্থিত বৃত্রকে বধ করেন। আর্য্য বৃত্র, ভারত হইতে যাইয়া পারস্যে উক্ত আর্য্যায়ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহা "ইরাণ" নামের বিষয়ীভূত।

তদীয় ভ্রাতা বলাসুর অন্তরীক্ষের একদেশে যে রাজ্য বিস্তার করেন, উহার নামই Asseria। ইন্দ্র তথায় যাইয়া বল ও তদনুচর পণি বা ফিনিসীয়ানগণকে নিহত করেন। বল্ যে এছিরিয়ার রাজা, তাহা Arian witness পাঠেও জানা যায়।

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuni form inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rig Veda, was the Belus or Bel of the Inscription — that the lofty capital of Vala in the Rig Veda, was the lofty citadel of Bel, in the Inscriptions that the Asuras, Panis (Sanskrit Panayas) of the Veda were identical with the Phinides of classical history. P. 62.

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন কেন এসিরিয়ার বেল ও ফিনিসিয়ানদিগের সহিত ঋক বেদের বল ও পণি-দিগের সমতা ঘটিতেছে?

যেহেতু ইন্দ্র-বিতাড়িত বৃত্র—পারস্য ও তদনুজ বল—দক্ষিণ তুরুস্কে এবং বলানুচর পণিরাও ভারত হইতে দক্ষিণতুরুস্কে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র যাইয়া উঁহাদিগকে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ পারস্য ও তুরুস্কে নিহত করেন।

সুতরাং তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান যে অন্তরীক্ষ, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা আরও শত শত মন্ত্র-দ্বারা তুরুস্ক ও পারস্যাদির অন্তরীক্ষত্ব সপ্রমাণ করিতে পারি—বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

তবে ইন্দ্র যে অন্তরীক্ষে ভারতের ইন্দ্রাদি দেবোপাসনা ব্যাবিলোন ও মেসপটেমিয়াতে প্রবর্ত্তিত করেন, তদ্দ্বারাও তুরুস্কাদিই যে অন্তরীক্ষ, তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। যথা—

ইন্দ্র প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানাং।
অপি কর্ত্ত মবর্ত্তয়ো অযজ্যূন্॥ ১৩।১২১।১ম

হে ইন্দ্র! তুমি নব্বই নদীর পরপারে যজ্ঞহীনদিগের মধ্যে কর্ত্তব্যের অর্থাৎ দেবোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছ।

তাই মেষপটেমিয়ার মিতানি জাতিদিগের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যের উপাসনা প্রচলিত হয়। জেকোবি সাহেব দগ্ধ ইষ্টকে লিখিত সন্ধিপত্রে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সন্ধি খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়।

অতএব যে অন্তরীক্ষে তুরুস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, ব্যাবিলোনিয়া ও মেষপটেমিয়া প্রভৃতি বিদ্যমান, যাহাতে অর্ণবযানে গমন করা যায়, যেখানে নব্বইবা নদী বর্ত্তমান, উহা শূন্য গগন হইতে পারে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বাঁচা।

—ঃ*ঃ—

বাঁচা শুধু বাঁচা নহে তন্দ্রাসম নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
অথবা বিহঙ্গসম উড্ডয়নে আকাশে বাতাসে
বাঁচা শুধু বাঁচা নহে পশুসম আহারে বিহারে
অথবা উদ্ভিদসম বৃদ্ধি লভি আকারে প্রকারে।
বাঁচা নহে অন্ধকূপে যে জীবন যাপিছে পেঁচায়
বাঁচা নহে শুক যথা বেঁচে থাকে খাঁচায় খাঁচায়
ব্যর্থ বাঁচা ভোগীদের ভোগপঙ্কে লালসা-বিলাসে
ব্যর্থ বাঁচা জড়তায় মূঢ়তায় অলস-উল্লাসে।
ধর্ম্মে বাঁচা কর্ম্মে বাঁচা মর্ম্মে-মর্ম্মে দেশের জীবনে
জ্ঞানে বাঁচা ধ্যানে বাঁচা বেঁচে থাকা দেহে-প্রাণে-মনে
সকলের মধ্যে বাঁচা সকলকে বাঁচাইয়া বাঁচা
অপুষ্টেরে পুষ্ট করি ডাঁটো করি যত কচি কাঁচা
তাহাই প্রকৃত বাঁচা—হৃৎস্পন্দনে জঠর জ্বালায়
বাঁচিয়া রহিলে শুধু বেঁচে থাকা নাহি কহি তায়।
বাঁচা চাই হস্তে পদে বাঁচা চাই আকাঙ্ক্ষা আশায়
শ্রবণে নয়নে মনে বাঁচা চাই কণ্ঠের ভাষায়
মহামানবের মাঝে বাঁচা চাই আপনা বিস্তারি
মরণান্তে বাঁচা চাই দেশ দেশ চিত্ত অধিকারি'।

শ্রীকালিদাস রায়

বিবাহ।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চক্রবর্ত্তী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একখানি দ্বিতল বাড়ীর একতলার একটি কক্ষে তাকিয়া মাথায় দিয়া বিছানার উপর শয়ন করিয়াছিলেন। বেলা তখন তিনটা। তাঁহার পাশে দুই তিনখানা বই ও একখানা খবরের কাগজ পড়িয়াছিল। একটা 'হাওয়াগাড়ী' সিগারেট ধরাইয়া টান দিতে দিতে ধূমপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধূমরাশির মতই জটিল চিন্তা সকল তাঁহার মনের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল।

তপনমোহন বি-এ পাশ করিয়াছেন। সংসারে আর কেহই নাই। দেশ বলিয়া এককালে একটা বোধ হয় কিছু ছিল, কারণ মধ্যে মধ্যে তর্কের সময় 'আমাদের দেশে এই রকম ঘটে' বলিয়া তপনমোহন নজীর দেখাইতেন। কিন্তু সে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আর নাই। সেখানকার জমীজমা বা বাড়ী হস্তান্তরিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কলিকাতায় একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতেই ইনি উপস্থিত বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শোনা যাইত ইঁহার পৈতৃক কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজও নাকি আছে। তবে তাহার পরিমাণ কত সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ ছিল। ঘটকের মুখে তাহা ত্রিশ, চল্লিশ হাজার বলিয়া বিঘোষিত হইত।

তপনমোহনের এ যাবৎ বিবাহ হয় নাই। কথাটা নিশ্চয়ই অদ্ভুদ্ শুনাইতেছে। বি-এ পাশ করা ছেলে, কলিকাতায় বাড়ী, নগদ টাকাও আছে। খাটিয়া খাইতে হয় না। এ হেন অষ্ট বজ্র মিলনেও যে তপনমোহনের ভাবী বধূরূপিনী উর্ব্বশী এ যাবৎ উদ্ধার হন নাই, ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা যে বৎসর খানেক হইতে বহুবিধ ঘটক ঘটকী আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তপনমোহনও নভেল পাঠের পর অবসর পাইলে চক্ষু বুজিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে এই সকল কন্যার রূপগুণচিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকেন।

সেদিনও তাঁহার মনে ঐ চিন্তাই উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন "তাইত, এ মাসে আবার ত বিয়ে হবার যো' নেই। এ আবার কি বিধান বাপু? বছরের মধ্যে আবার কয়েকটা মাসের সঙ্গে বিবাহের এমন অহিনকুল বিরোধের কারণ কি তা' ত বুঝ্‌তে পারা যায় না। এ সব ভট্‌চায্‌দের বুজরুকি আর কি? তাই বা বলি কি করে? এ'তে ত তাদেরই লোকসান। সম্বৎসর ধরে বিবাহ চালালে ত তাদেরই সুবিধা। এক এক মাসে আফিসের মেলডের মত খাটুনি খাট্‌তে হয় না। হয় ত এত বেশী জায়গায় ডাক পড়ে যে দু চারটে হাত ছাড়াও হয়ে যায়। এই বন্ধ মাসগুলো পুরুতদের Vacation ছিল হয় ত। এখন এ ভেকেসানের ঠেলায় পড়ে যে আমায় মহা মুস্কিল তার উপায় কি? আজ ত ঘটকী আসবার কথা আছে। ক'নে দেখাতে নিয়ে যাবে। কাপড় চোপড় গুলো ঠিক আছে কি না কে জানে? ওরে বিশু—"

"আজ্ঞে" বলিয়া বিশ্বনাথ ওরফে বিশু আসিয়া হাজির হইল। রন্ধন ভিন্ন তপনমোহনের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভারই বিশুর উপর। গৃহিনী, চাকর, ঝি, বাজার সরকার সবই এই বিশু। বিশু ও জনক নামধারী এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, তপনমোহনের সংসারতরণীর মাঝি ও দাঁড়ি।

বিশু আসিলে তপনমোহন বলিলেন "জরিপাড় কাপড়খানা কুঁচিয়ে রেখিছিস্ ত ?"

বি। আজ্ঞে হাঁ।

ত। জুতোটায় বুরুস করেছিস্ ?

বি। আজ্ঞে, সব ঠিক আছে।

ত। ঠিক না তোর মাথা আছে। পুরোণো কালীটা দিয়ে বুরুস করেছিস্ বুঝি ?

বি। আজ্ঞে না, নতুন এক কৌটো কালী কিনে এনেছি।

ত। এই দোকানটা থেকে বুঝি ?

বি। আজ্ঞে না। আপনি যে বলে দিয়েছিলেন সেই বড় রাস্তার চৌমাথার দোকান থেকে। ছ' আনা দাম নিয়েছে।

ত। এই ব্যাটাকে ঠকিয়েছে। ছ' আনা কি রে ? চার আনা করে কৌটো। দেখি কি এনেছিস্ ?

বিশু কৌটা আনিতে গেল। অনতিবিলম্বে এক কৌটা লইয়া আসিল। তপনমোহন দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "এই যা বলেছি তাই। ব্যাটা এতদিন বাজার কর্‌ছে, একদিনও যদি একটা জিনিস ঠিকমত আন্‌তে পারে। যা ফিরিয়ে দিয়ে আয় গিয়ে। বল্‌গে যা, এর চার আনা দাম।"

বি। আজ্ঞে এর খানিকটা খরচ করে ফেলেছি যে, জুতোয় মাখিয়েছি—

ত। কে তোকে মাখাতে বল্‌লে ? আগে আমায় দেখাতে পার্‌লি নি ? না হয়, আজ পুরোণো কালীটাই লাগাতিস্। ব্যাটা খালি লোকসান করাচ্ছে আমার—

এই সময় "বাবু আছেন নাকি গো।" বলিয়া থান কাপড় পরিধানে কাঁধে একখানি গামছা বামী ঘট্‌কী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তপনমোহন বিশুকে বলিলেন "যা ব্যাটা, কৌটোটা নিয়ে যা।" বিশু সরিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য কালীর দুই আনা পয়সা সে নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছিল, কারণ সে জানিত যে ধরা পড়িলেও তপনমোহন খানিক গর্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না।

বিশু চলিয়া গেলে তপনমোহন একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "কে ঘটক-ঠাকরুণ ? এদিকে এস।"

বামী ঘটকী দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল "চলুন তবে।"

ত। শ্যামবাজারে ?

বা। না, সেখানে আজ যাওয়া হবে না। মেয়েটির অসুখ। আজ আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।

ত। আবার কোথায় ?

বা। বেশী দুর নয়। এই দর্জ্জিপাড়ায়।

ত। এ আবার নতুন কথা এসে পড়ল যে। আগে কথাটাই শুনি। মেয়ের বাপ কি করেন ?

বা। মেয়ের বাপ নেই। এক মামা আছেন। তিনি সব্‌জজ। তাঁর ছেলেপুলে নেই। তিনিই মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছেন।

ত। দেবে থোবে কি রকম শুনি ?

বা। তা চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌বে।

ত। মোটে চা-র-পাঁ-চ হা-জা-র। এই না বল্‌ছ সব্‌ জজ। ও সব তা' হলে বাজে কথা। কোথা বিদেশে চাকরী বাকরী করে বোধ হয়। বলে দিয়েছে সব্‌জজ।

বা। ওগো না গো বাবু তা নয়। তাঁর মুখের দাপোট্ কি? বাড়ী কাঁপ্‌তে থাকে। চাকুরেদের অমন গলাই হয় না। আমরা কুত দেখে বেড়াচ্ছি। আমাদের ভুল হ'তে পারে না।

ত। (স্বগতঃ) বুড়ো ব্যাটা খুব কৃপণ ত? নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই শুন্‌ছি—ভাগ্‌নীর বে' দেবে তাতে মোটে চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করবে? ব্যাটা যকের ধন রেখে যাবে নাকি? তা যা হোক্ আর একটা সুবিধা হতে পারে বোধ হয়। যদি চেষ্টা করে ডেপুটি টেপুটি একটা করে দেয়। যাওয়াই যাক্ না একবার। (প্রকাশ্যে) তা হাঁ—মেয়েটি কি রকম?

বা। খাসা মেয়ে। অমন মেয়ে কিন্তু মেলা ভার এ আমি বড় গলা করে বলে যাচ্ছি। গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

ত। তা আজকে হঠাৎ এরকম বলা কওয়া নেই—গিয়ে পড়্‌ব।

বা। বলা আছে বৈকি? আমি বলে এসেছি। মেয়ের মামা আবার একধরণের মানুষ। তিনি বলেন, সাজাব গোজাব আবার কি? যখন খুসী দেখিয়ে নিয়ে যেও। তিনি এখন ছুটি নিয়ে ভাগ্‌নীর বিয়ে দিতে এসেছেন কি না? মাঘ মাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে।

তপনমোহন খানিকটা ভাবিতে লাগিলেন:—"সব্‌জজ লোকটা। একেবারে গিয়ে পড়্‌ব। কথা ছিল শ্যামবাজারে হরিশবাবুর মেয়ে দেখ্‌তে যাবার—তা হরিশবাবু আপীসে চাকরী করেন তাঁর বাড়ী যেমন তেমন পোষাক পরে গেলেই চল্‌ত। এ একেবারে সব্‌জজ। আর ডেপুটি টেপুটি হ'তে গেলে প্রথম থেকেই একটা ভাল ধারণা জন্মে দেওয়া চাই।"

প্রকাশ্যে বলিল "সব্‌জজ বাবুর বয়স কত?"

বা। বয়স অনেক হবে। চুল পেকে গেছে। তবে বেশ জোয়ান শরীর, অথর্ব্ব হয়ে পড়েন নি। পশ্চিমে থাকেন কি না।

ত। (স্বগতঃ) বাঙ্গলা বেহার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বোধ হয় বেহারে গিয়ে পড়েছে। বুড়ো যদি হয় তা হ'লে নেহাৎ ফচ্‌কে ছোঁড়ার মত যাওয়াটা ঠিক্ নয়। একটু গম্ভীর ভাবে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) তা দেখ, আর একদিন না হয় যাওয়া যাবে। এ-ই, আস্‌ছে রবিবারে—কি বল?

বা। কেন, আজই চলুন না। ও আর দেরী করে লাভ কি?

ত। আজ কি জান? শরীরটা তত ভাল নেই—আর হঠাৎ কথাটা হ'ল—দেখি একটু ভেবে।

বা। ভেবে আর কি দেখবেন? আগে দেখেই আসবেন চলুন। আজ ত এক জায়গায় যাবার কথাই ছিল।

ত। (স্বগতঃ) আজ আর যাওয়াটা হয় না। পাঞ্জাবীর হাত দুটো গিলে করে রাখ্‌তে বলেছিলুম—তা এ শীতকালে ওরকম পাঞ্জাবী দেখ্‌লে বুড়ো নিশ্চয়ই চটে যাবে। একটা কোট টোট্ পরে শাল গায়ে দিয়ে গম্ভীর চালে যেতে হবে। কাশ্মীরী কোটটা কোথা আছে কে জানে? খুঁজে দেখতে হবে। আর ও ষ্ট্রাইপ্ দেওয়া সিল্কের মোজা ত মানাবে না। পাঞ্জাবীর সঙ্গে না হয় চল্‌ত। এক জোড়া কালো উলের মোজা আনাতে হবে। আর জরিপাড় কাপড়খানাও সুবিধে হবে না। এক খানা কালাপেড়ে পরে গেলেই হবে। (প্রকাশ্যে) নাঃ আজ আর যাওয়া হয় না। বুঝলে?

এই বলিয়া তপনমোহন শয্যায় শুইয়া পড়িয়া একমনে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

ঘটকী মনে মনে যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল। আর তাহারই বা দোষ কি? আজ তিনমাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে, কত মেয়েই দেখাইয়াছে, কিন্তু কোথাও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

যখন তপনমোহন ঘটকীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তখন বিশু সদর দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তার দিকে চাহিতে হঠাৎ সে একজনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কি গো দাদাবাবু, ভাল ত? এতদিন ছিলেন কোথা?"

আগন্তুক সেই বাড়ীর দিকেই আসিতেছিল। দাঁড়াইয়া বলিল "কে? বিশু? বাবু কোথা?"

বিশু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "বৈঠকখানায় আছেন।"

আগন্তুক 'তপন, তপন,' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

তপনমোহন তাহার ডাক শুনিয়া বলিল "কে ললিত নাকি?

আগন্তুক বলিল "হাঁ—ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন—ইনি কে?" বলিয়াই ধপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল।

আগন্তুকের আবির্ভাবে তপনমোহনের হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া হর্ষ ও বিবাহের কথা শুনিলে বিদ্রূপের আশঙ্কা এই উভয় প্রকার ভাব হইতেই ঐপ্রকার অবস্থার উদয়। ললিত বিবাহের ধার ধারে না। এম্-এ, বি-এল, পাশ করিয়া মুঙ্গেরে ওকালতী করিতেছে। তপনমোহনের সহিত ইণ্টারমিডিয়েট পড়িয়াছিল। কিন্তু তপন বারকতক আই-এ, ও বি-এ, ফেল হওয়াতে ললিত তাহাকে আগাইয়া গিয়াছিল!

তপনমোহনের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল "ঘটক ঠাকরুণ।"

ল। এঁ্যা—বিবাহের সঙ্কল্প হচ্ছে নাকি? বাঃ—বাঃ—

"ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনম্"

ললিত সংস্কৃত আওড়াইতে বড় ভালবাসিত। এজন্য বহু যুতসই বুলি সে মুখস্থ করিয়াছিল।

ঘটকঠাকরুণের দিকে ফিরিয়া ললিত বলিল "কোথা সম্বন্ধ হচ্ছে ঘটকঠাক্রুণ? আমি ঘরেরই লোক, যে-সে লোক নই, স্বয়ং বরকর্ত্তা। তপনের ত আর কেউ নেই। কি বল হে? তারপর কাব্যটাব্য লেখা চল্‌ছে কি রকম? বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, প্রতিভা কোরকাবস্থা থেকে প্রস্ফুটিত হ'ল কি না তাও জান্‌তে পারি নি। বিশেষ তুমিত আর মাসিকে কবিতা পাঠাও না, পুস্তকাকারেও ছাপ না। Economically খুব ভাল বল্‌তে হবে। যশ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই! যাক্ বিয়ের কথাটাই আগে শুনি। একটু গম্ভীর হ'তে হবে—ব্যাপারটা ত

সোজা নয়। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) তা' ঘটকঠাকৃরুণ, গৃহস্থঘরের মেয়ে ত আর আলমারীতে সাজিয়ে রাখ্‌ব না। যেমন-তেমন হলেই হবে। কিন্তু এদিকে বুঝেছ ত—দেনা-পাওনার দিকটা বেশ ভারী হওয়া দরকার। (তপনের দিকে চাহিয়া) কেমন, ঠিক্ বলি নি ?

তপন, ললিতের পা টিপিয়া বলিল "যাঃ—কি ছেব্‌লামি আরম্ভ করলি ? সকলের সঙ্গেই তোর সমান—"

ল। কেন কি মন্দটা বলেছি। তুমি ত এই কথাটাই আমার—

"কর্ণে লোলঃ কথয়িতুম্"

ঘটকী একটু মৃদু হাসিয়া বলিল "মেয়ে খুব সুন্দরী গো বাবু। আর দেবেও পাঁচ ছয় হাজার।"

ল। বটে, এ একেবারে 'সুবর্ণসুযোগ'। এক দিকে "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" অন্য দিকে "অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ"। তবে আর দেরী কিসের ? পাত্রী দেখা হয়েছে ?

ঘ। না। আজ বাবুকে দেখাতে নিয়ে যাব বলে এসেছি।

ল। তবে ত ঠিক্ সময়ে এসে পড়েছি—"বিধি পরিতুষ্টে ন ভবতি কিংবা ?" কপালের জোর আছে বল্‌তে হবে। তা নাও,—উঠে পড়।

ঘ। বাবু আজ যেতে চাচ্ছেন না।

ল। কেন ? বাবুর আবার হ'ল কি ? এও কি একটা কথা ? এতক্ষণ জল খাবার সাজান হচ্ছে বোধ হয়। নিশ্চয়ই খেজুরে গুড়ের অথবা কমলালেবুর সন্দেশ এসেছে, কপি কড়াইশুঁটি দিয়ে গল্‌দাচিংড়ি ত আছেই—সুতরাং এহেন বিষয়ে আপত্তি কি ?

ত। থাম, থাম, পেটুক কোথাকার। খাওয়াটাই বুঝি আসল ?

ল। তা' আমার পক্ষে তাই বৈ কি ? তুমি না হয় "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ম্" ভেবেই প্রিয়ার অধর-পেয়ালায় চা ও গণ্ড-গেলাসে সরবৎ পান ক'র। আমরা সাধারণ লোক "মোদক-খণ্ডিকায়ৈ সুগৃহীতো জনঃ।"

ঘটকী দেখিল, বেলা যায়। বলিল "তা হ'লে চলুন আপনারা—বেলা যে গেল।"

ল। ওঠ হে—

ত। না হে আজ আর থাক্—

ল। তুমি বড় জ্বালালে দেখ্‌ছি। নেহাৎ ব্রাহ্মণকে আজ বঞ্চিত করবে ? এমন সুখের যাত্রায় আপত্তি কি ? অথবা—

"স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি-শঙ্কয়া।"

ভয় নাই ওঠ। হরধ্যান ভঙ্গের আয়োজনে আমাদের মতন মদনেরই ভস্ম হওয়ার সম্ভব। তোমার বিপদ্ ত কিছু দেখি নি।

এই বলিয়া ললিত ঠেলিয়া তপনমোহনকে তুলিয়া দিল। তপন অগত্যা চটি জোড়াটা পায়ে দিয়া ত্রিতলে চলিয়া গেল।

ললিত ঘটকীকে বলিল "তুমি দাঁড়াও। আমি আস্‌ছি।" বলিয়া সেও উপরে উঠিয়া গেল।

তপন উপরের ঘরে গিয়া ললিতকে বলিল "তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? তামাসার একটা সময় অসময় নেই ?"

ল। তাও ত বটে! বিয়ের সময় তামাসা কি অন্যায়! তা' নাও একটু চট্-পট্ করে সাজ-গোজ করে।

ত। আজ কি করে যাওয়া হয় বল্ দেখি—এই শীত কাল—

ল। তাতে কবিত্বের ব্যাঘাতটা কি? 'চোখের বালী'তে দোতলার বারান্দায় মিষ্টান্ন ভক্ষণ সহ পাত্রীদর্শনেও 'রোমান্স্' নষ্ট হয় নি, আজও নষ্ট হবে না।

ত। দেখ্ দেখি এখন কাপড়-চোপড় ঠিক্ নেই।

ল। নে না বাপু একখানা ফরসা কাপড় পরে, একটা জামা গায়ে দিয়ে। মিছে ভোগাস্ কেন? না হয় তোকে বরের পিস্তুত ভাইয়ের শালা বলে পরিচয় দেব এখন! "লজ্জা গুর্ব্বী—পরবশো আত্মা।"

তপনমোহন অগত্যা সাজ-গোজ আরম্ভ করিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড়, জামা, কলার, কোট, শাল চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। এটা পছন্দ হয় ত ওটা হয় না, কলারটা ভাল ইস্ত্রী নাই, ডবল্-ব্রেষ্ট্টার বুকের কাছটায় একটু কুঁচ্‌কিয়া গিয়াছে, মাফ্‌লার না হ'লে বুকখোলা কোট পরি কি ক'রে প্রভৃতি বহুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়া ললিত, তপনমোহনকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। বিশু বলিল "একখানা গাড়ী ডেকে দেব কি?"

তপনমোহন বলিলেন "যাক্। হেঁটেই যাব এখন।"

ললিত বলিল "হাঁ—ক্ষুধাবৃদ্ধিও করা চাই।"

যখন ঘটকঠাকুরুণ, ললিত ও তপনমোহন বাহির হইয়া পড়িল তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ললিত "ধেনুর্ব্বৎস-প্রযুক্তাঃ বৃষগজতুরগান্" ইত্যাদি আওড়াইতে আরম্ভ করিতেই তপন বলিল "ও রকম কর ত যাবই না বল্‌ছি।"

ল। না না।—চল, চুপি চুপিই যাচ্ছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্জ্জিপাড়ায় পরলোকগত রায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত সম্বন্ধ লইয়াই ঘটকঠাকুরুণ তপনমোহনের বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরঞ্জনের অনেক সুহৃদ্ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নিরঞ্জন পূর্ব্বে ইঁহাদের চক্ষেও দেখে নাই। বাড়ীর কাহারও কাছে ইঁহাদের নামও শুনে নাই। এখন ইঁহারা পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেহ নিরঞ্জনের বাপের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িয়াছিলেন, কেহ তাঁহার রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, কেহ সস্তায় বহুমূল্য জমী ও বাড়ী কিনাইয়া দিয়াছিলেন, কেহ বা বৈষয়িক পরামর্শ দিয়া পরলোকগত রায় বাহাদুরকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িত। বয়স তাহার উনিশ বৎসর। হঠাৎ এতগুলি নিঃস্বার্থ বন্ধুর অযাচিত উপদেশ লাভে সে যে নিজেকে খুব সহায় সম্পদশীল বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তবে এই সকল বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া তাহাদের সহিত নিরঞ্জনের সেরূপ মিল হইল না। বন্ধুর দল তাহাতে যে একটু ক্ষুন্ন হইল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। কারণ রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহারা যে রকম ইয়ারকি দিয়া আসিয়াছিলেন নিরঞ্জনের সহিতও সেইরূপ ইয়ারকি দিতে তাঁহাদের বিন্দু মাত্র দ্বিধা ছিল না। বরং তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন "আমরা মনখোলা লোক। অত ঘোর প্যাঁচ বুঝি না।" কিন্তু নিরঞ্জন কিছুতেই নিজেকে তাঁহাদের ইয়াররূপে কল্পনা করিতে পারিল না, কাজেই ব্যবধান একটু কেন, অনেকটাই রহিয়া গেল।

কিন্তু তা থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে সে এই বন্ধুদের উপদেশ না শুনিয়াই পারিল না। মহেন্দ্রবাবু বুঝাইলেন, তাকিয়া ফরাস, গালিচা, ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি এ সব আসবাব সেকেলে হইয়া গিয়াছে। আজিকার দিনে এ সব দেখিলে লোক উপহাস করে। মহেন্দ্রবাবুর সন্ধানে খুব সস্তায় আধুনিক কতকগুলি আসবাব বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এ একজন বড়দরের সাহেবের ছিল। জিনিসগুলি আনকোরা নূতন, অথচ সাহেব বিলাত যাইতেছে বলিয়া এগুলি অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এ সুযোগ ছাড়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। আর রায় বাহাদুরের পুরাতন আসবাবগুলি কিনিবার একজন খরিদদারও মহেন্দ্রবাবু ঠিক করিয়াছেন। তাহাতে কিছু টাকাও পাওয়া যাইবে। এমন যুক্তির সহিত মহেন্দ্রবাবু এ কথা পাড়িলেন, যে খরচের পরিমাণটা শুনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিলেও নিরঞ্জন আর 'না' বলিতে পারিল না।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নিরঞ্জনের বৈঠকখানার চেহারা ফিরিয়া গেল। কার্পেট, চেয়ার, মার্বেলের টেবিল, কৌচ, কাচের ফুলদানি, ফটো ফ্রেম, জানালায় দরজায় পরদা, আরও কত কি আসিল। বিহারীবাবু একদিন মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন "ওহে আমায় দুটো দেওয়ালগির দিলে না ?" মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন "যেয়ো একদিন আমার বাড়ী। পছন্দ করে এনো।"

রজনীবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন "সব ত হইল। কিন্তু এ আসবাবের সঙ্গে টানাপাখা আর কেরোসিনের আলো মোটেই খাপ খায় না।" হরেন্দ্রবাবু অমনি বলিলেন "যা বলেছেন। ইলেক্‌ট্রিক্ ফিট্ না করলেই নয়। আর এতে খরচই বা কি ? আজকাল ত মুদীর দোকানে পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিকের আলো। যদি বলেন ত আমার ভাইপো শৈলেনকে বলে দিই। সে বেশ ইলেকট্রিকের কাজ শিখেছে। খানকতক পাখা ও গোটাকতক আলো লাগিয়ে দিয়ে যাক্।"

রজনীবাবু বলিলেন "হাঁ। এতই যখন হ'ল তখন ও সামান্য খুঁতটুকুই বা আর থাকে কেন ?"

অগত্যা নিরঞ্জন ত্রুটি সংশোধনে মন দিল। মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ীর ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা হইয়া গেল।

শ্যামবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন "ওহে, বড় সস্তায় একখানা মোটরকার বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। হাজার আষ্টেক টাকা হ'লেই হয়। এ রকম মেসিন্ বাজারে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না।"

রজনীবাবু বলিলেন "কিনে ফেল্‌লে হয় না ? ও পুরোণো জুড়ীতে আর আজকাল মান থাকে না। কলিকাতার মত সহরে বড়লোকদের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া একরকম উঠেই গেছে।"

শ্যামবাবু বলিলেন "কি বল নিরঞ্জন, দেখ্‌ব না কি ?"

নিরঞ্জন একবার বলিল "অত টাকা ?"

শ্যামবাবু বলিলেন "একবার দেখেই আসবে চল না। না হয় কিছু কমাবার চেষ্টা করা যাবে।"

নিরঞ্জন গেল, কিন্তু সাহেব দোকানদারের মহা খাতিরের পাল্লায় পড়িয়া সে দাম কমাইবার কথা ত মুখেই আনিতে পারিল না, অধিকন্তু প্রায় অতিরিক্ত হাজার টাকার সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়া আসিল।

রায় বাহাদুরের বন্ধুগণ এইরূপে নিরঞ্জনের সুবিধা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অহোরহ ঘুরিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাজারে, দোকানে, নীলামে কোন্ ভাল জিনিসটি বিক্রয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিবার জন্য তাঁহারা আহার

নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতেন "আহা নিরঞ্জন—ছেলেমানুষ। ওকে দেখ্‌ব না? ওর বাপ যে আমাদের কত ভালবাসত। আমরা থাক্‌তে ওকে ঠকিয়ে নেবে?"

পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই নিরঞ্জনের বিবাহ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর একবৎসর পরে তাহার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। মেয়েটি অতুলনীয় সুন্দরী। নাম রাখা হইল—রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর জন্মোৎসবে বাড়ীতে কত উৎসব হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। নহবৎ বসিল। যাত্রা, থিয়েটারের অভিনয় হইল। প্রীতিভোজ, গার্ডেন পার্টি আরও কত কি? নিরঞ্জনের বন্ধুর দল এক একজনে এক এক কাজের ভার লইলেন। কি চমৎকার বন্দোবস্ত। কি সজ্জা! সহরের লোকেরা অবাক্‌ হইয়া গেল।

কিন্তু উৎসবান্তে খরচের টাকার হিসাব লইয়া যখন বাড়ীর বুড়া সরকার নীলকমল নিরঞ্জনের কাছে উপস্থিত হইল তখন নিরঞ্জনের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এত খরচ কিসে হইল? একবার মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার হাত দিয়ে যে খরচটা হল তার একটা ফর্দ্দ দেবেন কি?"

মহেন্দ্রবাবু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। পরে নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সে কি কথা? দেব বই কি। পরের টাকা খরচ করেছি, পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত মিলিয়ে দেব।"

কথাগুলি এমন সুরে বলা হইল, যেন নিরঞ্জন মহেন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করিয়াছে বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নিরঞ্জন অতিশয় লজ্জিত হইল। মহেন্দ্রবাবু হিসাব দিলেন না। নিরঞ্জনও চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর সে কথা পুনরুত্থাপন করিতে পারিল না। বুড়া সরকার নীলকমল একবার বলিল "বাবু হিসাবটা চেয়েছিলেন কি?" নিরঞ্জন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "যাও। ও মোট খরচ লিখে রাখ গে।"

এইরূপে দশবৎসর কাটিয়া গেল। রায়বাহাদুরের বন্ধুবর্গ এমন উৎসবের পর উৎসবে নিরঞ্জনকে মাতাইয়া রাখিলেন যে এই দীর্ঘসময় যেন আমোদময় স্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া গেল। ষ্টীমার পার্টি, নাচখেলা, ঘোড়দৌড়, সে কত কি ব্যাপার? দশ বৎসর পরে নিরঞ্জনের চমক ভাঙ্গিল।

একদিন প্রায় রাত্রি বারটার সময় নিরঞ্জনের মানিকতলার বাগানে নাচগান চলিতেছিল। এমন সময় সরকার নীলকমল সেখানে উপস্থিত হইল। বাহিরে মহেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন।

ভিতরে তখন মজলিস জমিয়া গিয়াছে। নীলকমলকে দেখিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন "কিহে, এত রাত্তিরে এখানে কেন?

নীলকমল কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল "আজ্ঞে বাবুকে নিতে এসেছি। বৌ ঠাকরুণের কলেরা হয়েছে।"

নীলকমল বহুদিনের লোক। নিরঞ্জনের স্ত্রীকে বৌঠাকরুণ বলিয়াই সে সম্বোধন করিত।

মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন ও নিরঞ্জনের কানে-কানে এই সংবাদ দিলেন। নিরঞ্জনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "গাড়ী এনেছ?"

নীলকমল বলিল "আজ্ঞে হাঁ।"

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে চড়িল। নীলকমলও উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে নিরঞ্জন কোন কথা বলিল না। তাহার মনে তখন অনন্ত চিন্তার উদয় হইতেছিল। তাহার পত্নী সাংঘাতিক রোগাক্রান্তা। না জানি কি হইবে? নেশা অনেকক্ষণ ছুটিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া নিরঞ্জন দেখিল, রোগিণীর গৃহের বাহিরে একজন ডাক্তার বসিয়া আছেন। দাসদাসীরাও সহজে কেহ ভিতরে যাইতে চাহিতেছে না। নিরঞ্জনের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা রাজলক্ষ্মীই ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত ঔষধ খাওয়াইতেছে। একজন মাত্র দাসী ভিতরে রহিয়াছে।

নিরঞ্জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম দেখ্‌ছেন ?"

ডা। তত সুবিধা নয়। ভয়ের আশঙ্কা আছে।

নি। আর কোনও ডাক্তার ডাকাব কি ?

ডা। আমি দরকার মনে করি না। তবে সে আপনার ইচ্ছা—

নীলকমল এই সময় ডাক্তারবাবুকে রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্নগুলি শুনিয়াই ডাক্তার বাবু বুঝিলেন যে নীলকমল এই রোগের লক্ষণ ও ধারাবাহিক গতি বেশ বোঝে। তিনি উত্তর দিতেই নীলকমল বলিল "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটা একবার করালে এ-অবস্থায় বোধ হয় উপকার পাওয়া যেতে পারে। যদি বলেন ত শশাঙ্ক ডাক্তারকে ডাকি।"

শশাঙ্ক সে পাড়ার একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নিরঞ্জন বলিল "ডাক।"

নীলকমল ছুটিয়া গেল। নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজলক্ষ্মীর মাতা তখন শয্যার উপর পড়িয়াছিলেন। ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন "এসেছ ? আমার ক'টা কথা বল্‌বার ছিল। আমি বড় সুখেই যাচ্ছি। আর কিছুদিন থাকলে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে হত। ভগবান্ আমায় তা হ'তে রক্ষা করেছেন। তুমি আমার একটা কথা রেখ—মেয়েটার মুখের দিকে চেও। ওর আর কেউ রইল না। সরকার মশায়ের কাছি শুনেছি বিষয় সম্পত্তি নাকি সবই গেছে। তুমি জানना, তোমায় বলি নাই— যখনই তোমার টাকার দরকার হয়েছে তখনই আমি আমার এক একখানা গয়না বেচে টাকা দিয়েছি। সরকার মশা'য় সবই জানেন। তোমার মেয়ের জন্য আর কিছুই নাই। যা আছে তা জান্‌তেই পার্‌বে। আর যা কর, মেয়েটার ভাল জায়গায় বিয়ে দিও। ও যেন সুখী হয়।"

কথা শেষ হইল না। নীলকমল ডাক্তার লইয়া আসিয়া পড়িল। নিরঞ্জন বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

নিরঞ্জনের পত্নী বলিলেন "একটু পায়ের ধূলো দাও। বল আমার কথাটা রাখ্‌বে ?"

নিরঞ্জনের চোখ্ দিয়া জল পড়িতেছিল। বলিল "এতদিন এ কথা আমায় বল নি কেন ? তোমার গয়না তুমি কেন দিতে গেলে ? আমি ত চাই নি।"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর হইল "তোমার দরকার—এর উপর আর কথা কি আছে ? সে জন্য আমার কিছু দুঃখ নাই। কেবল অনুরোধ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ো।"

নীলকমল বাহির হইতে ডাকিল "বাবু ! ডাক্তার বাবু এসেছেন।"

নিরঞ্জন বাহিরে গেল। ডাক্তার রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন "আপনার মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যান। রোগটা ভাল নয়।"

রাজলক্ষ্মী যাইতে চায় না। নিরঞ্জন তাহাকে লইয়া বাহিরের ঘরে গেল। নীলকমল রোগিণীর গৃহমধ্যে বসিয়া জল গরম করিতে লাগিল, ঔষধ ঢালিতে লাগিল। সেই দাসীও সেই ঘরে রহিল। সে রাজলক্ষ্মীর বাপের বাড়ীর ঝি।

নিরঞ্জন বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শৈশবেই সে মাতাকে হারাইয়াছিল। যতদিন না তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত প্রচুর অর্থব্যয় সত্ত্বেও সংসারে কি বিশৃঙ্খলাই না ছিল! ঠাকুর, চাকর, ঝি যে যেদিকে পাইত চুরি করিত। বিশ্বাসী সরকার নীলকমলের সতর্ক দৃষ্টিও সব সময় তাহা রোধ করিতে পারিত না। কিন্তু নিরঞ্জনের বিবাহের পর হইতেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। এই মৃদুভাষিণী চৌদ্দবছরের বধূটির যে এতাদৃশ শাসন ক্ষমতা ছিল তাহা আগে কে জানিত? ধীরে ধীরে সংসারে সকল বিষয়েই যে এই বালিকাটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল বিশৃঙ্খলতা সংশোধনে সর্ব্বদাই সজাগ ছিল তাহা অল্পদিনের মধ্যেই দাসদাসীরা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধ রায়বাহাদুর তাই আদর করিয়া বলিতেন "এতদিন লক্ষ্মীছাড়া হয়েছিলুম। মা লক্ষ্মীর আগমনে আজ সংসার উথ্‌লে উঠেছে।"

সেই বালিকা কালচক্রের আবর্ত্তনে যখন গৃহিনী ও জননী হইয়া উঠিল, তখনও তাহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। এতটা মৌনতা, এতটা সঙ্কোচের মধ্যে যে এতটা তেজ ও এতটা শক্তি থাকিতে পারে তাহা কাহারও কল্পনাতেই ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এত অপব্যয় সত্ত্বেও যে নিরঞ্জনের সংসার এতদিন চলিতেছিল, ভিতরের নিদারুণ অভাব যে বাহ্যিক কোনও নিদর্শনে প্রকাশ পায় নাই তাহার মূলে এই রমণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নীলকমলের অসাধারণ কার্য্যপটুতা গুপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই জায়গা জমী বন্ধক পড়িলেও, অলঙ্কার বিক্রীত হইলেও নিরঞ্জন যেরূপ প্রত্যহ বহু সুভোজ্যে অভ্যস্ত ছিল তাহার একটিরও অভাব এ যাবৎ অনুভব করিতে পারে নাই। আমোদ প্রমোদের জন্য টাকা চাহিয়া কখনও বিফলমনোরথও হয় নাই।

নীলকমল যদি কখনও বলিত "বৌ ঠাক্রুণ! এ রকম করে আপনি কতদিন যোগাবেন? বাবুকে বুঝিয়ে দু'কথা বলুন না কেন?" তখন রাজলক্ষ্মীর মাতা উত্তর করিতেন "আমার বল্‌বার দরকার কি? যাঁর বিষয় তিনি যদি না দেখেন ত আমি কথা ক'বার কে?" নীলকমল বুঝিত না এই কথাগুলির মধ্যে কতখানি অভিমান, কতখানি খেদ লুক্কায়িত ছিল। তাহার স্বামী যে অন্যায় করিতেছেন, রাজলক্ষ্মীর মাতার কথাবার্ত্তায় হাবভাবে তাহার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও কখনও ফুটিয়া উঠিত না। নীলকমল দুই একবার খরচের বাহুল্য প্রভৃতির কথা নিরঞ্জনের সম্মুখে বলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু নিরঞ্জন তাহাতে বড় একটা কান দিত না। অধঃপতন যখন হয় তখন এই রকমেই হইয়া থাকে।

এত কথা নিরঞ্জন জানিত না। সে মৃদুভাষিণী সংসারানভিজ্ঞা ধীরস্বভাবা রমণীরূপেই পত্নীকে চিনিয়াছিল। যেন সংসারের কাজ ও মেয়েকে আদর করা ছাড়া রাজলক্ষ্মীর মাতার আর কোনও কর্ত্তব্যই ছিল না। নীলকমলই কেবল এই নারীর চরিত্রের অপর দিকটি জানিত। আজ তাই মৃত্যুশয্যায় শয়ানা পত্নীর বাক্যগুলি যেন সহসা যবনিকার একপ্রান্ত তুলিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত দৃশ্য তাহার নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিল।

রাজলক্ষ্মী ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কেবল বলিতেছিল "বাবা! মার কাছে যাব।" নিরঞ্জন বহুক্লেশে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতেছিল।

রাত্রি যখন তিনটা তখন অন্তঃপুরে রোদন ধ্বনি উঠিল। ডাক্তার বিষণ্নমুখে বাহির হইয়া গেলেন। নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে নিরঞ্জনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজলক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল। নিরঞ্জন তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। আমোদ প্রমোদ থামিয়া গেল—কারণ হাতে আর টাকা নাই। হিতৈষিগণ এই সময় জমীদারী ও বাড়ী বন্ধক দেওয়াইবার জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়াছিলেন কিন্তু শুনিলেন যে তাহা বহু পূর্ব্বেই বন্ধক পড়িয়াছে। তখন শোনা গেল মহেন্দ্রবাবু কাশী গিয়াছেন। রজনীবাবুর ভয়ানক অসুখ—বাঁচেন কি না সন্দেহ। বিহারীবাবুর দেনায় সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শ্যামবাবুর দেশের সম্পত্তি লইয়া কি মামলা বাধিয়াছে তাই তিনি দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

বিরহী।

—:*:—

আমার লাগিয়া একেলা কে জাগে রাতে ?
জল ছল ছল দুখানি আঁখির পাতে !
অমন জোছনা তাইতে হয়েছে ম্লান,
নয়ন আসারে যেন সে করেছে স্নান,
ভিজে শাড়ীখানি তনুয়া জড়ায়ে ধরে’।
বরণের আভা দিয়েছে মলিন করে’ !
কেবলি অচল আকুল চাহিয়া আছে,
নিরালা আমার রুদ্ধ জানালা কাছে !

নয়ত উদাস, বাতাস পাগল পারা,
জানালা ধরিয়া কেবলি দিতেছে নাড়া,
খুলে দিতে দেরী সহেনা সহেনা আর,
ভেঙে আসে বুঝি, এমনি আকার তার !
ওঠে পড়ে বুক, তবুও সাহস মানি
খুলিতে পারিনা অদূর জানালাখানি,
সজল নয়নে জোছনা তেমনি রয়
পাগল বাতাস তেমনি সজোরে বয় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যনিষ্ঠা।*

—*—

সত্যনিষ্ঠা শান্তির প্রিয়সহচরী। যথায় পবিত্র সত্যনিষ্ঠা, তথায় আনন্দময়ী শান্তিদেবীর শুভ অধিষ্ঠান। সংসারের দুঃখ-কোলাহল, পুত্রকলত্রাদির জ্বালাময়ী বিরহবেদনা, ব্যাধিদারিদ্রোর ভীষণ নিষ্পেষণ হইতে দূরে আত্মরক্ষা করিয়া শান্তির শিশির-শীতল ক্রোড়ে সুখসুপ্তিভোগের বাসনা থাকিলে সযত্নে সত্যরত্ন অর্জন করিতে হইবে। সৌরভহীন কুসুম, বোধহীন বিদ্যা, অপ্রাণ দেহ, অফল বৃক্ষ, অধার্ম্মিক মানবের ন্যায় অসত্যনিষ্ঠ জীবন একান্ত জঘন্য ও অকর্ম্মণ্য। সত্যের উজ্জ্বল কিরণে হৃদয়-সরসী সমালোকিত না হইলে মনুষ্যত্বকমলকোরক সুবিকশিত হয় না। উদার হইতে চাও, সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মহান্ হইতে চাও, সতত সত্যের আজ্ঞাপালন করিবে। অসত্যপ্রিয় মানব কপটাচার হয়। কপটতা ধর্ম্মভাবের চিরশত্রু। অধর্ম্মাচার দুঃখদৈন্যের ও অধঃপতনের মূল প্রস্রবণ। কি পারিবারিক ব্যবহারে, কি সামাজিক আচারে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানক্ষেত্রে সফলতা ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে সাতিশয় আগ্রহ ও যত্ন সহকারে সত্যনিষ্ঠার অভ্যাস করিতে হইবে। অসত্যসেবী গৃহী স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট সতত অবিশ্বাসী ও সন্দেহভাজন হন। সত্যভ্রষ্ট মানব সভ্যসমাজে হেয় ও নিন্দনীয়। ব্যবসায়ী ও বণিক্ তিলমাত্র সত্যচ্যুত হইলে তাহার উন্নতির আশা দুরাশায় পরিণত হয়। মলিন দর্পণের ন্যায় অসত্য কলুষ হৃদয় কখনও ধর্ম্মের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। ঘনান্ধকারে বিজলী-বিকাশ, মরুদেশে স্রোতস্বতীর স্বচ্ছ প্রবাহ, নিদাঘতাপিত ভূখণ্ডে সুবৃষ্টিসম্পাত ও সাধুভক্তের হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয়ের ন্যায় দুঃখদগ্ধ ধরাধামে অকপট সত্যনিষ্ঠা মানববৃন্দের প্রাণে নববলের সঞ্চার ও সজীব উৎসাহের অঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্যতা লতা সুবিকশিত করে। সত্যনিষ্ঠা স্বর্গীয় সামগ্রী। ইহা লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিক সাধনার আবশ্যক। প্রাক্তন সুকৃতির বলে যাঁহারা ইহার একনিষ্ঠ সেবক কেবল তাঁহারাই ইহার বিমল প্রসাদ লাভ করিয়া ইহজগতে পূজ্য ও মহীয়ান্ এবং পরজগতে অক্ষয় সুখসম্পদ্ লাভের অধিকারী হন। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী ঘোষণা করিয়াছেন;—"Truthfulness, a deep, great, Genuine truthfulness is the first characteristic of all men in any way heroic. A great man cannot be without it. The merit of originality is not novelty, it is truthfulness. Every son of Adam can become a truthful man, an original man, in this sense, no mortal is doomed to be a lying man." (Carlyle) প্রগাঢ় অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠাই মহাজনগণের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ; কোন মহাপুরুষই এ লক্ষণে বঞ্চিত নহেন। নূতনত্বের ভিতর মৌলিকতা নহে, সত্যের মধ্যেই মৌলিকতা। প্রত্যেক মানব সন্তানই সত্যনিষ্ঠ ও অকপট হইতে পারে; এইভাবে প্রত্যেক মানবের মধ্যেই মৌলিকতা থাকিতে পারে। অসত্যনিষ্ঠ হওয়া কাহারও নিয়তি হইতে পারে না। উদ্ধৃত মহাবাক্য হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, কৃপাময় বিধাতা আমাদের সৃষ্টি বিধান করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে যে সকল সদ্গুণের বীজ নিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্যনিষ্ঠাই প্রধান। প্রিয় হইতে হইলে, অন্যের নিকট শ্রদ্ধাভক্তির দাবী করিতে হইলে, প্রথমতঃ নিজে ষোল আনা সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মনে ও বাক্যে অসমঞ্জস ব্যক্তিকে কেহই বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কিংবা বিবিধবিদ্যায় পারদর্শী,

* এই প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়ার অধিবেশনে পঠিত বলিয়া গৃহীত।

অথবা কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসী হইলেও মণিভূষিত ফণীর ন্যায় সকলেই ভীত ও আতঙ্কিত চিত্তে তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করিতে প্রয়াস পায়। চিররোগী ধনী হইতে সুস্থ সবলকায় দরিদ্রের ন্যায় সত্যত্যাগী হইয়া স্বর্গবাস অপেক্ষা সত্যপূত হৃদয়ে নরকে বাস অনন্তগুণে শ্রেয়স্কর। অসত্যনিষ্ঠ মানব প্রতারণার সাহায্যে মনুষ্যগণকে বঞ্চিত করিয়া নিজে অনুক্ষণ প্রতিপত্তিশালী হইতে যত্নবান্ হয়। কিন্তু সত্যমিথ্যার বিচারপতি অন্তর্যামী ভুবনস্বামীর ধর্ম্মরাজ্যে অসত্যের আশ্রয়ে কেহ কখন বিজয়ী হইতে পারে না। অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপাত সুখ উপভোগ করিলে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য পরিণামে অবশ্যই অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইতে হয়। সত্যের জয় ও অসত্যের ক্ষয় নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। অস্ ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ে "সৎ" শব্দের উৎপত্তি। উহার (সৎ) শব্দের পর ভাবার্থে "য" প্রত্যয় যোগে সত্য শব্দ নিষ্পন্ন। অতএব সত্যশব্দের মৌলিক অর্থ নিত্য। আমরা সর্ব্বদা যে সকল বিষয় মনন করি, যে সকল কথা উচ্চারণ করি, যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করি, ঐ চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মসমুদয় যদি চিরকাল সজীব থাকে, তাহা হইলে সেগুলি সত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। যুধিষ্ঠিরাদির বাক্য যেরূপ সত্য, শ্রীরামচন্দ্রাদির কর্ম্ম যেরূপ সত্য, দানবরাজ বলি প্রভৃতির চিন্তা (দান সঙ্কল্প) যেরূপ সত্য, যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইলে তাঁহাদের মন বাক্য কর্ম্ম তদ্রূপ সমরূপ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা মন মুখ ও কাজ একরূপ রাখার নাম সত্যনিষ্ঠা। জন্মক্ষণ হইতে মাতৃস্তন্য পানের ন্যায় আজীবন সত্যের অনুশীলন কর্ত্তব্য। বিনা অধ্যয়নে যেমন কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না, অনুশীলন বা অভ্যাস ভিন্ন তদ্রূপ সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায় না। যোগাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধি সহকারে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি যম, নিয়ম প্রভৃতি আট প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম উপায় যম অহিংসাদিভেদে পাঁচ প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার যমের নাম সত্য। এই সত্যতত্ত্ব অনুশীলনের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে বস্তুতত্ত্ববিষয়ে ধারণা জন্মে। এইরূপে নিরন্তর যথার্থ ও হিতকথনের দ্বারা বাক্য কেবল সত্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। সত্যতত্ত্ব অনুশীলনের দুইটী স্তর। প্রথম স্তরের মানব "বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের সমক্ষে, তীর্থক্ষেত্রে, বৈশাখাদি পুণ্য মাসে, জীবিকার জন্য মিথ্যা বলিব না" এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও উদ্দেশ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া সত্যের অনুশীলন করেন। আর দ্বিতীয় স্তরের উচ্চ অধিকারীরা "কোনও ব্যক্তির নিকট, কোনও দেশে, কোনও কালে অথবা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির মানসে কদাপি অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব না" এইরূপে জাতি, দেশ, কাল ও উদ্দেশ্যের সীমা বহির্ভূত হইয়া নিয়ত সত্যের অভ্যাসে তৎপর থাকেন। অনুর্ব্বর পতিত ক্ষেত্র পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে রীতিমত কর্ষিত ও প্রস্তুত হইলে উহাতে যেমন পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া ক্ষেত্রপতির দুঃখ নাশ করে, তদ্রূপ সত্যনিষ্ঠার গুণে চিত্ত হইতে রাগ, দ্বেষাদি আবর্জ্জনারাশি অপসারিত হইলে, উহাতে জ্ঞান-মহীরুহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অপার সংসার-পারাবারে জীবন-তরণী পরিচালনার পক্ষে সত্যনিষ্ঠা দিঙ্‌নির্ণয় শলাকা। ইহার অভাবে প্রতিপদে বিপদের সম্ভাবনা। বাল্যে অসত্যপরায়ণ বালককে সহপাঠিগণ অবিশ্বাস করে। তাহার দুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না। সে বিপদে পড়িলে কেহ সাহায্য করে না। যৌবনে মিথ্যাবাদী স্বামীকে পত্নীও মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী-গণ সতত তাহার উপর বিরক্তির ভাব পোষণ করে ও তাহার সংস্রব দূরে পরিহার করিতে চেষ্টাবান্ হয়। এরূপ হতভাগ্যের পরকালেও অনন্ত নরক। এতাদৃশ অসত্যসন্ধের গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়াই যেন সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া থাকেন। কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল যেরূপ ভীতি ও উদ্বেগজনক, অসত্যপ্রিয় মানবও ঠিক্ সেইরূপ সকল সময়ে জগতের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়। অমূল্য সত্যরত্নের অধিকার-লাভ দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ নহে; পরন্তু নূতন পাত্র-লগ্ন রেখার ন্যায় সুকুমার শিশু হৃদয়ে

ইহার অভাব সমধিক। দ্বাপরের শেষে বিরাটকুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সত্যাবতার যুধিষ্ঠিরের বিন্দুমাত্র সত্যচ্যুতি হইতে ভারতের যে অধঃপতনের সূক্ষ্ম সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ তাহা শুষ্কেন্ধন—প্রজ্বলিত অনলে ঝটিকা সংযোগের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় ও বর্ত্তমান দুঃখ-দৈন্যের মূলে ঐ দুর্নীতি অসত্য-নীতিই প্রবলরূপে দণ্ডায়মান। অসত্য-স্রোতে গাঢালা দিয়াছে বলিয়াই ভারত আজ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। ভারতে কোনও যুগে সত্যের এরূপ অকথ্য অবমাননা ঘটে নাই। সত্য এইরূপে অবজ্ঞাত হইতেছে বলিয়াই, অধুনা পিতা পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, পতি পত্নী, এমন কি কোথাও কোথাও গুরু-শিষ্য পর্য্যন্ত মিথ্যা অভিযোগ লইয়া রাজদ্বারে বিচার-ভিখারী। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সত্যকে অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের উপরে স্থান দান করিয়াছেন। স্মরণাতীত কালের অধ্যাত্মোপদেশ-পূর্ণ ইতিবৃত্ত পাঠে দেখিতে পাই,—বনবাসিনী দাসী জবালা বিদ্যালাভার্থ প্রবাসোদ্যত বালক-পুত্রকে অসঙ্কোচে অকপটহৃদয়ে আত্মপরিচয় দান করিতেছেন; "প্রিয় বৎস! আমি তোমার জনকের নাম অজ্ঞাত; ঋষিদের আশ্রমে দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম। আমার নাম জবালা। আমি তোমার কুলপরিচয় সম্বন্ধে এই মাত্র জ্ঞাত আছি।" সরলমতি বালক জননীর মুখে এইরূপ আত্ম-জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বেদবিৎ আচার্য্য-সভায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রশ্নমত মাতৃমুখশ্রুত স্বজন্ম বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিলে ঋষিগণ অজ্ঞাত—কুলশীল দাসীপুত্র বলিয়া উহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অমত করিলেন। কিন্তু সত্যের দ্বার সুপ্রশস্ত। উহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র উন্মুক্ত। যে তথায় আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করিতে চায়, তাহার সকল বাধাবিঘ্ন জলস্রোতে ভগ্ন সৈকত-বন্ধের ন্যায় দূরে ভাসিয়া যায়। তাই সেই ঋষিসঙ্ঘস্থ জনৈক উদার-হৃদয় মহাপ্রাণ মহর্ষি বিদ্যার্থী দাসীপুত্রের ব্রহ্মবাদি-বদনোচ্চারিত সুগম্ভীর বেদধ্বনির ন্যায় তেজোগর্ভ সত্যবাণী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া আনন্দপরবশ, হৃদয়ে তাহাকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে ধরিলেন। ঘন ঘন শিরশ্চুম্বন করিলেন। এবং অশেষ বিশেষ প্রকারে ঐ বালকের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া "সত্যবাক্যই ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) লক্ষণ, সুতরাং সত্যবাদী এই বালক নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-নন্দন ইহা স্থির করিলেন। জবালানন্দন দীর্ঘকাল তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া বিবিধ বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলে কৃপালু গুরুদেব সত্যপ্রিয় সেই বালকের "সত্যকাম" এই নূতন নামকরণ করিয়া জগতে সত্যের উজ্জ্বল মহিমা প্রচার করিলেন। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) ধন্য মাতা সত্যপ্রাণা জবালা; আর শত ধন্য তাঁহার গুণাভিরাম পুত্র সত্যকাম। কত যুগযুগান্তর কালের বিশাল কুক্ষিতে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে, কিন্তু নভোমণ্ডলে চিরস্থির ধ্রুবের ন্যায় তাঁহাদের পবিত্র কীর্ত্তিকাহিনী অদ্যাপি ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হায়! সে সকল দিন ভারতের কি সুদিন ছিল; যে দিন বনবাসিনী অনাথা পরিচারিকা ব্রহ্মবাদিনী ঋষিসহধর্ম্মিণীর ন্যায় অম্লান-বদনে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিকুলে আত্মতত্ত্ব শিক্ষালাভার্থ পাঠাইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। বালকের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক জনক-জননীর অপুষ্ট শিক্ষার বিকৃত আদর্শে আজ ভারতসমাজ মুমূর্ষু। একমাত্র সত্যসঞ্জীবনীসুধা ইহাকে বাঁচাইতে ও পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। সত্য বিসর্জ্জন দিয়া আত্মোন্নতি বা দেশাভ্যুদয়ের চেষ্টা ছিন্নমূল তরুর শাখা-সেবনের ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। সত্য অশেষ গুণের আকর। পুণ্যশ্লোক ভীষ্মদেব সত্যবাদী ছিলেন বলিয়াই বীর ও জিতেন্দ্রিয় রূপে আজিও সকলের সম্মান পাইতেছেন। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের ও নিত্যকর্ত্তব্য ভীষ্ম তর্পণ ইহার অকাট্য প্রমাণ। সত্যব্রত আচরণের পূর্ব্বে দেবব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস করিতে হয়। যে মানব প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যরূপ আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যথারীতি সত্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, অন্তে তিনি ত্যাগরূপ পূর্ণাহুতি দিয়া মুক্তিফল লাভের অধিকারী হন। সত্যবাদীর হৃদয় যুগপৎ

নবনীত-কোমল ও শাণিত—ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ। এজন্য দেবব্রত হইয়াও "ভীষ্ম" পৃথিবীর অকল্যাণকারীদের পক্ষে করাল কৃতান্ত সদৃশ ছিলেন। সত্যবাদী বীর। পৃথিবী রসাতলে যাইলেও তিনি সত্য-রক্ষার্থ দৃঢ়বদ্ধপরিকর। সত্যবীর রামচন্দ্র অদ্যাপি আমাদের মানস-পটে সজীব আলেখ্য রূপে শোভিত হইতেছেন। সত্যবাদী বাক্‌সিদ্ধ, তাই আমরা বহুঋষি তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদের কথা এখনও শুনিয়া থাকি। কবিবর ভবভূতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য "উত্তর চরিতে" ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।" বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে পাশ্চাত্য সুধী সমাজও মৌনী নহেন। একজন মহাত্মার উক্তি;— "Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight." "মিথ্যাবাদী ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র, আর সত্যবাদী তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন"। যে কার্য্য করিলে ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে পরম পিতার অকৃপা-ভাজন হইতে হয় তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে যে কাজ করিলে জীবিত কালে মানব সমাজ প্রীত ও পরকালে সর্ব্ব-জীব-হৃদয়বিহারী শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। তাই পুনরুক্তি করিতে বাসনা হয়, দুদিনের জন্য এ ভব ভবনে আসিয়া যদি যথার্থ সুখী, জ্ঞানী, মুক্ত বা ভক্ত হইতে চাও কায়মনোবাক্য এক করিয়া অনুক্ষণ সত্যনিষ্ঠার অনুশীলন কর। মনে এক ভাবিয়া, মুখে এক বলিয়া, কর্ম্মে অন্যরূপ করিয়া অপরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রতারিত হইও না। অসত্য উপায়ে অন্যকে প্রবঞ্চিত করিলে নিজেই প্রবঞ্চিত হইতে হয়। একটু ভাবিয়া দেখ; তুমি, আমি, সে, সমস্তই এক। একই মৃত্তিকা হইতে প্রাসাদ, প্রাচীর, ঘট, মঠ সবই নির্ম্মিত। ভিতরে ঢুকিয়া দেখ, ইষ্টকও মৃত্তিকা, তন্ময় প্রাসাদও মৃত্তিকা; কেবল পরিবর্ত্তন, রূপান্তর বা বিকার জন্য কল্পিত নাম রূপের সাহায্যে ভিন্নাকার বিকাশ মাত্র। এইরূপ তুমি, আমি, সে, সকলেই পঞ্চভূতের বিকার বা রূপান্তর। আমি যেমন তাহাকে "সে" তোমাকে "তুমি" বলিতেছি; ঠিক সে ও তুমি সেইরূপ আমাকে "সে" বা "তুমি" বলিতেছে। অতএব তুমি, আমি, সে, এ সকলই অন্তঃসারহীন শব্দাড়ম্বর মাত্র। সত্য কেবল "আমি।" আমি যেমন আমাকে "আমি" বলিয়া বুঝি; তুমি এবং সে ঠিক সেইরূপ তোমাকে এবং তাহাকে "আমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাক। বেশী দূর যাইতে হইবে না, নিত্য চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছ, দালান কোঠা ভাঙ্গিলেই মাটি, ঘর ভাঙিলেও মাটী, ঘট ভাঙিলেও মাটী। সেইরূপ আমি (দেহ) মরিলেও যা, তুমি বা সে মরিলেও তাহাই। ইহাতে কেশাগ্রমাত্র পার্থক্য নাই। একই আকাশে লাল নীল নানারঙের মেঘের খেলার ন্যায় এক আমার (আত্মার) উপর অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বজ্ঞগীতাকার ব্রাহ্মণ, সারমেয় ও শূকর দেহে একই ব্রহ্মের চৈতন্যময়ী মূর্ত্তির উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রশিরোরত্ন বেদান্তেরও সার উপদেশ, "একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "অধিষ্ঠানাব-শেষোহি নাশাঃ কল্পিত—বস্তুনঃ", অর্থাৎ, কল্পিত পরিদৃশ্যমান নামরূপময় জগতের বিলয়ে অধিষ্ঠান সত্তা এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সাধকবর রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন, "বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে।" ত্রিকাল সত্য এ সকল সার সত্যোপদেশ ভোজবাজীর মন্ত্র মাত্র নহে। ইহাকে খাঁটি সত্যবোধে জড়াইয়া ধরিতে হইবে। "ভাবের ঘরে চুরিকরা" মহাপাপ। ইহাতে আপনি মজিবে, পরকেও মজাইবে। এরূপ অসত্য পিচ্ছিল পথে চলিলে পদে পদে পদস্খলনের অবশ্যম্ভাবনা। যাহা ভাবিবে, যাহা বলিবে, যাহা করিবে সর্ব্বত্র যেন ভাব ঠিক থাকে। ভাবহারা হইলে অভাব কিনা সর্ব্বনাশ। এজন্য পাশ্চাত্য কবিকেশরী সাবধান করিয়া দিতেছেন; "My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go." "আমার (প্রার্থনার) শব্দগুলি বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছে; আমার মনের ভাবরাশি কিন্তু নীচেই পড়িয়া

আছে। ভাব-বিরহিত শব্দ কখনও ভগবানের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না।" এরূপ ভাবে ভাবহারা হওয়াতেই আধুনিক ধর্ম্মযাজকগণ গগনভেদী গলগর্জ্জন করিয়াও অভীষ্ট লাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। যে বিষয় আমার নিজের অনুভূতির বাহিরে, অন্যকে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মিথ্যার প্রলোভন অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। উহার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তি দৈবীমায়ার ন্যায় মন্দবুদ্ধি মানব-মনকে ভুলাইয়া তাহাদের দ্বারা কতই না অকার্য্য কুকার্য্য সাধন করিতেছে। নিদাঘমধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডতাপতপ্ত কোমলাঙ্গ হরিণবৃন্দ পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়া মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাপুঞ্জে প্রতিফলিত সৌরকরনিকরের প্রতি জলভ্রমে ধাবিত হইয়া জলাভাবে যেমন প্রাণত্যাগ করে, মিথ্যার আপাতমনোহর রূপে আকৃষ্ট ক্ষণিক সুখ-পিপাসু নরগণও তদ্রূপ প্রতিমুহূর্ত্তে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করে। সত্যের পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ হইলেও লক্ষ্যস্থল সুকোমল—কুসুমাস্তৃত। অপর দিকে অসত্যের পথ অবন্ধুর ও নিষ্কণ্টক হইলেও ইহার গম্যস্থল অতলস্পর্শ নিরয়। উহাতে একবার পড়িলে জন্মজন্মান্তরেও উদ্ধার লাভ অসম্ভব। যাহাতে আমরা স্বপ্নেও অসত্যের ছায়া স্পর্শ না করি তৎপ্রতি সতত সতর্ক থাকা উচিত। অসত্য বহুরূপী। পলাণ্ডুর ন্যায় উহার কেবল রূপসর্ব্বস্ব আবরণ (খোসা) সার। ক্রমশঃ ঐ আবরণগুলি সরাইয়া ফেলিলে উহার কোনও স্থিরতর রূপ বা সার অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যের কোনও বাহ্য বেশভূষা নাই। ইহা খাঁটি পদার্থ। ইক্ষুকাণ্ডের মত ইহার ভিতর বাহির সমস্তটাই রসে ভরপুর। চর্ব্বণাধিক্যে মাধুর্য্যানুভূতি বাহুল্যের ন্যায় অনুশীলনের উৎকর্ষে সত্য নিষ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রূপ বাহিরের জিনিষ। যে পদার্থে বাহ্য রূপের যত চটক সে পদার্থ ততই অসার। ইহা নানাছাঁদে পতঙ্গাকর্ষিণী মোহিনী অগ্নি-শিখার ন্যায় অসংযত বিষয়লম্পট্ মানবের দলকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। আর যাহা রূপাড়ম্বর-হীন তাহা কার্য্যকারী ও ফলোপধায়ী। সত্য জগৎ যন্ত্র পরিচালনের শক্তিশালী চক্র বলিয়াই তাহার স্থান অতি উচ্চতর। খাঁটি সত্য সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা সত্য ও অসত্য উভয়ে একত্র ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে একটী রম্য সরোবর দর্শন করিল। তাহারা দুইজনে কাকচক্ষু স্বচ্ছ সলিল ঐ সরোবরে সন্তরণমানসে নিজ নিজ পরিচ্ছদ উন্মোচন পূর্ব্বক তীরদেশে রাখিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিল। বিবিধ জলকেলিরত অনাবৃত-অঙ্গ সত্য ও অসত্য সহসা সেই সরোবরের তীরবাহী পথ দিয়া সেই দেশের নরেশকে যাইতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জল হইতে উত্থিত হইল। চতুর অসত্য ক্ষিপ্রতার সহিত সত্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় আত্মগোপন করিল। এদিকে ধীর গম্ভীর সরলতার প্রতিচ্ছবি সত্য তীরে উঠিয়া নিজের পরিচ্ছদ মিথ্যার হস্তগত ও মিথ্যার পোষাক তথায় পতিত দেখিয়া তস্কর-লুণ্ঠিত সাধুর পরদ্রব্যে সহজ উপেক্ষার ন্যায় উহা স্পর্শ করিল না। তদবধি সত্য নগ্নবেশে ও অসত্য সত্যের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নির্লজ্জ ধৃষ্টের মত জনসমাজে বিচরণ করিতে লাগিল। এটী রূপকথা, হইলেও ইহার ভিতরে বেশ একটু সত্যের আভাস আছে। সত্য নগ্ন বা উলঙ্গ, আর অসত্য রম্য-পরিচ্ছদ-পরিহিত বলিবার তাৎপর্য্য বোধ হয়, একটী আসল আর একটী নকল। আসল বস্তু জগতে চিরদিন সমভাবে আদৃত হইয়া থাকে। সত্য বাহ্য বেশ-ভূষা-শূন্য হইলেও উহা চরিত্র-ভূষণ সজ্জনের ন্যায় স্বভাবতঃ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। কুরূপা পতিব্রতা পত্নী, স্নেহাধার নিরাভরণ পুত্র, বিদ্যাদেবীর চীর-বসন সাধক, কৌপীন-শোভী যোগী, দৈন্য-বিনয়-মণ্ডিত ধূলি-লুণ্ঠিত ভক্ত, শিশিরসিক্ত নৈসর্গিক কুসুমদাম যেমন সকলেরই প্রাণে বিমল আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়, প্রকৃত সত্যও তেমনই সকল সময়ে নিরাবিল সুখের স্রোত বহাইয়া দুঃখতাপ-তপ্ত ভূমণ্ডল সুশীতল করে। যাহা সৎ তাহাই নিত্য, নির্ম্মল, পবিত্র, শান্ত ও মধুর। স্বভাব--সুন্দর পুরুষের অলঙ্কার নিরপেক্ষতার ন্যায় স্বতো

মধুর সত্যের পরিচায়ক কোনরূপ বেশ ভূষার আবশ্যক হয় না। গুড় মিষ্ট করিতে যেমন গুড়েরই প্রয়োজন, সত্যের উৎকর্ষে তেমনই উত্তরোত্তর সত্যনিষ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধির আবশ্যক। যে সকল বস্তু সহজ-সুন্দর, স্বতঃ কান্ত ও নিসর্গমধুর, তাহাদের সৌন্দর্য্য, কান্তি ও মাধুর্য্য বর্দ্ধনে অন্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কবিকুলতিলক কালিদাস তাঁহার কাব্য কোতিনুর অভিজ্ঞান শকুন্তলে ইহার সমর্থক প্রমাণ দিয়াছেন;—"কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং"। যে বস্তু যত মিথ্যার আবরণে আবৃত সে ততই অসার অপবিত্র ও তুচ্ছ। উহা আপাততঃ সরস, সুন্দর, ও মধুররূপে প্রতীত হইলেও পরিণামে বিরস ও তিক্ত স্বাদে পর্য্যবসিত হয়। বিচার কিংবা পরীক্ষা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে শুমিকা-মলিন-সুবর্ণখণ্ডের মলহানির ন্যায় পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইলেই অসত্য অংশ অপসৃত হইয়া শাণোজ্জ্বল মণির মত সত্যের সর্ব্বমোহন রূপরাশি শোভিত হইতে থাকে। অসত্যবাদী ভীরুযোদ্ধার মত আত্মশক্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সতত পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া থাকে। সত্যবাদী মত্ত-মার্তঙ্গ-জিগীষু কেশরি-কিশোরকের ন্যায় সর্ব্বত্র আত্মশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিজয় লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর মাল্যের অধিকারী হন। সত্য-সিংহের অবস্থিতির সন্ধান পাইলে অসত্য-শৃগাল তথা হইতে সুদূরে প্রস্থান করে। ফলতঃ আতপ ও ছায়া, আলোক ও অন্ধকার, শীত ও বসন্ত, সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কাম ও প্রেমের ন্যায় অসত্য ও সত্যের সহবাস একান্ত অসম্ভব। যে ব্যক্তি অসত্যের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে হৃৎপিণ্ড জাত গলিত ব্রণের যাতনা-ভোগীর ন্যায় নিয়ত অশেষ ক্লেশের মুর্ম্মুর দহনে দহ্যমান হইয়া থাকে। দূষিত গৃহবায়ু ও দুষ্টসলিল যেরূপ যত্নপূর্ব্বক গৃহ ও তড়াগ হইতে নিঃসারিত করিয়া না দিলে গৃহস্থ, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, তদ্রূপ হৃদয় হইতে অসত্যবিষ সদ্গুরুর উপদেশ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায়ে নিষ্কাশিত করিতে না পারিলে অকাল-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অসত্যবিষ পীত পারদ ও কৃত পাপের ন্যায় কদাপি জীর্ণ হয় না। ক্ষীরপূর্ণ কলসে বিন্দুমাত্র গোমূত্রপাতের ন্যায় আজীবন সত্যের সেবা করিয়া নিমেষার্দ্ধক্ষণও যদি অসত্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ অধঃপতন অনিবার্য্য। এজন্য বিশ্বহিতোপদেষ্টা পূজ্যপাদ মহাভারত প্রণেতা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের দেহান্তে "হত ইতিগজ," এই বাক্‌ছলের নিমিত্ত নরক দর্শন করাইয়া পাপকিঙ্কর মানব সংঘকে সতর্ক হস্তে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গল নিদান স্বয়ং ভগবান্‌ও সকল শাস্ত্রে "সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদি মহাবাক্যে সত্যস্বরূপে স্তূয়মান হন। সর্ব্বনিয়ন্তা কালের ন্যায় একমাত্র সত্যেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মুক্তি পর্য্যন্ত সাধিত হয়। সত্যবৎসল সাধুর দল সত্যবলে সত্যরূপী ভগবানের কৃপা, মুক্তি ও ভক্তি লাভে চরিতার্থ হন। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ "আব্রহ্মস্তম্বে" একই অদ্বিতীয় ভগবৎসত্তার বিকাশ রূপ মহাসত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া অগ্নিসর্প-সলিলাদি-সম্ভূত যাবতীয় পার্থিব দুঃখের মস্তকে সবলে পদাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজও ভক্তমুকুটমণি রূপে কীর্ত্তিত ও অর্চ্চিত হইতেছেন। ত্যাগী গৌতম "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" রূপ মহা-সত্যের ক্ষীর সাগরে অভিষিক্ত হইয়া অদ্যাপি জগতে "বুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ ও পূজিত হইতেছেন। জ্ঞানগুরু শঙ্কর প্রতি দেহ-মন্দিরে জীবরূপী সদাশিবের নিত্যাধিষ্ঠান সত্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এখনও "জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে নিত্য আরাধিত হইতেছেন। প্রেমিক শ্রীগৌরাঙ্গ ভালবাসাই জীবের পরমার্থরূপ প্রেমের মহাসত্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিন্ধু হিমাচল ভারতে যে প্রেম-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন; আজ তাহার মহতী পতাকার শীতল ছায়ায় বসিয়া শত শত পাপী তাপী পথভ্রষ্ট পতিত মানব সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছেন ইহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট অপ্রত্যক্ষ নহে। সত্যই সর্ব্বসাধনার কেন্দ্রভূমি বলিয়া হিন্দুগণ "সত্যনারায়ণ", যবন সম্প্রদায় "সত্যপীর", এবং ম্লেচ্ছাদি

অপরাপর জাতিগণ নানা নামে, নানারূপে ও নানাভাবে এই বিশ্বেশ্বর সত্যদেবের উপাসনা করেন। যাহা হৃদয়ের ধন, অন্তরের সামগ্রী, সাধনার বস্তু তাহাকে কুল দেবতার ন্যায় মনের মন্দিরে ভক্তি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেম কুসুমদামে অবিরত অর্চনা করাই বেদবিধিসিদ্ধ। নিরন্তর দুঃখের দাস আমরা যেন দুরন্ত অসত্যের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইয়া হৃদয়েশ্বর সত্যদেবের উপাসনা হইতে কদাপি বঞ্চিত না হই। শৈশবের পাঠ্য "শিশুশিক্ষায়" অসত্যবাদী রাখালের কথায়, সুপ্রাচীন উপাখ্যান গ্রন্থ এবং ভারতাদি অন্যান্য শাস্ত্রপুরাণ সমূহে সত্য সম্বন্ধে আমরা যে সকল অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছি,—সে সকল কি বিজন বনজাত উপেক্ষিত কুসুমের ন্যায় দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যগত করিতে পারিব না? পঞ্জিকার উল্লিখিত শত আঢ়ক জলের কথা শ্রবণমাত্রেই কি জ্যৈষ্ঠের দারুণ পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিবে? মধুময় দুগ্ধের নাম শুনিলেই কি শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া আরামদায়িনী নিদ্রার সঞ্চার করিবে? বীর্য্যবান্ ঔষধের নাম নির্ব্বাচিত হইলেই কি রুগ্নের দেহ হইতে রোগ ভয়ে পলায়ন করিবে? এ সকল "পুঁথিগত" বিদ্যায় এ যাবৎ কোন ফল ফলে নাই, ফলিবার সম্ভাবনাও নাই। কার্য্যক্ষেত্রে "হাতেকলমে" কাজ করা চাই। "দুগ্ধ মধুর" ইহা যেমন দুগ্ধপায়ীর রাসন-প্রত্যক্ষ, "অগ্নি দাহ করে" ইহা যেমন ভুক্তভোগীর ত্বাচ-প্রত্যক্ষ, সত্য ত্রিকাল সত্য ও ভুক্তি মুক্তি ভক্তিপ্রদ; এ মহান সত্যও তদ্রূপ অনুশীলন, অভ্যাস ও সাধনাবোধ্য। সাধনায় সিদ্ধি, বিনা সাধনায় কেহ কোনও দিন সিদ্ধির প্রফুল্ল ছবি দর্শনে সুখী হইতে পারে নাই। সর্ব্বদা অসত্যের পরিহার ও সত্যনিষ্ঠার অভ্যাসই সত্যের প্রধান সাধনা। সত্যনীতি সম্বন্ধে জনৈক মহাত্মার সারগর্ভ উপদেশ;—

"Oh 't is a lovely thing for youth
To walk betimes, in wisdom's way
To fear a lie, to speak the truth
That we may trust to all they say."

যথা সময়ে প্রজ্ঞার পথে বিবরণ, মিথ্যা কহিতে ভয়, আর সর্ব্বদা বিশ্বাসজনক সত্যকথনের অভ্যাস, এই গুণগুলি যুবকগণকে জন সমাজের প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র করিয়া তোলে। অন্তর্দর্শী কবির কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, কেবল শাস্তির ভয়ে মিথ্যা বলিতে বিরত থাকিলে চলিবে না, প্রবল মনোবলের সহিত সত্য কহিতেও অভ্যাস করিতে হইবে। অসত্যের বর্জন ও সত্যের গ্রহণ এই দুইএর সাধনে তবে পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সফলতা লাভ হইবে। পাপে ভয় ও পুণ্যের অনুষ্ঠান দুইটী যেমন পুরুষার্থ লাভের প্রতি হেতু, অসত্য ত্যাগ ও সত্যগ্রহণ এ উভয়ও তদ্রূপ সত্য সাধনায় গুরুতর প্রয়োজনীয়। পুঞ্জীকৃত সুবর্ণ ভার হইতে ক্ষুদ্র তুলসী দলের ভারাধিক্যের ন্যায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ধনরত্নাদির বিনিময়ে সত্যরত্ন অনন্ত গুণে গৌরবময় ও মূল্যবান্ ইহা মনে রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে নিয়ত পদক্ষেপ করিতে হইবে। সত্য পথই কর্ম্মের পথ, সত্য পথই যোগের পথ, সত্য পথই জ্ঞানের পথ, সত্য পথই ভক্তির পথ, সত্য পথই একমাত্র শান্তির পথ। ধর্ম্মরাজ যমের আদেশ, "সত্যেন পন্থাঃ বিততো দেবযান।" পরিণামে, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং॥"

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

অনুরোধ।

—:*:—

(রাগিণী—ইমন্ কল্যাণ)

আমারে কর'গো তোমার কানন মালাকর—
নিত্য গাঁথিয়া নব নব মালা
দোলাব তোমার গলা পর।
আমার প্রাণের আকুল এ ফুলগুলি
বিঁধি বিঁধি দিব তোমার কণ্ঠে তুলি'
আমার সকল তিয়াস যতন প্রয়াস
পাবে ক্ষণিকের তবু সমাদর।

হে দেবি, আমায় কর'গো তোমার সভাকবি
নিত্য গাহিয়া নব নব গীত
করিব রচনা তব ছবি।
নকীব তোমার কিবা গাবে জয়গান
আমার কণ্ঠে ধ্বনিবে সকল প্রাণ।
আমার জীবনে যা' কিছু। হয়েছে বিফল
মম গান হবে তারি মধুকর।

কর মোরে প্রিয়ে তোমার শালিকা-চিত্রকর
নিত্য আঁকিয়া নব নব ছবি
বসাব' আমার চিত্ত 'পর।
তুমি শুধু থেকো বিছায়ে এমনি মায়া
আমার নয়নে ভুবনে আলোক ছায়া
আমি গড়িব মনের মহা মাধুরীতে—
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি ধরা 'পর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

—:*:—

পরিবর্ত্তনই হ'ল জীবনের স্রোত, এই গতিশক্তি যদি না থাকৃত তবে জীবনটা যে ক্রম মরণের নামান্তর হয়ে উঠ্‌ত সে সত্য কিন্তু আমার স্বভাবের এতখানি পরিবর্ত্তনের একটা ন্যায়সঙ্গত কারণ পৃথিবীর সমস্ত কার্য্যকারণ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না! বন্ধুরা বলে "কি হে তুই যে নতুন মানুষ হয়ে গেলি, ব্যাপর কি?" আমি শান্তমুখে হাসি কিন্তু সে-হাসির আড়ালে যে কতখানি চোখের জল ছল-ছল্ করে তা অন্তর্যামিই জানেন! মানুষ প্রকাশ্যে পাপ করলে এখন ফাঁসি হয়, আগেকার দিনে মাথা কাটা যেত; আর আমি গোপনে পাপ করেছি তাই আমি যে দণ্ড বহন কর্‌ছি এর মত ভয়ানক মৃত্যু আর নাই! তাই আমার সে নিষ্ঠুর স্বভাব একেবারে মরেছে, লক্ষবার তার শিরচ্ছেদ হয়েছে,—লক্ষবার তার গলায় ফাঁসি লেগেছে, মৃত্যুর আর কিছু বাকি নেই তার! পুণ্যকে জাহির করা চলে, পাপকে চলে না, কিন্তু আমার পাপ যে আমি গোপন করেছি, এই কষ্টকর চিন্তা অহর্নিশি আমায় যাতনা দেয়, আমি অধীর হয়ে আজ তা প্রকাশ করছি এই আশায়—যদি এ-বেদনা কিছু লাঘব হয়!

যখন আমি শিশু তখনই আমার রাগ দেখে বাবা বল্‌তেন "ছেলেটা বড় গুণ্ডা হবে!" শরীরেও অসুরের মত বল ছিল, মা আমার যে কত অত্যাচার বহন করেছেন,—তাকে কোন মতেই স্নেহ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! ভাইবোনের সঙ্গে খেলা করা আমার পোষাত না, তারাও তাদের অত্যাচারী 'দাদার' কাছে বড় একটা ঘেঁস্‌ত না! আমি একাই পাড়া মাৎ করে রাখ্‌তাম, আমার দৌরাত্ম্যে সে পাড়ায় কারুর গাছে ফল পাকৃতে পেত না, পাড়ায় এমন বালক কেউ ছিল না যে আমায় ভয় না করত! আমার রাগ হলে ছোটবড় বিচার কর্‌তাম না, একদিন একটা ঘুড়ি নিয়ে ঝগড়া করে একটি ছোট ছেলেকে আমি যে বিষম ঘুসি চাপড় মেরেছিলাম তার জন্য তার মায়ের কাছে অকথ্য গালাগালি ও বাড়ীতে পিতার কাছে আমার গুরুতর দণ্ড বহন করতে হয়েছিল, কিন্তু আমার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হ'ল না। আমার মনের বড় একটা ঝোঁক ছিল, যখন কিছুর জন্য আমার রোখ্ চাপ্‌ত তখন আমায় ঠেকিয়ে রাখে পৃথিবীতে এমন কেউ ছিল না! যতক্ষণ আমি আমার ইপ্সিত কাজ না কর্‌তাম ততক্ষণ আমার মনে শান্তি থাকৃত না! আমার পিতার বংশে কিম্বা মাতার বংশে কেহই এমন ছিল না, আমি যে কোথা থেকে স্বভাবের এই দৃঢ়তা লাভ করেছিলাম তা জানি না।—আমি মনে মনে এর জন্য খুব গর্ব্ব অনুভব কর্‌তাম কিন্তু এজন্য আমার গৌরব একেবারেই বাড়ে নি বরং অগৌরবের ভাগ বৃদ্ধি হয়েছিল! বাবা বল্‌তেন "ও অবাধ্য ছেলেটা কোন দিন মানুষ হ'তে পার্‌বে না!" মা আমার বড় কোমল স্বভাবা ছিলেন, তাঁর কাছে আমি কখনও তিরস্কার পাই নি। আমি জান্‌তাম, আমি যতবড় অপরাধই করি, মা আমার আড়াল আছেন পিতার ক্রোধ থেকে আমায় রক্ষা কর্‌বার জন্য মার কাছে একটি স্নেহাবরণ আছে! আমার নাম ছিল "ডাকু"; বাল্যকাল থেকে আমার স্বভাব দেখে মা আদর করে আমার এ নাম দিয়েছিলেন, আমি যে সত্যই একদিন একটি নিরপরাধীর জীবন হরণ করব তা কে জানত!

তখন আমি আট বছরের; একদিন পিতার এক পুরাণ বন্ধু আমাদের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছিলেন। আমার ভ্রাতাভগ্নিরা তাঁর কাছে গিয়ে আদর-আশীর্ব্বাদ নিয়ে এল, আমি কিন্তু একেবারে রান্নাঘরের দ্বারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লাম। পিতা তাঁর গম্ভীর গলায় ডাক্‌লেন, "ডাকু, এস ত বাবা" আমি কিন্তু তার উত্তরমাত্র

দিলাম না। তারপর আমার ভ্রাতা ভগ্নিরা অন্বেষণে বাহির হ'ল, ক্রমে মা এলেন, তাঁর দৃষ্টি আমি এড়াতে পারলাম না। তিনি আমায় যখন দুই বন্ধুর মাঝে আলিঙ্গন করে বললেন "যাও ত লক্ষীধন আমার" তখন আমি নত মস্তকে তাঁর আজ্ঞা পালন করলাম; কিন্তু দ্বারের কাছে গিয়ে মনে মনে আমার বড়ই রাগ হ'ল! আমায় না দেখলে কি এই ভদ্রলোকটির চলছিল না? তারপর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার নামটি কি?" আমার মনে হ'ল আমার নাম যাই হক্ তোর তাতে কিরে বাপু? আমি উদ্ধত স্বরে বললাম "কি আবার নাম, ডাক্!" তিনি তাঁর কাঁচা পাকা গোঁফদাড়ির ভিতর থেকে বড় করুণভাবে হেসে উঠ্লেন, আমার কিন্তু মনে হ'ল তিনি আমায় বিদ্রূপ করছেন, তাই আমার রাগ আরও বেড়ে গেল! তারপর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি বই পড় বাবা?" তখন আমি রাগে উত্তর দিতে পারলাম না; বাবা কিন্তু তখনি বললেন "কিচ্ছু না,—কিচ্ছু না!" আমার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্ল, বাবা কি না এই অপরিচিত লোকটির সাম্নে এমন করে আমার নিন্দা করলেন! তখনি আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর খেলা নয় এবার আমি পাঠে মন দেব, এই প্রতিজ্ঞা আমায় পাগ্লা ঘোড়ার মত এক দৌড়ে পরীক্ষাশ্রেণীর ভিতর থেকে বাহির করে আন্তে পেরেছিল! সরস্বতী আমার প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রাখ্লেন, বিদ্যালয়ের প্রাত পরীক্ষায় আমি সর্ব্বোচ্চ স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিলেম! এই বিদ্যালাভের অনবসরে আমার ক্রোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল, ভস্মাবৃত অগ্নি যেমন অসাবধানে গৃহ দাহ করে আমার ক্রোধও তেমনি ক্ষণকালের জন্য শান্তমূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল। এমনি আদরে তিরস্কারে আমার তিক্ত-মধুর শৈশব-কৈশোর যৌবনে এসে পড়্ল। আমার দেহ মন যে কখন বিকশিত হয়ে উঠেছে তা আমি জান্তে পারি নি, তারপর যেদিন কলেজের সব কয়টি পরীক্ষা পাশ করে আমি মুক্তি পেলাম সেদিন দেখ্লাম প্রাণের ভিতরে বসন্তের হাওয়া দিয়েছে, জীবনের সমস্ত লতা-বিতান ফুলে ফুলময় হয়ে গেছে! অবকাশের ভিতরে এই জীবনটাকে এত বেশী সুন্দর, এত বেশী মধুর বোধ হ'ল যে আমি একে কেমন করে উপভোগ করব তা ভেবে পেলাম না। পিতা আমার চাকরীর জন্য অধীর হ'লেন, মাতা আমার বিবাহ দিয়ে বধূ আনবার জন্য ব্যাকুল হলেন! এই দীর্ঘ ছাড়াছাড়ির পর যখন আমি পিতামাতার স্নেহ থেকে ফিরে এলাম তখন সেই বাল্যকালের অসন্তোষের কথা একেবারেই চাপা পড়ে গেল, আর আমিও সে কথা স্মরণ করবার অবকাশ পেলাম না! পিতা সরকারী চাকরী করতেন, তাই অনেক উমেদারী অনেক ছুটাছুটি করে আমার জন্য একটি সামান্য আয়ের চাকরী জোগাড় করলেন। তবু তিনি যেদিন এসে প্রথম সংবাদ দিলেন যে আমি একটি কাজ পেয়েছি সেদিন তাঁর মুখে যে আনন্দ দেখেছিলাম, ঐ আনন্দ আমি জীবনে দেখি নি।

মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেদিনই হরিরলুট দিলেন। তারপর মনে পড়ে আমার বিয়ের রাত্রি। চন্দনের ফোঁটা-কাটা, নোলকপরা, লাল চেলীতে আবৃত চতুর্দ্দশ বর্ষের রাণী আমার পার্শ্বে জড়সড় হয়ে বসে আছে! তারপর যখন তার নরম হাতখানি আমার হাতের উপর এসে পড়্ল তখন আমি সে স্পর্শের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম—কতখানি বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা তার ভিতরে রয়েছে, তখন কি সে বুঝেছিল যে আমি তার সমস্ত বিশ্বাসকে এমন করে প্রতারণা করব? যেখানটিতে তার আঘাত লাগে সেখানেই সব চেয়ে বড় দরদ দেব!

রাত্রে যখন বাসরঘরে দীপ নিভিয়ে শয়নের উদ্যোগ করছি তখন রাণী শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করে' রইল, আমি ধীরে ধীরে তার হাত দুটি ধরে বললাম "এস রাণী—শোবে!" এতটুকু আদরে সে যেন গলে গেল। তার প্রাণের ভিতরে এক জায়গায় সমস্ত দুঃখটা যেন বরফের মত জমাট হয়ে ছিল, আমার এতটুকু স্নেহের তাপে

তার চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল! আমি অতিমাত্র অধীর হয়ে তার অশ্রু মুছিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কেন কাঁদছ রাণি! কি হয়েছে?" সে কিছুই উত্তর দিল না শুধু ঘেঁসে ঘেঁসে আমার বুকের কাছটিতে সরে এল। আমি বুঝ্‌লাম এ সুখের অশ্রু, এত স্নেহ সে জীবনে পায় নি, মাতৃহারা হয়ে বিমাতার শাসনে শুধু দণ্ডিত হয়েছে। ঝড়ের রাত্রি এই পক্ষীশাবকটি যে আমারই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এই বোধটি আমার মনের ভিতরে সমস্ত করুণাকে উৎসারিত করে দিলে! তাকে প্রফুল্ল করবার জন্য আমি কথা পরিবর্ত্তন করে বল্‌লাম "আচ্ছা রাণি তুমি খুব সুখী হচ্ছে?" সে শুধু ধীরে ধীরে তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, তার মথা এসে আমার বুকে ঠেক্‌ল! তারপর সব নিস্তব্ধ, কোন কথা বল্‌লে যে সে অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে তা আমি বুঝ্‌তেই পারলুম না! আমি ধীরে ধীরে তার হাতখানি আমার মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে বল্‌লাম "তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে?" সে মৃদুস্বরে বল্‌লে "আমার খুবই কষ্ট হবে কিন্তু তার মাঝেও আমি এইটুকু সান্ত্বনা পাচ্ছি যে তিনি আমার ভার থেকে মুক্তি পেলেন!" এ-কথায় আমি বড়ই ব্যথিত হ'লাম, বল্‌লাম "না রাণি, সন্তান কি কখনও পিতামাতার ভার হয়?" রাণী বল্‌লে "যত দিন মা বেঁচেছিলেন তত দিন হই নি! নতুন-মা আসার পর থেকে বাবার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয়েছি!" তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, আমি তার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লাম! তারপর কখন যে নিদ্রা এসে আমাদের দুজনকে তার শান্তিময় কোলে তুলে নিলে তা আমরা বুঝ্‌তেও পারি নি। আমাদের বাড়ী এসে দু'এক দিনে যখন প্রথম-পরিচয়ের সঙ্কোচ কাট্‌ল তখন এক দিন রাণী ভয়ে ভয়ে বল্‌লে "তোমায় একটা কথা বল্‌ব—রাগ কর্‌বে কি?" আমি হেসে বল্‌লাম "না গো না, রাগ কর্‌বো না, কি কথা শুনি?" সে তখন মৃদুস্বরে বল্‌লে "তুমি জান না বোধ হয় আমার একটি ছোট আপনার ভাই আছে; তাকে আমি এক দণ্ড চোখের আড়াল করতাম না! সে আমায় ছেড়ে কেমন করে আছে জানি না! মা মারা যাবার পর থেকে আমিই তাকে বুকে কোলে করে মানুষ করেছি, সে এই সবে ছয় বছরে পড়েছে। সে যদি আমার কাছে থাকে তা হ'লে তুমি কি—" আর বলা হ'ল না, রাণী ভয়ে সঙ্কোচে আমার দিকে তার ব্যথিত চোখ দুটি তুল্‌লে! আমি তার কপালের চুলগুলি সরিয়ে নিয়ে বল্‌লাম "বেশ ত রাণি, আজই তাকে আমি নিয়ে আস্‌ব!" রাণীর মুখ আশাতীত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, কি মনে করে সে আমায় প্রণাম কর্‌লে! আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বল্‌লাম "আ··ছি তুমি কি কর?"

সেই দিনই আমি তার পিত্রালয়ে গেলাম। ছোট একটি ছেলে দৌড়ে এসে বল্‌লে "জামাইবাবু দিদিকে আন্‌লেন না?" আমি তাকে কাছে টেনে বল্লাম "না, দিদিকে আনি নি, দিদি যে তোমায় ডেকেছে!" সে যেন কত দিনের আত্মীয়ের মত আমার কোলের উপর আপনার স্থানটুকু দখল করে বল্‌লে "কেন দিদি এলেন না? দিদি ত ভারী দুষ্টু হয়েছেন!" বল্‌তে বল্‌তে বালকের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল! আমি হেসে হেসে বল্লাম "বেশ ত দিদিকে তুমি খুব করে বকে নিও!"

তার পর যত কিছু অবান্তর অসম্ভব কথা বলে আমাদের বেশ ভাব জমে উঠ্‌ল। শেষে গাড়ীতে উঠে সে বল্লে "দেখুন জামাইবাবু, নতুন মা আমায় বড় বকেন! ছোট খোকাকে কোলে করেছিলাম বলে মা আমায় কাল মেরেছেন। দিদি থাক্‌লে আমি কখনই মার খেতাম না। বাবাকে বল্লাম, তিনি আমায় বল্লেন 'তুমি যদি খোকাকে মেরে দিতে, লাগিয়ে দিতে—তখন কি হ'ত দুষ্টু ছেলে!' আমি বল্লাম—'না বাবা, আমি যে খোকাকে ভালবাসি!' বাবা সে কথা বিশ্বাস কর্‌লেন না।" এমনি করে আমার মন্তব্যের কোন অপেক্ষা না রেখে সে ক্রমাগতই তার ছোট জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ বর্ণনা করতে লাগ্‌ল! আমি তাকে বল্লাম "হাঁ খোকা,

তোমার নাম কি তাই যে এখনও শোনা হয় নি !" সে আমার হাতের মাঝে মুখ লুকিয়ে বল্লে "আমার নামটা কিন্তু ভাল নয় জামাইবাবু—হাস্‌তে পাবেন না! আমার নাম হারাণ !" আমি তার পিঠ চাপড়ে বল্লাম "আর আমার নামটা বুঝি বড্ড ভাল? আমার নাম যে ডাকু !" সে তার বাল্য-মধুর কণ্ঠে 'খিল্‌ খিল্‌' করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "বেশ হয়েছে জামাইবাবু, আমরা দুই জনে বন্ধু হলাম—কেমন ?" আমি সাগ্রহে তার সরলতা দেখ্‌ছিলাম, আর মনে মনে স্পষ্ট অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিলাম—এই মাতৃহারা বালক এই বন্ধুহীন পৃথিবীতে আমার সখ্যতায় কত সুখী হয়েছে!

গাড়ী গৃহদ্বারে দাঁড়াতেই হারাণ তার দিদিকে দেখ্‌বার আগ্রহে নাম্‌বার জন্য অধীর হয়ে উঠ্‌ল! আমি তাকে কোলে করে শয়নঘরে রাণীর কাছে গিয়ে বল্লাম "এই যে তোমার দিদি, হারাণ, এইবার দু'জনে গল্প কর!" সহাস্যে রাণীর দিকে চেয়ে আমি গৃহের বাহির হয়ে এলাম কিন্তু ভ্রাতাভগ্নির মিলনানন্দ দেখ্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে না পেরে দ্বারের কাছে দাঁড়ালাম। রাণী হারাণকে কোলে বসিয়ে "হারু হীরু বলে বার বার চুম্বন কর্‌তে লাগ্‌ল! হারাণ দিদির গলা জড়িয়ে বল্‌লে "দিদি আর তুমি আমায় ছাড়্‌তে পাবে না।" রাণী বল্‌লে "না ভাই, আর আমি তোকে ছাড়্‌ব না!" আমি আর দেখ্‌তে পেলেম না, মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে বাহির বাটীতে চলে এলাম।

তারপর আমার কর্ম্মস্থানে যেতে হ'ল, রাণী ও হারাণকে সঙ্গে নিলাম। যাবার সময় মা মাথার দিব্য দিয়ে বলে দিলেন "বৌমাকে যেন কখনও বকিস্‌ নে, সুখে থাকিস আর সুখে রাখিস্‌!" আমার মনের ভিতরে আসতে লাগল যে মা এখনও আমার বাল্য কালের স্বভাবের কথা বিস্মৃত হন নি! আর বিস্মৃত না হবার কারণও হয়েছিল, কয়দিন আগে আমি আমাদের পুরাণ দাইকে সামান্য কারণে এত তিরস্কার করেছিলাম যে সে মার কাছে গিয়ে দুঃখ করে অনেক কেঁদেছিল! পাশের ঘর থেকে শুন্‌লাম মা বলছেন "থাক্‌ থাক্‌ আর কাঁদিস্‌নে দাই, জানিস্‌ ত ওর স্বভাবে ঐ একটা দোষ আছে! বড় হয়েছে এখন আর কি বলব বল? ছোট বেলায় ত ওর অনেক অত্যাচার সয়েছিস্‌, আজ বড় বেলার এ অবিচারও সেরে নে!" আমি জানি মা এমনি করে অত্যধিক স্নেহে আমায় প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন! মার কাছে কখনও তিরস্কার পাই নি, তাই যাবার দিনে মার ঐ উপদেশটিও যেন আমার কর্ণে তিরস্কারের মত বাজ্‌ল! আমি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা কিন্তু সে দিন বল্‌বার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন তাই আমার পিঠে হাত রেখে বল্লেন "দেখ বাবা তুমি যদি এই স্বভাবটি ছাড়্‌তে পার তবে আমি সত্যই সুখী হব!" আমি দেখ্‌লাম মার চোখে অশ্রু ছল্‌ ছল্‌ কর্‌ছে, যাবার দিন মনটা ব্যথিত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল তার উপরে আর অনুরোধে দ্বিধা না ক'রে আমি মার চরণ ছুঁয়ে বল্লাম "এই যে তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি "মা, আমি এস্বভাব ছাড়্‌ব, আমি তোমায় সুখী কর্‌ব!" মা আমার মাথা বুকের কাছে ধরে কপালে চুম্বন কর্‌লেন!

যে গ্রামে আমার চাকরী হ'ল তার নাম মহাদেবপুর। সেখানে গিয়ে নূতন করে সংসার পাত্‌লাম, সুখস্বপ্নের মত আমাদের দিনগুলি কাট্‌তে লাগল! ছ' বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল, ইতিমধ্যে একবার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছি। তখন রাণী বালিকাসুলভ লজ্জা ত্যাগ করে অজ্ঞাতে গৃহিণীর পদ গ্রহণ করেছে! হারাণ আট বছরের ছেলে তার দিদিকে অহর্নিশি সঙ্গ দান করে।

এক দিন আফিস থেকে প্রত্যাগমন করে আমি বস্ত্র ত্যাগ কর্‌ছি এমন সময়ে হারাণ এসে বল্লে "জামাইবাবু দেখি তোমার ঘড়ি, ক'টা বেজেছে!" আমি তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর; বল্লাম "না হারাণ থাক্‌," তবু সে বল্লে "তোমার কষ্ট হবে জামাইবাবু? আমি খুলে দেখি!" আমি অন্যমনস্কভাবে তার কথার উত্তর দিলাম না, সে

নিবিষ্ট মনে আমার কোটের পকেট থেকে ঘড়িটিকে বাহির করতে লাগ্‌ল। আমি যখন হাতমুখ ধোবার উদ্যোগ কর্‌ছি এমন সময়ে হঠাৎ হারাণের হাত থেকে ঘড়িটি মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল! হারাণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখখানি ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি চড়া গলায় বল্‌লাম "এ কি কর্‌লি?" সে ভীত কণ্ঠে বল্লে "হাত থেকে ফস্কে গেল জামাইবাবু!" আমি তার ছোট হাত দু'খানি ধরে নাড়া দিয়ে বল্লাম "ফস্কে গেল! কে নিতে বলেছিল?" সে নীরবে অশ্রুপূর্ণ চোখে আমার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল! এমন সময়ে রাণী ঘরে ঢুকে বল্লে "কেন গো কি হয়েছে?" আমি রাগতঃ স্বরে বল্লাম "কি আবার হবে? দেখনা তোমার ভাই কি কীর্ত্তি করেছে!" রাণী মিনতিপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে "আহা থাক্ ছেলেমানুষ ওকে মাপ কর!" তার চোখে মুখে মার আদেশটা যেন ফুটে উঠেছে, আমি তাড়াতাড়ি তখন হারাণকে বল্লাম "আচ্ছা মাপ কর্‌লাম এবার, কিন্তু খবরদার আর যেন এমন না হয়।"

তারপর থেকে হারাণের ছোট ছোট ত্রুটিগুলিও খুব গুরুতর অপরাধ বলে আমার মনে হতে লাগ্‌ল। শাসনও সেই সঙ্গে বেড়ে চল্‌ল। রাণী বাধা দিলেই আমি বল্‌তাম "তুমি দেখ্‌ছি নাই দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খাবে!" রাণীও আর বাধা দিত না; তার উভয় সঙ্কট,—সে যদি ভাইয়ের পক্ষ নেয় তবে স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন, আবার আমার পক্ষ নিলে ভাইকে কষ্ট দিতে হবে, সেখানে যে রক্তের সম্বন্ধ! তাই আমি যখন হারাণের শাসনের ভার গ্রহণ কর্‌লাম তখন রাণী নিরপেক্ষভাবে সরে গেল, হারাণ কিন্তু তত বেশী করে তার দিদির আশ্রয় খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল! হঠাৎ আমি হারাণকে খুব বড় করে তুল্‌লাম, তার জীবনে এতগুল বছরের পরও যে এই সব চাঞ্চল্য, দুরন্তপণা যে কতদূর অশোভন, আর এযে রাণীর প্রশ্রয়ে এত বছরেও সে ত্যাগ কর্‌তে পারে নি, এই কথাই আমি রাণীকে বুঝিয়ে দিলাম। রাণী 'হাঁ না' কিছুই বল্‌ত না, নির্ব্বাক্ হয়ে আমার কথা শুন্‌ত, তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেত!

একদিন আমি বল্লাম "রাণি, হারাণের ত কিছুই লেখাপড়া হচ্ছে না, এখানে ইস্কুলও নেই, যে দেব। আমি বলি আমি ওর পড়ানর ভার নিই, আফিস থেকে ফিরে ওকে পড়াব।" এর পর রাণীর 'না' বলা শোভা পায় না; সে মৃদুস্বরে বল্লে "বেশ্ ত তোমার কাছে পড়্‌লে ও খুব ভালই শিখ্‌বে।" কিন্তু রাণীর মুখে কালিমার ছায়া পড়্‌ল! আমি হারাণের শিক্ষকের পদ গ্রহণ কর্‌লাম! আমি যখন ছোট বারাণ্ডায় হারাণকে পড়াতে বস্‌তাম তখন রাণী দ্বারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। হারাণের ভার আমার উপরে দিয়ে সে কোনমতে নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহকাজ কর্‌তে পার্‌ত না। যখন হারানকে আমি তিরস্কার কর্‌তাম, সে কাতর চোখে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌ত, দিদি যে ওর কাছাকাছি কোথাও আছে এই চিন্তাই তাকে আশ্বস্ত কর্‌ত! একদিন হারাণের পড়া কেবলি ভুল হতে লাগ্‌ল, আমি প্রথমে কোন রকমে ধৈর্য্য ধারণ করে সংশোধন করে দিতে লাগ্‌লাম, কিন্তু ক্রমে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল, ক্রোধ জাগ্রত হ'ল, আমি ক্রোধে উন্মত্ত হলাম! আমি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে হারাণের গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত কর্‌লাম, তার কোমল গণ্ডে আমার নিষ্ঠুর আঙ্গুলের ছাপ এঁকে নিলে, তখন তা আমার ক্রোধের মত রক্তবর্ণ হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল! তার দিদি দৌড়ে এসে ব্যথিত ভাইকে বুকের ভিতর টেনে নিলে, আর আমার প্রতি যে করুণ ভীত কম্পিত দৃষ্টিতে চাইলে সে দৃষ্টি এখনও আমার বুকে বিঁধে আছে! সেই দিনই হারাণের জ্বরবিকার হ'ল, ভ্রাতাভগ্নিতে একটি কক্ষে আশ্রয় নিলে, আমি প্রবেশ কর্‌লে রাণী ভীতা হরিণীর মত ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ত। অনুশোচনায় আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল! একটুখানি আত্মসংযমের অভাবে আমি যে এতখানি বিভ্রাট বাধিয়েছি, এ আমি দিনে রাত্রে কোনমতে ভুল্‌তে পারছিলাম না। সেদিন রাত্রে পার্শ্বের ঘরে

শয়ন করে শয্যা আমার অসহ্য বোধ হ'ল; হারাণের প্রলাপ শোনা যাচ্ছিল—"ও জামাইবাবু, আর না!" আমার মনে হ'ল প্রতিজ্ঞার কথা,—মার কাছে সেই প্রতিশ্রুতি, মার সেই আনন্দ, মার সেই স্নেহচুম্বন! অত পবিত্র চুম্বনের অপমান করলাম! আমার হৃদয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল, মার স্নেহের অপমান করেছি, এই চিন্তা আমায় অতিষ্ঠ করে তুল্‌লে। আমি রোগীর ঘরে প্রবেশ করে দেখ্‌লাম—হারাণ দুই বাহু দিয়ে রাণীর বক্ষ আঁকড়ে পড়ে আছে, রাণী এক হাতে তাকে আলিঙ্গন করে অন্য হাতে বীজন কর্‌ছে! হারাণ প্রলাপের ঘোরে যতই 'মা মা' বলে চীৎকার কর্‌ছিল, রাণী বার বার তার উত্তপ্ত ললাটে চুম্বন করে বল্‌ছিল—"এই যে আমি তোর মা!" তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ছিল! আমায় দেখে রাণী যেন শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি বল্‌লে "তুমি কেন এলে? রাত জাগ্‌লে যে শরীর খারাপ হবে!" আমি মিনতির স্বরে বল্‌লাম—"না রাণি, আমার শরীর খারাপ হবে না, হারাণের জ্বর কি বেড়েছে? ডাক্তারকে একবার ডেকে পাঠাই, কি বল?" রাণী তখন বল্‌লে "এখনি তাঁকে ডেকে পাঠাও, আমার বড় ভয় কর্‌ছে!" আমি ডাক্তারের কাছে সংবাদ দিয়ে রোগীর ঘরে ফিরে এলাম। আমি রাণীকে বল্‌লাম—"আমি হারাণের কাছে বসি তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও! রাণী কাতর-কণ্ঠে বল্‌লে "না না না আমি ঘুমাতে পার্‌ব না! ওকে ফেলে আমি এক দণ্ড নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ব না!" আমার মনে হ'ল রাণী আমার উপর বিশ্বাস করতে না পেরে এমন কথা বল্‌ছে. আমার বুকে শেল বাজ্‌ল! আমি ব্যথিত স্বরে বল্‌লাম—"না রাণি, আর আমায় ভয় করো না! এই আমার শেষ অপরাধ!" রাণী নিশ্চল নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল! হারাণ আবার জ্বরের ঘোরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ও জামাইবাবু আর মেরো না!" রাণী তাকে বুকের কাছে দোল দিয়ে বল্‌লে "কে মার্‌বে যাদু, এই যে দিদির বুকে রয়েছ!" আমি অসহ্য বেদনায় ঘরে পাদ-চারণা কর্‌ছিলাম! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি করে অতীত হয়ে যাচ্ছিল! হঠাৎ হারাণ তার রক্তবর্ণ চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করে বল্‌লে—"কই দিদি যাই তবে যাই!" আমি দৌড়ে গিয়ে হারাণকে রাণীর কোল থেকে টেনে নিলাম! হারাণের প্রাণহীন দেহখানি আমার বাহুর উপরে ঝুলে পড়্‌ল, রাণী তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে স্থির হয়ে আছে! আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লাম "হারাণ বাবা আমার ফিরে আয় ফিরে আয়!"

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারিটা বাজ্‌ল, দ্বারের কাছে ভৃত্যের কণ্ঠ শোনা গেল "হুজুর ডাক্তারবাবু এসেছেন!"

মুড়ি

তোমরা বিস্কুট খাও করে টিণে ভরা
বছরের পুরাতন পরশন দুষী,
কচুরী সিঙারা লুচি দোকানের গড়া
খাও সবে তোমাদের যার যত খুসী।

আমি চাই কড়কড়ে টাটকা ও মুড়ি
যতনে গৃহেতে ভাজা, ধবধপে সাদা,
কমলার বাগানের যূথিকার কুঁড়ি
তেলমাখা সাথে তার কুচি কত আদা।
মুলা, কি মটরশুটী শশা কি কাঁকুর
লঙ্কা কি মরিচ সাথে আরো লাগে মিঠে,
কি মধুর মতিচূর দিয়েছ ঠাকুর—!
প্রিয় যেন আপনার পৈত্রিক ভিটে।
চিরদিন দিতে পারি এই করো নাথ
অতিথিরে যেন আমি মুড়ি আর ভাত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাঙ্গলা ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার।

বাঙ্গলা ভাষার সংস্কৃত অংশে শব্দাদির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির নিকট যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনেক সময়ে হার মানিতে হয় তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। কতকগুলি শব্দ মূলতঃ সংস্কৃত হইলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উপেক্ষা করিয়া ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও এগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ইহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতে পাইতেছি যে এক সম্প্রদায়ের লেখক ও সমালোচক এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে অশুদ্ধ বলিয়া ভাষা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্কুল কলেজে পাঠ্য ব্যাকরণগুলিতেও এই পন্থা অবলম্বিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার কর্ণধার, তাহাদের বোধ হয় ধারণা এই যে, বাঙ্গলা সংস্কৃতের কন্যা, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে বাঙ্গলাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় ভাষার সমূহ অনিষ্টই করা হইতেছে। পূর্ব্বেও আমি একাধিকবার এই কথা বলিয়াছি। আজ প্রথমে কয়েকটি তথাকথিত অশুদ্ধ শব্দ লইয়া আলোচনা করিব। সেগুলিকে যে প্রকৃত পক্ষে অশুদ্ধ মনে করিবার কারণ নাই, এবং শুধু কথিত ভাষায় নয়—লিখিত ভাষাতেও যে সেগুলিকে চালাইতে পারা যায় তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইব।

ইতিমধ্যে, ইতিপূর্ব্বে, ইত্যবসরে—এই শব্দগুলিকে অশুদ্ধ বলিয়া বরখাস্ত করিয়া ইহাদের স্থলে ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্ব্বে প্রভৃতি বাহাল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং কেহ কেহ ইহা কার্য্যে পরিণতও করিতেছেন। কিন্তু

'ইতি'কে 'ইতঃ'র অপভ্রংশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হানি কি ? কথিত ভাষায় অপভ্রংশ প্রয়োগ অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বাগ্‌ভটালঙ্কারেই বচন আছে—

'অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম্।'

প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্ততঃ অর্থে 'ইতিউতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা 'পাগলের ন্যায় কভু ইতিউতি চায়।' গোবিন্দ দাসের করচা (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ধৃত, বঙ্গভ যা ও সাহিত্য ৩৩০ পৃষ্ঠা) বৈষ্ণব পদাবলীতেও ইতিউতি পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে ভাষা হইতে বিতাড়িত করিয়া ইতঃপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে চালাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই এই সকল 'অশুদ্ধ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, বঙ্কিমচন্দ্রে, 'তুমি যে মিথ্যাবাদিনী তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি।'—(মৃণালিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।)

সশঙ্কিত, সক্ষম—এই সকল শব্দের গোড়ায় স সোদর সবান্ধব প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত 'সহসা সাদেশঃ' নয়, কিন্তু উত্তম, অত্যন্ত, বিশেষরূপে প্রভৃতি অর্থবাচক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অব্যয় 'সু'র বিকৃত রূপ; অর্থাৎ 'সক্ষম', 'সশঙ্কিত' প্রকৃত পক্ষে 'সুক্ষম' (বিশেষ রূপে ক্ষম বা সমর্থ), সুশঙ্কিত (বিলক্ষণ শঙ্কিত)। 'সঠিক' শব্দ (ঠিক সংস্কৃত না হইলেও) এই জাতীয়। যোগেশবাবু তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে' বক্ষ্যমাণ পদগুলি উক্তরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। (বাঙ্গলা ব্যাকরণ, ২৩৫ পৃষ্ঠা)। এবং ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই দেখিতে পাই না। সুতরাং এই সকল শব্দ অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই। শুধু তাহাই নহে। 'সশঙ্কিত' বলিয়া আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তাহা 'শঙ্কিত' শব্দে ব্যক্ত হয় না।

মনান্তর, মনসাধ, মনাগুন,—এই সকল সমাসবদ্ধ শব্দে সংস্কৃত অস্‌ভাগান্ত মনস্‌ শব্দের বিসর্গ খসিয়া গিয়া বাঙ্গলায় বিসর্গ-হীন মন শব্দ হইয়াছে। অতঃপর সমাসে মনান্তর, মনসাধ হইতে বাধা নাই। এইরূপ উস্‌ভাগান্ত চক্ষুঃ আয়ুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গের লোপ হইয়া সমাসে চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন প্রভৃতি সমস্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এসব শব্দ অশুদ্ধ বলিলে চলিবে না।

একত্রিত—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এই শব্দটি অশুদ্ধ। যোগেশ বাবু বলেন, 'সং একত্রীকৃত হইতে বাং একত্রিত' (বাং ব্যা, ১৫২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু সংস্কৃতে 'একত্রীকৃত' পদ কি শুদ্ধ ? অব্যয় 'একত্র' পদের উত্তর কোন প্রত্যয় চলে কি ? আমরা বলি, সংস্কৃতের দোহাই দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 'একত্রিত' শব্দটি বাঙ্গলায় খুব প্রচলিত, সুতরাং ইহাকে তাড়াইতে পারা যাইবে না।

কিম্বা, বশম্বদ, সম্বাদ—যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে কিংবা, বশংবদ, সংবাদ ইত্যাদি বানানই শুদ্ধ, তথাপি যদি কেহ প্রচলিত বানান অনুকরণ করে তাহা হইলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যোগেশ বাবু বলেন, 'আমরা এই সকল শব্দ ম দিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, অতএব ম লেখা বরং শুদ্ধ।' (বাং, ব্যা, ২১৩ পৃষ্ঠা।)

কেবলমাত্র সদাসর্ব্বদা, সমতুল্য—এই সকল স্থলে একার্থবোধক দুইটি শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ ব্যবহারে আর মনোগত ভাবটিতে যে একটু জোর (emphasis) দেওয়া হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্থানবিশেষে এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ বলা যায় না। বিশেষ্য পদেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, কলহবিবাদ, বাদবিসম্বাদ, বিপদআপদ, ক্ষেতজমি, (যাবনিক) ইত্যাদি।

কাজ—প্রাকৃত কজ্জ হইতে উৎপন্ন, সং 'কার্য্য' হইতে নহে, সুতরাং শুদ্ধ।

সৃজন—সাহিত্যে খুব প্রচলিত; সুতরাং ইহার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে আপত্তি করিলে চলিবে না। সর্জ্জন অসহ্য।

বাহ্যিক—মৌখিক ভাষায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সাহিত্যেও চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতে অশুদ্ধ বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় চালাইলে দোষের হয় না, কারণ বাঙ্গলা সংস্কৃত নহে।

আবশ্যকীয়—বাঙ্গলায় 'আবশ্যক' শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতেও সম্ভবতঃ হইয়া থাকে। সুতরাং আবশ্যকীয় অশুদ্ধ নহে।

সাধ্যাতীত ও আয়ত্তাধীন—এসব স্থলে সাধ্য, আয়ত্ত বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গলায় যে যাহা লিখিবে তাহাই শুদ্ধ। আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাই যে বাঙ্গলায় যে-সকল শব্দ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ভাষায় সেগুলির একটা চিরস্থায়ী অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। এখন সংস্কৃত ব্যাকরণের নজির দেখাইয়া সেগুলিকে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত। এবং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে। কারণ তাহা হইলে 'কৃষক' ও 'পর্য্যটক' পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারে না। 'কর্ষক' ও 'পর্য্যাটক' আমদানি করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের অজ্ঞতাবশতঃ যা' তা' লিখিবেন তাঁহাদিগকে ভাষাজননী ক্ষমা করিবেন না। ভাবার্থ বাচক ষ্ণ্য-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর পুনরায় তা-প্রত্যয় যথা—সৌজন্যতা, বাহুল্যতা, অধিক্যতা প্রভৃতি; সন্ধির বা ব্যুৎপত্তির শ্রাদ্ধ-সম্পাদন যথা, মনোকষ্ট, সদ্যোপ্রস্ফুটিত, সম্মত, ইয়ত্ত্বা প্রভৃতি; পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ, যথা—অমৃতনিস্যন্দিনী প্রবন্ধ, মোহিনী সঙ্গীত, মহতী মহিমা, ('রাজ কুমারী, রাজার মেয়ে, মহতী তব মহিমা'—'অপরাজিতা' ৫৬ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি।* সমাসে বা তদ্ধিৎ প্রত্যয়ে ইন্ ভাগান্ত শব্দগুলি ঈকারান্ত করিয়া লেখা, যথা—গুণীগণ, মনোহারীত্ব, ধনশালীতা ইত্যাদি,—এই সকল এবং এই প্রকারের অশুদ্ধ প্রয়োগ কখনই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ইংরাজিনবীশেরা আর এক প্রকারে ভাষার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক সময়ে এরূপ শব্দ ও বাক্য ইংরাজি হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলায় চালাইয়া থাকেন যেগুলি সম্পূর্ণ ইংরাজিগন্ধী। ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী সেরূপ বাঙ্গলা বুঝিতেই পারিবে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব ইংরাজি ওয়ালাদের লক্ষ্য করিয়া একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"একদল 'চন্দ্রাহত' সাহিত্যিক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা 'তপ্ত-যৌবনে' 'অভ্যাসের দাস' হইয়া 'লেখনীর লাগাম খুলিয়া দিয়া' 'সাধারণ আত্মা' (public spirit) দেখাইয়া ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার সাধনা করিতেছেন, এবং 'সুবর্ণময় সুযোগ' পাইয়া 'চা-বাটিতে তুফান তুলিয়া' 'অনুকূল হাওয়ায় পাল খাটাইয়া' নিতান্ত 'লৌহচেতা' হইয়া ভাষাটাকে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্য মহাযাত্রা করিয়াছেন।"

এই জাতীয় ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার আরও দু'একটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি:—

গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম যে টেবিলের উপর 'একখানি চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে'।

'আমি সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া' এই কথা বলিতেছি।

* কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ব্যক্তিবাচক না হইলে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে নাও হইতে পারে, যথা:—উদার প্রকৃতি

রজনীনাথ 'আপনার সময়ে' উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।—পোষ্যপুত্র।

যখন হাস্যরস উদ্রেকের জন্য এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয় তখন অবশ্য তাহা দূষণীয় বলা যাইতে পারেনা (যদিও সকলের তাহা বোধগম্য না হইতে পারে)। যথা—তিনি চীৎকার করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিলেন, 'অন্য স্থানে আপনারা ঢালের অন্য দিক দেখিবেন।' (নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন', প্রথম ভাগ, ১৪৯ পৃঃ)! নটরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার কোন কোন প্রহসনে এরূপ ভাষার সাহায্যে যথেষ্ট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রবন্ধান্তরে আধুনিক নব্য সাহিত্যিকগণের বিচিত্র রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

স্বরলিপি।

—:*:—

ইমন ভূপালী (?)—তেওরা।

বাদল এল উদল গায়ে
আজি বরিষায়
নূপুর ধ্বনি বাজল যেন কাহার পায়ে পায়।
নিঝুম্ দিবা নীরব রাতি
নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের ভাতি—
এই যে এল এলোকেশে
আজি এ ধরায়
পথিক হেন আসে ধীরে সজল চোখে চায়

গান ও সুর—শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত। স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

II র্সা র্সা । | না- ধা | ধা- পা I পধা পা -া | ক্ষা- গা | গা- রা I রগা গা রা |
বা দল্ • এ • • ল • উ দল্ • গা • য়ে • আ জি •

| রা- না | না- রা I সা -া -া | -া -া | । । I সা রা -া | গা -া | গা -া
ব • রি • ষা • • • • য় • নূ পুর • ধ্ব • নি •

I গা -া গা | গা- রা | গা -া I গা গা -রা | গা- রা | গা র্সা I র্সা -া -া |
বা জ ল যে • ন • কা হা র্ পা • য়ে • পা • •

-া -া | -া -া II
• •

I {সা সা –া | সা –া | সা– না I ধনা না না | ধা –া | পা –া I সা সা সা
নিঃ ঝু / ম্ দি • বা • নী র ব রা • তি • নি বি ড়ে

রা –গা | গা –া I গা গা গা | গা –া | গা –া} I I{ গপা– পা–া | পা– ক্ষা
দি • য়ে • চাঁ দে র ভা • তি • এই• যে এ •

| পা– ক্ষা I ক্ষধা পা–া | ক্ষা –গা | গা –া I পনা না –া | ধা –া | পা –া
ল • এ লো • কে • শে • আ রি • এ • ধ •

I মগা –া –রা | –সা –া | (পা –া)I} –া –া I সা রা –া | গা –া | গা –া
রা • • • • (• য়) • য় প থি ক • হে • ন

I গা গা -রা | গা রা | গা –া I গা গা -রা | গা -রা | গা -া | গসা -া -া | -া -া | -া -া II
আ সে • ধী • রে • স জ ল্ চো • খে • চা • • • • য় •

সম্মিলনের যাত্রীর ডায়রী।

এবার বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে রাত্রিতে খাইবার সময় একটা ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল তাই বৈশাখে সম্মিলনে যাইব কিনা ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। অভ্যর্থনা সমিতির সাহিত্য-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ বসু মহাশয়ের আহ্বানে প্রথমে কোন প্রবন্ধ দিতে স্বীকৃত হই নাই কারণ সম্মিলনে দুইবার প্রবন্ধ দিয়া দেখিয়াছি বক্তব্য বিষয়ের কিছুই পড়া হয় না অথচ সভাপতি মহাশয়ের ঘণ্টা পড়ে। শেষে গিরিজাবাবুর অনুরোধে প্রবন্ধও লিখিলাম এবং বাঁকীপুর সুহৃদ্ পরিষদের বহু ব্যক্তি প্রতিনিধিরূপে নাম ছাপাইলেও কেহই যাইতেছে না দেখিয়া আমি আমার জন্মবারে (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে দশটার ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীতে রওনা হইলাম। মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল—ভাবিতেছিলাম কোনরূপে হাওড়ায় উপস্থিত হইলেই বাঁচি। সমস্ত রাস্তা ট্রেণের বাহিরে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বসিয়াছিলাম। কেবল রাত্রিতে খানিকক্ষণের জন্য ঝোলান বিছানার একটু শুইয়া ছিলাম।

১ম ও ২য় সম্মিলনের কথা জানিতাম না বা নিমন্ত্রণ পাই নাই, ৩য় সম্মিলনে যাইতে ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের বর্দ্ধমানের স্কুলে ৺সরস্বতী পূজার জন্য যাইতে পারি নাই। ৪র্থ সম্মিলনের স্থান দূর বলিয়া যাই নাই। তৎপরে পঞ্চম সম্মিলন হইতেই আমি সম্মিলনের রীতিমত যাত্রী, তবে ঢাকায় যাইবার খুব ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাচক্রে যাইতে

পারি নাই। এক চুঁচুড়া সম্মিলন ভিন্ন অন্য সমস্ত সম্মিলনে যোগদানের ফলে অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিতে হইয়াছিল। যে যে সম্মিলনে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছি সেইখানেই "অর্দ্ধচন্দ্র"কে নীরবে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে, তথাপি সম্মিলনে যোগদান করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু এবার আমার ভাল করিয়া সাধ মিটিয়াছে—দোষ কাহারও নহে, আমার কর্ম্মফলেই এরূপ ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখি "যাইতেছি।" পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্র পাইয়া লিখি "শুক্রবার প্রাতঃকালে ১৮ ডাউন ট্রেণে ৫টা ৫৭ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইব। যদি এদিন প্রতিনিধিদের আহারের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া সংবাদ দিলে আমি কলিকাতায় যাইব।" এই পত্রের সঙ্গে আমার ২য় প্রবন্ধ পাঠাই। ষ্টেশনে গিয়া দেখি কোন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত নাই। পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি গিরিজাবাবুকে লাহিড়ী মহাশয় কোন প্রবন্ধও দেন নাই।

বিছানার বাণ্ডিলটি বগলদাবা করিয়া ব্যাগটি হাতে লইয়া একটু ভাবিলাম কি করি, কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম হাওড়া ষ্টেশনের উত্তর দিকে তেতালা বাড়ীতে প্রতিনিধিদের থাকিবার স্থান হইয়াছে। সেই বাড়ীটাতে কোন মাড়োয়ারীর নাম লেখা দেখিয়া আমি ভাবিতাম এটা ধর্ম্মশালা। তাই খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া যখন দেখিলাম কোন স্বেচ্ছাসেবক আসিল না তখন একজন কুলিকে বলিলাম—আমাকে ধরমশালায় নিয়ে চল। সে যখন উত্তর দিকের তেতালার বাড়ী ছাড়াইয়া চলিল তখন জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেটা ধরমশালা নয়। তৎপরে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম তেতালার উপরের ঘর সভার জন্য লওয়া হইয়াছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া তেতালার ঘরগুলির দিকে চাহিয়া দেখি, সেগুলি জনমানব শূন্য। তখন ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গেলাম। সেখানে একটি ঘর খুলিয়া দিলে জিনিষগুলি রাখিয়া দিয়া যখন ঘরের চাবি চাহিলাম, তখন চাবিওয়ালা বলিল, "এক চাবিতে অনেক তালা খোলে সুতরাং এ চাবি আপনাকে দিতে পারি না। আপনার নিজের তালা চাবি বাহির করুন।" আমার ধর্ম্মশালার সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানে থাকিতে হইবে জানিলে তালা লইয়া যাইতাম। কি করি, শেষে বিছানা দরোয়ানের ঘরে রাখিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া হাওড়ার ময়দান খুঁজিতে চলিলাম। হাওড়া ষ্টেশনের যে ওভারব্রিজের উপর দিয়া ট্রামলাইন গিয়াছে তাহার উপরে একটু গিয়া ছয় জন স্বেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ পাইলাম। আমি বাঁকীপুর হইতে আগত প্রতিনিধি, এ কথা জানাইলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাকে হাওড়া ময়দানের পথ দেখাইয়া দিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন। আমি ময়দানে গিয়া মণ্ডপের বাহিরে জনকয়েক বালক ও যুবককে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে জনৈক বালক আমাকে সঙ্গে করিয়া মণ্ডপের মধ্যে একস্থানে বসাইয়া কোন কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিল। আমি ঘরটির একদিকে দেখি স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি নানারূপ উপদেশ দিয়া হুকুম জারি করা হইয়াছে যথা "যে সকল স্বেচ্ছাসেবক হাজিরা লইবার সময় বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকিবে, তাহাদের নাম স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে।" অন্য এক স্থানে দেখি অনুপস্থিতির জন্য ১৩৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহির হইয়া দেখি মধ্যে প্রকাণ্ড মণ্ডপে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা খাটান হইয়াছে, মণ্ডপের একধারে ষ্টেজের মত বিস্তীর্ণ মঞ্চ। মণ্ডপ নানারকম রঙ্গবেরঙ্গের কাপড় দিয়া সাজান হইতেছে। চারিদিকে সারি সারি করিয়া হোগলার চালায় প্রদর্শনীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ। কোন কোন কক্ষে প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তখনও অধিকাংশ কক্ষ শূন্য।

একটু পরে স্বেচ্ছাসেবক বালকটি আসিয়া আমাকে একখানি ঘোড় গাড়ীতে বসাইয়া ধর্ম্মশালায় চলিল। সেখান হইতে আমার বিছানা লইয়া বাঁটরা স্কুলে উপস্থিত হইল। স্কুলের অধিকাংশ ঘর নূতন হইয়াছে, গৃহটি দোতালা। প্রতিনিধিদের বাসের জন্য বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাইবামাত্র "চা" দিবার আজ্ঞা হইলে আমি সবিনয়ে জানাইলাম "ও বস্তুটা আমি খাই না।" আমার সঙ্গে একটা কুজো ছিল। জল আনাইয়া হুঁকায় পুরিয়া তামাক সাজিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম। তখন বাসাটিতে আমি একমাত্র প্রতিনিধি। খানিকক্ষণ পরে মেদিনীপুরের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলেন। তিনিও ষ্টেশনে কোন স্বেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ না পাইয়া কিছু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন বেলা ৯টার সময় ভাত খাইয়াছিলাম, রাস্তায় তেমন খিদে পায় নাই, সামান্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়া দিবসের অবশিষ্ট ভাগ কাটাইয়াছি. সুতরাং ক্ষুধার তাড়না যখন অসহ্য হইল তখন লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই জলখাবার চাহিলাম। আধ ঘণ্টা পরে ৪টি রসগোল্লা ও ৪টি সন্দেশ আসিল। চট্‌পট্ করিয়া সেগুলি উদরসাৎ করিলাম। তৎপরে স্নানের যোগাড় করিতেছি, গায়ের কাপড়চোপড় খুলিয়া বসিয়া আছি। ডাক্তারবাবু আসিলেন। হঠাৎ শরীরের দিকে তাকাইয়া দেখি পেটে একটা ছোট ফোস্কা। মনে পড়িল রাত্রিতে মাথায় একটি ও গোঁফে একটি বায়ের মতন হইয়াছে। ডাক্তারবাবুকে সেগুলি দেখাইলাম। আমার গায়ে হাতে ব্যথা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম. সে সব কিছু নাই। বৈকালে আবার দেখিব বলিয়া ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে মেদিনীপুর হইতে ৬।৭ জন প্রতিনিধি আসিলেন। কেবলমাত্র পূর্ব্বদিন বাসার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আহারে কিঞ্চিত বিলম্ব হইল কিন্তু উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিনিধিদের আহারের ভার লইয়াছিলেন সুতরাং কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। যে কয়দিন প্রতিনিধিরা ছিলেন, দুইবেলা চা, জলখাবার, দিনে ভাত, রাত্রে লুচি, তামাক, সিগারেট, চুরুট, পান এবং চাকর ও স্বেচ্ছা সেবকদের সেবা প্রতিনিধিরা যথারীতি পাইয়া ছিলেন। শুনিলাম বাঁটরায় একটি অনাথবন্ধু সমিতি আছে তাহাতে বহু অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য করা হয়। এখানকার স্বেচ্ছাসেবকগণ অধিকাংশই সেই সমিতির জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের জংসন ষ্টেসন কদমতলা বাঁটরা স্কুল হইতে অতি নিকটে; চারিটার সময় দেশপূজ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রদর্শনী খুলিবেন বলিয়া আমরা কয়জন প্রতিনিধি ট্রেণে কদমতলা হইতে হাওড়ার ময়দান ষ্টেশনে আসিলাম। যথাসময়ে বক্তৃতার পরে প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইল। একটি ক্ষুদ্র জিনিষের প্রতি আমার দৃষ্টি গেল। ফরিদপুর জেলা হইতে আগত জনৈক মুসলমান-শিল্পী দুই প্রকারের নিব আনিয়াছিল। পিতলের নিবগুলিতে বেশ সরু লেখা হয়, বিলাতী 'জি' (G) নিবের মতন এবং ষ্টিলের নিব 'জে' (J) নিবের মতন। আমি নয় পয়সা দিয়া এক ডজন পিতলের নিব কিনিলাম। সেই নিবে আমি কয়েক দিন হইতে চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি লিখিতেছি, সুন্দর লেখা হইতেছে। "রেড ইঙ্ক" নিবের মত নরম নয়, বেশ কঠিন, সহজে খারাপ হয় বলিয়া মনে হয় না। শিল্পী বলিল "আমি যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে আমার যাতায়াত ও আহার বাবত যে খরচ হইবে তাহা নিব বিক্রয় করিয়া পাইব না। আমি কাল থাকিব না, কলিকাতায় দোকানদারদের নিকট আমার জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিব।" আমি বলিলাম "কাল বহুলোকের সমাগম হইবে, কাল থাকিলে জিনিষের প্রচার হইবে।" কিন্তু পরদিন দেখি শিল্পীর কক্ষ শূন্য।

প্রদর্শনী দেখিয়া কলিকাতা গেলাম। মানসী-কার্য্যালয়ে একবার দর্শন দিয়া প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া রাত্রি প্রায় ১০টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মেদিনীপুরের প্রতিনিধিগণকে পরিষদের শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের অভিনয় দেখিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য বাসায় আসিয়া দেখিলাম আরও কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়াছেন। শরীরটা বড় ক্লান্ত বলিয়া কাহারও সহিত তেমন আলাপ করিলাম না। আহারান্তে শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি কফ উঠিতে লাগিল, মাথা ভার বোধ হইতে লাগিল, ভাবিলাম বৈদ্যুতিক পাখার নীচে শুইয়া আছি বলিয়াই এরূপ হইতেছে।

সকালে আরও কয়েকজন প্রতিনিধি আসিলেন। সকলকে চা দেওয়া হইতে লাগিল, আমার গলাটাতে কেমন ব্যথা বোধ হইতে লাগিল বলিয়া আমি একটু গরম দুধ চাহিলাম। সম্ভবতঃ জমাটদুগ্ধ দিয়া চা তৈরি হইয়েছিল, তাই দুধ চাহিলে বাজারে দুধ কিনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। পাঁচ আনা সের দরে খাঁটিদুগ্ধ আসিল। আমাকে একটা কাপে করিয়া দুধ দেওয়া হইয়াছে, আমি খাইতেছি; অপর একজন প্রতিনিধিকে অবশিষ্ট দুধ, চিনি সংযোগে দেওয়া হইল। জনৈক ভদ্রলোক আমার দুধ সুস্বাদু করিবার জন্য সেই চিনি মিশ্রিত দুধ কিঞ্চিৎ আমার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। খাইয়া দেখি তাহা চিনি নহে, লবণ। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া পল্লী দেখিতে বাহির হইলাম। শ্রীঅসিপদ (বানানটা ঠিক জানিনা) মল্লিক নামক জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক আমাদের নেতা হইলেন। নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা বামাচরণ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইনি জনৈক সম্পত্তিপন্ন ব্যবসায়ী। অসিবাবু বলিলেন “এই বাড়ীতে আপনাদের জন্য অপেরার গান হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শুনিতে আসিবেন।” আমি বহুদিন অপেরার গান শুনি নাই বলিয়া আমার একান্ত ইচ্ছা হইল গান শুনিতেই হইবে। আমার অদৃষ্টবিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসিলেন।

বাসায় ফিরিয়া দেখি আরও অনেকগুলি প্রতিনিধি আসিয়াছেন তন্মধ্যে আমার পরিচিতও কয়েকজন আছেন। পূর্ব্বদিন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় সাহিত্য শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়ের সহিত আলাপে বুঝিয়াছিলাম আমার প্রথম প্রবন্ধ “অতীতে ল” পাইয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধ “বাঙ্গলার বাচান্তর” পান নাই। সেটী সাধারণ সম্পাদক লাহিড়ী মহাশয়ের নামে পাঠাই। সেই প্রবন্ধের সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়া ছিলাম আমি কোন্ ট্রেণে হাওড়ায় পৌছিব। প্রবন্ধও পৌছে নাই, স্বেচ্ছাসেবকও পৌছে নাই। যাহা হউক গিরিজা বাবু আমাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় প্রবন্ধ চাহিয়া ছিলেন কিন্তু আমি রাত্রি দশটায় ফিরিব বলিয়া প্রবন্ধ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে গিরিজা বাবুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বলিলেন “ব্যাটরা হইতে শিবপুরে গিয়া গিরিজা বাবুর বাসা চেনা আপনার পক্ষে দুষ্কর হইবে।” কাজেই নিরস্ত হইতে হইল। তাই তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আমি একাই সাড়ে দশটার ট্রেণে কদমতলা হইতে মণ্ডপে আসিয়া গিরিজা বাবুকে প্রবন্ধ দিলাম ও বলিলাম “এ-প্রবন্ধ আমি পড়িতে চাই না কেবল পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে।” তিনি প্রবন্ধটি পকেটস্থ করিলেন। পরে তিনি প্রবন্ধের নাম লিখিয়া লইলে “ইহার নকল রাখি নাই আপনাকে নকল করিয়া দিব” বলিয়া প্রবন্ধটি ফিরিয়া লই।

যথাসময়ে কন্‌সার্ট বাদ্য ও দুইটি গানের পরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থন হইলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। আমার মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার যখন অভ্যর্থনা-সমিতিরই

আছে তখন সাধারণ সভায় আবার প্রস্তাব সমর্থনের প্রয়োজন কি? যদি সাধারণ সভায় সভাপতির নিয়োগ সম্বন্ধে এক দল আপত্তি করে তাহা হইলে উপায় কি? যাহা হউক সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে যথারীতি কবিতার স্রোত বহিল। সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইল ইত্যাদি। তৎপরে সাহিত্য-শাখার অধিবেশন আরম্ভ হইল। ইহাতেও কিছুক্ষণ কবিতার স্রোত বহিয়াছিল, তৎপর প্রথম প্রবন্ধ---বাঙ্গলা দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের বর্ণনা—ইহা অর্থনীতির প্রবন্ধ, ইতিহাস শাখায় গেলেই ভাল হইত বলিয়া বোধ হইল। বোধহয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় প্রবন্ধ "রায় বাঘিনী" উপন্যাসের বিজ্ঞাপন রূপে ভূমিকা। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকি মহাশয় ইহাকে ইতিহাস শাখার প্রবন্ধ বলিয়া পাঠ স্থগিত রাখিতে প্রস্তাব করিলে সভাপতি মহাশয় জীবনীরূপে ইহাকে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠক বা লেখক মহাশয় এইরূপ দুইটি প্রবন্ধ পড়িলেন। বোধহয় পঞ্চম প্রবন্ধ আমার "অতীতে ল"। আমি প্রবন্ধটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছিলাম। তাহার উপর আবার পার্শ্বে লাল কালীর দাগ দিয়া আরও সংক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সারটুকু পড়িলাম। আশা ছিল কিছু আলোচনা হইবে। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে বলিয়া আলোচনা দূরে থাক্, সমস্তটাও পড়া হইল না। যখন প্রবন্ধ পাঠ করি তখন আমার জ্বরভাব হইয়াছে। আমি প্রবন্ধ পাঠের পরে কলিকাতায় মানসী ও প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে ঘুরিয়া [illegible] প্রায় ৫টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। তখন শরীর আর চলে না, আমি জনৈক প্রতিনিধির সহিত বহুকষ্টে একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন চলিবে বলিয়া মণ্ডপেই প্রতিনিধিগণের জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। আমি সেইখানেই জলযোগ করিয়াছিলাম।

কলিকাতার সম্মিলনে প্রথম শাখা বিভাগ করিয়া এক সময়ে চারি শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। মফস্বলের অধিকাংশ সভ্যের সহিত আমি ইহার বিরুদ্ধে ছিলাম। বর্দ্ধমান সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্তের উপদেশমত বাঁকিপুর অভ্যর্থনা সমিতি চারি শাখার গোটাকতক বাছা প্রবন্ধ সভায় পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ সভাপতি এক দিনের অধিক থাকিতে পারিবেন না বলায় সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। বহুদিন ধরিয়া চারি দিক হইতে এক সময়ে চারি শাখার অধিবেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি শোনা যাইতেছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবিধান হয় নাই। তাই এবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে শুনিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়াছিলাম কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমার সব আশায় ছাই পড়িল।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার আন্দাজ দুই ঘণ্টা পরে বাসার প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকি, মৌলবী মহম্মদ কে চাঁদ প্রভৃতি মুসলমান সাহিত্যসেবী, পরিষদের রামকমল বাবু, নলিনী-বাবু প্রভৃতি কয়েক জন সাহিত্যসেবী বিদেশাগত প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি রাত্রি কালে শরীর অসুস্থ বলিয়া, রুটি খাইলাম, অন্য সকলের জন্য লুচি হইল। সন্ধ্যাকালে দুই তিন বার ডাক্তার বাবুকে সন্ধান করিলাম। স্বেচ্ছাসেবকেরা উত্তর দিলেন "ডাক্তারবাবু আসিতেছেন।" কিন্তু ডাক্তারবাবুর দর্শন পাওয়া গেল না। তবুও একে জ্বরের মত বোধ হইতেছে আবার পেটে একটা ফোটকের মত। সন্দেহ হইল হয়ত পাণিবসন্ত হইয়াছে। তাই যে ঢালা বিছানায় আমার বিছানা পাতা ছিল সেখান হইতে সরিয়া আমি পার্শ্বের একটা ঘরে আমার বিছানা লইয়া গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রিকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম বেশ জ্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কফ উঠিতে লাগিল, গলায় ব্যথা বোধ হইল। তখন আর সন্দেহমাত্র রহিল না যে, আমার পাণিবসন্ত হইয়াছে। যদি সন্ধ্যাকালে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া একথা বলিতেন, তাহা হইলে রাত্রি দশটার ট্রেণে বাঁকীপুর চলিয়া আসিতাম।

সকালে (রবিবার ২০শে এপ্রিল) উঠিয়া দেখি মুখে হাতে গলায় পেটে এককথায় শরীরের সর্ব্বস্থানে পানি-বসন্ত বাহির হইয়াছে। তখন হইতে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন "আপনি রেলে চড়িয়া বাঁকীপুর যান।" আমি উত্তর দিলাম "যাহা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ তাহা করিতে মনও সরে না, বিপদও অনেক। যদি হাওড়া ষ্টেসনে ধরিতে নাও পারে, তথাপি রাস্তায় কোন ষ্টেসনে ধরিয়া আমাকে নামাইয়া দিলে আমি কি বিপদে পড়িব! তদ্ভিন্ন আমার সংস্পর্শে অন্য আরোহীরও বসন্ত হইবার আশঙ্কা।" একবার মনে হইল আমার বর্দ্ধমানের বাসায় যাই। সেখানে বন্ধুবান্ধব তেমন না থাকিলেও বাসায় পড়িয়া থাকিব, পাড়ার লোকে দয়া করিয়া পথ্য রাঁধিয়া দিতেও পারে। কিন্তু আবার মনে হইল, পাড়ার লোকে ভীতও হইতে পারে এবং আমার যাইবার পরে যদি কাহারও পাণিবসন্ত হয় তখন আমাকে পথ্যের পরিবর্ত্তে অভিশাপ দিবে। যখন ভগবান আমাকে সংসার পথে নিঃসঙ্গ পথিক করিয়া তুলিলেন তখন ভাবিয়াছিলাম ভালই হইল বিধাতা "মোরে লিখি দিল, বিশ্ব নিখিল, দুবিঘার পরিবর্ত্তে।" কিন্তু আজ দেখিতেছি আমার মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই এবং লুকোচুরি খেলায় চোর ধরার মত আমি যাহাকে আপনার করিতে গিয়াছি সেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক আমার মত লোকের জন্যই ত ইংরাজরাজ নগরে নগরে হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন, তবে আর ভাবনা কিসের? যদিও হাঁসপাতালের নামে হৃৎকম্প হইতেছিল, তথাপি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের বলিলাম "দেখুন রেলে আমার যাওয়া হইবে না। হয় কাহারও বাড়ীর দূরস্থিত পৃথক কক্ষে রাখিবার ব্যবস্থা করুন, এক টুখানি জল-টল দেবেন, পড়িয়া থাকিব, নয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

এই দিন সকালে বড় তর্ক উঠিল। জনৈক প্রতিনিধি বলিলেন "আমি প্রায় সকল সম্মিলনে গিয়াছি কোথাও আমাকে ফি দিতে হয় নাই, কোথাও কেহ ফি চাহেন নাই। আমি জানিতাম না সুতরাং টাকাও সঙ্গে লইয়া যাই নাই! দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি তাহার একখানিতে ফি'র কথার উল্লেখ নাই, অপরখানিতে আছে বটে কিন্তু তাহা হইতে এমন বুঝি নাই যে, টাকা না দিলে প্রবেশ করিতে পাইব না। আমি স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া টাকা ধার করিয়া প্রবেশাধিকার পাইয়াছি। ইহার কিছু বিহিত করা হউক।" বাসায় প্রতিনিধিদের সভা বসিল, দুর্গাদাস দাদা (মুর্সিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মির্জাপুরের প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীদুর্গাদাস রায়) সভাপতি হইলেন। প্রস্তাব হইল "যাঁহারা প্রতিনিধির ফি দিবেন না, তাহাদিগকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক এবং ভোটের অধিকার দেওয়া হউক। যাঁহারা ফি দিবেন, তাঁহারা রিপোর্ট পাইবেন।" আমি প্রথমে পৃথক কক্ষ হইতে সভাগৃহে মুখ বাড়াইয়া বলিলাম, বর্দ্ধমানে ফি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং যশোহরে প্রথম ফি আদায় করা হয়। সেখানে আমার উপর ফি আদায়ের ভার পড়িয়াছিল। মোট ৭৫ জন ফি দিয়াছিলেন। যাঁহারা দেন নাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিনিধিরূপে আসি নাই, নিমন্ত্রিতরূপে আসিয়াছি। কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,এ, মহাশয় বলিয়াছিলেন "সাহিত্য পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই অন্যান্য সভার সদস্যের ন্যায় প্রতিনিধি সুতরা তাঁহারা ফি দিতে বাধ্য।' যাঁহারা কোন সভাসমিতির সদস্য নহেন অথচ সাহিত্যসেবী অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা ফি দিবেন না। যাঁহারা ফি দিবেন তাঁহারা কেবল রিপোর্ট পাইবার অধিকারী হইলে ফি দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না।" অন্যান্য ২।৪ জন প্রতিনিধির বক্তৃতার পরে ভোট গ্রহণ করা হইলে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এইখানে একটা কথা বলি। কাশিমবাজার, রাজসাহী ও ভাগলপুরে সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, যে সকল প্রতিনিধি এই সকল সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন, কার্য্যবিবরণ পাইবার জন্য স্বতঃই তাঁহাদের একটা আগ্রহ

কিন্তু কোথায়ও কি করিলে যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তজ্জন্য চট্টগ্রাম সম্মিলনে দুই এক জন প্রতিনিধি বলেন "যদি কার্য্যবিবরণের মূল্য স্থির হয় আমরা মূল্য দিয়া কিনিতেপারি।" ময়মনসিংহ, চুঁচুড়া চট্টগ্রাম ও কলিকাতা সম্মিনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সভাপতিদের সম্ভাষণ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য বর্দ্ধমান সম্মিলনে আবার সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ ছাপাইয়া মূল্য নির্দ্ধারণের কথা উঠে। সম্মিলন পরিচালনসমিতি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, এবার একটা প্রস্তাব করা যাইবে, প্রতিনিধিদের ২৲ টাকা করিয়া ফি হউক। সংগৃহীত অর্থে সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ ছাপাইবার সাহায্য হইবে. যাঁহারা ফি দিবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে পাইবেন, অপরে ২ দিয়া ক্রয় করিবেন। এই প্রস্তাব বর্দ্ধমানসম্মিলনে গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতিও তৎ-প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের বলেন "এবার আমরা সম্পূর্ণ কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিব ও কিছু মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।" তখন সকলেই ক্রয় করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানসম্মিলনের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। মোট হাজার পৃষ্ঠার উপর, ৩৫ খানি হাপটোন ছবি আছে, দুই তিন খানি মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ মূল্য মাত্র ২৲ টাকা। যশোহর-সম্মিলনে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে পাঁচ ছয়খানি মাত্র বিক্রীত হয়। ইহার পরে আর দুই চারিখানি বিক্রীত হইয়া থাকিবে। যশোহরে ফি হইতে ১৫০ টাকা আদায় হয় কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে। খুব সম্ভব নগদ বিক্রয় একখানিও হয় নাই। বাঁকীপুরে ১৯০৲ টাকা ফি হইতে আদায় হয়। কার্য্যবিবরণে একটী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় নাই। সভাপতিদের অভিভাষণ ও কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। শুনিয়াছি মুদ্রণ ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় ৪০০৲ টাকা। প্রত্যেক কার্য্যবিবরণ ডাকে পাঠাইতে আরও ৵০ ডাক ব্যয় পড়িয়াছে। ঢাকায় ফি গ্রহণ করা হয় নাই, কার্য্যবিবরণও মুদ্রিত হয় নাই। হইলেও অভ্যর্থনা সমিতির ক্ষতি হইত। গল্প উপন্যাস না থাকিলে বাঙ্গলা দেশে কোন পুস্তকের বেশী কাটতি হইবে, বাঙ্গলার এমন অবস্থা এখনও হয় নাই।

অথচ সম্মিলনের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া অনেকেই সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেছেন না। সম্মিলনের প্রধান ব্যয় পাঁচ প্রকারে হয়—(১) মণ্ডপ (২) প্রতিনিধিদের আহার ব্যয় (৩) চিঠিপত্র ছাপান (৪) ডাক ব্যয় (৫) প্রতিনিধিদের যানবাহন। ডাক ব্যয় ও মুদ্রণ ব্যয় কমাইবার প্রস্তাব একবার বাঁকীপুর সম্মিলনের আন্দাজ দুই মাস পূর্ব্বে আমি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিকট করি; বর্দ্ধমান সম্মিলনের অনেক কাজ আমি স্বয়ং করিয়া দেখি যে, পরিষদের ২৫০০ সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিতে মুদ্রণ ও ডাক ব্যয় অনেক পড়ে। বর্দ্ধমান হইতে মোট ৩০০০ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়। যশোহরে খামের পরিবর্ত্তে পোষ্টকার্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক ডাকব্যয় কমাইয়া ফেলা হয়। আমি বলি "পরিষদের সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিবার নিয়ম না থাকিলেও পরিষদ্, সম্মিলন পরিচালন সমিতির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন বলিয়া আমি সে দাবী মানিয়া লইতেছি। কিন্তু প্রত্যেককে পৃথক্ নিমন্ত্রণ না করিয়া অন্যরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে। কোন বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ীর কর্ত্তাকেই বলা হয়, তিনি সকলকে সংবাদ দেন। যাহার ইচ্ছা সে যায়। সেইরূপ অভ্যর্থনা সমিতি পরিষদের সম্পাদককে বলিবেন, সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল। পরিষদের সম্পাদক কোন মাসিক অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্রে অভ্যর্থনা সমিতির নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—পরিষদের কোন্ কোন্ সদস্য সম্মিলনে প্রতিনিধি হইতে চাহেন। যাঁহারা নাম পাঠাইবেন, অভ্যর্থনা সমিতি কেবল তাঁহাদেরই সম্মিলনসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রযোগে জানাইবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে তিন হাজার স্থলে সাত আট শত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপান ও তাহার ডাকব্যয় হইতে অভ্যর্থনা সমিতি নিস্তার পাইবেন। আমার এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এবার সম্মিলন পরিচালন সমিতির নিকট অন্য এক প্রস্তাব করিয়া পাঠাই। অভ্যর্থনা সমিতিকে সাহায্য করিবার অন্য এক উপায় আছে। প্রতিনিধিরা অনেকেই ফি দিতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেস ও কনফারেন্সে প্রতিনিধিদের প্রায় সর্ব্বত্র আহার ব্যয় দিতে হয়। চট্টগ্রামে সাহিত্যসম্মিলনে প্রতিনিধিদের ১৲ টাকা করিয়া আহার ব্যয় স্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে যোগদানকালে যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের আহার ব্যয় ২৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। এ প্রস্তাব সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয় কিন্তু সম্মিলনে গৃহীত হয় নাই। আমি স্বয়ং যাইতে পারিব না বলিয়া শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্ধীকী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম "একটা দৃষ্টান্ত দিবেন। হিন্দুর বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে আত্মীয় স্বজনে লৌকিকতা দিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে সাহায্য করেন। ইহা হইতে মিউচুয়াল ফ্যামিলিফণ্ড প্রভৃতির জন্ম হইয়াছে।" কিন্তু কি হইয়াছিল ঠিক জানি না। অবশ্য ২৲ টাকা ব্যয়েই অভ্যর্থনা সমিতি নিস্তার পাইতেন না, আরও কিছু খরচ করিতে হইত।

যাক এবার নিজের কথা বলি যে সকল স্থানীয় ব্যক্তি প্রতিনিধিদের আপ্যায়িত করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যাঁটোরার প্রশংসা করিয়া বলিতেন "এখানে আমাদের একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় একটা বালিকা বিদ্যালয় ও একটি অনাথবন্ধু সমিতি আছে।" রবিবার দিন সকালে উঠিয়াই আমি সেই ভদ্রলোকের খোজ করিলাম। বহু চেষ্টার পরে অপরাহ্নে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আমার নিবেদন জানাইলাম যে, আমাকে একটা পৃথক স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু আমার ন্যায় অনাথের অদৃষ্টদোষে অনাথবন্ধু সমিতিও কৃপাদানে কৃপণতা করিলেন। হেতমপুরের অধ্যাপক অনিলবরণ বাবু অভ্যর্থনা সমিতির বহু সদস্য এবং জনৈক ধনীব্যক্তির পুত্রকে (নাম করিবার প্রয়োজন দেখি না) বলিয়াছিলেন "তাহত শেষে ভদ্র লোককে হাঁসপাতালে যাইতে হইবে। ইহাতে অভ্যর্থনা সমিতির কি কলঙ্ক হইবে না?" তখন যেটা সোজা উত্তর তাঁহারা তাহাই দিলেন কেন, তিনি ত বাঁকাপুর যাইবেন?" অনিলবাবু শেষে কখন একবার আমায় বলিয়া দিলেন "না, সে কি পারে মশায়? আপনাকে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে।" এই রবিবার দিনই একজন বলিয়া উঠিলেন "এটা একটা পাবলিক ইনষ্টিটুশন। বুজতেইত পার্চ্চেন।" ভাবিলাম, আজ বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া এ জ্ঞানটুকুও লোকে আমায় দিতে আসিতেছে।

যাহা হউক সোমবার সকাল হইতেই আমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার জোগাড় চলিতে লাগিল। ব্যাঁটরা হাঁসপাতালের ডাক্তার আসিয়া শালকে হাঁসপাতালের ডাক্তারের উপর এক চিঠি দিলেন। আমার গলার ভিতর আজ বড় ব্যথা। আমি খয়ের আনাইয়া মধ্যে মধ্যে একটু করিয়া খাইতে লাগিলাম। তিন খানি পত্র লেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। পরদিন পাটনার সেসন কোর্টে জুরিতে ডাক পড়িয়াছে। সুতরাং সেসন জজকে একখানি, টি কে ঘোষের একাডেমির প্রধান শিক্ষককে একখানি এবং আমার পালিত পুত্রকে একখানি পত্র লিখিতে বলিলাম। যিনি সেসন জজকে পত্র লিখিবার ভার লইলেন তিনি আমাকে একটা উপরি নিমন্ত্রণ করিলেন "আরোগ্যলাভ করিলে একদিন এখানে থাকিয়া যাইবেন।" এরূপ নিমন্ত্রণ পাইয়া আমার মানসিক বা শারীরিক কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি দ্বিতীয় পত্রখানি দেওয়া হয় নাই। বিছানাটা স্বয়ংই বাঁধিয়া ফেলিলাম, আর সঙ্গে একটি ব্যাগ। বেলা প্রায় ১০টা, গাড়ী প্রস্তুত দেখিতে পাইলাম। রাত্রিতে দুধ ভিন্ন কিছু খাই নাই, খিদের পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, হাঁসপাতালে গেলেই কিছু আমার জন্য পথ্য লইয়া বসিয়া থাকিবে না। সুতরাং যখন দেখিলাম আমার

খাইবার কথা কেহই কিছু বলিতেছে না, আমার কোনরূপে বিদায় করিবার জন্যই ব্যস্ত তখন লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম "আমায় গোটা চারেক সন্দেশ আনিয়া দেন।" জনৈক স্বেচ্ছাসেবক সন্দেশের উপরে ৪টা রসগোল্লা পর্য্যন্ত আনিয়া দেন।" গলায় ব্যথা, তবুও মাঝে মাঝে জল খাইয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। দুই জন যুবক আমার সঙ্গে গাড়ীতেই বসিলেন। গাড়ী হাঁসপাতাল অভিমুখে চলিল।

যাঁহারা আমার সঙ্গী হইলেন তাঁহারা হাঁসপাতালটা কোথায় ঠিক জানিতেন না। বহু অনুসন্ধানে হাঁসপাতাল আবিষ্কৃত হইল কিন্তু ঠাঁই নাই। তখন সঙ্গীদ্বয় একবার বলিলেন "ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে যাই।" আবার বলিলেন "না প্যাণ্ডালেই যাই, নতুবা লাহিড়ী মহাশয় বলিতে পারেন, কেন আমাকে না জানাইয়া ক্যাম্বেলে গেলে।" সুতরাং গাড়ী মণ্ডপে গেল। তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। আমি রাস্তায় গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলাম। খানিক পরে একটা কথা মনে হইল "যদি কাহাকেও দিয়া জানাইতে পারি যে, আমি একজন প্রতিনিধি এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি তাহা হইলে সম্মিলনে আগত হাওড়া ও কলিকাতার বড় বড় লোকের মধ্যেও এমন দয়ালু কেহ থাকিতে পারেন। যিনি আমাকে হাঁসপাতাল যাওয়া স্থগিত করিয়া পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন।" তখন আমি জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে বলিলাম মঞ্চের উপরে সবুজপত্র আপিসের পবিত্রকুমার গাঙ্গুলী রিপোর্ট লেখকের পাশে বসিয়া আছে তাহাকে ডাকিয়া দেন।" আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, স্বেচ্ছাসেবকের দেখা নাই। এটা বোধহয় ভালই হইয়াছিল। নতুবা আমার আবেদনের ফলে যদি বিফলমনোরথ হইতাম তাহা হইলে কলিকাতাবাসীদের সম্বন্ধে যে একটা মহত্বের ধারণা আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইত। তার পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি এক বিষয়ে বিদ্যাপতি মস্ত মূর্খ ছিলেন। তিনি বলেন "সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ত, কো দূর করব পিয়াসা।,, তিনি কখনই সিন্ধুর জল খাইয়া দেখেন নাই, তাই অমন কথা বলিয়াছিলেন। আমরা জানি সিন্ধুর জল অপেয়, বর্ষাকালে বড় নদীর জলও প্রায় তাই, আমাদের মত দরিদ্র লোকের পক্ষে দরিদ্রের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীতে যে দরিদ্র ভিক্ষার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র পায়, তাহা বিদ্যাসাগর জীবনীতে ভাল করিয়াই পড়িয়াছি, যাক আমার সঙ্গীদ্বয় আসিয়া দুজন বালক স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম" শালকে হাঁসপাতালের মত সেখানেও যদি স্থান না থাকে তাহা হইলে কি হইবে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "লাহিড়ী মহাশয় চিঠি দিয়াছেন, সে ভাবনা নাই।"

বেলা ১॥ টার সময় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "এতো চিকন পক্স, আপনি কি হাঁসপাতালে থাকবেন ?" তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, আমার থাকিবার স্থান আছে। আমি উত্তর দিলাম "যাঁহাদের অতিথি হইয়াছিলাম তাঁহারাই যখন আশ্রয় দিলেন না, তখন আর কোথায় যাই ? রেলে তো যাইতে দিবে না।" তখন ডাক্তার বাবু আমার ব্যাগের জিনিষের তালিকা শুনিয়া বলিলেন "অত খুচরা জিনিষের দায়িত্ব আমরা লইতে পারি না। ওসব ফেরত দেন।" আমি বলিলাম "তামাকের সরঞ্জাম রাখিতে পারি কি ?" ডাক্তার বাবু কিছু চটিয়া বলিলেন "আপনাকে তামাক সাজিয়া কে দিবে ?" "আজ্ঞে আমি আপনি সাজিয়া লইব।" "না ওসব হবে টবে না, তা হলে আপনার হাঁসপাতালে থাকা চলিবে না।" তখন ৩।০টা সিগারেট রাখিয়া সব জিনিষ হাওড়ায় ফিরিয়া পাঠাইলাম। আমার সঙ্গে ১৫॥৶০ ছিল তাহার মধ্যে ১৫৲

টাকা হাঁসপাতালে জমা থাকিল। আমি হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইলাম। আমার গায়ের জামা, ধুতি, উড়ানী, জুতা মোজা ও ছাতা প্রভৃতির তালিকা করিয়া লওয়া হইল।

আমি ম্যাকেঞ্জি ব্যারাকের ইনফার্ম্মেরী ওয়ার্ডের একটি কক্ষে একখান খাট পাইলাম। এইখানে হাঁসপাতালের একটু বিবরণ দিই। হাঁসপাতালটি শিয়ালদহ ষ্টেশনের ঠিক পূর্ব্বে, পুলিশ কোর্টের পশ্চাতে ও লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মধ্যে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোক ও পুরুষের দুইটি সাধারণ বিভাগের ব্যারাক। উত্তর দিকে ম্যাকেঞ্জি ব্যারাকের পশ্চিমাংশে স্ত্রীলোকদের সাধারণ বিভাগ নং ২, পূর্ব্বাংশে ইনফার্ম অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, পাগল, পক্ষাঘাত, রোগীদের স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিভাগ। মধ্যে একটী কক্ষে ৬ থানি খাট থাকে, ইহাতেই পাণিবসন্তের রোগী রাখা হয়। পূর্ব্বদিকে মধ্যে মেডিক্যালস্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষাগার, দুইপার্শ্বে স্ত্রীলোক পুরুষদের অস্ত্রচিকিৎসাগার। এগুলি দোতালা আর পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণদিকের ব্যারাকগুলি খোলার ছাউনী, দুইপার্শ্বে খুব চওড়া বারান্দা। রোগীর সংখ্যা বেশী হইলে কখন কখন বারান্দাতে পর্য্যন্ত রোগী রাখা চলে। ইচ্ছা-বসন্ত ও কলেরা রোগীদের স্থান হাঁসপাতালের এক ধারে, পূর্ব্বদিকে।

খাটগুলি প্রায় লোহার স্প্রিংএর। তাহার উপর নারিকেল ছোবড়ার তোষক ও চাদর, একটি করিয়া নারিকেল ছোবড়ার বালিস। বালিসে ওয়ার দেওয়া। শীত করিলে গায়ে দিবার জন্য একখানি করিয়া কম্বল। প্রায় সমস্ত কম্বলই লাল রঙের ও সুতি। আমার ভাগ্যে কিন্তু পড়িল একখানা দেশী কাল কম্বল আবার তোষকখানির তিন দিক উঁচু এক দিক নীচু। ইহাতে শুইতে বড় কষ্ট হইত। পরে কম্বল ও তোষক বদলাইয়া লইয়াছিলাম। আসবাবের মধ্যে একটি দোথাক ছোট টেবিল ও একটি এনামেলের মগ বা জলের পাত্র।

আমি যখন গেলাম, তখন কক্ষের এক অংশে চারের স্থানে ছয়খানি খাট ও অন্য অংশে দুইখানি ও বাহিরে বারান্দায় তিনখানি, মোট এগারখানি খাটে পাণিবসন্তের রোগী ছিল। ইহাদের পরিচয় এইরূপ, একজন হিন্দুস্থানী বালক, প্রকৃতপক্ষে ইহার পানিবসন্ত হয় নাই, প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল ইচ্ছাবসন্ত হইয়াছে, পরে সন্দেহ হয় হাম হইয়াছে তখন তাঁহাকে এখানে আনা হয়। ছেলেটির জ্বর ও নিউমোনিয়া হইয়াছিল। (২) একজন শিখসৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় ১৪ মাস থাকিয়া ২ মাসের জন্য দেশে আসিয়াছিল। ছুটীর শেষে পাঁচশত সৈন্যের সহিত রেঙ্গুন যাইতেছিল সেখান হইতে মিশর যাইবার কথা। কলিকাতায় আসিয়া পাণিবসন্ত হয়। (৩) জনৈক কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্র (৪) জনৈক মেডিক্যাল মেসের মেম্বর। এফ-এ ফেল করিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতেছে। (৫) কোন মফস্বলের ডাক্তারের পত্নীর চিকিৎসার্থে কলিকাতায় সাথী হইয়া আসিয়াছিল এমন একজন যুবক। (৬) একজন বালক দপ্তরী (৭) একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীদের পাচক বালক (৮—১১) ষ্টিমারের একজন বয় ও তিনজন খালাসী।

এইবার হাঁসপাতালের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিবরণ প্রদান করি। সর্ব্বোপরি কর্ম্মচারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তিনি সাহেব, মধ্যে মধ্যে রোগীদের দেখিয়া থাকেন। তন্নিম্নে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার অন্য কি কাজ জানি না, তবে রোগীরা অভিযোগ করিলে তিনি তাহার প্রতীকার করেন। তৎপর রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান, তিনি প্রত্যহ আমাদের ওয়ার্ডে ৯—৯॥০টার সময় আসিতেন। তিনি কোন কোন রোগীকে দেখিতেন। ইনি "স্বর্ণলতার" গ্রন্থকার স্বর্গীয় তারক গাঙ্গুলির পুত্র, নাম শ্রীলালবিহারী গাঙ্গুলী। সাধারণ বিভাগের অপর রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ানও আছেন, ইহার পরে রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার। ইনি সাব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন,—নাম শ্রীনাথ দাস। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছেন। ইনি দুইবেলা সমস্ত রোগীকে দেখিতেন। কোন কোন

দিন তিন চারি বারও আসিতেন'। ইনি প্রাতঃকাল সাত আটটার সময় আসিয়া প্রত্যেক রোগীকে দেখিয়া সেই দিনের ঔষধ ও পর দিনের পথ্য টিকেটে লিখিয়া দিতেন। নার্স আসিয়া প্রত্যেক রোগীর পথ্য ও ঔষধ লিখিয়া লইত এবং ডায়েট-সরকার প্রত্যেক রোগীর পথ্য লিখিয়া লইয়া গিয়া পরদিন হিসাবমত প্রতি বিভাগে পথ্য পাঠাইত। কম্পাউণ্ডার ঔষধ ঠিক করিয়া রাখিত, ছাত্রেরা ডিউটি মত ঔষধ খাওয়াইত।

বলিতে ভুলিয়াছি, প্রত্যেক রোগীর আসবাবের মধ্যে আর একটি জিনিষ ছিল, একটা বড় পিতলের গামলা। ইহাতে থুথু ফেলা, মুখ ধোয়া সবই চলে। সকালে দুই জন মেথর আসিয়া সেগুলি লইয়া গিয়া মাজিত, ঘণ্টা দুই পরে ফিরাইয়া দিত। তৎপরে মেথরদের কাজ,—ঘর ঝাঁট দেওয়া ও ধোয়া। ধোয়া বলিলে ঠিক বলা হইল না, বারন্দাগুলি জল দিয়া ধোয়া হইত কিন্তু ঘর নিকান হইত। কতকগুলি ৩।৪ হাত লম্বা ছেঁড়া কাপড় মাঝখানে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেনাইল ও জলে ভিজাইয়া দড়ি ধরিয়া এপাশ ওপাশ করা হইত। ইহাতেই নিকান হইয়া যাইত। পাণিওয়ালা খাইবার জল ও পথ্য দিয়া যাইত। একজন সকালে রোগীর বিছানা ঝাড়িয়া ভাল করিয়া পাতিয়া দিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ৫।৬ জন চাকর ছিল তাহারা নার্সের আজ্ঞানুসারে নানা কাজ করিত।

রোগী যে কাপড়-চোপড় পরিয়া আসে, তাহা টিকিটে লিখিয়া রাখিয়া জমা করিয়া রাখা হয় এবং রোগীকে হাঁসপাতালের জামা কাপড় পড়িতে হয়। কাপড় ৩ গজ লম্বা ১ গজ চওড়া খুব মোটা। এই ক্ষুদ্র ধুতি পাইয়া আমি প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই যে, কাছা দিয়া পরিব কি কোঁচা দিয়া পড়িব, দুই এক সঙ্গে হইতে পারে না, শেষে কোঁচাই রাখিতাম। তদ্ভিন্ন একখানি করিয়া গামছার মত বস্ত্রখণ্ড পাওয়া যায়, ইহা দেড় গজ লম্বা ও পোনে এক গজ চওড়া। জামা, কাপড়, গামছা, বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড়ে "ক্যাম্বেল হাসপাতাল, ১৯১৬ বা ১৯১৯" এইরূপ ছাপ থাকে। ইহাতে কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন কোন সালের কাপড় কি রকম টিকিল। প্রতি মঙ্গলবারে ধোপা কাপড় লইয়া আসে, তখন এ সমস্ত বদলাইয়া দেওয়া হয়। হাঁস-পাতালের এই কাপড় জামাগুলির একটি বিশেষ গুণ আছে, ইহাতে ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি এক শ্রেণীতে পড়িয়া যায়। আমাকে যখন ডাক্তারবাবু প্রথমে দেখিলেন তখন বোধহয় বেশভূষা দেখিয়া "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন কিন্তু দুই চারি দিন পরে যখন এই পক্বকেশ বৃদ্ধকেও ছাত্রেরা আসিয়া "তুমি" সম্বোধন করিত, তখন প্রথমে ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতাম না।

আমি যে ব্যারাকের কক্ষে ছিলাম, তাহার উত্তর দিকে মলমূত্রত্যাগের স্থান ও স্নানাগার। কলিকাতার সাধারণ স্নানাগারে গঙ্গার অপরিস্কৃত জল থাকে, কিন্তু এই স্নানাগারের জল পরিস্কৃত। হাঁসপাতালের অল্প রোগীই নিত্য স্নান করে, সাধারণতঃ রোগীরা গামছাখান পরিয়া স্নান করে এবং এক ধুতিই ব্যবহার করে। আমি যখন স্নান আরম্ভ করি তখন দুইখানি ধুতি চাহিয়া লইয়াছিলাম।

আমি ২১শে এপ্রিল বেলা ৩টার সময় আমার শয়নের স্থান পাই। আমি গেলে কক্ষের ভদ্র বাঙ্গালী রোগীরা আমার পরিচয় লইলেন। ১৯শে এপ্রিল হইতে প্রত্যহ বেলা একটার সময় আমার জ্বর হইত এবং প্রাতঃকালে ছাড়িত। সেদিনও জ্বর হইয়াছিল। আমি শুইয়া পড়িলাম। পাণিবসন্তের সকল রোগীই একটা তেল মাখিতে লাগিল। এই তেলকে ডাক্তারেরা বলেন "বডি অয়েল"। আমাকেও সকলে তেল মাখিতে পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারের আদেশ না পাইলে মাখা উচিত কিনা স্থির করিতে পারিলাম না। রাত্রিতে পথ্য আসিল,—শর্করাবিহীন মগ ভরা দুধসাগু। ঔষধ গেলার মত কোন রকমে খাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমার খাটখানি ছিল ঠিক রুদ্ধ দরজার পথে। খাটের উপর দিয়া বেশ বাতাস বহিতেছিল। জ্বরের জন্য একটু শীত লাগিতেছিল। কম্বল গায়ে দিয়া দেখি কুট্ কুট্ করে। তাই প্রথমে উড়ানিখানি গায় দিয়া তার উপরে কম্বল গায়ে দিলাম।

প্রাতঃকালে ডাক্তারবাবু আসিয়া ঔষধ পথ্য লিখিয়া দিয়া গেলেন। সম্ভবতঃ এইদিন সকালেই মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহের সহিত পরিচয় হয়। ইনি উড়িষ্যাচিত্রের গ্রন্থকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের পুত্র ও প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহোদয়ের জামাতা। ভগবান বোধহয় আমাকে অনাথ দেখিয়া এই বন্ধুটীকে আমার নিকট দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় এ সময়ে আমার দুইজন কুটুম্ব ছিলেন এবং বোধহয় শতাধিক পরিচিত (তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকে বন্ধু মনে করি) লোক আছেন। আমি অনাথ ভাবে হাঁসপাতালে পড়িয়া আছি এ কথা তাঁহাদের জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তজ্জন্য দুই তিন জনকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যেন সংবাদপত্রে এইভাবে একটা সংবাদ দেওয়া হয় যে, হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে আগত বাঁকীপুরের প্রতিনিধি শ্রীরাখালরাজ রায় পাণিবসন্তের চিকিৎসার জন্য ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। পৃথকভাবে পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধুবর্গকে পত্র দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ দেখিয়াছি রোগশয্যার নিকটে আসিতে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। তাহার উপরে হাঁসপাতালে, যেখানে ব্যাধির ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট, শত শত রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! আমার আবার পাণিবসন্ত হইয়াছে, এটা একটা সংক্রামক রোগ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের "পুরাতন ভৃত্য"এর কথা মনে পড়িল। সুতরাং কে আমার জন্য এই বিপদসঙ্কুল স্থানে আসিবে? যাহাদের বন্ধু মনে করিয়াছি, তাহারা সংবাদ পাইলেও যদি না আসে তখন যে ভুলচক্র ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি কাল্পনিক বন্ধুত্বে সুখ নাই, সেও ভাল। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া একজনকে মাত্র সংবাদ দিয়াছিলাম। সে সবুজপত্র আফিসের শ্রীমান্ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সে এখনও সংসারচক্রে ভাল করিয়া পড়ে নাই, তাই আশা ছিল সে আসিতে পারিবে। সে আসিয়াও ছিল। কলিকাতার অধিকাংশ লোক অর্থোপার্জ্জনে বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে নিযুক্ত। তাহার উপরে তাহাদিগকে ঘরকন্নার কাজ ও ছেলেপিলের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের অবসরই বা কোথায়?

তবু মন মানিত না। ভাবিতাম, আহা যদি কেহ কোনরূপে সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসে, তাহা হইলে আমার হাঁসপাতাল বাসের যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। দক্ষিণদিকের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডের দিকে চাহিতাম। রাস্তা দিয়া ট্রাম, মোটর, গাড়ী, সাইকেল্, কত লোকজন চলিয়া যাইত ঠিক যেন বায়োস্কোপের দৃশ্য। অথচ বায়োস্কোপ দেখিয়া যেমন আনন্দ হয় ইহাতে সেরূপ হয় না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান সহজে হয় নাই। আনন্দ বোধ হয় মনের সৃষ্টি। আমি হাঁসপাতালের মার্কামারা পাণীবসন্তের রোগী। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় কথায় বার্ত্তায় আমাকে ইংরাজী জানা ভদ্রলোক জানিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি ঘরে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। গায়ে ঢাকা দিয়া বাহিরে বারান্দায় বসিতে পারেন।" তিনি একথা নার্সদেরও বলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে নার্সরা কোন পাণিবসন্তের রোগীকে বাহিরে যাইতে দিত না। সুতরাং আমি এক প্রকার কারাবাস ভোগ করিতে ছিলাম। দ্বিতীয়তঃ কোন অলঙ্ঘ্য চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আমার কর্ম্মস্থান হইতে বহুদূরে এই নিবান্ধব অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িলাম ভাবিয়া মনের অবস্থাও তত ভাল নহে। হয়ত এই কারণেই আমার কিছু ভাল লাগিত না।

ঘরে আসিয়া যখন শুইতাম তখনও সহজে ঘুম আসিত না। পুরুষ বিভাগে কয়জন পাগলা ছিল। একজন স্নানাগারের টিনের বেড়া বাজাইয়া কখনও ৫।৭ ঘণ্টা ধরিয়া একাদিক্রমে গান করিত, আবার কখনও রাস্তারদিকে চাহিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত। আর একজন পাগলকে চাকরেরা একটু উত্যক্ত করিলে সে মিহিসুরে অনর্গল বকিয়া যাইত। এক বুড়ো অন্ধ স্ত্রীলোক উত্যক্ত হইয়া কান্না জুড়িয়া দিত। অনভ্যাসের ফলে রাস্তার ট্রামের শব্দে বড়ই বিরক্তি জন্মাইত। একজন পক্ষাঘাতের রোগী মাঝে মাঝে মধুরস্বরে গান করিত। আমি এই সব শুনিতাম আর বিছানায় শুইয়া শুইয়া তাহাদের একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতাম। একদিন বেলা ১০।১১টার সময় বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম। স্বরে বুঝিলাম বালক; শুনিলাম জলাতঙ্ক ব্যাধি। খানিক ক্ষণ পরে সব চুপ। পরদিন শুনিলাম সে মারা গিয়াছে। পিতা পুত্রকে রাখিয়া কোন কারণে বাহিরে চলিয়া যাইবার ১০ মিনিট পরে ছেলেটী মারা যায়। গৃহে কেহ মারা গেলে শোকে কত ক্রন্দনের রোল উঠে। কিন্তু এখানে সব রকমের ধ্বনি উঠিলেও ওটির নাম গন্ধ নাই। হাঁসপাতাল একটা বৃহৎ হৃদয়হীন যন্ত্র। ইহার যে দ্বার দিয়া রোগী প্রবেশ করে, কিছুদিন পরে হয় সে সেই দ্বার দিয়া বাহির হয়, নয় যমের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হয়। দ্বিতীয় দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিবার সময় কাহারও চক্ষে একবিন্দু অশ্রুও দেখা দেয় না। হাঁসপাতালের কর্ম্মচারী ও চাকরেরা পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছে (অবশ্য নিজের স্ত্রীপুত্রের বেলা সে কথা খাটে না।) যাহা হউক আমার মনে হইত, সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারেই হৃদয়হীনতা আছে। যে রাজা নরহত্যার জন্য কত কঠিন শাস্তি বিধান করেন, তিনিই আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কত নরহত্যার পথ মুক্ত করিয়া দেন। দুই চার জন বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইলে আমরা কত যত্ন করিয়া খাওয়াই কিন্তু বিবাহ বা শ্রাদ্ধের ভোজে হৃদয় জিনিষটার সদ্ব্যবহারের পথ থাকে না। কলিকাতা একটা বৃহৎ কর্ম্মস্থল। এখানেও সহৃদয়তার অবসর খুব কম।

আমি যেদিন গেলাম, তাহার পরদিনই দপ্তরী ছুটী পাইল। আমি তাহার খাটে গেলাম। তৎপর দিন মাদ্রাসার ছাত্র ও মফস্বলের ডাক্তারের লোকটী ছুটী পাইল! তৎপর দিন ষ্টিমারের খালাসীরা ও বয় ছুটী পাইল। বয়ের বাড়ী কলিকাতা কড়েয়ার বাজারে। সে ষ্টিমার হইতে হাঁসপাতালে প্রেরিত হইবার সময় বাড়ীতে সংবাদ দিতে পারে নাই। এখানে আসিয়া সংবাদ দেওয়ায়, তাহার ছুটী পাইবার পূর্ব্বদিন তাহার দুই সহোদর আসিয়া উপস্থিত হইল। সহোদরের মুখে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ এবং কিছুদিন পরে মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিন ভাই কাঁদিয়া উঠিল। ভ্রাতৃদ্বয় বিদায় লইলে, বয় সমস্ত দিন মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিত। সেদিন দুই একবার ভাত মুখে দিয়া ফেলিয়া রাখিল। আমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিতাম। তাহার পিতা ৬০।৬৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে। এখন আমরা ৫ জন থাকিলাম, মেডিক্যাল মেসের মেম্বর শ্রীহরমোহন মিত্র, আমি, হিন্দুস্থানী পাচক-ব্রাহ্মণ, শিখ সিপাহী ও হানে পীড়িত বালক। আমার যাইবার ৪।৫ দিন পরে বজবজ হইতে পানি-বসন্ত পীড়িত এক বালক কনষ্টেবল আসিল। তাহাকে ৬ দিন থাকিতে হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সে দুধ ভিন্ন কিছু খায় নাই। সে যে দিন দুধ না পাইত সে দিন তাহাকে আমার দুধ দিতাম, কখনও বা বাজার হইতে চিনি মিছরী আনাইয়া দিতাম। ইহার কারণ চৌকা অর্থাৎ পাকশালা হইতে দূরে ভাত বা রুটী আনিয়া দিলে সে খাইবে না বলিল। কিন্তু ডাক্তার বাবুরা বলিলেন পানিবসন্তের রোগীকে পাকশালার নিকটে যাইতে দিতে পারি না। সুতরাং তাহার ভাত রুটী খাওয়া হইল না। সে অবশ্য লুকাইয়া ২।১ দিন বাজারে গিয়া পুরী খাইয়া আসিয়াছিল। তাহার একটু সুবিধাও হইয়াছিল। আমাদের যেমন

কাপড় জামা কাড়িয়া লইয়া হাঁসপাতালের মার্কামারা কাপড় দেওয়া হইয়াছিল এই কনাষ্টেবলটির তাহা করা হয় নাই। তাই সে নিজের কাপড় জামা পরিয়া স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাইত। তাহার মুখে একটীও বসন্ত বাহির হয় নাই, আমি রাত্রিকালে রাস্তায় নামিয়া একদিন পায়চারি করিতেছিলাম এমন সময়ে একজন দাসী হাঁকিল "বাহার মাৎ যাও।" আমি বুঝিলাম আমি নজরবন্দী।

আমি ২১এ ২২এ ও ২৩এ এপ্রিল রোগীদের সহিত কথোপকথনে সময় কাটাইলাম। মাঝে মাঝে আমার অপ্রত্যাশিত হাঁসপাতাল-বাসের কথা ভাবিতাম। ২৩এ এপ্রিল বেলা ১১টার সময় পবিত্রকুমার দেখা করিয়া আমাকে মাজন জিবছোলা আনিয়া দিল এবং তৎপর দিন একখানা রুসিয়ান নভেলের ইংরাজি অনুবাদ আনিয়া দিল। এখানি ফুরাইলে ক্রমে ক্রমে আরও দুখানি বই আনিয়া দিয়াছিল। শ্রীমান সুরেন্দ্র মোহন ও তাঁহার পিতার "তপস্যা" ও "তোড়া" আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। আমি প্রায় সমস্ত দিনই মাঝে মাঝে এই সব বই পড়িতাম। দিনে আহারের পর একটু ঘুমাইতাম। রাত্রিতে শীঘ্র ঘুম আসিত না। মাঝে মাঝে ইলেট্রিক্ লাইট জ্বালিয়া পড়িতে বসিতাম। কোন দিন বা ছারপোকা মারিতাম। প্রথম প্রথম শরীর অসুস্থ বলিয়া রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতাম। তবে যে দিন বৃষ্টি হইত সেদিন বেশ ঘুমাইতাম।

পবিত্র সব দিন কাজের ভিড়ে আসিতে পারিত না। বই ফুরাইয়া গেলে কেমন করিয়া সময় কাটিবে ভাবিয়া কখনও কখনও অল্প অল্প করিয়া বই পড়িতাম। ৫ই মে তারিখে সকালে সব বই পড়া শেষ হইল। সেদিন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত সমস্ত দিন ছটফট করিয়াছি। সন্ধ্যাবেলায় বাঁটরার নিতাইবাবু আসিলেন। তাঁহাকে বলায় তিনি একখানি খাতা ও একটা কলম আনিয়া দিলেন। জনৈক ছাত্র আমার টেবিলে একটা দোয়াত রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা হইতে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া গেলাম। কিন্তু এক সঙ্গে অধিকক্ষণ লিখিতে পারিতাম না, কারণ তখন শরীর বড়ই দুর্ব্বল, এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিত।

আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, নার্সরা (Nurse) বোধহয় রোগীকে স্বহস্তে ঔষধ পথ্য খাওয়ায়। কিন্তু ২।১ দিনের মধ্যেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। দেখিলাম নার্সরা ওয়ার্ডের এগ্‌জিকিউটার বা কর্ম্মকর্ত্রী। নার্স মহোদয়া খাতা দেখিয়া বলেন "অমুক নম্বরের রোগীকে সাগু দাও"। পাণিওয়ালা তাহাকে দিয়া আসিল। বলিতে ভুলিয়াছি প্রত্যেক রোগীর খাটের একটা করিয়া নম্বর আছে। নম্বরটী এনামেলের অক্ষরে দেওয়ালে আঁটা আছে। রোগীর টিকিটেও এই নম্বরটী লিখিয়া দেওয়া হয়। নার্স চাকরবাকরেরা প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানী বলিয়াই হউক বা বাঙ্গালা জানে না বলিয়াই হউক নার্স মহোদয়ারা প্রায় হিন্দিতেই কথা বলেন। অবশ্য এ হিন্দী বিশুদ্ধ নহে। কারণ হিন্দীর ক্রিয়ার যে লিঙ্গভেদ হয় এ জ্ঞান ইঁহাদের নাই। রোগীর চলিত নাম এখানে "সিক্‌মান" (Sickman)। ইহার হিন্দী বহুবচন দাঁড়াইয়াছে "সিক্‌মানোঁ"। নার্স ও চাকরদের মধ্যে এই রকমের কথাবার্ত্তা চলে,—

নার্স। পাণিওয়ালা, পচাশ্ ছ (৫৬) সিক্‌মান্‌কো দুধ দিয়া ?

পাণি। জী মামা। লেকিন্ সিক্‌মান্ চিনি মাঙ্গত হৈ। চিনি দিজিয়ে।

নার্স। ইউ সোয়াইন্! তোম্ চোরি কর্ত্তা হৈ। হাম্ দোস্‌রা নোকর্‌সে ভেজ দেঙ্গে।

পাণি। জো খুসী কিজিয়ে, বাবা।

চাকররা নার্সদের কখনও 'মামা' বলে, কখনও "বাবা" বলে। দুটীই বাঙ্গলার পুংলিঙ্গ। বাস্তবিক দেখিলাম এই নার্সদের কাজ পুরুষ-জনোচিত। চাকরদের গালাগালি দিয়া বকিয়া, ত্রুটী হইলে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইয়া কাজ লইতেছে। মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে তাহাদের ডাকিতেছে। এ কাজ যে কোন কম্পাউণ্ডার পারে অথচ কম্পাউণ্ডারকে এ কাজ না দিয়া নার্সদের দেওয়া হয় কেন ইহার কারণ বুঝিলাম না। নার্সদের পোষাক সাদা, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত সাদা কেম্বিসের। কাহারও কাহারও আস্তীনে একটা রেড্ ক্রশ পিন দিয়া আঁটা। সাদা রংটা বোধ হয় করুণাব্যঞ্জক। কিন্তু নার্সদের মধ্যে একটী বাঙ্গালী রমণী ও একটী বয়স্কা শ্বেত মহিলা ব্যতীত আর সকলগুলিই কর্কশভাষিণী। এক এক জন যখন চাকরদের গালাগালি দেয়, তখন অনেক রোগীর রোগযন্ত্রণা বাড়িয়া উঠে। আর বাঙ্গালী রমণীটি এমন মধুরভাষিণী ছিলেন যে, তিনি কথা কহিলে মনে হইত যেন কোন সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আর একটি নার্সের চেহারা ঠিক নিগ্রোদের মত। আমার মনে হইত ইহাকে অন্ধকারে বা মৃদু আলোকে দেখিলে অনেক রোগী ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিবে।

যাহা হউক নানা কারণে এই নার্সদের সহিত যেন আমার ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, খাইবার জল নাই। যে মগে পাণিওয়ালা জল দিয়াছিল, ওয়ার্ডে কতগুলি মগ আছে তাহা গণিবার জন্য ছোকরা কুলি (বলিতে ভুলিয়াছি, চাকরদের 'কুলি' বলিয়া ডাকা হয়) সেটি লইয়া গিয়া নার্সের আফিসে হাজির করিল। আমি তখন জানিতাম না কে জল দেয় সুতরাং ২।৩ জন কুলি আসিলে তাহাদের একজনকে জল দিতে বলিলাম। সেদিন জিনিষপত্র গুণিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ একবার কম্বল গুণিতেছে, কেহ বালিশ গুণিতেছে। আমি যাহাকে জল দিতে বলিলাম সে রাগিয়া উত্তর করিল "আপ্‌কে লিয়ে নোক্‌রী যায়েগা।" "পঁয়তিস, পঁয়তিস্।" ভাবটা এই যে, যদি জিনিষগুলি ঠিক মিলাইয়া দিতে না পারি তাহা হইলে আমার কাজ যাইবে। সে লোকটা কম্বলের সংখ্যা গুণিতেছিল তাই অনামনস্ক হইলে ভুলিয়া যাইবে বলিয়া সে পঁয়তিস্, পঁয়তিস্ (৩৫) বলিতেছিল। রাত্রিকালে কেহ খাইবার জল দিয়া যায় নাই। জ্বরে অত্যন্ত পিপাসা পাইতেছিল। উঠিয়া একজনের টেবিলে জল পাইলাম। সেই জল ২।৩ বার পান করিয়া বাঁচিলাম। পরদিন গাঙ্গুলী মহাশয়কে এই পানীয় জলের অভাবের কথা জানাইলে তিনি ছোটবাবুকে বলিলেন "ডেপুটিসুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করুন।" সম্ভবতঃ ইহার জন্য নার্সদের সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

সুরেন্দ্রমোহন ডাক্তারবাবুদের জানাইয়া দিলেন, "ইনি (আমি) একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।" (অবশ্য একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছিল)। আমার প্রথম অসুবিধা দেখিয়াই সুরেন্দ্রমোহন ডাক্তারবাবুদের অনুরোধ করেন "ইঁহাকে ইলিয়ট ওয়ার্ডে পাঠান হউক।" এখানে ছাত্রেরা অসুস্থ হইলে আশ্রয় লয়, ছাত্রেরাই সেবকের কাজ করে। স্থানটীতে বাসের সুবিধা খুব। কিন্তু ইচ্ছাবসন্ত ও কলেরাবিভাগে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় লোকজনের একান্ত অভাববশতঃ তাহা করা হয় নাই।

প্রথম দিন রাত্রিতে শর্করাবিহীন দুধসাগু খাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিন জনৈক ছাত্রকে বলিলাম যেন আমাকে দুধ ও সাগু পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। বেলা ১০টার সময় তিন ছটাক আন্দাজ দুধ পাইলাম। সাগুর কথা বলিলে নার্স উত্তর করিল "ও সাগু খাবে না বলায় উহাকে কেবল দুধ দেওয়া হইয়াছে।" আর সাগু চাওয়ায় শুনিলাম পাইব না। রাত্রিকালে আবার সেই শর্করাবিহীন দুধ সাগু। খানিকটা খাইয়া আর পারিলাম না। তখন অবশিষ্ট সাগু রাখিয়া বলিলাম "আচ্ছা থাকিল, কাল ডাক্তারবাবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেমন

করিয়া বিনা চিনিতে সাগু খাওয়া যায়।" হরমোহনবাবু দয়া করিয়া নার্সকে চিনির কথা বলিলে নার্স বাজার হইতে চার পয়সার চিনি আনাইয়া দিলেন। পয়সা দিতে গেলে লইলেন না। এই নার্সটির সহিত হরমোহনবাবুর পূর্ব্বের পরিচয় ছিল। হরমোহনবাবুর প্রমুখাৎ আমার পরিচয় পাইয়া পরে ইনি আমার সহিত বড় সদ্ব্যবহার করিতেন। আমি কেমন আছি, আমার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না প্রভৃতি কথা ইনি নিজের ডিউটীর সময় জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু চিনি আনিয়াছিল অন্য কারণে। পরে শুনিয়াছিলাম, যাহাকে দুধ দেওয়া হয় তাহার জন্য ভাণ্ডার হইতে এক আধ ছটাক করিয়া চিনি আসে। পরে কখনও দুধের সঙ্গে আমাকে চিনি মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কখনও পৃথক্ চিনি পাইয়াছি কখনও একেবারেই পাই নাই।

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে রোগীর পথ্যাপথ্য বিষয়ে যেমন ব্যবস্থা আছে, তাহা বোধ হয় এক. মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল ছাড়া, অন্যত্র আছে বলিয়া শুনি নাই। রোগীর অবস্থা বিশেষে প্রত্যহ আধসের করিয়া খাঁটি দুধ তাহার সঙ্গে চিনি, রোগীর পথ্য ফল, চা ও অভ্যাস থাকিলে আফিম পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। খুব সরু পুরাণ চাউলের ভাত, মুগের ডাল ও সব রকম তরকারী দেওয়া হয়। কিন্তু তরকারীগুলির খোসা না ছাড়াইয়া একসঙ্গে রাঁধা হয়। আমি যখন খাইতাম তখন দেখিতাম, রাঙ্গা আলু, গোলআলু ঝিঙ্গে পটোল বিলাতী কুমড়া সবই এক সঙ্গে আছে। ২।৪টা পেঁয়াজের টুকরাও দেখিতাম। ইহা বোধহয় মশলারূপে দেওয়া হইত। সমস্ত তরকারী মিলিয়া ঝোল ঝোল একটা অপূর্ব্ব দ্রব্য হইত। ইহাকে বাঙ্গালীর রান্নার কোন শ্রেণীতেই ফেলা চলে না। ডাল্না নয়, চাচ্চরী ত নয়ই, ঘণ্টও নয়, রসা ঝোলও নয়। তদ্ভিন্ন বড় একটুকরা মাছভাজা রোগীরা পায়। আমি নিরামিষভোজী, পেঁয়াজও খাই না। কিন্তু কি করি, পিঁয়াজ পাইলে ফেলিয়া দিতাম। অবশ্য এরূপ তরকারী রাঁধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দোষ দেওয়া চলে না কারণ ১০০ রোগীর না হউক ৩০০।৪০০ রোগীর জন্য শুক্তনী ডাল্না রান্না করা বড় সহজ কথা নয়।

একজন রোগীর দুই পায়ের আঙ্গুল কাটিতে হইয়াছিল। তাহার জন্য ১১৲ টাকা দিয়া বুট কিনিয়া দেওয়া হইল। শুনিলাম সে নিঃসম্বল বলিয়া তাহার রাহা খরচও দেওয়া হইবে।

আমি প্রথম ৩ দিন দুধসাগু খাইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম দিন দুধ রুটি খাই। এইবার চিনি পাইতাম। পঞ্চম দিন পথ্য লিখিবার সময় ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "দুধরুটি খাইবেন?" সেই দিনকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাবিয়া আমি বলিলাম "হাঁ"। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের কাজ ছিল রোগীদের অবস্থা লেখা, কয়েকজনের কাজ ছিল দিনে তিন বার করিয়া ঔষধ খাওয়ান। আমাদের দিকে যে রোগীদের অবস্থা লিখিত সে আমায় সে দিন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কাল ভাত খাইবেন?" আমি বলিলাম "কাল নিশ্চয়ই।" তখন সে ডাক্তার বাবুর লেখা "দুধরুটি ও অতিরিক্ত আধসের দুধ" কাটিয়া লিখিয়া দিল "মিশ্রপথ্য" অর্থাৎ "ভাত ও রুটি"। ছাত্র চলিয়া গেলে দেখিলাম দুধের কথা একেবারেই লেখে নাই। ডায়েট সরকার ও নার্স আসিলে আমি বলিলাম "ডাক্তার বাবু আমার অতিরিক্ত দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু ছাত্র ভ্রমক্রমে দুধের কথা লেখে নাই।" তাহায় কেহ উচ্চবাচ্য করিল না। দুই দিন দুধরুটি দিবার সময় কখনও কম দুধ দিত কখনও ঠিক দুধ দিত। একবার অল্প দুধ পাইয়া ডাক্তার বাবুকে দেখাইলাম। তিনি নার্সের নিকট হইতে আবার দুধ আনিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবুকে ষষ্ঠ দিন প্রাতঃকালে দুধের কথা বলিলে ডায়েট সরকার ও নার্সকে বলিয়া আমার দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যথাসময়ে সাড়ে ৯টা কি ১০টার সময় দুধ পাইলাম। ভাত খাইব বলিয়া সুরেন্দ্রমোহন ১টা লেবু কাটিয়া আনিয়া দিয়াছেন। পার্শ্বওয়ালা

দ্বিজ দেখিয়া তাহাকে বলিলাম "তুমি ভাত দিলে খাইব। অন্যে যেন না ছোঁয়। আর আমাকে মাছ দিও না আমি মাছ খাইব না।" সে তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেল। আমার হাতে "বডি অয়েল" লাগিয়াছিল বলিয়া আমি কলে হাত ধুইতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, নার্স বুট-পরা গাউন-পরা অন্নপূর্ণারূপে মগে করিয়া থালায় থালায় অন্ন পরিবেশন করিতেছে।

দেখিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। আমি পাণিওয়ালাকে বলিলাম "আমায় ভাত দিবার পূর্ব্বে কেন ইহাকে ছুঁইতে দিলে?" সে বলিল "কি করিব? মামা আমার কথা শুনিল না।" তখন ইংরাজীতে নার্সের সঙ্গে আমার বচসা আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম "তুমি ছুঁইয়া দিলে, আমি খাই কেমন করিয়া? সে বলিয়া উঠিল "সবাই খায় তুমি কেন আপত্তি করিবে?" আমি বলিলাম "আমি হিন্দু, তোমার ছোঁওয়া ভাত খাইতে পারি না। "সবাই খায় তাহাতে আমার কি?" কথাটা এই—এ বিভাগে যে সকল হিন্দু আছে তাহাদের অধিকাংশই ভিখারী শ্রেণীর। অনেকে চিকিৎসার্থ আসিয়া আর যাইতে চাহে না। তাহারা দুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইলে বাঁচিয়া যায়, তা যে দিক না কেন। যে দুএকজনের আপত্তি আছে তাহারা ভয়ে কিছু বলিতে পারে না, ভাবে হাঁসপাতালের ব্যাপারই এইরূপ, আপত্তি করিলে শুনিবে কে?" কাজেই নার্সদের কেহ কখনও কিছু বলে নাই। আবার যাহারা উঠিতে পারে না, তাহারা জানিতেও পারে না বারান্দায় কি হইতেছে। পানিওয়ালা বা কুলি রোগীর নিকট গিয়া ভাত দেয়। তাহাদের গায়ে জামা থাকে সুতরাং তাহারা কি জাত তাও রোগীরা সহজে জানিতে পারে না, জানিতে চাহেও না। অপর পক্ষে নার্সরা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছে। হাঁসপাতালে যে সকল দরিদ্র হিন্দু রোগীকে দেখিতে পায় তাহাদের সকলকেই নিজেদের চাইতে ক্ষুদ্র ভাবে। সেই ক্ষুদ্র যে দর্প করিয়া বলিবে "আমি তোমার ছোঁওয়া ভাত খাইব না", ইহা নার্সদের পক্ষে অসহ্য। তাই যদি কেহ কোনকালে আপত্তি করিতে থাকে তাহা হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেই ক্ষুদ্র হিন্দু রোগীর দর্প নার্সমহোদয়ারা হয় তো চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকিবেন। নার্সরা এখানে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। চাকর বাকরও রোগীদের সম্মুখে আমি ছোঁওয়া ভাত খাইতে আপত্তি করায় তাহার আত্মম্ভরিতায় বোধহয় একটু আঘাত লাগিল। সে দলিতা ফনিণীর ন্যায় ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল "তোমরা চামারের হাতে খাইতে পার, আর আমি কি চামার হইতে উঁচু জাত নই?" "চামারের হাতে আমি খাই না" বলিয়া আমি বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকিলাম। পরে আর একবার বারেন্দায় গিয়া নার্সকে বলিলাম "যদি রান্নাঘরে ভাত থাকে আমাকে আনাইয়া দেও।" সে একটী ক্ষুদ্র "না" উচ্চারণ করিয়া ভাত পরিবেশন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ১০।১৫ মিনিট পরে সে এক চাকরকে ভাত দিয়া অন্য দ্বার দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। চাকর আমার টেবিলে ভাত রাখিতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথা হইতে আনিলে?" সে বলিল বাবুর্চ্চিখানা হইতে।" আমার কেমন সন্দেহ হইল, এই নার্স বলিল রান্নাঘরে ভাত নাই। আবার কোথা হইতে আসিল। আর রান্নাঘর হইতে এত শীঘ্র যাতায়াত অসম্ভব। সে চলিয়া গেলে হিন্দুস্থানী বালকটী বলিল, "বাবু ওকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি ও কি জাত?" আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম "তুম্ কৌন্ জাত?" উত্তরে শুনিলাম—চামার। "তুম্‌হারা দেশমে রিশ্‌কা জনেউ হৈ, উয়া তুম্‌হারা ছুঁয়া ভাত্ খাতা হৈ?" উত্তর "নেহি"। "তব্ তুম্ কেঁও মেরা লিয়ে ভাত লায়া হৈ?" "মামাকে হুকুমসে"। রাগিয়া বলিলাম "উঠাও ইঁহাসে"। টেবিলটী জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলাম।

তৎপরে লেবুর রস দিয়া চিনির সরবৎ করিয়া খাইলাম। দুধটুকুও খাইলাম। এইরূপে আমার প্রথম দিন অন্ন-পথ্য হইল।

বৈকালে ছোট ডাক্তারবাবুকে সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। তিনি আমার অভিযোগ ডেপুটীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া আমার এজাহার লইলেন। আমি সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলাম "দেখুন কেহ আপত্তি করে না এই ভুল ধারণায় নার্স যে ভাত ছুঁইয়া দিয়াছিল ইহাতে আমি তাহাকে দোষ দিই না কিন্তু সে যে পানিওয়ালাকে রান্নাঘর হইতে আবার ভাত আনিতে না পাঠাইয়া, চামার কুলিকে পাঠাইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতেছে সে আমার মনে দুঃখ দিবার জন্যই এই পরিহাস করিয়াছিল।" সেইদিন রাত্রে শুনিলাম এই নার্সটীর বদলী হইয়াছে।

দুধরুটি বা দুধসাগু পথ্য সকালে সাড়ে ৯টা দশটার সময় ও ভাত প্রায় এগারটার সময় দেওয়া হয় এবং বৈকাল ৫টার সময় ভাত রুটি ও রাত্রি সারে সাতটা আটটায় দুধ বা দুধসাগু প্রভৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং বৈকাল ৫টায় সেদিন রুটি ও তরকারী খাইলাম। ডাল লইলাম না, মাছ আমি খাই না। বড় পাতলা রুটি ৪ খানি করিয়া পাইতাম ইহার মধ্যে ৩ খানি খাইতাম, একখানি থালায় রাখিয়া দিতাম, কোনদিন বা কাহাকে বিলাইয়া দিতাম। সেদিন ভাত ও রুটি দুই বেলা খাইলাম কোন গোল হইল না।

অষ্টম দিনে প্রাতঃকালে সেই নার্সটি আসিয়া আমার প্রতি নানা প্রকার অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিল। বড় ডাক্তার বাবু নার্সটিকে আমার ঘরে পাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তোমরা ভাত ছোঁও কেন? তোমরা দেখিবে যেন রোগীদের পথ্য দেওয়া হয়।" নার্স আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি একটা উত্তর করিল। তাহার পরে যত দিন ছিলাম, এই নার্সকে আর আমাদের ওয়ার্ডে দেখি নাই।

এই দিন আমরা স্নান করিয়া ঘরে বসিয়া আছি। সাধারণতঃ বেলা ১১টার সময় আমাদের খাওয়া হয়, আজ ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ভাত রাখিয়া পানিওয়ালা ডাল-তরকারী আনিতে গিয়াছে। ইহার মধ্যে এক নার্স আসিয়া ভাত ছুঁইয়া দিলে, আমি বারান্দায় আসিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার পরে কথোপকথনটা এইরূপ চলিল,—

নার্স। তুমি হুকুম করিবার কে? আমি ছুঁই না ছুঁই তাহাতে তোমার কি?

আমি। আমি খাইব, আর তুমি দেখিবে। আমি বলিব না ত বলিবে কে?

তদ্ভিন্ন ডাক্তার বাবুরা আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে ভাত পরিবেশন করা বা ছোঁয়া নার্সদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; তাহারা দেখিবে যে, যাহারা ভাত খায় তাহারা ঠিক পাইতেছে কিনা।

নার্স। এত বেলা হইয়াছে, সিক্‌মানেরা ভাত পাইতেছে না, আমি সেই জন্য ভাত ছুঁইয়াছি।

আমি। তুমি ভাত ছুঁইয়া কি কাজ বাড়াইলে?

নার্স। চুপ্‌ কর—

আমি। তুমি চুপ্‌ কর।

নার্স। কি আমার অধীন হইয়া আমাকে চুপ্‌ করিতে বলা!

আমি। কেন বলিব না? আমি ভদ্রলোক (অবশ্য রেলের বিধান মতে নই)। তুমি আমাকে প্রথমে চুপ করিতে বলিলে আমি ছাড়িব কেন?

তখন নার্স মহোদয়া, যেমন চাকরবাকরদের উপর কথায় কথায় রিপোর্ট করেন, সেই রূপ আমাকে ভয় দেখাইয়া গেলেন যে আমার উপর রিপোর্ট করিবেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, "যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হই, তাহা হইলে স্কুলের ছাত্রের মত আমার জরিমানা হইবে, না পথ্য বন্ধ হইবে ?" খানিকক্ষণ পরে নার্স ফিরিয়া আসিয়া ভাত পরিবেশন করিতে লাগিল। আমি আবার বারান্দার গিয়া বলিলাম "আজ তুমি আমাদের তিনজনকে উপবাসী রাখিলে।"

বলিতে ভুলিয়াছি যে, ইহার পূর্ব্বে যেদিন ভাত ছোঁয়া হয় সেদিন আমাদের ঘরের সকলে পূর্ব্বেই ভাত লইয়াছিল। আজ আমাদের ঘরে আমাদের লইয়া পাঁচ জন রোগী, শিখ সিপাহীও ব্যারাকের পাচক ব্রাহ্মণ নার্সের ছোঁয়া ভাত খাইল না। আবার দুইজন তখন ভাত খাইত না। নার্স দেখিল যে, তিন জন রোগী ভাত না খাইলে তাহার দোষ হইবে। সে তখন পাণীওয়ালাকে বলিল "দেখ যদি রান্না ঘরে ভাত থাকে আনিয়া দাও নতুবা উহারা আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবে।" পাণিওয়ালা শিখ সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ভাত আনিয়া দিল। ভাল ভাত পাইলাম কিন্তু তরকরী নাই, তরকারী বোধহয় ফুরাইয়া গিয়াছিল। নার্স একবার আমায় বলিয়াছিল, "আমায় বলিলে না কেন যে আমার ছোঁয়া ভাত তোমরা খাইবে না ?" আমি তখন উত্তর দিয়াছিলাম "আমি কেমন করিয়া জানিব যে তুমি ভাত ছুঁইয়া দিবে?" তাই ভাবিলাম যে, আর এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া কাজ নাই। কিন্তু ছোট ডাক্তার বাবু নার্সের রিপোর্ট পড়িয়া স্বয়ং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সমস্ত ব্যাপার জানান। শুনিলাম তিনি ইহার পরে হুকুম দেন যে, সমস্ত হাঁসপাতালে নার্সেরা বা কোন ইতর জাতীয় কুলী ভাত ছুঁইতে পাইবে না। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য আমি ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডাক্তার শ্রীলালবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়কে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিয়া ছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই।

ইহার পরে ভাত আসিলেই পাণিওয়ালা আমাকে পাহারায় বসাইয়া রাখিয়া ডাল তরকারী আনিতে যাইত। নার্সদের নিজেদের বা আত্মীয় স্বজনের দুই চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়াছিল। কারণ যে সকল খাদ্য দ্রব্য আমি হাত দিয়া নাড়ি নাই তাহা কাগজের ঠোঙ্গা হইতে মাঝে মাঝে তাহাদের হাতে ঢালিয়া দিতাম। তালের মিছরী তাহার মধ্যে ছিল প্রধান দ্রব্য। একজনকে দিতেই সে গিয়া আর সকলকে ডাকিয়া আনিত। তাহার পরে প্রত্যহ দুই বেলা আমার কাছে তাহারা আসিয়া ফল ও তালের মিছরী খাইত। কখনও কখনও পয়সা দিয়া তালের মিছরী চাহিত। একদিন দেখি, বড় ছেলেটি কতকগুলি বিস্কুট ও লজেঞ্জস্ আমার জন্য আনিয়াছে। আমি ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "ওসব জিনিষ আমি খাই না।" সে দুঃখিত হইয়া সঙ্গীদের বলিল "এঁর জাত যাবে।" (It will break his caste) আমি বলিলাম "ঠিক্ তা নয়, আমি ওসকল বড় পছন্দ করি না।" এই ছেলেগুলি কখন হিন্দীতে; কখনও বা ইংরাজীতে কথা বলিত। বারান্দায় ভাত পাহারা দিতে বসিলে, ইহারা এক একখানি প্লেট হাতে করিয়া হাজির হইত। নার্সদের নিকট আমার কথা বোধহয় সব শুনিয়াছিল, তাই বড় ছেলেটি ইংরাজীতে সঙ্গীদের একদিন বলিতেছিল "ইনি একজন ভদ্রলোক' (He is a gentleman)। ছুঁয়ো না (Don't touch)। ইনি খাইবেন না (He won't eat)। ইহার পরে আর খাইবার পক্ষে কিছু গোলযোগ হয় নাই।

১লা মে শিখ সিপাহী ও দুইটি হিন্দুস্থানী রোগী ছুটি পাইল। সকলেই যাইবার সময় আমায় নমস্কার করিল। শিখ সিপাহী আমাকে ছাড়িয়া যাইতে যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিল "বাবু সাহেব, কয়দিন আপনার সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটাইয়াছি। আপনাকে একক ফেলিয়া আমরা চলিলাম ইহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু বাস্তবিক মুক্তি

পাইয়া আজ আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। মেসোপোটেমিয়ায় পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে ঠিক এমনি পড়িয়াছিলাম। যেদিন আমার টিকিটে লালকালীতে লিখিয়া দেওয়া হইল 'টু ইণ্ডিয়া' (To India) সেদিন যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আজ আমার ঠিক সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। আপনারও সেইরূপ আনন্দ শীঘ্র হউক।" ইহার পরে আমার গৃহের সঙ্গী থাকিল হামরোগে পীড়িত বালক।

আমি যখন প্রথম হাঁসপাতালে আসি, তখন এ বালকটি মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার করিত। লোকে এক আনন্দে বা যন্ত্রণায় চীৎকার করে। উভয় সময়েই অপরকে ভাগ দিতে চায়। তবে যন্ত্রণার চীৎকারে সাহায্য প্রার্থনা করে এই পার্থক্য। যেখানে সাহায্য প্রার্থনা করে না, সেখানে শৈশবের সাহায্যকারী অনুপস্থিত মাতা বা পিতার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে। আমি প্রথম প্রথম ইহার চীৎকারের অর্থ বুঝিতাম না। পরে একদিন থাকিতে না পারিয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বালক বলিল "আমি মলত্যাগ করিব কিন্তু আমি উঠিতে পারি না, মেথরকে ডাকিয়া দেন।" ইহার পরে যখনই সে চীৎকার করিত, তখনই আমি গিয়া তাহাকে আমার কুজো হইতে শীতল পানীয়জল দিতাম কিংবা মেথরকে ডাকিয়া দিতাম। তাহার চীৎকারে অন্য কেহ বড় কর্ণপাত করিত না। আমি ৬ই মে মুক্তিলাভ করি। সেদিন তাহাকে ডালভাত পথ্য খাইতে দেখিয়াছি এবং স্বয়ং উঠিয়া পায়খানা যাইতে পারিত। সে যখন বলিত "বাবু সাহেব, আজ বহুত্ আনন্দ্ সে খায়া;" তখন তাহার মুখে হাসি দেখিয়া আমারও বড় আনন্দ হইত।

আমি যেদিন হাঁসপাতালে যাই তাহার পরদিন বৈকালে হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন "আমি সভার কার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম। আমি কিছুই জানি না যে, আপনাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসিতেছে। আমাদের উচিত ছিল আপনাকে হাওড়াতেই পৃথক্ বাসাতে রাখা। যাহা হউক, আপনাকে কিছু টাকা দিয়া যাইতেছি যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা আনাইয়া লইবেন। একটা লোক এখানে বসাইয়া রাখিব, আপনার কাজ করিয়া দিবে। আর ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু মহাশয়কে বলিয়া আপনার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব।" আমার টাকা জমা ছিল, ছুটি না পাইলে তাহা ফেরত পাইব না : অথচ একদিনেই বুঝিলাম আমার কাছে যে দশ আনা পয়সা আছে তাহাতে কিছুই হইবে না। কাজেই আমি ৫টি টাকা চাহিয়া লইয়া সুরেন্দ্রমোহনকে রাখিতে দিলাম। তৎপরদিন বেলা ১০টায় একটি লোক আসিল। আমি তাহাকে বাহিরে বসিতে বলিলে সে উত্তর করিল "আমি বসিবার জন্য আসি নাই, আপনি কেমন আছেন লাহিড়ী মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন।" সুতরাং আমি ভাল আছি জানাইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। তৎপরদিন বৈকালে বাঁটরার শ্রীনিতাইচরণ পাল আমার সংবাদ লইতে আসিলেন ও আমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়া গেলেন। ইনি প্রত্যহ চাঁদনীর শ্রীঅখিলচন্দ্র পালের দোকানে কাজ করিতে আসিতেন সুতরাং প্রায় প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতেন। লাহিড়ী মহাশয় আর একদিন আসিয়াছিলেন।

নিতাইবাবু আমার কথা মত পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া ২৯এ এপ্রিল তারিখে আমার পালিত পুত্র বাঁকীপুর হইতে আসিয়া বাঁটরার নিতাইবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যাকালে আমায় দেখিতে আসিল, তাহার ইচ্ছা ছিল সে আমায় বর্দ্ধমানের বাসায় লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে। কিন্তু ট্রেণে যাওয়া নিষিদ্ধ জানিয়া সে অভিপ্রায় তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। আমি বলিলাম "এখন আমার কোন অসুবিধা নাই। বসন্তের স্ফোটক প্রায় শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধহয় পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিব।" সে সেরাত্রি কলিকাতায়

থাকিয়া পরদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার উপদেশ মত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল। তাহাকে কলিকাতায় রাখিলে আমার হয় ত অনেকটা সাহায্য হইত। কিন্তু ভাবিলাম বিধাতাই যখন আমাকে আমার কর্ম্মস্থল হইতে টানিয়া আনিয়া নির্ব্বান্ধব অবস্থায় হাঁসপাতালে ফেলিয়াছেন, তখন আর অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? আজ হাঁসপাতালের তরকারী রান্নার কথা মনে করিয়া আমার ঘৃণা হইতেছে। আমি নিরামিষভোজী বলিয়া তিন চার রকমের নিরামিষ তরকারী নইলে আমার খাওয়া হয় না। অথচ আমার জনৈক ছাত্র (সে আবার মেডিকাল স্কুলের ছাত্র) বাসা হইতে তরকারী আনিয়া দিতে চাওয়ায় আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। ভাবিতাম বিধাতা যখন আমায় এমন স্থানেই ফেলিয়াছেন, তখন আমার সংযম শিক্ষারই পরিচয় লইবেন। তাই চাঁদ মুখ করিয়া সেই অপূর্ব্ব তরকারী খাইতাম, ডালে নুন কম হইলেও একদিনের জন্য নুন আনিয়া রাখিবার কথা আমার মনে হয় নাই। মানুষ কোনরূপ দুঃখকষ্টে পড়িলে সাধ্যমত অপরকে তজ্জন্য দোষী করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, অভাবে বিধাতা বা অদৃষ্টপুরুষের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয়। এমন কি ইংরেজেরা এখানে বলে accidence আমরা সেখানে বলি 'দৈবাৎ' অর্থাৎ দেবতা করিয়াছে। আমি পীড়ার কথাটা দশ জনের মত একটা সাময়িক প্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম কিন্তু এটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে, কেমন করিয়া এমন ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবার উপায়টি পর্য্যন্ত থাকিল না। আরব্য রজনীর দৈত্য যেন ঠিক আমায় সময় মত আনিয়া হাঁসপাতালে ফেলিয়া দিয়া গেল। যেন একজন পাকা দাবা খেলোয়াড় পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে কয়চালে এবং কোন্ কোন্ বলের কিস্তীতে মাত করিবে এবং সময় হইবামাত্র এমনই উপর্য্যুপরি কিস্তি দিল যে আমি ভাবিবার চিন্তিবার অবসর পাইলাম না। যে অদৃষ্টবিধাতা আমাকে লইয়া এই দাবা খেলা খেলিতেছিলেন, তিনি যে ঘরে আমাকে মাৎ করিবেন বলিয়াছিলেন যেন ঠিক্ সেই ঘরেই মাৎ করিলেন।

একটি ঘটনার কথা এইখানে বলি। আমি রাত্রিকালে একা আমার কক্ষে শুইয়া আছি। আর তিনখানি খাট শূন্য। গরমে ঘুম হইতেছে না, রাত্রি তখন বারটা। হঠাৎ আমার বাহিরের কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। এই কক্ষে দুইখানি খাট, একখানিতে ঘামে পীড়িত বালক থাকে অপরখানি শূন্য ছিল। এই খাটখানিতে চাকরেরা চাদর পাতিয়া গেল। একটু পরে একখানি ষ্ট্রেচারে করিয়া একটি লোককে লইয়া আসিয়া এমন নির্ম্মম ভাবে হাত পা ধরিয়া টানিয়া খাটে ফেলিল যে, তাহা দেখিয়া আমার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। এই কুলিরা এমন হৃদয়হীন যে, তাহারা জীবিত ও মৃতের শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না। খানিকক্ষণ পরে ছোট ডাক্তারবাবু আসিয়া জল গরম করিয়া আনিতে বলিলেন। আরও কি ঔষধপত্র ও ঠাণ্ডা জল আসিলে রোগীর হাত পা কাপড় দিয়া খাটের সহিত বাঁধা হইল। তৎপরে একটা নলের একদিক মুখ দিয়া খানিকটা অন্ননালীর মধ্যে দেওয়া হইল অপর মুখের একটা বাটীর মত পাত্রে জল ঢালা হইতে লাগিল। জল পূর্ণ হইয়া গেলে সে মুখ খাট অপেক্ষা নীচে ধরিতেই পেটের সমস্ত তরল পদার্থ নীচে পড়িতে লাগিল। এইরূপে কয়েকবারে পাকাশয় ধোয়া হইলে বাহুতে কি ঔষধ ইঞ্জেক্‌শন্ করা হইল। এই রোগীর স্ত্রীকেও নারীবিভাগে ঠিক এইরূপ করা হইলে রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় ওয়ার্ড হইতে ডাক্তার বাবু ঘরে গেলেন। পর দিন বৈকালে লোকটির জ্ঞান হইলে শুনিলাম সে কানপুরে এক দেবালয় স্থাপন করিয়াছে তাহার জন্য পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ কলিকাতায় বেড়াইয়া বেড়ায়, রাত্রিকালে গঙ্গার ঘাটে শুইয়া থাকে। এক দিন সন্ধ্যা কালে (মঙ্গল বার) কোন হিন্দুস্থানী আসিয়া ইহাদের খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিল। ইহাদের একবার আহার হইয়াছিল বলিয়া আহারে

তেমন ইচ্ছা ছিল না, তাই খানিক দূর গিয়া লোকটি ইহাদিগকে এক নির্জ্জন স্থানে বসাইয়া দোকান হইতে খাবার আনিতে গেল। সেই খাবার খাইয়া ইহারা স্ত্রীপুরুষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং ইহাদের সঙ্গের অলঙ্কার ও ৩।৪টি টাকা অপহৃত হয়। ডাক্তারেরা বলেন ইহাকে ধুতুরা খাওয়ান হইয়াছিল। ইহার ২।৪ দিন পরে বেলা ৩টার সময় একজন মুচিকে এই বিছানায় আনা হয়। ইহাকে এক জোড়া নূতন জুতার লোভে কালীঘাটে কেহ বেলা ৮।৯টার সময় ধুতুরা খাওয়াইয়াছিল। এই সকল রোগী রেডক্রশ সোসাইটির এম্বুলেন্স মোটরে আনীত হয়। কাম্বেল হাঁসপাতালে একখানি ইহাদের মোটর থাকে, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগীকে এখানে পাঠাইতে হইলে সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিনামূল্যে এই মোটরে তাহাদিগকে আনা হয়। অন্য প্রকার রোগীকে আনিতে ভাড়া লাগে। কলিকাতায় এইরূপ তিন চারি খান মোটর কাজ করে বলিয়া শুনিয়াছি।

এইবার আমার মুক্তির কথা বলিয়া এই সুদীর্ঘ বিবরণ শেষ করিব। ১লা মে পর্য্যন্ত বড় ডাক্তারবাবু রোজই আমাদের কক্ষে আসিতেন, তাঁহার সঙ্গে একজন, বড় তালের পাখা লইয়া বাতাস করিতে থাকিত। কারণ জিজ্ঞাসায় শুনিলাম সমস্ত রেসিডেণ্ট্ বড় ডাক্তার সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম, যাহাতে রোগীর কক্ষের মাছি ডাক্তার বাবুর গায়ে বসিতে না পারে তজ্জন্য বাতাস করা হয়। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন প্রথমদিন আমার কক্ষে আসিয়াছিলেন তখনও তাঁহার সঙ্গে পাখা ছিলনা, তাহার পরে উপর্য্যপরি ৪দিন আসিয়া আমার সহিত কথা বলিয়া আমাকে অভয় দিয়া গিয়াছিলেন তখনও তাঁহার সঙ্গে পাখা ছিলনা। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গেও পাখা দেখিনাই। ছোট ডাক্তারবাবু, নার্স, ছাত্র, চাকর বাকর প্রভৃতি কাহারও সঙ্গে পাখা নাই। ভাবিলাম ইহাঁদের সকলের জীবনের অপেক্ষা কি বড় ডাক্তারবাবুর জীবনের মূল্য অধিক? যাহা হউক ২রা ও ৩রা মে বড় ডাক্তারবাবু আমার কক্ষের দিকে মুখ বাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, ৪ঠা আমাদের ওখানে তিনি আসিলেন না। ৫ইমে আমার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনে হইল এইরূপ অবস্থায় তিনি অনেককে মুক্তি দিয়াছেন, আমাকেও দিতে পারেন কিন্তু তিনি আমার কক্ষের দিকে চাহিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি একটি ছাত্রকে বলিলাম, আমার নিবেদনটা জানাও। উত্তরে শুনিলাম ডাক্তারবাবু বলিলেন "আরও দুএকদিন থাক্।" শুনিয়া আমি দমিয়া গেলাম। ছোট ডাক্তার শ্রীনাথবাবু কি কারণে পূর্ব্বদিন আসেন নাই। তিনি সকালে আমায় দেখিয়া মুক্তির কিঞ্চিৎ আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় বড় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছিলেন না। বৈকালে আসিলে তাহাকে বলিলাম "যদি বৃহস্পতিবার নাগাদ মুক্তি না পাই তাহা হইলে আমার ভারি মুস্কিল হইবে।" তিনি বলিলেন "আমি আলিপুরে বদলী হইয়াছি নতুবা আমিই বড় ডাক্তারবাবুকে সমস্ত ব্যাপার বলিতাম। আপনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে তিনি বিবেচনা করিবেন।" পরদিন দেখি ছোট ডাক্তারবাবু সকালে আসিলেন এবং বড় ডাক্তারবাবু আসিলে তাঁহাকে আমার মুক্তির কথা বলিলেন। তিনি আমায় দেখিয়া মুক্তির আদেশ দিলেন। পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন তখন আমার কি আনন্দ হইল। প্রথমেই মনে হইল, বারান্দায় বসিয়া যে রাস্তায় আমি প্রত্যহ গাড়ীঘোড়া ও স্বাধীন মানুষ চলিয়া যাইতে দেখি আজ আমি সেই রাস্তায় চলিতে ফিরিতে পারিব। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আমার কাপড়চোপড় আনিতে বলিয়া স্নান করিতে গেলাম। কাপড় আনিলে পরিয়া বাহিরের মুক্ত জীব হইলাম, এখন আর কেহ আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিবে না তবুও হাতা ছাড়াইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ আশঙ্কা গেল না। এক একবার মনে হইল, হয় ত কোন ছুতানেতা করিয়া আবার আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। আমি প্রথমেই, আপিসে জমা করা টাকা আনিতে গেলাম। আপিসের বাবু এক ঘণ্টা পরে আসিতে বলিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া আহার

করিয়া আবার গিয়া টাকা লইলাম। তৎপরে রাস্তায় গিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। জিনিষপত্রগুলি বাঁধিয়া লইয়া বক্‌শীস ও ভিক্ষায় ১৶১০ খরচ করিয়া হাঁসপাতালটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া ৩৬নং পুলিস হাঁসপাতাল রোডের মেসে গেলাম। এখানে স্বরেন্দ্রমোহন থাকেন, তাঁহার নিকট ঘড়িটি রাখিয়াছিলাম। আজ তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিকের পরীক্ষা। দশটা হইতে একটা পর্যান্ত মেডিকাল কলেজে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সুতরাং প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি আসিলে, তাঁহার পরীক্ষা সন্নিকট হইলেও তিনি যে, প্রত্যহ একবার কোন কোন দিন দুইবার পর্য্যন্ত আমার খবরাখবর লইয়া আমার দুঃখ কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির অভিমুখে চলিলাম। অবশ্য আমাকে ট্রামে চড়িয়েই যাইতে হইল। এখানে যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য পদকল্পতরু ২য় ভাগ ক্রয় করা। কারণ শেষ সংখ্যা পরিষদ্ পত্রিকায় পদকল্পতরু ২য় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম।

মুক্তি পাইয়া প্রথম যখন বাহিরে চলিতে লাগিলাম তখন মনে হইল, বনের পাখীকে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিলে সে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পালাইবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষে বুঝিতে পারে তাহার পালাইবার উপায় নাই ; তৎপরে তাহাকে খাঁচার বাহিরে ছাড়িয়া দিলেও সে ঠিক বুঝিতে পারে না যে, সে মুক্ত এবং বহুদিন অনভ্যাসের ফলে সে উড়িতে গেলেও ভালরকম উড়িতে পারে না। আজ আমারও সেই দশা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম চলিতে পা কাঁপিতে লাগিল, জোরে চলিতে পারি না—আমার মনে হয়, হয় ত কেহ দেখিয়া বলিতে পারে "না তুমি এখনও নির্ব্যাধি হও নাই।" খানিকটা ঘুরিতে ফিরিতেই মনে হইল, আমি বড় দুর্ব্বল হইয়াছি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিতেছে। হাঁসপাতালে থাকিতেই শেষ দিকটায় আমার মাথা ঘুরিত, সেইজন্য কিছু কিছু ফল খাইতাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও বহুদিন রোগ ভোগের পরে সেইদিনই পরিষদে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার "অতীতে ল" প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা হইল। "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব" নামক এক প্রবন্ধ পরিষদে কেহ পড়িয়া ছিলেন কি পরিষদে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এরূপ একটা ধারণা আমার ছিল। বাঁকীপুরে কোথাও সমস্ত পরিষদ্ পত্রিকা বাঁধান পাইবার উপায় নাই। আমার নিকটে চার পাঁচ বৎসরের আছে। কাজেই একটা সন্দেহ ছিল, হয় ত সেই প্রবন্ধ লেখক আমাকে চোর মনে করিবেন। শেষে মিলাইয়া দেখি, তাঁহার ও আমার মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদকল্পতরু বাঁধাইতে দিয়াছে, পাইলাম না। প্রায় ছটার সময় চাঁদনীতে শ্রীঅখিলচন্দ্র পালের দোকানে গেলাম। এইখানে শ্রীনিতাইচরণ রায় প্রত্যহ কার্য্যোপলক্ষে আসেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ লইতেন এবং আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া দিতেন। আমর মুক্তির সম্ভাবনা আছে জানিয়া তিনি আমার বিছানা ও ব্যাগ ব্যাটরা হইতে দোকানে আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি গেলে তিনি দোকানের বাসায় শীঘ্র শীঘ্র আমার আহারের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যাটরার বামাচরণ বাবুর ঘরের গাড়ী প্রত্যহ কার্য্যোপলক্ষে এই দোকানে আসিয়া থাকে। নিতাই বাবু ও বামাচরণ বাবুর সহোদর দয়া করিয়া এই গাড়ীখানি আমার জন্য কিছুক্ষণ রাখিয়া ছিলেন। পরে আমার আহার হইলে আমাকে হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া গিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিলেন।

ইহা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, রাত্রি দশটায় হাওড়া ছাড়ে ও পরদিন বৈকাল সাড়ে ছ'টায় বাঁকীপুরে হাজির হয়। আমি প্রায় সাতটার সময় বাসায় পৌঁছিয়া আয়নায় মুখ দেখিলাম। গায়ে কোথাও দাগগুলিতে গর্ত্ত নাই—মুখের দাগগুলিতে বেশ গর্ত্ত হইয়াছে। এগুলির নাম রাখিলাম "সম্মিলনের দাগ।" আমার গুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে প্রবন্ধ লেখাইবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি প্রবন্ধ লেখেন নাই। সাক্ষাৎ হইলে আমায় বলিয়াছিলেন, "বাপুহে, সম্মিলনে আমাকে বেশ করে দেগে দিয়েছে, আবার কি আমি সম্মিলনে প্রবন্ধ লিখি?" আমারও আজ ঠিক সেই কথা মনে হইল। আমার গুরু কেবল মনেই দাগা পাইয়াছেন আর আমি মনে ও মুখে দাগা পাইয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয় দুইবারে সুরেন্দ্রমোহনকে আমার জন্য নগদ চার টাকা দিয়াছিলেন এবং নিতাই বাবু কতকগুলি জিনিষ কিনিয়া দেন। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমি জানিতে চাহি তাঁহারা কত টাকা আমার জন্য খরচ করিয়াছেন। এটাকা আমি মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে চাহি কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় পত্রের কোন উত্তর দেন নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির আমাকে হাঁসপাতালে পাঠান ঠিক হইয়াছে কিনা ইহা লইয়া বর্দ্ধমান ও বাঁকীপুরে দুই প্রকার অভিমত শুনিলাম। বাঁকীপুরের সুহৃদ্-পরিষদের সদস্যেরা বলিল "আমাদের এখানে সম্মিলনে যদি কোন প্রতিনিধির এরূপ ব্যারাম হইত, তাহা হইলে আমরা প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে পারিতাম না। আমরা তাঁহাকে পৃথক ঘরে রাখিয়া নিজেরাই সেবা করিতাম।" বর্দ্ধমানের একজন নবীন উকীল বলিলেন "সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতি ঠিক কাজই করিয়াছেন। কংগ্রেসে ও বোধ হয় এইরূপ ব্যাপার হইত। ইহা ইংরাজী কায়দা।" একজন প্রবীণ উকীল বলিলেন "কংগ্রেস ও সম্মিলনে পার্থক্য আছে। কংগ্রেস টাকা লইয়া খাইতে দেয়, সম্মিলন খাইতে দিয়া অতিথি সৎকার করে। সম্মিলন কংগ্রেসের ন্যায় পাশ্চাত্য অনুকরণ হইলেও এই অতিথি সৎকার রূপ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়াছে।" আমি গোড়ায় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি

দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবি মরি শ্যামা।

তবে আমার গুরু দাগা পাইয়া সম্মিলনে প্রবন্ধলেখা বন্ধ করিয়াছেন আর আমি মনেও মুখে দাগা পাইয়া স্থির করিয়াছি "একালা মুখ আর সম্মিলনে দেখাইব না।" সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠের সাধ মিটিয়াছে। সম্মিলনের কার্য্য বিবরণীতে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে যত লোক পড়ে, যে কোন মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক পড়ে। সুতরাং সম্মিলনে প্রবন্ধ দিলে চতুর্ভুজ হইবনা। সম্মিলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে যেরূপ মিলন হয় তাহাও আমার বুঝিতে বাকী নাই। যে পরিচিত লোককে আমি সম্বৎসর ধরিয়া পত্র লিখিয়া সংবাদ লই নাই, তাহাকে সম্মিলনে যখন সুস্থশরীরে দেখিয়াও ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করি "কেমন আছেন?" তখন কি সেটা নিতান্তই পরিহাস হয় না? অথচ এই পরিহাসের অভিনয় আমরা প্রতি সম্মিলনে করিয়া থাকি। আর বড় বড় সাহিত্যিকেরা বহুবার পরিচয় সত্ত্বেও যখন চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করেন "আপনার সঙ্গে কোথায় যেন আলাপ হইয়াছে। বাঁকুড়ায় কি?" তখন মনে হয় মা বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও আর এই সম্মিলন তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। অথচ এই সব করিতেই প্রচুর অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মিলনে যাওয়া।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

খেয়ালী।

আমার মন মানে না যুক্তি।
ও আপন খেয়ালবশে উপহসে বেদ পুরাণের উক্তি।
উধাও-ধাওয়া ভাবের ঝোঁকে
চলছে কেবল পাগলা-রোখে,—
দিগ্‌বিদিক্ তার নাইকো চোখে,—
জ্ঞানবিবেকের সঙ্গে কভু করবে না সে চুক্তি।
চরণে সে বাঁধন বাঁধে
আপন হাতে, আপন কাঁধে
ভূতের বোঝা সাধে সাধে
তুল্‌ছে টানি দিবানিশি চায় না সে যে মুক্তি।
নিভায় সদা আলোর মালা,
ভেঙ্গে ফেলে ভোগের থালা,
সরায় ঠেলে প্রেমের ডালা,
মাড়ায় পায়ে সকল সাধের সুখ-সোহাগের ভুক্তি।
কে জানে ও কিসের খোঁজে
আছে সদাই, কি যে বোঝে
কে বল্‌বে তা, কুড়ায় ও যে
কোন্ কল্প-সুখের সায়র-তীরে সোণার রেণু শুক্তি।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

আত্মকর্ষণ

-:*:-

আত্মকর্ষণ বা চরিত্রগঠনই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। সৎশিক্ষা, সৎদৃষ্টান্ত ও প্রেরণামূলক কর্ম্ম-সাধন প্রচেষ্টা—আত্মকর্ষণে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল হৃদয়ক্ষেত্র, শিক্ষার অমৃতধারা সিঞ্চনে সিক্ত ও ধৌত না হইলে হৃদয়নিহিত সদ্বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটন সম্ভবপর নহে। শিক্ষায় প্রাণশক্তির বিকাশ, যে শিক্ষায় আমরা আপনাকে খুঁজিয়া পাই তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আপনার শক্তি আপনাতে অনুভব করিতে না পারিলে,

বাহ্যিক বিদ্যালাভে পারিপার্শ্বিক জগতের উপদেশ উদাহরণ কার্য্যকরী হয় না। তাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের আশা সর্ব্বৈব বৃথা! সর্ব্বাগ্রে আপনাকে জানিতে হইবে, আত্মবোধ হইলে স্বজাতি, স্বদেশ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখুঁৎ প্রাণশক্তির অনুভূতি স্বতঃই আপনাতে জাগ্রত হইবে, তবেই না দেশাত্মবোধের অমর প্রেরণা, আমাদের প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীতে আপনিই সাড়া দিয়া উঠিবে। সে শিক্ষা কেবল গুরুর উপদেশে বা শিক্ষকের শিক্ষায় হয় না, লাভ হইবে উহা—স্বতঃপ্রণোদিত স্বভাবের মৃদুল আকর্ষণে। গন্তব্য স্থির রাখিয়া—কর্ম্মচক্রের পাষাণ ঘর্ষণে আপনাকে ঘষিয়াপিষিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে কোন্‌টি কর্ত্তব্য,—কোন্‌টি অকর্ত্তব্য। সুরভি মলয়ান্দোলিত উপবনের পরিবর্ত্তে পূতিগন্ধ অন্ধকূপে বাস করুক্ সেই, যে আপনাকে কর্ম্মমুখে উৎসর্গ করিতে ভয় পায়, অনন্ত শাস্ত্রের বোঝা মাথায় আচার্য্যের পশ্চাতে ঘুরিয়া মরুক্ তাহারাই,—যাহাদের হৃদয়ে এই আত্ম-বোধ বর্ণমালার রেখাপাত মাত্র হয় নাই।

কোনও টোলে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে বা দুর্গম প্রদেশে নয়—আত্ম-হৃদয়ই শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। শ্রদ্ধা তাহাতে বীজ, বীর্য্য (উৎসাহ বা যত্ন) তাহাতে অঙ্কুর, স্মৃতি তাহাত শাখা, সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) তাহাতে পুষ্প এবং প্রজ্ঞা তাহাতে ফলরূপে উৎপন্ন হয়।* এই প্রজ্ঞা যদি পাইতে হয়—পাওয়া যাইবে তাহা নিজের হৃদয়ে—অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে,—অনাহতের আহত সঙ্কেতে। কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কিরূপে ক্ষতি সহিয়া লইতে হয়, প্রাণের মায়া কোথায় পরিত্যাগ করিতে হয়, উৎসর্গের প্ররোচনায় কখন ধন-জন স্ত্রী-পুত্রের মায়া বিসর্জ্জন দিতে হয়,—আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত যিনি অন্তর্যামী মহাপুরুষ † তিনিই তাহা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিবেন। মঙ্গল আমাদের কোথায়, শ্রেয়ঃ আমাদের কোন্‌টী সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবতা অপেক্ষা তাহা আর বেশী কে জানে! নতুবা ধনজন স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগই ধর্ম্ম নহে—বরং মনুষ্যের হৃদ্‌গত ধর্ম্মের বিরোধী। তাহাদের ত্যাগে জগত পরিবারে মিলিত হইবার শুভ মুহূর্ত্ত কখন্—সে ত আত্মস্থ মহাপুরুষই জানেন। বিশ্ব-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে; তাহা না হইলে মুখে বিশ্ব-প্রেমের কথা—নরনারায়ণের কথা বৃথা—কেবল গর্ব্বেরই কারণ—মনুষ্যত্ব নাশের হেতু,—মনুষ্যত্ব লাভের উপায় কিছুতেই নহে!

সুতরাং এশিক্ষা বাহিরের কোন কিছু পাওয়া জিনিষ নয় বা বাহিরের কোনও একটা কাটিয়া ছাঁটিয়া খাপ্ খাওয়াইয়া বাহাদুরী দেখানও নয়,—অন্তর্যামী মহাপুরুষের চেতনা না হইলে আত্মপ্রতিভা খেলিয়া উঠিবে কেন? যদিও অন্যের হাত ধরিয়া চলিলে পতনাশঙ্কা খুব কম কিন্তু তাহাতে চলচ্ছক্তি দৃঢ় হয় কৈ? আত্ম-শক্তিতে আস্থা জন্মে কোথায়? সেই প্রকৃত চলিবার শক্তি লাভ করিয়াছে—বিপথে-অপথে চলিয়া শত সহস্র বার পদস্খলন হইয়াও যাহার চলচ্ছক্তি স্বাধীনতা হারায় নাই।

আমাদের মস্তিষ্কজাত সম্পত্তি অপেক্ষা হৃদয়জাত সম্পত্তি আহরণ সমধিক কষ্টসাধ্য। যে পরিমাণ মস্তিষ্কজাত শক্তি প্রয়োগে মেধাবীগণ—বাচস্পতি, পঞ্চানন, বা স্বয়ং সরস্বতীর আসনে সমাসীন হইয়া থাকেন; হৃদয়জাত সদ্‌বৃত্তি ভাণ্ডারের একটী মাত্র রত্ন-কণিকা অর্জ্জন করিতে চাই তাহার শতগুণ সংযম—সহস্রগুণ নিষ্ঠার বিনিময়।

* শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ পাতঞ্জল দর্শন, সঃ পাঃ ২০ শ্লোক।

† সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ॥ পাতঞ্জল দর্শন, বিঃ পাঃ ৫০ শ্লোক।

আমাদের আত্মবিধৃত মহাপুরুষের কত যুগযুগান্ত সঞ্চিত শুভ সম্ভাবনীয়তাগুলি বিকাশ পায় শুধু হৃদয়জাত সদ্বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে। পরের দেওয়া অস্বাভাবিক শিক্ষার ফলে যদি কখনও সাফল্যের মুখদর্শন ঘটে—তাহাতে দীপ্তি পাইবে সেই উপদেষ্টারই অনুকৃতি মাত্র!—কিন্তু তার অভ্যন্তরে আর একটী জীবন্ত শক্তি, যাহা বিকাশ পাইবার জন্য আজন্মকাল ধরিয়া কত উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে তাহা উহার নীচে পড়িয়া নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

'আমাদের জীবনটা কেবল খেলা—কেবল হাসি-কান্নার মহাকোলাহল।' বৈরাগ্যের নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক এই অভিব্যক্তি কর্ম্মসাধনার প্রধান অন্তরায়। শত কোলাহলের মধ্য হইতে সংযমের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে শুনিয়া লইতে হইবে কর্ত্তব্যের গভীর প্রণব ধ্বনি! মনুষ্যসঙ্ঘকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের—আর আধার পরিত্যাগ করিয়া আধেয়ের সন্ধান একই কথা! 'জীবন' প্রকৃতই খেলা,—কিন্তু সে যে জীবনের খেলা!—কোন্ শিশু এ জগতে না খেলিয়া মানুষ হইতে সমর্থ হইয়াছে? মহাকবির উক্তি সত্যই—

> "হোক্ খেলা এ খেলায় যোগ দিতে হবে।
> আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে!
> সব ছেড়ে মৌন হয়ে কোথা বসে র'বে
> আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!"

মানব-মন এক দিকে যেমন নবনীত কোমল—সংযম রসায়ন যোগে উহাই আবার তেমনি বজ্রাদপি কঠোরে পরিণত হয়। সংযত মানব-মন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়ে সমর্থ! ইহার প্রসার যে যতদূর বাড়াইতে সক্ষম হইবে সে জগৎকে ততই স্তম্ভিত করিয়া তুলিবে। জগৎ এই শক্তিকে লুকাইয়া রাখিতে চাহে না—রাখিতে পারেও না।—তাই নূতন নূতন ঘটনা ঘটাইয়া, নূতন নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া পরিবর্ত্তনশীল রূপে কত নব নব বেশে সজ্জিত হইতেছে। কালের গতি আনুকূল্যে এই শক্তি অর্জ্জনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শক্তি লাভ করিতে হইলে খাটিতে হয়, লালসা বিসর্জ্জন দিতে হয়,—জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা করিতে হয়। শুধু সংসার-সৈকতে বসিয়া সুখ সমীরণ সেবন জীবনের উদ্দেশ্য নহে—লক্ষ্য তাহার শত ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া শত উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সাধন সমুদ্রের পরপারে উপনীত হওয়া।

আমরা বাল্যকাল হইতে বিপদের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে—অপমানের আভাস পাইয়া সরিয়া পড়িতে অভ্যস্ত। কিন্তু যদি বুঝিতাম বিপদেরও একটা দান আছে—অপমানেরও একটা মান আছে, তবে কি আলস্য রাক্ষসটা অষ্ট পাশে * আমাদিগকে বাঁধিয়া বুকের উপর দস্যুর মত চাপিয়া বসিতে পারিত, না—শিক্ষার দৈন্যে বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি আমাদের দীনা বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন!

আমাদের আত্মশক্তি বর্ত্তমানে স্তিমিত অর্দ্ধমৃত জ্ঞানহারা!—দলাদলির ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে,—অহং জ্ঞানের বিকট আস্ফালনে সমাজশক্তি ও আদর্শ তাহাতে পাওয়া দুষ্কর সুতরাং আত্মগত প্রাণসত্তার মহাভাগবত পুরুষই আমাদের একমাত্র আদর্শ বস্তু। উদার উন্মুক্ত হৃদয়কে বহু বিচিত্র রূপে ফুটাইয়া জানিতে হইবে তাহাকে, সেই যখন

* ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভৈরব যামল।

আপনার ভাব, আপনার পথ আপনার লক্ষ্য হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিবেন তখনই প্রকৃত ঐক্য—প্রাণ শক্তির প্রকৃত সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। সেই মুহূর্ত্তেই—

"দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
বন্ধন পাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।
উর্ম্মি-লীলায় সূর্য্য কিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণ বরণ,
বিঘ্ন বিপদ দুঃখ মরণ
ফেনের মতন ভাসিবে।"

দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। আদর্শ দর্শনের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে হইবে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি দৃষ্টান্ত অপ্রকাশ বা সুপ্রকাশভাবে বিদ্যমান, তাহাদের উৎপত্তি একটি অতিক্ষুদ্র বিন্দু পরিমিত স্থানে। বিভুদত্ত মহাদান সেই স্থানটুকু আমাদের প্রত্যেক হৃদয়ে বর্ত্তমান। আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয়-গ্রন্থ উন্মোচন করিলে শত শত দৃষ্টান্ত—সহস্র সহস্র আদর্শ দর্শনপথে আপনিই প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে। ধৈর্য্য সহকারে স্বকীয় জীবন-বেদের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে তাহার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পরাবিদ্যার কত স্পষ্ট সঙ্কেত আপনা হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িবে। অধ্যাত্মসাধন-প্রসঙ্গের উপক্রমণিকায় জানিয়া রাখা উচিত,—মনের আবেগ, প্রাণের বাসনা, দেহের কর্ম্ম—বিকৃত অবস্থা হইতে বিমুক্ত বিযুক্ত হইয়া আনন্দময় সত্বার সহিত সংযুক্ত করা। ঘটনা-তরঙ্গের উদ্দাম তাণ্ডবে আত্মহারা হইয়া অনৃত রজঃ-শক্তির উত্তেজনায় বক্ষের শোণিত ক্ষয় করিলে এ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জগতের ঐতিহাসিক নজির টানিয়া আমাদের জীবন গঠন প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা চাই দেবজীবন। সঞ্জীবনী মহামন্ত্রের সম্যক্ পুরশ্চরণ! অক্ষমের বক্ষে চাপিয়া আত্ম-ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া বা দশের অকল্যাণ করিয়া স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে—অক্ষমকে রক্ষা করিয়া, দশের শক্তি-সামঞ্জস্যে আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া মহামানবসঙ্ঘের বিমল আনন্দে অবস্থান করাই আমাদের জীবন গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু—

'উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।'

যে কোনও উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে বিবিধ উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত হইতে হয়। অভ্যস্ত না হইয়া—আপনাতে কার্য্যশক্তি সঞ্চয় না করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে সিদ্ধি লাভ ত দূরের কথা, পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। জলে নিমজ্জিত হইয়া অভ্যস্ত না হইলে সন্তরণ প্রয়াস যেরূপ বাতুলতার পরিচায়ক, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-সাধন আয়ত্ব না করিয়া সিদ্ধিলাভের প্রয়াস ও তদ্রূপ। আমি অধম, আমি অযোগ্য ভাবিয়া জড়সড়ভাবে সরিয়া পড়িলে বা 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'য় পদার্পণ করিয়া অতি সন্তর্পণে চলিলে সিদ্ধিলাভের আশা সুদূরপরাহত। সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষ ধারণ করিয়া আমাদের সহস্রারে বিরাজিত যিনি—ছুটিতে হইবে তাঁহারই নির্দ্দেশিত শতধা-বিন্যস্ত পথে; পূর্ব্বাপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া ব্যাকুল না হইয়া অবিশ্রান্ত নব্য প্রেরণায় কর্ম্ম পথে ছুটিলে স্বীয় গন্তব্য পথ আপনিই সুগম হইয়া পড়িবে।

আমাদের সম্মুখে যে কর্ম্মযুগ সমাগত, তাহার ভাব স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র, স্নেহের আহ্বান তাহার বিভিন্ন প্রকারের। বাহিরে নগ্নতা, নীরবতা, নির্জ্জীবতা অনুমিত হইলেও হৃদয়ে তাহার যে হোমাগ্নিশিখা ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা আর নিভিবার নহে!—শত-শত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আস্তরণ ভেদ করিয়া তাহাতে যে বিশুদ্ধ ঘৃতাহুতি বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে তাহাতেই কালে উহা সত্য-স্বপ্রকাশরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহারই পুণ্য-শিখায় অবিশুদ্ধ অন্তরাত্মা সুরভিত হইয়া উঠিবে, ভিতরের তড়িৎ-প্রবাহ বাহিরের জলদ-ঘটার গুরু-গর্জ্জন ভেদ করিয়া ছুটিবে সেই অনন্ত প্রেম-প্রতিষ্ঠানের শিরশ্চুম্বিত অয়স্কান্ত সূচী অভিমুখে। পরক্ষণেই বজ্র-নিনাদে বিঘোষিত হইবে—

'সদানন্দরূপ শিবোঽহং শিবোঽহং।'

মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত—প্রস্তুত হও, উঠ, জাগ! আত্মার আদর্শে, আত্মবোধের ঐক্যতানে জীবনবীণা বাঁধিয়া লও,—বিশ্ব সুর তোমার, প্রেমের সুর তোমার, আনন্দময় তোমার দেবতা—প্রাণারাম—প্রিয়তম,—জননী জন্মভূমি, তোমার স্বর্গাদপিগরীয়সী—আত্মস্থ হ'ক—মাতৃসেবায় প্রস্তুত হও—মানুষ, মনুষ্যত্ব লাভে জয়যুক্ত হও,—শত্রুতায় যে প্রাণ নাই—মৈত্রীতে প্রাণের আনন্দ। অসুয়া শত্রু তোমার প্রাণ-শক্তির বলে অবশ্য পরাজিত হইবে, প্রেমে হৃদয় শক্তিতে—তুমি বিশ্বজয়ী হইবে!

আমাদের বিষয়-বিভব, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের গৃহ-পরিজন, সমস্তই যোগ—সমস্তই সাধনা। সসাগরা ধরণী আকর্ষণ করিয়াও এ সাধনার সিদ্ধি-সীমায় উপনীত হওয়া অসম্ভব—যদি না আত্মোৎসর্গের পরমী-করণ মুদ্রায় অভ্যস্ত হই। উদ্যম হইবে তাহাতে পাদপীঠ, ধৃতি তাহাতে আসন, স্মৃতি—জপমালা, সম্মতি-অর্ঘ্য, এবং সংযম হইবে তাহাতে ভূতাপসরণের দুর্ভেদ্য গণ্ডীরেখা। আত্ম-কর্ষণপ্রয়াসী সাধক বসিবেন অসীম গগনমণ্ডপ-তলে, অনন্ত কর্ম্মসমুদ্রের ধু-ধু সৈকতবক্ষে—পীঠবদ্ধ শ্রদ্ধা-সিদ্ধাসনে। শোভা পাইবে ললাটে তাহার—বিজয়-তিলক, গলে—নিষ্ঠার উত্তরীয়। সাবধানী যাজ্ঞিক, কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মযজ্ঞের প্রথম সঙ্কল্পেই উৎসর্গ করিবেন আপনাকে, যজ্ঞেশ্বর যিনি—সচ্চিদানন্দ আত্মগত মহাপুরুষ, এ যজ্ঞের ফলভাগ গ্রহণ করিবেন স্বয়ং তিনি—কর্ষিত হৃদ্ যজ্ঞক্ষেত্র পরিশেষে স্নিগ্ধ হইবে তাঁহারই প্রেমপয়ঃধারা সিঞ্চনে। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাতেই নিবৃত্তিলাভ করিবে—তাঁহারই জীবাত্মা—তাঁহারই পরমাত্মায় যুক্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে—মানুষ, মহা-আনন্দের অধীকারী হইয়া সার্থক হইবে—সাফল্য লাভ করিবে—আত্মকর্ষণ ফলে আত্মার আত্মাকে লাভ করিয়া ভুলিয়া যাইবে সে আত্মকে!—কেবল আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে বাহ্য অন্তর প্রকৃতিতে ধীর উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইতে থাকিবে বিশ্ব-প্রেমের ঐক্যতানবাদ্য। বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিবে আনন্দে,—মানবের মহা-জীবনযজ্ঞের অমৃত ফল—অণুপরমাণুতে স্বরূপে প্রকাশ পাইবে! তখন—

"সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে!
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন-রণন স্বর্ণ তন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্ম্মল নীল গগনে।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নারী।

সমুদ্র মন্থনজাত দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত
জরা মৃত্যু ভয়হারী, দেবভোগ্য সুধা,
দুরন্ত দানববৃন্দে করিয়ে লাঞ্ছিত,
মিটায়েছে দেবতার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা।
মানব চাহেনি, তবু হয়নি বঞ্চিত।
পূরাইতে তাহাদের অমিয়া পিয়াস
নারী হৃদে সুধানিধি রয়েছে সঞ্চিত,
মাতৃ স্নেহে, পত্নী প্রেমে তাহার বিকাশ।
ওগো নারি! বিশ্বে তুমি বিশ্ব জননীর—
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পু য প্রতিচ্ছবি;
ধরে যথা ক্ষুদ্র দেহে নিশির শিশির—
প্রভাতের সুমহান দীপ্ত রবি-ছবি।
মানবের চিরারাধ্য দেবী তুমি নারি!
রোগে পথ্য, শোকে অশ্রু, পিপাসায় বারি।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার।

মহেন্দ্র-গিরি।

মান্দ্রাজ হইতে হাওড়া আসিবার পথে মাণ্ডাসারোড (Mandasa road) নামক ষ্টেসন হইতে তের মাইল উত্তর পশ্চিমে, মহেন্দ্রগিরি নামক পর্ব্বত। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে এই পর্ব্বতের নামোল্লেখ আছে, কালিদাসের রঘুবংশেও ইহার বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিলালিপিতেও এই পর্ব্বতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, সুতরাং এই পর্ব্বত যে বহুদিন হইতে বিখ্যাত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই পর্ব্বতে চারিটি পুরাতন মন্দির অবস্থিত, তন্মধ্যে একটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অপর তিনটি মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। (১)

উক্ত মন্দির চতুষ্টয় কাহার দ্বারা, কোন সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহার সঠিক মীমাংসা হয় নাই। কোন ইতিহাসেই এই মন্দির সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। ফারগুসনের ইতিবৃত্তে (Fergusson's

(১) See the Reports of the Archæological Society of Deccan Circle. 1915-16.

History of Indian Architecture) বা ক্যানিংহমের ইতিবৃত্তে (Cunningham's Reports of the Archæological Survery of India) এই মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা কোন সময়ে, কাহার দ্বারা নির্ম্মিত তাহা এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

যে মন্দির তিনটি এখনও বিদ্যমান আছে, উহাদের একটির নাম, "যুধিষ্ঠির মন্দির," দ্বিতীয়টীর নাম "ভীমমন্দির" ও অন্যটির নাম, "কুন্তীমন্দির।" ইহাদের এইরূপ নাম করণ কেন হইল, সে সম্বন্ধেও ইতিহাস নীরব। মন্দির ত্রয়ের মধ্যে, ভীমমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, ইহার উচ্চতা প্রায় বাইশ ফুট, সমচতুষ্কোণ আকারে প্রস্তুত। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিয়া, এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, শীর্ষ দেশে একটি চক্রাকারের গম্বুজ, প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের কোন চিহ্নই এই মন্দিরে নাই, সাধারণ ভাবেই নির্ম্মিত। লঙ্গহষ্ট সাহেবের মতে, এই মন্দির নবম শতাব্দীতে প্রস্তুত, এবং ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষোক্ত মত সমীচীন বোধ হয় না। মন্দিরটির নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উহা অসম্পূর্ণ নহে, সুতরাং লঙ্গহর্ষ্ট সাহেবের উক্তির কোন মূল্য নাই। খুব সম্ভব ইহার মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাতে কোন লিপি না থাকায়, ইহা কাহার দ্বারা প্রস্তুত তাহা জানা যায় নাই।

যুধিষ্ঠির মন্দিরও দেখিতে কতকাংশে ভীমের মন্দিরের মত, তবে ইহা ভীম মন্দির অপেক্ষা কিছু বড়, এবং ইহার গাত্রে সুন্দর কারুকার্য্য খোদিত, মন্দিরের ভিতর একখানি শিলালিপি আছে, কিন্তু লিপিখানি কেহ পাঠ করিতে পারেন নাই, উহা কোন ভাষায় লিখিত, তাহাও কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। প্রবেশ দ্বারের উপরে একাদশ শতাব্দীর একখানি শিলালিপি আছে। সেই লিপিতে তাঞ্জোরের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কলিঙ্গ বিজয়ের উল্লেখ আছে। এইরূপ লিপি জয়স্তম্ভেই লিখিত হইত, এই মন্দিরে বা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে, এমন কোন প্রস্তর নাই, যাহাকে জয়স্তম্ভ বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, উহা কোন একটি জয়স্তম্ভেই লিখিত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণ কালে উক্ত লিপি এই স্থানে ছিল না, মন্দির নির্ম্মাণের পরে উহা এই স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। এই লিপি অনুসারে লঙ্গহর্ষ্ট সাহেব ইহার নির্ম্মাণ কাল, একাদশ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

অন্যটি কুন্তী মন্দির, ইহা প্রায় যুধিষ্ঠির মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত, কিন্তু এই মন্দিরটি অন্য দুইটি মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও দেখিতে সুন্দর, ইহার গাত্রস্থ শিল্পকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার মধ্যেও কোন বিগ্রহ নাই, খুব সম্ভব ইহার মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল। এখন ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া লঙ্গহর্ষ্ট সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মন্দির ত্রয়ের নির্ম্মাণ কাল, লঙ্গহর্ষ্ট সাহেব বিভিন্ন শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই মন্দির ত্রয় একই সময়ে, একই ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত এবং যতদূর বিশ্বাস নবম শতাব্দীতে প্রস্তুত। তিনটি মন্দিরই দেখিতে প্রায় একরূপ এবং নামেরও বেশ মিল আছে। এই মন্দির তিনটির সহিত, মহাবলীপুরের কয়েকটি রথ মন্দিরের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইতে ধারণা হয় যে, মহাবলীপুরের রথ-মন্দিরগুলি যাহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এই মন্দিরগুলিও তাহার দ্বারা, উক্ত রথ মন্দির নির্ম্মাণের কিছু পূর্ব্বে বা পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।* মহাবলীপুর হইতে দুই মাইল দূরে উক্ত রথ মন্দিরগুলি অবস্থিত। উহার মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রোপদি প্রভৃতির মন্দির উল্লেখযোগ্য

* একজনের দ্বারা উহার নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা নিরাপদ নহে—একের অনুকরণে অন্য মন্দির নির্ম্মাণের সম্ভাবনা আছে। সঃ।

এবং প্রায় মহেন্দ্রগিরির মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত, এই সকল মন্দির শ্রেণীর মধ্যে যে শিলালিপি আছে, তাহা পাঠ করা কঠিন। যে দু'একখানি শিলালিপি অনুবাদিত (২) ও পঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নাম ও সময়ের উল্লেখ না থাকায়, উহা কাহার দ্বারা, কোন সময়ে নির্ম্মিত, তাহার সঠিক মীমাংসা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসকারগণ, এই রথ মন্দির সম্বন্ধে, আপনা আপন স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ফারগুসনের মতে,—এই রথ মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত। (৩) ইলিয়টসাহেব, (Sir W. Elliot) ইহার প্রস্তর গাত্র-লগ্ন তামিলী লিপি, একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাবে লিখিত সালভান কুপানের (Saluvan Kuphan) মতে উহা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত সংস্কৃত লিপিগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফারগুসন বলেন যে, এই রথ মন্দিরগুলি অধিকদিন নির্ম্মিত হয় নাই, এ গুলি আধুনিক এবং বুদ্ধ মন্দিরাদির অনুকরণে প্রস্তুত। (৪)

অনুমানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় - নানা বিপদ, বর্ত্তমান কালে প্রাত্নতত্ত্বিকগণের যেরূপ অধ্যবসায় ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আশা হয় কালে এ সকল মন্দির সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীশ্রীরাসগীতা।—প্রকাশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী। কুচবিহার। পকেট এডিসন। পৃষ্ঠা ২৮ মূল্য ৵০ আনা। ছাপা ভাল। স্তোত্র; সুখপাঠ্য। কবি—

"রাধিকা রূপিণং কৃষ্ণং রাধিকাং কৃষ্ণরূপিণীং।
রাস যোগানুসারেণ রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহং॥"

যুগল-রূপ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; কিন্তু গীতায় রাস-রস তাদৃশ প্রকট হয় নাই। রচনাও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

উচ্ছ্বাস।—কেদার রচিত। ১৬ পেঃ ডিমাই ১ ফর্ম্মা। মূল্য ৵০ আনা। ছাপা ভাল।

দশটি কবিতায় সাধন-কথা বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিস্ফুট হয় নাই। তত্ত্ব কথার চলিত বুকুনীতে দুর্ব্বোধ। রচনা গতিহীন। ছন্দ-মিল ও ভাবের সহিত যখন কবির সদ্ভাব নাই, তখন সরল গদ্যে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে দোষ ছিল কি?

---

(২) A copy and translation of Sanskrit inscriptions at Mahabalipur. by Dr Arthur Burnell will be found in the Appendix of the Descriptive and Historical papers relating to the seven pagodas on the Caromandel Coast. Edited by Capt M. W Carr.

(৩) See Mr. Fergusson's History of Indian Architecture. Vol II. P. 502.

(৪) Although these Raths are comparatively modern and belong to a different faith, they certainly constitute the best representations now known of the forms of the Buddhist Buildings. Mr. Fergusson's Hist of Arch Vol II. P. 500.

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
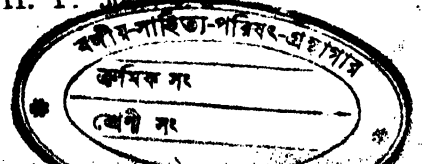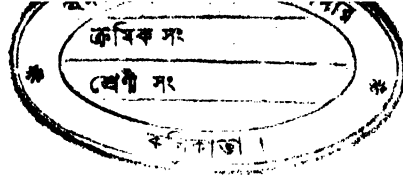
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল। ৯ম সংখ্যা।

নাবুঝ।

দিনের বেদনা নিশীথ বোঝে না তারে,
সে বহিয়া আনে আপন বেদনা ভারে,
জমা হতে থাকে কেবলি নূতন ব্যথা,
নিশা ভাবে মনে দিনের এমন আলো
লেখা নাই কোথা একটি আখর কালো,
এত হাসি তার, অলীক দুখের কথা,
দিবা ভাবে বুঝি এমন শান্তি যার
নিতল নীরব শীতল অন্ধকার,
এত আঁখি-তারা রয়েছে যে মুখ চেয়ে,
সাজে না তাহারে এমন বিলাপ করা ;
শিশির ধারায় কাঁদিয়া ভিজান ধরা,
আকুল নিশাসে সারাটি ভুবন ছেয়ে!
একে চাহে আলো, অপরে অন্ধকার
তাইতে বোঝে না কিসের বেদনা কার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাসন্তী।

—:*:—

নারী-ভাগ্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া বাসন্তীর সমস্ত জীবন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা এই বাসন্তী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের আজন্ম সঞ্চিত সমস্ত বাৎসল্য যেন বর্ষার পুণ্যধারার মত অনাহত অজস্র ধারায় তাহার জীবনের প্রথম কয়টি বর্ষকে একটি নব প্রস্ফুটিত পুষ্পমালার মত বয়ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁহাদের হৃদয়-স্বর্গের এই পারিজাত মাল্যটি উপযুক্ত কণ্ঠে অর্পিত হয়, তাই পাত্র নির্ব্বাচনের অভাব হয় নাই, কিন্তু যিনি এই বাসন্তী মালাটিকে গ্রহণ করিলেন তাঁহার কণ্ঠে দূরে থাকুক সে চরণেও স্থান পায় নাই,--স্থান পাইয়াছিল শুধু গৃহের এক কোণে!

যে চিরকাল অনাদরের মাঝে পালিত, তাহার এই একটি লাভ যে অনাদরের বেদনাবোধ তাহার চলিয়া যায়। বাসন্তীর ভাগ্যে তাহাও হইতে পায় নাই; পিতামাতার অযাচিত স্নেহ তাহার জীবনটিকে পল্লবিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময়ে যখন খর রৌদ্র তাহার জীবনের নব কিশলয়গুলিকে দগ্ধ করিতে বসিল তখন এক বিন্দু স্নেহ বৃষ্টির জন্য তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল! যখন সে জ্ঞানহীনা তখন সে পিতামাতার স্নেহ পাইয়াছিল যেদিন তাহার তৃষ্ণা জাগিল সেদিন তাহার পিতামাতা তাহাকে কাঁদাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন! সে সমস্ত বেদনা দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল কিন্তু মেঘমুক্ত আকাশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? অশ্রুভারাকুল দৃষ্টি নামাইয়া সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল! ভিক্ষা চাহিয়া ভিক্ষা না পাওয়ার মত এমন অপমান আর নাই।

বাসন্তী যে কেন তাহার স্বামীর মনোমত হইতে পারিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না! রূপ যাহাকে বলে তাহা ঠিক তাহার ছিল না, তথাপি সমস্ত তনুলতা ঘিরিয়া একটি বসন্ত-বল্লরীর মত কল্যাণশ্রী তাহাকে মাধুর্য্য দান করিয়াছিল। শ্যামবর্ণা তন্বী, এই বাসন্তী সেবা ও করুণায় যেন নত হইয়া পড়িতেছে! শুভদৃষ্টির সময়ে সে লজ্জায় ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই তাই যখন সে বিবাহের পর লজ্জা ভাঙ্গিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল তখন শুভক্ষণ বহিয়া গিয়াছে! সেই অশুভ ক্ষণের প্রভাবই যে তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যাইতেছে বাসন্তীর এই বিশ্বাস কিন্তু ভাগ্যদেবতা যেখানে কৌতুক করিয়া ভুল করেন সেখানে মানবের কি সাধ্য তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে! এ ভুল যেন পশমের বোনার মত, একটি ঘর ভুল হইলে আর তাহা সংশোধনের উপায় নাই, তাহাকে সারা জীবন টানিয়া চলিতে হইবে। বাসন্তীর স্বামী, পত্নীর যে আদর্শ মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল তাহার সহিত বোধ হয় বাসন্তীর মিল হয় নাই তাই সে এমন প্রথম হইতে চটিয়াছিল। ভাগ্য যে সর্ব্বদা মনের মত জিনিষ জোগায় না মানুষকেই যে তাহা মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে হয় এই বোধটুকু বুঝিবার মত ধৈর্য শক্তি বাসন্তীর স্বামীর ছিল না। ছোট বেলা হইতে রূপের নেশা এমনি করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে কলেজে তাহার বন্ধুদের সহিত ইহা লইয়া কতবার মনান্তর হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্যকে ভালবাসাই যে উন্নত হৃদয়ের লক্ষণ এই যুক্তির উপর যে জোর তর্ক করিয়া আপনার দিক বজায় রাখিয়াছে! বন্ধুরা বলিয়াছে "বেশ বেশ, সুন্দরকে না হয় ভালবাসলুম তাই বলে অসুন্দরকে ঘেন্না করতে হবে এমন কিছু কথা আছে?" সে বলিয়াছে সুন্দরের উপর

আকর্ষণ হইলেই কুৎসিতের উপর বিরাগ আসিবেই! বন্ধুরা তখন ঠাট্টা করিয়াছে "আরে রেখে দে তোর সুন্দর; যদি একটি কালো কুচ্ছিত মেয়ে তোর বৌ হয় তখন দেখে নেব রাগ বিরাগ! তারপর যখন একদিন তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ সুরেন, তুমি এখন বড় হয়েছ, রোজগার করছ, আমার ইচ্ছে তুমি বিয়ে করে ঘর-সংসার কর।" তখন সে বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে কথা মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পিতা বলিলেন "ঐ যে ও পাড়ার হরিহর মুখুর্য্যের মেয়ে তার সঙ্গেই আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই, ওর বাপ বড় মানুষ না হক্, শুনেছি টাকা কড়ির টানাটানি নেই, আর মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী আর লেখাপড়াও জানে। সুরেন যেন তখন কনে দেখার কথা তুলিয়া একটু কিছু বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াই পিতা বলিলেন "না বাবা ঐটি আমি পছন্দ করিনে। আমরা প্রৌঢ়, আমরা যাকে ভাল বল্‌ছি তাকে গ্রহণ করতে তোমরা দ্বিধা কর কেন? আমার বেলা কি আর আমি তোমার মাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম? তা ত নয়, তোমার ঠাকুরদা ঠাকুমাই ঠিক করে ছিলেন তা বলে আমি কি কিছু ঠকে ছিলুম?" তাহার পর আর কোন প্রতিবাদ করাই চলে না, বিশেষ সে তাহার পিতার তিনটি কন্যার পর বড় আদরের পুল! সে পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট হইতে ভাবী পত্নীর নামটি উদ্ধার করিল, বাসন্তী! নামটির মাঝে যে একটি মাধুরী আছে তাহারই উপর তাহার সৌন্দর্য্যপ্রিয় মনটি সৌন্দর্য্যের স্বর্গ রচনা করিতে লাগিয়া গেল! বাসন্তী যাহার নাম তাহার গায়ের বর্ণ যে ঐ মধ্যদিনের রবিকরের মত হইবে, তাহার নাসিকা চক্ষু অধর যে তুলির লিখনের মত হইবে তাহাতে আর তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। সে আপন হৃদয়ের কল্পনার রং দিয়া সেই কল্পনায় বাসন্তীর রক্তাভ কপোলের উপর আঁখি পল্লবের ছায়া ফেলিল, সূক্ষ্ম সুন্দর করিয়া ভুরুর টানটি টানিয়া দিল; হাসির হিল্লোলে অধরের পাশে ছোট একটি টোল খাওয়াইতে সে ভুলিল না! তাহার কল্পনার সৌন্দর্য্য প্রতিমা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে যখন একদিন বাস্তবের বাসন্তী তাহার সাদাসিধা লাবণ্য লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সুরেনের দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন দৃষ্টির পদাঙ্কিত করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে চাহিল! তাহার সর্ব্বপ্রথম ঘা লাগিল আত্ম-অভিমানে। স্বার্থের উপর ঘা পড়িলেও মানুষ সহিতে পারে কিন্তু অভিমানের উপর আঘাত সহে না! এতদিনের মতকে যে ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছে তাহাকে সে কোনমতেই ক্ষমা দিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিল না, ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল! সে ত তাহাকে ডাকিয়া লয় নাই, পিতা ডাকিয়াছেন তাই সে পিতার ঘরে থাকিবে মাত্র। বাসন্তীর স্বামী যদি তাহাকে বকিত ঝকিত মারিত ধরিত তাহাও সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত কিন্তু এই যে দিবারাত্রি একত্র বাস অথচ স্বামী তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতেছেন, এ যেন তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবহেলা হইতে যে আঘাত শতগুণে ভাল। স্বামী যদি বলিতেন কি তাঁহার মনোনীত হয় নাই তবে সে যে প্রাণ দিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারিত, কিন্তু কাঁটা কোথায় বিঁধিয়াছে না জানিলে সে কেমন করিয়া কাঁটা তুলিবে? প্রথম প্রথম সে বড় কাঁদিত, পিতা তার উপর মনে মনে রাগ করিত কিন্তু ক্রমে সহিয়া আসিল। আঘাতই মানুষকে সংযম দান করে। মেয়ে মানুষ ভাগ্যকে দোষী করিতে পাইলে আর কাহাকেও দোষী করিতে চাহে না। সে কোন পক্ষে দোষারোপ না করিয়া অনির্দ্দিষ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া পরম সহিষ্ণুতার সহিত বেদনা বহন করিতে পারে। দুর্ব্বলের ধর্ম্মই এই! যখন সে বলশালীর উপর প্রতিশোধ লইতে পারে না তখন সে নিজের উপরই সমস্ত শোধ তুলিয়া লয়।

(২)

বিবাহের পর আট বৎসর এমনি করিয়া কাটিয়া গেল; আর যদি বিধাতা বাদ না সাধিতেন তবে বাকী জীবনের বাকী কয়টা আট বৎসরও এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইত কিন্তু ভাগ্যদেবতা এবার নূতন কৌতুক আরম্ভ করিলেন! সুরেনের মনের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসা তাহাকে লইয়া ঘোড়দৌড় সুরু করিয়া দিল। এই বন্দীশালার মাঝে এতখানি বাসনা লইয়া বদ্ধ হইয়া থাকা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পুরাতন বন্ধুসমাজে মুখ দেখান তাহার ভার হইল, একবার যেখানে জয়পতাকা উড়ান যায়, পরমুহূর্ত্তে সেখানে গিয়া অবনতি স্বীকারের মত লজ্জা আর নাই! তাই সে বাছিয়া বাছিয়া নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিল এবার সে মেয়ে পুরুষের বিচার রাখিল না। তাহাদের রূপ যে পরিমাণে ছিল, গুণ সে পরিমাণে ছিল না। পুত্রকে এমনি করিয়া বিপথগামী হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার অশান্তির অবধি রহিল না; কিন্তু বাঁধ যখন ভাঙ্গে তখন সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ তুচ্ছ তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া যায়! বধূমাতার মুখের দিকে তিনি ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেন না; তিনি বুঝিতেন যে নিজে এত দুর্ব্বল, এত পরমুখাপেক্ষী, এত স্নেহভিক্ষু সে নষ্ট হইবার আকর্ষণ হইতে পুত্রকে বাঁচাইতে পারিবে না, এই জন্যই তিনি অধিক চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। মানুষের শরীরে আর কত সহিবে! এত অত্যাচার এত রাত্রি জাগরণে সুরেনের স্বাস্থ্য ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল সে ব সন্তীও বুঝিয়াছিল কিন্তু বুঝিলেও ঠেকাইয়া রাখিবার শক্তি কোথায়? তাহার হাতের সেবা গ্রহণ করিতে সুরেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিত; সে ঘরে প্রবেশ করিলে সুরেন ত্রাস্ত হইয়া উঠিত। একদিন বাসন্তী একাকী ঘরের ভিতরে স্বামীর জুতা কাপড় ঝাড়িয়া রাখিতেছিল এমন সময়ে সুরেন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অন্য দিন হইলে বাসন্তী কাজের অছিলায় গৃহান্তরে চলিয়া যাইত কিন্তু সেদিন সে স্থির করিয়াছিল স্বামীকে বাহিরে যাইতে দিবে না তাই সে বলিল "কোথাও যাচ্ছ না কি?" সুরেন বলিল "একবার বাইরে যেতে হবে,—কাজ আছে! বাসন্তী বুঝিত কাজ শুধু ছলমাত্র, বলিল "তা হক্ আজ থাক।—"

সুরেন সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া গায়ে চাদরখানি ফেলিয়া—দ্বারাভিমুখী হইল; বাসন্তী দ্বারের কাছে গিয়া বলিল "শুনছ? আজ থাক্ কাল কাজ হবে এখন!" বাধা পাইয়া সুরেনের রোখ চড়িয়া যাইতেছিল, সে উত্তর না দিয়া বাসন্তীকে ঠেলিয়া হন্ হন্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বাসন্তীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িল, সে বুঝিল যেখানে অধিকার নাই সেখানে জোর খাটান কত বড় বিড়ম্বনা! তারপর হইতে আর সে কখনও কিছু বলে নাই! মানুষ যে মানুষের এত কাছে থাকিয়াও এত অপরিচিত থাকিতে পারে তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। মেয়ে মানুষ দুর্ব্বল বলিয়াই একটা কিছুর আশ্রয় না পাইলে বাঁচে না। সেবাবৃত্তি তাহাদের এতখানি প্রবল যে সেবার একটা উপলক্ষ্য না পাইলে তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বাসন্তীর হৃদয়ের অবরুদ্ধ প্রেমটি একদিকে আঘাত খাইয়া অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। মানব প্রকৃতির উপর আর তাহার শ্রদ্ধা ছিল না, সমস্ত বিশ্বজগতের তাহার কাছে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যখন মানুষ চিনিবার অবকাশ হইল তখনই সকলের চেয়ে নিকটের মানুষটি সকলের চেয়ে দূরে গিয়া পড়িল তাই সে বুঝিল প্রেমের মর্য্যাদা মানুষ রাখিতে জানে না। বাড়ীর গরু বাছুরগুলির সহিত ও বাগানের তরুলতার সহিত তাহার অন্তরের ঘনিষ্ঠতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, মানুষের চেয়ে তাহারাই তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিল। তাহারা তাহার সেবা না পাইলে বিষন্ন হইয়া

উঠে, তাহার হাতের ঘাস না পাইলে গরুগুলি চীৎকার করে, খাঁচার ভিতরের টিয়া পাখীটা ফল না পাইলে ডাকিয়া ডাকিয়া কর্ণ বধির করিয়া দেয়, বাগানের গাছগুলি তাহার হাতের জল না পাইয়া শুখাইয়া ওঠে! মানুষ ত এমন করিয়া তাহার সেবার অপেক্ষা রাখিত না, তাই সে স্বামীর ঘরে এই এক জায়গায় শুধু গৌরব অনুভব করিত। দূর যখন দূর থাকে তখন সে তত ভয়ানক নহে – যত ভয়ানক নিকট যখন দূর হয়!

একদিন সুরেনের জ্বর হইল, পিতা বলিলেন ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়াছে কিন্তু বাসন্তীর হৃদয় এক অজানিত আশঙ্কায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জ্বর ক্রমে অধিক হইল, তাহার সহিত অল্প কাশী ও বুকের বেদনা বাড়িল। ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিলেন, তারপর বলিলেন নিউমোনিয়া হইয়াছে, অবস্থা সাংঘাতিক। সুরেনের তিন দিদিই আপনাপন শ্বশুরালয়ে বিদেশে ছিলেন, নিকটে সংবাদ দিবার মত ছিলেন শুধু সুরেনের এক বিধবা পিসি। তাঁহাকেই ডাকান হ'ল, ঔষধ পথ্য চলিতে লাগিল, সেবা শুশ্রূষার অভাব হইল না। সুরেন অধিকাংশ সময়ই চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া থাকিত, বাসন্তী শিয়রে বসিয়া পাখা করিত, পথ্য জোগাইত, পিসি দিবারজনী সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। বৃদ্ধ পিতা ভয়ে ভাবনায় অধীর; পিসি একবার গিয়া ভাইকে সান্ত্বনা দিতেন, একবার রোগীর কাছে ছুটিয়া আসিতেন, একবার বা বৌকে বুঝাইতেন। ডাক্তার ক্রমেই আশাহীন হইতে লাগিল। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে পিসি বলিলেন "তুমি সুরেনের মাথায় হাত বুলাও বৌ, আমি একবারটি দাদার কাছ থেকে ঔষধটা নিয়ে আসি!" বাসন্তী ধীরে ভয়ে ভয়ে গিয়া তার সেবাকোমল হাতখানি স্বামীর কপালে পাতিয়া দিল, সুরেন তখন অর্দ্ধচেতন অবস্থায় ঘুমাইয়া ছিল। পিসি ঔষধ ঢালিয়া বাসন্তীর হাতে দিয়া বলিলেন "সুরেনকে খাইয়ে দাও, বৌ দাঁড়াও আমি ওকে জাগাই! ওঠ বাবা একবারটি ওষুধ খাও" বলিয়া পিসি সুরেনের গায়ে হাত দিলেন। সুরেন চক্ষু খুলিল কিন্তু কিছুক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বাসন্তী যখন মুখের কাছে ঔষধ ধরিয়া বলিল "খেয়ে ফেল ওষুধটুকুন" তখন সুরেনের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার রোগপাণ্ডু মুখখানা মনের উত্তেজনায় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল, দুই হাতে সে বাসন্তীর হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল "ওকে যেতে বল পিসি।" গ্লাসশুদ্ধ ঔষধ সশব্দে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল, বাসন্তী জড়পুত্তলীর মত পাশের ঘরে চলিয়া গেল! তাহার বুকের ভিতর যেন ফাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া ডেলা পাকাইয়া তাহার গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিতেছিল তাই আঘাতের বেদনা যেন নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কাঁদিলে পাছে স্বামীর অমঙ্গল হয় তাই সে কাঁদিতে পারিল না, শুধু জানালার কাছে গিয়া সেই সন্ধ্যা আকাশের দিকে তার বেদনাভরা চোখ দুটি তুলিয়া দুই হাত বুকের উপর জোড় করিয়া আজ প্রথম দিন বলিল "হা ভগবান, একদিনের জন্যেও রূপ দিলে না কেন?" পিসির কানে সে কথা গিয়াছিল বুঝি, তিনি পিছন হইতে বাসন্তীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন "জ্বরের ঘোরে কি বলতে কি বলেছে তা বলে মন খারাপ করো না মা! আমি ওর কাছে আছি, তুমি গিয়ে সাবুটুকুন করে আনো।—" এই একটি কাজের উপলক্ষ্য পাইয়া বাসন্তী যেন বাঁচিয়া গেল। পিসি মুখে বলিলেন বটে ও জ্বর বিকারের কথা কিন্তু মনে মনে সমস্ত অবস্থাটি একরকম আঁচ করিয়া লইতে পারিলেন। বাসন্তীর জন্য তাঁর হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠিল, তাঁর একমাত্র কন্যা সুরমা যে আজ সবে দুই বৎসর হইল তাঁহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। একটি কন্যা লইয়াই যে পিসি বিধবা হইয়াছিলেন, তারপর সেই স্নেহপুত্তলী যখন বড় হইল, তখন সকলেই বলিল "মেয়ে ডাগর হ'ল আর কতদিন খুবড়ি করে রাখ্বে!" পিসি সে কথা কানে তুলেন নাই তারপর যখন পাড়ায় নিন্দা আরম্ভ হইল, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে খোঁচা দিতে লাগিল তখন অগত্যা পাত্র খুঁজিতে হইল! পাত্র জুটিল, সকলে বলিল "এমন পাত্র ছাড়্লে

ঠক্‌তে হবে!" তখন পাঁচজনের পরামর্শে তাহারই হাতে তিনি কন্যা সমর্পণ করিলেন। জামাই সেই যে মেয়েকে লইয়া গেল আর পাঠাইল না। মেয়ে মাকে দেখিবার জন্য কাঁদিয়া খুন হইত; কত সাধ্য সাধনা করিত কিন্তু জামাইয়ের মন গলিত না।—সে বৎসর পূজার সময়ে পিসি জামাইকে হাত জোড় করিয়া লিখিলেন একবার যেন মেয়েকে পাঠাইয়া দেন, দুদিন ভাল খাওয়াইয়া ভাল পরাইয়া, তিনি মনে শান্তি পাইবেন, সে পত্রের উত্তর পর্যান্ত আসিল না। তারপর কোথাও কিছু নাই হঠাৎ একদিন শুনিতে হইল সুরমা যক্ষাকাশে মারা গিয়াছে, জামাই অসুখের সংবাদ পর্যান্ত দেয় নাই! পিসি সেইদিন যেন আবার নূতন করিয়া বিধবা হইলেন। বুকের এই পুরাতন ক্ষত হইতে নূতন করিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল; সুরমা যে তাঁহার কোলেই আসিতে চাহিয়াছিল, তিনি যে তাহাকে কোলে লইতে পারেন নাই, সে কোল যে এখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। দুই বৎসর পরে সে শূন্য স্থানের একটু আজ বাসন্তী পূর্ণ করিয়াছিল!

(৩)

দ্বারের বাহির হইতে কে ডাকিল "বৌ"; ভিতর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না! পিসি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন "বৌ বৌমা", অন্ধকারে কিছুই ভাল করিয়া ঠাহর হয় না। দ্বারের কাছে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তার সেই ম্লান আলোটি বাসন্তীর থান কাপড়ের উপর পড়িয়া বড় ভীষণ রকম সাদা দেখাইতেছিল। বাসন্তী আঁচল পাতিয়া জানালার কাছে মাটিতেই গড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর যেন আপনাকে কৃত্রিম ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা দুঃসাধ্য! এ তাহার শুভ হইল কি অশুভ হইল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! সে অনেক চেষ্টা করিয়াও চোখে এক ফোঁটা জল আনিতে পারিল না. এক অশ্রুহীন বেদনায় যেন তাহার বুকের ভিতর অবধি ধূ ধূ করিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল ঐ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস যেন শীতল বিদ্রূপের মত তাকে ঠেলা দিয়া যাইতেছে. ঐ সন্ধ্যা আকাশের উজ্জ্বল তারাটা যেন কঠিন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে তার আলো যেন একটি তীক্ষ্ণ তীরের মত তার বুকে গিয়া বিঁধিল, সে দুই হাতে চোখ ঢাকিল! তার মনে হইল তার সমস্ত জীবনটা যেন আগাগোড়া বিধাতার বিদ্রূপ! যে সুযোগকে দ্বার হইতে বিদায় করিয়া দেয় তার মত হতভাগ্য আর কে আছে? একটি মানুষের প্রেমের জন্য আর একটি নূতন সংসারকে মানুষ অনায়াসে আপন হইতে আপন করিয়া লইতে পারে কিন্তু তাহার ভাগ্যে সে প্রেম ত জোটে নাই! যে প্রেমের অমৃত পান করিয়া মানুষ অমর হয় সে অমৃত সে জীবনে এক ফোঁটাও পায় নাই! তার প্রাণ যেন পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল "না না না এ আগাগোড়া সব মিথ্যা!" এমন সময়ে পিসি আসিয়া বাসন্তীর মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "বৌ, মনকে স্থির করতে চেষ্টা কর মা, মনকে সংযত করতে চেষ্টা কর! এই ত সময় এসেছে, বৌ. সুখে ত মানুষের মতিভ্রম হয়. সুখ ত আমাদের অন্ধ করে রাখে, দুঃখই যে চাই মা, তা নইলে মন বসবে কেন?" বাসন্তী পিসির কোল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল, কথা তাহার মুখে আসিল না. সে এ কথা বুঝাইতে পারিল না যে একদিনের জন্যও যদি সে প্রেম পাইত তবে আজ মনস্থির করা কত সহজ হইত! পিসি আবার বলিতে লাগিলেন "দেখ বৌ, দুঃখকে ভালবাসতে শেখ, দুঃখ যে আমার একেবারে ঘরের জিনিষ তাই আমি তাকে কোন মতেই ভয় করতে পারিনে! যখন আমি ভাল করে সংসার চিনি নি, তখন থেকে দুঃখকে চিনেছি তাই সংসারকে আর আমার ভয় করা হ'ল না। সুখ ত আর টেঁকতে পেল না, আমার চোখের সামনে দিয়ে কোথায় চলে গেল।" বাসন্তী বাধা দিয়া বলিল "আচ্ছা পিসি, তবে তুমি টেঁকে আছ কেন

করে, তোমার রইল কি ?" পিসি বড় করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন "কি রইল মা ? যা থাক্‌বার তাই রইল ! সত্য রইলেন আর আমি রইলাম। সুখের ত দরকার নেই আমাদের, যে টুকু পাই তাই যে যথেষ্ট বৌ !" বাসন্তী একবার যেন বুঝিতে পারিল এই কথাটির মাঝে কি গভীর বেদনা ! পিসি বলিলেন "দেখ বৌ, দুঃখ যখন প্রথম আসে তখন মনে হয় কি ভয়ানক, কি ভীষণ, কি অন্ধকার কিন্তু ঐ ভিতরে ঢোক্‌বার সবুরটি চাই তারপর একেবারে আলোয় আলো হয়ে যায়, আঃ কি সুন্দর সে !" পিসি অনেক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন বাসন্তী মন দিয়া দুঃখ-সুন্দরকে ভাবিতে চেষ্টা করিল কিন্তু একটি ধারণাও ধরা দিল না !

পরদিন বাসন্তীর শ্বশুর পিসিকে ডাকাইয়া বলিলেন "দিদি, আমার ভাগ্যে যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন বৌটার জন্যই ভাবনা হয় ! এই সমর্থ বয়েস, ছেলেপুলে নেই, ও থাক্‌বে কি নিয়ে ? আমি বলি ও আমাদের গুরুঠাকুরের কাছে মন্ত্র নিক্‌, যা হক্‌ একটা উপলক্ষ্য হবে।" পিসি শুনিলেন, বলিলেন "আচ্ছা আজ বলে দেখ্‌ব" কিন্তু মন তাঁর বলিল "মন্ত্র নেওয়া ত মুখের কথা নয়, মনের ভিতর থেকে যে চাওয়া চাই, তা নইলে মন্ত্র যে আগাগোড়া মিথ্যা হবে।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাসন্তী সংসারের কাজ সারিয়া পিসির কাছে আসিয়া বসিল, বলিল "পিসি একটা কথা বলিতে মায় ! তুমি আমায় বৌ বল ঐটে আমি কোন মতে সহ্য করতে পারি নে ! তোমাদের এই বাড়ীর বৌটুকুনের ভিতর ছাড়া আর কি আমার কোথাও অস্তিত্ব নেই ? আর, যে যা বলুক তুমি আমায় বৌ বলতে পাবে না।" পিসি ধীরে ধীরে বাসন্তীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তবে আমি তোমার নাম ধরেই ডাক্‌ব মা !" বাসন্তী বলিল "নাম ধরে ডাক্‌লে আমার কি মনে হয় জান পিসি ? আমি এই জগতের ঘরের লোক আর বৌ বল্‌লে মনে হয় তোমাদের এই বাড়ীর কখানা দেয়ালের বাইরে আমার আর স্থান নেই ! নিজের নামের ভিতরেও যেন একটা মুক্তি আছে, সেই মুক্তির সুখটি আমি তোমার কাছ থেকে পেতে চাই পিসি !" বাসন্তীর মনে হইতেছিল যার জন্য সে এই বাড়ীর বৌ হইয়াছে তার কাছে সে ত কোন অধিকার পায় নাই, তবে সে ঐ নামটুকুর অধিকারইবা লইবে কেন ? প্রেমের মুক্তই যদি সে না পাইল তবে এ ত দাসত্বের বন্ধন ! যেথানে সে শুধু অবহেলা পাইয়াছে সেখানে যে তার জীবনটি একেবারে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, তার মনের ভিতরে যে এক জায়গায় সত্য ছিল এই মিথ্যাকে কোন মতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না ! পিসি সমস্ত বুঝিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না শুধু তাঁহার করতলের কোমল স্পর্শে যেন বাসন্তী একটি সহানুভূতি ভরা উত্তর পাইল !

আকাশময় তখন তারা ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিতেছে, দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। বাহিরে হিম পড়িতেছিল, সেই পাতলা সাদা আবরণের আড়াল হইতেও তারাগুলি যেন অশ্রুপূর্ণ একদৃষ্টে তাঁহাদের দেখিতেছিল ! পিসি তাঁহার বিশ্বাসভরা চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলিতেই সন্ধ্যাতারার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অতি বড় দূরকে যেন বুকের কাছে পাওয়া গেল, তিনি মনে মনে সেই সত্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "বড়কে যে বড় বলে মান্‌তেই হবে মা, তা নইলে যে আমরাই ঠক্‌ব। সে তোমার মাঝেই হন্‌, আমার মাঝেই হন্‌ যেখানেই তাঁকে দেখ্‌ব সেখানে যে মাথা নীচু কর্‌তেই হবে !" বাসন্তী যে কখনও সেই বড়কে পায় নাই, তাই সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন পূজা সারিয়া আসিয়া পিসি বাসন্তীকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন "দেখ মা, তোমার শ্বশুরের ইচ্ছা তুমি গুরুঠাকুরের কাছে মন্ত্র নাও ; তা নইলে পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বল্‌বে।" তখন

বাসন্তী হাসি রাখিতে পারিল না। অদৃষ্টের মার যে খাইয়াছে, বিপদের চোখরাঙ্গানিকে সে কি আর ভয় করে? পিসি ধীরে ধীরে বাসন্তীর হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "দেখ বাসন্তি, এ জোরের কথা নয়। আমি তোমায় কিছু আদেশ কর্‌ছিনে মা, নিজের মন বুঝে দেখ, যদি ভিতর থেকে সাড়া পাও তবেই এ পূজার ভার নিও তা নইলে শুধু কষ্ট পাবে!" বাসন্তী বলিল "তবে পিসি, ও আমার দ্বারা হবে না। আমি যে মোটে ভগবানকে ডাক্‌তেই জানি না, পূজা করব কেমন করে?" পিসি বলিলেন "ডাক্‌লেই ডাক্‌তে শিখ্‌বে মা, এ ত শেখাবার কাজ নয়!" বাসন্তী বলিল "আচ্ছা পিসি, তুমি কি নাম দিয়ে তাঁকে ডাক?" পিসি বলিলেন "ডাক্‌তে কি আর জানি মা? নতুন নাম কোথায় পাব বল? ঘরের লোককে যে নামে ডাকি সেই নাম দিয়ে তাঁকেও ডাকি?" বাসন্তী বলিল "আচ্ছা তুমি উত্তর পাও পিসি?" পিসি বলিলেন "হঁা বাসন্তি, যে নামে ডাকি সেই নামেই সাড়া পাই!" বাসন্তী পিসিকে দুই হাতে জড়াইয়া বলিল "আমি যে মানুষকেই পাই নি পিসি, ভগবানকে পাব কেমন করে?" পিসি বলিলেন "মানুষ নন্ বলেই তাঁকে পাবে বাছা, মানুষকে মানুষ এমন করে পায় না!" এ যে কেমন করিয়া হইতে পারে বাসন্তী কিছুই বুঝিতে পারিল না! যাঁহাকে সে স্থির হইয়া ধ্যানও করিতে পারে না তাঁহাকে কি পূজা করা যায়? সে ত তাঁহার নিকট হইতে সুখ পায় নাই, দয়া পায় নাই তবে সে কেমন করিয়া তাঁহাকে ভাবিবে? সে যে তাঁহার নিকট হইতে রূপও পায় নাই, একদিনের জন্যও স্বামীর মন পাইল না, এত বড় নিষ্ঠুরকে সে ডাকিয়া করিবে কি? সে বলিল "না না পিসি ও আমার দ্বারা হবে না। পূজার ঘরে বসে আমি যদি তাঁকে ভাব্‌তে না পারি সে কি বিশ্রী হবে। না না না তুমি বাবাকে বলো পূজো করতে আমি পারব না!" পিসি বাসন্তীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন "অত শীঘ্র উত্তর দিও না মা, মনকে বুঝে দেখ্‌বার সময় নাও! ভাল করে ভেবে দেখো মন যদি রাজি হয় তবেই নিও।" তিনি বুঝিতেছিলেন এমন করিয়া মানুষের জীবন কাটিতেই পারে না! স্বামীহারা ভগবানকে না পাইলে বাঁচিবে কেন? তিনি আপনার মনে বলিলেন "মানুষের মন ত, বদ্‌লাতে কতক্ষণ! কখন কি হয় বলা যায় না।" সেদিন একাদশী ছিল বলিয়া কাজের তাড়া ছিল না, দিনের ঘণ্টা কয়টি যেন ক্ষুধিত রাক্ষসের মত বাসন্তীকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল! পিসির কথাগুলি তাহার মনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কিছুতেই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! জীবন যে এমন করিয়া কাটিতে পারে না তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিতেছিল কিন্তু ভগবানকেই যে পাইতে হইবে এ কথা সে কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না! সে যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, মনে শান্তি পাইতেছে না তাহা পিসি লক্ষ্য করিতেছিলেন তবু তিনি একবার ত সান্ত্বনা দিলেন না, তিনি মনকে কঠিন করিয়া বলিলেন "অস্থির হওয়াই যে চাই। কাঁদুক্ একবার তবেই ও শান্তিময়কে পাবে!" বাসন্তী সেদিন সকাল সকাল শুইতে গেল।

সে দেখিল যেন তাহার শিয়রের কাছে ভগবান দাঁড়াইয়া আছেন, এত রূপ সে জন্মে দেখে নাই! কিন্তু সে রূপের মাঝে যেন জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধতা আছে তাই সে যতই দেখিতে লাগিল ততই যেন তাহার শরীর মন জুড়াইয়া যাইতে লাগিল! এমনি করিয়াই সময়টুকু কাটিয়া যাইত কিন্তু বাসন্তী অবাক হইয়া শুনিল ভগবান কথা বলিতেছেন, সে শব্দ যেন কত দূর হইতে আসিতেছে, ঠিক সেই পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল তারাটির বুক হইতে।--আবার যেন কত নিকট হইতে আসিতেছে, ঠিক এই শয্যার শিয়র হইতে! সে শুনিল ভগবান বলিলেন "তুমি কি চাও তাই আজ বলে নাও মা!" সে যেন সমস্ত হৃদয় খুঁজিয়া দেখিল কি তাহার অভাব আছে! শেষে যেন হাত জোড়

করিয়া বলিল "আমি যে রূপের অভাবে স্বামীর প্রেম পাই নি,—এ খেদ আমার গেল না ! আমি যেন রূপ পাই, তাই করো ভগবান !" তিনি যেন হাসিলেন, তেমন হাসি বাসন্তী কখনও দেখে নাই—কখনও না ! তারপর যেন পরম করুণার সহিত বলিলেন "আমায় প্রণাম করতে শেখ মা, অনন্ত রূপ পাবে !" তারপর বাসন্তী যেন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার চরণ দু'খানি যেন বাসন্তীর মাথায় ঠেকিল ! সে যেন পদ্মগন্ধ পাইল, এই আনন্দের অনুভূতি সে এত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল যে তাহাতেই তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল !—এক মুহূর্ত্ত সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, ঘর একেবারে অন্ধকার শুধু জানালার ভিতর হইতে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর ক্ষীণ চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না তাহার গায়ে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে ! তাহার মনে হইল এখনও তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, খুব কাছে,—খুব কাছে ! সে তাহার নব জাগ্রত সমস্ত চেতনা দিয়া বলিয়া উঠিল "তুমি এত সুন্দর হরি ! হে সুন্দর, আজ আমি তোমায় দেখ্‌লুম, আমি বাঁচ্‌লুম ।"

আলো জাগিবার দেরী সহিল না, পূর্ব্বাকাশ একটু উজ্জ্বল হইতেই সে পিসিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল তাহার ইচ্ছা হইল সে বলে—আজ সে তাঁহাকে দেখিয়াছে—তিনি কি অপূর্ব্ব সুন্দর ! তাঁহাকে পূজা না করিলে সে যে সুন্দর হইতে পারিবে না, যে রূপের অভাবে সে স্বামীর অনাদর পাইয়াছে সেই রূপ যে সে সেই অরূপের নিকটেই পাইবে, তা ছাড়া আর যে উপায় নাই ! তাহার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না, সে শুধু বলিল "আজই গুরুঠাকুরকে ডেকে পাঠাও মা, আজি আমি মন্ত্র নেব, আর দেরী সইছে না !" এই বলিয়া সে পিসিকে প্রণাম করিল। পিসি দুই বাহু দিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কপালে চুম্বন করিলেন।

প্রভাতী ।

—:*:—

তোমারি দুয়ারে বাতায়নে আজ
প্রভাতের রবিখানি ;
রাঙিয়া উঠেছে গগন ভুবন
পুলক মগন প্রাণী !—

খোল খোল দ্বার কে ঘুমাও আর—
প্রভাতের সাড়া প্রাণে নাই কার—
কেগো ও এখন স্বপনে মগন
অলস শয্যা টানি ;
জাগ ওগো আজ তোমারি দুয়ারে,
প্রভাতের রবিখানি ।

সারাটি বিশ্বে মহা জাগরণ,
করম সাধনে সকলে মগন
সকলেই চায় স্থাপিত আসন
সাধনে সিদ্ধি আনি ;
রাঙিয়া উঠেছে, নবীন তপন
পুলক মগন প্রাণী।
উচ্চলক্ষ্য সাধনে আসিয়া
কে চায় মোহেতে সব পাশরিয়া
অলসের দ্বারে চির রহিবারে
জীবন চপল জানি
ওঠো ওগো আজ দুয়ারে তোমার
প্রভাতের রবিখানি।
তুমি কি এখনো রহিবে শয়নে ?
ছুটিবে না দলি' বিশ্ব চরণে ?
ক্ষিপ্ত পরাণে লক্ষ্য সাধনে
এস আজ মহাবাণী,
আর কেন ওঠো বাতায়নে তব
প্রভাতের রবিখানি।

শ্রী—

কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা।*

এই সভার ১৩২৪ সনের ১৪ই আশ্বিনের অধিবেশনে ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান জে, ডি, এণ্ডারসন সাহেবের এক পত্র পঠিত হইয়াছিল। পত্রখানা কোচবিহারের প্রাচীন ভাষার তত্ত্বানুসন্ধান সম্পর্কে লিখিত। এণ্ডারসন সাহেবের ন্যায় বঙ্গভাষাবিদ্ ব্যক্তি বঙ্গীয় ইংরেজ সমাজে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ভাষাবিদ্ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণেরও অভাব নাই। তিনি এখন বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাঁহার জন্মভূমি সুদূর ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গের ভাষা আলোচনার আগ্রহ তাঁহার এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। নামতঃ এণ্ডারসন সাহেবের পত্রের আলোচনার জন্য, কিন্তু

* কোচবিহার সাহিত্য-সভার তৃতীয় বার্ষিক ২য় অধিবেশনে পঠিত।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টীর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সদস্য-গণের মধ্যে কেহ কেহ পত্রের লিখিত বিষয় অনবগত থাকিতে পারেন, এজন্য তাহার আবশ্যকীয় অংশের পুনরুল্লেখ করিতেছি ;—

"That the মাতৃভাষা of the State (Cooch Behar) is not Bengali but Koch. It is dying-out, of course, as the Gaelic speech has died out in Cornwall. But we must remember that the Koch Kingdom extended all over Estern Bengal and Assam and even into Bhutan, and at that time the Koch language was spoken all over that area. The Kachari or Kochari of Darrang is a survival of that period. Now when a language is destroyed by a greater and more copious language it nevertheless affects and modifies that language. We must remember that the ancesters of most of the people in Estern Bengal and Assam spoke, not Bengali or Assamese but some dialect of the Koch or (বড়) Language, which has transmitted tricks of উচ্চারণ and idiom to people who now use the Bengali vacabulary"

অর্থাৎ কোচবিহারের মাতৃভাষা বাঙ্গলা নহে, কোচভাষা। কর্ণওয়ালে গ্যালিক ভাষা যে প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোচভাষাও তদ্রূপ বিলুপ্ত প্রায়। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোচরাজ্য এক সময় পূর্ব্ববঙ্গ আসাম এমন কি ভূটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই সময় এই স্থানে কোচভাষা কথিত ভাষা ছিল। তাহা এখন মাত্র দরঙ্গের কাছারী বা কোছারী জাতির ভাষা বলিয়া পরিচিত। কোন ভাষা কোন প্রবল ভাষা দ্বারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা প্রবল ভাষার উপর কার্য্য করে ও তাহার রূপান্তর সাধন করে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীর পূর্ব্বপুরুষগণের বাঙ্গলা অথবা আসামী ভাষা কথিত ভাষা ছিল না, তাহারা কোচ্ অথবা বদো মূলক কোন ভাষাতে কথা বলিত। বর্ত্তমান বাঙ্গলাভাষাভাষীগণের রীতি ও উচ্চারণ-কৌশলের মধ্যে তাহার আভাস রহিয়াছে।

বক্ষ্যমান আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে একটী নূতন আলোচনা নহে। এণ্ডারসন সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষাবিৎ অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক এণ্ডারসন সাহেবের বক্তব্য এই যে এতদঞ্চলে কোচভাষা নামে একটী ভাষা ছিল, যাহা এখন বিলুপ্ত প্রায়। সুপণ্ডিত জন বিমস্ সাহেব তাঁহার Outlines of Indian Philology (P. 14.) গ্রন্থে কোচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার কথিত ভাষার "কোচভাষা" নামকরণ করিয়াছেন। ডাঃ গ্রিয়ারসনের মতে সমগ্র বঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সুদূর লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগে Indo-Aryan ভাষা প্রচলিত। কিন্তু তাঁহার Linguistic Survey of India গ্রন্থে এতদঞ্চলের কথিত ভাষার (dialect) "রাজবংশী ভাষা" নাম দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে থাকা কালে তিনি এতদঞ্চলের কথিত ভাষার এক ব্যাকরণও সঙ্কলন করিয়াছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্ অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও প্রসঙ্গাধীন এতদঞ্চলের কথিত ভাষার কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণে দুই এক জন বাঙ্গালীকেও এখন এই পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

কোচভাষা নামে কোন ভাষা অথবা তাহার স্মৃতি এতদঞ্চলে কোথাও আছে শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জনশ্রুতির অভাব তাহার অস্তিত্বের বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নহে। "কোচভাষা"র অনুসন্ধান করিতে হইলে অতীতের

মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এতদঞ্চলের বর্ত্তমান কথিত ভাষা বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের কথিত ভাষার তুলনায় কিরূপ, গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাহার নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। একটী গল্প বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথিত ভাষায় (standard dialect) এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে :—

কলিকাতা—

কোন এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটী তাহার পিতাকে কহিল—"পিতঃ, বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দিন। তিনিও উহাদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই কনিষ্ঠ পুত্রটী সমস্ত একত্র করিয়া এক দূর দেশে যাত্রা করিল, এবং তথায় অপরিমিত আচারে তাহার বিষয় অপচয় করিয়া ফেলিল। যখন সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সেই দেশে বিষম দুর্ভিক্ষ হইল, এবং তাহার অভাবের সূত্রপাত হইল।

মেদিনীপুর—

এক লোক্কার দুট্টা পো থাইল। তাল্লেকার মাঝু কোচ্যা পো লিজের বাফুকে বল্ল বাফুহে! বিষৈ আশৈর যে বাঁটা মুই পাব সেটা মোকে দ্যা। সে তাল্লেকার মাঝু বিষৈ বাঁটী কোর‍্যা দিল। ভোৎ দিন যাইলি কোচ্যা পো সুমচ্যা শুটি লিয়া ভোৎ দূরে এক গাঁয়ে চোল্যা গ্যাল। সেঠী সে আকুত্তা থচ্চাপতর্ কোর‍্যা লিজের বিষৈ-আশৈ এক্কা-দমে ফুক্কা-প্যাল্ল। য্যাৎকে তার সুমচ্যা ফুরাইল সেঠী এক বড্ড আকাল পল্ল। তার বড্ড দুখ হোল্য।

বাথরগঞ্জ—

একজন মানষের দুগ্‌গা পোলা আছিল। তারগো মদ্যে ছোটুগ্‌গা হের বাপরে কইল বাবা বিত্তের যে ভাগ মুই পামু তা মোরে দেও। হেতে হে হেরগো মদ্যে বিত্ত ভাগ হরিয়া দিল। দিন হতো বাদে ছোটুগ্‌গা পোলা বেবাক একত্তর হরিয়া দূর দেশে মেলা হরিল। হেখানে হে লুচ্চামি হরিয়া তার বিত্ত বেসাদ উড়াইয়া দিল্। হে হকল খোয়াইলে পরে হে দেশে ভারী আহাল হৈল, হেতে হে মুস্‌কিলে (পৈল)।

কোচবিহার—

একজনা মান্‌সির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুঁই পাইম তাক্ মোক্ দেন। তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া চিরিয়া দিল্। ঢেইল্ দিন নাই যাইতে ছোট ব্যাটা কুল্লে মালমাত্তা গোটেয়া নিয়া দুরান্তর এক দেশোত্ গেইল। সেটে লুচ্চামি গুণ্ডামী করিয়া কুল্লে টাকা কড়ি উড়িয়া দিল্। পাচোৎ যেলা কুল্লে খরচ করিয়া ফেলাইল্ সেলায় অতি ভারী মঙ্গা নাগিল্। ঐ আকালোত্ উয়ার বড় নান্‌ছানা হবার্ ধরিল্।

ঢাকা—

য়্যাক জনের্ দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, বাবা; আমার ভাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ্ পরে তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তান্ বিষয় সম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান্। তার্ পর্ কিছু দিন্ পরে ঐ ছোট ছাওয়ালডি তার সগল টাকা কড়ি য়্যাকাত্র কইরা য়্যাক্ দূর দ্যাশে চইলা গ্যালো। সেখানে গিয়া তার্ যা কিছু আছিলো তা বদ্‌খ্যালী কৈরা উরাইয়া দিলো। তার্ পর্ তার্ যা আছিলো তা যখন্ সব্ খোয়াইলো তখন্ সেই দ্যাশে বর আকাল্ পোইলো।

গৌহাটী—

এটা মানুহর দুটা পুতাক আছিল। তাহাঁতর ভিতরত সরুটো পুতাকে বাপাকক্ কলাক; বাপা! মই যি বস্তুর ভাগ পাম তাক মোক দি। তাতে সি তাহাঁতর ভিতরত বস্তু ভাগ করি দিলাক্। অলপ দিনর পাছত সরুটো পুতাকে সুমদায় খেনি বস্তু লগ করি লই দূর দেশক লাগি গেল আর তাত যাই ঢাংখিলা করি আপোনার বস্তু খেনি নষ্ট করিলাক্। সি তার গোটাই খেনি বস্তু খরছ করি ফেলেবার পাছত সেই দেশত এটা বড় ডাঙার আকাল হল। আর তার খাবালবার নহোবা হবা ধরিলাক।

মালদহ—

য়্যাক্ কোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছলো। তার ঘোর বিচে ছোট্‌কা আপ্‌নার বাবাক্ কহ্‌লে, বাব ধন্‌করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক্ দে। তাৎ তাঁই তার ঘোরকে মালমাত্তা সব বাঁটা দিলে। বহুৎ দিন্ না বিৎতে, ছোট ছেল্যা সব্ য়্যাকঠে কর‍্যা বিদেশ্ চল্যা গ্যালো। আর্ সে বদ্‌চালে আপ্‌নার্ মাল্‌মাত্তা সব্ খুইয়া দিলে। যখুন সব্ সে খৎচ্ কর‍্যা ফেক্‌লে, তখুন সে দেশে বারা আকাল্ হোলো, আর্ সে বারা কঠিনে পোলো

(Vol. V. Part I)

সুপণ্ডিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত বহু গ্রন্থের সংবাদ আপনারা অবগত আছেন। তন্মধ্যে রামায়ণের অন্তর্গত সুন্দরকাণ্ডের স্থল বিশেষের ভণিতা এ অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বিবর্ণ হয়াছে স্বর্ণ বর্ণ অঙ্গ তার, অতি কষ্টে অস্পষ্টে সীতার সন্নিধান,
হিমন্তাগমনে পদ্মবন যে প্রকার। জায়া তথা পায়া এক বৃক্ষ বিদ্যমান। ৭৮
রাবনত রত মন নহে তার রাম, রাম নাম মুক্তি ধাম বদ সভাসদ,
মরণে নিশ্চয় করিয়াছে মনস্কাম। শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভনে রামায়ণ পদ।" ৪৮

এই সময় দক্ষিণ-বঙ্গে পদ্য রচনার কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত তুলনার নিমিত্ত তাহার নিদর্শন উদ্ধৃত হইতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সমসাময়িক ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অনুবাদিত কাশীখণ্ডের ভণিতা লিখিত আছে :—

"কাশীবাস করি পঞ্চ গঙ্গার উপর, ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ,
কাশী গুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর। এইখানে সমাপ্ত করিল বিবরণ।
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি, তাহার আদেশ ক্রমে কিতাব করিয়া,
ইহার সহায় হয় কাহারো না দেখি। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া।
মিত্র শত চৌদ্দ শক পৌষমাস যবে, সেহি বহি দৃষ্টি করি নকল নবিসী,
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী।"

... ...

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৬৪ পৃঃ)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্গত জয়ন্তীয়ার রাজা রাজেন্দ্রসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত গ্রাম্য গীতি রচিত হইয়াছিল ;—

"মুই কই যাউম রে—কোথায় গেলে তরি,
হাকিম হৈলা হুকুমদার পেদা প্রাণের বৈরী ;
—রে মুই কই যাউম রে।

বাটি, রুটি, ইন্দ্র (রাজেন্দ্র) সিংয়ে মুখে রেখা দাড়ি,
বন্দি করি থৈল নিয়া মুরারী চান্দের বাড়ী,
—রে মুই কই যাউম রে।"

শ্রীহট্টের ইতিঃ ১ম—২ভাঃ, ৪র্থ, ৩৭ পৃঃ

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়নের রাজত্ব কালের কোচবিহার অঞ্চলের গদ্য রচনার নমুনা একখণ্ড অপ্রকাশিত প্রাচীন দলিল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। অনাবশ্যক বোধে দলিলের পরিচয় পরিত্যাগ করা গেল ;—

"...তুমি হুজুরে আর্দ্দাশ করিলা যে মোর কদিম ব্রহ্মোত্তর ভোগ বাবদ...জমী...তালুকত আছে। তাহার ওয়াক্কা...হাঙ্গামত বাসা লুট গৈছে ৺ জার হুকুম হৈলে পুনশ্চ ব্রহ্মোত্তর ওয়াক্কা পাম...ইত্যাদি

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কৃত পদ্য ক্রিয়াযোগ-সার পুথির স্থল বিশেষে লিখিত আছে :—"এই অবধি আমার কৃত পদ এই হনে শেষ ভাগ খাপুঞ্জয় বড়কায়েতের করা আমার ভাগের ভুলচুক লেখাতে জে হৈছে তা সারা শুরা একপ্রকার করিলাম ঐ খণ্ড পুথি দেবানন্দ শর্ম্মাক দিয়া লেখা ও তার অক্ষর ভাল শব্দ বোধ আছে চাষা নয় ইতি"

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়েই দক্ষিণ বঙ্গে বাঙ্গলাভাষার নবযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় কৃত গৌড়ীয়ভাষা ব্যাকরণ এই সময় সঙ্কলিত হয়। এই ব্যাকরণ বাঙ্গলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বাবিংশ সংস্করণ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী তাহা মুদ্রিত করেন। এই ব্যাকরণের ভূমিকার স্থলবিশেষের ভাষা এইরূপ :—

"এ কারণ স্কুল বুক সোসাইটীর অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই।"

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ৭১৯ পৃঃ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে :—

"তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ-পথে গমন করিয়াছেন। কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কা্ণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়ত্ব রূপে গণিত ছিল সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশ যাত্রা হয় তাহার নাম বেলুন।"

সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকা ১৩০২

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র যে দণ্ডবিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার স্থল বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"উপরে যে সকল লিখা গিয়াছে ভেদের কথা ইহাতে
যদি ঐ সকলের পতন হয় তবে রাজাতে ৬২॥১০ সাড়ে-
বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।"

"মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাহাকেহ
রাজা প্রতি বদল শূলাদি দ্বারা মারিতে হয়—"
"কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিয়ে
প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে
পাচনা করিব ব্রাহ্মণের মারণান্তিক শাস্তি নাই—"
হেরম্ব রাজের দণ্ডবিধি

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের এলাকায় সম্পাদিত এক খণ্ড দলিলের ছায়াচিত্র হইতে গৃহীত যথাযথ বর্ণবিন্যাস যুক্ত প্রতিলিপি এইরূপ ;—

"শ্রীদুর্গা
শ্রীকৃষ্ণণাথ ন্যায়ভূষণ—
সাকিম চান্দসি যুচবিতেয
শ্রীরামদাস দাস সাকিম বাট্টাজোড়
পরগনে বাঙ্গরোড়া অস্য লিখনং আগে
শ্রীমতি কুঞ্জমালা জওজে রামরুদ্র দৈ সাকীম
শিপীলাকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার
কন্যা শ্রীমতি মহামায়া এই দুই জন সেইচ্ছা পূর্ব্বক
আপনার স্থানে থাও বিক্রী হইল এহার ঘর দুই জনকে
আমি আনীয়া দিলাম এহার ভাশুর শ্রীরামরায় দৈ
ইসাদ করেণ ২ দুই তঙ্কা আমী নিলাম এহার নাম
কওয়ালায় লিখাইয়া দিব জদি না লীখাইয়া দিতে
না পারি তবে এই দৈন্যে কিছু খেসারত আপনার
হয়ে তাহার নিসা আমী করিব ইতি সন ১১৯৫
তারিখ ১৪ অগ্রান"
সাহিত্য পত্রিকা ১৩২০ ভাদ্র ৪৩৫ পৃঃ

(— চিহ্নিত অক্ষরের পাঠ সন্দেহজনক)

এই সময়ের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারে রচিত নারদীয় পুরাণান্তর্গত গঙ্গামাহাত্ম্য নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থের ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"রূপভূপ অনুরূপ গুণর নোকর, যাহার অনুজ অনুরূপ গুণবন্ত,
উপেন্দ্র নরেন্দ্র তাত হৈল কলাকর। খড়্গানারায়ণ নাম পরম শ্রীমন্ত। ১
সজ্জনের নয়ন কুমুদ বিকসিত, তার অনুমতি পায়া অতি অল্প মতি,
যার কীর্ত্তি চন্দ্রিমা বর্দ্ধিত নীতে নীতে। নারায়ণে পুরাণ পয়ার নিগদতি। ৭
যার বাক্যামৃত কর্ণ পথে করি পান, তার আজ্ঞাপায়া ক্ষিপ্রে নারায়ণ নাম বিপ্রে
আশ্রিত সকলে করে স্বর্গকো বিজ্ঞান। ভনে পুরাণক ছন্দবন্দে।" ৯

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক একজন নারায়ণ পুরোহিতের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইঁহার বংশধরেরা এখন কোচবিহার রাজ্যের ইছামারী গ্রামে বাস করিতেছেন * এই সময়ের অর্থাৎ ১৭৩৯ খৃঃ একখানা অপ্রকাশিত প্রাচীন দলিল হইতে কোচবিহার অঞ্চলের গদ্যরচনার নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"...তুঞি যে আৰ্দ্দাশ করিলো মুঞি বেভাতি খেজমত করো মহারাজার হুকুম হৈলে পেটভাতাত জমি খানিক পাম এতকে...পলাম তার বাবদ বাড়ী পঞ্চাল্লা সহিত দুই বিষের জমী তোক পেটভাতাত হুকুম করিল..." ইত্যাদি

দক্ষিণ বঙ্গে এই সময় বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রী যুগ। স্বনামখ্যাত রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের লেখনী যাহা অমর করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রশংসিত যুগের পদ্য রচনার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। গদ্যের নমুনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতে পারে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমার কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার স্থল বিশেষ এইরূপ :—

"...অতএব তুমি এসময় কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল। ইহা মকরর মকরর জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষা কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৬৩২ পৃঃ)

১৬৫৮ শকে (১৭৩৬ খৃঃ) কাছাড় রাজ সরকারের সম্পাদিত এক খণ্ড দলিলের ভাষা এইরূপ :—

"বড়থলার চান্দশস্কর বেটা মণিরাম উজির গং...প্রতি আর আমার বংশের জত দিবস রাজ্য সম্পদ আছে অত দিবস জদ বুনিয়াদ বংশাবলি হাকিম ইতি জমিধারি তুমারে দিলাম এতে তুমার আইন শিমাউ বিসএত জে হিংসা করে তার প্রাণ রৈক্ষা না করিমু আর আমার বংশে তুমার বংশরে পালন করিব মহা অপরাদ পাইলে শাঠা অপরাদ খেমিআ উচিত দণ্ড করিমু আর আমার বংশে তুমার বংশরে অপনিআয় শাস্থি না করিমু তুমার বংশে আমার নুন বেকবুল করে···এই খাতিল জমাত না ভুলিমু সত্য এতেরিক্তে খাতিল জমা পত্র দিলাম ইতি শক ১৬৫৮ তারিখ ২৯ ভাদ্রস্য

শ্রীহট্টের ইতিঃ ১ম উপসং ১০৪ পৃঃ

* ১৭৩০ খৃঃ শ্রীহট্টের ভুবনেশ্বর বাচস্পতি বিরচিত "নারদী রসামৃত" গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ :—

"হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
ষোলশত বায়ান্ন শাকেতে হৈল লিখন॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ।
সর্ব্ব লোকে সদা যারে করে অনুরাগ॥
তানপুত্র শূরদর্প রাজা মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয়॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রীনারদী রসামৃত রচিলা পয়ারে॥"

শ্রীহট্টের ইতিঃ ২য়—পরিঃ ১১ পৃঃ

ইহ'রও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এতদঞ্চলের গদ্য ও পদ্য রচনার নমুনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। তাৎকালিক কোচবিহারাধিপতি মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত হস্তলিখিত আদিপর্ব্বে লিখিত আছে :—

"মহারাজ কাব্য সঙ্গীতের দীক্ষা গুরু,
দরিদ্র জনার জাঞ বাঞ্ছা কল্পতরু। ৫২
রত্ন পৃষ্ঠে মহারাজ প্রাণনারায়ণ,
জঙ্গম জঙ্গীশ যাক বলে সর্ব্বজন।
মেদনী মদন দেব ভোগে পুরন্দর
বিশ্বসিংহ কুল কুমদিনী দিবাকর। ১১৯
বিহার কামতানাথ প্রাণ মহীপাল,
সংগ্রামত বিপক্ষ জনার যমকাল। ১৪৬
প্রাণ মহীপাল গুণমন্দির,
বিদগধ জন মুকুটহীর।
নরপতি দেব বীর সুজন,
তান আজ্ঞাপায়া শ্রীনাথে গান।" ১৩১

শ্রীনাথ তাঁহার পিতামহ ভবানন্দের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে দ্রোণপর্ব্বে লিখিয়াছেন :—

"মল্ল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর,
শুক্লধ্বজ নাম দেব ভোগে পুরন্দর।
তাহার পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ,
কামরূপ দ্বিজকুল কুমদিনী চন্দ্র।"

শ্রীনাথের সমসাময়িক (১৬৮৭ খৃঃ) দক্ষিণ-বঙ্গের নিমতা নিবাসী কবি কৃষ্ণরাম "ষষ্ঠীমঙ্গলের" স্থল বিশেষে সপ্তগ্রামের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল,
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল।
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ,
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ।
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল,
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কুল।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সং, ২০৫ পৃঃ)

শ্রীনাথের সমসময়ে কোচবিহার রাজদপ্তরে কিরূপ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। বলা বাহুল্য যে এই সময় রঙ্গপুর জেলার উত্তরার্দ্ধ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৭৬ খৃঃ তাৎকালিক কোচবিহারাধিপতি মহারাজ মোদনারায়ণ সম্পাদিত একখণ্ড হস্তলিখিত দলিলের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ :—

"কাকিনিঞা চাকলার চাকলাদার শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীক ও পাছা যে অধিকার হয় তাবক্ক এতন্প্রতি সমাদেশঃ প্রয়োজনাঞ্চ......শকে স্বর্গীয় ৮৺র আজ্ঞা রুজু.........যখন যে অধিকার হয় তাবাক·· যে জীবিকা দিছি সে জীবিকার ভূমিত দুত্তি গ্রাম ছয়বিষ ভূমি ব্রহ্মোত্তর দিছে···পাত্রক...শকে...তাত বাপা আর্দ্দাশ করিল স্বর্গী বাপা অনেক ব্রহ্মোত্তর দিছে তার সমান মোঞ নহো সে জোখো সম্ভাবন নাহি এতকে মোঞ দুই গ্রাম ছয়বিশের ভূমি ব্রহ্মোত্তরত ··পাত্রক দিছো এতকে ৮৺র আজ্ঞায় আমার অভাবে আমার দত্ত ব্রহ্মোত্তরন্তে ভোগ হবেক এতকে হুকুম দিমু ··" ইত্যাদি।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের থানাদার মতিউল্যা সিরাজীর আহম রাজ প্রতিনিধির বরাবর লিখিত পত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"পরবত্ত সমাচার এহি। প্রীতপত্র এথা আমি শুভক্ষণে পহুছিল। যে রূপ নিমকহারাম জয়ন্তা ও কাছাড়ীর কারণ লিখিলা সেরূপ হৈব। প্রাচীন আমার পিতা নবাব নাখুল খাঁ সিরাজী কোচবিহার ও রাঙ্গামাটীর সুবা আছিলা, তাতে তোমার ঠাই অধিক প্রীতি আছিল। এথন পত্র পায় আমার অন্তঃকরণে অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইল, পরস্পর প্রীতি প্রতিপালন উচিত। আপনি লিখিয়াছিলা বামনিয়ার খাঁর যোগে রাঙ্গামাটীর পথক্রমে ৺নবাব সঙ্গে প্রীতি হইয়াছে। এবে ৺কারণ এই ক্রমে আগত অধিক প্রীতি হইবে। ৺অধিক প্রীতিতে অনেকরূপ কার্য্য হইবে। অল্প দিবস হয়, আমি এথা আসিয়াছি। থানার কার্য্যতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগের থানাত ফৌজ পাঠাইতেছি।" ইত্যাদি। শ্রীহট্টের ইতিঃ ২য় ভাঃ ৪থঃ ১৯পৃঃ।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর সন্ধিকালে কোচবিহারে রচিত কিরাতপর্ব্ব নামক পুথির ভণিতায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন ;—

"নাহি শাস্ত্র জ্ঞান আমি কাব্য না পড়িছি,
জনমে অধীন নরনাথেরে সেবিছি।
কাব্য কোষ অলঙ্কার না পড়ি বিশেষ,
ভারত পুরাণ নাহি শুনি সাবশেষ।

তথাপিত রাজ আজ্ঞা লাগে পালিবাক,
এতেকে অধিক দোষ না দিবা আমাক
বেদময় বেদব্যাস দেবের বচন,
শ্রবণর মন তনু তারণ কারণ।

সিন্ধু পক্ষ বাণ বিধু শকের সময়,
মকরত দেব দিনকরের উদয়।

গুরু দিন শ্রীপঞ্চমী পক্ষ পরধান,
কাননে কুসুমাকর করিল প্রস্থান।

সুগন্ধ সমীর দশো দিশে সঞ্চারিল,
মনমথ বাক মনে মনোজ্ঞ মিলিল।

জন্মে জন্মে বীর নারায়ণ নরেশ্বর,
যদি জন্ম নরতনু বিহার নগর।
ভবানন্দ নামে চন্দ্রসেনের নন্দন,
নিজ ধর্ম্মে কত নিজ কুলের মণ্ডন।

হেন মহাশয়ের তনয় অল্প মতি,
বোলারাম কৃষ্ণ কবি শেখর বদতি।

*

* *

তার আজ্ঞাপরমানে ভারত ভ ষায়,
বোলারাম কৃষ্ণ কবি শেখর কহয়।

*

* *

হেন মহারাজের সেবক শিশু মতি,
বোলারাম কৃষ্ণ কবিশেখর বদতি। ৪

১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টের ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈতপ্রকাশের ভণিতায় লিখিত আছে—

যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে,
পদ্মনাভ শ্যামদাস কহিলা যে মোকে।
পাপ চক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন,
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিনু বর্ণন।
চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে,
লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈলু শ্রীলাউর ধামে।"

(শ্রীহট্টের ইতিঃ ২ভাঃ ৩থঃ ১২পৃঃ)

লাউর শ্রীহট্টে অবস্থিত, ঈশান শ্রীহট্টের অধিবাসী হইলেও তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা শান্তিপুরেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ঈশানের স্বদেশবাসী ও সমসাময়িক বংশীদাস বিরচিত পদ্মপুরাণের ভূমিকায় লিখিত আছে—

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার (১৪৯৭)
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।"

(শ্রীহট্টের ইতিঃ ২—৪ভঃ ১০৩পৃঃ)

বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতিও প্রায় এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল"এর ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম, মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে,
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম। ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে।
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা, মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত,
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি দাতা। সর্ব্বতীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে কামরূপ রাজ নরনারায়ণের দরবার হইতে আহম দরবারে প্রেরিত একখণ্ড পত্র আসামের বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আসামবন্তী পত্রিকা হইতে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বস্তি সকল দিগ্দন্তীকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরঃরহারহাসকাশকৈলাসপাণ্ডর যশোরাশীবিরাজিত- ত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিনীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরপীশনধীরধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকলদিক্কামিনীগীয়মানগুণসন্তান

শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

"লেখলং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যেসে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম।......" ইত্যাদি।

দক্ষিণ-বঙ্গের সমসাময়িক রূপ গোস্বামীর কারিকার গদ্য রচনা এইরূপ—

"শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে।" ইত্যাদি

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২

১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের যে সমস্ত নিদর্শন উপস্থিত করিলাম তদ্দ্বারা কোচবিহার অঞ্চলের লিখিত ভাষা দক্ষিণ-বঙ্গের লিখিত ভাষার সহিত তুলনায় কিরূপ ছিল, বিচারের সুবিধা হইতে পারে। মহারাজ নরনারায়ণ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহার রাজবংশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার অন্যতম সভাপণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনুবাদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও ১০ম স্কন্ধ ভাগবত কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের হস্তলিপি। ভাগবত গ্রন্থখানা নষ্ট প্রায় ও অসম্পূর্ণ। আসামের অন্তর্গত দরঙ্গের রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত। তাহাতে লিখিত আছে সিদ্ধান্তবাগীশ

শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক গৌড় হইতে আনীত।" সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত উক্ত দুই পুথিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ভণিতায় লিখিত আছে—

"মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে,
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে।
একদিন সভা মাঝে বসি যুবরাজ,
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায।
পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়,
পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়।
একারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার,
নিজ দেশভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার।
বেদ পক্ষ বাণ আর শশাঙ্ক শকত,
আরম্ভ করিলো মার্কণ্ডেয় কথা যত। ১
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমানে,
কহে পিতাম্বর নারায়ণ পরশনে। ৪৮

দশম স্কন্ধ ভাগবতে লিখিত আছে :—

"দশম স্কন্ধের কথা পরম সম্পদ,
কৃষ্ণ জন্ম কর্ম্ম শুন হয়ো নিশবদ।
অতি সুরপুর সেজে কামতানগর,
.... বিশ্বসিংহ নৃপবর।
তাহার তনয় যে সমরসিংহ নাম,
কৃষ্ণের লীলাত তাঞ অতি অভিরাম।

শিশু মতি পীতাম্বর তাহার সমীপে,
কৃষ্ণের লীলার পদ রচিলো সংক্ষেপে। ৭৮

পীতাম্বর যে স্থানের অধিবাসী হউন না কেন পুথির রচনার ভাষাই যে যুবরাজের নিজ দেশভাষা ছিল তাহা "নিজ দেশভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার" আদেশ হইতে জানিতে পারা যাইতেছে। অধিকন্তু রচনায় এতদঞ্চলের বিভক্তিচিহ্ন, সর্ব্বনাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—শকত, লীলাত, তাঞ, কহিলন্ত ইত্যাদি। কহিলন্ত, করিলন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার এতদঞ্চলে অন্যান্য প্রাচীন পুথিতেও দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কালে বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও এই সমস্তের ব্যবহার ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমেশ্বর কবীন্দ্র কৃত মহাভারতে লিখিত আছে ;—

"দ্রৌপদী বোলন্ত সৌরিন্ধ্রী মোর নাম।"

"তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪০, ১৪১ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত বৌদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্যে ভণন্ত, নাচন্ত, করন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার আছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে মুছিলান্ত, খোজন্তি, গেলান্তি ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদঞ্চলে বিরচিত যে সমস্ত প্রাচীন পুথির ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে অন্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ব্বনাম, বিভক্তি চিহ্ন ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—তাত (তাহাতে) যাক (যাহাকে) জাঞ (যে, যিনি) তাঞ (তিনি) বারণত (বারণে) স্বর্গক (স্বর্গে) পুরাণক (পুরাণে বা পুরাণকে) সংগ্রামত (সংগ্রামে) জায়া

(যাইয়া, গিয়া) পায়া (পাইয়া) ইত্যাদি। এতদঞ্চলের কথিত ভাষায় এখনও এই সমস্তের অবাধ ব্যবহার রহিয়াছে। মারিবা, ধরিবা পদের উত্তর নিমিত্তার্থে ক প্রত্যয় যোগ এখন পশ্চিম কামরূপে আর শ্রুত হয় না। প্রাচীন কালে ছিল যথা—

"তথাপিত রাজআজ্ঞা লাগে পালিবাক।" কিরাত পর্ব্ব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ আছে যথা—

"মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।"

শূন্যপুরাণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।"

এতদঞ্চলের প্রাচীন 'পাম' ক্রিয়া এখন পাঁও (পাই) হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কামরূপে এখনও 'পাম' শুনিতে পাওয়া যায়। তদঞ্চলে আমি শব্দের রূপান্তর 'মঁই' বহুবচনে 'আমি' হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের প্রাচীন বাঙ্গলা গানে একবচনে 'মই' ও বহুবচনে 'আমি' বা 'আম্হে' শব্দের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ"

"ভণই লুই আম্হে মাণে দিঠা"

বৌদ্ধ গান ও দোহা, চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ১—৯।

বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত এতদঞ্চলের বাঙ্গলা পুথিগুলিতে সংস্কৃত গদ, বদ, ভব ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল যথা—

"রাম নাম মুক্তি ধাম বদ সভাসদ" (ক্রিয়াযোগ সার।)

"নারায়ণে পূরাণ পয়ার নিগদতি" (গঙ্গা মাহাত্ম্য।)

"অহে বিশ্বম্ভর ভব প্রসন্ন আমাক" (ক্রিয়াযোগ সার।)

এতদঞ্চলের মুঞি, মোর, আমাক, তুঞি, তোর, তোমাক, তাঞে, তার, তাত ইত্যাদি সর্ব্বনাম ও বিভক্তিচিহ্ন প্রাচীন কালে সমগ্র গৌর দেশেই ব্যবহৃত হইত যথা—

"এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা,
তোরে আমি কন্যা দিব আপনি কহিলা।"

* * *

"তবে মুঞি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর;
তোমার কন্যার যোগ্য নাহি মুঞি বর।"

চৈতন্যচরিতামৃত, সাক্ষীগোপাল বিবরণ।

"শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঞে দেখিবারে,
বিপ্রগৃহে বসিয়াছে দেখিল তাহারে।"

* * *

"প্রভুর আগমন তেই তাহাঞি শুনিল,
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তার ইচ্ছা হৈল।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, দক্ষিণ ভ্রমণ।)

"রথ হৈতে ফাল দিয়া চক্র নৈয়া হাতে,
ভীস্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে।"

* * *

"শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা মনস্তাপ।"

—পরমেশ্বর কবীন্দ্র কৃত মহাভারত, (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪৩ পৃঃ)

সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা রচনায়—

"টালত মোর ঘর নাঁহি পড়বেষী,
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।"

(বৌদ্ধ গান ও দোহা. চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ১-৩৩)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গের বহু-সংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২২৬ পৃঃ) কামরূপের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ যে তিনি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহাতে প্রাপ্ত হইতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধ গান ও দোহার" ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। ......ইহার জন্য তাঁহাদিগকে (অনুসন্ধানকারীগণকে) তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে! তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে। কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সিলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে।" ইত্যাদি (৩৬ পৃঃ)

শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত উপরোক্ত বৌদ্ধ বাঙ্গলা গান ও দোঁহার সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—"উহাতে বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ জাত, তাঁহারা তাহার প্রমাণও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা এবং অদ্য আপনাদের নিকট প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূরণ করিবে। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে!" ইত্যাদি

বৌদ্ধগান ও দোহার একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিন্যাস অনেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা "নিচ্চল," "নাব," "নাহি" শব্দে 'ন' ও 'ণ'। "যেন" শব্দে 'ন' ও 'ণ' এবং 'জ' ও 'য'। "ক্ষণ" শব্দে 'খ' ও 'ক্ষ' এবং 'ন' ও 'ণ'। "সম" ও "সহজ" শব্দে 'স' ও 'ষ'। "শিয়াল" শব্দে 'শ' ও 'ষ'। "শশি" শব্দে 'ি' ও 'ী' ব্যতীত দুইটিই 'শ', কোথাও একটি 'শ' ও একটি 'স' আবার কোথাও দুইটিই 'স'। "দোষ" শব্দে 'ষ' ও 'স'। "শূন্য" শব্দে 'ন' ও 'ণ' এর ব্যবহার ইত্যাদি অনেক নিদর্শন প্রদত্ত হইতে পারে। ঘরেঁ, গণেঁ, কঁহি, গলেঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দেরও অভাব নাই। নব প্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই প্রকারের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিরচিত কোচবিহার ও আসামের প্রাচীন পুথিগুলিতে বর্ণবিন্যাসের এই প্রকার সাম্যাভাব অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলির প্রকৃত বর্ণবিন্যাস ব্যবসায়ী প্রকাশকগণ

আধুনিক নিয়মে সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। এই উপায়ে প্রাচীন পুথিগুলি ক্রমশঃ অপ্রাচীনে পরিণত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের উপায় রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে প্রাচীন পুথির বর্ণবিন্যাসের এই প্রকার ঐক্যাভাব "প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় ক্রমপরিণতির প্রাচীনাবস্থার সাধারণ লক্ষণ" (বাঙ্গালাভাষার অভিধান ভূমিকা ১৯ পৃঃ)। ইহা গ্রন্থকারের অজ্ঞতা অথবা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া আধুনিক নিয়মে সংশোধন করিলে পুথিগুলি ঐ "সাধারণ লক্ষণ" হইতে বঞ্চিত হইবে। অন্ততঃ পক্ষে এই "সাধারণ লক্ষণ" লইয়া আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

বিগত ভাদ্র সংখ্যা "নারায়ণ" পত্রিকায় জনৈক লেখক এই আলোচনা উপলক্ষে প্রস্তাব করিয়াছেন যে তিনশত বৎসরের প্রাচীন পুথিগুলির বানান যথাযথ রক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী রচনাগুলি গ্রন্থকারের স্বলিখিত না হইলে তাহা আধুনিক নিয়মে সংশোধন করা আবশ্যক। আইন বিশারদ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তমাদী আইনের এই প্রস্তাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, প্রাচীন পুথি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, অনেক পুথিতে লিপিকরের প্রসঙ্গ থাকে না, অথচ অবস্থানুসারে তাহা গ্রন্থকারের স্বলিখিত নহে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপি বিজ্ঞান বিদ্যার আশ্রয় ব্যতীত অনেক পুথির সময় নির্ণয়ও অসম্ভব বিবেচিত হয়। যাঁহারা তিনশত বৎসরের প্রাচীন অথবা অপ্রাচীন সময় লিপিকর প্রমাদের যুগ বলিয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর, নিদর্শনগুলি তাঁহাদেরই স্বমত সমর্থনের জন্য যথাযথ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতের রূপ ও বর্ণবিন্যাসের সহিত বঙ্গভাষার সম্পর্ক বিচার না করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বর্ণবিন্যাসের ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে। প্রাকৃতে 'ন' স্থানে সর্ব্বত্রই 'ণ' হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী প্রাকৃতেও 'ন' সর্ব্বত্র 'ণ' হয়। পৈশাচী প্রাকৃতে 'ণ' স্থানে 'ন' এর প্রয়োগ বিধি সঙ্গত। পালিতে 'ন' ও 'ণ' দুইই প্রয়োগ হইতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালায় 'কিঙ্কিণী', 'মাণব', 'অঙ্গণ' প্রভৃতি শব্দে 'ন' অথবা 'ণ' বিন্যাস হইতে বাধা নাই। "ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছতি বর্ব্বরা" শাসন বাক্য কাহারও সম্বন্ধে উক্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গীয় কোষকারগণ লক্ষ্য স্থানীয় হইবেন। মাগধী প্রাকৃতে সাধারণত সর্ব্বত্রই 'শ' অন্যান্য প্রাকৃতে 'স' প্রয়োগ হয়। পালিতে 'শ' ও 'ষ' এর প্রয়োগ মোটেই নাই। বাঙ্গালায় 'শ' ও 'ষ' প্রয়োগ হইতে পারে এরূপ শব্দের অভাব নাই। যথা শৃগাল, কলশ, কাশ, কংশ ইত্যাদি। 'শ' অথবা 'ষ' প্রয়োগ হইতে পারে এরূপ শব্দও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—'বেশ', 'কোশ', 'কৃশানু' ইত্যাদি। 'শ', 'ষ', 'স', এর যে কোন একটি বিন্যস্ত হইতে আপত্তি নাই এরূপ শব্দ যথা শিশি, মুশল। শ্যালা, বাশষ, শূকর শব্দ প্রাচীন কালে 'স' দিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হইত। প্রাকৃতের প্রভাবে 'শ', 'স' এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাকৃতে আদি স্থিত 'য', 'জ' হয়। মাগধীতে ইহার বিপরীত প্রয়োগ আছে। বাঙ্গলায় যবন, জামাতা লিখিত দুই কুল রক্ষা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় বহু শব্দের একাধিক রূপ কোষকারগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা পরিবর্ত্তনের অবস্থা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যথা শৃগাল—শৃকাল, রং—রঙ্গ, তরক্ষু—তর্ক্ষু ইত্যাদি। শব্দের মধ্য বা শেষাক্ষরে 'অ' প্রয়োগ প্রাকৃতের আর একটী ক্ষীণস্মৃতি। বঙ্গীয় কোষকারগণ ইহা এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যথা—গোআলা, কুআশা, কুআ, যোআল ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অনেক শব্দ এখনও 'ি' অথবা 'ী' দিয়া লিখিত হইতে পারে। যথা নন্দি, মূষিক, চুরি, চুল্লি, চূর্ণি, কারাটি ইত্যাদি। 'ু' অথবা 'ূ' দিয়া লিখিত হয় এরূপ শব্দেরও অভাব নাই। যথা কুন্দী, কণ্ডু, শম্বুক, হনুমান, তনু ইত্যাদি।

তৃণ, কৃমি শব্দ ঋ কার দিয়া অথবা '্র'-কার ও 'ি' কার দিয়া লিখিলে অশুদ্ধ হয় না 'ঋষি' লিখিতে 'ঋ' অথবা 'রি' বিন্যাস হইতে পারে। গার্হস্থ্য, কর্ম্ম, সগর্ভ, সতীর্থ শব্দে 'র' কার দেওয়া না দেওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। পুনঃ, ছন্দ লিখিতে একটি অথবা দ্বিত্ব "ত" এর ব্যবহার অশাস্ত্রীয় নহে।

বঙ্গভাষার ইতিহাস অনুশীলনে প্রাচীন "বৌদ্ধগান ও দোহা" ও চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণকীর্ত্তন" আমাদের সম্মুখে এক নূতন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পুথি দুইখানা যথাযথ মুদ্রিত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুথির ভাষা ও অক্ষর ১৪ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ভাষা টীকায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সহিত প্রাচীন পারিপার্শ্বিক কবি বিদ্যাপতি, মাধবকন্দলী, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতির ভাষার সাদৃশ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি নাম ও ক্রিয়াপদ যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া কয়েকটী বাক্য রচনা করা গেল। যাঁহারা কোচবিহার অঞ্চলের বিংশ শতাব্দীর কথিত ভাষার সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে কামরূপের প্রাচীন কবি মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেবের ভাষার অনুসন্ধানে আর শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। এই বাক্যাবলী, ছয়শত বৎসরের প্রাচীন পশ্চিম বঙ্গের ভাষার সহিত, কোচবিহার বা কামরূপের বর্ত্তমান ভাষার সাদৃশ্য অনায়াসে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিবে।

"দেবতা চিআইল, নঅা আন পাইলোঁ, তুমি আগত জা. তোর যোগ মোঁই নহোঁ। কালি পূজা হৈবে. কোয়ঁরী আজি কিসক আইল. তোর পোঁপাত বউল ফুল পিন্ধিআঁ নাচএ। গোসাঞি বড়ল তিরী লোক ঘরত থাকে, তাক পরক দেখিবারে নাদে, এহাত খাঁখার হৈবে! মোঁই জরুআ. কিছুই না জানো, এহাক দেখিআঁ মোর মন ঝুরে। মোর জলানী ছাওয়াল তাক দেখি কচাল ধরিলেক, বেআকুল হআঁ কান্দে. সেআ আউলাইল। রে বঙ্গার সোয়াদ ভাল, নে খাঅ। খোপত চিনিী আছএ. চোখ খসাআঁ খাএ। আই আজলী হৈল, ভাত ওগাহ. খাআঁ নিন্দ যাউক। হের ওপত খাআঁ মুখ পুড়ি গেল। পাণি পিআ খাআঁ। বান্দিআ ওড় ফুল দিলেক তাত বিস পালাইল।"

কেবল ভাষা বলিয়া নহে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে লিপিচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এতদঞ্চলের বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন অক্ষরও প্রাপ্ত হইতে পারে।

এণ্ডারসন সাহেবের বক্তব্য এই যে যে সময় কোচশাসন পূর্ববঙ্গ ও আসামাদি দেশে বিস্তৃত ছিল, সেই সময় এতদঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষা লোকের কথিত ভাষা ছিল না, কোচভাষামূলক কোন এক ভাষাতেই লোকে কথোপকথন করিত। ইতিহাস পাঠে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচরাজ্যের তাদৃশ বিস্তৃত ভাষার নিদর্শন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। এখন কথিতভাষার উল্লেখ করিতে গিয়া আপনাদের কিছু সময় নষ্ট করিব।

ক্রমশঃ —

শ্রীআমানতউল্যা আহাম্মদ।

দুঃখের রাজ্যে

—:*:—

১

সেথা রবি উঠে নাক পড়ে যায় বেলা রে
হয় না'ক বেচা কেনা ভেঙ্গে যায় মেলা রে।
সেথা বনে কাঁদে সীতা
জ্বলে সতী জ্বলে চিতা,
গাঙ্গুরের নীরে ভাসে
বেহুলার ভেলা রে।

২

সেথা ধায় আঁখিনীর গিরিশির গলায়ে
সেথা যায় ভুখারীর পোড়া 'শোল' পলায়ে
সেথা উঠে হাহা-বাণী
শ্মশানেতে রাজারাণী
সেথা শুধু উৎসব
নব চিতা জ্বালায়ে।

৩

সেথা জাগে দুর্ব্বাসা কপিলের সহিতে
অভিশাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।
সেথা ভোঁভোঁ বাজে শিঙা
ডোবে মাঝি ডোবে ডিঙা
সেথা গিলে অঙ্গুরী
তীর্থেরি রোহিতে।

৪

তবু সুরধুনী নামে সে দেশেরি লাগি রে
চোর পরি যুবরাজ তারি অনুরাগী রে।

সেথা থামে আনাগোণা
পায়ে তরী হয় সোনা
পাষাণ মানবী হয়ে
উঠে ত্বরা জাগি রে।

৫

তারি ডাকে ভগবানে হয় শুধু আসিতে
নাশিতে শাসিতে অরি তারে ভালবাসিতে !
সেথাকার আঁখিজল,
যমুনায় আনে ঢল,
সেই দেয় নব সুর
কৃষ্ণের বাঁশীতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গুরুদেব।

—※—

(চিত্র)

প্রথম অঙ্ক।

[বিধবা বিন্দুবাসিনীর পোষ্যপুত্রগ্রহণোপলক্ষে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবে। তদুপলক্ষে পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্ণে সপুত্র গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবকে দেখিয়াই তাঁহার স্বামীশোক উথলিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন]

গুরুদেব। (সহানুভূতিসূচক স্বরে) কেঁদে আর কি করবে মা ? কেঁদে ত আর তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না। তার চেয়ে শেষ ক'টা দিন ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দাও—শান্তি পাবে। সংসারে কে কার মা ?

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

—সবই মায়া! সবই মোহ! সবই সেই লীলাময়ের লীলা! এসব তত্ত্ব তুমি আমি কি বুঝ্‌বো মা! হরি নারায়ণ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

[পরস্পর কুশল প্রশ্নাদির পর]

গুরুদেব। হ্যাঁ, তা হলে বিজয় বাবুর ছেলেকে নেওয়াই ত ঠিক হল? তা বেশ! ছেলেটি বেশ! অপুত্রক থাকাটা কিছু নয়! পূর্ব্বপুরুষের জলপিণ্ডের ত একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে! আর তা ছাড়া বিষয়সম্পত্তি দেখ্‌তে তো একটা লোক চাই। নইলে যে যার ভূতে উড়িয়ে দেবে! শাস্ত্রে আছে—

অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক তাদৃক প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদক ক্রিয়া হেতোর্নাম সঙ্কীর্ত্তনায় চ॥

অর্থাৎ যারা অপুত্রক তারা কর্ব্বে কি না পোষ্য নেবে। কেন নেবে? না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। আর কেন? না তাদের নাম রাখবার জন্য আর তাদের জলপিণ্ডের যোগাড় কর্ব্বার জন্য! বুঝেছ মা? হ্যাঁ তা যাক এখন এদিকে কাজকর্ম্মের ভার কার উপর দিয়েছ মা? শরৎবাবুর উপর? বেশ, বেশ, তিনি কাজের লোক বটেন! আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতেও তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা আছে বটে! তা যা হোক্ এদিকে কিন্তু ব্যয়বাহুল্য কিছু করো না মা! একটু বুঝেসুঝে চলো! জান ত এসব কাজে দশজনে দশকথা বল্‌বে। তাতে কান দিও না! তাদের কি? তারা ত বলেই খালাস! এদিকে ত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে! দশ গাঁয়ের লোক নাই বা খাওয়াইলে? তাতে কি আস্‌বে যাবে? ওকি ভিখিরীদের কাপড় দেবার ব্যবস্থা করেছ দেখ্‌ছি? না—না তা কর্ত্তে যেও না! তা পেরে উঠবে কেন? কাপড়ের দাম শুন্‌লে মাথা ঘুরে যায়! কি সর্ব্বনেশে যুদ্ধই বেধেছে! তার চেয়ে খাইয়েদাইয়ে চারটি করে পয়সা দিয়ে বিদেয় করো! সুবিধে হয় পরে দিলেই চল্‌বে। কি বল?

[বিন্দুবাসিনী গুরুদেব ও গুরুকুমারকে প্রণাম করিলেন]

গুরুদেব। শুধু হাতে কি কখন গুরুদর্শন কর্ত্তে হয় মা? ওতে যে বড় পাপ হয়। শাস্ত্রে আছে দেবতা গুরু রাজা এঁদের কখন শুধু হাতে দর্শন কর্ত্তে নেই!

[বিন্দুবাসিনী যথারীতি প্রণামী দিয়া গুরুবন্দনা করিলেন]

গুরুদেব। তোমাকে আর কত বুঝিয়ে বল্‌ব মা? আমি না হয় বছরে দশ বার আস্‌ছি যাচ্ছি, কোন কথা নেই কিন্তু গুরুকুমার ত তোমার এখানে আর কখন আসেনি মা? সে এই সবে তোমার এখানে পদধূলি দিচ্ছেন, তাঁকে রূপো দিয়ে প্রণাম করাটা কি ভাল হ'ল মা? সোনা হ'লেও বা যা হোক্ হ'ত! তা যাক যা দিয়েছ দিয়েছ, ঐ সঙ্গে একজোড়া বস্ত্র দিলেই বেশ মানাত। এমন কাজটা তোমার মত মায়ের পক্ষে ভাল হয় নি মা! 'যাবার সময় দেবে' কি বল্‌ছ? সে ত বিদায়ী বস্ত্র! সে কথা ত হচ্ছে না। প্রণামী বস্ত্র কই? আনা হয় নি বুঝি? তা বেশ, আনিয়েই দিও। এখনি না দিলে ত আর ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না! আর তোমারই বা দোষ কি মা! একলা মানুষ, ক'দিক দেখ্‌বে? যাঁরা কাজকর্ম্মের ভার নিয়েছেন, তাঁদেরও ত একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়।

[ইতিমধ্যে জনৈক ভৃত্য জল লইয়া উপস্থিত]

গুরুদেব। না—না—। এরি মধ্যে পা ধোবার জল নিয়ে এসেছ কেন? একটু চা খেতে হবে যে! দু পেয়ালা চা' আন্‌তে বল ত মা। একটু বেশী করে দুধ দিতে বলো! আর না হয় তুমিই যাও! যা'র তা'র

হাতে ত আর খেতে পারি না। দাঁড়িয়ে রইলে যে? সন্ধ্যোআহ্নিক হয় নি বলে ভাবছ! তাতে কি? চা যে একটা নেশা, পানতামাকের মত। ও ত মা যখনতখনই খাওয়া যায়! তাতে কোন দোষ নেই। তুমি যাও, নিয়ে এস। হ্যাঁ, দেখ, আর এক কাজ করো। কিছু জল গরম করে রেখ। ঠাণ্ডা জলে আজ আর নাইব না; শরীরটে বড় ভাল নেই। আর গুরুকুমারেরও কাল বিকেল থেকে একটু সর্দ্দি করেছে।

[স্নানাদির পর জলযোগের আয়োজন দেখিয়া]

গুরুদেব। ওঃ, এ যে অনেক আয়োজন দেখ্‌ছি! এত বেলায় এত সব না দিলেই পার্ত্তে! কি বল্‌ছ? ঠাকুরভোগের দেরী আছে? ও, তাই বল, তা হ'লে এক কাজ কর মা, আরো গুটীকয়েক করে ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস। আর শুধু তাতেই বা চল্‌বে কেন? খানকয়েক লুচি ভাজিয়ে আন না! খাবনা বলে আননি? কেন, খাবনা কেন? দিনে দুবার অন্ন গ্রহণ কর্ত্তে নেই বলে? লুচি ত অন্ন নয় মা। সে সব যে সিদ্ধ অন্নের কথা; লুচিতে কোন দোষ নেই। আর দেখ, বেশ ভাল করে একটু আলুর দম করে, কয়েকখানা বেগুনও ভাজিয়ে এন! একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কর মা!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

[যজ্ঞাগার]

গুরুদেব। (ক্রুদ্ধ স্বরে শরৎবাবুর প্রতি) এই কি বরণবস্ত্র নাকি? বলি, সূতী কাপড়ে কখন গুরুবরণ দেখেছ? তোমাদের সব কেমন আক্কেল হে? এ গাঁয়ে কি কেউ ভদ্রলোক নেই? বামুন পণ্ডিত নেই? তাদের কারো ঘটে কি বুদ্ধি নেই? গাঁটা কি এমন উচ্ছন্ন গেছে! উঃ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমরা যে আমাকে অবাক করলে দেখ্‌ছি! কি, 'এখন এই নিন' কি বল্‌ছ? না—না—ও সব ফাঁকি জোচ্চুরি চল্‌বে না? এ্যঁকি, বাজে বামুন পেয়েছ যে যা হাতে করে দেবে, তাই নেব? তোমরা শুধু টাকাই দেখ, গুরুর মান মর্য্যাদার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখ না! পাড়াগাঁর লোক তোমরা, তোমাদের আর কত বুদ্ধি হবে! যাক যা হবার হয়েছে, যখন আনা হয় নি, তখন আর উপায় কি? এখন মূল্য ধরেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে, পরে টাকাটা দিয়ে দিও। দশ টাকা কি বল্‌ছ? রেশমী কাপড় কখন কেন নি বুঝি? হাত দিয়ে জল গল্‌বার উপায় নেই। তোমরা কিন্‌বে রেশমী কাপড়! কি আর বল্‌বো! আজ কালকার বাজার দরতো জান না? পঁচিশ টাকার কমে হবার যো নেই। কি! সস্তায় কিনে দিতে পার? বেশ ত, সে ত তোমাদেরি লাভ। তাইই দিও। আমার তাতে ক্ষতি কি? হরি, নারায়ণ!

[ইতি মধ্যে ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গুরুদেবের জন্য মাংস রান্না হইবে কি না?]

গুরুদেব। না—না, এ বেলা আমার মাংস খাবার যো নেই। মা যে আজ আমার পাতে প্রসাদ পাবেন। আবার যে কবে এদিকে আস্‌তে পারব তার ত ঠিক নেই! এ বেলা শুধু গুরুকুমারের জন্য রাঁধ্‌তে বলগে, আমি খাই ত ও বেলা খাব এখন। আর দেখ, আমার জন্য বরং ঐ থালাটা রেখে দিও, বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাব, বুঝ্‌লে? তারপর কি বলছিলাম, হ্যাঁ, গুরুকুমারের 'বরণ' কই? না—না, শুধু প্রণামী বস্ত্র দিলে চল্‌বে কেন?

'বরণ' কই ? বিদায়ী বস্ত্রেই বা হবে কি ক'রে ? কি যে বল্‌ছ তার ঠিক নেই ? সে ত সকল বামুনেই পাবে। গুরুকুমার তো আর তাদের সমান হ'তে পারেন না ? এতে এত ভাব্‌বার কি হ'ল শরৎবাবু ? কাজের যা' যা' অঙ্গীয়, তা' না দিলে চল্‌বে কেন ? কি বলেন ভট্টাচার্য্য মশায় ? আনা না হ'য়ে থাকে, আনিয়ে দিও, তার আর কি ? হরি, দীনবন্ধু !

[এই যজ্ঞ উপলক্ষে গুরুদেবকে যে সব দ্রব্যাদি দান করা হইয়াছে, সে সমুদয় দর্শনান্তে]

গুরুদেব। এঃ, এ কি করেছ ? এ কি মশারি দিয়েছ ? কেন, নেটের দিতে পারনি ? সুজনি কই ? তোয়ালে চাদর দিয়েছ বলে কি আর সুজনি দিতে নেই ? বালিশের তোয়ালে কই ? ঝালর দেওয়া ওয়াড়ে ত আর তোয়ালের কাজ চল্‌বে না ? গদি তোষক ত দিয়েছ দেখ্‌ছি ! কিন্তু সতরঞ্চ কই ? এত টাকা খরচ করে অল্পের জন্যে আর কেন একটা খুঁৎ রেখে দিয়েছ, বল দেখি ? আরে দেখেছি তোমার কম্বল ! কিন্তু কম্বল তো আর সতরঞ্চ নয় ! ও কি, পিঁড়ি ? হ'লই বা কাঁঠাল কাঠের ! হা—হা—হা, তোমরা বড্ড হাসালে দেখ্‌ছি। হাল ফ্যাসনে কি আর কেউ পিঁড়ি দেয় হে ? কার্পেটের আসন দিতে পার নি ? কলসী তিনটে যে বড্ড ছোট ! ওতে আর ক' সের জল ধরবে ? বাটী গ্লাস ত কতগুলো দিয়েছ দেখ্‌ছি ? কিন্তু এমন বেঢক কেন ? দেখ্‌তে ত ভাল নয় ! পয়সাই যখন খরচ করলে তখন খাগড়া থেকে আনালেই পারতে। লোকেও বল্‌ত, হ্যাঁ, জিনিষের মত জিনিষ বটে ? থালা ক'খানা এত হাল্কা কেন হে ? এ কি শ্রাদ্ধবাড়ী যে নমোনমো করে কাজ সারবে ? নাঃ, এতটা ভাল হয় নি ; সব দিকে এত সংক্ষেপ করলে চল্‌বে কেন ? চটীজুতো ? সে কি ? বলি গোঁসাইগোবিন্দ মানুষ বলে কি আমরা মোজা-জুতো পরতে জানি নে ? না, তাতে আমাদের জাত যায় ? তোমরা আমাদের কি মনে কর বল দেখি ? ছাতার বাঁটটাও তো দেখ্‌তে ভাল নয়। কী যে তোমাদের পছন্দ, তা তোমরাই জানো। যাক্‌গে ! ওকি ঘড়ি ? ও গুরুকুমারের সেই ঘড়ি বুঝি ? তা' ওরকম ঘড়ি তো ঢের আছেই। হাতে বাঁধবার একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন ! অনর্থক কতগুলো টাকা নষ্ট হল। তা' এখন ওইটে থাক্‌, যখন পারবে সুবিধা মত আর একটা আনিয়ে দিও । বেশী বড় দরকার নেই । যত ছোট হয় তাই ভালো।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—॰❀॰—

[প্রভাতে চা পানান্তে গুরুদেব বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন]

গুরুদেব। তা হ'লে আমাকে বিদায় কর মা। আর বৃথা বিলম্ব করে লাভ কি ? (পাল্কী বেহারাদের প্রতি) ওরে নে—নে। তোরা শীগ্‌গীর জলটল খেয়ে নে। কি বল্‌ছ মা ? আমাদেরও জলখাবার তৈরী। তা বেশ, গুরুকুমারকে খাইয়ে দাওগে যাও। আমি ত এত সকালে কিছু খাবনা মা। না—না, সন্ধ্যে আহ্নিক হ'লে কি হবে। আমি তো সকালে কিছু খাইনা মা ? (প্রকৃত কথা বলিতে গেলে গত রাত্রিতে অতিরিক্ত ভোজনে ও সুরা পানে তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না।) কি বিপদ ! তুমি আমার কথা বুঝ্‌ছ না কেন মা ? আচ্ছা তা হ'লে এক কাজ কর, খাবারগুলো আমার পাল্কীতে তুলে দাওগে যাও। দই ক্ষীরের হাঁড়ি দুটোও দিয়ে দাও। না—না, আবার কতক রেখে যাচ্ছ কেন ? হ'লই বা আলুর দম। ও সব দিয়ে দাওগে যাও। কেন, আপত্তি কিসের ? বেহারাদের জন্য ? আমরা যে ওদের হাতে জল খাই না ! তা নইলে কি আর শুধু শুধু বল্‌ছি !

চাট্টে সরু চিঁড়ে দিলে হ'ত না? তোমাদের দৌলতপুরের চিঁড়ে বড় ভাল। সেই, সেবার দিয়েছিলে, তোমার গুরুমা সেই চিঁড়ে খেয়ে কত সুখ্যাত করলেন। দিয়েছ? তা দেবে বই কি! মাকে আমার কিছু বলতে হয় না। মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনি বুদ্ধিমতী। কি বলছ? খরচের কথা জিজ্ঞেস কর্‌চ! তা বল্‌বো বই কি? মার আমার সবদিকে লক্ষ্য থাকে! মার গুণেই ত সংসার জল্‌জল্‌ কচ্ছে। হাঁ, তা হ'লে এই যাওয়াআসার পাল্কীভাড়া ত্রিশটাকা, আর বেহারাদের খোরাকী ৬, ছয়টাকা —এই ছত্রিশ টাকা, খেয়াঘাট আর মুটেমজুর টাকা দেড়েক এই সবশুদ্ধ সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা,—ও চল্লিশটাকাই ধরো। তার পর পথে আমাদের দুজনারও জলটল খাওয়া আছে—আর তা ছাড়া খুচরো খরচও টাকা দুতিন হবে। ও গড়পড়তায় পঞ্চাশ টাকাই দিতে বল মা।

[গুরুমাতার জন্য একখানি শাড়ী, এক যোড়া শাঁখা ও সিন্দুর আনিয়া, বিন্দুবাসিনী গুরুদেবের নিকট অর্পণ করিলেন]

গুরুদেব। এত শিষ্যসেবক আমার! রাজা জমীদারও ত কত আছে। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি মা, এমন গুরুভক্তি আমি আর কারো দেখি নি! আশীর্ব্বাদ করছি গুরুভক্তি তোমার অক্ষয় হোক্‌, ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি থাক্‌। তা এখন এসব না দিলেই পার্ত্তে মা। মাসখানেক বাদেই ত শীতের 'বার্ষিকী' নিতে আসছি তখন দিলেই হ'ত! তা যা হোক এখন এর সঙ্গে যে কিছু প্রণামী দক্ষিণা দিতে হয় মা! এই যে তাও এনেছ দেখছি! বেশ, বেশ! (একটু পরে) এদিকে যে বেলা বাড়্‌ছে মা! আমার বিদায় প্রণামীটা দিতে বল।

[এক যোড়া করিয়া বস্ত্র ও যথ ক্রমে দশটী ও আটটা টাকা দিয়া, বিন্দুবাসিনী গুরুদেব ও গুরুকুমারকে প্রণাম করিলেন]

গুরুদেব। (ক্রুদ্ধ স্বরে শরৎ বাবুর প্রতি) কী! দশ টাকা দিয়ে গুরুবিদায়—বামুন পণ্ডিতদের সমান! না: তোমরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করচ দেখ্‌ছি!

[গৃহাভ্যন্তর হইতে কে বলিয়া উঠিল, বামুনপণ্ডিতের সমান হ'ল কি করে? তাঁদের ত চারটাকা করে বিদায় দেওয়া হয়েছে]

গুরুদেব। (সুরা দেবীর কৃপায় এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্জ্জন করিয়া) চোপরাও ছুঁচো, আমার কথার উপর কথা! গুরুর মূল্য তোরা কি বুঝ্‌বি পাজী—! থাকৃত যদি যাদব, তো সে আমার মূল্য বুঝ্‌ত! এত আস্পর্দ্ধা তোদের! দাতার দানে তোরা বাধা দিতে আসিস্‌! মাকে ত আমার চিনতে বাকী নেই। এ সব তোদেরই জোচ্চুরি! এ ত পরের উপকার করা নয়, তার সর্ব্বনাশ করা! নাবালকের সংসারটা তোরাই লুটে-পুটে খাবি দেখ্‌ছি!

বিন্দুবাসিনীর এক বোনপো সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কলেজে শিক্ষিত—গুরুদেবের এই অন্যায় অত্যাচার ও অভদ্র ব্যবহার তাহার কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলে, ক্রুদ্ধ স্বরে সে যেন কি বলিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী অমনি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ, চুপ! ওসব কি কিছু বল্‌তে আছে বাবা! গুরুদেব! সাক্ষাৎ নারায়ণ!" পরে তিনি উপযুক্ত প্রণামী দিয়া গুরুদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—আর বলিতে লাগিলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু।

বর্ষা-বরণ।

—*—

(১)

ভুবন ভরি'　　পড়িছে ঝরি'
বাদর-ধারা অবিরল,
সজল বায়ে　　যায় মিলায়ে
কেতকী-যূথী-পরিমল ;
নিখিলে আজি আন গো নব
ভরসা,
এস গো ভব-ভবনে, অয়ি
ভুবনময়ী বরষা !

(২)

জীবন মাঝে　　নবীন সাজে
এসেছ আজি,—একি ছল ?
করকা-ভাতি　　দিবস-রাতি,
ঝরিছে নিতি আঁখি-জল !
এ মরুভূমি কর গো কর
সরসা,
এস গো মেঘ-স্বপন বহি'
জীবনময়ী বরষা !

(৩)

মরণ-বঁধু　　ডাকিছে, 'বধূ,
এস গো এসো নীপ-তল,
আজি বাদলে　　যমুনা-জলে
উঠিছে ঘন কল-কল !'
এস গো চির-মধুর খর-
পরশা,
ভুবনময়ী　　জীবনময়ী
মরণময়ী বরষা !

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

চিত্র ও চিত্রবৃত্তি।

——ঃ*ঃ——

একবার একটি শিশু জানালার ধারে বসে সন্ধ্যাবেলায় আকাশে নানান রঙের মেঘের ভিতর বিচিত্র ছবি দেখে এতদূর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে সে থাকতে-না পেরে কোথা থেকে একটা স্লেট পেনসিল এনে আপন মনে সেই বিধাতার গড়া মেঘের ছবি নকল করতে লেগে গেল। সে বার বার মেঘের ছবি আঁকতে চেষ্টা করচে কিন্তু প্রতিবারেই পারচেনা—মুছে ফেলচে—আবার নতুন করে আঁকচে। কিছুতেই সেই হাঁ করা সিংগীটা যে নেউলের পিছনে তাড়া করেচে, এঁকে উঠতে পারলে না। ছবিটাও দেখতে দেখতে আকাশে মিলিয়ে গেল! এমন সময় তার মা পাঁচ বৎসরের শিশুটির কাণ্ড দেখে জিজ্ঞাসা করতেই বালক শ্লেটটি মাটিতে রেখে বিমর্ষভাবে বল্লে "আকাশে যে সব ছবি দেখচি—মা, আমি তো কৈ অমন আঁকতে পারচি না?"

এই কথাটাই হচ্চে এখন আমাদের আর্ট সম্বন্ধে ভাববার কথা। ভগবানের সৃষ্টির হুবহু নকল করবার স্পৃহা ছেলেটির মনে যেমন এসেছিল আমাদেরও মনে বিধাতার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শিল্পকলায় প্রকাশ করতে তেমনি আকুলি-বিকুলি হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই যে ভগবানের শ্লেটের মত করে ছবি আঁকার অক্ষমতা সেটা শুধু বালকেরই নয় প্রত্যেক শিল্পীরই সেই অক্ষমতা। ভগবানের সৃষ্টির হুবহু নকল চিত্র তুলতে সব শিল্পী হার মেনেচেন। তবে শিশুটির রাঙা মেঘের রাঙা ছবি দেখে যে আনন্দ, শিল্পীর বিধাতার সৃষ্ট সৌন্দর্য্য দেখেও সেই আনন্দ। কিন্তু শিশুর মত বিধাতার সৃষ্টির হুবহু নকল করবার চেষ্টা যেন না করি।

শিশুর কাছে আমাদের এখানে শেখবার আছে তার অহৈতুকি আনন্দ সে যে আপন মনে বিশ্বরচনা দেখে আপন খেয়াল-খুসী রচনায় মেতে গিয়েছিল, লাভালাভের কোন ধার ধারে না। একবার জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে সাহেব লণ্ডন ইনিস্টিটিউটে একটি চুম্বক দ্বারা কেমন করে বিদ্যুত উৎপন্ন যায় দেখাচ্ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক পরীক্ষার ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল "ফ্যারাডে মহাশয় আপনি যেটা দেখালেন সেটা প্রমাণ হ'ল কিন্তু তাতে কি কাজে আসবে?" তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন "মহাশয়া আপনি কি বলতে পারেন সদ্যোজাত শিশুটি কি উপকারে আসতে পারে?"

আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে একজন প্রধান শিল্পী রোঁদা বলেছিলেন "The word 'artist' in its widest acceptation means the man who takes pleasure in his work." আমরা কবিবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শুনেচি যে তিনি অল্প বয়সে কবিতা রচনা কালে শুধু একবাটি ডালপোরেই সমস্ত দিন তন্ময় হয়ে কবিতার-পর-কবিতা রচনা করে গেছেন—তাঁর এই রচনা কার্যের আনন্দ তাঁহার আহার বিহার ভুলিয়ে দিতো। এ রচনায় আনন্দ যদি না পেতেন শুধু কোন ব্যক্তির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে যদি কবিতা লিখতে বসতেন, তাহলে কি তাঁর মত প্রতিভার পরিচয় জগত আজ পেতে পারতো?

প্রত্যেক দেশের এক একটি জাতীয় ভাব এক এক দেশের শিল্পের ভিতর প্রকাশ পাবে—সেটা না হ'লে তার বিশেষত্ব লোপ পায়। জাপানের ছবি এবং চীনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির যেমন একটা জাতীয় রীতি-পদ্ধতিতে আঁকা এবং তাদের দেশের শিল্প বুঝতে হলে একটা বিশেষ শিক্ষা ও সহানুভূতির প্রয়োজন, আমাদের দেশে যেখানে খৃঃ পূঃ ১ম থেকে ১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিত্রশিল্প পাহাড়ের গুহার গায়ে মোগল দরবারে চলে এসেছিল

সেখানকার শিল্পকলাতেও একটা বিশেষত্ব নেই, একথা বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না। চীন জাপান প্রভৃতির মত আমাদের চিত্র-শিল্পেও রেখা ও বর্ণসমাবেশ প্রধানভাবে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা প্রকৃতির হুবহু ছবি ওঠাবার উদ্দেশ্যে Perspective, Anatomy, Shade and light, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায় সকল উদ্ভাবন করেছেন।

ছবির প্রধান কাজ হচ্চে চিত্তরঞ্জন করা এবং সজ্জা। এই কাজে আমাদের দেশী শিল্প ইউরোপীয় শিল্প অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো হয় নি। বরং আমাদের দেশী ছবিতে চিত্তরঞ্জক সজ্জাই (decorative treatment) বেশী থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য্য-সজ্জা আছে, সেটা প্রকৃতির বুকেই ভালরূপে প্রকাশ পায়, তাকে আলাদা করে ছিন্ন করে দেখতে গেলেই, তাকে মানুষের পোষাকী করে তুলতে গেলেই খর্ব্ব করা হয়। তাই তখন তাকে মানুষের মনের দরবারে পেষ্ করতে হলেই তাতে একটু বেশী রঙ (colour) বেশী ঢঙ (pose) দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির বুকের সাধাসিধে ভাবটা একটু হেঁয়ালিতে পরিণত করতে পারলে মানুষের তখন সুখ থাকে না। তাই প্রকৃতির হুবহু Photo Colour-photograph হলেও হাতে আঁকা দূরের পাহাড়ের বেগনী রঙ সামনে ধূসর রঙের কুয়াসা, ঝাপসা ঝাপসা দৃশ্য চিত্রখানিই আমাদের দেশী মনকে আকৃষ্ট করে। Photoটি সেখানে তুচ্ছ হলেও হাতে আঁকা ছবিটির অতি রঞ্জন ভাবটিই মোটের উপর আমাদের লাগে ভাল। এ বিষয় দেশী বিলাতি নেই, সব ছবি সম্বন্ধে একথা খাটে। আমাদের শিল্পীরা মানুষের মনের এই খবরটি বরাবরই জানতেন বলে আমাদের মনে হয়। তাই অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি পর্ব্বত গাত্রের চিত্রগুলিতে এত বেশী রঙ (colour) ঢঙের (pose) ছড়াছড়ি, আর মোগল দরবারের ছবির কারীকুরী যেন মীনের মিহী সূক্ষ্মকাজ চোখের সামনে ধরে চুল চিরে দেখে দিতে হয়। মোগল বা অজন্তার শিল্পীদের চিত্র ভাল করে দেখলে বোঝা যায় তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে প্রকৃতির দৃশ্যের কাছ-ঘেঁসা ছবি ভালরূপই আঁকতে পারতেন কিন্তু তবুও যেন সব ছবিতেই ইচ্ছাকৃত একটা অতিরঞ্জন, রেখায়, বর্ণে সবেরই ভিতর বিরাজ করচে। ইউরোপীয় শিল্পীরা যে যতই স্বভাবের হুবহু নকল করতে বদ্ধপরিকর হয়ে বসুন না কেন শেষে দেখা যায় কোথা থেকে তাঁর অতিরঞ্জন স্পৃহা ছবিখানিকে প্রকৃতির রঙগুলি অপেক্ষা বেশী রঙিয়ে দেয়। আর আমাদের দেশী শিল্পীরা প্রকৃতির মধ্যে কোথায় অতিরঞ্জন (decorative) ভাবটি আছে সেইটি ভালরূপে জেনে তবে মনের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে চিত্র রচনা করেন। প্রকৃতিতে আছে ফুল ফল বর্ণগন্ধের অপর্য্যাপ্ত বিকাশ! কিন্তু যতক্ষণ না কবি বা চিত্রকর সেটিকে তার মানস-কল্পনায় জাগিয়ে তুলে দর্শকের জন্যে ডালি সাজিয়ে তুলচেন ততক্ষণ সে সবই ব্যর্থ, সবই লোকের মনের বাইরেই প্রকাশ পেয়ে লোপ পাবে। তাই কবি গেয়েছেন :—

"ফুলে যে রঙ ঘুমের মত লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল"

শিল্পীর এইখানেই মহত্ত্ব। সকলেই চাঁদের আলো দেখে, ফুল দেখে, সঙ্গীত শোনে কিন্তু শিল্পী যতক্ষণ না সেই সব জিনিষের রস তাঁর রচনায় মানুষের সামনে ধরে দিচ্চেন ততক্ষণ আর—

"এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান"

এ কথা কেহ বলতে পারবেন না। Oscar Wilde এবিষয় বলেছেন :—

"To look at a thing is very different from seeing a thing. One does not see anything until one sees its beauty, then, and then only, does it come into existence. At present, people see fogs, not because poets and painters have taught them the mysterious loveliness of such effect. There may have been for centuries in London I dare say there were but no one saw them and so we do not know anything about them. They did not exist until art had invented them." সাধারণ লোকে চিত্রকলা বাস্তবপ্রধান হলেই সন্তুষ্ট হয় কিন্তু শিল্পীর রচনা স্বার্থক হয় যখন তার আর্ট প্রকৃতির বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে উঠে মানুষের মনে একটা অলৌকিক ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। শিল্প অনেক সময় শিল্পীরও দুরধিগম্য হয়ে পড়ে শিল্পীর শিল্প রচনা অনেক সময় তাঁর অবর্ত্তমানে কয়েক শতাব্দির পর উপযুক্ত রূপে ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়। এমার্সেন গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে একস্থলে যা বলেছেন, শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে : "One man shall not be able to bury his meaning so deep in a book, but time and like-minded men shall discover it." Schiller বলেন "An artist may be known rather by what he omits."

এখন আমাদের দেশে আর এক গুরুতর সমস্যা এই যে এখন অনেকেই আর্টের উপকারীতা কি তা জানতে চান। এ বিষয় একবার কোন ট্রেণের সহযাত্রী একজন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলুম যে তিনি নাকি রবিবাবুর ঘরেবাইরে গল্পটির সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাতে ঐ গল্পটির উপকারিতা সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে একদা রবিবাবুর সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং পণ্ডিত মহাশয় তাঁর সমালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় রবিবাবু 'হাস্য করে' বলেছিলেন :—"এইবার থেকে স্থির করেছি উপকারী কবিতা রচনা করবো—কুইনাইনের উপর কবিতা লিখবো—বলবো "হে কুইনাইন! তুমি তিক্ত বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রকোপিত বাঙলায় তোমার মত সুহৃদ আর কে আছে ইত্যাদি।" রবিবাবু বুঝেচেন আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা আর্ট চায় না, চায় উপকারিতা। অতএব বাঙলার চিত্র-শিল্পীদের ও ম্যালেরিয়া নিবারণের কুইনাইনের ছবি আঁকা ছাড়া গত্যন্তর কোথা!

ছবির কাজ মনের সূক্ষ্ম রসানুভূতিটুকু জাগিয়ে দেওয়া। এই উপকার খুব ক্ষুদ্র দেখতে হলেও আধ্যাত্মিক জগতে এর মূল্য বড় কম নয়। সঙ্গীত, কাব্য, কলা মানুষকে যে রস যোগায় তা কোন বাহ্যজগতের সাধ্য নাই মানুষকে কেহ দিতে পারে। এগুলি মনের ভিতর থেকে প্রকাশিত হয়ে মনেরই খোরাক যোগায়।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

জুলেখার রূপ।

—:*:—

(জামী)

বয়ান তাহার ইরাম বাগের মত
নানা বরণের গোলাপের যথা বিভা
ভোমরার মত যেন মধুপানে রত
কালো তিলগুলি তাহাতে শোভিছে কিবা।
রজতের কূপ চিবুকের টোল তার
জীবনের রস সঞ্চিত যাহে রয়,
লভিয়া কেবল শীকর গন্ধভার
ঋষিরো নয়ন স্নিগ্ধ পাবন হয়।
নিকটে আসিলে ঐরাবতের প্রায়
ঘূর্ণীর পাকে কোথায় ভাসিয়া যায়।

দ্বিরদের রদে রচিত কণ্ঠখানি
নয়নের তার বিশ্বে মাহিক তুলা
হরিণ শিশুরা অর্ঘ্য বহিয়া আনি
বার বার চুমে অর চরণের ধূলা
এক বার চেয়ে কান্তি নেহারি তার
গোলাপ বালারা মাথা হেঁট করি ঝুরে
বুল-বুল করি গুল্‌বাগ্‌ পরিহার
তাহার কেশের আরতি করিয়া ঘুরে
নিখিল নিকষ মেনে চির পরাজয়
পরখ করিতে আপনিই পূত হয়।

উরসিজ-যুগ সরসিজ, নীর-ধুত
মনসিজ তায় পূজিছে কৃত্তিবাসে
কাকুরের রস বিম্ব হইতে পূত
আলোক গোলক হৃদি নভে যেন ভাসে।

অথবা যেন তা শোভিছে কুঞ্জছায়

একটি বৃন্তে দুইটি আনার ফল

চক্ষুতে কভু পরশ করিবে গায়

বাসনা-শুকের নাহি হেন বুকে বল।

ভক্ত সাধুর হৃদয় মুকুতা রাজি

মণিপ্রকোষ্ঠে সদা তার উঠে বাজি।

শ্রীকালিদাস রায়।

মেঘের দিনে।

অস্তগামী তপনের ম্লান কিরণ যখনই সঞ্চিত মেঘের উপর বিষাদের তুলিটা বুলাইয়া দেয় তখনই অতীত যৌবনের একটা দিনের করুণ স্মৃতি বর্ত্তমানকে ভুলাইয়া দিয়া স্মৃতিপথে উদিত হয়।

* * * *

বহু দিনের কথা। এম্‌-এ পাশ করিয়া চাকরীর উমেদারী করিতেছি। পরীক্ষাগুলি উত্তরোত্তর সম্মানের সহিত পাশ করিবার সময় নিত্য নূতন রঙ্‌ ফলাইয়া কল্পনাকে বিচিত্র ইন্দ্রধনুতে পরিণত করিয়াছিলাম। আর আমারই সৃষ্ট ইন্দ্রজালের অন্তরালে অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেছিলাম। সহপাঠীদের অবিরত প্রশংসাবাক্য শুনিয়া শুনিয়া আর পরীক্ষা-বারিধির ছোট বড় তরঙ্গ হেলায় অতিক্রম করিয়া একটা উত্তেজনায় পড়িয়াছিলাম—নিজের ওজন ভাল বুঝিতে পারি নাই; তাই মোহময় অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এ মোহ, এ স্বপ্ন টুটিয়া গেল, যখন আমি তখন পরীক্ষা-বারিধির অপর পারে। এপারে থাকিয়া যে ইন্দ্র ধনু দেখিয়াছিলাম, অপর পারে দৃষ্টি-বিভ্রম কাটিয়া যাওয়াতে দেখিলাম ঘনকৃষ্ণ মেঘ—তড়িৎগর্ভ, বজ্রপাত হইতে বেশী দেরী নাই! সমস্ত পাশ করা শেষ হইয়া যাওয়ায় অকস্মাৎ যেন কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল—সংসারের—আবর্জ্জনায় হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। নয়ন হইতে পুরাণ অঞ্জন যেন কাটিয়া গেল। কখন যে ছাত্রজীবনের কাব্য শেষ হইয়া গিয়াছে জানি না। একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিলাম যে কোনও একটা মেসের প্রকোষ্ঠে বসিয়া সারাদিন ধরিয়া নানাবিধ ইংরাজী খবর-কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন মন্থন করিয়া হলাহল তুলিয়াছি, আর তাহাই পান করিয়া জর্জ্জরিত হইয়াছি!

আবেদন পত্র লিখিতে লিখিতে ও প্রশংসা পত্র নকল করিতে করিতে হাতে ব্যথা ধরিল, আঙ্গুলে কড়া পড়িল; কিন্তু দেখিলাম সব চিঠিপত্রেই একতরফা লেখা হইতেছে, ভুলিয়াও কেন তাহার উত্তর দেয় না। কয়েক স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হইয়াছিল। সে কি ভীষণ প্রতীক্ষা! দেখা করিবার পূর্ব্বে কত আশা, কত উদ্বেগে হৃদয় আন্দোলিত হইত, তাহা বলিতে পারি না। স্কুলের কত মাষ্টারি খালি হইল, পূর্ণ হইল; আবার খালি হইল, পূর্ণ হইল, কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। সকলেই অভিজ্ঞতা চায়; হায়! বিশ্ববিদ্যালয়ে

যদি একটা অভিজ্ঞতার পরীক্ষা থাকিত তাহা হইলে বোধহয় তাহা পাশ করিয়া অভিজ্ঞতার একটা ডিগ্রী লইতে পারিতাম! এই সময় আমার দুই একজন বন্ধু উপদেশ দিল যেন আমি ছেলে পড়ানর অনুসন্ধান করিতে বিরত না হই। তাহার পরদিনই প্রাতে উঠিয়াই এ স্কুল, সে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে, রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফ অথবা ট্রামকারের তারের স্তম্ভে "Wanted"এর সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। কোনখানে হাতে লেখা Wanted দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া গিয়া পড়িতাম। চাকরীটা হইতে পারে এই আশায় আনন্দ অনুভব করিতাম, কিন্তু হায় তাহা ক্ষণিক! যে অংশে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানাটা ছিল তাহা লুপ্ত, কোথায় আবেদন করিতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই! কতবার যে ভগ্নমনোরথ হইয়াছি তাহা আর বলিয়া কি হইবে? একবার একটা চাকরি পাইয়াও ভাগ্যদোষে তাহা পাইলাম না।

একদিন একটা গৃহশিক্ষকের পদের নিমিত্ত স্বয়ং দেখা করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইলাম। প্রাতে দশটার সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিয়োগকর্ত্তার অনুসন্ধান করিতেই বাড়ীর চাকর বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, আপুনি কি মাষ্টারির জন্য এসেছো?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি ক'রে জানলে বাপু?" সে হাসিয়া উত্তর করিল—"আজ সকাল থেকেই তো বাবুরা মেষ্টারির জন্য আসছে—তাই আমি মনে করলাম—আপুনিও বুঝি সেই জন্য এসেছো—কর্ত্তা বাবু বাড়ীর ভিতর গেছেন—এখন তো দেখা হবে না।" এই ব্যাপারে আমি বড় ব্যথা অনুভব করিলাম—আজ নয় দশমাস হইতে অবিরত চেষ্টা করিতেছি—হায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, উপযুক্ত সুপারিশের অভাবে তুমি কি একমুষ্টি অন্নেরও সংস্থান করিতে পার না?

মেসে ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া নিজ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় নীচে ঠং করিয়া শব্দ হইল। বুঝিলাম ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া গেল। হন্টলি পামারের বিস্কুটের বাক্সকে পত্রাধার করা হইয়াছিল। দেখিলাম সেই অভিনব পত্রাধারে আমার নামে একখানি চিঠি রহিয়াছে। খুলিয়া পড়িলাম—

তিনধারিয়া
১৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রিয় সুশীল,

কোন চাকরী মিলিল কি? কয়েক দিন তোমার চিঠি না পাইয়া ভাবিতেছিলাম রেঙ্গুন কিম্বা পঞ্জাব চলিয়া গিয়াছ—তাই পত্র পাইতে দেরী হইতেছে! যদি কোথাও না গিয়া থাক, একবার এখানে আসিলে ভাল হয়—আমার এখানে বড় একা একা বোধ হইতেছে। রোগীর নাড়ী টিপিয়া টিপিয়া তিক্ত বিরক্ত হইয়াছি। তোমার চাকরী অনুসন্ধানের বিঘ্ন হইবে না—এখানেও দুই তিনখানা ইংরেজী কাগজ আসে। তোমার দরখাস্ত করার কোন অসুবিধা হইবে না। একবার আসিয়া হিমালয়ের দৃশ্যটা দেখিয়া যাও। কবে আসিতেছ লিখিবে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ইতি—

তোমার
ধীরেন।

ধীরেন আমার সহপাঠী ছিল। ক্যাম্প্‌বেল মেডিকাল স্কুল হইতে পাশ করিয়া তিনধারিয়া রেলওয়ে হাঁসপাতালের সহকারী ডাক্তার হইয়াছে। কলিকাতা আর ভাল লাগিতেছিল না। সাত আটদিন পরে তিনধারিয়া আসিলাম।

• • • •

কর্ম্মকোলাহল মুখরিত কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর ঢং-ঢং—ঢং-আ-ঢং ঘণ্টার শব্দ, ছ্যাকড়া গাড়ীর অবিরত ঘড় ঘড়ানি, আর ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল। এই শান্ত স্থানটীতে আসিয়া সেই সব উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বেশ একটুকু আরাম অনুভব করিলাম। রোজ রোজ সকালে উঠিয়া দরখাস্ত করার পাঠ ঘুচিল—এমন বেজায় একঘেয়েমি হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এই প্রথম পাহাড়ে আসিয়া যেন একটা নূতন আনন্দের আস্বাদ পাইলাম। ধীরেনের সহিত সকালে বিকালে খুব এক চোট বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার যখন কাজের ভিড় থাকিত তখন একাই বাহির হইয়া পড়িতাম। প্রথম প্রথম কার্ট রোড ধরিয়া বেড়াইতে সুরু করিলাম। পরে পাহাড়িয়াদের দেখাদেখি উঁচু জায়গা হইতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া আসিতাম। প্রথম প্রথম মাথা বড় ঝিম্-ঝিম্ করিত, পরে অভ্যাস হইয়া গেলে উক্ত উপায়ে উঠানামা সোজা হইল। একেলা এই রকম চড়াই-উৎরাই করিয়া ধীরেনের বাসা হইতে অনেক দূর গিয়া বেড়াইতাম। সেখানে একটা বসিবার জায়গা ছিল। তথায় বসিয়া বসিয়া গাড়ীর গতায়াত দেখিতাম। ঊর্দ্ধগামী চলন্ত এঞ্জিনের সামনে ধকারের উপর ঝুঁকিয়া পাহাড়ী খালাসীদ্বয় যখন রেল লাইনের উপর বালি ছড়াইয়া চলিত তখন সাহসের জন্য মনে মনে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারিতাম না। রিভার্সের সাহায্যে অনেকখানি রাস্তা সংক্ষেপ করিয়া যখন গাড়ীখানি হঠাৎ খুব উচ্চে উঠিত তখন আমার বিস্ময় দ্বিগুণিত হইত।

এই স্থানটী আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এক দিন এইখানে রেজিমেণ্ট হইতে অবসর-প্রাপ্ত একজন বৃদ্ধ পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তাহার হাতে একটা ক্লারিওনেট ছিল। রেজিমেণ্টে থাকা কালীন যে গৎগুলি শিখিয়াছিল, তাহা একে একে বাজাইত—আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাও একটী প্রাণস্পর্শী করুণ পাহাড়িয়া গীতে বৃদ্ধ আমাকে মোহিত করিয়াছিল। তাহার বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমি তন্ময় হইয়া পড়িতাম—সমস্ত সংসার ভুলিয়া যাইতাম—আর মনে হইত যেন কোন সুদূর মায়ার দেশে চলিয়া গিয়াছি। কি যেন অজানা দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। তাই প্রায়ই এইখানটীতে আসিতাম।

একদিন এধারে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলাম একজন ভদ্রলোক আর ক্ষীণাঙ্গী একটী মহিলা আমার আসনটী দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাদিগের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া আর একটু দূরে বেড়াইতে গেলাম। অন্ধকার করিয়াছিল—পশ্চিমে গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতে ছিলেন। পাহাড়িয়া মেঘকে বিশ্বাস নাই—শুভ্রাভ্র কখন যে ঘন হইয়া গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। বৃষ্টি পাতের ভয়ে তাই তাড়াতাড়ি ফিরিতেছিলাম। বসিবার জায়গাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম তাঁহারা ও উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মহিলাটী বড় কৃশ, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, যেন অনেকদিন রোগে ভুগিয়াছেন। তাহাদিগের নিকট দিয়া যাইতেই ভদ্রলোকটী ডাকিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে অল্প দূরেই একটী বাংলোতে তিন চারি দিন হইল তাঁহারা আসিয়াছেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে কর্সাং কিংবা দার্জিলিঙ্গে যাইবেন। অল্প সময়ের ভিতরই আমাদের প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। আমাদের পিছনে তাঁহার স্ত্রী আসিতে লাগিলেন।

কিছুদূর আসিয়া পাহাড়িয়াদের একটী বাড়ীর কাছাকাছি হইয়াছি এমন সময় মেঘ হইতে বড় বড় বিন্দু পড়িতে লাগিল। আমরা যতদূর সম্ভব গতি দ্রুত করিলাম। সহসা আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া বিজলী চমকিয়া উঠিল—চোখে অন্ধকার দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া বজ্রধ্বনি হইল।

চীৎকার করিয়া মহিলাটী শূন্যে কি যেন ধরিতে যাইতেছেন এইরূপ বাহু প্রসারণ করিয়া সেইখানে পড়িয়া গিয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার স্বামী ভয়চকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"এ মূৰ্চ্ছা অল্পক্ষণের মধ্যে ভাঙ্গিবে না, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন ধরাধরি করিয়া লইয়া যাই।" আমি বলিলাম—"এই বৃষ্টিতে এই অবস্থায় আপনাদের বাসা পর্য্যন্ত যাওয়া সুবিধা হইবে না। চলুন ওই পাহাড়ীদের বাড়ীতে ওঁকে লইয়া যাই। এইখান দিয়া যাতায়াতে উহাদের সঙ্গে আমার একটু আধটু জানাশুনা হইয়াছে। পরে উহাদের সাহায্যে ডুলি করিয়া আপনাদের বাসা পর্য্যন্ত অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইবে।"

কোনও রকমে মহিলাটীকে পাহাড়ীদের ঘর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের আকস্মিক বিপদে সরল পাহাড়িয়া রমণীদের হৃদয় করুণাসিক্ত হইয়া উঠিল। রোগিণীর এইরূপ অবস্থার কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের ঔৎসুক্যের পরিচয় দিল। কেহ কেহ রোগিণীকে মূৰ্চ্ছাবস্থায় হাত পা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে দেখিয়া বলিল যে রোগিণী সত্বাবিষ্ট হইয়াছে—একটু ঝাড় ফুঁক করিলে "দেও" ছাড়িয়া যাইতে পারে। রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা কি ইহাদিগকে তাহা বুঝাইবার অনর্থক প্রয়াস না পাইয়া তাহাদিগের নিকট একটা ডুলি প্রার্থনা করিলাম। উহাদের মধ্যে কি একটা দুর্ব্বোধ্য কথাবার্ত্তা হইল। ক্ষণেকের মধ্যে দুইটী সবলকায় বালক ক্ষুদ্র একটী ডুলি লইয়া আসিল। বৃষ্টি ধারা ক্ষান্ত না হইতেই সেই ডুলিতে তাঁহাকে কোন প্রকারে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদের বাংলোতে লইয়া আসিলাম।

আমাদিগকে এই অবস্থায় আসিতে দেখিয়া বাংলোতে যিনি ছিলেন অস্ফুট আৰ্ত্তধ্বনি করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। পরে অতি সন্তর্পণে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া ডুলিটাকে বারান্দায় উপরে উঠান হইল। বারান্দার এক পার্শ্বে অসামান্য রূপ-লাবণ্যসম্পন্না গৌরাঙ্গী দশম বর্ষীয়া একটী বালিকা "মায়ের ফিট্ কখন হ'ল বাবা? মা কেমন আছে?" বলিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্ব্বে কোথাও যেন বালিকাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু—কিন্তু সে তো আর এখন এ জগতের নয়! তবে কি ছায়া দেখিলাম—না, বজ্র ধ্বনির পর আমার মস্তিষ্কের কিছু উলট্ পালট্ হইয়া গেল? চশমার কাঁচের উপর সঞ্চিত চূর্ণ বৃষ্টি-বিন্দু সযত্নে মুছিয়া লইয়া পুনরায় যখন চাহিলাম, তখন ডুলি গৃহ মধ্যে অৰ্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে। বালিকার কাপড়ের প্রান্তভাগ মাত্র দেখা গেল। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিলাম। মিনিট তিন চার পরে ডুলিবাহক বালকদুটী বাহির হইয়া গেল।

প্রায় অৰ্দ্ধঘণ্টা পরে সেই ভদ্রলোকটী বাহিরে আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর মূৰ্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, আমাকে তাঁহার সসম্ভ্রম কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। এই সময় দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী বালিকার সহিত প্রবেশ করিতেই তিনি introduce করিয়া দিয়া বলিলেন—'ইনি আমার ভাই' আর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন—'ইনি সুশীল বাবু।'

আমার পক্ষে এই পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যক ছিল না; কারণ ৩।৪ মাস আগে গৃহ শিক্ষার কর্ম্মের অনুসন্ধানে উঁহার সঙ্গেই একদিন দেখা হইয়াছিল—তবে উনি আমাকে চিনিতে পারিলেন কিনা সন্দেহ। বালিকাকে ভাল করিয়া দেখিয়া আমার আর কোনও সংশয় রহিল না। আমি ইহারই শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু প্রথম দিন পড়াইতে আসিয়াই শুনিলাম যে তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে! অনেক করিয়াও এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম যে আমার ভুলও হইতে পারে। সেই জন্য নানারূপ অনুকূল প্রতিকূল যুক্তির ঘাত সংঘাতে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলেও যথাসম্ভব ধৈর্য্য অবলম্বনে আত্মভাব প্রকাশ পাইতে দিলাম না।

এমন সময় তিনি বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ তো মা লিলি, চা হোল কি না ?"

লিলি ! আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি, নামের ও যে আশ্চর্য্য মিল !

লিলি বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল—পিছনে বেয়ারা চায়ের জিনিসগুলি লইয়া আসিল। লিলি তিনটা কাপে চা ঢালিয়া দিল। তাহার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, চায়ে তো আপনার কোন আপত্তি নেই ?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, না।"

"কিন্তু আপনাকে চা দেবার পূর্ব্বে একটা কথা বলতে চাই—, আমরা নেটিভ খৃষ্টান। আমাদের হাতে চা খেতে হয় তো আপনার সঙ্কোচ হতে পারে।"

বাস্তবিক এ বিষয়ে আমার কোন ও 'প্রেজুডিস্' ছিল না। তাই তখনই বলিয়া উঠিলাম—"কিছু না, কিছু না আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না।" তাঁহার হাত হইতে কাপটি লইয়া চামচ দিয়া নীচের চিনিটা বেশ করিয়া নাড়িয়া লইলাম। তাহার পর মুখ দিতেই অধরে বিশেষ উষ্ণতা অনুভব করিলেও সপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে চায়ের বাটীটা সশারের উপর রাখিয়া দিলাম।

চা পান করিতে করিতে লিলির পিতা বলিলেন—"আমরা সবাই আপনার নিকট বড় কৃতজ্ঞ। আপনি না থাকলে আজ বড় বিপদই হতো।"

আমি মাথা ঈষৎ নত করিয়া সময়োচিত বিনয় দেখাইলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"যখন আমরা বেড়াইতে বাহির হই একটা মেঘ করিয়া এমন কাণ্ডটা যে ঘটিবে তাহা ভাবি নাই। তবু আমি ভয়ানক অন্যায় করিয়াছি। আজ ৪।৫ মাস থেকে আমার স্ত্রীর এই রথম ফিট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই যে আমার মেয়েকে দেখিতেছেন একে ভগবানের দ্বিতীয় দান বলিয়া আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। খুব ছেলেবেলায় লিলির একবার ফিট হয় তখন প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল তারপর সে দিন বালিগঞ্জে—চার পাঁচ মাস আগে—সিঁড়ি হইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মাথায় সাংঘাতিক চোট লাগিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে brain concussion হইয়া Syncope হইয়াছে। অনেক রকম প্রক্রিয়া করিয়াও তিনি লিলির চেতনা সঞ্চার করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল—নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন পাইলাম না। সমস্ত দেহ নিস্পন্দ হইল সজীবতার সকল লক্ষণই তিরোহিত হইল। ডাক্তার বাহির হইয়া গিয়া বলিলেন যে 'মেয়েটা মারা গেছে'। গাড়ীতে উঠিবার আগে আমার ভাইকে Death-certificate লিখিয়া দিয়া গেলেন। লিলি যখন মারা গেল তখন অপরাহ্ন। পশ্চিমে বেশ মেঘ করিয়াছিল—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল। ডাক্তার বাহির হইয়া যাওয়াতেই আমার স্ত্রী বুঝিলেন যে মেয়ের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া লিলিকে কোলে করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। তাহার পর হইতে কোন দিন বিকাল বেলা মেঘ করিয়া বিদ্যুৎস্ফুরণ হইলেই তাঁহার ফিট হইবার ঝোঁক হয়—আর হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকে। আজও সেই আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতেছিলাম।" এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময় লিলি মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া তাহার কাকার সহিত চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল।

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন—শোচনীয় মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারে আমার স্ত্রী এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে তাঁকে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তখনও আমাদের উপর একটা রূঢ় কর্ত্তব্যের গুরুভার ছিল—মৃতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। কিন্তু গৃহে শবাধার লইয়া আসিতে পারিলাম না। শবাধারের আবরণ বন্ধ করিবার সময় যখন পেরেক ঠোকা হইবে, তখন সন্তানহারা মায়ের বুকে প্রত্যেকটী পেরেক কি শেলের মত গিয়া বিঁধবে না? হাতুড়ীর প্রত্যেকটী ঘা কি তাঁর শূন্য বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে না? না, না, হতভাগিনীকে আর নূতন যাতনা দিতে ইচ্ছা হইল না। ঠিক হইল যে অ্যাম্বুলান্স্ গাড়ী করিয়া মৃতাকে নিকটস্থ সমাধি ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে। আমার ভাই সন্ধ্যার কিছু আগেই গাড়ী লইয়া আসিল। সেখানে লইয়া যাইতে বেশ অন্ধকার হইবে। যখন কফিন আনা হইল তখন রাত ৮টা। কর্ম্মচারী বলিলেন যে এতরাত্রে কেছ্র্নকে পাওয়া যাইবে না সমাধি আজ আর হইতে পারে না। পার্শ্বের ঘরে কাফিনে শবদেহ রাখিয়া আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখা হউক। পর দিন প্রাতে কাফিন বন্ধ করিয়া শব সমাহিত করা হইবে। তাঁহার কথা মত এক ঘরে কফিন রাখিয়া আমি পার্শ্বের ঘরে শুইলাম, উভয় ঘরের মাঝখানে দরজা—এঘর ওঘর করা যায়। আমার ভাইকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

"এই আকস্মিক বিপদে আমার স্নায়ু বড় উত্তেজিত হইয়াছিল—ঘুম আসিল না। থাকিয়া থাকিয়া মেয়ের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। দুই একবার উঠিয়া কফিনের কাছে গেলাম। শেষে ক্লান্ত হইয়া প্রায় ৩টার সময় আমার তন্দ্রা আসিল। সেই তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম যেন লিলি অতি শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া বলিতেছে—"বাবা, বাবা, আমি কোথায়?" দেখিলাম গগনপ্রান্তাবলম্বী চন্দ্রের ম্লান রশ্মি খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে আর সেই ম্লান আলোকে—দেখিলাম—আমার মেয়ের শীর্ণ ছায়া মূর্ত্তি! পাণ্ডু মুখখানির আধখানা শবাচ্ছাদনে ঢাকা। কালো চাদরটী পিঠের উপর দিয়া গিয়া মেঝের উপর খানিকটা অন্ধকার বিছাইয়া দিয়াছে। তখন আমি জ্ঞান হারাইয়াছি। প্রেতমূর্ত্তি হইলেও মেয়েকে যে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি এই আনন্দেই উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া গিয়া লিলিকে বুকে ধরিলাম। দেখিলাম যে গা বেশ গরম, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ভগবান, ভগবান, অপার করুণা তোমার, দয়া করিয়া কি দুঃখীর ধনকে ফিরিয়া দিলে, দয়াময়? নতজানু হইয়া লিলিকে লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম।

এই সময় লিলি একটু কাতরধ্বনি করিতেই ধীরে ধীরে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। সে ঘুমাইয়া পড়িল। আবার বুঝি ফাঁকি দিয়া পলায় এস ভাব তাহাকে চৌকি দিতে লাগিলাম। ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশ অরুণ রঙে রাঙা হইয়া আমার প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিল।—কর্ম্মচারী সেদিকে আসিতেই আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি মনে করিলেন যে, কন্যার শোকে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি—অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছি। পরে ভিতরে আসিয়া নিদ্রিতের শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া আর গায়ের তাপ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পরে একটা ভাল গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া লিলিকে তাহাতে সন্তর্পণে উঠাইয়া দিয়া আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। লিলিকে দেখিয়া আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন—আনন্দের আতিশয্যে আবার তাঁহার ফিট হইল। ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া একটু লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তখনই আবার সপ্রতিভ হইয়া এই পুনর্জীবনপ্রাপ্তির চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত অনেক উদাহরণ ও যুক্তি দিলেন। ঔষধপ্রয়োগে লিলি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। ভগবানের এই অসীম অনুগ্রহের জন্য নতজানু হইয়া আমরা উপাসনা করিলাম। এই হইল আমার কন্যার ইতিহাস। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কিন্তু তখন

হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মেঘের দিনে এই রকম ফিট হইবার মত হয়। এই সুদীর্ঘ কাহিনী বলিয়া বোধ হয়—আপনাকে বড় বিরক্ত করিলাম।”

আমি বলিয়া উঠিলাম—“না, না, আপনি সঙ্কুচিত হবেন না, বরঞ্চ আমারই একটা সন্দেহ ছিল—সেটা কাটিয়া গেল।”

“কি রকম?”

“আমি আপনার কন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম—আপনার ভাই বোধহয় আমাকে চিনিতে পারেন নি। তিনিই আমাকে নিয়োগপত্র দেন।”

লিলি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“আমি তো আপনারই কথা কাকাকে বলিয়াছিলাম—আমিও আপনাকে চিনতে পেরেছি—কাকাও চিনতে পেরেছেন?”

আমি বলিলাম—“ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমার ছাত্রীর প্রাণ ফিরে দিয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার প্রথম পড়াতে আসবার কথা সেদিন বাড়ীতে এসে এই শোচনীয় ঘটনা শুনেই মর্ম্মাহত হয়ে আমি সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলাম।”

লিলির পিতা বলিলেন—“সে চাকরী আপনারই আছে—অবশ্য যদি আপনি অনুগ্রহ করে সেটা নেন। আমরা কিছুদিন দার্জ্জিলিংএ কাটাব। আপনি যদি সেখানে যান আমাদের সঙ্গেই চলুন—স্যানিটোরিয়মে থাকবেন—খরচপত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই—আর আপত্তি না থাকে তো আমাদেরই সঙ্গে দুটো দিন থাকতে পারেন। পরে কলিকাতা গিয়ে যেখানে থাকা সুবিধা হয়, থাকবেন।”

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। পরে উঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সন্ধ্যার ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে ধীরেনের বাসায় ফিরিতেই একমুখ হাসি হাসিয়া ধীরেন পৃষ্ঠদেশে এক প্রকার চপেটাঘাত করিয়া বলিল—“Hullo, man, I congratulate you. Here is your appointment letter—এই দেখো বালুরঘাট স্কুলের সেক্রেটারীর ছাপমারা খাম—এই নাও প'ড়ে দেখ।”

ধীরেনকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া আমি বলিলাম—“ওটার আপাততঃ দরকার নাই—আমার চাকরী মিলেছে, আমি পরশু দার্জ্জিলিঙ্ যাচ্ছি।”

প্রেস্কৃপ্‌শন ও ঔষধের নামে ভরা ধীরেনের মস্তিষ্কে প্রবেশই করিল না যে এই জঙ্গলে আমি কি করিয়া চাকরী কুড়াইয়া পাইলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

প্রতিবাদ।

—ঃ*ঃ—

(E. W. Wilcox)

" He travels the fastest who travels alone."

R. Kipling.

একলা যে জন পথ চলে গো উপর পানে নজর রাখি,
ফুল্ল-মনে দিন কাটালেও রাত্রে দাঁড়ায় সিক্ত-আঁখি;
অস্ত-তপন যায় যে নিয়ে প্রাণের সকল সাহস হরি'
রাস্তা চলার শ্রান্তি যখন একাই গো সব বহন করি।
যতই কেন স্ফূর্ত্তি করে' চালাও না পা,—দুখের পাঁকে
শেষকালেতে ডুব্‌বে সখা,—প্রেম যদি না পার্শ্বে থাকে।

*   *   *   *

একলা যে জন পথ চলে গো বন্ধুবিহীন, প্রেমিক হারা,
শূন্যে তাহার যাত্রা সুরু, শূন্যদেশেই যাত্রা সারা;
হোক্ না তাহার লক্ষ্য বিপুল, হোক্ না তাহার লক্ষ্য উঁচু,
জ্ঞানে সে জন দেউলে এবং প্রাণে সে জন নেহাৎ নীচু।
এই জীবনের অদ্বিতীয় দানটা কভু পায় নি যে সে
ভ্রমণ-পথে প্রণয় হেসে দাঁড়ায় নি যার সামনে এসে!

*   *   *   *

শক্ত কিছু নয়কো ধরায় এগিয়ে যেতে ছুট্‌কটানি,
হোঁচট্ খাওয়ার কথাও তবু দোষ কি ভাবায় একটুখানি!
জীবন-গীতিকাব্যগুলি পড়্‌তে হবে যত্নে অতি,
আনন্দ কি মিল্‌বে, মূঢ়, বাড়িয়ে দিলেই চলার গতি?
ব্যর্থ তাহার চেষ্টা এবং অবজ্ঞেয় স্পর্দ্ধাবাণী
দোলায় নি প্রেম গলায় যাহার অশ্রুমণির মাল্যখানি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সাধুভাষা।

—:*:—

সাধুভাষা বলিয়া যে কথাটী আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই তাহার অর্থটা যে ঠিক কি তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সাধারণতঃ ইহা চলিত ভাষার বিরুদ্ধবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যে ভাষা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতমূলক সম্ভবতঃ তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ভাষা এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এমন কি বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সংস্কৃতপন্থী লেখকগণের রচনাবলীতেও প্রচুর সংস্কৃতের শব্দের উদাহরণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, চলিত ভাষার প্রাদেশিকতাটুকু বাদ দিয়া তাহাকে একটু মার্জ্জিত করিয়া লইলেই আমরা প্রায় সাহিত্যের ভাষার কাছাকাছি আসিয়া উপস্থিত হই। এই ভাষাকে কেন সাধুভাষা আখ্যা দেওয়া হইবে না এবং যাহা একেবারে বাঙ্গলাই নয় তাহা ঐ মর্য্যাদা পাইবে কেন বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশুদ্ধ সুন্দর ও ভাবপ্রকাশক ভাষা অর্থে 'সাধুভাষা' শব্দ ব্যবহার করিব। সুতরাং এই ব্যাপক অর্থ অনুসারে 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' রূপ সমস্যা উঠিতেই পারে না। কারণ প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিলে চলিত ভাষার সহিত সাধুভাষার কোন বিরোধ থাকে না, ইহাই আমরা মনে করি। মোট কথা, ইংরাজিতে যাহাকে good, elegant style বলে তাহাই আমরা সাধুভাষা নামে সংজ্ঞিত করিতেছি।

এখন, এই সাধুভাষার কি কি গুণ থাকা দরকার এবং কোন্ কোন্ দোষ বর্জ্জন করিতে হইবে তাহাই আমরা আলোচনা করিব। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা। সুতরাং যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারা যায় সেইরূপ ভাষাই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিতেছেন তাহা সকলেরই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার মতে, 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলে বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য; সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয় তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিস্প্রয়োজনতাই আপত্তি।

এক কথায়, ভাষা ভাবের উপযোগিনী হওয়া চাই। ইংরাজিতে good styleএর আদর্শ হইতেছে তাহাই যাহাতে the proper word in the proper place- যথাস্থানে ঠিক শব্দটী ব্যবহৃত হয়। গুরু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় ভাষাও স্বভাবতঃই গুরু গম্ভীর হইয়া পড়ে; আবার যেখানে শুধু যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হইবে সেখানে ভাষাও অনাড়ম্বর হওয়া প্রয়োজন। শব্দচয়নে বিশেষ অবহিত না হইলে রচনা প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হয় না। সকল প্রকার শব্দই পাশাপাশি ব্যবহার করিতে পারা যায়; তাহাকে ভাষার সাধুতা নষ্ট হয় না। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গলা শব্দ ত চলিতেই পারে, প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহারেও বাধা নাই; তবে, নৈপুণ্য থাকা চাই এ কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান পথ-

প্রদর্শক। তিনি 'স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ' 'প্রাচীন গীত কোট করিয়া' প্রভৃতি শব্দ বিন্যাস করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যে সকল সংস্কৃতপন্থী বাঙ্গলায় পদে পদে গুরুচণ্ডালী দোষ আবিষ্কার করেন তাঁহাদের মত এখন আর গৃহীত হইতে পারে না।

স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা রচনার দুইটী প্রধান গুণ। ভাষা স্বাভাবিক বা স্বচ্ছন্দ গতি না হইলে আড়ষ্ট ও নীরস হইয়া পড়ে। সে ভাষার অন্যান্য গুণ আজকালও তাহা পাঠে আনন্দ পাওয়া যায় না। আর আন্তরিকতার অভাবে ভাষা প্রাণহীন শব্দ সমষ্টিতে পরিণত হয়। হৃদয় হইতে যে কথা বাহির হয় তাহা পাঠক বা শ্রোতের প্রাণের তারে গিয়া আঘাত করে, এবং অবিলম্বে অভীষ্ট সাধন করিয়া তাহা সার্থক হয়। কিন্তু ভাষাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে বলিয়া যে অলঙ্কারাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার প্রসাধনের আবশ্যকতা নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হইলে ভাষার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, এবং স্বাভাবিকতাও নষ্ট হয় না। শুধু দেখিতে হইবে যে, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে ভাষা যেন ভারাক্রান্ত না হয়;

ভাল রচনার কি কি গুণ থাকা চাই তাহা মোটামুটী বলা হইল। এইবার দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। ব্যাকরণ দোষ। ভাষা যে ব্যাকরণ সঙ্গত না হইলে বিশুদ্ধ হয় না তাহা নূতন করিয়া আর বলিতে হইবে না। তবে বাঙ্গালার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে মতভেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এ বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের আইন কানুন না মানিলে ভাষা যে অশুদ্ধ হইয়া যাইবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। কথিত ভাষা মাত্রেই শুধু ব্যাকরণ দোষ মুক্ত হইলে চলিবে না, সেই সঙ্গে idiomatic বা রীতিবিশুদ্ধ হওয়া চাই। অনেক সংস্কৃতশব্দ বাঙ্গলার এমন সব অর্থে ব্যবহৃত হয় যাহা সংস্কৃত অভিধানে নাই। এখন কেহ যদি বাঙ্গলার প্রচলিত অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া সংস্কৃত অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেরূপ বাঙ্গলা কেহ বুঝিবে না। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আড়ম্বর অর্থে 'সমারোহ,' দুঃখ প্রকাশ অর্থে 'আক্ষেপ,' রোগীর পরিচর্য্যা অর্থে 'শুশ্রূষা,' বিস্মিত অর্থে 'আশ্চর্য্য,' বাঙ্গলায় প্রচলিত কিন্তু সংস্কৃত এ সকল শব্দের এরূপ অর্থ নাই। কিন্তু যদি কেহ সংস্কৃত অর্থ অনুসারে বলেন বালকটি বৃক্ষোপরি সমারোহ করিয়া হস্তপদাদি আক্ষেপ করিতে লাগিল তাহা হইলে কোন বাঙ্গালীর সাধ্য নাই যে এরূপ বাঙ্গলা বোঝে। আবার যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় একেবারেই প্রচলিত নাই সেগুলিকে যদি জোর করিয়া ভাষায় টানিয়া আনা যায় তাহা হইলেও ফল কতকটা এইরূপই হয়। ক কগুলি সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কটমট সংস্কৃত শব্দ একত্র সংযোজিত করিলে তাহা যে কিরূপ একটা উৎকট হেঁয়ালীতে পরিণত হয় তাহার উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত পরিচিত উদ্ভট শ্লোকটির উল্লেখ করিতে পারা যায়—ঈশাক্ষের ঈশাব্দদে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার। পণ্ডিত মহাশয়গণ যখন বাঙ্গলার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করেন তখন তাঁহাদের ভাষা প্রায়ই কতকটা এইরূপ হইয়াই দাঁড়ায়। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিত 'কালিদাস' নামক পুস্তকের যে কোন পৃষ্ঠা খুলিলেই আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধ হইবে। 'বিদূষক রাজার সন্নদ্ধ হইলেন'—এখানে 'সন্নদ্ধ' এই অপ্রচলিত শব্দ না লিখিয়া নিকটবর্তী লিখিলে কি ক্ষতি হইত? সুখের বিষয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যে বাঙ্গলা লেখেন তাহা একেবারেই সংস্কৃতবহুল নহে, সকলেই সে ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

যে সকল ইংরাজি শব্দ বাঙ্গলার বিকৃত আকারে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে বিশুদ্ধ ইংরাজি আকার দিতে গেলেই রীতিবিরুদ্ধ (Unidiomatic) হইয়া দাঁড়াইবে। ডাক্তার, হাঁসপাতাল, রসীদ, টেবিল, বাক্‌স প্রভৃতি স্থলে যদি কোন ইংরাজিনবীস ডক্টর, হস্‌পিটাল, রিসিট্, টেব্‌ল, বক্স্ লেখেন, তাহা হইলে সে ভাষা আদৃত হইবে না। ইংরাজি হইতে বাঙ্গলার অনুবাদ করিবার সময়ও ভাষার এই রীতিবিশুদ্ধতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইংরাজিগন্ধী বাঙ্গলা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় দোষ প্রাদেশিকতা। নাটক উপন্যাসের কথোপকথনের ভাষার ব্যতীত অন্য কোথাও প্রাদেশিকতার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য করিতে হইলে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর স্থান নাই এবং ড় ও র প্রায়ই স্থান বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া রচনার দাঁত, চাঁদ, আড়ষ্ট না লিখিয়া দাত, চাদ, আরষ্ট লিখিলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আবার পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থলে ফোঁড়া, বাঁকা, কাঁচ, হাঁসি, আঁব, কুঁড়েমি প্রভৃতি শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ প্রাদেশিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে যাহা একস্থানের লোক বুঝিবে, অন্য স্থানের বাঙ্গালী বুঝিবে না। এই সকল শব্দ লিখিতভাষায় অবশ্য বর্জ্জনীয়।

এই কারণেই রচনায় মৌখিক ভাষার প্রচলন আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মৌখিক ভাষাকে কখনই অশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে প্রাদেশিকতা প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা বড় বেশী। যাঁহারা বলেন যে কলিকাতার মৌখিক ভাষা বঙ্গদেশের সকল স্থানের ভাষার সমন্বয়ে গঠিত, সুতরাং এ ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তাঁহারা বোধ হয় জানেন না কলিকাতার গেলুম খেলুম শুধু পূর্ব্ববঙ্গে কেন পশ্চিম বঙ্গেরও অন্যান্য স্থানবাসীদিগের কিরূপ শ্রুতিকটু। তবে এ কথাও সত্য যে মৌখিক ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তিটা প্রধানতঃ ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়াপদগুলি প্রাদেশিকতা দোষশূন্য হইলে মৌখিক ভাষায় আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

একই স্থলে মৌখিক ও অমৌখিক ভাষার সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই, অন্যে পরে কা কথা। উদাহরণ—

"শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, 'তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুর যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?'

কমলমণি। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধ্‌তেচি। আমিও যাব,—তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতাশে আমাতে দুদিকে দুজনে কাঁদ্‌তে বস্‌বো।"

(বিষবৃক্ষ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

তৃতীয়, গুরুচণ্ডালী দোষ। সংস্কৃত শব্দের সহিত সাধারণ বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার আমাদের মতে দূষনীয় নহে এবং এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের একত্র সমাবেশকে যাঁহারা গুরুচণ্ডালী দোষ বলিবেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া শব্দ প্রয়োগে যথেচ্ছাচারিতা কেহ মার্জ্জনা করিবে না, আর সন্ধি সমাসে এক শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার না করিয়া সংস্কৃতের সহিত চলিত বাঙ্গলা সংযোগ করিলে তাহা সাধারণতঃ 'শবপোড়া' বা 'মড়াদাহের' ন্যায় অদ্ভুত হইবে। 'উপর্য্যুপরি' চলে, কিন্তু উপর্য্যুক্ত অচল। এইরূপ অনেক

উদাহরণ দিতে পারা যায়। কিন্তু এখানেও একেবারে বাঁধাবাঁধি নিয়ম খাটিবে না। দেশত্যাগী, দেশছাড়া দুইই শুদ্ধ। এইরূপ, মাতৃহীন, মাতৃহারা ; গ্রন্থকীট, কেতাবকীট প্রভৃতি।

কৃত্রিমতা ও বাহুল্য-দোষ। ভাষাকে সহজ ও স্বাভাবিক না করিতে পারিলে তাহা প্রাণহীন শব্দ সমষ্টিতে পরিণত হয় একথা আগেই বলিয়াছি। এইরূপ ভাষার চেষ্টার লক্ষণ সকলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে কৃত্রিম বলা হয়। একখানি সুপরিচিত উপন্যাস হইতে এইরূপ ভাষায় উদাহরণ দিতেছি।—

'এমনি করিয়া দুঃখের যে ভারী মেঘখানা অম্লান পুষ্পকোরকের মত ক্ষুদ্র বক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়া আবার আনন্দের স্নিগ্ধ আলোটুকু যখন তরুণ হৃদয়ের একটি প্রান্ত দিয়া সবেমাত্র মুক্ত দ্বারপথে উষালোকের স্নিগ্ধ মধুর হাস্যচ্ছটার মত তাহার হৃদয়প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে একটা আসন্ন ঝটিকায় সজোরে সেই দ্বারখানা সব আলোটুকু চাপিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল'।

(পোষ্যপুত্র)

এরূপ ভাষার 'চাপে' পাঠকেরও নিশ্বাস 'রুদ্ধ' হইয়া আসে অর্থ বোঝা ত দূরের কথা। ভাষা যত আড়ম্বরশূন্য ও বাহুল্য-দোষবর্জ্জিত হয় ততই তাহা ফলোপধায়ক হয়। ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা ভাষার গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ফেলেন তাঁহারা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে আবশ্যকমত ভাষাকে কেহ গুরু-গম্ভীর করিতে চেষ্টা করিবেন না। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে শব্দ-মন্ত্রে সিদ্ধহস্ত লেখক ব্যতীত কেহ ভাষা হইতে হৃদয়োন্মাথী গম্ভীর নির্ঘোষ বাহির করিতে পারেন না। একটা উদাহরণ দিতেছি—

জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধন-সম্পদকেই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে তখনি হে রুদ্র সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি--এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারে অবিশ্বাস করিয়া জড়তা দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসার হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থি-মজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দ্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—আবিরাবর্ম্মে এধি।

(রবীন্দ্রনাথ ; ধর্ম্ম ১৩১ পৃষ্ঠা।)

এখানে শব্দের স্রোত কেমন তরতর বেগে বহিয়া গিয়াছে, কোথাও একটু বাধে নাই, কোথাও একটু ঘুরপাক খায় নাই ; পাঠকও সেই স্রোতে আপনি ভাসিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে ইহার মেঘমন্দ্র-ধ্বনি তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়মন আলোড়িত আকুলিত করিয়া তোলে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

গায়ে হলুদের গান।

(মুণ্ডাদের গান হইতে)

পতির সুখে পত্নী সুখী, পতির দুখেই দুখী,
পত্নী যদি স্বামীর সাথে থাকে মুখো মুখি।

স্বামী যাবে মাঠে, তার
পত্নী রবে সাথে—
পথ হারালে বাটে, তারে
আন্‌বে তুলে মাথে;—

বসিয়ে দেবে তীর ধনুকে, আন্‌বে মরা 'বোরা'
বেঁটে বেঁটে সারা পাড়ায় রাখ্‌বে নিজের থোরা।

মেঘের উপর কর্‌বে যখন দৈত্য শিশু খেলা
শাল মহুলের তিমির যখন হবে নিবিড় মেলা

কড়্‌কড়িয়ে হাস্‌বে, যখন
ফুটবে তড়িৎ লেখা
মড়্‌মড়িয়ে আস্‌বে, আর
বনটি যাবে দেখা—

ত্রস্ত ব্যাকুল ছাওয়ালগুলি বক্ষে এঁটে ধরে
বঁধুর কাছে বস্‌বে বধূ পূর্ব্ব পুরুষের ঘরে।

মন্দ লোকে বল্‌বে কত শুনো না ও-কথা
'বোঙ্গা' আছেন শালের তলে, রাগ্‌লে নেবে মাথা।

গভীর নিঝুম রাতে, মোদের
বাপ মা'রা সব এসে
খোঁজ নে' ফেরেন্ যা'তে, থাকে
সবাই ভাল বেসে।

পত্নী ক'বে "মাথার মণি" শতেক চুমো খেয়ে
কইবে পতি "বুকের রাণী" হাজার চুমোয় ছেয়ে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিবাহপ্রথা।

অতি পূর্ব্বকালে মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোনও জনপদ ছিল না।

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে। ঋক্।

বিস্তীর্ণ দ্যৌ (মঙ্গলিয়া) ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ জ্যেষ্ঠ বা প্রাচীনতম। তখন এই দুই মহা-জনপদে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। তজ্জন্য সন্তানেরা কন্যাদিগের নামে পরিচিত হইতেন। উক্তঞ্চ মহর্ষি বায়ুনা—

দিবৌকসাং সর্গ এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ।

এই যে দেবগণের সৃষ্টিকথা বলা যাইতেছে—ইঁহারা স্ব স্ব মাতৃনামে পরিচিত। যেমন—

দিতির পুত্র—দৈত্য, দনুর (শ্রীমনু) পুত্র—দানব, মনুর পুত্র—মানব, অদিতির পুত্র—আদিত্য, বিনতার পুত্র—বৈনতেয় প্রভৃতি।

ইঁহাদিগের পিতা কশ্যপ, কিন্তু তাঁহার নাম পরিচয়স্থলে গৃহীত হইত না। ফলতঃ যেমন গাভীর বাছুর সকল মাতৃনামে (ধলী, কালী, বুধী, রাঙ্গী) পরিচিত হয়, তদ্রূপ দেবতারাও মাতৃনামা ছিলেন। কালে পিতার নামেও পুত্রগণ পরিচিত হইতে থাকেন। যেমন—

গর্গস্য অপত্যং পুমান্ গার্গ্যঃ; কশ্যপস্য অপত্যং পুমান্ কাশ্যপেয়ঃ।

গর্গের পুত্র—গার্গ্য ও কশ্যপের পুত্র—কাশ্যপেয়।

আচ্ছা তবে কেন স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্রেরা মাতৃনামে পরিচিত হইলেন না? যথা—

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভৃগু ও নারদ।

হাঁ ইঁহারা না পিতার নামে পরিচিত ও না ইঁহারা মাতার নামে পরিচিত। ইঁহারা মনুর মানস-পুত্র। খুব সম্ভব স্বয়ম্ভুব মনু মানস বা ইচ্ছা করিয়া কোনও বা কতিপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করেন। এবং বোধ হয় মনু স্বাধীনভাবে ইঁহাদের নাম রাখেন। তৎপর সন্তানেরা মাতার নামে পরিচিত হইতে থাকেন। তখনও বিবাহ ছিল। কিন্তু সে সময়ের কাহারও নাম আমরা অবগত নহি।

স্বয়ম্ভুব মনু, দক্ষ, ধর্ম্ম ও শিবের (নকুল) কে বাপ ও কে মাতা, তাহা কেহ অবগত নহেন। কিন্তু কশ্যপাদির সময়ে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও লোক সকল পূর্ব্বপ্রথানুসারে মাতার নামে পরিচিত হইতেন।

যাহা হউক অতি পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎপর যখন উহার প্রবর্ত্তন হয়, তখনও উহাতে কোনও অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইত না, পুরোহিতও লাগিত না। পুরুষেরা যে যাঁহাকে পছন্দ করিয়া পাণি বা হস্ত ধারণ করিতেন—তিনিই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতেন। তাই বিবাহের নাম—"পাণিগ্রহণ" বা "পাণিপীড়ন"।

এখনও আসামের কোনও কোনও স্থানে উক্ত প্রাচীনতম প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। কন্যার পিতা প্রকাশ্য সভাতে কন্যাকে আনয়ন করিলে পর, বর যাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কন্যার পাণি বা হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে লইয়া যান, অমনি শঙ্খ বাজিয়া উঠে। কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। আমরা প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও ইহার সমর্থক একটী মন্ত্র দেখিতে পাই—

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ৩৮। ৮৫। ১০ম

আমার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার সহিত জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত একত্রে থাকিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীতা হও।

এই সময়ে জগতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। ফলতঃ কলিকালের প্রভাত কালেও যে ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহা দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরাপ্রভৃতির বিবাহেও সপ্রমাণ করে।

যে পরমারাধ্যা সাবিত্রীর নাম লইয়া সকলে কন্যাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন—

"সাবিত্রীসদৃশী ভব"

তিনিও পূর্ণযৌবনে সত্যবান্‌কে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন, উহাতে ঘটক তিনি স্বয়ং, পুরোহিত ও কন্যাকর্ত্তাও তিনি নিজে ছিলেন। এই সময়ে বিবাহের মন্ত্র ইহাই ছিল—

"যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।" পারস্কর।

যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি,

যা তব তনূ রিয়ং সা ময়ি। কৃষ্ণ যজুঃ।

আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার, তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার। আমার এই যে দেহ তাহা তোমাতে, তোমার ঐ যে দেহ তাহা আমাতে। সুতরাং ইহা বালক-বালিকার বিবাহ ছিল না।

অথর্ব্ব বেদও বলিতেছেন যে—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং।"

কন্যাও পুত্রদিগের ন্যায় গুরুগৃহে যাইয়া বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বিদুষী হইয়া তবে যুবা পতিকে বরণ করিবেন। একালের মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও বলিতেছেন যে—

"কন্যা প্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

দেয়া বরায় বিদুষে, ধনরত্নসমন্বিতা॥"

পিতা ও মাতা পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত করিয়া পরে ধনরত্ন সহ বিদ্বান্ বরে সমর্পণ করিবেন।

মহানির্ব্বাণ এরূপ কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে—পিতা ও মাতা প্রভৃতি কখনও অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা ও অজ্ঞাত-পতিসেবা কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। কেন দিবেন? ইহাতে ক্ষতি প্রভূত!

কে এক সময়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই উভয় দেবতার আরাধনা করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ যুবকগণের অকালে কেশপক্কতা এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ অল্পবয়সে বিবাহের ভার পিতা মাতার হস্তে পতিত হয় বলিয়া অনেক সময়েই এরূপ ঘটিয়া থাকে যে পাত্র ও পাত্রী কেহ কাহাকে পছন্দ না করিয়া উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। বাল্যবিবাহের এই বিষময় ফল দ্বারা কত প্রকৃত দেবতা অসুরে পরিণত হইয়া যাইতেছেন ও গিয়াছেন এবং শত শত সাধ্বী রমণী আজীবন ম্রিয়মাণা হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে জীবন কাটাইতেছেন।

ফলতঃ পূর্ব্বকালে কোনও ব্যক্তিই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পাঠসমাপ্তির পূর্ব্বে কাহারও পাণিগ্রহ করিতেন না। ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে—

বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবিশেৎ॥ ২। ৩৩

লোক সকল তিন বেদ দুই বেদ, কিংবা এক বেদ সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য সমাপ্তির পর দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। তথাহি—

ষট্ ত্রিংশতাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেববা॥ ১। ৩অ

ব্রাহ্মণবালক গর্ভাষ্টমাব্দে উপনীত হইয়া ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে সাম, ঋক্ ও যজুঃ, এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিবেন। যদি বুদ্ধি প্রখর হয়, তাহা হইলে ৮, ৯ বা যত বৎসরে পাঠ সমাপ্ত হয় (যেমন ৫। ৬। ৭) তত বৎসর কাল অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু কেহই ২০। ২৫ বৎসরের ন্যূনে তিন বেদ সমাপ্ত করিতে পারিতেন না। ব্যক্তিমাত্রই শঙ্করাচার্য্য ছিলেন না। তিনিও ৩২ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। সুতরাং অনেককেই ৪৪ হইতে ৪৫। ৪৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠদশাতেই থাকিতে হইত ও তৎপর তাঁহারা বিবাহ করিতেন। ভগবান্ সুশ্রুতও বলিতেছেন যে—

ঊনষোড়শ বর্ষায়াং অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেৎ বা বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাৎ অত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

মনুও বলিতেছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ, হৃদ্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার এবং চব্বিশ বৎসরের পুরুষ, অষ্টবর্ষার পাণি গ্রহণ করিবে।

সুতরাং মনুর সময়েও ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে?

না—একথা ঠিক নহে। মনুর এই শ্লোকটী বোধহয় স্ত্রী ও পুরুষের বয়সে কত তফাৎ থাকিবে তাহা বলিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। যদি সে অর্থ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—

"এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত"

কেননা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে মনুর ৯০।৯ অঃ শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। মনুর সময় ত অতি দূরের কথা—কলির প্রথমেও কি, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতির বিবাহও কি ভরা যৌবনে হইয়া ছিল না? অদ্ভুত-রামায়ণে আছে যে—

"বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত স্তনী"

সীতার যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার স্তন, বস্ত্রের ভিতর দিয়া ব্যঞ্জিত হইতেছিল। কুমারপাঠে জানা যায় যে ভগবতী উমা শিবের জন্য বনে যাইয়া তপস্যা করেন ও তাঁহাকে দেখিয়া শিবের ধ্যানভঙ্গ হয়, সুতরাং এই গৌরী ও জানকী কেহই অষ্টবর্ষা ছিলেন না।

আমরা আমাদিগের শাস্ত্রে আটটী বিবাহের সত্তা দেখিতে পাই। যথা—

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম বিবাহ কাহাকে কহে? ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

কন্যার পিতা বেদবিৎ ও চরিত্রবান্ বরকে আহ্বানপূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কারসমলঙ্কৃত ও অর্চ্চনা করিয়া কন্যা দান করিবেন। এই বিবাহের নামই "ব্রাহ্ম বিবাহ"।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যক্ ঋত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ ২৮

ঋত্বিক্ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকেই যে অলঙ্কৃত কন্যা দান, উহারই নাম "দৈব" বিবাহ।

একং গোমিথুনং দ্বে বা, বরাৎ আদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবৎ আর্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ২৯

বরের নিকট হইতে ধর্ম্মানুসারে এক যোড়া বা দুই যোড়া গো গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি কন্যাদানকে "আর্ষ" বিবাহ কহে।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ইতি বাচানু ভাষ্যচ।
কন্যাপ্রদান মভ্যর্চ্য, প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩০

তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, বর কন্যাকে এই উপদেশ দিয়া অর্চনাপূর্ব্বক যে কন্যাদান, ইহার নাম "প্রাজাপত্য" বিবাহ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাৎ আসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩১

কন্যার পিতা, মাতা বা ভ্রাতাদিগকে এবং কন্যাকেও যথাশক্তি ধনদানপূর্ব্বক যে কন্যাদান, উহার নাম "আসুর" বিবাহ।

ইচ্ছয়োঽন্যোন্য সংযোগঃ, কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ, মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩২

বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছানুসারে উভয়ের যে মিলন, উহার নাম গান্ধর্ববিবাহ। ইহা মৈথুন্য ও কাম সম্ভব।

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩৩

কোনও কুমারী-কন্যাকে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া যে বিবাহ, ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ। ইহাতে প্রয়োজন হইলে যে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাকে বধ করিয়া বা সেই বাধাপ্রদানকারীর হস্তাদি ছেদন কিংবা তাহার দেহের কোনও স্থল ভেদ করিয়া রোদন পরায়ণা কন্যার হরণ করিতে হইত।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা, রহো যত্রোপ গচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচ শ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩৪। ৩অ।

কোনও কন্যা নিদ্রায় অভিভূত আছে বা মদ্যপান করিয়া মত্ত বা প্রমত্ত হইয়াছে—এই অবস্থায় কন্যার অজ্ঞাতে গোপনে যে মিলন তাহা পৈশাচ বিবাহ উহা অষ্ট বিবাহের মধ্যে অধম.

বেশ জানা গেল যে—ইহার একটীও বাল্য বিবাহ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মন্ত্রে "কন্যাদান" শব্দ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা একালের ব্রাহ্ম সমাজের যৌবন বিবাহে কন্যাকর্ত্তার অনুমোদনের ন্যায় অনুমোদন মাত্র। কেন না—

"স্বাধীন মনুষ্যের দান ও বিক্রয় হইতে পারে না"

একালের হিন্দুদিগের যে বিবাহ হয়, উহা এই "ব্রাহ্ম" বিবাহ বলিয়া কথিত। কিন্তু সে কেবল কথার কথা মাত্র। যেখানে বরপণ বা কন্যাপণ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে "ব্রাহ্ম" বিবাহ হইতে পারে? বরপণ গ্রহণ ত দস্যুতাবিশেষ?

দেবতারা যে প্রকারে বিবাহ করিতেন, উহার নাম "দৈব বিবাহ।" উহা সহজ ব্যাপার।

আর্ষ বিবাহ ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাতে যে বর হইতে গো গ্রহণ করা হইত, উহা কন্যার শুল্ক বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ফলতঃ ইহাও আসুর বিবাহের একদেশ মাত্র।

অসুর বা পার্শীগণ কন্যার পিতৃপ্রভৃতিকে ধন দান করিতেন। পূর্বে বহুপণ লইয়া কন্যা ক্রয় করার প্রথা এদেশে ছিল। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে এ জন্য সর্বস্বান্ত হইতে হইত। এখনও নবশাখ প্রভৃতির মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান। কন্যাকে ধনদান, মুসলমানদিগের কাবিনের প্রকারান্তর মাত্র।

প্রজাপতিরা যে বিবাহ প্রথায় অনুবর্ত্তী হইতেন—উহা প্রাজাপত্য বিবাহ। ইহাও বাল্যবিবাহ নহে, বালক বালিকারা ধর্ম্মানুষ্ঠান কি করিবে? এই বিবাহও কন্যাদিগের অনুমোদনবিশেষ।

গান্ধর্ব্ববিবাহ গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহা যুবক যুবতীর সম্মেলনবিশেষ। ক্ষত্রিয়গণ ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই প্রকৃত বিবাহ। শকুন্তলা ও সুভদ্রা প্রভৃতির বিবাহ ইহার উদাহরণ স্থল। অবশ্য মনু ইহাকে "মৈথুনা" ও "কামসম্ভব" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু—

"দারকর্ম্মণি মৈথুনে"

ইহার দ্বারা মৈথুনের সত্তা কি ব্রাহ্মাদি বিবাহেও প্রসারিত হয় নাই? "প্রজার্থং গৃহমেধিনাং", বিবাহ সন্তানলাভের জন্যই। রাক্ষসেরা অপরকন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহ করিতেন। সেই জন্যই রামরাবণের যুদ্ধ। সীতাহরণ বর্ত্তমান রামায়ণ অকারণ প্রবেশিত। ঋষিরা দেখিলেন যে আর্য্যদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপে কন্যা সংগ্রহ করিতেছেন কাজেই ইহাও শেষ বৈধ বলিয়া মঞ্জুর করিয়া লইবেন। অনেক আর্য্যসন্তান পিশাচ (নেপালবাসী) দিগের ন্যায় নিদ্রিত কুমারী নারীদিগের সতীত্ব নাশ করিত। কিন্তু উহাকে অন্য আর কেহ বিবাহ করিবে না, এ জন্য তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়া উহাও বৈধ বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

ইহার পরই সমাজে কলিযুগের প্রারম্ভে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্বে যৌবনবিবাহে কচিৎ বা গোলযোগ হইত, কানীন পুত্র জন্মিত, একারণ একালের ঋষিরা সমাজে উহার প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহার মতন অধর্ম্ম ও কুপ্রথা আর জগতে নাই। বাল্যবিবাহ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধও হইতে পারে না।

অস্মিন্ দ্রব্যে মৎস্বত্বপরিত্যাগ
পূর্ব্বকং অস্য স্বত্বং জায়তাং
ইতি জ্ঞানপূর্ব্বকং সমর্পনং দানং।

কিন্তু কন্যার উপর পিতার পিতৃত্ব স্বত্ব ভিন্ন অন্য স্বত্ব নাই। "আমার এই কন্যা আজ হইতে তোমাকে বাবা বলিয়া ডাকিবে" পিতা কি ইহা বলিয়া সম্প্রদান করেন? সুতরাং স্বাধীন মনুষ্যের দান ও বিক্রয় অসিদ্ধ।

বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের এই অবৈধত্ব নিরসন জন্যই হিন্দুসমাজে পুনর্বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন। কেন না ঋতুমতী কন্যা ও তদ্‌বয়োজ্যেষ্ঠ বরের দান ও গ্রহণে অধিকার জন্মিয়া থাকে। কন্যা আপনাকে দান করিতে পারে, পিতা নহে। মুসলমানদিগের মধ্যেও বাল্যবিবাহ আছে কিন্তু—তাহারাও প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া উকিলের সে "এজীন" নামঞ্জুর করিতে পারে।

এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে গান্ধর্ববিবাহ ও বৈদিক ব্রাহ্মবিবাহের সমবায় সমুত্থ প্রথাবিশেষের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা আশা করি, অভিভাবকগণ চরিত্রবতী পুরন্ধ্রু ও প্রবীণ পুরুষগণকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া যুবকযুবতীকে দেখা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ করিতে দিবেন।

আর আমাদিগের সবিনয় প্রার্থনা এই যে কুলীনদিগের ন্যায় ব্রাহ্মভ্রাতৃগণও যে কন্যাদিগের যৌবনান্ত বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতেছেন, ইহার যেন গতিরোধ হয়। আর যেন ইহাও আমাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ না করে যে ব্রাহ্মগণও অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ত্রিধারা।

—.*:—

মন্দাকিনীর ত্রিদিব ধারাটী
নেমেছে জননী তোমার বুকে,
আপন রুধিরে বাঁচায়ে রেখেছ
সন্তানে তব, কত না সুখে।
তোমার স্তন্যে স্নাতক, জননী,
হেরিনু প্রথম বিশ্বভূমি,
—অস্থিমজ্জা, চেতনা আমার,
আমার ধরম সাধনা তুমি।

বেদনামরুর ঊষর বক্ষ
জ্বলিছে যেথায় দিবস-যামী
ভগিনী, তোমার স্নেহ ভাগিরথী,
জুড়াতে এ ভবে এসেছে নামি'।
কল্যাণী তুমি চিনেছ যাহারে
যেমন মায়ের পেটের ভাই,
এমন দরদী কে আছে তাহার,
ভুবনে তোমার তুলনা নাই।

মর্ম্মপাতাল ফুঁড়িয়া উঠেছে
ভোগবতী, তব বিমল ধারা
হে প্রেয়সী মোর শান্তিরূপিণী,
বিলায়ে দিয়েছ আপন হারা।
এ দেহ পাষাণ-প্রাচীর টুটিয়া
এ কোন্ জগত দেখালে মরি!
চির-সুশীতল, মন-অভিরাম—
আজিকে পরাণ উঠেছে ভরি।

হেথা ত্রিবেণীর অমিয়-পুলিনে
দাঁড়ায়ে রয়েছি যুক্ত-পাণি,
সঁপিতে অর্ঘ্য জ্ঞান-সবিতায়,
লভিতে দেবের আশীষ-বাণী।

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত।

দিদি। *

(আলোচনা)

আজকালকার রাশীকৃত বাজে উপন্যাসের উপর আমাদের কাছে যখন 'দিদি' আসিল তখন বুঝিলাম, বঙ্গ-সাহিত্যের ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু। ভারতবর্ষের নারীহৃদয়ের স্বচ্ছ স্রোতটিকে লেখিকা এমনি একটি সহজ অথচ সরল গতিতে ভঙ্গিমা দান করিয়াছেন যে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বইখানি খাঁটি বাংলা দেশের মর্ম্মের কথা। সেই জন্যই 'দিদি' গ্রন্থটি যদি ইংরাজিতে তর্জ্জমা করা যায়, তবে বাংলা 'দিদি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'sister'এর মতই, ইহার মর্ম্মকথাটি একটা কিম্ভূতকিমাকার বিলাতি বেশে সাজিয়া হাজির হয়। এই 'দিদি'কে বাংলা দেশের গঙ্গার স্নানে, কাশীর বিশ্বেশ্বরের আরতি সভায়, সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব হয় না কিন্তু একেই যদি বিলাতি গাউনে সাজাই ত ইহাকে একেবারে Puckএর মতই সাংঘাতিকরূপে Translated করা হয়। তাই ভাবিতেছিলাম আমাদের দেশের রমণীর এই আশ্চর্য্য হৃদয়, লেখিকার কাছে কি সত্যরূপেই ধরা পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ ছাড়া 'দিদি'কে অন্য কেহই আদর করিতে পারিবে না; কারণ এই 'দিদি'র রমণীহৃদয়ের যে শক্তিপুঞ্জ তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই নদীর স্রোতে প্রবাহিত, ভারতবর্ষেরই গৃহে গৃহে জ্যোৎস্নালোকে তাহা সঞ্চিত। এই 'দিদি'র পট্টবাস ভারতবর্ষেরই পুণ্য-সমীরণে চঞ্চল এবং তাঁহার কল্যাণময়ী দৃঢ়তা ভারতবর্ষের বর্ণে বর্ণে বিঘোষিত।

গল্পের প্লটটা খুব বড় নহে। অমর নামক এক মাতৃহীন ধনীসন্তান দেবেন্দ্র নামক এক দরিদ্র যুবকের সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। দেবেন্দ্রের মা বর্ত্তমান ছিলেন। তাহারা কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িত। ধনী বলিতে যে অভিমান বুঝায় অমরনাথের তাহা মোটেই ছিল না। বিলাস-বিবর্জ্জিত, সরল প্রাণ সুবন্ধু অমর দরিদ্র দেবেন্দ্রের একান্ত আত্মীয় ছিল। অমরনাথ একবার দেবেন্দ্রের বাড়ী বেড়াইতে গেল—ইহা দেবেন্দ্রেরই অনুরোধে। হঠাৎ

---

* শ্রীমতী নিরুপমা দেবী রচিত উপন্যাস "দিদি"।

এক দিন নবাগত অমরনাথ দেবেন্দ্রের সহিত তাহাদের এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর গৃহে একটি মুমূর্ষু বালিকাকে চিকিৎসা করিতে গিয়া দুই বন্ধুর হৃদয় বিগলিত হয় কারণ বালিকাটি ঐ বৃদ্ধা বিধবার একমাত্র কন্যা। নাম চারু। চারুকে ভাল না দেখিয়া এবং ভাল না বাসিয়া অমরনাথ আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না। পরিশেষে চারু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পর অমরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। দেবেন্দ্রের বাড়ীতে অমরনাথের এই প্রথম যাত্রা।

দ্বিতীয় যাত্রা, শারদীয় পূজার ছুটীতে। তখন অমর ও দেবেন্দ্রের ডাক্তারী পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেছে। দুইজনেই এক রকম নিশ্চিন্ত। অমরনাথ স্বগৃহের শারদীয় পূজার বিরাট আয়োজন উপেক্ষা করিয়া বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তাহার গৃহে পূজা দেখিতে আসিয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় উভয়ের বন্ধুত্ব কত গভীর। এই বন্ধুত্ব ছাড়াও সুন্দরী বালিকা চারুর কথা অমরনাথ একেবারে ভুলিতে পারে নাই। সেই চারু যখন বিজয়ার প্রণাম করিতে অমরনাথ ও দেবেন্দ্রের নিকট আসিল তখন অমরনাথ গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত! চারুর মাতা বৃদ্ধা, চারুর মুখ দিয়া দেবেন্দ্রকে বিজয়ার দিনে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া দেবেন্দ্র, অমরকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধার জীর্ণ গৃহে উপস্থিত হইয়া বিজয়ার আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিল।

বৃদ্ধার জীর্ণ গৃহ ত্যাগের পর, অমরের সহিত দেবেন্দ্রনাথের চারু-বিষয়ক যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে চারুকে সৎ পাত্রে দিবার জন্য বৃদ্ধা একান্ত ব্যস্ত। যদিও চারুর বয়স এগারো তথাপি "হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর কত দিন রাখা চলে?" অমরনাথকে দেবেন্দ্র এই অনুরোধ জানাইল যে, সে যেন চারুর জন্য একটি সৎ পাত্র খুঁজিয়া রাখে। আজকাল টাকা ছাড়া যখন তথাকথিত সৎ পাত্রের খোঁজ মিলে না, তখন ইহার জন্য চেষ্টার আবশ্যক। অমরনাথ সমাজের এই নৃশংস ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সোৎসাহে বলিয়া ছিল, "বল কি দেবেন্? তোমার এই বুঝা এত দিনের শিক্ষার ফল! জগতের সর্ব্বত্রই কি ঐ এক নীতি।" অমরনাথকে এত উৎসাহী দেখিয়া দেবেন্দ্র কহিল, "বিশেষ বড় লোকদের ঘরে! গরীব ভদ্রলোকও বা এক জায়গায় মনুষ্যত্ব দেখিয়ে থাকে কিন্তু বড় লোকদের ঘরে ঐ নীতি আবহমান কাল চলে আসচে!"

অমরনাথ হয় ত বড় লোকদের অর্থে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া কি মনে করিল, তাহা পাঠকই কল্পনা করিতে পারেন। যদিও লেখিকা স্পষ্ট করিয়া জানান নাই যে, অমরনাথের চলন্ত গাড়ীর চাকার শব্দে দেবেন্দ্র অমরের কি একটা কথা শুনিতে পায় নাই, তথাপি পাঠকগণের কল্পনা করিতে দোষ নাই যে, অমরনাথ নিজেই সেজন্য প্রস্তুত ছিল।

বাড়ী গিয়া অমরনাথ সুরমার কথা ভুলিতে পারে নাই, অথচ কালীগঞ্জের জমীদার শ্রীরাধাকিশোর ঘোষের একমাত্র দুহিতা সুলক্ষণা, সুবুদ্ধিমতী শ্রীমতী সুরমার সহিত শুভলগ্নে অমরনাথের বিবাহ হইয়া গেল। সুরমার সহিত অমর ফুলশয্যায় খাটের একপার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইল। অমর কোনো দিনও মুখ খুলিয়া সুরমার সহিত বাক্যালাপ করিল না।

এখন বিবাহিত অমর বন্ধুবর দেবেন্দ্রের অনুরোধে তৃতীয় বার তাহাদের গ্রামে গেল। অমর যে সদ্য বিবাহিত একথা দেবেন্দ্র বা তাহার বাটীর অপর কেহই জানিত না। পুনর্ব্বার সেই বৃদ্ধা বিধবার জীর্ণ কুটীরে গিয়া দেখিল যে, বৃদ্ধা আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় শয্যাশায়ী। "ম্লান, আরক্ত-মুখ-চারু"র ক্ষুদ্র হাতখানি লইয়া বৃদ্ধা, অমরের হস্তে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিলেন "তোমাকে দিয়ে গেলাম, আমার চারুলতা তোমার হ'ল! ভগবান

তোমাদের সুখী করুন।" বৃদ্ধা এই শেষ বাক্য বলিয়া চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। "বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত" অমরনাথ যে বিবাহিত, তাহা বৃদ্ধার আর ইহকালে কর্ণগোচর হইল না।

খেলার পুতুলের মত নব্য চিকিৎসক শ্রীমান অমরনাথ ভাবী বধূ চারুকে লইয়া কলিকাতাতে উপস্থিত হইল। ইচ্ছা, ভাল পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিবে কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই যে চারু, অমরনাথের চরণে নিজেকে নিবেদন করিয়াছিল তাহা অমরনাথ প্রথমটা না জানিবার ভাণ করিলেও শেষে উভয়ই উভয়কে ধরা দিল! বিবাহিত সুশিক্ষিত, সুসভ্য, নব্যযুবক মাতৃহীন অমরনাথ পিতার অসাক্ষাতে ও বিনানুমতিতে চারুকে বিবাহ করিল। বিবাহের পূর্ব্বে অমর চারুকে তাহার প্রথম বিবাহের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিয়াছিল কিন্তু চারু তথাপি অমরকে পতিরূপে বরণ করিয়া লইল।

অমরনাথ, তাহার পিতা হরনাথ বাবুকে ও প্রথম পত্নী সুরমাকে এই সংবাদ দিয়া উভয়েরই অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিল। হরনাথ বাবু তথাপি পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিলেন না, তাহার জন্য মাসিক একশত টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন কিন্তু পিতাপুত্রে মুখ দেখাদেখি রহিল না। -- স্বামীস্ত্রীতেও নয়। অমরের প্রথমা পত্নী সুরমা অধিকাংশ সময়ই শ্বশুরালয়ে থাকিত, সে প্রদীপ্ত তেজের সহিত তাহার স্বামীর এই অদ্ভুত কাণ্ডকে কদাপি ক্ষমা করিল না। সুরমার অল্প বয়স হইলেও তাহার চরিত্রে সতীত্বের এমন একটি তেজ প্রজ্জলিত ছিল যার কাছে সে নিজেকে ত দগ্ধ করিতে পারিতই এবং আর কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারিত না। হীরকের ন্যায় তাহার অন্তরের এই ঠিকরিত জ্যোতিতে, সুরমা তাহার শ্বশুরালয়ের সমস্ত ব্যবস্থা এমনি সহজ করিয়া উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সুরমা ব্যতীত হরনাথ বাবুর সংসার চলিত না।

সুরমা মনে মনে কদাপি অমরকে ক্ষমা করে নাই এবং সে নিজেকেও তজ্জন্য ক্ষমা করা দূরে থাকুক্—প্রতিদিন দুঃখের সুতীব্র অনলে দহন করিয়া মারিতেছিল।

অমরনাথ কলিকাতায় বসিয়া হঠাৎ একদিন এই মর্ম্মে একখানি তার পাইল যে, হরনাথ বাবু মৃত্যুশয্যায়; অমরনাথ ও চারুকে একবার দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অমরনাথকে বাধ্য হইয়া চারু সহ স্বগৃহে আসিতে হইল। মরিবার সময় হরনাথ বাবু, পুত্র অমরকে ক্ষমা করিয়া গেলেন এবং সুরমাকে বলিলেন :—"মা, তুমি হয় তো অমরকে ক্ষমা ক'রো নি; কখনো কর্‌তে পারবে কিনা জানি না, সে অনুরোধ তাই আমি সহসা কর্‌তে পারলাম না। কেননা আমার চেয়ে তোমার কাছে তার অপরাধ ঢের বেশী! মা, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, যে ক'দিন আমি থাকি, আমার সম্মুখে তুমি যেন তাকে ক্ষমা করেছ, এমনি ভাবে চল'।"

হরনাথের মৃত্যুর পর অমরনাথকে পিতার সংসারের কর্ত্তা হইতে বাধ্য হইতে হইল। হতভাগিনী সুরমা কিছুতেই নিজের শ্বশুরালয় বলিয়া এই গৃহকে আর দেখিতে পারিল না; কারণ চারুই যে অমরনাথের পত্নী। চারুকে সুরমা কখন সপত্নী বলিয়া ভাবিত না। নিজের ছোট বোনটির মতই দেখিত। চারুও সুরমাকে "দিদি" বলিয়া ডাকিত। এই "দিদি" নামে লেখিকা উপন্যাসের নাম-করণ করিয়াছেন।

অমরনাথ সুরমার নিকট কখনো স্বামীরূপে ধরা দেয় নাই কারণ সুরমা যে প্রকাশ্যে অমরনাথের কাছে, অমরনাথকে ক্ষমা করিতে পারে নাই!

অমরনাথ অনেকবার সুরমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল কিন্তু সুরমা প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, অমরের সে আকাঙ্ক্ষাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অমরের মনেও এই অভিমান ছিল যে, যে আমায় ক্ষমা করিতে

পারিল না তাহার কাছ হইতে ভিক্ষুকের মত প্রেমাকাঙ্ক্ষী এ জীবন থাকিতে হইব না। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে শিশুপুত্রসহ বেচারী চারুর জীবনটি বড় করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুরমার হৃদয়ের জ্বলন্ত অঙ্গার অমরনাথের কঠিন লোহার মনকে একটুও নরম করিতে পারে নাই। সুরমা এই অভিমান করিয়াছিল যে, আমি যদি রমণী হই ত অমরকে পরাজিত করিবই এবং অমর ভাবিয়াছিল, আমি পুরুষ হই ত সুরমা পরাজিতা হইবেই। অপরাজিতা সুরমা ও পরাজিত অমরনাথের দ্বন্দ্বের টানে উপন্যাসখানির মধ্যভাগ সুন্দর হওয়া, লেখিকার রচনার অশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা কথা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, সুরমা বাহিরে এত সুদৃঢ় হইলেও তাহার ভিতরের শক্তিপুঞ্জ ঠিক্ জমাট্ বাঁধিয়া উঠে নাই। পৃথিবীর আদিম অবস্থার মতই সুরমার মনটার উপরে একটা কঠিন বৈরাগ্যের গেরুয়া-আস্তরণ সঞ্চিত হইলেও, তাহার ভিতরে তখনো একেবারে কঠিন আকার লাভ করে নাই। কারণ সুরমার বয়স অল্প। তাহার হৃদয়ের ভিতরটা জলন্ত অগ্নিরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল।

সুরমার এই অগ্নিময়ী মনের পরিচয় সুরমার পরিচিত মাত্রেই অনুভব করিত এবং পাঠকপাঠিকাগণও হয় ত তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। অমরের প্রতি সুরমার যে গভীর প্রেম তাহা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইলেও সুরমা সুদৃঢ়ভাবে সেই প্রেমকে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। মনের সহিত সুরমার এই সংগ্রাম এত সুপারস্ফুটভাবে লেখিকার তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মনস্তত্ত্বে লেখিকার স্থান বহু উচ্চে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুরমার এই সংকল্প দৃঢ় ছিল যে তাহার স্বামী নাই—সে বিধবা। কিন্তু হায়! যে পূজারিণী প্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকেই আরতি করিতেছে সে কেমন করিয়া চোখ্ বুঁজিয়া বলিতে পারে যে, প্রতিমা বিসর্জ্জিতা। সুরমার চরিত্রের এই দৃঢ়তা একস্থানে স্পষ্টরূপে ফুটিয়াছে। সুরমার পিত্রালয়ে তাহারি আত্মীয় এক বিধবা বালিকা থাকিত, তাহার নাম "উমা।" উমা সুন্দরী ছিল, ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। প্রকাশ নামক সুরমারই এক আত্মীয় যুবক উমার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছিল। সুরমা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহার তীরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি, উমা ও প্রকাশের মধ্য দিয়া, যে সুতীব্র বিচ্ছেদ অঙ্কিত করিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ছুটিয়া গেল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রকাশকে জোর করিয়া নিষ্ঠুর সুরমা অমরনাথের এক আত্মীয় মন্দাকিনীর সহিত বিবাহ দিল। "মন্দার" সহিত প্রকাশের বিবাহ হইলেও বেচারী প্রকাশচন্দ্র উমাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। উমারও ইহ জীবনে প্রকাশকে ভুলিবার সাধ্য আর রহিল না। প্রকাশের সহিত মন্দার বিবাহে প্রকাশ নিজে ত অসুখী হইলও অধিকন্তু মন্দাকিনীকে সে ভালবাসিতে পারিল না।

বিধবা উমাকে সুরমা সঙ্গে লইয়া কাশীভ্রমণে চলিয়া গেল। সুরমার কল্পিত বৈধব্যের কঠিন ব্রতে, যথার্থ বিধবা উমার মিলন মনে হয় যেন ঠিক্ হয় নাই। কারণ ইহা সত্য যে, উমা বালবিধবা কিন্তু সুরমা?—সে ত বিধবা নহে; এই দুই রমণীকে একই শ্রেণীতে দিলে আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

তাহার পর গল্পটা অমর ও চারুকে লইয়া একটানা চলিয়াছে। ঝড়ঝঞ্ঝা, অনুকুল ও প্রতিকুল বায়ুতে তাহাদের জীবন তরণীখানি সংসার নদীপথে দুলিতে দুলিতে চলিল। যখন থাকিয়া থাকিয়া সংসারের তীরের বিশুষ্ক, ধূসর বালুকারাশিতে তাহাদের জীবনতরী আট্কাইয়া যায়, তখন একমাত্র সুরমাই তাহাকে টানিয়া আবার বিপুল স্রোতে ছাড়িয়া দেয়। সেই জন্যই সুরমাকে প্রায়ই অমরের গৃহে চারুর আহ্বানে আসিতে হয়। কিন্তু

অমর ও সুরমা উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় অচল অটল রহিল। অমর ও চারুর জীবন হইতে সুরমার সম্বন্ধ একপ্রকার অবিচ্ছিন্নই হইয়া রহিল। সংসারের তীরে তীরে তাহাদের জীবন-তরণীকে লক্ষ্য করিয়া সুরমা, উত্তপ্ত, ধূসর মরুবালুকার উপর একাকী চলিতেছিল। সংসারে চারু ও অমর পাছে দুঃখ পায়, সুরমার সেদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল।

সুরমা এই তরুণ যাত্রীদ্বয়ের নৌকার বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া এক একবার অমরের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে লজ্জায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায়, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া, সেই প্রেমকে আহুতি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

একদিন কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পট্টবাসে সুরমা যখন আরতি দেখিয়া, দেবতাকে নত হইয়া প্রণাম করিতে যাইবে, চোখ্ মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে অমরনাথ। অমর দৈবক্রমে কাশীভ্রমণ করিতে গিয়া ঐ একদিনে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়া সুরমাকে দেখিয়া চিনিল। দুইজনের দ্বিতীয়বার চারিচক্ষে মিলন হইল। সুরমা লজ্জায় মরিল অমরনাথ কাশীর ভাড়াটে বাড়ী আসিয়া চারুর কাছে সুরমার সহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের কথা কিছুই বলে নাই। পরে, সুরমাকে চারু তাহাদের বাসায় আসিতে চাহিলে, সুরমার চিরপ্রথানুযায়ী সে যাইতে অস্বীকার করিল না।

সুরমার সহিত অমরনাথের এই মন্দিরের ভিতর পরস্পরের সাক্ষাতের পর হইতে সুরমার মন ফিরিল। সুরমা অমরনাথের সহিত একদিন স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং তাহার পতি-অমরনাথের চরণে তাহার নারীহৃদয়ের সত্তাকে একমুহূর্ত্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া, তাহার দুর্জ্জয় অভিমান ও কাঠিন্যের অবসান করিয়া দিল। সুরমা যে কি মূর্ত্তিতে অমরনাথের নিকট প্রকাশিত হইল তাহা "দিদির" পাঠকপাঠিকাগণ জানেন্। অমরনাথও এক নিমেষে তাহার সুদৃঢ় দাম্ভিকতাকে বিসর্জ্জন দিয়া সুরমার হাত ধরিল, চারিচক্ষের তৃতীয়বার মিলন হইল। এইখানেই গ্রন্থকর্ত্রী উপন্যাস শেষ করিয়া দিয়াছেন।

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে অমর ও সুরমার এই অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য্য সাক্ষাতে লেখিকা কতকটা অলৌকিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। মনে হয় যেন, লেখিকা অমর ও সুরমার হৃদয়কেও এই জায়গায় একটা অলৌকিক শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এই ঘটনাই "দিদি" উপন্যাসের গতিকে হঠাৎ নূতন পথে গতি দান করিল সুরমা যখন তাহার ভ্রান্তির চরমে গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না, তখন যেন সে একটা আশ্চর্য্য শক্তিতে তাহার ভুলটা বুঝিতে পারিল। বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে যখন সুরমা তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে উৎসর্গ করিয়া, আরতি অন্তে প্রণাম করিতে যাইবে, চক্ষু মেলিয়া সে দেখিল সম্মুখে অমর। পট্টবাসে বিধবার বেশে সুরমা; সংসারী সম্মুখে অমরনাথ। দুইজনেই মনে শান্তি পাইবার জন্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছিল এবং দুইজনেই হৃদয়ের আরাধ্যকে নিঃশেষে দেখিলেও, সুরমার শুধু চৈতন্য হইল, অমরনাথের নহে। অমর অত বড় একটা শিক্ষিত যুবা, সে কি জানে না যে তাহার কর্ত্তব্য কি। এবং সুরমাও কি বুঝিত না যে, তাহার কি কর্ত্তব্য। যদি তাহারা পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রীরূপে পাইতে চাহে তবে সেই পথে সুরমার যে বাধা, তাহা ত সে নিজের সাধনা দ্বারা জয় করিতে পারিত। অমরনাথও কি তাহার হারানো শক্তিকে আর লাভ করিবার একেবারে অনুপযুক্ত ছিল? মানুষের এই হারানো শক্তিকে এমন অলৌকিকতা দ্বারা সচেতন করানো, নিদ্রিত রাজকুমারীর সোনার কাটির স্পর্শ জাগরণের কথা মনে করাইয়া দেয়। এই সোনার কাটির স্পর্শ সুরমা যেন একটা আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত শক্তিতে একমুহূর্ত্তে লাভ করিল। সুরমা যে পথে যাইতেছিল তাহা

ভুল হইলেও তাহা সুরমার স্বাধীন বিচার-প্রসূত। তাহার সেই বিনির্মুক্ত, স্বাধীন বিচার বুদ্ধি, তাহার নারীহৃদয়ের কঠিন সাধনাকে একমুহূর্ত্তে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া, প্রেমের এই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ, তাহার নিজত্বকে, তাহার "আমি"কে কি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিল?— এই সুরমা কি সেই "দিদি" সুরমা যে উমাকে উপদেশ দিয়াছিল? যে প্রকাশের জীবন মন্দার সহিত জোর করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সুদৃঢ় কর্ত্তব্যের পরিচয় দিতে একদিন পারিয়াছিল? যে, জীবনের দারুণ শোকেও পর্ব্বতের মত অটল ও অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিল? লেখিকা কি ইহাই বলিতে চান্ যে, যে হিন্দুরমণী জীবিত স্বামীকে সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সেই প্রেমকে সিদ্ধির জন্য অর্পণ করিতে চান্ —সে হিন্দুরমণীরও হৃদয়ে যথার্থ শক্তি নাই, সাধনার তেজ তাঁহাতেও পুঞ্জিভূত হইয়া উঠে নাই? সুরমা যদি নিজের মনে কর্ত্তব্য বলিয়া অমরের কাছে প্রণাম করিতে যাইত তবে সুরমার সমস্ত সাধনা সফলতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিত কিন্তু এই অলৌকিকতা দ্বারা সুরমার এত বড় কঠিন সাধনা, এত কঠিন মনন শক্তি লেখিকা এমন করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন!

কাশীর মন্দিরের সাক্ষাতের পর, সুরমা অমরের কাছে গিয়া ধরা দিল এবং অমরও তাহা স্বীকার করিয়া লইল এই সত্যটি খুবই সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুরমাকে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে টানিয়া আনিয়া লেখিকা সুরমার দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। কারণ এই মিলন আমাদের মনে হয় যেন বাহিরের একটা আশ্চর্য্য শক্তিতে ঘটিল, যে শক্তির উপর সুরমারও হাত নাই, অমরনাথেরও তথৈবচ। যে সুরমার এত তেজ, এত জ্ঞান, এত অভিমান, এত সংযম সেও কি পরিশেষে নিজেই অলৌকিকতায় ধরা পড়িয়া গেল?

অমরের কাছে সুরমার এই পরাজয় আমরা আশা করিয়াছিলাম কিন্তু অন্যরূপে,—সুরমার আপন সাধনার পথে। যা হৌক্, সুরমা প্রেমকে যখন যথার্থরূপে দেখিল তখন অমরনাথকে কহিল "নারীর দর্প, তেজ, অভিমান কিছু নাই, আছে কেবল—" তখন সুরমা সমগ্র ভারত রমণীর কথাকেই বলিয়াছিল। ভারতের ধূসর গেরুয়া-বাসের সঙ্গে সঙ্গেই যে পার্ব্বতীর শ্যামাঞ্চল শোভিত! কঠিন সাধনার মধ্যেই, শক্তি ও সিদ্ধি পূর্ণকুম্ভের ন্যায় ভারতের লক্ষ কোটী নরনারীর তৃষ্ণা বিদূরিত করিতেছে। সুরমা একদিন নিজেকে একমুহূর্ত্তে সেই কাঠিন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভাবিয়াছিল, অমরকে ক্ষমা সে কিছুতেই করিবে না। তাহার সিদ্ধি সে একদিন পাইলই। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যে দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া সে আরতি অন্তে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, সেই পরম দেবতাই সুরমার সাধনার সফলতা প্রদান করিলেন।

সুরমা চরিত্রে কাঠিন্যের এই আদর্শ থাকিলেও তাহা সম্যকভাবে ফুটিয়া উঠে নাই এবং অপরকে সে নিজের চরিত্র দিয়া আকর্ষণ করিতে পারিত না। উমাকে সে জোর করিয়াই প্রকাশের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সে কি এমন কোনো আদর্শই ধরিতে পারিল না, যাহাদ্বারা তাহারা নিজেরাই সত্যের সন্ধান হইতে পারে? সুরমাকে কিনা তাহার নিজের ধর্ম্মটাকেই অপরের কাছে preach করিতে হইল? এই জন্যই মনে হয়, সুরমার সমস্ত সাধনাটা একটা ভুল পথে বেগমান্ ছিল এবং তাহাই যে সত্য তাহা লেখিকা পরে দেখাইয়াছেন। সুরমার সাধন-পথ যে ভুল, তাহা প্রকাশ দৃঢ়ভাবেই একবার সুরমাকে বলিয়াছিল। সুরমা যদি যথার্থ-পথে যাইত তবে প্রকাশ তাহার মুখের উপর বলিতে সাহস করিত না যে;—"সকলে তোমার মত নয় সুরমা—তুমি সব পার। "কেন পার তাও বল্তে পারি। তুমি কখন সে বিষের আস্বাদ জান নি—তুমি জেনেছ কেবল, আবেগহীন শুষ্ক দয়া আর মায়া; আর কর্ত্তব্যেতরা অহঙ্কারপূর্ণ দৃঢ় অভিমান। তুমি এ ছাড়া আর কিছু

জান নি, তাই এমন হ'তে পেরেছ। যাক্—যা হবার তাত' হয়ে গেছে, আর ফিরবে না। এখন মন্দা কিসে ফেরে বল। সে আমায় সুখী দেখে নি বলে মরতেও প্রস্তুত নয়,—আমি যেন সত্যই তাকে সেই মৃত্যুর কোলেই না ঠেলে দি ! বল কিসে সে ফিরবে ?"

পুরুষের নিকট হইতেও যে সুরমা এমনভাবে তিরস্কৃত হইল পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারেন সেই সুরমার হৃদয় কতদূর কঠিন ছিল অথচ প্রেমহীন ছিল না। প্রকাশ সুরমার কাছে হার মানিয়া বলিয়াছিল "ক্ষমা কর, সুরমা ক্ষমা কর।" কিন্তু সুরমা ক্ষমা করিল না। সুরমা উমাকে প্রকাশের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সুরমা ছাড়া আর কাহারো নিকট হইতে প্রকাশ মন্দাকে বিবাহকরারূপ প্রায়শ্চিত্তকে বহন করিতে পারিত না। প্রকাশের গুরু সুরমা পরিশেষে যেন একটা দুর্বলভাবে অমরনাথের চরণে প্রণাম করিতে যাইতেও পারিল দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য লাগিতে পারে কিন্তু অমরের উপর সুরমা কঠিন শক্তি দ্বারা বিজয়িনী হইলেও তখনো সে রমণী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদ্ধতা, অভিমানিনী সুরমার অমরের উপর জয়বার্ত্তা দিয়া ইংরাজি নভেল হইলে উহাই তাহার চরম পরিণতি হইত কিন্তু লেখিকা পরিশেষে সুরমার দর্পকে চূর্ণ করিলেন ও তাহাকে প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। সুরমার কঠিন হৃদয়ের এই প্রেমাভিষেক কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের আরতি অন্তে এক মুহূর্ত্তে হইয়া গেল। সুরমা অতঃপর রমণীয় হইল, রমণী হইয়া উঠিল। সুরমা তখন কোন্ প্রদীপ হইতে স্নিগ্ধরশ্মিজালে অমরকে উজ্জ্বল করিয়া দিল—অমর ধন্য হইল। সুরমাও কঠিন সাধনার সিদ্ধি পাইল।

আর একটি কথা বলিয়া আলোচনা শেষ করিব। সুরমার জীবন পরিবর্ত্তনে প্রকাশ ও উমা উভয়েই যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বলিতে গেলে তাহারাই সুরমার পথকে ফিরাইল ; কোনো অলৌকিক শক্তি দ্বারা অভিভূত সুরমা মন্ত্র চালিতের ন্যায় নিজের সাধনার পথ পরিবর্ত্তন করিল। প্রকাশের স্বচ্ছমনের দর্পণে, সুরমা নিজের যে বীভৎস কাঠিন্যের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা লেখিকা একস্থানে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে লেখিকার সেই লিপি উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"প্রকাশ যাহা বলিল তাহা কি সত্য ? সত্যই তাহার (সুরমার) আর কিছু নাই, আছে কেবল অহঙ্কার আর অভিমান ? সত্যই কি তাহার কিছুই নাই ? তবে কিসের এ জ্বালা—যাহা অনির্ব্বাণ রাবণের চিতার মত ধীরে ধীরে আজ কত বৎসর হইতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ? প্রথম প্রথম তাহার দাহিকা শক্তি তত অনুভূত হয় নাই, কিন্তু তারপর ? সেই কাশীর শ্মশানের মতই যে কেবল ত্বল রব। এ কি অগ্নি তাহা বুঝা বড় কঠিন। প্রকাশ যাহা তাহাতে (সুরমাতে) নাই বলিল,—প্রেম যার নাম—সে বস্তু কি এমনই অগ্নিময় ? তাহা কি শান্ত স্নিগ্ধ শীতল বারিপূর্ণ প্রভাতের জাহ্নবী-স্রোতের মত অনাবিল অনাবর্ত্ত স্থির ধীর শান্তিময় নয় ? সে যে জীবনে কখনো একদিনের নিমিত্তও এ ধারায় অভিষিক্ত হয় নাই ! কোথা হইতে হইবে ? কে দিবে ? শৈশব হইতেই যে তাহার জীবন মরুভূমি। মরু-বালুকায় যে সেই স্রোত-সর্ব্বস্ব প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব। সেই প্রাণদ প্রেমকে সে কখনো চিনে নাই, তাই চিরদিন তাহাকে মরীচিকা বলিয়া উপহাস করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বনাথ একদিন তাহার সম্মুখে এই প্রেমমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু সে চিনে নাই ; প্রণাম করিতে জানে নাই। চিনিবে কিরূপে—সে যে চিরদিন অন্ধ ! (দিদি, ৪০১ পৃষ্ঠা)

উমা ও মন্দাকিনীর কথা লেখিকা দুই একস্থানে উল্লেখ করিয়া তাহাদের বিসর্জ্জন দিয়াছেন। "শকুন্তলা"র অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার ন্যায় "দিদি-"র এই উমা ও মন্দাকিনী আমাদের কাছে দেখা দিয়াই পলাইয়া গেছে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

তাজমহল।

—ঃ-ǀ-ঃ—

সার্জাহার প্রিয়তমা
ওগো রাণি ওগো মমতাজ!
মরণের পারে গিয়ে
পরেছ কি অমরের সাজ?
অন্দরের অন্ধতাকে
খর্ব্ব দেখি করেছ গো আজ
সূর্য্য যারে স্পর্শে নাই
তারো দেখি ভেঙে গেছে লাজ!
পাথরের গুণ্ঠনেতে ঢাকা তুমি রাখনি সরম
প্রকাশিছ শতকণ্ঠে যেন শত প্রণয়ী মরম!

* • • *

ধরণীর সুশ্যামল করপর্ণপুটে
শিশিরের মত তুমি আছ সদা ফুটে
দিতেছ বিলায়ে হেন প্রেম কণিকায়
যুগে যুগে জনে জনে অকাতরে হায়!
ধরণীর সেরা ধন
স্থপতির চারু-কারু-কাজ
মর্ম্মরে মর্ম্মরি
মরণের গীতি গাহে তাজ!

• • • •

ওগো মমতাজ!
আজি তোর নাহি কোন লাজ!
কোমল হৃদয়ে আর কঠোর প্রস্তরে
মরমের লেখা তব হয়েছে মর্ম্মরে
এই তব সাজ
লুকাতে নারিবে কভু যুগ যুগান্তরে
লুকানো যা ছিলে রাণি রাজার অন্দরে

সবি দেখি তাজ

ঘোমটার বাহিরেতে আজ—

গোপন প্রণয় কথা—হৃদয়ের বাণী

রাজরাজেশ্বরী প্রেম ! অন্দরের রাণী ।

*　*　*　*

ওগো মমতাজ

(আজি তব নাহি কোন লাজ)

বরষায় ঝরে জল জোছনায় সুধা

ধরণীর ঋতু তব মিটাইছে ক্ষুধা

সাজ পেশোয়াজ

আজ তব নাহি কাজ ;

নানা ফুলে ফলে

শিশিরের মণিমালা তারা ঝলমলে

সদা তোরে তাজ

সাজাইছে ; দেখাইছে । সমস্ত জগৎ

দেখে আজি শিখিতেছে প্রণয় মহৎ

শুভক্ষণে তাজ

প্রণয় ধরম তরে তব প্রাণনাথ

তব নামে রেখে গেছে চির সাথে সাথ ।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত ।

৺কামাখ্যাধাম দর্শন ।

—:*:—

কর্ম্মসূত্রের প্রবল টানে সেদিন হিমালয়ের প্রান্তবর্ত্তী বঙ্গের একমাত্র করদমিত্র হিন্দুরাজ্য কোচবিহারে কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীকামাখ্যার পবিত্রধাম দর্শনের বাসনা বড়ই বলবতী হইয়াছিল। বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ১১টার গাড়ীতে মাতৃধাম ৺কামাখ্যাতীর্থ দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে আসাম গৌরীপুরের রাজকুমারের অভিভাবক অধ্যাপক মাতৃভক্ত সন্তান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ও আমার ভূতপূর্ব্ব কতিপয় স্নেহাস্পদ ছাত্রের সাদর আহ্বান রক্ষা করিতে তিনদিন অপেক্ষা করিতে হইল। সেই তিনদিন বিশেষ আনন্দেই অতিবাহিত হইয়া গেল। কারণ আশুবাবুর

মত উদার ধর্ম্মোন্মত্ত ভক্তের সঙ্গলাভ, প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দের প্রীতিময় সহবাস, দুর্লভ রাজদর্শন, ও সুযোগ্য রাজমন্ত্রীর সহিত সদালাপ; একসঙ্গে এতগুলি শুভ সংযোগ মাদৃশ দীন ব্যক্তির পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের পরিচায়ক। বিশেষতঃ বিলাসপ্রধান এই বিংশশতাব্দীতে গৌরীপুরের প্রিয়দর্শন রাজাবাহাদুরের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি, স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পূর্ত্তকর্ম্মে মুক্তহস্ততা, এবং গীতবাদ্যে পারদর্শিতা, উহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃত্তিভোগী হিন্দুস্থানী ওস্তাদ রক্ষা, প্রজাসাধারণ ও আগন্তুক অভ্যাগতের সহিত অবাধ সাক্ষাৎকার এবং সদয় কথোপকথন, আর সর্ব্বোপরি বিত্তবিভবশালী নরপতি হইয়াও অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুরাজগুণগুলি আমরা অন্যত্র বিরল-দর্শন বলিয়াই মনে করি। ইঁহারা পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ। বহুপূর্ব্বে ইঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ কার্য্যসূত্রে আসাম অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তদবধি এ স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। আমি প্রাচ্য প্রথামত তাঁহাকে নিম্নোক্ত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।

বিদ্যা বিনয় সৌজন্য কীর্ত্তিচারিত্র মণ্ডিতঃ।
শ্রীনৃপ প্রভাতচন্দ্র স্বং বিজয় স্ব নিরন্তরং॥

বিনয়ের খনি নরমণিও অবনতশীর্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাণী স্বীকার করিলেন। অতঃপর আশুবাবুর বাসায় তাঁহার অভ্যাসমত শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে দিন ত্রয় সানন্দে কাটাইয়া দিয়া গন্তব্যপথ অবলম্বন করিলাম। পরদিন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ৭টার সময় গৌহাটীগামী রেলে চড়িয়া মধ্যাহ্ন ১২টার সময় আমিনগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গাড়ী এই কয়েকঘন্টার মধ্যে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় কত কত নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত পশ্চাতে ফেলিয়া স্বাভিমত স্থলে উপনীত হইল। মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ অনন্ত নীলিমময় আকাশের গাত্রে স্বীয় গাত্র মিশাইয়া ভূলোক, দ্যুলোকের সংযোগ স্থলে শান্ত নরের অনন্ত নরোত্তমের সহিত কিরূপে মিলন ও সাযুজ্য লাভ ঘটিয়া থাকে তাহার সঙ্কেত করিতেছে। কোথাও কোথাও বা দ্বন্দ্বকোলাহলময় সংসার হইতে কিয়ৎকাল নীরব নিস্তব্ধ শান্ত স্নিগ্ধ বিজন বনে নিভৃত বিহার সুখ কামনায় প্রকৃতি যেন নিবিড় অরণ্যানী সকল স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিরল জনপদ আসামের এই অঞ্চলে লোক সংঘট্টের তেমন কোন ঘটা দেখিলাম না। মধ্যে মধ্যে বোধ হয় হাটের জন্য দু দশজন পাহাড়িয়া দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কোথাও বা সরলা সাঁওতালবালা আকর্ণদীর্ঘ তৃণস্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বনচারিণী হরিণীর ন্যায় অভিরাম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে কৃত্রিম কটাক্ষ বর্জ্জিত সরল দৃষ্টিপাতে আরোহীবর্গের মনে কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের হাইল্যাণ্ড বাসী তরুণীবৃন্দের বর্ণনা, 'For never saw I mien or face.

In which more plainly I could trace;" ইত্যাদি মধুময়ী কবিতার সুমধুর ভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। গাড়ী আমিনগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিলে আরোহীগণ অবতরণ করিয়া ষ্টীমার যোগে নীলাচল পাদবাহী তরঙ্গভঙ্গসঙ্কুল সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র পার হইবার জন্য ত্বরান্বিত সহকারে স্ব স্ব দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। এস্থলে কামাখ্যাদেবীর অর্থলাভে পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ যাত্রী ধরিবার বা অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশে, সমবেত ছিলেন। ইঁহারা সকলে গৌরাঙ্গ, সভ্য পরিচ্ছেদসম্পন্ন ও পুষ্পমণ্ডিত শিখাধারী। ক্ষুধার্ত্তের আহার্য্য দর্শনের ন্যায় দেবীর বরপুত্র পাণ্ডাগণ যাত্রীগণকে দেখিয়া শশব্যস্তে যিনি যাঁহাকে পান, তাঁহাকে বংশ পরম্পরায় "যজমান" করিতে উদ্যত হইলেন। অপরাপর তীর্থ পাণ্ডার ন্যায় ব্যবসায়ী হইলেও ইঁহারা একেবারে "কশাই" পাণ্ডা নহেন। ইঁহাদের সহিত আলাপে ও ব্যবহারে বুঝিলাম, ইঁহারা "ধার বুঝিয়া কোপ" মারিয়া থাকেন; অর্থাৎ যাত্রীর অবস্থা বুঝিয়া—

প্রণামীর ব্যবস্থা করেন। সুখের-বিষয় পূর্ব্ব হইতেই একটি শিষ্ট পাণ্ডার নাম (শ্রীযুক্ত শান্তিরাম শর্ম্মা) সংগ্রহ করায় এই যাত্রীধরা বিভ্রাটে আমাকে বড় বেগ পাইতে হয় নাই। দু'একজনার নিকট একটু আধটু কৈফিয়ৎ দিবার পরই উক্ত শান্তিরামের কিশোর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মদাস আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার সুমিষ্ট সম্ভাষণে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন। লেখা বাহুল্য, এই সুদর্শন ব্রাহ্মণবালক তাঁহাদের অবস্থানুসারে আমার তথায় অবস্থান, দর্শন, ভোজন ও পূজনাদির—যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে পৌঁছিলে ধর্ম্মদাসের কথামত গাড়ী কামাখ্যা ষ্টেশনে পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে বুঝিয়া উহার সহিত পাণ্ডু ঘাট হইতে পদব্রজে কামাখ্যা শৈল আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কঠোর মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে প্রায় দুইমাইল প্রস্তর কঙ্করময় বন্ধুর অনভ্যস্ত শৈলপথ অতিক্রম করিতে বিনিদ্র, অভুক্ত, অবলিষ্ঠ, ব্রাহ্মণের যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে "কষ্ট নহিলে কৃষ্ট মিলেনা" এই প্রাচীন প্রবাদের তাৎপর্য্য বেশ হৃদগত হইয়াছে। অগ্রগামী পথপ্রদর্শক ধর্ম্মদাসের অস্ফুটবিরক্তিব্যঞ্জক নিষেধ সত্ত্বেও ক্লান্তি ও অবসাদ বিনোদনের জন্য পথিমধ্যে একাধিক বার বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন তিনটার সময় মাতৃমন্দিরের বহির্দ্বারোপান্তে উপস্থিত হইলাম। এরূপ ক্লিষ্ট অবস্থাতেও তথায় দু'চারিজন পাণ্ডাকে নাম ধাম ও বংশাবলীর পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। তথা হইতে শান্ত ও প্রথামত পাণ্ডা সঙ্গে দেবীবাড়ী অতিক্রম করিয়া পাণ্ডা মহাশয়দের নিবাস পল্লীতে দারুময় এক দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লাভ করিলাম। তাঁহাদের আগ্রহ সত্ত্বেও সেদিন দেবী দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। মাতৃমন্দিরের অব্যবহিত উত্তর দিক্‌স্থিত শৈলসরোবর 'সৌভাগ্য কুণ্ডে' স্নান করিয়া তাঁহাদের পাঠিত তর্পণ মন্ত্রে উর্দ্ধাধঃ একবিংশতি পুরুষের সদ্গতির সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনন্তর যথালব্ধ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা সহচারিণী সুকোমলা শয্যার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলাম; বিশ্রামান্তে ইতস্ততঃ একটু ভ্রমণ করিয়া সায়ং কৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। পরদিন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, শৌচাদির পর প্রাতঃস্নানান্তে পাণ্ডা ঠাকুরের দ্বারা দেবীর পূজোপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ হইলে বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই সময় মনের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এখন আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কারণ আজন্ম যদি কেহ হৃদয়ের অন্তস্তলে অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রিয় দর্শনের প্রবল আশা পোষণ করেন, আর শুভাদৃষ্ট ক্রমে যদি তাঁহার ঐ আশা কোন দিন ফলবতী হয়, তাহা হইলে সে সময় ঐ প্রিয়দর্শীর মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় উহা অপরকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা অদ্যাপি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। পরে পাণ্ডাঠাকুরের আদেশমত যথাক্রমে মায়ের ও মন্দিরস্থ অন্যান্য দেবীর অর্চ্চনা, মন্দিরভিত্তিখোদিত দেবদেবী এবং মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি দীপালোকের সাহায্যে দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে কোচবিহার রাজবংশের পূর্ব্বতন দুইজন মহাপুরুষ পূর্ব্বকালে দেবীর ভগ্ন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া মায়ের অপার কৃপায় সশরীরে সালোক্য মুক্তি লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষনিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিলাম। তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর ভৌতিক দেহত্যাগ করিলেও কীর্ত্তিময় দারু মূর্ত্তিতে মাতৃভক্তসন্তানরূপে মায়ের শ্রীমন্দিরে সদানন্দে বিরাজ করিতেছেন। আমি ইঁহাদেরই কুলপ্রদীপ কোচবিহার মহারাজাধিরাজের বৃত্তিভোগী সামান্য কর্ম্মচারী বলিয়া কামরূপখণ্ডের অথবা অখণ্ড বঙ্গের শিরোরত্ন স্থানীয় কোচবিহার রাজবংশের এই কালবিজয়িনী কীর্ত্তিচিহ্ন নেত্রগোচর করিয়া মনে মনে বড়ই সগর্ব্ব গৌরব অনুভব করিলাম। অনন্তর যথাবিধি শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ৺কামাখ্যা তীর্থে বিশিষ্ট ফলপ্রদ কুমারী পূজাদিতে মধ্যাহ্ন অতীত হওয়ায় বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে

৺কামাখ্যা দেবীর যোগিনীবর্গ কালীতারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার পীঠস্থান, কামেশ্বর মহাদেব, ভৈরবী কুণ্ড প্রমুখ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরী মন্দির সর্ব্বোচ্চ শৈলশৃঙ্গে বিরাজিত। উহার উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে পাদবাহী ব্রহ্মপুত্রবক্ষে ভাসমান বাষ্পযান ও নৌকাগুলিকে ছোট ছোট কলার "ডোঙ্গার" মত, দূরবর্ত্তী শৈলশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বড়র নিকট ছোটর ঈদৃশ দুরবস্থা সর্ব্বত্রই সমান এই প্রমাণ এখানেও প্রত্যক্ষগোচর হইল। এ স্থানে একটী হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী দেখিলাম। তিনি অপর একটী গৈরিক পরিহিত যুবক সন্ন্যাসীর সহিত হিন্দী ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতেছিলেন। মন দিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে একটু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হিন্দী ভারতী দেবীর অকৃপাবশতঃ উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। যতটুকু বুঝিলাম তাহাতে বেদ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে বলিয়া মনে হইল। সন্ন্যাসী মধ্যবয়স্ক, দাড়ি ও চসমাধারী। রূপার "আলবোলায়" তামাকু সেবন করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় সন্ন্যাসীটীকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছিলেন। ইঁহার মূর্ত্তিতে তেজস্বিতার লক্ষণ অনুমিত হয়। "Application" প্রভৃতি দুইচারিটী কথায় পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ইঁহার পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হইল। আমি দূরে হইতে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন কালে সন্ন্যাসীর আবাস কুটীরে বিস্তৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ধুনী, মশারি আবৃত শয্যা দেখিয়া শৈল হইতে অবতরণ করিলাম। ৺কামাখ্যাধামে দুই একটী পীঠস্থান ভিন্ন সর্ব্বত্রই কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। প্রণাম মন্ত্রের প্রায় সকলগুলিরই শেষাংশে "যোনিমুদ্রেনমোঽস্তুতে" এই বাক্য সন্নিবেশিত। অবশ্য কালিকা পুরাণাদিতে এই মহাপীঠের উৎপত্তির যেরূপ বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে মূর্ত্তি থাকিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। মন্দির মধ্যস্থিত পীঠস্থান সমূহ কিঞ্চিৎ নিম্নভূমিস্থ ও অন্ধকারময়। অন্ততঃ আটদশটী ক্ষুদ্র আয়তন প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিয়া আলোকের সাহায্যে ঐ সকল ধাম দর্শন করিতে হয়। কামরূপভূখণ্ডের তীর্থক্ষেত্রের ইহাও একটা বিশিষ্টতা যে, প্রায় সর্ব্বত্রই প্রজ্বলিত দীপ রক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী যে কয়টী ধাম দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। এইরূপে সেদিন দিনমণি অস্তগত হইলে সায়ংকৃত্য আদি সারিয়া মায়ের আরত্রিক দেখিলাম। পরে মন্দিরের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী গৃহে পাণ্ডা মহাশয়গণ ও দুই চারিটী যাত্রী লইয়া একটী ছোটখাট সভায় কিছুকাল তীর্থ ও দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ে মৌখিক কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এই রূপে সেদিনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলাম। পরদিন ৩২শে জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানাদি সমাধা করিয়া শ্রীশ্রীউমানন্দভৈরব ও অশ্বক্রান্তা দর্শন ভিলাষে গৌহাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উমানন্দ পর্ব্বতটী ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। উহার চারিদিকে খরতর প্রবাহ প্রবহমান। নৌকা যোগে ঐ স্থান দর্শন করিতে হয়। যাত্রীদের জন্য নৌকার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত দেখিলাম না। এইজন্য "কাছারীর ঘাটে" অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘাটে প্রৌঢ় বয়স্ক গৌরকান্তি বাঙ্গালী একটী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বিন্ধ্যাচল হইতে কয়েকদিন মাত্র কামাখ্যায় আসিয়াছেন। তিনিও আমার ন্যায় উমানন্দদর্শনার্থী। কিছু পূর্ব্বে ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। ভাবিলাম, পারে যাইতে হইলে সন্ন্যাসীরও আমাদের ন্যায় গৃহীর মত নৌকার দরকার হয়। ধন্য কলিকাল! তোমার আমলে সব "একাকার" হইবে শুনিয়াছি, ইহাই কি তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ? যাহা হউক, তিনি তো সন্ন্যাসী; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পারের আশায় ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; নৌকা একদিন মিলিবেই মিলিবে। এক্ষণে আমার উপায় কি? সেরূপ অর্থ বল নাই, যাহাতে একাকী একখানি নৌকাভাড়া করিয়া বাসনা পূর্ণ

করি। অথচ পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের প্রয়াসের ন্যায় তীর্থ দর্শনের সাধটুকু পুরাপুরী বিদ্যমান। এইরূপ নানা চিন্তায় আন্দোলিত চিত্ত হইয়া বিমনাভাবে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত পারে যাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বোধ হয়—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

এই মহাবাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের ফলে জীবের সকল বাসনা ফলবতী হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য যেন অন্তর্যামী ভগবান্ ও একখান ইলিশ মৎস্যধারী মৎস্যজীবিদের "জেলে" ডিঙ্গি পাঠাইয়া দিলেন। অনেক দরদস্তুরের পর শেষে একখানি আট আনায় ভাড়া করিয়া—

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে—
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে"র—

ন্যায় সাধুসঙ্গে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া উমানন্দধামে উপনীত হইলাম। তথায় প্রায় আধঘণ্টা থাকিয়া দর্শনাদি করিয়া নৌকাযোগে পুনরায় এ পারে আসিলাম। সাধু মহাত্মা গৌহাটী সহরের মধ্যে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। আমি তথা হইতে ফিরিয়া ষ্টীমার যোগে অশ্বক্রান্তা দর্শনান্তে পুনরায় "ডোঙ্গার" কৃপায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। ঐ দিবস রবিবার। গৌহাটীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন। আমি পূর্ব্ব দিবস ঐ সভার জনপ্রিয় ও গবর্ণমেণ্ট সমাদৃত সম্পাদক গৌহাটীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবি রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি সানন্দে উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের দ্বারায় যথারীতি শ্রোতৃ সমাগমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন রৌদ্রে নানা স্থানে ঘুরাঘুরি করিয়া শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে, ও বহুদিন হইতে শ্রুত ঐ সভার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তৃপ্তি লাভের আশায় শরীরে না কুলাইলেও কেবল মনের জোরে অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় রৌদ্রের উগ্রতা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে কামাখ্যা শৈল হইতে অবতরণ করিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে একমাইল ব্যাপী শৈল হইতে নামিতে বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু উঠিবার সময় হীনবল ব্যক্তি সেরূপ আয়াস ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, মা যেন পাপভারগ্রস্ত তীর্থযাত্রীকে তাঁহার পুণ্যধাম হইতে সরাইয়া দিবার মানসে অনায়াসে নামাইয়া দেন। সে পুনরায় তাঁহার ধামে উঠিতে চাহিলে "অধঃপতন কত সহজ. উত্থান কত কষ্ট সাধ্য" এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। সভায় আমার ৫টার সময় উপস্থিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ৫॥০টার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারি নাই। পঁহুছিয়া দেখিলাম একজন কামরূপ প্রদেশীয় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় ব্যাসাসনে আসন গ্রহণ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-শিরোরত্ন শ্রীমদভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ পুরঞ্জন উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত পদস্থ ধর্ম্মপ্রাণ সদস্যের সমাগম হইয়াছে। ধর্ম্মসভার গৃহটী দারুময়। বহুবিধ মনোরম দৈব আলেখ্য বিলম্বিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত। নিস্তব্ধতা, রম্যতা ও পবিত্রতার শুভ সম্মিলনে গৃহটী প্রকৃতই ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন করিতেছিল। আমি তথায় প্রবেশ করিবামাত্র সময় অতীত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় পাঠ স্থগিত রাখিবার ইঙ্গিত করিয়া পাঠকের আসন সরাইয়া তথায় কালোপযোগী বক্তৃতার আসন "টেবিলের" আবির্ভাব করাইলেন। তিনি আমার কাণে কাণে আগমনের বিলম্ব হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া "We are anxiously waiting for you." বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি অবিলম্বে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত "আত্মপ্রেম বা ভালবাসা" বিষয়ক দীর্ঘায়তন সন্দর্ভটী রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া প্রায় দেড় ঘণ্টায়

মধ্যেই স্বকর্ত্তব্য নিঃশেষিত করিলাম। তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। অপরিচিত স্থানে অন্ধকারময় বিজন পর্ব্বতে আরোহণ অতি কষ্ট সাধ্য হইবে বিবেচনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি তথা হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শৈলসোপান অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন সন্ধ্যার ছায়া পর্ব্বতগাত্রসঞ্জাত পাদপ পল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া সোপানপথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বৃক্ষের অনিবিড়তা বশতঃ অন্ধকারের গাঢ়তা কিছু কম এরূপ অবস্থায় একাকী পর্ব্বত আরোহণ করিতে মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু নিরূপায় বিশেষতঃ নিরাশ্রয়, পাণ্ডাঠাকুরের বাড়া ফিরিয়া যাইতে না পারিলে আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের কোনই সংস্থান নাই। কাজেই সাহসে ভর করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাতৃনাম স্মরণ পূর্ব্বক উঠিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের প্রভাব অজ্ঞেয়, কিন্তু দয়া প্রত্যক্ষ ও অসীম। রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে জনহীন বন্ধুর পার্ব্বতাপথেও দেখিলাম, সবৎসা ভগবতী গাভীগণ আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছেন। আমি অবিশ্বাসী ধর্ম্মান্ধ সংসারী মানব। লীলাময়ীর রাজ্যে নিয়ত কত যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না। জন্মান্তরীণ সংস্কার, সংসর্গ, শিক্ষা, দীক্ষাও প্রারব্ধের অদম্য প্রভাবে মন এতই বিকৃত ও কলুষিত যে দুর্লভ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজেকে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেও ভীত ও সঙ্কুচিত হই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, তরঙ্গ-কল্লোলমালিনী দুকূলপ্লাবিনী যমুনা তরঙ্গিণীর পারগামী চিন্তিত বসুদেবের অগ্রে অগ্রে এই মহামায়া কামাখ্যাই শিবারূপে পথপ্রদর্শিনী হইয়া গোকুলে স্বীয় প্রিয়তনাকে লইয়া গিয়া আনন্দময় লীলার হাট পত্তন করিয়াছিলেন। জানিনা, আজ তিনিই কিনা পাষাণবাসিনী হইয়াও করুণাময়ী সাক্ষাৎ ভগবতী গাভীরূপে নীলাচলযাত্রী তীর্থদর্শী পথিককুলকে আমার ন্যায় প্রত্যহ পথ দেখাইয়া স্বধামে লইয়া যান। মাতৃলীলা রহস্যের এ জটিল তত্ত্ব উদ্ভেদ করিবে কে? আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস জন সমাজে উপহাস্য হইবার সাহস রাখি না। যাঁর তত্ত্ব তিনিই বুঝাইবেন, আমি ব্যক্তিগত ঘটনার সত্য উল্লেখ করিলাম মাত্র। এইরূপ দেবীধামে ত্রিরাত্র বাস করিয়া গত ১লা আষাঢ় বেলা প্রায় ১টার গাড়ীতে কামাখ্যা ষ্টেশনে উঠিয়া পরদিন ৯টার সময় স্বকর্ম্মক্ষেত্র কুচবিহারে ফিরিয়া স্বীয় পর্ণকুটীরে পুনরায় "যে তিমিরে সে তিমিরেই" ডুবিলাম। সঙ্গী ও অর্থবলের অভাবে বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি দুএটি দূরবর্ত্তী পুণ্যক্ষেত্র দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। মা যদি জীবনে আর একবার এ অধম সন্তানকে কৃপা করিয়া দর্শন দেন, তাহা হইলে এ আশাও ফলবতী হইতে পারে। মায়ের কৃপা ও স্নেহে সন্তানের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না। এই কৃপা লাভ করিতে ধনজন, শক্তিসামর্থ্য, কুলমান, বিদ্যাবুদ্ধি, কিছুরই আবশ্যক নাই, চাই কেবল শ্রদ্ধাভক্তি। তাই আর্ত্তভাবে মাতৃপদযুগলে নিরন্তর প্রার্থনা করি;—

নার্থ কামৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কামাখ্যে দেবি কাময়ে।
কেবলাং তব পাদাব্জে দেহি ভক্তি মকৈতবাং॥
ওঁ তৎ সৎ॥

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ।

—— ঃ*ঃ ——

সাহিত্য-তপোবনের কণ্টক আমরা, ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা ভ্রান্ত আদর্শের সংঘাত-জনিত কর্কশ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তপোবনের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিতেছিলাম, সেই সময়ে বাঙ্গলার চারিদিক্ হইতে কি দারুণ হাহাকারের তপ্ত শ্বাস আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী অনেক দিন হইতেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনমতে জীবনধারণের জন্য, অতি কায়ক্লেশে যে একমুষ্টি অন্ন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে আজ তাহাও জুটিতেছে না। বাঙ্গালায় আজ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে গৃহে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; পুড়িতেছে—পুড়িবে, মরিতেছে— মরিবে। সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইয়া যাইবে। কোটি কোটি বাঙ্গালী আজ ক্ষুধার তাড়নায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ঊর্দ্ধে-নিম্নে চারিদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে, কে তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিবে? খাইতে না পাইলে যে মানুষ বাঁচে না! ইহারা কাহার দুয়ারে গিয়া হাত পাতিবে? রাজদ্বারে? শ্মশানে? কোথায় যাইবে?

অমাবস্যার নিশীথিনী,—অন্ধকারে অন্ধ,—এ শ্মশানে কে জাগে? একটা জাতি বহুদিন খাইতে না পাইয়া, যে জীর্ণ কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া আসিতেছিল, আজ আর সে তাহাও পারে না। অস্থিচর্ম্মসার কোটি কোটি বুভুক্ষু পড়িয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে, পতিপুত্রকে কোনরকমে আধপেটা খাওয়াইয়া ঘরে ঘরে বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীরা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া চক্ষের জল আঁচলে মুছিতেছে,—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না, কেহ দেখিতেছে না,—কেহ জানিতেছে না,—দিনে দিনে শুকাইয়া মরিতেছে। এ শ্মশানে কেহ জাগে? কেহ জাগে না? একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না? বলিবে অদৃষ্ট? কে গড়িয়াছে? কেহ কি ভাঙ্গিতে পারে না? বলিবে তাহা ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। কেহ কি গড়িতে পারে না?

বহুদিন বাঙ্গলায় মানুষ জন্মে নাই। কিন্তু আর ত দেরী সহ্য হইবে না। এ যে যায় যায়। আকাশের উপর যদি ঈশ্বর থাক, বাঙ্গলা দেশকে একটা মানুষ ভিক্ষা দাও।

ইংরেজী কেতাবের অর্থ-বিজ্ঞানের সব ফরমুলাগুলি নিঃশেষে পড়িয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে তাতে মরিতেছে, এ সমস্যার উত্তর তাহাতে ত মিলে না। সবাই—এ—অ—দৃষ্ট।

বলিবে—অজন্মা হয়, অনাবৃষ্টি হয়,—এর প্রতিকার কে করিবে? বলিবে—জমির উৎপাদানের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, জমিতে সার দেওয়া হয় না, কৃষক ভাল চাষ করিতে জানে না,—সে দোষ কাহার? বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক অমিতব্যয়ী, কাজেই ধার করে, শোধ দিতে পারে না, সুদের দায়ে জমির শস্য উড়িয়া যায়! বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক স্ত্রীর জন্য রূপার পৈঁছা তৈয়ার করে, মাটিতে টাকা পুঁতিয়া রাখে, কাজেই না খাইয়া মরে। আরও যা যা বলিয়া আসিতেছে, এবং বলিতে চাও, তা সবই জানি। কিন্তু শুনিলে হয়ত বিশ্বাস করিবে না,—বোধ হয়, এ সকল কথার উপরেও কিছু বেশী জানি। বলি না কেন? বলিতে দেও না। আর এ ত শুধু কথা কাটাকাটির ব্যাপার নয়। কথার মত কাজের ব্যবস্থা নাই, হইতে পার না, হইতে দেও না। যাহা কাজের কথা—তাহার পশ্চাতে যদি কাজ না থাকে, তবে সে হয় শুধু কথার কথা। তাহা বলিয়া লাভ কি? বাঙ্গলার নব্য ন্যায় লইয়া যে বিতণ্ডা

(Speculation) একদিন অনায়াসে চলিয়াছে, বাঙ্গলায় অর্থ নৈতিক সমস্যা লইয়া আজ তাহা চলিতে পারে না। কেন না, অর্থ-বিজ্ঞান—তা সে বাঙ্গালারই হউক, আয়র্লণ্ডেরই হউক, শুধু বিতণ্ডা (Speculation) নহে।

আমরা যাহার দেশের দুঃখ ও দুর্গতি লইয়া বক্তৃতা করি, তাঁহাদের মুখে সম্প্রতি বাঙ্গালার এই অর্থনৈতিক সমস্যার কত কল্পনা জল্পনা ও বিতণ্ডা শুনিয়া শুনিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা যৌত-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই এই দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে,—শুনিয়াছি নাকি, জাতিভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে,—শুনিয়াছি, পাশ্চাত্য Industrialism এর ভ্রান্ত আদর্শে বিভ্রান্ত না হইয়া কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রচলন করিতে হইবে, সহর ছাড়িয়া পল্লীবাসী হইতে হইবে, নূতন ছাড়িয়া সনাতনে ফিরিতে হইবে; ইত্যাদি।

কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কেন গেল, সে কথার উত্তরে ইতিবৃত্ত মুখ লুকায় কেন? এত যে অন্নকষ্ট, তব রাশি রাশি অন্নের বিদেশে রপ্তানী কেন? যে টাকা জাতি একদিন ধার লইয়াছিল, এই মুখের গ্রাস তাহার সুদ যোগাবার জন্য পাঠাইতে হইবে? উত্তম। কিন্তু কত দিন? যাবৎ না এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটা——, কে জানে, কে বলিবে ভবিষ্যতে কি লেখা আছে?

আজ একটা জাতির মুখের গ্রাস, কি পাপে জানি না, বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি, জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, মরণোন্মুখ। এই অন্নকষ্টে কে বলিতে পারে, জাতির স্বভাবধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে নাই? কে বলিতে পারে, একটা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমে পশুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে কি না? দেশের এ হেন অবস্থায়, সাহিত্যের কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়? ধর্ম্ম যদি ধারণই করিতে না পারিল, তবে, সে ধর্ম্ম কি? সমাজ যদি এই জাতীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিল, তবে স্মৃতির আদেশ রঘুনন্দন দিলেও এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তত দিন এত দুঃখে তাহা মানিয়া চলিয়াও লাভ কি?

এ কি মৃত্যু? না হত্যা? না আত্মহত্যা?

'নারায়ণ'—আষাঢ়।

শ্রীযুক্ত রোমেন রোল্যাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ফরাসীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রোমেন রোল্যাণ্ড ও আমাদের কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মধ্যে সম্প্রতি যে পত্র বিনিময় ঘটিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল।

রোল্যাণ্ড লিখিয়াছেন,—মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তির উপর প্রায় বিশ্বব্যাপী উৎপীড়ন ও দাসত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে,—কতিপয় স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিয়া মানব মনের সেই মহা অনিষ্ঠকারী দাসত্ব ভাব বিদূরিত করিতে নিখিল মানব সঙ্ঘের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! আপনি কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিবেন? আমার বিশ্বাস—আপনার মতবাদ হইতে

আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন নহে,—মূলতঃ এক। আমরা হেনরী বারবেস, চিত্র-শিল্পী পল সিগ্নে, ডাক্তার ফেডারিক্-ভ্যান্‌ইডেন, অধ্যাপক জর্জ্জ ফ্রি নিকলি, হেন্‌রী ভ্যাল্‌মড়ার ভেণ্ড ও ষ্টিফেন জেউইগের সম্মতি লাভে কৃতার্থ হইয়াছি; এবং বার্টাণ্ড রাসেল, সেল্মা লেজার, আপটন্ সিন্‌ক্লেয়ার, বেনড্রিটো ক্রোস প্রভৃতি মনিষীগণের সহানুভূতি শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। আমাদের অভিলাষ—সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক দেশ হইতে প্রথমতঃ এক এক জন জ্ঞানবৃদ্ধ লেখক, কবি ও শিল্পীকে সদস্যরূপে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের স্বাক্ষর সম্বলিত ঘোষণাপত্র প্রত্যেক রাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্ঞানীর নিকট প্রেরণ করা। আপনি যদি ভারবর্ষের, জাপান ও চীন হইতে এরূপ কোন নাম সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমরা বিশেষ ভাবে বাধিত হইব। আমার আশা, ভারতীয় প্রতিভা ইউরোপীয় ভাব-রাজ্যে অচিরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে। প্রতীচী ও পাশ্চাত্যের রাজ্যের ভাব-সমন্বয় আমার জীবনের সুখস্বপ্ন! এই সমন্বয় সাধন সংকল্পে আপনি অন্য অপেক্ষা বহু প্রবন্ধ বহুবার প্রকাশ করায় আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা অসীম। উপসংহারে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, আপনার জ্ঞান, মনীষা ও রচনাকৌশল আমার প্রিয়। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।

রোমেন রোল্যাণ্ড।

পুনশ্চ—

যুদ্ধ কালে আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে,—তাহার একটিতে আপনার ১৯১৬ সনে টোকিও নগরে প্রদত্ত বক্তৃতার কতিপয় অংশ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। উহা প্রেরিত হইল, আপনার বাক্যের ফরাসী অনুবাদ সুষ্ঠু হয় নাই। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও পাঠাইতেছি, উহা এমন একজন ইউরোপীয় মনীষীকে উৎসর্গ করিয়াছি যিনি আপনার ন্যায় আমার চিন্তারাজ্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, আপনিও তাঁহাকে পছন্দ করিবেন আশা! পুস্তিকার মর্ম্ম—

হে আমাদের সহকামী একাত্ম ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা এই পঞ্চবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ব্যপদেশে নানা কার্য্যে নানা ভাবে বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আজ যুদ্ধ অবসানে সমস্ত বাধা বিঘ্ন মুক্ত হইয়া, আমরা আবার অধিকতর অনুরাগে, দৃঢ়তার সহিত আপনাদের ভ্রাতৃত্ব দাবী করিতেছি, তাহা সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

যুদ্ধ আমাদের পূর্ব্ব দল বিছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! বহু জ্ঞানী তাঁহাদের জ্ঞান গবেষণা, কলা-কৌশল, বুদ্ধি বিবেচনা ও মানসিক শক্তি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সেবা করিয়াছেন! আমরা মানুষের দুর্ব্বলতা ও তুল্যরূপে সমষ্টি-শক্তির প্রভাব অবগত আছি,—অকস্মাৎ সমবেত শক্তির নিকট ব্যক্তিত্বকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে; কারণ পূর্ব্বে উহার প্রতিকার চেষ্টা আদবেই করা হয় নাই। এক্ষণে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে লাভবান হইব।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে কিরূপ ভাবে মানবোচিত মানসিক বৃত্তিগুলিকে অবজ্ঞাত করিয়া পৃথিবীতে পশুবল কতদূর প্রধান্য লাভ করিতেছে,—প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত পশুবলের পদে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশে মনোযোগী হইয়াছেন—সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা। যে মহাব্যাধি ইউরোপীয়গণের দেহ ও আত্মাকে পীড়াগ্রস্ত পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে তাহার উগ্রতা বর্দ্ধনে কবি ও শিল্পীগণ তাঁহাদের সমগ্র-শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাহারা আরও মানবিকতাকে অপমানিত কলুষিত করিতেছেন। পুরা কালের

ও আধুনিক ন্যায়, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা এই বিদ্বেষ বহ্নি প্রধূমিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যে সদ্ভাব ও স্বাভাবিক প্রীতিবন্ধন তাহা ছিন্ন করিতে ইঁহারা চেষ্টিত। * * * মহাসমরে তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার না করিলেও, সকলেই আপনাদের কুকীর্ত্তির বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর কেন! হে ভ্রাতৃবৃন্দ! জাগ্রত হউন, আসুন, আমরা আত্মাকে আমাদের অন্তরের গুপ্ত প্রদেশে নিহিত এই দাসত্ব কলঙ্ক, অপমান হইতে মুক্ত করিয়া দেই! আত্মা ত কাহারও দাস নহে, আমরাই আত্মার দাস—আত্মশক্তি ব্যতীত মানুষের অন্য প্রভু আর কে থাকিতে পারে? (মোহ কেবল আমাদিগকে অন্য ভাবে আচ্ছন্ন করে।) * * * সত্যকে জীবনের ধ্রুব কর,—জীবনের অমানিশাতে অশান্তির অন্ধকারে হে ভোগলিপ্সু ব্যক্তিগণ ধ্রুব নক্ষত্রে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হও!—মাৎসর্য্য গর্ব্বের এস্থান নহে—সমস্তই অসার, বর্জ্জনীয়। মানব—সত্যের সেবক, সত্য—স্বাধীন, তাহার অভিব্যক্তি অনন্ত,—সে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় কিছুই স্বীকার করে না। নিখিল মানবের অংশ,—সকলেই ভ্রাতা ভগিনী। এই বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব সুখ দুঃখ উত্থান পতনের মধ্যে দিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে, আমরা বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বভাব জাগ্রত করিতে আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তর—

বিগত মহাসমরের মহোচ্চ আদর্শ নীতি ব্যর্থ করিয়া জনসাধারণ কেবল ক্রোধ ও বিদ্বেষকেই চিরন্তন করিবার চেষ্টায় সংসারকে দ্রুত ধ্বংসমুখে অগ্রসর করিতেছে দেখিয়া আমার মন যখন ঘোরতর দুর্ভাবনার অন্ধকারে নিমজ্জিত এমন সময়ে আপনার পত্র আশার বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রফুল্লিত করিল। সত্য-ধর্ম্মই আমাদের জীবনরক্ষক—একথা অতি অল্প ব্যক্তিই উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছে;—ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে অনেকেই! যে যাহাই করুক, সত্য যে ব্যর্থতার মধ্যে দিয়াও পরিণামে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। কদর্য্য স্বার্থকোলাহল মুখরিত রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যেও যে ইউরোপীয় জাতি উচ্চ বিবেকবুদ্ধি, কতিপয় স্বাধীন আত্মার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহা আমার পক্ষে আশাতীত বারতা! নিখিলমানব আত্মার স্বাধীনতা বিঘোষণ পরিপন্থী সেই স্বাধীনচেতা মহাত্মগণের আহ্বান সানন্দে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আমি তাঁহাদের দলভুক্ত হইলাম।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ।	ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।	১০ম সংখ্যা।

পল্লীর গর্ব্ব।

মূর্খ গরিব গোঁয়ার ছেলে ফেলবো কোথায় থাকুক কাছে,
বিদ্বান এবং ধনাঢ্যেরা সহর পেয়ে ভুলেই আছে।
পুত্র যে সব বিদেশ গেছে বিদ্যা ধন ও জ্ঞানের আশে,
অনিচ্ছাতে রয় যে দূরে, অন্তরে গ্রাম ভালই বাসে।
কতক গেছে সখের পাছে সুখের আঁচে সহর তলে,
হাল্‌কা ছেলের পলকা মাথা বিগ্‌ড়ে দেছে কলের জলে।
স্বদেশ-প্রেমিক, দেশের নেতা, ত্যাগ করেছেন 'দেশের' মায়া,
রাজোদ্যানের 'পাইন' তরু, পাইনে তাদের ফল কি ছায়া।
চড়ায় পাষাণ-বক্ষো্যে তারা বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের আলো,
বক্ষে আমার সাজবে কেন? ভগ্ন ভিটায় প্রদীপ জ্বালো।
কর্দ্দম এবং ধানের ধূলা, রন্ধন এবং 'গোয়াল কাড়া'
বোঝা আমার কন্যা ধনীর কোন্ প্রাণেতে সইবে তারা।

নধর চিকণ শ্যামল শোভা, বন্য ফুলের মধুর ঘ্রাণে
বর্ষা কালের বন্যা জলের আতঙ্ক যে সদাই প্রাণে।
পিতার পিতার বাস্তু হেরি' হাস্য করেন নিত্য নাতি,
কুঁড়ের মাঝে সাজ্‌বে না যে ব্রহ্মদেশের শুভ্র হাতী।
সঙ্গে আনেন চাকর-বাকর বসন ভূষণ বচন রাশি,
বিরক্তি, আর রোগের ভীতি, বিদ্রূপ এবং ঘৃণার হাসি।
কয় না গ্রামের দুখের কথা নিজের বড়াই নিয়েই রত,
পুঁথির বুলি আউরে চলে, সজীব গ্রামোফোনের মত।
দিনেক থেকে বিরক্ত হয় সহর যেন পেলেই বাঁচে,
মূর্খ গোঁয়ার গরিব যারা রয় ত তারাই আমার কাছে।
দেশের 'বালাম' লওগো সহর, যা থাক্ আমার তাহাই সোনা
আমার থাকুক 'মড়াই' ভরে 'দুধ্‌কল্‌মা' ও আউস নোণা।
ফেলবো কোথায় আমার 'বোড়ো' রুক্ষ হউক আমার 'তরা'
বর্ষা দিনের ভরসা আমার বিপুল ক্ষুধার সুধায় ভরা।
লও গো সহর কিষণ্‌ভোগ ও ন্যাংড়া ভাদুই ফজলি আগে
কাঁচমিঠা টক্ কদ্‌মে জোয়ান তারাই থাকুক আমার ভাগে।
তোমার থাকুক গোলাপ ক্রোটন অর্কিড এবং আইভি লতা
আমার থাকুক বকুল চাঁপা যুঁই জবা আর অপরাজিতা।
তোমার সালার্ড, টোমাটো বীট গাজর এবং কপির ফালি
আমার বেগুন কুমড়া ডাঁটা পুঁই কচু লাউ খেঁড়োর জালি।
তোমার ডেভিল কাটলেট কারি মটন চপেই পীযূষ ঢালে
গরিব আমার তৃপ্তি কেবল মাছের টক্ আর কলাই ডালে।
তোমার যে চাই গোল্লা, গজা, ভীমনাগ এবং ঢাকাই পুরী
আমার থাকুক মতির মিঠাই চাষের গুড় আর মুড়কী মুড়ি।
সহর তোমার ক্লান্তি হরুক্ তাড়িত-পাখায় সোডার জলে
ঘাম যে আমার নিত্য মুছায় দখিন বাতাস গাছের তলে।
তোমার থাকুক ক্রিকেট্ টেনিস্ বিলিয়ার্ড এবং 'কারোম' খেলা
ছক্কা পঞ্জা দশপঁচিশেই কাটবে আমার অলস বেলা।
থাকুক তোমার ব্যাণ্ড 'লোবোর' ব্যাগপাইপ আর ভেঁপুর রাশি
আমার থাকুক রসানচৌকী, ঢোল কাঁশি আর শানাই বাঁশি।

সিনামাতেই তুষ্ট তুমি, তৃপ্ত তুমি ডুয়েট শুনে,
সন্ধ্যা আমার সুখেই কাটে হরিনাম আর রামায়ণে।
ধনের রাজা, সুখের রাজা, সখের রাজা বটই তুমি,
ফলের ফুলের ধানের গানের প্রাণের আমিই জন্মভূমি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-গৌরব।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারত ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় ভারতে বৌদ্ধ প্রাধান্যের কাল। সে যুগে ভারতে রাজশক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা একাধারে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে অশোকের রাজগৌরব ও ধর্ম্মবিস্তার চেষ্টা, ভারতে বৈদেশিক পরিব্রাজক মেগেস্থেনিস ও চিউন সাঙের আগমন, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মহা-মেলা সংঘটন ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপণ্ডিত শিলাদিত্যের অধ্যক্ষতায় জ্ঞান বিস্তারের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা এ সকল বৌদ্ধ গৌরবের স্মৃতি আজিও সাধারণ পাঠকের মনে জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু সে যুগে ইহা অপেক্ষা যে গৌরবময় কার্য্য বৌদ্ধরাজগণের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা প্রচলিত ইতিহাসে প্রায়ই স্থান লাভ করে না। বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে জাতি বিভাগের চেষ্টা যে দৃঢ়তা ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগ যেরূপ বিশিষ্টতা লাভ করে, তাহা দেখিয়া বৌদ্ধযুগের রাজনীতিতে আপামর সাধারণের জন্য যে সকল উন্নত ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার আভাস লাভ করা কঠিন।

বৌদ্ধযুগের আখ্যান সকলে দেখা যায় যে কোনও এক ক্ষত্রিয় কুমার ক্রমে কুম্ভকার, সূত্রধর, মালাকার, পাচক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সেবা করিয়াও জাতিচ্যুত হন নাই। অপর এক রাজপুত্র ভগিনীকে নিজ অংশ দান করিয়া ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও অখ্যাতিভাজন হন নাই; অনৈক ব্রাহ্মণ ব্যবসা দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া এবং অপর ব্রাহ্মণ এক তীরন্দাজের সহায়তা কার্য্যে এবং তৃতীয় ব্রাহ্মণ পশু শিকার ও চাকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও জাতি হারান নাই। প্রায়সঃই ব্রাহ্মণগণ কৃষিজীবী এবং গোপালক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহ ব্যাপারে জাতি বিভাগ স্থল বিশেষে প্রাধান্য সে যুগেই লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে বিবাহ অপ্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধও যে সে যুগেও স্থাপিত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক এক অবিমিশ্র আর্য্যজাতি ভারতে কোনও যুগেই ছিল কিনা সন্দেহ। যেমন আইবিরিয়ান (Iberian) কেল্ট, সেকসন, ডেনস্, নরমান্ জাতির মিশ্রনে এক ইংরাজ জাতি গঠিত, তেমনি ভারতে কোলারিয়ান, দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতির সংমিশ্রনে এক নব জাতি প্রাচীন কালেই গঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই মিশ্র জাতির ভিতরে পরকালে শ্রেণীবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয়। আর্য্য ও অনার্য্য, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সভ্য ও অসভ্যের বর্ত্তমান পার্থক্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব সে যুগেও যা এত প্রবল ছিল তাহা বলা যায়

না। ক্ষত্রিয় ও বিজিত আর্য্যের মধ্যে যে বিবাহ ঘটে নাই এমনও নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই যে ব্রাহ্মণগণও কোথাও কোথাও নিম্ন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত তুলনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক উচ্চস্থান লাভ উত্তর-ভারতে কোথাও ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদিগের লিখিত পুস্তকেও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের কাল বৌদ্ধযুগের পরেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী কুরু ও পাঞ্চালই সেকালের বরেণ্য স্থান। কাশী ও কোশল তখন নগণ্য। জৈন গ্রন্থ সকলে পুরোহিত জাতি রাজপুরুষের নিম্নে স্থান লাভ করে দেখা যায়। অপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের পালক ও পোষক। পুরোহিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ চরিত্রগুণে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহারা ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টবাদী আবট বা বিশপদিগের ন্যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের জাতিবিভাগ তৎকালীন ইটালী ও গ্রীশের জাতিবিভাগ হইতে শ্রেষ্ঠতর হয় নাই।

এ বিষয়ে ভাণ্ডারকারের (Professor Bhandarker) ন্যায় পণ্ডিত ও উচ্চকুলজ ব্রাহ্মণের অভিমত প্রামাণ্য-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার কোনও বিশেষ প্রবন্ধে লিপি সকলের লিখন হইতে যে সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ লোকের নিকট হইতে দেবোত্তর ভূমি ইত্যাদি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে ক্রমে ভূমিদান প্রচলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে গুপ্ত রাজগণের রাজত্ব কালে বহু ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ সকল এমন কি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃ ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে কোনও ভূমি দানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্ব্বে যে দান প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণকৃত পূজা ইত্যাদির জন্য প্রদত্ত হইবার প্রমাণ নাই।

যে সকল পরবর্ত্তী কালের দানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার ভাষা সংস্কৃত তৎ পূর্ব্ব পালিভাষায় লিখনে সেরূপ দানের বর্ণনা নাই। প্রফেসার ভাণ্ডারকার তাই লিখিয়াছেন "যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী শেষ) সে সময়ের মন্দির ও হর্ম্ম্যাদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোনও চিহ্ন নাই। ব্রাহ্মণ জাতি তখনও ছিলেন কিন্তু তেমন প্রবল এবং সাধারণের ধর্ম্ম উপদেষ্টা রূপে নহে কারণ রাজা হইতে সামান্য মজুর সকলেই সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল।"

ভাষা বিকাশের ইতিহাস আলোচনা দ্বারাও এই মতের পোষকতা হয়। সংস্কৃত ভাষা যে কালে প্রচলিত ভাষা মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করে সে সময়ে ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১ম দ্রাবিড়, কোলিরায়ণ ও আর্য্য অধিবাসীদিগের ভাষা; ২য় স্তরে প্রাচীন বৈদিক ভাষা; ৩য় স্তরে আর্য্যজাতির উত্তর ভারতের প্রাকৃত ভাষা; ৪র্থ স্তরে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা; ৫ম স্তরে গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; ৬ষ্ঠ স্তরে কোশল প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষা ৭ম স্তরে মধ্য ভারতের প্রচলিত সাহিত্যিক পালি ভাষা; ৮ম স্তরে অশোকি প্রাকৃত ৯ম স্তরে অর্দ্ধ মগধ ১০ম স্তরে কেশ প্রাকৃত ১১ম স্তরে উচ্চ সাহিত্যিক সংস্কৃত ১২শ স্তরে ভারতের প্রচলিত ৫ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী প্রাকৃত ভাষা। পূর্ব্বরূপ ভাষার শ্রেণী হইতে দেখা যায় যে ভাষার কেন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিয়াছে। প্রথমে সে কেন্দ্র পাঞ্জাবে ছিল, তৎপর কোশল, তৎপর মগধ তৎপর সংস্কৃত ভাষা পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। লঙ্কার প্রাকৃত ভাষা বহুকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা পর সময়ে ধীরে ধীরে সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুর ও টাঞ্জরে পালি ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন

চলিয়াছিল উত্তর ভারতেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূর্ণ জয়লাভ ও প্রতিষ্ঠা কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের কালের (৭০০—৮৩০ খ্রীঃ) পূর্ব্বে ঘটে নাই। এই উভয় প্রচারকই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী।

সে সময় যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল তাহা সকল প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান পরিহার করিল; কেবল অদ্বৈত-বাদের মতই তাহাতে স্থান পাইল বেদের ক্রিয়া কলাপ। আলোচনাও বিলীন হইল; প্রকৃতপক্ষে একটী নবধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিল। রাজপুত ও ব্রাহ্মণ রাজা ও পুরোহিতে যে বিবাদ চলিতেছিল ইউরোপের পোপ ও রাজার দ্বন্দের ন্যায়—তাহার মীমাংসা হইল। সাধারণে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধ-ভারতে পালি সাহিত্যের ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতের যে প্রচার ঘটিয়াছিল তাহা কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ ছিলনা। বৌদ্ধ-সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত থাকিলেও কোশল প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাহিত্যের কেন্দ্রে জ্ঞান বিস্তারের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে সময়ে উক্ত শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরুষ ও নারী মধ্যে জ্ঞানালোচনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে লিখিত ভাষায় প্রচলন অল্পই হইয়াছিল অধিকাংশ বিষয়ই স্মৃতিশক্তির ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া আবৃত্তি ও আলোচনা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিতে হইত; কোনও কোনও বিষয়ে লিখিত বিবরণও সামান্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকতত্ত্ব বেদ উপনিষদের দর্শন হইতে উচ্চাঙ্গের না হইলেও তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। খ্রী পূঃ ৩য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত বৌদ্ধ হর্ম্ম্যাদির গাত্রে যে সকল বিভিন্ন কর্ম্মজ্ঞাপক নক্সা অঙ্কিত দেখা যায় তাহাতে সে কালের পূর্ব্বে যে বৌদ্ধসাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; সে সাহিত্যে "ধর্ম্মকথিকা" "পেটিক," "সুত্তানটিকা", "সুত্তান্তাকিনি" শব্দের উল্লেখে বিবিধ বৌদ্ধ গ্রন্থ বুঝায়। কেবল তাহাই নহে রাজা অশোক তাহার ভব্রলিপিতে (Bhabra edict) বৌদ্ধ সঙ্ঘকে নির্দ্দেশ করিয়া, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী ও সাধারণ নরনারী সকলকে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের বাক্য চিন্তা ও পালন করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল শ্রেণীর নরনারীর জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের অধিকার স্বীকৃত দেখা যায়। বাস্তবিক বৌদ্ধরাজগণের শাসনে ভরতবর্ষে যে ধর্ম্মনৈতিক রাজশাসন (Theocratic Government) প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি প্রজাসাধারণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে। বর্ত্তমান কালেও আংশিকভাবে বৌদ্ধথেরীদিগের গাথা সকল শ্রীমতী রিস্‌ডেভিস্ জায়ার সংগ্রহে (Misses Rhys Davids) যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অনুবাদে থেরীগাথা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধযুগের কেবল স্ত্রীজাতির উন্নতির যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গৌরবের একঅংশ।

বৌদ্ধযুগের অপর মহাগৌরবের বাহিরে, রাজশাসনে ধর্ম্ম অন্তরে নীতির শাসন দ্বারা—কবিকল্পিত নহে—কিন্তু বাস্তবিক দ্বেষহিংসা, দ্বন্দ্বকলহ পরিশূন্য শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। জীবনের গৌরব দানে ত্যাগে সহিষ্ণুতার ও নীতি পালন এই বার্ত্তা দেশময় প্রচারিত এবং লক্ষ লক্ষ জীবনে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ধর্ম্মনৈতিক শাসন যে জগতে স্থায়ী হয় না তাহা বৌদ্ধগৌরবের আসামের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে; অল্পসংখ্যক লোকই উচ্চনীতির বহন সহ্য করিতে পারে, সাধারণের পক্ষে কেবল নীতির শাসনই যথেষ্ট নয়। বর্ত্তমান ভারতে স্ত্রীজাতি শিক্ষাশূন্য ও বহুকার্য্য হইতে দূরে গৃহে আবদ্ধ। বৌদ্ধ ভারতের উচ্চপদস্থা সেবারতা শত শত জ্ঞানবৃদ্ধা থেরী দিগের চিত্রখানি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া যায়। প্রশ্ন করিতে হয়—এ জ্ঞান স্রোত কোথায় শুকাইয়া গেল! ভারতের সে গৌরবময় চিত্রখানির মত দ্বিতীয় একখানি চিত্র ভারত-ইতিহাসের কোনও যুগে অঙ্কিত করিবার সুযোগ আসে নাই। বুদ্ধ প্রাণ আজ ভারতে নাই—ইহাই ভারতে বিশেষ ক্ষতি।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

দিন যায়, মাস যায়।

—:*:—

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় চলে,
বাদল আঁধার বুকে কখনো আঁচলে
রাঙ্গা পুষ্পরাশি
পূর্ণিমার হাসি
পড়ে আসি, পথ-খোঁজা আকুল নয়নে
তারার আখর আঁকা স্বপন চরণে,
তমসায় মিশি,
যায় সারা নিশি ;
দশদিশি জাগে যবে উষার ইঙ্গিতে
বৈতালিক বিহঙ্গের আনন্দ সঙ্গীতে ;
যেন পরশসে,
আঁখি মুদে আসে,
সুপ্তি আশে ; জগতের জাগরণ গান
নিদ্রিত হৃদয় আর পায় না সন্ধান !
কোন দিন জেগে যদি ওঠে অসময়ে
মধ্য দিনে, লুপ্ত ছায়া মুখর আলয়ে
অসহ্য আলোকে
ভরে এই লোকে
কোন চোখে, চাহিবে সে কিসের সন্ধানে
অবারিত স্বচ্ছনীল আকাশের পানে !
সেথা কোন রেখা
লেখে নাই লেখা,
আলো একা অনিমেষ উদ্দীপ্ত নয়ান,
গুপ্ত কথা লয়ে ছায়া কোথায় প্রয়াণ !
তার চেয়ে ভালো এই মায়া কুহেলিকা,
কালো মেঘ আলো করা বিজুলির শিখা,

খুঁজিবার সুখ,
পরাণ উৎসুক,
রুদ্ধ বুক, যার দ্বারে আসি ফিরে ফিরে
আশা করে', মিনতির মৌন আঁখি নীরে!
তার চেয়ে ভালো
আধখানা আলো,
যে "ফুরাল বলে" আমি চাই এত করে,
ঘর ছাড়ি, যার লাগি' ফেরা ঘরে ঘরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দেবতা।

—'*'—

আজকাল তো আমাদের ঘরের পুরুষেরা প্রায় পনেরো আনার ভাগই বড় নিয়ম কিছুই মানেন না অনেকে আবার ঠাকুরদেবতা পর্য্যন্তও মানিতে চাহেন না। দু'পাতা ইংরাজী বই মুখস্থ করিয়া তাঁরা এই না-মানাটাই নিজেদের উন্নতি মনে করেন। কিন্তু মেয়েদের তো না মানিয়া উপায় নাই, তাঁরা এ জন্য পুরুষদের হাসি বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও তাঁদের কসুর ক্ষমা করাইয়া লইবার জন্য স্তব স্তুতি আরও বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। অনেক স্থানে বাবুদের জন্য বাবুর্চ্চি এবং স্ত্রীদের জন্য শিখাতিলকধারী বামুন ঠাকুরের ব্যবস্থা আছে, ইঁহাদের তো সহধর্ম্মিণী বলা রীতিসঙ্গত হইবেই না,—সহকর্ম্মিণীও নহেন। এই সূত্রে অনেক স্ত্রীরা অনাচারী স্বামীর পাতে খাওয়া ছোঁওয়া পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলেন; যাক্ সে অনধিকার চর্চ্চা! এ হেন যুগেও আমাদের বাড়ীর নিয়মকানুন ছিল সেকেলে, পিতা আমার একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শচীনাথ বেদান্তবাগীশের নাম এ অঞ্চলে সকলেরই সুপরিচিত। অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি কলিকাতা বাস আরম্ভ করেন নাই। দেশেই বাস করেন। বাড়ীতে ৺পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাধানাথ স্থাপিত আছেন তাঁহারই পূজার্চ্চনা করিয়া বাবার দিন কাটিত। শৈশব হইতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিই পূজার সমস্ত উপকরণ সাজাইয়াছি। ঠাকুরের উপর আমার টান দেখিয়াই ঠাকুমা আমার নাম রাখিয়াছিলেন মীরা। দিদির নাম ছিল ধীরা। আজকালকার সভ্যরা তো গৌরী দান মানিতেই চাহেন না, কিন্তু আমার ঠাকুমা বাবা এঁরা খুব মানিতেন, তাই দিদির ঠিক আট বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। এবং আমার বয়স আট ছাড়িয়া নয় বৎসরে পড়িতেই সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, পাত্র না কি মনের মতন জুটিতেছিল না, আমিও তখন দিদির মত মাথায় ঘোমটা দিয়া বউ সাজিবার জন্য কম ব্যস্ত হই নাই। হায়, আমার পোড়া কপাল! তখন কে জানিত আমার পিছনে এমন গ্রহ বর্ত্তমান ছিল। নয় বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত উকীল ৺নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্রের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমার

স্বামী তখন সহরে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। আমি বিবাহের পর কয়েকদিন মাত্র শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া আবার বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। নয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার বাপের বাড়ীতেই কাটিয়াছিল। এই কয় বৎসর আমার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিক্রিগুলা দখল করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বাগ্দেবীর সেবায় নিবিষ্ট, আর আমি ছিলাম রাধানাথের সেবায় নিবিষ্ট। বাবা আমার ভক্তি দেখিয়া খুব খুসী হইতেন চারিদিকের লোকে ধন্য ধন্য করিত, উৎসাহে আমি দশখানা হইয়া কাজ করিতাম। বুঝিতাম না যে এ ত আমার রাধানাথের কাজ হইতেছে না, আমারই অহঙ্কারের গর্ব্বের পূজা হইতেছে এই যে আপনাকে ভুলাইয়া দেবতার সঙ্গে প্রতারণা, ইহার ফল যে রাধানাথের বদ্ধমুষ্টির ভিতর নিঃশব্দে সঞ্চিত হইতেছিল ইহা তখন কে জানিত? কিন্তু এই যে শাস্তিতে আমার শাসন করিয়াছ রাধানাথ, এর জন্যও আজ তোমায় ভাষাতীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। ইহাই যে আমায় উপযুক্ত উচিত পাওনা ছিল। দিন কতক পরেই বাবা আমার এ সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সেই শোকে ঠাকুমা অর্দ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। বাবা থাকিতে বাবা নিজেই রাধানাথের পূজা করিতেন, বাবার অভাবে নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইল। বৈদিকপাড়ার সার্ব্বভৌম ঠাকুরের পুত্র মুরারীকে পুরোহিত করা হইল। এই সময়ে আমারও শ্বশুর বাড়ী হইতে তলব আসিল, আমাকে যাইতেই হইবে। আমার বর্ত্তমানে যে রাধানাথের সেবার ত্রুটী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই তাই রাধানাথের দুয়ারে অনেক চোখের জল ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলাম। সারা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে গেলাম। রাধানাথের সেবা না করিয়া দিন আমার কাটিবে কেমন করিয়া? অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কন্যা আমি, তবু রাধানাথ যে শুধু এই মন্দিরটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নন, এই সহজ কথাটা যে এ মাথায় তখন কেন ঢুকিল না তাই ভাবি।

(২)

শ্বশুর ছিলেন না, বিধবা শাশুড়ী, তিন চারিটী দেবর, একটী বিধবা জা এইগুলি লইয়া আমার স্বামীর সংসার। স্বামী অধ্যাপক। কলেজে পড়াইয়া যা বেতন পান সমস্ত আনিয়া মায়ের হাতে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। নিজে চব্বিশ ঘণ্টা চারিপাশে উঁচু বইএর থাক্ সাজাইয়া সেই পুস্তক দুর্গে বাস করেন। সমুদ্র তুল্য উদার প্রশান্ত তাঁর কান্তি, কোন ঝড়ঝাপ্টাতে তাকে বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ বিচলিত করিতে পারে না। তিনি স্বল্পভাষী, কখনই কিছুতে বেশী কথা বলেন না, মুখে সর্ব্বদা প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাসি, অন্তর স্নেহ-কোমল হইলেও কর্ত্তব্যে সততায় তাঁর অটল দৃঢ়তায় তাঁর আর সব আমার কাছে মন্দ না লাগিলেও আমি দেখিলাম তিনিও একজন কিছু না-মানা সভ্য। সকল রকম হিন্দুর অখাদ্য মাংস ম্লেচ্ছের স্পৃশ্য জল সবই তিনি দ্বিধাহীন ভাবে খান। ঠাকুরদেবতা মানেন কিনা জানি না কিন্তু কখনো ত পূজার্চ্চনা কিছু করিতে দেখি নাই। তিনি দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফিলজফির প্রফেসার তাঁর সকল কিছু পাণ্ডিত্য কলেজে ছাত্রমহলে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ। আমি কিন্তু চিরদিন যাহা ঘৃণা করিয়াছি অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। তবে ভাগ্যের কথা এই যে তিনি সকল কিছু খান বটে তাই বলিয়া নিয়মিতও নয় বাড়ীতেও বাবুর্চ্চি খান্সামাও রাখেন নাই পাইলে যে কোন বাধা মানেন তাও মানেন না, যে কোন জাতির বন্ধু নিমন্ত্রণ করিলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। আমার ত ঘৃণা বিতৃষ্ণায় সারা মন ভরিয়া উঠিল। যে মানুষ এমন ম্লেচ্ছ, তার উচ্ছিষ্ট খাইলে আর কি আমার ছোঁয়া সেবা রাধানাথের চলিবে? হা রাধানাথ তখন কেন বুঝি নাই যে সে পাতের প্রসাদ আমার কত জন্মের তপস্যার ফল! প্রথম প্রথম দিন কয়েক আমি তিনি খাইয়া গেলে ইচ্ছ

করিয়াই পাতে বিড়াল লাগাইয়া দিতাম। শাশুড়ী এক একদিন বলিতেন "হাঁ বৌমা দাঁড়িয়ে থেকে পাতে বেড়াল তুলে দিলে গা?" একদিন কথাটা তাঁর কানেও বুঝি গিয়াছিল; পরদিন আহারের পর সবশুদ্ধ থালের উপর বিড়ালকে দুধমাখা ভাত খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন, আমি বাঁচিয়া গেলাম। একদিন তাঁর কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনি বিছানার উপর রাশি রাশি বই বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া বই পড়িতেন আমি সেগুলাকে টেবিলের উপর রাখিয়া বিছানা ঝাড়িয়া নিজের জায়গা করিয়া লইতাম, সেদিন দেখিলাম তিনি সেই বিছানায় একখানা ছোট বই হাতে করিয়া শুইয়া আছেন। আমি বিছানার বইগুলা টেবিলে রাখিতেছিলাম তিনি আমার দিকেই চাহিয়া আছেন দেখিয়া কহিলাম "কি দেখ্‌ছো?" তিনি হঠাৎ আমাকে নিকটে টানিয়া আমার মুখের উপর মুখ নত করিতেই আমি সরিয়া গেলাম, নিদারুণ ঘৃণায় আমার দেহখানা আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাঁকে যে কতখানি ব্যথা দিলাম তা আর ফিরিয়াও দেখিলাম না। এ ঘটনার পরও আমার দিনগুলা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল কিন্তু রাধানাথের সেবার পরিবর্ত্তে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার মনে হইতেছিল যে এ দিনগুলো আমার একেবারে অনর্থক বৃথাই যাইতেছে তাই স্বস্তি পাইতেছিলাম না। একদিন স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কহিলাম "যে আমায় একটীবার পাঠিয়ে দাও।" তিনি আপত্তি মাত্র না করিয়া কহিলেন "আচ্ছা", আমি এত সহজে অনুমতি পাইবার আশা করি নাই। ঠিক পরদিনই মেজ দেওর আমার বাপের বাড়ী রাখিয়া গেল। ভয় করিতেছিলাম যে শাশুড়ী হয়ত আপত্তি করিবেন কিন্তু কই তিনি ত কোন আপত্তি করিলেন না। স্বামী যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার মত লইয়াছেন তাহা পরে জানিয়াছিলাম। যাওয়ার সময় একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম দেখিলাম তিনি ঘরে নাই, শুনিলাম বাহির হইয়া গিয়াছেন, এটা তাঁর বেড়াইতে যাইবারই সময় বটে! তিনি প্রত্যহই এই সময়ে বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকেন আজ আমি যাইতেছি বলিয়া তো তাঁর যে কাজের যে নির্দ্দিষ্ট সময় তার এক চুলও এদিক ওদিক হইবে না। বড় জা আমাকে কহিলেন "বউ কবে আসবে?" আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শাশুড়ী কহিলেন "বড় জোর মাস ছ'একের বেশী ত নয়ই, তবে মা সারলেই অমনি নিয়ে আসবে" বুঝিলাম তিনি মাকে বুঝাইয়াছেন যে আমার মায়ের অসুখ বলিয়াই আমি যাইতেছি কিন্তু এ কথা ত আমি তাঁকে বলি নাই। আমার মায়ের শরীর যথার্থ অসুস্থ ছিল বটে কিন্তু সেজন্য মা তো আমাকে লইয়া যাইতে চাহেন নাই।

(৩)

আজ প্রায় এক বৎসরেরও বেশী দিন আমি বাপের বাড়ী আছি। আমাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনও তাগিদপত্র আসে নাই। আমি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি ইচ্ছা করিয়া যাইতে না চাহিলে যে কেহ লইয়া যাইবে না তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম। নিশ্চিন্ত আরামে মনের সাধে রাধানাথের সেবা করিতে-ছিলাম। কিন্তু এখন এ সেবায় আমার সে পূজার স্ফূর্ত্তি হওয়া ত দূরের কথা আমাকে দেখিলেই পাঁচজনে গা টেপাটেপি করিয়া কি একটা অর্থসূচক ইঙ্গিত করে। দেখিয়া শুনিয়া ত কই রাধানাথের দোহাই দিয়া সব ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিই না, উপরন্তু মনের ভিতর বিজাতির হুলকার মত তীক্ষ্ণ একটা বিষাক্ত শ্বাস জমিয়া ওঠে। বাস্তবিক তখন বুঝি নাই, আত্মপ্রাণ দিয়াই না পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা না পারিলে পুতুল খেলা মানুষের কয়দিন ভাল লাগে? এই সময় দিদি ও গোঁসাইদা অর্থাৎ আমার ভগ্নিপতি আসিলেন। আমি দিদির সে অষ্টপ্রহরের সাজসজ্জা আর গোঁসাইদার দাসীগিরি পছন্দ করিতাম না, আমি আপন মনে ঠাকুর ঘরেই সারায় থাকিতাম।

অনেক দিনের রৌদ্রদগ্ধ ধূসর মাটীর উপর সেদিন রাত্রে দু পশলা বৃষ্টি হইয়া গাছপালার স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী যেন চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছিল। রাধানাথের সুমুখের বাগানটার যুঁই মল্লিকা আর দোপাটী ফুলের গাছগুলা যেন স্নান করিয়া সজীব হইয়া ডালপালা মেলিয়াছিল। ধূলামাখা ফুলগুলাও শুভ্রকোমল বর্ণ বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল। ভিজা মাটির সোঁধা গন্ধ আর বকুলতলার ঝরা বকুলের গন্ধে মিশ্রিত সুগন্ধ বাতাস আমার রাধানাথের শিখিপাখা দোলাইয়া যাইতেছিল। আমি গঙ্গা স্নান করিয়া মাথার রুক্ষ ভিজা চুলগুলার আগায় গিঁট দিয়া বসিয়া দূর্ব্বা বাছিতেছিলাম। মেঘভাঙ্গা স্নিগ্ধ রোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। পাশে যেখানে আতপ চা'ল ধুইয়াছিলাম সেখানে একআধটী চাউলের দানা পড়িয়াছিল দুইটা কাক তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। একটা সুপুষ্ট গাভী আমার একটু দূরেই নূতন তৃণ ঘেরা জমিটুকুতে চরিতেছিল। হঠাৎ হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া দেখি দিদি ও গোঁসা দা আমারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন, আমি রুক্ষ কণ্ঠে কহিলাম "কি?" দিদি কহিল "কি আবার!" "হাসচো যে!" "কখন আবার হাস্‌চি, দেখ্‌চি তুই কি কর্‌চিস? দেখলেও দোষ?" "দেখচো তো তুর্ব্বো তুল্‌চি" এবার গোঁসাইদা হাসিয়া কহিলেন "মিছে কথা, তুমি বায়সদম্পতি দেখ্‌ছো" রাগ করিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম "দেখ্‌ছিলাম না গোঁসাইদা এখন দেখ্‌লাম। মনে পড়িল ছোট বেলায় আমার গৌরবর্ণ দিদির হিংসার সামগ্রী ছিল। এই কথায় দিদি অভিমান করিয়া বাবাকে কহিত "আমি কালো মীরা সুন্দর তাই তুমি ওকে বেশী ভাল বাস।" বাবা হাসিয়া বলিতেন মীরা মায়ের রংটাই তো আমার ধীরা মাকে অধীরা ক'রে তোলে। এই সময় দিদির নজর পড়িল আমার মাথার উপর, সে চমকিয়া কহিল মীরা তুই সিঁদূর পরিস্‌নে নাকি? ওসব প্রসাধনের আদিই ত! সুতরাং ওসব আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াই ছাড়িয়াছিলাম। দিদির কথার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কেবল মাত্র কহিলাম না' দিদি শিহরিয়া উঠিল কহিল "ওমা ওযে স্বোয়ামীর কল্যাণ" গোঁসাইদা গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "সে যেখানে গিয়েছে সেখানে শুভাশুভ কিছুরই ঠিক নেই, তার কল্যাণ প্রার্থনা করা তোমার উচিত মীরা" আমি অর্থহীন দৃষ্টিতে তার মুখ পানে চাহিলাম "কোথায় গিয়াছেন তিনি?" গোঁসাইদা কহিলেন "অপূর্ব্ব যুদ্ধে গিয়েছে তাকি তুমি জাননা? সে যে ফ্রান্সে পৌঁছে গেছে এতদিন!" হায় হায় তিনি যে যুদ্ধে গেছেন তা আমি প্রায় বছরখানেক পরে আজ শুনলাম! ভিতরকার নারীর বুক ভাঙ্গিয়া একটা তুফান হয় তো ফেনাইয়া উঠিতেছিল সেটাকে দমন করিয়া দিদিকে কহিলাম "তার জন্যে সিঁদূর পরে কি হবে?" আমার কতখানি অশোভন স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল তাই একবার দেখ! মন যে মানুষের সর্ব্বজ্ঞ, মনের অগোচর যে পাপ নেই নিজের মনকে ছাপিয়েও আমার উদ্ধত অহঙ্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিদি কহিল "জানিস্ বেওয়ারিশ মালের ওপর সিঁদূর হচ্চে,—ধ'রে নে ওয়ারীশের নামের ছাপ মারা লেবেল" তাচ্ছল্য ভরে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিলাম "আমার ওয়ারীশ হচ্ছেন একমাত্র রাধানাথ" সতীলক্ষ্মী দিদির কথাটা কতখানি সত্য তা না বুঝিয়াও উত্তর করিয়াছিলাম কারণ প্রতিবাদ তো করা চাই। গোঁসাইদা-কে কহিলাম যে, কে আপনাকে খবর দিলে যে তিনি যুদ্ধে গেছেন?" গোঁসাইদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন "আমি নিজে গিয়ে তাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসেছি যে!" আমি তখন স্তব্ধ হওয়া রহিলাম।

(৪)

রাধানাথের মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়া একটা রাস্তা গিয়াছে। সেই দিকে কয়েকটা ঘুলঘুলি ছিল, সেই ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া আমি রাস্তাটার সবই দেখিতে পাইলাম। একদিন মুরারি ঠাকুর পূজা করিতেছিল আমি ঘুলঘুলি

দিয়া রাস্তা দেখিতেছিলাম। জন কয়েক ফাজিল ছোকরা বাঁশ ঝাড়ের নীচে বসিয়া উৎকটগন্ধ চুরুট খাইতেছিল, শাঁখারীদের বিধবা ভগ্নি সদু কাঁখের কলসীর মুখে গামছা চাপাইয়া স্নান করিতে যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া ফাজিল ইতরেরা কোনও একটা অসম্ভ্রমের কথাই বলিয়া থাকিবে আমি ভাল শুনিতে পাইলাম না কিন্তু সদু হঠাৎ থমকিয়া পড়িল একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এই যুবতীটি বালবিধবা ও সুন্দরী হইলেও ইহার সুনাম যথেষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সদুর পর সেই পথে ধোপা বউ হনহন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে চলিয়া গেলে কে একটা কহিল "চণ্ডিধোপার রণচণ্ডী! চণ্ডেটা কি গোঁয়ার!" মুরারী হাসিয়া কহিল "মীরা কি দেখ্‌ছো?" একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "না কিছু না" সে কহিল "তোমার মন ভাল নয় বুঝি?" আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিলাম সে তখন পূজা আরম্ভই করে নাই; দেখিলাম আমার আয়োজনই আজ ষোলআনা ভুল! অপ্রতিভ হইয়া সারিতে বসিলাম বারবারই ভুল হইতেছিল ভাগ্যে মুরারীর অসীম ধৈর্য্য তাই রক্ষা! সে বসিয়াই রহিল। অনেকক্ষণ পরে বাহির হইয়া শুনিলাম মা দিদিকে বলিতেছেন "সোমত্ত মেয়ে তাকে একা ঠাকুর ঘরে থাক্‌তে দেওয়া যে অন্যায় তা কি আমি বুঝি নে মা কিন্তু ওর যে রাধানাথ অন্ত প্রাণ!" দিদি বিরক্ত হইয়া কহিল "মেয়ে মানুষের আবার রাধানাথ অন্ত প্রাণ! সোয়ামীগত প্রাণ হবে সেই না কত ভাগ্যি। রাধানাথের কাজে যে ভুল করিয়াছি তাহাতেই মন আমার অনুতপ্ত ছিল, দিদির কথায় রাগে দুঃখে চক্ষে জল আসিয়া পড়িল! কি অপরাধ করিয়াছি তাই আমার এ দণ্ডখানি? তখনও টের পাই নাই যে অপরাধের বোঝাই আমার অসীম। এই কি আমার আজন্মের রাধানাথ সেবার ফল? মদান্ধ মত্ততায় আপনার পূজাই করিয়াছি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া নিজের যা ভাল লাগিয়াছে তাই করিয়াছি এখন ফলের বেলায় রাধানাথের দোহাই দিলে কি হইবে? তাই তো বলিতেছি স্ত্রী কেবলমাত্র সন্তানের গর্ভধারিণী, নারী যন্ত্র মাত্র হইলেও হয় না—সেও একটি জীব, সংসারধর্ম্মে তার স্বামীর সহধর্ম্মিণী হওয়া চাই। এত দিন লক্ষ্য করি নাই এখন দেখিতেছি মা, ঠাকুমা, দিদি এবা আমায় কি চক্ষে দেখিতেছে। সকলকার অতি সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমায় পাহাড়া দিয়া ফেরে। নিজের এই অপমানে রাধানাথে অতি ভক্তিমতি আমি ত কই "তুল্য নিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।" হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলাম। মা প্রায়ই শোনাইতে লাগিলেন যে—'পুড়্‌বে মেয়ে উড়্‌বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই।' বে'থা দিলাম, পরের ঘরে চ'লে গেল দায় নিশ্চিন্দি! তা নয়, সোমত্ত মেয়ের আন্‌চানির উপর আগ্‌লে বসে থাকা, এও ত কম অধর্ম্মের ভোগ নয় মা?" এসব কথার জবাব আমি দিলে যে দিতে পারিতাম না তা নয় কিন্তু একটা সামান্য মাত্র জবাব দিবামাত্র সকলে মিলিয়া যে ভাবে কতকগুলা কুৎসিৎ, অপ্রীতিকর কথা আনিয়া ফেলিবেন সেগুলা শুনিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, তাই সব নিঃশব্দে সহিয়া যাইতাম। দেশ জুড়িয়া রটিয়াছিল—স্বামী আমার স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া দূর খেদাইয়া দিয়াছেন এবং সেই ঘৃণায় নিজে যুদ্ধে গিয়াছেন। যাক্‌, আমার এ পুরস্কার উচিতই হইয়াছে যা চাহিয়াছিলাম তাই পাইয়াছি, চাহিবার সময়ে যদি নিজেই ভুল করিয়া থাকি তো সে কার দোষ দিব? আমার হইল "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।"

(৫)

ঝুলনের পূর্ণিমা। বৈকালে রাশি রাশি ফুলের মালা ফুলের গহনায় রাধানাথকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়া ফেলিলাম, সময় মত যূঁই, বেল, চামেলি, গন্ধরাজের মনোরম গন্ধে, আর পূর্ণিমার অম্লান শুভ্র জ্যোৎস্নায় ঝুলন উৎরাইল

চমৎকার! আজ আমি ঠাকুর ঘরে একা নই, মা দিদি সকলে আমার সঙ্গে আছেন ঠাকুমাও জপের মালার ঝুলিটার ভিতর হাত পুরিয়া মৃদু মৃদু ঝাঁকানি দিতেছিলেন। তিনি কোনও কাজ না করিলেও বয়সের গুণে প্রত্যেক কথায় ফোড়ন দিতেছিলেন, সে ফোড়ন এমনি ঝাঁঝালো, যে মানুষের ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তখনও আমরা কীর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়া ঠাকুরের ঘরেই ছিলাম, মুরারীর কীর্ত্তন গাহিতে হইবে তাই সে পূজা সারিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। পূজার দালানে জ্যোৎস্নায় বসিয়া মা দিদি প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন সেই সময় এক দল কীর্ত্তন আসিয়া রাধানাথের সুমুখের ছোট প্রাঙ্গণটুকুতে দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিল। গানটা বুঝিতে পারি নাই—সুরটী বেশ মিষ্টি তাহা মনে আছে। প্রত্যেকের গলায় তপ্‌সী ফুলের মালা, কাহারও কাহারও আবার হাতেও এক বোঝা মালা জড়ানো। কীর্ত্তন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া ভূমিষ্ট হইয়া রাধানাথকে প্রণাম করিল। কেহ কেহ বা হাতের ফুলের মালা রাধানাথকে পরাইয়া গেল। আমি রাধানাথের পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম। কে একটা লোক সর্ব্বশেষে মন্দিরে ঢুকিয়া এক ছড়া মালা রাধানাথকে পরাইয়া দিয়া একবার চারিদিকে চাহিল তারপর তার নিজের গলার মালা খুলিয়া ঝুপ্ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে বাহির হইয়া গেল। লোকটা যে কে তাও বুঝিতে পারিলাম না। প্রচণ্ড বেগে উষ্ণ রক্তস্রোত আমার আপাদ-মস্তকে বিদ্যুৎ খেলাইয়া গেল। অন্তরের প্রত্যেক শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত বড়ো গাছের শিকড়ের মত বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। রাধানাথের পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া পড়িতে পড়িতে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। আর নয়! এখানে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আর রাধানাথের পায়ে অপরাধের বোঝা বাড়াইব না। হৃদয়ের অন্তস্তল লক্ষ্য করিলাম আর সেখানে কোনও বল, কোনও সম্বল নাই। আমার ভিতরে যে মা, যে বোন্, যে স্ত্রী যে কন্যা, যত কিছু নারী ছিল সকলে মিলিয়া এই অপমানে আহত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। রাধানাথ আমার রক্ষা-কর্ত্তা! না না ভুল, এ বিষম ভুল! তাহা হইলে রাধানাথের পবিত্র মন্দিরে তাঁর পাশেও আমার এ অপমান! না প্রভু বেশ করিয়াছ, এই যে কশাঘাত করিয়াছ ইহাতেই না এ ভ্রান্ত মনোরথ আমার কর্ত্তব্যপথ চিনিয়াছে। মাকে বলিলাম "মা আমি শশুর বাড়ী যাবো।" মা মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন "তোমার তো যেমন আসার ছিরি, তেমনি যাওয়ার ছিরি!" শ্বশুরবাড়ী পত্র লিখিয়া দিলাম। পত্রপাঠ মেজ দেওর আসিয়া আমাকে লইয়া চলিল। এখন আমি শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর শূন্য ঘরখানা দিনরাত সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁরই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছি। কায়মনোবাক্যে বুঝিয়াছি নারীর অন্য ধর্ম্ম, অন্য দেবতা, তীর্থ পূজা, কিছু নাই, আছ কেবল তুমি স্বামী, তুমি রাধানাথ! মহাসমরের তো অবসান হইয়াছে, আর কত দিনে তিনি ফিরিবেন?

শ্রীনীহারবালা দেবী।

স্পর্শমণি।

—॰৪৪॰—

আমার, দুঃখ তোমার চরণ ছোঁয়া
তাই সে এমন পরশমণি
বুকের মাঝে গড়্‌ছে তুলে
অমূল্য এ সোণার খনি।

তাই সে যেমন এল প্রাণে
ডুবিয়ে দিল ভক্তি বানে
মৌন পিকের কণ্ঠে জাগে
হর্ষসুখের কুহুধ্বনি
এ যে আমার পরশমণি।

দুঃখ আমার তোমার বুকের
অমূল্য কোন্ সোহাগ ঢালা
তোমার দুটি অধর ছোঁয়া
চুম্বনেরই কণ্ঠমালা।

এ যে অতুল এ যে অতুল
ছাপিয়ে এবার গেল রে কূল
সকল হারা হয়ে তোমার
সোহাগ ধনে হলাম ধনী
এ যে তোমার পরশমণি!

কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা।

এতদঞ্চলে গীত, গীতগুলি এদিকের ষোলআনা রথমের নিজস্ব। উহা নিরক্ষর গ্রাম্য কবি দ্বারা কেবল কথিত ভাষার সাহায্যে মুখে মুখে রচিত এবং সারিন্দা, দোতারা, কেরেঙা প্রভৃতি যন্ত্রযোগে গীত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত গীতের মধ্যে "যুগীর গীতের" নাম সর্ব্বাগ্রে উক্ত হইতে পারে। যুগীরগীত অল্প দিন হইল লিপিবদ্ধ

হইয়াছে। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও এই গীত শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা ও পঞ্জাবাদি অঞ্চলেও রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত রহিয়াছে। এই গীতের নায়ক ও নায়িকাগণের জন্ম ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এতদঞ্চলের সুপরিচিত মেচপাড়া (ধুবরী) পাটিকা-পাড়া ও শ্রীকলার হাট (রঙ্গপুর) করতোয়া প্রভৃতি স্থান ও নদীর নাম যুগীরগীতে শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের ডোমার ষ্টেশন হইতে পাৰ্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত স্থানে অবস্থিত অনেক ধ্বংশাবশেষের সহিত এই গীতের নায়ক গোপীচান্দ ও তাহার মাতা ময়নামতীর নাম জড়িত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও ডাঃ গ্রিয়ারসন সাহেব এই যুগীর বা ময়নামতীর গীত লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই গীতের মূল ভাগ মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে রচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে ইহার আলোচনা পাঠ করিয়াছি। যুগীর গীতের এক এক অংশ মানিকচান্দের গীত, গোপীচান্দের গীত ও ময়নামতীর গীত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুখে মুখে গীত, এই যুগীরগীত তাহার প্রাচীন রূপরক্ষায় কতদূর সক্ষম হইয়াছে বলা কঠিন। সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের লোকের হস্তে লিপিবদ্ধ হইতে গিয়া এই গীতের প্রকৃত রূপ যে অনেক স্থলেই বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত প্রকৃত উচ্চারণ সহ মুদ্রিত গীতের কিছু পরিচয় প্রদানের চেষ্টা পাইব।

রাজা গোপীচান্দ সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত হইলে রাণীগণ তাঁহার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করায় রাণীগণের উক্তি :—

"কাঞ্চ কয় হগলো কতা কাঞ্চ আর পাইতায়
সে যামার সতে গেহলে তিরিক বাঘে খায়।
এমন দুষ্টা বনের বাঘ তিরি পুরুষ বাছিয়া বেড়ায়।
যে খানত বনের বাঘ খাইবে ধরিয়া।
নিশ্চয় করি পানের পাত মোক পালাইস ছাড়িয়া।

মেচ জাতির বর্ণন উপলক্ষে গীতে আছে :—

"এক ব্যাটা মেচ আছে তেমাই পাত্তর,
মনদশেক ধান শুকায় পিঠির উপর।
তার ছোট ভাই আছে বাঁও ঠেঙ্গত গোদ,
হাতি ঘোড়া চাগ যায় গোদের না পায় বোদ
তার ছোট বহিন আছে নাই তার কোঁক,
নও হাড়ি পন্তা খায় দশ হাড়ি তপত।
তার ছোট বহিন আছে নাম ডুমতানি,
আশী মন্দে পাড়িয়া কিনায় নাই চউকত পানি।

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় যুগীরগীতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তথাপি মুসলমান আধিপত্য কালের আরম্ভে যে ইহার কোন কোন অংশ রচিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যথা :—

দক্ষিণ হাতে আইল বাঙ্গাল নম্বা নম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুল্লুকত কৈল্যে কড়ি।

মুল্লুক আরবী শব্দ। মোল্‌ক অর্থে রাজ্য, দেশ। বাঙ্গাল অর্থে মুসলমান বুঝাইতেছে। তাহা লম্বা লম্বা দাড়ির জন্য নহে। মুসলমান সংশ্রবের প্রারম্ভে এতদঞ্চলে বাঙ্গাল বলিতে মুসলমান বুঝাইত। ক্রমশঃ দক্ষিণ হইতে আগত ব্যক্তিমাত্রই বাঙ্গাল নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। এস্থলে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। এতদঞ্চলের ভাষা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া অনেক শব্দ এখন আসামী ভাষার কল্যাণে তথায় গিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। তন্মধ্যে এই 'বাঙ্গাল' শব্দ একটা। এখনও আসামে বঙ্গদেশবাসিগণকে, বিশেষ ভাবে মুসলমানগণকে বাঙ্গাল বলা হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয়গণকে পর্যান্ত "বগা বঙ্গাল" অর্থাৎ সাদা বঙ্গাল বলা হয়।

এতদঞ্চলের "গোরক্ষনাথেরগীত" আর একটী অতি প্রাচীন গীত। ইহা মৈণীরগীত অপেক্ষা কোন অংশে অপ্রাচীন নহে। এই গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে "গোরক্ষনাথ" ব্যক্তি বিশেষের নাম না হইয়া বৌদ্ধ-যোগীগণের একটী উপাধি বলিয়াই মনে হয়। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে গোরক্ষনাথের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের এতদঞ্চলে গারোহিলের গোরক্ষনাথের পাহাড়, রঙ্গপুরের গোরক্ষমণ্ডপ, দিনাজপুরের গোরক্ষনাথের মন্দির ও গোরক্ষকুণ্ড, বগুড়ার গোরক্ষনাথের মন্দির যোগী গোরক্ষনাথের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। গোরক্ষনাথেরগীত রচনা কালে ধর্ম্মরূপী বুদ্ধের পূজা, মেচজাতির প্রভাব, রাজা জল্পেশ্বরের স্মৃতি এতদঞ্চলের জনসমাজে বিদ্যমান ছিল। পরে পাঁড়ুয়ার পঙ্কপীর গীতে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। ১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পাঁড়ুয়ার পঙ্কপীর গৌড়দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের গীতে আছে :—

"পুব্বঘাটে যায়া কন্যা দিল দরশন
সেও ঘাটে ছিন্নান করে ধর্ম্মনারায়ণ
উত্তর ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরশন
সেও ঘাটে ছিন্নান করে মেচপাড়ার মেচনী
পশ্চিম ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরশন
সেও ঘাটে ছিন্নান করে পাঁড়ুয়ার পঙ্কপীর
দক্ষিণ ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরশন
সেও ঘাটে ছিন্নান করে রাজা জল্পেশ্বর।

গোরক্ষনাথের জন্ম বিবরণ এইরূপ :—

"দে দে ধর্ম্মরাজঠাকুর পুত্রধনের বর
পুত্র ধনের বর না দিবু যদি কাটারিক করিম ধার।
কাঁচাকলা আতপ চাউল ধর্ম্মক বাড়ে দিল
যারে যা গোয়ালের নারী তোক সে দিলাম বর
তোমার ঘরে জন্ম নিবে গোরক্ষনাথ ঠাকুর।
একথা শুনিয়া কন্যা হরষিত হৈল
আপন মন্দির বলি গমন করিল।

ব্যাঘ্র দেবতা সোণারায়ের গীত ও যাগের গান এদেশীয় নিরক্ষর কবির মৌখিক রচনা। এই সমস্ত গীত অতি প্রাচীন কালে রচিত হইয়া থাকিলেও ইহাতে মুসলমানী ভাব ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে।

কামদেবের পূজা উপলক্ষে গীত।—যাগের গান কত প্রাচীন এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ আলোচনা হয় নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দশম-বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে ইহা স্মরণাতীত কালের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাগের গান দুই ভাগে বিভক্ত, আসল ও শুকল। আসল যাগে আদিরসের পূর্ণ অবতারণা। সোজা কথায় বলিতে ইহা কল্পনার অতীত অশ্লীল। এই কারণেই এতকাল লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। পরিষৎ পত্রিকায় কিছু যাগের গান মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা আসল নহে, শুকল। শুকল যাগ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। তাহাতে আসল যাগের ন্যায় খোলাখুলি কোন কথা নাই। ভাষার আবরণে অশ্লীল ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যাগের গীতের সমস্ত অংশ কখনই প্রাচীন নহে। এই গীতে স্থানীয় ইতিহাস প্রক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। তাহাতে পরশুরাম ও ইসমাইল গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা নীলাম্বর, নরনারায়ণ, পরীক্ষিত, মানসিংহ ও দিল্লীর বাদসাহের সংক্ষিপ্ত অথচ খাঁটী বিবরণ আছে। ১৮শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বিবরণ কোন যাগের গীতে আছে কি না অবগত নহি। দেবীসিংহের রঙ্গপুর-অত্যাচারই ইহার শেষ ঐতিহাসিক বিবরণ। ঐতিহাসিক বিবরণ ক্রমশঃ বিরচিত বলিয়া মনে হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত অংশ রচিত হইয়া থাকিলে এতটা শুদ্ধ হইতে পারিত না। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত এতদঞ্চলে যে কয়েক খণ্ড ইতিহাস পুঁথি আছে এই গীতের ঐতিহাসিক অংশ তদপেক্ষা বিশুদ্ধ।

যাগের গীতের রাসপূর্ণিমার চিত্র আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি :—

"আশিন গেইচে কাতির আইস্ক গেল আদেক দিন
আত্তিরকোণা একটু বাইড়্চে পাওয়া না যায় চিন
গাদলা নাই ঝড়ি নাই কাশিয়ার ফুল ফুটে,
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জনগুলা ইত্তি উত্তি ছুটে
নদীর জল টল টল দেখা যায় বালা,
মাথার উপর আকাশখানি খালি সব নীলা
রাস্তা ঘাটত কাদো নাই খালি পাঁয়ে যাও
আনিতে হৈবেনা জল ধুবার নাগে না পাঁও
শীত গিরিষ কিছুই নাই বড় মজার দিন
মাচি নাই মোশা নাই করে না পিন পিন
সাঁজের বেলায় পূবের দিকে ঝলক দিয়া চান্দ
আকাশের গায় উঠে ঐ কেমন তার ছান্দ
গাছের উপর পড়ে জোনাক রূপার গাছ করি
পাতের উপর জোনাকের খাটে না কারিকুরি
নদীর জল জোনাক পায়া করে ঝক ঝক
বালার চরে কাশিয়ার ফুল করে চক চক

জোনাকত ভরিয়া গেল সমস্ত পিথিমি
আকাশত তারাগুলা করে ঝিমি ঝিমি
সিংহাহারের ফুলে ফুলে ঢাকিয়া গেল বন
সুবাস পায়া ঘরে থাকির কারো না হয় মন।
সব ঠাঁই ছাড়ায় বাস ফুরফুরা বায়
লাখে লাখে ভোমরা উড়ে যুঁত ফুলের গায়
এমন সময় নদীর কূলে বাঁশতে দিল শান
গলে মালা চিকনকালা রাধা রাধা গান।"

এতদঞ্চলে কোচভাষার অস্তিত্ব ধরিয়া লইলে কথিত কোচরাজত্ব কালের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান কতদূর ফলপ্রদ হইবে বলা কঠিন। এণ্ডারসন্ সাহেবের মতে পূর্ববঙ্গ ও আসামবাসীর পূর্ব্বপুরুষগণ কোচ বা বদোমূলক ভাষায় কথাবার্তা বলিত ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বি, এইচ, হডসন্ সাহেব প্রণীত "Essay the first on the Koch, Bodo and Dhimal tribes" নামক পুস্তকে কোচ, বদো ও ধিমাল ভাষার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "I must begin with the remark that I do not propose to say anything of the Koch Gramar, which is wholly corrupt Bengali. The reason which have indu ed me to give the Koch vocabulary are stated elsewhere" (P.105) অর্থাৎ "কোচব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাই না। উহা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত বাঙ্গালা ভাষা। কোচভাষার শব্দকোষ লিখিবার কারণ অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত শব্দকোষের মধ্যে কাগজ, তমশুক, নালিস, জওয়াব, তজবীজ প্রভৃতি আরবী ও পারসী এবং জ্যোতিষ, পণ্ডিত, মন্ত্রী, ধর্ম্মাধিকারী, গোঁসাই প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোচ, বদো ও ধিমাল ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে এরূপ শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য। অনুসন্ধান করিলে তাহারও ভিত্তি স্থির থাকে না। হডসন্ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্যের পরেই লিখিয়াছেন যে "I have failed to get at the original and true speech of this race, whose ancient tongue is fast merging in Bengali" অর্থাৎ এই জাতির মূল এবং প্রকৃত ভাষা সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। ইহাদের প্রাচীন ভাষা দ্রুত গতিতে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইতেছে।

উন্নত ভাষার চাপে অনুন্নত ভাষার বিলোপ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কামরূপের ঐতিহাসিক যুগে তাহার প্রমাণাভাব দৃষ্ট হয়। কথিত কোচরাজত্বের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে মুসলমান সংশ্রবের সূত্রপাত। মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সম্মুখে শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। মুসলমান শাসন যন্ত্র পরিচালনের নিমিত্ত লেখাপড়ার বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। লিখিত পঠিতের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচারের ঐসলামিক প্রথা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে কণামাত্র ত্রুটি হয় নাই। তাহার প্রভাব ক্রমশঃ হিন্দু সমাজেও কার্য্যকর হইয়াছিল। রাজ্যকার্য্য ব্যতীত জ্ঞানালোচনার প্রয়োজনেও লোকে লেখাপড়া শিক্ষা করিত। এই সময় বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতীত মুসলমানী বাঙ্গালা অর্থাৎ আরবী ও পারসী বহুল বাঙ্গালা গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (২৩ ভাঃ ৩য় সং) ৮৩২৫খানা গ্রন্থের সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৪৪৬খানা বটতলার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি। গ্রন্থকারগণের মধ্যে হিন্দুরও অভাব ছিল না। অন্যদিকে দলে দলে লোক ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব সমাজের পার্শ্বেই নব সমাজ স্থাপন করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর অনুকরণে সত্যপীর, গাজী, একদিল, সাহ সোলতান প্রভৃতি মোসলেম সাধুগণের চরিত রচিত হইয়া এতদঞ্চলে পীরের গীত প্রচার হইয়াছিল। ইহা ইসলাম শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও গীত হইতে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু মুসলমান বলিয়া তাহাতে কোন প্রভেদ ছিল না। বরং অনেক স্থলে হিন্দু গায়ক দৃষ্ট হইত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গৌড়ের হিন্দু রাজা গণেশ কর্ত্তৃক একবার ধর্ম্মসমন্বয়েরও চেষ্টা হইয়াছিল। যাহার ফলে আজ "হিন্দুর নারায়ণ আমি মোসলমানের পীর, দুই কুলে লই সেবা হইয়া জাহির" সত্যপীরের গীত অথবা পাঁচালীতে শুনিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান সংশ্রবের ফলে প্রাচীন কামরূপের ভাষায় যে সমস্ত আরবী পারসী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তাহার পরিমাণ ন্যূন নহে। তাহার পরিচয় প্রদান অতি সহজ। এত সংশ্রব সত্ত্বেও কথিত ভাষায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহারে হিন্দুরা তেমন অভ্যস্ত নহেন। মুসলমানের নিত্য ব্যবহার্য্য "কাল্লা," "আনাজ," "চেরাগ," "গোস্ত," "নাস্তা," "খানকাঘর," "জবহ্," "জ্যাকৎ," প্রভৃতি শব্দের স্থলে হিন্দুর মুখে "মাথা," "তরকারী," "প্রদীপ," "মাংস," "জলপান," "ভাঁড়ারঘর," "কাটা," "নিমন্ত্রণ" শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানের "নানা," "চাচা," "খালু"কে হিন্দুরা "আজু," "কাকা," "মাউসা" বলিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বহুশব্দে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উচ্চারণ-বৈষম্য শুনিতে পাওয়া যায়। অল্প কথায় বলিতে হইলে শত শত বৎসর ব্যাপী মুসলমানী ভাষা ও চালচলনের এক প্রবল বন্যা বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। যাহার ফলে আজ অর্দ্ধেকের অধিক মুসলমান। কিন্তু এত সত্বেও বঙ্গভূমি আরব, পারস্য, অথবা তুর্কীস্থানে পরিণত হয় নাই। বরং আরব, পারস্য ও তুর্কীস্থানবাসীই এখানে আসিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে।

এতদঞ্চলের তেলেঙ্গা, বাদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি কতকাল ধরিয়া এদেশে বাস করিতেছে তাহা বলিবার উপায় নাই। ইহাদের নিজের এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা আছে; তাহা আপনাদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। নিম্ন আসামে স্থানে স্থানে কাছাড়ী জাতির বাস দৃষ্ট হয়। তাহারা প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আসামী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। অথচ তাহাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। লিখিত পঠিতের বহুল প্রচার দ্বারাই উন্নতভাষা আত্মপ্রকাশ করিতে ও অনুন্নত ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। কেবল কথিতভাষার সাহায্যে আরবী, পারসী ও ইংরেজী শব্দগুলি ভারতে এমনভাবে শিকড় গাড়িতে সক্ষম হইত না। আমাদের নিজের কথাই ধরা যাউক না কেন, বিগত ৫০ বৎসরে কোচবিহার রাজ্যের ভাষায় যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালীর কথোপকথনের ফল নহে। মদনমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের লিখিত পুস্তক গৃহে গৃহে পঠিত না হইলে ইহা শত বৎসরেও সম্ভব হইত না।

মোসলমান সংশ্রবের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রভাব কালের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ৭ম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজক Hiuen Tsiang (হিউয়েন সাঙ্) এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত Si-yu-ki'র প্রফেসর Samuel Beal অনুবাদিত "Buddhist Records of the western world" গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"The letters of their alphabet were arranged by Bramhadeva, and their forms have been handed down from the first till now. They are forty-seven in number, and are combined so as to form words according to the objects and according to circumstances (of time or place) : there are other forms (inflexions) used. This alphabet has spread in different

directions and formed divers branches, according to circumstances ; therefore there have been slight modifications in the sounds of the words (spoken language) ; but in its great features there has been no change. Middle India preserves the original character of the language in its integrity. Here the pronunciation is soft and agreeable, and like the language of the Devas. The pronunciation of the words is clear and pure, and fit as a modle for all men. The people of the frontiers have contracted several erroneous mods of pronunciation : for according to the licentious habits of the people, so also will be the corrupt nature of their language."

অর্থাৎ তাহাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলি ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত অক্ষরের আকার পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বর্ণমালার সংখ্যা ৪৭টি। তাৎকালিক আবশ্যক ও অবস্থানুযায়ী (স্থান ও সময়ের) অক্ষরগুলি সংযোজিত হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দ রূপান্তরেও (শব্দ বা ধাতুর বিভক্তিকরণ) ব্যবহৃত হয়। সময় ও অবস্থানুসারে এই বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বিস্তৃত শাখায় পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য শব্দের (কথিত ভাষার) উচ্চারণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার বৃহদঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মধ্যভারত, ভাষার আদি অক্ষরগুলি সম্পূর্ণভাবে ও সর্ব্বতোপ্রকারে রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানের উচ্চারণ কোমল ও শ্রুতিমধুর এবং দেবভাষার অনুরূপ। শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট এবং শুদ্ধ ও মনুষ্য মাত্রেরই গ্রহণপযোগী, উহা আদর্শ-স্বরূপ। সীমান্তপ্রদেশবাসীরা কতকগুলি ভ্রমাত্মক উচ্চারণপদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু লোকের মন্দ অভ্যাসানুযায়ী তাহাদের ভাষাও মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগই middle India নামে অভিহিত হইয়াছে। কান্যকুব্জের অধিবাসীগণের সম্পর্কে লিখিত আছে :— "They apply themselves much to learning, and in their travels are very much given to discussion (on religious subjects). (The fame of) their pure language is far spread" P. 207. অর্থাৎ তাহারা অধিক মাত্রায় জ্ঞানার্জ্জন করে এবং ভ্রমণ কালে (ধর্ম্মবিষয়ক) আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া থাকে। তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। কামরূপের অধিবাসীগণের প্রসঙ্গে পরিব্রাজক বলিয়াছেন ;—"Their language diffirs a little from that of Mid-India" P. 196 অর্থাৎ তাহাদের ও মধ্যভারতের ভাষার মধ্যে পার্থক্য সামান্য।*

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে ৭ম শতাব্দীর উত্তর ভারতের ভাষার মোটামুটি অবস্থা আমরা অবগত হইতেছি। ঐ সময় মধ্যভারতের ভাষার উচ্চারণ দেবভাষার অনুরূপ ছিল। দেব ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যতীত আর একটি ভাষা এই সময় উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, যাহা উত্তর ভারতের তাৎকালিক আদর্শ ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। কামরূপের ভাষা সেই ভাষার প্রায় অনুরূপ ছিল। কেবল দূর ও প্রান্ত দেশবাসীর ভাষা বলিয়া উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য ছিল। হিউয়েন সাং এর আগমনের পরে কামরূপে বৌদ্ধ মতের রীতিমত প্রচার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে কয়েক শতাব্দী কাল বৌদ্ধ পাল রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালশাসন কালে এতদঞ্চলের ভাষা ও সমাজদেহে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। কথিত আছে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের জননী কুটিলাক্ষরের কামরূপে প্রচার হইয়াছিল।

* "Their speach diffired a little from that of Mid-India" Translated by Thomas Watters II P. P. 185, 186.

জন বিম্‌স সাহেবের মতে বঙ্গদেশে পশ্চিম ভারতের অনেক পরে মুসলমান সংশ্রব আরম্ভ হওয়ায়, এই সুযোগে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান সংশ্রবের আরম্ভ ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষার অবস্থা আলোচনা করিলে এই মত গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

ডাঃ গ্রিয়ারসন্ প্রমুখ ইয়োরোপীয় ও তাঁহাদের অনুসরণকারী দুই একজন বাঙ্গালী কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দ নির্ব্বচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোন অঞ্চলের কথিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করিয়া কেবল শব্দ সংগ্রহ দ্বারা তাহার পৃথকত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস কখনও নিরাপদ বিবেচিত হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী সম্প্রদায় ও স্থান সমূহের কথিত ভাষা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আবশ্যক। ১৫শ ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া একজন লেখক কোচ ভাষার শব্দ নির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে এতদঞ্চলের ঝিং, চাকুলা, ডেকু, ত্যারাংঝাটাং, আনু, ছ্যাকা, প্রভৃতি শব্দ কোচ ভাষার। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে এই সমস্ত শব্দ রূপান্তরিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। যথা—ঝিং—নিঝুম, ডেকু—দাঁড়া, ত্যারাংঝাটাং—তেড়াবেড়া, চাকুলা—গুলা, আনুবানু—বোনাই, ছ্যাকা—ছাঁকা।

এতদঞ্চলে "বাহে" বলিয়া একটী সম্বোধন আছে। সাধারণতঃ সম্ভ্রমার্থেই তাহা ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাসীগণ এই উপলক্ষে এতদঞ্চল "বাহেরদেশ" ও অধিবাসীগণকে "বাহের" বলিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ইঁহারা "বাহে" শব্দের উৎপত্তি বা মূল অবগত থাকিলে অথবা অবগত হইবার চেষ্টা করিলে এই সংস্কৃত ধাতুজাত শব্দটীর অসম্মান করিতেন না। "বাপুহে" অথবা "বাবাহে" সম্বোধনের মধ্যাক্ষর বিলুপ্ত হইয়াই এই "বাহে" সম্বোধনের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষাজগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে "বাপা" ও "বাপু" সম্বোধন অজানিত নহে। ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

"সোণা রূপা নয় বাপা এ বেঙ্গা পিতল
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল।"

বাঙ্গালীর গো, লো, রে, হে, বাপুড়ী প্রভৃতি সম্বোধনের ব্যবহার অন্ততঃপক্ষে সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও ছিল, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে গো, রে, হে সম্বোধনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কোন শব্দ অবোধ্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব হইলে ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তাহা উপেক্ষিত না হইয়া বরং আলোচনার অন্তর্গত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞানের অভাবে "একদেশের বুলি, আর দেশের গালি"তে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে,—ঢাকা অঞ্চলে "মাইয়া" বলিতে কন্যা বুঝায়, কোচবিহার ও মানভূমে স্ত্রীকে "মাইয়া" বলে, "বৌ" কথাটি বধূ শব্দের অপভ্রংশ,—অর্থ—ভার্য্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদি। দক্ষিণ বঙ্গে "রামের বৌ" বলিলে অনেক স্থলেই "রামের স্ত্রী" মনে করা হয়। এতদঞ্চলে বিশেষভাবে "রামের পুত্র বধূ"ই বুঝাইয়া থাকে। কোচবিহার অঞ্চলে Idiom অর্থাৎ রীতি লইয়া পরিষৎ পত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলেই অর্থ যথোচিত হয় নাই। ডাঃ গ্রিয়ারসনের গ্রন্থেও Idiom এর অর্থে প্রমাদ দৃষ্ট হয়। তিনি "বাউদিয়া" অর্থে "Bereaved lover" করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ ভবঘুরে। "ঠেলা" অর্থে Threatening, "ঘোপা" অর্থে—Sheltered nook ইত্যাদি অনেক শব্দ ও তাহার অপ্রকৃত অর্থ তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। "ঠেলা" শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাতে গালমন্দ প্রদান ও বুঝায়। অভিধানে "ঠেলন"

দেশজ শব্দ; অর্থ হেলন, অমান্যকরণ, দূরীকরণ ইত্যাদি। কোন নদীর সংলগ্ন স্বল্প বিস্তৃত স্রোতহীন জলভাগ এতদঞ্চলে "ঘোপা" নামে অভিহিত।

এণ্ডারসন্ সাহেব "কোচাড়" ও "কাছাড়" একই শব্দ মনে করিয়াছেন। আধুনিক কোষকারগণ সংস্কৃত "কচ্চরম্" শব্দ হইতে "কাচড়া" শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। অর্থ মলিনম্ কুৎসিতম্। কিছুকাল পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণের নিকট এতদঞ্চল "কোচাড়দেশ" বলিয়া পরিচিত ছিল। "কোচাড়" শব্দটি কোচের "আড়া" অর্থাৎ বসতি হইতে উৎপন্ন কি না বিবেচ্য। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে "আড়া" শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলেও "আড়া" শব্দটি সুপরিচিত। অর্থ—গুচ্ছ বা ঝাড়। ইহা "আড্ডা" শব্দের রূপান্তরও হইতে পারে। "কাছাড়" শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। অল্প বর্ষিত শস্য আবাদ যোগ্য ভূমি "কাছাড়" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এইরূপে স্থানের অধিবাসী বলিয়াই আসামের সম্প্রদায় বিশেষ "কাছাড়ী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচবিহার অঞ্চলে নদীর পাড়ের নাম "কাছাড়"। "কাছাড়" সংস্কৃত "কচ্ছঃ" শব্দজাত। কচ্ছঃ শব্দের অর্থ সিন্ধুনাং স[illegible] প্রান্তভাগঃ, জলাশয় প্রান্তদেশঃ, নদীপর্ব্বতাদি সমীপম্। (শব্দকল্পদ্রুমঃ) ব্যবহারেও মনুষ্য কচ্ছ, নদীকচ্ছ প্রাপ্ত হওয়া যায় (পালি প্রঃ ৭৭ পৃঃ)।

সাদৃশ্য দর্শনে দুইটা শব্দ এক মনে করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। এই এক কোচবিহারের সম্পর্কেই তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ এতদঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের "নস্য" উপাধির উল্লেখ করিতেছি। জানি না কে কখন সংস্কৃত "নষ্ট" শব্দ হইতে এই "নস্য" উপাধির সৃষ্টি প্রচার করিয়াছিলেন। [illegible] নষ্ট হওয়ার "নষ্ট" অপভ্রংশে "নস্য" উপাধি মুসলমানেরা ধারণ করিয়া থাকেন, "নস্য" উপাধির [illegible] অনেক [illegible] পাওয়া যায়। ইহা [illegible] বিবেচনায় অনেক মুসলমানই এখন এই উপাধি [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] মুসলমানদের সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর নাম আছে। ১ম বিশুদ্ধ আরবী যথা—[illegible], [illegible]। ২য় মিশ্র আরবী যথা—[illegible] উল্যা, হর মহম্মদ। ৩য় স্থানীয় নাম [illegible] কালটু, [illegible] ইত্যাদি। [illegible] ৩য় শ্রেণীর নাম মুসলমান পরিচায়ক। স্থানীয় নাম অর্থাৎ কালটু, [illegible] হিন্দু মুসলমান উভয় [illegible] পারে বলিয়া [illegible] মুসলমান পরিচায়ক "নস্য" উপাধি যুক্ত হয়। [illegible] অভাবে [illegible] বাঁ[illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে। "নস্য" নষ্ট শব্দজাত হইলে তদ্দ্বারা নষ্টধর্ম্মা অর্থাৎ পতিত বুঝাইতে পারে, মুসলমান বুঝাইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এতদঞ্চলের সেখ ও বাধাবর (বেদে) শ্রেণীর মধ্যে [illegible] লোক দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে "নষ্ট" বা "নস্য" "উপাধি" ধারণের প্রথা নাই। একটা বৃহৎ [illegible] অধিক [illegible] যাহাদের পশ্চাতে প্রবল রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তাহারা এইরূপ একটী অর্থহীন অধিকন্তু অপমানকর উপাধি বহনে গৌরবে সম্মত হইয়াছিল, বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। নবধর্ম্মীকে সাদরে ও সসম্মানে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করাই ইসলামের শিক্ষা। [illegible] তাহা হইয়াও থাকে। ইতিহাসে দৃষ্ট হয় গৌড়ে পাঠান শাসন কালে "[illegible]" নামে এক শ্রেণীর মুসলমান ছিল। নূতন মুসলমানকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। গয়শাল বা গাশিল আরবী শব্দ; অর্থ—ধৌত। আরবীতে "নস্থা" ও "নসা" দুইটী শব্দ আছে। "নূ", "সিন", "ওয়াও" অক্ষর যোগে "নস্থা" ও "নূ", "সিন", "আলেফ" অক্ষর যোগে "নসা" গঠিত হইয়াছে। উভয় শব্দই "এনসা" ধাতু হইতে উৎপন্ন। শব্দ দুইটার অর্থ প্রায় একই যথা—জন্মগ্রহণ করা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, নূতন জন্মগ্রহণ করা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দের রূপ নির্ণয়ে যাঁহারা শ্রম স্বীকার করিতেছেন তাঁহারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত শব্দগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত (তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ) এই উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই উদ্যম যতই কেন প্রশংসনীয় হউক না নির্ব্বাচন কখনও শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে অধিকাংশ দেশজ শব্দের মধ্যে সংস্কৃতের গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। মানবজাতি পরামর্শ করিয়া ভাষা সৃষ্টি করে নাই। স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার ধাতু নির্ণয় কতকালে সম্পূর্ণ হইবে কে বলিতে পারে? ভাষাতত্ত্ববিদ্ মেজর কণ্ডর এমন ৭০টী ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত ভাষার মধ্যে দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত, (শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি) ভাষার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত পণ্ডিতী সমস্যার প্রতি আমাদের "ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া" থাকা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই অবস্থায় কোন বিশেষ ভাষার মাপকাটি লইয়া বঙ্গের ভাষাক্ষেত্র পরিমাপ করিবার যোগ্যতা নেহাত্ত সাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কোন সম্প্রদায় বিশেষের ভাষা বলিয়া বাঙ্গালার কোন অশ্রুতপূর্ব্ব প্রাদেশিক শব্দ পরিচিত করিতে অগ্রসর হওয়া তদপেক্ষা কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রতিবেশী ভাষার শব্দ সমাগম অস্বীকৃত হইতে পারে না। বরং তাহার সম্ভাবনাই অধিক। পূর্ব্ব ও উত্তরে গারো, ভোট, মেচ, নেপালী প্রভৃতি জাতিগুলি এতদঞ্চলের ঘনিষ্ট প্রতিবেশী। অজানিত কাল হইতে বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত এতদঞ্চলবাসীগণের সহিত তাহাদের ব্যবসায়ের আদান প্রদান ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্যবসায়ী ভুটীয়া জাতির কর্ম্মক্ষেত্র কামরূপ অতিক্রম করিয়া গৌড় ও মগধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সমসাময়িক গ্রন্থকারগণের পুস্তকে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির সহিত বঙ্গদেশবাসীর সংস্রবের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সেই সংস্রবের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষার গেজেট, গীর্জ্জা, পাদ্রি, গ্যাস, পিস্তল প্রভৃতি শব্দ এখন ক্রমশঃ বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীন কালে শক, হূণ, যুয়েচি, পারসীয়, গ্রীক ও মোঙ্গল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়া ভারতবাসী হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভাষাহীন অবস্থায় এদেশে আগমন করে নাই। এতদঞ্চলবাসীগণ অথবা কোচ নামে অভিহিত সম্প্রদায় এদেশে কোন আগন্তুক জাতি হইলে ইহাদেরও একটী ভাষা ছিল মনে করিতে হইবে। ভাষার আলোচনায় জাতিতত্ত্বের (Ethnology) আলোচনা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর ভাষার সাহায্যে জাতি নির্ণয় শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। ভাষা সম্বন্ধীয় এই আলোচনায় জাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য সত্ত্বেও সংক্ষিপ্তভাবে এবং আপনাদের ধৈর্য্যের উপর যে অমার্জ্জনীয় অত্যাচার করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া, নিরস্ত হইলাম।*

শ্রীআমানতউল্যা আহম্মদ।

---

* "কামরূপের ইতিহাসের একাংশ" প্রবন্ধে ("সাহিত্য" ১৩২৫ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা) এই জাতি সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

কাঁদে গো পরাণ কাঁদে।

—ঃ*ঃ—

কাঁদে গো পরাণ কাঁদে
　　না জানি কিসের ছলে,
আঁখি জল ছাপিয়ে উঠে
　　নিশিদিন হিয়ার তলে;
সাঁঝের এ আঁধার আলো
আমার এ বুক ভরালো,
বেদনার পরশ দিয়ে
　　ঝর ঝর আঁখির জলে।
আঁধারের বুকের মাঝে
আমার কাঁদন বাজে,
আমারি কাঁদন-ধারা
　　গগনে বয়ে চলে।
ও আমার নিঠুর প্রিয়!
দিয়ো গো আঘাত দিয়ো,—
সে যে মোর মাথার মণি,
　　সে যে মোর মালা গলে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

শ্রীক্ষেত্র।

—ঃ*ঃ—

এবার যখন গ্রীষ্মাবকাশে পুরী যাওয়া স্থির হইল তখন আর আমার উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না, কারণ ইহার পূর্ব্বে আরো দুইবার পুরীর সমুদ্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপের মাঝে হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তরে কেবলি সমুদ্রের চিরসুখময় সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত হইয়া আমায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়েই পুরীতে লোকসমাগমের আধিক্য, সেজন্য বহু চেষ্টার পর একখানি বাড়ী পাওয়া গেল কিন্তু সেই সঙ্গে বহু আত্মীয়-স্বজনের ভয়প্রদর্শন ও বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যাওয়া স্থির করিলাম কারণ কিছু দিনের জন্য সংসারের পুরাতন ভাবনাচিন্তা বিস্মৃত হইতে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। যাত্রা করা

গেল। গ্রীষ্মাধিক্যে পথে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা বহুদিন স্মরণ থাকিবে। কলিকাতায় এক রাত্রিও না কাটাইয়া সেই সন্ধ্যায় আবার আমরা চারজন যাত্রী সপরিবারে বহু মালপত্র লইয়া পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। কোনরূপে অর্দ্ধ নিদ্রায় রাত্রি যাপন করিবার পর যখন প্রভাতে পুরী আসিয়া পৌছিলাম, দেখিলাম আমাদের ভৃত্যেরা অথবা পরিচিত কেহই ষ্টেশনে আসে নাই, তাই কোনরূপে আপনারাই সকল বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতেই দুইজন পাণ্ডা আমাদের অনুসরণ করিল এবং অন্য একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর তাহাদের মুখে শুনিলাম যে তাহারাই আমার শ্বশুরবংশের পাণ্ডা অর্থাৎ "বিহার মহারাজের পাণ্ডা!" পথ হইতেই সমুদ্র দর্শন করিলাম, মনে হইল কত দিনের পুরতান বন্ধুকে দেখিলাম এবং বহুদিন পরে বন্ধুদর্শনে হৃদয় যেরূপ আলোড়িত হয় সমুদ্রের হৃদয়ও সেইরূপ ঘন ঘন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, নৃত্য করিতেছে। মনে হইল যেবার প্রথম সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলাম, দেখিয়া দেখিয়া মনে যে উচ্চ ভাবের উদয় হইয়াছিল, যে উদার মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছিলাম, যেরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম—সমুদ্র সেইরূপই আছে! সেই গর্জ্জন, সেই নর্ত্তন, সেই তরঙ্গের পর তরঙ্গমালা, সেই ফেণার অজস্র-প্রকাশ!—কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র মানব, সংসারে আবদ্ধ জীব, জীবনের তুচ্ছ আঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জীবন-স্রোতে কি পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে।

যাহা হউক আমাদের বাড়ীটি সমুদ্রের খুব নিকটে; অবিরাম জলকল্লোল শুনা যায় এবং প্রতি কক্ষ হইতেই সমুদ্রের অবাধ বিস্তৃতির অতুলনীয় শোভা দেখা যায়, সমুদ্রের নির্ম্মল মুক্ত বাতাস উপভোগ করা যায়। এই যে সমুদ্র—ইহার বর্ণনা কি ভাষায় সম্ভবে? শব্দের আধার এই সমুদ্র, ইহার নিকট সকল ভাষাই যে মৌন মূক হইয়া যায়। তথাপি জগতে এমন ভাষা বোধ হয় নাই, এমন সাহিত্য বোধ হয় নাই—যাহাতে সমুদ্রের বর্ণনা নাই; মনে পড়িল,—

"হে দুর্নিবার মুক্ত উদার
হে পূর্ণ অক্ষুরন্ত
চেয়ে দেখি ঐ বিপুল উরসে
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন,
কল্পলোকের প্রান্ত।
খেলিছ এমনি লীলাউদ্বেল
অমলিন মহা দীপ্ত
কত না ভাবুক তব পাশে আসি
এমনি হরষে আলোড়ি উছাসি
সঁপেছেন তোমা অনঘ-অর্ঘ্য
বিভোর অপরিতৃপ্ত!

কত জন কত ভাবে কত কথাবিন্যাসে ইহাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু যে এক বার স্বচক্ষে দেখিয়াছে সে বুঝিয়াছে, সব চেষ্টাই কতদূর ব্যর্থ! কোন চিত্রকরের রঙ্গীণ রেখাপাত, কোন কবির কাব্যসৃষ্টি ইহাকে কোন দিন প্রকাশ করিতে পারিবে না, এ সমুদ্র এমনি প্রাণময় অনন্তের রূপ, এমনি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর!

এ বাড়ী হইতে পুরীর শ্মশান ঘাট দেখা যায় ; যেমন গম্ভীর তেমনি সুন্দর দৃশ্য, ইহা এক দিকে যেরূপ ভয়াবহ অপর দিকে তেমনি প্রাণস্পর্শী ! যেদিন প্রথম দেখিলাম—রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে, জনশূন্য সমুদ্র-সৈকতে চিতার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার রক্তিমাভা সমুদ্রের ফেণার উপর পড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া তটের উপর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ! ঐ ত জীবনের সমাপ্তি, ঐ অনন্ত আকাশের তলায় অনন্ত সমুদ্রের ধারে এই নশ্বর মানব জীবনের অবসান ; এক মুহূর্ত্তের মাঝে প্রাণে কি অনন্তের ছায়া পড়িল। মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার এই সংমিশ্রণ, ইহাতে বিভীষিকা কোথায় ? পরম ভয়ানক আজ পরম সুন্দর পরম মধুর হইয়া প্রতিভাত হইল। এই শ্মশান ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে ইহার অধিকারী যে বিগ্রহ আছেন তাঁহার নাম 'মশান মহাবীর', ইনি শ্মশানবাসী ভূতপ্রেতগণের প্রহরী। শুনিতে পাওয়া যায় বহুদিন পূর্ব্বে পুরীর এ অঞ্চলে জনমানবের বাস ছিল না, এমন কি দ্বিপ্রহরে লোক আসিতে ভয়বিহ্বল হইত, কিন্তু এখন এত লোকালয় হইয়াছে যে ক্রয় করিতে চাহিলেও জমি পাওয়া দুষ্কর !

সমুদ্রে স্নানের কথা অনেকে হয় ত অনেকভাবে লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই কিন্তু এবার সমুদ্রস্নানে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লিখিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পুরীতে যেমন সমুদ্রে স্নান করিবার সুবিধা—তেমনি আনন্দ। এখানকার তটভূমি সমতল, কোনখানে চোরা বালি নাই, কোমরজল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিলেও ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাণ্ড বড় ঢেউগুলি যখন ফেণার মুকুট পরিয়া তটাভিমুখে ছুটিয়া আসে তখন যুগপৎ হৃৎকম্প ও হর্ষ উপস্থিত হয়। আবার ঢেউটি মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেলেই আর কোন ভয় নাই। তবে পূর্ণিমার সময়ে সমুদ্রের স্রোতের যেরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হয় তাহাতে একা স্নান করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া, ফেণায় ফেণায় আঘাত লাগিয়া, ফোয়ারার মত ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া সহস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। পুরীতে এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম 'নুলিয়া', ইহারাই যাত্রীদিগকে সমুদ্রে স্নান করায়। ইহারা এবং ইহাদিগের সন্তানেরা জলজন্তুর মত সন্তরণপটু, অক্লেশে বড় বড় ঢেউগুলির ভিতর দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সন্তরণ করিয়া যায় ও ঢেউয়ের মাঝে পয়সা নিক্ষেপ করিলে নানারূপ কৌশলে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে পারিতোষিক আদায় করে।

এখানকার মৎস্যধরণও বিচিত্র, একটি করিয়া বড় ঢেউ আসিলেই মৎস্যজীবি বালকগণ জাল লইয়া ছুটিয়া গিয়া জালের দুই পার্শ্বের খুঁটি বালির ভিতর চাপিয়া ধরে, আবার ঢেউ চলিয়া গেলেই তীরে জাল টানিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন আরও দুই প্রকারের মাছ ধরা দেখিয়াছি। প্রত্যূষে মৎস্যজীবিগণ নৌকা বা ভেলায় ঢেউয়ের সীমা পার হইয়া বহুদূরে চলিয়া যায়, তার পর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এক একটি বড় ঢেউয়ের আঘাতে ঐ নৌকা উল্টাইয়া গিয়া আরোহীগণ জলে পড়িয়া যায় আবার তৎক্ষণাৎ দ্রুত কৌশলে দুইজন দুইদিকে লাফাইয়া উঠিয়া বসে, ইহা দেখিতে বড়ই প্রীতিকর। আবার রজ্জুগাত্রে বঁড়শি লাগাইয়া মাছ ধরিতেও দেখিয়াছি, ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসের মাঝে প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ধরিয়া থাকে, তারপর মাছ পড়িয়াছে বুঝিলেই টানিয়া তোলে। সন্ধ্যার সময়ে সমুদ্রের ধারে যাত্রীদিগের জনতা, তাহাও বেশ দর্শনযোগ্য ! কেহবা বালুকা লইয়া ঘর বাঁধিতেছে কেহবা ঝিনুক কুড়াইতেছে, কেহবা গল্পগুজব করিতেছে, কেহবা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া পূজায় বসিয়াছে, কেহবা ঢেউয়ের সহিত খেলা করিতেছে। ছোট ছোট শিশুগুলির আনন্দের শেষ নাই, তাহারা সমুদ্রের মুক্ত বাতাসের মাঝে ছুটিয়া খেলিয়া ফেণার সহিত দৌড়িয়া হাসিয়া বালির উপর লুটাপুটি করিতেছে !

আর একটি জিনিষ দেখিয়া বড় আনন্দ হয়—সে বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাধীনভাবে বিচরণ। চির অবগুণ্ঠনবতী অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলারা এখানে স্বেচ্ছায় বেড়াইতেছেন, সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতেছেন, শোভা দেখিতেছেন। তীর্থস্থানের এই অবাধ স্বাধীনতাটুকু আমার চক্ষে বড়ই মধুর বোধ হইল!

পুরীতে এত মঠ বিদ্যমান যে সবগুলির সংখ্যা নিরূপণ করাই একরূপ অসম্ভব। রামানুজ ও চৈতন্যপন্থী-সম্প্রদায়ের ৭৫২টি মঠ আছে। কেবলমাত্র তার যে কয়টি উহার মাঝে প্রধান এবং আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার মাঝে জটিয়া-বাবার আশ্রম (অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ) সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর! এই মঠটি নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ফলফুলের বৃক্ষাচ্ছাদিত ছায়াসুশীতল নির্জ্জন স্থানটিতে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাধিটির সম্মুখে তাঁহার বসিবার চৌকি ও তাহার পার্শ্বে তাঁহার একটি বৃহৎ ছবি রক্ষিত। একটি জিনিষ দেখিয়া মনে বড়ই আঘাত পাইলাম তাঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিবার সূত্রপাত হইতেছে, তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। যিনি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান কালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে তাঁহার ভক্তদিগকর্ত্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অবতার-বাদের সূত্রপাত হইতেছে তাঁহাকেই আজ তাঁহার মৃত্যুর পর অবতার রূপে পূজা করা হইতেছে ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? পুরীতে সর্ব্বস্থানে এই অবতারবাদ এতদূর প্রবল এতদূর বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে যে প্রকৃত ধর্ম্ম বিরূপ হইয়া গিয়াছে, ভক্তি গোঁড়ামিতে পরিণত হইয়া প্রকৃত সত্যকে বিদ্রূপ করিতেছে!

যাহা হউক এখানে তিনবার ভোগ হয়। সকালে চা, মধ্যে ফলমূল, অপরাহ্নে মহাপ্রসাদ। এই খাদ্যই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার সমাধির নিকটে তাঁহার রচিত কয়েকটী গ্রন্থ মহাভারত ও গ্রন্থসাহেব পঠিত হয়। এই আশ্রমে তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মিত আছে, এবং এই আশ্রমের এক সীমায় একটি অত্যন্ত পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদ্যমান, ইহার নিম্নে চৈতন্যদেব আসিয়া উপবেশন করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই মঠ হইতে প্রতিদিন একশত ভিক্ষুককে অন্ন দান করা হয়। এইখানে প্রথম ভূর্জ্জ বৃক্ষ দেখিলাম।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মঠ,—

এখানে শঙ্করাচার্য্যের একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত যৌবনকালের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এই মঠের অধিকারী ন্যায় দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া শুনা যায়। এখানে প্রতিদিন বেদ পঠিত হয়।

নানকপন্থী মঠ,—

এখানে শিখ কর্ত্তৃক নানকের চিত্র পূজিত হয়। এই মঠে শিখদিগের বাক্যালাপ অন্যান্য মঠের পাণ্ডাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে ভদ্রোচিত। এক পার্শ্বে জগন্নাথের চিত্র ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। এখানে শিখদিগের গ্রন্থসাহেব পঠিত হয়; এই মঠে একটি 'ভাসুর-ভাদ্রবধূ' নামক কূপ আছে, ইহা এমনভাবে নির্ম্মিত যে দুই ব্যক্তি একই সময়ে জল তুলিলে পরস্পরকে দেখিতে পাইবে না, একজন উপর হইতে জল তুলিবে অপর জন মৃত্তিকার নিম্নে যে সোপান আছে সেখান হইতে জল লইবে।

রাধাকান্তের মঠ—

এখানে তাম্রফলকের উপর চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার ব্যবহৃত কন্থার ছিন্নাংশ ও একটি কমণ্ডলু অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ইহা ভিন্ন যে খড়ম আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে।

অমর মঠ,—

এখানে রঘুনাথ মূর্ত্তি রক্ষিত আছে, ইহা অন্যান্য মঠ অপেক্ষা বৃহৎ, ইহার অধিকারী মোহন্ত অত্যন্ত ধনী ইঁহার ঘোড়া জুড়িগাড়ী ইত্যাদি আছে।

কবীর মঠ,—

এ স্থানে মহাত্মা কবীরের কাষ্ঠপাদুকা ও জপমালা আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য ভক্তদিগের সমাধিও নির্ম্মিত আছে। এখানে এক ব্যক্তি একটি 'মুড় ঝাঁঠা' লইয়া দর্শকদিগের মস্তকে মারিতেছে। শুনিলাম ইহা কবীরের ঝাঁটা; এই ঝাঁটার উৎপত্তি যে কোথা হইতে হইল তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। অনেক পুণ্যের প্রলোভন সত্ত্বেও উড়িয়া পাণ্ডার হাতের সম্মার্জ্জনী প্রহারে স্বীকৃত হই নাই।

সিদ্ধাবকুল—

এটি চৈতন্যদেবের সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে যে বকুলগাছ বিদ্যমান তাহার একদিক শুধু বল্কলসার হইয়াছে তথাপি সেদিকে বৃক্ষে রস চলাচলের কোন বাধা নাই। প্রবাদ আছে,—এক বৎসর জগন্নাথের রথের চাকা প্রস্তুতের জন্য পুরীর রাজা ঐ বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ করেন কিন্তু প্রাতঃকালে আসিয়া সকলে দেখিল বৃক্ষটি অন্তঃসার শূন্য হইয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। তখন হইতে ঐ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এখানে একটি ষড়্‌ভুজ চৈতন্য মূর্ত্তি আছে।

হরিদাস মঠ—

ইহা ভক্ত হরিদাসের সমাধি। প্রবাদ আছে,—চৈতন্যদেব স্বয়ং ইঁহার শবদেহ বহন করিয়া এই স্থানে প্রোথিত করেন। ইহা যদি প্রকৃত হয় তবে বুঝিতে হইবে প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বেও সমুদ্র ঠিক এই স্থানেই ছিল কারণ এই সমাধিটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে একটি চৈতন্যদেবের একটি নিত্যানন্দের ও একটি অদ্বৈতের মূর্ত্তি আছে, তিনটিই অবিকল একরূপ।

ইহা ভিন্নও পুরীতে অন্যান্য বহু মঠ আছে।

একদিন আমরা জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম। ভাবিয়া গিয়াছিলাম,—ভাল করিয়া মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন করিব, কোন্ School of Art তাহা অনুমান করিতে চেষ্টা করিব কিন্তু সাধ্য কি আছে দাঁড়াইয়া দর্শন করি? যেমন যাত্রীদিগের জনতা তেমনি পাণ্ডাদিগের এবং ভিক্ষুকদিগের চীৎকার, মনোনিবেশ করিয়া দেখিবার অবকাশমাত্র দেয় না। মন্দিরে প্রবেশ করিবার চারিটি তোরণ, পূর্ব্বদিকের তোরণের নাম সিংহদ্বার, দক্ষিণ দিকের তোরণের নাম অশ্বদ্বার, উত্তর দিকের তোরণের নাম হস্তীদ্বার ও পশ্চিম দিকের তোরণের নাম খণ্ডদ্বার।

মন্দিরের সম্মুখস্থ রাজপথ অত্যন্ত প্রশস্ত, এই পথ দিয়া জগন্নাথের রথযাত্রা হয়। জগন্নাথের মন্দির ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে অনেকরূপ মতভেদ আছে। A. C. Mukherjee র Short History of the Indian people নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে উড়িষ্যায়.........গঙ্গাবংশীয় চোলাগঙ্গাদেব নামক এক নরপতি উড়িষ্যা জয় করেন, তাঁহার উড়িষ্যা জয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়।

আবার কেহ বা বলেন ইহা বৌদ্ধমঠ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন, মহাজন ও হীনজন। হীনজনগণ বুদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংসার ত্যাগী

হইতেন, এবং মহাজনগণ সংসারে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন। ইঁহারা কালক্রমে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করেন ও সেই সকল মঠে বিগ্রহ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। সেই সময়ে বৌদ্ধ উৎসব ও বৌদ্ধ দেবদেবীগুলি হিন্দুরা ক্রমশঃ আত্মস্থ করিয়া লন। জগন্নাথ বিগ্রহ ও তাঁহার উপাসনাও এই সময়েই হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়। কিন্তু পাণ্ডারা এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহারা বলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পূজিত হইত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময়ে ঐ হিন্দু মূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন কিন্তু পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হওয়ায় ঐ মূর্ত্তি হিন্দুরা ফিরিয়া পান। এ কথা তেমন বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা ভিন্ন আর একটি মত শ্রুত হয়। প্রবাদ আছে জগন্নাথ দেবের বক্ষের অভ্যন্তরে একটি কৌটার মাঝে প্রাণপুরুষ বিদ্যমান আছেন, দ্বাদশ বৎসর পরে জগন্নাথদেব যখন কলেবর ত্যাগ করেন তখন ঐ প্রাণপুরুষকেও কলেবরান্তরিত করা হয়। কিন্তু উহা নাকি বুদ্ধদেবের দন্ত অথবা পঞ্জর সন্দেহে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রতি বৎসরে স্নানযাত্রার সময়ে অত্যন্ত গোপনে ঐ দন্ত বাহির করিয়া ধৌত করা হয়। ইহা নূতন কলেবরে স্থাপনকালে পাণ্ডার চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। আবার এরূপও শুনা যায় যে এখনকার এই মন্দিরটি অধিক দিনের নহে, ইহার নির্ম্মাণকাল আট নয় শতাব্দীর অধিক নহে। পাণ্ডার বলে 'এ মন্দির এক প্রস্তরে নির্ম্মিত' কিন্তু দেখিলে তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে এটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যেরূপভাবেই প্রস্তুত হউক না কেন ইহা সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে কোন ঋতুতে যে কোন প্রহরে সূর্য্য যে ভাবেই থাকুক না কেন ইহার ছায়া চত্বরের বাহিরে পড়ে না। এমন সুন্দর কারুকার্য্য খোদিত প্রস্তর-মন্দির কেমন করিয়া দাঁড় করান হইল ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জগন্নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শে প্রকাণ্ড চত্বর, তাহাতে যে সকল প্রধান প্রধান দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিমলাদেবী (শক্তিদেবী)—ইহার মঠ মন্দির অভ্যন্তরস্থ ভূমির নৈঋত কোণে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরী (শক্তিদেবী)—মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত।

ক্ষেত্রকালী (শক্তিদেবী)—ইহা বায়ুকোণে অবস্থিত।

মহালক্ষ্মী (বৈষ্ণবদেবী)—মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত।

উত্তরায়ণী—মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। ইনি তান্ত্রিক মতে পূজিত হইয়া থাকেন।

শীতলা,—ইঁহার বৈষ্ণব মতে পূজা হয়।

ঈশানেশ্বর মহাদেব—ঈশান দিকে অবস্থিত, ইনি জগবন্ধুর গুরু বলিয়া কথিত হয়েন।

বিশ্বনাথ পতিতপাবন—পূর্ব্ব দ্বারপথে অবস্থিত। যে সকল হীনজাতিকে মন্দির অভ্যন্তরে ঠাকুর দর্শন করিতে দেওয়া হয় না, তাহারা দ্বার পথে দাঁড়াইয়া এই পতিতপাবন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যায়।

কল্পবট—কল্পেশ্বর মহাদেব—

বটমঙ্গলা, বালমুকুন্দ—ইঁহারা সকলেই অগ্নিকোণে অবস্থিত।

ক্ষেত্রপাল, রোহিণী কুণ্ড মধ্যে ভূষণ্ডীকাক—দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

ইহা ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দেবদেবী আছেন। এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি মন্দিরের পাণ্ডাও কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে, সকলেই চীৎকার করিয়া যাত্রীদিগকে পুণ্যের প্রলোভন দেখাইতেছে

ধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বরে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ. অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় না। এ যে নিজেকেই স্বয়ং বঞ্চনা করা! ধর্ম্মের বেশ পরিয়া অর্থলালসা প্রকাণ্ড ক্ষুধিত পিশাচের মত আমাদের ভারতবর্ষের পুণ্য-লোভাতুর ব্রহ্মচারিণী বিধবাদিগের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া খাইতেছে। একস্থানে দেখিলাম কতকগুলি ব্রাহ্মণ টিকি নাড়িয়া, উড়িয়া ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, আমরা যাইবামাত্র সমস্বরে ভিক্ষার আবেদন জানাইল। পরে শুনিলাম ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে অন্য সকল কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল কেবলমাত্র ঐ স্থানে বসিয়া সর্ব্বদিনব্যাপী জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রালোচনা ও কুটতর্কেরও মীমাংসা সমাধান করিতেন. সে জন্য সে অবধি এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করার প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু সেরূপ শাস্ত্রালোচনা ইত্যাদি কিছুই হয় না শুধু অর্থলালসার প্রবল আধিপত্য!

আর এক স্থানে দেখিলাম এক ব্যক্তি, আর এক ব্যক্তির মস্তকে একটি পা স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পা রাখিয়াছে সে ব্রাহ্মণ, এবং যাহার উপর রাখিয়াছে সে কোন হীনজাতি অপধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছে তাই ঐ ব্রাহ্মণ তাহার মস্তকে শ্রীচরণ রাখিয়া অপরাধ ক্ষালন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে! পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিতে সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইত সেই ব্রাহ্মণের আজ সর্ব্বগুণ তিরোহিত হইয়া শুধু ঐ ব্রাহ্মণত্বের দম্ভটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে! তাহার পর, জগন্নাথ দর্শন করিবার সময় আসিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকার ও গৃহতল জলময়, দু' একটি প্রদীপের ক্ষীণালোকে অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। তখন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার নিত্যনৈমিত্তিক বেশ পরিবর্ত্তন ও চন্দনলেপন হইতেছিল। বাহির হইতে বহুলোকের সমস্বরে বন্দনা গীতি ও ভিতরের চন্দন ও ফুলের গন্ধ মনে ভক্তিরসের সঞ্চার করে। জগন্নাথ মূর্ত্তি ওঁকারের অনুকরণে নির্ম্মিত কিন্তু এই জগতের প্রভু যিনি, সকল কল্পনার কেন্দ্র, সকল সৌন্দর্য্যের স্রষ্টাকর্ত্তা, সকল প্রেমের আধার, জগতের নাথ যিনি তাঁহার মুখাবয়ব যে কেন আরো সুন্দর করিয়া গঠন করা হয় নাই! আমরা অনভিজ্ঞ তাই বোধহয় ভাবি যখন তাঁহাকে কলেবর দান করা হইল, আকৃতি দান করা হইল, প্রতিদিনের মানবোচিত বেশভূষা আহার ব্যবহারের গণ্ডীর মাঝে বদ্ধ করা হইল, তখন কেন আরো সৌন্দর্য্য দিয়া আরো মাধুর্য্য দিয়া গঠন করা হইল না? সে যাহা হউক হিন্দুদিগের এমন যে পবিত্র পূজার স্থান সেখানকার ব্যবহার দেখিয়াও মর্ম্মাহত হইয়াছি। যে সকল ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরের প্রতি-দ্রব্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হস্ত শুদ্ধ করিতেছে তাহারাই আবার মহাপ্রভুর প্রণামীর টাকা লইয়া জগন্নাথের চরণতলে দাঁড়াইয়া বিবাদ করিতেছে; কাড়াকাড়ি করিতেছে। হস্ত অপবিত্র করিতেছে।

শুনিলাম ঠাকুরের ফুলের মালা গাঁথিবার জন্য আটজন ব্যক্তি বেতন দিয়া রক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সারাদিন ধরিয়া মালা গাঁথে। ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিবার যে পথ আছে তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে দুই জন লোক পাশাপাশি যাইতে পারে না। যতরূপ প্র ক্রিয়া আছে সকলের মূলে অর্থ আদায়, ধর্ম্মের অধঃপতনের এই দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। ঠাকুরকে সমস্ত দিনে পাঁচটি ভোগ দেওয়া হয়. 'সকাল ধুপো' সকাল ৮টায়, বাল্যভোগ ১০টা, মধ্যাহ্ন ভোগ অথবা 'দুপর ধুপো' মধ্যাহ্ন ১টা, 'সাঁঝ ধুপো' রাত্রি ৯টায়, বড় শৃঙ্গার ভোগ রাত্রি ১টা ৷৹ এই পাঁচ বারে ৫৬ প্রকার ভোগ দেওয়া হয়।

এই ৫টি ভোগ ছাড়া আর একরূপ ভোগ আছে, রাজবাড়ী ব্যতীত সর্ব্বসাধারণ যে ভোগ দেয় তাহাকে ছত্র-ভোগ বলে। পুরীর রাজার পক্ষ হইতে দৈনিক ৩৬০৲ টাকার ভোগ দেওয়া হয়।

ভোগ রন্ধনের সময়ে ও জগন্নাথকে নিবেদন করিবার সময়ে পাণ্ডারা নাসিকা ও মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে,—পাছে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হয়। যত ভোগ প্রস্তুত হয় তাহার তিন চতুর্থাংশ বিক্রয় হইয়া রাজার তহবিলে যায়, অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ হইতে পাঁচটি ভাগ করা হয়, তাহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। এক থালা মন্দিরবাসী সন্ন্যাসীদিগের জন্য, এক থালা পাণ্ডাদিগের জন্য, এক থালা ব্রাহ্মণদিগের জন্য, এক থালা রাজবাড়ীর জন্য ও এক থালা রন্ধনবাটী সম্পর্কীয় সকল কর্ম্মচারীদিগের জন্য। এই ভোগ ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিবার কোন প্রথা নাই, তাহাদের নিকট ঠাকুরের এই ভোগ মূল্য লইয়া বিক্রয় করা হয়। এই প্রকৃত উপযুক্ত পাত্রদিগকে কেন যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় না জানি না যিনি একবার এখানকার জরাজীর্ণ ও রোগগ্রস্ত অসংখ্য ভিক্ষুককে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই হৃদয়ে কি গভীর ব্যথা অনুভব করিয়াছেন!

প্রাতে ৬টার সময়ে মঙ্গল আরতি শৃঙ্গার; 'কুলা' 'মুখধৌত' 'দন্তধাবন' 'জিহ্বামার্জ্জন' স্নান ইত্যাদি হয়। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক ভোগের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শৃঙ্গার হইয়া থাকে। সপ্তাহের ৭ দিনে ৭ রংএর বস্ত্র পরিধান করান হয়।

জগন্নাথের ১২০ জন দেবদাসী আছে। ইহাদিগকে উড়িষ্যাবাসীগণ "মাহুরী" বলে। মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভিক্ষুকদিগের যে ভয়ানক উৎপাত সহ্য করিলাম এরূপ বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নাই। আমরা দ্বারের ভিতর হইতে দুই হাতে কেবলি পয়সা ছড়াইতে লাগিলাম তবু নিস্তার নাই, কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। আমাদের গাড়ী আটক করিয়া তাহারা পরস্পরে যেরূপ বিবাদ ও মারামারি আরম্ভ করিল তাহাতে আমরা দুই জন মাত্র স্ত্রীলোক গাড়ীর ভিতর হইতে রীতিমত ভীত হইয়াছিলাম। দুইজন আহত হইল তবু নিরস্ত হইল না, কোনরূপে গাড়ী হাঁকাইয়া যখন তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিলাম তখন মনের মাঝে চাহিয়া দেখিলাম এরূপ ভাবে দান করিয়া একবিন্দু পরিতৃপ্তি লাভ করি নাই। ইহাদের মাঝে কুষ্ঠ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক, ইহা ভিন্নও অনেক উপযুক্ত পাত্র আছে তথাপি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সব হতভাগ্যগণ যে মন্দিরের মহাপ্রসাদ বিনামূল্যে পায় না ইহাই পরিতাপের বিষয়। মন্দিরের চূড়ায় নীলচক্রের উপর ধ্বজা টাঙ্গাইবার পদ্ধতি আছে। ১০ হইতে ৩০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিলে দাতার নামে ধ্বজা টাঙ্গান হয়। ৩০০০৲ টাকা দিলে নীলচক্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ধ্বজার শ্রেণী বিস্তৃত করা হয়। নীলচক্র হইতে শ্বেতগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে ৭৫০৲ ও নীলচক্র হইতে চরণামৃত কুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে ১২৫৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

জগন্নাথদেবের রথের কাষ্ঠ আটমলিক ও দশপাল্লার রাজা দেন ইহা ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য পুরীর রাজা দিয়া থাকেন। রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে ঐ রথ বিক্রয় হয় তাহার মূল্য রাজার তহবিলে যায়। মন্দিরের আয় বহু প্রকারে হইয়া থাকে। প্রসাদ বিক্রয়ের অর্থ, প্রণামীর অর্থ ও রথ বিক্রয়ের অর্থ ভিন্নও অন্য অনেক প্রকারে অর্থ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে সকল যাত্রীগণ ঠাকুর দর্শন কালে অন্যান্য দর্শকদিগকে মন্দিরের বাহিরে রাখিতে চাহেন তাঁহারা পাণ্ডাদিগকে অধিক পরিমাণে অর্থ দিলেই ইহা সম্ভবপর হয়। সেবাইত নিয়োগ কালেও নজর লওয়া হয়। এই সকল আয়ের অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পন্ন হইয়াও ২০।২৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

পুরীতে রামকুমার দোয়েঙ্কার, বংশীলাল মারওয়ারী ইত্যাদি ধনশালী ব্যক্তিগণের নির্ম্মিত ১৪।১৫টি ধর্ম্মশালা আছে। এই সকল ধর্ম্মশালায় যাত্রীগণের অবস্থানের অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত।

আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। নরেন্দ্রসরোবর—ইহার জল অতি নির্ম্মল, এই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি নাটমন্দির নির্ম্মিত আছে। এই সরোবরে নৌকা করিয়া জগন্নাথদেবের নৌবিহার হইয়া থাকে।

আঠার নালা নদী—অষ্টাদশটি খিলানে বাঁধান সেতুর তল দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা অষ্টাদশটি আপন পুত্র বলিদান করিলে এই নদী সন্তুষ্ট হইয়া সেতু বন্ধন করিতে দেন। কিন্তু সেতুর অবস্থা দেখিলে তত পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহা হইতে কিছু দূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই সরোবরের এক পার্শ্বে রাজার এবং অপর পার্শ্বে রাণীর মূর্ত্তি আছে। এই সরোবরের নিকটেই গুণ্ডিচাবাড়ী (জগন্নাথের মাসীর বাড়ী)। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবকে মন্দির হইতে এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উড়িষ্যায় যে সকল ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করে তাহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর উড়িয়া ব্রাহ্মণ আছে তাহারা বলভদ্র গোত্রীয় মাস্তান নামে পরিচিত, ইহারা মোটবহন, শকটচালন হলকর্ষণ ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণদিগের আহার ও বৈবাহিক সম্পর্ক নাই। ইহাদের এবং বৈশ্যদিগের মাঝে সাধারণতঃ ৮।৯ বৎসর বয়সের কন্যার বিবাহ প্রচলিত, অন্যান্য জাতির মাঝে ইহাপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের নিম্নে মহান্তী বা করণ জাতি (কায়স্থ) ইহাদের মাঝে কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে পিত্রালয়ে আনিবার প্রথা নাই। যদি কেহ বিবাহানুরূপ ব্যয়সাধ্য সকল অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহা হইলে কন্যাকে পিত্রালয়ে আনা সম্ভবপর হয়। জামাতারও শ্বশুরালয়ে গমনের ঐরূপই প্রথা। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিবাহকালে কন্যার সহিত যিনি যত অধিকসংখ্যক দাসী প্রেরণ করিতে পারেন সমাজে তাঁহার ততই প্রতিষ্ঠালাভ হয়। ঐ সকল দাসীর গর্ভজাত সন্তানেরা সগবেশ্যা নামে অভিহিত হইয়া এক পৃথক জাতিতে পরিগণিত হয়।

ইহা ভিন্ন গুড়াকর (গুড়িয়া বা ময়রা) গোপ ও ভাণ্ডারী (নাপিত), খণ্ডাইত বা তসা (চাষা) পাটরা (দোকানদার), পধান উড়িয়া, রঙ্গণী (তাঁতী) এই সকল জাতি জলাচরণীয়। ইহাদের মাঝে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। শঙ্কর জাতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, ইহা ভিন্ন কতকগুলি হীন ও অস্পৃশ্য জাতিও আছে। এখানে জ্যোতিষী নামে একটি পৃথক জাতি আছে, তাহারা সাধারণ বঙ্গদেশের জ্যোতিষীদিগের মত ব্রাহ্মণ নহে।

এখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মাঝে সুরাপান অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের মাঝে মহিলাদিগের অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশের ভাদ্রবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্পর্শ করে না, কিন্তু এখানে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত স্পর্শ করা ভাদ্রবধূর পক্ষে নিষিদ্ধ।

এখানে ধান্য চারি প্রকার উৎপন্ন হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'আশু' ও 'বড়ধান' বপন করা হয়, আশুধান ভাদ্রমাসে ও বড়ধান অগ্রহায়ণ বা পৌষে কর্ত্তন করা হয়। 'ছোটধান্য' ধান্য (আমন) শ্রাবণ মাসে রোপণ করিয়া কার্ত্তিকে কাটা হয়। ইহা ভিন্ন ডাড়ুয়া নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে তাহা অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে বপন করা যায়। এই ধান্য সাধারণত ৬০ দিনে সুপক্ক হয়।

বাঁশ প্রচুর পরিমাণে হয়। পাট ও সুপারীর চাষ অতি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। নারিকেল এখানে সুপ্রচুর, সর্ব্বত্রই নারিকেল বৃক্ষ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে এখানে কোনরূপ শাকশব্জি উৎপন্ন হইত না কিন্তু এখন অন্যান্য স্থানের অনুকরণে এখানেও সর্ব্বপ্রকার তরিতরকারির চাষ হইয়া থাকে।

এ বৎসর ভারতবর্ষব্যাপী যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা ভীষণতর রূপে উড়িষ্যায় প্রকাশমান। এ দেশ যে কত দরিদ্র তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। অস্থিকঙ্কালসার ভিক্ষুকদলের করুণ চীৎকার দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করিতেছে অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার প্রতীকার না হইলে আর উপায় নাই। গৃহে গৃহে রন্ধনশালার নর্দ্দমা হইতে অন্নের ফেণ পান করিয়া ক্ষুধিত ভিক্ষুকদল প্রাণধারণ করিতেছে।

এখানে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে দাতব্য চিকিৎসালয় ব্যতীত সরকারী ডাক্তারখানাও আছে তবে কঠিন রোগের ঔষধ পাওয়া দুষ্কর। এতবড় তীর্থস্থানে চিকিৎসার আরো সুবন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন। এখানে বালকদিগের স্কুল আছে কিন্তু কলেজ নাই। এখানকার সাধারণ পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও হীনাবস্থাপন্ন। অল্প কয়েকটি পথ ভিন্ন মোটর চালন একরূপ অসম্ভব। পুরীর পারিপার্শ্বিক অন্যান্য তীর্থস্থান সকল দর্শন করিবার রেলপথ ছাড়া অন্য উপায় নাই, যেখানে রেলপথ নাই সেখানে গোরুর গাড়ী অথবা পাল্কীর পথ আছে। সমুদ্রতীর দিয়া দুই তিন ক্রোশ পথ পশ্চিমাভিমুখে পদব্রজে গমন করিলে জঙ্গল দৃষ্ট হয়। শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই স্থানে গিয়া মৃগাদি শিকার করিয়া থাকেন। সমুদ্র তীরবর্ত্তী সকল স্থানে কলিকাতাবাসী ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইদানিং বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

আমাদের পুরী অবস্থানের কাল ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রাকালে সমুদ্রের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য হৃদয়ের অতৃপ্তি বাড়াইয়া দিতে লাগিল। অনন্তের উদার সুন্দর ছবি হৃদয়ের চিত্রপটে নানা বর্ণ ভঙ্গিমায়, প্রভাতারুণস্পৃষ্ট রৌপ্যশুভ্র ফেণোচ্ছ্বাসের ও পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্রকরোদ্দীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল তরঙ্গ বিক্ষেপের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার হৃদয়ের চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া বিচ্ছেদ-বেদনার সহিত পুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম!

———:*:———

আশা।

(সঙ্ঘের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের প্রতি—)

— *:—

জাগো বন্ধু জাগো ভাই হে তরুণ ভবিষ্যের আশা

আনো তব দৃঢ়চিত্ত উদ্দীপনা প্রেম ভালবাসা,

এখনও মাঝিপাশে রচনিক জান আপনারা

সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে হতজ্ঞান ভ্রান্ত দিশাহারা

এখনও চিত্ত তব অর্থলিপ্সা কি যে কঠিন

লাঞ্ছিত মুখে ভাসিতেছে এখনও রমণীর প্রাণ।

জননী জাতির ব্যথা হের হের মায়ের মানিক,

ন্যায় সত্য লুটে পথে ক্ষিপ্র পদে দাঁড়াও ক্ষণিক।

করুণাকে দুর্ব্বলতা এখনোত বলিতে শিখনি'

পাষাণের পাদমূলে দাসবৎ এখনো লেখনি'।

পিতৃকল্প শ্বশুরের অস্থিচর্ম্ম টানিয়া ছিঁড়িয়া
রচিয়া দামামা কাড়া বাজাবে কি স্বগৃহে ফিরিয়া ?
তাঁর বক্ষ রক্ত নিয়ে বন্ধুগণে করি নিমন্ত্রণ
পৈশাচ উল্লাসে তুমি মাতিবে কি সহ প্রিয়জন ?
সর্ব্বস্বান্ত করি তাঁরে হাস্যমুখে তাঁরি গৃহে ফিরে
গ্রহণ করিবে অর্ঘ্য মৃত্তিকার পাত্রে আঁখিনীরে ?
তথা জননীর করে শঙ্খ, শিরে সিন্দূর সম্বল
তুমি কি দুলাবে তথা দর্পভরে সুবর্ণ শৃঙ্খল ?
হেরিবে, ভ্রাতায় তথা আলিঙ্গিতে, বক্ষ ক্ষত হায়
তোমারি কৃপাণে ঝরা রক্ত তার তোমারে তিতায়
রক্তস্রোতে অস্থিপুঞ্জে আহতের করুণ চীৎকার
তারমাঝে সিংহাসনে লুণ্ঠনের করিবে প্রচার ?

প্রেম দেউলের দ্বার খুলিবে কি স্বর্ণকুঞ্জী দিয়া ?
হেলা ফেলা ক্রূর খেলা প্রেয়সীর প্রাণটুকু নিয়া !
এ’-ত তব প্রেম নহে—এ যে তব শিকার নিষ্ঠুর
শায়কে বিঁধিয়া তুমি মৃগশিশু ধরিবে চতুর ?
বেচিতে এসেছ তুমি ভব হাটে হৃদয়ের প্রেম
তব প্রেমপুরোহিত শূদ্র বৈশ্য রৌপ্য আর হেম ?
জানিনা রজতবৃন্তে প্রেমপুষ্প ফুটিবে কেমনে !
ভক্তি দিবে প্রেম দিবে তুলাদণ্ডে স্বর্ণের ওজনে !
মাঝে যদি নাহি দুলে কণ্ঠহার সুবর্ণ শৃঙ্খল
দিবে নাক প্রেয়সীরে চির কাম্য পরশ শীতল ?
সুবর্ণের অসিপত্র ব্যবধানে দুইটী হৃদয়
অশিথিল পরিরম্ভ লভিবে না কখনো নিদয় ?
দিবে নাক ফুলহার কণ্ঠে তার, বিনা মুদ্রামালা ?
ভিষক দর্শনী বিনা জুড়াবে না তার বক্ষোজ্বালা ?

প্রিয়া কি গো লীলাযষ্টি মুঠে যার সুবর্ণবেষ্টনী ?
গৃহসজ্জা দ্রব্য মাত্র ? পত্নী কি গো ধাতুর রমণী ?
ইন্দ্রিয়ের অর্ঘ্য সে কি বিত্তজাত শত অর্ঘ্য সনে ?
শ্রেষ্ঠ ভোগ্য-বাহিনী কি অন্য যত পশারিণী গণে ?

রাজস্ব ভেটের সনে ক্রীতদাসী তোমার সেবিকা
পত্রিকার কোণে যেন সর্ব্ব শেষে তার নাম লিখা!
বিত্তে কি করিবে বিয়া নারীচিত্তে ঠেলিয়া চরণে?
যৌতুক-বাহীরে কি গো বক্ষে নিবে বধূর বরণে?

জননীর নেত্রজল জনকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
মূর্ত্তি ধরে' বধূরূপে আসিবে যে তোমার আবাস।
কাতরা করুণাপাত্রী,—ভক্তি কোথা? চিত্তে শুধু ভয়
চাহিতে তোমার পানে ডরে তার কাঁপিবে হৃদয়।
অঙ্গে তার কণ্টকিত স্বর্ণীভূত ভ্রাতৃরক্ত সার
মায়ের কলিজা,—ছোট ভগিনীর মুখের আহার।
পিতৃবক্ষস্নায়ুপাশে বন্দী হয়ে হেরিবে কেবল
পিতৃরক্তে পাতা গৃহে শুধু মা'র আঁখি ছলছল।
সে কি শান্তি। ভেবো না কি ক্ষুদ্রা বলি সে গো চিত্তহীনা
অস্ফুট বেদনা সে যে রক্ষোগৃহে জানকী মলিনা।

পিতৃদৈন্য-কুণ্ঠানতা সঙ্কুচিতা ভয়ে বেদনায়
সে কেমনে হবে শিষ্যা নর্ম্মসখী ললিত কলায়?
ভূধরের বক্ষ ক্ষত নদী কভু পারিবে ভুলিতে?
তব তট-বাহু-পাশে বেদনায় রবে গুমরিতে!
হারাইবে মুক্ত প্রেম হাস্য-সুধা বিম্বাধরপুটে?
করো হৃদি বিনিময় বাধাহীন ধাতু-বাঁধ টুটে
তুচ্ছ স্বর্ণরৌপ্য-লাগি হারাও না পরশ-মানিক
ভুজগে চন্দন তরু জড়াও না তরুণ প্রেমিক।

বুঝ নি বধূর হৃদি—কত দামী ভাবিতেছ তাই
সামান্য পরীক্ষা-পাশে উচ্চ মূল্যে কিনিতেছ ভাই,
শত শত ডিগ্রী লাভে ভূসম্পদে রূপে উচ্চ কুলে
তার যোগ্য মূল্য নাই কিছু পরে বুঝিবে সে ভুলে।
তখন ভাবিবে বন্ধু, যে দিয়াছে পরম রতন
জীবনে সর্ব্বস্ব দিলে তার ঋণ হয় না মোচন।

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" শুচিশীল দীনগৃহ হ'তে
শাকুন্তুর মত ভাই আনো বহি' হৃদয়ের রথে
করে মৃণালের বালা কণ্ঠে যার বনফুল-মালা
পতিব্রতা 'শকুন্তলা' তব গৃহ করুক্ উজ্জ্বালা।
নিষ্কলঙ্ক কর প্রেমে হে প্রেমিক হ'য়ো না কঠিন
কুল-দেবতার অর্ঘ্য কর পণ-আমিষ বিহীন।

হর্ম্ম্য নহে অর্থ নহে—নহে তুচ্ছ ভূষণ-সম্ভার
বিবাহ করিতে হবে কুমারীর হৃদিটী, কুমার
এসত্য না বুঝ যদি ব্যর্থ হবে পুঁথি-বন খোঁজা
কুবেরের উপাসনা, গ্রন্থ হবে—গর্দ্দভের বোঝা
ব্যর্থ সে শোণিতপাত হবে ভ্রাতঃ গণিত তোমার
ইতিহাস—উপহাস, বিজ্ঞান সে অজ্ঞানতাভার
সার হবে দৃষ্টিক্ষীণ, ব্যঙ্গ হবে—উপাধির মালা
ব্যর্থ হবে অর্থব্যয় ছাত্রাবাস হবে পণ্যশালা।
এই শিক্ষা নাহি পেলে, বিদ্যা তব বিফল ভূতলে
কূট মিথ্যা শাঠ্য শিখি' শুধু সত্য সাধনার ছলে।
গুণুক্ টাকার থলি গৃহে বসি বিগত-যৌবন
হে প্রেমিক তুমি জাগো—ভবিষ্যের আশা-নিকেতন।

শ্রীকালিদাস রায়।

আমাদের কথা।

—:*:—

যে যাই বলুক, আমরা যে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি, তাতে আর ভুল নেই। এই চলার পথে আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক নূতন সমস্যার উদয় হয়েছে। সেগুলো বাস্তবিকই যদি সমস্যা হয়ে থাকে তবে আর সমাধানের চেষ্টা করা যে কর্ত্তব্য তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না। তাই 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ'-টাকেও একটা সমস্যা মনে করে নিয়ে তার সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বল্‌তে চাই।

আমাদের পক্ষে এ জিনিষটা নূতন হলেও আসলে খুব নূতন নয়। ইউরোপে এই Individualismএর চর্চা অনেকদিন থেকেই চলে আসচে। রবীন্দ্রনাথ যখন এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা সুরু করেন তখন তাকে খুবই বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছিল। একদল লোক বলেছিলেন "রবিবাবু Individualismএর theoryটা বেলাত থেকে বেমালুম ধার করে এনেছেন। এদের যুক্তি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বলে একটা কিছু আমাদের দেশে কোন কালে ছিল না। এটা বিজাতীয়; সুতরাং এর আলোচনায় দেশের উপকার নেই—অপকার আছে। যা পূর্ব্বে ছিল না, তা যে পরে আর হতে পারে না, এটা অবশ্য কোনো যুক্তি নয়, তবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ কোনো জাতি বা দেশ বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিনা সেটা বিবেচনার বিষয় বটে।

প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হিসেবে যেমন কতগুলো কর্ত্তব্য আছে তেমনি কতগুলো অধিকারো আছে। কারণ অধিকার যেখানে নেই দায়িত্বের কথা সেখানে উঠ্‌তেই পারে না। ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে সব মানুষই সমান। তা সে ফরাসী হোক্, ইংরেজ হোক্, আর ভারতবাসীই হোক্। স্বাধীনতা যেমন জাতি মাত্রেই জন্মগত অধিকার, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরেও তেমনি মানুষ মাত্রেরই জন্মগত দাবী আছে। সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা হচ্ছে বিশ্বমানবের কথা। সেটাকে কোনো জাতিবিশেষের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে ভুল করা হবে।

তবে সমাজকে বাদ দিয়ে এ বিষয়ে কোন আলোচনা চল্‌তে পারে না; কারণ সমাজ আর যাই হোক্—প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ কতকগুলো মানুষের সমষ্টি। আমাদের সমাজ যেভাবে গঠিত তাতে মনে হয় ব্যক্তির অস্তিত্ব বিসর্জ্জনের উপরেই তার ভিত্তি। কাজে কাজেই সম্পূর্ণ বাইরের এই জিনিষটাকে সমাজের মধ্যে জোর করে ঢোকানের ফলে শুধু অশান্তিই বেড়ে চলেছে। যা নাই এবং যার দরকার নাই এমন কোনো জিনিষকে ডেকে আনা অবশ্য বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই বল্‌বেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করবার জন্যই সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়েছে, এবং যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে এই অশান্তি আজ স্তূপাকার হয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের ব্যবহারিক জগতে এবং মনোজগতে যে বিপুল পরিবর্ত্তন হয়েছে, তার ফলে আজকের এই সমস্যা। একশ বছর পূর্ব্বে আমরা যা ছিলাম আজ তা থেকে অনেক বদলে গিয়েছি। আমরা দশজনে যদি বদলে থাকি, তবে আমাদের দশজনকে নিয়ে যে সমাজ তা তেম্‌নিই থাকবে কেন? অনেকদিন অন্ধকারে ডুবেছিলাম তাই আলো আর সহ্য হয় না। একটা নূতন কিছু উপস্থিত হ'লেই আমাদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হয়ে পড়েন। যুগযুগান্তব্যাপী "নিশ্চিন্ত আলস্য এবং নিষ্কর্ম্ম নৈরাশ্যে" বসে থেকে খুঁজবার এবং চলবার আনন্দ অনেকেই হারিয়েছেন। কিন্তু যেটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, "ওটা কিছু নয়, কিছু নয়" বলে চোখ বুজে রইলে তো সেটা "কিছু নয়" হয়ে যাবে না।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্ম বিলেতের মাটিতেই হোক্ আর যেখানেই হোক্, আমাদের পক্ষে এখন আর তা বিদেশী বা বিজাতীয় নয়। চোখটা একটু খুলে চাইলেই দেখা যাবে আমাদের "ঘরে বাইরে" এ সমস্যা দিনের পর দিন স্পষ্টতর হয়ে আস্‌চে। এ কথা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা করে না। কাজেই কোন Idealistic কবির কল্পনার খেয়াল মনে করে এবং দেশের জল মাটীর সঙ্গে সংস্রব হীন ভেবে যদি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে দূরে সরিয়ে রাখি তবে অপরোক্ষভাবে সমাজেরই অকল্যাণ করা হবে।

কোন জিনিষই এই পৃথিবীতে নিখুঁৎ নয়; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরও একটা খুঁৎ আছে। শুধু নিজকে নিয়েই মানুষের দিন কাটে না। কাজেই সমাজ বলে একটা কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে "সকলে আমরা সকলের তরে"—"Each for all and all for each" সেখানে দেওয়া নেওয়াই চিরন্তন নিয়ম। প্রত্যেক মানুষের

উপরই দেশ এবং সমাজের প্রচুর দাবী আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই দেশ এবং সমাজ যখন তাদের ন্যায্য দেনাপাওনা নিয়েও বেশীর জন্য অন্যায় করে জুলুম করতে চায়, তখন তার হাত থেকে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করবার জন্য এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। "ত্যাগ" বড় না "ভোগ" বড়, এটা যে অনেকদিনের পুরাণো তর্ক। হতে পারে মানুষের মনুষ্যত্ব আত্মত্যাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়; কিন্তু এটাও ঠিক যে যাঁরা ভোগ করতে জানেন তাঁরাই শুধু ত্যাগ করতে পারেন। মানুষ অন্তর থেকে যা করে না, সে কাজ কোনদিনই ঠিকমতো হয় না। ত্যাগ ভাল, অতএব গোড়া থেকে যদি আর সমস্ত হতে নিজকে বঞ্চিত করে ত্যাগের চেষ্টা করা হয় তবে পাখীর শেখানো বুলীর-মতো সেটা একান্তই প্রাণহীন হবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তো এই কথাই বলতে চায় যে ত্যাগ কর। ত্যাগ না করলে কেউ বড় হয় না। কিন্তু ভুলে যেওনা যে তুমি "মানুষ," যন্ত্র নও; তোমার প্রাণ আছে আর স্বাধীনতা সেই প্রাণেরই জিনিষ। পরার্থে ত্যাগকে ততক্ষণই শ্রেয়ঃ বলে মনে করবে যতক্ষণ না তার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হতে না হয়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের কথা উঠলে প্রথমতঃ স্বামী স্ত্রীর অধিকারের তর্ক উপস্থিত হয়। বহু শতাব্দী ধরেই পুরুষ নারীর উপর অবাধ প্রভুত্ব চালিয়ে এসেছে। তাই আজ বহুদিনের প্রচলিত পথ ছেড়ে নারীদের নিজেদের সমান বলে মেনে নিতে তাদের বড় আপত্তি। পুরুষ নিজের বেলা উচ্চ গলায় আপত্তি তোলেন—নির্ম্মম পেষণে মনুষ্যত্ব গেল। অথচ আশ্চর্য্য এই, তাঁহাদেরই দারুণ চাপে নারীর নারীত্ব ফুটে উঠবার অবসর পাচ্ছে না। এবিষয় পুরুষেরা শুধু গায়ের জোরেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকেন। তার প্রমাণ তাদের স্বপক্ষে বলবার কিছুই নেই। অথচ নারীদের এই ন্যায়গত আত্ম-অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য তাঁরা লজ্জিত নন্। তাঁরাই নাকি নারীদের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভিভাবক, একথা এখনো এদেশের লোকেরা বড়-গলায় বলে থাকেন।

এই যে হিন্দু বিবাহ,—এতে পাত্রপাত্রী উভয়েরই তো ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। দুটী প্রাণী জীবন-ভরে নিজ নিজ সুখদুঃখের বোঝা বইবে আর তাদের যাত্রাপথের সাথী বাছাই করে দেবে অন্য লোক।

কতকগুলো লোকের সমষ্টিতে একটা জাতির গঠন। এবং সেই লোকের সমষ্টি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখি জাতীয়জীবনে স্ত্রী জাতির কোনো অধিকার নেই। কাজেই আমরা জাতীয়-জীবনে অর্দ্ধপঙ্গু।

অনেকে বলেন যে ঈশ্বরের এটা অভিপ্রায় নয় যে নারীজাতি পুরুষের সমান অধিকার পাবে। তাই তিনি পুরুষকে নারী অপেক্ষা বলিষ্ঠতর করে গড়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে নারী কেবল 'child producing machine' তাদের সমাজে কোন অধিকার থাকবে না। এটা নেহাৎ গোঁড়া materialistic idea সুতরাং উচ্চজগতে এর স্থান নেই।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখ্‌তে পাই, আমরা নারীজাতীর প্রতি দৃষ্টি দেইনি তা নয়, কিন্তু সে দৃষ্টিতে সম্মানের চেয়ে দয়ার ভাবটাই বেশী ছিল। "স্ত্রীহত্যা মহাপাপ" এ বিধি শুধু স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল বলে; এটা তাদের নারীত্বের গৌরব রক্ষা করবার জন্য নয়। তবে রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে যে তাদের অধিকার একেবারে ছিল না তা সত্য নয়, কারণ প্রথা ছিল রাণী ব্যতীত রাজ্যাভিষেক হতনা, তাই রামচন্দ্রকে স্বর্ণসীতা গড়্‌তে হয়েছিল।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আজো আমরা সেই পুরাণের বিধিব্যবস্থা সজোরে আঁকড়ে ধরে রয়েছি। শাস্ত্র বলেন 'পতি দেবতা'। ব্যবস্থাটা শুধু পুরুষেরই স্বপক্ষে কেননা যিনি শাস্ত্রকার তিনি ছিলেন পুরুষ। সুতরাং তারি জয়। যে দেশের শাস্ত্রকার বলেছেন "আত্মানাং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি—অর্থাৎ ধন ও দারা যেন সমান জিনিষ। দুটোই শুধু সুখের সময় ভোগের, দুঃখের সময় ত্যাগের। ধিক্ সে দেশের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারকে, ধিক্ সে দেশের পুরুষ জাতিকে।

পুরুষ মহাপাপ হোক্, মূর্খ হোক্, তিনি দেবতা, আর স্ত্রী দেবী হোক্, বিদুষী হোক্, সে দাসী। পুরুষ উপাস্য, স্ত্রী উপাসিকা; পুরুষ রক্ষক, স্ত্রী রক্ষিতা, এদেশের এই সনাতন নিয়ম। জানিনা স্ত্রীজাতি যদি শাস্ত্রকার হতেন তবে তাঁরা এরূপ আত্মত্যাগে সমর্থ হতেন কি না, তাঁরাও পুরুষের মতো ভোগের দিকেই দৃষ্টি দিতেন কি না, এবং আধুনিক বিধি সম্পূর্ণ বিপরীত হত কি না।

আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিলুম, পাশ্চাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও সে দেশের এ অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা বলেন তাঁরাই হচ্ছেন স্ত্রীজাতির অধিকারের রক্ষক। কিন্তু স্পষ্টবাদী বলবেন যে তাঁদের স্ত্রীজাতি এখনো স্বামীদের চেয়ে বেশী উঠতে পারেননি। যদিও আচারব্যবহারের পার্থক্যে সামাজিক অধিকারের কতক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মূলে উভয়েই সমান। সেখানেও পুরুষের জয়জয়কার। তাঁরা বলেন "Woman is the mistress of the house" কথাটা শুনতে বড় বটে কিন্তু এটাও আমাদের "গৃহলক্ষ্মী" কথাটারইমতো ফাঁপা। স্ত্রীজাতি কি শুধু নাচতে গাইতে ও উপভোগের সামগ্রী হতে এ পৃথিবীতে এসেছে? রান্নাকরা ও বাসন মাজাই কি তাদের একমাত্র কাজ? তারা কি শুধু অজ্ঞতার অন্ধকারেই চিরকাল ডুবে রইবে? তাদের কি কোন উচ্চতর কর্ত্তব্য নেই, জীবনের সার্থকতা নেই? পুরুষ কি চিরকালই তাদের জন্মগত অধিকারের পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে থাকবে? এর উত্তর কোথায়?

মানবের সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে স্বীকার করি কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার থাকিলে এর চেয়েও দ্বিগুণ বেগে অগ্রসর হতে পারত। এই সেদিনও বিলেতে স্ত্রীজাতির ভোট দিবার অধিকার নিয়ে কতনা কাণ্ড ঘটে গেল। এটা কি ইংরাজ পুরুষদের লজ্জার বিষয় নয় যে আজো তাঁরা চক্ষু খুলে নারী জাতির অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। দৃষ্টি দেওয়া দূরে থাক্ বাধারূপে দণ্ডায়মান হচ্ছেন! democratic বলে যাঁরা গর্ব্ব করেন তাঁদের এটা মহৎ অশোভন। আর আমাদের দেশের তো কথাই নাই। যে দেশে সামান্য স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন উপস্থিত হতেই একদল লোক ক্ষেপে "ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল" বলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয় সে দেশের উন্নতি শুধু সুদূরপরাহত নয়, কল্পনারো অতীত। এখন এদেশে 'অবাক কাণ্ড' 'খাস দখল' এর-মতো কুৎসিত মাতৃজাতির নিন্দাপূর্ণ বই বা'র হয় আর, লিখে গ্রন্থকার বাহাদুরী পান। এরা আবার চায় জাতীয় অধিকার।

আমেরিকা আজ কেন এত উন্নত? কারণ তাঁদের দেশে সুমাতা আছেন যাঁরা সুপুত্র প্রসব করেন, আমেরিকাতেও যখন প্রথম নারীর অধিকারের আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন যে গোলযোগ হয়নি তা নয়। একদল লোক বলেছিলেন যে নারীজাতি পুরুষের অধিকার পেলে সন্তান পালনের এবং অন্যান্য গৃহকার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে কিন্তু ফলে তা হয়নি। আজ আমেরিকার নারীজাতি সুপত্নীরূপে স্বামীর সুখদুঃখের সমভাগী এবং সুমাতারূপে সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিযুক্তা বলেই সেদেশ দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এমন সব লোক জন্মাচ্ছে যারা জাতির গৌরব দেশের গৌরব ও পৃথিবীর গৌরব বলে পরিগণিত হচ্ছেন।

অনেকে বলেন নারী দুর্ব্বল, তারা বোঝা বইতে পারবে কেন? কিন্তু দুর্ব্বল তো তাদের পুরুষেরাই করছে। জন্ম থেকে যে মেয়েকে লোহার জুতো পরান হয় সে মেয়ে খোঁড়াই হয়। ছেলেবেলা মেয়েদের শেখানো হয় 'পতিদেবতা'। স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে কায়মনোবাক্যে ঐ পতিপূজা করতে হবে। তার জীবনে যেন আর কোন সার্থকতা নেই। সে যে নারী এই বিশাল পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা জুড়ে আছে, সে সব তাকে যত্ন করে ভুলতে হবে। পরার্থে এ কেমনতর আত্মত্যাগ? এ ত্যাগের মহত্বই বা কোথায়? জন্মাবধি সকল অধিকার নির্ম্মমভাবে কেটে ছেঁটে বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে পুরে, মনটাকে ছোট করে দেওয়ার ফলে মেয়েরা এখন আর নিজেদের দাসী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ডিম ফেটে বার হওয়া অবধি যে পাখী পিঞ্জর বই জানে না, সে কেমন করে মুক্ত আকাশে আপন মনে উড়ে যাবে!

এই যে নারী জাতিটাকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত করে রেখেছি এতেই আমাদের এই অধঃপতন। পুরুষ ও নারী যেদিন সমভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জীবনপথে চলতে পারবে সেদিন দিনের আলোর মতো সমস্ত ধাঁধাঁ এক নিমিষে ঘুচে যাবে; যাত্রাপথের সমস্ত বাধা আপনা হতে সরে যাবে; জীবনের সমস্ত অবসাদ ঝরে পড়ে সত্যই বড় মধুময় হয়ে উঠবে।

এতো গেল স্বামী স্ত্রীর কথা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী এখানেই শেষ নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের যেমন শেখানো হয় "কায়মনোবাক্যে পতি সেবা করো" ছেলেদেরো শেখানো হয় "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" আমরা সবাই জানি পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। ছেলে পিতৃভক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা ঘাড়ে করে বেড়াবে, এটা আমার মত নয়। কিন্তু এই যে মাতৃহত্যা ব্যাপারটা। এটা আমাদের দেশের পিতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পরশুরাম পিতৃভক্তি দেখাতে গিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে বিদায় দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস এই অন্ধ-পিতৃভক্তি তাঁর একটা মহাকলঙ্ক। অজ্ঞ-তিনি জগৎ-সমক্ষে মহা অপরাধী।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, পিতৃভক্তিতে এবং মনুষ্যত্বে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে কার স্থান উপরে হবে। ধরুন, ছেলে বিবাহে বরপণের ঘোর বিপক্ষে. পিতা ছেলেকে না জানিয়ে কয়েক হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে কোনো "সরলা ননিবালার" সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করলেন। তারপর গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন "অমুক তারিখ তোমার বিয়ে। সময় মতো উপস্থিত হয়ো।" ছেলে আদেশ পেয়ে বিয়ে করে ফিরে এল। বন্ধুবর্গ জিজ্ঞাসা কর্ল্লে উত্তর দিল "আমার বিয়েতে তো আর আমার হাত নেই। আমার তো মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কি কর্ব্বো, বাবা বল্লেন তার কথা তো আর ফেলতে পারিনে।" ছেলে কিন্তু ভুলে গিয়েছিল যে বিয়েটা তারই—তার বাবার নয়। তার ব্যক্তিত্ব বলে একটা জিনিষ আছে, তারও বিবেক-বুদ্ধি আছে মনুষ্যত্ব আছে; পিতা যদি ঘরে আগুন দিতে বলেন তবে সে তাই করবে? বাবা তাঁর বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ছেলের ব্যক্তিত্ব ভুলতে পারেন কিন্তু তাই ব'লে কি ছেলেও নীরব হয়ে সমস্ত সহ্য করবে, যে হেতু পিতা চোকের জল পায়ে ফেলে আমাদের পালন করেছেন শুধু সেই জনই কি আমাদের অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে তাঁদেরই জন্য জীবন রইতে হবে? তা হলে আর তিনি আমাদের শিক্ষা দেন কেন? কন্যার মতো পুত্রকেও অজ্ঞানতার চির অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে "আমি কে, আমার মূল্যই বা কি, শক্তিই বা কি" এ সব সত্য তত্ব বুঝবার অবকাশ দেওয়া উচিত নয়। তাকে পিতার আজ্ঞাবহ যন্ত্রচালিত ভৃত্য করে গড়ে তোলা উচিত।

আজকালকার লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতির ভেতর কি আছে না-আছে জানিনে, কিন্তু সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চিরনির্ব্বাসিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকই একটা বিরাট কারখানা। সেখানে কলে সব কাজ হয়। সেখানে মনুষ্যত্বের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনো কারবার নেই। তাই দেখ্‌তে পাই সেখান থেকে যারা বার হন্, তাঁদের মধ্যে গোটা মানুষ খুব কমই থাকে; দেশবিদেশে আজ "নববিদ্যালয়ের" সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষকে খাঁটী মানুষ করবার জন্য সকল দেশের লোকই আজ বদ্ধপরিকর কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কলের পুতুল তৈরী করে আজও তৃপ্ত। এটাকি মাটীরই গুণে?

আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি। আমাদের করো করবার আছে; আমাদের ক্ষমতা কত বড়; কিন্তু ভিন্ন রকম আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে সে সব আমাদের ভুলতে হয়। আমাদের দুই আনা ব্যক্তিত্ব পিতৃভক্তিতে, দুই আনা মাতৃভক্তিতে আর চারি আনা বর্ত্তমান শিক্ষার পায়ে বলি দিয়ে, বেরুতে না বেরুতে ধর্ম্ম ও সমাজ মনু ও পরাশর, তাদের বিধিনিষেধের বিপুল বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেন। তখন বাকি আট আনা মনুষ্যত্ব তাদের দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জীবনযাত্রার পথে বেরিয়ে পড়ি। আমার ধর্ম্ম থাকতে পারে, সমাজ থাকতে পারে, বাবা মা, গুরু থাকতে পারেন—তাঁদের প্রতি আমার মহান্ কর্ত্তব্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমি মানুষ এইটেই সবচেয়ে বড় জিনিষ। এবং সেই মনুষ্যত্বই আমার পিতৃভক্তির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে দেবে। অন্য জনের দেবার কাজ নেই।

আজকের দিনে বিশ্বের যাত্রাপথে আমরা জাতকে জাত অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ব্যক্তিত্ব যেখানে লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বকে যে জাতি সম্মান করে না, সে জাতি জীবন্মৃত হতে বাধ্য! মানুষ যে শক্তির বলে বড় হয় সেই মনুষ্যত্বকে নির্ম্মমভাবে পেষণ করা হচ্ছে, কবির প্রাণ তাই দেখে আজ বেদনার ভরে উঠেছে; তিনি রুদ্র বীণায় ডাক দিয়ে তাঁর দেশকে বল্‌ছেন "সব অচলায়তন ভেঙে ফেল; সব বাঁধন কেটে দাও।" মানুষ মাত্রেরই মহান্ কর্ত্তব্য আছে, সে কাজ তাঁকে করতে দাও। বাধা দিও না ভুল করে করুক, ভুলের ভিতরেই সে এক দিন সত্যকে খুঁজে পাবে।

আজ আমি আমাদের যুবক বন্ধুদের এই কথাই বল্‌তে চাই। তাঁরা পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি যা দেখাতে হয় দেখান; তাঁরা তাদের শিক্ষা ধর্ম্ম সমাজ নিয়ে গৌরব করতে চান, করুন;—কিন্তু যেন ভুলে না যান তাঁরা মানুষ। আমাদের কবি ব্যথায় সুরে গেয়েছেন "সে দিন আগত ঐ, ভারতে তবু কই? সে কি রইল সুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে? লউক বিশ্ব কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।"

এ ডাক শুনে আর স্থির থাকলে চল্‌বে না। বিশ্বের মিলন মন্দিরে আমাদেরও স্থান আছে। তাই আমাদের মনুষ্যত্বকে কেবল বাঁচিয়ে রাখলেই তো চল্‌বে না। তাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে। তার জন্য চাই কায়মনোবাক্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। অনেক দিনের জড়তার চাপে আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে আজ আর শাস্ত্রের বচন শুনবার অবকাশ আমাদের নেই। তার "সূক্ষ্ম বিচার পণ্ডিতে করুক, আর গোময় লিপ্ত গণ্ডীতে নস্যদানী নিঃস্ব করুক।" আমরা আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে চল্‌ব। প্রাচীর ভেঙে দেব, লোহার দরজা খুলে দেব, এবং কর্ম্মজগতের মহাপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়ে নব-জীবন লাভ করবো। তখন সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন কেটে যাবে। উন্মুক্ত আকাশে শরতের জোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রীসুশীলকুমার দাস গুপ্ত।

বিশ্বরাজ।

—:*:—

(রাগিণী—কানাড়া)

ভিন্ন তুমি নহ ত' প্রভু পৃথিবী হ'তে পৃথিবী-নাথ
তবুও কেন ঢুঁড়িছে লোকে 'তয় করি দিবস রাত।
ধরণীরূপে ধরিছ বুকে, সলিলে দিছ প্রাণ
বহ্নি হয়ে জ্বালিছ আলো আঁধার করি ম্লান
পবন হয়ে শ্রান্তিহান, ঘুরিছ সদা সঙ্গলীন
কে বলে তবু তোমারে পেতে করিতে হয় পরাণপাত
ধরণী হ'তে সুদূরে যদি থাকিত অন্য-লোক
রাজনহীন রাজ্য তব হইত অরাজক ;
অত্যাচারে সূর্য্য-সোমে, সোহাগে প্রেমে বায়ুতে ব্যোমে
হ'মে মহা দ্বন্দ্বে হ'ত বিশ্ব মহা ভস্ম খাত !
তাই ত' ভাবি রয়েছ তুমি জগত জুড়ি' জগন্নাথ
ধরণী ছাড়ি' তোমারে খোঁজা মিথ্যা সে যে ব্যর্থ সাধ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথার প্রতিবাদ

পরিচারিকায় আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত "অন্তরীক্ষে দেবাসুর যুদ্ধ" নামক প্রবন্ধ এবং শ্রাবণে "প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথা" নামক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি স্বকপোল-কল্পনা সাহায্যে বৈদিক শাস্ত্রসমূহের অযথার্থ কল্পনা করিয়া অন্তরীক্ষ শব্দে পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ স্বামী "আর্য্যজাতি" নামক পুস্তকে এই সমস্ত মত উত্থাপন করিয়া সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশ্য এই প্রবন্ধ যদি বিদ্যারত্নপদসম্বলিত মহোদয়ের না হইত তাহা হইলে অন্যান্য প্রবন্ধের ন্যায় উপেক্ষিত হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আমরা বিশেষরূপে জানি। তিনি দেশের মঙ্গল কামনাতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট।

বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রের উপরে যেরূপ বিলোল কটাক্ষের পূর্ণ প্রকোপ পতিত হইতেছে—আশঙ্কার উপরে আশঙ্কা উত্থিত হইতেছে তাহার যথারীতি সমাধান করিবার জন্যই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এত প্রযত্ন। অবশ্য তিনি সমাধান করিতে গিয়া মূলেই তাল ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুজাতির অধঃপতন হইলেও হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বলিবার শক্তি অনেকেরই নাই। যিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি ডুবিয়াছেন—তিনি পতিত হইয়াছেন। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া জগতের সমক্ষে না ধরিয়া তাহার ক্লিষ্টার্থ কল্পনা দ্বারা কত ছাঁটিয়া, বাছিয়া অন্যার্থ করিতে গেলে সত্যের অপমান করা হয়। সেইজন্য তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি প্রমাণের যথাসম্ভব মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইতে হইল। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে অন্য কোনও জনপদ ছিল না। একথা বলিয়া তিনি—প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও লোকান্তরের অস্তিত্ব নাই। পৃথিবী ভিন্ন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, মহঃ জনঃ, তপঃ সত্যং প্রভৃতি সপ্তলোকের কথা কি বেদে পাওয়া যায় না? এই সমস্ত মন্ত্র কি বৈদিক মন্ত্র নহে? পৃথিবী ভিন্ন স্বর্গ বলিয়া যদি লোকান্তর না থাকিত তবে শাস্ত্রে—

"সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা"

স্বর্গে পবনদেব সর্ব্বদা সুখ প্রদান করিতেছেন সুন্দর গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে আবার মীমাংসা শাস্ত্রে—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

স্বর্গে ইচ্ছানুসারে সুখলাভ হয়। সেখানে দুঃখের লেশমাত্রও নাই ইত্যাদি গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর। কিম্বা যুদ্ধে জয়ী হইয়া পৃথিবী ভোগ কর। মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের উপদেশ পাওয়া যায়। স্বর্গ যদি পৃথিবীতেই হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের উপদেশ হইত না। এবং শাস্ত্রে স্বর্গের যেরূপ বর্ণন পাওয়া যাইতেছে পৃথিবীর কোনও স্থলে কোনও প্রদেশে সেরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে না। অতএব পৃথিবীতেই স্বর্গ কল্পনা করা সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ। বেদে সৃষ্টিবর্ণন প্রসঙ্গে—

আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অপঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।

আকাশের দশমাংশে বায়ু—বায়ুর দশমাংশে অগ্নি—অগ্নির দশমাংশে জল, এবং জলের দশমাংশে পৃথিবীর সৃষ্টি। অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা জললোক দশগুণ বড়—জললোক হইতে অগ্নিলোক দশগুণ বড়। এবং অগ্নিলোক হইতে বায়ুলোক দশগুণ ও বায়ুলোক হইতে আকাশলোক দশগুণ বড়। অতএব পৃথিবী নিয়ত এই পঞ্চলোক আমরা স্বতঃই অনুভব করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্নও আমাদের শাস্ত্রে নবগ্রহের নয়টী লোকের কথাও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সায়ন্সের দ্বারা আরও দুইটী গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন্ লোকের পরিমাণ কত তাহাও প্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। এক একটী সৌরজগৎ এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। সৌরজগতে সূর্য্যই কেন্দ্র এবং একমাত্র জ্যোতিষ্মান। বুধগ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। তার পর সূর্য্যের পথ তার পর পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর ইয়ুরেনস্ নেপচুন প্রভৃতি অনেক গ্রহ অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ

করে। এ ছাড়া আরও অনেক উপগ্রহ আছে। বর্ত্তমান সময়েও সৌরপরিবারে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০০ তিন শত গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রহগণের মধ্যে আয়তনে পৃথিবীই প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। এই সৌরজগৎ একটী ব্রহ্মাণ্ড। হিন্দুশাস্ত্রে কেবল একটী ব্রহ্মাণ্ডের কথা নয়, মহানারায়ণোপনিষদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে যথা—

"অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশানানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রজ্বলন্তি।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে। অতএব পৃথিবীর মধ্যেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করিতে যাওয়া বেদশাস্ত্রের অপলাপ করা মাত্র।

(খ) পূর্ব্বে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। যেহেতু সন্তানগণ মাতৃনামে পরিচিত হইতেন।

মাতৃনামে পরিচিত হইতেন বলিয়াই বিবাহ বন্ধন ছিল না। ইহা কোনও যুক্তি নয়। গীতায়--সৌভদ্র, দ্রৌপদেয়, গাঙ্গেয় প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরাদির গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ হইয়াছিল না। ঋষি কশ্যপের সহিত দিতি অদিতি প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিবাহ হইয়াছিল—পুরাণাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন প্রমাণিত হয়; বিবাহ প্রথা ছিল না এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যে স্থলে একজনের বহু পত্নী থাকিত সেস্থলে পিতার নামানুসারে নামকরণ হইলে—সকলকেই বোঝা যাইত। তাহাদের মধ্যে বিভেদ থাকিত না। এই বিভেদ স্পষ্টীকরণের জন্যই পূর্ব্বে মাতৃনামে পরিচয় দিতে হইত। ইহা দ্বারা বিবাহবন্ধন ছিল না—ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

(গ) মরীচি অত্রি; প্রভৃতি ঋষিগণ মনুর মানস পুত্র। খুব সম্ভব। মনু মানস বা ইচ্ছা করিয়া কতিপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করেন।

মানস পুত্র যে হইতে পারে বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। অথচ তিনি বেদের দোহাই দেন প্রতি পদে পদে। বেদ হইতেই আমরা জ্ঞাত হই যে ভগবানের মানস হইতেই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রথমে মৈথুন সৃষ্টি ছিল না। সে সময়ে মানসিক সৃষ্টিই হইত। বেদ বলেন—

"সদেকমেবাদ্বিতীয়মগ্র আসীৎ"

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সৎপুরুষই বর্ত্তমান ছিলেন।

"স তদা ঐক্ষত বহুস্যাথ প্রজায়েয়॥ মুণ্ডকোপনিষ।

তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন।

সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। "স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ॥

বৃহদারণ্যক॥

তিনি আত্মা ভিন্ন কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন। যেমন ইচ্ছা হইল সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইল। ভাগবত বলেন—

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশপুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।

ভগবচ্ছক্তি যুক্তস্য লোকসন্ত ন হেতবঃ।

মরীচ্যত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্রনারদ।

লোক বৃদ্ধির জন্য তিনি ধ্যান করিয়াই মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ধ্যানের দ্বারা যে সৃষ্টি হইতে পারে পুরাণে এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ঋষি যখন সুরভী হরণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন সুরভি নিজ অঙ্গ হইতে সহস্র সহস্র সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। সুরভী সাধারণ গো ছিলেন না, তিনি দৈবশক্তিসম্পন্না ছিলেন। এবং বিশ্বামিত্র ঋষিই কল্পনা দ্বারা মানব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উষ্ট্র প্রভৃতি বহু জীব সৃষ্টিও করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য নারায়ণী সেনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূল জগতের সৃষ্টি। সূক্ষ্মদর্শী সিদ্ধিসম্পন্ন ঋষিগণ অমানুষিক যোগপ্রভাবের দ্বারা মানসিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করেন, ভরদ্বাজ মুনি যোগবলে কিরূপে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন? পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অতএব মনু কোনও বা কতিপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন এরূপ অপসিদ্ধান্তের প্রচার করিতে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রবিগর্হিত।

(খ) প্রাচীনকালে পুরোহিতের আবশ্যক হইত না। কেবলমাত্র পাণিগ্রহণ হইত। ইহার সমর্থনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে :—

"গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।"

(ইহার অর্থ) আমার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্তগ্রহণ করিতেছি—তুমি আমার সহিত জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত একত্রে থাকিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হও।

এই প্রমাণের দ্বারা পাণিগ্রহনই ছিল বিবাহ সংস্কার ছিল না এরূপ প্রমাণিত হয় না। কারণ এই প্রমাণটী বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ মন্ত্রে পঠিত হয়। পাণিগ্রহণ বিবাহ সংস্কারের একটী অঙ্গীভূত সংস্কার। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পাণিগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্কার হইয়া থাকে, প্রাচীনকালেও তাহাই হইত। প্রাচীন সময়ে যে অন্যান্য সমস্ত সংস্কার হইত না—তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে হিন্দুর কোনও ক্রিয়াই অমন্ত্রক হয় না। সমন্ত্রক সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব প্রাচীনকালেও সমন্ত্রক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

(২) এই সময়ে জগতে বাল্যবিবাহ ছিল না।

বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন দেশহিতৈষী লোক। জানি না, বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ করিবার জন্য তিনি কেন এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ঋষিগণের বিরুদ্ধে বলিয়া তিনি কি কখনও দেশের উন্নতি করিতে পারিবেন? তিনি—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ হৃদ্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার এবং চব্বিশ বৎসরের পুরুষ অষ্টবর্ষার পাণিগ্রহণ করিবেন। ভগবান মনুর এই শ্লোকটীকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজ মত পোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বীকার করিলাম এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু—দেবল বলেন :—

ঊর্দ্ধং দশাব্দাদ্যা কন্যা প্রাগ্রজো দর্শনাত্তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্যা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা॥

সংবর্ত্ত সংহিতায় লিখিত আছে :—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাং॥
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টম বর্ষায়াঃ কন্যায়াস্ত প্রশস্যতে॥

অতএব রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। যম সংহিতায় লিখিত আছে :—

প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্।
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যা নৃতু কালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥

মহর্ষি গৌতম বলেন :—

"প্রদানং প্রাগৃতোরপ্রযচ্ছন্ দোষী"

মহর্ষি আশ্বলায়ন বলেন—

অদৃষ্টরজসে দদ্যাৎ কন্যায়ৈ রত্নভূষণম্॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।

মনুও স্থানান্তরে বলিয়াছেন—

প্রদানং প্রাগৃতোঃ স্মৃতম্।

এই সমস্ত প্রমাণেরই অর্থ—ঋতুকালের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। মনুর একটী বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কিন্তু এই সমস্ত ঋষিবাক্য অস্বীকার করিবার উপায় কি? তিনি যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সকল স্থলেই কন্যা শব্দের প্রয়োগ আছে যথা—"ব্রহ্মচর্য্যেন কন্যা" "কন্যাপ্যেব পালনীয়া" "আচ্ছন্ন দানং কন্যায়া" "কন্যা প্রদানং বিধিবৎ" "কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাৎ" ইত্যাদি। হিন্দুশাস্ত্রে কন্যার লক্ষণ করিয়াছেন—অষ্টম বর্ষ বয়স্কা বালিকা কন্যা। বালিকার বয়স আট বৎসর হইলে তাহাকে কন্যা বলা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে কন্যাদান গৌরীদানের বিশেষ বিশেষ ফলশ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পুরুষের অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে যথারীতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিলে অবশেষে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই বিবাহ দেওয়া উচিত। *

* * * *

* বর্ত্তমানের উচিত অনুচিতের সমস্যা-সমাধানের স্থান এ প্রবন্ধে নাই, কারণ বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার তাহাই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে বক্তব্য। স্থান কাল শিক্ষাদি গণনায় আনিয়া বাল্যবিবাহের সপক্ষে বা বিপক্ষে বহু কথা বলা যায়,—সে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপকরণ; "অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইলে কন্যা শ্বশুরকুলের কেমন আপন হইয়া যায়" ইত্যাদি যুক্তি ও উক্তি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। সঃ।

তবে প্রাচীন কালে যে একেবারে অধিক বয়সে বিবাহ হইত না তাহা নহে। পুরাণে দুই একটী উদাহরণ পাওয়া যায়, যথা,—দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা প্রভৃতি। তবে তাহারাই অত্যধিক বয়স্কা ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ ভগবান রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সীতারও বয়স সেই সময়ে দ্বাদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। সাবিত্রী, দময়ন্তী সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। দ্বাদশ বর্ষ বয়সেও কাহারও কাহারও স্তনোদ্গম হইয়া থাকে। সেই সময়ে—

"বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত স্তনী"

বলা যাইতে পারে।

নিয়ম সাধারণতঃ তিন প্রকার;—অসাধারণ, সাধারণ ও বিশেষ। অসাধারণ নিয়ম কোনও কোনও স্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ—সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। দুই এক জনের দৃষ্টান্তে জগতের নিয়ম হইতে পারে না। সর্ব্ব সাধারণকে লইয়াই সাধারণের নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। অতএব দুই এক জনের বিবাহ অধিক বয়সে হইলেও সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে সে নিয়ম চলিতে পারে না। অতএব বাল্যবিবাহ সর্ব্বথা ঋষি-শাস্ত্রানুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী।

উত্তর।

—:*:—

(E. W. Wilcox)

১

বিদায় তবে,—যাচ্ছি অন্যদিক;
'হঠাৎ?—হ্যাঁ, তা'—হয়তো বা তাই ঠিক;
তবু এ মোর গোপন মানস-মূলে
এমন সে-এক সত্য গেছে খুলে
কাল্‌কে গভীর রাতে;
এক নিমেষেই জীবন-মরণ
চম্‌কে গেছে যাতে!
কি সত্য সে, শুন্‌তে চাহ? না, না, কচ্ছি বারণ;
বিদায় চাহি, সহজ কথা—বল্‌বো নাকো কারণ;

২

'সংক্ষেপে' ?—বেশ, চাইছি যেতে সমরভূমি ছাড়ি'
শত্রুরে মোর পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া।
প্রহেলিকা ? ভাবছো এটা কৃতঘ্নতা ভারি
আমার প্রতি সদয় ছিল যখন তোমার হিয়া ?
সত্য সবি, তবু যখন অমন করে শুধাও
দাঁড়িয়ে পড়ি আনত মুখ,—জবাব যে হয় উধাও।

৩

ভেবো নাকো, লক্ষ্য করি' সেবায় কোনো ত্রুটী
ভগ্ন আশায় এই অতিথি যাচ্ছে হঠাৎ ফিরে ;
যত্ন তোমার কাঁটার মতন বক্ষে আছে ফুটি'
সারাজীবন তাহার স্মৃতি রাখ্‌বে আমায় ঘিরে।

৪

'তবে কেন এমন হঠাৎ'--চাও কি তুমি জান্‌তে ?
জবাব,—কোন দার্শনিকের আবিষ্কৃত তথ্য
পরীক্ষিত হচ্ছিল এই নীরব-হৃদয় প্রান্তে,
প্রমাণ হয়ে গেল এবার, নয়কো তাহা সত্য।
হয়তো তুমি থাক্‌বে শুনে প্লেটোর কোনো যুক্তি
আমার মুখের বক্তৃতাতে থাক্‌তো তক্তা তক্তা ;
এতদিনে বুঝে নিলুম—যদ্বিষয়ক উক্তি
তদ্বিষয়ে বিশেষ রকম অজ্ঞ ছিলেন বক্তা।

৫

ভাব্‌ছো—আমি বল্‌ছি এমন সৃষ্টিছাড়া বাক্য
অর্থ যাহার যায় না বোঝা চিন্তা করেও অনেক ?
লও গো তবে নয়ন পাতি আমার চোখের সাক্ষ্য
কম্পিত এই হস্তে তোমার হাতটী রাখ ক্ষণেক।
শোনো, আমি পালিয়ে যাচ্ছি সাম্‌নে হেরি সর্প,
পালিয়ে যাচ্ছি উদ্ধত তার ফণার প্রসার দেখি ;
পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমার পরাণ-মনের দর্প
পড়্‌ছে গলে ভালবাসায়,—আর তা',—না, না, এ কি !

৬

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে তোমার রাগে,
আগেই জানি, ইহাই শেষে হবে ;
খুঁটিয়ে কেন কারণ চাহ এমন ভাগে ভাগে,
অতিথ এসে বিদায় মাগে যবে !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

বন্যায়।

—:*:—

(১)

তিন বৎসর আগে যখন আমার কন্যা কমলা ঘর আলো কর্‌ল, সে কথা কখনো ভুল্‌ব না। জানি না, কত তপস্যার ফলেই তা'র মত মেয়ে পেয়েছিলেম ; কারণ তা'র জন্মের পরই আমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি আর 'তাঁর'ও পদোন্নতি। তাই, দেখে শুনে নাম রাখ্‌লাম কমলা।

এমন মেয়ে, এমন রূপ, এমন গুণ, এমন সরলতা ; এত সুলক্ষণ দেখে' কোন মায়ের প্রাণে আশা হয় না ? তাই, একদিন কমলার হাত দেখালেম। গণক বল্লে "মেয়ে বড় সুলক্ষণা—রাজরাণী হবে।" প্রাণ নেচে উঠ্‌ল। ভাবলেম, এমন মেয়ে যদি তাই না হয়, তবে আর হবে কে ? খুসী হ'য়ে দু'টাকা 'বিদায়' দিলেম। গণক আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল।

মেয়ে মানুষ কিনা,—তাই অত বুঝি নাই। আশায় ও আনন্দে কমলাকে বুকে তুলে নিলেম। কমলা আমার কোলে মাথা গুঁজে বল্লে "মা, ও কি বল্লে ?"

আমি তার কোঁকড়ান চুলগুলি কপাল হ'তে সরাতে সরাতে বল্লেম, "ও বল্লে, তুই রাজরাণী হবি।"

"রাজরাণী কি মা ? চাকরাণী ? তুই সেদিন বল্‌ছিলি আমাদের চাকরাণী বিন্দি বড় ভাল মানুষ—খুব কাজ করে ? আমিও তা'র মত খুব কাজ কর্‌ব !"

আমি তা'র মুখ চুম্বন ক'রে বল্লেম "ষাট্‌ মা, অমন কথা বল্‌তে নেই।"

(২)

সেই একদিন, আর এই একদিন। কত তফাৎ, অথচ সেই ঘাট, সেই মাঠ, সেই ঘর, সেই বাড়ী। তবু কি যেন নাই—সে আমার কমলা। দুরন্ত দামোদরের বাণে আমার প্রাণের ধন ভেসে গিয়েছে। হায়, কেন আমি তা'কে একা একা নাইতে পাঠিয়েছিলেম !

এখনও সেই গণনার কথা মনে পড়ে,—আর একটি বিদ্রূপের অট্টহাস্যে প্রাণ কেঁদে উঠে। "কমলা রাজরাণী হবে।" না, অবিশ্বাস ত' মনে স্থান পায় না, বুঝি যমরাজার ঈর্ষা হ'ল, তাই তিনি কমলাকে আপনার রাজরাণী করতে নিয়ে গেলেন।

তার'পর এক বৎসর কেটে গেল। আমার কুটীর দালান হ'ল, বড়লোকের বন্ধু বলিলে যা' বুঝায় তা'ও হ'ল, কিন্তু যা' গিয়েছে তা' হয় নি—তাই সব শূন্য,—সব ফাঁকা!!

দামোদরে আর আমি স্নান করিতে যাই না। কেন যাব? বাড়ীর পাশেই সিঁড়ি বাঁধান পুকুর কাটিয়ে নিয়েছি। ঠিক ক'রেছি, পোড়া দামোদরের মুখ আর দেখ্‌ব না।

রাক্ষসী দামোদরে একদিন বান ডাকল, কি প্রবল জলোচ্ছ্বাস, প্রলয়করী বন্যায় লোকজন জীবজন্তু গৃহহীন আশ্রয়হীন প্রাণহীন করে প্রাণহীন রাক্ষসীর কি তাণ্ডব নৃত্য—আমাদের গৃহ হইতে সে ভীষণ বন্যার স্রোত-শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনটা যে কি হয়ে গেল!

"মা এক জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি—শিগ্‌গীর আগুন করে সেক দাও—"

বাড়ীর চাকর হরিচরণ আমার সম্মুখে হস্তপ্রসারিত করে একটি ফুট্‌ফুটে শিশুকন্যা দেখিয়ে বল্লে—দেখুন কি সুন্দর মেয়ে বন্যায় ভেসে এসেছে!

বিস্মিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম "সর্ব্বনাশ এ কা'র মেয়ে,—এখনো যে ঠোঁট নড়্‌ছে—আগুনে সেক দে।"

সেবা শুশ্রূষায় মেয়েটা ভাল হয়ে উঠ্‌লো—সেই তাকে কোলে তুলে নিলেম—বুক হতে তাকে আর বড় নামাই নাই। সময় সময় ভয় হত—যদি এর মা বাপ এসে একে দাবি করে—আবার মনকে প্রবোধ দিতেম—কত মেয়ে সে সময় ভেসে গিয়েছে—কে কার খোঁজ করে—কে জানে কারটি বেঁচেছে আর বেঁচেই বা কোথায় আছে?

ভগবান ওকে রক্ষা কর।

(৩)

কুড়ান মেয়ে—স্নেহের ধন—ওর নাম রাখ্‌লাম স্নেহলতা।

স্নেহ এখন বড় হ'য়েছে—কা'র মেয়ে জানি না—কিন্তু সে আমার সম্পূর্ণ আপনার। সে কমলার স্থান অধিকার ক'রেছে। আজ যদি কেহ এসে বলে—'এ আমার মেয়ে'—তা' হ'লে কি ফিরিয়ে দেব?—না!—কখনই না! আর স্নেহলতা? আমার আদরে, আমার স্তন্যে পালিত হ'য়ে সে কখনই অন্য লোকের আশ্রয়ে যেতে চাইবে না—না,—সে এত কঠোর, এত নিস্মম হ'তে পারে না। হাঁ, সে ত আমায় মা ব'লে ডাকে—এম্নি ক'রে আমার কমলাও ত' আমাকে ডাকৃত!

যে বারের বানে স্নেহলতা ভাসিয়া আসে, তেমন ভীষণ বান দামোদরে বোধহয় আর হয় নি! কতজন ভেসে গিয়েছে, আবার কতজন গৃহহীন হ'য়ে অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েচে।

এইরূপ কতকগুলি লোক আমাদের গ্রামেও এসেছে। কেউ বা ভিক্ষা ক'রে, কেউ বা মানুষের কাজ ক'রে খায়। বানে ভেসে আসা এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে সম্প্রতি আমার ঝি বিন্দি খুব ভাব ক'রে নিয়েচে। তাদের মধ্যে সুখদুঃখের আলোচনা প্রায়ই হ'ত। শুনেছি একদিন সেই বানের কথা উঠ্‌লে বৈষ্ণবী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে সুলোচনা নামে তা'র এক মেয়ে সেই বানে ভেসে গেছে।

বিন্দী বল্‌ল সুলোচনা স্নেহলতা নয় ত? তারপর দেখ্‌ল কতকগুলি শারীরিক চিহ্ন অবিকল স্নেহলতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তখন সে সব কথা খুলে ব'ল্লে। স্নেহকে একদিন ভিক্ষাচ্ছলে দেখে' আস্‌তেও বল্‌তে ছাড়্‌লে না।

বৈষ্ণবী কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। সে কোন উপায় দেখ্‌ল না। বিন্দী সহানুভূতি ক'রে বল্লে "দিদি, দুঃখ ক'র না। পুলিস্ ছাড়া এ কাজের উপায় নেই। তুমি পুলিসে ঠিক্‌ঠাক্ প্রমাণ দিতে পেলেই মেয়ে পাবে, নতুবা চক্ষুজলে মহোদয়ের বান ডাকালেও কিছু হবে না—হবে না—হবে না।"

পরদিন বৈকালে আমি স্নেহলতার চুল বেঁধে দিচ্ছি এমন সময় "হরেকৃষ্ণ" ব'লে এক বৈষ্ণবী ভিক্ষা চাইল। আমি স্নেহকে ভিক্ষা আন্‌তে বল্লেম। তাড়াতাড়ি সে অত দেখে নি, যাবার সময় তেলের শিশিটা পায়ে লগে প'ড়ে গেল। সৌরভে চারিদিক আমোদিত হ'ল বটে; কিন্তু কি যেন অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল।

(৫)

হরিচরণ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে আমার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বুঝ্‌তে না পেরে আমি বল্লেম— "কি রে হ'রে,—কি হয়েছে, কাঁদছিস্ কেন?"

হরি কিছু বল্লে না, নিশ্চলভাবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি আবার বল্লেম—"হ্যাঁ রে, হয়েছে কি? অমন ক'রে কাঁদ্‌ছিস্ যে?"

এই বার সে কথা কইল "যা হবার হয়েছে—যে ভয় করেছিলেম অবশেষে কিনা হ'ল তাই—তোমার মেয়েকে নিতে এসেছে।"

"আমার মেয়েকে নিতে এসেছে? কে? এমন আস্পর্দ্ধা কার? তুই কি বল্‌তে কি বল্‌ছিস্?"

হরি চোখ মুছতে মুছতে মুখ নামিয়ে বল্লে "না মা, আমি ঠিকই বল্‌ছি। কোন্ বৈষ্ণবী নাকি ওর মা,—পুলিসে প্রমাণ দিয়েচে, তাই .... "

আমার হৃদয় জ্বলে' যেতে লাগ্‌ল। অবিশ্বাসের কারণ না থাক্‌লেও মন কিছুতেই হরির কথা মান্‌তে চাইল না। তাই আবেগে বলে ফেল্লাম—"ওর মা কে? আমিই ত' ওর মা। কোথায় সেই সর্ব্বনাশী, রাক্ষসী,— আমার মেয়েকে চুরি ক'রে নিতে এসেচে! আমি জানি, কুচরিত্রা স্ত্রীলোকেরা এইরূপে কত মেয়েকে কুপথে নিয়ে যায়। না, না, আমার স্নেহকে যেতে দিব না—হৃদয় খুলে দেখাব—কা'র স্নেহ অধিক—আমার না সেই রাক্ষসীর, সেই প্রমাণে যদি সে মা হয়, তবেই মা—নইলে নয়।"

বিষাদে ও বিস্ময়ে হরিচরণ কেঁদেতে কাঁদ্‌তে চ'লে গেল।

আমার গলা শুনে স্নেহলতা ভিতর হ'তে দৌড়ে এল। আমি ভাব-গোপন কর্‌তে গেলাম, কিন্তু তার চক্ষু এড়াতে পার্‌লাম না। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে "মা, তোর চোখে জল কেন? তোর কি হয়েছে বল্‌না?"

আমি তাকে আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেম "ও কিছু না। আচ্ছা স্নেহ, আজ যদি আর কেউ তোকে তোর মা বলে পরিচয় দেয়, তা'হলে তুই আমায় ছেড়ে তার কাছে যাবি?"

স্নেহ মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাগ হলে সে অম্‌নি কর্‌ত। বল্লে "তোমার কি সব কথা মা বুঝ্‌তে পারি নে। তুমিই ত' আমার মা আবার কে মা হ'তে যাবে, ছিঃ, এমন কথা বল্লে আমার বড্ড রাগ হয়।"

আমি সস্নেহে তার মুখচুম্বন কর্‌লেম।

(৫)

এমন সময় আমার স্বামী ঘরে ঢুক্‌লেন। কোনরূপ গোলমাল তাঁর সহ্য হ'ত না।

স্নেহ ইতিমধ্যে দৌড়ে তার খেলার ঘর সাজাতে গিয়েছিল। স্বামী বিনা আড়ম্বরেই ব'লে উঠলেন "কি গো তোমার কুড়ান মেয়ের জন্য আমাকে জেলে যাইতে হয় যে ?"

আমি নিম্নস্বরে বল্লেম "কেন ?"

"আদালত থেকে হুকুম এসেচে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুলোচনাকে বিদায় দিতেই হবে। না দিলে হাতে কড়ি।

"সুলোচনা' কে ? ও নামে ত আমাদের বাড়ী কেউ নাই।"

"নাও আর ন্যাকামি ক'র না। সুলোচনা যে তোমার স্নেহ ছাড়া কেউ নয়, সে বিষয়ে আদালত নিঃসন্দেহ।"

বাজ মাথায় পড়্‌লেও অধিকতর স্তম্ভিত হ'তেম না। সমস্ত পৃথিবী আমার চোখের সাম্নে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেম।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা হলে দেখ্‌লেম স্বামী ঘরে নাই। কি জানি কেন আমার প্রাণ খালি খালি লাগছিল। ভাবলেম, অনেকক্ষণ স্নেহকে দেখি নি, একবার দেখে আসি। ধড়ফড় করে উঠলাম, কৈ স্নেহ ত আমার ঘরে নাই। সে কি খেলায় এত মেতেছে যে আমার কথা তার মনেই নাই ? এঘর সেঘর খুঁজলাম—কোথাও ত নাই, সব শূন্য! তবে নিশ্চয়ই সে খেলার ঘরে আছে। ঐ ত সে পুতুলগুলি বিছানায় শুইয়ে কোথায় উঠে গেছে। তাই ত' কোথায় গেল ? পুকুরের ধারে, বাগানে, ছাদে দেখলাম—নাঃ, কোথাও ত' আমার প্রাণের পুতুল নাই! বিন্দি বাসন মাজ্‌ছিল, তাকে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। সর্ব্বনাশী সব জান্‌ত—জেনেও আমায় ভাঁড়ালে। সে বাসনের দিকে দৃষ্টি রেখেই, যেন কিছু জানে না, এইভাবে বল্লে—"এইমাত্র দরোয়ান তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে।"

খিরকির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাগলীর মত ছুটলাম। যে আমি পুরনারী কোন দিন ঘরের বাইরে পা দি' নি—সেই আমি আজ রাজপথে ছুটে চ'লেছি। কোন্ দিকে চ'লেছি কিছুই জানি নে। অবশেষে এক বিপুল নদী আমার গতিরোধ কর্‌ল। চিন্‌তে আর বাকী রইল না—এই সেই চিরপরিচিত ভীষণ রাক্ষসী দামোদর!!—বান ডেকেছে—আমার কমলাকে খেয়েচে—স্নেহকে দান ক'রে প্রতারণা ক'রেচে—এখন আবার আমাকে গ্রাস করবার জন্য গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়েচে !!! আর আমার বেঁচে লাভ কি ? আর সহ্য হ'ল না, রাক্ষসীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেম—কমলা যেখানে, সেইখানে জুড়াতে! সঙ্গে সঙ্গে কে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন! স্বামী! আমায় বুকে করে টেনে তীরে তুল্‌লেন।

পাগলীর মত বল্‌লাম "কেন বাঁচালে ?—আমার বুক যে শূন্য !"

তিনি কি সুন্দর স্মিত প্রেমভরা দৃষ্টিতে কেবল একবার আমার চোখে চাইলেন!

কি অপার্থিব দৃষ্টি! সব ভুলে তখন মনে হ'ল—"আমার সব আছে ওই দৃষ্টিতে!"

শ্রী—

লগ্নহারা।

—:০:—

বিজন নিশীথে কবে করিয়া শয়ন
হেরিলাম ঘুমঘোরে মধুর স্বপন,—
কহিছে দেবতা মোর—'হে ভক্ত আমার!
কি দিয়া পূজিবে মূর্ত্তি প্রাণ-দেবতার?'
—কিছু নাই! নাহি অর্ঘ্য কুসুম-চন্দন,
ফিরিনু কুসুম খুঁজি বন উপবন;
আনমনে শোভা হেরি শেষে অবেলায়
উতরি মন্দির-দ্বারে দেখিলাম হায়,
সুদৃঢ় আগলে বাঁধা রহিয়াছে দ্বার,
লেখা আছে তদুপরে—লগ্ন নাহি আর!

কুমারী স্নেহলতা চন্দ।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ।

কবিবরের শান্তিনিকেতন বোলপুরের ভুবনডাঙ্গা নামক ডাঙ্গার উপরে। মরুভূমির মধ্যে একটু ওয়েসিসের মত দেখা যায়। জায়গাটী তাঁহার যত্ন ও উপস্থিতিতে প্রকৃতই মনোরম হইয়াছে। নানাবিধ বৃক্ষাদি, অসংখ্য মালতীর লতার মধ্যে ছোট ছোট গৃহগুলি আশ্রমের মতই হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য দ্রব্য কবি নিজে। আমি যখন বৈকালে গেলাম তখন তিনি একটী দ্বিতল গৃহের নিম্নে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সেই বাড়ীর উপর তলার একটী ঘরেই তিনি থাকেন। যেখানে বাসয়া লিখেন, সে জায়গাটী ছোট, ছোট জায়গা ভিন্ন লিখিতে মন বসে না। আমি সে দলের মধ্যে গিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা না করায় শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে (ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্রের পুত্র এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক আমেরিকার বি এসসি) সে কথা বলিলাম। শুনিয়াই কবিগুরু উঠিলেন এবং সেই আশ্রমের মালতীর মত শুভ্র মৃদু হাস্যে 'তুমি আসিয়াছ' বলিয়া যে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতেই প্রাণ ভরিয়া গেল, একটু হাসিতে এত আদর থাকিতে পারে তাহা ইহার আগে জানি নাই। তার পর আমি প্রণাম করিলে আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া যে আদর করিলেন তাহাই মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদের মত আমার মনে হইল। তার পর দুইজনে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। কত কথা, কত আলোচনা সেই একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টার

যে হইল তাহা বলিতে পারি নে। প্রত্যেক কথাতেই তাঁহার অনধিগম্য গভীরতা ও অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রকাশ পাইতে লাগিল। আর আমি আমার স্বল্পজ্ঞান লইয়া, হিমালয়ের নিকট ডুম্‌কার সেই উঁচু ঢিপিগুলির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। Art, Personality, প্রভৃতি লইয়া গল্প হইতে লাগিল। ঠিক গল্প নয় তাঁহার মত ও উপদেশ শুনিতে লাগিলাম এবং মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অভিভূত করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনেরই একটী 'বিশ্ব ভারতীর' সঙ্গীতের ছাত্র আমাদের নিকট আসিয়া কবিগুরুকে, তাঁহার নিজের কবিতা সংশোধন করিয়া দিবার কথা বলিলেন। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ত বুড়া হইলেন না তাই আবার ছেলে হইয়াছেন, তিনি সে যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে যে একজন এখনো কবিতা সংশোধন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে তাহা আমার জ্ঞানে ছিল না। তাঁহার সময় এত প্রচুর নহে যে ঐ সব নূতন লেখা দেখিয়া কাটিয়া দিবার অবসর তাঁহার আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নন দেখিলাম। বলিলেন "বাপু তোমার কবিতা আমি ত অনেক দেখিয়া দিয়াছি, তা এখনো কবিতা হয় নাই, এখন কেটে লাভ নাই। যুবকটী তাহাতে বলিল "আমি না লিখিয়া পারি নে, ভাবে আমায় বিভোর করে" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "দেখ, কবিতা যখন হবে তখন তুমিও জান্‌তে পার্‌বে লোকেও জান্‌তে পার্‌বে, সেটা আলো, জলে উঠলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, কিন্তু যতক্ষণ না জলে ততক্ষণ কবিতা হবে না। দিয়েশলাই আমি অনেকক্ষণ ঘষেছি বল্‌লেই আলো হয় না।" আর ও-জিনিষটা দেখিয়ে দিলে হয় না, আমি বহু বহু লেখা দেখে দিয়েছি তাতে কেউ কিছুই লাভ কর্‌তে পারে নাই। যাহক যুবকটী ত বিদায় হইল। আমি বলিলাম "জ্বালা ত আপনার কম নয় ?" তাতে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন "কি করি বল ? এ রকম অনেক কর্‌তে হয়।"

তার পরে মেঘদূত ও মেঘের কথা উঠলো। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "কুমুদ, মেঘ দেখ্‌লে যে আমি কি হয়ে যাই তোমায় কি বলবো আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে, ওই ঘরেই বসে মেঘ দেখে আমি 'মেঘদূত' কবিতাটা লিখেছিলাম।" আমি শুনিয়াছিলাম, উর্ব্বশী নামক কবিতাটী পদ্মা-তীরে কোন স্ত্রীলোক দেখিয়া লেখা কিন্তু তাহা নহে, তিনি বলেন, "উর্ব্বশীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম বটে তবে সেটা আমার কল্পনালোকে। পৃথিবীর ঘটে ঘটে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তবে কোন বিশেষ ঘটে নয়।" তার পরে নানা কথা কইতে কইতে দুইজনে ফিরে গেলাম। রাত্রে তিনি ব্রাউনিং Browing পড়াইবার একটী ক্লাস করেন, তাহাতেও যোগ দিয়া আনন্দ পাইলাম। রবীন্দ্রনাথ একটী সাদা রঙের ও সাদা জামার উপর একটী সামান্য চোগা পরিধান করেন। তিনি জুতা ব্যবহার করেন অন্য কেহ করেন না। নিকটের সাঁওতাল ও ভ্রমণকারীর ছেলেরা তাঁহাকে দেখ্‌লে মজা পায়, সবাই পয়সা চায়, তিনি পয়সা সঙ্গে রাখেন না, দোয়ানী দেন, আর বলেন "তোরা কত জুটেছিস্ রে, আর পারি নে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকের সমস্ত আয় আশ্রমে দান করিয়াছেন এবং এই আশ্রমের তিনিও একজন শিক্ষক, তিনি একটী ক্লাসে translation পড়াইতেছিলেন আমিও ক্লাসে গেলাম, আমাদের পড়ানই পেশা, তবু তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া অবাক হইলাম, প্রত্যেক ছেলেকে এক কথা যে কতবার বলিতেছেন, তাহা বলা যায় না। একজন পাঠশালের গুরু মহাশয়ও বৃত্তি পরীক্ষার ছেলেকে এত কষ্ট ও আগ্রহের সহিত পড়ান না। কেউ একটা প্রশ্নের সদুত্তর দিলে, "বাঃ তুই যে পণ্ডিত রে," এবং না বল্‌তে পার্‌লে, "তুই বাপু বড় অন্যমনস্ক, তোকে আর পারি নে দেখ্‌ছি," প্রভৃতি বলিয়া ঘণ্টা শেষে correctionএর জন্য কতকগুলি খাতা লইয়া গেলেন। অবকাশ সময়ে সেগুলি দেখিবেন। আমি এখনো তাঁহার সামান্য কার্য্যে এত উদ্যম, এত আগ্রহ দেখিয়া অবাক হইলাম—

অতিক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটীও সম্পাদন করা চাই। এ যেন সেই Wordsworthএর Skylarkএ "Tnue to the kindred points of heaven and home".

সে দিন রাত্রে গান রচনার ব্রতী হন সেদিন আর ঘুমও নাই, রাত জাগিয়াই আনন্দে কাটিতেছে। গান তৈয়ার করিব বলিয়া বসেন না, যখন গীত তাঁহাকে ছাড়ে না তখনই এস্‌রাজে সুর দেন। হারমোনিয়াম আশ্রম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অল্প বয়সে বিকশিত হইয়া এত দিন স্থায়ী যে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও বিরল। ভগবান তাঁহাকে ধনে, রূপে, গুণে, কণ্ঠে, প্রতিভার সর্ব্বাংশেই নিজের মনেরমত করিয়া গড়িয়াছেন। গত বৎসর আমি বীরভূমে মহাকবি চণ্ডীদাসের পাট 'নানুরে' গিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এবার বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নিকট গিয়াও তেমনি আনন্দ অনুভব করিলাম।

আমার কবিতা সম্বন্ধে তিনি যা বলিলেন তাহাতে আমার আশাতিরিক্ত প্রশংসা, হয় ত তিনি সেটা স্নেহবশতই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই হাসি সেই স্নেহ সেই আদর সেই প্রশংসা দেখিয়া ও শুনিয়া তখন আমার তাঁহারি সেই কবিতাটী মনে হইতে লাগিল—

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্র হীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পূজনীয়া স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু উপলক্ষে—

দীপ্ত ঋজু হৃদয়ের স্নিগ্ধ জীব-জ্যোতি
নিভিল গঙ্গার তীরে। অঙ্গের বিভূতি
লভিল বঙ্গের মাটী! এই হ'ল শেষ?
কে বলিল শেষ ইহা? তোমারি স্বদেশ—
অন্তঃপুরে আত্মহারা ছিলে মর্ত্ত্য মাঝে,
আজি চরাচর ব্যাপি' তব সত্ত্বা রাজে।

চির-পুণ্য হৃদয়ের ঊর্দ্ধশিখাখানি
সযত্নে অঞ্চল দিয়া ঢেকেছিলে জানি;
সে প্রদীপে কত দীপ পেয়েছে পরাণ,—
কত অন্ধকারে আলো করি' গেলে দান;

বাক্যহীনা, কর্ম্মময়ী হে ভারতনারি!
এক দীপে শত দীপ এ শুধু তোমারি!
তরঙ্গিত স্রোতস্বিনী, ভেদি' নিজ কারা,
প্রবাহি' প্রসন্ন চিত্তে দিলে প্রাণ-ধারা!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মণিপুর চিত্র

অতিথি-সৎকার।

মণিপুরে অতিথি-সৎকার এক শোভনীয় ব্যাপার। অতিথিকে যদি সৎকার করিতে হয়, তাহার জন্য বন্দোবস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার তুলন ই হয়না। আজকাল আমরা অতিথি-সৎকার জন্য Garden-party, Evening-party, অথবা Dinner-party, প্রভৃতি Partyর উদ্যোগ করিয়া থাকি, কিন্তু এই Happy valleyতে অতিথি-সৎকারের জন্য 'কীর্ত্তন' দিয়া থাকে। সেই কীর্ত্তন আমাদের যাত্রা-কীর্ত্তন অথবা বাউল-কীর্ত্তন প্রভৃতি বিরাট আয়োজন নহে। আমি এবিষয়ে একটি কীর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিব। জনৈক মণিপুরী ব্রাহ্মণ আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত তাঁহার কন্যার 'সইমালা' পাতাইয়া দিয়াছিলেন; যখন এই ব্রাহ্মণ আগরতলা-বাসী ছিলেন, ঘটনাক্রমে মণিপুরে আসিয়া তিনি দুই মাইল দূরে বাস করেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমার দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং আমার দর্শনাভিলাষ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। আমি শকটারোহণে এই দুই মাইল পথ যাইয়া দেখি তাঁহার বাটীতে লোকারণ্য! বাটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে একটি চৌকীতে বসাইয়া আমার পাদপ্রক্ষালন করিলেন। ইহাই পাদ্যঅর্ঘ্য বলা যায়। পাদুকা ত্যাগ পূর্ব্বক এই স্বাগত অভি-বাদন গ্রহণ করিয়া আমি নগ্ন পদে একটি নাটমন্দির-ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখানে দেখিতে পাইলাম বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি জানিতে অভিলাষ হইবামাত্র কতকগুলি মণিপুরী লোক অগ্রসর হইয়া আমাকে "বার্ত্তন" * করিয়া বসিল। এই 'বার্ত্তন' করার প্রথা মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত। একখানা থালে পান, সুপারী, পুষ্পমালা এবং চন্দন লইয়া আমার নিকট নত শিরে উপস্থিত হইল। ইহাই অতিথির স্বাগত অভিবাদন। চন্দনের টীকা দান করিয়া, পুষ্পমালা গলায় ঝুলাইয়া তাম্বুলদ্বারা আমাকে স্বাগত করিল।

---

* "বার্ত্তন" আর এখানকার "পান দেখান" প্রায় একই জিনিষ। "বার্ত্তন" খুব সম্ভব বার্ত্তা শব্দের অপভ্রংশ, ইহা "নিমন্ত্রণ" করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যাগতকে যে পান দেওয়া হয় তাহাকে "পান পিবা" "পান দান" বলা হয়। পাদ্যঅর্ঘ্য প্রথমেই দেওয়া হয় তৎপর আসন গ্রহণ করার পর "সেই চন্দন" অর্থাৎ পুষ্পচন্দন দান ও তাম্বুল দান দ্বারা অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করার নিয়ম। ইহা ছোট-বড় সকল ব্যাপারেই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে করা হয়। ইহা ভিন্ন অভ্যর্থনার অঙ্গ পূর্ণ হয় না।

আমি দীনবেশে কুটুম্বসমাগমে গিয়াছিলাম এই বিরাট আয়োজন করার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং আমি আশাও করি নাই। আমি রাজপারিষদরূপে এ বাড়ীতে কখনও উপস্থিত হই নাই এবং ইহা আমার উদ্দেশ্যও নয় তবে এ রাজসিক আয়োজন কেন; এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুটুম্বকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন জানিতে পারিলাম তিনিও আমাকে কুটুম্ব ব্যতীত রাজ-পারিষদরূপে গ্রহণ করেন নাই। দূরদেশাগত কুটুম্বকে যে উপায়ে তাঁহারা অভ্যর্থনা করেন এই অভ্যর্থনাও সেইরূপ। মণিপুরের প্রথা,—এমন কি পররাজ্যে মণিপুরবাসীগণ এই প্রথাই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতিথিকে এবং কুটুম্বকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া জানেন। প্রত্যেক মণিপুরী পল্লীতে একটি করিয়া নাটমন্দির বৃহৎ চালাঘর থাকে। ইহা গ্রামবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। এখানেই তাহাদের আমোদ-প্রমোদ অভ্যর্থনা এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়। গ্রাম-সম্পর্কে উপস্থিত অতিথি, সকলেরই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত হইয়া পড়ে; কাজেই গ্রামের একটা আনন্দোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে নির্ব্বাচন করিয়া এই অতিথি অভ্যর্থনার লোক ঠিক করা যায়,—অতিথি-সৎকার ব্রতে কে কে কোন্ কাজ করিবে। মণিপুরে জাত্যভিমান নাই। উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি করিয়া থাকে। আমার আগমনে গ্রামের লোকেরা এই সম্মিলন-সভার আয়োজন করিয়াছেন। ইহাতে খরচের বিড়ম্বনা নাই, গ্রামের লোক সকলের ঘর হইতে যে যে রকম সাহায্য করিতে পারেন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। খোল করতল লইয়া বাদকবৃন্দ আসরে নামিয়া বাদ্য বাজাইতেছেন আর গায়কগণ জয়দেব গান গাইয়া যাইতেছেন। এই জয়দেব গান মণিপুরী রাগিণীতে গীত হইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক এক জন লোক উঠিয়া গায়কগণের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট গান গাইতে পারিতেছেন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাম্বুল দানে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাতে বালক বৃদ্ধ ভেদ নাই। ইহা গায়কের প্রাপ্য সম্মান। বয়সের সঙ্গে তাহার তারতম্য হয় না। এ প্রথাও আমার নিকট বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কোমল কলাপাত এমন বিচিত্র রকমে কাটা হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মণিপুরের শিল্পচাতুর্য্যের তারিফ না করিয়া উপায় নাই। যখন কীর্ত্তন শেষ হইল, তখন পরস্পর কোলাকোলি এবং অতিথির নিকট আসিয়া আবার বার্ত্তন করিয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তারপর জলযোগ, তাহাতেও আড়ম্বরশূন্য। খইয়ের মোয়া, তিলের পিষ্টক এবং গ্রামের ফল দ্বারা অতিথির ভোগ দিলেন এবং সকলে তাহা আস্বাদন করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া Happy-valleyর অতিথি-সৎকারের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম. এই আড়ম্বর শূন্য ব্যাপার অথচ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একটি উৎসব। গ্রামে গ্রামে এই প্রথা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গ্রামে দূরাগত অতিথিকে আত্মার্পণ করিয়া অতি নিকট-আত্মীয় করিয়া লইতেছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সমাগমে এই অতিথি-সৎকার পূর্ণ হইয়াছিল এবং আমিও আতিথ্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, আমি কুটুম্বসমাগমে গিয়াছিলাম কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক আমার সম্পর্কান্বিত হইয়া পড়িল। তারপর মহিলা-মহলের রসিকতা, পুরুষ মহলের রসের কথা আমাকে রসস্থ করিয়া দিয়াছিল। মেয়ে পুরুষ মিলিয়া আমাকে এবং আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে বয়সের সুবিধানুসারে সম্পর্ক পাতাইয়াছিল এবং এ উপলক্ষে রসিকতা প্রচুর হইয়াছিল। এই কুটুম্বসমাগমে যে কয় ঘণ্টা বিমল আনন্দে কাটাইয়াছি, তেমন সুখ আমার জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

পরস্পর।

—:*:—

(বাইবেলের ছায়া)

কা'র কথা !—কা'র স্বর !—শোনো লো সখী,
অই বুঝি নেচে গেয়ে
অই বুঝি আসে ধেয়ে !
—দেখ নিরখি—
পার হয়ে' নদী-গিরি
বনে বনে খুঁজি ফিরি,
অই বুঝি বঁধু মোর—দেখ না লখি—
অই বুঝি আসে পিয়া—দেখ লো সখি !

সাধের কুরঙ্গ মোর চপল গতি !
এ নব যৌবন-বনে
রসালস-বিলসনে,
রভসে অতি,
রহিবে না দু'টা দিন ?
আঁখি-জল দুখ-চিন্
মুছিতে বারেক বড় ব্যাকুল-মতি !
সাধের কুরঙ্গ মোর চপল গতি !

বৃথাই কি নিতি নিতি শয়ন রচি ?
তুলি নব কিশলয়
বিকশিত ফুলচয়,
মুকুলে খচি,
জ্বালি নিতি দীপ-ভাতি
জেগে থাকি সারা রাতি,
পাতাটী নড়িলে চিত পড়ে মুরছি ?
বৃথাই কি নিতি নিতি শয়ন রচি ?

(২)

ওঠ ওগো কথা কও মধুর হাসি,
প্রিয়া-সখী-সু-ভাষিণী,
সু-কুসুম-সুবাসিনী,
রূপের রাশি,
দেখ প্রিয়া দেখ চাহি,
শীতের কুয়াসা নাহি,
আকাশ হাসিছে আজ আলোকে ভাসি!
ওঠ ওগো কথা কও মধুর হাসি!

আকুল আঙুর বন ফলের ভারে!
লতায় লতায় ফল
ঝলমল টল্ টল্
হ্রদের পারে!
নবীন মুকুল ফুল
তরুগুলি নিরাকুল,
সে শোভা-সৌরভ-ভার বহিতে নারে।
আকুল আঙুর বন ফলের ভারে।

এস এ কাননে আজি প্রেয়সী মম।
কপোত কূজন করে
বিরহ-বেদন-ভরে ;—
কোমল-কম
অমল সমীর বয়,
মানস অবশ হয়
স্মরিয়া পরশ তব সরসতম!
এস এ কাননে আজি প্রেয়সী মম!

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

শ্রমশীলতা।
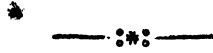
শিনোলার মার্কুইস্, সার হোরাস্ ভিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আচ্ছা সার হোরাস্, কিসে আপনার ভাই মারা গেলেন?" হোরাস্ উত্তর করিয়াছিলেন—"কিছু করবার না থাকাতেই তিনি মারা গেছেন।" মার্কুইস্ বলিয়াছিলেন "কাকো মারবার জন্যে ওই কারণটিই যথেষ্ট বটে।" এই কথা কয়টির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। আমাদের বিশ্বাস যে বেশী কাজ করাও সম্ভব। আমরা জানি যে সাধারণ রকম পরিশ্রম সে সকলেই প্রায় করিতেছে। বেশী কাজ করিলে যে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন শক্তি কমিয়া যায় সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। শ্রমশীলতা হইতে অলসতাই যে বহু লোকের মৃত্যুর কারণ ইহা নিত্যই দেখা যাইতেছে। শারীরিক শক্তি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য শ্রমশীলতা ভগবানদত্ত জিনিষ। শারীরিক মানসিক এবং নৈতিক ক্ষমতা বাড়ানো পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করে, অলসতার উপর নহে। শেষোক্তটি ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু, জড় করিয়া দেয়, শ্রমে মনুষ্যত্ব আনে, অলসতায় কখনও নহে। যে চাবিটি সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায় সে যেমন উজ্জ্বল থাকে—অব্যবহার্য্যটিতে মরিচা ধরিয়া যায়, শ্রমবিমুখ জনেরও তেমনি ভিতর বাহির মরিচা পড়ে।

বোষ্টন সহরের একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের একদিন রাস্তায় দেখা হওয়ায় বন্ধুরা তাঁর শারীরিক অসুস্থতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন "প্রায় এক বৎসর হ'ল আমি ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিলাম—নিশ্চিন্ত আলস্যের জীবন কতই না সুখের হবে, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার মত হতভাগ্য আর জগতে নেই। আমি এখন মেইনের দিকে চলেছি একটা ফ্যাক্টরি কিনবো মনে করে, কারণ এম্নি ভাবে আর কিছুদিন জীবন চল্‌লে আমি মারা যাব। এই 'কিছু না করিবার প্রলোভন' তাঁর পুষ্ট সুগঠিত দেহটিকে প্রায় পঁচিশ সের কমাইয়া দিয়াছে—এবং মৃত্যুভয়ও দেখাইতেছে। শুধু কর্ম্ম,—ডাক্তারদের এ ব্যাধি সারাইবার ক্ষমতা নাই।

মানসিক দৃঢ়তা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে মন যখন পূর্ণ হইয়া ওঠে—শ্রমশীলতা ইহাদের সঙ্গে আসিবেই আসিবে। মানুষ অবশ্যই কাজ করিবে। ওই সব গুণাবলীর সঙ্গে ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সিডিয়নলির বাল্যকাল এমন দারিদ্র্যে কাটিয়াছিল যে শীতকালেও খালি পায় তাহাকে কর্ম্মগৃহে যাইতে হইত—দিবসে ষোল ঘণ্টা শ্রম করিতে হইত, তাঁহার শিক্ষানবীশ অবস্থায়। কালে ইনিই নিউইয়র্ক সহরের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, মেয়র এবং দেশ-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। পরিশ্রম করার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া প্রত্যেক যুবকের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য ইহাই আমরা মনে করি। কার্য্যারম্ভে ইহার বলেই সে কৃতকার্য্যতার দিকে অগ্রসর হইবে। যদি তাহার প্রতিভা থাকে পরিশ্রম ইহা উন্নত করিবে, যদি না থাকে অক্লান্তশ্রম সেই স্থান পূর্ণ করিয়া লইবে। প্রতিভা শ্রমকে কখনও তুচ্ছ মনে করে না, অতি প্রতিভা সম্পন্ন লোক যাঁরা তাঁরাই সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী। টার্ণারকে তাঁহার কৃতকার্য্য-তার গুপ্ত কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন "কঠোর পরিশ্রম—এ ছাড়া গুপ্ত কারণ আর কিছু আমার নাই। এই গুপ্ত কারণটিই অনেকে এখনও শিখ্‌তে পারে না তারা কৃতকার্য্যও হয় না—কারণ তারা এ শেখে না। শ্রমই হচ্ছে সেই প্রতিভা যাতে বিশ্বের কদর্য্যতা ঘুচিয়ে তাকে সৌন্দর্য্যেমণ্ডিত করে তোলে, অভিশাপ

ষর হয়ে দাঁড়ায়।" ওয়েবেষ্টার বলিয়াছেন—নিজকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা—এবং ওই কার্য্যে সফলতা লাভ এই ছিল তার প্রতিভা এই ছিল সর্ব্বস্ব।

বিশ্বে যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গেছেন তাহারা কেহই এই গুণটার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। কৃতকার্য্যতা লাভের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণরূপেই ইহাকে তাহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন তাহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ 'বাণী' লিখিয়া গেছেন—যথা—"তুমি জীবনকে অবশ্যই ভালবাস? তবে সময় বৃথা নষ্ট কোরো না কারণ জীবন উহাদ্বারাই রচিত।"

"সময় যদি সব জিনিসের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়—সময় নষ্ট করাই তবে সব চেয়ে ক্ষতিকর।"

"অলসতা সব জিনিসকেই কঠিন বানায়, কিন্তু শ্রমশীলতায় সব সোজা হয়ে যায়।"

"যে বেশী বেলা করে ওঠে রাত্রেও সে কচিৎ কাজের নাগাল পায়; অলসতা এত মন্থর গতিতে চলে যে দারিদ্র্য শীঘ্রই তাকে ধরে ফেলে।"

"যারা কাজ করে খায় ক্ষুধা তাদের দ্বারে উঁকি মারিলেও ঢুকিতে সাহস পায় না।"

"আজকার একদিন আসছে দু'দিনের সমান।"

"বিশ্রাম চাও তো ভাল করে নিজের সময় খাটাও, এবং যে পর্য্যন্ত না একমিনিট সম্বন্ধেও তুমি নিশ্চিত—ততক্ষণ এক ঘণ্টা বৃথা ব্যয় কোরো না।"

একজন যুবক ব্যবসায়ীকে তিনি লিখিয়াছিলেন "মনে রেখো সময়ই টাকা, যে পরিশ্রম করে দিনে দশ শিলিং রোজগার করতে পারে সে যদি আলস্যে কিম্বা অপর কোন আমোদে মাত্র ছয় পেনী খরচ করে দিনের অর্দ্ধেক কাটায় তো মনে কোরো না সেই সামান্য ছ' পেনী মাত্রই তার খরচ হয়েছে, সে বাস্তবিক খরচ করেছে অথবা বৃথা নষ্ট করেছে ওর উপরেও পাঁচ শিলিং।"

তাঁহার আত্মচরিতে তিনি যে ভ্রাতার নিকট শিক্ষা-নবীশ ছিলেন তাঁহার নিকট হইতে অধ্যয়নের জন্য বেশী সময় করিয়া লওয়ার বন্দোবস্তের উল্লেখ আছে।

"আমি আমার ভাইএর কাছে প্রস্তাব করিলাম যে, তিনি সপ্তাহে আমার আহারের জন্য যত ব্যয় করেন তাহার অর্দ্ধেক যদি আমাকে দেন তবে আমি নিজের আহারের বন্দোবস্ত নিজে করিয়া লইতে পারি। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আমি দেখিলাম আমাকে তিনি যাহা দিতেন তাহার অর্দ্ধেক আমি বাঁচাইতে পারিতাম। এতে আমার বই কিনিবার আরও একটা অতিরিক্ত তহবিল হইল—এবং আমি আরও এক সুবিধা পাইলাম, আমার ভাই এবং আর আর সকলে আহারের জন্য ছাপাখানা থেকে বাইরে গেলে আমি আমার সামান্য জলখাবার একখানা বিস্কিট কিম্বা এক টুকরো রুটি ও একগ্লাস জল খেয়ে বই নিয়ে বসিতাম—মিতাহারে মাথা বেশ পরিষ্কার থাকে, তাই আমার পাঠও দ্রুত অগ্রসর হইত। বাজে কাজের বোঝা কমিয়ে সময় যথাসম্ভব কাজে লাগানের এ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—এবং তাঁহার সফলতা লাভেরও একটি কারণ।"

প্রতিভার কথায় একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন "Is but Capability of Labouring intensely; the power of making great and Sustained efforts',—এ সম্বন্ধে কিটো তাঁহার একজন বন্ধুর কাছে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"আমার কোন বিশেষ প্রতিভা নাই এবং সে চাইও না. আমি শুধু জানি আমার কিছু শ্রম করিবার ক্ষমতা আছে—এবং সেই ক্ষমতা ঠিক পথে লাগাতে পারাতেই আমার যে একটু সফলতা লাভ হয়েছে।"

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডিও কিটোর সম্বন্ধে এই কথাই লিখিয়াছেন—"যা কিছু তিনি করিয়াছেন নিজ ক্ষমতাই করিয়াছেন, এ কোন ইন্দ্রজাল সাহায্যে কিছু করা নয়—শুধু ধৈর্য্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমেই এ হইয়াছে। তিনি সিংহের মত তার শিকারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়েন নাই কিন্তু তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাজ বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে করিতেন, কিন্তু সব সময়ই কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকিতেন।"

পাঠকগণ এই সব উদাহরণ হইতে অবশ্যই দেখিতেছেন যে শ্রমশীলতাই কৃতকার্য্যতার পথ সুগম করিয়া দেয়, এমন কি অতি অলস প্রকৃতির লোক যে সেও ইহার মূল্য অস্বীকার করিতে পারে না। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন একজন নবীন ব্যবসায়ীকে লিখিয়াছিলেন "ভোর পাঁচটা কিম্বা রাত্রি নয়টায় তোমার হাতুরীর শব্দ যদি তোমার পাওনাদার শোনে তো সে ছয় মাস শান্ত হইয়া থাকিবে, তাগিদ দিবে না—কিন্তু কাজের সময় তোমায় যদি সে কোন তাসের আড্ডায় কিম্বা শুঁড়ির দোকানে দেখিতে পায় তো সেইদিনই সে তোমায় তাগিদ আরম্ভ করিবে ও সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারা পর্য্যন্ত তাগিদের চোটে উত্যক্ত করিয়া মারিবে।"

পরিশ্রমী লোকের যেরূপ সহায় ও বন্ধু জোটে অলসের তেমন জোটে না, অলস লোক কাহারও নিকট সম্মান বা বিশ্বাস পায় না। আর সবদিকে তার চরিত্র সুন্দর হইলেও অলসতাই একটা মস্ত কলঙ্ক। সাধারণে তাহাকে সন্দেহের চোখে দেখে, সে অর্থ, জ্ঞান, বা ধর্ম্ম কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সর্ব বিষয়েই সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

হৃদয়বান ব্যক্তিরা পরিশ্রমীকেই সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, অলসকে নহে। কারণ শেষোক্তটির সাহায্য করিয়া কোন ফল নাই, অলসকে সাহায্য করাও যা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়াও তাই। সাহায্য পাইলে অলসের অলসতা আরো বাড়িয়া চলে। অলসতার প্রশ্রয় কোনরূপে দেওয়া মহাভুল, সমাজ ও জাতির অহিতকর। এই জন্য আমেরিকার অধিকাংশ সহরেই তাহাদিগকে সংশোধনাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। অভিজ্ঞতায় জানা যায় কোনরূপ সাহায্য পাইলে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, ধনী হউন, শিক্ষিত হউন, ভদ্র হউন—অলস প্রকৃতির সকল লোকদেরই ঐ এক পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

শ্রম করিয়া যাহারা নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই—তাহারা রাজার সম্মুখেও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত।

যুবকদিগের কখনো ভুলিলে চলিবে না যে—পরিশ্রমই ঐশ্বর্য্যের জন্মদাতা, অলসতা কখনো কোন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা কোন জাতির এক পয়সাও বাড়াইতে সক্ষম হয় নাই। পরিশ্রমেই বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এ সুখ সৌভাগ্যের এক কণাও অলসতার দান নহে। এই স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান মন্দির, রেল রাস্তা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ সবই পরিশ্রমের দান। ইহাদের কোন একটিও স্থায়ীত্বের জন্য অলসতার নিকট ঋণী নহে। প্রাসাদ নহে—কয়েদখানা, শিল্প-সৌন্দর্য্য নহে—অন্ধগৃহের কোণ, শিক্ষা ও বিজ্ঞান নহে—শুধু মূর্খতা এইগুলিই হইতেছে সর্ব্বদেশে অলসতার দান।

শোনা যায় যে—পাঁচডলার দামের সাধারণ লোহা, ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরী হইলেই তার দাম হয় দশ ডলার, ছুরি তৈরী হইলে তার দাম হয় একশ আশি ডলার, ছয় হাজার অটশ' ডলার দাম হয় সূঁচ তৈরী করিলে, ঘড়ির স্প্রিং তৈরী করিলে দাম হয় দুই লক্ষ ডলার—হেয়ার স্প্রিং তৈরী হইলে দাম হয় চারি লক্ষ ডলার। এই হিসাব ঠিক সত্য কিনা জানি না—কিন্তু পরিশ্রমে যে মূল্যের এইরূপ আকাশ পাতাল তারতম্য হয় ইহাতে সন্দেহ

করিবার কিছু নাই। কৃষাণ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে স্বল্প, কিন্তু সেই বীজ ফলানোর জন্য জমীর উপর সে যে অসাধারণ পরিশ্রম করে ভগবানের অনুগ্রহে রোদ বৃষ্টি সময় মত হলে সে বীজের কত গুণ ফসল লাভ ক'রে তার শ্রমের সার্থকতা লাভ করে। শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে এই চিন্তা সব সময় মনে করা দরকার। জগতের অর্দ্ধেক লোক যদি শ্রম না করে তবে অপরার্দ্ধ যে তাহার ফলে অনশনে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি শ্রমই সকল ঐশ্বর্য্যের স্রষ্টা তবে শ্রমীরাই জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড, শ্রমী বলিতে যাহারা হাতে খাটে আমরা শুধু তাহাদিগকেই বুঝিতেছি না, যাহারা মাথা খাটাইয়া পুস্তক রচনা করিতেছেন, শিক্ষা দিতেছেন, বক্তৃতা দিতেছেন, কাগজ চালাইতেছেন সকলের হিতের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহারাও শ্রমী। ইহাতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও এই পর্য্যায়ে পড়িবেন, কৃষাণ, বণিক, অধ্যাপক কলওয়ালা সকলেই পাশাপাশি দাঁড়াইবেন। একজন অতি হীন অবস্থার কলাবিদ্‌ও তাঁহার দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে ও দেশ সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন তাঁহার দেশবাসী চারিঘোড়ার গাড়িওয়ালা সুন্দর লোভনীয় পোষাক পরিহিত লক্ষপতির চেয়ে। কয়লার খনির একজন ইঞ্জিন ফায়ারম্যানই লকোমোটিভের (locomotive) স্রষ্টা। একজন অন্ধের যন্ত্র নির্ম্মাতাই ষ্টিমইঞ্জিন (Steam Engine) তৈরী করিয়াছিলেন। আরো বহু অশিক্ষিত শ্রমজীবিরা জগতের সভ্যতা বৰ্দ্ধনের জন্য তাহাদের সমস্ত জীবনের শ্রম উৎসাহ অকাতরে ব্যয় করিয়া গেছে। হোরাস্ ম্যান্ বলিয়াছেন—"যুবকেরা স্মরণ রেখো, জাতির উন্নতির জন্য যেমন কোন কাজই হোক না কেন তাহার মধ্যে দীনতা বা হীনতা বিন্দুমাত্র নাই। যে লাঙ্গল চষিতেছে সেও একদিন ওয়াসিংটন হইতে পারে। যেমন কাজই হোক না কেন মনের উচ্চতা চাই—মনের প্রসারতা থাকা চাই।"

শ্রমে যেমন আশা ও উদ্দীপনা আনে এমন আর কিছুতেই নহে। অন্তর্নিহিত সকল সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রমের গুণ। ৫৫ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ লেখক সার ওয়াল্টারস্কট তাঁহার প্রকাশকদের দোষে খুব বেশী ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, পরিশ্রমে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল, তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন ঋণের শেষ কড়িটাও তাঁহাকে পরিশোধ করিতে হইবে। সেই শ্রম ক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি কলম ও খাতা লইয়া বসিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইয়া এমন কি নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত সংক্ষেপ করিয়া বীরের ন্যায় একাগ্র সাধনায় তৎপর হইলেন। শরীর, মন, ঋণ শোধের জন্য সব যেন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের পর গ্রন্থ গল্প বাহির হইতে লাগিল—(ইহার মধ্যে কয়েকখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) শ্রমের ডাকে মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতিটি শক্তি যেন সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর ওইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তিনি ঋণ নিঃশেষে শোধ দিলেন। এই কঠোর পরিশ্রমের পর অল্প দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন—দেশসেবক যেমন দেশের জন্য প্রাণ দেয় তিনিও সাহিত্যের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

অলসতা নানারূপ জঘন্য দোষ ও অপরাধের জন্মদাতা, শয়তান আর সকলকে প্রলোভিত করে কিন্তু অলস যে সেই শয়তানকে প্রলুব্ধ করে। এই শ্রেণী সাধারণতঃ তাস, পাশার আড্ডা, থিয়েটার প্রভৃতি পছন্দ করে। "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" খেলাধূলা করিবার লোভ, উচ্ছৃঙ্খল আমোদের মোহ এই সব অলস মুহূর্ত্তেই মনে জাগে। এই সব লোকদ্বারাই শয়তান কাজ করাইয়া লয়। একজন ইংরেজ কারাধ্যক্ষ বলেন—"বহুপ্রকার অপরাধীদের সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে প্রায় সকলপ্রকার অসাধু চরিত্রতার কাজেই অজ্ঞতা, মত্ততা কিম্বা দারিদ্র্য হইতে নহে, কিম্বা সহরের অসম্ভব জনবাহুল্য চারিদিকের ঐশ্বর্য্যের লোভ—কিম্বা অপর কোন কারণের জন্যই নহে—সাধারণ পরিশ্রমের চেয়ে অতি অল্প পরিশ্রমে কিছু প্রাপ্তির প্রবৃত্তি হইতেই এই সব অপরাধের বাহুল্য দেখিয়াছি। তহবিল ভাঙ্গা কিম্বা অতি নীচ অসাধুতার যে সব কাজ, এ প্রায়ই অলস শ্রেণীর দ্বারা হয়. এবং এ টাকার অধিকাংশই—মদ. বেশ্যালয়. নৰ্ত্তকী প্রভতির জন্যই ব্যয়িত হয়।

সকল দেশেরই সংশোধনাগারের লোকের আমদানী হয় এই অলস শ্রেণী হইতে, অলসতাই সকল রকম অন্যায় ও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারস্বরূপ। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ব্লকি তাঁহার 'Self culture'এ লিখিয়াছেন,—এই মানুষের মস্ত রক্ষাকবচ যখন সে বলিতে পারে আমার কোনরূপ বাজে কাজের সময় নাই, নানা আবশ্যকীয় কাজেই আনন্দ—এবং এর পর সুখের বিশ্রাম উপভোগ করিয়া আবার নূতন উদ্যমে নবীন কার্য্যে প্রবেশ করিতে হইবে।"

পরিশ্রমে এবং পরিশ্রমলব্ধ অর্থে যে একটা মানসিক উল্লাস ও তৃপ্তিলাভ হয় তেমন তৃপ্তি ধনী তাহার মূল্যবান মণিরত্নাদিপূরিত ধনভাণ্ডারের এক কোণ উজাড় করিয়াও পাইতে পারে না। পরিশ্রমেই আত্মসম্মান ও আত্ম-বিশ্বাস পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবি সভার সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।—সুখের বিষয় বাঙ্গলা জুড়িয়া একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, আলোচ্য সভার কার্য্যকলাপ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সভা বারুজীবি জাতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পরোক্ষে স্বদেশের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। স্বনামধন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন—'তত্ত্বদর্শীর নিকট হিন্দু মুসলমান সমান। * * গোঁড়ামী মঙ্গলদায়ক নয়। * * ভগবান্ বিশ্বব্যাপী, তাঁহার ঠিক মন্দির গড়া যায় না। কারণ তিনি অনন্ত ও অবাঙ্মনসোগোচর। আমরা আমাদের শক্তি সাধ্যমত তাঁহাকে 'ছোট' করিয়া লইয়া তাঁহার উপাসনা করি। * * যে যেভাবে উপযুক্ত, সে সেই ভাবে তাঁহাকে ভাবে বা উপাসনা করে। চিন্তা করিতে গেলে মূর্ত্তি চাই। মনের ভাব প্রকাশ করিবার নানা পথ। * * ধর্ম্ম লইয়া দলাদলি কেবল অজ্ঞতা-বশতই হইয়া থাকে। বারুজীবি সভায় এ উদারতা অক্ষয় হউক। জগতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে দশকে রক্ষা করিতেই হইবে। সকলের সহিত সদ্ভাব না থাকিলে কখনো শেষ রক্ষা হয় না, স্বার্থরক্ষা পায় না, অকালে ব্যক্তিবিশেষের অপরিণামদর্শীতায়, লোভে আত্মস্বার্থ। সংসারে স্বার্থ তুচ্ছ নহে পরিণামে যাহার আত্মোন্নতি, ঐশ্বর্য্যে উন্নতি পরোক্ষে পরের উন্নতি নষ্ট হয়। জগতের সকলেই এই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যস্ত, নিজের উন্নতির সহিত দেশকে ধন ঐশ্বর্য্যে বিদ্যাগরিমায় ভূষিত করিয়া সকলেই শীর্ষস্থান লাভ করিতে প্রাণপণ করিতেছে, আমারই কেবল সংস্কারের গণ্ডীবদ্ধ হইয়া, নিজের ও পরিবারের ক্ষণিক স্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়া সমগ্র জাতির, স্বদেশবাসীর স্বার্থ যাহা যাহাতে জাতীয় শক্তি বৰ্দ্ধিত হইবে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত! বারুজীবি সভা আমাদের এই জাতীয় কলঙ্ক আমাদের একতাহীন স্বার্থ যৌথকার্য্য করণের অন্তরায় যদি অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে দূর করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব। ইঁহারা বিলাত প্রত্যাগতগণকে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে সমাজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যে উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়!

সভা, বারুজীবিগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা উপযুক্ত ছাত্রকে অর্থ ধার দিয়া শিক্ষা সৌকর্য্য করিতেছেন। ক্রমেই উচ্চশিক্ষা এদেশে যেরূপ মহার্ঘ্য হইতেছে তাহাতে মধ্যবিত্ত কেন ধনীর পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয় দুর্লভ, এই সঙ্কটের দিনে শিক্ষায় জাতির সমবেত চেষ্টা অত্যাবশ্যক। একাল পর্য্যন্ত, 'ইঁহাদের সাহায্যে ১৮৫ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহীত সাহায্যের টাকা সভাকে আংশিক প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।' তাঁহাদের অপরিশোধনীয় ঋণ পরিশোধে আরও কত নূতন ছাত্র বিদ্যালাভে সমর্থ হইবে। এমনি ত হওয়া চাই! কিন্তু দুঃখের কথা, বিবরণে প্রকাশ অনেকেই এই ঋণ পরিশোধে উদাসীন! এইখানেই শিক্ষার ব্যর্থতা, শিক্ষিত জাগ্রত হউন আপনার ঋণ

অপরিশোধিত রাখিবেন না, আপনার স্নেহের জ্ঞান-বর্ত্তিকা উজ্জ্বল হ'ক। এ কুটীর দেশে পরস্পর মিলিত না হইলে যে গত্যন্তর নাই,—সামাজিক জীবনে শিক্ষিতের তাহাই সাধনার লক্ষ্য হউক'।

(প্রাপ্ত)

সারনাথের ইতিহাস—রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম.এ. সঙ্কলিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১।৷৹ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনবাবু সারনাথের ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। সারনাথের বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হওয়া এই প্রথম। সারনাথ বারাণসীর নিকট অবস্থিত। ইহা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সার্দ্ধসহস্রাধিক বৎসরের মূর্ত্তিমান সাক্ষ্য। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মসমাজ গঠন করেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের চারি তীর্থের মধ্যে সারনাথ অন্যতম। পরবর্ত্তী কালে সম্প্রদায় গঠন, তান্ত্রিকতা ও দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও মতবাদ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার সংবাদ সারনাথে আবিষ্কৃত লিপি ও মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতীয় শক, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও চেদি রাজগণের আধিপত্যের প্রমাণও সারনাথে বিদ্যমান আছে। সারনাথে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী ও গুপ্তলিপি এবং দেবনাগর ও বাঙ্গালা লিপিগুলি ভাষাতত্ত্ব আলোচনার অতি উৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পের অবস্থা একত্রে দর্শন করিতে হইলে এই সারনাথে আগমন করিতে হইবে। সমসাময়িক গ্রন্থ ব্যতীত বৈদেশিক ভ্রমণকারী ফাহিয়ান (৪র্থ শতাব্দী,) হিউয়েন সাঙ, ইচিঙ্গ (৭ম সতাব্দী ও তাইসং (৮ম শতাব্দী) এর লিখিত বৃত্তান্তে সারনাথের প্রাচীন সমৃদ্ধির অবস্থা বিবৃত আছে। সারনাথ দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ অথবা মুসলমানগণের দ্বারা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়।

পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী, ডাঃ ভিনিস, ডাঃ ভোগেল, মিঃ মার্সাল, মিঃ কিটো, জেনেরাল কানিংহাম প্রমুখ ইয়োরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণ সারনাথের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাবু কেবল পুস্তক পড়িয়া ইতিহাস লেখেন নাই। তিনিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে সারনাথের ইতিবৃত্ত, সমৃদ্ধি ও আবিষ্কৃত বস্তুর পরিচয় গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থে ৬ খানা মাত্র দ্রষ্টব্য চিত্র আছে। কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে বাঙ্গালী পাঠক ঘরে বসিয়া "ঘোলে দুধের সাধ" মিটাইতে পারিতেন। এই গল্পের বাজারে এই শ্রেণীর পুস্তক বিক্রয় করিয়া গ্রন্থকার লাভবান হইবেন, আশা করি না। এইজন্য মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিলাম। গ্রন্থের ভাষা উত্তম। তথাপি দুই এক স্থান আপত্তিকর বলিয়া মনে হইল। যথা—২য় পৃষ্ঠার (গ্রন্থকারের নিবেদন) ৯ম ও ১৬শ পংক্তি, ২য় পৃষ্ঠার ২১শ পংক্তি, ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ৩য় ও ১৪শ পংক্তি ইত্যাদি।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভ্রম সংশোধন।

অনবধানতা বশতঃ গত শ্রাবণ সংখ্যা পরিচারিকায় 'সাধুভাষা' নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভুলগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, যথা—

৫৯৮ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তিতে 'সংস্কৃতের শব্দের' স্থলে 'সংস্কৃতেতর শব্দের', ৫৯৯ পৃঃ ১ম পংক্তিতে 'বিশ্বাস' স্থলে 'বিন্যাস' উক্ত পৃঃ ৫ম পংক্তিতে 'আজকালও' স্থলে 'থাকিলেও', ৬০০ পৃঃ ৯ম পংক্তিতে 'পূর্ব্বপশ্চিম বঙ্গের' স্থলে 'পশ্চিম বঙ্গের' এবং ৬০১ পৃঃ ২৩ পংক্তিতে 'আবিরাধর্ম্মে'র স্থলে 'আবিরাবীর্য্য' হইবে।

মৃত্যুর আলোকে

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
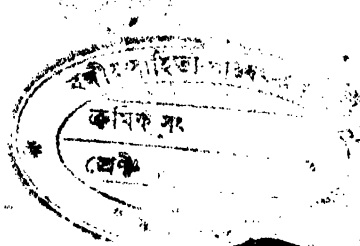
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। { আশ্বিন, ১৩২৬ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

জ্ঞান জননী।

মাগো তোমারি চরণ জ্যোতি শলাকায়
ফুটাও তাদের আঁখি।
যারা শুধু ভান করে চিনেনা তোমায়
স্বার্থ আঁধারে থাকি।
ভূমারে যাহারা চরেণ ঠেলিয়া
বিরাট মহান রুদ্রে ফেলিয়া
তুচ্ছ ক্ষুদ্রে উচ্চ গণিছে
নাচিছে মাথায় রাখি'।
পূর্ণেরে যারা জানিতে চাহেনা
খণ্ডেরে ভাবে পূর্ণ
আঁকড়ি ধরিতে না পারি সমূহে
করিবারে চায় চূর্ণ

শাশ্বত ধ্রুবে দূরে পরিহরি
অনৃত অধ্রুবে রয়েছে আঁকড়ি
তেয়াগি সত্যে, ভূষণ করেছে
ভুয়ো ভণ্ডামি ফাঁকি॥
বিধাতার হতে পরম বিধাতা
ভাবে নিজেদের নিত্য,
ঋষি কবন্ধে ছাগের তুণ্ডে
পূজে ইহাদের চিত্ত।
তুমি যে জননী নিখিল জননী
নহে নিজ দেশই অখিল অবনী
মহামানবের অরাতিগণেরে
একথা বল মা ডাকি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

সেবাব্রত।

এই যে ছোট একটি সেবামণ্ডলী আজ আমায় আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বসিবার অধিকার দিয়াছেন তাহার মাঝে এই কথাটিই আমায় বিশেষ করিয়া আনন্দ দান করিতেছে যে ইঁহারা আমাকেও এই সেবার আনন্দ হইতে বঞ্চিতা করেন নাই, সেবার সৌভাগ্য দান করিয়া আমাকেও গৌরবান্বিতা করিতেছেন। ইঁহারা আমায় কেবলমাত্র সামাজিক অথবা লৌকিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই, ইঁহারা এই কর্ম্ম-জগতের কর্ম্মক্ষেত্রেও আমায় সহজভাবে ডাক দিয়াছেন। এই বিশাল জগতের অনন্ত দুঃখ বেদনা আর্ত্তনাদে ইঁহারা যেরূপ বিচলিত হইয়াছেন আমাকেও সেই ধ্বনি শুনাইয়া সেইরূপ করুণাধারায় আর্দ্র করিতে চাহিয়াছেন। ইঁহারা কেবলমাত্র আমার দৈহিক শক্তি চাহেন নাই, হৃদয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ অশ্রু চাহিয়াছেন, সেজন্য আমি সত্যই আজ কৃতজ্ঞ হইতেছি, সুখী হইতেছি ও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি! এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন ফাঁকিই চলিবে না, কেবলমাত্র বাক্যের আড়ম্বর নহে প্রতিজনের সাধ্যকেও নিয়োজিত করিতে হইবে। আজ যদি কেহ বলেন আমরা নারী আমাদের সাধ্য কত ক্ষুদ্র এবং এই পৃথিবীর দুঃখ কত বৃহৎ, তবে আমরা বলিব সে কথা সত্য বটে তবে তোমরা কিসে হীন? তোমরা শক্তিরূপা জগন্মাতারই অংশ, তোমরা যে শক্তির আধার সে কথা কি আজ ভুলিয়া যাইবে? একবার ভাবিয়া দেখ,—কি শক্তি তোমাদের নাই, তোমরা জগৎকে পালন করিতেছ, রক্ষা করিতেছ, সর্ব্বনাশ হইতে উদ্ধার করিতেছ! তোমরা পিতামাতার সেবা করিয়াছ,

ভ্রাতাভগ্নীকে ভাল বাসিয়াছ, শ্বশুরালয়ের সকল আত্মীয়কে আপন করিয়াছ, পাড়া-প্রতিবেশীকে স্নেহ দিয়া মুগ্ধ করিয়াছ, রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছ তোমরা হীন কিসে? আজ কি তোমরা এ কথাও ভুলিতে বসিবে যে তোমরা জননী; তোমরা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতেছ, অঙ্কে লইয়া মানুষ করিতেছ, আপনার রক্তধারা দিয়া পোষণ করিতেছ; এই যে মাতৃস্নেহের অসীম শক্তি ইহা হইতে আরো শক্তি কিছু কি জগতে আছে? এই সেবকমণ্ডলী যে আজ তোমাদের সেই শক্তিই ভিক্ষা চাহিতেছে. আজ তোমরা কুণ্ঠিত হইও না, এই বিশ্বের দুঃখী, রোগগ্রস্ত সন্তানদিগের জননীর স্থান অধিকার করিয়া একবার বসো! এখানে কেহ দীন নহে. হীন নহে, কেহ ধনী নহে, মানী নহে, সকলেই এক কার্য্যে ব্রতী; সকলেই সকলের সহকারিণী—সকলেই সেবিকা। এখানে সকলের কার্য্যের মাঝে যেমন একটি ঐক্য থাকা প্রয়োজন তেমনি হৃদয়ের মাঝেও। তাই এই আহ্বানে আমার প্রাণের তারে যে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল, আমায় আর আপনাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে দিল না, সকল অনৈক্যের বিঘ্ন ভঙ্গ করিয়া এই পৃথিবীর ধূলির উপরে দীন হইতে দীনের সহিত সমান আসনে দাঁড় করাইয়া দিল।

এই ঐক্যটি কি, আজ একবার ভাবিয়া দেখি। যেমন অন্যান্য হৃদয়বৃত্তি স্বয়ং উৎসারিত হইয়া আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্ত করে এই সেবাবৃত্তিও সেইরূপ। ইহাকে তর্ক অথবা যুক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হয় না, শাস্ত্রের শাসন দিয়া ইহাকে বুঝাইতে হয় না। এই সেবা-বৃত্তি সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে নিহিত আছে নহিলে মানুষ আত্মীয়স্বজনের জন্য স্বার্থহীনভাবে কার্য্য করিত না। তবে যে-কেহ ইহাকে প্রাধান্য দেয়, যে কেহ ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, যে-কেহ এই সেবা-বৃত্তিকে আত্মীয়ের গণ্ডীর বাহিরে এই জগতের অনাত্মীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারে সেই ধন্য; যে না পারিল সে জীবনের প্রধান আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইল। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে;—যে-কার্য্যে মানুষের স্বার্থ নাই সে-কার্য্য মানুষ করে কেন? কি লোভে, কি আশায়? ইহার একমাত্র উত্তর আনন্দ! আনন্দেই ইহার উৎপত্তি আনন্দেই ইহার স্থিতি। আনন্দই ইহার একমাত্র কারণ এবং উদ্দেশ্য। যে আনন্দ হইতে এই জগৎ সৃজিত হইয়াছে, যে আনন্দের কথা উপনিষৎ বলিতেছেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যে আনন্দে জীবসকল জীবন ধারণ করিয়া আছে, সেই আনন্দ যদি কেহ উপলব্ধি করিতে চাহেন তবে সে বিশ্বের সেবায়।

রাজা রামমোহন রায় বলিয়া গিয়াছেন স্বার্থ এবং পরার্থ দুই-ই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই উভয়ের সামঞ্জস্যের উপর ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিবে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। এখানে তিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থ সাধন করিতেও বলিতেছেন না; শুধু এমন কার্য্য যদ্দ্বারা আপনার এবং সেই সঙ্গে অপরের মঙ্গল হয়, ইহাও সেবাধর্ম্মের অন্তর্গত।

আমরা আজ এই সেবার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার আলোচনা করিয়া দেখি কতরূপে এই কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান—জ্ঞানদান, বিদ্যাদান, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা সকল দুঃখের সকল দারিদ্র্যের অবসান হয়, যে জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা মানবের অন্ধ চক্ষু নীচতার সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল স্থান তুচ্ছ করিয়া অনন্তের পথ দেখিতে পায় সেই জ্ঞানদানের তুলনা কোথায়? বলাই বাহুল্য তবে ইহা যে সকল স্থানে সম্ভব নয় সাধ্যায়ত্তও নয় অথবা প্রয়োজনও নাই। তাই সেবার বহু বিভিন্ন ক্ষেত্র, অবস্থাবিশেষে তাহার কোনটিই হীন নহে;

মরণাপন্ন রোগীর সেবাশুশ্রূষাও যেমন,—দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে অন্নদানও সেইরূপ, অসহায় বিধবার প্রতিপালনও সেইরূপ আবার পুত্রকন্যার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতাকে সান্ত্বনাও সেইরূপ! কোনটিকে উচ্চে আবার কোনটিকে নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। সেবামাত্রই পুণ্য, সেবামাত্রই অবশ্যকরণীয়। ভগবান এই যে একটি পবিত্র হৃদয়বৃত্তি দিয়া আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সকল পশু কীট পতঙ্গ হইতে উচ্চে স্থান দিয়া আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া এই পবিত্র হৃদয়বৃত্তিকে যদি আমরা অবহেলা করি সেও কি ভগবানের আদেশ অমান্য করা নহে? সেও কি অবাধ্য সন্তানের কার্য্য নহে?

যেরূপ সকল কার্য্যের সাধনা প্রয়োজন সেইরূপ এ কার্য্যেরও সাধনা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে আমরা গর্ব্ব করিয়া এ কথা বলিতে পারি—আমরা ভারতবর্ষের নারীজাতি, আমাদিগকে সেবাধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে না, সে দীক্ষা জ্ঞান সঞ্চারের সহিতই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, বাল্যকালেই তার 'হাতে খড়ি' হইয়া গিয়াছে এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত সাধনার প্রয়োজন। যে বিদ্যা আমরা অধ্যয়ন করিতে চাই তাহা যেরূপ আমাদিগকে প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, কিছুদিনের অনভ্যাসে তাহা যেরূপ আমরা পূর্ব্বের মত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিতে পারি না, এই পরার্থপরতাও অনেকটা সেইরূপ, ইহাকে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে অভ্যাস না করিলে কখন ইহা অন্যান্য বিদ্যার মত আমাদের হৃদ্‌গত হইবে না। যদি আমরা পরোপকারকে অভ্যাসগত করিতে না পারি তবে যে মুহূর্ত্তে আমরা দীনদুঃখীর উপকার করিব সেই মুহূর্ত্তেই সুনাম ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী হইব, আমরা আপনার মনে দম্ভে পরিপূর্ণ হইয়া উপকারের পাত্র ও পাত্রীকে দয়ার চক্ষে দেখিব, অর্থাৎ এক কথায় আমরা করুণা করিয়া সুযশপ্রার্থী হইব কিন্তু ইহা যদি একবার আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে সেবাধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মেরই অন্তর্গত তাহা আমারই ঈশ্বর-নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর সুনামের লালসা থাকিবে না, এবং বিশ্বপ্রেমের পরিবর্ত্তে করুণারও উদ্রেক হইবে না। ইহাও আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মেরই অন্তর্গত হইয়া পড়িবে, আমাদের স্বার্থ আমাদের জীবন, আমাদের একান্ত সহজ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মত সেবাও আমাদের জীবনে সরল ও সহজ হইয়া আসিবে। এই যে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মের কথা বলিতেছি ইহাই ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—(ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক)

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, নিরগ্নি অথবা অক্রিয় এতদুভয়ের কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন। আবার আর এক স্থানে শ্রীভগবান বলিতেছেন—(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক)

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

"হে ধনঞ্জয় কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন (হর্ষবিষাদশূন্য) হইয়া যোগস্থ (ঈশ্বর পরায়ণ) হইয়া কর্ম্ম কর, সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।" গীতায় কত স্থানে যে এই আকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সর্ব্বোপরি আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

কর্ম্ম মাত্রে তোমার অধিকার, কর্ম্ম ফলে কদাচ অধিকার নাই। ইহা মুখে বলিতে ও কর্ণে শ্রবণ করিতে যত সহজ, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমরা বহু সময়ে মুখে বলি বটে যে আমি আকাঙ্ক্ষার বশে এ কার্য্য করিতেছি না কিন্তু সত্যই কি এ কথা ঠিক? ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া যদি আমরা সত্যই সকল কার্য্য করিতাম তবে অপবাদে আমরা বেদনা অনুভব করি কেন? তখন আমরা এ কথা বলিয়াও আপন হৃদয়কে প্রবোধ দিয়া থাকি যে আমি ত সুনামের আকাঙ্ক্ষা করি নাই, ইহারা যদি সুনামও না দিত তথাপি মতামত ব্যক্ত করিল কেন? ইহাপেক্ষা নীরবে থাকিলেও ভাল হইত। কিন্তু তখন আমরা এ কথা কেন বলিতে পারি না যে ফলাকাঙ্ক্ষা যদি করি নাই তবে মন্দ অপবাদে আমার দুঃখ কেন? আমার ত সুযশে আনন্দ অথবা অপবাদে দুঃখ হইবার কথা নহে, কারণ আমি যে ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত কর্ম্মী! এইরূপ কর্ম যেদিন আমরা করিতে পারিব সেইদিনই প্রকৃত সেবার অধিকারী হইব। আমরা স্বার্থ-বিজড়িত সংসারের জীব এরূপভাবে সঙ্কীর্ণতার আবরণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি যে স্বার্থশূন্য কর্ম্মের ধারণাও আমাদের কল্পনা বহির্ভূত! বর্ত্তমান যুগে যদি কদাচ দু'একটি এরূপ কর্ম্মীর দেখা পাই তথাপি আমরা সহজে এ কথা বিশ্বাস করিতে রাজি নহি যে লোকটি প্রকৃতপক্ষেই নিঃস্বার্থপর, প্রকৃতপক্ষেই পরসেবাপরায়ণ অথবা আত্মত্যাগী! আমরা সে উচ্চমার্গে পৌঁছাইতে পারি নাই তাই নীচু হইতে শুধু উচ্চ ও মহৎ চরিত্রের ভ্রম অন্বেষণে নিযুক্ত হই, এবং শেষে যদি তাহাও না পাই তবে কল্পনাপ্রসূত অপবাদে শুভ্র চরিত্রে মলিনতা দান করিতে পশ্চাৎপদ হই না! এইরূপে আমরা সেবাধর্ম্মের পথকে আরও কণ্টক সমাকুল করিয়া তুলিতেছি, সহায়তা দূরে থাক্, মহৎ চরিত্রে দোষারোপ করিয়া নিজেরা ঘৃণিত হইতেছি।

সে যাহা হউক একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক স্থান ও অধিকারের ভিতর দিয়া আমরা কতদূর এ-ব্রত পালনে সক্ষম। আমাদের চির অবরোধ প্রথা যে, এ-কার্য্যের অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ নাই তবে ইচ্ছা থাকিলে অবরোধপ্রথার ভিতর দিয়াও যে জগত-সেবা করা অসম্ভব নহে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বিদ্যমান। সেবা দুই প্রকার, এক স্বয়ং সেবার কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া অন্যটি অপরকে দিয়া করান। পরোপকারিণী রমণীগণ ঐ শেষোক্ত প্রকারে সেবা করিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্রামের সময়ে আপন আপন সাধ্যানুরূপ শ্রমসাধ্য শিল্প কার্য্যাদি করিয়া লাভার্জ্জিত অর্থ এই সকল সৎকার্য্যে দান করিতে পারেন। ইহাতে এক পক্ষে যেমন উপকার অপর পক্ষে আবার তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। তবে জীবনে একবার সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তখন আর কার্য্যের মাঝে গণ্ডী টানিয়া রাখিলে চলে না, অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরে সেবাপ্রার্থী ব্যক্তি আসিলে সেবা পাইবে কিন্তু গৃহের বাহিরে যদি সেবার অভাবে কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে তথাপি আমার সেবা পাইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে তবে এরূপস্থলে কি করা কর্ত্তব্য? আমার মতে এইরূপ সেবার কার্য্যে যদি সামাজিক প্রথা কিছু ভাল হয় তাহাতে ক্ষতি নাই; বর্ত্তমান কালের সহিত ত আমাদের জীবনকে মিলাইয়া চলিতে হইবে। পুরাতন প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবনের গতিকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে ত চলিবে না; নানাদিক দিয়া হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, সেবার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরের অভাব দুঃখবেদনাকে নিজের দুঃখ ভাবিয়া তাহা দূর করিবার জন্য সংসারপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমরা কি নিত্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি না—ইউরোপীয় মিশনারীগণ কত শত যোজন দূর হইতে আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া কি দারুণ দৈন্য স্বীকার করিয়া কি গভীর পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন, আত্মীয়বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অশিক্ষিত দৈন্যপীড়িত প্রদেশে তাঁহাদের সকল সাধ্য প্রয়োগ করিয়া শুধু পরোপকারের

মহান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ? আমরা আমাদের দেশের দুঃখ বুঝি না, আমরা ঐ সকল জাতিকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, সমাজের সহিত ইহাদের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি আর সেই দুঃখ গিয়া বাজিল কাহাদের বুকে ? যাহারা আমাদের স্বধর্ম্মী নহে, আমাদের জন্মভূমির সহিত সংযুক্ত নহে, যাহাদের আকারপ্রকার আচারব্যবহার নিয়মপ্রথা সকলই আমাদিগের হইতে বিপরীত তাহারা আসিল আমাদের পতিত জাতিকে উদ্ধার করিতে, বিদ্যাশিক্ষা দিতে, ধর্ম্মের কথা শুনাইতে, তাহাদের সুখেদুঃখে সহানুভূতি জানাইতে, আপনাদের অন্নের গ্রাস তাহাদের মুখে তুলিয়া দিতে ! সব দেখিব, সব বুঝিব তবু একবার লজ্জিত হইব না, তাহাদের মহৎ বলিয়া স্বীকারও করিব না আমাদের কি সত্যই এত অধঃপতন হইয়াছে ? যদি আমরা সত্যই মিশনারীদিগকে ঘৃণা করিতাম, আমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতাম তবে বহুপূর্ব্বে আমরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইতাম, আশ্চর্য্য সেবাধর্ম্ম দেখাইয়া তাহাদের লজ্জা দিয়া তাড়াইতাম কিন্তু তাহা নহে আমরা নিষ্ক্রিয়, আমরা স্বার্থ ফেলিয়া পরের জন্য খাটিতে জনি না, কাঁদিতে জানি না, প্রাণ দিতে জানি না। তাই আজ অপর দেশের আদর্শ দেখিয়া শিখিতে হইবে,—হায় লজ্জা !

এ কথাও উঠিবার সম্ভাবনা যে সেবাধর্ম্মমাত্রই ব্যয়সাপেক্ষ। যাহার অর্থবল নাই তাহার পক্ষে এ পথ একেবারেই বন্ধ ! কিন্তু সকলেই জানেন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়ারও সাগর ছিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে কেহ কখনও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই, শোনা যায় একবার তিনি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর হইয়া খাইতে বসিবেন এমন সময়ে একজন অনাহারী ভিক্ষুক আসিল তখনি তিনি তাহাকে আপনার 'বাড়াভাত' খাইতে দিলেন সেদিন আর তাঁহার নিজের আহার হইল না ; খই ও জল খাইয়া উদর পূরণ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত একবার নহে ইহা তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে, শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত তিনি পরসেবায় দান করিয়াছেন। শুধু অর্থ দিয়াই বা বলি কেন একবার তিনি পথিমধ্যে এক সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে চলচ্ছক্তি রহিত দেখিয়া আপনার পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ! আপনারা বহু মহৎব্যক্তির জীবনের আলোচনা করিয়াছেন, তবু আজ একটি জীবনের কথা বলি। ইঁহার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিতে পারেন কিম্বা নাও শুনিয়া থাকিতে পারেন। ফাদার ড্যামিয়ান, ফিলিপ্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে একটি কুষ্টাশ্রমে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, একদিন দুইদিন নহে চিরকাল শুধু কুষ্ঠরোগীর গলিত দেহ নিজ হাতে ধৌত করিয়া ঔষধ প্রলেপ দিয়া সেই সকল হতভাগ্যদিগের মাঝে তিনি জীবন কাটাইয়া ছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে তিনি স্বয়ং ঐ ভয়াবহ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা ভিন্নও সিষ্টার ডোরা, মহারাণী স্বর্ণময়ী, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ইঁহাদের নাম সেবা ও দানের ইতিহাসে চির অমর হইয়া থাকিবে। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই যে আর্থিক বলে বলীয়ান্ ছিলেন তাহা নহে, দৈহিক শক্তিতে ও মনের জোরেই তাঁহারা জগতের পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে সেবার ইচ্ছা ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই এই সেবাধর্ম্মের প্রাণ ! ঐ ইচ্ছা যাহাতে আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হয় তাহার জন্যই এত সাধনা ! বাল্যকালে মার কাছে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা বলিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছি না। "এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে জীবনে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই—এজন্য তাহার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর পর তাহাকে মৃত্যুদূত আসিয়া যখন স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেল, সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি মহাশয় এখানে ত আমার কোন অধিকার নাই" তখন দূত শুধু জানাইল এখানে আনিবার জন্য সে আদেশ পাইয়াছে। তারপর ভগবানের নিকটও সে যখন ঐ কথা

জিজ্ঞাসা করিল, ভগবান বলিলেন "তুমি কি ভুলিয়া যাইতেছ যখন তোমার অমুক ধনী-প্রতিবেশী পাঁচ শত দরিদ্রকে কাঙাল ভোজন করাইয়াছিল তখন তুমি মনে মনে দুঃখ করিয়া ভাবিয়াছিলে হা কপাল আমার যদি অর্থ থাকিত আমিও ঐরূপ কাঙাল ভোজন করাইতাম, তাই ঐ পাঁচ শত কাঙাল ভোজনের পুণ্যে তোমার এই স্বর্গলাভ!" এই গল্পটি হইতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় ইচ্ছাটুকুই সকল দানের সার, এবং অন্তর্যামী ভগবান শুধু সেই ইচ্ছাটুকুই দেখিতেছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ সভাসমিতির দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। এক অপরের মঙ্গল এবং অন্যটি নিজের কল্যাণ! সেবা জিনিষটিরও সেইরূপ দুইটি দিক আছে। দান করা বা সেবা করা তাহাদের অপেক্ষা এক পক্ষে আমার নিজের জন্যই অধিক প্রয়োজন! তাহাদের বাঁচাইব কি আমি যে নিজেই উহাতে বাঁচিয়া যাইব—বর্ত্তিয়া যাইব!

সেবাধর্ম্ম যে সর্ব্ববাদীসম্মত ও সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত এখন একবার তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। বাইবেলে একস্থানে লিখিত আছে,—

Thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as Thou hast given him.

যে কেহ আমাদের মধ্যে উচ্চ হইতে চায় তাহাকেও যে সকলের সেবক হইতে হইবে একথাও বাইবেলে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

Whosoever will be chief among you, let him be your servant ;

ইস্লাম ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণসরিফে একস্থানে লিখিত আছে যাহারা আপন সম্পত্তি ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যয় করে, এবং যাহারা সে কার্য্যের উল্লেখ করিয়া গ্রহীতার মনে আঘাত দান না করে তাহারা প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে, এবং তাহারা কখনও দুঃখ পাইবে না। ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে দান লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে করা হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ। আবার এই দান করিবার সময়ে হৃদয়ে ভাব কিরূপ হওয়া উচিত? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্ম্মযোগ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন দান করিবার সময়ে সাধারণতঃ হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। কেহ কেহ ভাবেন পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে, দানের পুণ্যে অনন্ত স্বর্গলাভ কিন্তু এই হৃদয়ভাব স্বার্থ-প্রণোদিত। আর একরূপ ভাব আছে তাঁহারা বলেন পাপপুণ্যের গূঢ় তত্ত্ব বুঝি না, তবে সকল ধর্ম্মে যখন দান ও পরোপকারের গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে তখন তাহা পালন করাই কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাও একরূপ অন্ধবিশ্বাস। কেহ কেহ আবার দুঃখীর দুঃখে করুণার্দ্র হইয়া দান করেন ইহাও আদর্শ দান নহে। তবে আদর্শ দান কি? তিনি বলিতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাহাই যে দানের একমাত্র উদ্দেশ্য অহেতুকী আনন্দও শুধু কেবল তাহাই নহে ইহার সহিত মনে মনে একটি কৃতজ্ঞতার সঞ্চারও হওয়া উচিত। যে সকল দানের পাত্র বা পাত্রী এই দানের সুযোগ দান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য; তাঁহারা যদি উপস্থিত না হইতেন তবে ত আমি দান করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতাম না এইরূপ ভাব! কি উচ্চ আদর্শ!

এখন দেখিতে হইবে এই দানের ও সেবার পাত্র বা পাত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি? ইস্লাম ধর্ম্মগ্রন্থে আছে সর্ব্বপ্রথম নিকট, তারপর দূরাত্মীয়, তারপর পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও তারপর অনাত্মীয় গ্রামবাসী ও তৎপরে অন্যান্য দেশবাসী ও তৎপরে বিদেশীয়। এই আদর্শ যে কত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে তাহা একবার খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে হইবে। খৃষ্ট বলিয়াছেন এই যে প্রেমের জন্য সেবাধর্ম্ম ইহার বিচার নাই, যে আমার বন্ধু তাহাকে দিব,

যে আমার অনাত্মীয়, অপরিচিত তাহাকে দিব আবার যে আমার শত্রু তাহাকেও বঞ্চিত করিব না। কি সুন্দর কি প্রাণস্পর্শী কথা,—

Love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again,

—Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another,—

তোমার শত্রুকে ভালবাস, উপকার কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দান কর।

পরস্পরকে স্নেহান্তঃকরণে দয়া ও ক্ষমা দাও।

Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

ঈশ্বর যদি আমাদের এত ভালবাসিয়াছেন, আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

আমাদের আর কি করা কর্ত্তব্য? খৃষ্ট বলিতেছেন,—

We ought to lay down our lives for the brethren.

আমাদের ভ্রাতাভগ্নীর জন্য আমাদের জীবন দান করা উচিত।

বুদ্ধদেবও ঐ সর্ব্বজীবে দয়ার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আমাদের হিন্দু পৌরাণিক গল্পে ত দান ও সেবার দৃষ্টান্তের সীমা নাই। সে সকল গল্প ত আপনারা জানেন তাই আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সেবাব্রতে দীক্ষা লইবার সময়ে আমাদের আজ অন্তর দিয়া এই কথা স্বীকার করিতে হইবে—

"আমরা তাঁহারি সব নরনারী
কেহ নহে কারো পর;
এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে
জ্বলিছে নিরন্তর!
তবে আর কেন ভাই
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
এস প্রেমে গলে এক হয়ে যাই!"

কত কাজ যে বাকী রহিয়াছে, জগতের এই কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই এক একটী ব্রত লইয়া আসিয়াছি সে কথা ভুলিয়া আছি তাই বড় দুঃখ হয়, জগতের দুঃখদারিদ্র্যের ক্রন্দন শুনিয়াও পাষাণের মত অটল রহিয়াছি, ভোগসুখে মত্ত রহিয়াছি তাই মহাত্মা কেশবচন্দ্রের একটি প্রার্থনা মনে পড়িতেছে:—

"পিতা প্রেমময়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কি করিব? তুমি বল, বলিলে তুই যে করিস্‌নে। পিতা ঢের কাজ বাকী রহিল, লোকের মঙ্গলের জন্য যত ভাবা উচিত ছিল, লোকের যত ভাল করা উচিত ছিল তাহা করি নাই। তুমি যাহা করিতে বলিয়াছ তাহা করি নাই। তোমার আদেশ শুনি নাই। পিতা, কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে প্রভুভক্তি দাও, আনুগত্য দাও!" *

---

* রাঁচি মহিলা সমিতির জন্য লিখিত।

রূপের পরশ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন।

রূপের পরশ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন,
সাজায়ে বরণ-ডালা করেছ বরণ!
অশোক-কিংশুক-রাগে, চম্পক-কনকে,
অপরাজিতার নীলে, জবা-অলক্তকে,
চূতমুকুলের পীতে, পল্লব প্রবালে,
কাঞ্চনের আকিঞ্চনে, শিমুলের লালে,
নবাঙ্কুর স্নিগ্ধ-শ্যামে, দাড়িম্ব হিঙ্গুলে,
বরণের ভঙ্গীমায়, অরুণ অঙ্গুলে
কেড়ে নিয়ে গেলে মন, হ'ল পরিচয়,
প্রণয়ে জাগিল প্রাণ তোমাতে তন্ময়!

তুমি জ্বালাইলে দীপ তারায় তারায়,
ঢালিলে সুরভি বারি বাদল-ধারায়,
সূক্ষ্ম ঊর্ণাতন্তুসম কুহেলিকা জালে,
টেনে দিলে লাজ-বাস শুভ-দৃষ্টি-কালে,
হেমন্তের দীর্ঘ রাতে নিস্পন্দ তিমির
আনিল নিকট করি সুদূর বাহির;
স্থির হ'ল আঁখি শুধু তোমারি নয়ানে
পুলকিত কিশলয়ে, বসন্তের গানে
অকস্মাৎ মুখরিয়া ফুলের বাসর
আপন করিলে, সরমের অবসর
দিলে না আমারে তুমি এতটুকু আর,
সেই হ'তে এ মিলন তোমার আমার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মতিয়া।

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণপুরের বৈকুণ্ঠ শিরোমণি একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আচার নিয়ম, তিনি শাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া কত রকম নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। অবস্থা স্বচ্ছন্দ সচ্ছল। পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম সমেত একটা সংসার চলিবার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। গ্রামে সুবৃহৎ বসতবাটী, বাড়ীর সংলগ্ন দেবালয়, পুষ্করিণী বাগান ও বাহিরে গোমস্তার কাছারীঘর পরিপূর্ণ। শিরোমণি কলিকাতার গোঁসাইদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে ভাল স্কুল না থাকাতে একমাত্র পুত্রকে কলিকাতায় তাহার মামার নিকট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ পুত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি পাইয়া পিতার একান্ত অনভিমতে বিলাতে পলায়ন করিলে পর, শিরোমণি মহাশয় পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু কমলার কৃপাক্ষেত্রে মা ষষ্ঠির কৃপা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে, এস্থলেও বংশের ভিতর শিরোমণি মহাশয়ের একটী ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র এমন কি একটী ভাগিনেয়ও কেহ ছিল না,—যাহাকে পুত্রস্থানীয় করিতে পারেন। একটী নয় বৎসরের জন্মান্ধ বালিকা কন্যা মাত্র ছিল। গৃহিণী চিররুগ্না হওয়াতে একটী পশ্চিম দেশীয়া স্ত্রীলোক তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল, সেই নাম রাখিয়াছিল মতিয়া। পুত্রের উপর প্রবল বিরাগ বশতঃ শিরোমণি অবশেষে স্থির করিলেন যেমন করিয়াই হউক মতিয়ার বিবাহ দিয়া তাহাকেই নিজের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার আবাল্যের সুহৃদ্ মৃত্যুঞ্জয় রায় আসিয়া নানা বিষয় আলাপের পর সাংসারিক কথাবার্ত্তাও অবতারণা করিলেন। একদিন আসিয়া স্মিতমুখে কহিলেন "ওহে আমার চারুর আজ পাশের খবর এসেচে।" অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া শিরোমণি নিজের মনোগত সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় অনেক বুঝাইলেন। অনেক ইতস্ততঃ করিলেন কিন্তু নিজ সঙ্কল্পে চিরদিনকার অটল শিরোমণি, স্থিরভাবে শান্তকণ্ঠে কহিলেন "এতে তোমার ইতস্ততঃ কোরবার কিছুই নেই, কারণ তুমি ত চারুর আবার বিয়ে দেবেই, তবে মতিয়ার একটা সহায় রেখে যাওয়াই হচ্চে আমার অভিপ্রায়। সে ছেলেটা তার নিজের ইচ্ছেমত ম্লেচ্ছই হোক, আর যাই কেন হোক না, তার যে কোন একটা উপায় সে করে নিতে পারবে নিশ্চয়। কিন্তু মেয়েটার ওপর যে বিধাতার বিড়ম্বনা, ওকে কিছু না দিলে কে দেখবে বল দেখি? এবং চারুকেই যে দিয়ে যাচ্চি সেও আমার একটা তৃপ্তি, কি বল?" চারু বারাকপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে। চৌদ্দ বৎসর মাত্র বয়স। তখনও ষোলর আইন উঠে নাই। এই সময়ে একদিন গোধূলিলগ্নে সন্ধ্যায় যথেষ্ঠ সমারোহ করিয়া মতিয়ার সহিত চারুর বিবাহ হইয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় রায়ের ইচ্ছা ছিল না যে এতটা ধুমধাম হয়, কিন্তু শিরোমণি পুত্রের উপর প্রচ্ছন্ন অভিমানের নিগূঢ় বেদনার ঝোঁকে সাতগ্রামের লোক একত্রে করিয়া কলিকাতা হইতে বাজনা আনাইয়া জন্মান্ধ কন্যার বিবাহ দিলেন। কন্যার মাতার অভিমত যে এই উপলক্ষে যথেষ্ঠ কোলাহল উৎসব না করিলে জীবনের এই মহা অনুষ্ঠানটী মতিয়া অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বিবাহের পর চারু আর কখনো এই স্ত্রী বা শ্বশুরের সংবাদ লইবার সুযোগ পায় নাই। কলিকাতা হইতে এল্-এ, পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজ প্রবেশ করিবার পর তাহাদের গ্রামেই সে আর আসে নাই। ইতি মধ্যে শিরোমণি স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পরিত্যক্ত পুত্র দেবেন্দ্র কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিয়া মাতা ও ভগ্নির তত্ত্বাবধান করিতেন। গৃহিণী ও পুত্রের সাহায্যে বিষয়কর্ম্মও একরূপ চলিয়া যাইতেছিল।

(২)

রায়েদের কৃতীপুত্র চারু, ডাক্তারি পাশ করিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই ডিস্পেন্সারী খুলিয়া বসিয়াছিল। চারুর স্ত্রী ইন্দুও এই সময়ে ঘর করিতে আসিল। চারু নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামেই চিকিৎসা করিতে যাইত। ষ্টেশনের ধারে গ্রাম। যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে গ্রামখানি জমকালো। শ্রাবণের কজ্জল ঘন মেঘে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত। স্নিগ্ধগম্ভীর মৃদু মেঘনির্ঘোষে বাষ্পসিক্ত বায়ুস্তরকে স্পন্দিত করিতেছিল। এলায়িত নিবিড় কেশরাশির মত অচ্ছিদ্র জলদজালকে চিরিয়া-চিরিয়া সুতীব্র বিদ্যুৎরেখা দিগন্ত ঝলসিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। ঘরের ভিতর সম্মুখের মুক্ত জানালার বাহির পানে চাহিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল। জলখাবারের রেকাবী নিঃশেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে চারু উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল "আঃ এ বৃষ্টি যে ছাড়বেই না দেখ্‌চি।" ইন্দু মেঘান্তরিত ম্লান আকাশের অজস্র ধারাপাতের পাংশু উচ্চে যেখানকার নিম্নগামী জল ধারাকে আর জল বলিয়া দেখা যায় না সেইখানে চাহিয়া ছিল। মুখ ফিরাইয়া কহিল "আমার হুকুম না পেলে কেমন করে ছাড়বে বল।" চারু সবিনয়ে কহিল "ওঃ তবে অনুগ্রহ কোরে হুকুমটা হ'য়ে যাক্‌না।" ইন্দু কৌতুকস্মিত মুখে কহিল "ওমা তাকি হ'তে পারে গো, আমায় গাল্ দেবে যে" "আমি তো জোড়া পাঁটা দেব থেও এখন, শীগ্‌গির হুকুম কর, দেখি ক্ষমতার দৌড়!" ইন্দু মুখ টিপিয়া চক্ষু দুটী বিস্ফারিত করিয়া কহিল "আমি বুঝি রক্ষেকালী?" চারু নিতান্ত বেচারা বনিয়া গিয়া কহিল "আমি কখন্ তা বল্‌লাম?" "বল নি? এই মাত্র জোড়া পাটা দেবে বল নি তুমি।" "ওঃ এই জন্যে,—তা জোড়া পাঁটা তোমায় দেব তো বলি নি তবে তুমি যদি ঘাড়পেতে নাও কথাটা, তা আমি কি কোর্‌বো বল?" ইন্দু রাগ করিয়া কহিল "ঘরে মন টেঁকচে না বেড়াতে যেতে পারচেন্ না তাই শেষটা আমার সঙ্গে কোঁদল আরম্ভ কর্‌চেন্—আচ্ছা বেরোও না কেন? তোমার আবার ঝড় বাদল কি?" চারু হাসিমুখে ইন্দুর কথা মানিয়া লইল, কহিল "তা সত্যিই ত! ডাক্তার মানুষের আবার ঝড়বাদল কি? জুতার ভিতর পা গলাইয়া দিয়া নিষ্ক্রমণের জন্য পা বাড়াইতেই ইন্দু ব্যগ্র হইয়া কহিল "হ্যাগা সত্যি সত্যি তুমি এই এই দুর্যোগে বেরুচ্চো?" জুতার ফিতাতে ফাঁস দিতে দিতে চারু কহিল "কি রকম মনে হয়!" ইন্দু প্রবল অভিমানে মুখ ফিরাইল। অগত্যা চারু ফিরিয়া স্ত্রীকে একটু আদর করিয়া ভুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সান্ধ্যভ্রমণটা তাহার একটা অপরিহার্য্য নেশার মত ছিল। পথে শিরোমণিবাড়ীর ভৃত্য পাঁচু তাহাকে ধরিল। "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু একবারটী চলুন; নলিন ডাক্তারবাবুকে তো আজ পেলামই না ওদিকে মা ঠাক্‌রুণ বড্ড নেতিয়ে পড়েচেন।" চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সে পাঁচুকে চিনিত না, পাঁচুও যে তাহাকে খুব চিনিত তাহা নয়, তবে চারু যে শ্রীকৃষ্ণপুরের ডাক্তার তাহা সে জানিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপুরে ভাল পাশ করা ডাক্তার আবির্ভাব সত্বেও যে শিরোমণি গৃহিণীর চিকিৎসা পীরগাটীর নলিন ডাক্তারের দ্বারা হইত সেটা পাঁচুর মতে শ্রীকৃষ্ণপুরের চারু ডাক্তার নিতান্ত ছোকরা বলিয়া। আপাততঃ নলিন ডাক্তারের জ্বর হওয়াতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে ফিরিতে সে বুদ্ধি খাটাইয়া সম্মুখে যে ডাক্তার পাইল তাহাকেই গ্রেপ্তার করিল। চারু বিরক্ত হইয়া কহিল "দেখ্‌চো যে রকম দিন, আজ আমি অন্য কোথাও যেতে-টেতে পারবো না বাপু" পাঁচু হাত জোড় করিয়া বলিল "যদি মারাই যান্ তিনি, বাড়ীতে আর একটী মনিষ্যি নেই, বাবু আসবেন্ তা সেই রাত্তির দুপুরের টেরেনে, এই তো গাঁ ছাড়িয়ে বেরিয়েচেন বাবু, আর একটু চলুন।" চারু নূতন ডাক্তার, কিছু কৌতূহলও হইল সে পাঁচুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বর্ষাবিকশিত নীপকুঞ্জের মৃদু মধুর গন্ধামোদিত ঘন ঝোপের ভিতর একটী টালীর

বাঙ্‌লোর বারান্দায় আসিয়া চারু জলসিক্ত ছাতিটা মুড়িয়া ফেলিল। সীমাহারা মেঘের নীচে নীচে তখন দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। চারু বারান্দায় উঠিবামাত্র একজন দাসী মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার বাবু বলিয়া ডাকিয়া চারুর মুখপানে চাহিয়া থমকিয়া গেল। দেহস্থিত বৃষ্টিবিন্দুগুলা রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে চারু পাঁচুর সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিল। তিনটী চারটী ঘরের পরে যে আলোকিত কক্ষে তাঁহারা থামিল সেখানে চারুর সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়িল,—সামনের কুলুঙ্গির উপর রক্তিমকান্তি সিদ্ধিদাতা গণেশের মৃণ্ময় মূর্ত্তির উপর। তারপর বড় একখানা পালঙ্কের উপর শায়িতা, রুগ্নার পার্শ্বে উপবিষ্টা তরুণীর উপর। যেন ছাঁচে ঢালা একখানি নিটোল মোমের পুতুল। নিজের আশেপাশের লুটায়িত কেশের গুচ্ছ হাতে করিয়া নাড়িতেছিল। জুতার শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবনীত-কোমল শুভ্র জ্যোৎস্নার মত দেহলতাটীর পশ্চাদ্ভাগে রাশি রাশি রেশমের মত তরঙ্গিত চুলে জানু পর্য্যন্ত ঘিরিয়া আছে। রুগ্না চক্ষু মেলিয়া কহিলেন "কে ?" পাঁচু কহিল "হ্যামাঠান্ নলিন্ ডাক্তারকে পেলাম না তাই এই "ছিরকেষ্টোপুরের ডাক্তার বাবুকেই নিয়ে এসেছি" রুগ্না ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিলে "কে চারু ?" চারু কেমন বিমূঢ়ভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁচু একখানি চেয়ার দিয়া কহিল "বসুন বাবু।" তারপর কিছুমাত্র ডাক্তারি না করিয়াই রীতিমত আহারের পর শিরোমণিদের গাড়ী করিয়া চারু বাড়ী ফিরিয়া গেল। চারু চলিয়া গেলে পর মতিয়া মাতার বুকের উপর পড়িয়া প্রশ্ন করিল "মা, ও কে মা ?" মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লান মুখে কহিলেন "কেন, ওই পাঁচু তো বল্লে।" মতিয়া সন্দিগ্ধ মনে কহিল "পাঁচু তো বল্লে শ্রীকেষ্ণপুরেরই ডাক্তার, তা আমাদের কে হয়, তুমি যে খুব কোরে খাইয়ে দিলে!" মাতা কহিলেন "ওমা, রাস্তা থেকে আমার জন্যে পাঁচু ধরে আন্‌লে বাছাকে, আর এই দুর্যোগে শুধু মুখে শুধু পায়ে কি করে পাঠাই ?" বাড়ী ফিরিয়া চারু নিজের প্রতি কি একটা অকারণ বিতৃষ্ণায় কাহাকেও কোন কথা না বলিয়াই শুইয়া পড়িল। দিন চারেক পর তেমনি ভরা বর্ষার শ্রাবণের জলধারা বর্ষণরত আসন্ন সন্ধ্যায় শিরোমণিদের ঘোড়ার গাড়ী আসিল ডাক্তার লইবার জন্য—সঙ্গে সেই পাঁচু। চারু প্রথমটা যাইতে স্বীকার করে নাই, তারপর স্থির করিল যে এক্ষেত্রে আমি ডাক্তার, রোগী দেখিব, ঔষধ দিব, এজন্য আমার আবার ইতস্ততঃ কেন ? ভাবিয়াচিন্তিয়া চারু গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতেই মনস্থ করিল। ষ্টেথেস্‌কোপ, থার্ম্মোমিটার, ঘড়ি সমস্ত গুছাইয়া লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। এ গাড়ী গ্রামের আবালবৃদ্ধের সুপরিচিত। কারণ পল্লীগ্রামে অবস্থা সচ্ছল হইলেও গাড়ী ঘোড়া কেহ রাখেনা, কিন্তু দেবেন্দ্র শিরোমণির যখন-তখন মা ও ভগ্নির তত্ত্বাবধানের জন্য আসা যাওয়া করিতে হয়, কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতে হয় ষ্টেশনের দূরত্বও নিতান্ত অল্প নয়। এ জন্য তিনি গ্রামেই গাড়ী করিয়াছিলেন। বিশেষ মতিয়ার বিষয়ের আয়ের তুলনায় ব্যয় খুবই সামান্য। দেবেন্দ্র স্বয়ং যথেষ্ঠ উপার্জ্জনক্ষম, এবং কোন্ এক লক্ষপতির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি ভাগ্যবান। সুতরাং মতিয়ার ধনসম্পত্তি হইতে ব্যয় কুণ্ঠার কোনও কারণই ছিল না।

(৩)

চারু গাড়ী হইতে নামিতেই দেবেন্দ্র সহাস্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। ঘরে ঢুকিবামাত্র হিল্লোলিত লতাটির মত মতিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রের হাত জড়াইয়া ধরিল। গম্ভীর প্রকৃতি পিতার পরই এই সদানন্দ স্নেহশীল দাদাটিকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। বয়সেও উভয়ের অনেক পার্থক্য ছিল। বৈকুণ্ঠ শিরোমণির প্রথম সন্তান দেবেন্দ্রের জন্মের বহু পরে বৃদ্ধ বয়সে এই অধর্ম্মের ভোগটুকু জন্মিয়াছিল। একটা

চেয়ারের উপর বসিয়া দেবেন্দ্র কহিলেন "মায়ের কাছে শুনলাম পাঁচু নাকি একদিন তোমায় ধরে এনেছিল, যদিও তোমায় বিরক্ত ক'রতে ইচ্ছে কোনও দিনই করি নি, তবু এত নিকটে থেকে এমন স্নেহের জিনিষে একটু টান দেবার লোভ কিছুতেই ছাড়্‌তে পারলাম না ভাই।" চারু নত মুখে প্রশ্ন করিল "মা কেমন আছেন ? দেবেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিলেন "ভালই।" মতিয়া নিঃশব্দে প্রশ্নোত্তরগুলি শুনিতেছিল মাত্র। আগন্তুক যে তাহারই স্বামী, সে ইহার বিন্দুমাত্রও জানিত না। বোধ করি ভাঙ্গিয়াচুরিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে ঠিক বুঝিতে পারিত না। তাহার বিবাহরাত্রির ব্যাপার তাহার অতি অস্পষ্ট মনে ছিল এবং তা ছাড়া পৃথিবীর সার-ধন দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিতার নিকট স্বামী পদার্থ সম্বন্ধে, যাহাকে বলে দেখিয়া শুনিয়া লাভ, এরূপ স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং আনুসঙ্গিক লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। চারু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "মা ভাল আছেন, তবে অসুখ কার!" দেবেন্দ্র হাসিলেন "অসুখ ব্যতিরেকে তোমাদের আগমন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নাকি?" চারু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "না, না, তা কেন, তবে আমায় অসুখের কথাই বলা হয়েছিল কিনা? অতএব, একজনের অসুখ হওয়া চাই. আচ্ছা, তাঁকে মতি তোর কোনও অসুখ-টসুখ কচ্চে না তো রে?" চারুর মুখ-খানা আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মতিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রসন্ন হাস্যরঞ্জিত মুখে কহিল "যাঃ আমার কেন অসুখ হ'তে যাবে, না ডাক্তার বাবু আমার কিচ্ছুই হয় নি।" চারু মুখ তুলিয়া তাহার মুখ পানে চাহিল। মতিয়ার কণ্ঠস্বর সে প্রথম শুনিল। দেবেন্দ্র চারুর মুখ পানে চাহিয়া মতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আমি ত সব সময়ে আস্‌তে পারি নে, তাই এই ডাক্তার বাবুকে এবার ভার দিয়ে যাচ্চি, ইনি সদাসর্ব্বদা এসে তোদের দেখে শুনে যাবেন, কেমন চারু তুমি পারবে তো?" চারু বিব্রত কুণ্ঠিতভাবে মৃদু আপত্তি করিল। দেবেন্দ্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখের স্নিগ্ধদীপ্তি অকস্মাৎ নিভিয়া গেল। "পারবে না? কেন চারু, যার কিছু নেই তার নিকটের লোক হ'লেও কি তাকে দূরে সরে যেতেই হয়? বাবা যখন এই সমস্ত ভার তোমাকেই দিয়েছিলেন, তখন আমি খুসীই হয়েছিলেম, ভেবেছিলেম তুমি তোমার কর্ত্তব্য গ্রহণ করবে।" তখন আমার মনে হয়েছিল যে ভগবান আমার দায়ীত্বের বোঝা নামিয়ে আমায় হাল্‌কা করে দিলেন। আর কিছু আমরা চাইনে, কিন্তু একগ্রামে থেকে দূর আত্মীয়ের মত এইটুকু উপকারও কি তুমি ক'র্‌বে না? ভেবে দেখ, সবই ত তোমারি।" সুগভীর ভগ্নিপ্রীতিতে দেবেন্দ্রের কণ্ঠ কম্পোচ্ছ্বাসে ধরিয়া আসিল। এ স্নেহের সীমা ছিল না। মতিয়া বিষয়ের কোন কথাই জানিত না বুঝিতও না সহজ সরলভাবে কহিল "কেন দাদা ওঁকে তুমি বিব্রত ক'রচো, তুমি যেমন দেখ্‌চো শুনচো এই ত বেশ হচ্চে" দেবেন্দ্র সংযতকণ্ঠে কহিলেন "না রে আমি বিব্রত, বিরক্ত ক'র্‌চিনে, শুধু ওঁর কাজের ভার "ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্চি তবে উনি যদি দয়া করেন।" মতিয়া হাসিল। আরক্ত ওষ্ঠে প্রভাতের আলোকের মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর হাসি মুখে কহিল "ওঁর বুঝি দয়াই নেই?" কথাটা চারুর অন্তরে সুতীক্ষ্ণ খোঁচা দিল। সত্যই ত কিসের জন্য সে এখানে এমন অপরাধ-শঙ্কিত হইয়া থাকে। তাহার কুণ্ঠাই বা কাহার জন্য? কেন সে দেবেন্দ্রের মতই আপন হইয়া এই করুণার পাত্রী মেয়েটী সহায় হইতে পারিবে না? স্থির করিল স্নেহশীল বন্ধুর মত, ভ্রাতার মত অকুণ্ঠিত চিত্তে সে এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবে।

(৪)

একত্রে দুই ভাই বসিয়া আহার করিতেছিল। বড় ভাই বিরজানাথ পূর্ব্বেই আহার করিয়া গিয়াছেন। নিকটে চারুর মাতা বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে ছেলেদের খাওয়াইতেছিলেন। দালানের অপর এক পাশে

একটু অন্তরালে ইন্দু পান সাজিতেছিল। চারু কহিল "জান মা আমি কোথায় গিয়েছিলেম।" মাতা উৎসুকভাবে কহিলেন "কোথায় ?" "আমার শ্বশুরবাড়ী" বলিয়াই চারু একটু ম্লান হাসিল। ইন্দু উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল বুঝি তাহারই পিত্রালয় সম্বন্ধে ? চারুর কনিষ্ঠ সুবোধ কহিল "কিরকম ?" "কি রকম আবার! আমার তো বাপমায়ের কৃপায় শ্বশুরবাড়ীর অভাব নেই, যেখানে আছি সেখানেই শ্বশুরবাড়ী।" মাতা হাসিলেন "কি যে বলিস্ বাপু।" চারু মুখখানাকে আরক্ত করিয়া কহিল "কি আবার বলি, কাল তো শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেম কেন দেখ নি নাকি ? আর এ গাঁয়ে গাড়ী ঘোড়া কার আছে ?" বলিতে বলিতে নিজের ভালরূপ জ্ঞানসঞ্চারের দায়ীত্ববোধ হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতি যে বিষম অবিচার হইয়া গিয়াছে ইহাই মনে করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতা স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "কি হয়েছে তাতে,—গ্রামশুদ্ধ রোগী দেখে বেড়াস্, না হয় সেখানেও এক দিন গিয়েছিস্ তাতে হয়েছে কি তাই অমন করছিস্ ?" চারু তেমনি অভিমানের বেদনায় ক্ষুন্নস্বরে কহিল "কি আর হবে কিছুই না, তবে এক দিন শুধু রোগী দেখ্‌তেও নয় মা, বাড়ীর কর্ত্তার অভাবে তাঁর যত কানা খোঁড়া যা'কিছু আছে সেই সব কিছুর তত্ত্বাবধান করতে যেতে হবে আমায়" মাতা শান্তকণ্ঠে কহিলেন "হ'লই বা, সে তো ভাল কথা, তাতে কি তোর অপমান হয়েছে না কি ?" ইন্দুর মনটা খারাপ হইয়া গেলেও তাহার সপত্নীভীতির কোনও সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না, বিশেষ চারু যখন তাহার আকর্ণ-টানা চক্ষুদুটী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "যমের বাড়ীর তাগাদা হইতেও সে ছুটী পাহাড়া তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং ইন্দুর স্বপক্ষে ——— করাই উচিত। দিন কয়েক পরে চারু আপনা হইতে গিয়া অপ্রত্যাশিতরূপে শিরোমণিদের বাস্তবক চারু দেখা দিল। সেখানে দেবেন্দ্রের খুল্লতাত সম্পর্কীয় নীলখুড়ো নায়েবী করেন, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহাকের তত্ত্বাবধানে আসিয়া পাঁচু দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিল। চারুর ভাগ্যক্রমে সে যখন আসিয়াছিল তখন শরতের আসন্ন আগমন সম্ভাবনায় সুনীল আকাশে দু'এক টুকরা ছিন্ন পীতাভ মেঘ এদিক ওদিক সন্তরণ করিতেছিল। কিন্তু পৌঁছিবার ক্ষণকাল পরেই তেমনি অস্তমান সূর্য্যের শেষ রৌদ্রচ্ছটার উপর বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল এবং উভয় দিক্ হইতে একখানা কালো মেঘও ধীরে ধীরে দেহ প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। মতিয়া তখন খোলা রোয়াকের উপর বসিয়া গতকল্যকার সমাপ্ত ইতিহাস কাহিনী এবং চক্ষু উৎপাটিত হওয়ার পর কুনাল যে চিরপ্রার্থিত ভগবানের করুণাধারা কেমন করিয়া অনুভব করিয়াছিল দেবেন্দ্রের নিকট তাহাই মুগ্ধচিত্তে শুনিতেছিল। বৃষ্টিপাতে দেবেন্দ্র মতিয়াকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেই অপ্রত্যাশিতরূপে চারুকে দেখিয়া দেবেন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। আজ মতিয়াই প্রথমে প্রশ্ন করিল "আপনি কি খুব ভিজে গেছেন ডাক্তার বাবু ?" চারু বিপদে পড়িল। সে জানে যে মতিয়ার সহিত তাহার কি সম্পর্ক। কিন্তু মতিয়ার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পায় না। তাহা ধরিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা মাতার সম্মুখে স্বামীর সহিত অনবগুণ্ঠনে বাক্যালাপ কোনও হিন্দু পরিবারেই এমন নিঃসঙ্কোচে চলিতে পারে না। তবে কিনা দেবেন্দ্র "বিলাত ফেরত" কিন্তু সাহেবীয়ানা তো তাঁহার অন্য কিছুই নাই। তবু সে মতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে দেবেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়াই কহিল "না ভিজি নি তো ? কিন্তু যে গরমে ভাজা-ভাজা হচ্চি ভিজলেও কোন ক্ষতি হত না।" "হুঁ সে ক্ষতি হোত বুঝি আমাদের, আপনি কিনা ডাক্তার।" চারু একটু হাসিয়া কহিল "ডাক্তার যে হয় সেও তো মানুষই।" দেবেন্দ্র সহাস্যে কহিলেন "আমরা তা মনে করি নে, তা ছাড়া তোমরা যে সব স্বাস্থ্যতত্ত্ব আওড়াও, তোমার বাড়ী থেকে বেরোন সত্যিই আশ্চর্য্যের।" চারু কহিল "আপনাদের বুঝি আর ও পাট নেই ?" মতিয়া কহিল "কাল যখন আমরা কথকতা শুনতে যাচ্ছিলাম—" চারু সোৎসুকে বলিল "কোথায় ?" "সেই আমাদের

এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে।” “তারপর! কেমন লাগ্‌লো।” “খুব ভালো, ধ্রুবের উপাখ্যান থেকে কথকতা, হচ্ছিল, চোখে জল এসে পড়ে” চারু, মতিয়ার এই প্রসন্ন তৃপ্তির আভাসে প্রীত হইয়া কহিল “ভক্তিরসের প্রাবল্যে?” মতিয়া হাসিল “ভক্তিরসে? কই আর তা হ'ল, তা হ'লে ত এই ঝিম্‌-ঝিম্‌ রিম্‌-রিম্‌ বৃষ্টির শব্দে আর এই যে ফুলের গন্ধ আস্‌চে এই নিয়ে—ঐ তাঁর পদশব্দ আর ঐ তাঁর অঙ্গসুবাস বলে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌তে পারতাম।” দেবেন্দ্র কহিলেন “কিন্তু যে তাঁর অভাব অনুভব করে সে যে তাঁকে ছাড়া থাক্‌তেই পারে না।” মতিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল “সত্যি, দাদা মনে হয় তাঁকে খোঁজা ফুরিয়ে গেলে বাঁচাই মুস্কিল। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে খোঁজাই সুখ।” চারু শুনিয়াছিল শিরোমণি মহাশয় মতিয়ার ব্যর্থ জীবনটার কিছু পরিমাণে সার্থকতা দানের জন্য এই পথই চিনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতক পরিমাণে হইয়াও ছিল। চারু আর একবার কি একটা উত্তর করিবার জন্য মুখ তুলিয়া মতিয়ার পানে চাহিতে গিয়া ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সে যেন নিপুণ ভাস্কর-নির্ম্মিত শুভ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি মাত্র। ইহার কোনওখানেই যেন কোন দৈন্য নাই, ইহার প্রতি যে চারুর নিজের কোন কর্ত্তব্য আছে বা থাকিতে পারে ইহা যেন সে ধারণা করিতে পারিল না। মনের ভিতর নিজের প্রতি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া চারু উঠিয়া দাঁড়াইল দেবেন্দ্র কহিলেন “ওকি চল্‌লে নাকি?” মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। রাত্রি হইয়া গিয়াছিল কিন্তু দেবেন্দ্রের সানুনয় [illegible] গাড়ীর জন্য দাঁড়াইল না। বাহিরের খদ্যোৎসঙ্কুল জমাট অন্ধকার দেখিয়া ক্ষণেক থমকিয়া মৃদুপদে [illegible] চারুর [illegible] পড়িল। অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই শুনিল মতিয়া গাহিতেছে:—

“তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে এস গন্ধে, এস গানে—”

ঘরের কোণের অর্গাণটা সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র বাজাইতেছিলেন। চারু কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে চলিয়া গেল।

(৫)

গ্রামের সীমান্তে শিরোমণিদের বাড়ী, সেখানে গৃহস্থের আবাস অপেক্ষা চারিদিককার আবাদের মাঠে মা লক্ষ্মীর লুণ্ঠিত অঞ্চলের মত হরিৎ শস্যক্ষেত্র। এমন কি গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠতা তাঁহাদের অতি অল্পই ছিল। বাড়ী ফিরিয়াও সহসা আর কোনও কথা মনে না পড়িয়া চারুর অন্তরে কেবলি জাগিতে ছিল সেই চির আলোক-বঞ্চিতার শুভ্রকোমল বক্ষে জীবনের সকল সম্পদই যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। না থাকিবে কেন? উহার অভ্যন্তরে ওতো চারুর নিজের মত, উহঁদের মত, একই রকম আশা আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ উচ্ছল পিপাসাপূর্ণ একখানি হৃদয় আছে, তা হউক না সে বিকার-বিক্ষোভ হীন। সে যে সাধারণ হইতে কতখানি স্বতন্ত্র, তাহার তমোময় মনোমন্দিরে যে কি পদার্থ কতটুকু সঞ্চিত আছে ইহাই লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিবার কৌতূহল চারুর যেন [illegible] হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয় জিনিসটা তো চাক্ষুষ দেখিবার বস্তু নহে,— ষ্টেথেসকোপেরও কর্ম্ম নহে কেবল মাত্র হৃদয় দিয়াই হৃদয় গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলে তারও তো একখানি হৃদয় আছে এবং বাহ্য দৃষ্টির অভাবে তাহা অন্যের অপেক্ষা অধিক সুতীক্ষ্ণ সুতরাং সেও তো সেই মনের দ্বারা অপরের মনোভাব অনুভব করিতে পারে? [illegible] হইলে? চারুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ছি ছি সেকি ইতর হইয়া গিয়াছে একি অনধিকার হীন [illegible] তাহার! যে বিধিবিড়ম্বিতার অস্ফুট চিত্তবৃত্তি সকল প্রচ্ছন্ন সুপ্তাবস্থায় আছে তাই নাড়িয়া দিয়া বিশ্বের [illegible] পাত্রী যে, তাহাকে ব্যথা দিবার অকরুণ প্রবৃত্তি তাহার কোথা হইতে আসিল? দুই একদিন পরে [illegible]বাসী গ্রাম্যবন্ধু যতীন, তারক, সত্য ইহাদের তাসের আড্ডায় প্রবেশ পথে চারু শুনিল বিদ্রূপ ব্যঙ্গের সহিত

তাহার বন্ধুবৃন্দ তাহারই আলোচনা করিতেছে "হাঁ কি বলছিলি সত্যদা, চারুকে আর সন্ধ্যে বেলা মোটেই পাওয়া যায় না—" তারক মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "তার এখন পুরোণ সম্বন্ধ চাগিয়ে উঠেছে" সত্য কহিল "ওহে চারুদা আমাদের নির্ব্বোধ নয়, কানাই বল আর যাই বল বিষয়সম্পত্তি তো সব তারই।" আর একজন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "তোর বুঝি হিংসে হয় রে?" সত্য মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল "হ'লেও হ'তে পারে—তবু এও একটা কবিত্ব।" "কবিত্ব? কিসে রে কানার আবার কবিত্ব আর সৌন্দর্য্য কিসে?" বাঃ বঙ্কিম বাবুর শচীন্দ্র কি কানাতেই কিছু পান নি, আর অমরনাথ?" সহসা চারুর আবির্ভাবে সকলেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল, কেবল যতীন সহাস্যে বলিল "কি হে চারু যে! আরে এস এস এই মাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল আমাদের।" চারু বসিয়া পড়িয়া বলিল "হুঁ কি কথা হচ্ছিল, আবার হোক্ না তাই শুনি, সব থেমে গেলে কেন?" যতীন মুখ ফিরাইয়া কহিল "ডাক্তারের বইতে মাথা ঘামিয়ে, মাথা বুঝি গোল্লায় গেছে, তা নইলে এও বুঝ্তে পার না, যে স্তুতিবাদ কারো সাম্নে কর্তে নেই—যতক্ষণ দেখা না পাও স্তবস্তুতি কর।" চারু কহিল "তারপর! দেখা পেলে?" যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল "বাস্ বরপ্রার্থনা।" চারু রাগ করিয়া কহিল তবে বুঝি সবাই চুপ কোরে বসেই থাক্বি?" যতীন কহিল "তা কি কোরবে? তোমার যে 'সারং শ্বশুরমন্দিরম্' হয়ে উঠেছে, তোমার কি পাত্তা পাওয়া যায়?" চারু বন্ধুর পিঠের উপর মৃদু আঘাত করিয়া কহিল "তোমার মস্তক। আমার হয়েচে সারং রোগীদের মন্দিরম্।" "রোগীদের, না রোগী বিশেষের?" চারু গম্ভীর মুখে ধীরকণ্ঠে কহিল "থামো, কি নিয়ে তামাসা করচো ভেবে দ্যাখ যতীন।" যতীন কুণ্ঠিতভাবে কহিল "তোর লাগচে নাকি রে?" প্রস্তাবক চারুর ব্যথাই লাগিয়াছিল। সেই অম্লান শুভ্র কুন্দ কলিটির মত নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক অন্ধ জীবটিকে লইয়া প্রসঙ্গ, আলোচনায় কল্পনা সাহায্যে আপন আপন মত টীকাটিপ্পনি সহ যে ইহারা বিদ্রূপ করিবে ইহা চারুর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সেই দিনই শয়নকক্ষে প্রবেশ মাত্র ইন্দু হাসিমুখে কহিল "তোমার যে বদনাম বেরিয়ে গেল" চারু কহিল "কি?" "তুমি নাকি—" বলিয়াই ইন্দু হাসিয়া ফেলিল। চারু কহিল "একি, থামলে কেন? বল আমি নাকি কি? খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছি, না গেছি?" ইন্দু নতমুখে টেবিলের উপরকার দগ্ধ মোমের জমাট বিন্দুগুলা নখে খুঁটিয়া তুলিতেছিল। একটু কুণ্ঠিত সঙ্কোচে কহিল "না তা নয়।" তা নয় তবে কি? বলিয়া চারু একপাট দরোজা ভেজাইয়া ঘরের ভিতরকার একটা চৌকীর উপর বসিল। নির্নিমেষে ক্ষণকাল ইন্দুর নতমুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। কোমল কণ্ঠে কহিল "শোন, মিথ্যে কষ্ট পাচ্চে কেন?" বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে—যে অন্ধ অসহায় পরনির্ভর জীব, তার উপর মানুষমাত্রেরই একটা স্বতঃ সহানুভূতি সঞ্চার নিতান্তই স্বাভাবিক। ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতির লেশ মাত্র নাই।" ইন্দু মৃদু হাসিয়া কহিল "থাকলেও আমি ভয় করি নে।" "না, কর না বৈ কি, সে আমি মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।" ইন্দু সরিয়া গিয়া আরক্ত মুখে কহিল "তা বৈ কি, কক্ষণো নয় তোমারই মুখ ভার দেখে আমি চুপ করেছিলাম।" চারু সহাস্যে কহিল "হুঁ বিশ্বাসের ভুলে গিয়েছিলে আমার।" ইন্দু লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া কহিল "ওমা সত্যিই ত গো তোমার খাবার আনি নি যে! দাঁড়াও আনি" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৬)

মতিয়া নিজের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটা লোহার বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। তাহার দাসী তাহাকে একটা সুবৃহৎ সুরভি গোলাপ তুলিয়া দিয়াছিল সে পরম প্রীত মনে তাহারই সুবাস গ্রহণ করিতেছিল। দাসী রাজারের

অন্য প্রান্তে আমড়া কুড়াইতে গিয়াছিল। ঘন সন্নিবিষ্ট মেহেদী ঘেরের আড়ে এক পাল গরু ছাড়িয়া দিয়া ডোবার তীরে বসিয়া দুই জন রাখাল সুমিষ্ট বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছিল। একটী কৃষককন্যা স্নানসিক্ত কাপড়ে ডোবার পুষ্পিত কলমীলতা হইতে শাক তুলিতেছিল। শারদ-প্রকৃতির মৃদু আন্দোলিত শ্যামাঞ্চলের উপর হেমান্ত কিরণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সেফালি-বাসিত প্রভাত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি বঞ্চিতা কিছুই দেখিতে না পাইলেও "যচ্চক্ষুসা ন পশ্যতি,—যে ন চক্ষুংষি পশ্যতি" সেই অতি নিগূঢ় একটা স্থানে সকল কিছুরই অতি অস্ফুট অনুভব সে করিতে পারে। দেবেন্দ্র কলিকাতায় ছিলেন সুতরাং চারু বাহিরে আর কাহাকেও না পাইয়া বাগানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বাগানের ভিতর মূর্ত্তিমতী কবিকল্পনার মত অচঞ্চল লাবণ্যশ্রী মাধুর্য্যময়ী তরুণীকে দেখিয়া সে মুগ্ধ চিত্তে একটু দাঁড়াইল। পীত রৌদ্রাম্বরা প্রকৃতির বক্ষশোভনা শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি দেখিয়া তাহার মন হইতে প্রশ্ন জাগিল "শুধুই কি ওই মূর্ত্তিমাত্র? লালিত্য মাখা নয়নরঞ্জন দর্শনীয় বস্তুমাত্র? চারু কখনও কবিত্বের কোনও সন্ধান করে নাই। বোধ করি সে সময়টা কোন্ ঋতু তাহাকে প্রশ্ন করিলে তাহাও তাহাকে হিসাব করিয়া বলিতে হইত। কিন্তু অকস্মাৎ একটা অনির্ব্বচনীয় হিল্লোলে তাহার আকাশ বাতাস এমন কি পদতলের হরিৎ তৃণাস্তরণ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সেই মনোময় প্রাণ-শরীর নেতার নেতৃত্বে মনের ভিতর একটা দুঃসহ পুলকাবেশ জাগাইয়া দিল। চারু নিঃশব্দে গিয়া বেঞ্চটার পাশে দাঁড়াইল। কোন্ উপলক্ষে যে নিজের আগমন বার্ত্তা মতিয়াকে জ্ঞাপন করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। ক্ষণেক পরে মতিয়া অন্য-মনে বেঞ্চটার গায়ে হেলিয়া পড়িতেই চারুর হস্ত স্পর্শে চকিতে তড়িৎ স্পৃষ্টের মত সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—"দাদা" চারু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল "আমি।" ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে মৃদু কণ্ঠে কহিল "ওঃ আপনি?" তাহার ক্ষুদ্র ললাটের কুঞ্চনরেখায় সুস্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া চারু অপ্রতিভ হইয়া নির্জ্জন সাক্ষাতে যে তাহার কি অধিকার তাহারই কৈফিয়ৎ দিতে যাইতে ছিল কিন্তু মতিয়ার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। মতিয়া ব্যস্ত-কাতর-কণ্ঠে কহিল "দয়া কোরে কালী দিদিকে ডেকে দিন্ না" চারু কোমল কণ্ঠে কহিল "কেন?" "আমায় মায়ের কাছে নিয়ে যাবে" "তা চল না আমিই নিয়ে যাচ্চি" বলিয়া হাত বাড়াইয়া মতিয়ার হাত স্পর্শ মাত্র বারংবার শিহরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মতিয়া বসিয়া পড়িল। চারু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "ও কি হইল তোমার?" মতিয়া প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "কি বিশ্রী হাত আপনার, আমার হাত আপনি ধরতে গেলেন কেন?" কালী দাসী আসিয়া কহিল "কি হ'ল গো দিদিমণি?" মতিয়া উত্তর করিল না, চারু কহিল "হয় নি কিছুই, তুমি নিয়ে যাও।" কিছুই যে হয় নাই কালী দাসীও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না, পূর্ণ সন্দিগ্ধ চক্ষে চারুর প্রতি চাহিতে চাহিতে সে মতিয়াকে লইয়া গেল। চারু অন্যমনস্কে বাগানের এক দিকে একটা বিকশিত স্থলপদ্মের অম্লান কোমল পল্লবের উপরস্থিত সুকৃষ্ণ ভ্রমরের দিকে আবিষ্টের মত চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সেটা উড়িয়া গেলে চোখ তুলিয়া দেখিল ফুলের ভিতরকার ক্ষীণ কোমল পাপড়িটা কীটদষ্টে ক্ষতবিক্ষত। চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; হায়, সৃষ্টি কর্ত্তা এই দংশনক্ষত সহ্য করিবার জন্যই কি পুষ্পাঙ্কে এ মধুর সৃষ্টি করিয়াছেন! আবার তাহার মনে পড়িল মতিয়ার সেই শরাহত মৃগীর মত সে কি ব্যথার্ত্ত ব্যাকুলতা, কেন সে অম্লান শুভ্র পবিত্রতায় এ মলিন ব্যথা মাখাইতে গেল! দৃষ্টির অভাব হইলেও অপরিচিতের অনভ্যস্ত হস্ত সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সে তাহার বিখ্যাত পিতার মতনই অতি নিষ্ঠার দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহা চারু শুনিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া মতিয়া মায়ের নিকট একটা নূতন তথ্য সেই দিনই প্রথম শুনিল। তাহার স্বর্গগত পিতা এতদিন তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন বুঝাইয়াছিলেন এখন তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহার মনের ভিতর কেমন একটা বিতৃষ্ণা ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মতনই দেহধারী জরামরণশীল আত্মের

নিঃসম্পর্কীয় কোনও একটা মনুষ্যকেই না কি এতটা ভালবাসিবার দরকার আছে যাহাতে এক বস্ত্রের সঙ্গিনীও কেহ হইয়াছিল। নশ্বর দেহের অবশ্য বিনাশ জানিয়াও দু'দিনকার অগ্রপশ্চাৎও অসহ্য মনে করিয়া একের চিতাবক্ষে অপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, যাহারা পড়ে তাহারাও তাহারই মত নারী! মানুষ মানুষকে আত্মসমর্পণ করিবে কেন? যিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, তিনি তো কিছুমাত্র দুর্ল্লভ নন। মতিয়া পিতার মুখে ভগবানোক্তি শুনিয়াছে যে তিনিই—

"পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে এবং সর্ব্বত এব সর্ব্ব:।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্ব॥"

তবে কিসের জন্য কোন্ অভাবে মানুষকে মানুষে ভালবাসিতে যাইবে? জীবন যদি উৎসর্গ করিতে হয় তবে সেই একমাত্র গতিপ্রদ চরণারবিন্দে। সে নিজের জীবনকেও এত দিন তাহাই ভাবিয়া আসিয়াছিল। যেদিন মায়ের মুখে শুনিল সেও পিতাকর্ত্তৃক মানবে উৎসর্গীকৃতা, তাহার সমস্ত মন সেদিন ক্ষোভে, দুঃখে ভরিয়া উঠিল। নিদারুণ সত্যটাকে কাল্পনিক মিথ্যা আবরণে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টায় সে কহিল "তার তো আবার বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে। মা তবুও" মাতা শুষ্ক নীরস কণ্ঠে কহিলেন "হ্যাঁ মা, তবুও;—তবু তুমি তারই।" মতিয়া হতাশ হইয়া কহিল "তা হ'ক্ গে, যাক্ মা আমি মানুষের সেবাভক্তি করতে পার্‌বো না।" বেদনাদিগ্ধ মলিন হাস্যে মা কহিলেন "ভগবান কি তোমায় সেই শক্তিই কিছু দিয়েচেন যে কাউকে সেবাভক্তি করতে পার্‌বে?" মতিয়া মাথা নাড়িয়া তেমনি শান্তকণ্ঠে কহিল "আমায় ভগবান যা দিয়েচেন তা সব আমি তাঁকেই উৎসর্গ করেচি। অতঃপর চারু আসিয়া আর কোনও দিনই মতিয়ার লুণ্ঠিত অঞ্চলের একটু প্রান্তভাগও দেখিতে পাইত না। বড় ঘরে বসিয়া শাশুড়ী ও নীলু-খুড়োর সহিত বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে ঠাকুরঘরের অভ্যন্তরস্থিতা মতিয়ার স্তব আবৃত্তি শুনিয়া ফিরিয়া আসিত। এই ব্যাপারে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া গেল। মতিয়ার আঁধার বক্ষেও তবে এমন কিছু আছে যাহাতে এই সামান্যটুকু উপলক্ষ করিয়া সে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিল। অথবা এত দিনে যাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল তাহাই জানিয়া ফেলিয়াছে তাই। দেবেন্দ্র বাড়ী আসিলে যেদিন চারু সাক্ষাৎ করিতে গেল সেদিন মতিয়া রীতিমত মাথায় কাপড় দিয়া দাদার পাশে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছিল। পরস্পর মুখের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে সে ইচ্ছা করিয়া আসে নাই। দেবেন্দ্রের মুখ কৌতুকস্মিত, তিনি চারুকে আহ্বান করিলেন, চারু নিকটে আসিয়া কহিল "তবু আহ্বানের লোক যে এক জন পাওয়া গেল, বাঁচলাম!" দেবেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন "আর যখন প্রথম এ বাড়ীতে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া বরণ করা হয়েছিল, তখন আমি কোথায় ছিলাম জান তো? বিলাতে।" সে দিন আর দেবেন্দ্রের সামনেও মতিয়া একটী বারও মুখ খুলিল না দেখিয়া চারু অত্যন্ত ব্যথিত হইল। একটু একটু করিয়া সে অনেকখানি কর্ত্তব্যই উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল মতিয়াকেও দেবেন্দ্রের মত উত্তাপ হীন স্নিগ্ধ সোদরের মত বিশুদ্ধ অনাবিল প্রীতি স্নেহ দিয়া সুখী করিবে। কিন্তু বিধির বন্ধন একই ফাঁসে বাঁধা, তাই চারু ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি তাহাদের পরস্পরকে সেই একই দাম্পত্যক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতেছিল—তা সে স্থান, কাল, পাত্রে যত ত্রুটীই থাকুক না কেন? বাড়ী ফিরিলে ইন্দু যখন স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সোদ্বেগে প্রশ্ন করিল "আজ এমন কোরে রয়েছ যে! কি হয়েছে?" চারু শ্রান্তভাবে চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল "কেমন?" ইন্দু নিকটে আসিয়া কপালের উপর হাত দিয়া কহিল "তাই তো জিজ্ঞেস কর্‌চি?" চারু চোখ মেলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল "কেন তোমার এ পাহারা দু'টী বুঝি আর পেরে উঠছে না? অন্য যায়গা-টায়গা খুঁজে নেয় নি তো?" ইন্দু নিতান্ত রাগিয়া কহিল "যে যেমন, সে বিশ্বশুদ্ধ সবাইকে

তেমনি দেখে কি না।" তার পর কিছুক্ষণ স্বামীর মুখপানে নির্নিমেষে চাহিয়া প্রসন্ন হাসি মুখে কহিল "যেখানে জুজুই নেই সেখানে পাহারার দরকার তো কিছু দেখি নে আমি।" আর কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া সে সরিয়া আসিয়া সযত্নে স্বামীর সিঁথির দুই পাশের চুলের থাক হাত দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত সাজাইতে লাগিল।

(৭)

বৎসরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। পাটনার ওইদিকে কোন্ একটা সরকারী হাঁসপাতালে চাকুরী পাইয়া চারু সেইখানেই এক বৎসর কাটাইয়া সম্প্রতি ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। ইন্দু সঙ্গে যায় নাই সে তাহার পিত্রালয়ে ছিল, সেখানে তাহার নবাগত খুকীটি তাহার প্রথম উচ্চারিত ভাষায় কেবল তাহার প্রবাসী পিতাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছে। ইন্দুর পত্রে এই সংবাদ পাইয়া চারু বাড়ী আসিয়াছে। তাহার আগমন সংবাদে তাহার দুইজন পল্লীবন্ধু আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চারুর নিকট পশ্চিমের কাহিনী শুনিতেছিল। যতীন ইতিপূর্ব্বে চারুকে গ্রামে আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র দিয়াছিল, উত্তরে চারু লিখিয়াছিল যে গ্রাম তাহার নিকট অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে, অতএব সেখানে আর সে শীঘ্র ফিরিতেছে না ইত্যাদি···। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে কহিল "কি হে সহুরে বাবু, এখনই যে বড় ফিরলে? এবার হার ম্যাজিষ্টির তলব কিনা?" চারু লজ্জিত-হাস্যে কহিল "তবে তোমার ইচ্ছে যে চলে যাই?" যতীন হাসিয়া উঠিল "কোথায়? শ্বশুর বাড়ী তো? মতলব তো একমাত্র তাই, তার জন্য অত ভনিতার কোনও দরকার নেই তো!" আর একজন কহিল "তা নৈ কি তোমরা তো ডানে বাঁয়ে।" চারুর কনিষ্ঠ সুবোধ কহিল "মেজদা তো বলেই যে ওর শ্বশুর বাড়ীর··" চারু ধমক্ দিয়া কহিল "ওরে থাম্ চুপ কর্ তোর আর রসান দিতে হবে না।" সুবোধ দুষ্টামি করিয়া আরো একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময়ে গ্রামের সর্ব্বজন পরিচিত গাড়ীখানা আসিয়া দ্বারে থামিয়া পড়িল। যতীন কহিল "ওই দ্যাখ্ চারু মনে মনে টেলিগ্রাফ করেছিল।" গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া মাথার হ্যাট্‌টা কক্ষতলে চাপিয়া দেবেন্দ্র সোজাসুজি বিরজানাথের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বিরজানাথকে প্রণাম করিলে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তিনি দেবেন্দ্রকে চিনিতেন না। চারু চিনিল সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া দেবেন্দ্র কহিলেন "এই যে! ভাল তো?" চারু মস্তক হেলাইয়া উত্তর দিল। দেবেন্দ্র কহিলেন "তুমি এসেচ শুনেই আসচি, চল একবার, তার অসুখ করেচে যে।" বিরজানাথ দেবেন্দ্রের বাক্যের তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলেন "কার?" "মতির" চারু মতিয়ার শয্যার নিকটস্থ হইয়া সবিস্ময়ে দেখিল এই সুদীর্ঘ কালেও মতিয়া চারুর পদশব্দটীও ভুলে নাই। চারুর পদশব্দ শুনিবামাত্র সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বস্ত্র ভ্রমে বিছানার চাদরটা টানিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মাথায় তুলিতেছিল। চারু তাড়াতাড়ি কহিল "থাক্ থাক্।" দেবেন্দ্র সেইমাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন তাই মাতা তাঁহার আহারের উদ্যোগে মতিয়াকে চারুর কাছে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চারু ঔষধ আনাইবার জন্য প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান্ লিখিতে বসিল। ঔষধ আসিলে সেই কটু ঔষধটা মতিয়া অসঙ্কুচিত মুখে গিলিয়া ফেলিল, চারু কহিল "একটু সুপুরী টুপুরী-কিছু লাগ্‌বে না?" মাতা কহিলেন "না, ঔষধ খেতে ওর কোনও আপত্তি নেই, আপত্তি ওজর যত পথ্যের বেলা," মতিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল "আমার শ্রাদ্ধে খুব খাবার দিও মা, খাবো।" মাতা সজল চক্ষে চলিয়া গেলে মতিয়া সহসা অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কহিল "আমার শ্রাদ্ধটাও তোমাকেই করতে হবে নয়?" চারু শান্তকণ্ঠে কহিল "না আপাততঃ তার দরকার হবে না।" সম্ভবতঃ জ্বরের জ্বালায় মতিয়া উত্তপ্ত কপালের উপর নিজের হাত দুখানি দিয়া টিপিয়াছিল। চারু এক হাতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া অপর হাত কপালের উপর স্থাপন মাত্র মতিয়া অসহিষ্ণুভাবে আরক্ত মুখে মাথাটা সবেগে সরাইয়া

লইল। দেবেন্দ্র আসিয়া চেয়ার সরাইয়া বসিবার শব্দে মতিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল "দাদা এঁর ভিজিট!" চারুর মুখের দীপ্তিটুকু দপ্ করিয়া নিভিয়া সমস্ত মুখখানি মলিন হইয়া গেল। দেবেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "ভিজিট! ভিজিট দেবো কাকে মতি ওযে চারু।" দেবেন্দ্র বুঝিলেন যে জ্বরের মোহে বুঝি মতিয়া চারুকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু মতিয়া তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "হলেনই বা, তুমি কি রোগী দেখ্‌তে ডাক্তার ডেকে আন নি? উনিই কি আপনা হতে এসেছিলেন?" দেবেন্দ্র নতমুখে উঠিয়া গেলেন। মতিয়ার প্রচ্ছন্ন অভিমান-সিক্ত কণ্ঠ কেহই যথার্থ অনুভব করিতে পারিলেন না। চারু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল "আর না হোক, তোমায় তাক্ত করবো না, আমি যাচ্চি, দাদাকে ডেকে দিয়ে যাচ্চি।" চারু চলিয়া গেল। মতিয়া তার অসার চক্ষের শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া অসহিষ্ণুভাবে চিন্তা করিতেছিল। মা বলেন কিনা এই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোত্তম সার পদার্থ। আঃ স্পর্শ যার এমন তীব্র মধুর উত্তেজক, আগুনের মত উত্তপ্ত বাষ্পে যে হৃদয় মন ভরাইয়া দেয়, সেই নাকি আবার সুখ-শান্তির আশ্রয়। চিরদিন শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি প্রভাতপ্রদোষে ঠাকুরঘরে বসিয়া মতিয়ার নিষ্ঠাবান পিতা এই হতভাগিনী কন্যাটীকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিবার চেষ্টায় সুগভীর আগ্রহে যে অনাদি অনন্ত অপচল জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিঃবিন্দু মহিমোজ্জ্বল রেখাকারে সেই অম্লান অন্ধ হৃদয়ের প্রতি স্তরেস্তরে আঁকিয়া দিয়াছেন একি তাহার সেই জাগ্রত হৃদয় দেবতা? না তাহা তো নয়। সে করুণা স্নিগ্ধ, হৃদয় মগ্নকারী অমৃতের প্লাবন স্বরূপ। আর এ যে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত একের প্রতি অন্যের তীব্র আকর্ষণ। এই বুঝি সব চেয়ে প্রবল।

চারুর প্রবাসে যাত্রার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র চলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু একটা বৈষয়িক কাজ চারুকে নিষ্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। অফিস ঘরে কাজ সারিয়া চারু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল এই প্রত্যূষে আর কেহ কোথাও নাই; কেবল পূজার ঘর মুক্ত দ্বার, এবং অভ্যন্তর হইতে মতিয়ার মধুর কণ্ঠের স্তোত্র আবৃত্তি শুনা যাইতেছিল "একং নিত্যম্ বিমলমচলম্ সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্ ভাবাতীতম্ ত্রিগুণ রহিতম্. সদ্গুরুম্ ত্বং নমামি" নগ্নপদে চারু ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। একখানি তরুণ উষার লোহিতাভাসের মত রক্তাম্বরা মতিয়ার শুভ্র গৌরদেহের চারি পাশে সদ্য স্নানসিক্ত কেশরাশি এলায়িত। তাহার সপ্তমীর ইন্দুরেখার মত চারুরই স্বহস্তপ্রদত্ত সেই কুশণ্ডিকা'চহ্ন, নিশাশেষের শুকতারার মত উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু। সদ্যঃ রোগমুক্তা মতিয়া তখনো দুর্ব্বল ছিল। নতজানু হইয়া দেবপ্রণাম করিয়া উঠিবার সময় একটা ছোট চৌকীর গায়ে লাগিয়া পদস্খলন হইয়া সে একেবারে ছিট্‌কাইয়া চারুর নিতান্ত সন্নিকটে গিয়া পড়িল। চারু ক্ষিপ্রগতিতে তাহার পতনোন্মুখ ক্ষুদ্র দেহখানা নিজের বুক দিয়া ধরিয়া ফেলিল। দৃষ্টিহীনা মনে করিল বুঝি তাহার সম্মুখস্থ প্রণম্য দেবতাই তাহাকে শিশুর মত লুফিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। তাহার সমস্ত দেহমন দুঃসহ পুলকাবেগে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অন্তর ভরিয়া সে অনুভব করিল এই তো স্বর্গ। এত পুণ্যময়ী এত ভাগ্যবতী সে! তাহাকে এত মধুর আবেশে ঘুম পাড়াইবার জন্য তাহার অন্তরের চির নূতন বীণা অকস্মাৎ মধুর মূর্চ্ছনায় মৃত ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। এই এক পলক মধ্যেই তাহার মনে হইল সে এইখানেই মিলাইয়া যাইবে আর ধূলিলাঞ্ছিত পৃথিবীর জীব তাহাকে হইতে হইবে না। চারু যখন ধীরে ধীরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল "প'ড়ে মারা যেতে, তাই এই এই দুঃখ-টুকু তোমায় ভোগ করতে হ'ল।" তখন সে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িল। 'হায় ভগবান মানুষের বুকে আজ তার স্বর্গ জ্ঞান হইল!' মতিয়ার পবিত্র পুষ্পতুল্য অন্তর ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া গেল। "একি অপমান ঘটিল তাহায়—হে ঠাকুর তোমারই পদ-প্রান্তে! এও কি তোমারি দান? তবে কি তাঁই সত্য! মানুষকে যাহা দিয়াছ তাহা তো মানুষেরই জন্য, তবে তুমি শুধু হে অন্তরদর্শী কেবলমাত্র সৌরভ গ্রহণকারী নির্ম্মাল্যের ফুলের মত?"

(৮)

মতিয়াকে তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা ইঁহারা বহু যত্নে বহু আদরে তাহার যে পদার্থের অভাব তাহা যতদূর সম্ভব অপর সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পূর্ণ করিয়া আসিতেছিলেন। মুখে মুখে অনেক কাহিনী, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শুনাইয়া অনেক শিক্ষাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল কেবল স্বামীর মর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাকে তাহার মাতা। চারুর যাত্রার পর প্রতি প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মতিয়ার সদা-সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয় অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। কই আর যে সে জুতার শব্দও তাহার ভাগ্যে জুটে না। চির আরাধনার দেবতাও যে অনেক দুঃখ তাহাকে এখন দেন। আর তো সে পূজ্যের নিকট পূজারিণী আত্মসমাহিতা আত্মহারা হইতে পারে না, নিজের সেই শৃঙ্খলবন্ধনের নিকটই ঘুরিয়া মরে। যেন দেবতা তাহাকে বুঝাইতে চাহেন যে মানুষের রক্তমাংসের দেহ, তাহার আনুমানিক যাহা কিছু তাহা বাহিরের বশে দমনীয় নহে। মতিয়া বসিয়া নিজের কল্পিত ভ্রান্তির সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চিন্তা করিতেছিল ; সেদিন—শুধু সেই একটী দিনই মাত্র সে জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। আর কতকাল সেই আকস্মিক শব্দ শুনিতে পায় নাই, তা নাই বা পাইল এই না পাওয়াই যেন তার পরিপূর্ণ হইয়া অক্ষয় প্রাপ্তি সংঘটন করে। বাহিরে একটী সুমিষ্ট হর্ষকাকলী শুনিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাসতুতো বোন আশা, কয়েক দিন পরে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া মাসীমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহারই নূতন খোকাটীর হাসির লহরে আকৃষ্টা হইয়া মতিয়া বাহির হইয়াছিল। আশা, নূতন মাতৃত্বের গৌরবে সলজ্জস্মিত হাসিমুখে মতিয়াকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিতেই খোকা মতিয়ার চুলের গোছা ধরিয়া বদনে অর্পণ করিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল। এই শিশু-ভিনিষটী মতিয়ার নিকট দুষ্প্রাপ্য সম্পদ! সে আগ্রহ ভরে সেই পুষ্পস্তবকের মত শিশুটীকে বুকে চাপিয়া ধরিল। খোকাও পরমোৎসাহে মতিয়ার নাসিকাগ্র মুখে পুরিয়া মুখময় লালা মাখাইয়া দিতে লাগিল। এবং তাহার ভাষার অশ্রান্ত ঝঙ্কারে সকলের কথা ডুবাইতে লাগিল। মতিয়া প্রফুল্লমুখে কহিল "তুই সমস্ত দিনরাত একে আদর করিস্ নয় আশা ?" আশা হাসিয়া কহিল "হ্যাঁ আমার তো আর কোনও কাজ কর্ম্ম নেই কিনা? শুধু ওরি কাজ নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা থাকি তবু আর অন্ত নেই, কম বিরক্ত করে ও।" মতিয়া শিশুটীকে বুকের ভিতর চাপিয়া কহিল "এ না কি আবার বিরক্ত করে।" "করে কি না-করে তা একরাত্রি রাখ্‌লে বুঝতে পারো, সারা রাত্রি ঘুমুতে দেয় না" মতিয়া কহিল "একে পেলে আমি না ঘুমিয়েও থাক্‌তে পারি।" আশা চলিয়া গেলেও মতিয়ার হৃদয়ে বিগত বসন্ত স্মৃতির মত শিশুটীর মিষ্টত্ব লাগিয়া রহিল। এবার যেন পৃথিবীর লুকানো সম্পদ একটু একটু করিয়া তাহার জীবনকে স্পর্শ করিয়া দোলাইয়া যাইতেছে। অন্ধ বলিয়া দয়া করিয়া আর কিছুতেই ছাড়িয়া চলিতেছে না। ইহার উপর যেদিন শুনিল তাহার দাদারও একটী খোকা আছে কিন্তু বৌদিদি কোনমতেই গ্রামে আসিতে চাহেন না তাহার মাতাও অনুমতি দেন না, আর চারুরও তো একটী খুকী আছে, তাহাও মতিয়া পায় না। নির্জ্জনে বসিয়া এক একদিন মতিয়ার অন্ধ নয়নে ঝর্-ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামে একটা গঙ্গাস্নানের হুজুক উঠিয়াছিল মতিয়ার মাতাও গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া মতিয়াকে রাখিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু মতিয়া স্বীকার করিল না, সেও সঙ্গে যাইবে। অতি সতর্কে মতিয়াকে স্নান করাইয়া মা মতিয়াকে তীরে তুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই মতিয়া কহিল আর একটু থাকি মা বেশ্ লাগ্‌ছে।" অবিরত স্নানার্থীদের করতাড়িত প্রতপ্ত-স্নিগ্ধ গঙ্গার তরঙ্গগুলি মতিয়ার বুকে পিঠে মৃদু আঘাত করিতেছিল। কেহ কেহ গঙ্গাস্তব করিতেছিলেন, কেহ

বা আসন্ন উদয়ের আরক্তচ্ছটা বিভাসিত পূর্ব্বদিকে চাহিয়া অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া অর্ঘ্য দিতেছিলেন। কে একজন চারুদের আত্মীয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। মতিয়ার মাতা তাঁহার সহিত আলাপে সংবাদ পাইলেন যে, চারু সস্ত্রীক পুরী গিয়াছে, কন্যার শরীর অসুস্থ হওয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। মতিয়া উৎকর্ণ হইয়া কথাগুলি গিলিতেছিল।

(৯)

পূজার ছুটীতে কোর্ট বন্ধ হওয়ায় দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার মা এই সময় পূজার উপচার আনাইতে ও সাজাইতে বিব্রত ছিলেন। মতিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরিয়াছিল কিন্তু তাহার তো এমত শক্তি ছিল না যে মাতার কাজের সে যথেষ্ঠ সাহায্য করিতে পারে। তাই ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিল। দেবেন্দ্র আসিয়া কহিলেন "চল ঘরে গিয়া বসি।" দেবেন্দ্র জানিতেন মতিয়াও অন্ধের স্বাভাবিক মিষ্ট শব্দ শুনিতে বড় ভালবাসিত। তাহারই পরিতোষের জন্য মিষ্ট আওয়াজের সকল যন্ত্রই সে গৃহে বর্ত্তমান ছিল। মতিয়া কহিল "তুমি বুঝি বাজনা নিয়ে বসতে চাও? আমি এখন ও-সব পারবো না, তুমি একটা গল্প বল, কিংবা বই পড় শুনচি।" দেবেন্দ্র কহিলেন "তোর যেমন গান করতে ইচ্ছে করচে না আমারও তেমনি বই পড়তে ইচ্ছে ক'রচে না।" মতিয়া কহিল "আচ্ছা তবে গল্প বল।" "কোন্‌টা বল্‌বো? আর যে মনে হয় না।" তোমাদের নবেলের গল্প একটা কর তাই শুনতে ভাল লাগে, আচ্ছা দাদা গল্পেও আমার মত কাণা মানুষ থাকে? কই কাণার গল্প তো বল না কখনো। "বলি নি বাঃ, ধৃতরাষ্ট্র তো অন্ধ ছিলেন।" "ওঃ তিনি তো গল্প নন তিনি তো সত্যিই ছিলেন। আর গল্পে অন্ধ মেয়ে মানুষ থাকে না?" দেবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন "হাঁ রজনী অন্ধ ছিল, তা সে গল্প তোকে আর একদিন শোনাব।" অধীর আগ্রহে মতিয়া কহিল "আর একদিন আবার কবে শোনাবে; তুমি ত চ'লে যাবে।" "চলেই যদি যাই, তুই আর কারোকে দিয়ে পড়িয়ে শুনিস।" পৃথিবীর সচরাচর প্রচলিত মহৎ হইতে হীন, উত্তম হইতে অধম সকল প্রকার বিষসংবাদ মতিয়াকে গোপন করা তাহার মা ও দাদা আবশ্যক মনে করিতেছিলেন। তাহার স্বার্থ-পঙ্কিল সংসারে শুভাশুভ জ্ঞানলেশমাত্র বর্জ্জিতা অন্ধ যুবতীর বিপদাশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আত্মরক্ষার মহাসহায়, বিশেষ মাতার অবর্ত্তমানে মতিয়ার একান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়াই অধিক সম্ভাবনা। এইরূপে সংসারের নূতন তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ মতিয়ার ঔৎসুক্য বাড়াইয়া দিতেছিল। পরদিনই প্রভাত হইতে না হইতে বাড়ীর শেফালিগাছের তলায় একদল বালিকা ফুল কুড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিল। শুভ্রকোমল দলের নীচে আরক্তবৃন্ত ফুলের রাশি যেন গালিচার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ মৃদুসুবাসে সারাবাড়ী ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েদের কলকণ্ঠ শুনিয়া ও সুবাস লক্ষ্য করিয়া মতিয়া ধীরপদে গাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পদতলে পড়িয়া ফুলগুলি পিষিয়া গেল দেখিয়া বালিকারা ব্যস্ত হইয়া কহিল "ও দিদিমণি তুমি সব ফুলগুলি মাড়িয়ে দিলো যে! তুমি আর এদিকে এসো না আমরা তোমার ফুল কুড়িয়ে দিচ্চি। মতিয়া পদদলিত ফুলকয়টা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া অপ্রতিভভাবে কহিল "আচ্ছা, আচ্ছা আমি যাচ্চি, তোদের মধ্যে সুকু আছে? সুকুমারী কহিল "আছি! কেন? তুই বাড়ী গিয়ে বিনুকে পাঠিয়ে দিস তো রে, বলিস্ বড্ড দরকার, বাড়ীর কাজকর্ম্ম যেন সেরে আসে।" মতিয়া দুই পদ পিছাইয়া যেখানে তুলসীমঞ্চের নিকটে তাহার পিতার শানবাঁধানো বসিবার বেদী ছিল সেইখানে গিয়া বসিল। মেয়েরা

কোচড় ভরিয়া ফুল লইয়া ফিরিতেছিল। মতিয়া কহিল "তোরা ফিরচিস্ যে বড়, আমায় ফুল দিলি নে?" মেয়েরা পরস্পর চাহিল। অর্থাৎ সকলে নিজ নিজ অংশ হইতে দিতে স্বীকৃত কি না? মতিয়া বসিয়াছিল যে এই ফুলের মালা আজ ঠাকুরের কণ্ঠে দিতে হইবে কারণ যদি অনায়াসে ফুলকটি পাওয়া গেল তবে একটুখানি আলস্যের জন্য অসার্থক কেন হইবে। দুখানা কচুর পাতায় করিয়া সুকু তাহাকে কতকগুলি ফুল দিয়া গেল। মতিয়া কহিল "তোর কাপড় ছাড়া তো? এ ফুলের মালা ঠাকুরকে দেব বুঝে দিস্, তোর আকাচা কাপড় হয় তো তুই ফুল নিয়ে যা।" নিজের বস্ত্রের শুদ্ধতা প্রমাণ করিয়া দিয়া সুকু চলিয়া গেল। সুকুর বোন্ বিনু ষোড়শী। দেবেন্দ্রর অনুপস্থিত কালে মতিয়াকে অনেক পুস্তক পড়িয়া সেই শুনাইত। অবশ্য সে যাহা শুনাইত তাহা হয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ না হয় কোনও উপন্যাস এই রকম কিছু একটা হইত। ইহা ছাড়া ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত মহাশয় মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে গীতা ভাগবত ইত্যাদির অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। সহস্রবার শুনিয়া শুনিয়া সে সকলের প্রত্যেক শ্লোক মতিয়ার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। বিনুর মুখে মতিয়া রজনী শুনিতেছিল। এমন করিয়া তাহার নিজের অনুরূপ অন্ধের সুখদুঃখ গ্রহণ করিয়া আর কোনও কল্পনা-কাহিনী তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার মতনই শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধময়, তথাপি আলোকচ্ছটায় পরিপূর্ণা সুষমাময়ী প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাচক্র তাহাকে অন্ধ বলিয়া এতটুকুও সকরুণ ব্যবধান রাখিয়া চলিবে না। মতিয়া নিমগ্ন হইয়া শুনিতেছিল। যে মতিয়া নল-দময়ন্তীর অর্দ্ধবাস গ্রহণকে নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা মনে করিত এবং মানুষে মানুষের জন্য কেমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া অত ভাল বাসিতে পারে ইহারই প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া সমস্যায় পড়িত; আজ আর সে মতিয়া ছিল না। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল মানুষ তো দূরের কথা মানুষের পায়ের তুচ্ছ বিনামার মৃদু ধ্বনিতে বুকের নিভৃত কেন্দ্রে কি প্রচণ্ড হিল্লোল বহিয়া যাইতে পারে। কস্তূরী-সম্ভব কুরঙ্গের মতই সে আপনার সদ্যবিকশিত হৃদ্‌পদ্মের মধু-মাদকতায় অর্থহীন ভাবে বিভোরা। মতিয়া তো শুনিয়াই যাইতেছে, তাহার ক্লান্তি নাই। পাঠিকা বিনু চঞ্চল হইয়া অস্ফুট দ্রুত কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়ই পিয়নের প্রাত্যহিক ডাক বিলির সময়। সে উদ্ধমুখে পিয়নের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে আর সময় মত উপস্থিত হইয়া চিঠিখানি গ্রহণ করিতে না পারিলে বৌদি হইতে কাকী পর্য্যন্ত মিলিয়া মিশিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিবে এবং যখন তখন এক আধ ছত্র বাহির করিয়া বিনুকে কাঁদাইয়া ছাড়িবে এই আশঙ্কায় সে প্রত্যহ ডাকের সময় সুকুকে পাঠাইয়া জানিয়া লয় যে—"যাতো সুকু দেখে আয় না ভাই পিয়ন আসছে কিনা" সেই অভ্যাস মত সুকু তাহার পছন্দ মত একটা সুবৃহৎ পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া প্রশ্ন করিল "দেখে আসবো দিদি পিয়ন আসচে না কি।" বিনু নির্বোধ সুকুর বুদ্ধিহীনতায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া কহিল "দোৎ না" মতিয়া কহিল "কি?" বিনু বইখানা মুড়িয়া কহিল "কিছু না ভাই মতিদি সুকটা বড্ড বোকা। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্ আবার কাল এসে শোনাব'খন। আজ যাই মতিদি?" মতিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল "না, না, যাবি কি? এখন তোর কোনও কাজ তো নেই? বোস্ আর একটু শুনিয়ে যা ভাই "বিনু অনিচ্ছায় একটু বসিল। অতি দ্রুতকণ্ঠে একটু পড়িয়া আবার উঠিল "যাই ভাই মতিদি, রাগ কোর না আমার বড় দরকারী কাজ আছে, কাল সকাল সকাল এসে তোমায় সমস্তটা শুনিয়ে দিয়ে যাব।" অতি প্রখর বুদ্ধিমতী মতিয়ার বিনুর বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে বিলম্ব হইল না সে মৃদু হাসিয়া বিনুকে ছুটী দিল। বিনুকে বিদায় করিয়া দিয়া মতিয়া নিজে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(১০)

চারু পুরী হইতে সপরিবারে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেলা দুই প্রহরে চারু স্নানান্তে আহারে বসিয়াছিল। ইন্দু তপ্ত দুধ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে করিতে কহিল "বউঠাকুর কি লিখেছেন গো?" "কি আর লিখবেন; পূজোর সময় তোমায় নিয়ে বাড়ী যেতে লিখেচেন।" ইন্দু হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল "তা বেশ তো, চল না নিয়ে।" "বটে! রেণুর শরীরটা সবে মাত্র একটু সারতে আরম্ভ করেচে, এখন গাঁয়ে গিয়ে যদি আবার খারাপ হয়?" "কিন্তু মা যে ওকে দেখতে চেয়েচেন।" চারু কহিল "তা কি-কোরে এখন হ'তে পারে, উপায় নেই।" ইন্দু অভিমানে মুখ আরক্ত করিয়া কহিল "তুমি পাঠাবে না তাই বল।" চারু মুখ তুলিয়া ইন্দুর মুখপানে চাহিয়া কহিল "ওঃ তুমি দেখ্‌চি ব্যস্ত হয়ে উঠেচ যাবার জন্যে?" ইন্দু কহিল "উঠেচিই তো! আমাকে রাখ্‌তে হলেই তোমার আর একটা কারোকে এনে রাখতে হবে। একা আমায় ফেলে তুমি বেরিয়ে যাও, না-আছে আসবার ঠিক্, না-আছে খাবার ঠিক্, আমি পারি নে আর একা থাকতে।" অদূরে একটী মাদুরের উপর মল্লিকাশুভ্র ফুল্লকান্তি রেণু বসিয়া একটা কাকের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়াছিল। চারু স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "আমার মায়িটা থাকে কেমন কোরে?" ইন্দু হাসিয়া কহিল "হ্যাঁ উনি ত আরো দুখোর। আচ্ছা সে না হয় তোমার যা খুসী করো। আর একখানা চিঠি কার?" চারু অনামনস্কভাবে কহিল "দেবেন বাবুর।" "কি লিখেচেন?" "সে অনেক কথা" চারুর উৎকণ্ঠিত মুখ পানে চাহিয়া ইন্দু মৃদুকণ্ঠে কহিল "কোন খারাপ খবর?" চারু কহিল "খারাপ আর কি? দাদা গাঁ-শুদ্ধ দেনা কোরে কোরে ঋণ ক্রমশঃ বাড়িয়েই তুলচেন, তাঁর মস্ত বড় ভরসা আমার এই চাকরী, কি যে আমি হাজারবারোশো রোজগার কচ্চি তা তো বোঝেন না।" ইন্দু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল "তিনিই লিখেচেন, এসব কথা?" চারু কহিল "হ্যাঁ তিনিই এসব শোধ করে দিতে চান, আর কি?" "তা মন্দ কি? তোমারই তো সে সবও।" "হ্যাঁ, তিনিও তাই লিখেছেন। লিখেচেন গাঁয়ে গিয়ে থাকতে কিন্তু এ সব কি যুক্তিসঙ্গত কথা?" "নয় কেন? সে বিষয়সম্পত্তি তো পড়েই আছে, তোমার নিজের জিনিষ।"—চারুর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল "ছি, সে আমার জিনিষ কেন হ'তে যাবে, সে তাঁদেরই; আমি আর কিছু পারবো না কেবল সম্পত্তির কর্ত্তা হ'তে যাব?" আহারান্তে পান মুখে পূরিয়া চারু রেণুকে লইয়া বসিল। রেণু স্থির থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা জানাইয়া পিতার উচ্ছিষ্ট থালাটার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। সহসা মায়ের হাতে দুধ দেখিয়া সে অকস্মাৎ নিতান্ত শান্ত হইয়া পিতার বুকের ভিতর গিয়া লুকাইল। ইন্দু সহাস্যে চারুর হাতের ভিতর দিয়া রেণুর পিঠে হস্তার্পণ করিয়া কহিল "বড় যে লুকিয়ে আছিস, দুধ খেতে হবে না?" অত্যন্ত নিকটে একটা পত্রবিরল জিউলির গাছে একটী সুকণ্ঠ পাখী মিষ্ট কণ্ঠে কহিল "খোকা হোক, খোকা হোক।" স্বামীস্ত্রী সকৌতুকে গাছটার পানে চাহিয়া হাসিল। ইন্দু হাসিতে হাসিতে কহিল "দূর হতভাগা, মানুষ কোরে দিবি তুই? "এসে খাইয়ে দিয়ে যানা এই দুধটুকু।" চারু সহাস্যে কহিল "তা যাইহোক্ গলাটি মিষ্টি।" গলাটি যে বাস্তবিকই মিষ্ট তাহা মনে মনে স্বীকার করিলেও ইন্দু কহিল "ছাই।" "ছাই বই কি? তা হলে এ-ক্ষেত্রে তোমার কান দু'টাই বিগ্‌ড়ে গেছে বল্‌তে হবে।" ইন্দু প্রচ্ছন্ন হাসিতে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল "হবে না তো কি? তোমার কপাল যেমন কারু বা চোক নেই, আর কারুর বা কান নেই।" চারু কহিল "না তা নয় কান নেই, এমন কথা তো আমি বলি নি, বলেচি যে কান বিকৃত।" ইন্দু হাসিয়া কহিল "ও এক কথাই হল।" "হল

তো হ'ল।" বলিয়া চারু বাহিরে চলিয়া গেল। ইহার পর আরো কয়েক বার ইন্দু বাড়ী যাইবার জন্য চারুকে অনুরোধ করিল। কিন্তু অনাবশ্যক ব্যায়বাহুল্য ইত্যাদির অছিলায় চারু তাহা কানেই তুলে নাই। অবশেষে ইন্দু যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিল তখন একদিন চারু আসিয়া কহিল "চল ইন্দু বাড়ীই যাই।" ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি হল? হঠাৎ মন বদ্‌লে যাবার কারণ?" চারু অন্যমনস্কভাবে কহিল "কি জানি বুঝ্‌তে পারচি নে যে! জ্ঞান হ'য়ে অবধি প্রতি বিজয়ায় মাকে প্রণাম কোরে আস্‌চি, তাই মা'ই হয় তো তলব ক'রছেন।" ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া কহিল "বেশ তো, আমিও যেতে পেলেই বাঁচি।" চারু কহিল "বাঁচ? আচ্ছা এবার তোমায় রেখেই আস্‌বো" ইন্দু মুখ ফিরাইয়া কহিল "তা বৈ কি, তবে তুমি একাই যাও।" চারু হাসিয়া কহিল "নাও যা গোছাবার সব গুছিয়ে নাও, সময় খুব বেশী পাওয়া যাবে না, আমি ছুটির চেষ্টায় যাই।"

(১১)

বিজয়ার শুভ মিলন রাত্রি। বালক বালিকা ও যুবকের দল পরম উৎসাহে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথা নত করিয়া মিষ্টমুখ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের পুলকোচ্ছ্বাসিত হাস্যে ও উচ্চ গল্পে সারা পথ মুখরিত। জোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের ধারে বসিয়া একজন পল্লীবালক বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিল :—

"উমা কেমন ছিলে হরের ঘরে?
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।

একদল যুবক উচ্চৈস্বরে কহিল "দূর বোকা, বিজয়ার দিনে আগমনী গাইচিস্‌।" দূর হইতে বিসর্জ্জনের সকরুণ সহান-মন্দ্র শুভ্র নির্ম্মল জোৎস্নাহসিত গ্রামখানির বক্ষ কাঁপাইতেছিল। দেবেন্দ্র আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। মা ও মতিয়া তখন ঠাকুর ঘরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। তখনও আরতির দীপ নিভে নাই। মুক্ত দ্বারপথে আলোকোজ্জ্বল পুষ্পাভরণ-সজ্জিত বিগ্রহমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। মা কহিলেন "এখানে ওঁর সাম্‌নে আ-গে প্রণাম কর্‌লি দেবু, ওঁকেও কর।" দেবেন্দ্র যুক্তকরে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। মতিয়া উঠিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া মাকে প্রশ্ন করিলেন "কি বোলে আশীর্ব্বাদ ক'রতে হয় মা?" "বল জন্মায়তী হও।" "আর? ওকেতো বেঁচে থাকা বলা হল না।" "হ'ল বই কি। মেয়ে মানুষের স্বামীর কল্যাণই সব, তা নইলে আবার বেঁচে থাকা, আচ্ছা বল্‌ সাবিত্রী সমান হও।" মতিয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল "হয়েছে দাদা হয়েছে।" দেবেন্দ্র সেই রাত্রেই কলিকাতা ফিরিবেন। মতিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বিজয়ার দিন স্বামী-প্রণাম করিতে না পাইলে তাহার বৌদিদি কাঁদিয়া, উপবাস করিয়া অনর্থ করিবে। সুতরাং দেবেন্দ্রকে যাইতেই হইবে। মতিয়া যখন ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া আনতমুখখানি গুঁজিয়া অকারণ অশ্রুপাত করিতেছিল তখন তাহার সেই চিরতমসাবৃত মনোমন্দিরে সেই দিনকার সেই ধান্তারি প্রার্থনা করিতেছিল বুঝি। মনে মনে বলিতেছিল আর কোন ত শক্তি আমায় দাও নাই ঠাকুর—তা নাই বা দিলে ভগবান, কিন্তু প্রণাম করিবার শক্তি তো আছে, তবে আজকার এমন দিনে এ লোভাতুর কাঙ্গালচিত্তকে কেন এমন বঞ্চিত কর ঠাকুর।" বন্দনাশেষে মাথা তুলিতেও তাহার ভরসা হইতেছিল না। সেই কল্পিত স্বর্গের গোপন বাঞ্ছা যদি নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া যায়। অনেকক্ষণ পরে মনের উচ্ছ্বসিত

ক্ষোভের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে পরে মতিয়া শান্তভাবে মাথা তুলিয়া বসিল। সহসা অসহনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার হৃদ্‌যন্ত্র লাফাইয়া উঠিয়া দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষিত পদশব্দ! প্রত্যক্ষ অন্তর্য্যামী বটে। বুভুক্ষুর মত মতিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি হইয়া লুটিয়া পড়িল। চারু সুগভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। মতিয়া অনেক দিনকার সঞ্চিত দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ বহুকষ্টে দমন করিয়া কহিল "আঃ আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।" চারু সবিস্ময়ে কহিল "কি ভাব্‌ছিলে?" মতিয়া মৃদু হাসিল, প্রসন্ন-মুখে কহিল "সে হয়েছে, সার্থকই হ'য়ে গেছে। তুমি কবে এলে?" চারু সংশয়াকুলকণ্ঠে কহিল "কি সার্থক হয়ে গেছে আগে বল।" মতিয়া একটু কি ভাবিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "কিছুই না, এই বিজয়ার প্রণামের কথা ভাব্‌ছিলাম তাই।" "কাকে? আমাকে প্রণামের কথা ভাব্‌ছিলে? কেন? তোমার আবাল্যের ঠাকুর দেবতায় আর মন ভরে না?" মতিয়া নিঃশব্দে হাসিলমাত্র, কোনও উত্তর দিল না। চারু কহিল "আমি বাড়ী এসেচি, একথা তুমি জান্‌তে না কি?" "না আমি তা কি কোরে জান্‌বো, কেউ বলে নি তো।" "তবে তুমি আমায় দেখ্‌তে—" মতিয়া বাধা দিয়া কহিল "দেখ্‌তে তো আমি পাই নে।" চারু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "আমায় প্রণাম কর্‌বার কথা ভেবেছিলে কেন?" এবারও মতিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিল না প্রসঙ্গান্তর চেষ্টায় কহিল "আর একটু আগে এলেই দাদার সঙ্গে দেখা হ'ত।" চারু কহিল "তিনি নেই বাড়ী?" "না তিনি এই একটু আগে বেড়িয়ে গেচেন, ক'লকাতা গেলেন।" "হ্যাঁ আমার আসতে রাত হয়ে গেল যে।" মতিয়া কহিল "রাত বুঝি অনেকটা হয়ে গেচে।" চারু বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল অম্লান-শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। নীল-নির্ম্মল আকাশে সন্তরণশীল শঙ্খতুষার দশমীর চন্দ্র। পাপিয়ার করুণ মধুর স্বরলহরীতে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত। মৃদুকণ্ঠে কহিল "তা হয়ে গেছে বই কি।" মতিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল "তোমায় যে ঠাণ্ডা লাগ্‌চে, এতখানি যেতে হবে আবার।" চারু কহিল "না বেশী ঠাণ্ডা লাগ্‌চে না; মা এলে তাঁকে প্রণাম কোরে যাই।" মতিয়ার সমস্ত ধমনীতে উৎকট শোণিত-স্রোত বহিয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছিল দুই হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্পর্শদ্বারা পরিপূর্ণরূপে স্বামীকে,—স্মৃতির সেই স্বর্গসুখকে, অন্তর ভরিয়া অনুভব করিয়া নেয়, কিন্তু স্বাভাবিক দ্বিধাভরে তাহা পারিল না। দুর্গোৎসবের অবশিষ্ট পদ্মরাশির মাঝে প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

(১২)

দেবেন্দ্র গ্রামে না থাকায় ও পূজার পরই চারুর ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া আসায় এবার চারুকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। গ্রামের পরিচিত আত্মীয়দিগের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ের অল্পতায় এবং বন্ধুদের সদাসমাগমে ইচ্ছাসত্ত্বেও সে আর একবার মতিয়াদের নিকট গিয়া বিদায় লইয়া আসিতে পারে নাই। সে যে চলিয়া গিয়াছে এ-সংবাদ মতিয়ার মাতা অবশ্য পাইয়াছিলেন কিন্তু মতিয়াকেও জানান বোধকরি আবশ্যক মনে করেন নাই। মতিয়া আশা করিয়া করিয়া তারপর হতাশ হইয়া সঠিক সংবাদ পাইবার জন্য মায়ের কাছে গেল। কিন্তু আর তো সে সেই মুক্ত হৃদয় শিশুটির মত উদার প্রাণের অধিকারী নাই তাই কি একটা প্রবল বেদনাকুণ্ঠিত সঙ্কোচে তাহার মুখ চাপিয়া ছিল একটী প্রশ্ন ও সে করিতে পারিল না। মনটা ভারাক্রান্ত ক্লিষ্ট বোধে নিজের এই অপ্রীতিকর ভাবনাচিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিজের বসিবার ঘরে গিয়া হাত বাড়াইয়া বসিবার একটা কিছু খুঁজিতেছিল। পাশেই খোলা জানালার সংলগ্ন ফলভরা পেয়ারা গাছের তলায় পাড়ার চাষাভুষাদের ছেলেরা পেয়ারা পাড়িয়া খাইতেছিল।

শুষ্ক পত্রের মচ্‌মচ্‌ শব্দে এবং লুব্ধ বালকদের কলঝঙ্কারে মতিয়া সরিয়া আসিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। একটী বালক কহিল "দিদি ঠাকুরুণ একটা পেয়ারা নেবে?" মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া সে জানালা ছাড়িয়া একটা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। হাত বাড়াইতেই খোলা অর্গ্যাণটা পাইয়া সে আরো একটু সরিয়া বসিল। মিষ্টশব্দে আকৃষ্ট বালকদল একে একে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে বিনু আসিয়া হাসিয়া কহিল "বেশ সময়ে এসে পড়েছি মতিদি থামিয়ো না ভাই. একটা শুনিয়ে দাও" মতিয়া অলস মধ্যাহ্নের দুঃসহ স্তব্ধতার মাঝে এই রকম একটী সঙ্গীই খুঁজিতেছিল। হাসিয়া কহিল "কিন্তু আমার পছন্দ মত গান তো তোর পছন্দ হয় না বিনু।" "না তা কি কোরে হবে ভাই তুমি যদি ধর "শেষের সেদিন মন করবে স্মরণ"—তবে সেটাও আমি কেমন কোরে পছন্দ করি বল তো?" মতিয়া হাসিল "তুই তাহ'লে কোন্‌টা পছন্দ করিস্‌?" "আমি. তোমার ওইটের ঠিক পালটা পছন্দ করি:—

"আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাথা পাখা তুলে।"

"তবে দে তোর পছন্দ মতই একটা খুঁজে দে শীগ্‌গীর।" বিনু আলমারী হইতে "গান" খানা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠা হইতে দেখিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক নিঃশব্দে দেখিয়া কহিল "এমন একটা পছন্দ করি, যা তোমারও মনে লাগ্‌বে আর আমারও মনে লাগ্‌বে।" মতিয়া কহিল "আচ্ছা তাই।" বিনু কহিল "যদিও আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু।" মতিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল। মতিয়ার শিক্ষাগুরু দেবেন্দ্রের সকল শিক্ষা হইতে এই বিদ্যার শিক্ষকতা মতিয়া সার্থক করিয়াছিল। মতিয়া ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল:—

"যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্র বেদনে জাগাও আমায়
ফিরিয়া যেও না প্রভু।
যদি কোনও দিন তোমার আসনে
অপর কারেও বসাই যতনে
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেওনা কভু।"

মতিয়া থামিলে বিনু কহিল "আর একটা মতিদি, আর একটা" মতিয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিল "আর পাচ্চিনে ভাই।" কিছুক্ষণ পরে বিনু মৃদুকণ্ঠে কহিল "হাঁফ ছাড়া হ'ল তোমার।" মতিয়া সহাস্যে কহিল "হ'ল" বিনু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল ওই যায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগে নয় মতিদি?" মতিয়া কহিল "কোন্‌খানটা?" বিনুর এই সামান্য প্রশ্নেই মতিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিনু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল "জানিস্‌ বিনু, ওটা মানুষকে নিয়ে তৈরী নয়, ওটা ভগবানকে লক্ষ্য করেই লেখা।" বিনু প্রশ্নের গুরুত্ব কিছুমাত্রও প্রশ্রয় না দিয়া কহিল "তা হ'লই বা, আমরা তো মানুষের চেয়ে ভগবানকেই বেশী ভালবাসি নে" "হুঁ:, ভগবান না হলে মানুষ পেতে কোথা থেকে?" বিনু স্নিগ্ধকণ্ঠে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল "ঠাণ্ডা হও মতিদি, আমি নাস্তিকতা করচি নে, তোমার সঙ্গে শাস্তরের তর্কও করতে বসি নি, তুমি তোমার মনকে চাবুক মেরে মেরে

ছত্রিশ দুয়োর বন্ধ কোরে ভগবান ভজাও গে—আমি বারণ করচি নে ; কিন্তু আমার মনে হয় যারা নিজের শক্তি না বুঝে ভগবান বুঝ্‌তে যায়, তারা তাদের মনকে শুদ্ধর বদলে শুধু রুদ্ধই করে।" "তা হলে মানুষে ভগবানকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে না, এই তো বলচিস্?" বিনু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "অন্ততঃ তুমি আমি ত নইই।" "তবে তুমি আমি সবচেয়ে ভাল বাসি কাকে?" বিনু মুখ নামাইয়া হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। ক্ষণেক উত্তরের প্রত্যাশায় নীরব থাকিয়া মতিয়া বিনুর নিকটে সরিয়া আসিল, কহিল "বিনু উত্তর দিচ্চিস্ নে যে!" "কি উত্তর দেব বল?" মতিয়া বিরক্ত হইয়া তিক্তস্বরে কহিল "যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।" "ও কথার উত্তর মানুষ আপনা আপনিই পেয়ে থাকে তুমিও তাই পাবে।"

(১)

মতিয়ার মনটা উদাস হইয়া গেল। গানবাজনা থামিয়া যাওয়ায় ঘরের ভিতর শিশুর দল অধৈর্য্য হইয়া কহিতেছিল "আর বাজাবে না?" সহসা নীলুর দ্রুততাল চটির শব্দে সকলেই চমকিয়া উঠিল। নীলুর মসীবর্ণ মুখে আরক্ত শিরাবহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটীকে ভয় করিত না এমন বালক পাড়ায় কেহ ছিল না। দুরন্ত শিশুকে দুধ খাওয়াইবার জন্য তাহাদের মাতার একমাত্র অব্যর্থ কৌশল নীলুর নামটী মাত্র। এ হেন নীলুর সশরীরে আবির্ভাবে ত্রস্ত শিশুর দল নিমেষে অন্তর্হিত হইল। অসময় নীলুর আগমনের হেতু নির্ণয়ে মতিয়াও উৎসুক হইয়া কান পাতিয়া রহিল। গৃহিণীর ঘরের সম্মুখের দ্বারে গিয়া নীলু ডাকিলেন "বৌঠান্।" ঘরের মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া সদুর মা একমুখ পানদোক্তা ঠাসিয়া পরম আরামে ঝিমাইতেছিল। নীলুর কণ্ঠস্বরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া রকের নীচে গিয়া খানিকটা পানের পিক ফেলিয়া মুখ বিবর হালকা করিয়া লইয়া কহিল "মাঠান্ ঘুমিয়ে পড়েছেন।" নীলু ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হস্তস্থিত টেলিগ্রাফের লেফাফার উপর দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "একবার জাগিয়ে দিতে পারিস সদুর মা, বড্ড জরুরী কাজ আছে।" সদুর মায়ের আহ্বানে তন্দ্রামুক্তা গৃহিণী নীলুর হাতের দিকে চাহিয়া আশঙ্কায় বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করিলেন "ওকি ঠাকুরপো টেলিগ্রাফ? দেবু ভাল আছে তো?" নীলু শশব্যস্তে কহিলেন "সেকি ভাল আছেন বৈকি, এ অন্য কাজের কথা" এই সময় নীলুর পিঠের কাছে মতিয়া নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলু দ্বার ছাড়িয়া ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। মতিয়াও মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। গৃহিণী কহিলেন বল ঠাকুরপো তোমার কি কাজের কথা,—টেলিগ্রাফ কে করেচে?" "বাবাজী করেচেন।" বলিয়া তিনি টেলিগ্রাফের মর্ম্মার্থ গৃহিণীকে শুনাইলেন। গৃহিণী কহিলেন "এই দেনার জন্যেই চারু চাকরী আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আমাদের জানায় নি। বিরজানাথ যে বেহিসাবী লোক তাতো আমরা বরাবরই শুনে আসচি" নীলু কহিলেন "তবে এখন আমাদের কি করা উচিত মনে করেন?" "দেবু টাকা দিতে বারণ করেচে?" "হুঁ, তাই বইকি? লিখেচেন না চাইলে দিও না" গৃহিণী একবার কন্যার পানে চাহিয়া কি ভাবিলেন তার পর স্থিরকণ্ঠে কহিলেন "ওটা দেবুর চারুর ওপর অভিমানের কথা, সে যাই বলুক তুমি মোকদ্দমার দিন ও-টাকাগুলো শোধ কোরে এস ঠাকুর পো" "আমায় যা বলেন তাই কর্‌বো, তবে বিরজাবাবুর এই সাহস দেখে অবাক হচ্চি। তিন তিনবার লোকসান হয়ে গেল, তবু আবার সেই ব্যবসা। আর আগাগোড়াই তার দেনা" গৃহিণী ম্লান হাস্যে কহিলেন "কপালের গেরো তাই এ দুর্ব্বুদ্ধি।" "আচ্ছা চারু-বাবার কি উচিত ছিল না যে বাবাজীকে একবারটী খবর দেওয়া?" "তাদের কি উচিত ছিল না-ছিল, তা দেখবার ত সময় আর নেই, আমাদের যা উচিত তাই করোগে, যদি মহাজন নিজে এসে আমাদের না জানাতেন তা হলে তো আমরা কিছুই জান্‌তে পার্‌তাম না" মতিয়া নিস্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। নীলু চলিয়া গেলে সে মাকে কহিল "এ গুলো কি ধার মা, তোমরা শোধ

দিচো ?” “আমরা আর কি দিচ্ছি মা, তাদেরই তো সব,—চারু বোঝে না তাই, তা বলে চারুর টাকা থাক্‌তে বিরজার অপমান হয় এ কি কোরে দেখি ?” তারই তো সব, সত্যই তো সমস্তই তার। তবে কেন সে গ্রহণ করে না ? দূরে দূরে থাকে কেন ? সে কি কেবল এই বিড়ম্বিত অন্ধকার জীবনটুকুর ব্যবধান ? এই দুর্গ্রহ হইতে যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সেইখান হইতে সে এড়াইয়া চলে—তবু তারি সব। এই গুরুভার ব্যর্থ জীবনটাও পরতে পরতে তারই। বহুক্ষণ মতিয়া নিশ্চেষ্ট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে মায়ের আহ্বানে মায়ের কাছে গিয়া বসিল। তাহার স্বভাব-সঙ্কোচের উপর চিরদিনকার হাস্য-কোমল-স্নিগ্ধ মুখচ্ছবির ভাবান্তর, মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু তাহার চিন্তাধারা যে কোন্ অভিমুখী, তাহা তাহার মাও অনুভব করিতে পারিলেন না। মতিয়া নিঃশব্দে অব্যক্ত-বেদনা-ভারে নিবিড়ভাবে ডুবিয়া রহিল।

মাসখানেক পরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ফোঁটা নিতে দেবেন্দ্র বাড়ী আসিলেন। মতিয়া কহিল “তুমি আজ-কাল আর বাড়ীই আস না, যদি বা কালে-ভদ্রে আস তো সেই দিনই যাই যাই কর। সহাস্যে দেবেন্দ্র কহিলেন “শুধু শুধুই কি করি রে, আমার যে কত কাজ” “তুমি আজই কি চলে যাবে ?” দেবেন্দ্র স্নিগ্ধ-হাস্যে মতিয়ার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন “না আমি কাল যাবো। আমার সঙ্গে তুই যাবি কলিকাতায় ?” “আমি ? না। এখানকার ঘরবাড়ী বাগান পর্য্যন্ত আমি চিনি, একা বেড়িয়ে আস্‌তে পারি, সেখানে তো তা হবে না।” “সেই জন্যই তো তোকে আমি কোথাও নিয়ে যাই নে, কিন্তু আমার যে কাজ আমার এখানে যে একটা সপ্তাহ থাক্‌বারও সময় নেই। অথচ তোদের ফেলে আমিই কি স্বস্তিতে থাকি ?” মতিয়ার ধারণা ছিল যে তার বৌদিদি অবিকল তার দাদারই অনুরূপা হইবেন। দাদারই মত তাহার রুদ্ধালোক-তামস চিত্তের সহিত একান্ত নিবিড় পরিচিত। অমন ঘনিষ্ঠ আপনার লোকেরও অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ লাভে যে সে বঞ্চিত, ইহা সে সকলের সহিত সমান নয় বলিয়া, অন্ধ বলিয়া। তাই ক্ষুব্ধ অভিমানে কহিল “আমাদের জন্যে তো তোমার ভারি অস্বস্তি। আচ্ছা, বৌদিকে আন্‌তে তোমায় কতবার বলেচি, তুমি তবু তাঁকে আনো না, তার মানে আমি তাঁকে তো দেখতে পাব না ? আমি মরে গেলে হয় তো আস্‌বেন কিন্তু—” মতিয়ার শিশুকণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে ধরিয়া আসিল। দেবেন্দ্র সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন “ওকি বল্‌ছিস রে, তখন এ বাড়ীটা কার হবে তা জানিস্ ?” “কার ?” “তাদের, চারুর।” মতিয়া একটু চমকিয়া ক্ষণেক নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল “যদি তাঁরা এখনই এবাড়ী এসে থাকেন ?” “মন্দ কি ? সে তো খুব ভালই হয়!” “তাহলে তোমরা আর কেউ আসবে না ?” “কেন আসবো না, মা তো সর্ব্বদাই তোকে দেখতে আসবেন।”

মতিয়া অকস্মাৎ শঙ্কিত আর্ত্তকণ্ঠে কহিল “মা থাক্‌বেন না ? আমি কার কাছে থাক্‌বো ?” দেবেন্দ্র কহিলেন “কি পাগল ! কতকগুলো মিছে ভয় পাচ্ছিস, দেখা যাচ্ছে চারুর সে মতলবই নয়।” মতিয়া প্রত্যুত্তর মাত্র না করিয়া ভীতিব্যাকুল শিশুর মত মাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। দেবেন্দ্র কহিলেন “মাকে জড়িয়ে ধর্‌লি ? হ্যাঁরে মতি, আমরা যদি না থাকি তো তুই কি চারুর কাছে থাক্‌তে পারবি নে ? চারুকে তোর ভাল লাগে না ?” মতিয়া মৃদু হাসিল। “হাসলি যে” মাতা এই পরনির্ভর অক্ষম সন্তানটীকে নিকটে টানিয়া প্রগাঢ় স্নেহে কহিলেন “এও আমার এক শাস্তি ! প্রাণ, দেহ ত্যাগ কর্‌তে গিয়েও হা হা করে উঠ্‌বে যে, মা ছেড়ে যে থাক্‌তে পারে না।” মতিয়া কহিল “মরণ অত নিষ্ঠুর নয় মা, আমার কাছে থেকে তোমায় সরাবে না!” দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন “তা মন্দ নয় তোমার কল্যাণে মা অমর হয়ে থাকুন।

(১৪)

সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর মুক্ত জানালা দিয়া মহুয়া গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অষ্টমীর অপূর্ণ চন্দ্রের মৃদুরশ্মি আসিয়া শুভ্র শয্যার উপর পড়িয়াছিল। গাছের অন্তরালে শিশুচাঁদের হাসিমাখা কনককান্তি দেখা যাইতেছিল। একটা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নারিকেলশীর্ষে বিরহ-ব্যাকুল পাপিয়া সকরুণ প্রিয়তম আহ্বানে দিগদিগন্ত কাঁপাইতেছিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে শুইয়া চারু নিঃশব্দে চক্ষু মুদিয়াছিল। সম্মুখে ফুটন্ত হাসনাহানা ফুলের মাদক-সুবাসে চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইন্দু, রেণুকে ঘুম পাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া মৃদুপদে চারুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চারু যেমন মুদিত চক্ষে শুইয়াছিল তেমনি রহিল, বোধকরি ইন্দুর পদশব্দ সে শুনিতেই পায় নাই। ইন্দু চেয়ারের গায়ে হেলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নামাইয়া চারুর কপালের উপর নিজের কপাল স্থাপন করিল। চারু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেই ইন্দু হাসিয়া উঠিল "আচ্ছা, যদি আমি না হতাম?" চারু চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া কহিল "আর আমিও যদি আমি না হতাম?" "আমি ত আর চোখ বন্ধ করে ছিলাম না যে দেখতে পাব না" চারু সহাস্যে কহিল "ওঃ চোখ দুটো বন্ধ থাকলেই বুঝি—ইন্দু স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আরক্ত মুখে কহিল "তা কেন? আমরা চোখ বুজেও মানুষ চিনতে পারি।" "আর আমরা পারি নে?" ইন্দু হাসিমুখে কহিল "তোমাদের কি বল, ইচ্ছে হ'ল চিনলে, না হল নাই চিনলে, ইচ্ছে বই ত নয়।" চারু কহিল "বটে!" "হ্যাঁ, তা নয় তো কি! তুমি ঘরে যাবে না?" উঠিয়া বসিয়া চারু কহিল "হ্যাঁ চল যাই শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না মনটাও নয়।" ইন্দু ব্যস্ত হইয়া কহিল "তাই এমন করে চোখ বুজে শুয়েছিলে? ওঠো, ওঠো, বলচো শরীর ভাল নেই শেষটা অসুখ বিসুখ হ'য়ে পড়বে।" চারু উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। কহিল "তাই তো! জ্বরই বুঝি হ'ল, দাদাও সংসারের দেনাপত্রের গোলমালে আছেন, এই সময় অসুখ হয়ে প'ড়ে থাকলেই তো মুস্কিল।" ইন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। চারু চিরদিনই সুস্থ সবল। ইন্দু বিবাহের পর একদিনের জন্যও চারুকে সামান্য অসুস্থও দেখে নাই। চারুর অসুখ যে কি রকম হইবে তাহা ভাবিয়াই ইন্দু ভয়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সেই রাত্রেই চারুর প্রবল জ্বর আসিল। কোন রকমে রাত্রি কাটাইয়া ইন্দু ভয়ে আশঙ্কায় কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আত্মীয়স্বজন-হীন প্রবাসে, বিশেষ সেই বাঙালীবিরল পশ্চিম দেশের পল্লীতে কেবলমাত্র দাসদাসী সহায়। হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার স্থানীয় যুবক বিশ্বনাথ ও বৃদ্ধ বাঙ্গালী প্রসন্নকুমার ইঁহারা দুইজন চারুকে দেখিয়াশুনিয়া পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। ইন্দু ইঁহাদের সম্মুখে স্বভাবসঙ্কোচে অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। চারু প্রবল জ্বরে অর্দ্ধচেতনা হইয়াই থাকিত, তাহার মুখপানে চাহিয়া আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় ইন্দুর চোখে দিনের প্রখর আলোক ও রাত্রের গাঢ় অন্ধকার এক হইয়া লেপিয়া-মুছিয়া গিয়াছে। যদিও বিপদে বিকল হওয়া অত্যন্ত দুর্ব্বলের কাজ এবং সেই দৌর্ব্বল্য আবার সমধিক বিপদ ডাকিয়া আনে তথাপি ইন্দু একটুও সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। উপরন্তু তাহার এই অধীরতায় অনিয়ম ঠাণ্ডা লাগিয়া রেণুরও সর্দ্দি হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর ইন্দু, চারুকে বাতাস করিতেছিল প্রসন্নকুমার চারুর মাথায় আইসব্যাগ বরফ দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, রেণুকে তাহার দাসী খোলা গায়ে লইয়া ঘুরিতেছিল জানালা দিয়া মাকে দেখিয়া রেণু কাঁদিয়া উঠিল। প্রথমে দুই এক বার "মা মা" করিয়া তারপর "বাব্বা বাব্বা" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চারুর কানে সে ডাক গিয়া তাহার তন্দ্রার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, সে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া ইন্দুর পানে চাহিল। বিশ্বনাথ উঠিয়া পাখা লইল, কহিল "আপনি ওঘর থেকে খুকীকে ঘুম পাড়িয়ে আসুন" ইন্দু রেণুকে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। অত্যন্ত সর্দ্দিতে রেণুর কচি মুখখানি ফুলিয়া

উঠিয়াছিল। রেণুকে বুকে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া অশুভ আশঙ্কায় সমস্ত বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। চারুর জ্বরের বিরাম না দেখিয়া ইন্দু বিরজানাথকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল কিন্তু তিনি দেনা-দারের তাগাদায় ও মোকদ্দমায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। দু' এক জনের কাছে নিজের কিছু পাওনা ছিল তাহাদের নিকট আদায়ের জন্যও ঘুরিতেছিলেন, অবশেষে নীলুর মারফত টাকা পাইয়া দেনা মিটাইয়া তিনি মাকে লইয়া কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীতে সুবোধ ছিল টেলিগ্রাফ তাহারই হস্তগত হইল। সে টেলিগ্রাফের উত্তর দিয়া নিজের যাত্রার জন্য আফিসে ছুটি প্রার্থনা করিতে গেল। রেণুকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে বিশ্বনাথ তাহাকে টেলিগ্রাফের উত্তর যাহা আসিয়াছিল তাহা জানাইল। ইন্দু যেন কতকটা আশা পাইল।

(১৫)

সুবোধকে পাইয়া ইন্দুর উদ্বেগ অনেকটা লঘুতর হইয়া গিয়াছিল। তার কারণ সুবোধ বুঝাইয়া প্রবোধ দিয়া তাহাকে অনেক সুস্থ রাখিত। রোগী সম্বন্ধে তাহার নিজের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প। প্রায় এগার দিন জ্বরের প্রকোপে অচৈতন্য থাকিয়া চারুর দুই দিন মাত্র জ্ঞান হইয়াছিল। সে চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সুবোধের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। জ্বর তখন খুব অল্পই ছিল, ছাড়িয়া যাইবে আশা করিয়া সুবোধ ও ইন্দু দুই জনের মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়াছিল। চারু সুবোধকে সেই দেনা, মোকদ্দমা ইত্যাদির বিষয় প্রশ্ন করিতেছিল। সুবোধ কহিল "সে টাকার কথা শিবু সেন নিজেই গিয়ে শিরোমণি বাড়ী বলে এসেছিল তাঁরাই মিটিয়ে দিয়েচেন।" চারু অপ্রসন্ন মুখে ক্ষণেক নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল "তাঁরা দাদাকে কিছু বলেছিলেন?" "না, দাদার সঙ্গে তাঁদের দেখাই হয় নি।" "দাদা পশ্চিমে গেলেন কবে?" "সেই মোকদ্দমা মিটে গেলেই।" "দাদা আমায় কোনও খবরই জানান্ নি কেন?" সুবোধ হাসিয়া কহিল "তুমি ত দাদাকে জান, তা ছাড়া দাদা খবর দিলেও তুমি হয় তো তা পাও নি।" ইন্দু কহিল "ওই তো এক বোঝা চিঠিপত্র পড়ে আছে কতকাল খোলাই হয় নি।" চারু কহিল "নিয়ে এস এদিকে সুবোধ প'ড়ে শোনাক।" সুবোধ কহিল "আজ থাক্ আর দুদিন যাক্ তার পর শুনো।" চারু ব্যগ্র হইয়া কহিল "তুই পড়্, আমি শুনি, তাতে আর আমার কোনও কষ্ট হবে না।" ইন্দু ডাকের চিঠি কয়খানা বাছিয়া আনিল। তিন চারিখানি পত্র দেবেন্দ্রের ও তাঁহার মাতার ছিল। তাঁহারা চারুর কোন সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়াছেন। কার্ডে শিরোমণিগৃহিণী নীলুকে দিয়া লিখাইয়াছেন "তোমার শারীরিক সুস্থ সংবাদ যত শীঘ্র সম্ভব জানাইয়া আমাদের নিরুদ্বিগ্ন করিও। নতি পর্য্যন্ত তোমার অসুস্থতার অবস্থা অনুমান করিতেছে,—অকারণ মনশ্চাঞ্চল্যের জন্য আমরা তোমারই জন্য চিন্তিত আছি। সত্বর সংবাদ দিবে, ইত্যাদি। কার্ডখানি চারু নিজেই পড়িয়াছিল এবং সেই শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সুবোধ ঔষধ খাওয়াইবার জন্য তাহার মাথায় হাত দিতেই সে সহসা প্রশ্ন করিল "দিলি টেলিগ্রাফ করে?" বিস্মিত সুবোধ কহিল "কোথায়?" "কোথায় আবার!" বলিয়া চারু ধমকিয়া উঠিল। সুবোধ কহিল "কি লিখ্‌বো?" "লিখে দে খবর ভাল, অনর্থক তাদের ভাবনার দরকার কি?" সুবোধ আর কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু সুবোধ ও ইন্দু যাহা আশা করিয়াছিল তাহা হইল না। চারুর জ্বর আবার বাড়িয়া উঠিল এই জ্বর তাহার দেড়মাস পরে ছাড়িল। চারু পথ্য পাইয়া যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল তখন বিরজানাথ সংবাদ পাইয়া আসিলেন। চারু অল্পমাত্র সুস্থ হইবার পরই ছয়মাসের ছুটি লইয়া তাহার গ্রামে আসিতেই হইল। কারণ

বিদেশে সকলে থাকিলে চলে না। সুবোধ অনেক চেষ্টায় দুইমাসের ছুটি পাইয়াছিল, তারপর বাধ্য হইয়া তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে। এত কথা ছাড়িয়া দিলেও তখন সংসার ও রোগীর খরচ চালাইবার মত আর্থিক সাচ্ছল্যও ছিল না। চারুকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবার ইচ্ছা বিরজানাথের ছিল। কিন্তু টাকার কথা তুলিয়া চারু তাহাকে নিরস্ত করিল। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে অগত্যা সকলকে লইয়া গ্রামেই ফিরিলেন। চারু তখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। বাড়ী ফিরিয়াও সে শয্যার আশ্রয়ে থাকিয়া দিন কাটাইত।

(১৬)

বেলা দশটার সময় চারু একাকী বিছানায় শুইয়াছিল। নিকটে রেণু বসিয়া খেলিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে পিতার আদর চুম্বনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরটা অন্তঃপুর ও বাহিরের মধ্যবর্ত্তী। বাহির হইতে প্রবেশদ্বার আছে এবং ভিতর দিকেরও দ্বার আছে, বন্ধুরা সাক্ষাৎ করিতে আসে সেজন্য ভিতর দিকে দ্বারে পরদা দেওয়া আছে। সুবোধ বা বিরজানাথ কেহই বাড়ী ছিলেন না, চারু মুক্ত জানালা দিয়া চাহিয়া চাহিয়া জনবিরল পল্লী-পথে দেখিতেছিল। পথের পাশে গোটাকয়েক ছাগল শীতের মিষ্ট রৌদ্র উপভোগ করিতে করিতে পরম আরামে কাঁটালের পাতা চর্ব্বণ করিতেছিল। দু'একটী খঞ্জন পাখী পুচ্ছ দোলাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। কামারদের গৌরী তাহার ছোট ভাইটীকে কোলে ও কোঁচড়ে মুড়ী লইয়া ক্রন্দনরত ভাইকে শান্ত করিবার জন্য একটা গোবৎসের গায়ে হাত বুলাইতে গিয়া সহসা তাহার নির্ব্বোধ মাতার শিং সমেত মস্তক আন্দোলন দেখিয়া সত্রাসে পলায়ন করিতেছিল। অনতিদূরে কেদার কৈবর্ত্তের বাড়ীর সম্মুখের ভেরেণ্ডা ঘেরা স্থানটুকু কচি সরিষার গাছ হরিৎক্ষেত্রে পরিণত। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চারু শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল এবং বালিশের পাশেই যে অসমাপ্ত বইখানি ছিল তাহাতেই মন দিল। ক্ষণকাল পরে জুতার শব্দে চক্ষু ফিরাইয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ এই সময়ে দেবেন্দ্রের আগমন প্রত্যাশা সে একেবারেই করে নাই। এবং দেবেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মতিয়াকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল কিন্তু কোনও অভ্যর্থনা করিবার পূর্ব্বেই রেণুকে কোলে তুলিয়া দেবেন্দ্র মতিয়ার কোলে দিলেন, মতিয়া তাহাকে অত্যন্ত তৃপ্তিভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল। একটা ঘেরাটোপ আবৃত সিন্দুকের উপর মতিয়াকে বসাইয়া দেবেন্দ্র চারুর নিকট আসিয়া বসিলেন; চারু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কহিলেন "তোমার অসুখ হয়েছিল শুন্‌লাম কিন্তু তুমি আমাদের তো কোনও সংবাদ দাও নি? আমরা কত চিঠি দিয়েচ তার জবাবই দাও নি, কিন্তু আপন আপন মঙ্গল অমঙ্গল মানুষের মনই জান্‌তে পারে।" চারু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "আমার অসুখ আমি নিজে প্রথমটা সিরিয়াস্ বলে মনে করি নি" 'তা আমি সবই শুনলাম অবশ্য তোমার এখানে আসার পর শুনেচি; দুঃখিত হলাম চারু, যে তুমি আমাদের একটুও প্রশ্রয় দিতে চাও না।" চারু কুণ্ঠিত-সঙ্কোচে অধোমুখে কহিল "না হোক আপনাদেরও কষ্ট দেওয়া হ'ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাক্‌তেন, এখানে এসে ভেবেছিলাম একদিন গিয়ে,—দেবেন্দ্র সক্ষোভে কহিলেন "শরীরটায়? শরীরটায় আর আছে কি? উঃ কি ভয়ানক রোগা হয়ে গেছ চারু দেখলেও—" মতিয়ার ভয়াকুল বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া দেবেন্দ্র কথাটা চাপিয়া গেলেন। পরদার ভিতর 'দকে বাড়ীর মেয়েরা অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে পরদা একটু সরাইয়া দেখিতেছিলেন। দেবেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন "আমার বোন্‌টী ত তার শ্বশুর বাড়ী এসেচে, তা ওকে একবার বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাবেন নাকি কেউ?" চারু নতমুখে কহিল "যদি ইচ্ছা করেন" মতিয়া ত্রস্তপদে আসিয়া দেবেন্দ্রের পাশে চারুর পদতলে বসিয়া পড়িয়া কহিল "না দাদা।" দেবেন্দ্র মলিনহাস্যে কহিলেন "কেন এলি তবে?" বিরজানাথ ঘরে ঢুকিতে গিয়া থমকিয়া

পড়িলেন। দেবেন্দ্র উঠিয়া প্রণাম করিতেই তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন "এস এস একটু বসো।" দেবেন্দ্র উত্তীর্ণপ্রায় মধ্যাহ্ন দেখিয়া মৃদু আপত্তি করিলেন কিন্তু বিরজানাথ তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। মতিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট অচল হইয়া চারুর পদতলে বসিয়াছিল, চারু সসঙ্কোচে পা টানিতে গেলে মতিয়া ব্যগ্র আগ্রহ ভরে তাহা চাপিয়া ধরিল। চারু কোমলকণ্ঠে কহিল "কেন তুমি কষ্ট করে এলে? একটু সারলে আমি নিজেই যেতাম।" মতিয়া ক্ষণেক নিঃশব্দে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, পরে উচ্ছ্বসিত আর্দ্র কণ্ঠে কহিল "আমি কাণা বলে তুমি মনে কর যে আমি আর একটা মানুষ নই?" চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ অভিযোগ তাহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার নিজের শত ব্যবহার এই কথার প্রমাণ স্বরূপ। আর বাস্তবিকই এই দেবোৎসর্গা শুভ্র সুন্দর মর্ম্মর প্রতিমার মত নারীটিকে সে স্ত্রীরূপে মনে মনে কোন দিনও মানাইতে পারে নাই। শিশিরবৃন্ত কামিনী ফুলটির মত একান্ত স্পর্শ-অসহিষ্ণু এই সুনির্ম্মল সুপবিত্র ফুলটাতে সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে সত্য তবু ইহাকে নিজের উপভোগ্য ভাবিতে পারে নাই। এই রকমই কি যেন একটা গূঢ় আভাস একদিন মনের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি দিয়াছিল। সে দিন সে অত্যুগ্র আত্মগ্লানিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া দুইহাতে তাহার নিজস্ব ধন ইন্দুকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। চারুর মনে পড়িল গত বিজয়ার দিনও সে মতিয়ার এই অভিনব ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়াছিল, কিন্তু যাহার চক্ষে দৃষ্টি নাই, কটাক্ষ নাই, নব ভাবের উন্মেষ-আলোক যার নেত্রের উপর খেলিয়া যায় না, চক্ষুষ্মানের নিকট তাহার তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়গুহানিহিত চিত্তরাগ সহজে অনুমেয় নহে। তাই চারু তখন বুঝিতে পারে নাই চেষ্টাও করে নাই। এবং যদিও বুঝিত তথাপি মতিয়ার ঐশ্বর্য্যের অবলম্বনে থাকা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র সম্ভব ছিল না। মতিয়ার প্রতি স্ত্রীর উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালনও তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ইহার মনে ব্যথা দিবার প্রবৃত্তিও তাহার কোন দিনই হয় নাই। মতিয়ার আর্ত্তকণ্ঠে ব্যথিত হইয়া চারু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল "একথা বল্‌চো কেন? আমি তোমায় মানুষ মনে করি বা না করি এ নিয়ে বিচলিত হওয়া ত তোমার স্বভাব নয়। তা'ছাড়া আমি তোমায় মানুষের জন্যে যেরা মানুষ মনে করি নে সত্য,—অমলিন নির্ম্মাল্যের ফুলের মত মনে করি।" মতিয়া মনে মনে কহিল "এই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা" কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করিবার মত অপর্য্যাপ্ত ভাষাও সে জানিত না। নত হইয়া স্বামীর পায়ের উপর মস্তক স্থাপন করিল। অস্থিকঠিন পায়ের স্পর্শে তাহার মনে হইল সে হাত বুলাইয়া দেখিবে তাহার স্বামী কতখানি রোগা হইয়া গিয়াছেন। যে স্পর্শ তাহার জীবন মরুতে মন্দাকিনী হইয়া আছে, দগ্ধ বনে সুরভি দেবসম্পদ মন্দার তুল্য হইয়া আছে তাহা শুষ্ক কি সরস সে কি চিনিতে পারিবে না? মতিয়া তাহার সুকোমল পদ্মপল্লবের মত হাতখানি লঘুগতিতে চারুর সমস্ত গায়ে বুলাইয়া দেখিতেছিল। চারু ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া কহিল "কি করচো?" মতিয়া হাত সরাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "কিছু না" চারুর মনে পড়িল একদিন এই নারীই তাহার হস্ত স্পর্শে সর্পাঘাতের মত শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অসীম মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমার আকাশ-বক্ষস্থ অদৃশ্য সুধাকরের অতি ম্লান জ্যোৎস্নালোকের মত আজ সে জাগ্রতা,—প্রকৃতির অবার্য প্রভাবে সদ্য সুপ্তোত্থিত প্রাণ তাহার ক্ষুধিত তৃষিত! উভয়ের মৌনভাবে অতিষ্ঠ হইয়া রেণু "মা মা" করিয়া ডাকিতেই ইন্দু পরদা সরাইয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মাত্র স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চারুর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া ইন্দু মৃদু কণ্ঠে কহিল "বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাই" চারু তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল "না দরকার নেই।" ইন্দুর কণ্ঠস্বরে মতিয়া অকারণ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া চারুর চৌকীর উপর মাথা গুঁজিয়া কক্ষতলে মসৃণ সিমেন্টের উপর বসিয়া পড়িল।

(১৭)

মাস তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্রের অবারিত এলোমেলো বাতাসে গ্রামের মেটে রাস্তার উপরকার গরুর গাড়ীর চাকা ঘর্ষণে ধুলা রাশি উড়িয়া উড়িয়া গাঢ় হরিদ্বর্ণ গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত ধুলধুসরিত। ঘোড়ানিম, সাজিনার ফুল, আম্র মুকুলের অকালপতনে ও বৃ চ্যুত শুষ্ক পত্রে চারিদিকে আবর্জ্জনা হইয়া পড়িতেছে। বাতাবী নেবুর ফুলের মাদক সুবাসে পল্লীপথ, গৃহস্থের প্রাঙ্গণ সুরভিত। বসন্তের উদ্দাম বাতাসের দৌরাত্ম্যে অগ্নিভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত। বিন্দুমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভয়ে গোশালায় আর সাঁজাল দেওয়া হয় না। রামনবমীর উপবাস করিয়া মতিয়া ও তাহার মাতা বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন। মতিয়ার মায়ের ইচ্ছা ছিল না যে মতিয়াও উপবাস করে কিন্তু মতিয়া মায়ের উপবাস শুনিয়া জেদ্ করিয়াই উপবাস করিয়াছিল। পুরোহিত যখন কথা শুনাইতে বসিয়া দশরথোক্ত আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন—

"অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং ক্রিয়া"

সেই সময়ে বিণু আসিয়া দাঁড়াইল। কথা শেষে পুরোহিত বিদায় গ্রহণ করিলে বিণু কহিল "মতিদিও উপোস্ করেচে নাকি?" মতিয়া কহিল "এবার করলাম" বিণু সহাস্যে কহিল "তুমি মরে আর মানুষ হ'য়ে জন্মাবে না, আমায় কিন্তু কোন ব্রত নিয়ম কর্‌তে দেয় না।" মাতা কহিল "কে দ্যায় না রে? তুই কর্‌লেই পারিস্?" নীণু মৃদু হাসিয়া কহিল "অনুমতি না পেলে ব্রত সিদ্ধ হয় না যে, তা জান তো?" মতিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল "সিদ্ধ হয় না? কে বল্‌লে আমি তো ক'রলাম, আমারটাও অসিদ্ধ হ'ল তবে?" বিণু একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "আমি কি অত জানি, তবে তাই ত শুনি।" মতিয়ার মনে কিন্তু বিণুর সামান্য কথা কয়টাই তড়িৎ-রেখার মত স্পর্শ করিল, সে অনুভব করিল কি সুদৃঢ় বন্ধন এই বিবাহ। এই শৃঙ্খলের আকর্ষণ কত মধুর কত তীব্র! কোন্ সুদূরের দুইটী পৃথক প্রাণী এই গ্রন্থিতে কি নিবিড়ভবেই না মিলিয়া যায়? বিণু মতিয়াকে নীরব দেখিয়া কহিল "কি ভাবচো মতিদি, আমার কথায় রাগ হ'ল নাকি?" মতিয়া ম্লান হাস্যে কহিল "না রে তোরা সব দেখিস্ শুনিস্, তোদের কথায় কি আমার রাগ হয়?" "বরং কিছু শিক্ষাই পাই" "কই কি ভাব্‌ছি, কিছুই ত ভাব্‌চিনে" "ভাব্‌চো বই কি নিশ্চয় ভাব্‌চো কিন্তু তা বলে ভগবানকে ভাব্‌চো না তুমি—তা আমি বলতে পারি। একজন দাসী আসিয়া কহিল "ঘরে গিয়ে বসো দিদিমণি, মাঠান্ ডাকচেন" মতিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "মা কি শোবার ঘরে নাকি?" দাসী জানাইল "হাঁ, তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে তিনি শুয়েই পরেচেন" মতিয়া স্রস্ত পদে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল। মায়ের পাশে বসিয়া হাত বাড়াইয়া মায়ের দেহস্পর্শ করিয়া কহিল "কি হয়েছে মা?" তাহার করুণকণ্ঠে সচকিত হইয়া মা দুই হাতে তাহার মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া মলিন হাস্যে কহিলেন "এই দেখ, ভয় পেলি? কি হয়েচে আমার! কিছুই ত তেমন হয়নি।" "হয়নি তো কি মা তোমার গা যে খুব গরম, নীলু কাকাকে ডেকে বল না মা, ডাক্তার ডাকতে।" নিজে ভাবনা করিয়া শুরুতর না বুঝিলেও রাত্রিতে মাতার জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন ও সারা রাত্রির জ্বরে শেষ রাত্রে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বিনিদ্র মতিয়ার সকরুণ মা ডাকের ক্ষীণ উত্তরও আর পাওয়া গেল না সুতরাং মতিয়া উৎকণ্ঠায় ভয়ে চঞ্চল প্রায় হইয়া উঠিল।

(১৮)

দেবেন্দ্র এই সময়ে একজন পুরাতন সম্ভ্রান্ত মক্কেলের আহ্বানে এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। সুতরাং মায়ের পীড়ার সংবাদ তাঁহার নিকট যথা সময়ে পৌঁছিতে পারিল না। নীলু সর্ব্বাগ্রে চারুকেই সংবাদ দিয়াছিলেন।

চারু আসিয়া দেখিল রোগীর স্বাভাবিক দুর্ব্বল শরীরে জ্বরের তাড়না অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্রের অতি দুর্ব্বল স্পন্দন সহসা থামিয়া যাওয়ার অত্যধিক সম্ভাবনা। মতিয়া আশঙ্কায় ম্লান মুখের উপর আশার দীপ্তি লইয়া সাগ্রহে কহিল "মা সেরে যাবেন নয় ? চারু আশা দিয়া কহিল "হাঁ, সেরে যাবেন বই কি শিগ্‌গীরই সেরে উঠ্‌বেন।" তিন চার দিন হইয়া গেল, রোগের বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। মতিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া শুষ্কমুখে তাহার যতদূর শক্তি মায়ের সেবা করিতেছিল। কিন্তু সে দৃষ্টিহীনা, শুশ্রূষা করিয়া তৃপ্তি পাইবার উপায় তো তাহার ছিল না। কেহ ঔষধ ঢালিয়া তাহার হাতে দিলে তবে সে মাকে খাওয়াইতে পারে। কিন্তু চৈতন্যহীন রোগীকে ঔষধপথ্য দেওয়া সহজসাধ্য নহে সুতরাং চারু তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিত না। চারু তথাপি মতিয়ার অক্লান্ত শ্রান্তিহীন পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তাহার শঙ্কিত ব্যথাতুর ম্লান মুখ দেখিয়া চারুও বেদনা অনুভব করিতেছিল। উত্তর পায় না তবুও অশ্রুসিক্ত ভগ্নকণ্ঠে ঘুরিয়া ফিরিয়া ডাকে "মা, মাগো" মতিয়া জানিত কতদিন তাহার আর্ত্তকণ্ঠে মাতার প্রগাঢ় সুপ্তি চকিতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেই মা যে আজ তাহার বুক ফাটা আহ্বানে প্রত্যুত্তর মাত্র দেন না, এ ব্যথা যে কি অসহনীয় তাহা সেই অনুভব করিতেছিল। এমনি করিয়া পাঁচদিন কাটিয়া গেল। সর্ব্বলোকবিদিত কথা যে নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ হাসিয়া উঠে। সব স্থানেই ইহা অভ্রান্তরূপে ফলিয়া যায় কি না তাহা কে জানে ? এই পাঁচদিন পরে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মতিয়ার মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিশান্তে প্রভাতের মত তাহার সকল আশঙ্কা নিমিষে ঘুচিয়া গেল। সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানলাভের পর মা তাহার, তাহাকেই বুকে টানিয়া চুম্বন করিয়াছেন। তাহার বিশুষ্ক মুখ দেখিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছে "হয় তো অভাগী কিছু খায় নাই। কোন্‌টা কোন্ জিনিস, কোন্‌টা তাহার হাতের কাছে, কোন্‌টা তাহার কোলের কাছে, এ কথা মা না বলিয়া দিলে অভিমানে মতিয়ার খাওয়া হইত না। মা সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। চারু প্রশস্ত কক্ষের অন্য এক কোণে ইজি চেয়ারে বসিয়া একখানি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতেছিল। ছুটি ফুরায় নাই সুতরাং কাজের অভাবে এই বইগুলি তার সম্বল ছিল। এই মতিয়া সে ঘড়ির দিকে চাহিল প্রায় চারিটা। পশ্চিমের মুক্ত জানালা দিয়া সুদূর পশ্চিমাকাশে লোহিত সমুদ্র দেখা যাইতেছিল। সূর্য্যাস্তের রক্তিম রশ্মি ঘরখানার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। রুগ্নার আহ্বানে চারু নিকটস্থ হইলে তিনি বিছানা দেখাইয়া কহিলেন "বোস বাবা দুটো কথা বলি।" চারু আর একটা চেয়ার বিছানার নিকটে টানিয়া আনিয়া বসিল, কহিল "কিন্তু কথা বল্‌তে এখন কষ্ট হবে আপনার।" শুষ্ক মুখে মৃদু হাসে কহিলেন "না তা হবে না, কিন্তু বাবা তুমি অসুখ থেকে উঠেছ মাত্র, কেন এখন এখানে পরিশ্রম করচো ? অন্য ডাক্তার আনালেই পারতে—চারু কহিল "তার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না—" "না বাবা ব্যস্ত হবার যে কত কারণ হয়েচে আমার, স্বস্তিতে মরবার মত ভাগ্য করে ত আসি নি" রোগপাণ্ডুর মুখে অন্তর্বেদনার চিহ্ন রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিল। চারু কহিল "কষ্ট হচ্চে আপনার! বল্‌লাম তো যে আপনি এখনো সকল কথা বল্‌বার চেষ্টা করবেন না।" ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা রুদ্ধ শ্বাস প্রবল জোরে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ডাকিলেন "মতি,—মতি" চারু কহিল "এই যে আপনার পাশেই, ফিরে চেয়ে দেখুন—" "আমি ? আমি আর কি দেখ্‌বো বাবা, আমার দেখা শেষ হয়ে গেল চারু, এখন থেকে তুমিই দেখ বাবা,—আমায় কৃতার্থ করো, শান্তিতে চক্ষু বুজ্‌তে দাও।" মায়ের বিগলিত-কণ্ঠ শুনিয়া মতিয়া দুইহাতে মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ডাকিল "মা" চারু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল "ওকি ওঁর যে কষ্ট হবে" মাতা দুইহাতে কন্যার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন "জড়িয়ে ধরিস! হায় হতভাগী, তুই ধরে রাখ্‌তে চাস্ ? কিন্তু আর আমায় কেন

মা ?" বলিয়া নিজের শীর্ণ হাত দিয়া চারুর হাতের উপর তিনি মতিয়ার হাত দুখানি অর্পণ করিয়া কহিলেন "জড়িয়ে ধর্ মতি,—একেই জড়িয়ে ধর্, আমায় নিষ্কৃতি দে, ম'র্‌তে দে।—ওকি শুধুই বুঝি কাঁদচিস্ ?" দুই হাতে অবারিত অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে মতিয়া কহিল "তুমি কি সব বল্‌চো যে মা" "কি বল্‌চি মা, এই যথার্থ কথা বল্‌চি, আবার তুইও আস্‌বি ওকি মা আবার কান্না কেন ?" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে কহিল "কার কাছে থাক্‌বো মা আমি ?" মা স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল "চারুর কাছে। চিরকাল কি মাবাপের কাছে কেউ থাকে ?" মতিয়া কাঁদিয়া কহিল "আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতেও পার্‌বো না, একা থাক্‌তেও যে পার্‌বো না মা" কন্যার অশ্রুসিক্ত মুখপানে অপলক নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া অবসাদক্লিষ্ট চক্ষু তিনি মুদিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া ব্যথিতা কন্যার লুণ্ঠিত মস্তকের উপর স্নেহাশীর্ব্বাদভরা হাতখানি রাখিয়া তিনি কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করি মা আমার এ চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় যেন তুই আলোর যোগাড় রেখে সার্থক ক'র্‌তে পারিস্।" মতিয়া এ আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, উঠিয়া বসিয়া কহিল "আমিও তো মরে যাব মা।" ইহার পরই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে শুষ্ক মুখে দেবেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়াই টেলিগ্রাফ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। দেবেন্দ্র যে কলিকাতায় ছিলেন না চারু এ সংবাদ জানিত না এজন্য সে কলিকাতার ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। অতি প্রত্যূষে, তখনো উষার রক্তিমাভাস ভাল করিয়া জাগে নাই। পূর্ব্ব দিগন্তে কেবল স্নিগ্ধকোমল পিঙ্গলচ্ছটা তরল মেঘস্তরের অভ্যন্তরে দেখা যাইতেছিল। সুদূর কোন পল্লী হইতে সদাজাগ্রত কুক্কুরের রব মাত্র শুনা যাইতেছিল। নীলু, চারু ধরাধরি করিয়া তুলসী বেদী মূলে মৃত্যুছায়ালিপ্ত দেহ নামাইলেন। মায়ের বুক হইতে যখন তাহাকে সরাইয়া মাকে স্থানান্তরিত করা হইল তখনি মতিয়া বুঝিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

(১৯)

শ্রাদ্ধ চুকিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্র একরাত্রি ব্যতীত সে বাড়ীতে থাকেন নাই। মতিয়ার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্যই বোধহয় তিনি সরিয়া গিয়াছিলেন। মতিয়াও তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল না। অতি আঘাতে তাহার অন্তর যেন পাষাণে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তার আর জাগ্রত চেতনার স্পন্দন যেন কিছুমাত্রই ছিল না। আজ তাহার মা নাই, তাহার দাদা নাই; বাড়ীতে উৎসবের মত কর্ম্মকোলাহল কিন্তু কেহ তাহার আপনার নাই। সে এ হতেও একটুও চঞ্চল নহে। সকালে উঠিয়া যেখানে বসে সারাদিন প্রস্তর প্রতিমার মত শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া নিষ্পন্দ নীরবে সেই একাসনেই কাটাইয়া দেয়। তাহার এই স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া চারু এইবার নিজের আসন্ন সঙ্কট বুঝিল। এই অসহায়া অন্ধ তরুণীকে একাকী রাখিয়া যাওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সম্ভব নহে, কিন্তু ইহারই পৈত্রিক বিষয় বৈভবে ইহার সপত্নী প্রতিপালন,—তাহাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া ? কি করা যে কর্ত্তব্য তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার নিজের মা এই সময়ে দেহান্তে শিবলোক কামনায় কাশীবাস করিতেছিলেন সুতরাং কোন সুপরামর্শদাতাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না দুই প্রহরে মতিয়াকে আহার করাইয়া চারু বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল। মতিয়ার পুরাতন দাসীকে মতিয়ার নিকট রাখিয়া বাহির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখিল যতীন আসিয়া পাঁচুর নিকট তাহারই খোঁজ করিতেছে। ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া কহিল "ব্যাপার কি হে ?" যতীন সহাস্যে কহিল "বড়ই গুরুতর, আজকাল এখানেই অবস্থান হচ্চে নাকি ? চারু সংক্ষেপে কহিল "আপাততঃ। যাক্ কোন ও রুগী টুগীর জন্যে আসনি তো ?" যতীন কহিল "না, তুমি

কোথাও বেরোচ্ছ ?" "হ্যাঁ বাড়ী যাচ্চি, চল।" যতীন ও চারু দুইজনে পথে আসিলে চারু যতীনকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া পরামর্শ চাহিল। যতীন কহিল "তোমার ঘরের মন্ত্রীটিকে আগে জিজ্ঞাসা কর কি বলেন ?" "সে কিছুই বোঝে না, সে ত একবার বলেছিল ওই বাড়ীতে বাস ক'র্‌তে।" যতীন কহিল "তবে তাই,—যে ক'দিন ছুটি আছে থাক তো, তার পরে যা হয় করো। তোমার এ রাজকন্যেটী কেমন ?" চারু একটু ক্ষুব্ধ ভাবে কহিল "কেমন আর ভগবান যেমন করেচেন তেমনি, অসহায় অন্ধ জীব বলেই দয়া হয়, ওর রাজত্বের জন্যে আমি লালায়িত নই তা জেনো।" যতীন প্রতিবাদ করিয়া "আমি ও-ভাবে কোনও কথা তো বলি নি, আমি বল্‌চি যে মাতৃশোকে বড় অধীর নাকি ?" "কিছুমাত্রও না। এত অধিক স্থির যে সেইটেই আমার খারাপ মনে হয়।" যতীন ক্ষণেক কি ভাবিয়া সহাস্যে কহিল "আমাদের এক একটা তাই অসহ্য ভাবনা, আর তুই ভাই ছটোর ভাবনা ভাবিস্ ? আমি তো এস্থানে তোমার কনিষ্ঠার পরামর্শ গ্রহণই সুযুক্তি মনে করি, তাই করো।" চারু এ যুক্তি নিতান্ত অসার বুঝিয়া তাচ্ছল্যভরে কহিল "ভাল পরামর্শদাতাই ধরে ছিলাম, এই পরামর্শ দিতে তুই ও বাড়ীতে গিয়েছিলি ?" যতীন কহিল "আমি বুঝি পরামর্শ দিতে গিয়েছিলাম ? দেখ্‌তে গিয়েছিলাম তুই কেমন আছিস্।" "কি দেখলি ?" যতীন সহাস্যে মাথা নাড়িয়া কহিল "দেখ্‌তে পেলাম না, একাসনে লক্ষ্মী সরস্বতী সংযুক্ত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখতে দিলি নে।" যতীনের হাসি দেখিয়া চারু রাগিয়া উঠিল, কহিল "আচ্ছা এমন শোচনীয় প্রসঙ্গেও তোর হাসি আসে ?" যতীন তেমনি হাসি মুখে কহিল "কেন আস্‌বে না, শোচনীয় এর কোথায় ? তুমি যদি শোচনীয় ক'রে তোল তার আর কথা কি ?" "কিছুই না,—তোমার কাছে পরামর্শ ক'রে কোন লাভ হল না।" কথায় কথায় চারুর নিজের বাড়ীর দুয়ারেই পৌঁছিয়াছিল। যতীন পথে দাঁড়াইয়া কহিল "না, যাও পাকা পরামর্শ ক'রে এস।" চারু একটু হাসিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার চিন্তার আর অন্ত ছিল না। কতটুকুই বা সে বাড়ীতে থাকিবে ? সন্ধ্যার পরই আবার তাহার সেই নিঃসঙ্গ শোক-স্তব্ধ প্রগাঢ় মৌনতার ভিতর রাত্রি যাপন করিতে যাইতে হইবে।

(২০)

যে শয়ন কক্ষে মতিয়া মাতার কোলে শুইয়া থাকিত সেই ঘরে সেই খাটেই মতিয়া নিঃশব্দে একাকী শুইত। ঘরের পরপার্শ্বে একখান ছোট ক্যাম্বিসের খাটে শয্যার বন্দবস্ত করিয়া চারু শুইয়াছিল। খুব বড় একটা টেবিললাম্পের উজ্জ্বল আলোকে ঘরখানা আলোকিত। অনেক রাত্রি অবধি পুস্তক লইয়া কাটাইয়া তারপর আলোর দম কমাইয়া চারু শুইয়া পড়িল। চারু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বাহিরের চাকরদের কোলাহলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল তাহার শয্যার একান্ত নিকটে দাঁড়াইয়া, মতিয়া তাঁহার আরক্ত কপোলের উপর দিয়া মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুমালা। চারু লাফাইয়া উঠিয়া বসিল, সবিস্ময়ে কহিল "কি হয়েছে ?" মতিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাহিরের উচ্চকলরবে সে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। দূরে অগ্নিকাণ্ডে সেদিকের আকাশ উজ্জ্বল লোহিত আলোকে প্রদীপ্ত, এমনি প্রখর যে এত দূরেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। বিকট এক একটা স্ফুলিঙ্গ হাউইএর মত প্রলয় শব্দে সেই অগ্নি তরঙ্গের ভিতর দিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল। অস্ফুট হাহাকার নিশিথের সুপ্ত বক্ষ বিদ্ধ করিতেছিল। চকিতে একবার নিদ্রাজড়িত চক্ষু দুইটী মার্জ্জনা করিয়া চারু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে গেল। মতিয়া আসিয়া স্বামীর হাত ধরিল। সিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "যদি দরকার হয়, তাঁদের তোমার এই বাড়ীতে নিয়ে এস, এখন তো এও তোমারই বাড়ী।" চারু ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলু আসিয়া কহিলেন "মা মণি একটু থাক তা' হলে আমিও একবার

যাই দেখে আসি ব্যাপারটা কি রকম?" মতিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল "হ্যাঁ যান কাকা, গাড়ীখানাও বলে যান্, যদি সেই বাড়ীই সত্যি হয় তো বাড়ীর সবাইকে এই বাড়ীতে আন্‌বেন।" মতিয়ার সতর্ক দাসীর তরল নিদ্রা এতক্ষণে ভাঙ্গিয়াছিল তার কারণ দুই দিককার খোলা দুয়ার দিয়া অনেকগুলি লোকের ভীতিব্যাকুল কণ্ঠ একসঙ্গে ঘরে আসিতেছিল। সে উঠিয়া বসিয়া নিদ্রালস-জড়িত কণ্ঠে কহিল "কি গা দিদিমণি উঠেচ কেন? শোও শোও" নীলু কহিলেন "এতক্ষণে তোর ঘুম ভাঙ্‌লো, বেরিয়ে একবার বাইরের কাণ্ডটা দেখ্‌গে যা"—দাসীটা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "এখনো যে রাত রয়েচে, বাবু কি হয়েছে কি?" নীলু চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়াই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া বকিতে বকিতে ঘরে আসিয়া কহিল "ওমাগো—দিদিমণি, বাপ্‌রে আকাশ একেবারে লাল লাল হয়ে গেছে আগুনের কি ফুল্‌কী,—জামাই বাবুদের বাড়ীটে না হ'লে বাঁচি. সেই দিকটাই তো বোধহচ্চে গো!" মতিয়া তেমনি কাঠের মত তার আলোকবাঞ্চিত শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাসী বলিতে লাগিল "আহা ঘরের মেয়েছেলে ঝিবৌয়েরা কোথায় যে দাঁড়াবে আহা তা!" মতিয়া কহিল "কেন রে তাঁরা এই বাড়ীতে আস্‌বেন।" দাসীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল "এই বাড়ীতে? হ্যাঁ দিদিমণি কি যে বল তুমি, কি দুঃখে সেই সতীন কাঁটা নিয়ে ঘর ক'রতে যাবে গা,—সে হাজারই ভাল মানুষ হোক না কেন বাপু হ্যাঃ সতিন সইতে? ওঃ সে দেবতারাও পারেন নি।" মতিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "কেন কি করবে সে?" "ওমা কি করবে না কি? সোয়ামীর ভাগীদার এ নাকি কেউ সইতে পারে? এরপর উঠ্‌তে বস্‌তে তোমাকেই খোয়ার করবে, সে বালাইতে কাজ নেই বাপু।" মতিয়া সাগ্রহে সরিয়া আসিল। তাই কি সে দিন সেই ননীর পুতুল রেণুর যে মাতা তারই আবির্ভাবে মতিয়ার সমস্ত মন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল? বুঝি যখন তাহারই স্বামীর উপর প্রচণ্ড অধিকার লইয়া সে পিপাসিত মনের তৃষ্ণায় চক্ষুর অভাবে হাত দিয়া দেখিতেছিল কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, সেই সময়েই হয় তো সে আসিয়াছিল এবং নিদারুণ বিতৃষ্ণায় অবজ্ঞায় চাহিয়া দেখিয়াছে। মতিয়া দাসীর কাছে আসিয়া কহিল "আচ্ছা, যদি আমি তার স্বামীর ভাগীদার না হই, তবু সে রাগ করবে? তার স্বামীর কিছুই তো আমি নিচ্চি নে?" দাসীটা মতিয়ার সে প্রশ্নের উত্তরেও কিছুমাত্র আশা দিল না, কহিল "তবু তো সতিন বটে, সোয়ামী যদি একটা হেসে কথা কয় তবু গা জ্বলে মরে, ওই তো ফেলু ভশ্চায্যির দুটো বউ, যে দিবারাত্তির চুলোচুলি কোরে মরে, কোন্ দিন নাকি বড় বৌটার হাতে ঢেঁকি পড়ে হাতটা থেঁত্‌লে গেছ্‌লো তাই দেখে ভশ্চায্যি বুঝি একবার তার হাতখানা ধরে আহা বলেছিল, তাইতে ছোট বৌটা তেরাত্তির জল খায় নি, শুনলে?" মতিয়া শিহরিয়া উঠিল। পৃথিবীতে কাহারও সহিত তাহার মত অভাগা জীবেরও এমন একটা সম্বন্ধ আছে, সে তো ইহা কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই। এখন এখানে কিছুই সহিবে না। অথচ মায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ ছিল যে সে যেন তার এই দ্বিতীয় স্বামীর বংশ-প্রদীপ স্থাপন করিতে পারে। মতিয়া কহিল "হ্যাঁ রে বিধু, আমি তো কিছুই দেখতে পাই নে, তোরা আমায় ওই ঠাকুর ঘরের কাছে যে ঘরটা আছে, এই বড় ঘর সারাবার সময় আমরা যেখানে ছিলাম সেই ঘরটায় রেখে দিস্। মা বল্‌তেন সেখানে থাকলে বাড়ীর কারুকে দেখা যায় না, আমি সেইখানে থাক্‌বো, ঠাকুরবাড়ীর উঠানে নামবো। তোরা এখানেও যেমন আমার কাছে থাকিস্ সেখানেও তেমনি থাকবি, আর কাউকে যেতে বারণ করিস্, কাউকে নয়—বুঝ্‌লি?" এই বিশেষ করিয়া কাউকে কথাটা দাসী বুঝিল, কহিল "জামাইবাবুকেও না?" "না, তা'হলেই তো সে রাগ করবে, তোরা আমার কাছে থাকিস্. আর তো মা নেই,—" বলিয়াই মতিয়ার কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে রোধ হইয়া গেল। গাড়ী ফিরিয়া আসিবার শব্দে ও সঙ্গের লোকজনের হা-হুতাসে ত্রস্তা মতিয়া ব্যাকুলভাবে বিধুকে কহিল "ওই

ওঁরা আসচেন, আমায় দেখে রাগ করবেন না তো?" বিধু ততক্ষণে অভ্যাগতদের বসাইবার জন্য একটা আলোর সন্ধানে গিয়াছিল। ভীতিবিহ্বলা মতিয়া কেবল কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে অসহায়ভাবে সেই কক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। একখানি স্নেহনীড়ের অভাবে শূন্য বায়ুর চাপও যেন তাহাকে চাপিতেছিল। আজ আর কোথাও তার ঝাঁপাইয়া পড়িবার স্থান নাই।

মেয়েদের পাঠাইয়া দিয়া কয় ভাই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মনে বিস্ফারিত নেত্রে পিতৃপিতামহ সঞ্চিত জিনিষপত্রের শোচনীয় ধ্বংস চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। একটা সিন্দুক ও কয়েকটা ট্রাঙ্ক বাহির করা হইয়াছিল। সেগুলাকে বাহিরে একটা গাছের নীচে রাখিয়া সেই সিন্দুকের উপর [illegible] বসিয়া বিশুষ্ক মুখে বাড়ীর পানে চাহিয়াছিল। যাহারা দর্শক হইয়া আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়াছিল তাহারা [illegible] আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেলে বিরজানাথ সজোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "চারু, তুই চলে যা, সারা রাত্রির হিম তো লাগলই আবার—" চারু কহিল "আর বসে থেকেই বা কি হবে? উঠুন না আপনিও চলুন।" বিরজানাথ কথা কহিলেন না, বেদনাহত ম্লান দৃষ্টিতে দগ্ধাবশেষ বাড়ীখানার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মায়াপাশাবদ্ধ মানবাত্মা বুঝি এমনি করিয়াই দেহান্তের পর দগ্ধীভূত দেহের পানে চাহিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে যখন শিখার পর ধূম, ধূমের পর অগ্নি পর্য্যন্ত নিভিয়া আসে,—যখন সমস্ত অস্তিত্বের অবসানে মুষ্টিমেয় ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন আবার শূন্য হইতে শূন্যে পিঞ্জর অন্বেষণে ছুটিয়া যায়। তেমনি দেহবন্ধনচ্যুত আত্মার মত বিরজানাথ চাহিয়া রহিলেন।

নীলু গাড়ী করিয়া মেয়েদের আনিয়া বাহির দিকের একটী ঘরে রাত্রির মত বসাইয়া ছিলেন। তাঁহারা নিদ্রাহীন রাত্রিটুকু কোন ঘরে কি ছিল এবং কত কিছু যে গেল তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন। রেণুকে একটা চৌকীর উপর শোয়াইয়া ইন্দুও শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িয়াছিল। মতিয়ার শয়ন কক্ষ হইতে এই ঘর তিন চারিটী ঘরের ব্যবধান এজন্য মতিয়া কোনও কথাই সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল না।

বিরজানাথের উদ্বিগ্ন তাড়ায় সমস্ত বিনিদ্র রাত্রির দেহভরা ক্লান্তি লইয়া চারু যখন ফিরিল তখন প্রায় ঊষা সমাগত। আসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে নেবুফুল ও সজিন ফুলের মধুর গন্ধ বিকাশ করিতেছিল। ধূলা ভরা পা দুখানা ধুইবার জন্য চারু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বারান্দায় পা ধুইয়া অন্যমনস্কে ঘরে যাইবার জন্য পা তুলিতে গিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিল চৌকাঠের উপর মাথা লুটাইয়া দিয়া অনাবৃত কক্ষতলে পড়িয়া মতিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মাতার চতুর্থী পালনে চুলগুলা যে রুক্ষ হইয়াছিল আর তাহাতে তেল পড়ে নাই। আজানু বেষ্টিত সেই রেশমের মত কোমল চুলগুলা চারিদিকে লুটাইয়া পড়িয়াছে। যেন ঠিক পূর্ব্ব দিগন্ত প্রান্তে-উদয় আসন্ন জবাকুসুমের আভারঞ্জিত তরল মেঘস্তরের মত। সুপ্তিতে তাহার সকল নিগ্রহের মূল অন্ধ চক্ষু ঘন পল্লবে আবৃত। অতি খর্ব্ব মোমের মত শুভ্র সুকুমার দেহলতা, চাপিয়া ধরিলে বুকের সহিত মিলাইয়া যায় এমনি কোমল। মল্লিকা-মালার মত শুভ্র হাতখানি ও আরক্ত করতল চৌকাটের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। তরুণ অরুণ-রশ্মি যেন সূক্ষ্ম স্বর্ণজাল ভেদিয়া তার মুখের উপরে ও স্থলপদ্মের দলের মত আরক্ত অধরে প্রসন্ন হাসা-রেখা ফুটাইয়া দিতেছিল। সৌখীন যুবকেরা যেমন কোটের বোতামে একটী মাত্র ফুলের সংক্ষিপ্ত তোড়া পরেন, তেমনি বিস্তৃত কেশরাশির উপর একটী ফুলের মতনই সে শোভনীয়। রুদ্ধ বায়ু কারাগারের বন্দীকে একটী মাত্র দ্বার মোচন করিয়া যদি নন্দন উদ্যানে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তেমনি নিমেষে চারুর সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি যেন জুড়াইয়া গেল। তাহার বিরস

শুষ্ক মন কোথা হইতে প্রচুর স্নেহে সিক্ত হইয়া উঠিল। সে সেই দ্বারপ্রান্তে চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িল। এই দু'এক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে যাহার শিয়রের জানালায় ছিদ্র থাকায় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মা তার অস্থির হইয়া উঠিতেন, আর আজ সেই স্নেহের ধনই, সম্ভবতঃ জীবনে সর্ব্বপ্রথম এমনি করিয়া ধূলায় লুন্ঠিতা! আর উদ্বেগে আশঙ্কায় ব্যাকুল হইবার তার কেহ নাই। এই অসহায় ভবিষ্যতের আশাতেই না পিতামাতা তাহার বিবাহ দিয়া ভবিষ্যত জলপিণ্ড স্থূল পুত্র সন্তানকে পৈত্রিক বাস্তু হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। একটা কাক উচ্চ কাকা রবে উড়িয়া প্রভাতবার্ত্তা জানাইয়া গেল। চারু মতিয়ার মুখের উপরকার একটী মাত্র চুল সরাইবার জন্য স্পর্শ করিবামাত্র মতিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। চারু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল "এমন করে মাটীতে প'ড়েছিলে কেন মতি?" মতিয়া ভীতি কুণ্ঠিতকণ্ঠে কহিল "তুমি? ওঁরা সবাই এসেছেন?" চারু মলিন হাস্যে কহিল "এসেছেন বই কি, না এসে আর উপায় কি?" রুক্ষ চুলের রাশি হাত দিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মতিয়া কহিল "সকলেই হয় তো ক্লান্ত আছেন, কাকাকে ডাকিয়ে সব যা যা দরকার হয় বলো। হ্যাঁ খুকু?" চারু কহিল "খুকু ঘুমুচ্চে হয় তো, তুমি কোথায় যাচ্চ?" মতিয়া উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

(১১)

অসহনীয় বিষম বেদনা মনের মধ্যে অত্যুগ্র তুফানে ফেনাইয়া উঠিয়া মানুষকে যখন বিকল করিয়া দেয়, সেই বেদনাহত প্রাণটাকে খাড়া করিয়া রাখিবার একটা আশ্রয়ও যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তখনই পুরাতন অনাদিকালের চির নূতন বন্ধুটী প্রাণের সকল আবর্জ্জন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার করুণা-বিগলিত হাসিটুকু সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ তাপ ধুইয়া দিয়া প্রভাত সূর্য্যের মত ঝলমল করিয়া সারা প্রাণে পুলকাবেশ জাগাইয়া দেয়। মতিয়ারও নিরবলম্ব ব্যথাত প্রাণ তাই আজ ঠাকুর ঘরে আত্মনিবেদন করিবার জন্য উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছিল— সেই পূর্ব্বের মত, যখন সে নিজের বিবাহের কিছুই জানিত না সেই সময়ের মত বাহিরের সকল দ্বন্দ্ব মিটাইয়া চুকাইয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে আত্মস্থ হইয়া, সমস্ত মনেপ্রাণে সেই অপার্থিব স্নিগ্ধ শান্তিধারা গ্রহণ করিতে। চিত্তের একমাত্র তিনিই প্রার্থনীয় হইয়া উঠিলেন, একাধারে যাঁহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী সকল কিছু বর্ত্তমান। বিগ্রহের চরণোপান্তে সে নিস্পন্দ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পুরোহিত আসিলেন। যথারীতি পূজা সাঙ্গ হইয়া গেলে পরও তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন মতিয়া তেমনি স্পন্দনহীনভাবে বসিয়া আছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন "মা দোর বন্ধ করতে হবে যে!" মতিয়া সচকিত হইয়া পরক্ষণেই শান্তকণ্ঠে কহিল "বাড়ীর ভিতর দিককার দুয়োর বন্ধ থাক, আমি এই পাশের ঘরে থাক্‌বো।"

তিন চারি দিন মতিয়া সেইখানেই কাটাইল। নীলু আসিয়া সেইখানেই তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া যাইতেন। ঠাকুর ঘরের উপর যে মতিয়ার আবাল্যের আকর্ষণ আছে এ কথা সকলেই জানিত। বাল্যকালে মাথা ধরিলেই মতিয়া ঠাকুরকে জানাইতে ছুটিত, আর আজ এত বড় বিয়োগ-ব্যথাতুর চিত্ত লইয়া সে যে ঠাকুর ঘরেই আসন পাতিবে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাহাকে এ অবস্থায় উত্যক্ত করা কেবল কষ্ট দেওয়া বুঝিয়া কেহ কোনও বাধা দিলেন না। বাড়ীর ভিতর কেবল চারুরই পরিবারবর্গ মাত্র, সর্ব্বত্র নিরুপদ্রব স্বাচ্ছন্দ্য। চারু নীলুর নিকট হইতে মতিয়ার সংবাদ লইত কিন্তু যে নির্জ্জন স্থান লাভের জন্য সরিয়া গিয়াছে তাহাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিল না। দুই প্রহরে প্রখর রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝলসিত। কচিৎ বকুলের পত্রবহুল শাখার ভিতর হইতে তৃষিত চাতকের সকরুণ চীৎকারে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। প্রখর রৌদ্র তাপাকুল গাভীগুলি

বৃক্ষতলে বিশ্রামে রোমন্থন-রত। এমন সময়ে নীলু আসিয়া চারুকে ডাকিয়া বাহির করিলেন। চারুর কোলে রেণু ছিল, সে রেণুকে লইয়া বাহির হইতেই নীলু তাহার হাতে এক খণ্ড পত্র দিয়া রেণুকে প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন "কচি ছেলে মা আমার বড় ভালবাসেন, তাই নিয়ে যাচ্চি, যদি একটু মুখ খোলেন, দেখনা বাবাজী কি কোরে চিঠিখানা লিখেচেন, প'ড়ে দেখ,—" চারুর কোল হইতে রেণু কোনও মতেই নীলুর কোলে যাইতে চাহে না। চিঠির শূন্য খামের লোভে যদি বা গেল তখনই নীলুর শিশুত্রাসকর মুখখানির পানে চাহিয়াই ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! চারু রেণুকে কোলে লইয়া কহিল "আপনি যান্, ভিতর দিকের দুয়োর খুলে দিন্‌গে আমি একে পাঠিয়ে দিচ্চি।" ইন্দুকে ডাকিয়া চারু কহিল "রেণুকে ওই ঠাকুর ঘরে দিয়ে এস।" ইন্দু হাসিল "আমি? আমি গিয়েই বুঝি সর্ব্বপ্রথম বিরক্ত ক'রবো?" একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িয়া চারু দেবেন্দ্রের পত্র খুলিল। প্রথমতঃ দুই এক কথায় চারু গৃহদাহের জন্য দুঃখ করিয়া তারপর প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর একান্ত পরমুখাপেক্ষিণী বোন্‌টীর কথা। তাহার প্রতি করুণা প্রকাশের জন্য সকাতর মিনতিপূর্ণ পত্র। "তোমার আমার সবই আছে, তাহার কিছুই নাই। ব্যর্থ জীবন বলিয়া তাচ্ছল্যের ফলে যেন আমাদের অত স্নেহের ফুলটী শুকাইয়া না যায়। পরিশেষে লিখিয়াছেন যে আমি জানি মতিয়া তোমাকে ভালবাসে, হয় তো তুমি জান না বা বুঝিতে পার নাই, কিন্তু তুমি সামান্য মাত্র স্নেহ প্রকাশ করিলেই তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে এ ভরসা আমি করি।" চারু পত্রখানি ইন্দুর হাতে দিল কহিল "রেণুকে পাঠিয়েচ?" "হাঁা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি শোবার ঘরে নেই বোধ হয় পূজোর ঘরেই আছেন, তাই রেণুকে ফিরিয়ে এনেচে।" "ফিরিয়ে এনেচে?" "হুঁ, তা কি আর ক'রবে।" চারু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল "পড়্‌লে চিঠি? কি করা উচিত?" ইন্দু হাসিয়া কহিল "একটু স্নেহ প্রকাশ করা, আর কি?" চারুও হাসিল "তা করনা কেন, যা ক'রতে হয়।" "আমি কি কোর্‌বো, আমাকে কিছু ক'রতে তো বলেন নি, বলেচেন তোমাকে, তুমি কোর্‌বে, যা ক'রতে হয়, কর।" "কেন তুমি পৃথক নাকি?" ইন্দু কহিল "না, পৃথক তো নই সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে যে যে সম্পর্ক, আমার ত সাহসই হয় না, তা না হলে আমার আটকাত না।" চারুর মুখখানা একটু আরক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল যাহাই হউক না কেন তাহার সংসার এমনি করিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখে একটু হাসিয়া কহিল "কেন সঙ্গে আর কি?" ইন্দু কহিল "আর কিছুই না বল্‌লাম তো প্রীতিকর সম্পর্ক নয় বলেই—" "বড্ড অপ্রীতিকর? কারণ—" ইন্দু আরক্ত মুখে কহিল "কক্ষণো নয়, ও কারণ কখনই নয়, আমি বুঝি এই বুড়ো বয়সেও ওই সব ভয় করি? বাসুক গে না কেন তোমাকে ভাল, আমার ত তে কি, আমি ভয় করি বিরক্ত হবেন বলে? বুঝ্‌লে?" দিন কয়েক পরে ইন্দুকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবার জন্য চারু কলিকাতায় গেল। সেখানে দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, দেবেন্দ্র মতিয়া সম্বন্ধে শত শত প্রশ্নে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিলেন। এই প্রশ্নের মধ্যে তিনি একবার প্রশ্ন করিলেন "মতি এখন কোন্ ঘরে শোয়?" চারু কহিল সেই ঠাকুরবাড়ীর খালি ঘরটায়।" দেবেন্দ্র কঠিন স্বরে কহিলেন "কেন, বাড়ীর অতগুলো ঘরের মধ্যে তার জন্যে একটা ঘরও খালি ছিল না?" চারু নম্রকণ্ঠেই কহিল "আপনি বুঝি রাগ ক'রচেন, তা নয়, নিজে হ'তে বাড়ীর সঙ্গে সব সূত্র ঘুচিয়ে সেই ঘরে বাস কচ্চে, আমাদের কারো সেখানে যাবার অধিকারই নেই যে আমরা অনুরোধ ক'র্‌বো।" দেবেন্দ্র গাঢ় স্বরে কহিলেন "অধিকারই নেই, কার? এমনও কখনো শুনেচ তুমি চারু, যে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার নেই,"—চারু মুখ নত করিল। দেবেন্দ্র পুনরায় কহিলেন "তোমাদেরই ভুল হয়েচে চারু সে যে কখনো অচেনা লোকের কাছে থাকে নি, নিজেকে সাধারণের বাহিরে জেনেই সে সরে গেছে, ভয় পেয়েই সরে আছে,

তুমি গিয়ে তাকে ঘরে এনো ভাই, অমন করে থাক্‌লে যে ম'রে যাবে।" চারু কুণ্ঠিত সঙ্কোচে কহিল "আপনি একবার যাবেন না?" দেবেন্দ্র ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন "আমিও যাব বই কি চারু, কিন্তু আর যে মা নেই বাড়ীর কাছে থেকেই মা বলে ডাকতাম, তাই আর যেতে ইচ্ছা করে না তা ছাড়া আমি যে সমাজচ্যুত।" "কিন্তু সমাজের বাহিরের মানুষ বাড়ীতে গেলেই ত জাতি নাশ হয় না, মা থাক্‌তে যেমন যেতেন তেমন গেলে আমরা সুখী হবো।" দেবেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। চারু কহিল "বাড়ীতে সকলেই আছেন কিন্তু আপনি না গেলে কেউ বোধ হয় সাহস ক'রে সে পূজোর ঘরের ভিতর যেতে পারবে না।" বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া দেবেন্দ্র কহিলেন "কেন তুমি? তোমার এটুকু সাহস থাকা উচিত চারু এ সাহসের বল তো নয়, এ স্নেহের জোর, তুমি গিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেও আর বলো যে আমি ছুটি পেলেই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আস্‌বো।" চারু নত হইয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিল।

(২২)

চারু যখন কলিকাতায় ইন্দুকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি ৯টা। বাড়ীতে আসিয়া আহার সারিয়াই সে ঠাকুরবাড়ীর সদরদিকের প্রাচীরসংলগ্ন ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল তাহা রীতিমত তালাবদ্ধ সুতরাং ভিতরদিকের দুয়ার না খুলিলে প্রবেশ সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়া বদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল "বিধু" কিন্তু বিধু তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। কেহ উত্তর দিল না অগত্যা চারু গিয়া শুইয়া পড়িল। ইন্দু নাই—রেণু নাই ঘরখানাকে বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল। নিশীথ রাত্রে বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে বাড়ীখানি স্তব্ধ। সেই রাত্রে দুয়ার খোলার শব্দে চারু উঠিয়া বসিল। গ্রীষ্মের তরল নিদ্রা চকিতে ছুটিয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইয়া সবিস্ময়ে দেখিল পূজার ঘরেরই দ্বার খোলা। দ্রুতপদে অন্ধকার ঘরের ভিতর গিয়া ডাকিল "মতিয়া" অস্ফুট প্রত্যুত্তর শুনিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হইয়াই নগ্ন পায়ের উপর মতিয়ার কোমল করস্পর্শে থামিল। সে কোমলকণ্ঠে কহিল "দরজা খুলে এখানে কেন প'ড়ে আছ মতি?" অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে মতিয়া কহিল "বড় গরম, তাই একটু হাওয়ার জন্যে।" চারু বুঝিল ওদিকের দুয়ার বা জানালা খুলিবার সাহস হয় নাই বলিয়াই মতিয়া গ্রীষ্মাধিক্যে একটু বাতাসের জন্য অন্তঃপুরের দুয়ার খুলিয়াছে নতুবা অন্ধকারে আর ক্ষতি কি? তাহার তো দিবারাত্রি সকলই চির অন্ধকার? চারু নত হইয়া দেহস্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। মতিয়ার বাহুমূল আগুনের মত উত্তপ্ত। চারু গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল "তোমার কি জ্বর হয়েচে?" মতিয়া উত্তর দিল না। চারু আর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না, তাহার আপাদমস্তকে যেন একটা তীব্র চাবুকের আঘাত লাগিয়া সচেতন করিয়া দিয়াছিল। দুই হাতে মতিয়াকে তুলিয়া লইয়া মুক্ত দ্বার দিয়া পাশের ঘরে মতিয়ার শয্যার উপরে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। ঘরখানি অন্ধকার। চারু শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া কহিল "তোমার জ্বর হয়েচে কবে?" কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া শিথিল হাতখানি তুলিয়া নাড়ী দেখিতে দেখিতে আবার কহিল "কই বল্‌লে না, কবে জ্বর হয়েচে।" মতিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া জাগিল, কহিল, "কিছু বোল্‌চ?" "হ্যাঁ, বলচি, তোমার জ্বর কবে হয়েছে?" মতিয়া দ্রুতনিঃশ্বাসে কহিল "আজ চারদিন বোধ হয়।" চারু আবেগের সহিত কহিল "তবে কেন তুমি মাটীতে গিয়ে ঠাণ্ডায় প'ড়েছিলে? ঝিকে ডাকলেই ত বাতাস দিতে পার্‌তো। কেন তা ডাক নি?" মতিয়া নিঃশব্দে পাশ ফিরিয়া শুইল। চারু তাহার ঝিকে ডাকিয়া তুলিল,—তাহাকে দিয়াই জল আনাইয়া মতিয়ার জ্বর তপ্ত কপালের উপর জলপটী বসাইয়া দিল। সেই ঝিয়ের হাতে পাখা দিয়া সে নিজে মতিয়ার পাশে

বসিয়া জ্বরের উত্তাপের পরিমাণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। থার্ম্মোমিটার উঠাইয়া দেখিল ১০৫´ ডিগ্রি তখনো রহিয়াছে। মতিয়ার নিটোল দেহখানি যে কতখানি শুকাইয়া গিয়াছে আজ চারু তাহা ভাল করিয়া দেখিল। হয় তো এই চার দিন জ্বর সমভাবে আছে, বাড়ীর কেহ এ সংবাদ পায় নাই। ঝিগুলা কি কেহ একবার কোনও কথা কাহাকেও জানাইতে পারে নাই? ক্ষোভে বিরক্তিতে অধীর হইয়া নিষ্ফলক্রোধে অগ্নিদৃষ্টিতে ঝিয়ের পানে চাহিল। তৃষ্ণায় মতিয়ার ওষ্ঠাধার শুকাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু তথাপি সে জল প্রার্থনা না করিয়া শয্যা হইতে নামিতে যাইতেছিল। চারু ধরিয়া ফেলিল। মতিয়া শিথিল দেহখানি অবসন্নভাবে শয্যার উপর এলাইয়া দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল "জল" "জল"। মতিয়ার জলের জন্য চারু বাধ্য হইয়া পূর্ব্বদিকের একটা জানালা খুলিয়া ফেলিল। সমস্ত গ্রামখানি নিদাঘের ধূসর আকাশের অগণ্য নক্ষত্র দেউটীর নিম্নে সুষুপ্তি সুস্থির। কোথাও কোনও শব্দ নাই। চারু শুষ্ককণ্ঠে কহিল "এঁকে এতদিন কি খাইয়ে রেখেচ ঝি, ভাত না আর কিছু?" ঝি চারুর ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল কহিল "জ্বরের উপর কি ভাত কেউ খায়, দুধ খেয়েচেন।" বাস্তবিক মতিয়া কেবল জল ছাড়া আর কিছুই খায় নাই। সমস্ত রাত্রি মাথায় জল দিয়া চারু মতিয়ার নিকট বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দেহের উষ্ণতা বিন্দুমাত্রও কমিল না। বরং অত্যন্ত চঞ্চলতায় মতিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। একটু বরফের জন্য চারু প্রভাতের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া রহিল।

(২৩)

প্রত্যূষেই নীলু আসিয়া ডাকিলেন "মা।" চারু উত্তর দিল "আসুন, ঘরের ভিতরই আসুন।" তথায় চারুকে দেখিয়া নীলু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন, একটা কিছু ঘটিয়াছে বুঝিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মতিয়াকে দেখিয়া উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিলেন "একি; কি হয়েচে বাবা?" চারু বিরসকণ্ঠে কহিল "এই ত যা দেখ্‌ছেন, আপনি কি একদিন কোনও খোঁজ-খবর করেন নি? আমি জান্‌তাম যে আপনিই সব খোঁজ রাখেন।"—অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া নীলু কহিলেন "আজ কদিন থেকে মা ঘরে থেকেই উত্তর দিয়ে বিদেয় করে দিতেন, তাই বাবা কিছু জান্‌তাম না আমি; মা যে এমন ক'রে ফাঁকি দেন তা আমি একটুও বুঝতে পারি নি।—" অপরাধের বেদনায় বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। চারু কহিল "একটু বরফের দরকার; কোথায় পাওয়া যাবে জানেন কি? গ্রামের এক একজন নিষ্কর্ম্মা যুবক মধ্যে মধ্যে দোকান খুলিয়া বসে তেমনি একজন এই গ্রীষ্মের দিনে লাভের আশায় সোডা লেমনেড্ বরফের দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল। সেইখান হইতে বরফ আনাইয়া চারু ব্যাগ ভরিয়া লইল। চারুর সমস্ত মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ মনে পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে তিনি, এমন কি গ্রামের আত্মীয়বন্ধু প্রভৃতি সকলেই চারুকে যে কতখানি অপরাধী স্থির করিবেন সেই লজ্জায় সে অন্তরে প্রচুর বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই মতিয়ার চরম অমঙ্গলে লোকচক্ষে চারুর যে কত বড় মঙ্গল, তাহা তো কাহারও অবিদিত ছিল না। এই সব চিন্তাতেই চারুর চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রীড়া দিতেছিল। চারু মতিয়ার শয্যাপার্শেই দিনরাত্রি বসিয়াছিল, মতিয়া নিশ্চেষ্টভাবে মুদ্রিত চক্ষে পড়িয়াছিল। নিকটে কেহ আছে কিংবা নাই, এ সম্বন্ধে তাহার যে কোন সংজ্ঞা আছে তা প্রকাশ পাইতেছিল না। মধ্যাহ্নে বিরজানাথের স্ত্রী আসিয়া চারুকে স্নানাহারের জন্য উঠাইয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া চারু যখন মতিয়ার বিছানার কাছে দাঁড়াইল তখন অকস্মাৎ মতিয়া সবেগে পাশ ফিরিয়া দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া চারুর বুকের উপর মুখ গুঁজিল। এমনি অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বেগে সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল যে চারু পড়িয়া যাইতে যাইতে

বসিয়া সামলাইল। বিরজানাথের স্ত্রী গভীর বিস্ময়ে চারুর মুখপানে চাহিলেন। যে আজন্ম দৃষ্টি বঞ্চিতা সে যে নিজের স্থান এমন করিয়া অনুভব করে কোন্ শক্তিতে—এই টুকুই বিস্ময়ের কথা! চারু বসিয়া সস্নেহে মাথাটী বুকের ভিতর চাপিয়া মতিয়ার তপ্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মতিয়াও তাহার সেই স্বর্গে, স্বামীর উন্মুক্ত বুকের ভিতর, পরম তৃপ্তিতে শান্ত হইয়া চক্ষু মুদিল। সেদিনও সমস্ত দিন সমভাবেই চলিয়া গেল। চারু দেবেন্দ্রকে সংবাদ দিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন্ আর তিনি আসিলেন না। রাত্রি হইয়া গেল। রোগী যদি যন্ত্রণায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল শুশ্রূষায় মানুষে সজাগ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে একাকী জাগিতে হইলে সুগভীর মৌনতায় প্রায়ই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। চারু মতিয়ার বালিশটা একটু সরাইয়া রাখিয়া ঔষধের জন্য উঠিয়া গেল। মতিয়া অত্যন্ত ত্রস্তে চমকিয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া চারুকে ধরিতে গেল। চারু মুখ নামাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল "একটু থাক আমি ওষুধটা আনি" মতিয়া প্রলাপের মত উচ্চকণ্ঠে কহিল "না, না, যেও না, যেও না, তুমি এইখানেই থাক, ওগো তুমি চলে যেও না, যেও না।" চারু মতিয়ার কথায় মনে মনে কহিল "চ'লে যে যাচ্চ তুমিই," ক্ষণেক পরে আবার চমকিয়া আরক্ত মুখে মতিয়া চারুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার কণ্ঠ আর্ত্ত-গভীর প্রবল বিকারে জড়িত। সহসা সজোরে চারুকে ঠেলিয়া দিয়া মতিয়া উঠিয়া খাট হইতে নামিতে গেল। চারু ধরিতে গেলে কহিল "মা ডাক্‌ছেন, যে ছেড়ে দাও তুমি ছেড়ে দাও, মায়ের কাছে যাই।" চারু কম্পিতকণ্ঠে কহিল "না তুমি শোবে, এখন কোথাও যাবে না শোও।" নেশার মত্ততার মত জ্বরের মোহে মুহূর্ত্তে তাহার দেহখানা শিথিলভাবে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল কহিল "যাবো না?" তবে, তবে কি কর্‌বো,—বলে দাও কি কর্‌বো? "চারু তুষার-শীতল জল হাতে করিয়া তাহার মাথা ভিজাইয়া দিয়া কহিল "কি কর্‌বে? গল্প কর, হাস, গান কর।" অদূরে একটা মাদুর পাতিয়া নীলু নিদ্রিত। দাস দাসীরা প্রায় সকলেই নিদ্রিত। পাহাড়ের মত অপ্রিয় কঠোর রাত্রি যেন আর শেষ হইতে চাহে না। মতিয়া তেমনি আবেগে কহিল "কি কর্‌বো? গান? হ্যাঁ কর্‌চি।" মৌন গম্ভীর নিশিথের সুপ্ত বক্ষে দূরাগত বাঁশীর মত মূর্চ্ছনা ঢালিয়া ক্ষীণ উদাসকণ্ঠে মতিয়া গাহিয়া উঠিল :—

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি মহাসঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।
বলে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা,
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
(হেথায়) বাতাস গীতি-গন্ধ ভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে
চির শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে।"--

ছন্দে ছন্দে ওপারের ডাকের প্রতিধ্বনিই ধ্বনিত হইতেছিল,—যাহা অন্তরের ভিতর দিয়াই অন্তর স্পর্শ করে; অনন্তপথের যাত্রীর এই শেষ গান, ক্লান্ত শ্রান্ত পথিকের উৎসাহিত আশ্বাস বাণী। বাহিরে ঝড় উঠিয়া প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রবীণ কবিরাজ ও নলিনী ডাক্তার কক্ষান্তরে ঘুমাইয়াছিলেন। নীলু আসিয়া তাঁহাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। চারু মতিয়ার শুভ্র কোমল হাতখানি তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল "দেখুন তো একবার নাড়ীটা, হাত পা তো খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে, আর বুঝি আশা

নেই।" ভোরে ঝড় বৃষ্টির অবসানে বৈশাখের মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতি ঝলসিয়া উঠিল। নির্ম্মল রৌদ্রপাতে ধারাস্নাত গাছগুলির স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। মাজা রূপার ঝক্ ঝকে তৈজসের মত সমস্ত ভুবন-ভরা শুভ্র জ্যোতির মাখামাখি। শ্যামল প্রকৃতির বক্ষে এক দুঃসহ আবেগ যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া মৌন ঝঙ্কারের মৃদু মধুর মূর্চ্ছনা স্পন্দিত হইতেছিল। মতিয়ার জ্বর অতিক্রান্ত কমিয়া আসিতেছিল মতিয়া তার কম্পনিক্ত শীতল হাত দিয়া চারুর পা চাপিয়া ধরিল, কহিল "সকাল হ'য়ে গেছে না?" চারু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার কহিল "ওগো কথা কও, কথা কও, আমি যে দেখ্তে পাইনে—শুন্তে পাই, চুপ্ ক'রে থেকো না, বল সকাল হ'য়ে গেছে কি?" চারু অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল "হাঁ রোদ্ উঠে গেছে।" মুখ উজ্জ্বল করিয়া মতিয়া কহিল "খুব আলো হয়েছে তো খুব বেশী আলো, যাতে সব দেখা যায়;" "হাঁ, আজকের মত আলো প্রায় হয় না।" মতিয়া দুইহাতে চারুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল "তুমিও আজ আমায় দেখ্তে পাচ্ছ কি? আমি আজ এই আলোয় এইখানে মিলিয়ে যাব। ঘোড়ানিমের ফুল বিছানো তুলসী মঞ্চের নীচে মতিয়াকে রাখিয়া সেই অম্লান মুখপানে চাহিয়া চারু যখন তার তুষারশীতল হাত দুখানি নিজের পদতল হইতে সরাইতেছিল সেই সময়ে বা ঘর হইতে অশ্রুবিকৃত করুণ কণ্ঠে দেবেন্দ্র ডাকিলেন "মতিরে!" কোঁচার খুঁটে অশ্রু মুছিতে মুছিতে নীরু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

কালো ছেলে।

—:*:—

(একটী বেহারাদের ছেলে, কালো কুচ-কুচে ছেলেটী সর্ব্বদা হাতে তীরধনুক লইয়া ঘুরিত এবং সর্ব্বদাই তাহাকে একটী কুল গাছের তলায় দেখিতাম।)

তুই কি রামের গুহক মিতা, শ্যামের সুবল ভাই
একেবারে বদ্‌লেছ সাজ, ধরার উপায় নাই।
বাহক যে তুই আনন্দেরি, আয় রে কাছে আয়,
তুই কি সীতায় আন্‌লি ব'য়ে সুখের অযোধ্যায়?
গৌরী এনে কর্‌লি আলো গিরিরাজের পুর,
স্কন্ধে করে কৃষ্ণে বনে ঘুর্‌লি বহুদূর।
জীবন্ত তুই কষ্টি-পাথর, মূর্ত্ত মধু মাস,
শ্যামের দেওয়া রঙটী তুঁহার হরের দেওয়া হাস।
কার বদনে কুল দিবি তুই, কুল কুড়িয়ে খুন
ক্ষুদ্র করে কাহার তরে ফির্‌ছে ধনু তূণ?

এমন ধনুক কোথায় পেলি, এমন খাসা তীর
কর্‌বি শিকার কোন্ বনেতে ওরে নিষাদ-বীর।
ত্রেতায় বুঝি ক্রৌঞ্চ-মিথুন বিঁধ্‌লে তোরি বাণ
অমর ব্যথায় কর্‌লে আকুল মহাকবির প্রাণ!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মণিপুর রাজ্যের চিত্র।

রসিকতা ও রসের কথা।

—:*:—

মণিপুর আমাদের কুটুম্বরাজ্য। বহুদিন যাবৎ এ রাজ্য দর্শনের ইচ্ছা ছিল এবং সেই রাজ্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব এই ইচ্ছাও ছিল। মণিপুর বলিতে গেলে, আমাদের কুটুম্বিতার তীর্থ-স্থান। কাজেই তীর্থে যাইতে গেলে,— "রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দীনবেশে মণিপুরে প্রবেশ করি নাই কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদ রূপে আমাদের মহারাজার সহিত। মণিপুর-অধিপতি একবার আমাদের রাজঅতিথিরূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করিয়া-ছিলেন। সে স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রতিদর্শন বর্ত্তমান মহারাজা মণিপুর রাজ্যে যাইয়া আদায় করিয়া[illegible] এ উপলক্ষে মণিপুরে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে রাজকীয় আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই; কারণ, আমি চিত্রকর। চিত্রই সাহিত্যিকগণের নিকট দিবার ইচ্ছা।

মণিপুর রাজ্যের কাহিনী অনেক শুনিয়াছি এবং অনেক কুটুম্বের নিকট মণিপুরের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম সে কাহিনী যেন স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মত বোধ হইত, তাহা যেন একটা Happy valley চিত্রের মত মনে হইত। বাল্যস্মৃতির কাহিনী বলিতে গেলে বাল্যকালের স্বপ্নের ন্যায়। এখন মণিপুরে—সেই সুখময় সাগরও নাই, কাহিনীও নাই। এখন মণিপুর দেখিলে মনে হয়;—

"সে সুখ সাগর দৈবে শুকাইল।"

মণিপুর ইম্ফাল নদীর পারে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্রায়তন নদী দেখিয়া আমার মনে হইত,—

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিনী?"—

সে সব দুঃখের কাহিনী বলিবার এখন অবকাশ নাই। অতীতের গর্ভে মণিপুরের কাহিনী লুপ্ত হইয়াছে। আছে মাত্র স্মৃতি। সে স্মৃতিও কালে বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মণিপুরে গিয়া একটী মাত্র কার্য্য আমার ছিল;—সে রাজ্যের কাহিনীর সত্যতা অনুসন্ধান করা। মণিপুর দুর্ঘটনার পর যে সব কাহিনী লুপ্ত হইয়াছে, তাহার যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই হাতড়ান।

মণিপুরে আছে দুর্গ মধ্যে প্রাচীন রাজবাড়ী। বর্ত্তমান, রাজবাড়ী অন্যত্র প্রস্তুত হইয়াছে। রাজপথ উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই দুর্গ এক্ষণে (১৯১২ সালে) ইংরেজ সৈন্যাবাস, অস্ত্রাগার প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ গোবিন্দজীর দেবায়তনে অর্সেনেলের কাজ করিতেছে এবং তথায় ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিতেছে। মণিপুরীগণ গোবিন্দজীউকে সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই এবং তথায় আর দেবকার্য্য সম্পাদিত হয় না। রাজবাড়ী তোপের গুলিতে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে এবং দেখিলাম সেই রাজবাড়ীতে পতিত ভিটা যাহা দেখিলে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় এই মণিপুরীরাজগণের বিলাস আরামের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। ইম্ফাল নদীটা উত্তর হইতে দক্ষিণ বাহিনী। এই নদী দুর্গের উত্তরদিক হইতে টেকে-বেকে ঘুরিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালে দুর্গের পরিখা ইম্ফাল নদীর জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তথায় মণিপুরীদের রকমবেরকমের জলকেলী হইত। ইহাই যেন মণিপুরের প্রধান আমোদপ্রমোদ। দুর্গের উপরিভাগে রাজার বসিবার স্থান এবং জলকেলী দেখিবার একটী সুদৃশ্য বেদিকা। যখন ইচ্ছা হইত অতি অল্প সময় মধ্যে ইম্ফাল নদী বাঁধিয়া দিয়া পরিখাপূর্ণ হইলে দুর্গ নিরাপদ হইত এবং আবশ্যক হইলে নৌকা দৌড়ের আমোদ হইত। সমস্ত পরিখা পদ্মবন-সুশোভিত ছিল। এই পদ্মবনের শোভা এখন নাই। সে আমোদ প্রমোদও এখন নাই। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিতে গেলে সেই চিত্র মানসনয়নে প্রতিফলিত হয়; মণিপুর বঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় নগর। আমরা গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে একথা শুনিয়াছি।

মণিপুরীগণ প্রচুর আমোদী,—ইহা আমি জানি। কিন্তু আমোদপ্রমোদ কাহাকে বলে, মণিপুরের পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া ইহা মনে হয় যে, এই Happy valley বাস্তবিকই আনন্দ কানন ছিল। মণিপুরে যাহা দেখিলাম এবং যাহা শুনিলাম তাহাতে এজাতি যেপ্রচুর আমোদী তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। মণিপুর স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ। পথে—ঘাটে—বাজারে মণিপুরবাসিনীদের একচাটিয়া গতিবিধি—তাহারা যেমন রসিকা, তেমনি সরস আমোদিনী। মণিপুরে কোন আমোদপ্রমোদই স্ত্রীলোক ছাড়া হইবার জো নাই। পদে পদে রসিকতা ইহাদের —আয়ত্বাধীন। মণিপুরের বাজারের নাম 'সোনার বাজার'। সেই বাজারে গেলে, দেখা যায় যেন গোলাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। এ বাজারে স্ত্রীলোকই গ্রাহক, স্ত্রীলোকই বিক্রেতা। এই বাজারে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, যদি কোনক্রমে পুরুষ তথা উপস্থিত হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে প্রচুর সরস লাঞ্ছনা-অভিসম্পাত লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গীর কোন এক কুমারবংশীয় লোক এই বাজার দেখিবার জন্য গিয়াছিল,— বেচারীকে অপর্ণব হইতে হইয়াছিল। ললনাসুলভ রসিকতায় এবং কটাক্ষপাতে তাঁহার প্রায় মুণ্ডপাত হইয়াছিল। আমরা মণিপুরী ভাষা জানি, কাজেই রসিকতা করিতে মণিপুর-বাসিনীগণ ত্রুটি করেন নাই। একটী মণিপুরী স্ত্রীলোক বাজারে পুরুষ আগমন দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হে সুন্দর পুরুষ! তুমি আমার ছেলেকে কোলে কর আর তুমি আমার বেসাতির ব্যবসা কর।" আর আমাদের সে বাজারে দাঁড়াইতে হয় নাই—ছুটিয়া পলাইয়া আসিবারও জো ছিল না, কারণ, সুন্দরীগণ আমাদের পথ আগলাইয়া সমস্ত বাজারময় তামাসা করিতে

করিতে হয়রাণ করিয়াছিল। আমরা যোড়হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বাহির হইলাম। এই বাজারে সমস্ত রকমের জিনিষই বিক্রয় হয়। মাছ পর্য্যন্ত বিক্রী করিতে মণিপুরী হিন্দুরমণীগণ পশ্চাৎপদ নহেন।* ব্যবসা মাত্রই ইহারা করিতে পারে—কারণ, মণিপুরবাসিনী জানে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী," কিন্তু আমরা জানি চাকুরীতে লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকে। মণিপুরে প্রচুর ধান হইয়া থাকে। সস্তাও তেমনি সে বছর চাউল চৌদ্দ আনা করিয়া মন বিক্রী হইত; ইহা আমি দেখিয়া আসিয়াছি, কারণ, এই Happy valley সমস্তই ধান্য ক্ষেত্র এবং এই ধান্য অন্যত্র রপ্তানি হইবার উপায় নাই। কারণ, রেলওয়ে ষ্টেশন ১৩৭ মাইল দূরে। মণিপুরীগণ জানেন "তদর্দ্ধং কৃষিকার্য্যে" লক্ষ্মী বাস করেন। কাজেই কৃষিকার্য্য এখানে প্রধান কার্য্য।

সকালে মণিপুরীগণ কৃষি ক্ষেত্রে রীতিমত পরিশ্রম করে কিন্তু বৈকালে ইহারা সুসজ্জিত হইয়া নগর ভ্রমণে অথবা আমোদ প্রমোদ স্থানে গতিবিধি করে। মাথায় উষ্ণীষ, পরণে ত্রিকচ্ছ বসন এবং একখানা ধপ্ধপে সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। প্রায় সমস্ত মণিপুরী জাতির এই পোষাক। পলো খেলা হইতেছে। ১০,০০০ মণিপুরী স্ত্রী পুরুষ পলো ফিল্ডের চারিদিকে আড্ডা করিয়া বসিয়াছে এবং বাজি রাখিতেছে; কোন্ দল খেলা জিতিবে। এত জনতার মধ্যে টুঁ শব্দটী নাই। কেবল মাত্র খেলার রকম সকম দেখিয়া এক প্রকার তাহাদের উচ্চকণ্ঠের হাস্যধ্বনি শুনা যায়। আর দলবিশেষ জিতিলে Betting লইয়া তোল পাড়—উপস্থিত হয়। রাস্তাঘাটে মণিপুরীদের একে অন্যকে অভিবাদন একটা বৃহৎ ব্যাপার ইহারা জাপানীদের মত প্রচুর আমোদী এবং সাদর অভিবাদন ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সকলেই পরিচিত, সকলই আত্মীয় এবং কুটুম্ব হইতে পারে। স্ত্রীলোক বলিয়া ইতর বিশেষ নাই। অভিবাদন করাও যেন তাহাদের আর এক রকমের আমোদ। আমি দেখিয়াছি একটা অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রণাম দণ্ডবৎ পাইতে পাইতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন তবুও বৃদ্ধ রসিকতা ছাড়েন নাই; একটা স্ত্রীলোক কতকগুলি সন্তান সন্ততি লইয়া চলিয়াছে; বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ সহাস্য বদনে বলিয়া বসিলেন, "তোমাকে দেখিলে আমার পেঁপে গাছের কথা মনে পড়ে।" অর্থাৎ সন্তানগুলি যেন বৃক্ষটীকে বেড়িয়া আছে! আর স্ত্রীমহল হইতে উচ্চ হাসি উত্থিত হইল। যুবতী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। যুবকগণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "হে সুন্দরী, তোমার গায়ে মেলা মৌমাছি বসিয়াছে; ফুলের গন্ধে।" যুবতী উত্তর করিল—"এই মৌমাছি হুল ফুটায় না তোমার ভয় নাই।" আর রাস্তাময় কেবলই হাসির ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়; ইহা মণিপুরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি।

* "সোনার বাজার" রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত কেনাবেচা শেষ করিয়া ভঙ্গ হইয়া থাকে। সন্ধ্যা আগত হইবামাত্র 'সোনার বাজার' দীপমালায় আলোকিত হইয়া হাসিতে থাকে। ইহাকে যদিও দীপমালা বলা যাইতে পারে না; কেন না মণিপুরে পাইন বৃক্ষ প্রচুর, এই কাঠগাছের টুকরা অগ্নি সংযোগে জ্বালাইয়া কেনাবেচা চলিয়া থাকে। দূর হইতে দেখিতে গেলে মনে হয়, আলেয়ার আগুনের মত, এই আলোকসমষ্টি বাজারময় ঘুরিতেছে। সে কি চমৎকার দৃশ্য! যেন শত শত জোনাকী ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে—সে দৃশ্য বড় মনোরম—বর্ণনায় তাহা চিত্রিত করা অসম্ভব। যখন বাজার ভাঙ্গে তখন রাস্তাময় দীপমালার আলোকে আলোকিত হয় তখন রাস্তার সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, রাস্তাময় গোলাপের ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। "সোনার বাজার" হইতে পল্লীগণ অন্তর্ধান করিয়াছে। এখন "সোনার বাজার" স্তব্ধ এবং জন প্রাণীশূন্য।

প্রত্যেক আমোদপ্রমোদের জনতার মধ্যে স্ত্রীলোকের জনতাই অধিক। আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতে গেলে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধও আসিবে এবং কোলের দুগ্ধ পোষাটীও মাতৃপৃষ্ঠে চড়িয়া সমাগত হয়। মণিপুরীগণ জাপানীদের মত শিশুদের পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লয় এবং এ দরুণে কার্য্য সৌকর্য্য হইয়া থাকে কিন্তু কোন শিশুই কাঁদিয়া সভাভঙ্গ করে না। বিষয়টা আমার অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইল। শিশুর ক্রন্দনে কলিকাতায় থিয়েটার দেখা যেমন দায় হইয়া পরে, মণিপুরে এই উৎপাত নাই কেন? এই শিশুরা কি কাঁদিতেও জানে না? জানে কিন্তু "নট অপারগ।" অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম তাহারা সঙ্কটে পড়িয়াছে। মা তাহাদের মুখের মধ্যে কাঠের গুলি পুরিয়া দিয়া সুতার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কাণের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে। চীৎকার করা তাহাদের অধিকার মাত্র নাই। মা যখন দুগ্ধ ভার সহিতে না পারেন তখন শিশুটিকে পিট হইতে নামাইয়া প্রমোশন দিয়া কোলে আনিয়া পীযূষপূরিত স্তন শিশুর মুখে পুরিয়া দেন। শিশু পিযূষ খাইয়া তৃপ্ত হইতেছে এবং মা উপস্থিত দৃশ্য দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা একটী দৃশ্য বটে। আমি ভরসা করি, কলিকাতা থিয়েটার কোম্পানী ইহার অনুকরণ করিবে এবং বিজ্ঞাপন দিবে, ভবিষ্যতে আর দর্শক এবং অভিনেতার কান ঝালাপালা হইবেক না। Flartation স্ত্রী স্বাধীন দেশে প্রচলিত আছে ইহার বাঙ্গলা কি হইতে পারে, আমি জানি না। বাঙ্গলার অবরোধ প্রথা থাকার দরুণ সেই রসিকতা অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু মণিপুরে Flartation রসিকতার সহিত এবং রসের কথায় অনুবাদনে খুব বেশী রকমে প্রচলিত আছে। Flartation বিবাহ ও Divorce অনেক ক্ষেত্রে আনয়ণ করিতে দেখা যায়। মণিপুরেও বাদ পরে নাই। তবে রসিক দেশের রসিকতা দেখিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তিগণই সরস হইয়া উঠে সেই বিষয় সন্দেহ নাই। মণিপুরী পুরুষগণ মাথায় উষ্ণীষ পড়িয়া থাকে এবং নিজহাতে রংকরা কাপড়ে উষ্ণীষ বাঁধিয়া থাকে। ঈষৎ গোলাপী অথবা কুমকুমে রংয়ের উষ্ণীষ আদরের সহিত বাঁধিয়া থাকে। রাস্তায় শুনিতে পাইলাম যুবতী যুবককে ফরমাইস্ করিতেছে, "তোমার পাগড়ীর ন্যায় আমার সাড়ী রঙ্গাইয়া দাও না?" তখন স্ত্রীমহলে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। অবার তখন যুবক উত্তর করিল "আমার গোলাপীরং নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কারণ, অন্তর চাদর তাহা দিয়া রঙ্গাইয়া ফেলিয়া ছ।" তখন যুবক-মহলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। এই প্রকারে রসিকতা ও রসের কথায় মণিপুর সদা মুখরিত, ওদেশ আনন্দে দেশ নির্ম্মল রস-মন্দাকিনী অন্তরে অন্তরে তথায় প্রবাহিত। মণিপুরের Political Agent ১৮৭৪ সালে Major General Sir James Johnstone, K. C. S. I., তাহার প্রণীত "My Experiences in Manipur"এ লিখিয়াছেন;—

Close to the gateway is the place where the grand-stand is erected, from which the Rajah and his relations view the boat races on the Palace moat. I say 'view,' as in old age a Rajah sits there all the time; but in the prime of life he takes part in these races, steering one of the boats himself. These boat-races generally take place in September when the moat is full, and are the great event of the year. Everyone turns out to see them, the Ranees and other female relations being on the opposite side of the moat, for in Manipur there is no concealment of women, while the side next to the road is thronged with spectators. The boatmen have a handsome dress peculiar to the occasion, and the whole scene is highly

interesting. The boats are canoes hewn out of single trees of great size, and are decorated with colour and carving".

Page 108.

ভাবার্থ—রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার-সন্নিকটেই রঙ্গমঞ্চ, তথা হইতে রাজা ও রাজপরিবারবর্গ দুর্গপরিখায় নৌকা-বাইচ দেখিতেন, সেপ্টেম্বর মাসে পরিখা পূর্ণসলিলা—তখন বাইচের ধুম পড়িয়া যাইত। নৌকাগুলি ডোঙ্গা, বড় বড় বৃক্ষ খোদিয়া প্রস্তুত; বিবিধ চিত্র-বিচিত্রে শোভিত। রাজা স্বয়ং নৌবিহারে মত্ত হইতেন, পরিখার উভয় পার্শ্বে জনতা, স্ত্রীপুরুষের সমাবেশে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

হায়, মণিপুরের এই চমৎকার দৃশ্য এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি!

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

পাগলী।

—:*:—

আমাদেরি এই আঙ্গিনা-কোণে
সঙ্গোপনে
নাচে যেথায় নিমের ছায়াখানি,
নেবু ফুলের গন্ধটুকু বাতাসে দেয় আনি
ছোটবেলার মধুর স্মৃতিসম,
বাঁশের বেড়া ঢেকে আছে ঝুম্‌ক লতায় নিরুপম;
ইহারই এক কোণে
দুই নয়নে
ব্যাকুল দিঠি তার
দাঁড়াল সে যেদিন এসে, আকাশ-ভরা মেঘের অন্ধকার।

ব্যস্ত ছিলাম কাজে
তাহার মাঝে
কোন মতে দেখি নয়ন তুলি'
সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে তাহার গ্রন্থি বাঁধা কাপড়গুলি
লুটিয়ে আছে ধূলার 'পরে;
অযতনের ঘরে

মুখখানিকে ঘিরে আছে বহু দিনের ঘন জটা-রাশি,
চোখে তবু কি এক মৃদু হাসি!
উষার শশীকলা যদি বিবর্ণও হয়!
তবু দিয়ে যায় সে পরিচয়!

তার পরেতে অবাক হয়ে দেখি
বুকের মাঝে এ কি!
শীর্ণ শিশু ঘুমিয়ে আছে মাতার আলিঙ্গনে,
ভাবনাহারা শান্ত মনে!
অস্থিগুলি অনাহারে
দৈত্যসম শিশুটিকে গিল্‌তে যেন পারে!
মৃত্যু-ঘেরা ফ্যাকাসে মুখখানি,
পাঁজর-ঢাকা বুকের মাঝে থামে নি' ক প্রাণের ধুক্‌ধুকানি!
মাতার চোখে দারুণ ব্যাকুলতা;—
অকথিত দুঃখের ব্যথা
কাঁপে গভীর শ্বাসের ধারায়
অশ্রু যেন কঠিন হয়ে জমে গেছে হাসির কারায়!

এক পলকে পড়্‌ল বাধা কাজে
হাতের মাঝে
হাতের সেলাই রইল শুধু থেমে
আঁখিজলের পর্দ্দা আমার চক্ষে এল নেমে!
কাছে ডেকে বসাই তারে
সহব্যথার গভীর অশ্রুধারে
শুনি তাহার জীবনকথা
—কত গভীর দীর্ঘশ্বাসে কত গভীর ব্যথা
উঠ্‌ল দুলে দুলে
গৃহহারার দুঃখে যেন প্রাণের কূলে কূলে!

দারিদ্র্য কি জান্‌ত না সে
বড় সুখে ছিল স্বামীর পাশে,

—ধনীঘরের বধূ
পেয়েছিল সুখৈশ্বর্য্য মধু;
খাট্‌তে কভু হয় নি এতটুক্
পর্দ্দাঢাকা আব্রু মাঝে সূর্য্য-শশী দেখে নি তার মুখ!

কপালে তার সইল না রে,—
নূতন প্রেমে স্বামীর হিয়া মজ্‌ল একেবারে;
সতীন এসে তাদের ঘরে নিল এবার বাসা,
চিরদিনের সুখসাধের আশা

চূর্ণ হয়ে পড়্‌ল ধূলি-লীন;
তার পরে এক দিন
স্বামী তাদের তাড়িয়ে দিল পথে।

একটি দুটি গয়না যাহা বাঁচিয়েছিল কোনমতে
অঙ্গ হ'তে খুলে তাহা মাটির দরে বেচে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা যেচে

কোন মতে বাঁচিয়েছে এই কচি শিশুর প্রাণ,
—বাঁচিয়েছে তার নিজের দেহখান্!

দিন চলে না আর
দু'দিন হ'তে অন্ন মেলা ভার;
দুগ্ধ শিশুর লাগি? সে ত স্বপ্নাতীত আশ;
—ঘুচিয়ে দেহ-বাস

বল্লে কেঁদে পেটে যাহার নাইক কণা ক্ষুদ্
স্তনে তাহার নাম্‌বে কেন দুধ?
আমার চোখে বন্যা এল নেমে

মাতৃপ্রেমে

মুগ্ধ হ'ল হিয়া,
তৃপ্ত করি তৃপ্তি লভি সাধ্যমত দিয়া!

এমনি করে যেদিন হতে ভাঙ্গল তাহার ভয়
ইচ্ছামত এসে হাজির হয়,

দুঃখে সুখে কেঁদে হেসে বলে মনের কথা
শিশুর লাগি জানায় ব্যাকুলতা
আদর করে সোহাগ করে নারী ;
চোখে আমার নামে নয়ন-বারি
ওরে অবুঝ মাতৃস্নেহ, ওরে মূঢ় মুগ্ধমতি !
বুঝিস্ নাকি আস্‌ছে নিভে জ্যোতি
তৈলহারা দীপাধারে ?
বুঝিস্ নাকি একেবারে
বড় প্রখর সূর্য্যতাপে বড় কোমল কলি
মৃত্যু-কোলে পড়্‌ল বুঝি ঢলি ?
অন্ধ স্নেহে মাতা
কোন মতে বুঝ্‌ল না তা, বুঝ্‌ল না তা !

বর্ষা গেল নিয়ে তাহার নিবিড় ঘনঘটা
মেঘাস্তীর্ণ জটা,
এল শরৎ গেল শরৎ ফিরে
স্বচ্ছ নীলাকাশের পরে ছায়ালোকের পথটি চিরে চিরে !
পাকা ধানের গন্ধ মেখে গায়ে
হেমন্তেরই স্বর্ণদ্যুতি অস্ত গেল চপল লঘু পায়ে ;
শীতের হাওয়া বইল বনে
শুষ্ক পাতা পড়্‌ল ঝরে ; আবার সঙ্গোপনে
সুরু হ'ল নবরসের কেলি,
নবীন কচি পল্লবেরই দারুণ ঠেলাঠেলি !
আমাদের ঐ উঠানটিতে
কোথায় ছায়া কোথায় আলো বিছিয়ে ছিল চারিভিতে
চন্দনেরই প্রলেপ সম স্বর্ণরবিকরে,
নিমের ছায়া কাঁপ্‌তেছিল চপল লীলা ভরে !
হাতে কোন ছিল না কাজ আর
শুব্ধ চারিধার

ছুটে এল নারী তাহার শিশুটিকে বক্ষে নিয়ে
সযতনে ঢেকে আঁচল দিয়ে,
বল্লে হেসে "বাছা আমার ঘুমিয়েছে আজ এতদিনে
দুগ্ধ বিনে
কাঁদ্‌ত শুধু দিনে রাতে
থামাতে যে পারিনি তায় হাজার সান্ত্বনাতে।"
এবার নারী হাস্‌ল হা হা করি'
পরম স্নেহে মুখের কাছে মুখটি তুলে ধরি
চুমার পরে কেবল দিল চুমা
বল্লে "বাছা ঘুমা ঘুমা!"
আমি এবার অবাক হয়ে চেয়ে দেখি
কি ভয়ানক, কি অপরূপ কাণ্ড একি!
কাঠের মত কঠিন এযে শিশুর দেহটুক্‌,
—রক্ত হারা মুখ;
মৃত শিশুর মুখে মুখে একি সোহাগ তার,
দিনের আলো ঠেক্‌ল অন্ধকার
মুদে এল আপনি দুনয়ন,
অস্থিগুল কাঁপিয়ে দিল কি যে ভীষণ দারুণ শিহরণ!
পায়ের তলে ধরণী মোর উঠ্‌ল ঘুরে দুলে
দেখি নয়ন তুলে
নারী এবার মহানন্দে ছুট্‌ছে পথের 'পরে
হাসির ধ্বনি কাঁপ্‌ছে শুধু হাওয়ার স্তরে স্তরে।

প্রাচীন ভারতে সমাধি প্রথার অকাট্য প্রমাণ।*

একটা তুচ্ছ Aeroplane গড়ের মাঠে কাৎ হইয়া পড়িল, আর তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড় জমিয়া গেল। পুলিশ পাহাড়া, বেত, বাত, ও রসারসির কসুর ছিল না। তথাপি দর্শকের অভাব হয় নাই

*প্রতিবাদ সাদরে গৃহীত হইবে। লেখক।

যেন উহা একটা অপূর্ব্ব বস্তু! কেন হে বাপু, এত আগ্রহ কিসের? আমাদের দেশে কি Aeroplane ছিল না? ছিল না ত পুষ্পক-রথটা কি? 'মেঘনাদ মেঘের ভিতর হইতে অস্ত্রানিক্ষেপ করিতে লাগিলেন' ইহা কি একটা গাঁজাখুরি? মেঘনাদ জর্ম্মানদেশীয় ছিলেন না বলিয়াই কি এ কথা অবিশ্বাস করিতে হইবে? শুনিতে পাই দেবগণ বিমানপথে বিহার করিতেন। মাধ্যাকর্ষণ যাঁহাদের আবিষ্কার, সেই আর্যঋষিগণের কি একটুকু ধারণা ছিল না যে বিমানে নিরলম্ব হইয়া বিহার করা অসম্ভব? তবে তাঁহারা এমন কথা বলিলেন কেন? নিশ্চয়ই বিমানযানারোহী দেবগণের সম্বন্ধে একথা বলিয়াছেন। সেকালে বিমানযানের এত বেশী প্রচলন ছিল যে বিমান-বিহার বলিতে যানের উল্লেখ করিতে হইত না। আমরা যখন বলি "তিনি জলপথে যাত্রা করিলেন।" তখন কি কেহ মনে করেন 'তিনি জলের উপর' দিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন'? এও সেইরূপ। অতএব দেখা গেল Aeroplane একটা নূতন কিছু নহে। আমাদের দেশে একালের অপেক্ষা ভাল ভাল Aeroplane ছিল, অজস্র। শুধু Aeroplane কেন, সেকালে এদেশে সবই ছিল। এপর্য্যন্ত নূতন কিছুই হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না।

ইহাই যখন স্থির হইল, তখন বুঝা যাইতেছে সেকালে গোর দিবার ব্যবস্থাও ছিল। মৃতদেহ সৎকারের শ্রেষ্ঠ উপায় যে গোর দেওয়া, বা ইহাই যে সভ্যতার একটী লক্ষণ, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যখন দেখিতেছি বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় উক্ত প্রথা প্রচলিত তখন তাহা নিশ্চয় ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।

সকলই জানেন মৃত দেহের অগ্নি সংস্কারের বিধি বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। আমরা শবদাহ করিয়া তাহার অগ্নিসংস্কার করি, এবং এইরূপে ঋষিগণের আদেশ পালন করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হই। এরূপ ভাবিবার কারণ আমরা অগ্নি বলিতে আগুনকেই বুঝি। একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, আমাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। ঋষিগণ কখনও আগুনের প্রতিশব্দরূপে অগ্নিশব্দ ব্যবহার করেন নাই। প্রথমতঃ আমরা জানি রাম লক্ষ্মণ ও তদীয় ভক্তবৃন্দের সমক্ষে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন—আপনার নিষ্কলুষিতা প্রমাণ করিবার জন্য! ইহাঁরা কি উন্মাদ ছিলেন যে তাঁহাকে আগুনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট রহিলেন? অগ্নি যদি আগুন হইত তাহা হইলে সীতা কি অক্ষত শরীরে বাহির হইবার আশা করিতে পারিতেন? কখনই না। দ্বিতীয়তঃ—ঋষিগণ অগ্নির পূজা করিতেন। আগুনের পূজা অসম্ভব, কারণ আগুন জড়। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাগণ জড়ের উপাসনা করিতেন একথা অশ্রদ্ধেয়। আগুন ঋষিদিগের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবে কিরূপে? যাঁহা হইতে অপকারের সম্ভাবনা আছে তাঁহাকেই আমরা ভক্তি করি, তাঁহার কাছেই আমাদের যত নতিস্তুতি। আগুন ঋষিদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারিত না, কারণ তাঁহাদের আটচালাও ছিল না, পাটের গোলাও ছিল না। তাঁহারা ছিলেন হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বনবাসী! আগুন ইহাঁদের অনেক উপকারেই আসিত! যিনি উপকার করেন, তাঁহাকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, যদি উপকার আশানুরূপ হয়, আর না হইলে গালি দিয়া থাকি; কিন্তু পূজা করি না, একমাত্র যিনি অপকার করিতে পারেন তাহারই পূজা করিয়া থাকি। আমরা শীতলার পূজা করি, ঈশ্বরের পূজা করি না। আমরা কালীর পূজায় যত জাগ্রত, ভদ্রকালীর পূজায় তত নহি। হরিচাড়ুজ্জের পায়ে মাথা লুটাইয়া দিই কারণ ইনি রুষ্ট হইলে আমার বংশলোপের সম্ভাবনা, কৃষ্ণদাস পালকে কিন্তু বসিতে আসন দিই না। সার্জ্জিনের জ্বর তিনদিনে আরোগ্য করিতে না পারিলে চিকিৎসকের বাপান্ত করি, কিন্তু পূজা করি নারেবের।

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় অগ্নি ও আগুন এক পদার্থ নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন নহে আরসুলা। আরসুলা আগুনের মতই রক্তবর্ণ কিন্তু আগুনের মত জড় নহেন। ইনি চেতন। ইহাঁর পূজায় মহামহোর্মির মানহানি হয় না। ইনি শিখী, ইহাঁর মস্তকে নিয়ত চঞ্চল দুই দুইটী শিখা কখনও দক্ষিণাবর্ত্তে, কখনও বামাবর্ত্তে ঘুরিতেছে। ইনি হর্ব্বিই,—সুবিধা পাইলে হবিঃ বহন করিতে ইনি কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। ইনি সর্ব্বভুক্,—ইহাঁর অখাদ্য ত কিছু দেখিলাম না; উৎকৃষ্ট মোহনভোগ হইতে নিকৃষ্ট জুতার কালী ও পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইহাঁর সমান রুচি; বইএর মলাটই বল আর সাটের প্লেটই বল, ইহাঁর দন্তখণ্ড হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ইনি দেবতা, কারণ ইনি দীপ্যতি; এমন দীপ্তি ত কাহারও দেখি নাই। ইনি বায়ুসখ,—বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণে ক্ষণে শূন্যমার্গে বিহার করিতে থাকেন। কথায় কথায় উর্দ্ধে উঠিয়া ফুর্ ফুর্ করেন বলিয়া ইনি উর্দ্ধস্ফুরণ। শুধু উর্দ্ধে কেন? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ইহাঁর অবাধ গতি; চৌবাচ্ছার জলে ইনি, চায়ের কেট্‌লিতে ইনি, গরম মসলার ভাণ্ডে ইনি, পালং শাক চড়্‌চড়িতে ইনি, পেটকনিবদ্ধ শালের স্তরে স্তরে ইহাঁর অস্তিত্বের অক্ষয়নিদর্শন মুদ্রিত দেখিতে পাই। দেবতা না হইলে এত শক্তি ইনি কোথা হইতে পাইলেন?

একদিন উনপঞ্চাশৎ পবনধূনিত চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাবলী সাগরগর্ভে বারিবিম্ববৎ অনন্তে বিলীন ছিল। সেই মহাপ্রলয়ের মহাশূন্যতার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল এক বিরাট সমুদ্র, একটী শেষ সর্প, তদুপরি চিরশয়ান নারায়ণ, তাঁহার নাভিপদ্মনিষণ্ণ ব্রহ্মা, তদ্রচিত বেদ ও সেই বেদের মধ্যে এই আরসুথা। ব্রহ্মা প্রুফ সংশোধনমানসে পুঁথি খুলিতেই ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করিলেন। পরম বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিলেন 'এ অপূর্ব্ব পক্ষী কোথা হইতে আসিল? ইহা ত আমার সৃষ্ট নহে, সৃজ্যমান্ বিশ্বের কল্পনা ছবি এখনও আমার মনোবিন্দুতে মুদ্রিত হয় নাই। ইহা নিশ্চয় বেদ হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি চীৎকার করিলেন "অয়ং জাতো বেদাৎ।" উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতসংযোগে সমুচ্চারিত সেই মহাবাণী অনন্ত বায়ুসমূহ মথিত করিয়া, দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইতে হইতে একদিন মর্ত্ত্যবাসী ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দেশকালের বিপুল ব্যবধানবশতঃ একটু বিকৃত হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। শিষ্যেরা শুনিলেন 'অয়ং জাতবেদা।" সেই অবধি আরসুলার নাম হইল জাতবেদা। সেই অবধি দেশে দেশে, দিকে দিকে, আরসুলার পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। পাষাণ প্রাসাদ হইতে জীর্ণ পর্ণশালা পর্য্যন্ত বিবিধোপচারতুষ্ট আরসুলায় ভরিয়া গেল। আরসুলার প্রভায় সমস্ত ভারতের মানচিত্র রক্তাভ হইয়া উঠিল।

"পুরাকালে অগ্নি সংযোগে মৃত দেহের সংস্কার করা হইত' বলিলে বুঝিতে হইবে "মৃত দেহকে আরসুলা সহযোগে সংস্কৃত করা হইত।' এই আরসুলা সহযোগ ঘটিত কিরূপে! সকলেই জানেন আরসুলার প্রিয় বাসস্থান বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি। শবকে বাক্সে বন্ধ করিয়াই যে তাহার অগ্নি সংযোগ বা আরসুলা সংযোগ করা হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বাক্স অবশ্য Coffinএর রূপান্তর। Coffinএ বন্ধ করা হইত এটাই যখন মানিলাম তখন সেই Coffinকে ভূগর্ভে নিহিত করা হইত এ টুকুই বা মানিব না কেন? ভূগর্ভে নিহিত না হইলে সে সকল Coffiin গেল কোথায়? পৃথিবীর উপরে রক্ষিত হইলে ত হিন্দুস্থান এতদিনে Coffin এই ভরিয়া উঠিত। অতএব স্থির হইল প্রাচীন ভারতে মৃত দেহকে Coffinএ বন্ধ করিয়া ইউরোপীয় প্রথায় গোর দেওয়া হইত।

এত গেল মৃত দেহের কথা। সে কালে অনেকে জীবদ্দশায় আরসুলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মসংস্কার করিতেন। তন্মধ্যে জানকীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যিনি আরসুলাকুলিত কক্ষে, অনাবৃত দেহে এক রাত্রিও যাপন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন জানকীর এ অগ্নি-পরীক্ষা কি কঠোর !

তীর্থ সলিল।

—ঃ*ঃ—

কবে শুনেছিনু গান করুণ মধুর
ভাষা তার মনে নাই, শুধু সেই সুর
বাজিতেছে চিত্ত মাঝে ; একটী চরণ
হৃদয়ের তালে তালে করিছে নর্ত্তন ;
সতত শুনি কে গায় আকাশে অনিলে
'ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে''

* * * *

হে দেবতা, এসেছিনু এ ভুবন পরে
তব অভিষেক বারি সংগ্রহের তরে।
জানি যে গো এ হৃদয় সিংহাসনে মম
বরিয়া লইতে হবে, ওগো অনুপম,
তোমারি মূরতি খানি ; জানি তারি লাগি
ফিরিতেছি শত তীর্থে পূত করি মাগি ;
"ভরে নিতে হবে মোর হৃদি কুম্ভ খানি
রূপ-রস-গন্ধ-গীত বারি ধারা আনি।
তুমি জান হৃদি কুম্ভ ভরিবার তরে
ফিরিআছি কিনা শত লোক লোকান্তরে ;

দিবস নিশীথ, আলো ছায়া, হর্ষ ভয়
সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু শত রূপময়
চঞ্চল সুন্দর তব ধরণীর মাঝে
তুমি জান ফিরিতেছি সদা কোন কাজে।

*　　*　　*　　*

অন্তর নয়ন মেলি প্রথম যে দিন
চেয়েছিনু ধরা পানে মধুর নবীন,
পরিপূর্ণ প্রাণখানি অসীম আশ্বাসে
উথলি উঠিল মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
সে শৈশব তীর্থে প্রভু মনে পড়ে আজ
দেখেছিনু সে কি রূপ তব রাজ রাজ
পরিপূর্ণ বিশ্বখানি আলোকে সৌরভে,
পরিপূর্ণ চিত্তাকাশ কি সঙ্গীত রবে!
মনে হত সুখ অতি সহজ সুলভ,
পেয়েছি যে এ ভুবনে কি মহা গৌরব!
এ বিপুল বিশ্ব তব ছিল মোর প্রভু
সাধের খেলার ঘর; কারো কাছে কভু
ছিল না সঙ্কোচ ভয়, সবাই আমার
নিতান্ত প্রাণের ধন; আমি সবাকার।
আকাশ বাতাস আলো স্নেহে সখা সম
ঘিরে রেখেছিল মুগ্ধ দেহমন মম।
অযাচিত এত সুধা ভ'রেছিল মন
চাহিতে বাসনা তাই হয়নি কখন।
তরুণ জীবনখানি শুধু পদ তলে
মুক্ত করি,' রিক্ত করি,' রেখেছিনু মেলে।

সৃজন গঙ্গোত্রী হ'তে আনন্দ তরল
শ্রীচরণ ধৌত করি ঝরে অবিরল,—
তারি বিন্দু বিন্দু দিয়ে দিতেছিলে ভ'রে
এ জীবন-পাত্রখানি নিজ হাতে ধ'রে।
তরুণ সে আনন্দের কোলাহল হ'তে
অসীম অতৃপ্তি ভরি' ল'য়ে হৃদয়েতে,
গম্ভীর উদাস প্রাণ দাঁড়াইনু আসি
এ কোথায়! চারিধারে একি মৌন হাসি!
মনে হয় ফিরে যাই পরিচিত ঘরে,
কিন্তু কে ডাকিছে কোথা অসীমের পারে!
কি ভাষা উঠিছে ফুটি নয়ন উপরে,
কি সঙ্গীত অজানিত ঝরিছে অম্বরে!
সৃষ্টি শতদলে বসি' কে হাসিছে হাসি,
বিশ্ব অন্তরাল হ'তে কে বাজায় বাঁশী!
সে হাসি, সে বাঁশী মিলি সৃজন লহরী
অসীম চ'লেছে রচি। নিশি দিন ফিরি
যেন তারি পাছে আমি; কে বলিবে হায়
সে হাসি সে বাঁশীখানি কোথা দেখা যায়!
জানি না কি চাই আমি, খুঁজে ফিরি কারে
নিদ্রাহীন, জগতের বাহিরে, মাঝারে।
বিশাল সংসার তটে, বিজনে গোপনে
ব'সে থাকি একা; মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে
কি দুরাশা, কি পিপাসা, দেখেছিলে প্রভু,
সে রহস্য সমাধান করিবে কে কভু?
সে কৈশোর তীর্থ মাঝে দাঁড়ায়ে না জানি
কি রহস্য রসপূর্ণ হৃদি কুম্ভখানি।

তার পরে আনিলে এ মোরে কোন লোকে,
ডুবে গেল সব চিন্তা অসীম পুলকে।
কুহেলিকা নয়নের ছিন্ন করি' মম
কে আসিল প্রভাতের নব রবি সম
অসীম রহস্য মাঝে পথ করি' ধীরে
লয়ে চলে মোরে কোন অমৃতের তীরে।
সুমধুর সুমধুর সে রহস্য মাঝে
সুধীরে ডুবিল প্রাণ। কি যে গীত বাজে
আনন্দ মুর্চ্ছনাময় ঐই বিশ্ব তারে,
হৃদি তন্ত্রী সেই সাথে নিয়ত ঝঙ্কারে।
কি আনন্দ বেদনা সে। ধরি হাতে হাতে
চলিতে এ জগতের সীমাহীন পথে!
নবীন মাধুরী দেখি চারিধারে কিবা
বর্ণগন্ধগীতময়! কি মহিমা বিভা
ফুটে ওঠে থরে থরে অন্তর নয়নে,
দোঁহার হৃদয় দিয়ে বুঝি দুই জনে
কি আনন্দ বেদনা সে শুনি থেকে থেকে
দোঁহার হৃদয় ভাষা বুকে বুক রেখে।
আর,—দুই জীবনের তুমি কর্ণধার
একই তরণী পরে; এই পারাবার
প্রশান্ত চরণ স্পর্শে। দুটী হৃদি তারে
একই সুর বাজে তব অঙ্গুলি ঝঙ্কারে।
সেই সে যৌবন তীর্থে জীবন আমার
প্রেমানন্দ রস পূর্ণ সম্পূর্ণ আবার

* * * *

একি লীলা পুনঃ তব! সংসারে তোমার
জীবনান্ত ছবি কি একাকী আবার?
এ ভুবন যাত্রা মোর অবসান হ'লে,
মরণ সঙ্গীত তব গাহিবার কালে

না যদি ঝঙ্কারে প্রভু আনন্দের তার
দাসীরে ক্ষমিয়ো তবে ; জীবন আমার
চূর্ণ যে ক'রেছ প্রভু আপনার হাতে
আনন্দের তারখানি ছিন্ন সেই সাথে।
ভাল লাগিল না নাথ এক হাসি গান,
এ তীব্র অনলে তাই দহিল পরাণ ?
কত সাধে ভরা মোর হৃদি কুম্ভখানি
নিমেষে শুখায়ে গেল কখন না জানি !
আবার ঘুরিতে হবে যুগ যুগান্তর,
ভরিয়া তুলিতে হবে শূন্য এ অন্তর ?

* * * *

আমায় ক্ষমিয়ো তবে, আসিবে যখন
অভিষেক বারি তব করিতে গ্রহণ,
শত বর্ণে ঝলসিত উছলিত বারি—
পাদমূলে প্রভু যদি না ঢালিতে পারি,
ছিন্ন হৃদি গাহে যদি নমি পদতলে
"ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে"।

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী।

বিচিত্র—সংগ্রহ।

কাপ্তেন ওয়েবার যখন ভারতবর্ষে সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন তখনই তাঁর দুইটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। সেই অবধি তিনি বিলাতে গিয়ে মুরগীর ব্যবসা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি গিয়ে পর্য্যন্ত স্পর্শেন্দ্রিয় বড় আশ্চর্য্য রকম প্রখর হয়ে উঠেছে। ঐ শক্তির সাহায্যে তিনি কোনও একটি মুরগীর গা ছুঁয়ে বলতে পারেন সেটি কোন্ জাত, কত বয়সের, কেমন তার ডিম হবে, সে ডিমগুলিই বা কত বড় হবে। আবার ডিমের উপর ওষ্ঠ ছুঁইয়ে তিনি বলে দিতে পারেন ডিমটি কত দিনের। এখন আবার তাঁর এ শক্তিও হয়েছে যে তিনি কোন জায়গায় গিয়েই বলে দিতে পারেন সে জায়গায় মুরগী পোষা যাবে কি না। শক্তির সাধনাই শক্তিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

* * * *

অনেক লোকের মনে অনেক রকম বাতিক দেখা যায়, কেউ বা পুরাণ মুদ্রা, কেউ বা নানা দেশের ছবি আবার কেউ বা নানা দেশের ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করে। পরলোকগত ট্যাপলিং সাহেব বিলাতের "ব্রিটিশ মিউজিয়মে" এমনি একটি ষ্ট্যাম্পের বই উপহার দিয়াছেন, এরকম দামী সংগ্রহের বই পৃথিবীতে বোধ হয় অল্পই আছে। বইখানির দাম পনেরো লক্ষ টাকা!

* * * *

প্যারী সহরে যতগুলি সমিতি আছে তার মাঝে একটির নাম "মেটার আড্ডা।" রোগা পট্‌কে লোকেরা এ সমিতির সভ্য হতে পায় না, এখানে সকলেই মোটা। এ মোটাদের আবার ছাড়িয়ে উঠেছে একজন সেরা মোটা, তার ওজন কত জানেন? চার মণ আট সের! মোটা বটে!!

* * * *

এ পৃথিবীটা একটা চিড়িয়াখানা, এখানে যেমন নানা রকম জীব জানোয়ার আছে তেমনি আবার হরেক রকম মানুষ; আবার রকম বেরকম রীতিনীতি! আমাদের যেমন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে নমস্কার করে বলি "কেমন আছেন?" তেমনি আবার আরব দেশের লোকেদের সাক্ষাৎ হলে তারা পরস্পরের গালে গালে ঘসে নমস্কারের অভাব মেটায়। মগেরা আবার মুখ শুঁকে বলে "বাঃ বাঃ খাসা গন্ধ ত!" অষ্ট্রেলিয়ায় আবার কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা জিভে জিভ ঠেকায়। জাপানীরা তার চেয়ে কিছু মজা তারা জুতা খুলে বুকের উপরে ক্রুশের মত হাত রেখে বলেন "দাসকে দয়া করবেন!" সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অভিবাদনের নিয়ম কিন্তু সব চেয়ে ভাল, তারা অভ্যাগতদের মাথায় জল ঢেলে দেয়!

* * * *

আমরা অনেক ঘোড়ার কথা শুনেছি খুব দামী কিন্তু গরুর দাম খুব বেশী শুনি নি। একটি বড় আশ্চর্য্য খবর পাওয়া গেছে যে বিলাতে কার্ডিফের একটি প্রদর্শনীতে মিঃ এ জে মার্শাল নামে একজন গাভী ব্যবসায়ী একটি গরু বিক্রী করেছেন—এক লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শো টাকায়, অবাক কাণ্ড!

* * * *

রেশমের ব্যবসায় জাপানী কারিগররা প্রায় রোজ সারে পাঁচ আনা থেকে এগারো আনা পর্য্যন্ত মজুরী পায়। ইংলণ্ডে ঐ সব কারিগররা ঘণ্টার এক টাকা দুই আনা থেকে এক টাকা পাঁচ আনা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে আবার তারা সংখ্যায়ও বড় কম নয়। ইংলণ্ডে শুধু রেশম-ব্যবসায়ী লোক আছে ত্রিশ হাজার!

* * * *

কোন নূতন ভাল বই লেখা হলেই দেখা যায় ২।৩টি ভাষায় তার তর্জ্জমা হয় কিন্তু বাইবেলের মতন কোন বইই নয়। 'দি বৃটিশ অ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি' থেকে ৩৭০ রকম ভাষায় বাইবেলের কিম্বা তার কোন কোন অংশের তর্জ্জমা প্রকাশ করা হয়েছে! আর গত কয় বৎসর যুদ্ধের সময়ে কত বাইবেল প্রচারিত হয়েছে জানেন? ৯০০০০০০!!

* * * *

অনেক ভাল লেখকের কথা শোনা যায় তাঁরা অনেক বই লিখে তার আয়ে স্বচ্ছল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু একটি বড় আশ্চর্য্য খবর পাওয়া গেছে, মিস হেলেন মাদাস তাঁর বাইশ বছর বয়সে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন তার নাম "Com'in thro, the Rye" তখন তিনি এই বই বিক্রীর অর্থ থেকে কমিশন না নিয়ে ৪৫০৲ টাকায় গ্রন্থ-স্বত্ব ছেড়ে দেন। তারপর এই চল্লিশ বৎসর কেটে গেছে এখন পর্য্যন্ত বইটির কাট্‌তি সমান চলেছে। এই চল্লিশ বছরে বইখানির ৫৩ সংস্করণ বাহির হয়েছে আর এখন তিনি হিসাব করে দেখেছেন ঐ ৪৫০ টাকার লোভ সাম্‌লাতে পারলে আজ তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকার মালিক হতেন! 'সবুরে মেওয়া ফলে' কথাটি মিথ্যা নয়!

* * * *

যখন বাজারের সব জিনিষ উচিত মূল্যে পাওয়া যেত সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেও আমেরিকায় কনের পোষাকের দাম খুব কম করেও ৪৫০৲ টাকা লাগ্‌ত। সে সময়েও একটি কনের পোষাকে পঁচিশ হাজার একশো চল্লিশ টাকা লেগেছিল; পোষাকটি নাকি খুব সূক্ষ্ম রেশমে তৈরী আর খুব দামী মণি-মুক্তায় খচিত ছিল। ঘাগরাটি বুটিদার, লেসও চমৎকার। এই পোষাকেই দাম পড়েছিল সাড়ে সতেরো হাজার টাকা, হাতে বোনা রেশমী মোজায় লেগেছিল এক শো পাঁচ টাকা, জুতায় লেগেছিল দুশো পঁচিশ টাকা, আংরাখায় সাড়ে সাত শো টাকা আর লেসের রুমালে দেড়শো টাকা! চুল বাঁধা, নখ কাটা ইত্যাদির খরচ তবু ঐ সঙ্গে ধরা হয় নি!

থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপের পাত্রপাত্রীদের কাঁদতে দেখে অনেক সময়ে দর্শকদের কাঁদতে দেখা যায় কিন্তু সকলেই জানেন ঐ সব অভিনেত্রীরা সত্য কাঁদে না, অভিনয় করে মাত্র! কিন্তু বায়স্কোপের বিখ্যাত অভিনেত্রী মে মারে একবার একটি নাট্য চিত্রে এক মরণোন্মুখ স্বামীর সহধর্ম্মিণী সেজে শোকাভিভূত হয়ে কেঁদেছিলেন কিন্তু তাঁর ঐ শোকের অভিনয়টা এমনি সত্যি হয়ে উঠেছিল যে অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পরও আধঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর অশান্ত কান্নাকে কিছুতে থামাতে পারেন নি! তিনি নিজে অবিবাহিতা আর স্বামীকে তিনি স্বপ্নেও দেখেন নি তবু তাঁর অভিনয়টা এমনি বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

অনুতাপ।

(বাইবেলের ছায়া)

আমি অভাগিনী জাগিনী কেন?
তাই তো দুখের ভাগিনী হেন!
হৃদয় আমার আছিল জাগি,
সারাটী রজনী কিসের লাগি!
গভীর নিশীথে আসিলে বঁধু
ডাকিল—"উঠ গো প্রেয়সী বধূ!
ওগো ওগো প্রিয়া ও কপোতিনী,
পূত পবিত্রা তুষার জিনি,
তুষার আসারে ভিজিয়া মরি,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুয়ার ধরি,
খোলো গো দুয়ার—খালি এ গা,
মাতিয়া আসছে তীখিন বা—"
হায় সে বঁধুর কাতর বাণী
—ধিক্ এ জীবনে—কিছু না জানি!
আছিনু কি কাল-স্বপনে ভোর!
শুনেছিল সব হৃদয় মোর।
বঁধূ সে যখন গিয়াছে চলি
চির দুখিনীরে কেন যে ছলি,
হা হত হৃদয়। তখনি তুই
উঠিলি কাঁপিয়া—নিমেষ দুই
আগে কেন মোরে দিলি না সাড়া—
বুকের মাঝারে দিলি না নাড়া!—

উঠিলি কাঁপিয়া—আমিও কাঁপি
উঠিনু—বাসনু—দাঁড়ানু—ঝাঁপি
শিথিল বসন বুকের পরে!
আঁধারে কেহই নাহিক ঘরে;
কেবল সখার কথার রেশ
কাঁপিয়া কাঁপিয়া হইয়া শেষ
মিলাল আকুল বায়ুর সনে!
কোথায় সে কোন গহন বনে
মিলাল বঁধুয়া ব্যাকুল মনে!
কোথা গেলে পাব হৃদয়-ধনে?
এই যে সাধের অগুরু চুয়া,
এই মৃগমদ সুরভি গুয়া।
এই যে এখনো রয়েছে হাতে!
হায় রে বজর পড়ুক মাথে!
হারানু হাতের পরশমণি,
কোথা পাব সেই গুণের খনি!
তখনি আসিনু বাহিরে ছুটি,
নিবিড় আঁধারে নয়ন দুটী
পাইবে কাহারে? আঁধার স্তূপ
কি ঘন কি ঘোর! হৃদয়-ভূপ
কোথারে কোথারে! ডাকিনু কত
বুকফাটা ডাক—বিহগ যত

শাখায় বসিয়া আছিল যব
উড়িয়া পলাল শুনি সে রব।
হৃদয়-বঁধু তো এলো না আর !
কোথা গেল কোন্ পাহাড়-পার ?
পথে পথে কত খুঁজিনু বৃথা ;
পাইনু কি দুখ কহিব কি তা !
পাহাড়া দেয় সে নিঠুর-মতি,
রোধিল তাহারা আমার গতি ;
কত অপমান হৃদয়-হীন;
অঙ্গে অঙ্গে শোণিত-চিন্।
অবগুণ্ঠন লইল খুলি,—
বঁধুর লাগিয়া সকলি ভুলি।
বঁধুর বিরহ শেলের ঘায়
জ্বলিছে হৃদয়—আঘাত গায়
তুচ্ছ গণিয়া চলিনু ধাই'
কাহারে পুছিব—কাহারে পাই ?
পল্লী-রমণী জাগিয়া যারা
কহিনু তাদের—নয়নে ধারা—
"তোরা কি জানিস্—তোরা কি বোন্,
দেখেছিস্ তারে—এ পোড়া মন
জুড়া জুড়া দিদি, সখার কথা
বল্ বল্ ত্বরা—সে মোর কোথা ?"
কহিল না তারা—কহিল শুধু
"কিবা সে এমন তোমার বঁধু !
তেমন কি আর নাহিক কারু ?
তুমি তো রূপসী—মধুর চারু
মু'খানি তোমার—তোমার পিয়া
কি আর এমন ?—পাগল হিয়া
তারি তরে ছি ছি !"—কহিনু আমি
আমার সে সখা—হৃদয়-স্বামী,
কোথা পাব হায় ! তুলনা তার ?
তুল' না তুল' না সে কথা আর !—

কিংশুক উপমা অধর-পুট ;
বরণ সুদূর গিরির কূট ;
বকের বলাকা গলার মালা ;
বসন অরুণ কিরণ—জ্বালা ;
নট খঞ্জন নয়ন জোর,—
রসের আবেশে অবশ ভোর ;
গোছে গোছে গোছে অলকাবলি,—
সারি সারি সারি লুটিছে অলি।
কুসুমে গন্ধিত কপোল-দ্বয়,
সৌরভে তারা পাগল হয় !
শুক্তি—রক্ত সে করতল,
কোমল যেন সে কুসুম-দল ;—
অশেষ অসীম সুষমা তার,
জগতে আছে কি উপমা তার !
কেমনে তোদের বুঝাব দিদি,
সে যে লো সাগর তলের নিধি !
যাই—যাই—দিদি, সময় যায়,
বনে বনে আজি খুঁজিব তায়।
পাহাড়ে পাহাড়ে, হ্রদের ধারে,
ঝরণার তটে তটিনী পারে।
যতদিন তার না পাই দেখা,
দিবানিশি তারে খুঁজিব একা।
অই যে এখনো রজনী আছে !
আছে কি বঁধুয়া কোথাও কাছে ?
উহু রে পরাণ ফাটিয়া যায় !
বেদনায় বুক ফাটিয়া যায় !
অন্তর যে রে যাইছে ছিঁড়ি—
অপমানে বঁধু গিয়াছে ফিরি !
এ ঘোর আঁধার শীতের রাতি,
হায় রে কেহ তো ছিল না সাথী !
হায় রে আর কি মিলাবে বিধি ?—
আর কি জুড়াবে দগধ হৃদি ?

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

প্রানবতা

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৩য় বর্ষ। | কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

দিন যায়, যাক্ দিন চলে।

দিন যায়, যাক্ দিন চলে'
সে কি নিয়ে যেতে পারে আমার আঁচলে
যে ফুল ঘুমায়,
যার সুরভিতে মোর চারিভিতে
নন্দন রচিত হয় নব সুষমায়!

দিন যায়, যাক্ দিন চলে',
সে কি নিয়ে যেতে পারে, কভু কোন ছলে
আমার স্বপনে,
যে আলোক জাগে,
যার অনুরাগে
দু'বেলা অতিথি কত আসে মোর মনে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রামমোহন-স্মৃতিসভা।

স্থান,—রাঁচি ব্রহ্মমন্দির।

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে মহাত্মার স্মরণার্থে আমরা অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি তিনি এই দিবসে ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। জিলা কৃষ্ণনগর, রাধানগর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—আর ব্রিষ্টল নগরে ইহলোক হতে অপসৃত হন। এ দেশে জন্ম, বিদেশে মৃত্যু—এথেকে কি প্রমাণ হচ্ছে এই যে তিনি শুধু এদেশের নন পূর্ব্ব পশ্চিম দুদেশের মানুষ। প্রকৃত পক্ষে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যের বন্ধনী। বাঙ্গলা দেশ তাঁর জন্মভূমি মনে করে' যেমন আমরা তাঁকে আপনার বলে' গ্রহণ করি, তেমনি ইংলণ্ডে তাঁর দেহ প্রোথিত—তাঁর সমাধি মন্দির স্থাপিত হয়েছে, এই কারণে ইংলণ্ডবাসীও তাঁকে আপন অন্তরঙ্গরূপে বরণ করতে পারেন—এবং তাই করেও ছিলেন। কারণ তাঁর শেষ বয়সে যে কতিপয় মাস তিনি য়ুরোপ প্রবাসে যাপন করেছিলেন তাঁর বিবরণ পাঠ করলে মনে হয় যেন তিনি বিদেশীয়দের মধ্যে নয় কিন্তু স্বদেশে, নিজগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে আপনার লোকের মধ্যেই বাস করেছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায় শুধু এদেশের নন—বিশ্বভুবনগামী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি যেরূপ বিশ্বজনীন উদার হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তাতে তাঁকে একদেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা ঠিক হয় না। তিনি শুধু বঙ্গদেশের নন, ভারতবর্ষের নন কিন্তু বিশ্বজগতের অন্তরঙ্গ। আমাদের শাস্ত্রে এই যে মহাবাক্য প্রচারিত হয়েছে—

অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই বাক্য বিশেষরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদের দেশের জন্য কি কি কাজ করে গিয়েছেন—আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ কোন্ বিভাগে তিনি স্বনাম অঙ্কিত করেছেন আজ তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই—সময়ও নাই। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আপনারা অল্পবিস্তর সকলেই অবগত আছেন; কি শিক্ষা, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজসংস্কার কি ধর্ম্ম সংস্কার,—ভারতের সকল উন্নতির মূলেই রাজার হস্ত কার্য্য করিয়াছে। সুবিখ্যাত স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নব্য ভারতের অভ্যুদয়কে রামমোহন রায় যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সে কথা যথার্থ। তিনি যেমন প্রাচ্য প্রতীচ্যের বন্ধনী তেমনি সেকাল আর একালের সন্ধিস্থল।

এই মহাপুরুষের স্মৃতিসভায় আজ আমরা সমবেত হয়েছি—কিরূপে আমরা তাঁর স্মৃতি রক্ষা করিতে পারি? মহাপুরুষের মৃত্যু নেই। তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈলচিত্র বা মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন আবশ্যক করে না। তাঁদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণেই তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষিত হয়। বুদ্ধদেব তাঁর পরিনির্ব্বাণ কালে তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে যে কয়েকটি অমূল্য কথায় উপদেশ দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধদেবের

মৃত্যুশয্যায় তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ শোকবিহ্বল হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"গুরুদেব আপনি আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন আমাদের গতি কি হইবে ?"

বুদ্ধদেব বলিলেন —

"তাই আনন্দ আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না. দেখ আমি আত্মনির্ভরে চলিয়া যাইতেছি--তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার গুণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপন নির্ভরযষ্টি। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিও না।"

এই সকল মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তে আমরাও যেন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি। তাঁরা কালের সাগর তটে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন সেই সকল চিহ্ন হীনবীর্য্য ভগ্নতরি জনের একমাত্র অবলম্বন। আমরা যদি সংসারের অশেষ প্রলোভনে ধর্ম্মপথ হতে ভ্রষ্ট হই -লোকভয়ে কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হই—সেই পদাঙ্ক দেখে আমরা নূতন বল লাভ করব—নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হব—আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চার হবে।

আমি আর অধিক সময় নষ্ট করতে চাই না—অন্যান্য অনেক সুবক্তা উপস্থিত আছেন—এই প্রসঙ্গে কবি Longfellowর জীবনসঙ্গীতের কয়েকটী শেষচরণ আবৃত্তি করে এইখানে শেষ করি—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sbblime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time ;"

"Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again."

"Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate,
Still achieving, Still persuing,
Learn to labour and to wait."

রাজা রামমোহন রায়।

—:*:—

বক্তা—ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু।

৮৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশবাসী যে মহাপুরুষ স্বদেশের হিতব্রতে প্রবাসে গমন করিয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজার জন্য আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আমরা এই সভাগৃহে সমাগত হইয়াছি।

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের পূজা প্রচলিত আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ মানসচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই পথে অগ্রসর হইতে শক্তিলাভ করিবার জন্য, আমরা মহাপুরুষদিগের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। যখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-তরী এই অকূল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে দিশাহারা হইয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়, তখন মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন স্নিগ্ধজ্যোতি ধ্রুবতারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সেই পথভ্রান্ত তরণীকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বনীয়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Longfellow লিখিয়াছেন :—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন আমাদিগের জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার প্রধান সহায়। মহাপুরুষেরা জগতের গুরু—তাঁহাদের আগমনে জগতে সত্যের আলোক প্রকাশিত হয়। সেই আলোকের সাহায্যে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বিপথগামী মানব, সত্যের পথ, কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইয়া সেই দিকে জীবনের গতি ফিরাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং কেবল যে মহাপুরুষদিগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহা নহে; আমাদের আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগের স্মৃতি-পূজার আয়োজন অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশ ধন্য হইয়াছে; যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি ধন্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে এই বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি আজীবন সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, তিনি যেসকল বিশ্বজনীন উদারমতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণপ্রদ। জগতের যে কোন মনুষ্য তাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, চিরদিন শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে। এই জন্য তিনি বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী হইলেও, সমগ্র বিশ্ববাসীর আপনার-লোক ছিলেন—বঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি হইলেও আসমুদ্র পৃথিবীই তাঁহার

প্রকৃত জন্মভূমি। তাঁহার ধর্ম্মমত এমনই উদার ছিল যে তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল; অথচ তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের সহিত নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মের ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত—একেশ্বর-বাদ—অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। জগতে অতি অল্পলোকই এরূপ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই প্রতিভাবলেই তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তিনি মূল ভাষায় রচিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলে যীশুতে ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয় নাই, ত্রীশ্বর বাদের (Doctrine of Trinity) উল্লেখ তন্মধ্যে নাই এবং খ্রীষ্টের রক্তে মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইবে, এরূপ মতের প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের এই সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য মার্সমান্ প্রমুখ তৎকালীন মিসনরীদিগের সহিত তাঁহার বহু তর্ক ও বিচার হইয়াছিল। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম যে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মিসনরীদিগের সহিত বিচার করিয়া অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে দুই একজন মিসনরী ত্রয়ীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ (Unitarianism গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তথায় মহম্মদের পয়গম্বরত্বের কোথাও উল্লেখ নাই—কেবল একমাত্র একেশ্বরবাদই কোরাণে সমর্থিত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদ্ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে সেই সকল গ্রন্থে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা যে উপাসনার নিকৃষ্ট পদ্ধতি, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না; তিনি যাবতীয় মলিনতা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে সার পদার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমি নিজে হিন্দু, এবং আমার বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম্মের মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম জগতে আর নাই। যিনি যেমতেই ভগবানের আরাধনা করুন না কেন, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম, সুপুত্র, কুপুত্র উভয়কেই তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারীভেদে, পূজার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একেশ্বরবাদ যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যখন সমস্ত জগত অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আমাদের দেশেরই প্রাচীন ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা ও তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ঋষি-উচ্চারিত সেই প্রাচীন মহাবাণী তাঁহার দেশের লোককে নূতন করিয়া শুনাইবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন না; তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক না বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক বলিব।

তাঁহার ভাষা-জ্ঞান তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয়। নয় বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনা নগরে গমন করেন। তিন বৎসরে তথায় আরবী ভাষা মৌলবীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মূল কোরাণ গ্রন্থ আয়ত্ত করেন এবং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই একেশ্বর-বাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য

কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অত্যন্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি তিনটী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং তুইটী ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের যে মূল ভিত্তি, তাহা এই বয়সেই তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় এবং প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় গদ্যে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিবার জন্য পুত্র পিতার বিষম বিরাগভাজন হন এবং ইহার ফলে তিনি সেই কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারাই তাঁহার অসীম সাহস, দুর্জ্জয় মানসিক বল ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায়, আত্মশক্তি ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপর প্রান্তে অবস্থিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তখন যানাদির সুবিধা ছিল না, পথ অপরিচিত ও হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ছিল, তাঁহার পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তিব্বত-অভিযান কোন বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যেও আসে নাই। এই নির্ভীক বাঙ্গালী বালক বৌদ্ধধর্ম্ম, লামাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার জন্য, সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া একাকী সেই দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। এরূপ সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার পরিচয় জগতের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। তিনি সেখানে যাইয়া লামা-পূজার প্রতিবাদ করিলে লামাগণ তাঁহার প্রাণ বিনাশের সংকল্প করেন কিন্তু স্নেহশীলা তিব্বত-রমণীগণ সেই সুকুমারমতি বালককে গোপনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বত রমণীগণের নিকট হইতে এই বিপদের সময় তিনি যে স্নেহ ও দয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যাবজ্জীবন বিস্মৃত হন নাই। স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল, এই ঘটনা তাহার মূলে বর্ত্তমান।

তিনি ২৮ বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি হিব্রু ভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মমত বিচার সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

বৃদ্ধ বয়সে দেশের কার্য্যে বিলাত যাত্রা তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের আর একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তখন বিলাত গমন এখনকার মত সহজ ও সুসাধ্য ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বিলাতে গমন করেন নাই। তখন বিলাত যাইতে ছয়মাস সময় লাগিত এবং ধর্ম্ম ও দেশাচার উভয়ই ইহার প্রবল বিরোধী ছিল। তিনি সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে ৫৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের গুণে হিন্দু জাতির প্রতি ইয়ুরোপীয় সুধীমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশকে এক অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি আদর্শ-জ্ঞানী, আদর্শ-কর্ম্মী এবং আদর্শ ভক্ত ছিলেন। এই তিনের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন এক, দুই, ছয় চোর, আট বা দশ কলার সমষ্টি মাত্র, তাঁহার জীবন ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। তিনি একজন

পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন এবং আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। দেশপূজ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই নব যুগকে "রামমোহন যুগ" বলিয়া গিয়াছেন। এই যুগের কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক স্বার্থ-বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হইবে, অনেক বিপদ অনেক দুঃখ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে, তবে এই যুগের সাধনা সম্পূর্ণ হইবে। রামমোহন রায়ের স্বদেশবাসী আমরা তাঁহার সেই প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধি-লাভের আনুকূল্যে কার্য্য করিতে কি পশ্চাৎপদ হইব ?

ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তাঁহার সংস্কার কার্য্যের জাজ্জল্য প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে সংস্কারের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট-বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন এবং তজ্জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন, তখন রাজা রামমোহন রায় সেই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষায় দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচারিত না হইলে দেশের লোকের মনের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা ঘুচিবে না, শাসন কার্য্যে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহারা উচ্চ অধিকার কখনই পাইতে পারিবে না। জীবন-সংগ্রামে তাহারা চিরদিনই পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে। সুতরাং তিনি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহার বহুদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সবিশেষ পরিচায়ক। হিন্দু কলেজ-স্থাপনে তিনি ডেভিড্ হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, অথচ তাঁহার সংযোগ হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাগণের বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ইহার সহিত যোগদান করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন ডাক্তার ডফ্ এদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতায় প্রথম মিসনরী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বিধিমতে তাঁহার সাহায্য করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচার কার্য্য সমাধান হইবার ব্যবস্থা তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন পরে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার চিরদিনের আশা ফলবতী হইয়াছিল। যদিও তিনি ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা যে এই সুব্যবস্থার আদি কারণ, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে উচ্চ শিক্ষার ফলে দেশ উন্নতির দিকে এত অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূলে রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। ভারতবাসীমাত্রেই ইহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক যেরূপ উর্ব্বর ছিল, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ কোমল ও উদার ছিল। হৃদয়ের এই উদারতা ও কোমলতাই তাঁহাকে বিবিধ সমাজ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের স্থল। তাঁহার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া কেহই আইনানুসারে ইহা নিবারণ করিতে সাহস করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় যেখানে সতীদাহের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা কর্ণে শুনিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে যাইয়া নানা উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে সতীর সংকল্প পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিতেন।

অবশ্য কোন কোন স্থলে সতী স্বামী বিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় এবং সামাজিক অপযশের ভয়ে অনেকানেক বিধবা স্বামীর সহগমন করিতেন। সহগমনের সময় ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইলে অনেক স্থলে জোর করিয়া তাহাকে চিতায় প্রবেশ করান হইত এবং যদিও সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মম আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে বল পূর্ব্বক চিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিত। স্ত্রীজাতির প্রতি এই পৈশাচিক সামাজিক অত্যাচার অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের কোমল হৃদয়ে বিষম আঘাত করিতেছিল। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক-ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রচলিত হইয়া ভারতবাসী হিন্দুকে ধর্ম্মের নামে স্ত্রীহত্যার পাতক হইতে রক্ষা করে। এই সংস্কার সংসাধনের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে অশেষবিধ সামাজিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ ছিল না। তাঁহার দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি ও সুদৃঢ় বিবেক বুদ্ধিবলে তিনি সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে "হরকরা" নামক ইংরাজচালিত একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কোন কারণে গভর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার সম্পাদককে আটক করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের দ্বারা পরিচালিত "আকবর" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের প্রচারও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এখানকার আন্দোলনে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ জর্জের নিকট সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনের শেষ ফল দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্যে তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের দুই বৎসর পরেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টের একটী কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় এদেশের কৃষকদিগের হীনাবস্থার বিষয় বিশেষ ভাবে বিলাতের মন্ত্রীসভার গোচর করিয়া উহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। অধিক সংখ্যক এদেশবাসী লোক যাহাতে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্যও তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলা গদ্যে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলাভাষায় যে দুই একখানি গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি অনেকগুলি উপনিষদ্ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভাষার উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রনিহিত ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সমূহ সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি সংবাদপত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ কর্ত্তৃক "সমাচার দর্পণ" নামক একখানিমাত্র সম্বাদ পত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হিব্রুভাষার বাইবেল হইতে এবং আরবীভাষায় লিখিত কোরান হইতে অনেকানেক স্থান অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; অনেকানেক ইংরাজী গ্রন্থ ও সময়োপযোগী পুস্তিকা লিখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজ গৃহে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন। "একেশ্বরবাদ" প্রচারই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভায় পরিণত হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এই সভার স্থায়ী ভবন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণ ভাবে ব্রহ্মোপসনা কলিকাতায় প্রচলিত হয়। এই উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ইহার উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ১৮৩০ সালে বিলাত গমন করেন এবং তথায় তিন বৎসর স্বদেশের কল্যাণে কার্য্য করিবার পর সাংঘাতিক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করেন।

যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণ কামনায় জন্য সেই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবেই আমাদের অদ্যকার এই স্মৃতিপূজার আয়োজন সার্থক হইবে।

রাজা রামমোহন রায় *

—:*:—

হে তাপস, হে সাধক, হে পূজারী, বীর
তোমা লাগি কেন আজ ঝরে আঁখিনীর
একবার ভাবি মনে,
একবার পূজা-থালি সাজাই যতনে
বহুদিন পরে,
বড় বলে একবার স্বীকার করিব আজ আপন অন্তরে,
কি তুমি চাহিলে দিতে
— কোন্ শান্তি, কোন্ ধর্ম্ম, এই পৃথিবীতে
কোন্ জ্ঞান,
আপনি ডুবিয়া তুমি শিখাইলে কোন্ মহাধ্যান
কর্ম্মযোগে জ্ঞানযোগে
মিশাইয়া দিলে তুমি জীবনের ভোগে;
সুধা পাত্র ভরি
জনে জনে বেঁটে দিলে আহা মরি মরি!

* ৺রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় পঠিত।

কোন ধর্ম্ম ভাঙ্গিলে না কিছু,
কোন ধর্ম্ম মতে তুমি কর নাই নাচু,
সঞ্জীবনী সুধা দিয়া
সত্য পথ দেখাইলে—বাঁচাইলে পিপাসিত হিয়া
ফেলিলে না কারে দূরে,—
এক মহা বিশ্বপ্রেম সুরে
প্রাণ মন মাতালে সবার,
দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ধর্ম্মগুরু আর !
বিধবার অনির্ব্বাণ চিতার অনল
নিভাইলে মহাঋষি ঢালিয়া তোমার শান্তিজল !
ওগো কর্ম্মী কোন্ গুণে
সমাজ করিলে শুদ্ধ, শক্তির আগুনে,
জ্বালাইলে মহাভাব,
দুর্দ্দিনের রবি তুমি ছড়াইলে পুণ্যের প্রভাব,
ভোগের পালঙ্ক রাখি
নেমে এলে ধরণীতে বিশ্বব্যথা নিলে বুকে ডাকি
দুটি বাহু প্রসারিয়া,
মানব কল্যাণ লাগি কত ধন দিলে বিতরিয়া।
ভারত ডুবিতেছিল মহা সর্ব্বনাশে
অত্যাচার পীড়নের গ্রাসে ;
ধর্ম্মের মুখোস্ পরা সে কোন্ রাক্ষসী
অন্ধকারে বসি
মেলেছিল যবে তার করাল বদন
ভারতের রক্তধারা করিতে শোষণ ;
কে তুমি উদিলে বীর
কোন ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়ে এই পৃথিবীর
ছিন্ন করি জড়তার পাশ ;
এক মহা ব্রহ্ম জ্যোতি করিলে প্রকাশ।

কে তুমি বাঁচালে তবে
ভগবৎ প্রেমের বিভবে ?
শুনাইলে হরিনাম মধু পারাবার
ব্রহ্মের সন্তান বলি সকলেরে দিলে অধিকার !
ধীর পদে গেলে চলি জয়ের পতাকাটিরে বহি
এত নিন্দা অপবাদ এত জ্বালা সহি ?
কমলার বরপুত্র জগতের হিতে
এসেছিল বিলাইতে
সর্ব্ব ধন মান
মহাপ্রাণ জাগাইলে দিয়ে নিজ প্রাণ !
তাই আজ কাঁদি ফিরে ;
ভাসাইয়া মুখে অশ্রু নীরে
জাগিতেছে এ বেদনা
যাহা গেছে ফিরিবে না ফিরিবে না
এ জীবনে আর
রাজা তুমি, ঋষি তুমি, ত্যাগী তুমি, আরাধ্য সবার !

মণিপুর চিত্র

(৩)

দাসত্ব-প্রথা।

আমি দেশীয় রাজ্যবাসী বিশেষ আজকাল যাহাকে Backward State (অনুন্নত রাজ্য) মধ্যে গণ্য করিতে চায়। কেন জানি না। সেই রাজ্য আমার—জন্মভূমি। মণিপুর রাজ্যের সহিত আমাদের রাজ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে কেবল কুটুম্বিতা সূত্রে নহে, রাজ্যের অবস্থা দৃষ্টে এককে অন্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মণিপুর রাজ্যে 'লালুপ' বা বাহিরের লোকে যাহাকে দাসত্বপ্রথা বলে, সেই প্রথা বর্ত্তমান ছিল এবং ইহা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও ছিল। "দাসত্বপ্রথার" ন্যায় এত জঘন্য প্রথাও কি এখনও বৃটীস শাসিত ভারত

ভিতরে বর্ত্তমান থাকিতে পারে? কখনই না। এই 'লালুপ' প্রথার অর্থ কি এবং ইহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইত তাহা যাহারা জানেন তাঁহারা ইহাকে কখনও দাসত্বপ্রথা বলিতে পারেন না। ইংরেজ Political Agent সহৃদয়তার সহিত দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি যখন দেখিতে পান তখন তিনি দেবতার মত কার্য্য করিতে পারেন।

মণিপুরের একজন Political Agent লিখিয়াছেন;—

"The Manipur paid very little revenue in money, and none in direct taxes. The land all belonged to the Rajah, and every holding paid a small quantity of rice each year. The chief payment was in personal service. This system known by the name of "Lalloop," and by so often miscalled, "forced labour," was much the same as formerly existed in Assam under its "Ahom Rajahs".—[*My experience in Manipur P. 113 by Colonel Johnstone.*]

মণিপুরে খাজানা টাকায় খুব কমই আদায় হইত; ট্যাক্স ও ছিলই না। ভূমি সমস্তই রাজার অধীনে,—প্রজারা প্রতিবৎসর সামান্য কিছু শস্য বিনিময়ে তাহা ভোগ দখল করিত। অধিকাংশ স্থলেই প্রজারা খাজানা না দিয়া শরীর খাটাইয়া মালেকের পাওনা পরিশোধ করিত, মণিপুরে এই প্রথার নাম "লালুপ।" লালুপকে কিছুতেই দাসত্বপ্রথা বলা যায় না। আহম রাজার রাজত্বকালে আসামেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা বলিতে যাহা,—নামান্তরে হইলেও তাহার বিষে বরং আসাম জর্জ্জরিত হইয়াছে এই সভ্য যুগেই—দেশীয় রাজার হাতে নহে,—স্বার্থপর বৈদেশীক চা-করের নির্ম্মম পীড়নে; অন্যত্রও এ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না,—আফ্রিকা, ফিজি আজও দাসত্বের জঘন্য অত্যাচারের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই। আমেরিকায় কিউবা দ্বীপের দাসত্বপ্রথা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রহিত হইয়াছিল।

"The system of slavery was finally abolished from Cuba Island in 1887."—(*America through Hindu eyes, by I. B. De. Majumdar.*)

এই লোকহাসান লোমহর্ষণ প্রথার উল্লেখ না করাই ভাল। আমাদের দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি ইউরোপীয় দেশের প্রথার তুলনা হইতে পারে না। দাসত্বপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথার নাম শুনলেই আমরা চমকিয়া উঠি। এখনও কি ইংরেজ আমলে এ সব বর্ব্বর প্রথা দেশীয় রাজ্যে চলিতে পারে? এ কথা মনে আসে। অথচ, 'স্নেহলতার' কেরোসিনে মৃত্যু আমরা সতীদাহ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। এক দেশের প্রথার সহিত অপর দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং এক নহে। আমাদের ত্রিপুররাজ্যে দাসত্বপ্রথা ছিল এবং বলিতে গেলে এখনও প্রকারান্তরে আছে। কিন্তু, তাহাকে Slavery বলা যায় না। ১৮৭৮ সালে Mr Botton আমাদের রাজ্যের (পলিটিক্যাল এজেন্ট) Political Agent ছিলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি এই দাসত্বপ্রথা লইয়া একটা তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। "ইংরেজরাজত্বে দাসত্বপ্রথা থাকিতে পারে না।" এই নীতিতে তিনি 'বর্ব্বর প্রথার' বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের দেশের দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যকে ধরিয়া পড়েন। তাই Slavery (?) দাসত্ব (!) বীরচন্দ্র মাণিক্য উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার ফলে কি হইয়াছিল এবং কি হইতেছে? সে কথা বলিতে আমার দুঃখ হয়। যদি Colonel

John Stone এর মত সহৃদয় Political Agent থাকিত তাহা হইলে তিনি এই প্রথাকে বর্ব্বরোচিত (Barborous) প্রথা কখনই বলিতে পারিবেন না এবং ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন এবং এ প্রথা রক্ষা করিতেন। এই 'লালুপ' প্রথা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"I hear that "Lalloop" has been abolished in Manipur since we took the State in charge. We may live to regret it; the unfortunate Puppet Rajah certainly will. Why cannot we leave well alone, and attack the real evils of India that remain unredressed, evils that the native system has much good in it, much to recommend it, and that it is in many cases the natural out-growth of the requirements of the people."—(*My experiences in Manipur*) *P. 115.*

এই লালুপ প্রথাকে যদি Slavery বলা যায় তাহা হইলে চাকুরী প্রথাকেও দাসত্বপ্রথা বলা যাইতে পারে। তবে কেন, এ প্রথা লইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ হাঙ্গামা করেন? তাহার কারণ, Col. John Stone বলিতেছেন;

"Unfortunately, our so called Statesman are carried away by false ideas of humanitarianism, and a desire to pass in every way as the exponents of civilisation, that is the last fad that is uppermost, and the experience of ages and the real good of primitive people are often sacrificed to *ignis fatuus*"—(*My experience in Manipur by Col. John Stone.*) *P. 115.*

Col. John Stone এর মত সহৃদয় Political Agent (পলিটিক্যাল এজেন্ট) প্রায় দেখা যায় না এবং তিনি যথার্থ মণিপুরের বন্ধু ছিলেন, একথা মণিপুরবাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে এবং তাহার নাম স্মরণ করিলে অশ্রুপাত করেন। এই যথার্থ বন্ধুর সম্বন্ধে আমি পরে বিশেষভাবে বলিতে ইচ্ছা করি। যদি "লালুপ" প্রথাকে দাসত্বপ্রথা বলা যায় তাহা হইলে ত্রিপুররাজ্যে দাসত্বপ্রথা রহিত করার একই অর্থ হইয়া থাকে। যদি স্বাধীন ত্রিপুররাজ্যে এ প্রথা না থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ এবং বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকাগুলি কখনও 'সাগর' নামে পরিচিত হইত না, উহারা প্রজাবর্গকে জলদান করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিত না। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে, ত্রিপুরার ধর্ম্মমাণিক্য কুমিল্লা নগরীতে 'ধর্ম্মসাগর' নামে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে এই দীঘির চারি পারের ২৯/০ দ্রোণ জমি দ্রাবীঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণকে দান করেন; এরাজ্যে বসতি করিবার জন্য। সেই তাম্রশাসনে লিখা আছে, "যদি আমার বংশ ব্যতীত অন্য কোন বংশ এই রাজ্যের অধিপতি হন, আমি তাহার দাসানুদাস হইব যদি আমার ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।" ৫১২ বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুরাজা এই হিন্দুভাবে যিনি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অদ্য পর্য্যন্ত এই দীর্ঘিকামাত্র কুমিল্লা সহরের পানীয় জল সরবরাহ করিতেছে।

এই দীর্ঘিকা খনন করিবার দুটী কারণ ছিল, দ্রাবীড় দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসতি করাইবার এবং চট্টগ্রাম প্রদেশে যখন আরাকান নৃপতি জয় করিয়া লন, তখন কতকগুলি মাইটাল অর্থাৎ মাটীখননকারী প্রজা আসিয়া ধর্ম্মমাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই আশ্রিতবৎসল ধর্ম্মমাণিক্য তাহাদের উভয়ের উপকারার্থে এই হিন্দুর কীর্ত্তি সাগর খনন করিয়াছিলেন।

Col. Jhon Stone লিখিয়াছেন—

"High embanked roads were made throughout the country, and large tanks, lakes, appropriately termed "seas", were excavated under former ages in other parts of India are due to something of the same kind." (*My experience in Manipur*) *P. 114.*

আসাম, কোচবিহার, মণিপুর এবং ত্রিপুরারাজ্যে প্রাচীন প্রথাগুলি একই রকম ছিল একই কারণে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, উঠাইয়া দিবার দরুণ যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ইষ্টের তুলনা করিলে আমাকে Col. John Stoneএর মত বাণীই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই "লালুপপ্রথা" মণিপুর হইতে চিরতরে আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন করিয়াছিলেন, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট। তাঁহারা হয় ত বুঝিয়াছিলেন একটা আপদ গিয়াছে—কিন্তু, আপদ রহিয়া গিয়াছে বংশানুক্রমে; তুষানলের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ইহা জ্বলিয়া উঠে। তখন দোষ পড়ে বেচারী রাজার ঘাড়ে। লালুপ প্রথায় রাজা প্রজার মধ্যে যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কল্পনায় বুঝিবার নয়। লালুপ প্রজা যেন ছিল পরিবারভুক্ত ব্যক্তি,—পারিবারিক উৎসবাদিতে তাহার উৎসাহ কত, মনিবের ভালমন্দ তাহাকে অভিভূত করিত; অথচ সেই স্নেহবন্ধন কাটাইত, দাসত্বের মত মনিবের সহিত তার আর কি বন্ধন ছিল?—সে ইচ্ছা করিলে ম্যাদ অন্তে জমীর দখল ত্যাগ করিলেই স্বাধীন, বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্বের সর্ত্তও কি তাহা হইতে ভিন্ন?

তা ছাড়া—রাজার দিক হইতে ভাবিবার আছে,—তাঁহারা ত আর আমাদের মত নন,—রাজার আরাম আয়েসে আমোদ প্রমোদে একটা রাজসিক ভাব থাকিবেই; তার ঝোঁকে রাজাকে প্রজার উপর একআধটু আধিপত্য বিস্তার করিতে হয়—যেমন শিকার সখ মিটাইতে হবে,—মালপত্র বহিতে শত গোগাড়ীর প্রয়োজন; টাকা পয়সা দিয়াও এত গাড়ী এককালে একদিনে সংগ্রহ হয় কি? একটু রাজআধিপত্য,—ক্ষমতাপ্রকাশে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়,—সর্ব্বত্র এই প্রথা। কিন্তু, রাজার ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার দরুণ প্রজাগণ মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। রাজা শিকারের সখে—সেই সভ্য জগতের অনুমোদিত—'লালুপ' প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে চান, তখন প্রজাসাধারণ আপত্তি করে। আপত্তি করিবার প্রধান কারণ, নগদ টাকায় খাজানা প্রথা প্রবর্ত্তন রাজা প্রজার মধ্যে এখন কেবলমাত্র প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ বর্ত্তমান। রাজা প্রজা সম্বন্ধ আর নাই। ইহা দেশীয় রাজ্যের পক্ষে বিপরীত ভাব আনয়ন করিয়া ফেলে; আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছে, কেবল মাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খাতিরে নহে কিন্তু বাহিরের শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দের অত্যাধিক ইচ্ছায় এবং অভিপ্রায়ে সে সব প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন আপদ গিয়াছে এবং চিরকাল এ আপদ থাকিবে। আমাদের রাজ্যে 'ঠেগুর' প্রথা ছিল অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশে গতিবিধির সৌকার্য্যার্থ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রজাগণ ভ্রমণকারীর লটবহর লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইত এবং উক্তস্থানে পঁহুছাইয়া দিয়া তথায় একবেলা আহার করিয়া লইত। দেশের অবস্থা দৃষ্টে এ প্রথা উত্তম ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা হইয়াছে এই, প্রজারা নগদ পয়সা লইয়া মোট বহিতে নারাজ এবং মুটেগিরী করিতে অত্যন্ত আপত্তি করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভিমানী কর্ম্মচারীবৃন্দ রাজ্যের অভ্যন্তরে গতিবিধি করিতে নারাজ কারণ, গতিবিধি করিবার সুবিধা তো নাই-ই অসুবিধা যাহা আছে তাহা এ শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দ স্বপ্নেও দেখে নাই। রেলের রাস্তা থাকা দূরের কথা সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত নাই। ব্রিটিস Systemএ travelling allowance (ভ্রমণের জন্য ভাতা) প্রথম ২য় শ্রেণীতে গতিবিধি করিয়া মজুরী পোষায় না কাজেই ডেস্কে বসিয়া হাকিমী করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন; হাকিমের মুখ প্রজাগণ কখনও দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। ইহা কি, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে?

পূর্ব্বে 'আলং' নামে আর একটী প্রথা ছিল। এ প্রথার রাজ্যের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইহা ধরিতে গেলে Irregular force (অবিধিবদ্ধ সাধারণ ফৌজ) বলা যাইতে পারে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন 'আলং' প্রথা বর্ত্তমান ছিল। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র ঠাকুর সে 'আলং'এর অধিকারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি এই Force এর Chief-Commandant ছিলেন। তখন তিনশত লোকবল ছিল। এইক্ষণে এই প্রথা মিলিটারী (Military) এবং পুলিশ সিষ্টেমে (Police-System) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিজে Military Dept এ Chief-Commanding Officer এর (সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর) কাজ করিতাম, তখন নব্য শিক্ষিত এবং নব্য প্রথার 'Colonel' (করনেল) পদবাচ্যকে আমি উৎকৃষ্ট মনে করিতাম। এখন যদিচ অবসর নিয়াছি কিন্তু পদবাচ্য নাম আমাকে আঠার মত আঁকড়াইয়া আছে—কম্বল ত্যাগ করিতে চাই কিন্তু কম্বলই কম্বল এখনও ভোগাইতেছে। কিন্তু, অবস্থা হইয়াছে এই বিনোদিয়াগণ প্রজাসাধারণের সহিত এক জাতির অন্তর্গত ছিল এবং পরস্পরের সহানুভূতি ছিল—কারণ এই প্রজাপুঞ্জ হইতেই বিনোদিয়াগণকে সরবরাহ করা হইত। কাজেই, তাহারা যে কার্য্যে যাইত সেই কার্য্যের দরুণ Travelling-allowance (ভাতা) পাইত না এবং Bill (বিল) লম্বা চওড়াও হইত না। কিন্তু কাজ সহানুভূতির সহিত স্বজাতি বা স্বদেশীভাবে সম্পন্ন হইত। সেভাবের এক্ষণে অভাব হইয়াছে—এক্ষণে সস্তা চাকরীর বাজারের ব্যানার্জ্জি, মুখার্জ্জি, ঘোষ, বোস এবং সেন বংশীয়গণ পুলিশে ঢুকিয়া জাত্যাভিমান হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরাবাসী পার্ব্বত্য জাতির প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটী প্রথা যাহা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভদ্রবংশে ভদ্রতা রক্ষার্থে ছিল সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার দরুণ—কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা ভদ্রবংশীয়গণ অন্তরের সহিত অনুভব করি। 'পিছারা সেবক' বলিয়া আমাদের প্রত্যেক বাড়ীতে এক একটী (প্রজার বসতি) Colny ছিল বাড়ীর পিছনে থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে পিছারার সেবক বলা যাইত। তাহাদের কার্য্য ছিল, মনিব অথবা অন্নদাতার বাড়ীতে সেবা করিয়া এবং আবশ্যক স্থলে চাকুরী করিয়া জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিত। ইহারাই আমাদের লোকবল ছিল এবং তাহাদের অভাবে আমরা লোকবল শূন্য হইয়া দুর্ব্বল—হইয়াছি। হায়রে!

"গড়ন ভাঙ্গিতে পারে যেই কোনজন,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সেই মহাজন"

প্রাচীন রাজ্যের প্রাচীনত্ব অতি সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, কিন্তু গড়ন কখনও সম্ভব হইয়া উঠে না। সেকালে যেমন মনিব ছিলেন, তিনি তাহাদের Puryare ছিলেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রজাগণ হইতেই সেবক শ্রেণীর লোক আমদানী হইত। যাহারা "জুম" করিয়া হয়রাণ হইত তাহারাই সেবকী করিয়া—আসান পাইত। অধিকাংশ লোকই আত্মবিক্রয় কি পরিবারের লোকদিগকে বিক্রয় করিত না। যদি বা মাঝে মাঝে কেউ করিত তাহার অর্থ ছিল—বাঁধা-বসা—অর্থাৎ উক্ত জনের নিকট অর্থ ঋণ লইয়া সুদ না দিয়া চাকুরী করিয়া সুদ আদায় করিত। যখন ঋণ পরিশোধিত হইত তখন তাহারা খালাস পাইত। অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে আসিয়া রাজ পরিবার বা ঠাকুর পরিবারে সেবকশ্রেণীভুক্ত হইত এবং তাঁহারাও এ সব সেবকদিগকে আপন পরিবারের লোকদের ন্যায় দেখিতেন। অশন ভূষণ যোগাইতেন এবং সময় সময় অলঙ্কারাদি দেওয়ার প্রথা কেবলমাত্র—মণিবের মর্য্যাদা রক্ষার্থ পাইত তাহা না হইলে মনিবের ইজ্জৎ থাকে না। এক্ষণে, সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার দরুণ ত্রিপুরার প্রজাগণকে কুসীদজীবির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্বের অধোগতিতে স্থান

পাইতে হইয়াছে। একণে তাহা নিজারা সেবক নয় সত্য কিন্তু দাসের অধম, নিত্য উত্তমর্ণের তাড়নে নিপীড়িত,—অন্ন বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী—এ দরিদ্র দেশে কি ও-স্বাধীন দেশের প্রথায় চলে,—তাহাতে কি ফল, তাহা প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তনে স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান,—মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষায়,—কর্ম্মঠ করিয়া তোল; তাহাদিগকে বুঝিতে দাও তাহারা মানুষ—তখন তাহার নিজের স্থান নিজে চিনিয়া লইবে তাহাদের উন্নতির পথে তখন আর কে বাধা দিবে—আমরা তাই চাই—কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিলে—তাহা কেবল তাহাদের দুঃখের কারণ নয় কি ?

হঠাৎ একদিন (বাল্যকালে) পিতা মাতার নিকট শুনিলাম,—আমাদের পিচারার লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—এবং আমাদের বাড়ীর আত্মীয়েরা নিজ হাতে কার্য্য করিয়া লইবেন। এই প্রথা গবর্ণমেণ্টের উপদেশে বাধ্য হইয়া রাজা ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের (১৮৭৮ খৃঃ) ১৭ই আষাঢ় তারিখে বিধি করিয়া উঠাইয়া দিতে ঘোষণাপত্র জারী করিয়াছেন। আইন হইয়াছে বন্ধকীপ্রথা—বর্ব্বর-রীতি, এ-রীতি কুনীতি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। সেই হঠাৎ-স্বাধীন বাড়ীর পরিচারিকাগণ আইনতঃ মুক্তিলাভ করিয়া মহাবিপদ গণিল; তাহারা কি সহজে আমাদের আশ্রয় ছাড়িতে চায়—[illegible] পড়িয়া গেল,—আজও তাহারা স্বাধীন হইয়াও স্বেচ্ছায় তাহাদের সেই অধীনতার জন্য লালায়িত,—সেই আমাদের দ্বারেই তেমনি কাজ করিয়া খাইতেছে; তার জন্য যে মজুরী পায় তা পূর্ব্বের সুবিধার তুলনায় সামান্য,—তাহাদের সংসার পালনের পক্ষে অপ্রচুর। তাহাদের দুর্দ্দশা আজ এই ৫৮ বৎসর বয়সে পর্য্যন্ত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। বলিতে কি ইহাদের মধ্যে অনেকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশের একটা Moral atmosphere দূর করিয়া দিয়াছে।

আমাদিগকে যাহারা মাতৃবৎ লালন-পালন করিত এবং মা হইতেও অধিক শাসন করিত, অদ্য তাহারা কলিকাতা কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপের নানাস্থানে প্রথমে রক্ষিতাবস্থায় পরে যাহা হয়—বাজারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে। একদিন এই শ্রেণীর আমাদের 'ধাই মা' সম্পর্কীয় একজন নবদ্বীপের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম কিন্তু আমাকে চেনা তাহার অসাধ্য ছিল। আমি নিজ হইতে পরিচয় দিলে সে বেচারী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন আমার ডাকনাম তাহার নিকট বলিলাম তখন বাঁধা রাস্তার উপর উপুর হইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং দেশের সেই মুক্তির আইনকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক! আমি যত দিন নবদ্বীপে ছিলাম তত দিন তথাকার এক ভদ্র পরিবারে বাস করিতাম, এই বৃদ্ধাকে আমি আনিয়া পরিচয় দিলে তখন বাড়ীর গৃহিনী-মহলে তাহার স্থান হইয়া গেল এবং এক বৎসরের মধ্যে তাহার মানবলীলা সম্বরণ হইয়াছিল। বেচারী ভেক লইয়াছিল এইজন্য আমি খরচ করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় একটী মহোৎসব দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি বলিতে পারি, যাহা Barberous labouring বলিয়া তাহার প্রতি পাশবিক ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার দরকার ছিল না বরং অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়াছিল এবং আমরা তাহার ভুক্তভোগী। মণিপুরের পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে ভুক্তভোগ করিতেছে তাহা বর্ণনা করা অপর লোকের নিকট সম্ভবপর নহে। এই 'লালুপ' প্রথা উঠিয়া যাইবার দরুণ মণিপুরে নৈতিক-জগত তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই Happy-valleyতে Happiness উঠিয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি Meanness বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্ত্রীস্বাধীন দেশ মণিপুরে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকা দরুণ যে সব মহত্তোপকার হইয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে, তাহাই সেই নৈতিক-জগতে দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। মণিপুর সমাজে সকলেই সুমান ছিল, উচ্চ নীচ ভেদ ছিল না রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত এক সমাজ ভুক্ত ছিল, তদ্দরুণ সমাজ শরীরে একতা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সুখে

ছিল। এক্ষণে সে সুখ-সাগর শুকাইয়া গিয়াছে। সাগরের পঙ্ক দেখা দিয়াছে এবং সময়ে পঙ্কোদ্ধার কে করিবে আমি জানি না। একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলে যথেষ্ট হইবে। মণিপুরে মণিপুরী স্ত্রীলোক ম্লেচ্ছের রক্ষিতা হইয়া এবং প্রকাশ্যভাবে বাস করার প্রথা চলিতেছে।

য়ুরেশিয়ান টেলিগ্রাফ মাষ্টার চমৎকার মণিপুরী ভাষা বলিতে পারেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে ভাষা শিক্ষার দিশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তর দিলেন—"I have got a living dictionary. "আমার একখানি জীবন্ত অভিধান আছে।"

দুঃখের বিষয় আমি এই জীবন্ত-অভিধানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং এই সূত্রে মণিপুরের নৈতিক-জগতের যে চিত্র দেখিতে পাইয়াছি তাহা চিত্রিত করিতে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হয়! বিশ্রী চিত্র দেখাইতে হয় কাজেই এখানে প্রবন্ধ বন্ধ করিলাম। মণিপুরে মহিলাগণ ধর্ম্মের নামে নৃত্যগীত করিত এক্ষণে বাইজি ও খেমটা নাচ করিয়া খাস মণিপুরের মধ্যেই বীভৎসতার অভিনয় করে এবং ঐই নাচ লইয়া এক্ষণে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া ব্যবসা করা হইতেছে! ইহা হইতে অধোগতির আর বাকী রহিল কি? Tea-Plantergণ এই সমাজ হইতে রক্ষিতা স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিতেছে, ইহা এক্ষণে প্রথারূপে দাঁড়াইয়া বিপথগামী হইবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরকের পথ দেখাইতেছে। মণিপুরে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেছেন এবং স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম, ঈষৎ হাসি ব্যতীত অন্যরূপ উত্তর পাইলাম না। বাঙ্গালী ক্লাবে একটী Theatre-party আছে তাহাতে মণিপুরী স্ত্রীলোক অভিনয় করিয়া থাকে এবং বেশ অভিনয় করিতে পারে দেখিলাম—কিন্তু আমি ইহাদের নৈতিক-চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে না পারায় সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

দীপালী।

আয় মা করালি কালি আয় মা আবার
ধরণীর বুকে,
আমরা মানব দীন জ্বেলেছি এ দীপ ক'টী
ভকতির সুখে।
জানি ইহা অতি দীন তুচ্ছতম আয়োজন
জানি তাহা জানি
জানি তুমি আস নিতি মর মরতের বুকে
জননি শিবানি।

জানি যবে নিভে যায় দিবসের শেষ আলো
—রবি ডুবে যায়
গভীর আঁধার-রূপে আস তুমি অয়ি দেবী
নীরব ধরায় !
আকাশে উজলি ওঠে কোটী কোটী কোটী তারা
অয়ি মহাকালী
বরিতে তোমারে দেবী ফোটে আকাশের কোলে
তারার দীপালী
তারকার ভাতি হতে প্রদীপের এই আলো
জানি বহু ক্ষীণ
তবু মা বরিতে তোরে ভকতের আজ এই
আয়োজন দীন।

"বনফুল"

আমাদের শ্রবণ ও তাহার যন্ত্র-কৌশল।

শ্রবণশক্তি মানুষের সীমাবদ্ধ ইহা সকলেরই জানা আছে ; আমরা দেখিবার সময় যেমন সাত রঙের অধিক বর্ণ দেখিতে পাই না, শুনিবার সময়ও তেমনি সাত সুরের অধিক ধ্বনি শুনিতে অক্ষম। এই সাত সুরের নানা লীলায় গুণী লোকের কণ্ঠ ধ্বনিত। 'ধ্বনি' বা 'শব্দ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা বায়ুর কম্পন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই বায়ুকম্পনের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল শব্দের উৎপত্তি। এই সুনির্দ্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার উপরে উঠিলে অথবা নিম্নে নামিলে বায়ু-কম্পন শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে কি না তাহা জানা যায় নাই কারণ সে শব্দ শুনিবার ক্ষমতা আমাদের কর্ণের নাই সুতরাং তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাও আমাদের ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত ; ঈথরের কম্পন যেমন আলোক-তরঙ্গ উত্থিত করে, বায়ু-কম্পন তদ্রূপ শব্দ-তরঙ্গের হেতু। কম্পন বলিলে ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, বায়ু কণিকাগুলি বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্তভাবে কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পনের ভিতর এরূপ কৌশল এবং সুনিয়ম আছে, যদ্দারা একস্থানের বায়ু কণিকাগুলি, কম্পন হেতু অধিক ঘন হইয়া পরস্পর ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান করে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু কণিকাগুলি দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনেকটা অন্তরায় রাখিয়া অবস্থান করে। এই ঘন সন্নিবেশিত বায়ু কণিকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী লঘু-সন্নিবেশিত বায়ুকণিকা মিলিয়া বাতাসে যে পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহাই শব্দ-তরঙ্গ বা Sound wave. এই তরঙ্গ

একস্থানে উৎপন্ন হইলে ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বায়ুর এই পরিবর্ত্তন অথবা "শব্দ-তরঙ্গ" পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। শব্দের উচ্চতার উপরই ঐ শব্দের তরঙ্গ-বেগ ও তাহার যাত্রাপথের সীমানির্দ্দেশ নির্ভর করে।

কেমন করিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই তাহার আলোচনা করিতে যাইলে, শ্রবণযন্ত্রের (EAR) সহিত আমাদের মোটামুটি একটা পরিচয় থাকা একান্ত দরকার।

আমরা সাধারণতঃ বাংলায় কান (Ear) বলিতে যাহা বুঝি তাহা অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। বাহিরের এই অর্দ্ধচক্রাকার মাংসল অংশকেই আমরা কান বা কর্ণ বলিয়া থাকি, অথচ বিজ্ঞানের ভাষায় তাহার নাম Auricual. Auricula কর্ণের যে বায়ু-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহা external Acoustic meatus বা কর্ণকুহর। কর্ণ বা earকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বহিঃকর্ণ বা External-ear ; পূর্ব্বোক্ত Auricula ও External Acoustic meatus ইহার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যকর্ণ বা Middle Ear ও অন্তঃকর্ণ বা Internal Ear. কর্ণকুহর কিছুদুর গিয়াই বক্রভাগে স্থাপিত "কর্ণপটহ" বা Tymphanic Menbranceএ শেষ হইয়া গিয়াছে। "কর্ণপটহ"টি পর্দ্দার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃত্তাকারে ইহা কর্ণকুহরে তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। এই পর্দ্দাটির ভিতর দিকে' উহার গাত্রসংলগ্ন একটি খুব ছোট অস্থি আছে। বায়ুর শব্দ-তরঙ্গ সর্ব্বদাই এই কর্ণপটহকে কম্পিত করিতেছে; কর্ণপটহ যাহাতে অত্যধিক কম্পনে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, সুতীব্র শব্দ হইলে এই অস্থি কর্ণপটহকে টানিয়া ধরিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত অশ্লথ করিয়া রাখে। কাজেই পর্দ্দার বাহিরের সুতীব্র শব্দ তরঙ্গ প্রতিহত হইলেও তাহা অনিষ্টকর হইতে পারে না। পটহ-সংলগ্ন অস্থির সহিত পর্য্যায়ক্রমে যুক্ত হইয়া আরও দুইখানি ক্ষুদ্রতম অস্থি আছে। শেষ অস্থিটি অশ্ব-সরঞ্জামের রেকাব্ বা Stirrup এর ন্যায় দেখিতে বলিয়া ইহার নাম ষ্টেপিস্ (Stapes)

বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ কদাপি একইভাবে পরিচালিত হয় না। বহিঃকর্ণের (External Ear) সীমা কর্ণকুহরের কর্ণপটহ পর্য্যন্ত সুতরাং বহিঃকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ বায়ু বাহিত হইয়াই কর্ণপটহে আঘাত করে। ফলে, পটহটি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া তৎসংলগ্ন অস্থিত্রয়ে এই কম্পনকে গতিক movements রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাঠাইয়া দেয়। Middle Ear বা মধ্যকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া অস্থির নড়াচড়ায় পরিণত হয়।

অন্তঃকর্ণে আবার এই অস্থির গতি বা movement পরিবর্ত্তিত হইয়া চাপ্ বা Pressure আকারে তথাকার (Perilymph) পেরিলিম্প্ নামক তরল পদার্থে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং আমরা কর্ণকে তিনভাগে ভাগ করিবার তাৎপর্য্য এখন বুঝিতে পারিলাম। প্রথমভাগে, শব্দ-তরঙ্গ, বায়ু-পথে বাহিত ; দ্বিতীয়ভাগে শব্দ-তরঙ্গ রূপান্তরিত হইয়া অস্থিত্রয়ের Movement বা নড়াচড়ায় প্রকাশিত এবং তৃতীয়ভাগে এই অস্থির নড়া-চড়া রূপান্তরিত হইয়া Pressure বা "চাপ" আকার ধারণ করিয়া থাকে।

মধ্যকর্ণের রেকাবাস্থি বা Stapes. একটি পর্দ্দার উপর স্থাপিত। এই পর্দ্দাটি অন্তঃকর্ণের (Internal Ear,) "ওভালিস্" নামক একটি ছোট ছিদ্রকে আবৃত করিয়া থাকে বলিয়া, ইহা (Membrane of the fenestra Ovalis) "ওভালিসের চর্ম্মাবরণ" বলিয় কথিত হয়। ওভালিসের চর্ম্মাবরণের দ্বারাই মধ্য-কর্ণের অস্থির

গতি (movement.) অন্তঃকর্ণের তরলাংশে বাহিত হয়। এই চর্ম্মাবরণটি অস্থি ও তরলাংশকে পৃথক্ করিয়া রাখে।

অন্তঃকর্ণ বা Internal Ear কতকটা শামুকের খোলার মত (Labyrinth) ও অস্থিময়। অস্থিময় এই শামুকের খোলার আকৃতি যন্ত্রটি বড়ই আশ্চর্য্য জনক। এই অস্থিগঠিত (Osseous) শামুকের খোলা ফাঁপা এবং ইহার ভিতর ঠিক্ ইহারই আকারের আর একটি চর্ম্মনির্ম্মিত (Membranous) শামুকের খোল বা Labyrinth আছে। অস্থিময় (Osseous) ও Membranous বা চর্ম্মময় শামুকের খোল সদৃশ যন্ত্রের (Labyrinth) মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা স্থান থাকে ; এইস্থান পেরিলিম্প্ (Perilymph) নামক তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। উপমা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জল পূর্ণ একটি লোহার নলের (Pipe) ভিতর যদি একটী ইণ্ডিয়া রবার নল (India Rubber tube) রাখা যায় তবে লোহার নলের জল Perilymph ও রবারের নলটী চর্ম্মময় শামুকের খোলের (Membranous Labyrinth) তুলনা মনে করিয়া দেয়।

ফুটবলের ছেঁড়া রবারের ব্লাডারের (Bladder) কতকটা যদি খুব জোরে টান করিয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ লোহার নলের মুখটাকে ঢাকিয়া বাঁধা যায়, তবে ঐ বিস্তৃত রবারের উপর একটু চাপ দিলেই সেই চাপ লোহার নলের জলে সঞ্চারিত হইবে। এই নলের অপর প্রান্তটী যে বন্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। Internal Ear বা মধ্যকর্ণে অস্থিময় শামুকের খোলার মুখে ঠিক্ এইরূপই একটী অতি পাৎলা চামড়া দিয়া ঢাকা। সেই চামড়ার উপর মধ্যকর্ণের 'রেকাবাস্থি' অবস্থিত কাজেই উহা একটু নড়িলেই ঐ চামড়ায় চাপ পড়ে ও সেই চাপ ভিতরের পেরিলিম্পে (Perilymph) সঞ্চারিত হইয়া, পেরিলিম্প্-পরিবেষ্টিত চর্ম্মময় শামুকের খোলার (Membranous Labyrinth) দেহে চাপ দিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বায়ু-তরঙ্গ রেকাবাস্থি দিয়া গতিরূপে অস্থিময় শামুকের খোলার মুখের সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণে আসিয়া ধাক্কা দেয়, সেই ধাক্কা উহার চর্ম্মাবরণ (Membrane of the fenestra ovalis) হইতে ভিতরের পেরিলিম্প্ নামক তরল পদার্থে সঞ্চারিত হয়। তাহার পর এই চাপ পেরিলিম্প্ পরিবেষ্টিত চর্ম্মময় শামুকের খোলায় সহজেই বাহিত হইতে পারে। এই চাপ বা Pressure এক অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে স্নায়ু-জালে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্কে যায়। সুতরাং শব্দ-তরঙ্গকে নিম্নলিখিত পথ দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া মস্তিষ্কে যাইতে হয় :—

১ম। বাহিরের বায়ুপথ।
২য়। কর্ণকুহর (External Acuistic meatus)
৩য়। কর্ণপটহ (Tymphanic membrane)
৪র্থ। কর্ণপটহ সংলগ্ন অস্থিত্রয়।
৫ম। "ওভালিস্" ছিদ্রের সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ।
৬ষ্ঠ। অস্থিময় শামুকের খোলাকৃতি যন্ত্রের (Ossous Labyrinth) মধ্যবর্ত্তী "পেরিলিম্প্" (Perilymph)
৭ম। "পেরিলিম্প্-আবৃত চর্ম্মময় শামুকের খোলাকৃতি (Membranous Labyrinth) যন্ত্র।
৮ম। অষ্টম স্নায়ুর স্নায়ুজাল।
৯ম। মস্তিষ্ক।

Membranous Labyrinth বা চর্ম্মময় শামুকের খোলাকৃতির যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ চাপ বা Pressureএ পরিবর্ত্তিত হইয়া ধাক্কা দিবার পর যে কৌশলে সেই ধাক্কা শব্দ জন্মাইবার পক্ষে সাহায্য করে তাহা অত্যাশ্চর্য্য কৌশল পূর্ণ এই কৌশলটি পিয়ানোর (Piano) তারের ন্যায় বলিয়া এই কৌশলময় চর্ম্মাবরণস্থিত যন্ত্রকে, ইহার আবিষ্কর্ত্তা কর্টাই (Corti) সাহেবের নামানুসারে, Organ of Corti বা "কর্টাই যন্ত্র" নাম দেওয়া হইয়াছে। চর্ম্মময় শামুকাকৃতি যন্ত্রের (Membranous Labyrinth) নিম্নভাগ অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য তন্তু (string) দ্বারা গঠিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই কোটী কোটী তন্তুগঠিত চর্ম্মময় নলটির চতুর্দ্দিক পেরিলিম্প দ্বারা পরিবেষ্টিত। তন্তুগুলি এত সূক্ষ্ম যে খুব তেজালো অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহাদের দেখা যায় না। এই অতি সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে পিয়ানোর তারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পিয়ানোর এক একটি তার যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিকে প্রকাশ করে, Internal Earএর এই যন্ত্রের প্রত্যেক তন্তুটি এক একটি পৃথক ধ্বনিকে সূচিত করে।

এই অসংখ্য তন্তুগুচ্ছ এক যোগে Membranous Lrbyrinthএর একাংশ মাত্র গঠিত করিয়াছে। কেমন করিয়া পেরিলিম্পের চাপ (Pressure) এই তন্তুকে কাঁপায় তাহা বুঝিতে হইলে শব্দবিজ্ঞানের Ressonance বা Sympathetic Vibration অথবা "সহানুভূতিতে অনুরণণ" নামক ব্যাপারটি বুঝা আবশ্যক। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই জানেন যে, একই সুরে "বাঁধা" দুইটি এস্রাজের মধ্যে যদি একটিকে বাজানো যায় তবে অন্য এস্রাজটী আপনা হইতে বাজিয়া উঠে। একটী যন্ত্রের ঝঙ্কৃত শব্দতরঙ্গ বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া অপর যন্ত্রটীর তারগুলিতে আসিয়া ধাক্কা দেয় এবং তাহারা একই সুরে বাঁধা আছে বলিয়া দুইটী যন্ত্রের তার একই সুরে ধ্বনিত হইয়া "সমধ্বনি" বা "সহানুভূতিতে অনুরণণ"এর সৃষ্টি করে।

"Organ of Corti" নামক শ্রবণ যন্ত্রটি অনেকটা সুরে বাঁধা অসংখ্য এস্রাজ বা পিয়ানোর তারের সমষ্টি বলিলে ভুল বলা হয় না। বাহিরের অসংখ্য শব্দতরঙ্গ, চাপ বা Pressure রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পেরিলিম্প্ (Perilymph) দিয়া এই "Organ of Corti এর চারিদিকে অনবরত আঘাত করিতেছে। ইহার অসংখ্য তন্তু রাজি এই Pressure দ্বারা কম্পিত হইতেছে। তন্তুগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নির্দ্দিষ্ট সুরে বাঁধা আছে সুতরাং বাহিরের সেই সেই সুর বাজিলে তাহারাও নিজে কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পন "Sympathetic Vibration" বা "সহানুভূতিতে অনুরণণ"—প্রসূত। বাহিরে অসংখ্য শব্দধ্বনিত হইলেও কর্ণের ভিতর এই যন্ত্রে আসিয়া শব্দ তরঙ্গ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। বাহিরে পিয়ানো বাজাইলে যে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হয়, কানের ভিতর সে শব্দতরঙ্গগুলি একত্রে একই সময় ধাক্কা দিলেও, কানের ভিতর পুনর্ব্বার পিয়ানো যন্ত্রের কৌশলেই সেই শব্দতরঙ্গমালা পুনর্ব্বার বিশ্লিষ্ট হইয়া এক্‌একটি পৃথক পৃথক ধ্বনিরূপে মস্তিষ্কে পৌছায়। এই যন্ত্রটিকে একটি পিয়ানো যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। ইহার শব্দবিশ্লেষণের নিপুণক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়।

"শব্দ" বলিতে আমরা প্রত্যেক কথার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের পৃথক্ পৃথক উচ্চারণ বুঝি না পরন্তু প্রত্যেক বাক্যের এককালীন শব্দানুভূতিকেই "শ্রবণ" বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাক্য বিশ্লিষ্ট হইতে এত অল্প সময় লয়, যাহাতে পরবর্ত্তী বাক্যের বিশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এ বিশ্লেষণ ব্যাপার অতিদ্রুত ও আশ্চর্য্য ভ্রান্তিহীন। যদি একটি বাক্য এই যন্ত্রে বিশ্লিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় আর একটি বাক্য আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তবে সে শব্দ অতি কদর্য্যভাবে আমাদের কর্ণে বোধ হয়; তাহা কোলাহল (Noise) রূপেই আমরা শুনিয়া থাকি।

এই সূক্ষ্ম তন্তুগুচ্ছ যে কোনো শব্দকে বিশ্লিষ্ট বা Analyse করিতে পারে। কিরূপে এই তন্তুর কম্পন মস্তিষ্কে বাহিত হইয়া শ্রবণশক্তির উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহা আলোচ্য বিষয়-ভুক্ত। প্রত্যেক তন্তুর সহিত অতি সূক্ষ্ম এক একটি স্নায়ু তন্ত্রী সংযুক্ত আছে কাজেই প্রত্যেকের আন্দোলন জনিত উত্তেজনা (Impulse.) পৃথক্‌ভাবে মস্তিষ্কে যাইতে পারে। এই পৃথক্ পৃথক্ উত্তেজনা অতিক্রতগামী বলিয়া কোন একটি শব্দে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায় না।

অপর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, পেরিলিম্প দ্বারা শব্দতরঙ্গ বাহিত হইয়া Membranous Labyrinthএ ধাক্কা দেয় কিন্তু তথায় বিশ্লিষ্ট না হইয়া শব্দতরঙ্গ একইভাবে ও একটি উত্তেজনা রূপে ঐ চর্ম্মময় শামুকের খোলাকৃতি বস্তুতে আঘাত করে এবং সেই আঘাত স্নায়ু দ্বারা একটি মাত্র অনুভূতিরূপে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। কিন্তু আজকাল এই সিদ্ধান্ত কেহই মানিতে চাহেন না। কারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পূর্ব্বোক্ত Organ of Corti সুস্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছে ও তাহার পিয়ানোর তারের অনুরূপ অতিসূক্ষ্ম তন্তুগুচ্ছের অস্তিত্বও ধরা পড়িয়াছে সুতরাং প্রথম সিদ্ধান্তকে ভুল বলিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি যে ভ্রান্ত তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক্ আমরা প্রথম সিদ্ধান্তকেই মানিতে বাধ্য। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই আশ্চর্য্য পিয়ানো যন্ত্রের কথা ও তাহার আশ্চর্য্য শব্দবিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়াছেন। এত সূক্ষ্ম ও ভ্রান্তিহীন যন্ত্র মানুষ ত রচনা করিতে পারেই না, শরীরের অপর কোন স্থানে এইরূপ যন্ত্রের ন্যায় জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বিতীয় আর একটি আছে কি না সন্দেহ।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

রিক্ত।

ও রে দীন ও রে রিক্ত অন্তর আমার !
নিশিদিন ফেনোচ্ছল তরঙ্গ মাঝার
লীলায়িত গতি-ভঙ্গে একি সঞ্চরণ—
শূন্য-গর্ভ বুদ্বুদের হিল্লোল-নর্ত্তন !
কোথায় দিগন্ত-রেখা ? কোন্ অজানায়
ক্ষান্ত হবে অন্ধ-খেয়া ফেন-হিন্দোলায় ?
হা ভিখারি ! বক্ষে লয়ে বাসনা বিপুল
পূর্ণতার কল্পনায় আনন্দ-আকুল

আপনা ছলিছ নিত্য মিথ্যা প্রবঞ্চনে,
রঙীন স্বপনে রচা শতেক ছলনে ;
ওরে অন্ধ অসহায় ! ওরে নিঃস্ব দীন !
শান্ত কর চিত্ত তব, গতি ক্লান্তিহীন ;
টুটে যাক্ স্বপ্নাবেশ তীব্র পিপাসায়,
ঘুচে যাক্ মোহঘোর মৌন বুভুক্ষায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ক্যামেরার সামনে রাজন্যবর্গ।

আমার বিশ্বাস জগতে স্পেনের রাজাই সব চেয়ে বড় সিগার ব্যবহার করে থাকেন। ১৯০২ খৃঃ তিনি মিউনিচে আমার ষ্টুডিওতে ফটো তুলতে এসে তাঁর পকেট থেকে এক সিগার বের করলেন, লম্বায় প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চ, মাঝখানটা দেড় দু'ইঞ্চ পুরু। রাজা এলফঁনসো'র মুখখানা ছোট; তিনি ফুর্ত্তি ও আরামের সঙ্গে দেয়ালে টাঙ্গান রাজ রাজরা ও আত্মীয় স্বজনদের ফোটোগুলো দেখতে লাগলেন। বোধ হয় আমার মুখে অন্তরের বিস্ময় ফুটে উঠেছিল—আমি এত বড় সিগার এর পূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি। রাজা লম্বা, ছিপছিপে, চলন ফেরন নমনীয় একেবারে নারীর মত, অথচ এমন বিপরীত রস ! যা হোক রাজা তার সহচরের দিকে চেয়ে বললেন "আমার কেসে আর সিগার নেই, তোমার থেকে আমার একটি স্পেশাল সিগার হার বোঁমানকে দেবে কি ?"

রাজা আমার পানে ফিরে বললেন "এ গুলি আমার খুব প্রিয়, হাভেনায় তৈরী, খেয়ে আরাম পাবে।" ভব্যতার উপরোধে আমি সেই বৃহৎ সিগারটি হাতে নিয়ে ধরালেম, জীবনে অনেক কড়া সিগার খেয়েছি কিন্তু এমনটি কখনো খাই নাই। অবশ্য খুব ভাল তামাকের তৈরী, কিন্তু এমন কড়া যে মাত্র দু'চার টান দিতে পেরেছিলাম—সেও সভ্যতার খাতিরে, সিগার আমায় প্রায় ঘুরিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি !

আমার বিশ্বাস রাজা এলফঁনসোর আহত অবস্থার ফটো একমাত্র আমিই তুলেছি। রাজা, কাইজার উলহেলমের সঙ্গে দেখা করে ব্যাভেরিয়ার কোর্টে এসেছিলেন, সমস্ত দিন শিকার করে বন্দুকের নাল টানবার সময় আঙ্গুলে লেগে যায়। রাজা তাঁর হাত উঁচু করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙ্গুল গর্ব্বের চিহ্ন স্বরূপ বের করেছিলেন। তিনি বললেন "হার বোঁমোন আমার আহত অবস্থা দেখাবার জন্যই এ ফটো তুলছি, দেখো এ একখানা ঐতিহাসিক ফটো হবে। ফটো নেওয়া হয়ে গেলে পকেট থেকে কি বের করে আমায় বললেন "হার বোঁমান তোমার কাজ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আশা করি আমার নিজের ফটোও আর যে সব ফটো দেখলুম সে গুলোর মত ভাল হবে, এই মেডেলটি তোমার উপহার।" এর পূর্ব্বে রাজার আদেশে তার মা ঠাকুমা এবং আরো অনেক রাজ বংশীয়দের ফটো আমি নিয়েছিলাম, যে মেডেলটি তিনি আমার হাতে দিলেন

সেট স্পেনের 'অর্ডার অব্ ইসাবেলা ডি কেটোলিকা'। রাজার নিজ হাতে তুলে এই উপহার দানে তাঁর যথেষ্ট সদাশয়তা প্রকাশ হচ্ছিল। ফটোগ্রাফীর সেই প্রথম অবস্থায় অজ্ঞাত অখ্যাত দিবসে যখন রাজা আমার সম্মুখে উপস্থিত সে দিনের অন্তরের ভাব আমি কখনো বিস্মৃত হতে পারবো না। ছেলেবেলা থেকেই আমি ফটোগ্রাফী শিখেছি, ইওরোপের প্রায় বড় বড় সহরেই ষ্টুডিওতে কাজ করেছি। ১৮৮৩ খৃঃ চব্বিশ বৎসর বয়সে উত্তর সাগর তীরে নর্ডানি নামক গ্রীষ্মাবাস স্থানে আমি একটি ষ্টুডিও খুলি, একদিন জুলাই মাসে প্রিন্সেস উল-হেলমের (এখন কাইজারিন জার্ম্মেন) সেরিমোনিয়াল মাষ্টার কাউন্ট মারব্যাচ্ হোটেল ভিক্টোরিয়া থেকে আমায় ডাকলেন, তিনি আমায় বল্লেন প্রিন্সেস একখানা ফটো নেবেন ইচ্ছা করেছেন, সেই অনুসারে আমার ষ্টুডিওতে কখন যাবেন সময় স্থির করে দিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সময়ের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আমি নির্দ্ধারিত সময়ে ষ্টুডিওতে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম, একখানা একঘোড়ার গাড়ী এসে আমার দোরে লাগ্‌ল আমি এগিয়ে গেলাম, একজন মহিলা ও ধাত্রীর কোলে একটি শিশু প্রবেশ করল, ইনিই প্রিন্সেস জার্ম্মেনীর ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী, নারীটিকে আমি দেখ্‌লুম, নমনীয় মাঝারি গোছের, উচ্চ মাথায় সুন্দর কেশদাম, চোখ দুটি গাঢ় নীল বর্ণ। একটি অতি সাধারণ গোছের সাদা লেসে আবৃত পরিচ্ছদ, হাতে একখানা মাত্র ব্রেসলেট, স্বর অতি মধুর কোমল,—মধুর ভাবে আমায় বল্লেন "হার বৌমান আমি আমার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" তিনি ধাত্রীর ক্রোড়স্থিত শিশুটির পানে চেয়ে হাসলেন—সেই শিশুই বর্ত্তমান ক্রাউন প্রিন্স, "আমরা ফটো নেব ইচ্ছা করেছি, আর আশা আছে সে বেশ ভালই হবে, আমি স্বামীকে আমার অবাক্ করে দিতে চাই।"

তাঁকে দেখে প্রিন্সেসের মত মোটেই বোধ হচ্ছিল না, এমনি সাধারণ ধরণ চাল চলন,—আমার সহকারী আয়োজন উদ্যোগ শেষ করলে তখন 'বসা' আরম্ভ হোল। প্রথমে আমরা ভবিষ্যৎ ক্রাউন প্রিন্সের ক'খানি ছবি নিলুম, ছোট্ট জীবন্ত শিশু—চেয়ারে লাফান ও চীৎকার সুরু করে' কত রকমারী আমোদ করতে লাগ্‌লেন, আমি তাঁর গা চাপড়িয়ে বল্‌তে লাগলেম ওই ক্যামেরা থেকে পাখী বের হবে, ওই দিকে চেয়ে থাক্‌লে দেখা যাবে।

প্রিন্সেস বস্‌লে পর সহচরী তাঁর কেশ ও পরিচ্ছদের ভাঁজগুলি ঠিক করে দিলেন, প্রিন্সেস্ বল্লেন "আমার মুখখানা বেশ আনন্দ ভরা দেখ্‌ছেন তো? দেখ্‌বেন খুব বেশী হাসিও কিন্তু থাক্‌বে না মুখে।" মোটের উপর পঁচিশবার আমি ফটো নিলুম, প্রিন্সেস হোটেলে আমায় প্রুফ্ নিয়ে যেতে বল্‌লেন—পরে আমি সেথায় গেলে প্রিন্সেস্ প্রুফ্‌গুলো দেখে চোদ্দখানি পছন্দ করলেন, যে ফটোগুলোয় বেশ হাসিভরা মুখ উঠেছে সেগুলো শুধু পরিবারস্থ লোকদের উপহার দেওয়া হবে, সাধারণ সেগুলোতেও দেখবে, বেশ ভারিকিক গম্ভীরভাব থাকা আবশ্যক—এই আমায় বল্‌লেন। ওর মধ্যে তিনখানা ফটো আমায় দেখিয়ে বল্‌লেন এগুলো ইচ্ছে করলে আমি সাধারণে বিক্রীত করতে পারি, সে ছবিগুলোতে তাঁকে খুব গম্ভীর ভাবে দেখাচ্ছিল, পরে আমি জান্‌তে পেরেছিলাম যে কাইজারের একটা নিয়ম যে-ছবি বাইরে যাবে সেগুলোতে তিনি গম্ভীর কঠোর রাজোয়াজা চাল মুখে, ভঙ্গীতে আনেন; তাঁর মত মুখের হাসি বাইরের লোকে দেখ্‌লে তাঁর মান এবং ক্ষমতার লাঘব হয়।

যখন রাজ রাজাদের একজন কারো ছবি নেবার ভাগ্য আমার হয়েছে তখন সৈন্যদলের ও বড় ঘরের ছবি যে আমি পাব সে নিশ্চিত। সেপ্টেম্বর মাসে নর্ডারনীর মরশুম ফুরিয়ে গেলে আমি বার্লিনে গিয়ে ষ্টুডিও খুলে

বললেন। ডিসেম্বর মাসে কাউন্ট মারব্যাচ্ পটস্ডামের রাজপ্রাসাদে আমায় যেতে লিখলেন। নির্দ্ধারিত দিনে সকাল ১১টার সময় আমি রাজকীয় একটী কক্ষের বাহিরে অপেক্ষা করছিলাম, আমি ও আমার সহকারী একেবারে ঠিক হয়েই এসেছিলাম, প্রিন্সেসকে দেখে আমরা অভিবাদন করলাম। তিনি বললেন প্রস্তুত, হার বেঁামান।

"হাঁ মহানুভব রাজ্ঞী!"

"আসুন আমরা অপর একটী কক্ষে যাই, সেথায় যথেষ্ট আলো পাওয়া যাবে।"

জানালার পূর্ণ আলোর সমুখে একখানি সোফা পাতা, তার উপর নগ্ন ক্রাউন প্রিন্স শুয়ে আছেন। প্রিন্সেস আমায় বললেন এই ছেলের ফটোই তিনি উঠাতে চান।—এগুলো স্বামীকে আমার বড় দিনের উপহার দেওয়া হবে, বড় দিনের আগে শেষ হবে না?

বালকের বসার ভঙ্গী ও ক্যামরা ঠিক করার সময় প্রিন্সেস আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, বার্লিনে এডিলিনা প্যাটির মুজরার কথা উল্লেখে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি করে আমি সঙ্গীত রাণীর মুজরা দেখেছি কি না জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললাম--'আমি প্যাটির একখানা ফটো নেবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম, তিনি আমার একখানা মুজরার টিকিট উপহার দিয়াছিলেন, সে দিন অভিনয়ে স্থান পাওয়া দুর্ঘট ঐ টিকিটের জন্য তিন শত মার্ক (১৫ পাউণ্ড) অনেকে আমায় দিতে চেয়েছিলেন, আমি তা বিক্রী না করে নিজেই মুজরা দেখতে গিয়েছিলেম"

প্রিন্সেস বললেন "ঠিক করেছিলেন হার বেঁামান, আর্ট টাকার অনেক উপরে, আর প্যাটিও আশ্চর্য্য—খুব ভাল করেছিলেন আপনি, টাকা তো আরো অনেক উপায়ে করতে পারেন।"

আটবার ফটো নেওয়া হলে রাজ্ঞী বললেন "হার বেঁামান আপনাকে এখানেই খেতে হবে।" আমি দেখলুম আমার ও সহকারীর জন্য একজন কর্ম্মচারীর কক্ষে খাবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বে থেকেই করা হয়ে গেছে। রাজ্ঞী ফোটোগুলো দেখে এত খুসী যে তিনি বারো ডজনের অর্ডার দিলেন, এবং আমায় দোকানেও বিক্রয় করতে অনুমতি দিলেন, ব্যবসার হিসাবে এ আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ।

রাজ রাজরার ফটো তোলা ব্যাপারে সাধারণ চার্জ্জ আমি চির দিন করেছি, দর দস্তুরের কোন কথা কোন দিন হয় নাই। ১৮৮৫ খ্রীঃ আমি ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হলেম, এর মানে রাজবংশে ও রাজ অতিথিদের সকলের ফটো নেবার ভার আমার উপর, স্থানটী বেশ দর্শনীয় ব'লে প্রায়ই অনেক রাজরাজারা মিউনিচ্ দেখতে আসতেন।

বর্ত্তমান জার্ম্মেণ সম্রাজ্ঞী সিংহাসনে বসতে ১৮৮৭ খ্রীঃ আমি জার্ম্মেণীর কোর্ট ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হলেম তারপর দশ বৎসের মধ্যে আমি স্পেনের রাজা ও রাণী, ব্যাভেরিয়ার রাজা লিয়োপোল্ড, বুলগেরিয়ার জার ফার্ডিনাণ্ড এবং আরোও বহু স্থানে কোর্ট ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হয়েছি।

ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের ওয়েগনারের উপর বড় বিদ্বেষ, তার নাম পর্য্যন্ত কারো সমুখে উচ্চারণ করবার অনুমতি নাই, তাঁরা বলেন লুডউইগের খেয়ালের জন্যই ওয়েগনারের এই প্রতিপত্তি, এই কোর্ট এক দিন ওয়েগনারের—কতখ্যাতি আর আজ যখন ওয়েগনারের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত তখন তার উপর এত বিদ্বেষ! তবে রুমেনীয়ার রাণী কার্ম্মেণ সিলভারের এভাবে আমি দেখি নাই—আমি এই রাণীর বহু ফোটো নিয়েছি, ইয়োরোপের রাণীদের মধ্যে ইনি এক জন সেরা বুদ্ধিমতী, মনে পড়ে এক দিন তিনি এসেছিলেন আমার কাছে টান হাঁসারের বাদ্যে

অভিভূত হয়ে—পূর্ব্ব রজনীতেই তিনি এর গান-বাজনা শুনে এসেছিলেন—রাণী বলিলেন, "এর যেমন বাজনা শুনলেম এমন আর কোথাও শুনি নি, অদ্ভুত প্রতিভা অপূর্ব্ব—আশ্চর্য্য !"

অনেকে অনেক সময়ে আমায় জিজ্ঞাসা করেন আর্টিষ্টের চোখে ইওরোপের কোন রাজ ঘরের নারী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আমার বোধ হয় শারীরিক সৌন্দর্য্য হিসাবে ধরতে গেলে স্পেনের রাণী ইনফ্যান্টা ইওলেলিয়া সেরা সুন্দরী, আমি তাঁর এবং তাঁর বোন ইনফেন্টা ইসাবেলার অনেক ফোটো নিয়েছি।

ইটালির রাণী হেলেনা সজীব বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মাধুরী এবং হাসির আশ্চর্য্য সমাবেশ। ইনি জগতের সব রাণীর চেয়ে সুপরিচ্ছদ-ভূষিতা। রাজ্ঞী হেলেনা প্রায়ই হালকা রঙের জমকালো লেসওয়ালা একেবারে নূতন ধরণের প্যারী ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কোন রূপ হীরা জহরৎ কখনো পরতে দেখি নি। দেখতে বেশ লম্বা, ফিট্‌ফিটে মধুর রং,—স্বর মৃদু, সঙ্গীতে ভরা তরঙ্গায়িত। নমস্কার করে আমি রাণীকে ক্যামেরার সম্মুখে কোথায় বসতে হবে দেখিয়ে দিলে তিনি রূপো বাঁধা আয়নাখানি হাতে ধরে—কখনো হেসে মুখভঙ্গী বদলে কি ভাবে ভাল দেখাবে, নিজেই পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার কেশ ঠিক আছে তো ?" তারপর তিনি সেই কুন্তলগুচ্ছের ওপর হাত দিয়ে, ক্রু জোরা অঙুল দিয়ে একটু টেনে—পরিচ্ছদের ভাঁজ ঠিক করে, ফোটো উঠাতে বললেন।

আমি রাজ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয় প্রথমে কখনো কোনও কথা বলতে যাই নি। কেহ কেহ মনে করেন তাদের সম্মুখে অতি বিনীত ভাব দেখাতে হবে, আমি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, কোনরূপ অতি সম্মান কিম্বা দাসের মত ব্যবহার তারা অপছন্দ করেন। রাজ রাজারা সাধারণ বন্ধু ভাবে ব্যবহার পেতে চান কোর্টের চাল চলনের গণ্ডী কাটিয়ে ছবি ওঠাবার সময় ওঁরা যেন অনেকটা গণতন্ত্রবাদী হবার সুবিধা পান।

রাণী হেলেনা বললেন "দেখুন দেখি আমার হাত ঠিক রাখা হয়েছে কি না, আর কি রকম করতে হবে বলুন।" রাণী ফোটোতে বেশ ভাল দেখতে চান এবং সে কথা সরল ভাবে বলেন।

রাণী হেলেনার পর অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা বাভেরিয়ার প্রিন্স লিওপল্ডের পত্নী জিসেলা অতি সৌন্দর্য্যময়ী নারী। রাজ বংশীদের মধ্যে বড় দিনের সময় নিজ নিজ ফোটো উপহার দেওয়ার প্রথা বেশ চলিত, এ উদ্দেশ্যেই প্রিন্সেস প্রথম আমার কাছে ফোটো তোলাতে আসেন। আমি তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, লম্বা, কোমল ননীর মূর্ত্তি—সুন্দর; একেবারে নূতন প্যারী মডেলের পরিচ্ছদ পরিহিতা। মুখখানা খুব সুন্দর না হলেও তার দেহের গঠন অপূর্ব্ব. কোমর দু' হাতের আঙুল দিয়ে মাপা যায়, প্রিন্সেস জিসেলার কটিদেশ ইওরোপের সব রাণী. রাজবধূ ও রাজকন্যার চেয়ে সরু সন্দেহ নাই।

রাজা আলফনসোর মা রাণী ক্রিশ্চিনা অধিকাংশ সময়ই মিউনিচে কাটান, সব রাণীর মধ্যে তাঁকেই দেখেছি খুব স্ফূর্ত্তি-বাজ আনন্দময়ী। তিনি সব সময়ই অপেরা, থিয়েটার—কোন না কোন আমোদে যোগ দিয়ে আছেন।

ব্যাভেরিয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসা ইওরোপের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে দানশীলা রাণী, দরিদ্রের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি—এই মহৎ কার্য্যে তিনি সদাই অগ্রগণ্যা, ইওরোপের রেড্ ক্রস সোসাইটির নেত্রীরূপে তিনি সর্ব্বদাই ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, মনে পড়ে একদিন ফোটো তুলতে এসে বলছিলেন—"হার বোমান আমরা রেড্‌ক্রসের জন্য খুব বড় একটা মেলা দিচ্ছি—এ যাতে বেশ ভাল ভাবে উৎরে যায় আমারও খুব ইচ্ছা।— তুমি সেই মেলায় ছবি তুলে আমাদের সাহায্য করবে না ?"

তিন দিন আমার এই মহৎ কার্যের জন্য বিনি পয়সার কাজ করতে হবে,—সেদা তাজলে রাণী আমার বললেন—"বেশ কাজ করেছ তুমি, মহৎ কার্যে আমাদের সহায়তা করেছ, অপরকে সাহায্য করা আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ কার্য্য। মানবিকতার এ একটি মহৎ কার্য্য—এ কাজও আমরা পুরস্কার ছাড়া করি না, আপাততঃ আর্থিক ক্ষতি কিছু হলেও—এ সব তোমার পুষিয়ে যাবে।"

স্পেনের রাজার এক খুড়ো প্রিন্স ডাক্তার লুডউইগ্ ফার্ডিনাণ্ড মিউনিচে নিজ খরচায় এক প্রকাণ্ড হাসপাতাল চালিয়ে থাকেন, একদিন ফটো তুলতে এসে তিনি বললেন চিকিৎসা বিদ্যাই সব চেয়ে তাঁর ভাল লেগেছে।

"রাজবংশে জন্মেছি এই শূন্য সম্মানে কোন তৃপ্তি নেই—তৃপ্ত হচ্ছে কার্য্যে।"

প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড আজীবন চিকিৎসা-শাস্ত্র চর্চ্চা করেছেন, বোধহয় এখন ইনি ইওরোপের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, ইনি লম্বা জোয়ান, চোখে বিশ্ব-ভালবাসার জ্যোতিঃ কতকটা কবি-ধরণের। শত সহস্র দরিদ্রের চিকিৎসা করছেন—ঔষধ এবং নিজকে বিন-খরচায় সকলের কাছে সহজপ্রাপ্য করেছেন, নিজের আমোদের জন্য ইনি ভায়োলিন বাজিয়ে থাকেন।

রাজাদের ফোটোগ্রাফার হিসাবে অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে আমার মন্দ আমোদজনক হয় নি, মনে পড়ে এক দিন বিকেলে গ্রাণ্ড ডিউক লুডউইগ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কক্ষে উপস্থিত। সদা হাস্যময় কোন আদব-কায়দার ধারও বড় বেশী ধারেন না, হাস্তে হাস্তে বল্লেন "ভার বৌমান, ধূম পান করতে না পেয়ে মারা গেলাম—হবে কি এখানে?" ইওরোপে রাজারা কেউ রাস্তায় ধূম পান করেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন এতে তাঁদের মানের খর্ব্বতা হয়।

আমি বলিলাম "নিশ্চয় খান না" তখন তিনি সিগার ধরিয়ে বেশ করে ধূম পান করে বেরিয়ে গেলেন।

একবার প্রিন্স লিওপোল্ড তাঁর ছেলে চারি বৎসরের বালক রিউপার্টকে (এখন ব্যাভেরিয়ার ক্রাউন প্রিন্স) নিয়ে আমার ষ্টুডিওতে আসেন, আমার ছেলে তখন একখানা সাজান বেত হাতে নিয়ে খেলছিল, বেতখানার উপর রাজপুত্রের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল, দৌড়ে গিয়ে তিনি বেতখানা ধরলেন, দুই শিশুতে অবশ্যম্ভাবী টানাটানি সুরু হোল, কিন্তু রাজপুত্র ছিলেন আমার পুত্রের চেয়ে বলবান—আমার ছেলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, রাজপুত্র বেতখানা ততক্ষণ অধিকার করেছেন। তাঁর বাবা বল্লেন—

"ওটা ফিরিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি"—ছেলেটি মুখখানা বিকৃত করলে—যেন প্রায় কেঁদে ফেলে। তখন তাঁর বাপ বললেন—"যাহোক্ এ নিয়ে আর ফোটো নষ্ট করা যায় না"—আমি আমার ছেলেকে কক্ষ থেকে সরিয়ে দিয়ে ফোটো নিলুম, যখন তাঁরা উঠবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাঁর বাপ বেতখানা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সেখানা বালকের মনে ধরেছে, সে কাঁদিতে লাগল! আমি বললুম— নাও তুমি বেত।" আমার খোকাও ঘোর অনিচ্ছায় দানে সম্মতি দিল। এর ক'দিন পরেই মূল্যবান একখানা বেত এসে উপস্থিত—প্রিন্স আমার ছেলেকে উপহার পাঠিয়েছেন।

বহুদিন আমেরিকা ঘুরে আসার পর প্রিন্সেস পের্সা ফোটো তোলাতে এলেন, ইনি ব্যাভিরিয়ার রাজার বোন, ইউরোপীয় প্রিন্সেসদের মধ্যে একজন অতি বুদ্ধিমতী, এঁর মন উদার,—জগতের রাজনীতি, শিল্পকথা সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান। ক'খানা বইও লিখেছেন আমার কাছে এসে বেশ আলাপ করেন, তাঁর ভ্রমণকাহিনী আমি

আনন্দের সঙ্গে গান, বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ইনি। বললেন "হার হোমান আমেরিকার সহরগুলির মধ্যে সেরা নিউইয়র্ক আমি বড় ভালবাসি, এ যেন সৌন্দর্যসম্ভারের প্রাচুর্যে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এ আমেরিকার শিল্প এর মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বস্থানের চিহ্ন পাবে। সমগ্র ইউরোপের শিল্পের ধারা এখানে মিশ্রিত হয়েছে। এখানে এলে যেন কল্পনার একটা নূতন সুবৃহৎ দোর খুলে যায়, এই ইউনাইটেড ষ্টেটস্ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সব চেয়ে শক্তিশালী দেশ হতে যাচ্ছে। বাণিজ্য এরই ইঙ্গিতে চলবে, এ আমাদের সকলকার আগে চলবে। হার হোমান আমি আমেরিকার নারীদের বড় পছন্দ করি, নানারূপ নিয়মের শৃঙ্খলো এঁরা শৃঙ্খলিতা নয়, আমাদের মত শত বাধা এদের পায় পায় নেই, তাদের মাথা আছে এবং সে কাজে লাগাবে উন্নত করার ক্ষেত্রও তাদের আছে—আরো তাদের চেহারা খুব ভাল না হলেও তারা জানে কেমন করে ভাল দেখাতে হয়। হেসে বললেন "হার হোমান আমার ইচ্ছে হয় আমেরিকায় বাস করি।"

কেমন একটা ভীতি নূতন ভাব আসতো প্রথম প্রথম রাজাদের সম্মুখে যেতে—তারপর রাজা রাণী রাজপুত্র বা রাজকন্যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একটা সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। রাজাদের সাধারণে যেস্থানে মনে মনে বসিয়ে রাখে তার অধিকাংশই কাল্পনিক—এরাও সাধারণ মানুষের মতই মানুষ, কোর্টের নানারূপ নিয়মকানুনে বদ্ধ থেকে—একটু সাধারণ মানুষের সহজ স্বাধীনতা পাবার জন্য ব্যগ্র, আমার বিশ্বাস রাণীদের যদি গৃহস্থালীর কাজ করতে হয়, তো মাংসের দাম নিয়ে এদেরও মাথা ঘামাতে হবে। জাতীয় কোন বড় নীতি আর্থিক বা সামাজিক কোন প্রশ্ন এ সব সম্বন্ধে তাঁরা সাধারণে কচিৎ কোন মত ব্যক্ত করে থাকেন। সোজা কথা এ সব জিনিস তাঁদের মন্ত্রী অমাত্যরাই ভেবে রাখেন, রাজার নূতন মত কিছু দেওয়া হয় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে, প্যারী থেকে কি ধরণের নূতন পোষাক এল রাজকন্যা সেই নিয়েই মগ্ন আছেন, রাজপুত্র আছেন তাঁর নূতন ব্রাণ্ডের সিগার নিয়ে, সকলেই ক্যামেরার সামনে খুব ভাল দেখাতে ইচ্ছুক এবং সাধারণে কিভাবে ফোটোখান নেবে—সে বিষয়ে সকলের চিত্তই সজাগ।

এই সব রাজাদের এবং তাদের ব্যক্তিত্বের কথা মনে উঠলে কাইজারের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার অনেক রাজা মহারাজাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু কাইজার উলহেলমের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি কথাও বিস্মৃতিতে ডুবে যায় নাই। কাইজারের প্রবল নূতন ধরণের ব্যক্তিত্ব নিজেকেও চালায়, অপরকেও চালিত করে, ক্যামেরার সামনেও নিজ ভঙ্গী নিজেই ঠিক করে নেন, এমন কি ফটোগ্রাফারকে পর্য্যন্ত কোন রূপ ইঙ্গিত করবার সুযোগ দেন না, ইনি সব সময়ই যোদ্ধা, প্রভু ও শাসক। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কোর্ট ফটোগ্রাফার রূপে প্রায়ই বার্লিন হতে আমার ফটো তোলাবার ডাক আসতো, সব বারই কাইজার আমার ও আমার সহকারীদের হোটেল বিল জোর করে দিয়ে দিতেন।

তার এই উদ্দাম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাইজারিণের অপূর্ব্ব মধুর সৌন্দর্য্যের বিচিত্র মিলন হয়েছে। কাইজার কর্কশ তীক্ষ্ণ সৈনিকের স্বরে কথা বলেন, সম্রাজ্ঞী কোমল মৃদুমধুর স্বরে কথা বলেন। কাইজার তাঁর বিদ্যুৎশক্তিতে ঝলসে দিয়ে যান, কাইজারিণ অমায়িক সুন্দরী, নেহাৎ ঘরোয়া রমণীর মত। একবার মনে পড়ে রাজপ্রাসাদে গিয়েছিলাম কাইজারিণ ও প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া লুইসার ফটো নিতে, কাইজারিণকে সব সময়ই দেখেছি সাধারণ পোষাক পরতে—এবার দেখলুম সাদা সিল্কের পোষাক, কাল লেসে আবৃত—কোনরূপ গহনার আড়ম্বর মোটে নেই, তার পর এক দিন কাইজার ইউনিফর্ম নিয়ে এক ফটো তুললেন। হাতে তাঁর অসাধারণ বৃহৎ এক আংটি—তার হীরে

কত প্রকাণ্ড! কাইজারিণ তাঁর ফটো তুলিয়েছেন পেছনটা একেবারে ফুলে মণ্ডিত ক'রে। তিনি বল্‌ছিলেন ফুল বড় ভালবাসেন, ফটোতেও তাই ফুল দিয়ে ওঠার ইচ্ছা—ফুলের পাশে ফটো তুল্‌তে দাঁড়ালেন অজ্ঞাতসারে, হাতখানি কেশদাম সংযত করে দিল, এ ছাড়া নিজ বেশবিন্যাসে তাঁকে কোন দিন বড় মনোযোগী দেখি নি। কিন্তু যখন রাজকন্যার ফটো নেওয়া হোত তখন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তিনি বল্‌তেন—"হার বোঁমান খুব সুন্দর ফটো চাই—খুব সুন্দর।"

মেয়েকে তাঁর নানা ভাবে দাঁড় করাতেন, এক জন কেশবিন্যাসকারিণী কেশদাম ঠিক করে দিত, রাজ্ঞী হাঁটু গেড়ে বসে পোষাকের ভাঁজ ঠিক করে দিতেন।

শেষ বার যখন কাইজারের ফটো তুলি, যে কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। বার্লিন থেকে ডাক পড়লো,--কাইজার কতকগুলি ফটো নেবেন, তিন জন সহকারী নিয়ে আমি প্রাসাদে গেলাম, মিনিট পাঁচেক পাশের কক্ষে অপেক্ষা করার পর সাম্‌নের কক্ষের দ্বার খুলে গেল, কাইজার 'হুঙ্গেরিয়ার সৈনিকের' পরিচ্ছদে বেরিয়ে এলেন মাথা সোজা করে মিলিটারী কায়দায় পা ফেলে কক্ষে ঢুকলেন, ব্যক্তিত্ব তাঁর বিদ্যুৎ-বর্ষী, সমস্ত কক্ষ তাতে উদ্ভাসিত হ'ল—বাতাস পর্য্যন্ত যেন স্তব্ধ !

"নমস্কার ভদ্রমণ্ডলী"

স্বর প্রভুত্বব্যঞ্জক—প্রতিধ্বনি উৎপাদনকারী, প্রতিটি ভঙ্গীতে সামরিকরীতির সম্পূর্ণতা দেখাচ্ছিলেন, দৃষ্টি যেন তাঁর আমাদের গ্রাস কচ্ছিল, কাইজার যখন কথা বলেন তখন তিনি চোখের পানে স্থির গভীর দৃষ্টি রেখে কথা বলেন। তোমার মনে হবে তিনি যেন তোমার অন্তর পড়ে নিচ্ছেন। বল্‌লেন—

"ফটোগ্রাফার কোথায় ?"

আমি এগিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোথায় আমি দাঁড়াব—আলো বেশ ভাল কোথায় ?" এ যেন তিনি মিলিটারী অর্ডার দিচ্ছেন, আমি স্থান দেখিয়ে দিলাম, কাইজার গিয়ে দাঁড়ালেন, এক একবার ফটো তোলা হলে তিনি ইচ্ছামত ভঙ্গী বদলিয়ে আবার তুল্‌তে বলেন—বসে ফটো তোলেন না, এতে মর্য্যাদার লাঘব হয় মনে করেন।

এই রকম ফটো পছন্দ করেন যাতে, তাকে খুব কঠোর প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাবে দেখা যায়। ফটো ওঠাবার সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য আমি দেখেছি যাতে ফটো সেনাদলের প্রিয় হয় তারপর সাধারণের। আমি ফটো নিতে আরম্ভ করলুম সহকারীরা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছিল। কাইজার একের পর এক ভঙ্গী বদলাচ্ছিলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা,—কি ভাবে কোন ফটোখানি তুলতে হবে সে ঠিক করাই আছে। ক্যামেরার সামনে সুদক্ষ অভিনেতার মত ভঙ্গীর পর ভঙ্গী বদলাচ্ছিলেন। গোঁফ জোড়ার উপর তার প্রখর দৃষ্টি—এক একবার ফটো নিতেই আঙ্গুল দিয়ে গোঁফ জোড়া মুচড়ে দিচ্ছিলেন। দাঁড়ানোর সব ভঙ্গীই সব মিলিটারি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করছিলেন।

"বেশ নাও এইবার বোঁমান," এযেন চলন্ত ফটো নেওয়া, প্লেটগুলো আমার ও সহকারীদের মধ্যে অনবরত ফিরছিল। কাইজার বললেন 'ঢের হয়েছে,' চল্লিশ মিনিটের ভেতরে পঁয়ত্রিশখানি ফটো নেওয়া হয়েছিল। সবগুলিই বিভিন্ন ভঙ্গীতে। বললেন—"আমি যেমন পছন্দ করি আশা করি ফটোগুলো তেমনি হবে—পরে অর্ডার যাবে।"

যখন প্রুফ ফিরে পেলাম—দেখলাম 'রি-টাচ্' করবার মত অতি আবশ্যকীয় কয়েকটি স্থান তিনি দেখিয়েছেন। পোষাকে একটিও ভাঁজের দাগ না থাকে এ বিষয়ে তিনি ভারি সতর্ক, অধিকাংশ ফটোতেই খুব গম্ভীর—ফটো পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন। সেবার ফটোতে তিনশত পাউণ্ড পরিমাণ আমায় দেন। মনস্তত্বে কাইজার যে অতি নিপুণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।*

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বরলিপি।

মেঘমল্লার—তেতালা।

এল বাদল মেঘ-ডমুরু বাজায়ে
মধুর মধুর ধ্বনি বাজিল পায়ে!
দামিনী ঝলকে ওড়না উড়ায়ে!
ঝনননন ঝননন, ঝননন বোলে,
আকুলি বিকুলি ঘন, ঘন ঘন রোলে
প্রলয় পবনে সঘনে তরসায়ে।

গান ও সুর :—শ্রীউমীচাঁদ গুপ্ত। স্বরলিপি :—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

II

II রা-গা রা গমপা | মা গা রসণ্‌া সা | -া রগা রা গা | মপধা পমপা মা-গমা I
এ • ল বা দ ল মে ঘ • ডম রু বা জা • য়ে •

I -রা ররা মা মা | পা পা মা পা | ধনা-র্সা ধা পা I মপা-ধপা মা-গা I
• মধু র ম ধু র ধ্ব নি বা • জি ল পা • য়ে •

I গনা- া- না না | র্সা র্সনা র্রর্সা-পা | পা র রা গা | মপধা-পমপা মা-গমা II
দা • মি নী ঝ ল কে • ওড় • না উ ড়া • য়ে •

II -া মপা পা পনা | না না নধা না | -া র্সর্সা র্সা র্সর্রা | র্সনা-র্সা র্সা-া I
• ঝন ন ন ঝ ন ন ন • ঝ ন ন ন বো • লে •

I পা পনা না না | র্সা র্সা র্সনা র্সা | -া নর্সা না নর্রা | র্সণা-ধা পা -া I
আ কু লি বি কু লি ঘ ন • ঘ ন ঘ ন রো • লে •

I -রা ররা মা মা | পা পা গমা পা | পর্সা-া ধা পা | মপা-ধপা মা গমা II
• প্র ল য় প ব নে স ঘ নে • ত র সা • য়ে •

---

* জার্ম্মেন সম্রাটসম্রাজ্ঞী, ইটালির রাজা ও রাণী, স্পেনের রাজা ও রাণী, বুলগেরিয়ার জার ও জারিণা, সার্ভিয়ার রাজা প্রভৃতির কোর্ট ফোটোগ্রাফার এ্যাডলফ্ বৌমানের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

বোঝা।

—*—

চিরদিনের তরে এযে
বোঝা নিলেম মাথে
রাখবো আমি এরে সদা
আপন সাথে সাথে।
দুঃখে সুখে হাস্য মুখে
আগুণ যখন জ্বলবে বুকে
এই তো আমায় তুষবে জানি
তুলবে আপন হাতে
পিছল পথে ধরবে আমায়
জ্বালবে আলো রাতে।
সারাদিনের কাজের শেষে
ফিরবো যখন ঘরে এসে
দেহ যখন ভরবে অলস
ক্লান্তি আপনাতে
শ্রান্তি আমার দূরে যাবে
তারি নয়ন পাতে

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

থিয়েটার-দেখা।

——:*:——

(চিত্র)

(১)

রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের বারেণ্ডায় গালিচার উপর বসিয়া উজ্জ্বল আলোর সামনে মাথা হেঁট করিয়া 'নন্তু' মখমলের জুতায় রেশমের ফুল তুলিতেছিল। । নন্তুর বয়স বছর এগারো, প্যাংলা ছিপ্ছিপে গড়ন, মুখশ্রী অতি সরলতার ও কোমলতায় সমাবেশে মনোরম সুন্দর, রং ফর্সা। নন্তুর ডান পাশে বড় দিদি, বিমলা বসিয়া একখানা বাংলা

উপন্যাস পড়িতেছিলেন। আলোর অপর পাশে বড় জামাইবাবু অর্থাৎ বিমলার স্বামী বিপিনবাবু একটা তাকিয়া হেলান দিয়া শুইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখে করিয়া, খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। বারেণ্ডার অন্যপাশে দোলনায় শুইয়া বিমলার তিন মাসের খোকাটি অগাধে ঘুমাইতেছিল। সকলেই নীরব, শুধু গুড়গুড়ির মৃদু-গম্ভীর অলস-আর্ত্তনাদ এক-বাই ধ্বনিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে খবরের কাগজখানা শেষ করিয়া বিপিনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বড় দিদি বই হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন "খাবার দিতে ?"

বিবিনবাবু বলিলেন "আঃ, এর মধ্যে! ন-টা বাজুক-ই না। হার্ম্মোনিয়ামটা নিয়ে আসি, নন্তু জুতো সেলাই রেখে সোজা হয়ে বস—"

নন্তু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষিপ্র-কৌশলে স্ূঁচ চালাইতে চালাইতে সবিস্ময়ে বলিল "তা বলে জুতো সেলাই ছেড়ে আমি এখন চণ্ডীপাঠ ধরতে পারব না জামাইবাবু, লক্ষ্মিটী, এখন বল্‌বেন্ না।—"

টেবিলের উপর হইতে হার্ম্মোনিয়াম পড়িয়া চাবি টিপিয়া ধরিয়া বিপিনবাবু বলিলেন "লক্ষ্মিটীই বল, আর দুষ্টুটীই বল, আমি ছাড়চি নে। গাও 'প্রলয় পয়োধি জলে—"

ঘাড় নাড়িয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে নন্তু বলিল "ওমা! প্রলয় না হলে বুঝি 'প্রলয়-পয়োধি-জলে' গান করা হয়!—"

বিপিনবাবু বলিলেন "দেখ্‌বে, প্রলয় হওয়ার? ঐ স্ূঁচ সুতো কেড়ে নিলেই এখুনি—"

সভয়ে নন্তু বলিল "না জামাইবাবু, আপনার পায়ে পড়ি,—"

বড় দিদি বইখানা মুড়িয়া গালিচার উপর শুইয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন "গা' না বাপু, ক'দিন-ত গাস্ নি,—হাফ্‌ইয়ার্লি একজামিন হয়ে গেলে গান শোনাবি বলেছিলি মনে আছে ?"

অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নন্তু বলিল "এই! দিদি সুদ্ধ জামাইবাবুর দিক হয়ে দাঁড়ালে! তোমাদের জ্বালায়, সত্যি আমার আর কিছু হবে না, কিছুটী—না!—"

বিপিনবাবু একটা সুর আরম্ভ করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন "এত বিদ্যের পরও 'কিছুটী না?' সে কি? আরস্থলোর বাচ্চা ছারপোকা বিছানায় থাকে কেন? না—পাখা নেই, ছেলে মানুষ, উড়্‌তে পারে না বলে!—কুমীরের বাচ্চা টিক্‌টিকি দেয়ালে বেড়ায় কেন? না—কচি ছেলে, জলে নাম্‌লে সর্দ্দি করবে বলে। পায়রাগুলো বক্‌-বকম্ বকৃতে বকৃতে টবে মাথা ডুবিয়ে চান্ করে কেন? না, কুন্তলীন তেল মাখিয়ে দেওয়া হয় নি, সেই দুঃখে! এমন অগাধ বিদ্যের পরও কিছু না!—একি আশ্চর্য্য কথা!"

বলা বাহুল্য উক্ত অগাধ বিদ্যাগুলা,—নন্তুর শৈশব জীবনের স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল! লজ্জায় অস্থির হইয়া সে বলিল "হ্যাঁ তা বই কি! যান্ আমি কিছুতেই গান গাইব না, কিছুতেই না! আপনি স্ূঁচই কাড়ুন আমি কিছুতেই না! এইখানে শুয়ে চুপ্‌টী করে ঘুমিয়ে পর্‌ব সেও ভালো,—তবুও, না!"

টপাটপ্ চাবির উপর আঙ্গুল চালাইয়া বিপিনবাবু—সঙ্গীত কলার নির্দ্দিষ্ট সুর তালের সাক্ষাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ স্বরূপ অসহনীয় বেসুরা চীৎকারে গান ধরিলেন "ও বাবা, কি কালো!"

নন্তু হাসিয়া ফেলিল! সেলাই হইতে চোখ তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া কৌতুক-কোমল কণ্ঠে বলিল "দেখ্‌ছ ভাই দিদি! সাধে বলি, পুরুষ মানুষদের গান শুন্‌লে আমার বড্ড হাসি পায়! চ্যাঁচ্যান'র দৌড় দেখ দেখি!— "ও বাবা!" উঃ, কি চিচ্‌কার! যেন কেউটে সাপ দেখে লাফিয়ে উঠ্‌লেন্! ওমা একি? এর নাম গান?—"

"তবে রে পাজি!—" বলিয়া বিপিনবাবু হারমোনিয়াম ছাড়িয়া নন্তর দিকে অগ্রসর হইলেন, নন্ত চক্ষের নিমেষে সেলাই ফেলিয়া, লঘু লম্ফে ছুটিয়া বারেণ্ডার দুয়ারের দিকে দৌড়িল! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, অলঙ্কার ও সুবসনে সসজ্জিতা এক ষোড়শী সুন্দরী হাসিমুখে ব্যস্তভাবে বারেণ্ডায় ঢুকিয়াই—সহসা নন্তকে সামনে দেখিয়া, সবিস্ময়ে বলিল "এ কিরে! এমন করে ছুট্‌ছিস্ কেন?"

ষোড়শীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার আড়ালে নিজেকে উত্তমরূপে নিরাপদ করিয়া, নন্ত অনুযোগ পূর্ণ স্বরে বলিল "দ্যাখো না ভাই মেজ দি, জামাইবাবু আমায় ধর্‌তে আস্‌ছেন্—"

পিছনে দুহাত ঘুরাইয়া, ছোট বোনটিকে সাদরে বেষ্টন করিয়া, মেজদি হাস্যোজ্জ্বল মুখে তর্জ্জন করিয়া বলিল "বটে! এত অত্যাচার! এমন অরাজকতা! আপনি কি রকম ভদ্রলোক বলুন ত?—"

বিপিনবাবু যারপর নাই বিস্ময়ের সহিত পিছু হটিয়া গিয়া বলিলেন "ও বাবা! এ কি! আচম্বিতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলীশ!—"

মেজ-দি স্মিতমুখে বলিল "সেটা অত্যাচারীর চোখে! অত্যাচার-পীড়িতের চোখ নিয়ে যদি দেখ্‌তে পারেন, তবে এ অধমের চেহারাটা অন্য রকমই দেখ্‌তে পাবেন, না হয়—দয়া করে মাইক্রোশ কোপ্‌টা চোখে আঁটুন্—"

সহসা অপরিসীম উৎসাহের সহিত বিপিন বাবু বলিলেন "গুড্ ইভনিং মেম্‌সাহেব! কামিং, কামিং, বসুন এই ইজি চেয়ারটায়। কইরে সিগার কেস্‌টা কোথায় গেল—"

মেজদির উপর এতটা অবিচার নন্তর মোটেই সহ্য হইল না! সে তাড়াতাড়ি মেজদির বাঁ দিক হইতে মুখ বাড়াইয়া সকোপে বলিল "আহা, নিজেদের যেমন বিদ্যে! রাতদিন্ ঐ সব অসভ্য অসভ্য নেশা নিয়ে পড়ে আছেন, আবার মেজদির নাম করা হচ্ছে! মেজদি কেন সিগারেট খাবে, আপনি খান্‌গে!—"

নন্তকে টানিয়া লইয়া গালিচার দিকে মেজদি অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বিপিন বাবু শশব্যস্তে বলিলেন "আহা ওদিকে কোথা মেম সাহেব? এই যে চেয়ার"—

মাথা নাড়িয়া সুকোমল কণ্ঠে মেজদি বলিল "আমি মেমও নই, সাহেবও নই, খাঁটি বাঙালী! আমার পক্ষে বাংলা গাল্‌টেই ভাল, বিশেষ আমার দিদি ওখানে বসে রয়েছেন। তা ছাড়া গুরুজনের সামনে উচ্চ আসনে বসাটাও অবিধেয়!—"

নন্ত মাঝখান হইতে টিপ্পনী কাটিয়া বলিল "সে বুদ্ধি কি ওঁর আছে? তা হলে কি আর আমাদের সামনে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে অসভ্যের মত তামাক টান্‌তে পারেন! মাগো ছিঃ!—" কথাটা বলিতে বলিতেই সাগ্রহে মেজদির মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "হাঁ ভাই মেজদি, মেজ্ জামাইবাবু এসেছেন?"

বিপিনবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "কেন? এতক্ষণ মেজ্ জামাইবাবুর জুতো সেলাই হোল, এবার গোঁফে তা লাগাতে হবে বুঝি?"

অসহিষ্ণু হইয়া নন্ত বলিল "কেনই বা হবে না? মেজ্ জামাইবাবু তো আপনার মত অসভ্য নন্, সেই জন্যেই তো তাঁকে ভালবাসি—"

বিপিনবাবু সশব্দে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহা আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন "এঁ্যা! একেবারে কবুল জবাব! প্রতিমা দেবী সাবধান, সাবধান, আর রক্ষা নাই—"

প্রতিমা,—অর্থাৎ মেজদি স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিল "প্রতিমা দেবী, সাবধান ছেড়ে, খোশ মেজাজে দানপত্র লিখে দিতে রাজী আছে, আপনি ত এ্যাটর্নি মানুষ জামাইবাবু,—আপনি ঘটকালীটা—"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া মেজদির মুখ চাপিয়া ধরিয়া, সলজ্জ অনুনয়ের স্বরে নন্তু বলিল "না ভাই ছিঃ, ও কি ভাই মেজদি! আমি কি ভাই তাই বল্‌ছি,—আমি বল্‌ছি ভাই,—এই আমি কিনা মেজ্‌ জামাইবাবুকে, ভাই,—বেশ আন্তরিক ভালবাসি—"

হাতের উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া উল্লসিত চীৎকারে বিপিনবাবু বলিলেন "এ্যা—এই! কবুলের ওপর কবুল,--ডবল কবুল! শুধু ভালবাসা নয় বেশ আন্তরিক ভালবাসা! বাপ্‌, ভয়ানক ঘোরালো ব্যাপার!"

লজ্জায়, দুঃখে অস্থির হইয়া, অধৈর্য্য ভাবে বিপিনবাবুর পায়ের পাতার উপর এক চড় বসাইয়া দিয়া, নন্তু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল "হ্যাঁ আমি তাই বল্‌ছি না কি! হ্যাঁ, যান, আমি আপনার সামনে আর আসিব না—যান!"

সে ছুটিয়া নীচে চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনবাবু ধরিয়া ফেলিলেন! পালাইবার পথেও বাধা পাইয়া, ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া, গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িয়া, সে দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। বিপিনবাবু তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া,—ক্রন্দন-সুর অনুকরণের ব্যর্থ-চেষ্টায়, হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে গলার স্বর কাঁপাইয়া সান্ত্বনাচ্ছন্দে, সহানুভূতি জ্ঞাপন আরম্ভ করিলেন "আহা মরে যাই, মরে যাই, সত্যযুগ থেকেই এই এক ব্যাপারই চলে আস্‌ছে,—ভালবাসার পরিণাম—কান্না, কান্না, শুধুই হৃদয়-বিদারক কান্না! আহা, কি অনুতাপ! রুমালটা কই,—থাক্‌ এই কোঁচার কাপড়েই চোখগুলো মুছিয়ে দিই—এস—" সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্তু তাঁহার হাতের উপর আর এক চড় বসাইয়া দিয়া, কোঁচার কাপড়টা মুখে চাপিয়া ধরিয়া, দুঃসহ শোকাকুল কান্নার মাঝেই, অকস্মাৎ খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল! বিপিনবাবু তৎক্ষণাৎ হার্ম্মোনিয়মটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাবি টিপিয়া গান আরম্ভ করিলেন "ছি, ছি, ছি কর্‌লি কিলো সর্ব্বনাশি!"

বড়দিদি এতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া ইহাদের কীর্ত্তি কারখানাগুলা দেখিয়া যাইতেছিলেন, এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "তানসেন মশাই সুর থামাও,—মা গো মা, কি হুড়োহুড়িই জুড়েছে। মানুষটা বাড়ী এল, তা একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় নাই, ও কি বিট্‌কেলে কাণ্ড! থাম এবার একটু--"

বিপিনবাবু হার্ম্মোনিয়াম ছাড়িয়া হাত পা গুটাইয়া সহসা নিরীহ ভাল মানুষের মত নিঝুম হইয়া বসিলেন। নন্তু, মুক্তি পাইয়া মাথার খোপাটা ঠিক করিয়া লইতে লইতে, বিপিনবাবুর দিকে চাহিয়া জনান্তিকে অস্ফুট স্বরে বলিল "দিদির কাছেই ঠিক জব্দ! কেমন শাসন? বেশ হয়েছে, এইবার আমার মনে যা সুখ হচ্ছে!—"

বিপিনবাবু অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

নন্তু মেজদির গা ঘেঁসিয়া, কথোপকথন শুনিতে বসিল।

(২)

বড়দিদি বলিলেন "হ্যাঁরে মন্‌সা; তুই কার সঙ্গে এলি?"

প্রতিমাকে ছেলেবেলা হইতে তিনি আদর করিয়া মনসা বলিয়া ডাকিতেন। দিদির প্রশ্ন শুনিয়া, সঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়া সে হাসিমুখে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, বিপিনবাবু—অতীব-কোমল সুরে বলিলেন "মুক্তির সঙ্গে এসেছেন, সে বিষয়ে নাস্তি সংশয়ঃ!—"

নন্তু অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "আহা, তিনি মুক্তি হবেন কেন? তিনি ত দালাল, গা—"

মেজদি তাহার পিঠে একটা ছোট চড় বসাইয়া দিয়া সস্মিত মুখে বলিল "তুই থাম-না, নন্তু,—এক তরফাই ডিক্রি হয়ে যাক্-না—"

দিদির উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করিয়া, নন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সাহসে ভর দিয়া বিপিনবাবুর দিকে একটা অবজ্ঞায় কটাক্ষ হানিয়া বলিল "তাই বটে! মিছে কি? সাধে, লোকে বলে, বোকা উকীল না হলে কেউ মুন্সেফীও করে না, এ্যাটর্ণীও হয় না, হুঁ!" কথাটা শেষ করিয়াই সে মেজদিকে খুব শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া বসিল। অবশ্য সেই সঙ্গে বিপিনবাবুর দিকে সন্দিগ্ধ-নজর রাখিতেও ভুলিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ চক্ষু বুঁজিয়া, নীরবে রহিলেন।—

ক্ষণপরে বিপিনবাবু উঠিয়া জুতা পায়ে দিতেছেন দেখিয়া প্রতিমা বলিল "কোথা যাচ্ছেন?"

বিপিনবাবু বলিলেন "সুখিয়াষ্ট্রীটের বাড়ীর দরোয়ানকে ধরে আনতে, আহা বেচারী একলা নীচে বসে আছে।"

প্রতিমা বলিল "বেচারীর জন্যে অত আহা উহু করতে হবে না, তিনি মাসীমার কাছে বেশ বসে আছেন। আপনি খেয়ে দেয়ে, কাপড় পরে নিন্, থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে হবে।"

বিপিনবাবু বলিলেন "থিয়েটার!"

প্রতিমা তাঁহার বিস্ময় ভাবে দৃক্‌পাত না করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিল "গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দিদি, তুমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নাও—"

দিদি সভয়ে বলিলেন "ও বাবা, এই কচি ছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া, সে আমি পারব না। তা[illegible]? রাত জেগে কাল আমার অসুখ হলেই, ছেলে সুদ্ধ ভুগ্‌বে।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "এবং ডাক্তারের ফি, ও—ঔষধের মূল্যের জন্য নিরপরাধ ছেলের—"

দিদি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আঃ, কি যে বল তুমি!—মন্‌সা, না ভাই, থিয়েটার ফিয়েটারের হুজুগ তুলিস্ নি, এসেছিস, বেশ করেছিস্, বোস গল্প কর দু দণ্ড—"

মন্‌সা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল "সে হবে না দিদি, আজ '—' থিয়েটারে '—' প্লে হচ্ছে। আজ যেতেই হবে, আমি বলে কত কষ্টে মত করিয়ে তবে এসেছি—"

বিপিনবাবু বিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "একে হুতাশন, বিশ্বদাহক্ষম, তাহাতে ইন্ধন, তাহাতে বাতাস! দাঁড়াও দেখাচ্ছি থিয়েটার! দালালীর কাঁচা পয়সার থলি কেড়ে নিচ্ছি—"

তিনি দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন।

অসমতঃ দিদির সম্মতি আদায়ের জন্য মন্‌সা তুমুল বাক্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আজিকার মত অভিনয় বহুদিন হয় নাই, বহুদিন হইবার সম্ভাবনাও নাই,—এই অজুহাতে দিদিকে সে দৃঢ় ভাবেই চাপিয়া ধরিল,—যাইতে হইবেই! দিদি অবশ্য পূর্ব্বে এ সব বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহশীলা ছিলেন, কিন্তু আজকাল একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রতিমায় পক্ষে, হয় দিদি, নয় তাহার স্নেহময়ী ননদিনী ছাড়া, অন্য কাহাকেও সঙ্গিনী করিয়া এ সব ব্যাপারে কোথাও বাহির হইতে ইচ্ছা করে না, তাহার মতে এ সকল ক্ষেত্রে,—দিদি ও ননদিনী ছাড়া আর সকলেই আনাড়ী! ওদিকে তাঁহারা দুইজনে এখন সন্তানের মা হইয়া সংযম-বৈরাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে বসিয়াছেন, অনাবশ্যক হুজুগে আর যোগ দিবেন না! প্রতিমা চটিয়া গিয়া বলিত "এ গুলো নিতান্তই আলস্যে কুঁড়েমির চিহ্ন, আর গিন্নী হয়ে পড়ার লক্ষণ!"

ইহার উত্তরে উভয় পক্ষই সস্নেহ ক্ষমার সহিত তাহাকে ভবিষ্যত জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই।

প্রতিমার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দিদি অবশেষে যখন 'অগত্যা আজকের মত' নিমরাজী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন বিপিন বাবু প্রতিমার স্বামী নবীনকে লইয়া বারেণ্ডায় ঢুকিয়া একেবারে প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন—"দেখ্‌ছ, স্বয়ং মনসা ঠাকুরাণী,—তার ওপর আবার ভক্তিভরে তুমি অর্ঘ্য দিতে সুরু করেছ কি না, ধুনোর ধোঁয়া! নির্ব্বোধ যুবক, এর পরিণামটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? এঁদের অত্যাচার এবং অনাচারের চোটে, বাঙালী সমাজের সামাজিক বিশেষত্ব ধ্বংস প্রায় হতে বসেছে,—স্পষ্টই দেখ্‌ছ এঁরা এক একজন,—এক-একটি আস্ত সফ্রিজেট্ হয়ে দাঁড়াতে সুরু করেছেন—"

প্রতিমা ঘোমটার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ-হাস্যে অস্ফুট-স্বরে বলিল "তা নুলো ঠুঁটো সফ্রিজেট্ হওয়ার চেয়ে আস্ত সফ্রিজেট্ হওয়াই ভাল জামাইবাবু, গৃহস্থালীর কাজগুলোও তো করতে হবে!—"

সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া—যেন শুনিতেই পান নাই এমনি ভাবে বিপিন বাবু বলিলেন "এঁদের ভবিষ্যত ভেবে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে!"

নন্তু মাঝখান হইতে খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"তা, স্মেলিং সল্টটা একবার শুঁকে নিন্-না, ঝাঁ করে ঝিন্ ঝিনী ছেড়ে যাবে' খন!"

"অপারগ!" বলিয়া বিপিন বাবু হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "বস নবীন,—যাক্ ওসব ভাবনা বৃথা! ইক্ষণ হ্যাঁ হে নবীন, এখন তুমি কাকেও—বেশ আন্তরিক ভাল বেসেছ কি? বল দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে, নন্তুর অলক্ষ্যে একটা গোপন ইঙ্গিত!

নবীন এতক্ষণ নিঃশব্দেই মৃদু মৃদু হাসিতে ছিল! প্রিয়তম ফুটবল-গ্রাউণ্ড এবং ব্যবসার ক্ষেত্র ছাড়া, অন্য সর্ব্বত্রই সে অতি-নিরীহ-চালে চলে, ঠাট্টা-তামাসার দিকে মোটেই ভিড়ে না। সেই গুণেই নন্তু তাহার ভক্ত-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু আজ বিপিন বাবুর প্রশ্ন শুনিবামাত্র, নন্তু অবাক হইয়া দেখিল—নবীন বাবু তাঁহার সনাতন-অভ্যস্ত, সলজ্জ-নীরবতা ছাড়িয়া, সোজা নন্তুর দিকে চাহিয়া চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "বেসেছি বই কি! এই নন্তুকে—"

নন্তুর গায়ে যেন কে আগুনের ফুল্‌কি ছিটাইয়া দিল! লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল "এ্যা, মেজ জামাইবাবু! ও মাগো! আপনি সুদ্ধ আবার ঐসব অসভ্যতা শিখ্‌লেন! যান, আপনাদের কারুর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না, কারুর সঙ্গেই না—! এই চল্লুম এখান থেকে—"

নবীন ফুটবল খেলিয়া খেলিয়া শরীরটা বেশ মজবুত করিয়া তুলিয়াছিল, পলায়ন-তৎপর নন্তুকে টপ্ করিয়া তুলিয়া ইজি-চেয়ারের চওড়া হাতার উপর বসাইয়া দিয়া, মৃদু হাস্যে কি একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতে করিতে, বিপিন বাবু ততক্ষণে উচ্চ কণ্ঠে বাক্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন "তবে আর কি! উভয় পক্ষেই যখন বেশ আন্তরিক ভালবাসা জমে গেছে, তখন আর কি-ই-বা দেখ্‌তে হবে! কালই বহরমপুরে শ্বশুর মশাইকে লিখ্‌ছি যে নন্তুর গতিমুক্তির ব্যবস্থা ঠিক্ হয়ে গেছে, নবীনকেই সে বিয়ে করবে!"

ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে অস্থির হইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে নন্তু বলিল "দেখুন, এবার সত্যিই আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে—"

বিপিন বাবু আবার সেই কান্নার কার্য্যকারণতত্ত্ব লইয়া, যুগযুগান্তরের কাহিনী আওড়াইয়া বিশদ ব্যাখ্যায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন! বেচারা নন্তু এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল!—নবীন করুণা-প্রণোদিত চিত্তে, স্নেহময় স্বরে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়া বলিল "আহা চট্‌ছ কেন? উনি ঠাট্টা করছেন বুঝছ না? তুমি বোকা হচ্ছ কেন?"

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সুরে,—নন্তু সজোরে প্রতিবাদ করিল, "নাঃ, বোকা হবে না! এর নাম ঠাট্টা!—আপনি কিসের জন্যে আমায় ভালবাসবেন—খবর্দ্দার ভালবাসতে পাবেন না, কক্‌খোনো না—" কথা বলিতে বলিতেই দারুণ ক্ষোভে অধীর হইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া, সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আবার কান্না জুড়িল!

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বিপিন বাবু একটু থামিলেন। নবীন সুগভীর স্নেহের সহিত নন্তুর পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে বলিল "ঐ! ভালবাস্‌ব না? তুমি খুব ভাল থাক, তাই ত ভালবাসি! আমার ছোট বোন অনুকে আমি ভালবাসি না? তোমাকেও তেম্নি ভালবাসি, তাতে কি দোষ হয়েছে বল দেখি?—"

হেঁট হইয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্তু বলিল "নাঃ দোষ হয় নি! কত দোষ হচ্ছে, দেখছেন না তো যান্, আমাকে আর ভালবাসবেন না,—খবর্দ্দার না!—" শেষের কথাটা রীতিমত ধমকের ভঙ্গিতে উচ্চারিত হইল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল!

বিপিন বাবু ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মিঠে সুরে বলিলেন "কবিরা ঠিক্ এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

'বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনি ভাসে—'

নন্তুর কান্নার উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল! দিদির দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "দেখেছ দিদি দেখেছ? আচ্ছা এতে কি বলতে ইচ্ছা করে বল দেখি? তুমিই বল?"

দিদি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুই-ই বল্‌-না। আমি আর কি বলব?"

দিদির এই ঔদাস্য শিথিলতা দেখিয়া নন্তু রাগে অন্ধ হইয়া বলিল "তা বলবে কেন? তোমার নিজের বরটি কি না?"

এর চেয়ে বড় গোছের শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ বাক্য আর তাহার মনেই পড়িল না! দিদিরা হাসিয়া ফেলিলেন! বিপিন বাবু টুক্ টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, গোফে তা দিতে দিতে বলিলেন "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার আর সন্দেহ আছে! পরের বর হলে এখন অম্লান বদনে অভিসম্পাৎ করে বসতে অবশ্য, কিন্তু নিজের বর বলে—"

বড় দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি থাম ত! আচ্ছা নন্তু, পাগলামো করে কেঁদে মরছিস্ কেন বল দেখি? নবীনের সঙ্গে কি সত্যিই তোর বিয়ে হচ্ছে? না সত্যি-সত্যিই সেকথা বাবাকে লেখা হচ্ছে! তুই মিছে কথাও বুঝতে পারিস্ না?"

নন্তু চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "কি করে বুঝ্‌ব? অমন সত্যি সত্যি করে মিথ্যে বল্লে কেউ না কি বুঝ্‌তে পারে? বাবা! আমি ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, কিন্তু বড়-জামাই বাবুর মত এমন সত্যিকার-মিথ্যেবাদী কোথাও দেখি নি।"

বড় দিদি হাসিয়া বলিলেন "এইবার লাখ্ কথার এক কথা বলছিস 'সত্যিকার মিথ্যেবাদী!' তোর বড় জামাই বাবুকে মিছে করে মিথ্যে বলতে কখনো শুনলুম না, যা বলেন—তা সত্যিকার মিথ্যেই বটে! আমিই এক এক সময় এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই যে—"

প্রতিমা চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "অ-দিদি থাম ভাই, অতটা স্পষ্ট করে আর বোল না, আমার গোঁড়া হিন্দু জামাই বাবু, এখনি—আগ্যশাস্ত্র আর পতিভক্তির মাহাত্মাহানির নরক বর্ণনা নিয়ে হয় ত এমন বক্তৃতাবিভ্রাট বাধিয়ে ফেলবেন যে আজ আর থিয়েটার দেখার দফাই নিকেশ হয়ে যাবে! চল ভাই কাপড় পড়্বে—"

দিদিকে সে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল।

নবীন এই সব বহুভাষীদের মাঝে পড়িয়া বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এই বার একটু কথা বলিবার সূত্র পাইয়া—নস্তর কাঁধে হাত চাপড়াইয়া বলিল "যাও তুমও কাপড় পরে এস,—জুতো পায়ে দিও, আমি তোমায় নিয়ে ফ্রণ্ট ষ্টলে বস্‌ব—"

বিপিন বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আর আমি অম্নি পেছন থেকে গিয়ে হুলুধ্বনি করব!"

তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটে ঠোঁট মুখ কুঞ্চিত করিয়া নস্ত সজোরে বলিল "বয়ে গেল! অসভ্য কোথাকার! নিজের যেমন বিদ্যে, খালি অসভ্যের মত বিয়ের কথা! ছি, ছি,—একটু লজ্জাও করে না! আহা আবার ভাঙ্‌খোরের মত গোঁফে তা দিচ্ছেন ছাখো না!—ছিঃ, ঐ গোঁফ জোড়া দেখলে আমার এত রাগ হয়! -"

সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া, সজোরে গোঁফে তা দিতে দিতে বিপিন বাবু বলিলেন "গুম্ফ হচ্ছে, রাজপুতদের গৌরবের চিহ্ন! বড় সাধারণ জিনিস নয়! বুঝ্‌লে—"

প্রতিমা নস্তর দিকে চাহিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নস্ত বলিল "ওঃ!—তবে আর কি! তা হলে বড় বড় গোঁফওয়ালা চিংড়ি মাছগুলোও মস্ত লোক, নয়?

বিপিন বাবু হঠাৎ সে কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্যি প্রতিমা, অনেক দিন চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট্ খাওয়া হয় নি, কাল স্বহস্তে রন্ধন করে একবার খাইয়ে দাও, তুমি বেশ কাট্‌লেট্ তৈরি কর সত্য!"

প্রতিমা সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নস্ত দারুণ অপ্রসন্নতা সহকারে বলিয়া উঠিল "ছি ছি, কি পেটুক্কুরে-পনা বাপু! চিংড়ি মাছের গোঁফের নাম শুনে অম্নি, কাট্‌লেট্ খাবার ইচ্ছে! ওমা এ কি!—"

প্রতিমা বলিল "এই রে! আবার এই সাপে-নেউলে বেধে যায়! না, না, নস্ত তুই থাম ভাই, লক্ষ্মিটি আমার! জামাই বাবু,—একটু সদয় হোন্, আপনার গোঁফ জোড়াটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে ওর উন্নতি-কামনা করছি, কিন্তু মাপ করুন, আজকের মত থিয়েটার দেখাটা সার্থক হোতে দেন, দোহাই দিচ্ছি—"

নস্ত প্রসাধন-কক্ষের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিল "খবর্দ্দার মেজ দি, ওঁর দোহাই দিয়ে পা বাড়িও না, চৌকাঠের কাছেই হোঁচট্ খেয়ে পড়্বে! উনি যে কি ভয়ানক লোক তাতো জান না—!" সে অদৃশ্য হইয়া গেল!

বিপিন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "যেন সে তত্ত্বটা ও নিজে আগাগোড়াই জেনে ফেলেছে!—"

প্রতিমা বলিল "ওকে আর রাগিয়ে দেবেন না, জামাই বাবু,—একটু ঠাণ্ডা হতে দেন।"

বিপিন বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন "কিন্তু তুমি সত্যিই থিয়েটারে চল্‌বে? ও দুরভিসন্ধিটা ছাড় না।—"

প্রতিমা সবিনয়ে বলিল "না, ও কথাটি বলবেন না"।

বিপিন বাবু গালিচার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া, সুগভীর পরিতাপ ব্যঞ্জক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হায়! মহৎ লোকেরা ঠিকই বলেছেন "Swine, women, and bees, cannot be turned."

প্রতিমা বলিল "তা শূয়ার বলুন, গাধা বলুন, থিয়েটার দেখার গরজে পড়ে এখন সব সয়ে নিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখ্‌বেন্ কাল যদি কাট্‌লেট্ খাবার ইচ্ছে থাকে —"

বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বিপিনবাবু বলিলেন "আহা সাধু! সাধু! সাধে মুনি-ঋষিরা অন্নপূর্ণার পূজা করেন! বাস্তবিক বলছি মনসা, তোমাদের কোন বিদ্যেই আমি ভক্তি চক্ষে দেখ্‌তে পারি না সেটা ঠিক--কিন্তু ঐ রান্নাঘরের বিদ্যেটা, পেটের জ্বালায় বড় ভক্তি করি! এবং তোমাদের বুদ্ধি সুদ্ধি গুলা যদিচ শূয়ারের গোঁ বস্তুটির সঙ্গে Compare করছি বটে, তত্রাচ---"

প্রতিমা বলিল "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আর তত্রাচ'র কাজ নাই! তা হলে ঘোর সত্যিকার মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবেন।"

(৩)

দিদি ও নন্দ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিনবাবু চাহিয়া দেখিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "খনার বচনে আছে 'অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক ঘা?'—"

নন্দর ভিতরে সঞ্চিত উচ্চ-বাষ্পের গোলমালটা তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই. সে ক্রুদ্ধ স্বরে "হুঁ. এইবার হাঁচি, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, সাপ ব্যাং, ইঁচিংড়ে, গেবো-ফাঁড়া, সব আরম্ভ হোক্! দেখচো মেজদি —"

বিপিন বাবু বলিলেন "মেজ দি আর এখন কি দেখবে? কাল সকালে ডাক্তারের বাড়ী যাবার সময়, যখন বোন্ আর বোন্‌পো'র অসুখের সেবার জন্যে ধরে আন্‌ব তখন মনসা দেবী মজা টের পাবেন।"

বড়দিদি উদ্যত-চরণ সম্বরণ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "আঃ তুমি যদি ওরকম করে আমাদের ভয় দেখাও, তাহলে আমি বাপু যেতে পারব না। সত্যি, নিজের অসুখের জন্যে ভয় করি না, কিন্তু ছেলে যদি অসুখে পড়ে!"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া বিপিন বাবু উৎসাহিত হইয়া ছেলের দোল্‌নার দিকে চাহিয়া সুগভীর পরিতাপের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন "হায় ভগবানের রাজ্যের নিরীহ জীব!—কেনই যে এই সব দুরাচার মা'র কাছে এসেছিলে যারা অনাচার অত্যাচারের পূর্ণ—"

অধৈর্য্য হইয়া প্রতিমা বলিল "থামুন, থামুন!—নিজেরো যেমন! বিশ্ববিদ্যালয় দেবতার পাদপদ্মে স্বাস্থ্য-রত্নকে তালাক দিয়ে ছেড়ে এসে, এখন হাড়গোড় ভাঙা 'দ'টী সেজে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন,—কোন কাজে এতটুকু ক্ষমতা নাই,—একটু হাঁটতে হলে কি খাটতে হলে, অম্নি পেটে খিল্ ধরে, বুকে ঝাঁকি লাগে,—মাথা ভোঁ ভোঁ করে, সকলকে তাই মনে করেছেন, না? আমরা অমন আপনাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই না,—হুঁ! চল দিদি চল, বাড়ীতে ঝির কাছে খোকা থাক্‌বে, অসুখ-ই বা করবে কেন? আর তোমার অসুখ? ছেলের মা হয়েই তো রাত জাগা অভ্যাস ঠিক করে নিয়েছ ভাই, জামাই বাবুর মিথ্যে ভয় দেখান'য় কান দিচ্ছ কেন? চল"—দিদিকে সে টানিয়া তুলিল!

নন্দ দুই দিদির মাঝখানে আপনাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "জামাই বাবুর যা কিছু ক্ষমতা সে শুধু পড়ে পড়ে ল্যাজ্ নাড়ায়! খালি বচনের ঝুড়ি! কিন্তু একটি কাজ করতে বল দেখি [illegible]

দিয়ে এলিয়ে পড়বেন্ অকর্ম্মার সর্দ্দার ! একদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে আন্‌তে বল্‌লুম, তা যদি ক্ষমতায় হোল ! উনি আবার পরকে উপদেশ দেন !”—

বিপিন বাবু ঘাড় হেঁট করিয়া, ঠোঁট মুখ কুঁচাইয়া কি-যেন একটা উত্তর ভাবিবার চেষ্টায় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, তাঁহার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, স্বল্পভাষী নবীন কৃষ্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রসন্ন-স্মিত-মুখে মৃদু স্বরে বলিল “One tongue is enough for a woman জানেন ত, আর কত শুন্‌বেন, দাদা, এবার উঠুন-না গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুক্ষণ থেকে।”

নন্তু বলিল “আপনি খেপেছেন ? উনি থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন ? তা হলে যে অগাধ আলস্যের অপব্যবহার হবে ! সে পাত্রই উনি নন্ !”

বিপিন বাবু সামনে তাকিয়াটার উপর সশব্দে এক মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিয়া বলিলেন “রে দুর্ব্বিনীতে ! জানো গুরু নিন্দা অধোগতি !”

নন্তু হাসিয়া বলিল “তা গুরুজনরা যদি অধোগমনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান, তা-হলে একটু-আধটু নিন্দে করে তাঁদের গতি ফেরানর চেষ্টাটা এমনই বা মন্দ কি ? কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি আপনার তাকিয়া হয়ে জন্মাই নি জামাই বাবু, তা হলে ঐ ঘুসীটা এখনি ঘড়ে পড়েছিল আর কি !—বাবা !—চলুন্ মেজ জামাই বাবু, আর মিথ্যে দেরী করা কেন ?” সে নবীনের হাত ধরিয়া টানিল।

বিপিন বাবু তদ্দণ্ডেই সুর ধরিলেন “আহা কি বা মানিয়েছে রে !—”

রাগিয়া উঠিয়া নন্তু বলিল “বেশ চমৎকার মানিয়েছে রে ! চলুন মেজ জামাই বাবু—”

নবীন উঠিতে উঠিতে বলিল “দাদা সত্যিই যাবেন না ? আজকের মত চলুন-না, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য দেবার জন্যই আজ বহুদিন পরে এই প্লে-টা হচ্ছে, আজকে যাওয়া উচিত।”

বিপিন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন “উচিত বটে, কিন্তু, কি জানো নবীন, দুনীয়ায় যেখানে যত কিছু অনিষ্ট ঘটে, তার মূলে থাকেন স্ত্রীলোক ! সুতরাং এঁদের সঙ্গে পথে বেরুনো সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম বিগর্হিত কাজ !”—

বড় দিদি বলিলেন “তথাস্তু ! তুমি ঘরেই থাক, যখন খিদে পাবে, ঠাকুরকে বোলো খাবার দেবে।”

থিয়েটার যাত্রীরা নীচে নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের গাড়ী বাহির হইয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইয়া বিপিন বাবু উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন “ঠাকুর আমার খাবার দাও ; আর মধুসূদন, আমার সাইকেলে হাওয়া পূরে গ্যাসের আলোটা জ্বেলে ঠিক করে রাখো, এখনি বেরুবো।”

(৪)

থিয়েটার বাড়ীতে গাড়ী পৌঁছিলে, নবীন নামিয়া টিকিট ঘরের দিকে যাইতেছিল, সহসা সামনেই, বাইক হাতে করিয়া দণ্ডায়মান বিপিন বাবুকে এক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিপিন বাবু তাহাকে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া নিতান্ত সহজভাবেই বলিলেন “হ্যাঁ, আমি টিকিট কিনে ঠিক করেই রেখেছি ; এস।” তারপর ভদ্রলোকটীর জিম্মায় বাইক গচ্ছিত রাখিয়া, নবীনকে লইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

নন্তু গাড়ীর দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া বিপিন বাবুকে দেখিয়া ত্রস্তে জুতা মোজা খুলিয়া রুমালে জড়াইয়া বগলে পুরিল। প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল “আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বস্‌ব, বুঝলে মেজদি, আজ আর বাইরে বস্‌ব না”

নন্তুর এই আকস্মিক মতি পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড়দি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এই নাও! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! কেন? বাইরে নবীনের কাছে বেশ দেখতে পাবি ত।"

নন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল "আর আমার বেশ দেখায় কাজ নাই বাপু, ওই ছাখো-না, কে এসেছেন! বাবা, আবার!

কথা শেষ হইতে না হইতে বিপিন বাবু গাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বড়দিদি ও প্রতিমা এক যোগে বিস্ময়ে প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, এ কি কাণ্ড! এ কি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! বিপিন বাবুর চিরাভ্যস্ত অগাধ আলস্যপ্রিয়তার এ কি শোচনীয় অপব্যবহার!

নন্তু ততক্ষণে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ওদিকের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া নামিয়া পড়িল! ব্যস্ত হইয়া বলিল "মেজ জামাই বাবু, শুনুন্ কানে কানে একটা কথা বলি—"

কথাটা সুক্ষ্মকর্ণ বিপিন বাবুর কর্ণগোচর হইল—তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন "এই রে! এখানে এসেও কানে কানে কথা! নাঃ কেলেঙ্কারী আর বাকী রাখ্‌লে না।"

নন্তু একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—নিকটে কেহ আছে কি না? তারপর অস্ফুটস্বরে খুব সংক্ষেপেই বলিল "বেশ করব।

নবীনকে একপাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সে কানে কানে কি বলিল কে জানে নবীন হেঁট হইয়া কথাটা শুনিল, তারপর হাসি মুখে গাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে নন্তুর নিকট হইতে সঙ্গোপনে কি একটা জিনিস লইয়া চটপট্ পকেটস্থ করিয়া ফেলিল। নন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দেখ্‌বেন, কাউকে বলবেন না যেন।"

নবীন হাসি মুখে সজোরে ঘাড় নাড়িল, কিছুতে না।

বড়দিদি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন হাঁ গা, তুমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেচ ত?"

আকাশের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিন বাবু বলিলেন "ওঃ। আষ্টেপৃষ্টে। যুগল শ্যালিকার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে,— ওর নাম কি—তাপর কি হওয়া উচিত? নীলকণ্ঠ বোধ হয়, নয়?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল "অন্যায় বলছেন।—বাক্যবাণ গলায় ফোটে না, কানেই ফোটা উচিত, নীলকর্ণ হয়েছেন বলুন বরং। দিদি তুমি ভাবচ কেন ভাই, মাসীমা বাড়ীতে আছেন না-খইয়ে তিনি ওই আদরে ছেলেকে অমি ছেড়ে দিয়েছেন কি না? চল চল ভেতরে যাওয়া যাক।"

নন্তু চট্ করিয়া গাড়ীর পাশ ঘুরিয়া, দিদিদের আগেই দ্রুত ভিতর দিকে ছুটিল! বিপিন বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে আরে, এ ভড় বড়ে চণ্ডী পালায় কোথা? এস এস, তুমি আমাদের কাছে বস্‌বে"—

নন্তু এক লাফে সিঁড়িতে পৌঁছিয়া বলিল "না গো ধড়্‌ফড়ে সন্নিপাত মশাই, আপনাকে অত অনুগ্রহ করতে হবে না, আপনি যান্!"—

ঠিক সেই সময় একখানা জানানা-গাড়ী আসিয়া পড়িল, অগত্যা বিপিন বাবু আর বাক্য ব্যয় করিলেন না, নবীনকে লইয়া সরিয়া গেলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বড় দিদি বলিলেন "দ্যাখ্‌ নন্তু চুপ চাপ বসে থাক্‌বি। 'এটা কি' 'ওটা কি' করে চেঁচিয়ে পাশের মেয়েদের যে বিরক্ত করবি, সে হবে না"—

প্রতিমা একটু হাসিয়া বলিল "হাঁ, যা, না বুঝতে পারবি, তা বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেসা করিস্। ওইখানে বসে যেন সেবারের মত, কে কার মাসতুতো বর, কে কার খুড়তুতো কনে, তা জানবার জন্যে অসভ্যের মত চেঁচামেচি করিস্ নি, তা হলে গলা টিপে বিদেয় করে দেব বাইরে।"

নন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "না ভাই, আজ আমি কিচ্ছুটি করব না, আমায় বাইরে পাঠিও না। আজ বলে বড় জামাই বাবু এসেছেন, বাবা! আজ আবার বাইরে যায়!"

উপরে উঠিয়া দেখা গেল, বসিবার স্থানের সকল আসনই প্রায় পূর্ণ। তখনও যবনিকা উঠে নাই, মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প গুজব ক'রতেছেন। বড়দিদি আসন গ্রহণ করিয়া চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "এই রে মনসা!—পুলিন বাবুর মা আজ যে এখানে!"—

পাশের আসন হইতে একটি সুন্দরী তরুণী বলিল "আপনারাও চেনেন ওঁকে! উনি একটি বিশ্ব-বিখ্যাত জীব!"

নন্তু যদিও কিছুটি করিবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু এই 'বিশ্ববিখ্যাত জীবটির' পরিচয় জানিবার জন্য এক মুহূর্ত্তেই তাহার কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল!—তৎক্ষণাৎ তরুণীর দিকে চাহিয়া সুকোমল অনুনয়ের স্বরে প্রশ্ন করিল "কেন, উনি কি করেছেন, বলুন না।"—

প্রতিমা অস্ফুট ভাবে তর্জ্জন করিয়া বলিল "হাতী, আর ঘোড়া! চুপ, বলছি শীগ্‌গীর!—"

নন্তু দমিয়া গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। তাহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া, অপরিচিতা তরুণীর মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল! সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নন্তুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল "কিছু করেন-নি, কিন্তু উনি—এই তোমার মত বয়েস থেকে থিয়েটার দেখার নেশায় এম্নি মশ্‌গুল্ হয়েছেন, যে থিয়েটার দেখে দেখে, ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করেছেন, নিজের গয়নাগাঁটি ত গেছেই, এখন পুত্রবধূদের গয়না বাঁধা দিয়ে থিয়েটার দেখার আশা মেটাচ্ছেন। বুড়ো হয়েছেন তবু প্রতি হপ্তায় থিয়েটার না দেখ্‌লে ওঁর চলেই না। আজ নাৎনীর গলা থেকে হার খুলে বাঁধা দিয়ে এসেছেন, বড় ছেলে থিয়েটার বাড়ী পর্য্যন্ত এসে কত বকাবকি ঝগড়া ঝাঁটি করে গেল, ছিঃ, কি ইতুরে কাণ্ড বল দেখি! বিশ্ববিখ্যাত জীব বলব না ভাই?"—

নন্তু সভয়ে বলিল "বাবা!"—তারপর সে এক দৃষ্টে ওপাশে উপবিষ্টা, সেই স্থূল গঠনের প্রৌঢ়া রমণীর দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার মত বয়স হইতে এই প্রৌঢ়াকে থিয়েটারের নেশা এমন ভীষণভাবে ধরিয়াছে! উঃ, যদি নন্তুকেও তেমনই ভয়ানক নেশা ধরে! ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল!

তরুণী উক্ত প্রৌঢ়ার নেশার উগ্রতা সম্বন্ধে চুপি চুপি আরও এমন কতকগুলি ইতিহাস নন্তুকে শোনাইল যাহার পর নন্তুর বাক্য স্ফুরণের ক্ষমতাও লোপ হইল!—যতক্ষণ না রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুরু হইল, ততক্ষণ তরুণী এক-ঝাড় বলিয়া গেল, আর নন্তু অবাক্ হইয়া শুনিল!

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হইল, এবং অপ্রতিহত বেগে চলিতেও লাগিল। চারিদিকে অন্য শব্দ সংযত হইয়া গেল, সকলেই একান্ত আগ্রহে অভিনয় দেখিতে লাগিল, কিন্তু নন্তুর মাথার মধ্যে কি যে গোলমালের জট্ পাকাইয়া গেল কে জানে, অভিনয় দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ টের পাওয়া গেল না! সন্ধ্যাবেলায় বিপিন বাবুর বেসুরা চীৎকারে—"ও বাবা কি কালো"—শুনিয়া নন্তুর যত না হাসি পাইয়াছিল, এখন অভিনয় দেখিতে তার চেয়েও বেশী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল! কষ্টে সৃষ্টে সংযত হইয়া সে পাঁচ মিনিট যদি অভিনয়

দেখিতে চোখ ফিরায়, তবে পনের মিনিট কাল ঘাড় বাঁকাইয়া নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকে,—সেই প্রৌঢ়া রমণীর দিকে! প্রৌঢ়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন,—আশে পাশে ঝুঁকিয়া, এই অভিনয় করিতে কোন সালের কোন মাসের কোন তারিখের কোন কোন অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, কি কি অভিনব রঙ্গ কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পার্শ্ববর্ত্তিনীদের শুনাইতেছিলেন। নন্তু সে সব অমূল্য তথ্য শুনিতে পাইল না, শুধু দেখিতে লাগিল দূর হইতে—প্রৌঢ়ার নথ নাড়ার ঘটা! থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল—তাহার মত বয়স হইতে ঐ প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা থিয়েটার দেখার নেশায় পড়িয়াছিলেন! উঃ, নন্তুকেও যদি অমনই উৎকট নেশা ধরে! নন্তু ঘামিয়া উঠিল!

একজামিনে পাশ করিবার ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনাই নন্তু কস্মিন্‌কালে ভাবে নাই কিন্তু আজ হঠাৎ অতর্কিতে বিপুল দুর্ভাবনার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল নিজের বয়সটার জন্য? নন্তুর প্রাণটা এতই অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, যে যদি ক্ষমতায় অকুলান না হইত তবে বোধ হয় তদ্দণ্ডেই সে এক ধাক্কায় নিজের বয়সটাকে বিশ পঁচিশ বৎসর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া, তবে নিশ্চিন্তের হ্যাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত! কিন্তু সে সুযোগটা কোনমতেই হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আপাদমস্তক পূর্ণ অশান্তির মাঝে সে আড়ষ্ট হইয়া বসিল।

গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক শেষ হইয়া অভিনয়ের প্রথমাঙ্ক শেষ হইল। মেয়েরা আত্মীয় অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, বড়দিদি, মেজদিদিও গেলেন, কিন্তু নন্তু যাইতে রাজী হইল না, প্রতিমা আন্দাজেই বুঝিল,—সেটা শুধু বিপিনবাবুর ভয়ে!

যাহাই হউক নীচে হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, পুলীনবাবুর মা তখন গুটিকতক মেয়েকে জড় করিয়া—এধারে বসিয়া পরমোৎসাহে অভিনয় সমালোচনা শুনাইতেছেন, আর নন্তু দূরে বসিয়া দুই হাতের উপর মুখখানি রাখিয়া, ঘাড় কাৎ করিয়া নিস্পন্দ দেহে, নিস্পলক নয়নে,—তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রতিমা অস্ফুট স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "কিরে নন্তু, তুই যে একেবারে মোহিত হয়ে গেছিস্!—"

নন্তু চমকিয়া, সভয়ে চুপি চুপি বলিল "না ভাই মেজদি, কিযে বাপু তোমাদের এই সব থিয়েটার দ্যাখার বাই! বড় খারাপ, বড় খারাপ! বড় জামাইবাবু সাধে চিপ্‌টেন্ কাটেন্, ছিঃ, আর এ সব থিয়েটার—ফিয়েটার দেখ্‌তে এসো না বাপু, ভারী বিশ্রী জিনিস্!—"

মেজদি হাসিয়া বলিলেন "আরে! তুই যে একেবারে পরমহংস হয়ে গেলি!—রকমটা কি?"

নন্তু বিরক্ত হইয়া বলিল "না ভাই, সকল তাতে ঠাট্টা কোর না। আমি আর সাত জন্মেও, থিয়েটার দেখ্‌তে আস্‌ছি নে! ছি ছি, এ সব মানুষে দেখে না কি!"—তারপর মেজদির পিঠের উপর ঠেস্ দিয়া, বেশ একটু নিদ্রার আয়োজন করিতে করিতে বলিল "কাল বাপু আমার স্কুল আছে, বাজে কাজে রাত জাগ্‌লে চল্‌বে না, একটু ঘুমুই।"

বড় দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন "তাই বল না বাপু, যে আমার ঘুম পেয়েছে! তা নয়, যত দোষ থিয়েটার দ্যাখার ঘাড়ে!"

নন্তু দারুণ অসন্তোষের সহিত বলিল "হুঁ!" তারপর আড় চোখে পুলীন বাবুর মাতার দিকে একবার চাহিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুদিল। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, যেন থিয়েটার দেখার নেশাটা, একটা বিকটাকার দৈত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া,—পিছন হইতে নন্তর ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া মুখ পানে চাহিয়া অসভ্যের মত ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে! তাহার হাসি দেখিয়া নন্তর পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু চেহারার ভীষণতায় চিত্ত এমন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে যে ভয়ে বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না! নন্তু আড়ষ্ট, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ!

হঠাৎ দৈত্যটার প্রচণ্ড হাস্য কলরবের ধাক্কা খাইয়া নন্তর নিদ্রা ছুটিয়া গেল! চমকিয়া বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল, মেয়েরা হুড়্ মুড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িতেছে! স্বপ্নের সঙ্গে, বাহ্য দৃশ্যের বিসদৃশ্য—অসামঞ্জস্য দেখিয়া নন্তু হতভম্ব হইয়া গেল!—ভীতি বিহ্বল নেত্রে চারিদিক চাহিল, দৈত্যটা কোথা?

মেজদি বলিল "থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে নন্তু, ওঠ—"

পূর্ব্ব পরিচিতা তরুণী পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে নন্তর মুখ পানে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া গেল, "লম্বা ঘুমের মাঝে বেশ পরিস্কার থিয়েটার দেখ্‌লে ভাই!"

নন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না, শুধু মেজদিকে শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, কোন রকমে কষ্টে স্বষ্টে নীচে নামিয়া আসিল। পুলীন বাবুর মা'র সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিল, কিন্তু ভিঁড়ে দেখিতে পাইল না। থিয়েটার বাড়ীর দুয়ারের বিশৃঙ্খল—কোলাহল-বন্যার ভিঁড় এড়াইয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলেন, বিপিন বাবু বাইক লইয়া গাড়ীর সঙ্গে চলিলেন। গাড়ীতে মেজদি, বড়দি ও নবীনকৃষ্ণ থিয়েটারের দৃশ্যপট, আলোক-সমাবেশ, এবং অভিনয় সৌন্দর্য্যের অজস্র প্রশংসা সমালোচনায় যখন গাড়ী ভরাইয়া তুলিলেন, নন্তু তখন গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, পুলীন বাবুর মাতার কথা!

বাড়ীতে গাড়ী পৌছিলে, নন্তু নামিয়া সকলের আগেই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, নবীন ডাকিয়া বলিল "নন্তু তোমার সেই জিনিসটা ফেরৎ নাও—"

জুতা জোড়াটা যে নবীনের কাছে দিয়াছিল, সে কথা নন্তু ভুলিয়া-ই গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল "দেন।"—

নবীন দিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিপিনবাবু পিছন হইতে বাজ পাখীর মত ছো মারিয়া বমাল সুদ্ধ নন্তর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া,—হতা বিস্ময়ে, দারুণ আক্ষেপ চ্ছন্দে বলিলেন "এ্যাঁ! বিনামা বহনের সৌভাগ্যটা পর্য্যন্ত নবীনের! আর আমি অভাগা বুঝি সকল তাতেই বঞ্চিত!—"

নন্তু রাগ করিয়া বিপিনবাবুর হাতে জুতা জোড়াটা মায় রুমাল সুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া—টক্ টক্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল! থিয়েটার দেখিয়া আজ তাহার এতই মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে বিপিনবাবুর এই অসহ্য পরিহাস-পারিপাট্যের উত্তরে প্রতিবাদ করিবার মত আধখানা কথাও খুঁজিয়া পাইল না!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

———

অন্ধ।

—*—

দুটি চোখের অন্ধ আজীবন
কখন সে দেখ্‌লে নাক কেমন এ ভুবন,
কেমন আকাশ, কেমন মাটি;
পাতায় ফুলে বনের শোভা কেমন পরিপাটি !
কেমন নদী জল,
প্রিয়জনের মধুর দিঠি কেমন সুকোমল।
নাপিত তারা জাতে ;
বিধবা তার মায়ের হাতে
মানুষ করা শেষ জীবনের একটি মেয়ে একটি মাত্র ছেলে
মেয়ে গিয়েছে স্বামীর ঘরে মাতৃস্নেহ ফেলে !
মা খেটে খায় পরের বাড়ী
অন্ধ ছেলে ছাড়ি,
অন্ধ থাকে মায়ের গৃহ কোণে
গানের পরে গান গেয়ে তার প্রহরগুলি গোণে !
সকাল বেলা রাঁধে ছেলের রুটি ;
একটু করে সারাদিনে খায় সে খুঁটি খুঁটি !

সেদিন ঘরে ছিল না চালচুলো
দৈত্যসম চেয়েছিল ভগ্নকানা শূন্য হাঁড়িগুল ;
মা গিয়েছে কাজে,
ক্ষুধা ক্রমে প্রবল হ'ল হারুর পেটের মাঝে,
—তর্ সহে না একটুখানি
চিরদিনের পরিচিত বাসনগুলি আনি
নাড়ে চাড়ে,
পেটের মাঝে ক্ষুধা আরো বাড়ে কেবল বাড়ে !
সহ্য সীমা পেরিয়ে গেল যবে
মনে মনে ঠিক করিল ভিক্ষা চেয়ে লবে।

মুচির ছেলে ছুঁচে পরায় সুত
জড় ক'রে বসেছিল হাজার লোকের জুতো,
অন্ধ এল তাহার দ্বারে
মুচির হিয়া ভিজে গেল দয়ার সুধাধারে !
ঘরে যাহা ছিল তাহা এনে দিল তাহার হাতে ;
—কৃতজ্ঞতার অশ্রু পাতে
ভিজিয়ে দিল অন্ধ আঁখিকোণ ;
মৃদু মৃদু আশীর্ব্বচন গুঞ্জরিল হারুর মন !

তার পরেতে ফির্‌ল যখন বাধ্‌ল মহাগোল
নাপিত পাড়া কর্‌ল উতরোল,
মুচির অন্নে তুলে গ্রাস
কেমন করে কর্‌বে আবার বিধবা সে মায়ের সাথে বাস
ঐ ছেলেকে রাখে যদি আপন ঘরে
মৃত দেহ তুল্‌বে না কেউ মায়ের মৃত্যু-পরে !

তাই ত একি দায়,—
মায়ের হিয়া ছেলেকে তার আলিঙ্গিতে চায়
বুকের মাঝে টানি,
মুখে তবু বল্‌তে হবে নিঠুরতম বাণী ;
নইলে শেষে বন্ধ হবে জাতের মাঝে ওঠা বসা,
ধরলে মরণ দশা
মুখের পানে চাইবে না কেউ আর,
হবে নাক শেষের গতি, হবে না সৎকার !

* * * *

মায়ের ঘরে ঠাঁই পেলে না ছেলে
গ্রীষ্ম এল রুদ্র তেজে, বর্ষা এল বৃষ্টিধারা ঢেলে
আড়াল কিছু নাই,
গাছের তলা ভিন্ন তাহার নাইক অন্য ঠাঁই !
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে অন্ধ ফিরে একা,
ছেলের সাথে মায়ের কভু হয় না চোখের দেখা।

এমনি করে কাটল কতদিন,
দিনে দিনে অনাহারে হারুর দেহ হতেছে বলহীন !
মৃত্যুছায়া পড়েছে তার মুখে,
জগৎ শুধু চেয়ে আছে নিষ্ঠুর কৌতুকে
উপহাসের দৃষ্টি মেলে ;
অন্ধ দুটি চোখের কোলে কে দিয়েছে ঢেলে
এমন কালো কালী,—
বস্ত্রখানি হয়েছে তার শত হাজার ফালি।
দেহ অস্থিসার,—
চিরদিনের অন্ধ অন্ধকার
আরো গভীর আরো কালো ;
নাইক সেথা একটু আশা নাইক সেথা একটুখানি আলো

এমনি করে হারু যেদিন শেষে
মায়ের প্রভুর বাড়ীর মাঝে এসে
ভিক্ষা চাওয়া করলে সুরু,
বল্‌লে সবাই পাকিয়ে রুষ্ট ভুরু,
"কে বলেছে আস্‌তে হেথা বল্ ?"
প্রভুর ছোট মেয়ের চোখে অশ্রুধারা ঝরল অবিরল
বাক্স হতে এনে আপন সাড়ী
গুঁজে দিল তাহার হাতে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি !
যখন কেহ স্পর্শ নাহি করে
মেথর সেও রইল সরে প্রবল ঘৃণা ভরে,
মাতা তাহার পুত্রে ছুঁতে করলে অস্বীকার
ছোট মেয়ের মনে তখন রইল নাক কোনই দ্বিধা তার।
আপন হাতে কেটে দিল মাথার জটা,
পড়ে গেল তেল মাখান ঘটা !
নানা রকম চক্রে পাকে
আপন পাতের অন্নটুকু লুকিয়ে তুলে রাখে।

এমনি করে চলল সেবা রোজ,
—নিত্য করে খোঁজ ;
ঐ যেখানে তেঁতুল গাছে আঁধার হয়ে আছে
ঐ যে হোথা চৌমাথাটির কাছে,
আসে যেথায় পূব আকাশের প্রথম আলো ছটা,
সন্ধ্যাকাশের রক্ত রাঙ্গা ঘটা ;
ঐখানে তার আস্তানাটি ফেলেছে ঐই এসে
শক্তিহারা দেহটাকে পারে না আর চল্‌তে টেনে টো
ওষুধ দিয়ে পথ্য দিয়ে নিতি
মনের প্রীতি
পাঠায় ছোট মেয়ে।
অন্ধ বুঝি পেয়েছিল গভীরতর প্রীতি ইহার চেয়ে।
তাইত তাহার দেহ ক্রমে হ'ল শক্তিহারা ;
প্রাণ ছাড়িল ভগ্ন দেহ-কারা।
পরজ্ঞ নিল এবার বরণ করি তারে,
অনন্তেরই দ্বারে
পড়ল জয় জয়ধ্বনি ;
প্রহর গণি গণি
মাতা শুধু রইল বসে কঠিন শুষ্ক মতি,
আতের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার রইল অবাধ গতি।

বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার আর্টে নারীচিত্র।*

মাননীয়া ভগ্নীগণ। আপনাদের নিকট সাবনয় নিবেদন ;—বাংলা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র ও ফটো সম্বন্ধে আমার কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য। তাহাতে যদি আমার কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, আশা,— আপনারা অনুগ্রহ করিয়া নিজগুণে মার্জনা করিবেন।

আজকাল মাসিক পত্রিকায়, আর্টিষ্ট মহোদয়গণ আপনাদের শিল্পদক্ষতা নারীঅঙ্গে নিখুঁতভাবে দেখাইতেছেন এবং তাহা প্রকৃষ্টভাবে দেখাইবার জন্য নারীর লজ্জানিবারক বস্ত্রখানি সরাইয়া লইয়াছেন ; কোথাও বা বসনের

* বিগত ২৪শে শ্রাবণ, কলিকাতা "মহিলা-পার্কে" পঠিত।

নামমাত্র অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাহা এমনই স্বচ্ছ যে সে অস্তিত্বের কোনই মূল্য নাই—সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাহার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষীভূত। এইরূপ চিত্রের পসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; নানান্ মতের ও নানান্ রকম ভঙ্গীর চিত্র মাসিক পত্রিকায় দিন দিন যেভাবে শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে "গোপীকার বস্ত্র হরণ" চিত্রটিও যে নিখুঁতভাবে কোন মাসিক পত্রিকার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিবে সে আশা দুরাশা নহে।

শুনিতে ইচ্ছা হয় আপনাদের নিকট এরূপ চিত্রগুলি কেমন মনে হয়? ইহাতে কি আপনারা নিজেদের খুব গৌরবান্বিতা মনে করেন? হায় লজ্জাই যে নারী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ! আর্টিষ্ট মহোদয়গণ নারীদের সেই লজ্জা কোন্ নীতি বলে—নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া আপনাদের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য নগ্ন ও অর্দ্ধ নগ্ন নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সমস্ত নারীজাতির অবমাননা করিতেছেন? অতি প্রাচীন কালেও যে দ্রৌপদী স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন; আর আজ সভ্যতাভিমানী নারীজাতি নিশ্চিন্ত নির্বিকার হইয়া বিনা প্রতিবাদে জগতের সম্মুখে আপনাদের এই বিবস্ত্র নগ্ন চিত্র অনায়াসে কিনা উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন!

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে যখন আমাদের বাংলা দেশেরও চতুর্দ্দিকে ব্যাকেট-দলের হুড়াহুড়ি—আমাদের দেশের নারীসমাজ কি করিতেছেন? তাঁহাদের কি উচিত নয়, এই সকল অসংযত-বাসনা-বশীভূত চিত্র-শিল্পীদের লজ্জাপহারী হাত হইতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধন লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য সকলে মিলিয়া শ্রীভগবানকে ডাকা? তিনি যে অসহায়ের সহায়। সেই দর্পহারী ভগবান ব্যতীত আমাদের আর্টিষ্ট সম্প্রদায়কে সুমতি আর কে দিবে? আমাদের কতটুকু শক্তি—আমাদের হয়ত অরণ্যে রোদনই সার!

প্রশ্ন হইতে পারে—এই চিত্রগুলি কোন নারীবিশেষের নয়, কিন্তু এগুলি যে সমস্ত নারীজাতির। যদি কোন বিশেষ-নারীদেহ চিত্রে নগ্নরূপ অবস্থায় প্রদর্শন করা হইত তাহা হইলে সেই নারী অপমানে মৃতকল্পা হইতেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও কি সমগ্র নারীজাতির অপমান—ভগিনী! অপমান নিহিত নাই? এইরূপ চিত্র, নারীমাত্রেরই অপমানজনক; সুতরাং আমাদের সকলেরই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত।

বিগত ৪ঠা আষাঢ় এই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু আপনাদের জানাইয়াছিলাম। সেদিন একজন "—"তে প্রকাশিত "বঙ্গশ্রী" চিত্রটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এই চিত্রটি কি পবিত্রতাপূর্ণ, এতে কি কমনীয় ভাব! এতে কি দোষ?" আমি কিন্তু দেখিলাম উহা একটি নগ্নরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি, সাধারণ নারীদের যেপ্রকার উহাও সেইরূপ, তাই তাঁর কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আচ্ছা আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, ঐটী যদি পুরুষমূর্ত্তি হইত তাহা হইলে কি আপনারা ভ্রাতা-ভগিনী একত্র মিলিত হইয়া তাহা দেখিতে পারিতেন? কি লজ্জাজনক! আস্পর্দ্ধা এত যে এখন মেয়েরা আপনাদের শরীর উলঙ্গ দেখাতে ও দেখিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। পুরুষদের যে লজ্জা আছে মেয়েদের তাহাও কি নাই? এদেশীয় আধুনিক আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহারা মেয়েদের একেবারে লজ্জাহীনা করিতে চান। বিগত ৬ই আষাঢ়ের প্রবন্ধে জানাইয়াছিলাম সেদিন একজন বলিলেন "প্রকাশ্যভাবে গঙ্গাস্নানে কি লজ্জা নাই?" তাহা লজ্জাজনক খুবই কিন্তু নিজকে সংযত করিয়া উপযুক্তভাবে লজ্জারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গঙ্গাস্নান অসম্ভব নয়; স্নানার্থীর রুচির উপর তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শুদ্ধ হইতেই লোকের গঙ্গাস্নান,—হৃদয়-মনে পবিত্রতা,—ভাবকে সংযত,—দেহকে আবৃত করিয়া গঙ্গাস্নান কি এমনি কঠিন। মন যেখানে পবিত্র—ইচ্ছা যেখানে প্রবল, সেখানে সকল অবস্থাই সম্ভব। আর যদি মনে থাকে অশ্লীল,

কিছুতেই কিছু নয়—লজ্জা,—লজ্জাহীনতা—ধর্ম্মকার্য্য এসকল নারীর হস্তে। আর মাসিক পত্রিকায় যে সকল চিত্র প্রকাশিত হয় তাহার নির্লজ্জতা পরিহারকল্পে শিল্পী ও পত্রিকার কাণ্ডারী সম্পাদক ব্যতীত নারীর তাহাতে কোন হাত আছে? সে সকল চিত্রের উদ্দেশ্যই বা কি? তাহা কি কেবল পুরুষদের অদম্য রূপ-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য নয়? যাহাতে বিশ্রামকালে স্ত্রীরূপের নগ্ন-মাধুরী দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের রূপলালসা তৃপ্ত হয়—সেই জন্যই এত! ছি—ছি শিল্পি! কোন্ নীতিতে কেমন করিয়া তুমি তোমার মাতা ভগিনী স্ত্রীর নগ্নমূর্ত্তি শত সহস্র পুরুষের সতৃষ্ণ নয়নের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছ!—নিজ গৃহের কথা কি একবারও স্মরণে আসে না তোমার!

বস্ত্রাবৃত চিত্রগুলিও আমার চোখে ভাল লাগে না। আপনারা অনেকে বলিবেন কেন? বস্ত্রাবৃত চিত্রগুলি দিতে আর দোষ কি? দোষ কি তাহা আমি বলিতে অক্ষম; কিন্তু আর্টিষ্ট মহোদয়গণ কিছু দিন সুন্দরী যুবতীদের চিত্রের বদলে সুন্দর যুবা পুরুষদের চিত্র মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন যদি তখন সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

যদি "সুন্দরী" চিত্র দেওয়ার দোষ না হয় তাহা হইলে "সুন্দর" চিত্র দিতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর ত স্ত্রী ও পুরুষ দুইই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু চিত্রশিল্পী মহোদয়গণ একঘেয়ে ভাবে স্ত্রীচিত্রই অঙ্কিত করিয়া যাইতেছেন কি উদ্দেশ্যে? আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা যে কোন মাসিক পত্রিকা এক বৎসরের এক সঙ্গে দেখুন তাহাতে কয়টী বা সুন্দর স্ত্রী ও কয়টীই বা সুন্দর পুরুষ-চিত্র আছে! তাহা হইলে আমার বক্তব্যটী বেশ বুঝিতে পারিবেন।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবেন আর্টিষ্ট মহোদয়গণের সুন্দর সুন্দর নারীচিত্রগুলি সকলই হয় বিধবা নয় কুমারী! এই কাণ্ডারীহীনা তরুণীদের চিত্র পুরুষের সম্মুখে না ধরিলে কি করুণ রস ফুটিয়া উঠে—সিক্ত বস্ত্র না হইলে আর্টের পবিত্রতা ফুটে না—কেন? পুরুষের নয়ন তৃপ্তির সৌন্দর্য্য সম্ভারের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উহাতে ফুটিয়া উঠে বলিয়া? ভাল, পবিত্রতা এতই যদি, স্বামী দেবতার সহিতও নারীচিত্র সম্পর্কহীন কেন? নারী না সহধর্ম্মিণী—সে কি কথায়? পুরুষেরা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের জন্য প্রবঞ্চনা করিয়া বলিতে চান্ যে, নারী সুন্দর, তাই সুন্দর চিত্র আঁকিয়া উঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা নারীদের রূপকেই বড় মনে করিয়া, নিজেদের মনকে কত ছোট করিতেছেন তাহা একবার ধীর, অপ্রমত্তভাবে ভাবিয়া দেখুন। ব্যাখ্যা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন!

আচ্ছা, সুন্দর পুরুষচিত্র না দিয়া মাসিক পত্রিকাতে বৃদ্ধ, কুৎসিৎ পুরুষচিত্র প্রকাশ করা হয় কেন? শিল্পীদের মনে এই আশঙ্কা খুব সম্ভবতঃ জাগিতেছে যে সুন্দর পুরুষচিত্রগুলি ক্রমান্বয়ে দেখিয়া দেখিয়া পাছে মেয়েদের সুন্দর স্বামীলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে—এই নয় কি? অন্ততঃ তাঁহাদের সদাসর্ব্বদাই নারীচিত্র অঙ্কন দেখিয়া আমার ত তাই মনে হয়।

আর নারীদের ক্রমাগতই সুন্দর করিয়া অঙ্কন করাতে নারীরা এই কথাই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে তাঁহাদের রূপই সর্ব্বস্ব, তাহার তুল্য তাঁহাদের আর কিছুই নাই; রূপ দিয়া পুরুষদের তৃপ্ত করিতে পারিলেই নারী নারীত্বে সার্থক হইলেন! নারী পুরুষদের সম্পত্তি মাত্র আর সেই সম্পত্তির তারিফ তাঁহার রূপ! তাঁকে হাতের পাশা বলিতেও পারা যায়—যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকেই ফিরিতে হইবে।

হায়, আমরা কি মৃত ? আমরা কি চিত্রশিল্পী মহোদয়দিগকে বলিতে পারি না যে, আপনারা কেবলমাত্র স্ত্রী-চিত্র (হউক না কেন বস্ত্রাবৃত ও সুরুচি-সঙ্গত) দিতে পারিবেন না, তাহাতে করিয়া আমাদের নারীজাতিকে অপমান করা হইতেছে।

আনন্দ দান যেখানে উদ্দেশ্য—পবিত্রতা সেখানে মূলাধার,—আনন্দময়ের রাজ্যে কামনা লইয়া কে কবে আনন্দকে লাভ করিয়াছে!—সমগ্র মানব ঋষি নয়,—সমস্ত সৌন্দর্য্য সকলের উপভোগ করিবার অধিকার নাই,—নগ্নসৌন্দর্য্য বুঝিয়াছেন কয় জন? আত্মজয় করিয়াছেন যিনি—কেবল তিনিই! নতুবা আর্টের নামে এ নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিয়া লালসার পথে,—নরকের দ্বারে দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাহাদুরী কি আছে শিল্পি!

ভক্তিভাজন মাতাগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ, বিদায়ের পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিতে চাই,—আপনাদের চিত্র-দর্শনের আনন্দে ব্যাঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, "গোপাকে গৌতমের অশোকভাণ্ড দানের" মত যে চিত্র স্ত্রীপুরুষ উভয়েই আছেন তাহাতে কি আনন্দ পাইবেন না? মাসিক পত্রিকার আর্টিষ্ট মহোদয়গণ কি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন না?

শ্রীনীরজবালা ব্রহ্মচারীজায়া।

হিয়ার টান।

রূপের আলোকে কানন উজলি
　　গোলাপ যখন ফুটে—
সে আলোর পানে প্রকৃতির টানে
　　হিয়া সে আমার ছুটে।
এ যদি আমার দোষ হ'য়ে থাকে
　　সে দোষ কি মোর ভাই,
গোলাপ যে মোরে টেনে নিয়ে যায়
　　আমি কি সেথায় যাই!

প্রেমিক প্রেমিকা মিলে গো সেথায়
　　গভীর পুলক ভরে,
একের হৃদয় অপরের সাথে
　　সেথা বিনিময় করে;—
স্বর্গ বলিয়া প্রণমি সে ভূমি
　　এ যদি দোষের হয়,
প্রকৃতিরে তবে দুষিও বন্ধু,—
　　সে দোষ আমার নয়।

শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বিচিত্র সংগ্রহ।

(জন্তু জানোয়ার)

সমুদ্রের গভীর জলের মাছেদের মাঝে অনেকের চোখ থাকে না, কাহারও বা দেহের উপরের চোখ দেহের ভিতরে ফুটে ওঠে। আবার কারুবা মাথার খুলির গর্ত্ত থেকে আলো বাহির হয়, কারুবা গা থেকে আবার কারুবা ল্যাজ থেকে।

মাকড়সার জাল দিয়ে বায়ুমান যন্ত্রেরকাজ বেশ চলে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা হলেই তারা জালের সুতা টেনে বাঁধে আবার ঝড় বৃষ্টি আস্‌বার সূচনা স্বরূপ সেগুলি আগের মত আলগা করে দেয়।

বাঘ ও সিংহের ফুসফুস এত দুর্ব্বল যে তারা বেশী দুর জোরে দৌড়াতে পারে না। প্রথমটা তারা তেমন ছোটে যে ঘোড়াও হেরে যায় কিন্তু তারপর এক পোয়া পথ গিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াত দূরের কথা মানুষও দৌড়ে তাদের হারিয়ে দিতে পারে।

গাছ পালার যে প্রাণ আছে তা আমরা আজ কাল জান্‌তে পেরেছি কিন্তু এমন কথা কেউ শুনেছেন? সাউথ আমেরিকায় একরকম উদ্ভিদ আছে তারা তৃষ্ণার্থ হলেই জলের মাঝে একটি চোঙা নামিয়ে জল খায়। আবার তার পরেই চোঙাটি গুটিয়ে ছোট করে মাথার উপরে তুলে রাখে। মধ্যভারতে একরকম গাছ আছে তার পাতার স্পর্শে আবার মানুষকে বিদ্যুতাহত করে দেয়।

মেয়ে কুকুর প্রায়ই পাগল হয় না, মদ্দা কুকুরই সচরাচর পাগল হয়।

সূক্ষ্ম লোমের জন্য বছরে সাত কোটী করে জন্তু মারা হয়।

চড়াই পাখীরা ঘণ্টায় বাহাত্তর মাইল বেগে ওড়ে।

ছয় মাসের মাঝে একটী মাছির কত বংশ বৃদ্ধি হয় জানেন? ৬০০০০০০০০০০০০!! সাগর লঙ্ঘন করে মানুষ ত বাহবা পেয়েছেই, ত্রেতাযুগের হনুমানও পেয়েছিল কিন্তু বছরে বছরে কত প্রজাপতি যে সাগর লঙ্ঘন করছে তাদের কথা কেউ জানেও না। সাগর পারে যেমন বসন্তের উদয় হয় অমনি অন্য পার থেকে প্রজাপতির দল উড়ে যেতে আরম্ভ করে, কয়েকটি হয় ত হাঁপিয়ে জলে ডুবে মরে কিন্তু অধিকাংশই নির্ব্বিঘ্নে বসন্তের রাজ্যে পৌছায়।

(ঘর সংসারের কায়দা)

আলুমিনিয়ামের জিনিষ পরিষ্কার করতে কখন সোডা কিম্বা সাবান ব্যবহার করতে নেই, এনামেলের জিনিষে ও না, তাহলেই ফেটে যাবে। ফ্লানেলের কাপড় প্যারাফিনে ডুবিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

চাল সিদ্ধ করবার জলে লেবুর রস দিলে ভাতের রং যেমন সাদা হয় ভাতগুলি তেমনি ঝরঝরে হয়।

হাতের আলকাতরারর দাগ লেবুর খোসা ঘসে মুছে ফেললেই উঠে যাবে।

অনেকদিনের ময়লা বোতল পরিষ্কার করতে হলে পাঁচ মিনিট সালফিউরিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে পরিষ্কার জলে ধুলেই সব ময়লা উঠে যাবে।

পুরাণো ময়লা পিতলের জিনিষ আমোনিয়ায় ভিজিয়ে কাপড় কিম্বা ব্রাশ দিয়ে মাজলেই একেবারে নূতনের মত উজ্জ্বল হবে। পরে জলে ধুয়ে শুখিয়ে রাখতে হবে।

জলে একটি লেবুর রস দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করলে কাপড়ের ময়লা কিম্বা কোনরকম দাগ থাকলে সব উঠে গিয়ে ধব্‌ধবে সাদা হবে।

কালো কাঠের জিনিষের উপর আঁচড়ের দাগ ওঠাতে হলে প্যারাফিনের তেলে কাপড় ভিজিয়ে ঘস্‌তে হবে, তাতে পুরাণো পালিসও ফিরিবে।

নতুন জুতার তলায় Copal বার্নিস মাখিয়ে নিলে জুতার তলা খুব মজবুত হবে আর মাসে দু'একবার মাখিয়ে নিলে অনেক দিন টিক্‌বে।

বেশী লোনা জিনিষে একটু চিনি ও ভিনিগার মিশিয়ে দিলে লোনা স্বাদ একেবারে কমে যাবে।

গরমে কিম্বা অন্য কারণে ভাল দুধ ছিঁড়ে গেলে সে দুধ আমরা নষ্ট হয়েছে বলে ফেলে দিই। অজীর্ণরোগীর পক্ষে টাট্‌কা দুধের চেয়ে ছেঁড়া দুধ বেশী উপকারী। মুর্গিদের এই দুধ খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য ও ডিমের আরো উন্নতি হবে। চামড়ার জিনিষ পরিষ্কার করতে বিশেষ করে পেটেণ্ট লেদার জুতার পক্ষে এ একেবারে অদ্বিতীয়। এই দুধ গায়ে মাখ্‌লে যেমন রং পরিষ্কার হয় তেমনি হাত মুখ গলার সব দাগ উঠে যায়। গায়ের চামড়াও এ দুধ মসৃন করে।

শীতের রাত্রে শীত নিবারণ করবার অদ্বিতীয় উপায় গায়ের জামা কিম্বা লেপের তলায় একখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে।

গায়ের চামড়ার উপরেই মণিমুক্তা পরা উচিত; তাতে মণিমুক্তার জেল্লা বেড়ে দাম বেশী হয়।

(পাঁচ রকম)

মানুষের দেহে সবশুদ্ধ ২০০ খানা হাড় আছে আর সে গুলির ওজন প্রায় সাত সের।

আখ গাছ ছাড়া প্রায় ১৯০টি ভিন্ন ভিন্ন গাছ থেকে চিনি উৎপন্ন করা যায়।

খাঁটি দুধও দেখি জলেরই সামিল। একশো ভাগ দুধে সাতাশী ভাগ জল থাকে। গয়লাদের দোষ নেই, তারা জলেই জল ঢালে!

সুইডেনে প্রথম Safety match তৈরী হয়।

আধুনিক মত হচ্ছে সমস্ত লোকের গায়ের রং আগে লাল ছিল পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম বদলে গেছে।

ইংলণ্ডে বাহাত্তরটি জায়গার নাম নিউটন! এত বেশী জায়গা এক নামের শোনা যায় না কোথাও।

অনেক রকম ফলের ছালের পোষাক তৈরী হতে শোনা গেছে কিন্তু বেগুনের ছালের পোষাক কেউ শুনেছেন কি? লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে তাও বাকি থাকে নি।

পৃথিবীতে যত রকম কাপড় বোনা হয় তার মাঝে কাশ্মীরী শাল তৈরী হতেই সব চেয়ে বেশী সময় লাগে। এক জোড়া ভাল শাল তৈরী করতে প্রায় তিন বছর লাগে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের ট্রাম গাড়ীতে বছরে প্রায় পঁচিশ কোটী লোক চড়ে!

গত বছর আমেরিকায় আঁশ থেকে তৈরী রেশমে ষাট লক্ষ জোড়া মোজা বোনা হয়েছে।

মোটামুটি হিসাবে জানা যায় পৃথিবীতে ৩০০০০ হাজার দৈনিক আর সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, তার মাঝে অর্দ্ধেকের বেশী ইংরাজী।

ইংরাজদের বিশ্বাস ডান হাতে আঘাত লাগলে মঙ্গলের লক্ষণ কিন্তু বাঁ হাত আঁচড়ে গেলেই বিপদ!

আমেরিকার কোলোর্যাডো স্প্রিংসের মিঃ স্যালিবার্ডস নামে এক ভদ্রলোকের দেহে পাশাপাশি দুইটি হৃৎপিণ্ড পাওয়া গেছে; ডাক্তারী ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম!

ভাবি সাহারে একটা চূণ পাথর পাওয়া গেছে ওজন তার ৩০০ টন (২৮ মনে এক টন) এত ভারি চূণ পাথর এই প্রথম পাওয়া গেল।

দু' হাজার বছর আগের মিশরের এক রাজকন্যার 'মামি' বা রক্ষিত শব পাওয়া গেছে, তার দেহেও 'করসেট' পরা, তা হলে প্রাচীন কালেও এ উপসর্গ ছিল !

জাপান সাম্রাজ্যে চার হাজার দ্বীপ আছে, কিন্তু সমস্ত ইংরাজ রাজত্বে তা নেই

ভালবাসি।

(রাগিণী—খাম্বাজ)

তোমারে ভালবেসেছি বলে'
আমারে সবে ভালবাসে—
আপন ভেবে আমারে সবে
আমারি কাছে ফিরে আসে।
উপরে নীল উদার নভ
নিম্নে শ্যাম শস্প নব
ভুবন জুড়ি পবন তব
ঘুরিছে মম পাশে পাশে।
কোমল কর-পরশ সম
সন্ধ্যা আনে সুপ্তি মম
তোমার স্নেহ সোহাগ কম
দুয়ারে জাগে ঊষা হাসে।
মধুর তুমি বঁধুর প্রীতি,
করুণ-মা'র হৃদয়ে নিতি,
বচনাতীত রচনারীতি
হে প্রিয়, প্রিয়া মধুভাষে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সর্প দংশন।

——:*:——

সর্প দংশন করিলে পাশাপাশি চারিটী শ্রেণীতে কয়েকটী দন্তের দাগ পড়ে। যদি বিষধর সর্প দংশন করে তবে দুই পার্শ্বে বিষ দন্তের মোটা দাগ দেখা যায়। নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে এইরূপ দাগ পড়ে না। বিষ দন্তের দৈর্ঘ্যানুযায়ী দংশন গভীর ও অগভীর হয়। বোড়া সর্পের বিষদন্ত বড় দীর্ঘ, গোখুরা ও কেউটে সর্পের বিষদন্ত তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। সামুদ্রিক সর্পের দন্ত খুব ক্ষুদ্র। সামুদ্রিক সর্পের প্রায়ই বিষ থাকে না।

বিষাক্ত সর্পের দংশন মাত্রেই ফুলিয়া উঠে। দষ্ট স্থান অল্পক্ষণ মধ্যে স্ফীত হইয়া উঠে, লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। বিষাক্ত সর্পদিষ্ট স্থান হইতে পাতলা জলের মত রস গড়াইয়া থাকে। এইরূপ জল গড়ান অবস্থা দংশন করিবার বহু পরেও বিদ্যমান থাকে, তৎপরে রোগী মাদক দ্রব্যাদি সেবীর ন্যায় আবিলাগ্রস্ত হয়। কখনও কখনও গা বমি বমি করে, ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে পক্ষাঘাতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্ষুর পাতা খুলিবার সামর্থ্য লুপ্ত হয়, ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে, মুখ দিয়া লালা গড়ায়, গলায় শ্লেষ্মা আসে ও ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে। তাড়াতাড়ি নিশ্বাস বহে, রোগী অচেতন হয়, ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে অবিলম্বে রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। অনেক সময়ে রজ্জু পাওয়া যায় না তখন পরিধান বস্ত্র দ্বারা খুব দৃঢ় বন্ধন চলিতে পারে। দষ্ট স্থান ফালাফালি করিয়া চিড়িয়া প্যার মাঙ্গানেট অফ্ পটাস্ নামক পদার্থের দানা লইয়া তাহার মধ্যে উত্তমরূপে দিতে হয়। রোগীকে মদ্য পান করিতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। প্রয়োজন বোধ হইলে মৃগনাভি, হরিতালভস্ম প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে শুইতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী হিমাঙ্গ হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া ফোমেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে।

পঞ্জাবে কসৌলি সহরে প্রধান অনুসন্ধান সমিতি (Central Research Institute-Kasuali) হইতে এন্টিভেনিম (Antivenim) নামক এক প্রকার ঔষধ দেয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পত্র লিখিয়া পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।

কার্ব্বলিক এসিড সাপের পক্ষে ভয়ানক বিষ, উহার গন্ধে সাপ কদাপিই আসে না। সর্পের গর্ত্তে কার্ব্বলিক-এসিড দিলে সর্প মরিয়া যায়। জল মিশ্রিত কার্ব্বলিক এসিড মেঝেয় ছড়াইলে সর্পভীতি মোটেই থাকে না।

তেলাকুচা পাতার রস মাথায় ও দষ্ট স্থানে মালিস করিতে হয়। *

কাল মরিচ দিয়া মুক্তাঝুরির শিকড় বাটিয়া খাইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য হয়। †

শ্বেত করবী ফুলের শিকড় সর্পের পক্ষে যম। সেই কারণে সাপুড়িয়া এই শিকড় লইয়া সাপ খেলা করে। এই শিকড় চিবাইয়া খাইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। কার্পাস তুলার পাতার রসও মন্দ নহে। এই এই জন্য বেহার ও মধ্যপ্রদেশে কার্পাস তুলার গাছ আছে। "কাজের লোকে" প্রকাশ যে, মেদিনীপুরান্তর্গত কান্দিতে যে সকল বাদাম গাছ জন্মে তাহা নাকি সর্পদংশনের পক্ষে বড় উপকারী।

---

* † "Vegetable poison is an antidote for animal poison. So Kuchila (Nux. Vomica) & opium can be administered to a snake bitten person"—S. A.

এমেরিকান সায়েন্টিফিক নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে, কুচিলা ও আফিং মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে সেই ব্যক্তি নিরাময় হয়। * ল্যান্সেট নামক (Lancet) পত্রিকায়ও এই ঔষধ ব্যবহারে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বাসে।

—:*:—

জীবনের ধন মরণ রতন
হে চিরসুহৃদ মোর!
তব করুণায় হয়েছে আমার
বুকের তমসা ভোর,
কাল যবনিকা গিয়াছে সরিয়া—
অমার আঁধার রাতি,
চক্ষে আমার ভাতিছে পুলক—
লক্ষ অরুণ ভাতি!
সুন্দর হতে সুন্দরতর
অমর জ্যোছনা ভরা
চন্দন মাখা নন্দন ফুল
মন্দারময় ধরা!
মঙ্গল-নীরে হেরি যে আজিকে
বিশ্ব করিছে স্নান;
পদ্ম চরণে দেখিছি তোমার
রয়েছে আমারো স্থান!

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

---

* Telegraph, July 28, 1917.

দেবেন্দ্র সঙ্গমে।

আমি গত বৎসর পূজার বন্ধে হরিদ্বার দর্শন করিতে যাই। হরিদ্বার হৃষিকেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কনখলে শেঠ সুরযমল বাহাদুরের সুন্দর ধর্ম্মশালার একটী কক্ষ অধিকার করিয়া কয়েকদিন অবস্থান করি। একদিন বৈকাল বেলায় হঠাৎ কয়টী সুন্দর ফুটফুটে বাঙ্গালী যুবক ঐ ধর্ম্মশালাতেই অতিথি হইলেন। পরিচয়ে জানিলাম তাঁহারা কলিকাতার অধিবাসী সম্প্রতি দেরাদুন হইতে হরিদ্বার দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এ ধর্ম্মশালাটী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া এই খানেই দুই দিন থাকিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র এম-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র এবং হিন্দু কালেজের (বেনারস) অধ্যাপক। যে তিনটী ভাই আসিয়াছেন তাহার বড়টীর নাম সোমনাথ, দ্বিতীয়টীর নাম শিশির এবং তৃতীয়টীর নাম বিজয়। সঙ্গে তাঁহাদের ভাগিনেয় অজিতকুমারও আসিয়াছে, সেটী প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। দুই দিন ব্যবহারেই জানিলাম যুবক কয়টীর বহিঃসৌন্দর্য্য অপেক্ষাও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অধিক মনোরম। আমাকে একেবারে নিতান্ত আপনার করিয়া ফেলিলেন তাঁহাদের সঙ্গে চাকর ও ব্রাহ্মণ ছিল এজন্য আমাকে তাঁহাদের কাছে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন আমিও সে অনুরোধ এড়াইবার চেষ্টা করিলাম না। তাঁদের স্নেহ ও ভালবাসায় বশীভূত হইয়া আরও কয়েকদিন অধিক রহিয়াছিলাম। ইঁহাদের সহিত কথা প্রসঙ্গে একদিন কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা উঠিল। শুনিলাম তাঁহার বাসা তাঁহাদের বাসার নিকটেই এবং দেরাদুনের বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত লোক। শুনিলাম তিনি তথায় ওকালতি করিতেছেন এবং পসারও বেশ হইয়াছে। তাঁহার নাম শুনিয়াই হঠাৎ মনে হইল এতদূর আসিয়া একবার ভক্ত কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া না গেলে তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফল পাইব না।

আমার দেরাদুন যাওয়ার প্রস্তাবে সোমনাথ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতারা বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের বাসাতেই থাকি তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃষিকেশ হইয়া দেরাদুন যাওয়ার স্থির হইল। সোমনাথ বাবু তাঁহার সাত ভাই চম্পার বোন পারুলটীর মত টুকটুকে ছোট বালিকা ভগ্নীকে, হরিদ্বারে স্নান করাইয়াই দেরাদুনে অগ্রগামী হইলেন। আমি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা হৃষিকেশ দর্শন করিয়া দেরাদুন রওনা হইব স্থির করিলাম। আমি পূর্ব্বে হৃষিকেশে গিয়া চারপাঁচ দিন থাকিয়া আসিয়াছি, আবার তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইল।

আমরা হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম প্রাতে দেখিয়া রামাশ্রমে এক সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রসাদ পাইয়া, বৈকালে হৃষিকেশ রোড ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিলাম এবং দেরাদুনগামী গাড়ীতে আরোহন করিলাম। যাইতে পথেই রাত্রি হইল। দেরাদুন ঢুকিবার পূর্ব্বে গাড়ী হইতে ভীষণ জঙ্গলে ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হইল। তখন দূরে মুশৌরী শৈলে সহরের আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী হইতে পাহাড়ের গায়ে ঠিক ছায়াপথের ন্যায় লাগিতেছিল। একটা নগর বলিয়া মোটেই ধারণা হইতেছিল না। দৃশ্যটী বড়ই মনোরম।

রাত্রি ৮৷৷•টার সময় আমরা দেরাদুনে সোমনাথ বাবুদের বাসায় পঁহুছিলাম যেখানে দুইদিন কি-সুখেই অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বলিতে পারিনে। সে স্নেহ সে যত্ন আচার এখনো প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে।* এই বাসায় থাকিয়া একদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সান্যাল বিএ মহাশয়ের সহিত দেবেন্দ্র দর্শনে গেলাম। আমি দেবেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় একবার শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালে দেখিয়াছিলাম, তখন আমি এফ-এ পড়ি তাঁহার জামতা রাধিকা আমার সহপাঠী। সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের উপর আমি একটী কবিতা লিখি তাহা অযোগ্য হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

হে দেবেন্দ্র কৃষ্ণ সখা হে সৌম্য সুন্দর,
প্রবেশিয়া তব কাব্য নন্দন কাননে
সাগসী চোরের মত, হে মৌলিমন্দার,
বৃন্তচ্যুত করিয়াছি কত পারিজাত
কল্পদ্রুম কিশলয়। স্নিগ্ধ ফুলবাপি!
তুলেছি অঞ্চল ভরি। ছিঁড়েছি কতই
পরুষ নখরে মোর সুবর্ণ সেফালি।
রক্তোরুণ কর দুটী আছে সাক্ষী তার!
পড়িছে সম্মুখে ধরা, হে বিশাল আঁখি
পলাবার শক্তি নাই বাঞ্ছা নাই হৃদে,
আপনি দিতেছি ধরা। ক্ষমিয়ো না দেব
কৃত অপরাধে। রাখ দৃঢ় বদ্ধ করি
নিশিতে পরাগ-অন্ধ ভ্রমরের মত
তব পদ কোকনদ রম্য কারাগারে।

দেবেন্দ্রনাথ আমায় যে এত শীঘ্র চিনিতে পারিবেন তাহা ভাবি নাই। প্রভাত সাতটার সময় তাঁহার কবিকুঞ্জে উপস্থিত হইলাম, সুন্দর বাড়ীটী, সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি পড়ে ধূ ধূ মাঠ, দূরে মুশৌরির উচ্চ পাহাড় মধ্যে কোন ব্যাবধান নাই। মুশৌরির বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য গৃহগুলি এক একখানি সাদা পাথরের টালির ন্যায় মনে হয়। রাত্রে তেমনি ছায়াপথের মাধুরী অনুকরণ করে। দেবেন্দ্রনাথের গৃহের টিনের ছাদে আইভি লতা বেড়িয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। 'আনার' ও 'আপেল' নামে তাঁর দুটী ছোট ছেলে মেয়ে তাহাতে খেলা করিয়া বেড়ায়।

দুইবার ডাকিতেই দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া "ও কুমুদ তুমি এসেছ, এসো এসো ভিতরে এসো"

"এসো হে স্বদেশী বন্ধু চির বিদেশীর
বুকে ধরি করি আলিঙ্গন"

* বড়ই দুঃখের বিষয় নিখিলনাথ বাবু অকালে দেহত্যাগ করিয়া সুখের সংসারটী একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছেন, পরে জানিলাম তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যদি দেরাদুনে তাঁহার বাসায় উঠিয়াছিলাম জানিয়া রোগ-শয্যাতেই বলিয়াছিলেন "কুমুদ কি জানে না যে সে আমার সহপাঠী, সে আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিত।" এই-আতিথেয় পরিবারকে ভগবান শান্তি দিন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। প্রঃ লেঃ।

বলিয়া একেবারে বক্ষে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁর কবিতার ন্যায় তাঁর স্নেহও একেবারে সারা বুক অধিকার করিয়া বসে। বহুদিন পর পুত্র গৃহে ফিরিলে পিতা যেমন ভাবে আদর করেন এ আদর অনেকটা সেই ধরণের। আমি বলিলাম এতদূর আসিয়া আপনার শিষ্য হইয়া আপনাকে না দর্শন করিয়া গেলে যে পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম হইবে তাই দর্শন করিতে আসিয়াছি, আমরা ত আপনাদের শিষ্য বই আর কিছুই নই। তিনি হাসিয়া বলিলেন "জানো হিন্দীতে একটা কথা আছে;—গুরু ত চেটো গুড়ই রহিয়া গেলেন, শিষ্য যে চিনি হয়ে গেল।" তোমরাও তাই আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তার পরে বলিলেন "যাক্, তুমি নিখিল বাবুদের ওখানে উঠেছ ভালই করেছ, তিনি অতি মহৎ লোক ও আমার বন্ধুই বলিতে হইবে, কিন্তু এখন তোমাকে আমার বাড়ীতে থাকিতে হইবেই। আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইতে পারিলাম না। সোমনাথ বাবু প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া এই-খানেই আসিলাম।

কবিবর বাড়ীর গুরুজন তাঁহার খুড়িমার নিকট ডাকিয়া আমায় আহার করিতে দিলেন, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের-লোক হইয়া গেলাম। মাতৃকল্পা কবিপত্নীকে প্রণাম করিলাম। খুড়িমার নিকট শুনিলাম তিনি এখনো 'কণে বউ'এর মতই থাকেন সর্ব্বদা গৃহকাজ লইয়া ব্যস্ত।

আমি কবিবরের সহিত তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়া ও স্বচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার এত যত্ন ও আহার হইতে লাগিল যে আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। শেষে বলিলাম এত অধিক মাত্রার যত্ন ও আহার পাইলে আমাকে অদ্য রাত্রিতেই রওনা হইতে হইবে।

পথে আসিবার সময় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আতা বিক্রয় করিতেছিল, আতা দেখিয়া কবিবরের 'লক্ষ্ণৌ আতা' নামক সুন্দর কবিতাটী মনে পড়িল, যেরূপ মনে আছে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

চাহি নে আনার যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর।
চাহি নাক কেউ যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির পাণ্ডু বদন রুচির।
একটুকু রসে ভরা চাহি নে আঙুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটীর।
দাও মোরে ওই জাতি সুবৃহৎ আতা
রক্ষিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া
রূপসী বেগম কোনো হয়ে উল্লসিতা
পাড়িত। সে গর্ব্বে হর্ষে আনন্দে গুমরি
মিশে যেত রসিকার রসনা উপরি।

অধিক মূল্য দিয়া দুইটী আতা কিনিলাম এবং তাহাতে অপূর্ব্ব নূতন আস্বাদ পাইলাম। আমার দেখাদেখি আরও দুই তিন জন সহযাত্রী কিনিলেন কিন্তু তাহাতে সাধারণ আতা অপেক্ষা কোন নূতন স্বাদই পাইলেন না। আপনার কবিতা লক্ষ্ণৌ আতাতে আমার পক্ষে একটা নূতন স্বাদ দিয়াছিল কি না?

The beauty that near was on sea or land

The consecration of a poets dream.

শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তুমি যে আতা কিনেছ সে আতার কথা ত লিখি নাই লক্ষ্ণৌ এর আতা খুব ভাল বটে কিন্তু সে বৃহৎ আতা ষ্টেশনে বিক্রী হয় না।"

তার পর তাঁর 'কদম্ব সুন্দরী'র কথা উঠিল-'কদম্ব সুন্দরী'র মত সুন্দর কাব্য আমি খুব কমই পড়েছি, যেমন মধুর তেমনি সরস সুন্দর। তার মধ্যে কেন দুএকটা হালকা কথা দিয়েছেন কবিবরকে তাহা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "তার কারণ ত তাতেই দেওয়া আছে।" বলিয়া আবার হাসিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী ঠিক ভাবে সাজানো ও বাছা না হওয়ায় তাঁর কবিতার রস সাধারণে সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, বলায় তিনি বলিলেন "উহা এত তাড়াতাড়িতে মুদ্রিত হয় যে তাহার অবকাশ ছিল না। কবিতাগুলা যেখানে-সেখানে হইয়া গিয়াছে।"

তাঁর 'অশোকগুচ্ছে' তবু অনেকটা বাছিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া কবিতা প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু অন্যগুলিতে তার একান্ত অভাব। তারপর বর্ত্তমান কবিতায় তাঁর পূর্ব্বের সে অপূর্ব্ব মাদকতা নাই বলায় তিনি বলিলেন "তা ঠিক বটে একজন সাহিত্যিক ত বলিয়াছেন "আমার কবিতার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে। তবে জানো আমার কৃষ্ণ থেকে যতটুকু মাদকতা থাকে থাকুক, কৃষ্ণহারা মাদকতা চাই নে। সত্যই দেখিলাম কবিবর অর্দ্ধ সন্ন্যাসী অর্দ্ধ গৃহীর জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি কেবল লিখিয়া নয় জীবনেও দেখাইতেছেন ;—

"হরি বিনা গান মিছে হরি বিনা জ্ঞান মিছে
হরি বিনা প্রাণ সে ত জীবনে মরণ।"

তাঁহার গৃহে প্রতিদিন প্রভাতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া গীতা পাঠ করেন এবং কবিবর সর্ব্বদাই হরিপ্রেমে ভোর। তাঁহার ভবনটী বঙ্গবাণীর শৈলাবাস, এখানে আসিলে সে বঙ্গ সাহিত্যের আবহাওয়া যেন পাওয়া যায়। সে ভবন "যেন অশোকে, আবীরে লালে লাল।" "তাঁর বুকের কূলে কূলে, প্রাণের অশথ মূলে" যেন তেমনি জাহ্নবী বহিতেছে" তিনি বুক জুড়িয়া বাঙ্গলার ছবি রাঙ্গাতেছেন। ওই শৈলাবাসে 'বাঙ্গলার কবি' যেন বাঙ্গলার সাহিত্য-সম্পদ লইয়া আপন মহিমায় বসিয়া আছেন, তাহাতে ইহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের তীর্থভূমি করিয়া তুলিয়াছে। কবির কাব্যের সরলতা তাঁর প্রাণ হইতে পারিয়াছে, সে প্রাণ কত গভীর কত স্বচ্ছ তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

কবিবরের সহিত তাঁর 'দ্বারকা' দর্শনের কথা ও দেশপর্য্যটনের কথা হইল। তাঁহার যে বালিকা কন্যার উদ্দেশে 'দুহিতা মঙ্গলশঙ্খ' লিখা তাঁকে দেখিলাম। অল্প দিন পূর্ব্বে এখানে বিখ্যাত মহিলা-কবি কামিনী রায় আসিয়াছিলেন এবং কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ দিলীপ ও কন্যা মায়াদেবীও দেবেন্দ্র সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতেই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শালীপতি-ভাই ব্যারিষ্টার Mr. Chatterjee র সঙ্গে আলাপ হয়। অতি মধুর চরিত্রের লোক, বঙ্গভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ।

দুই দিন থাকিয়া আমি কবিবরের নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার Rikhshaw খানিতে দুই জনের স্থানে তিন জন চার জন চাকর দিয়া আমায় ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন, বিদায় দিতে যেন কত কাতর। "বাড়ী গিয়ে পত্র দিবে, পথে সাবধানে যাইবে" প্রভৃতি কথা যেন বলিয়া ফুরায় না। এত সরল সহজ সুন্দর ব্যবহার কোথাও দেখি নাই। এ যেন একেবারে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় উদার উন্মুক্ত, কোথাও এক বিন্দু মেঘ মালিন্য নাই। মনটী দেরাদুনের ইউক্যালিপটাস্ Avenewএর চেয়েও সরল সুন্দর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র।

সাধ্বী পূর্ণিমা দেবী।

কার্য্যব্যপদেশে রঙ্গপুরের অদূরবর্ত্তী ভূতছাড়া গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ভূতছাড়ার অন্যতম ভূস্বামী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসেই আমাদিগকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সৌজন্য বিনয় ও অমায়িকতা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

যাহাকে আবাস বলিলাম উহাকে আবাস না বলিয়া দেবালয় বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। নাতিপ্রশস্ত নাতিদীর্ঘ চত্বরের পুরোভাগে মাতা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বিরাজিতা। মাতা দশভুজারূপে অবস্থান করিতেছেন। মতে মন্দির সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইলে পূর্ব্বপার্শ্বে রামেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, জয়কালী ভৈরবেশ্বর ও দুর্গাবল্লভ মহাদেবের মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণ ভূস্বামী লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২১৪ সালে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে মাতা রাজরাজেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ১২১৩ সালে অনন্তধামে প্রস্থান করেন। তদবধি প্রতিদিবস মাতৃ-মন্দিরে নিত্য দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ লক্ষ্মণচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র লক্ষ্মীকান্ত জননী রামমণির নামে রামেশ্বর, জনক লক্ষ্মণচন্দ্রের নামে লক্ষ্মণেশ্বর ও তিন পিতৃব্য কালিকা প্রসাদ, ভৈরবনাথ ও জয়দেবের নামে জয়কালী ভৈরবেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মীকান্তের পুত্রবধূ রাজকুমারী স্বামী দুর্গাকান্তের নামে দুর্গাবল্লভ শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়দেবের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী পূর্ণিমা দেবীর অলৌকিকা পতিভক্তি এবং জয়দেবের শরণাগতরক্ষণ এই ভূস্বামী বংশকে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরো" ইতিহাস প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিবে। সে অপূর্ব্ব পুণ্যকাহিনী পরে আলোচনা করিব আপাততঃ এই ভূস্বামীবংশের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

অত্যল্পকালের মধ্যে এই ধর্ম্মপ্রাণ ভূস্বামী বংশের কুলপরিচয় যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, এই বংশের আদিপুরুষ হরিদেব চুঁচুঁড়া হইতে ৬ মাইল দূরে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। হরিদেবের পুত্র রামকান্ত সর্ব্বপ্রথম রাঢ়দেশ হইতে বারেন্দ্রভূমিতে আগমন করেন। তখন প্রজারঞ্জক সুশাসক নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে বঙ্গদেশের নানারূপ আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইতেছিল। দেশবাসিগণই তৎকালে কার্য্যতঃ দেশ শাসন করিতেন। নামসর্ব্বস্ব মোগলসম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে বাঙ্গালার নবাব ও তাঁহার অনুচর ফৌজদার সুবেদার প্রভৃতি স্বার্থসাধন ও রাজস্ব সংগ্রহেই লিপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালীই তখন দেশ শাসন করিত, প্রয়োজন হইলে শাসক সম্প্রদায়ের অনুকূলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে লাঠি ধরিত, আবার সম্ভব হইলে রাজ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে ত্রুটি করিত না।

হরিদেবের পুত্র রমাকান্ত নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনকালের শেষভাগে কোন রাজকার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তর বঙ্গে আগমন করেন। ইহার পুত্র দর্পনারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গপুরের অদূরবর্ত্তী ঘড়িয়ালডাঙ্গা গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণ ও জয়দেব, পিতা দর্পনারায়ণের ন্যায় উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা সাধারণতঃ লক্ষণ বক্সী ও জয়দেব বক্সী নামে পরিচিত ছিলেন। জয়দেবের পুত্র যাদবেন্দ্র রঙ্গপুরে খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন। তৎকালে দেশের শাসনতন্ত্র বিশৃঙ্খল থাকায় দস্যু তস্করের উপদ্রব প্রবল ছিল। লক্ষণ বক্সী প্রথমে ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে পাশগুপ্তা পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ বর্ত্ম নির্ম্মাণ করেন। এই রাস্তার পার্শ্বে দেবালয় ও অতিথিশালা নির্ম্মিত এবং পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। অধুনা এই বর্ত্ম ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে রঙ্গপুর আগমনের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। লক্ষণবক্সীর নির্ম্মিত রাস্তা ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান কালেও লক্ষণব ক্সীর যাল্লী (Road) ও লক্ষণ বক্সীর তাপাও (Tank) নামে পরিচিত হইয়া জনসাধারণের চিত্তে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া থাকে।

লক্ষণবক্সীর প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও অতিথিশালা বর্ত্তমানে ভূতছাড়া গ্রামের জমিদার বাবুদিগের আবাস বাটীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মাতা রাজরাজেশ্বরীর সেবাইতমাত্র। ইহাদিগের সমস্ত ভূসম্পত্তি মাতা রাজরাজেশ্বরীর নামে উৎসর্গীকৃত।

তৎকালে পরগণে উদাসীর প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামীবর্গ ভূতছাড়ার অদূরবর্ত্তী কুর্শাগ্রামে বাস করিতেন। এখনও ইহাদিগের বংশধরগণের কেহ কেহ কুর্শাতে অবস্থান করিতেছেন। এই বংশের ঈশান চৌধুরী মহাশয়ের এক পুত্র এবং ঈশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা ও দৌহিত্রী ইত্যাদি কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। দর্পনারায়ণের চারিপুত্র লক্ষ্মণবক্সী, ভৈরবনাথ, কালিকাপ্রসাদ ও জয়দেবের মধ্যে কালিকাপ্রসাদ ও ভৈরবনাথের কোন বংশধর বিদ্যমান নাই। লক্ষ্মণ বক্সীর বংশধরদিগের মধ্যে বক্সী মহাশয়ের পৌত্রের দৌহিত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায় অল্প কাল পূর্ব্বে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। দৌহিত্র প্রাগুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমানে ভূতছাড়ার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

জয়দেবের প্রপৌত্রদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধুনা ৺বারাণসী ধামে অবস্থান করিতেছেন শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র বক্সী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। অন্যতম শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র কাশীতে বহুমূল্য অলঙ্কার ও জহরত ইত্যাদির কারবার করিতেছেন। নীরদচন্দ্র হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীত ও কবিতা

রচনায় বিশেষ দক্ষ। নিজেও সুগায়ক। প্রসিদ্ধ জহুরী বলিয়া ইঁহার সুপ্রতিষ্ঠা আছে। ইনি কবিতাকারে স্ববংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ইঁহারই সাহায্যে আমি পূর্ব্বোক্ত বংশপরিচয় বহুলভাবে অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভূতছাড়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া এক সময়ে খরসলিলা মনাস প্রবাহিত হইত। বহুপণ্যবাহী তরণী এই পথে যাতায়াত করিত, মনাসের উত্তর প্রাপ্ত খরস্রোতা পর্ব্বতদুহিতা তিস্রোতার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অধুনা বিগত সলিলা মনাসের খাতমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পূর্ব্বে মনাসের এইরূপ দুরবস্থা হয় নাই। তৎকালেও ইহার বক্ষে বহু পণ্যবাহী তরণী যাতায়াত করিত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্যে এক ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। সলিল বহুল নদনদীসমূহ সুবিস্তৃত চরভূমিতে পরিণত হয় পরন্তু বহু উচ্চভূমি সলিল সমাকীর্ণ হইয়া যায়। মনাসের নাতিগভীর সলিলগর্ভ এই সময়ে উন্নত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে সমস্ত নদীগর্ভ মজিয়া যায়। সম্ভবতঃ আর কয়েক বৎসর পরে মনাসের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

• • • • •

দ্বিপ্রহর—বায়ু বহে না, পাতা নড়ে না, বিশ্বজগৎ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে বিরাজিত। প্রখর রৌদ্র দশদিক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই রূপ অসময়ে পরগণে উদাসীর জমিদার পুণ্যকীর্ত্তি জয়দেব বক্সীর শরণাপন্ন হইলেন। জয়দেবের তখন স্নানাহার হয় নাই। নিয়মিত রূপে দেবতাদি পূজা সমাপন করিয়া জয়দেব গৃহের বাহির হইতেছিলেন। এমন সময়ে উদাসীর জমিদার ধর্ম্মপ্রাণ জয়দেবের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। আপন ভ্রাতা, ভ্রাতাকর্ত্তৃক বিতাড়িত ন্যায্য ভূসম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত। কে তাঁহাকে সাহায্য করে? তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ শরণাগতরক্ষক প্রবল পরাক্রান্ত জয়দেব বক্সীর নাম সর্ব্বত্র লোকমুখে প্রচারিত ছিল। জয়দেব আত্মীয় বটেন। সুতরাং বঞ্চিত-বিভব ভূস্বামী অনন্যভাবে জয়দেবের শরণ প্রার্থী হইলেন। জয়দেব তাঁহাকে স্নানাহারের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার অপহৃত বিভব উদ্ধারের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান না করিলে তিনি স্নানাহার করিবেন না। অবশেষে ঠিক হইল, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার পক্ষ সমর্থনের জন্য জয়দেব কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উত্থাপন করিবেন। সম্পত্তির উদ্ধার সাধিত হইলে পরগণে উদাসীর দুই আনা সম্পত্তি জয়দেব ও তাহার বংশধরগণ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। ধর্ম্মপ্রাণ জয়দেবের নিকট উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্ব্বক বঞ্চিতবিভব ভূস্বামী স্নানাহার করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে জয়দেব প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

তখন ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা গমন সহজ সাধ্য ছিল না। নৌকা ও স্থলপথে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যানি অতিক্রম করিয়া লোকে ভয়ে ভয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিত। দস্যুতস্করের উপদ্রবে প্রাণ হাতে করিয়া পথের বাহির হইতে হইত। আমরা গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে অবগত হইতে পারি এক সময়ে এই জেলার জনৈক ভূস্বামীকে কলিকাতায় গমন করিতে হওয়ায় তাহার পথের ব্যয় এক সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহা অনুমান দেড়শত বৎসরের কথা। জয়দেবও অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের জন্য জয়দেব যথাকালে কলিকাতায় পৌছিলেন।

মাসের পর মাস চলিয়া গেল, জয়দেবের সংবাদ নাই। অনাহারে অনিদ্রায় অনন্য-কর্ম্ম জয়দেব শরণাগতের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীমাত্রকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ন্যায় ও ধর্ম্মের সমর্থনের জন্যই তিনি সুদূর রঙ্গপুর হইতে ভারতের-রাজধানী কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহার প্রবল যুক্তিতর্কের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। জয়দেব জয়লাভ করিলেন।

কয়েক মাস পরে একদিন সহসা প্রচারিত হইল জয়দেব মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। ইহারই কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল অনাহার, অনিদ্রা, উদ্বেগ অনিয়মিত পরিশ্রম এবং তদানীন্তন কলিকাতার দূষিত স্বাস্থ্যের ফলে জয়দেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। জয়দেব স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সোদর প্রাণলক্ষণ, কালিকা প্রসাদ, ও ভৈরবনাথ সকলেই ভ্রাতার পীড়ার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন। পতিব্রতা পূর্ণিমা দেবী হৃদয়ে চিন্তানল পোষণ করিয়া অবিচলিতভাবে সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কে যেন তাহাকে বলিয়া দিত তাহার দেবতুল্য স্বামী জয়দেবের ইহলোকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে সত্বরই তিনি অনন্তলোকের যাত্রী হইবেন।

দিন যাইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গের চিন্তা ও উদ্বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা ছিল না, তাড়িৎবার্ত্তা ও রেলপথ অনেকের পক্ষে কল্পনার সামগ্রী ছিল। সুতরাং আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক না কেন কাহারও বিশেষ কিছু প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিলনা।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে পতিব্রতা পূর্ণিমা দেবী পরিচারিকার সাহায্যে লক্ষণ বক্সীকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাহাকে এখনই রঙ্গপুরে যাত্রা করিতে হইবে। তিনি অবিলম্বে যেন উপযুক্ত-সংখ্যক দাসদাসী পাইক পাল্কী বেহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

লক্ষণ বক্সী একটু বিচলিত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি অন্দরে বলিয়া পাঠাইলেন বধূমাতা অকস্মাৎ রঙ্গপুরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে রঙ্গপুরে গমনাগমন তখন সহজ সাধ্য ছিল না। লক্ষণ বক্সী বধূমাতার উদ্বেগের কারণ জানিতে চাহিলেন।

পতিপরায়ণা পূর্ণিমাদেবী ভাসুরের অনুমতি গ্রহণের জন্য অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী একটি পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে বল্ তিনি সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইয়া রঙ্গপুরে পৌছিয়াছেন এই মুহূর্ত্তেই আমাকে রঙ্গপুরে যাত্রা করিতে হইবে নচেৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।"

লক্ষণ বক্সী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। জয়দেবের রঙ্গপুরে পৌছিবার সংবাদ ত তিনি প্রাপ্ত হন নাই! তবে বধূমাতা কি করিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন?

লক্ষণ বক্সী জানিতেন না পতিব্রতার হৃদয়-মুকুরে স্বামীর প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা প্রতিফলিত থাকে। এই হৃদয় মুকুরের সাহায্যেই পতিব্রতা পূর্ণিমাদেবী স্বামী জয়দেবের রঙ্গপুরে আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অবিলম্বে পাল্কী বেহারা দাস দাসী পাইক বরকন্দাজ সমস্ত সজ্জিত হইল। ঘড়িয়ালডাঙ্গার পরিবারবর্গের মধ্যে একজনও বাটিতে রহিলেন না। জয়দেবের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া সুবৃহৎ পরিবার রঙ্গপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে জয়দেবও রঙ্গপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি জানিয়াছিলেন তাঁহার কালপূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং যথাসম্ভব উপযুক্তসংখ্যক লোক সঙ্গে করিয়া তিনিও ঘড়িয়ালী ডাঙ্গার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

পথিমধ্যে উভয়ে দলের সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী স্ত্রীতে মিলন হইল। জয়দেব পূর্ণিমা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'আমার কালপূর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।' পতিব্রতা পত্নীও অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "আমিও তাহা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিলাম। তাই যথাকালে প্রভুর অনুগমন করিবার জন্য স্বেচ্ছায়গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

উষার অস্ফুটালোক ধরাতল ঈষদালোকিত করিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মপ্রাণ জয়দেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। খরসলিলা মনাসের পবিত্রবক্ষে স্বামী স্ত্রী উভয়ের শেষ চিহ্ন মিলিত হইয়া যায়।

পতিব্রতা পূর্ণিমা দেবী সম্ভবতঃ ১২০১ হইতে ১২১০ সালের মধ্যে স্বামীর সহিত চিতারোহণ করেন। ১২১২ সনের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় মাতা রাজরাজেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১২১৩ সালে ভ্রাতৃগতপ্রাণ লক্ষ্মণ বকসী ভ্রাতার অনুগমন করেন।

পতিব্রতা পূর্ণিমাদেবী যে স্থানে চিতারোহণ করেন, ঐ স্থানে কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জয়দেবের উপযুক্ত বংশধর শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন মাতা রাজরাজেশ্বরীর ইচ্ছা হইলে বর্ষেক মধ্যে তিনি এই শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইবেন।

মাতা রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরগাত্রস্থিত ইষ্টকের উপর দেবদেবীর খোদিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য পদার্থ। এই সমস্ত মূর্ত্তির একটিও কুরুচি ও অশ্লীল ভাবসম্পন্ন নহে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে গৃহীত দেবলীলা সমূহের বিবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র ভাস্করের চিত্রফলকে সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এক স্থানে দেখিলাম, গোলন্দাজ সৈন্যগণ দ্বিচক্রযানের সাহায্যে কামানসমূহ স্থানান্তরিত করিতেছেন। এই চিত্রাংশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পলাশীযুদ্ধের স্মৃতি তখন নিরক্ষর ভাস্করের হৃদয়-ফলকে কিরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরটি একশত বর্ষের অধিক কাল নির্ম্মিত হইলেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহার একপার্শ্ব সামান্য বসিয়া গিয়াছে মাত্র।

শ্রীকেশবলাল বসু।